ভারতবর্ষ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

CALCUTTA UNIVERSITY Library

পৌষ ১৩৭২

৫৩-তম বর্ষ
দ্বিতীয় খণ্ড
প্রথম সংখ্যা

শক্তিপদ রাজগুরুর বিপুল-কাহিনীর নূতন উপন্যাস

বাসাংসি জীর্ণানি

[illegible] পুরাতন জমিদারীবংশের পতন—মধ্যবিত্ত বিংশশতাব্দীর নূতন বাস্তব যুগের উত্থান। প্রাচীন ভাঙ্গাবাড়ি পরিবেশের ঘনিষ্ঠতায় আনন্দে [illegible] আর গড়া, সমস্যা ও সমাধানের অভিনব চৌদ্দ [illegible] একদল নর-নারী। তারকবন্ধুবাবু বকুল আর [illegible], সন্দীপ আর প্রীতি, তুহিন আর কনক-বৌ, গোকুল আর পাঁচু বাবু, ঝরিগর আর মিষ্টি, অবিনাশ আর নিতে বাউরী, জীবন আর [illegible], [illegible] আর রাণী, সতীশ আর এলোকেশী, সনাতন আর গঙ্গাপদি—একজন আরো অনেকেই এই উপন্যাসে ভিড় ক'রে এসেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রই মনে দাগ কাটার মত। কিন্তু তাহাদের [illegible] একত্র যোগাযোগ এক অনবদ্য সৃষ্টি।

পরিবর্তনের পটভূমিতে জীবনের রূপায়ন।

চেনা-জানা পরিবেশে নূতন ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা এমন প্রাণবন্ত উপন্যাস অনেকদিন বাঙলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়নি।

দাম—চৌদ্দ টাকা।

—অন্যান্য উপন্যাস—

গৌড়জন বধূ	৫-৫০
কেউ ফেরে নাই	৭-৫০
কাজল গাঁয়ের কাহিনী (২য় সং)	৫,
মণিবেগম (৩য় সং)	৬-২৫
কুমারী মন (ছায়াচিত্রে রূপায়িত)	৩-৫০
জীবন-কাহিনী (ছায়াচিত্রে রূপায়িত)	৪-৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

ভারতবর্ষের সূচী

ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম সংখ্যা

পৌষ—১৩৭২

লেখ-সূচী

১। ব্রহ্মের নিত্যত্ববাদ (প্রবন্ধ)
ডক্টর রমা চৌধুরী ... ১
২। ব্রহ্মসূত্র (কাব্যানুবাদ)
পুষ্পদেবী সরস্বতী শ্রুতিভারতী ... ৭
৩। অঘটনের পূর্বরাগ (উপন্যাস)
শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ৭
৪। লোকোত্তর প্রতিভা (পরিচয়)
অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ১৪
৫। মোক্ষধাম (প্রবন্ধ)—শ্রীপথিক ... ১৯
৬। মিলি সেনের ককটেল পার্টি (নাটিকা)
নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ... ২১

চিত্র-সূচী

১। অরুণাচলম্, ২। মুখ্য প্রবেশপথের মোহিনী —অরুণাচলের মন্দির, ৩। অরুণাচলেশ্বর মন্দিরে -ভিরুবণ্ণামলৈ, ৪। মহর্ষি রমণের আশ্রম— বণ্ণামলৈ, ৫। পশ্চিম দিনাজপুর রায়গঞ্জে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বিশেষ অধিবেশনে সমবেত সাহিত্যিক-বৃন্দ—মধ্যে—সভাপতি জরাসন্ধ (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী), ৬। শ্রীশ্রীহৈমবতী, ৭। ফিরে চল—সবিতা বসু, ৮। হিরণ্ময় সেন পরিচালিত "পাগল ঠাকুর" চিত্রের নায়ক ভূমিকায় স্বপনকুমার, ও ভৈরবীর চরিত্রে সমিতা বিশ্বাস।

লেখ-সূচী

৭। দক্ষিণভারত (ভ্রমণ)
শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৭
৮। বাংলা সাহিত্যে গীত (প্রবন্ধ)
অতুলেন্দু গুপ্ত ... ৫১
৯। ঘুম (গল্প)—শৈলেন রায় ... ৫৬
১০। বৈষ্ণবসিংহ গীতিকা (প্রবন্ধ)
জগবন্ধু নাথ ... ৫৮
১১। শ্যামা সঙ্গীত—কথা সত্যানন্দ, সুর—ব্রজেন সেন,
স্বরলিপি অমিতা দী ... ৬১
১২। বৈমানিক (গল্প)—সেবা বসু ... ৬৩
১৩। অতীতের স্মৃতি (বিবরণ)
পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায় ... ৬৫
১৪। শেষ প্রান্তে (গল্প)
অনিল মজুমদার ... ৭১

চিত্র-সূচী

বাই কলার-চিত্র
ভুটানী
বিশেষ-চিত্র
১। অবরুদ্ধ
২। আলোয় কালো

—পুনরায় প্রকাশিত হইল—

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কবিভূষণ প্রণীত

আয়ুর্বেদ-সোপান

শরীরং ব্যাধিমন্দিরং—অর্থাৎ আমাদের শরীর বিবিধ ব্যাধির আবাস-গৃহ। সেজন্য সাধারণ অট্টালিকার ন্যায় মধ্যে মধ্যে জীর্ণ ও অসুস্থ শরীরেরও মেরামতী বা চিকিৎসা দরকার। সুতরাং তার মিস্ত্রিগিরি বা চিকিৎসা-পদ্ধতি সকলেরই কিছু-না-কিছু জানা থাকা প্রয়োজন।

এদেশের জল-হাওয়ায় মানুষ হওয়া ভারতীয়দের জন্য এই দেশের ত্রিকালদর্শী মুনি-ঋষিরা যে ঔষধ ও চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, আমাদের পক্ষে তাই যে সর্বোত্তম বিধান, এতে আর সন্দেহ কি? প্রবিত্তবংশ কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রাচীন আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের বাছাই করা তত্ত্বগুলি সরল ভাষায় সুসংবদ্ধভাবে সাধারণের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করেছেন।

প্রতি গৃহস্থেরই গৃহে রাখার উপযোগী অত্যাবশ্যক গ্রন্থ।

দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

— শ্রীসুষমা মিত্র প্রণীত —

নিশীথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে

দাম—২৸০

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত

নিত্যকর্ম-কৌমুদী

যাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে—তাহাই নিত্যকর্ম।
ইহাতে ত্রিবেলার নমস্ত কার্য, সন্ধ্যা, আহ্নিক, সকল প্রধান দেব-দেবী পূজা, ধ্যান, প্রণাম, স্তব-কবচ, পার্থিব শিবপূজা, তীর্থ-স্নান, তর্পণ ও বিশেষ বিশেষ তিথির বিধান সকল সরল বাংলা ভাষায় যে কার্য যেমন ভাবে করিতে হয়—তাহা লিখিত হইয়াছে।
এই গ্রন্থখানি নিকটে থাকিলে কাহাকেও আরকোন বিষয়ের জন্য অন্যের সাহায্য লইতে হইবে না। অধিকন্তু গৃহস্থগণ পুরোহিত অভাবেও বহুবিধ সৎকর্ম করিতে সক্ষম হইবেন। দাম—৩৲

ভট্টাচার্য চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

লেখ-সূচী

১৫। বাংলার ভগীরথ—কুমুদরঞ্জন মল্লিক (পরিচয়)
তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৭৫
১৬। ইজ্জত (গল্প)—সুনীলচন্দ্র সেন ... ৭৯
১৭। কিশোর জগৎ ... ৮১
(ক) চেষ্টা কর—শ্রীজ্ঞান
(খ) প্রকৃতির খেলা (পীতিনাটা)
শ্রীমতী স্মরণা দেবী
(গ) হিন্দুধর্ম ও ওয়ারেন হেষ্টিংস
শ্রীভাগবতদাস বরাট
(ঘ) যীশুকে (কবিতা)—শ্রীরূপক রায়
(ঙ) ছুটীর ঘণ্টায়—চিত্রগুপ্ত
(চ) ধাঁধা আর হেঁয়ালি—মনোহর মৈত্র
(ছ) কিশোর দল (কবিতা)
শ্রীজয়ন্তকুমার গুপ্ত
১৮। রাজযন্ত্রের কথা (চিত্র)
দেবশর্মা বিরচিত ... ৮৮
১৯। সাময়িকী ... ৮৯
২০। মেয়েদের কথা— ... ৯৫
(ক) শিশু যখন কাঁদে—সুবর্ণা চট্টোপাধ্যায়

লেখ-সূচী

(খ) রূপচর্চা—সুপর্ণা দেবী
(গ) পুঁতির কারু-শিল্প—রুচিরা দেবী
(ঘ) সূচী-শিল্প শশধরের 'রমপার'—
সৌদামিনী সেন
(ঙ) রান্নাঘর—সুধীরা হালদার
২১। জ্ঞানতপস্বী তারকচন্দ্র রায়—
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ১০২
২২। শেষ আহুতি (গল্প)—
যূথিকা রায় ... ১০৩
২৩। ফাগালিপি—
শ্রীপঙ্কজকুমার মিত্র ... ১০৫
২৪। মতদের মর্দানা (কার্টুন)—
পৃথ্বী দেবশর্ম্মা ... ১০৬
২৫। পট ও পীঠ—শ্রী'শ' ... ১০৭
২৬। খেলা-ধূলা—
সম্পাদনা—শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ... ১০৪
২৭। খেলার কথা—ক্ষেত্রনাথ রায় ... ১০৮

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী

জ্যোতিষ-সম্রাটপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতির্বার্ণব, রাজজ্যোতিষ এম্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)

(জ্যোতিষ-সম্রাট)

অখিল ভারত গণিত ও পণিত সভার সভাপতি এবং ভারতীয় রাজ্যের পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি, তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভোগের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত কঠিন রোগাদির আরামে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশস্থ মনীষীবৃন্দ তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজনের অলৌকিক শক্তিতে যাঁহারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিজ হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মাননীয় মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সম্রোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি, কে, রায়, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী মাননীয়বাহাদুর শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত, কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব মিঃ এস, এম, রায়, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল স্যার কজল আলী কে-টি, চান মহাশেণের সাংহাই মাদারীর মিঃ কে, রুচপল।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ নবগ্রহ শক্তিযুক্ত বহুরোগহারক তন্ত্রোক্ত তাম্রাপত্রস্থ কবচ

ধারণে ধনলাভ—ধারণে পরাক্রমে প্রচুর ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (অব্যর্থ)। সাধারণ—৩৸৵, পরিবারী বৃহৎ—২৯৸৵, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ী—১২১৸৵, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি অন্তীর কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য)। সরস্বতী কবচ—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল ১৸৵, বৃহৎ—৩৸৵। মোহিনী (বশীকরণ) কবচ ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত এবং চির প্রেমের মিল হয় ১১৸৵, বৃহৎ—৩৯৸৵, মহাশক্তিশালী ৩৭৸৵। বগলামুখী কবচ—ধারণে অভিলষিত কর্ম্মোন্নতি, উপরিস্থ ব্যক্তি সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ৯৸৵, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৯৸৵, মহাশক্তিশালী—১৮৸৵। (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাওয়াল রাজা জয়ী হইয়াছেন)।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী

(স্থাপিতাব্দ ১৯০৭ খৃঃ) (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (ক), বর্ণতলা, ষ্ট্রীট জ্যোতিষ-সম্রাট [illegible]" (প্রবেশ পথ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৩—৪০৩৫। সময়—বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা। ব্রাঞ্চ অফিস ১০৫, গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুশ্রী নিবাস", কলিকাতা—৯, ফোন ৫৫—৩৮৮৫। সময়—প্রাতে ৯টা হইতে ১১টা

সমরেশ বসুর নূতন উপন্যাস

ছিন্নবাধা

সর্ব বাধা-বন্ধহীন একটি সৃষ্টিশীল আত্মসন্ধানী সাধারণ মানুষের পথ-চলার কাহিনী।

পঙ্কে তার উদ্ভব—পঙ্কিল পরিবেশেই তার পুষ্টি। কিন্তু তার অন্তরের সৃষ্টির প্রেরণা তাকে সকল প্রলোভন—সকল প্ররোচনা এবং সকল জটিলতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে তার শাশ্বত মানবাত্মার অভিব্যক্তিকে সহজ করে দিয়েছে।

একটি বলিষ্ঠ মানুষের সংঘাতময় বাস্তব জীবন-কথা।

সুন্দর প্রচ্ছদ-শোভিত সুবৃহৎ উপন্যাস। দাম—৭·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

—প্রকাশিত হইয়াছে—

শ্রীপঞ্চানন ঘোষালের

একটি নারী-হত্যা

পুলিশী জীবনের বহু পুরোনো ডাইরির ঝরা-মরা পাতায় সুখুরাণী নামে একটি বিশ বছরের হতভাগিনী নারীর উল্লেখ আছে—যার বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু বিবাহের রাত্রি হ'তেই স্বামী যার উধাও। তারপর স্রোতের মুখে খড়-কুটোর মত ভাসতে ভাসতে কি করে যে সে কলকাতার সারদা-সুন্দরী বাড়িউলীর বাড়ির দু'তলায় একখানি কফের ভাড়াটে হ'লো—সে এক করুণ ইতিহাস। তার জীবনে এসেছেন দুর্দান্ত ধনী মল্লিকবাবু, এসেছে "দাদাবাবু" নামধেয় মল্লিকবাবুর নাতিও। রেডিওর এক রহস্যময় বাবুও তার জীবনে বুঝি ছায়াপাত ক'রেছিল।

তা করুক, কিন্তু এতজনের আনা-গোনার মাঝে তার নিহত হওয়ার ঘটনাচক্রটা কি?

দাম—ভিন টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

মেয়াদী আমানতে (মেয়াদ অনুযায়ী) সর্বোচ্চ বার্ষিক সুদ ৭½%

সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে বার্ষিক সুদ ৪%

রেকারিং ডিপোজিটে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা

ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করুন, আনন্দের সঙ্গে গড়ে উঠবে সঞ্চয়ের অভ্যাস।

সেবার প্রতীক

ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা—১

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—১৩৭২ জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৩

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অবতীর্ণ পূর্বরাগ (উপন্যাস)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ১, ১১৪, ২০৫, ৩৪৫, ৪৫৪, ৫৬৪

অতীতের স্মৃতি (বিবরণ)—পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায় ... ৬৫, ১৬৯, ২৭৭, ৫৭৪

অকলঙ্ক চাঁদ (গল্প)—শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী ... ১২৩

অবিশ্বাসী নই (গল্প)—মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৪৫, ২৫৭, ৩৬৭

অচিনবনের পাখী (উপন্যাস)—প্রফুল্ল রায় ... ১৯৭, ৩২১, ৪০৯, ৬৩৯

অপ্রয়োজনে (কবিতা)—নবীরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫১৫

অসম্পূর্ণ (গল্প)—প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৮২

অনুভব (কবিতা)—অমিতাভ বসু ... ৫৮৩

অনামিকা (কবিতা)—শক্তি মুখোপাধ্যায় ... ৬০৭

অহেতুকী কৃপা (কবিতা)—শ্রীগোপালদাস কাব্যভারতী ... ৬৪৩

আহ্বান (কবিতা)—শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ... ২৭৬

আজকের দিনে (কার্টুন)—পৃথ্বী দেবশর্মা ... ৩১২

আমি কে ? (প্রবন্ধ)—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ... ৫৬১

আহ্বান (কবিতা)—শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৯১

আমি (কবিতা)—গীতা মুখোপাধ্যায় ... ৭৯

ঈজ্জত (গল্প)—সুনীলচন্দ্র নন্দ ... ৬০৪

ঊর্ধ্বাকাশে পূর্ণচন্দ্র গগন প্রাঙ্গণে (অনুবাদ কবিতা)—ভূমানন্দ ১৩৬

উপরোধ (কবিতা)—দিলীপ দেব সিকদার ... ২৯৪

কিশোর জগৎ ৮১, ২০১, ৩১৩, ৪১৭, ৫২৯, ৬২৫

কুহু ও কেকা (গল্প)—শ্রীবংশী [illegible] ... ৫১১

কালিদাস ও প্রকৃতি (প্রবন্ধ)—শ্রীসমীরণ চক্রবর্তী ... ১২০

কবি এলিয়টের মৃত্যুতে (কবিতা)—শক্তি মুখোপাধ্যায় ... ২৭৯

কবি (কবিতা)—শ্রীহরিমোহন দাশগুপ্ত ... ২৫৬

কাল-প্রবাহ (কবিতা)—ভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত ... ২৯০

কামরী মন (গল্প)—শ্রীপ [illegible] ... ২৯১

কুমার সিং—শেখরচন্দ্র সেনগুপ্ত ... ৫১৬

কোথায় থামবেন—শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ... ১১৭

খেলাধূলা—সম্পাদনা—শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ... ৯৯, ২২২, ৩৩৫ ৪৭

খেলার কথা—ক্ষেত্রনাথ রায় ১০৯, ২২২, ৩৩৫, ৪৫

গঙ্গা পতিতপাবনী (কবিতা)—দিলীপকুমার রায় ... ৫২৮

গ্রহ জগৎ—বাসুদেব ভট্টাচার্য ৫২৯, ৬১১

ঘুম (গল্প)—শৈলেন রায় ... ৫৩

চাইতে আমি জানি না যে (কবিতা)—শ্রীরবি গুপ্ত ... ১১৮

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজা (প্রবন্ধ)—পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৩৫৮

চিঠির জবাব—শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী ... ৫২৩

জ্ঞানতপস্বী তারকচন্দ্র রায়—শ্রীকুসুমরঞ্জন মল্লিক ... ১০২

জল মাটির গন্ধ (উপন্যাস)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৭৭, ৩২৯, ৪৩৮

জীবন তৃষ্ণা (কবিতা)—শক্তি বসাক ... ৩৫২

জলে ঢেউ দিও না (কবিতা)—সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৩৫৯

জীবনের রঙ্গ (কবিতা)—জাহাঙ্গীর ... ৫৮১

তক্ষশিলা (আলোচনা)—অধ্যাপক অতুলানন্দ সেন ... ৪৭৬

ত্রিপুরারিকা (প্রবন্ধ)—শ্রীগোপালচন্দ্র দে ... ১১৩

তোমার পূজা (কবিতা)—শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী ... ৫৪৬

দক্ষিণেশ্বর (ভ্রমণ)—শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭, ১৩১, ২৬৬, ৪০৫

দাঁতের যত্ন (প্রবন্ধ)—শ্রীরমেশচন্দ্র আচার্য ... ২৯১

দেবভূমি (গল্প)—নীরদবরণ ... ২৪৫

দর্শনলাভ ও ধলিরাজাবুদ্ধি (প্রবন্ধ)—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৩৫০

দুরুপট (কবিতা)—শক্তি বসাক ... ৫১৫

নারীর প্রার্থনা (কবিতা)—শ্রীবংশী [illegible] ... ১১৯

নদীমার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি (প্রবন্ধ)—শিবনারায়ণ চক্রবর্তী ... ১৪১

নৈমিষারণ্য (প্রবন্ধ)—স্বামী ভক্তিকৃষ্ণ শ্রীমন ... ২০১

নেশা (অনুবাদ কবিতা)—নচিকেতা ভরদ্বাজ ... ২৮৫

নিষ্কামকর্ম তত্ত্বের রবীন্দ্রভাষ্য (প্রবন্ধ)—পল্লব ঘোষ ... ৫৬৮

নবজন্মের রঙ্গ ফেরা (কবিতা)—শ্রীবরীন গুপ্ত ... ৬৯৫

নবরবি (আলোচনা)—নির্মলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... ৪৯৮

নবাভারত গঠনে আন্তর্জাতিক (প্রবন্ধ)—অমিয়গতি কুমার ... ৬৪৫

পট ও পীঠ—শ্রী [illegible] ১০৭, ২১৮, ৩৪৬

পাশ্চিম বাংলার উদ্দেশে (অনুবাদ কবিতা)—অরবিন্দ ... ২৮৪

পথিচিত্তাকে (কবিতা)—তুলীলাল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৩৫৫
পরকরী লোচনদাস (প্রবন্ধ)—
অধ্যাপক জীবনবল্লভ চৌধুরী ... ৩৬০
প্রিয়তমু নিরঞ্জন (কবিতা)—শ্রীসতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য ... ৪৪৯
প্রভাতের পরমায়ু (গল্প)—শচীন রায় ... ৪৯০
প্রতিহারী (গল্প)—সমীর চট্টোপাধ্যায় ... ৪৯৯
পরিবর্তন (গল্প)—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩০০
প্রতিনিধি (গল্প)—[illegible] ... ৩০৮
প্রজাপতির নির্বন্ধ (নাটিকা)—শীতল চন্দ ... ৩১৪
প্রাচীন ভারতের লক্ষ্মীনীতি—
অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী ... ৩১৯
ফুলের গন্ধে (গল্প)—রমেশ মজুমদার ... ৩২১
ফ্রয়েডের নিত্যতৃষ্ণাবাদ (প্রবন্ধ)—ডঃ রমা চৌধুরী ... ১
বসন্তসূত্র (কাব্যানুবাদ)—
পুষ্পদেবী সরস্বতী ৫, ২১৫, ২২৮, ৩৩৪, ৪৪৩, ৫১৩,
বাংলা সাহিত্যে পীত (প্রবন্ধ)—শ্রীঅতুলেন্দু গুপ্ত ... ৫১
বৈমানিক (গল্প)—দেবা বসু ... ৬৩
বাংলার তীর্থ (পরিচয়)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ৭৫
বাঙ্ময়ের কথা (চিত্র)—
দেবশর্মা বিরচিত ৮৮, ৩২০
বার্তিকা (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ১৪৩
ব্রহ্মনির্বাণ ও জন্মান্তরবাদ (প্রবন্ধ)—শ্রীমৎ অনির্বাণ ... ২২৫
বোধা দর্শনের পরিচয় (প্রবন্ধ)—
ত্রিদণ্ডীস্বামী ভক্তিবিলাসতীর্থ গোস্বামী ... ৩৩৭
বিজ্ঞাননায়ক হোমী ভাবা (প্রবন্ধ)—শ্রীরাসুদেব সিংহ ... ৩৭৫
বঞ্চনা (গল্প)—অরুণ দে ... ৩৭৮
বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর—কালীপদ মণ্ডল ... ৪১৪
ভোজ্যম ঔতি-সূত্র (প্রবন্ধ)—নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪২৫
বাংলা ও বাঙালী (প্রবন্ধ)—স্বামী সত্যানন্দ ... ৪৩১
বাউল সূত্র ও সঙ্গীত প্রসঙ্গে—শ্রীবাসবিহারী ভট্টাচার্য ... ৪৩৩
ব্রহ্মজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—শ্রীশশাঙ্কশেখর মহাপাত্র ... ৪৪৯
ভিক্ষুকের মাঠ (কবিতা)—শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ... ৫০৭
ভিষগ্ভারতী ও বৌদ্ধভাষাধারা (প্রবন্ধ)—
সুধাংশুবিমল বড়ুয়া ... ৫০৮
বাক্যরচনায় সংস্কৃত ছন্দ (প্রবন্ধ)—প্রবোধচন্দ্র সেন ... ৫৭৬
ছায়াপ্রতিমা (কবিতা)—শ্রীপঙ্কজকুমার মিত্র ... ১০৫
মোক্ষধাম (প্রবন্ধ)—শ্রীপথিক ... ১৯
মিলি সেনের কক্‌টেল পার্টি (নাটিকা)—নারায়ণ চক্রবর্তী ... ২১
মৈমনসিংহ গীতিকা (প্রবন্ধ)—জগবন্ধু নাথ ... ৫৮
মেয়েদের কথা— ৯৫, ১৮৩, ২৯২, ৩৯০, ৫৫১, ৬৫৫
যন্ত্রের মর্মবাণী (কার্টুন)—পৃথ্বী দেবশর্মা ... ১৭৬
যেমনাদবধ-কাব্যকথা (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত ... ১১৫
যুদ্ধ (কবিতা)—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ... ১৬৮
যোগসঙ্গীত (কবিতা)—অধ্যাপক নির্মলকান্তি বসু ... ৩৮৪
মাষ্টার মশাই (গল্প)—শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় ... ৩৮৫
মানব ও দানব (কবিতা)—শান্তশীল দাস ... ৩৮৯
মহানগরীর পথে (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ... ৪৬৭
যখন যেমন (কার্টুন)—পৃথ্বী দেবশর্মা ... ২০০
রুদ্ধস্বরনন্দিনীর স্বগতোক্তি (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত ... ৩৭৭
রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি না রজ্জুকনীতি (প্রবন্ধ)—
শ্রীধীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ... ৪১৯
রাতের চিন্তা—সুস্মিতা সান্যাল ... ৪৩০
রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব (প্রবন্ধ)—
ডঃ দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৩৮
রাজাবাহাদুর (গল্প)—অচিন্ত্যনাথ ভট্টাচার্য ... ৪৫৩
রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা (প্রবন্ধ)—শ্রীউমাদেব রায় ... ৪৮৪
রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক (প্রবন্ধ)—অরুণ দে ... ৪৯৬
রবীন্দ্রনাথের 'শেষ সপ্তক' এ প্রেমানুভূতি—
শ্রীত্রাসবিহারী ভট্টাচার্য ... ৫২১
রবীন্দ্ররচনায় শিশু (প্রবন্ধ)—শ্রীসাক্ষোষকুমার রায়চৌধুরী ... ৫৩৭
রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)—কালীসাধন চৌধুরী ... ৫৪৯
রোকোকোত্তর প্রতিভা (পরিচয়)—
অধ্যাপক শ্যামল চট্টোপাধ্যায় ... ১৪
লালবাহাদুর শাস্ত্রী (জীবনী)—অনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৮০
শ্যামা সঙ্গীত (কথা)—সত্যানন্দ ... ৩১
শেষ প্রান্তে (গল্প)—অনিল মজুমদার ... ৭১
শেষ আহুতি (গল্প)—সুখিকা রায় ... ১০৩
শান্তিদূত লালবাহাদুর (কবিতা)—অনিলচন্দ্র চক্রবর্তী ... ১৮২
শাস্ত্রীজী স্মরণে প্রণাম (কবিতা)—
শ্রীগোপালদাস কাব্যভারতী ... ১৮২
শাস্ত্রীজীর মৃত্যুতে মাতা ললিতাদেবীকে (কবিতা)—
সুষমা মৈত্র ... ২৬
শিল্পশ্রমিকের অভাব অভিযোগ দূরীকরণ পন্থা (প্রবন্ধ)—
শ্রীসমর গুপ্ত ... ২৫৪
সখীরী (গল্প)—শ্রীযমুনা ঘোষ ... ৪৫৫
শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের ইঙ্গিত—ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার ... ৬৩৩
সাময়িকী— ৮০, ২১১, ৩২৩, ৪৪৩, ৫০৫, ৬০৫
সঙ্গীত (কথা ও সুর)—স্বামী সত্যানন্দ ... ৩০৬
স্মৃতির ব্যথা (কবিতা)—ছায়া দেবী ... ৩৩২
সাজসজ্জা (গল্প)—বানসী মুখোপাধ্যায় ... ৩৪৬
সমস্যার মুখে ছাত্রসমাজ (প্রবন্ধ)—কনক ধর ... ৩৮২
স্বর্গের প্রজাসংস্থের সাধনা (রম্যরচনা)—মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায় ... ৪০২
স্বরূপে নদীর ঢেউ (কবিতা)—কুসুমকুমার দে ... ৪২৯
সমর্পণ (কবিতা)—কিতীশ দাসগুপ্ত ... ৫৫০
সুন্দরবনগরের ইতিকথা—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ করণ ... ৫৮৭
সময় হয়নি (গল্প)—শ্রীকালাচাঁদ রায় ... ৫৯২
সুন্দর (কবিতা)—কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৯৩
ক্ষয় নাই (গল্প)—শ্রীজগবন্ধু নাথ ... ৫৯৭

ষাণ্মাসিক চিত্র সূচী

পৌষ— বাইকালার চিত্র—১
বিশেষ চিত্র—২
মাঘ— বাইকালার চিত্র—১
বিশেষ চিত্র—২
ফাল্গুন— বাইকালার চিত্র—১
বিশেষ চিত্র—২
চৈত্র— বাইকালার চিত্র—১
বৈশা[illegible] বাইকালার চিত্র—১
বিশেষ চিত্র—২
জ্যৈষ্ঠ- বাইকালার চিত্র—১

শিল্পী—মৃণাল চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

পৌষ—১৩৭২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

ব্রহ্মের নিত্যত্ববাদ

ডক্টর রমা চৌধুরী

ভারতীয় দর্শনের মূলীভূত তত্ত্ব হল এই যে "সত্য" ও "নিত্য" সমার্থক। এই মতানুসারে, যদি কোনো বস্তু সত্য হয়, তাহলেই তা' নিত্যও; যদি কোনো বস্তু নিত্য হয় তাহলেই তা' সত্যও। অর্থাৎ কোনো অনিত্য ক্ষণস্থায়ী, অল্পস্থায়ী, অধিকস্থায়ী বস্তু অনিত্য বলে' অসত্য; একমাত্র চিরস্থায়ী বস্তুই সত্য।

ব্রহ্মও সত্য—কেবল সত্য নয়, এক ও অদ্বিতীয় সত্য। সেজন্যও ব্রহ্ম অনিবার্য ভাবেই নিত্য।

আপত্তি

এ স্থলে একটী আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে—সংসারে সব কিছুই অনিত্য বলেই অসত্য—এতে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্টই আছে। কারণ, স্থিতি যতক্ষণস্থায়ীই হোক্ না কেন স্থিতি স্থিতিই—ক্ষণের উপর স্থিতির স্থিতিত্ব নির্ভর করেনা। এমন কি, প্রথমক্ষণে স্থিতি করে,' দ্বিতীয়-ক্ষণে ধ্বংসীভূত হয়ে যায় যা' তারও প্রথমক্ষণের স্থিতি স্থিতিই—তা'কে 'না' বলে' অস্বীকার করবার উপায় কি? যা' একবার হয়ে গেছে, ঘটে গেছে, তা পরে পুনরায় হোক্ বা না হোক্, ঘটুক বা না ঘটুক, তার সেই একবার হওয়াকে, সেই একবার ঘটাকে 'না হওয়া' 'না ঘটা' বলা যাবে কেবল মাত্র 'গায়ের জোরেই' যুক্তির জোরে নয় একে-বারেই।

দেখ, একটী রামধনুর সপ্ত রং বিমণ্ডিত অপূর্ব মনোহর

সাবানের বুদ্বুদ—একক্ষণমাত্র বাতাসে ভেসে তা' পরক্ষণেই বিদীর্ণ হ'য়ে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে জন্যই কি তার পূর্বের সেই স্থিতি, সেইরূপ, সেই রং, অসত্য হয়ে যাচ্ছে?

দেখ, একটী ক্ষুদ্র তৃণশীর্ষে একটী ক্ষুদ্র, স্বচ্ছ, শুভ্র, স্নিগ্ধ, শিশিরবিন্দু—অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তা' শুকিয়ে যাচ্ছে—এই বিশাল পৃথিবীতে কোনোই লেশমাত্র না রেখে। কিন্তু সে জন্যই কি তা' কোনো কিছুই নয়? সে জন্যই কি তার সেই পূর্বের পবিত্র লাবণ্য মরীচিকাই মাত্র?

দেখ, একটী ক্ষীণ ধূপ—কয়েক মুহূর্ত মধ্যে স্বল্প পরিসরে গন্ধ বিতরণ করে তা' অতি সামান্য ভস্মে পরিণত হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই। কিন্তু সেজন্যই কি তার সেই পূর্বের চিত্তোন্মাদনকারী সৌরভ শূন্যই কেবল?

দেখ, প্রভাতাকাশে, অথবা সন্ধ্যাকাশে একটা বিবিধ-বিচিত্র বর্ণ মেঘ—কি মনোমুগ্ধকর অথচ কি স্বল্পস্থায়ী! কিন্তু সে জন্যই কি তার সেই পূর্বের উজ্জ্বলতা, উৎকৃষ্টতা লাঘবহীন?

দেখ, বর্ষাবিধৌত নীল গগনে একটি অপরূপ ইন্দ্রধনু—চতুর্দিকে শোভা বিস্তার করে' তার অতি অনিত্য স্থিতি। কিন্তু সেজন্যই কি তার পূর্বের সেই অতুলনীয় বর্ণালীস্থিতি ভিত্তিবিহীন?

দেখ, একটি পূর্ণ বিকশিত অনুপম কুসুম—কতক্ষণই বা তার স্থিতি? কিন্তু সেজন্যই কি সেই অতি অল্প সময়-ব্যাপী সৌন্দর্য—সৌরভ-মধুসম্বলিত সেই স্থিতি মিথ্যা, মূল্য-হীন? পরে তার রং মুছে যাবে বলে কি তার পূর্বের সৌন্দর্য স্বপ্ন? পরে তার গন্ধ মিলিয়ে যাবে বলে কি তার পূর্বের সৌরভ মায়া? পরে তার রস শুকিয়ে যাবে বলে কি তার পূর্বের মধু মতিভ্রম?

এই বিপরীত উদাহরণের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ যেরূপ পূর্বের সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য ক্ষণস্থায়ী, বা অল্পস্থায়ী হলেও অসত্য নয়, ঠিক সেরূপ পূর্বের কুশ্রীতা কর্কশতা, দীনতা ক্ষণস্থায়ী, বা অল্পস্থায়ী হলেও অসত্য নয়। যথা শীতের কুশ্রীতা-কর্কশতা-দীনতার পরে' উদয় হচ্ছেন বসন্তরাণী তাঁর অমল অশোক-অরুণ-সৌন্দর্য-মাধুর্য ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণ ডালাখানি বহন করে'। কিন্তু সেজন্য নিশ্চয়ই পূর্বের কুশ্রীতা-কর্কশতা-দীনতা অসত্য হয়ে যায় না।

অধিক উদাহরণ উদ্ধৃত করে আর লাভ কি? সংসারের সর্বত্রই, সর্বকালেই সর্বাবস্থাতেই এরূপ উদাহরণ সংখ্যাতীত। কারণ একথা স্থিরসত্য যে, পৃথিবীর সব কিছুই অনিত্য কিছু ক্ষণস্থায়ী, কিছু অল্পস্থায়ী, কিছু অধিকস্থায়ী; কিন্তু কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সেক্ষেত্রে জগতে কিছুই "নিত্য" নয় বলেই কি কিছুই "সত্যও নয়? "নিত্যতাই" কি সত্যতার" একমাত্র লক্ষণ, একমাত্র প্রমাণ, একমাত্র ভিত্তি?

বস্তুতঃ "অভাব" "ভাবকে" "অনস্তিত্ব" "অস্তিত্বকে" "নঞর্থক" (Negative) "সদর্থকে" (Positive) বাধিত, খণ্ডিত, অপ্রমাণীকৃত করবে কিরূপে? নিত্যগমনশীল এই জগতে নিরন্তরপ্রবাহী নদীস্রোতের মতই একের পর এক ঘটনা ঘটে চলছে; একটি তরঙ্গের পর আরেকটি তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন, অনিবার্য, অবিসংবাদী ভাবেই; সৃষ্টির পরে স্থিতি, স্থিতির পরে লয় বা ধ্বংস হয়েই চলেছে প্রকৃতির অমোঘ বিধানানুসারেই। কিন্তু পূর্বের "স্থিতিকে" পরে "অস্থিতি" বা ধ্বংস ধ্বংস করবে কিরূপে? দিনের পরে রাত্রির, হেমন্তের পরে শীতের, যৌবনের পরে বার্ধক্যের আগমন হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই। এস্থলে, দিনের আলো-কের পরে রাত্রিতে আলোকাভাব ঘটলে, তদ্দ্বারা, অর্থাৎ আলোকাভাব দ্বারা পূর্বের আলোক খণ্ডিত হয়ে যেতে পারেনা কোনোক্রমেই। আলোক যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ ছিলই। পরে তার স্থানে, নূতন আরেকটি বস্তু, বা ঘনান্ধকার, আবির্ভূত হলে, সেই দ্বিতীয় বস্তুটি সত্য নিশ্চয়ই, কিন্তু তার পূর্বের বস্তুটিকে মিথ্যা করে দিয়ে নয়।

এস্থলে, তরঙ্গের উদাহরণ অতি সুষ্ঠু ও সুযোগ্য। একটি তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে, ক্ষণমাত্রেই ভেঙ্গে পড়ে সমুদ্রে বিলীন হয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, এবং তৎক্ষণাৎ নিরব-চ্ছিন্নের সেই স্থানে আরেকটি দ্বিতীয় তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে, এবং পূর্ববৎ সব কিছুই হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি তরঙ্গেরই নিয়তি পরিণতি সেই একই সেই একই উত্থান-পতন মাত্র। তাহলেও প্রত্যেক তরঙ্গই অস্তিত্ববান্। নতুবা নদীকে "তরঙ্গসঙ্ঘ" বলা যেত আর কি করে?

সুতরাং অনিত্য বস্তুর ক্ষেত্রেও, তার পরবর্তী অভাব তার পূর্ববর্তী ভাবকে অভাব করে দিতে পারে না কোনো

দিক্ থেকেই। তাহলে "নিত্য" এবং "সত্য" সমার্থক হবে কোন্ যুক্তিবলে?

বস্তুতঃ, বস্তুর সত্যতা তার অতি নিজস্ব, সম্পূর্ণ নিজস্ব ধন। তার জন্য বস্তু পরমুখাপেক্ষী হতে যাবে কেন? তার জন্য বস্তু কালের উপরে নির্ভরশীল হতে যাবে কেন? ফলতঃ, বস্তুর অস্তিত্ব দেশকাল জয়ী। যথা, একটি পেটিকা কলিকাতায় যেরূপভাবে অস্তিত্বশীল ছিল, লণ্ডনেও ঠিক সেই একইভাবে অস্তিত্বশীল থাকবে। (অন্য কোনো কারণ থাকলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা)। যাঁর পেটিকা, তিনি কলিকাতা থেকে লণ্ডনে গেছেন পেটিকাটি নিয়ে বলেই যে, তার স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে যাবে—এ অতি হাস্যকর কথা। সে জন্য, বস্তু একক্ষণই থাকুক বা বহুক্ষণই থাকুক বস্তু বস্তুই। অতএব "নিত্য" ও "সত্য" যে সমার্থক, এ'কথা অযৌক্তিক। সুতরাং 'যা "নিত্য" বলেই "সত্য" "সত্য" বলেই "নিত্য"—এই মতবাদ কোনোরূপেই গ্রহণযোগ্য নয়, সুনিশ্চিত। এই হল ব্রহ্মের নিত্যত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রথম সম্ভাব্য আপত্তি।

খণ্ডন

নিত্য তত্ত্বই তত্ত্ব, নিত্য—সত্তাই-সত্তা, নিত্য সত্যই সত্য—অনিত্য-তত্ত্ব, অনিত্য-সত্য, অনিত্য-সত্ত্য নয়, এই হল ভারতীয়-দর্শনের মূলীভূত তত্ত্ব, মূলীভূত সত্তা, মূলীভূত সত্য। ভারতীয় মতে, "অনিত্য-তত্ত্ব, অনিত্য-সত্তা অনিত্য সত্য" কথাগুলিই বিরোধ দোষ দুষ্ট এবং অসম্ভব কারণ, যদি তত্ত্ব থাকে, সত্তা থাকে, সত্য থাকে তাহলে তা' কেবল নিত্যভাবেই থাকতে পারে, নিত্যরূপেই থাকতে পারে নিত্য অবস্থাতেই থাকতে পারে, অন্য কোনো প্রকারেই নয়।

তার কারণ হল এই :—

উপরে যা বলা হল তা' সবই ব্যবহারিক দিকের কথা, পার্থিব জগতের কথা, সাংসারিক জীবনের কথা।

পার্থিব-বস্তুর স্থিতি সর্তাধীন

এই দিক থেকে, বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্নপ্রকারের স্থিতি আছে। এই বিভিন্নপ্রকার দেশ-কাল-অবস্থা-পাত্রানুযায়ী। অর্থাৎ পার্থিব স্থিতি আত্যন্তিক (Absolute) স্থিতি নয়, সর্তাধীন (Relative) স্থিতি এবং সেজন্য পার্থিব বস্তু এরূপ বিবিধ বিচিত্র। সুতরাং পার্থিব বস্তুকে দেশকাল বিজয়ী বলা চলে না। উপরে যে অর্থে তাদের দেশকাল বিজয়ী বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। সে কথা পরে বলা হচ্ছে। প্রথমে, এই সাধারণ, সার্বজনীন সাংসারিক সর্তের কথা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক্।

প্রথমতঃ দেশ (space), প্রত্যেক পার্থিব বস্তুই সসীম; অথবা পরিমিত, সীমাবদ্ধ দেশ বা স্থান পূর্ণকরে বিরাজমান এবং একেই পাশ্চাত্ত্য-দর্শনে বলা হয় (extension) বা পরিধি বা বিস্তৃতি। এরূপে অনন্ত অসীম দেশে (space) প্রত্যেক পার্থিব বস্তুই স্বীয় স্বরূপানুসারে একটা মাত্র অংশেই একটি মাত্র পরিমিত স্থানেই বিস্তৃত। যথা, তৃণের "দেশ" এক, মহীরুহের অন্য; পিপীলিকার "দেশ" এক হস্তীর অন্য; প্রস্তরের "দেশ" এক পর্বতের অন্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, "কাল" (time)। প্রত্যেক পার্থিব বস্তু যেরূপ "দেশের" দিক্ থেকে সসীম "কালের" দিক থেকেও ঠিক তাই। কারণ যেখানেই "কালের" প্রশ্ন ওঠে, সেখানেই জন্ম-স্থিতি-বৃদ্ধি-পরিণাম—অন্ত মরণরূপ ষড়বিকারেরও প্রশ্ন ওঠে অনিবার্যভাবেই। এরূপে, প্রত্যেক পার্থিব বস্তুই, অনন্ত অসীম কালে, স্বীয় স্বরূপানুসারে একটী মাত্র অংশেই, একটীমাত্র পরিমিতকালেই সংঘটিত; একেই পাশ্চাত্ত্যদর্শনে বলা হয় "duration বা স্থিতিকাল। যথা মানবের "কাল" এক, হস্তীর অন্য; পুষ্পের "কাল" এক, প্রস্তরের অন্য, ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ, "অবস্থা" (circumstances) একটী বিশেষ দেশে অবস্থিত, একটী বিশেষ কালে সংঘটিত একটী বিশেষ পার্থিব বস্তু কিন্তু একক বস্তু নয়। উপরন্তু সকলেই জানেন যে, সংসারে অসংখ্য, বিবিধ বস্তু আছে; অথচ, সংসার সেই একই সংসার সেই বিধিবদ্ধ, সুশৃঙ্খল একই। সেজন্য, এই সকল অসংখ্য, বিবিধ বস্তু পরস্পর বিভিন্ন হলেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়; পরস্পর বিরুদ্ধ নয়, পরস্পর সম্বদ্ধ সেজন্য, একটী বিশেষ বস্তুর অস্তিত্ব অবস্থা অপরাপর বস্তুর অস্তিত্ব ও অবস্থার উপর নির্ভরশীল বহুলাংশে। তার সঙ্গে অপর সকলের এই যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাকেই বলা হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা (circumstances) যথা একটী বিশেষ দেশ-কালব্যাপী একটি বিশেষ পুষ্প-সাধারণ রীতি অনুসারে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবার পরে, তাকে রাখা হল দুই অবস্থায় সুন্দর "হট্ হাউসে (Hot House) অথবা—

উদ্যানের একটি কোণে। ফলে, সেই, একই পুষ্পটির সৌন্দর্য সৌরভ-সুধার অল্পাধিক্য ঘটে গেল এই অবস্থা বৈগুণ্যে।

চতুর্থতঃ—"পাত্র"। বাহিরে যা "অবস্থা" ভিতরে তা "পাত্র" (Individual)। প্রত্যেক পার্থিব বস্তু যেরূপ অন্যান্য পার্থিব বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ সেরূপ ঠিক পাত্রেরও সঙ্গে। অবশ্য, অবস্থা-ভেদে বস্তুর যেরূপ ভেদ হয়, পাত্র ভেদে স্বভাবতঃই সেরূপ হয়না, সাধারণ মতানুসারে। কারণ, এক্ষেত্রে ভেদ সংঘটিত হয় পাত্র বা জ্ঞাতার দিক থেকে, বস্তু বা জ্ঞেয়ের দিক থেকে নয়। যথা, পাত্রের নিজের আন্তর-ভাব-ভাবনা-কামনা-ভেদে তার জ্ঞানেরও ভেদ হয়, বাহ্যবস্তু এক থাকলেও। যথা, যখন তার শরীর সবল ও মন প্রফুল্ল, তখন পুষ্প তার নিকট মনোরম ও প্রীতিপ্রদ; কিন্তু যখন তার শরীর ক্লান্ত ও মন বিষণ্ণ, তখন সেই একই পুষ্প তার নিকট শোভাহীন ও বিরক্তিজনক।

পার্থিব ক্ষণস্থায়ী বস্তুর সার্থকতা

সে যা হোক সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রত্যেক পার্থিব বস্তুর স্থিতি দেশ-কাল-অবস্থা প্রমুখ সর্তের অধীন; এবং সেজন্যই, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রত্যেকের স্থিতিই প্রত্যেকটি থেকে ভিন্ন। সেদিক থেকেই, যেরূপ "দেশে"র পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র, মধ্যম, বৃহৎ প্রমুখ নানা পরিমাণের বস্তু আছে; সেরূপ "কালের" পরিপ্রেক্ষিতে, ক্ষণস্থায়ী, অল্প-স্থায়ী, অধিকস্থায়ী প্রমুখ নানা স্থিতিকালের বস্তুও আছে। এরূপে "দেশের দিক থেকে, যদি কোনো বস্তু স্বরূপতঃই আকারে ক্ষুদ্র, এবং কালের দিক থেকে, স্থিতিতে ক্ষণস্থায়ী হয়, তাহলে সেই ক্ষুদ্রাকারেই ও সেই ক্ষণস্থায়ীত্বেই তার পরিপূর্ণ সত্যতা—যেহেতু এতদ্ব্যতীত তার ত আর কিছুই নেই, কিছুই হবেনা, কিছুই হতে পারে না। উপরের দু'একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। যথা সাবানের বুদ্বুদ। সে ক্ষণস্থায়ী, তা' হলেও সত্য, যেহেতু এরূপ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বই তার সব এর অধিক কোনো অস্তিত্ব তার নেই, হবেনা, হতে পারে না। সেজন্য তার স্থিতি, তার সত্তা, তার সত্য, তার পূর্ণতা, তার সার্থকতা—সবই সেই ক্ষণের মধ্যেই। এই কারণেই তার সেই ক্ষণস্থায়ী স্থিতি সত্য, পূর্ণ, সার্থকস্থিতি।

ক্ষণস্থায়ী বা অল্পস্থায়ী শিশির, ধূপ, মেঘ, ইন্দ্রধনু, পুষ্প প্রত্যেকটি উদাহরণকে ঠিক একই ভাবে গ্রহণ করা যায়। সে জন্য এদের স্থিতি অনিত্য হলেও সম্ভব ও সার্থক, সত্য ও সুন্দর সাংসারিক দিক থেকে। এ ছাড়া আর উপায় কি?

কিন্তু পার্থিব দিক্ থেকেও, ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ-শিশির-ধূপ-মেঘ-ইন্দ্রধনু-পুষ্পাদি স্বরূপতঃই ক্ষণস্থায়ী, অল্পস্থায়ী, অধিকস্থায়ী বলে', তাদের না হয় সেই সেই রূপেই প্রকাশ সত্য ও সার্থক। কিন্তু যা প্রকৃতিগত দিক্ থেকেই এরূপ নয়, তাদের সত্যতা ও সার্থকতা সেরূপ হবে কেন? যথা, স্বরূপতঃ ক্ষণস্থায়ী পুষ্পের সার্থকতা সেই-ক্ষণেই কেবল। কিন্তু বিশাল মহীরুহের নয়, কারণ তা স্বরূপতঃ ক্ষণস্থায়ী নয়, দীর্ঘকালস্থায়ী। সেজন্য, তা যদি ক্ষণস্থায়ী হয়, ক্ষণমাত্র, অথবা, অল্পকাল মাত্র থেকে ধ্বংসীভূত হয়ে যায় তাহলে তাকে সত্য, সুন্দর, পূর্ণ, সার্থক বলা যাবে কিরূপে? কারণ, তখন তার সম্পূর্ণ বিকাশসাধনই, সম্পূর্ণ স্থিতিলাভই হবে না, সম্পূর্ণ সত্তা সৃষ্টিই হবে না, সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশই হবে না।

একইভাবে, স্বরূপতঃ ক্ষুদ্রাকার ও ক্ষণস্থায়ী শিশির-বিন্দুকে আমরা সত্য, সুন্দর, পূর্ণ ও সার্থক বলে' স্বীকার করে নেব নিশ্চয়ই, সাগ্রহে, সানন্দে। কিন্তু গঙ্গা নদী যদি ক্ষুদ্রাকার ক্ষণস্থায়ী হয়, তাহলে তা' তার নিজের দোষ, নিজের অপূর্ণতা, নিজের অক্ষমতা। সেক্ষেত্রে তাকে সত্য, সুন্দর, পূর্ণ, সার্থক বলা যাবে কিরূপে?

একইভাবে, মেঘের স্বভাবতঃই ক্ষণস্থায়ী সত্যতা, সৌন্দর্য, মাধুর্য, ঐশ্বর্য আমরা স্বীকার করে নেব নিশ্চয়ই সাগ্রহে, সানন্দে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী পর্বতের নয়, পূর্বোক্ত হেতু অনুসারে।

প্রকৃতকল্পে, সাংসারিক দিক থেকে, পুষ্পকে মহীরুহ থেকে, শিশিরকে নদী থেকে, মেঘকে পর্বত থেকে, অল্প সত্য, অল্প সুন্দর, অল্প পূর্ণ, অল্প সার্থক কেহই বলবেন না, সুনিশ্চিত।

উদাহরণের সংখ্যা বর্ধিত করে আর লাভ নেই। কিন্তু উপরের আপত্তির মধ্যে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা সবই স্বরূপতঃ ক্ষণস্থায়ী বলে, ক্ষণস্থায়িত্বের জন্য তাদের সত্যতা ব্যাহত হয় না কোনোদিনও। অপর

পক্ষে যা' ক্ষণস্থায়ী, অথবা অল্পস্থায়ী নয়, তাদের ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়িত্ব অথবা অল্পস্থায়িত্ব থাকলে তা সত্য, তত্ত্ব, সত্তা, সুন্দর, পূর্ণ সার্থক প্রভৃতি বলাই ত অনর্থক। এরূপে, সাংসারিক দিক্ থেকে, বিভিন্ন বস্তু স্ব স্ব স্বরূপানুসারে, স্ব স্ব দেশ-কাল-অবস্থানুসারে বিভিন্নভাবে সত্য, সুন্দর, পূর্ণ ও সার্থক হয়। সে দিক্ থেকে দেখতে গেলে, এমন কি, ক্ষণস্থায়ী বস্তুও সত্য হতে পারে, যদি সেই ক্ষণস্থায়িত্বই তার স্বভাব হয়।

ব্রহ্মের স্থিতি সর্তহীন ও শাশ্বত

কিন্তু ব্রহ্মের কথা স্বতন্ত্র, কারণ, তিনি ত পার্থিববস্তু নন। তাঁর স্থিতি স্বরূপগতভাবেই পরমস্থিতি, আত্যন্তিক-স্থিতি, সর্তহীনস্থিতি (Absolute Existence)। সেজন্যই ব্রহ্মের স্থিতি শাশ্বতস্থিতি। কারণ, যা সর্তাধীন এবং সেজন্য অপরের প্রতি নির্ভরশীল, তা' স্বভাবতঃই অশাশ্বত; যেহেতু সেই সর্তসমূহ পূর্ণ হলে' তবেই তার অস্তিত্ব সম্ভবপর, অন্যথায় নয়।

এরূপে, তার জন্ম আছে, যেহেতু সেই সর্তসমূহ পূর্ণ হলেই তার সৃষ্টি হয়। তার মৃত্যুও আছে, এই একই কারণে সেজন্য তা' অনিত্য। কিন্তু যার ক্ষেত্রে কোনো-রূপ সর্তই নেই তার ক্ষেত্রে জন্মাদি বস্তুবিকারেরও কোনরূপ প্রশ্নই নেই কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধনেরও কোনোরূপ সম্ভাবনা নেই। তাহলে তা' নিশ্চয়ই নিত্য।

একইভাবে, ব্রহ্মও নিত্য। তিনি দেশ-কাল-অবস্থা-পাত্রাতীত, কেবল, পরম, নিঃসর্ত, স্বনির্ভরশীলতত্ত্ব' সত্তা, বা সত্য। এবং সেজন্য স্বরূপতঃই স্বভাবতঃই, অনিবার্য ভাবেই, শাশ্বততত্ত্ব, সত্তা বা সত্য। সেক্ষেত্রে, ক্ষণস্থায়ী, অল্পস্থায়ী, অধিকস্থায়ী হলে তাঁর চলবে না, তিনি তাতে সত্য, সুন্দর, পূর্ণ, সার্থক হবেন না। সেজন্য তাঁকে হতে হবে অবশ্যম্ভাবীভাবেই চিরস্থায়ী। অতএব, একমাত্র নিত্য ব্রহ্মই সত্য ব্রহ্ম। সুতরাং ব্যবহারিক, দিক্ থেকে, "নিত্য" ও "সত্য" সমার্থক না হলেও, পারমার্থিক দিক্ থেকে, তা'ই, অর্থাৎ যা নিত্য, তা'ই কেবল "সত্য"।

পুনরায় পারমার্থিক দিক্ থেকে, যা "সত্য" তাই "নিত্য"। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মই একমাত্র "সত্য"। সেজন্যও ব্রহ্ম "নিত্য" যেহেতু এই সত্য নির্বিকার বা অপরিবর্তনীয়।

এইভাবে, পারমার্থিক দিক থেকে "নিত্য" ও "সত্যে"র, "সত্য" ও "নিত্যে"র উভয়মুখী সমার্থকতা স্বীকার করে নিতেই হয়।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পাদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(৬)

বিকার শব্দাদেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ (১৩)

আনন্দময় মানে
সাধারণে নাহি জানে
ময়ট অর্থে বিকার এখানে নয়
ব্রহ্ম যেখানে রাজে
বিকার সেথা কি সাজে
এখানে ময়ট প্রাচুর্য্য হয়ে রয়।
অল্প বুদ্ধি কেহ
হয় যদি সন্দেহ
তাতে যদি আছে কণা দুঃখও তায়
তাহলে ভুলই হবে
আনন্দময় ভবে
দুঃখ তাহার পরশে যে পায় লয়।

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ (১৪)

তৎ হেতু হেথা আনন্দ হেতু ব্যপদেশ বলি রয়
সব আনন্দ কারণ সেজন নিজে আনন্দময়
জীবে আনন্দ দান
দুঃখেরে করে ত্রাণ
জীব হতে সেই ভিন্ন তখন হয়
অপরূপ লীলা বলে বোঝানর নয়।

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে (১৫)

হয়ে থাকাও উল্লেখ আছে মাত্র কথিত তাই
তারি কথা তেমনি ইহা কথা গেল বলা হল শুধু তাই
সহজ জ্ঞানে অনন্ত ব্রহ্ম
এই মাত্র শাস্ত্র কন
এই মন্ত্রেতে সেই কথা উল্লেখ শুধু হল
আনন্দময় এ পাঠে ব্রহ্ম বারে বারে তাই বলা।
নেতরোনুপপত্তেঃ (১৯)
চতুর ইন্দ্রিয়ে আনন্দময় বলা সঙ্গত নয়
এক হয়ে সেই ইচ্ছা করিয়া বহুজন হয়ে রয়
সেই আনন্দময়
গাহ মন তারি জয়
আনন্দময়ে নিলে যেইজন হয়ে যায় একাকার
সেই পায় সেই অমৃতের স্বাদ নহিলে সাধ্য কার ?
ভেদব্যপদেশাচ্চ (২০)
আনন্দময় শুধু সেইজন আত্মা ও তাহা নয়
এই ভেদ কথা উপনিষদেতে বিস্তার করিয়া কয়
সেই স্বরূপ সেই
তাঁহারে পাইলে ভাই
আনন্দময়ে ভরে নিখিল জীবে আনন্দ পায়
পরশ পাথরে পরশি যেমন লোহা সোনা হয়ে যায়।
জীব ও ব্রহ্মে ভেদ যেইখানে জীব তাহা করিয়াছে
আপনাতেতে বহু হইয়া ভিন্নতা সেই আছে
নিজ স্বরূপেতে ব্রহ্ম না হেরি
দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ধরি
আপনারে সেই কল্পনা করি ভিন্ন হইয়া যায়
জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই বুঝে না
একথা হায়।
'আত্মা অবেইদ্যঃ' এই কথা বেদ উপনিষদেতে কয়
আত্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মেরে ছাড়া কোন জীব নাহি হয়।
কামাচ্চনানুমানাপেক্ষা (২১)
কাম শব্দের প্রয়োগে যুক্তিও
অনুমানের অপেক্ষা নয়
স্বাভাবিকোক্ত প্রকৃতির কথা
তেমনি এইখানে নয়

প্রকৃতি প্রধান এই ভুবন
আনন্দময় কভু নাহি হন
যে জন একেই বহু হয়ে খেলা করিবারে বাসনেতে রয়
অপার লীলা সে বুঝায় কেবলে সেইজন লীলাময়
অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি (২২)
অস্মিন মানে আনন্দময় বস্তুতে এই রয়
অন্য অর্থে জীবের যে যোগ সাধনেতে তাহা কয়
একত্বে যবে মিশে যোগে যায়
ব্রহ্ম অভয় পদ সেই পায়
তৈত্তিরীয়েতে এই মিলনের বর্ণনা তেমনি আছে
বাক্য যাহারে বর্ণিতে হারে সেই পদ সবে যাচে।
রসের সাগর সেই
তাহাতে মিশিল যেই
রস সমুদ্রে হল সেই ভাসমান
আনন্দময় করিল অধিষ্ঠান।
অন্তরউপপত্তেঃ (২৩)
সূর্য্যে এবং চক্ষুর মাঝে যে পুরুষ সদা রয়
অন্তঃ নামেতে ব্রহ্ম সেজন সেজন ধর্ম্ম হয়
সোনার বরণ পুরুষ সেজন
বর্ণিবে কেবা সেই অতুলন
কেশ ও কেশ সকলি সোনার নখাগ্র সোনা হয়
সর্ব্ব দেহটি সোনায় গঠিত উজল জ্যোতির্ম্ময়
আঁখি দুটি তাঁর রক্ত কমল রক্তিম আভা ধরে
সূর্য্যের ন্যায় হয়ে বিকশিত অমল কমল হারে
সকল পাপের উর্দ্ধে সে রয়
পাপ পরশিতে পারে না তাহায়
তাঁহারে যে জানে সকল পাপের হয় তার অবসান
বক্ষ শীতলকারী সেই জন দুঃখী জনের ত্রাণ।
কেহ বলে উনি কৃষ্ণ, সাম্ব, বসু এই জন তিন যেন
বর্ণিতে মোর আসা হায় মানে মনে রয় শুধু খেদ
নিজ মহিমায় রাজে সেই জন
আপনার ভেদেতে বিভিন্ন হন
অপাপ শক্তি হয়ে যে সেজন বলিবার তাহা নয়
সূর্য্য এবং চক্ষুর মাঝে অন্তঃ হইয়া রয়।

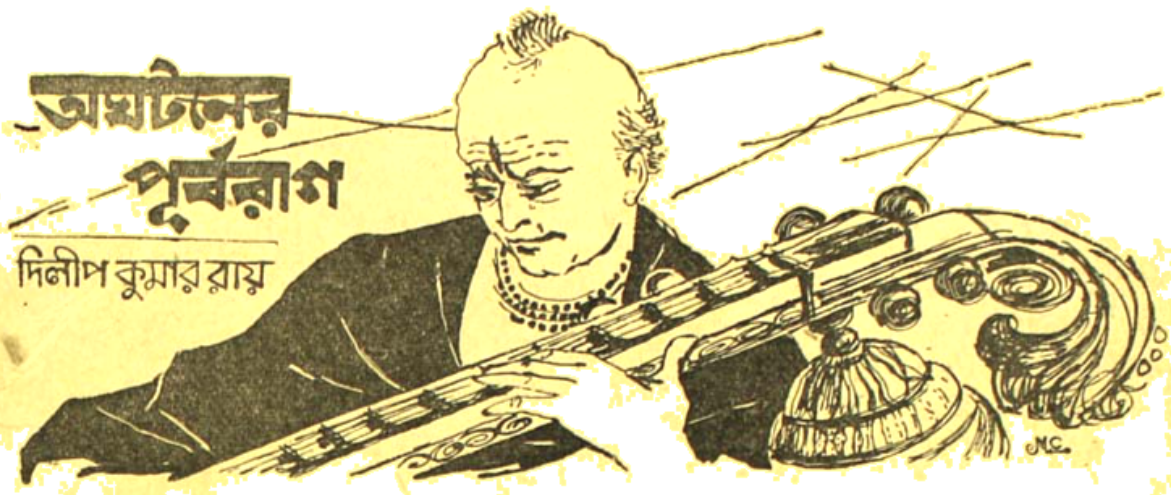

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ষোলো

নিজে মোটর হাঁকিয়ে মূর্ছনা আমাকে নিয়ে চলল বালন্তী-পুরের একটি চমৎকার বাগানে। মোটরে একটি কথাও হয় নি। রাত তখন সাড়ে নটা হবে। ঝিরঝিরে বাতাস লেগে আমার মাথার ধব্‌ধবানি জুড়িয়ে গেল। পাশে মূর্ছনা চুপ ক'রে হাঁফাচ্ছে। তার ওড়না থেকে মৃদু খস্‌-খসের গন্ধও ভেসে আসছে। ওদিকে চাঁদের আলো।··· ভেসে এল হাস্নাহানার গন্ধ। মাথাব্যথা প্রায় ছেড়ে গেছে।···

হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম ওর কনুইয়ের ঠেলায়। ও বলল হেসে: "ভয় নেই, আমি।" ব'লেই: "শুধু মনে করিয়ে দিতে, যে এমন রাতে অত ভাবে না।"

আমি ঈষৎ কুণ্ঠিত হ'য়ে বললাম: "ভাবছি কি আমি একা? মাসিমাকে অকারণ ভাবিয়ে তুললাম—তোমাদেরও তো false positionএ পড়তে হ'ল আমারই জন্যে।"

মূর্ছনা হাসল: 'তা বটে। কিন্তু why cry over spilt milk?"

আমি চুপ ক'রে রইলাম। মিনিটখানেক বাদে ও চিম্‌টি কাটল আমার হাতে। আমি ফের চম্‌কে উঠলাম। বললাম: "আঃ, লাগে না বুঝি?"

"লাগে ব'লেই তো মানুষ চিম্‌টি কাটে।

"বারে বা! যাতে লাগে তাই করতে হবে না কি?"

ও হেসে উঠে ফের বলল:

"If would your friend you must
Prick the kernel, not the crust."

আমি হেসে বললাম: "তবু ভালো যে আমি খোসার দলে পড়ি নি।"

ও আমার দিকে চকিতে কটাক্ষ ক'রে বলল: "এত অভিমান কার ওপর—শুনতে পাই নে?"

"ফের কথাকাটাকাটি ধরলে কেন? ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরতে?"

ঠিক এই সময়ে মোটর পাবলিক পার্কের গেটে ঢুকল।

পার্কটি বড়। এক প্রান্তে একটি ছোট ফোয়ারা। তখন আর জল উঠছে না। কিন্তু চারপাশে ফুল, সামনে আর একটি লন। চাঁদের আলোয় বড় মায়াময় দেখাচ্ছিল। আমরা গিয়ে একটি বেঞ্চিতে বসলাম।

ও বলল: "অমন কথা কেন বললে অমিত? আমি মুখরা মানি, কিন্তু তেড়ে ধরব—এতই বেহরদী মনে হয় কি আমাকে?"

বললাম: "তোমাকে লক্ষ্য ক'রে ওকথা বলি নি মূর্ছনা।"

"তবে? বাবাকে?" ব'লেই আমার দুটি হাতই ও টেনে নিল নিজের মুঠিতে।

আমি উত্তর দিলাম না। ও বলল: "বাবার কথায় কিছু মনে কোরো না অমিত!"

তবু জবাব দিতে পারলাম না। কী বলব?

ও আমার বন্দী হাত দুটি ছেড়ে দিল, বলল: "যদি

তাঁর অবস্থাটা জানতে হয়ত ক্ষমা করতে পারতে তাঁকে। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়—" ব'লেই দীর্ঘনিশ্বাস।

তাকালাম ওর মুখের পানে। চাঁদের আলোয় সে-মুখ এত শুভ্র মনে হ'ল—।···একটু গ্লানি এল বৈকি—ওর একটা হাত টেনে নিলাম নিজের হাতের মধ্যে বললাম: "তোমার বাবার তরফের কথাটা কি আমি কিছুই বুঝতে পারি না?"

"না, পারো না। আর শুধু যে পারো না তাই নয় এ না-পারার কথাটা জানোও না। তাই থাক্ এ-আলোচনা, কেন আর? মা একটা কথা কেবল আজ ঠিক বলেছেন: the wearer alone knows where the shoe pinches."

কটাক্ষটা বাজল, কিন্তু গায়ে না মেখে বললাম হাল্কা সুর: "কী পারি তাহ'লে সেটাও না হয় শুনিয়ে দিলে—বাকি থাকে কেন আর?"

"যে পারায় তোমার জুড়ি মেলা ভার তার নাম—আত্মাভিমানকে সযত্নে পুষে রাখা। তবে এ-গুণে গুণধর না হ'লে কবি প্রাস গুণী হবেই বা কী ক'রে?"

"তাই না কি?" ব'লে ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম "হয়ত ঠিকই বলেছ তুমি। এর পরেও বৃথা বাধিততা কেন আর? চলো উঠি।"

"উঠতে যেতেই ও আমার পাঞ্জাবির হাতাটা চেপে ধরে বলল: "বোসো অসিত, আমি অন্যায় বলেছি, স্বীকার করছি।"

"না না, অন্যায় আবার কী? তোমার যা ধারণা তা বলবার অধিকার তোমার আছেই।"

ও আমার চোখের দিকে চেয়ে মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলল: "কেন এত রাগ করছ অসিত? বলছিলে না এই-মাত্র যে, বাবার তরফের কথাটা ভেবেছ? কী ভেবেছ তাহ'লে যদি এটুকুও না ভেবে থাকো যে, রাজাসাহেবের তিনি কর্মচারী—পাদা বাংলায় যাকে বলে চাকর?"

মনের মধ্যে ধক্ ক'রে উঠল। মনে পড়ল মাসিমার খেদ—'চাকর কুকুর!' বললাম ঈষৎ নরম হ'য়ে: "মূর্খনা, সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে। শুধু তোমার বাবার আতিথ্যের মর্যাদা রাখতে পারি নি ব'লেই নয়—তাঁকে কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছি ব'লে আরো—"

ও মুখ ঢাকল আঁচলে।

আমি ওর যে-হাতটা আমার কোলের কাছে নেতিয়ে প'ড়ে ছিল সেটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম: "মূর্খনা! শোনো—"

ও 'যাও' ব'লে হাত ছাড়িয়ে নিল।

মুহূর্তে মন আমার ফের বিমুখ হ'য়ে উঠল। অথচ ওদিকে ও কাঁদছে—গ্রাহ্য না ক'রেও পারি না। চুপ ক'রে ব'সে সামনের অঘনার দিকে চেয়ে রইলাম। সমস্ত মনটা বিষাদে ভ'রে গেছে। এখন রূঢ় ভাবে হাত ছাড়িয়ে নেওয়া!

"অসিত!"

তাকালাম ওর দিকে।

"যা হ'য়ে গেছে তার তো চারা নেই···কিন্তু—" একটু ইতস্ততঃ ক'রে: "এখনো এর নিষ্পত্তি হ'তে পারে যদি বাবাকে গিয়ে তুমি শুধু একটি কথা বলো: যে রাণী-সাহেবের প্রতি রূঢ় আচরণের জন্যে তুমি দুঃখিত। লক্ষীটি! বলবে?"

"অসম্ভব।"

আচমুকা এ-ধরণের রুক্ষ জবাবের জন্যে ও প্রস্তুত ছিল না। একটু তাকিয়ে রইল আমার পানে, পরে শুধু বলল: "কেন অসম্ভব জানতে পারি কি?"

বললাম জোর দিয়েই: "আমি ম'নে করি না ব'লে যে রাণী সাহেবার কাছে আমার কোনো জবাবদিহি আছে।"

"তবে খানিক আগে বললে কেন অন্যায় হয়েছে?"

"অন্যায় হয়েছে তোমার বাবার কাছে—তোমাদের কাছে—এত পেয়ে তোমাদের মধ্যে কাঁটার মতন হ'য়ে উঠলাম ব'লে।"

"ও।"

ফের কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করলাম মনের মধ্যে। একটু ভেবে বললাম: "তবে যদি তোমরা বলো তো শুধু তোমাদের খাতিরে আমি রাণীসাহেবার কাছে ক্ষমা চাইতে পারি।"

ও বাঁকা হাসল, বলল: "তো—ম—রা কি গৌরবে বহুবচন অসিত?"

"মানে?"

"মানে তুমি বেশ জানো—কেন মিছে সাধু সাজছ?

ক্ষমা তুমি চাইতে পারো কেবলমাত্র তজনের অনুরোধে, আর সে-জন মূর্ছনা নয়। আরো প্রাঞ্জল ভাষায় বলার দরকার আছে কি?

চড়া সুরের উত্তরে চড়া সুরই যোগায়, বললাম শ্লেষের সুরে: "তোমার যে-দোষই থাক—কোনো কাজ হাসিল করবার সময়ে তোমার ভাষা যথেষ্ট প্রাঞ্জল হয় না এ-অপবাদ তোমাকে তোমার অতিবড় শত্রুও দেবে না।'

ও কি বলতে গিয়ে থেমে গেল! একটু বাদে বলল: "তুমি ঠিকই বলেছ অসিত—এ-বিতণ্ডা নিষ্ফল। চলো উঠি।" কিন্তু উঠতে গিয়েই ভেঙে পড়ল—দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

মনটা আমার ধিক্কারে ভরে গেল! ওকে অভিনেত্রী ব'লে গাল দিই—কিন্তু আজ নিয়ে এ কী আত্মম্ভরী নাটুকে-পনা ক'রে চলেছি—ছি! বললাম: "আমার আজকের আচরণের জন্যে আমি সত্যিই লজ্জিত, মূর্ছনা! বিশ্বাস কোরো।"

"ও চোখ মুছে শুষ্ককণ্ঠে বলল: "আমিও লজ্জিত—বিশ্বাস কোরো—যে, তোমার সামনে আমার চোখের জলকে বাগ মানাতে পারি নি।"

"শোনো মূর্ছনা: লক্ষ্মীটি—"

"আর কেন অসিত? যে-মেয়ে শুধু কাজ হাসিল করতেই প্রাঞ্জল ভাষাকে ডাক দেয়, তার সঙ্গে তোমার না মেশাই ভালো। না—এ-অভিযোগের পরে আর কী হবে রফা করতে চেয়ে?"

"অভিযোগ কেন বলছ মূর্ছনা—যখন এর ভিত্তি নেই—"

"নেই কার কাছে? আমাদের নিজের কাছে আমরা যা—পরের কাছে তো তা নই। ধরো না কেন, তুমি মনে করো তুমি স্বভাবে অতি ভদ্র, মেজাজ তোমার গঙ্গাজল। কিন্তু বাসন্তীপুরের কোনো পর্দা-নসীনার কাছে তদন্ত করলে হয়ত খবর পাবে তাঁর মনের পটে তোমার ঠিক এ ছবি ফুটে ওঠে নি।"

এবার রাগে আমার কান গরম হ'য়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ কেন জানি না মনে প'ড়ে গেল সাধুজির একটি কথা: রিতং জলৎ কেন? মনো হি যেন।" মনে মনে জপ করতে লাগলাম প্রাণপণে।

মূর্ছনা আমার মুখের দিকে একটু চেয়ে রইল। ও খুব একটা ঝাঁকালো উত্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু হঠাৎ আমার এভাবে চুপ হ'য়ে যাওয়া দেখে একটু যেন ভয়ই পেয়ে গেল। একবার তাকাল আমার মুখের দিকে আবার ঘাড় ফেরাল। একটু বাদে জোর ক'রেই হাসল, ডাকল "অসিত!"

"কী?" বললাম আমি নিরুত্তাপ সুরে।

"যদি কেউ একটা বেফাঁস কথা ব'লেই ফেলে কখনো, তাকে কি এমনি ক'রে সাজা দিতে হয়?" বলেই হেসে আমার একটি হাত টেনে নিল ওর দুহাতের মধ্যে।

"হাত টেনে নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও ছাড়ল না। অগত্যা বললাম: "চলো ফিরি।"

"না। লক্ষ্মীটি! শোনো। আমার কথা, এখনো শেষ হয় নি।'

"আমার আর ভালো লাগছে না মূর্ছনা। কথায় শুধু কথাই বাড়ে। তোমার রকমারি মুডের টাল সামলানোর শক্তি আমার নেই।"

"ওর সুর আরো নরম হয়ে গেল: "কী এমন বলেছি—যে এহেন দুর্ভর মান হ'ল? আর মুড্ কি একলা আমারই?"

আমি কথা বললাম না। ও হাত ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে বসল।

আমি একটু ইতস্তত ক'রে যথাসম্ভব শান্তকণ্ঠে বললাম: "শোনো মূর্ছনা! তর্কটা আসলে একটা বেফাঁস কথা ব'লে ফেলা নিয়ে নয়। আমার তরফের কথাটা শুধু এই যে, আমার আচরণে যদি কাউকে ভুগতে হয়—তবে সে প্রত্যক্ষ ভাবে রাণী সাহেবা, আর পরোক্ষভাবে তোমার বাবা। কাজেই এর জন্যে আমার জবাবদিহিটা 'তুমি' চাইলে কেমন যেন বেসুরো লাগে—অন্ততঃ আমাদের মতন মানুষের কাছে।"

"আমি কি তোমার জবাবদিহি চেয়েছি?"

"জেরা যখন মানুষ করে তখন সে আর কী চায় শুনি?

"অসিত, বন্ধুভাবে কেউ কারুর দোষ দেখাতে গেলেই সেটা জেরা হ'য়ে দাঁড়ায়—এ আজ তোমার কাছেই প্রথম শুনলাম। কিন্তু শোনো—না, আমি অবেদার করব না, ভয় নেই—কেবল একটা কথা তোমাকে শুধাই: আজই

না হয় দুটো বেফুরো ঠাট্টা ক'রে ফেলেছি, কিন্তু তুমিও কোনো ব্যবহারই কি পাও নি কখনো আমার কাছ থেকে?"

বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে এল। পারলাম না নিজের পণ রাখতে—নরম সুরেই বললাম: "আমার কক্ষ টোনের জন্যে ত্রুটি নিও না মুহূর্না! কিন্তু ভেবে দেখ, এ-ব্যাপারে শুধু তোমাদের রাণী সাহেবার কথাটাই কি একমাত্র ভাববার বিষয়? আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে যে—"

"জানি অসিত! কেবল আমার বাবাকে—কিন্তু না—সে নিয়ে এত্ত আমারই বা কেন এত মাথাব্যথা? তুমি বিশ্বে বলো নি।"

"মনে দুর্জয় অভিমান কেন?" বললাম আমি আরো নরম সুরে: "এক্ষেত্রে মনে রেখো, তোমার বাবাকে যেটা সইতে হয়েছে তার নাম অন্তত অপমান নয়।"

ও আমার দিকে সোজা তাকালো, বলল: "অসিত, আমাদের এখানে এসে তোমাকে এই যে অপমান সইতে হল তার জন্যে যদি শাস্তি দিতে চাও তো বাবাকে দিও না, দাও আমাকে, আমি নেব মাথা পেতে।'

"এটা কি ঠাট্টা, না ড্রামা?"

যেকাস কথাটা বলেই আক্ষেপ হ'ল, কারণ তখন স্মৃতি আমার যেতায় ছিল নয়নের কোঠায়···অথচ কেন যে ব'লে ফেললাম!

ও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল: "অসিত, আজ···আর আমার প্রতি কথায় তুমি যে সন্দেহ করছ, বলবে কি তার জন্যে দায়িক শুধুই আমার নটী-পনা?"

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। ও সমানে তাকিয়ে রইল আমার মুখের পানে, বলল: "উত্তর দিচ্ছ না যে?"

"কী উত্তর দেব বলো—এ-ধরণের আবছা প্রশ্নের?"

ও একটু হাসল, কিন্তু মুহূর্তের জন্যে, বলল: "আর যদি প্রশ্নটা একেবারে সোজাসুজি হয়—ঠিক যেমন, তাহলে উত্তর দেবে?"

"সোজা চেক সই করো, এ-উপরোধ মেয়েরা সব সময়েই করে বটে, কিন্তু ছেলেরা সব সময়ে রাখতে পারে না।"

এবার ও রাগ করল না, বলল: "আচ্ছা, সরল ভাবেই বলছি তাহলে। কেবল—উপরোধ না ক'রে শুধু এই আর্জিটা জানিয়ে রাখি যে, প্রশ্নটা সোজা হলে উত্তরটা যেন অষ্টাবক্র না হয়।"

"আচ্ছা।"

ও একমুহূর্ত খানিক আমার চোখের পানে তাকিয়ে, পরে যেন জোর ক'রেই ব'লে বসল: "বলো তো, সেই যেদিন দিদি তোমার বাংলোয় উপযাচিকা হয়ে গিয়ে বকুলতলায় চাঁদের আলোয় বলছিল ওর প্রাণের কথা, সেদিন ও আমার নামে লাগিয়েছিল কি না?"

"শর্মিতা! তোমার নামে লাগাবে? অনাত্মীয়ের কাছে?"

"কেন এসব ছেলেভুলোনো কথা আওড়াচ্ছ অসিত? তুমি কি নিজেই একদিন বলো নি আমাকে যে, আত্মীয়দের চেয়ে যে-পরই এ-জগতে মেলা ভার।"

"বলেছি—কিন্তু—"

"অসিত, একথা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, মেয়েরা অনাত্মীয় খোঁজে আত্মীয়তার বাঁধন থেকে মুক্তি পেতেই। এও হাড়ে হাড়ে জেনেছে যে, আত্মীয়রা ভালোবাসে চিনতে নয়—জিনতে। দিদি বরাবর চেয়েছে আমি ওর মতে চলি—কোন্ আত্মীয় না চায় বলো? কিন্তু না—এসব কথা কেনই বা বলছি!—শোনো—আমি বলতে চেয়েছিলাম শুধু এই কথাটি যে, দিদির পক্ষে তোমার কাছে গিয়ে আমার নামে চুকলি-কাটাটা স্বাভাবিক, তাই ওর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই—"

"তুমি এসব কী বলছ মুহূর্না—?"

"অসিত, আমি জানি যে, আমি সেদিন তোমায় ব'লে অন্যায় করেছিলাম যে, দিদি তোমায় পছন্দ করে না। কিন্তু এ-মিথ্যা ইঙ্গিত করার শাস্তি কি আমার যথেষ্ট হয় নি? আর কেন?—না, শোনো, আমায় বাধা দিও না আজ—এমন সময় মেয়েদেরও জীবনে দু-একবার আসে—যখন মুখোষ তাদের হয় অসহ্য। তাই আজ আমাকে দুটো খোলা খুলি কথা বলতে দাও।"

বলতে বলতে ওর চোখে জল ভ'রে এল কের। মনটা আমার বিষণ্ণ না হোক, দুর্বল হ'য়ে পড়ল। আমি বললাম: "তোমার মনে কষ্ট দেওয়ার জন্যে—"

ও বাধা দিয়ে বলল: "যেতে দাও বাজে কথা।

আজ আমাকে বলতে দাও যা না—ব'লে থাকতে পারছি না, যদিও জানি—কাল হয়ত লজ্জায় তোমাকে মুখ দেখাতে পারব না। না—না—না—কোনো কথা নয় আর—আমি বলবই আজ। চুপ্।"

অগত্যা চুপ ক'রে আমি তাকিয়ে রইলাম ওর পানে। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছিল ওকে চাঁদের আলোয়! কিংবা আমার এ-দৃষ্টির মূলে ছিল এক নতুন আবিষ্কারের আলো!

"কী দেখছ এক দৃষ্টে?" বলল ও হঠাৎ—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সুরে।

আমি লজ্জিত হ'য়ে মুখ নিচু ক'রে বললাম: "না। তুমি বলো যা বলতে যাচ্ছিলে।"

ও একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "রাণী সাহেবা বাবাকে আজ টেলিফোনে বিষম ধমকেছেন।" কেন ওর কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে এল।

আত্মগ্লানি এল আমার, বললাম: "ধমকেছেন? কেন?"

'অসিত, অসিত, তোমাকে দেখলে মনে পড়ে ঈশপের সেই জ্যোতিষীর কথা—যে আকাশে চোখ রেখে চলতে চেয়েছিল কাঁটাবনে। এ-ও কি তোমাকে ব'লে বোঝাতে হবে যে, রাজবাড়ীতে বাবার পোষাকী পদবি যা-ই হোক না কেন সেটা বাইরের ঠাট? আসলে উনি কর্মচারী, চাকর।"

"তা জানি—"

"জানতে পারো, কিন্তু বিশ্বাসে—কার্যক্ষেত্রে নয়। নইলে আজ মোতিমহলে একথাটা তুমি বেমালুম ভুলে যেতে না যে, রাজা সাহেবের সঙ্গে বাবার সম্বন্ধ প্রভু-ভৃত্যের, আর রাণীসাহেবা হচ্ছেন বাবার প্রভুপত্নী।"

ওর এতটা উষ্ণ টোন সইল না। বললাম: "কিন্তু প্রতি পদে এ-ধরণের কথা মনে রাখতে হ'লে পথিককে পথ চলাই ছাড়তে হয় না কি?"

"পথ চলতে চাও মানা করছে কে অসিত? কিন্তু একটা অপরিচিত মানুষও পথে পড়লে চক্ষুষ্মান্ পথিকে তাকে মাড়িয়ে যায় না এইটেই আমরা দেখে এসেছি।"

আমি পরুষ কণ্ঠে বললাম: "আমরা আরো দু-একটা জিনিস দেখে এসেছি। তাদের মধ্যে একটার নাম হচ্ছে অতিথির মর্যাদা রাখা।"

"রাণী সাহেবা তোমার কী এমন অমর্যাদা করেছেন শুনি? ওঁদের নবাবী কারবার চলেছেন—এইমাত্র। এটা যদি অশোভনও হয়ে থাকে, তাহ'লেই কি তোমার আচরণটা চমৎকার প্রমাণ হয়? সত্যি, আমার লজ্জা করছে অসিত—যে বিলেতফেরত হ'য়েও ভদ্রমহিলার আতিথ্য স্বীকার ক'রে এ-কেলেঙ্কারিটা তুমি ক'রে এলে।"

প্রাণপণে চেষ্টা করা সত্ত্বেও এবার জিভ বাগ মানল না, বলসাম: "লজ্জা কার কিসে করে সব সময়ে তার ঠাহর পাওয়া যায় না মুর্হুমা! এই ধরো না কেন, আমাদের লজ্জা করে ভাবতে যে—রাজা রাণীর মর্যাদা নিয়েই যারা অষ্টপ্রহর ভেবে সারা হয় তাদের আত্মমর্যাদা লোপ পায় এমন কি স্বাভাবিকবোধও—অথচ তারা দেখেও দেখে না, জেনেও জানে না।"

"মানে?"

"মানে, আমার আপত্তি তোমার এই ইঙ্গিতে যে, ভদ্রমহিলার মান রাখতে জানে শুধু বিলেতফেরতে।"

"রাগটা পুরুষের লক্ষণ কিনা জানি না অসিত," বলল ও কাঁজালো কণ্ঠে, "কিন্তু সত্যাদাধকের নয় এটা জানি। নৈলে তোমরা মানতে যে, আমি ভুল বলি নি—মেয়েদের সম্মান করতে শিখেছি আমরা ওদের দৃষ্টান্তেই। মানতে যে, আমাদের কাছে মেয়েদের পরম-পদ—স্বামীর চিতা, বিধবার পরমগৌরব—একাদশী, আর অবলার পরম তপস্যা কোনো না কোনো সবল পুরুষের বাহুশিরি—শৈশবে বাপের, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে ছেলের। এ কি আমাদের শাস্ত্রেরই কথা নয় বলতে চাও?"

"আর তোমরা যে-সত্যের সাধনা করো তা-ও জানি মুর্হুমা, যার নাম সাহেবিয়ানার চশমা ভালো ক'রে নাকে আঁটতে শেখা। নৈলে তোমরাও জানতে যে, সত্যের সাধনা হয় না ফিরিঙ্গিদের ক্লাবে, ঈথারে কি বলডান্সের হররায়। জানতে যে, আমাদের দেশ সম্বন্ধে জানতে হ'লে মিস্ মেয়োদের বইয়ের শরণ নেওয়াই যথেষ্ট নয়—সত্য জানতে হলে সব আগে চাই প্রীতির পরিচয়। কিন্তু এ-পরিচয় তাদের হয় না কোনোদিনই, যারা এদেশকে গোড়া থেকেই অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করে। না, শোনো:

আমি কোনোদিনই বলি নি—আমাদের সব আচরণই নিখুঁৎ। কিন্তু আমাদের মেয়েদের দেবার মধ্যে তুমি শুধু তাদের অসহায় দীনতাটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলে না—আর ওদেশের মেয়েদের দলে দলে বর-শিকার করার রকমারি কলাকৌশল ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে দেখলে আশ্চর্য স্বাধীন মহিমা, এতেই মনটা হায় হায় ক'রে ওঠে। মূর্ছনা, নানা মানুষ একই জিনিসের নানা দর ধরে। সাধুজি সেদিন আমাকেই বলেছিলেন: হীরেকে যেখে বেগুনওয়ালা বলেছিল, দশটা বেগুন দেব, আমায় হীরেটা দাও। কিন্তু বেগুনওয়ালাকে বোঝানোর পথ নেই যে এক্ষেত্রে অহরীই সত্যদ্রষ্টা।—না, এ আমার তর্কের কথা নয়। তোমরা এ-ব্যাপারটাকে ঠিক চোখে দেখতে অক্ষম, এ আমি টের পেয়েছি। তাই একথা তোমাকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা যে, যে-আচরণে একজন দেখে রাণীসাহেবার অমর্যাদার কালো ছায়া—আর একজন ঠিক সেই আচরণেই দেখতে পায় আত্মমর্যাদার শাদা আলো। না মূর্ছনা, এ-ধরণের কথা-কাটাকাটিতে আমি শুধু যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি তাই নয়, এতে কোনো সুফল ফলবে এমন ভরসাও হারিয়েছি। তাই বিতণ্ডা রেখে শোনো আমার এ সম্বন্ধে শেষ বক্তব্য: আমি মনে করি যে, তোমাদের রাণী-সাহেবার কোনো দাবি যদি আমার কাছে অশোভন বা মানিকর মনে হয়, তবে তাতে সায় দিতে আমি বাধ্য নই। ঠিক তেমনি, তোমারও অধিকার আছে আমার অস্বীকৃতিকে অন্যায় বলবার। কিন্তু কী করব বলো এখানে? মানুষের স্বভাবের মধ্যে মিল যেমন অকাট্য, গরমিলও তাই,—কাজেই যেখানে মিল নেই সেখানে মিলের ভঙ্গি করলে মূর্ছনা শোনার না শেষ অবধি।"

"কিন্তু এক্ষেত্রে মিল—"

"এটা এক্ষেত্রে ওক্ষেত্রের জবানবন্দির কথা নয়—এখানে আমাদের গলদটা হয়েছে গোড়াতেই—তোমাদের ও আমাদের স্বভাব হল তেল আর জল—তাই মিশ খাওয়াবার চেষ্টা বৃথা। তবু মোহবশে মানুষ করে অসাধ্যসাধনের প্রয়াস। কিন্তু আর না—সব কিছুরই একটা লিমিট আছে: তোমাদের রাজকীয় কায়দাকানুনের শাদা চোখে আমি নাম সই করতে অক্ষম—একথা বলার সময় এসেছে। তোমাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগে যেমন তাই আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, এ-ভালোলাগার খাতিরে আমার উচিত-অনুচিত বোধ ছাড়তে আমি অপারগ। পরে কী করা উচিত সেটা তুমিই ব'লে দাও, যদি ব'লো আমার কর্তব্য প্রস্থান করা, বেশ, কালই আমি চ'লে যাব।"

ওর চোখ জলে ভ'রে এল, আমার দুটি হাত নিজের দুহাতের মধ্যে জোর করে টেনে বন্দী ক'রে ধ'রে রেখে বলল: "এককথায় তুমি আমাদের এভাবে বিদায় দেবার জন্যে মুখিয়ে উঠতে পারো—এটা আমি ভাবতে পারি নি অসিত! তাছাড়া তোমাকে "যাও" বলার মালিক কি আমি? না বাড়ীটা একা আমার? আর এ-ও তুমি বেশ জানো যে, মা তোমার দিকে তো বটেই, দিদিও এ-ব্যাপারে দোষী করেছেন রাণী সাহেবাকেই, তোমাকে নয়। বেজেছে প্রত্যক্ষভাবে—শুধু বাবাকে, আর—পরোক্ষভাবে—আমাকে, কেন না বাবাকে শুধু যে আমি ভালোবাসি তাই নয়—আমি জানি তাঁর জীবনের শূন্যতার দিকটা কত গভীর। অসিত, স্বভাবে আমি উদ্ধত ও অসহিষ্ণু—জানি, কিন্তু তাই ব'লে কি আমি এতই ধার্মিক যে, তোমার উচিত-বুদ্ধির পথে চলতেও তোমাকে বাধা দেব? যদি আমার স্নেহপ্রীতির কোনো দাবি থাকত বা শুভেচ্ছার অধিকার মঞ্জুর হ'ত, তাহলেও বা কথা ছিল—কিন্তু সে-অধিকার আর যারই থাকুক না কেন, আমার যে নেই এটুকু বুঝবার মতন বুদ্ধি হয়ত আমার আছে।"

"শোনো মূর্ছনা—"

"না অসিত, তুমিই শোনো; আমি তোমাকে আজ কয়েকটা রুক্ষ কথা বলেছি দেজন্যে অপরাধ নিও না—কারণ এ তো তুমি জানো যে তপ্ত জলে ফোস্কা পড়লেও ফোস্কা ফোটানোই জলের স্বভাব নয়। স্নেহের আঁচে যেসব কথা বেরোয় তাদের দিয়েই আমাকে বিচার কোরো না, ভেবো না—তোমাকে আজ এখানে এনেছিলাম শুধু তোমার সঙ্গে বাবার ও রাণীসাহেবার একটা মিটমাট করবার চেষ্টা করতে। তাই চেয়েছিলাম তোমাকে বোঝাতে যে, বাবা বাইরে দেখতে যতই হোমরা চোমরা হোন না কেন, এক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত অসহায়, কেন না তিনি আসলে রাজসাহেবের চাকরই বটে। এ-হেন পরাধীনতার দুঃখ তুমি বুঝবে ভেবেছিলাম এই জন্যে যে, আমার মনে হয়েছিল—শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে ঠাণ্ডা হ'য়ে ব্যাপারটা

নিয়ে একটু ভেবে দেখলে তুমি কল্পনা করতে পারবে যে, যে কুক্ষণে তুমি ক'রে এসে তার ওপর রায়সাহেব তোমার নাগাল না পেয়ে আরো চেপে ধরবেন বাবার টুঁটি—কেন না, এরকম ক্ষেত্রে ওঁকে অন্তত ঠাট বজায় রাখতেও কঠোর হ'তে হবে। তাই আমি তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, যে-কাণ্ডটা তুমি বাধিয়ে এলে তাতে তোমার মানের পেয়ালার হয়ত পৌরুষের তৃপ্তি উপচে পড়তে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার তৃপ্তির কথাটাই সব নয়—বাবার দিকের কথাটাও ভাববার আছে। এমন কি ধরো, যদি এক্ষেত্রে তিনি ভুল করেও থাকেন—তাহ'লেও তিনি যে অপরাধী নন, ক্রিমিনাল নন, এ কথাটা তোমাকে বোঝাতে পারব ভেবেই তর্ক করেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশে কথার ঘুর্ণি টেনে নিয়ে যায় আমাদের হানাহানির আঘাটায়—কিন্তু তবু একথা তুমি হয়ত পরে একদিন বুঝবে যে তোমাকে আঘাত দিতে পণ ক'রেই আমি তর্ক তুলি নি! অমিত, জীবনে প্রতিপদে আমরা ভাবি—আমরা স্বাধীন, সবল, নিজের ভাগ্য গড়ি নিজে—কিন্তু আসলে আমরা যে কী নিঃসহায়, কী লাঞ্ছিত, কী—" আর পারল না ও, পড়ল ভেঙে—আমারই কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কী কান্না!

মৃদুলা (অস্ফুটস্বরে): বেচারী!

অমিত: সত্যি। মনে আছে সেদিন সন্ধ্যায় ঐ একটি কথাই রণিয়ে রণিয়ে উঠছিল আমার মনের তারে তারে—বেচারি! কারণ এ-জগতে এমন কে আছে যে বলতে পারে সে কারুরই মুখাপেক্ষী নয়? মন আমার শুধু আত্মগ্লানিতে নয়—করুণার এক মধুর আবেশে ছেয়ে এল, কোল থেকে ওর মাথাটা আমার বুকে তুলে নিয়ে ওর মাথার চুলে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম: "আমাকে ক্ষমা কোরো মৃদুলা! বিশ্বাস কোরো—আমি এদিক দিয়ে একবারও ভাবি নি। সত্যি বলছি—তোমার বাবা যদি আমাকে এভাবে গুছিয়ে বলতেন, তাহলে আমি কখনই রাগ করতাম না! কারণ এটুকু হয়ত তুমিও স্বীকার করবে যে, আমি স্বভাবে অভিমানী হ'লেও প্রকৃতিতে দাম্ভিক কি নিষ্ঠুর নই। শোনো লক্ষ্মীটি, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে, আজ রাতেই তোমার বাবার কাছে ক্ষমা চাইব। আর কী করতে পারি বলো? যা বলবে করব—প্রতিজ্ঞা করছি।"

ও মুখ তুলল। চোখ মুছে ধরা গলায় বলল: "অমিত, আমাকেও তুমি ক্ষমা কোরো। অভিমানী কে নয় বলো? আমি তো জানি আমি নিজে কত অহঙ্কারী! জানি তো—আমি কত সময়েই ভাব করি, এড়িয়ে চলি, শুধু নিজের ঘর বাঁচাতে। কিন্তু তুমিও বিশ্বাস কোরো একটা কথা: যে, বাবাকে আমি ভালোবাসি—বড় বেশি ভালোবাসি—সেখানে আমার একটুও অভিনয় নেই। কিন্তু মা তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না—দিদিও না।"

বলতে বলতে ওর স্বর রুদ্ধ হ'য়ে এলো।

* * *

অমিত (একটু পরে যেন নিজের মনেই): ঐ একটা জায়গায় বুঝি মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে যায়, ধরা দেয়—যেখানে সে সত্যি ভালোবাসে। তাই সেখানে সে শুধু যে বেদনা বোঝে তাই নয়—সে-বেদনা অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করতেও পারে। সেদিন রাতে এই সমবেদনার বেদনায়ই আমার মন ভ'রে গিয়েছিল। তাই ভুলে গেলাম ওর নানা ঠাট ঠমক, চকলতা, নানা পুরুষালি বাবাদুরি, সিগারেট খাওয়া, ফুলমাখা, আরো কত বহিরঙ্গ অপোজনতা। কারণ যেখানে ওর সঙ্গে আমার মিল হ'ল তার ছন্দ অন্তরঙ্গ—সেখানে সব মানুষই একলা—তার নাম আত্মদৃষ্টি। ও বাবাকে ও সত্যি ভালো-বেসেছিল—আর কাউকে কখনো বেসেছিল কি না জানি না, শুনেছি বাসেনি, কারণ নিজের নিরন্তরকে আপেলের অত্যন্ত বড় ক'রে দেখে এসেছিল ব'লে আত্মাভিমানকে কিছুতে বাগ মানাতে পারত না। কেবল এই এক জায়গায় ওর অভিমান ছিল না। থাকলে আমার কাছে অমন অভিমানিনী মেয়ে কখনই এত সহজে নত হ'তে পারত না।

[ক্রমশঃ

লোকোত্তর প্রতিভা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-ফিল

বর্তমান ভারতে বিজ্ঞান জগতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা যেমন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের, তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতিজগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা সঙ্গীতে ও সাহিত্যে নিঃসংশয়ে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও এই দুই বাঙালি মহামনীষী ভারতের বিজ্ঞান ও ললিত কলাক্ষেত্র আলোকিত ক'রে আছেন। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ও সর্বতোমুখী সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী দিলীপকুমারের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও কাব্যপ্রতিভা সংক্ষেপে এ প্রবন্ধে আলোচ্য।

১৮৯৭ সালের ২২শে জানুয়ারী দিলীপকুমার জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-নাটকার-গায়ক-প্রাবন্ধিক ও অতুলনীয় হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র তিনি—তাঁর পিতৃদেবের যে স্নেহ যত্ন ও সুপ্রভাবের মধ্যে পরিবর্ধিত হন, খুব কম লোকের ভাগ্যে তা জোটে। উৎকৃষ্টতম বহুমুখী শিক্ষা তিনি আশৈশব লাভ করেন। তাঁর অন্তর্নিহিত ভগবদ্দত্ত সর্বতোমুখী প্রতিভা—তার ফলে সহজে পূর্ণবিকাশের সুযোগ লাভ করে। প্রতিভার এমন উজ্জ্বল উৎসারণ, এমন প্রচুর পুষ্পল বিকাশ বাংলাদেশে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো মধ্যে দেখা যায় নি। জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্যের দিক থেকেও মধুসূদন ছাড়া আর কোন বাঙালি সাহিত্যিকের জীবন এত প্রাণপ্রাচুর্য পরিপূর্ণ, দ্বন্দ্ব সঙ্কুল অথচ ভাবগম্ভীর হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টি সময়ে সংক্ষেপে মনোযোগী ছিলেন। তিনি দিলীপকুমারের মতো পূর্ণ যৌবনে সংসারত্যাগী আশ্রমবাসী না হওয়ায় এবং তাঁর অসামান্য বিত্ত ও প্রতিষ্ঠা সাহিত্য খ্যাতি অর্জনে কথঞ্চিৎ নিযুক্ত হওয়ায়—তিনি একদিকে যেমন তাঁর সমস্ত রচনাবলী সুবিন্যস্ত রেখে গেছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রভূত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। 'নোবেল পুরস্কার' পাওয়ায় আমাদের দেশে সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁর খ্যাতি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে আরাধ্য দেবতায় পরিণত করেছে। তারও তাঁর সব গুণীদের প্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর করে না পাশ্চাত্য দেশগুলির মতো। কিন্তু অন্তত দুজন তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা জনসাধারণের কাছে পেয়েছেন, হয় তো কিছু বেশিই পেয়েছেন: রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলাল। ভারতীয় জনসাধারণ এঁদের যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্পণে ত্রুটি করে নি।

দিলীপকুমার প্রতিভাবান্ শিল্পী হলেও খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা লাভের মন্ত্রে সমস্ত উদ্যম নিয়োজিত করেন নি। তার কারণ অনেক। প্রধান কারণ অবশ্যই তাঁর যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ। ১৯০৩ সালে মাত্র ছয় বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। পিতা যতই স্নেহশীল হোন না কেন, শিশুর অন্তঃকরণে মায়ের অভাবে যে শূন্যতা বোধ, তা তিনি সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারেন না। এই শূন্যতাবোধ অন্য নানা উত্তেজক কারণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে অতি বাল্যকালেই দিলীপকুমারের মনে অধ্যাত্ম-উপলব্ধি ও পারলৌকিকতার বীজ বপন করে। অনুকূল পরিবেষ্টনের মধ্যে বাল্যকালেই হরিবংশ, ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ শেষ ক'রে বালকের সরল নিঃসংশয় বিশ্বাসে তিনি কৃষ্ণভক্ত হয়ে ওঠেন। গৌরাঙ্গভক্তিও উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের কাছ থেকে পান। ১৯১০ সালে মাত্র তেরো বছর বয়সে তাঁর ওপর নির্মলেন্দু লাহিড়ি মহাশয়ের প্রভাব পড়ে। প্রসিদ্ধ নট নির্মলেন্দুবাবু ভক্তও ছিলেন; তাঁর প্রভাবে দিলীপকুমার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুরাগী হয়ে ওঠেন তো বটেই, অঘটন বা অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতেও তাঁর বিশ্বাস নিবিড় হয়। ১৯১৩ সালে মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। ১৯১৮ সালে তিনি একুশ

বছর বয়সে সি, এস, সি, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের শিষ্য-সহচরদের সান্নিধ্যে তাঁর অধ্যাত্মস্পৃহা আরো বৃদ্ধি পায়। সুভাষচন্দ্রের প্রভাব আর বিপ্লবচর্চা তাঁকে অধ্যাত্মপথ-বিচ্যুত করে দেশপ্রেমাত্মক বিপ্লব সাধনা বা ঐহিকতার পথে টানতে পারে নি। অবশ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই জগতের সংস্কৃতিধারার সুসমন্বয় তাঁর মধ্যে সাধিত হয়েছিল। ১৯১৯ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে দিলীপকুমার ইউরোপ যাত্রা করেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই পারিবারিক জীবন বলতে যা বোঝায়, তাঁর ক্ষেত্রে তা মোটামুটি শেষ হয়ে যায়। তখন থেকে আরম্ভ হল তাঁর ভ্রাম্যমাণ পরিব্রাজক প্রবাসী জীবন, যা নয় বছরের মধ্যে ১৯২৮ সালে পূর্ণ সন্ন্যাসে পরিণতি লাভ করল। অন্যান্য প্রতিভাধর সাহিত্যিকেরা কেউই দিলীপ-কুমারের মতন জীবন-বিরাগী অনাসক্ত পুরুষ ছিলেন না, স্বার্থ সংরক্ষণে তাঁদের সেটুকু লক্ষ্য ছিল—যার জন্য নিজের রচনার বিস্তার ও রক্ষাব্যবস্থায় তাঁরা কখনও অবহেলা করেন নি। কিন্তু দিলীপকুমার খ্যাতি লাভ করেছেন অনেকটা অবশ্য সন্তর্পণ ভাবে, উদাসীন জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে। লোকে তাঁকে ভালোবেসে অযাচিতভাবে সম্মান দান ক'রে তৃপ্তি বোধ করেছে, তিনি কখনও প্রতিষ্ঠাবিলাসী হন নি।

প্রায় পঁচিশ বছর আশ্রমবাসের ফলে দিলীপকুমারের সৃষ্টিশক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণ ও যশ বিস্তৃত হওয়ার পথে গুরুতর প্রতিবন্ধক উপস্থাপিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব তিনি আশ্রমে বাস না ক'রেও লাভ করতে পারতেন। ইন্দিরা দেবীর ঐকান্তিক প্রয়াসে তিনি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন পুনায়। এখানেই তিনি গত এক যুগ স্বধর্মে স্বস্থ থেকে আত্মবিকাশের প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছেন। ভক্তিই তাঁর স্বধর্ম, স্বচ্ছন্দ পরিহাসকেলিবিহীন জীবন যাপনেই তাঁর স্বস্থতা।

এই আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের পরিপ্রেক্ষিতে দিলীপ-কুমারের সমগ্র প্রতিভার বহুমুখী বিকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। দিলীপকুমারের সাঙ্গীতিক যশোলাভ এখন লোককাহিনীতে প্রবাদবাক্যে পরিণত; আর, মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি ঐ অলোকসামান্য খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর ঔপন্যাসিক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তাও ১৯৬১ সালে প্রশ্নাতীত। তাঁর আধ্যাত্মিক উপন্যাসের সমাদর রূপদক্ষ কবিটনিষ্ট পত্রিকার কাছেও। কবিরূপে তিনি এখন সর্বোত্তম সিদ্ধির অধিকারী হলেও কবিখ্যাতি তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত বিস্তৃতি লাভ করে নি। তাঁর কাব্যধারার বিকাশ সংক্ষেপে আলোচ্য।

প্রথমে অবহিত হওয়া প্রয়োজন যে, বাঙালি সাহিত্যিক সমাজে মধুসূদনের পর দিলীপকুমারের চেয়ে বেশি পড়াশুনো আর কারোরই সিদ্ধি আর কারো পক্ষে সম্ভব-পর হয় নি। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় তিনি অনর্গল কবিতা লিখতে পারেন, মধুসূদন পারতেন বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি, জর্মন ও ইতালী ভাষায়, যা আর কেউ উনিশ-বিশ শতকে পারেন নি। ভালো পড়াশুনো না ক'রেও কেবল জন্মদত্ত স্বভাবকবিত্বের জোরে বাগ্বিস্তার করার পরিকল্পনা অসুস্থ নির্বোধ মানসিক-তার পরিচয় দেয়, প্রতিভার বদান্য সাধনালভ্য। দিলীপকুমার অন্যান্য সাধনার কবিরূপে বিকশিত হন, সে কাব্যসাধনার অন্তরালে "A necessary autobio-graphical basis" বা এমার্সন-কথিত আত্মজীবনীর প্রয়োজনীয় ভিত্তিও সুদৃঢ়ভাবে বর্তমান। অতি-আধুনিক নিউরোটিক বিট্‌নিক কবিদের পুঙ্খ পুঙ্খ আবর্জনা পরিত্যাগ ক'রে দিলীপকুমারের কাব্যধারার অনুবর্তন করলেই বাংলাকাব্যলক্ষ্মী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হবেন।

১৯২৮ সালের শেষের দিকে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যাবার আগেই দিলীপকুমারের কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল। ১৯৩১ সালে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমারের কবিত্ব প্রথম স্বীকার ক'রে নেন। ১৯৩৩ সালে দিলীপকুমারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "অনামী" প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "সূর্যমুখী" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলের জন্যে দিলীপকুমার তাঁর কবিতা সমষ্টি অনুরূপ কোন বৃহৎ তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করতে পারেন নি। ১৯৭২ সালে "দিনে দিনে" ও "প্রতিদিনের তীরে" নামে দুটি পুস্তিকা মাত্র প্রকাশিত হয়। তারপর তিনি সংস্কৃত কাব্যানুবাদে মগ্ন হন। তাঁর মৌলিক কবিতাগুলির উৎকর্ষ ও মনোহারিত্বের কোন সীমা নেই। তা সত্ত্বেও তিনি অনুবাদে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯৪৬

সালে তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ "ভাগবতী কথা" প্রকাশ করেন। এটি ভাগবতের অনুবাদ হলেও এতে তাঁর কাব্যরচনাসামর্থ্যের প্রভূত উন্নতি দেখা যায়। পৃথিবীর কোন ভাষায় ভাগবতের এর চেয়ে মনোজ্ঞ অনুবাদ প্রকাশিত হয় নি। ১৯২৯ সালে "ভাগবতী গীতি" এবং ১৯৫০ সালে "মহাভারতী কথা" প্রকাশিত হয়। তাঁর অনেক গান, যা উৎকৃষ্ট কবিতা, বিভিন্ন গানের সঙ্কলনে, পাঠ্যপুস্তকে, রম্য-রচনায় ও উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। গানের সঙ্কলনগুলির মধ্যে "গীতিমঞ্জরী", "নব গীতি মঞ্জরী", "গীতশ্রী" ও "সুর বিহার" উল্লেখযোগ্য। দিলীপকুমারের সমস্ত গান একত্র সঙ্কলন ক'রে কোন চয়নিকা বা সঞ্চয়ন আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। গীতিপদবাচ্য রচনা বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত সব চেয়ে বেশি করেছেন কাজি নজরুল ইসলাম—দু হাজারের বেশি। তারপর সংখ্যার দিক থেকে রবীন্দ্র নাথের স্থান—দেড় হাজারের ওপর—যদিও কাব্যোৎকর্ষের বিচারে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের অনেক উর্ধ্বে। তার পরই দিলীপকুমারের গান—সংখ্যায় প্রায় সহস্র—হিন্দী ভজনের বাংলা অনুবাদ ধরলে আরো বেশি—উৎকর্ষে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সমকক্ষ।

কৃতবিদ্য শিল্প দিলীপকুমার এবং আরো অনেক শ্রীঅরবিন্দ-ভক্তের ধারণা, শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তির প্রভাবে দিলীপকুমারের মধ্যে কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হয়েছিল। এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ১৯২৬-২৭ সালেই দিলীপকুমার এমন সব কবিতা ও গান লিখতেন, যা লিখতে পারলে যে কোন কবি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করতেন। প্রমাণস্বরূপ দু একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল।

গ্রামোফোন রেকর্ডে শ্রীযুক্তা মঞ্জু গুপ্তার গাওয়া অতুল প্রসাদ-বিরচিত "কত গান তো হল গাওয়া" গানটি বোধহয় বাঙালি সঙ্গীত-প্রিয় ব্যক্তিমাত্রই শুনেছেন। অমন চমৎকার গানটি দিলীপকুমারের ১৯২৩ সালে রচিত একটি গানের সুরে রচিত—কথাংশের মধ্যেও মিল আছে। পাঠকদের বিচারের জন্যে দুটিই পর পর উদ্ধৃত হল :—

দিলীপকুমার :—

যদি দিন না দেবে তবে
ব্যথা কেন এত সওয়াও ?
যদি আশা নাহি রবে
বৃথা বোঝা কেন বওয়াও ?

যদি মেঘের নানা খেলা
শুধুই মিথ্যে রঙের মেলা,
তবে ধ্রুবতারা বাজে কেন
সকাল-সন্ধে বেলা ?

যদি সৃষ্টি মিছে মায়া
মিছে লক্ষ রূপ-কায়া,
কেন নন্দে পরাণ গানে—ধরায়
ছন্দে আলোছায়া !

যদি বিফলতাই ভবে
চির অমর হয়ে রবে;
কেন ধরার ধূলিবুকে তারার
বাঁশি উছল তবে ?

অতুল প্রসাদ :—

কত গান তো হ'ল গাওয়া
আর মিছে কেন গাওয়াও ?
যদি দেখা নাহি দিবে
তবে মিছে কেন চাওয়াও ?

আমি যতই মরি ঘুরে
তুমি ততই রবে দূরে
তবে কেন বাঁশির সুরে
তব তরে শুধু ধাওয়াও ?

যদি সন্ধ্যা হ'লে বেলা
নাহি মিলে তব বেলা,
পথ ভোলা মোর ভেলা
এ-অকূলে কেন বাওয়াও ?

যদি আঁধার দিবা-রাত্রি
কাটি' যায় বিনা সাথী
তবে কেন বঁধু লাগি'
পথ-পানে শুধু চাওয়াও ?

কবি নজরুল ও "বুলবুল" কাব্যে অন্তত তিনটি কবিতায় দিলীপকুমারের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তাঁর সন্ন্যাসী হওয়ার জন্যে এবং পাশ্চাত্য জগতে সঙ্গীতে আলোড়ন আনার জন্যে। ২৬ বছর বয়সের তরুণ কবির কাছে ৫২ বছরের প্রবীণ কবির এ-ঋণগ্রহণ সত্যই বিস্ময়ের বিষয়।

১৯২৬ সালে দিলীকুমার তাঁর বিখ্যাত "জয়-পরাজয়" কাব্যগীতি রচনা করেন। মাত্র এই একটি কবিতার জন্যে তিনি বাংলা কাব্যজগতে অমর হয়ে থাকতেন। এটি গ্রামোফোনে বিখ্যাত জনপ্রিয় গায়ক রেকর্ড করেন, এর অনুকৃতিও রেকর্ড করা হয়। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর উপন্যাসে এটি উদ্ধৃত করেন, শিবরাম চক্রবর্তী ও আরো অনেক সাহিত্যিক এটি তাঁদের রচনায় বারবার উদ্ধৃত করেছেন। এই কবিতাটি প্রমাণ করে যে, রোমান্টিক প্রেমের কবিতা লিখতে দিলীপকুমারের নৈপুণ্য যে কোন কবির ঈর্ষার কারণ হতে পারত :—

প্রিয়, তোমার কাছে যে হার মানি'
সেই তো মোর জয়!
দেখা জয়বিজয়মাঝিতে প্রেম
জয়ী কি কভু হয়?

* * *

জানি তোমার কাছে জিতিলে হারি
হারিলে লভি জয়।

দিলীপকুমারের কবিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি রোমান্টিক অধ্যাত্ম-ভাবনার কবি। Romantic Idealism বা রমণীয় আদর্শবাদ সূক্ষ্ম সুকুমার অধ্যাত্ম-বোধের রসব্যঞ্জনায় পরিণত। এ-ধারায় বাংলাসাহিত্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁকে ঘিরে পণ্ডিচেরিতে একটি কবিগোষ্ঠীও গড়ে উঠেছিল। তাঁর প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল নিশিকান্ত, নীরদবরণ আর জ্যোতির্ময়ীর ওপর। বাংলা সাহিত্যজগতে তাঁর মতো Spiritual adventurer বা অধ্যাত্ম-অভিযাত্রী দুর্লভ। ১৯২৯ সালে তিনি লিখেছিলেন যা সাহানা দেবীর কণ্ঠে আজও গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনা যাবে :—

তব আশাপথ চেয়ে
যাবো তরীখানি বেয়ে
ও
ধ্রুবতারা যদি নাহি জলে মা উষায়
জ্বলি' উঠিবে নিশিতিমিরে প্রাণসাধনায়।

যাঁরা জীবনে কখনও যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁরা দেখে মুগ্ধ হবেন কি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি যোগানুভূতিগুলির কাব্যরসরূপ দান করেছেন :—

প্রতিপলে পাই—হেলায় হারাই
পরে কোঁদে তোমা' খুঁজি মা!
কাঁদে পা বাড়াই—বন্দী হইলে ভবি মা!

এই অনুভূতি আরো সুরেলা হয়ে তার কোমল মূর্ছনায় আমাদের মনোহরণ করে :—

তোর ঐ নয়নপাতে যখন সুখী
চিত্তবনের সূর্যমুখী
মেলি' তার দলগুলি চায় ঊর্ধ্বলোকের পানে,
হই বঞ্চিত কি সেই নিমেষেই বিকাশ-বরদানে।

যে মাকে কবি শৈশবে হারিয়েছিলেন, যাঁর মুখচ্ছবি কবির মুখে সুপ্রতিফলিত, তিনি অন্তরাল থেকে কবিকে চিরদিন প্রেরণা সঞ্চার ক'রে এসেছেন :—

প্রতিপলেই শুনি মা তোর মিলন-মণির নূপুরধ্বনি
হারাই মুখর মেলায় তবু সঙ্গোপনীর আগমনী।

অবশ্য কবির সজ্ঞান মনে জগন্মাতা চিন্ময়ী জননীর ধ্যান অব্যাহত থেকেছে—কিন্তু আড়াল থেকে মৃন্ময়ী জননীর মৃদুল চরণধ্বনিই কবিকে উতলা করেছে। মাতৃ-ভাবের এত সুন্দর গীতিকাব্য রামপ্রসাদ আর নজরুল ছাড়া আর কেউ লেখেন নি—

তোর কৃপা বরেণ্য জেনে শুভ্র হিয়া হ'ল পুণ্যব্রত!···
দেবদ্রোহী তিমির-কাঁটা ধন্য হ'ল হয়ে আলোকলতা!

দিলীপকুমারের সম্বন্ধে অনেক বিমুখপাঠকের না প'ড়েই এই রকম ধারণা দেখা যায় যে, তিনি কেবল ধর্মসঙ্গীত রচনা করেন যাতেমামুলি হরিগুজনার সহপদেশের চর্বিতচর্বণ ছাড়া আর কিছু কবিত্বসম্পদ্ থাকে না। কিন্তু ছন্দের বহুচিত্র বর্ণাঢ্য ঝঙ্কারে নতুন সুরের মর্মিন্ সুখস্পর্শ, অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক সুষমার সুগন্ধি ঝলকনে কবি অতুলনীয়, সম্পূর্ণ মৌলিক, যার জন্যে সম্প্রতি পরলোকগত বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিৎ জর্মন মনীষী Helmuth Von Glasenapp লিখেছিলেন :—

"you are a very able son of your great

father, the more so as your poetical genius is original and quite different from his."

রোমান্টিক স্বপ্নকরুণ জাতিস্মরের রেশঘন্ন অনুভূতির ছন্দকুশল একটি বর্ণনা :—

স্বপ্ন কোথায় পথের চলায়
রক্ত কাঁটায়
ছিন্ন দলে পৃথ্বীতলে
কহত না নিরালী।...
কোথায় সবই পেয়েছিলাম
কেন দিলাম
বিসর্জনি' তায় এমনি—
আজ কে শুধাই তাই।

কবির সৌন্দর্যচেতনার অভিনব উদার ও ব্যাপ্ত চিত্ররূপ :—

ঘিরে র'খো মোরে তব নীহারিকা-মেখলায়,
হে মণি-অম্বর!
বাসন্তিকা! স্নিগ্ধ করো মোরে তব সপ্তরঙা
মলয়-কিরণে।
দোলাও আমারে নীল ঘুমপাড়ানিয়া গানে, হে সিন্ধুমর্মর!
তুষারশিখর! করো বিহ্বল আমারে
তব আবেশ-স্বপনে।

প্রেম, স্বপ্ন, দুরাশা, অভিলাষ, দিশা, আরাধনা ও নিসর্গ-শোভার নিসর্গস্বামীর অরূপ রূপের উদ্ভাসনের কবি দিলীপকুমার। তাঁকে চিনতে পারলে বাঙালি কাব্য-রসিকের চিত্তের অর্গলমুক্তি ঘটবে। আজ যখন ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গহাসি-বিহসিত প্রিয়ারা তাদের দিকে সকরুণ বিভ্রমের দৃষ্টিতে চেয়ে তাদের মানসী হয়ে প্রেরণা দিতে অস্বীকার করছে, তখন নতুন ভাব ও ছন্দের লহরী-লীলার ভরে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের ব্যর্থ কবিদের দ্বারস্থ হয়ে তাদের উচ্ছিষ্ট যৌনবিকার ভোজন না ক'রে স্থিতপ্রজ্ঞ সৌন্দর্যের সত্য সাধনার পথে পদার্পণ করাই হবে যোগী কবি মহামনীষী শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় Sunlit Path বা সূর্যালোকিত সরণীতে যাত্রা সুরু করা। দিলীপকুমারের চন্দ্রালোকিত চৈতন্যের এই প্রজ্ঞাসুন্দর ইঙ্গিতটি তরুণ বাঙালি কবিদের অনুধাবনীয় :—

চাঁদের আলো কাঁপে বুকের জলে...
তারার আঁখি আখিতারায় জ্বলে...
বাইরে দেখি যারে—
অন্তর-পাথারে
ছন্দ-পরী রচল তারি গান
লুপ্ত হ'ল ক্ষুব্ধ অভিমান!

শ্রীঅরবিন্দের উপদেশে ও পরিচালনায় দিলীপকুমার কাব্যচর্চার বহু সমৃদ্ধির সন্ধান পান, সে বিষয়ে সংশয় নেই। বাংলা ছন্দে তাঁর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্য এখন গুণিজনসমাজে স্বীকৃত। মুখ্যত গদ্যকবিতা রচনায় ব্রতী ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র এক বৈঠকে বক্তৃতায় এ-ক্ষেত্রে দিলীপকুমারের দান সম্প্রতি স্বীকার করেছেন। শুনে খুব ভালো লাগল। দিলীপকুমারের পুণ্যপ্রভাবে যত বেশি নিম্নমুখী প্রাণকলিকা তাদের ঊর্ধ্বশিখা আলে, ততই আনন্দের কথা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন গদ্য কবিতার চর্চা ক'রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো অকবি পদ্য-পণ্ডিতের খোদামোদ ক'রে শেষে হাঁপিয়ে উঠে অমিয় চক্রবর্তী মশাইকে সাফ জবাব দিয়েছিলেন, নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন রোমান্টিক রসতীর্থ পথের পথিক হয়ে। সেই পথের প্রকৃত উত্তরপথিক বাঙালি পাঠকের মাথার নীল অদৃশ্য চাঁটি মারেন না, রসতীর্থকে ভক্তির গঙ্গোত্রী-উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে বলেন :

অমৃতের আশা নয়
শ্মশান-উদ্ভবা, জ্বালাময়। তৃষ্ণাহরা মন্দাকিনী
সমুজ্জ্বলা সেই লোকে—আঁখি যার দিশা নাহি পায়,
তারি ঢেউ নিতি এসে লাগে রূপোজ্জ্বল ধরাতলে
ইন্দ্রিয়রঙিন বেলা'পরে অনুরাগে। যারে কভু
চিনি নাই জানি নাই—সেই প্রাণে বিদ্যুৎ-চুম্বনে
শিহরে লীলায় চির-বান্ধবের প্রায়।

কবিশ্রেষ্ঠ দিলীপকুমারের সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলি :—

প্লাবন ঢেউয়ে ওঠো দুলে জীবন-যমুনায়
আলোর আলো! ছায়া কাঁপে তোমার পিপাসায়।

মোক্ষধাম

শ্রীপথিক

ভারতবর্ষের চিরন্তন পরিচয়—তার ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। তার পরিপূর্ণ রূপ আধ্যাত্মিকতায়। এদেশের মানুষের মনে অধ্যাত্মিকতার ছোঁওয়া লেগেছে প্রাক্-ইতিহাসের প্রথম দিন হতে। তারই সুরণ হয়েছে, তারই এষণা ছড়িয়ে রয়েছে বৈদিক ও ঔপনিষদিক চিন্তা ধারার মধ্য দিয়ে।

ভাস্কর্যবিদ্যা জগতে রডিনের (Rodin) The Thinker একটা সফল শিল্প প্রচেষ্টা। The Thinker নিবিষ্ট ভাবে বসে আছে দুটো হাতুর উপর মাথা রেখে। কুঞ্চিত ললাট। দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। ভেবে চলেছে। —ভেবে চলেছে। কিন্তু জীবনের সমাধান আজও খুঁজে পায়নি।

বিশ্বজনীন মানবজীবনের ইতিহাসও তাই। The Thinker তারই প্রতিভূ। জীবনের পরিপূর্ণতার সন্ধান তারা আজও খুঁজে পায়নি। কিন্তু ভারতবর্ষের নয়। ভারতবর্ষের মানুষ পরমার্থের পূজারী হয়ে জীবনের পরিপূর্ণতাকে খুঁজে পেয়েছে। বেদ উপনিষদ তারই চিরন্তন ভাষা। একমাত্র ভারতবর্ষের মানুষই উদাত্ত কণ্ঠে বিশ্বজনেরে ডেকে বলেছে—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

জেনেছি আমার শেষ
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ।

দেওঘর দেবসঙ্ঘ আশ্রমের নবনির্মিত মন্দির 'মোক্ষধামে'র সামনে গিয়ে দাঁড়ালে উপনিষদের এ ভাবধারাটিই চোখের সামনে ফুটে উঠে।

মানুষ সুমহান। আপন সত্তায় চির সুন্দর। জীবনের পরিপূর্ণতা সেখানেই। কিন্তু সেখানে সে প্রতিষ্ঠিত নয়। তাকে সে পরিপূর্ণতা লাভ করে সুমহান্ হতে হবে। জীবনের সে পরিপূর্ণতা লাভের প্রচেষ্টাই চলছে দেবসঙ্ঘ আশ্রমের সাধনার মধ্য দিয়ে।

ভারতীয় সাধনার দুটো ধারা। অস্তিবাদ ও নেতিবাদ—অস্তিবাদ সত্য প্রতিষ্ঠাবাদেরই দ্যোতক। সত্য প্রতিষ্ঠাবাদের সম্যক বিকাশ আমরা দেখতে পাই উপনিষদের চিন্তাধারায়, তৎপরবর্তী দর্শন ও সাহিত্যে। একালে সত্য প্রতিষ্ঠাবাদের সাধনাকে আরও মূর্ত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—আচার্য শ্রীমৎ বিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও সাধন সমর গ্রন্থ প্রণেতা ব্রহ্মর্ষি শ্রীমতাদেব। দেবসঙ্ঘ আশ্রম এ সত্য প্রতিষ্ঠাবাদের সাধনারই অনুপ্রাণিত। বেদ উপনিষদ গীতা চণ্ডী প্রভৃতি হিন্দুধর্মের মুখ্য শাস্ত্রগুলোকে অবলম্বন করেই এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে।

দেবসঙ্ঘ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ। দেওঘর বোম্বপাশ টাউনের শেষ প্রান্তে শান্ত নিবিড় পরিবেশের মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। সহরের কল-কোলাহল হতে দূরে এসে এর শান্ত নিবিড় ধ্যান গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অনেক মানুষই আজ তার আধ্যাত্ম জীবনের পাথেয় খুঁজে পায় এখানে।

১৯৪৫ খৃঃ একটা পুরাতন বাড়ী নিয়ে দেবসঙ্ঘের দেওঘর শাখাটির শুভ সূচনা হয়েছিল। আজ দেখতে দেখতে তার আকার ও আয়তনের অনেক পরিবর্তনই হয়েছে। দেবসঙ্ঘের অন্যান্য আশ্রম রয়েছে কোলকাতার নিকটবর্তী কোন্নগর ও জলপাইগুড়িতে।

'মোক্ষধামের' নির্মাণকার্য সুরু হয়েছিল ১৯৫১ খৃঃ। পরিসমাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে। 'মোক্ষধামে' একটা মূল মন্দিরকে কেন্দ্রকরে রয়েছে তার পাশে আরও দুটি মন্দির। সামনে এক বিরাট নাটমন্দির। পার্শ্ববর্তী মন্দির দুটিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন—শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মহেশ্বর ও শ্রীশ্রীপার্থসারথির পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি। মূলমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন উপনিষদের আদর্শে গঠিত শ্রীশ্রীহৈমবতীর মর্মর বিগ্রহ।

হৈমবতী ঔপনিষদিক দেবতা। কেনোপনিষদে একটা

উপাখ্যান আছে। দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণ বিজয়ী হয়েছেন। দেবতাবর্গ আলোচনায় রত কে তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। কার মহিমা তাঁদের এ যুদ্ধে জয়ী করেছে। সকলেই আপন আপন মহিমা সম্বন্ধে সচেতন। এমনি সময় অদূরে এক যক্ষের আবির্ভাব হলো। দেবতাবর্গ জানার জন্য ব্যাকুল হলেন এ যক্ষ কে ?—অগ্নি যক্ষের সমীপস্থ হলেন। যক্ষ অগ্নির পরিচয় জানতে চেলেন। স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে অগ্নি তাঁর সর্ব্বদাহিকা শক্তির কথা বললেন। অগ্নি কিন্তু যক্ষ প্রদত্ত একটা তৃণ-খণ্ডও ভস্ম করতে সমর্থ হলেন না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। গেলেন বায়ু। বায়ু তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে প্রচণ্ড গতিশক্তির কথা উল্লেখ করলেন। কিন্তু বায়ুও সে তৃণখণ্ডটি স্থানচ্যুত করতে পারলেন না। তারপর অতি বিনীত ভাবে যুক্তপাণি হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যক্ষ-সমীপস্থ হলেন। ইন্দ্রের-বিনীত ও সম্ভ্রমভাবে যক্ষ পরিতুষ্ট হলেন। তিনি যক্ষরূপ পরিত্যাগ করে হৈমবতী দেবী মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হলেন।—স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্।

উপনিষদের উপাখ্যানের এখানেই পরিসমাপ্তি। উপনিষদের চিরন্তন আদর্শকেই এ উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে। একই শক্তি বিবিধের মধ্য দিয়ে নানাভাবে, নানা ছন্দে ক্রিয়া শীলা। একই বহু হয়েছেন। বহুর অন্তরালে রয়েছে একই সত্তা।—সচ্চিদানন্দময়। তিনিই—একম্ সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি। তাঁকে ছাড়া কিছুই নেই। তিনিই সব কিছু। তারই শক্তিতে চলা। তারই শক্তিতে বলা। তারই শক্তিতে শুনা। তারই শক্তিতে মনন করা। তিনিই জীবনের এক মাত্র প্রবতারা। তবে জানার মধ্য দিয়েই আসে জীবনের চরম সিদ্ধি ও পরম পরিপূর্ণতা। নতুবা—মহতি বিনষ্টি। ভারত এ অমৃতত্বের পূজারী হয়েই বিশ্বের কাছে বরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই পরম সত্তা ব্রহ্ম। সা হোবাচ ব্রহ্মেতি।

'মোক্ষধামে' হৈমবতীর যে মূর্ত্তি আমরা দেখতে পাই তা শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের মানস প্রতিমূর্ত্তি। উপনিষদে হৈমবতীর আকার আকৃতি প্রভৃতির কোন বিবরণই নেই। শুধু হেমকান্তি স্ত্রী মূর্ত্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারীজীর প্রকাশিত এ মূর্ত্তি অষ্টভুজা।

শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা।—সত্ত্ব, রজ, তম। ব্যক্ত জগতের তার রূপ—সৃষ্টি স্থিতি লয়। সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা। স্থিতির দেবতা বিষ্ণু। লয়ের দেবতা শিব। ব্রহ্মা—মন। বিষ্ণু—প্রাণ। শিব—জ্ঞান। তাই দেবী হৈমবতীর নিম্নদিকের তিন জোড়া হাত ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের বর্ণ যথাক্রমে—লাল, পীত ও শ্বেত। প্রত্যেক হাতে ঐ দেবতার অস্ত্র ও ও উপকরণাদিও রয়েছে। ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত। হৈমবতীই ব্রহ্ম। তাই ত্রিগুণের উর্দ্ধে ঐ দেবীর দুটি হাত। তার বর্ণ হৈম। বেদীর একপার্শ্বে ইন্দ্র যুক্ত করে নতজানু হয়ে রয়েছে।

প্রশস্ত নাটমন্দিরটির উত্তর দিকের দেওয়ালে রয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন তৈল-চিত্র। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে রয়েছে শ্রীশ্রীচণ্ডীকে অবলম্বন করে বিবিধ তৈলচিত্র। নাটমন্দিরের মধ্যভাগে উপরের দেওয়ালে রয়েছে ত্রিসন্ধ্যার মূর্ত্তি, নবদুর্গা, দশমহা-বিদ্যা ও উপনিষদ অবলম্বনে বিবিধ চিত্র। এ সব চিত্র অঙ্কন করেছেন—বিবিধ নিপুণ শিল্পীরা। সেগুলো বর্ণ ও শিল্পে চিত্তাকর্ষক। এ নাটমন্দিরেই দেবসঙ্ঘের শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঐ সময় ভারতের বিবিধ প্রান্ত হতে বহু লোকের সমাগম হয়।

'মোক্ষধামের' শান্ত মধুর পরিবেশের মধ্যে সমস্ত দিন চলে বিবিধ প্রার্থনা ও উপাসনা। বিকালে বহু ধর্মার্থীর সমাগম হয়। ক্রমে সন্ধ্যা নামে। আলো ঝলমল মন্দিরে আরত্রিকের ঐকতান বাজনা বাজে। কানে ভেসে আসে উপনিষদের মন্ত্র—'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।'—তিনি আমাদের শুভ বুদ্ধি যুক্ত করুন।—'ধিয়ো যো নঃ প্রচো-দয়াৎ'।—তোমাকে ধারণা করার মেধা দাও।

মিলি সেনের ককটেল পার্টি

একাঙ্ক—নাটক

* • • নারায়ণ চক্রবর্তী

এই নাটকের চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক

পাত্র-পাত্রী

মিলি সেন	নিস্কাশনপুর অফিসার্স কোয়ার্টারের অধিবাসিনী।
ত্রিবিক্রম সেন	মিলি সেনের স্বামী নিস্কাশনপুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর পার্শোনেল ডিরেক্টর।
সোনালিদা সেন	মিলি সেনের মেয়ে।
স্যার হুসমত্তিয়া	নিস্কাশনপুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট ডিরেক্টর।
চার্লস গিলবার্ট	আকাশখালি রিফ্রাক্টরী ওয়ার্কস্‌এর সিনিয়র পার্টনার।
সোনালি চন্দ্র	নিস্কাশনপুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস্‌এর চীফ্ ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টেন্ট মিষ্টার এ, কে, চন্দ্রের স্ত্রী।
অসীম চন্দ্র ...	সোনালি চন্দ্রের স্বামী।
অরুণ চন্দ্র ...	সোনালি চন্দ্রের ছেলে।
মলয় চ্যাটার্জি ...	উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক।
শেফালী, ছন্দা, ইন্দ্রা, কমলা	নিস্কাশনপুরের হাই সোসাইটি-লেডীস্।
মিষ্টার কাপাডিয়া ...	নিস্কাশনপুর কারখানার অফিসার।
মিসেস কাপাডিয়া ...	মিষ্টার কাপাডিয়ার স্ত্রী।
মিসেস কৃপালনী	চন্দ্রশেখর কৃপালনীর স্ত্রী।
সুলতান	মিলিসেনের খাস বেয়ারা।

প্রথম দৃশ্য

[নিস্কাশনপুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কসএর পার্শোনেল ডিরেক্টর মিষ্টার ত্রিবিক্রম সেনের বাংলো। উৎসবের সাজে সজ্জিত। হলঘর নিপুণভাবে সাজানো। মিসেস মিলি সেন আধুনিকতম রূপসজ্জায় রঙীন প্রজাপতিটির মতো যেন উড়তে উড়তে ভেতর থেকে হল ঘরে ঢুকলেন। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। মিলি সেনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মেঘের গায়ে লেগে থাকা সূর্যের শেষ রশ্মির মতো যৌবনের রেশ লেগে আছে তাঁর শরীরে। সময় : সন্ধ্যা ছ'টা]

মিলি। সুলতান,—সুলতান—

বেয়ারা সুলতানের প্রবেশ

সুলতান। জী মেমসাব্?

মিলি। সব বন্দোবস্ত ঠিক হ্যায়?

সুলতান। জী হাঁ মেমসাব্—

মিলি। বারান্দামে কিতনা কুর্সী দিয়া?

সুলতান। পঁচিশ কুর্সী মেমসাব্—

মিলি। ঠিক হ্যায়। হুইস্কি, ব্রিয়ার, জিন, বরফ সব আ গিয়া?

সুলতান। জী হাঁ মেমসাব্, সব সামান মৌজুদ হ্যায়। ইয়াসিন মিঞা ভি আসানসোল সে লৌট আয়ে হৈঁ। ককটেল বন রহা হ্যায় কিতেন মে,—লাই এক দ'স?

মিলি। আভি নেহি সুলতান। সাব্‌কো পহেলে আনে দো। মিসিবাবা কিধার হ্যায়—

সুলতান। অপনে কমরে মে মেমসাব্,—বুলাউ?

মিলি। নেহি নেহি। ঠিক হ্যায়, অব তুম যাও, ইয়াসিন কো মদত করো। পার্টিমে আচ্ছা কাম করনেসে আচ্ছা ইনাম মিলে গা—

সুলতান। বহোত আচ্ছা মেমসাব্—

সুলতানের প্রস্থান

মিলি। [ঘুরে ঘুরে এ টেবিল ও টেবিলে গিয়ে ফুলদানীগুলো পছন্দ মতো জায়গায় রাখতে লাগলেন]।

গুণ গুণ স্বরে

I dreamt a sweet dream
That near a lovely stream···

[ত্রিবিক্রম সেনের প্রবেশ। টিপটপ্ বুটপরা। বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ, মাথায় টাক, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, ভারিক্কি চেহারা।]

মিলি। (গান থামিয়ে) আজ সোনালিদার বার্থ-ডে পার্টি, আজকের দিনেও এত দেরী করে কারখানা থেকে ফিরলে ত্রিবিক্রম?

ত্রিবিক্রম। আই অ্যাম সো সরি মিলি, প্যাটার্ণশপে লেবার ষ্ট্রাইক চলছে, সেই ঝামেলায় আটকে গিয়েছিলাম—

মিলি। আজ মেশিন শপ, কাল রোলিং মিল, পরশু প্রাট-কার্খেস,—একটা না একটা শপে ষ্ট্রাইক তো তোমার লেগেই আছে দেখছি—

ত্রিবিক্রম। কী আর করা যাবে বলো,—লেবার আমরেষ্টএর কেস চলছে এখন দারা দেশে, এদের এ মুভ্-মেণ্টটা ক্রাশ্ করতে সময় লাগবে মিলি—

মিলি। কিন্তু তোমার তো দু' দু'জন এ্যাসিষ্টেণ্ট রয়েছে, তাদের ওপর ভার দিয়ে আসতে পারলে না?

ত্রিবিক্রম। তা কি করে হয় মিলি? ডেপুটি লেবার কমিশনার এসেছিলেন, এসেছিল ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেণ্ট আর জেনারেল সেক্রেটারী—

মিলি। জেনারেল সেক্রেটারী? আট্ রোগ্? যে ওপেন মাস মিটিংএ তোমার নামে যা তা বলেছিল? আমি হলে তো জীবনে ওর সঙ্গে কথাই বলতাম না—

ত্রিবিক্রম। কূটনীতি কিন্তু তার উল্টো কথাই বলে মিলি। আমি জানি ও আমাকে কোম্পানীর দালাল বলে গাল দেয়, তোমাকে আর তার হনুমন্তিয়াকে নিয়ে বিশ্রী কথা বলে, তবু মিটিংএ ওকেই চা বিস্কিট খাওয়াতে হয়—

মিলি। তা বলুকগে ওদের যা খুশী, কথায় তো আর ফোস্কা পড়ে না গায়ে। তুমি কি নিয়াশনপুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কসএর পার্শেনেল ডিরেক্টার, কোম্পানীর ইনটারেষ্ট তো তোমাকে দেখতেই হবে—

ত্রিবিক্র। তা তো হবেই মিলি, তার হনুমন্তিয়া আমাকে ট্রিপ্‌ল প্রোমোশন দিয়ে এতবড়ো একটা দায়িত্ব তার দিয়েছেন, তাঁর ইন্টারেষ্ট্ আমি দেখব বৈকি—

মিলি। প্যাটার্ণ শপের এই স্ট্রাইকটা তো আজ দিন দশেক ধরেই চলছে,—ওদের ডীমাণ্ডটা কী বলো তো?

ত্রিবিক্রম। এই—মাইনে কম,—মাইনে বাড়াও, নতুন গ্রেডিং করো, আরও দুট্ বোনাস দাও, ডিয়ারনেস এ্যালাউন্স বাড়াও,—এগুলি আছে আট দফা দফা।—

মিলি। স্পর্দ্ধা তো কম নয় ওদের? চল্লিশ হাজার শ্রমিক কাজ করে এই ইস্পাত কারখানায়, দশ টাকা করে ডি, ও, বাড়ালেও তো চার লাখ টাকা বেরিয়ে যাবে,—আবার আর কি!

ত্রিবিক্রম। ওদের এই আবদারে উস্কানী দেবার লোকও জুটে গেছে বিস্তর—

মিলি। না না। ওদের ওসব কথায় মোটেই কান দিও না তুমি, বুঝলে? এমনিতেই যথেষ্ট পাচ্ছে ওরা—

ত্রিবিক্রম। ম্যানেজমেণ্টেরও তো তাই ইচ্ছে মিলি, কিন্তু—

মিলি। কিন্তু? কিন্তু আবার কি?

ত্রিবিক্রম। কিছু দিন আগে কোম্পানীর ছোট বড়ো সব অফিসারদেরই দু' শো টাকা করে ফ্ল্যাট ইন্‌ক্রিমেণ্ট হ'ল না? ওরা এখন সেই নজিরই দেখাচ্ছে গভর্ণমেণ্টের কাছে,—বলছে যে যারা প্রাণপাত করে, গায়ের রক্ত জল করে কোম্পানীর মুনাফা বাড়াচ্ছে তাদের প্রতি কোম্পানীর চরম বিশ্বাসঘাতকতা এটা—

মিলি। হোয়াট এ সিলি আইডিয়া! অফিসারদের সঙ্গে লেবারের তুলনা? এ রেশটায় হল কি বলোতো? চার হাজার টাকা মাইনে পাও তুমি, তবু ভালো ভাবে সংসার চালাতে পারছি কি? পারলাম কন্টিনেণ্টে গিয়ে দু মাসের ওপর থাকতে? দেড় মাসের মধ্যেই ফতুর্ হয়ে ফিরে এলাম না?

ত্রিবিক্রম। তবু তো তোমার আর আমার এবার প্যাসেজের টাকা কোম্পানীই দিয়েছিল, সুব্রত আর মোনোলিসাকে তো সঙ্গে নিতেই পারলাম না, রেখে গেলাম কলকাতায় গীতাদের ওখানে—

মিলি। তবেই দেখ, জীবনের সামান্য সাধ-আহ্লাদটুকুও মেটাতে পারছি না আমরা, অথচ নিজের চোখেই তো দেখে এলাম কন্টিনেণ্টের স্ত্রী পুরুষদের,—জীবনটাকে কী নিপুণ ভাবেই না উপভোগ করছে ওরা, ওদের তুলনায় আমরা কতো নগণ্য, কতো নিঃস্ব—

ত্রিবিক্রম। ঠিক বলেছ মিলি, ইউ আর কোয়াইট

রাইট—চার হাজার টাকা শুনতেই বিরাট, কিন্তু আসলে তার ভেতর যে কতো খানি ফাঁকি তা শুধু জানি তুমি আর আমি,—

মিলি। অথচ তার হিংসেতেই জলে পুড়ে মরছে ঐ ইউনিয়ান ওয়ালারা,—হোটাট এ ফাইসেন্স দে আর—ওদের মতো আমিও তোমাকে নোটিশ দিচ্ছি ত্রিবিক্রম; এ মাইনেতে সংসার চালাতে পারবনা আমি—

ত্রিবিক্রম। ডোণ্ট ওরি মিলি,—স্যার হুহুমন্ত্রিয়া আশ্বাস দিয়েছিলেন যে নেক্স্ট ফাইনানশিয়াল ইয়ার থেকে কিছু ইনক্রিমেণ্টের ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু মাঝখানে এই একার্স্ড্ ষ্ট্রাইক গুলো এসে পড়ল, নাউ হি ঘাস্ট বি অফ্ হিজ মুড্—

মিলি। ষ্ট্রাইকের হাঙ্গামাগুলো কি শিগগির মিটবেনা ত্রিবিক্রম?—

ত্রিবিক্রম। ইউনিয়নের বড়ো বড়ো পাণ্ডাদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা, কিছু ইনক্রিমেণ্ট প্রোমোশন, কাউকে বাগালো কোয়ার্টার্স দিয়ে বশ করবার চেষ্টা করছি কিছুদিন ধরে, পাঁচ সাত জন কমিটি মেম্বার তো এরই মধ্যে বেশ সাড়া দিয়েছে, ওদের মধ্যে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, দলাদলি আছে তার সুযোগও পুরোপুরিই নিচ্ছি কিন্তু—

মিলি। কিন্তু? হোয়াট ডু ইয়ু মীন বাই—কিন্তু?

ত্রিবিক্রম। ইউনিয়নের নতুন জেনারেল সেক্রেটারী বিন্ধ্যেশ্বরী চতুর্বেদী লোকটি তেমন সুবিধের নয়,—বাগে আসছে না কিছুতেই—

মিলি। কেন? লোকটা কি সর্ব প্রলোভন মুক্ত? একেবারে শুকদেব গোঁসাই?

ত্রিবিক্রম। নতুন এসেছে বলে এখনো তার দুর্বলতার সন্ধান পাই নি, তাই প্রতি মিটিংএই গরম আবহাওয়া, প্রতি মিটিংএই টেবিল ঠোকাঠুকি চলছে—

মিলি। লোকটার আস্পর্দ্ধাও তো কম নয় ত্রিবিক্রম? তোমার সামনেও টেবিল ঠুকবার সাহস রাখে?

ত্রিবিক্রম। এ কারখানার চল্লিশ হাজার মজদুর ওর কথায় ওঠে বসে এ রকম একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে ওর মনে,—সেই জনশক্তির ক্ষমতার নেশায় আজ বুঁদ হয়ে আছে লোকটা। ও তো এখনো জানে না যে অশিক্ষিত মজদুররা আজ যাকে মাথায় তুলে নাচে কালই তাকে পায়ের নীচে ফেলে পিষে মারতেও দ্বিধা করবে না—এও আই অ্যাম ওয়েটিং ফর দ্যাট আওয়ার—

মিলি। ইউ আর রাইট ত্রিবিক্রম এখন ওকে বাড়তে দাও—তা হলেই ওর পতন ঘনিয়ে আসবে খুব তাড়াতাড়ি।

ত্রিবিক্রম। ঠিক কথা। তাই তো আজকের মিটিংএ ওর ইন্সাল্টিং টোনকে বুধ বুঝে হজম করলাম। আমি—

মিলি। ইনসাল্টিং টোন? হাউ হি ডেয়ার্স।

ত্রিবিক্রম। নাউ নাউ ডোণ্ট-গেট একসাইটেড মাই গার্ল এটা আমাদের সিস্ এণ্ড টেক পলিসিরই অঙ্গ—

মিলি। কিন্তু তোমার পোজিশন, তোমার প্রেষ্টিজ—

ত্রিবিক্রম। ছাড় ইয়োর পোজিশন এণ্ড প্রেষ্টিজ চাকরী সবার আগে। ইউনিয়নকে ট্যাকল করাই তো আমার সব চেয়ে বড়ো কাজ—

মিলি। কী বলছিল ও লোকটা—

ত্রিবিক্রম। বলছিল আপনারা ছানা মাখন খাবেন আর গরীব মজদুর আধখানা রুটিও খাবেনা? আপনারা প্যালেশিয়াল বিল্ডিংএ থাকবেন আর মজদুররা থাকবে অন্ধকার বস্তিতে শুয়োরের খুপরিতে—আপনাদের ছেলে মেয়েরা কোম্পানীর গাড়িতে চেপে সবচেয়ে সেণ্ট প্যাট্রিকে পড়তে যাবে আর মজদুরদের ছেলেমেয়েরা স্কুলের অভাবে অশিক্ষিত হয়ে থাকবে?—

মিলি। শোনো কথা একবার? এ সব কথা বলার জন্য গভর্ণমেণ্ট জেলে পাঠায় না কেন লোকটাকে?

ত্রিবিক্রম। ট্রেড্ ইউনিয়ন লীডারদের ঘাঁটাতে চায় না গভর্ণমেণ্ট। ভোটের ভয় আছে তো—

মিলি। শুনেছি জেনারেল লেবাররা আশী টাকার মতো পায় মাসে। কী এ এমন কম হ'ল। এ্যাকচুয়ালী ওদের তো কোনো খরচাই নেই—থাকার মধ্যে আছে একটি খাটিয়া আর রুটি সেঁকবার একটা তাওয়া। তাদি দেওয়া জামা প্যাণ্ট পরতেও কোনো বাধা নেই ওদের—এডুকেশন কষ্ট নেই, বড়ো এসটাব্লিশমেণ্ট্ মেইনটেন করবার খরচা নেই,—ওদের তো মহাসুখে থাকবার কথা—

ত্রিবিক্রম। তবে ব্যাপার কি জানো মিলি, বিটুইন আওয়ার সেলভস্—আমরা সবাই ওদের কাছে ঋণী—

মিলি। স্বপ্ন! ঐ ওদের কাছে? এ তুমি বলছ কি ত্রিবিক্রম?

ত্রিবিক্রম। হাঁ মিলি। সত্যি বলতে কি আমাদের প্রভুত্বের উৎস তো ওরাই—আমার আর আমার মতো আরও আড়াই শ' অফিসারেরও ঠাট, বাট, শাড়ি, গাড়ি, বাড়ি সব কিছুই তো আসছে ঐ রোদে গরমে মেহনত খেটে খাওয়া লোকগুলোর রক্ত জল করা পরিশ্রম থেকে—

মিলি। তোমার ঐ এক সিলি আইডিয়া। ওরা যে মজুর, খাটবার জন্যই তো জন্মেছে ওরা—চিরকাল খেটেই যাবে,—এর মধ্যে আবার বাহাদুরীটা কি আছে? যারা স্ট্রাইক করেছে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে অন্যলোক ভরতি করলেই হয়, দেশে কি আর খেটে খাবার লোকের অভাব—

ত্রিবিক্রম। দক্ষ শ্রমিকের অভাব আছে বৈ কি মিলি—

মিলি। অন্ততঃ পাওা গোছের লোকগুলোকেও তো দূর করে দিতে পারো—

ত্রিবিক্রম। চট্ করে এ সব করা যায় না মিলি, নানা আইনকানুনের ক্যাকড়া আছে, তবে সুযোগ পেলেই আমি কামড় বসাবো—

মিলি। সুযোগ কি এমনি আসে? সুযোগ করে নিতে হয়, দেরী করলে তো ম্যানেজমেণ্ট তোমাকেই দোষ দেবে,—কে?

সুলতানের প্রবেশ

সুলতান। সাব্—

ত্রিবিক্রম। ক্যা বাত হ্যায় সুলতান?

সুলতান। ইউনিয়ন কা চাপরাশি এক চিঠি দে কে আয়া হ্যায় সাব—

মিলি। চিঠ্‌টি? ক্যায়সা চিঠ্‌টি?

সুলতান। ক্যা মালুম মেম সাব, পিওন-বুক মে লায়া হ্যায়—

ত্রিবিক্রম। পিওন-বুক মে? আচ্ছা: সহি করকে লে লেও।

সুলতান। বহোত আচ্ছা সাব্—

সুলতানের প্রস্থান

মিলি। কী ব্যাপার ত্রিবিক্রম?

ত্রিবিক্রম। ঠিক বুঝতে পারছি না। আজকের মিটিংএ অবশ্য ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারীর সঙ্গে খুব হট্ ডিস্কাশন হয়েছে, হয়তো তারই কোনো প্রতিবাদ পাঠিয়েছে—

মিলি। আজ মোনালিসায় বার্থ-ডে পার্টি, আজকের দিনেও কি একটু শান্তি পাব না আমরা?

ত্রিবিক্রম। শান্তি? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,—শান্তি কোথায় পাবে মিলি? শান্তি কি আর এ জগতে আছে?

মিলি। তার মানে?

ত্রিবিক্রম। পালিয়ে গেছে। শান্তির পায়রা চির-দিনের জন্য পালিয়ে গেছে, মুছে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। আমরা, হাঁ, সভ্য জগতের এই আমরাই হত্যা করেছি তাকে—

মিলি। এ তুমি কী বলছ ত্রিবিক্রম?

ত্রিবিক্রম। কথাটা শুনতে ভালোলাগছে না, না? এই যে আমাদের বিলাস-কুঞ্জ, বাংলো, গাড়ি, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি, অপ্রতিহত ক্ষমতা, এত সব পেয়েও কি রাত্রে আমরা শান্তিতে ঘুমুতে পারি মিলি?

মিলি। ঘুম? ঘুম তো আসে না আমার,—ওষুধ খেতে হয় তার জন্য,—তবু বিছানায় শুয়ে ছটফট করা থামতে চায় না—

ত্রিবিক্রম। বিবেক তোমাকে ঘুমুতে দেয় না মিলি,—আমাকেও না। যতো টাকাই থাক, বিবেককে ঘুষ দিয়ে ঘুম পাড়াতে পারে না কেউ। মাঝে মাঝে অনেক রাতে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে কী দেখি জানো মিলি?

মিলি। কী?

ত্রিবিক্রম। দেখি সামনে ঐ কারখানার ভেতর রাবণের চিতার মতো গ্যাস-ফ্লেম হু হু করে জ্বলছে, তার রক্তাক্ত জিভ যেন আকাশকে চেটে চেটে খাচ্ছে, তবু তার খিদে মিটছে না। ব্লাষ্ট ফার্নেসের হুহুংকারের মধ্যে যেন তার অশান্ত, অতৃপ্ত আত্মা গুমরে গুমরে কাঁদছে—

মিলি। এত তার কিসের খিদে ত্রিবিক্রম?

ত্রিবিক্রম। তা জানি না মিলি, তবে বেসিমার কন্-ভার্টারের মশাল যখন সারা আকাশের গায়ে রক্তিম ছোপ মেখে দেয় আর গাঢ় হলুদ রংএর ধোঁয়া নিরুদ্দেশ

যাত্রা সুরু করে তখন কেন যেন মনে হয় যে কারখানাটার এই বিষগ্রাহী সুধা হয়তো একদিন আমাকেও গ্রাস করবে—

মিলি। তোমার যতো আজে বাজে চিন্তা,—ঐ দেখ সুলতান আসছে তোমার চিঠি নিয়ে—

সুলতানের প্রবেশ। হাতে একটি টাইপ করা কাগজ।

সুলতান। আপকা চিট্‌ঠি সাব্—

ত্রিবিক্রম। লাও—(সুলতানের হাত থেকে চিঠি নিলেন) অব্ তুম যা সকতে হো সুলতান—

সুলতান। বহোত আচ্ছা সাব্—

সুলতানের প্রস্থান

মিলি। কী কী আছে ও চিঠিতে ত্রিবিক্রম ?

ত্রিবিক্রম। (চিঠি থেকে মুখ তুলে) কোনো সুসংবাদ নয় মিলি—

মিলি। তার মানে ?

ত্রিবিক্রম। জেনারেল ষ্টাইকের নোটিশ দিয়েছে ইউনিয়নের তরফ থেকে—

মিলি। বলো কি ? জেনারেল স্টাইক নোটিশ ? মানে গোটা কারখানায় হরতাল ?

ত্রিবিক্রম। হাঁ। প্যাটার্ণ শপের স্টাইকারদের দাবীর প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য আর তাদের ধর পাকড় ভিমাণ্ড আদায় করবার জন্য চল্লিশ হাজার শ্রমিক পনেরো দিন পরে একযোগে স্টাইক করবে—

মিলি। বলো কি ত্রিবিক্রম ? এতখানি সাহস ওদের ?

ত্রিবিক্রম। হাঁ জনশক্তির দম্ভ অন্ধ করে দিয়েছে ওদের, ওরা ভেবেছে যে স্টাইকের হুমকি দিলেই ম্যানেজমেণ্ট কাবু হয়ে পড়বে। কিন্তু ওদের এ ভুল ভাঙ্গতে বেশী দেরী হবে না মিলি—

মিলি। কি করবে তোমরা ?

ত্রিবিক্রম (উত্তেজিতভাবে) লক-আউট। কারখানা বন্ধ করে দেব। তেল ফুরিয়ে গেলে বাতি যেমন নিভে যায় তেমনিভাবে নিভে যাবে ওদের আজকের যতো তেজ।

মিলি। তুমি অত একসাইটেড্ হয়ো না ত্রিবিক্রম—

ত্রিবিক্রম। ইঁদুরের মতো না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে ওরা, তারপর বণ্ডে সই করিয়ে শুধু পছন্দমতো লোকগুলোকে তরতি করব আমরা,—ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারীর বিষদাঁত আমরা ভেঙ্গে দেব—

মিলি। কিন্তু তোমার একার কথায় তো আর তা হবে না ত্রিবিক্রম, তার হুহুমন্তিরা এ কারখানার প্রেসিডেণ্ট ডাইরেক্টার,—তিনি রাজী হন তবে তো। আর তুমিই তো সেদিন বলছিলে যে তিনি আজকাল আর প্রসন্ন নন তোমার ওপর—

ত্রিবিক্রম। হাঁ, তাঁর বিরক্তির একটা কারণও আছে মিলি—

মিলি। কী কারণ ত্রিবিক্রম ?

ত্রিবিক্রম। আমার নতুন এ্যাসিষ্টেণ্ট চৌধুরীর স্ত্রী রিণী চৌধুরী অপূর্ব সুন্দরী,—শিক্ষিতা, সুরুচিকা—

মিলি। হুঁ: দেখছি তাকে মিষ্টার চক্রর বাড়ির পার্টিতে,—সুন্দরী না ছাই,—তবু দেখাকে পা পড়ে না মাটিতে,—কিন্তু তাতে তোমার কি ?

ত্রিবিক্রম। এই,—মানে,—তার হুহুমন্তিরা আজকাল প্রায়ই ওদের বাংলোতে যান, আর আমার নামে নানা আজেবাজে কথা শুনে কান ভারি করে ফিরে আসেন।

মিলি। কথাগুলো যদি সত্যি সত্যিই আজেবাজে হয় তা হ'লে তোমার ভাবনার কি আছে ত্রিবিক্রম—

ত্রিবিক্রম। আহা, কথাটা তলিয়ে দেখছ না কেন ? রিণী চৌধুরীর মতো স্নেহময়ী নারী যখন রক্তাধরে তার হুহুমন্তিরার কানে কানে কোনো কথা বলেন তখন তাকে বাজে কথা বলে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা কার থাকে বলো ?

মিলি। ও, আই সী—আচ্ছা:, এর ব্যবস্থা আমি করব—

ত্রিবিক্রম। (সাগ্রহে) করবে ? কী ব্যবস্থা করবে মিলি ?

মিলি। আঃ, সব কথাই শুনতে চাও কেন ত্রিবিক্রম ? এটা একান্তই আমার নিজস্ব ব্যাপার। এখন যাও তো, অফিসের পোষাক পাল্টে স্নান সেরে এসো, পার্টি আরম্ভ হতে আর দেরী নেই—

ত্রিবিক্রম। এই যে যাচ্ছি, কিন্তু আর একটা কথা—

মিলি। আবার কী কথা ?

ত্রিবিক্রম। এই,—মানে,—তার হুহুমন্তিরা আসছেন তো আজ ?

মিলি। তুমি অবাক করলে ত্রিবিক্রম। তাঁর জন্যই তো এত আয়োজন, এত অর্থব্যয়, আর তিনিই আসবেন না? স্টাইক নোটিশ পেয়েই তোমার মাথাটা বিগড়ে গেল নাকি?

ত্রিবিক্রম। না না, মানে,—বলছিলাম কি,—স্যার হনুমন্তিয়াকে আজ একটু বিশেষভাবে—মানে,—তোয়াজ কোরো, বুঝলে? আমার ওপর তিনি যে মনে মনে বিরক্ত হয়েছেন সে ভাবটা যেন তাঁর মন থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে যায়।

মিলি। আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্য তোমাকে মোটেই ভাবতে হবে না। দেখতো, কেমন সেজেছি আজ? মানিয়েছে?

ত্রিবিক্রম। মানিয়েছে মানে? ওয়াণ্ডার ফুল,—টপিং—

মিলি। (গম্ভীর স্বরে) থাও, তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলো,—সত্যি বলো তো, রিণী চৌধুরীকে হার মানাতে পারব তো?

ত্রিবিক্রম। রূপসী বলে রিণীর ভারি গর্ব আছে মনে, কিন্তু এখন এসে দাঁড়াক দেখি তোমার সামনে! বিশেষ করে নাইলনের এই পাৎলা শাড়িতে তোমার শরীরের তরঙ্গায়িত রেখাগুলো এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যে—

মিলি। দেখ, আবার ঠাট্টা সুরু করলে? ভালো হবে না বলছি। আমি এদিকে ভেবে ভেবে মরছি আর তুমি দিব্যি রঙ্গ তামাশায় মেতে উঠেছ—

ত্রিবিক্রম। সোনালি ডানার ফুরফুরে প্রজাপতি তুমি, তোমার আবার ভাবনাটা কি মিলি?

মিলি। প্রিয় কিশোরের মামার আর রইল কোথায় আমার? মিসেস মজুমদার এই বয়সেও কেমন ট্রিম আছেন, মিসেস কৃপালনী এখনো কেমন চার্মিং—এ সব কথা ভাবতে গেলে রাতে আমার ঘুম আসে না ত্রিবিক্রম—

ত্রিবিক্রম। সিলি গার্ল, আজে-বাজে চিন্তায় মনের শান্তি নষ্ট! কর এখনো নিষ্কাশনপুরে তোমার পায়ের কাছে দাঁড়াবার যুগ্যি কেউ নেই, আর তাইতো স্যার হনুমন্তিয়ার একটু বিশেষ পক্ষপাত আছে তোমার ওপরে,—

মিলি। হোয়াট ডু ইউ মীন ত্রিবিক্রম?

ত্রিবিক্রম। আহা রাগ করছ কেন মিলি? কথাটা তো আর মিথ্যে নয়—

মিলি। (রেগে) সত্যি হলেই কি সব কথা ঢাক পিটিয়ে বলতে হয়? তুমিই যদি এমন কথা বলতে আরম্ভ কর তবে সোসাইটির আর পাঁচজনই বা বলবে না কেন?

ত্রিবিক্রম। আমি,—আমি ঠাট্টা করছিলাম মিলি,—

মিলি। ঠাট্টা মোটেই নয়, আজকাল তুমি এমনি বাঁকা কথায় তীর মারতে বেশ ওস্তাদ হয়েছ, কিন্তু আমি যদি স্যার হনুমন্তিয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ না হতাম তবে কোথায় থাকতো তোমার এই ঠাটবাট প্রভাব প্রতিপত্তি, আর এই দেমাক—

ত্রিবিক্রম। আই অ্যাম সো সরি মিলি, তুমি কথাটা ও সাইটে নেবে তা ভাবিনি—প্রিন্স এক্সকিউজ মি—বাই দি ওয়ে, মোনালিসাকে দেখছি না যে? আজ তারই জন্মদিন আর তাকেই দেখছি না?

মিলি। ওর সাজগোজই শেষ হয়নি এখনো—

ত্রিবিক্রম। —টু টেল দি ট্রুথ, রূপে কিন্তু তোমাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে মোনালিসা—

মিলি। মোনালিসার রূপের ব্যাখ্যা আর তোমার কাছে শুনতে হবে না ত্রিবিক্রম—

ত্রিবিক্রম। আচ্ছা, মোনালিসার নাম নিতেই তুমি অমন উগ্র মূর্তি হয়ে ওঠো কেন বলোতো মিলি?

মিলি। শী-ইজ এ্যাব্‌সল্যুটলি মাইন,—তার সম্বন্ধে কোনো কথা বলা চলবে না তোমার,—আমাদের চুক্তির কথা কি ভুলে গেছ তুমি?

ত্রিবিক্রম। ভুলিনি, কিছুই ভুলিনি মিলি, তবে আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয় যে টাকাটাই এ দুনিয়ায় সব নয়, —শুধু টাকাতেই শান্তি আসে না মনে, সার্থক হয় না জীবন—

মিলি। ভুল, ভুল, ভুল বলছ তুমি ত্রিবিক্রম, এই পৃথিবীতে সার্থক ভাবে বেঁচে থাকতে হলে চাই প্রচুর টাকা, পর্যাপ্ত টাকা, টাকাই সব কিনতে পারে এই পৃথিবীতে, আমাদের আজ টাকা আছে বলেই তার মূল্য তুমি বুঝতে চাইছো না—

[মোনালিসার প্রবেশ। পরণে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের পোষাক; প্রচুর রূপ সজ্জায় হঠাৎ ইংরেজের

মেয়ে বলে ভ্রম হয়। মাথার চুল বব্ করা। চঞ্চলা, উদ্ধত যৌবনা। বয়েস উনিশ।]

মোনালিসা। ড্যাডি—

ত্রিবিক্রম। আহ্, হিয়ার কাম্স্ মাই পেট গার্ল—

মোনালিসা। আমি আজ কেমন সেজেছি মা? ডু আই লুক চার্মিং?

মিলি। (মোনালিসার আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখে) হ্যাঁ, ভালোই দেখাচ্ছে তোকে—

মোনালিসা। মা,—ইউ আর এ ডিয়ার—তোমাকেও কিন্তু চমৎকার দেখাচ্ছে মা,—মনে হচ্ছে যেন তুমি আমার দিদি—

ত্রিবিক্রম। আর আমাকে লিসা?

মোনালিসা। তোমাকে? তুমি এখনো তৈরীই হওনি—যাও—শিগ্‌গির তৈরী হয়ে এসো, পার্টি শুরু হতে আর দেরী নেই—ডিস্টিংগুইশড্ গেষ্টরা সব আসবেন—

ত্রিবিক্রম। নিমন্ত্রিত-নির্বাচন যদিও হোম এ্যাফেয়ার্স, তবু একটু জেনে নিতে লোভ হচ্ছে মিলি—

মিলি। ও তোমায় বলি নি বুঝি? শোনো তাহলে,—আজ আসছেন মধুতটি কোলিয়ারীর ম্যানেজার মিষ্টার ইন্দ্রগুপ্ত আর মিসেস গুপ্ত, কোকমিয়া ইঞ্জিনীয়ারীং ওয়ার্কস্‌এর চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিষ্টার পি, কে, রায় আর মিসেস দীপ্তি রায়, ডক্টর এন, সি, খাস্তগীর আর মিসেস খাস্তগীর—

ত্রিবিক্রম। ডক্টর খাস্তগীর? চিনলাম নাতো তাঁকে—

মিলি। পার্টিতে যাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছ আজকাল, চিনবে কি করে? কল্যাণগড় মেশিনটুলস্ ফ্যাক্টরীর চীফ গাইনোকলোজিষ্ট তিনি—

ত্রিবিক্রম। বেশ, আর কে কে আসছেন?

মিলি। লেফটেনাণ্ট কর্ণেল প্রতাপ সিং আর মিসেস সিং, কোল রেইজিং কোম্পানীর ওয়ার্কস্ ম্যানেজার ভগতরাম প্রেমচন্দ্ আর মিসেস প্রেমচন্দ্, ধরমবীর শাস্ত্রী, মিষ্টার চার্লস গিলবার্ট, আমাদের কোম্পানীর চীফ ওয়ার্কস্ এ্যাকাউন্টেণ্ট আর, কে, চন্দ্র আর তার স্ত্রী সোনালি চন্দ্র, আর কোম্পানীর অন্যান্য অফিসারেরা—

ত্রিবিক্রম। আর অরুণচন্দ্র? সেই ছোকরাকে বলোনি?

মিলি। (তাচ্ছিল্যের সঙ্গে) আমার বলার অপেক্ষা রাখে নি লিসা, আগেভাগেই বলে এসেছে তাকে—

ত্রিবিক্রম। দিলি গার্ল, মায়ের পছন্দের সঙ্গে নিজের পছন্দ মেলাতে শেখে নি আজও—

মোনালিসা। বা রে, আমার বার্থ ডে পার্টি, আর আমার বন্ধু অরুণ আসবে না?

মিলি। না, আসবে না, অরুণের সঙ্গে মেলামেশা করতে তোমায় বারণ করে দিয়েছি না?

মোনালিসা। এবার কোলকাতা থেকে এসে তো একবারও অরুণের সঙ্গে দেখা করি নি মা—

ত্রিবিক্রম। তোমারা দু'জনে তা হলে এ ব্যাপারটা নিয়ে বোঝাপড়া করে নাও, আমি স্নানটা সেরে পোষাক পাল্টে আসি।

ত্রিবিক্রমের প্রস্থান

মোনালিসা। আচ্ছা মা, অরুণের ওপর তোমার এত রাগ কেন বলোতো?

মিলি। হবে না রাগ? অরুণের কী আছে শুনি? না আছে একটা বিলিতি ডিগ্রী, না আছে উঁচু মাইনের চাকরী।

মোনালিসা। বা, অরুণও এ কোম্পানীর একজন অফিসার মা—

মিলি। হুঁঃ, অফিসারী—মাত্র আটশো টাকা মাইনে সে আবার একটা অফিসার! খবরদার মোনালিসা, ওকে আর একটুও প্রশ্রয় দেবেনা। ছেলে হিসেবে ওর চেয়ে রামচন্দ্রন্ অনেক ভালো, এই বয়েসেই দেড় হাজার টাকা মাইনেতে নিম্পদন কোম্পানীতে কাজ করছে—

মোনালিসা। রামচন্দ্রন্? উঃ ম্যাগো,—হাতির-মতো হোঁৎকা আর আলকাতরার মতো কালো—

মিলি। টাকা থাকলে কালোও আলো হয়। এই তোর বাবাকেই ভাখ না, কী এমন চেহারা,—তাকে নিয়ে কি ঘর করছি না আমি?

মোনালিসা। তোমার কথা আলাদা মা, বাবাকে তুমি পছন্দ করে বিয়ে করেছ আর আমাকে বলছ তোমার পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করতে—

মিলি। হুঁ, তোর বাবাকে আমি পছন্দ করে বিয়ে করেছি ভেবেছিস? মোটেই তা নয়—

মোনালিসা। তবে ?

মিলি। ঘটনাচক্রে তোর বাবার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার,—সে ছিল এক দুঃস্বপ্নের রাত—

মোনালিসা। এ তুমি—বলছ কি মা ?

মিলি। সে সব কথা তোকে বলতে পারি না লিসা, তবে এটুকু জেনে রাখ যে আভিজাত্যের দুর্গ রক্ষা করতে গেলে অনেক সময়ে অসম সন্ধিতেও রাজী না হয়ে উপায় থাকে না—

মোনালিসা। অসম সন্ধি।

মিলি। হ্যাঁ, অসম সন্ধি। আমি কলকাতার সবচেয়ে বনেদী বংশের মেয়ে—আর রাজীবলোচন আমার বাবা আর ত্রিবিক্রম ছিল নিতান্তই এক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে—

মোনালিসা। তা হলে তোমাদের বিয়ে কি করে সম্ভব হ'ল মা ?

মিলি। সহজে হয় নি লিসা, সম্ভব করতে হয়েছে আর সে জন্যই তো কলকাতার এ্যারিস্টক্র্যাট সমাজের সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদ ঘটে গেছে—

মোনালিসা। ও বুঝেছি। তুমি বুঝি বিয়ের আগে বাবাকে ভী—ষ—ণ ভালোবাসতে মা ? তাই বুঝি দাদু দিদিমার মতামত গ্রাহ্য করো নি, সাহসিকা তুমি, আহা আমিও যদি তোমার মতো হতে পারতাম ?

মিলি। মোটেই তা নয় লিসা—বিয়ের আগে আমি ত্রিবিক্রমকে ধরতে গেলে ভালো ভাবে চিনতামই না—

মোনালিসা। এ তুমি কি বলছ মা ? এও কি সম্ভব ?

মিলি। এই পৃথিবীতে কী যে সম্ভব আর কী যে অসম্ভব তার হদিশ আজ পর্যন্তও তো কেউ পায় নি লিসা ! জীবনের আর পাঁচটা রহস্যের মতো এ ও এক দুর্ভেদ্য অবগুণ্ঠনে ঢাকা—

মোনালিসা। কিন্তু বাবাকে যদি ভালো করে চিনতেই না তবে বাবার সঙ্গে তোমার বিয়ে হল কী করে ?

মিলি। বিয়ের আগে তোর বাবা কী করত তা জানিস ?

মোনালিসা। না মা—

মিলি। সে ছিল আমার ছোট ভাই নিরঞ্জনের প্রাইভেট টিউটার—

মোনালিসা। বলো কি মা ?. অবাক করলে তুমি ?—

মিলি। হ্যাঁ অবাক হবারই কথা এটা লিসা। কলকাতার এ্যারিস্টোক্র্যাট সমাজের মুকুটমণি লরেটোয় পড়া সুন্দরী সোসাইটি গার্ল মিলি গুপ্তের সঙ্গে কিনা বিয়ে হল এম এ ডিগ্রী সহল এক অখ্যাত যুবক ত্রিবিক্রম সেনের সঙ্গে। কলকাতার অভিজাত-সমাজও সেদিন তোর চেয়ে বেশী বই কম অবাক হয় নি লিসা—

মোনালিসা। কিন্তু কেন ? কেন তুমি এ কাজ করতে গেলে মা ? ভালোবেসে বিয়ে করলে তবু একটা কথা ছিল কিন্তু তুমি বলছ যে বিয়ের আগে বাবার সঙ্গে তোমার বিশেষ পরিচয়ই ছিল না—

মিলি। এ নিয়ে আর আমাকে কোনো প্রশ্ন করিস নে লিসা,—আমি সব সময়েই সেই দুঃস্বপ্নের রাতকে ভুলে থাকতে চাই,—এমন করে বারে বারে সে সব স্মৃতির নিভন্ত প্রদীপকে উস্কে দিস না।

মোনালিসা। বিয়ের পরেই বুঝি তুমি আর বাবা নিকাশন পুরে এলে মা ?

মিলি। হ্যাঁ—এই কারখানায় ত্রিবিক্রম এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড্ ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিল, উঃ, কী করেই না কেটেছিল সে দিনগুলো !

মোনালিসা। তারপর ?

মিলি। কিন্তু ভাগ্যের ষড়যন্ত্রে আমি হেরে পড়িনি লিসা, ভাগ্যের সঙ্গে রীতিমতো সংগ্রাম করে গেছি, আর তার ফলেই তো ত্রিবিক্রম আজ ধরতে গেলে নিকাশন পুরের সর্বেসর্বা আর আমি এখানকার এ্যারিস্টক্র্যাট্ সমাজের অবিসংবাদী নেত্রী।

মোনালিসা। এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে বাবার খুব সুনাম, তাই না মা ?

মিলি। হ্যাঁ, কিন্তু তার জন্য ওর ব্যক্তিগত গুণপণা কোনো কাজেই আসে নি।

মোনালিসা। তবে ?

মিলি। ওর এই উন্নতির মূলে আছি আমি।

মোনালিসা। জানো মা, ক্লাবের লাউঞ্জে বসে মিসেস চ্যাটার্জি সে দিন বলছিলেন।

মিলি। মিসেস চ্যাটার্জি? চীফ সুপারিন্টেন্ডেন্টের আহ্লাদী স্ত্রী? কী বলছিল সে?

মোনালিসা। বলছিল,—থাক মা, সে সব নোংরা কথা শুনে তোমার কাজ নেই, আমিও হঠাৎ শুনে ফেলেছিলাম—

মিলি। আহা বলই না শুনি—

মোনালিসা। মিসেস সেনাইর কাছে বলছিল যে রূপসী স্ত্রী থাকাটাই মিষ্টার সেনের সবচেয়ে বড়ো কোয়ালিফিকেশন।

মিলি। তা আর বলবে না? স্যার হনুমন্তিরার সঙ্গে আমার একটু মাখামাখি আছে বলে হিংসেতে জ্বলে পুড়ে মরে সব। চাকরীতে উন্নতি করতে হলে এ সব করতেই হয়। কেন? মিসেস চ্যাটার্জিই বা কম যায় কিসে? দেশমুখকে ডিভোর্স করে শান্তনু চ্যাটার্জি কি করে চীফ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হল তা তো সবারই জানা—

সুলতানের প্রবেশ

সুলতান। মেম সাব্—

মিলি। ক্যা মাংতা সুলতান?

সুলতান। এক বাবু আয়ে হেঁ, বাহর খড়ে হেঁ—

মিলি। বাবু? ক্যায়সা বাবু? কারখানাকা কোই?

সুলতান। ক্যা মালুম মেম সাব্—বোলতা হ্যায় কি সেন সাব্ খুদ বুলায়ে হেঁ উনকো—

মিলি। নাম ক্যা বতায়া?

সুলতান। নাম বোলা মলয় চ্যাটার্জি, সাব্ সে মুলাকাৎ মাংতা—

মিলি। কে রে লোকটা লিসা? তুই জানিস কিছু?

মোনালিসা। মনে হয় সুব্রতর নতুন বাংলার মাষ্টার—

মিলি। সুব্রতর নতুন মাষ্টার?

মোনালিসা। হ্যাঁ, বাবাই ঠিক করেছেন। কারখানার কোন এক সুপারভাইজারের ভাগনে, এবার এম-এ, পরীক্ষায় বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে—

মিলি। তোর বাবার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, বাবু ক্লাস থেকে মাষ্টার ঠিক করতে গেছে, তাও আবার বাংলার,—হুঃ—

মোনালিসা। বাঃ, কনভেন্টে পড়ে বলে সুব্রত বাংলায় কাঁচা না? আজকাল বাংলা পরীক্ষায় খুব কড়াকড়ি—

মিলি। তা হলেও আগে একবার কনসাল্ট্ করা উচিত ছিল আমার সঙ্গে—

মোনালিসা। জিজ্ঞেস করবে কি করে? তুমি যে সেদিন মিষ্টার বিলিমোরিয়ার সঙ্গে পরেশনাথে পিকনিক করতে গেলে,—ফিরলে দু'দিন পরে,—

মিলি। সে যাই হোক, সুপারভাইজারের ভাগনেকে আমার বাড়িতে টিউটর রাখতে পারব না, এতে প্রেস্টিজ থাকে না—

সুলতান। মেমসাব্—

মিলি। তুমরা রোজ আনে বোলো বাবুকো,—আজ হম পার্টি লেকে বহোত বিজি হ্যায়—

সুলতান। বহোৎ আচ্ছা মেমসাব্—

মোনালিসা। জেবা ঠহর যাও সুলতান,—মা, বাবা ওকে আসতে বলেছিলেন বলেই ও এসেছে, তাই ডেকে দুটো কথা বলতে দোষ কি, তা না হলে হয়তো ভাববে যে সেন সাহেবের কথার কোনো দাম নেই—

মিলি। কথাটা মন্দ বলিস নি লিসা,—এটাও একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। সুলতান—

সুলতান। জি মেম সাব্!

মিলি। বাবুকো অন্দর লে আও—

সুলতান। বহোত আচ্ছা মেম সাব, মৈ আভি বুলা লাতা হুঁ—

সুলতানের প্রস্থান

মিলি। লোকটার সঙ্গে দেখা করে তাকে বলে দিস যে সুব্রতর জন্য অন্য টিউটর ঠিক হয়ে গেছে,—আমি যাই,—ইয়াসিন ককটেলের কতদূর কী করল একবার দেখে আসি—

মিলির প্রস্থান

মোনালিসা। আঠারো থেকে আজ উনিশে পড়লাম আমি, আজ সারাদিন ধরে যার কথা সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ছে সে আছে সুদূর কলকাতায়, কিন্তু কলকাতার যে মোনালিসাকে সে চিনত সে কি নিরাশনপুরের এই মোসাইটি গার্ল মোনালিসাকে চিনে নিতে পারবে? জানি না। তবু কেন যেন মন আজ অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে: (গুণ গুণ করে গান)

"ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে মাধবী জাগল বনে
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারা দিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।

[সতর্পণে মলয়ের প্রবেশ। বয়স ২২।২৩, ফর্সা রং, টিকোলো নাক, সুন্দর সুগঠিত চেহারা। একমাথা কোঁকড়া চুল। মোনালিসা গান গাইতে গাইতে ঘরের কোণে একোয়ারিয়ামে রঙিন মাছের খেলা দেখছিল।]

মলয়। হুঁহে,—দেখুন,—মিষ্টার সেন কি ওয়ার্কস থেকে ফেরেন নি এখনো?

মোনালিসা। (গলার স্বর শুনে চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে) কে? একি! তুমি? মলয়! কী আশ্চর্য, আমি যে একটু আগে তোমার কথাই ভাবছিলাম—

মলয়। আরে! তুমি! তুমি এখানে কী করছ লিসা?

মোনালিসা। (মিষ্টি হেসে) বাঃ, এটা যে আমাদের বাংলো—

মলয়। তাই নাকি, তুমি সেন সাহেবের মেয়ে?

মোনালিসা। কেন? সন্দেহ আছে নাকি তোমার?

মলয়। না না, তা নয়, মানে,—হঠাৎ এখানে এমন-ভাবে আমাদের দেখা হয়ে যাবে এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—

মোনালিসা। দেখলে তো? বাস্তব অনেক সময়ে কল্পনাকেও হার মানায়—

মলয়। তিন মাস পরে আবার তোমাকে দেখে যে কী ভালোই না লাগছে লিসা,—কিন্তু ব্রাউজ স্কার্টস পরে এমন মেমসাহেব সেজেছো কেন বলো তো? মনে পড়ে সেই চিড়িয়াখানায় পিকনিকের কথা? আহা সবুজ শাড়িতে সেদিন কী চমৎকারই না মানিয়েছিল তোমায়—

মোনালিসা। চুপ্,—দেওয়ালেরও কান আছে মলয়—

মলয়। তার মানে?

মোনালিসা। মা ভয়ানক সাহেবিয়ানার ভক্ত কিনা তাই এখানে আমায় শাড়ি পরা বারণ। কলকাতার ওসব কথা শুনলে মা আর আমাকে আস্ত রাখবে না,—এমন কি —তোমার মতো ছেলের সঙ্গে যে আমার পরিচয় আছে তা জানতে পারলেও বিপদের সম্ভাবনা—

মলয়। কেন লিসা? আমি কি অস্পৃশ্য না অছুত?

মোনালিসা। কী আশ্চর্য! আমি কি তাই বলেছি? কিন্তু মা যে ঐ রকমই,—আমি তার কী করব? মা চান না যে আমি আমাদের এ্যারিষ্টক্রাট্ সমাজের বাইরের কোনো ছেলের সঙ্গে মিশি, বিশেষ করে তুমি একজন নগণ্য সুপারভাইজারের ভাগনে এ কথা শোনা মাত্রই তাঁর মন বিষিয়ে উঠেছে—

মলয়। একটিবার চোখে না দেখেই?

মোনালিসা। হাঁা। তাই বলছি কলকাতায় গীতাদির বাড়িতে তোমার সঙ্গে যে আমার আলাপ হয়েছে, তারপর দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতা গাঢ়তর হয়েছে এ সব কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে মা ক্ষেপে আগুন হয়ে যাবেন—

মলয়। আগুন হয়ে যাবেন? এ তুমি বলছ কি লিসা?

মোনালিসা। হাঁা, আর সেই জন্যই তো বলছি যে আমরা যে পরস্পরকে চিনি তা যেন মা কোনোমতেই টের না পায়—

মলয়। কেন লিসা? আমি গরীব ঘরের ছেলে, এই কি আমার অপরাধ?

মোনালিসা। আমায় তুমি ভুল বুঝোনা মলয়, আমার চারপাশে বিধিনিষেধের গণ্ডী টেনে দিয়েছে আমার মা, তার বাইরে যাবার শক্তি আমার নেই—

মলয়। কিন্তু কলকাতায় তো তোমায় ভিন্ন চেহারা দেখেছিলাম লিসা।

মোনালিসা। কলকাতা আর নিষ্কাশনপুরে আকাশ-পাতাল তফাৎ মলয়। কলকাতায় গীতাদির ওখানে যখন ছিলাম তখন এই লৌহনগরীর মিথ্যা আভিজাত্যের দুঃসহ চাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। প্রথম যেদিন তুমি চন্দন-দার সঙ্গে গীতার বাড়িতে এলে তখন তোমার সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছিলাম যে নিষ্কাশনপুরের অফিসারি আভিজাত্যের পরিধির বাইরেও একটা আলাদা জগৎ আছে, আর সে জগৎ সুন্দর—

মলয়। বলে যাও, থামলে কেন লিসা—

মোনালিসা। তোমার সঙ্গ, তোমার প্রাণ-চাঞ্চল্য,

তোমার সাহিত্য-প্রীতি আমাকে যেন নিদির ডাকের মতো আচ্ছন্ন করে ফেলল, আমি—আমি ভুলে গেলাম মা-র শাসনের কথা, ভুলে গেলাম নিজেকে, ভুলে গেলাম নিষ্কাশনপুরের কঠোর নিষ্পেষণের কথা।

মলয়। তোমার সঙ্গ আমাকে আনন্দ দিয়েছে লিসা, দিয়েছে আশা আর আশ্বাসের হাতছানি, তাইতো আমি ভুলতে পারিনি তোমায়। লিসা, তোমার মনে আছে গঙ্গার বুকে সেই ষ্টীমার ট্রিপের কথা?

মোনালিসা। মনে আছে মলয়, সবই মনে আছে। ওসব সুখ-স্মৃতি আমার মনের মণি-কোঠায় বহু ধরে তোলা আছে।

মলয়। তা হলে আমাদের দু'জনের জীবন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যাত্রা করার বাধা কোথায় লিসা?

মোনালিসা। না মলয়, সে হয়না। এখানকার জগৎ আলাদা, এখানে পাঁচশ টাকা মাইনে পাওয়া লোক চারশ টাকা মাইনে পাওয়া লোকের সঙ্গে মেশে না! বড় অফিসার ছোট অফিসারের বাড়ি যায় না। ম্যানেজারের স্ত্রী অ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজারের স্ত্রীকে কৃপার চোখে দেখে,—এখানকার পরিমণ্ডল কারখানার চিমনিগুলোর কালো নিশ্বাসে কালি হয়ে গেছে, বিষিয়ে গেছে মানুষের সুস্থ সবল মন—

মলয়। এ বিষবাষ্প থেকে তোমাকে আমি উদ্ধার করে নিয়ে যাবো লিসা।

মোনালিসা। পারবে না মলয়, পারবে না—এখানকার উঁচু সমাজে তুমি অবাঞ্ছিত, অপাংক্তেয়, তোমার সঙ্গে মেলামেশা করা দূরে থাক, কথা বলাই নিষিদ্ধ।

মলয়। পৃথিবীজোড়া সামন্ততন্ত্রবাদ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে সমাজতন্ত্রবাদ গড়ে ওঠার দিনে আমাকে এ কোন আশ্চর্য কাহিনী শোনাচ্ছ লিসা?

মোনালিসা। লৌহনগরীর রুদ্ধ দুয়ারে বৃথাই করাঘাত করে ফিরে যাবে তোমার সমাজতন্ত্রবাদ। এই শহর জুড়ে আছে শুধু স্বার্থের সংঘাত, টাকার লালসা, প্রোমোশনের জন্য ভাবতে পারা যায় না এমন সব কাজ করা।

মলয়। অদ্ভুত লাগছে শুনতে—

মোনালিসা। এখানকার লোকের কাছে এটাই পরম স্বাভাবিক ব্যবস্থা। মলয় আর তাই তো বলছিলাম যে আমাদের দু'জনের জীবনের পথ বিপরীতমুখী, এক জায়গায় এসে মিলবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

মলয়। কতো স্বচ্ছন্দেই না এ কথাটা তুমি উচ্চারণ করলে লিসা? অথচ এই তুমিই সেদিন আমার কানের কাছে, আমার প্রাণের কাছে কতো মধুর কথাই না বলেছিলে, সে সবের কি কোনো দামই নেই?

মোনালিসা। আজ এ কথার আলোচনা থাক মলয়, তুমি নতুন কি লিখলে তাই বলো।

মলয়। আমার নতুন কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে 'ধূসর গোধূলি'—

মোনালিসা। এঁ্যা, সত্যি? এতক্ষণ এ কথাটা বলোনি। এ তোমার ভারি অন্যায় মলয়!

মলয়। বলবার আর সুযোগ দিলে কোথায় লিসা,—আর বলে লাভই বা কি? সাহিত্য বা সংস্কৃতির কোনো দাম দাও কি তোমরা?

মোনালিসা। এ কথা বোলোনা মলয়, তুমি কি জানোনা তোমার কবিতা পড়তে কতো ভালোবাসি আমি!

মলয়। জানি নে কি লিসা, আর জানি বলেই বহু প্রত্যাশায় ভরা ছিল আমার মন, তুমি নিজের হাতে আঘাত হেনে গুঁড়িয়ে দিলে তাকে।

মোনালিসা। বেছে বেছে আজকের দিনটাতেই এ কথাগুলো না বললেই ভালো করতে মলয়।

মলয়। কেন? আর পাঁচটা দিনের সঙ্গে আজকের দিনের তফাৎটা কি?

মোনালিসা। আজ সকালে পুব আকাশের রাঙা সূর্য হাসতে হাসতে আমার কপালে রোদের টিপ পরিয়ে দিয়ে বলেছিল 'মোনালিসা আজ তুমি উনিশে পড়লে—' শুনে একজনের হাসিমুখ আমার মনে উঁকি দিয়েছিল যার আর আমার মাঝখানে আছে দুস্তর ব্যবধান।

মলয়। এতবড়ো খবরটা এতক্ষণ ধরে চেপে রেখেছিলে লিসা? তাই বুঝি সারা বাড়িতে একটা উৎসবের গন্ধ?

মোনালিসা। হ্যাঁ, মা একটা ককটেল্ পার্টির আয়োজন করেছেন, নিষ্কাশনপুর আর তার আশে-পাশের গণ্যমান্য স্ত্রী-পুরুষেরা এসে পড়বে এক্ষুণি।

মলয়। অতএব আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির প্রস্থান করাই উচিত, তাই না লিসা ?

মোনালিসা। হ্যাঁ—

মলয়। কিন্তু কলকাতা হলে নিশ্চয়ই সবার আগে আমিই এ কথাটা জানতে পারতাম আর আজকের উৎসবে আমিই হতাম বাঞ্ছিত অতিথি।

মোনালিসা। এটা কিন্তু কলকাতা নয় মলয়, এটা হচ্ছে নিস্তাপনপুর,—কিন্তু আর নয়, ঐ মা আসছে, এবার তুমি যাও—(তোরে মাকে শুনিয়ে) অঙ্ক মাষ্টার ঠিক হয়ে গেছে,—এ বিষয়ে আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করবেন কাল সন্ধ্যা সাতটায়।

মলয়। আমাকে তোমার মার সামনে স্বীকার না করে তুমি ভুল করলে লিসা, আজ আমি যাচ্ছি, কিন্তু যে দিন তোমার ভুল ভাঙবে সেদিন ডাক দিতে তুমি ভুলো না,—আমি—আমি প্রতীক্ষা করে থাকব সেদিনটির জন্যে। জন্মদিনে তোমার কল্যাণ কামনা করি।

মলয়ের প্রস্থান।

মিলি সেনের প্রবেশ

মিলি। এতক্ষণ ধরে ও লোকটা কি করছিল রে লিসা ? একি ! তোর চোখে জল কেন ?

মোনালিসা। হঠাৎ একটা কুটো এসে চোখে পড়ল মা—

মিলি। কুটো ? এ ঘরে আবার কুটো এলো কোত্থেকে ?

মোনালিসা। বা, আমি কি করে বলব—

ছুটে শোবার ঘরে চলে গেল

(ত্রিবিক্রম সেনের প্রবেশ। পরনে ইভ্‌নিংস্যুট, স্নানান্তে স্নিগ্ধ মুখ চোখ।)

ত্রিবিক্রম। লিসা ছুটে পালালো কেন হঠাৎ ?

মিলি। কি জানি। কন্টিনেন্ট থেকে ফেরার পর থেকেই ওর ভাবসাব সব কেমন কেমন দেখছি,—সোসাইটির আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে হৈহৈ করে বেড়াবে, তা না করে ঘরের কোণে মুখ বুঁজে রাজ্যের যতো বাংলা বই পড়তে দেখি,—রাবিশ—

ত্রিবিক্রম। কলকাতায় গীতার বাড়িতে দেড় মাস থাকার ফল এটা—

মিলি। কিন্তু তুমি কি কাণ্ডটা করলে বলো তো ত্রিবিক্রম ?

ত্রিবিক্রম। কাণ্ড ?

মিলি। কোত্থেকে কোন এক সুপারভাইজারের ভাগনেকে সুব্রতর টিউটার ঠিক করেছ—হট করে বাবু ক্লাশের লোক আমার বাংলোর কম্পাউণ্ডে ঢোকে এ আমার মোটেই পছন্দ নয়—

ত্রিবিক্রম। ও, মলয় এসেছিল বুঝি ? ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন মিলি, ভালো সাহিত্যিক।

মিলি। সাহিত্যিক ! হুঁঃ—বাংলা আবার একটা ভাষা তার আবার সাহিত্য—

সুলতানের প্রবেশ

সুলতান। কাপড়িয়া সাব্‌ ঔর উনকা মেম সাব্‌ আয়ে হেঁ—

দ্বার প্রান্তে মিষ্টার আর মিসেস কাপাড়িয়া দেখা দিলেন।

মিলি। (দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে) ওয়েলকাম, ওয়েলকাম মিষ্টার কাপাড়িয়া। আজকের পার্টিতে আপনারাই প্রথম অতিথি—

মিসেস কাপাড়িয়া। লিসা কোথায় ? লিসা ? এই

মিলি। ড্রেসিংরুমে গেছে, আসবে এক্ষুণি,—সুলতান মেমসাব্‌ কা প্যাকেট লে কে কোনা কা টেবিল পর রাখ দো—আসুন, এই সোফাতে বসুন—

[সুলতান উপহারের প্যাকেট নিয়ে কোণের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ত্রিবিক্রম আর মিষ্টার কাপাড়িয়া হাণ্ডশেক করলেন ধীরে ধীরে স্ত্রীও নেমে এলো]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিলি সেনের হল-ঘর

সময় : রাত আটটা

(মিলি সেনের হল ঘরে সুসজ্জিত নরনারীর ভীড়। পুরুষেরা সবাই পাশ্চাত্য পোষাকে আর মহিলারা কেউ ভারতীয় ব্লাউজে শাড়িতে, কেউ স্কার্ট ব্লাউজে, কেউ বা স্ল্যাক্স পরে এসেছেন। তকমা-আঁটা বেয়ারারা ট্রেতে ক'রে কাচের গ্লাসে ভরতি পানীয় নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। নারী-পুরুষেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। মিলি সেন রাজহংসীর মতো ঘুরে

ঘুরে বেড়াচ্ছেন,—কাউকে একটা কথা, কাউকে একটু সৌজন্যের হাসি, কাউকে বা হাতের ছোঁয়া বিতরণ করছেন। ত্রিবিক্রম সেনও এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর কান আর চোখ আছে দরজার দিকে, তাঁর হনুমন্তিয়ার আসার প্রতীক্ষায়। মোনালিসা ঘরে নেই। ঘরের কোণের বড় টেবিলটা ফুলের তোড়া আর উপহারের স্তূপে ভরে উঠেছে।

ত্রিবিক্রম। (স্বগতঃ) নাঃ, আটটা বেজে গেল, তার হনুমন্তিয়া দেখছি এখনো এলেন না। আমার ওপর ইদানীং বিশেষ খুশী নন বলেই নানা ভাবনা উঠছে মনে—মিলি বেশ মনের আনন্দে পার্টি নিয়ে মেতে আছে। ও স্বীকার না করলেও আসলে ওর রূপে আজ ভাঁটা পড়েছে বলেই না আজ আমি এই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছি। ঈস ম্যানেজার চৌধুরীর স্ত্রী এখানে আসার পর থেকেই পাশার দান উল্টে গেছে। অস্বীকার করব না যে মিসেস চৌধুরী রূপসী, যৌবন জোয়ারে ভাসছেন। তার হনুমন্তিয়া নিশ্চয়ই মিস্টার চৌধুরীর বাংলোয় গেছেন আজও, তাই এখানে আসবার তাড়া নেই তাঁর—

ঘরের মাঝখান থেকে মিসেস কৃপালনী এগিয়ে এলেন, ত্রিবিক্রম সেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। হাতে ধরা গ্লাসে হুইস্কি পানীয়।

মিসেস কৃপালনী। গুড্‌ ইভ্‌নিং মিষ্টার সেন—

ত্রিবিক্রম? কে? ও, মিসেস কৃপালনী? গুড্‌ ইভ্‌নিং—গুড্‌ ইভ্‌নিং—

মিসেস কৃপালনী। এখানে একা একা দাঁড়িয়ে কী ভাবছেন মিষ্টার সেন?

ত্রিবিক্রম। অ্যাঁ? কী ভাবছি? না না, কিছু না কিছু না,—দূর থেকে আপনাকে দেখেছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম যে আমাদের ঘরে এই স্বর্গের অপ্সরা নেমে এলো কী করে?

মিসেস কৃপালনী। (খুশী হয়ে) যান, আপনি বড্ড দুষ্টু—

ত্রিবিক্রম। একটু আধটু দুষ্টুমী না করলে এমন লোভনীয় ধনকটি কপালে জুটতো কি করে?

মিসেস কৃপালনী। আবার! আচ্ছা আপনাকে আজকাল কোনো পার্টিতে বা ক্লাবে দেখি না কেন বলুন তো? ব্যাপারটা কী? আমাদের সঙ্গ আর ভালো লাগে না বুঝি?

ত্রিবিক্রম। না না, সে সব কিছুই নয় মিসেস কৃপালনী! আর আপনার মতো মহিলার সঙ্গ ভালো লাগেনা বললে—তো দাদাই মিলে ধরে বেঁধে ঢুঁচি পাঠাবে আমাকে—

মিসেস কৃপালনী। এটা আপনার মন-রাখা কথা, তা না হলে এক মাসের মধ্যেও আমাদের বাংলোতে যাবার সময় করতে পারতেন না আপনি?

ত্রিবিক্রম। বিশ্বাস করুন মিসেস কৃপালনী, কোম্পানীর কাজের ভীড়ে অন্য দিকে মন দেবার অবসরই পাই না আজকাল। ওয়ার্কস্‌ এ ভীষণ লেবার ট্রাবল্‌ চলছে কিনা—

মিসেস কৃপালনী। তা সত্যি। আর এ কথাও সত্যি যে আপনার মতো এমন একজন এফিসিয়েন্ট অফিসার আছে বলেই তো এ কোম্পানী এমন ফুলে ফেঁপে বড়ো হয়ে উঠেছে। আমার স্বামী চন্দ্রশেখর তো আপনার নাম করতে অজ্ঞান—বলে যে তার হনুমন্তিয়ার ডান হাত আপনি—

ত্রিবিক্রম। ধন্যবাদ মিসেস কৃপালনী,—আপনার শুভেচ্ছা আর সহানুভূতির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ—

মিসেস কৃপালনী। চন্দ্রশেখর আরও একটা কথা বলেছিল, শুনলে হয়তো আপনি রাগ করবেন—আমি কিন্তু তার কথার প্রবল প্রতিবাদ করেছিলাম—

ত্রিবিক্রম। কী কথা বলুন তো মিসেস কৃপালনী—

মিসেস কৃপালনী। ও বলছিল যে আপনি আজকাল আমাদের ভুলেই গেছেন। শুনে আমি ওকে সিলি বয় বলে বকেছি। ঠিক করিনি মিষ্টার সেন?

ত্রিবিক্রম। ডেফিনিটলি। আপনার মতো সুন্দরী, সুরসিকা, সুলজ্জিতা মহিলাকে কি আর ইচ্ছে থাকলেও ভুলে থাকা যায়!—এই যে এখানে একদল মহিলা রয়েছেন—তাঁদের ভেতর আপনার মতো এমন সুরুচি শোভন সজ্জা আর চোখ ধাঁধানো রূপ আর কার আছে বলুন তো?

মিসেস কৃপালনী। সৌন্দর্য-চর্চায় আমাকে রোজ বেশ কিছু সময় দিতে হয় সত্যি, কিন্তু—

ত্রিবিক্রম। কিন্তু কি মিসেস কৃপালনী?

মিসেস কৃপালিনী। কিন্তু আমাদের বাংলোটা এমন জায়গায় যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় যেন নির্বাসন-পুরে নয়—নির্বাসনে আছি। আচ্ছা আমাদের অমন দূর ভেপান্তরে ঠেলে দিয়েছেন কেন বলুন তো মিষ্টার সেন?

ত্রিবিক্রম। দূর ভেপান্তরে! এ কী বলছেন আপনি?

মিসেস কৃপালিনী। তা নয় তো কী। আশে পাশে শুধু সুপারভাইজার আর কেরাণীদের কোয়ার্টার্স, না পারি কারো সঙ্গে মিশতে, না পারি কারু বাড়ি যেতে। হাঁপিয়ে উঠতে হয় মাঝে মাঝে—

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ, ও বাংলোটা পুরোণো আমলের বলে অফিসার্স কলোনী থেকে বেশ একটু দূরে ঠিকই—

মিসেস কৃপালিনী। এই দেখুন,—আপনিও স্বীকার করলেন তো এ কথাটা? তা হলে আমাদের একটা ভালো বাংলোর ব্যবস্থা করে দিন মিষ্টার সেন,—প্লীজ—

ত্রিবিক্রম। ভালো বাংলো? কই তেমন তো কোনো—

মিসেস কৃপালিনী। আছে আছে,—জাস্টিস রোডে বাংলো নাম্বার থ্রি খালি পড়ে আছে—

ত্রিবিক্রম। কিন্তু ওটা তো সিনিয়র একজিকিউটিভ অফিসারের বাংলো মিসেস কৃপালিনী, ওটা আপনারা কি করে পাবেন!

মিসেস কৃপালিনী। আপনি ইচ্ছে করলে কী না হতে পারে মিষ্টার সেন? আপনার হাতেই তো সব—

ত্রিবিক্রম। তবু একটা নিয়ম মেনে চলতে হবে তো—

মিসেস কৃপালিনী। নিয়ম? হি হি হি,—হাসালেন আপনি মিষ্টার সেন,—নিয়ম তো শুধু যারা পারে না তাদের জন্য, আর আপনি যে সব নিয়মের উর্দ্ধে তা কি আর আমি জানি না ভেবেছেন?—আপনি একটু ইচ্ছে করলেই আমরা ওটা পেয়ে যাই, কি বিরাট বাংলো, কতো বড়ো বড়ো ঘর, কী চমৎকার বাগান—(ত্রিবিক্রমের হাত চেপে ধরে) আপনি হাঁ বলে দিচ্ছেন মিষ্টার সেন?

ত্রিবিক্রম। আচ্ছা, চেষ্টা করব—

মিসেস কৃপালিনী। আপনার চেষ্টা করা মানেই বাংলোটা আমাদের হাতে পাওয়া। আসুন না মিষ্টার সেন, আমরা একটু বাগানে যাই,—আপনার বাগানবাড়ির ঝোপে ঝোপে থোকা থোকা ফুল ফুটেছে দেখেছি,—কয়েকটা ফুলে আমার খোঁপায় পরিয়ে দেবেন চলুন—

ত্রিবিক্রম। বেতে তো খুবই লোভ হচ্ছে,—কিন্তু—

মিসেস কৃপালিনী। ও, আপনি মিসেস সেনের কথা ভাবছেন? ঐ দেখুন তিনি এখন ডক্টর খাস্তগীরকে খাতির করতে ব্যস্ত,—এ দিকে নজর দেবার ফুরসৎ কোথায় তাঁর? আসুন না,—নিরিবিলিতে কয়েকটা কথা বলবার আছে আপনার কাছে,—কই, আ—সু—ন—

ত্রিবিক্রম। চলুন তবে—

দুজনে হাত ধরাধরি করে বাইরে চলে গেল।

ঘরের অন্য কোণে:

পানীয় ভরতি গ্লাস হাতে সোনালি চন্দ্র আর গিলবার্ট।

সোনালি। হি হি হি হি,—আপনি বেশ মজার কথা বলতে পারেন মিষ্টার গিলবার্ট,—অবশ্য বানিয়ে বানিয়েই যে বলছেন তা বেশ বুঝতে পারছি, তবু সত্যি বলে ভাবতে ভী—ষ—ণ ইচ্ছে করছে—

গিলবার্ট। বেশ তো, সত্যি কি মিথ্যে তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য একদিন সন্ধ্যায় আমার বাংলোয় আসুন না মিসেস চন্দ্র। বড্ড একা একা থাকি, আপনার সঙ্গ পেলে সময়টা কাটবে আনন্দে,—তা ছাড়া আমার বাংলোর ডান্স হলটি এ-সব নাচের জন্য বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে—

সোনালি। ওরে বাব্বাঃ,—আবার আমাকে আপনার বাংলোয় যেতে বলছেন? মনে নেই সেবার?—চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিলাম ভোপ টাঁচে—

গিলবার্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ,—মনে আছে বৈ কি,—এই তো গত নভেম্বরে—

সোনালি। আমি আর আপনি সেই ছোট্ট টিলাটার আড়ালে বসে গল্প করছিলাম,—হঠাৎ কোত্থেকে ঝড়ের বেগে মিসেস গিলবার্ট এসে হাজির—

গিলবার্ট। এলিস চিরকালই একটু টেম্পারামেন্টাল—

সোনালি। উঃ, কী বিশ্রী সীনটাই না ক্রিয়েট করলেন,—না মিষ্টার গিলবার্ট,—আপনার ঐ খাণ্ডারনী স্ত্রী থাকতে আর আমি আপনার বাংলোয় যাচ্ছি না—

গিলবার্ট। আহা, আপনি মিছে ভয় পাচ্ছেন মিসেস চন্দ্র, এলিস এখন এখানে নেই—

সোনালি। নেই? কোথায় গেছে? ভোপে?—

গিলবার্ট। জাহান্নামে,—জনসন বলে আমাদের এক চ্যাংড়া ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ছিল না? তারই সঙ্গে ইলোপ করেছে এলিস,—আমার বাংলো এখন একদম ফাঁকা—

সোনালি। ও, তাই নাকি? এ ঘটনাটা শুনি নি তো আগে,—আই অ্যাম অ সরি মিষ্টার গিলবার্ট—

গিলবার্ট। নট্‌ এ্যাট অল্‌, নট্‌ এ্যাট্‌ অল্‌,—আপনি শুনবেন কি করে, দু' মাস তো আপনি ছিলেনই না এখানে,—হিল ষ্টেশনে রূপো খরচ করে রূপসকর করে ফিরে এসেছেন, এ্যাণ্ড ইউ লুক মোর চার্মিং দ্যান এভার।

সোনালি। যে দু'দু' মাস সিমলায় বেশ আরামেই কেটে গেছে আমার,—কী ভ্যাপ্সা গরম এই নিষ্কাশনপুরে! এয়ারকণ্ডিশনড্‌ ঘরে থেকেও যেন হাঁপিয়ে উঠি, আশ-পাশের আকাশখানি বরং অনেকটা ফাঁকা, খোলা-মেলা, —অনেক বেশি বাসযোগ্য, এই নিষ্কাপনপুরে পড়ে থাকতে একটুও ভালো লাগে না আমার।

গিলবার্ট। (সাগ্রহে) আকাশখানিতে পার্মানেণ্টলি থাকতে চান আপনি মিসেস চন্দ্র?

সোনালি। সে ব্যবস্থা হলে তো বেঁচে যাই আমি,—মিলি সেনের দম্ভ আর সহ্য হয় না মিষ্টার গিলবার্ট, আমার স্বামীও তো চীফ্‌ ওয়ার্কস এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট,—আমিই বা ওর চেয়ে কম কিসে বলুন তো?

গিলবার্ট। কম মোটেই নয়, ইউ আর এ গার্ল ইন এ মিলিয়ন,—ঠিক আছে, আমাদের কনট্রোলার অব্‌ এ্যাকাউণ্টস্‌ মিষ্টার রামস্বামী আয়েঙ্গার শিগগিরই রিটায়ার করছেন,—পোষ্টটা ভালো, তিন হাজার টাকা স্টার্টিং,—মিষ্টার চন্দ্র যদি এ বিষয়ে ইণ্টারেস্টেড্‌ হন তাহলে চেষ্টা করতে পারি আমি।

সোনালি। এর মধ্যে কোনো 'যদির' প্রশ্ন নেই মিষ্টার গিলবার্ট,—আমরা একুণি রাজি। আর আপনিই তো আকাশখানি রিক্রিয়েশন্‌ ওয়ার্কস্‌ এর সিনিয়র পার্টনার, আপনার হাতেই তো সব।

গিলবার্ট। স্যাটস্‌ সেটলড্‌ দেন। বাই দি বাই, এই শনিবারে আসছেন তো আমার বাংলোয়?

সোনালি। অফ্‌ কোর্স। মিষ্টার চন্দ্রও কলকাতা যাচ্ছে শনিবার, কাজেই কোনো অসুবিধেই হবে না।

গিলবার্ট। চমৎকার যোগাযোগ। আমি তাহলে সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ কর পাঠিয়ে দেব, কেমন?

সোনালি। (গলা নামিয়ে) তাই দেবেন। তবে একটু অন্ধকার হলে, কেমন? জানেন তো নিষ্কাপন-পুরের লোকগুলোকে? স্যাণ্ডালের গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়ায় শুধু।

গিলবার্ট। ও কে।

ঘরের অন্য কোণে

শেফালী। ও দিকে কোথায় যাচ্ছেন মিসেস চ্যাটার্জি? এদিকে আসুন না, একটু গল্প করি।

ছন্দা চ্যাটার্জি। শেফালী যে! বিয়ের পর এই তোমাকে প্রথম দেখলুম, তোমার বর কোথায়?

শেফালী। আন্দামানে।

ছন্দা। আন্দামানে? সে কি!

শেফালী। হ্যাঁ, ওখানকার রোড কনস্ট্রাকশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ট্রান্সফার হয়েছে।

ছন্দা। তুমি গেলে না সঙ্গে?

শেফালী। ম্যাগো, ওখানে আবার মানুষ থাকে? নেই মানুষ, নেই জন, চার দিকে শুধু জঙ্গল, কী বিশ্রী।

ছন্দা। কিন্তু তোমার বর একা একা থাকবে?

শেফালী। (ঠোঁট উল্টে) থাকবে তো থাকবে,—আমি তার কী করব? তা বলে এখানকার সোসাইটি, পার্টি, ক্লাব, বার, ফাংশন সব ছেড়ে ওর সঙ্গে নির্বাসনে তো আর থাকতে পারি না!

রত্না। ছন্দা দি, ও দিকে তাকিয়ে দেখুন একবার।

ছন্দা। কোন দিকে রে?—

রত্না। ঐ যে, ঐ দরজার দিকে, দেখছেন না শ্রী স্বরূপ দেশমুখ আর মিসেস কাপাডিয়া কেমন হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে যাচ্ছে বাগানের দিকে—খুব টেনেছে আজ মিসেস কাপাডিয়া, দেখছেন না, পা দুটো কেমন টলছে।

ছন্দা। ও আর এমন কি দৃশ্য? দৃশ্য যদি দেখতে চাস তো ও দিকে তাকা,—বুড়ি হতে চললো, তবু এখনো খুকী সাজার শখ গেল না।

রত্না। কার কথা বলছেন ছন্দাদি?

ছন্দা। ঐ যে মিলি সেন, রঙ দেখে হেসে আর বাঁচি নে।

শেফালী। সত্যি, মিসেস সেন যেন অনেকটা বুড়িয়ে গেছেন আজকাল, অথচ এক কালে তিনিই ছিলেন নিকাশনপুরের আরিষ্টক্র্যাট্ সোসাইটির মক্ষিরাণী তাই না মিসেস চ্যাটার্জি?

ছন্দা। মেয়ে মেয়ে যেন কিছু কম হয় নি তো—চুপ্ চুপ, কমলা আসছে,—ও আবার মিলি সেনের চর তা জানো তো?

ঘরের অন্য দিক থেকে কমলা এসে যোগ দিল, পরিণত যৌবনা।

কমলা। আপনারা তিনজনে বেশ একটা মুখরোচক আলোচনা করছিলেন বলে মনে হচ্ছে মিসেস চ্যাটার্জি,—আমি একটু ভাগ পেতে পারি কি?

ছন্দা। স্বচ্ছন্দে, আমরা এই আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

কমলা। আবহাওয়া?

ছন্দা। হ্যাঁ, পার্টির আবহাওয়া, কেমন জোলো জোলো ঠেকছে না?

কমলা। তা আর ঠেকবে না কেন বলুন? পার্টির প্রধান নায়কই যে এসে পৌঁছোন নি এখনো।

ছন্দা। ও, তাই বুঝি মিসেস সেন অমন আনমনা আর মনমরা হয়ে আছেন?

শেফালী। প্রধান নায়ক! কে সে? সোনালিসার ভাবী স্বামী?

কমলা। আঃ স্যাকামী করছ কেন শেফালী? আমি যে স্যার হনুমন্তিয়ার কথা বলছি তা তো নিকাশনপুরের একটা বাচ্চা ছেলেও বোঝে।

রত্না। আর একজনকেও দেখছি না আজকের পার্টিতে।

কমলা। কার কথা বলছ রত্না?

রত্না। মিসেস মালিয়ারের কথা—নিকাশনপুরের কোনো পার্টিতেই তো দেখছি না তাঁকে কিছুদিন ধরে।

কমলা। তোমার এখনো বিয়ে হয় নি, তাই তোমাকে এ কথা বলা হবে না রত্না।

রত্না। তার মানে? আমি এন্‌গেজড্ তা জানেন?

শেফালী। ও বাবা: কোঁস করে উঠলে যে একেবারে।

রত্না। কথা কি, শিগগির বলুন, নইলে ছোবল দিতেও দেরী করবনা, হ্যাঁ—

কমলা। (গলা নামিয়ে) মিসেস মালিয়ার যে তাঁর ড্রাইভারের সঙ্গে লম্বা দিয়েছেন।

রত্না। ছি ছি, কী জঘন্য রুচি!

কমলা। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হলে এ রকমই হয় রত্না,—ও কি, মিসেস সেন হঠাৎ দরজার দিকে ছুটলেন কেন?

ছন্দা। শুধু মিসেস সেন কেন, ঘর শুদ্ধ সবাই তো ছুটছে ও দিকে।

শেফালী। বাঃ, তা ছুটবে না? স্যার হনুমন্তিয়া এলেন যে।

ছন্দা। চলো চলো আমরাও যাই, নইলে মনে করতে পারেন যে আমরা তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাই নি।

কমলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন, চলুন,—হাজার হোক প্রেসিডেন্ট ডিরেক্টর তো,—তাঁর হাতেই যে আপনার, আমার, ভবিষ্যৎ—

শেফালী ও রত্না। চলুন চলুন।

(সবাই এগিয়ে গেল দরজার দিকে, সেখানে আগে ভাগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন মিলি সেন)

মিলি। (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) আসুন,আসুন স্যার হনুমন্তিয়া, আপনি না আসায় পার্টিটা জমছিলই না মোটে. বড্ড দেরী করে ফেলেছেন কিন্তু।

ছন্দা। ওঁর কি আর একটা কাজ! সময় করে উঠতে পারলে তো আসবেন।

কমলা। কর্মব্যস্ত মানুষ।

স্যার হনুমন্তিয়া। না না। সে সোব কিছু নয়, হঠাৎ ইউনিয়নের কষ্ট্রাইক নোটিশটা পেয়ে কলকাতায় ডিরেক্টরস বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ট্রাঙ্ক কল কোরেছিলাম, তাই একটু দেরী হোয়ে গেলো। আমি খুবই লজ্জিত মিসেস সেন,—প্লীজ এক্সকিউজ মি।

মিলি। ছি ছি, এ কথা বলে আমাকে অপরাধী করবেন না, আসুন, বসুন এই নরম সোফাটায়।

স্যার হনুমন্তিয়া। হ্যাঃ, সেই ভালো, পা দুটো ভারী শরীর আর বইতে চাইছে না আজকাল, আঃ—(রুপার ট্রে হাতে বেয়ারা এসে পাশে দাঁড়ালো মিলি সেন নিজের হাতে এক গ্লাস পানীয় তুলে স্যার হনুমন্তিয়ার দিকে এগিয়ে দিলেন, তাঁর নখের রাঙা নখ-পালিশের প্রতিবিম্ব গ্লাসের রক্তিম তরলতায় মিলিয়ে গেল)

মিলি। প্লীজ হ্যাভ্‌ এ ড্রিংক স্যার হনুমন্তিয়া।

স্যার হনুমন্তিয়া। থ্যাঙ্কস্—আঃ,—নাইস কক্‌টেল মিসেস সেন। এই যে মিসেস চ্যাটার্জিও এসেছেন দেখছি, ও কি! আপনি অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন মিসেস নন্দী?

কমলা। (গদগদ সুরে) পরীক্ষা করে দেখছিলাম আমাকে চিনতে পারেন কি না—

স্যার হনুমন্তিয়া। আপনার নাম কমলা, আপনার পরীক্ষায় কি আর ফেল করতে পারি? হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ।

ছন্দা। সত্যি, লক্ষ্মীর বরপুত্র আপনি, কিন্তু আপনাকে একটু শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন স্যার?

স্যার হনুমন্তিয়া। ভীষণ নেভাস্‌ স্ট্রেইন যাচ্ছে কিছু দিন ধোরে।

ছন্দা। কেন? কেন স্যার হনুমন্তিয়া?

স্যার হনুমন্তিয়া। কোম্পানী এতো সুখ সুবিধা, এতো বেনিফিটস্‌, এতো ফেসিলিটি দিচ্ছে তবু লেবাররা খুশী নয় মিসেস চ্যাটার্জি। আগে আয়রণ এণ্ড স্টীল প্রোডাক্টে একচেটিয়া কারবার ছিলো আমাদের, এখন কী কম্পিটিশনের মার্কেট—প্রোডাকশান বাড়াবার নাম নেই তবু মজুরী বাড়াবার দাবি কোরছে—কী অন্যায় বোলুন তো।

ছন্দা। অন্যায় বইকি—ভীষণ অন্যায়। মিষ্টার চ্যাটার্জি বলছিলেন যে আগে যাদের জুতোর ঠোকর দিলেও কথাটি বলত না, আর তারাই সামান্য কারণে মারমুখি হয়ে উঠছে। ডিসিপ্লিন বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে দিনকে দিন।

মিলি। (মিষ্টি হেসে) আপনি কিছু ভাববেন না স্যার হনুমন্তিয়া—ত্রিবিক্রম সব ঠিক করে দেবে।

স্যার হনুমন্তিয়া। হ্যাঁ, মিষ্টার সেন এক্সিলিয়েন্ট অফিসার, তবে আজকাল একটু বেনো—তবে এক্সেপ্ট একা তাঁকে দোষ দেওয়া চোলে না,—লেবার আনরেস্ট সারা ভারতেই ছড়িয়ে পোড়েছে।

মিলি। না না,—ত্রিবিক্রমের এফিসিয়েন্সি ডিমনস্ট্রেট কোরে নি স্যার হনুমন্তিয়া, দেখছি তো রোজ,—আজকাল আবার এক গাদা ফাইল নিয়ে আসে বাংলোতে, দিনে রাতে একটুও বিশ্রাম পায় না বলেই হয়তো মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

স্যার হনুমন্তিয়া। একজ্যাক্টলি সো—তবেই দেখুন মিসেস সেন, কোম্পানীর মেরুদণ্ডই হোল অফিসারেরা, আর তাদের ওপরেই লেবারদের যতো রাগ,—বোলে কিনা মজুর আর অফিসারদের মধ্যে এমোন আকাশ পাতাল তফাৎ কেনো থাকবে। একটু ডিসেন্ট লিভিং এর জোন্য অফিসার বা এমোন কী বেশী পাচ্ছে বোলুন তো মিসেস সেন?

মিলি। মোটেই বেশী পাচ্ছে না, জিনিষ পত্রের দাম যে ভাবে হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে তাতে তো ভাবনাতেই পড়তে হয় মাঝে মাঝে। এই তো সেদিন,—কলকাতায় একটা ক্লিফ দেখতে গেলাম, শুনলাম পাঁচশো টাকা দাম বেড়ে গেছে।

কমলা। সত্যি, টেপ্‌ রেকর্ডার, রেডিওগ্রাম—প্রত্যেকটি জিনিষ যেন আগুন!

ছন্দা। জিন, হুইস্কি, বিয়ার, রাম—কোনটা নয়? একটা পার্টি দিতে গেলে তিনগুণ বেশী খরচ পড়ে যায়।

স্যার হনুমন্তিয়া। ঠিক বোলেছেন আপনারা, অথচ মজা দেখুন, ডিরেক্টরস্‌ বোর্ড আমার এ কথাটা মানতেই চায় না,—কিন্তু কারখানার এ সোব কথাটি এখন থাক, লেট আস বি মেরি ফর এ হোয়াইল,—(চারদিকে তাকিয়ে) মিসেস সেন তো দেখছি বিরাট আয়োজন কোরেছেন, সিনিয়ার অফিসারদের মধ্যে বাকী নেই কেউ।

মিলি। (কৃতার্থের হাসি হেসে) না না, এ আর এমন কি।

স্যার হনুমন্তিয়া। মিষ্টার সেন গেলেন কোথায়? উপহারের প্যাকেটটা যে তাঁর হাতেই দিলাম।

ত্রিবিক্রম। (পেছন থেকে এগিয়ে এসে) এই যে আমি স্যার, আপনার পেছনেই দাঁড়িয়েছিলাম।

স্যার হনুমন্তিয়া। তিরদিন এমনি ভাবে আমার পেছনে থেকে আমার শক্তি বৃদ্ধি কোরবেন মিষ্টার সেন।

ত্রিবিক্রম। আপনার আদেশ পেলে আমি সব কিছুই করতে প্রস্তুত স্যার,—এই নিন আপনার উপহারের প্যাকেট।

(স্যার হনুমন্তিয়া প্যাকেটটা খুলে ফেললেন, ভেতরে গহনার বাক্সে এক ছড়া হার বিদ্যুতের প্রখর আলোয় ঝলসে উঠলো।)

মিলি। (সহর্ষে) এ আপনি করেছেন কি স্যার হনুমন্তিয়া,—যেন দামি উপহার!

স্যার হনুমন্তিয়া। মোনালিসাকে যে উপহারই দিই না কেনো, কোনোটাই যথেষ্ট দামি হোতে পারে না মিসেস সেন,—মোনালিসা আজ নিষ্কাশনপুর ক্লিউটি হোয়ে উঠেছে, সে হোবে সোসাইটি—কুইন, আপনার মেয়ের কাছে আপনি এবার হেরে যাবেন মিসেস সেন.—হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ।

মিলি। হারও পাবে আবার হারিয়েও দেবে! হি হি হি।

স্যার হনুমন্তিয়া। কিন্তু মোনালিসা গেলো কোথায়? তাকে ডাকুন মিসেস সেন, আমি নিজের হাতে এ হার পোরিয়ে দেবো তার গলায়।

মিলি। (চারদিকে তাকিয়ে, স্বগতঃ) মেয়েটা আবার গেল কোথায় এ সময়ে? আঃ, কী যে হয়েছে এরা,—(প্রকাশ্যে) আমি এক্ষুণি তাকে ধরে আনছি স্যার হনুমন্তিয়া, ও বোধ হয় ড্রেসিং রুমে একটু হি-টাচিং করতে গেছে,—ত্রিবিক্রম, তুমি একটু এখানে থাকো—আমি এক্ষুণি আসছি।

(মিলি সেনের দ্রুত প্রস্থান)

(হঠাৎ বাইরে বহু লোকের মিলিতকণ্ঠের চীৎকারের শব্দ শোনা গেল। হল-ঘরের সবাই হঠাৎ চুপ করে তাই শুনতে লাগল)

জনতা। (নেপথ্যে) ইনক্লাব্—জিন্দাবাদ্,—ইনক্লাব্—জিন্দাবাদ্, মজদুর ইউনিয়ান কা জয় হো', পর্দাপ্রে-থার—কোতল হো।

স্যার হনুমন্তিয়া। (উঠবার চেষ্টা করে) ব্যাপার কি মিষ্টার সেন, রাস্তায় ও কিসের শব্দ?

ত্রিবিক্রম। (দরজার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল, ফিরে এল) কারখানার শ্রমিকরা মিছিল বার করেছে স্যার।

স্যার হনুমন্তিয়া। (উত্তেজিত ভাবে) বটে! সাহস তো কম নয় ওদের! অফিসার্স বাংলোর কাছে এসে এক ঘর লেডীর সামনে হাল্লা কোরছে অসভ্যের মতো—ব্রিটিশ আমলে এ রাস্তায় হাঁটবার সাহস ছিল না ওদের।

ত্রিবিক্রম। ইউনিয়ন হবার পর ইদানীং ওদের সাহসটা একটু বেড়েই গেছে স্যার,—ডিসিপ্লিন মানার চেয়ে ডিসিপ্লিন ভাঙ্গার দিকেই উৎসাহটা ওদের বেশী।

স্যার হনুমন্তিয়া। বটে! কালই এক ঝাঁক চার্জসীট ইস্যু কোরুন আপনি, আমার নামনে, সোজাইটি সেক্রিভের সামনে এসে হাল্লা করবার মজাটা বুঝিয়ে দেব ভালো করে,—আর যে করেই হোক, ইউনিয়নটাও ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

ত্রিবিক্রম। তাই হবে স্যার, কমিটি মেম্বারদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে হাত করে ফেলেছি আমি, কিছু টাকা ছড়ালে ওদের নিজেদের মধ্যেই এমন দলাদলি শুরু হবে যে নিজের ঘর সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী।

স্যার হনুমন্তিয়া। চমৎকার,—টাকার জন্য আপনি ভাববেন না মিষ্টার সেন।

ত্রিবিক্রম। তা ছাড়া একটা পাল্টা ইউনিয়ন খাড়া করবার কাজও বহুদূর এগিয়ে গেছে স্যার।

স্যার হনুমন্তিয়া। ম্যানেজমেণ্ট যাতে আপনার কর্মদক্ষতার পুরস্কার দিতে ভুলে না যায় তা আমি দেখব মিষ্টার সেন।

ত্রিবিক্রম। (বিনয়ে মাথা নুইয়ে) আপনার আস্থা আর অনুগ্রহই আমার সব চেয়ে বড়ো পুরস্কার স্যার।

বাইরে আবার মিলিত কণ্ঠের চীৎকার

জনতা। (নেপথ্যে) ইনক্লাব—জিন্দাবাদ—ইনক্লাব জিন্দাবাদ, মজদুরোঁকা কারেম হো—হমারা সাথ্ো জারেম হায়—বোলো বোলো মজদুর ইউনিয়ন কী—জয়।

শব্দ আস্তে আস্তে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলো

তৃতীয় দৃশ্য

মোনালিসার শোবার ঘর

ঘরের মাঝখানে সিঙ্গল ইংলিশ খাটে পরিপাটি নির্ভাজ বিছানা পাতা, এক কোণে ছোট বুক সেলফে খানকয়েক ইংরিজি বই, ওয়ার্ডরোবের মাথায় সুন্দর ফ্রেমে মোনালিসার আবক্ষ ছবি। জানালার কাছে প্রসাধনের নানা উপকরণ সহ ড্রেসিং টেবিল।

নরম আলো জ্বলছে ঘরে

অরুণচন্দ্র আর মোনালিসা। সময় রাত সাড়ে আটটা। মোনালিসার ম্যানিকিউর করা মসৃণ নরম হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে।

অরুণ। তোমাকে কিন্তু আজ সুপার্ব দেখাচ্ছে লিসা এ্যাব্‌সোলিউটলি র‍্যাভিশিং।

হাত ছাড়িয়ে ছোট গোলাপি রুমাল ঠোঁটে ছুঁইয়ে।

মোনালিসা। আঃ, তুমি দিন দিন বড় অশান্ত হয়ে উঠছ অরুণ।

অরুণ। এমন ভাবে সাজলে স্বয়ং সেন্ট পিটারেরও মাথা ঘুরে যেতো, আমি তো নেহাৎ রক্ত মাংসের মানুষ, শান্ত থাকি কী করে বলো?

মোনালিসা। (রূপের স্তুতি শুনে খুশী, কিন্তু মুখে নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে) এত আজে-বাজে কথাও তুমি বলতে পারো অরুণ, যার সঙ্গে কাল রাত্রে ক্লাবে নেচেছিলে সেই ইভা বোস কেমন সেজে এসেছে দেখলে যাও, সে হয়তো তোমায় না দেখে এতক্ষণে হার্টফেল করেছে।

অরুণ। তার হার্ট ক্যাপচার করবার জন্য সঙ্ঘ দোশী, ভেভিড্, চ্যাটার্জি আর কপিলদেও শর্মা ঘুর ঘুর করছে আশে-পাশে।

মোনালিসা। তা হলে সুভদ্রা দেশমুখের কাছে যাও, মাইথন ড্যামে তো তাকে নিয়েই গিয়েছিলে মুনলাইট পিকনিক করতে।

অরুণ। চাঁদের আলোয় তার চুনকাম করা মুখটা যদিও বা সহ্য হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যুতের প্রখর আলোয় সে অচল।

মোনালিসা। আর একমাত্র আমিই বুঝি সচল?

অরুণ। (আবার হাত ধরে) সে কথা কি বারে বারে বলতে হবে লিসা? আমি বুঝতে পারছিনা আজকাল তুমি এমন সুদূর হয়েছ কেন?

মোনালিসা। (হাত ছাড়িয়ে) সময়ের সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন হয় অরুণ, নাও, লক্ষ্মী তো, তার চতুর্ভুজিয়া এসে পড়েছেন হয়তো, দেরী হলে মা আবার ভীষণ বকবে—

অরুণ। আমার চেয়ে ঐ হোঁদল কুৎকুতের সঙ্গই তোমার বেশী প্রিয় হল লিসা?

মোনালিসা। প্রিয় অপ্রিয়র কোনো প্রশ্নই ওঠেনা এখানে, এটা হচ্ছে প্রয়োজন।

অরুণ। প্রিয়জন থেকে কি প্রয়োজনের দাবি বেশী লিসা?

মোনালিসা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে লৌহনগরীর কূটনীতিরই অঙ্গ।

অরুণ। সোসাইটির সব মেয়েই ঐ একটি পুরুষকে লক্ষ্য করে হন্তে হয়ে ছুটতে থাকে,—এটা আমার একদম পছন্দ নয় লিসা।

মোনালিসা। পছন্দ তো আমারও নয়,—কিন্তু উপায় কি? বাবার প্রভাব, প্রতিপত্তি, প্রোমোশন, সব কিছুই যে ঐ একটি লোকের মর্জির ওপর নির্ভর করে আছে। তাঁকে খুশী রাখতে না পারার বিপদ আছে অরুণ,—তোমার মাও তো শুনেছি মিষ্টার গিলবার্টকে খুশী করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

অরুণ। কথাটা মিথ্যে নয়, আর ঠিক সে জন্যই কী বিশ্রী! জানো, আমি মেয়ে না হয়ে ছেলে হয়ে জন্মেছি বলে মা-র বড়ো আক্ষেপ।

মোনালিসা। সত্যি, তা হলে এ সময়ে তুমি তোমার মা-র একটি নিপুণ হাতিয়ার হতে পারতে।

অরুণ। এই যেমন তুমি হয়েছ?

মোনালিসা। আমি নিজের ইচ্ছায় হই নি অরুণ, আমাকে হতে বাধ্য করা হয়েছে। সোসাইটি গার্ল-এর অভিনয় করে করে আজ আমি ক্লান্ত, নিঃস্ব, রিক্ত। তাই যখনই ফাঁক পাই, কলকাতায় সীতাদির বাড়ি গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

অরুণ। এবার কলকাতা থেকে ফেরার পর তুমি কিন্তু অনেক বদলে গেছ লিসা, কথায় কথায় নাচ, গান, ঠাট্টা তামাশা সব ছেড়ে দিয়ে ঘরকুনো হয়ে পড়েছ।

মোনালিসা। প্রজাপতি যতক্ষণ উড়তে থাকে ততক্ষণই সে সুন্দর, কিন্তু ফুলের পাপড়ির ওপর একবার বসলেই সে একেবারে নিথর, নিশ্চুপ,—কলকাতায় গেলে আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে যাই অরুণ, তখন এমন সব কথা ভাবতে পারি, এমন সব কাজ করতে পারি যা এই লৌহনগরীর আরিষ্টক্র্যাট সোসাইটির চার দেওয়ালের বন্দী জীবনের পক্ষে ভাবাও অন্যায়।

অরুণ। এ তুমি বলছ কি লিসা?

মোনালিসা। সময় সময় আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভেতর দু'জন মোনালিসা আছে, একজন এখানকার এই কৃত্রিম আবহাওয়া, মাপা হাসি, মাপা কথা, স্টিফ্ এটিকেটের গণ্ডীর ভেতরেই চলাফেরা করতে পছন্দ করে, নিরাশনপুরের ক্লাব আর নিরাশনপুরের এই অভিজাত অফিসার্স সোসাইটিকেই জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে মনে করে—

অরুণ। হাউ ইন্টারেস্টিং। আর অন্য জন?

মোনালিসা। আমার দ্বিতীয় সত্তা এ সমস্তই মনে প্রাণে ঘৃণা করে, সে চায় মুক্ত পরিবেশ। সব কৃত্রিমতার বাইরে যে বিশাল উদার পৃথিবী, মুক্ত বায়ু, অনন্ত আকাশ আছে তার ডাক শুনতে পায় সে, শুনতে শুনতে অন্যমনা হয়ে যায়,—এই দুই বিরোধী সত্তার নিরন্তর সংঘর্ষ আমাকে বুঝি পাগল করে দেবে অরুণ। তুমি পারবে আমাকে এর হাত থেকে বাঁচাতে? বলো, বলো অরুণ,—পারবে?

অরুণ। আমি!

মোনালিসা। হ্যাঁ, তুমি, এই সমাজের প্রতিভূ তুমি, তুমি আমায় ডাক দিয়ে নিয়ে যাও—

অরুণ। তোমার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে লিসা, মনে হচ্ছে যেন বিক্ষত-ডানা একটা পাখি যেন তীব্র বেগে আমার দিকে ছুটে আসছে—

মোনালিসা। পারবে না? পারবে না সেই আহত পাখিকে আশ্রয় দিতে, সান্ত্বনা দিতে?

অরুণ। তোমাকে আমি চিনতে পারছি না লিসা,—আমি,—আমি ভেবে দেখব—

মোনালিসা। (কিছুক্ষণ চুপ করে অরুণের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে) তুমি এত ভীরু কেন অরুণ?

অরুণ। ভীরু!

মোনালিসা। হ্যাঁ, স্টেট করবার বেলাতে কুয়াশার নীচে কি ভালোবাসার শক্ত ভিত্ নেই তোমার মনে? দুর্বার শক্তিতে আমার প্রাণের ভিত্ ধরে টান দাও না কেন তুমি? কিসের ভয় তোমার?

অরুণ। এ সব তুমি কী বলছ লিসা? আমি তো তোমার কোনো কথাই বুঝতে পারছি না—

মোনালিসা! অরুণ, তুমি কি পারো না তোমার পৌরুষের শক্তিতে আমাকে অধিকার করে নিতে? নিয়ে যেতে পারো না নিরাশনপুরের এই অভিশপ্ত আভিজাত্যের আবেষ্টনী থেকে বহুদূরে,—যেখানে পদে পদে মায়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টির আঘাত নেই,—এটিকেটের বাঁধা নিয়ম থেকে সামান্যতম বিচ্যুতির জন্য খণ্ড প্রলয় নেই—

অরুণ। (উৎকণ্ঠিতভাবে) লিসা,—লিসা,—এসব তুমি কী বলছ লিসা? আমি যে—

মোনালিসা। পারলে না, তুমি পারলে না অরুণ, হেরে গেলে তুমি তার কাছে। সে পারে,—বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সে পারে আমার ডাকে সাড়া দিতে, দৃঢ়পায়ে এগিয়ে এসে আমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে এই অপমানের পথ থেকে—

অরুণ। এ তুমি কার কথা বলছ লিসা?

মোনালিসা। (আত্মগতভাবে) যে লুকিয়েছিল আমারই অবচেতন মনে, যে আমাকে অন্য জগতের সন্ধান দিয়েছে, যে জ্বেলেছে আমার প্রাণের প্রেমের প্রদীপ-খানি, আর সেই আলোতেই আমি আমার চারদিকে তাকিয়ে যন্ত্রসভ্যতার এই লালসাজীর্ণ বৈরস্যের ছবি দেখেছি, শুনেছি মানবাত্মার মুক্তির গান,—যে আছে আমার জন্য প্রতীক্ষা করে—

অরুণ। (মোনালিসার হাত ধরে নাড়া দিয়ে) লিসা! এ সব কী বলছ তুমি? কার কথা বলছ? কে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে?

[ঘরের ভেতরের দরজার পাল্লা দুটো নিঃশব্দে খুলে গেল। মিলি সেন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন, জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকালেন]

মিলি। (কঠিন কণ্ঠে) আপাততঃ আমি প্রতীক্ষা করে আছি—

সোনালিসা। (শিউরে উঠে, অরুণের হাত ছাড়িয়ে) মা!

মিলি। লিসা,—কাম হিয়ার,—কুইক—

সোনালিসা। (মিলি সেনের কাছে গিয়ে) কী মা?

মিলি। ইউ গুড্ বি অ্যাশেমড্ অব্ ইয়োরসেলফ লিসা—

সোনালিসা। বারে! কী করলাম আমি?

মিলি। অরুণ, প্লিজ গো ফ্রম হিয়ার—

অরুণ। ও কে—(প্রাগ্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল)

মিলি। লিসা, আমি না তোকে বার বার মানা করে দিয়েছি ঐ লোফারটার সঙ্গে মিশতে, এ ঘরে কি করছিল ও?

সোনালিসা। মুখের মেকআপে একটু রি-টাচিং করতে ঘরে ঢুকেছিলাম তখন ও নক করে ঘরে ঢুকলো, তা ছাড়া অরুণ তো লোফার নয় মা—

মিলি। একশবার লোফার—

সোনালিসা। আমেরিকা থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং এ ডিগ্রী নিয়ে এসেছে অরুণ—

মিলি। আসুক ডিগ্রী, টাকা থাকলেই আমেরিকার ডিগ্রী কিনতে পারা যায়—

সোনালিসা। ওর মা সোনালি চন্দ্র আর কে কে দত্তের মেয়ে—

মিলি। সোনালিকে আমার চেয়ে তুই বেশী চিনিস নে লিসা, একটু আগে ডিংক করে পিলবার্টের সঙ্গে কী ঢলাঢলিই না করল—

সোনালিসা। আমাদের সোসাইটির কোন্ মেয়েই বা তা না করে মা? বিশেষ করে যেখানে একটু স্বার্থের গন্ধ থাকে—

মিলি। হোয়াট্ ডু ইউ মীন লিসা?

সোনালিসা। এই যে তুমি আজ আমার জন্মদিন এই অজুহাতে এত বড়ো ককটেল পার্টির আয়োজন করেছ, এমন অপরূপ সাজে সেজেছ,—ছুটে এসেছ আমাকে হলঘরে টেনে নিয়ে যেতে,—এ সবের আসল উদ্দেশ্যও তো খুব লুকোনো নয় মা—

মিলি। কী! পেটের মেয়ে হয়ে তুই আমাকে এত বড়ো কথা বললি লিসা?

সোনালিসা। আমি তো বলতে চাইনি মা, মনের কথাগুলোকে বাইরে টেনে আনতে বাধ্য করলে তো তুমি—

মিলি। আমি! আমি বাধ্য করলাম?

সোনালিসা। হ্যাঁ। মনে রেখো আজ আমি আঠারো থেকে উনিশে পড়েছি, অনেক কিছুই ভাবতে আর বুঝতে শিখেছি, তোমাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে আর আমি চাই না মা,—আমার নিজেরও একটা স্বাধীন সত্তা আছে, আমার নিজেরও ইচ্ছা অনিচ্ছা, রুচি অরুচি আছে—

মিলি। তুই কী বলতে চাইছিস্ লিসা?

সোনালিসা। আমি বলতে চাইছি যে আমাদের সোসাইটির এই যেপে যেপে করা বলা, যেপে যেপে হাসা, সব সময়ে অন্যের স্যাণ্ডাল নিয়ে হাসাহাসি করা; আর বার, ক্লাব, পার্টির গণ্ডীর বাইরের জগৎটাকে চোখ বুঁজে অস্বীকার করাটাকেই জীবনের চরম চরিতার্থতা বলে মনে করতে পারছি না, সহ্য করতে পারছি না তোমাদের আন্তরিকতাশূন্য ব্যবহার, আর—

মিলি। আর? থামলি কেন? বলেই ফেলনা, সবটুকুই শুনে যাই—

সোনালিসা। আর কারখানার চাকরীকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি নরনারীর আবর্তন। দেহের যে সৌন্দর্য শুধু বিশেষ একজনের জন্য, তাকে হাটের মাঝখানে নিয়ে এসে অনেক লোকের চোখে ধাঁধা লাগাবার চেষ্টাকে আমি মনে মনে ঘৃণা করি মা।

মিলি। বটে! এতবড়ো কথা তোর মুখে! কিন্তু এ সব উদ্ভট আইডিয়া তোর মাথায় কে ঢোকালো শুনি? অরুণ নামে ঐ বাঁদরটা?

সোনালিসা। না মা। অরুণ নয়, আর যে বলেছে সে বাঁদরও নয়।

মিলি। তবে কে সে?

সোনালিসা। সে তোমাদের সোসাইটির সেউ নয় মা, সে অতি সাধারণ ঘরের ছেলে, কিন্তু অসাধারণ তার ব্যক্তিত্ব, এখানকার নকল সাহেবিয়ানার খোলসে-ঢাকা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল, অনেক বেশী প্রখর।

মিলি। তার সঙ্গে তোর কোথায় আলাপ হল লিসা?

মোনালিসা। কলকাতায়, গীতাদির ওখানে।

মিলি। ও, তাই বুঝি কারণে অকারণে অমন ঘন ঘন কলকাতায় ছোটা হচ্ছিল তোমার? কিন্তু গীতার বাবা তো মস্ত ধনী, তাঁর বাড়িতে যে আদা যাওয়া করে সে নাবাল হ'তে যাবে কেন?

মোনালিসা। গীতাদির বাবা হঠাৎ বড়লোক নন মা, তাই তাঁর ঐশ্বর্যের হীপ্তিই আছে, দেমাক নেই, সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে তাঁদের বাধে না। তাঁর কাছে টাকাটাই সব নয়—শিক্ষা আর সংস্কৃতিকে টাকার অনেক,—অনেক ওপরে স্থান দেন তিনি।

মিলি। ভুল লিসা, ভুল। শিক্ষাই বল আর সংস্কৃতিই বল বা ঐ তোর ব্যক্তিত্বই বল, টাকা না থাকলে সবই বৃথা। তোর বাবা যদি ঐ আনীটাকার কেরানী হয়েই থাকতেন তা হলে কি এখনকার মতো এত মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকতো আমাদের?

মোনালিসা। তা থাকতো না বটে, কিন্তু তার বদলে এমন একটি জিনিষ থাকতো যা তোমাদের নেই মা, যা তোমরা চেষ্টা করলেও পাবে না।

মিলি। কী সে জিনিষ?

মোনালিসা। সুখ।

মিলি। সুখ? তুই কি বলতে চাস যে আমি বা তোর বাবা সুখে নেই?

মোনালিসা। না, তোমরা কেউই সুখী নও। বাবা দিন রাত তার হুহুমন্ত্রিত্বের নেক-নজরে থাকবার জন্য মিষ্টার চ্যাটার্জি আর মিষ্টার শিবরামানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চলেছেন। মনে তিল মাত্র শান্তি নেই তাঁর। আর তুমি শুধু ভাবছ কার বউ বা কার মেয়ে তার হুহুমন্ত্রিত্বকে রূপের ফাঁদে ফেলে তোমাকে হারিয়ে দেবে। তুমি বা বাবা পরস্পরের প্রেরণার উৎস নও,—একে কি তুমি সুখ বলো মা?

মিলি। লিসা, আজ তোর জন্মদিন, তা না হলে এ সব কথা বলবার জন্য শাস্তি আমি হাতে হাতে দিতাম তোকে—

মোনালিসা। শাস্তি দিয়ে শরীরকেই কষ্ট দেওয়া চলে মা, মনকে বাঁধা যায় না। সে যে চির স্বাধীন—

মিলি। তোর মনের সে স্বাধীনতা আমি ঘুচিয়ে দেব এবার। কাল থেকে বাংলো থেকে এক পা-ও বাইরে যেতে পারবি না বলে দিলাম।

মোনালিসা। এই শহরের দূষিত বাতাস থেকে দূরে থাকবো তাতে তো আমার আনন্দ বা।

মিলি। আচ্ছা তুই সেই আনন্দেই থাকিস। এখন চল তো, তার হুহুমন্ত্রিত্বা নিজের হাতে তোর গলায় হার পরিয়ে দেবেন বলে অপেক্ষা করে আছেন—ছন্দা, রত্না, শেফালী, গোপালী সব হিংসেতে ফেটে মরছে একেবারে।

মোনালিসা। সে হার আমি চাই নে মা, সে হারে বিগত-বসন্তের উষ্ণ কামনা লেগে আছে, লেগে আছে লালসার ক্লেদাক্ত স্পর্শ।

মিলি। কোনো কথা শুনতে চাইনে আমি, সে হার তোকে নিতেই হবে, আজ,—এক্ষুণি।

মোনালিসা। কক্ষণো না,—ও হার আমি পারব না, ও হার আমি নেব না।

মিলি। লিসা!—কে?

বেয়ারা সুলতানের প্রবেশ

সুলতান। ম্যাম্ হুঁ মেম সাব,—সুলতান।

মিলি। ক্যা মাংগতা?

সুলতান। বহোত দের হো রহি হ্যায়, সাব্ বহোত রঙ্গ হুয়ে হ্যায়, আপকো জলদ্ সে জলদ্ বুলায়ে হৈ—

মিলি। (অস্থিরকণ্ঠে) ঐ শুনে লিসা, তার হুহুমন্ত্রিত্বা বুঝি বা রাগই করলেন। এমনিতেই তোর বাবার ওপর একটু বিরক্ত হয়ে আছেন, তার ওপর তুই না গেলে আর রক্ষে থাকবে না। আমি তোর মা তোর হাত ধরে বলছি আজকের মতো চল লক্ষ্মীটি, নইলে একঘর লোকের সামনে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমার—চল।

মোনালিসা। বেশ চলো,—কিন্তু এই—এই শেষ বার মা।

মিলি। সুলতান তুম যাও, সাব্ কো বোলো মিসি-বাবা কা সির মে দর্দ হুয়া থা, উসি ওয়াস্তে আস্তে আস্তে আনে মে দের হুই। হুম লোগ আতি আতা হুঁ —

সুলতান। বহোত আচ্ছা মেম সাব্—

সুলতানের প্রস্থান

মিলি। (পাউডারে পাফ্‌টা গালে নাকে একটু বুলিয়ে) নে লিসা, আয় আমি ঠিক করে দি।

দু' জনে ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ধীরে ধীরে স্নান নেমে এলো।

চতুর্থ দৃশ্য

হল ঘর

ককটেল পার্টি শেষ হয়ে গেছে। হল ঘরের বিশৃঙ্খলতা দূর হয় নি এখনো, বাতাস এখনো সেন্ট, পাউডার আর চুরুটের গন্ধে ভারি।

পরিশ্রান্ত মিলি সেন আর ত্রিবিক্রম সেন পাশাপাশি দুটো সোফাতে বসে আছে। মুখুয়ের টেবিলে একটা স্কচ্‌ হুইস্কির বোতল। দু'জনের হাতে দু'টি গ্লাস।

সময় : রাত এগারোটা।

মিলি। যাক, এতক্ষণে পার্টির ঝামেলাটা মিটলো, আর পারি নে বাবা এত ঝকমারি সইতে।

ত্রিবিক্রম। তা থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে সময় তার হিংস্র নখগুলো তোমার ছংশিণ্ডে বেঁধাতে আরম্ভ করেছে মিলি।

মিলি। আর তুমি? তোমার বুকে বুঝি সময়ের থাবা চেপে বসে নি?

ত্রিবিক্রম। আমি এখনো কমপারেটিভলি ইয়ং আছি মিলি। মেয়েদের যৌবন অনেকটা শিউলি ফুলের মতো, টুপ করে ঝরে যায়।

মিলি। আর পুরুষের যৌবন।

ত্রিবিক্রম। পুরুষের যৌবন চন্দ্রমল্লিকার মতো, অনেক দিন ধরে টাটকা আর সতেজ থাকে।

মিলি। থাক থাক, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না তোমাকে, তোমার যৌবনের আয়ু যে এখনো ফুরোয় নি তার ভালো প্রমাণ আমি আজই পেয়েছি।

ত্রিবিক্রম। কি প্রমাণ পেলে শুনি?

মিলি। অন্ধকার বাগানে হাসনুহানার ঝোপের আড়ালে মিসেস কৃপালনীর সঙ্গে যে চলাচলিটা করেছ তা বুঝি আমার চোখে পড়ে নি ভেবেছ?

ত্রিবিক্রম। কী আশ্চর্য। চলাচলিটা আবার কোথায় দেখলে তুমি? সুপ্রভা আমায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল মিনিটখানিকে একটা কথা বলতে।

মিলি। চন্দ্রশেখর কৃপালনীর জন্ম একটা বড়ো বঙ্গোর ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এই কথা তো?

ত্রিবিক্রম। তুমি কি করে জানলে এ কথা?

মিলি। আমার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয় ত্রিবিক্রম। আর আমি এও জানি যে সুচতুর সুন্দর মুখের শুকনো অনুরোধটুকুই তাদের ভালো বাংলো পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়!

ত্রিবিক্রম। ছি ছি, এ তুমি কি বলছ মিলি, ফিল্‌থি আইডিয়া।

মিলি। (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে) ফিল্‌থি আইডিয়া যাই হউ, আমি যা ইংগিত করছি তার এক বর্ণও যে মিথ্যে নয় সে কথা অস্বীকার করতে পারো তুমি?

ত্রিবিক্রম। ডোণ্ট গেট এক্সাইটেড্‌ মিলি। আয়দালি, বাবুর্চি বেয়ারারা দূরে সারভেণ্টস্‌ কোয়ার্টারে থাকে বটে, কিন্তু হোনালিসা আর সুব্রতর শোবার ঘর বেশী দূরে নয়—

মিলি। ওরা এখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে, রাত এগারোটায় আমার হাজার চীৎকারেও ওদের ঘুম ভাঙবে না, কিন্তু তুমি আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ ত্রিবিক্রম।

ত্রিবিক্রম। কোন কথাটা মিলি?

মিলি। কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি যে আমার সম্বন্ধে তুমি উদাসীন হয়ে পড়েছ ত্রিবিক্রম, তুমি ফ্লার্ট করছ অন্য মেয়েদের সঙ্গে।

ত্রিবিক্রম। এ বয়েসে তোমার এই অভিযোগটা নিতান্তই বেমানান মিলি, ইট ইজ এ্যাক্‌সিডেণ্টলি চাইল্ডিশ্‌।

মিলি। নট্‌ এট অল্‌, নট্‌ এট অল্‌। মানুষের যৌবন ঝরে যায় কিন্তু মন মরে না, ত্রিবিক্রম, আমি নারী, তোমার অবহেলা আমার মর্মে গিয়ে বিঁধে রক্তাক্ত বেদনার সৃষ্টি করে!

ত্রিবিক্রম। টাচ্‌, টাচ্‌, এমন টাচি তো তুমি কোনোদিন ছিলে না মিলি।

মিলি। যতদিন আমার রূপ আর যৌবন দিয়ে পুরুষের মনকে বেঁধে রাখবার ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলাম ততদিন এ সব ভাবনা আমার মনের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে পারতো না।

ত্রিবিক্রম। তা হলে কি তুমি তোমার মোহময়ী শক্তি সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়েছ মিলি?

মিলি। হাঁা হয়েছি। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি যে তার বহুমন্ত্রিয়ার চোখ দুটি আমাকে ছেড়ে আমার মেয়ের শরীরকেই ছুঁয়ে যাচ্ছিল বারে বারে।

ত্রিবিক্রম। আই দি। আমি কিন্তু মোনালিসাকে এ সব থেকে দূরে রাখতেই চেয়েছিলাম মিলি।

মিলি। কিন্তু তুমি চাইলেই কি হবে ত্রিবিক্রম? ওর রক্তে যে রয়েছে উচ্ছৃঙ্খলতার বিষ, তার আশা, তার সাহ। ও এ সব থেকে দূরে থাকবে কি করে বলো?

ত্রিবিক্রম। ও তো আর সে সব কথা জানে না মিলি।

মিলি। না জানলেও তার রক্তের মধ্যে নিশ্চয়ই সর্বনাশের ডাক শুনতে পায় সে, শুনতে পায় যাযাবরী অসংযমের আহ্বান।

ত্রিবিক্রম। না না, আমি তাকে সে ডাক শুনতে দেব না মিলি, সেই স্বয়ম্ভুর মাঝখান থেকে তাকে সরিয়ে আনব আমি।

মিলি। (ব্যঙ্গের সুরে) কিন্তু তাকে নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন ত্রিবিক্রম? লিসা তো তোমার কেউ নয়।

ত্রিবিক্রম। আমি তার পিতা।

মিলি। তুমি তার পিতা! হোয়াট য়ারিশ টক্।

ত্রিবিক্রম। হাঁা মিলি। যে জন্ম দেয় সে হল জনক, আর যে পালন করে সেই হয় পিতা, তার দাবিই সব চেয়ে বেশী মিলি। শকুন্তলার ওপর বিশ্বামিত্রের চেয়ে কণ্বের অধিকারই যে বেশী সে কথা অস্বীকার করতে পারো তুমি? ক্যান ইউ ডিনাই? তাই আমি ঠিক করেছি যে লিসাকে আমি সরিয়ে দেব এখান থেকে, এই ঠুনকো সোসাইটি থেকে বহু দূরে—ঐ যে ছেলেটি এসেছিল আজ সন্ধ্যায়, হি ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট বয়, চরিত্র আছে তার, হি উইল মেক হার হ্যাপি।

মিলি। (চীৎকার করে) হোয়াট? ভাট্ বেপার? মোনালিসার ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্বই চলবে না ত্রিবিক্রম, ও আমার, একান্তই আমার, আমি ওকে আমারই মনের মতো করে গড়ে তুলব, ওর ওপরে তোমাকে কোনো ভাগ বসাতে দেবনা, দেবনা, দেবনা,—

ত্রিবিক্রম। আঃ, আস্তে কথা বলো মিলি। লিসা হয়তো হঠাৎ জেগে উঠে শুনতে পাবে এসব কথা। ও তো আর জানে না যে কলঙ্কের হাত এড়াবার জন্যেই আমাকে তুমি বিয়ে করেছিলে আর ও-ই সেই কলঙ্কের ফল।

মিলি। হাঁা, জনমন হঠাৎ মরে গেল তাই, তা না হলে আমি আজ লণ্ডনে থাকতাম।

ঝড়ের বেগে মোনালিসার প্রবেশ

পরণে বাইরে যাবার জামা-কাপড়।

মোনালিসা। তোমাদের সব আলোচনাই আমার কানে গেছে মা।

মিলি। এ কী! লিসা! তুই ঘুমুস নি এখনো?

মোনালিসা। ঘুমুলে কি আর আমার জন্মের ইতিহাসটা জানতে পারতাম মা?

ত্রিবিক্রম। ছিঃ লিসা, এ সব কি বলছ তুমি? আমাদের কথায় কান দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।

মিলি। তুই যে এখনো বাইরে যাবার পোষাক পরে আছিস লিসা, এত রাত হ'ল, এখনো শোবার পোষাক পরিস নি কেন?

মোনালিসা। শোবার পোষাক পরে আরামে ঘুমিয়ে থাকলে কি আর এত সব আশ্চর্য কথা জানতে পারতাম মা?

ত্রিবিক্রম। ছি লিসা, অমন ভাবে কথা বোলো না মাকে। জীবনের সব রহস্য জানতে চেওনা, না, তাতে আনন্দ নেই, আঘাত আছে।

মোনালিসা। আসুক আঘাত, আমি তাকেই বরণ করে নেব বাবা, অনিশ্চয়ের সংশয়ের কাদড় থেকে সত্যের কঠিন আঘাত ঢের ভালো—কিন্তু তোমার সঙ্গে শুধু শুধু কথা বলে লাভ কি? আমার ওপর তো তোমার কোনো দাবি নেই।

মিলি। লিসা, সংযত হয়ে কথা বলো, উনি যেই হোন তোমার গুরুজন—

মোনালিসা। অসংযমের মধ্যে আমার জন্ম, যেখানে বড়ো হয়েছি তারও চারদিকে অসংখ্য অসংযমের দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে, এখন তুমি আমার কাছ থেকে সংযত আচরণ কি করে আশা করো মা?

মিলি। তুমি উত্তেজিত হয়েছ লিসা, শান্ত হও, এই সোফায় আমার পাশে বোসো।

মোনালিসা। না মা, আমি বলব না, তোমরা আমায় যে গোলক ধাঁধার ভেতরে ঠেলে ফেলছ তার থেকে মুক্তির পথ আমাকে খুঁজে বার করতে হবে, কিন্তু কে আমাকে সে পথ দেখাবে ?

ত্রিবিক্রম। মানুষের মনের ভেতর বিবেকের দীপ্তশিখা অনির্বাণ জ্বলছে লিসা, ঝড়-ঝঞ্ঝা তাকে নেভাতে পারে না, তার আলোতেই মানুষ পথ চিনে নেয়—

মোনালিসা। কিন্তু সে শিখাও যে মাঝে মাঝে সংশয়ের ধোঁয়ায় আড়ালে ঢাকা পড়ে বাবা—

ত্রিবিক্রম। তা হয় তো পড়ে, কিন্তু মেঘ আকাশের সূর্যকে কতক্ষণ ঢেকে রাখতে পারে লিসা ? কিছুক্ষণের ভেতরেই নিষ্কলুষ সূর্য তার দীপ্ততেজে বেরিয়ে আসে না ?

মোনালিসা। আমার পথ আমি চিনে নিয়েছি বাবা, কিন্তু মা কি তাকে সইতে পারবে ?

ত্রিবিক্রম। তা যদি সে না পারে তবে সেটা হবে তার অক্ষমতা, কিন্তু সে জন্য তুমি জীবনের পাত্র থেকে অমৃতরস পান না করে কেন থাকবে লিসা ?

মিলি। এ সব তোমরা কী বলছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—

মোনালিসা। আমি আমার অত্যন্ত গতিপথে পরিবর্তন আনতে চাই মা—

মিলি। তার মানে ?

মোনালিসা। মানে মিথ্যে আভিজাত্যের সোনার খাঁচায় আমি আর বন্দী থাকতে চাই না মা। আমি চাই পৃথিবীর জনারণ্যে মিশে আমার নিজস্ব মূল্য যাচাই করে নিতে—

মিলি। এ কথার অর্থ কি লিসা ? কোথায় যাবি তুই ?

মোনালিসা। আমি যাব তার কাছে যে আমাকে মহৎ প্রেমে দীক্ষা দিয়েছে, উন্মোচিত করেছে আমার অন্তরাত্মাকে—

মিলি। কে সে ? অরুণ ?

মোনালিসা। না মা, অরুণ নয়, স্ট্রাট করাই তার পেশা, ভালোবাসার গভীরতার স্বাদ তার উপলব্ধির বাইরে।

ত্রিবিক্রম। তা হলে কার কথা তুমি বলছ লিসা,—আমাদের চেনা-শোনার মধ্যে কেউ ?

মোনালিসা। তুমি তাকে চেনো বাবা—

ত্রিবিক্রম। আমি চিনি তাকে ?

মিলি। নাম কি তার ? কার ছেলে সে ?

মোনালিসা। তার নাম মলয় চট্টোপাধ্যায়।

মিলি। মলয় ? সেই ছেলেটি যে আজ সন্ধ্যায় এসেছিল ?

ত্রিবিক্রম। তোমার নির্বাচনের প্রশংসা করি লিসা—

মিলি। ও, তোমরা তবে বাপে-বেটিতে ষড়যন্ত্র করেছ—

মোনালিসা। না মা, এতে ষড়যন্ত্রের কিছু নেই, এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার—

মিলি। কিন্তু তাকে তো তুই আজই প্রথম দেখলি লিসা, তার সম্বন্ধে তো কিছুই জানিস না তুই,—তাছাড়া একজন নগণ্য সুপারভাইসারের ভাগনে সে.—না না এ হতেই পারে না—এ হতেই পারে না।

মোনালিসা। কেন হতে পারবে না মা ? আমি যে তাকে দেখেছি অনেক দিন ধরে, কলকাতায়, গীতাদির বাড়িতে,—দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হয়েছি তার সঙ্গে, প্রেমের বাতায়নপথে আমাদের আত্মার মিলন হয়েছে অনেক আগেই—

মিলি। কিন্তু সে যে সোসাইটির কেউ নয় লিসা, সে অতি সাধারণ ঘরের ছেলে—

মোনালিসা। সেখানেই তো তার অসাধারণত্ব মা। অন্তরের ঐশ্বর্যে সে ভরপুর বলেই তো ভগবান তাকে বাইরের ঐশ্বর্য দেওয়া দরকার মনে করেন নি। সে যে সাহিত্যিক, নিখিলবিশ্বের সুখদুঃখের তরঙ্গাঘাতে তার হৃদয় চঞ্চল, উদ্বেল, উন্মুখর—

মিলি। সাহিত্যিক ! কথার পিঠে কথা বসিয়ে পাতা ভরানো যার পেশা ? ঃ—

মোনালিসা। সে পাতা কিন্তু সাধারণ পাতা নয় মা, তা-জীবনেরই এক একটি পাতা, তার বাণী পৌঁছে যায় মহাকালের শব্দপ্রান্তে—

ত্রিবিক্রম। এত বড়ো বড়ো কথা তুমি শিখলে কোথায় লিসা ?

মোনালিসা। মলয়ের কাছে বাবা,—তার কাছেই আমি জীবনকে চিনতে শিখেছি, তবু আমার চোখ থেকে

অত্যন্ত জীবনের মোহ-অঞ্জন ঘুচেও ঘোচেনি, আমার দৈত সত্তার অবসান হয়নি,—কিন্তু আজ তোমরাই তা ঘুচিয়ে দিলে নিজের হাতে। আমার মনে আর কোনো সংশয়, দ্বিধা বা দুর্বলতা নেই বাবা—

মিলি। আমরা ঘুচিয়ে দিলাম? তার মানে?

মোনালিসা। হাঁ মা। তোমাদের কথা থেকেই একটু আগে জানতে পারলাম যে আমার জন্ম পঙ্কে, তবু পঙ্কজ হয়েই আমি ফুটে থাকতে চাই। এই বিলাস আর আভিজাত্যের কাঁদে জড়িয়ে পড়লে আর আমি মাথা তুলবার সুযোগ পাবো না, তলিয়ে যাবো।

মিলি। কিন্তু—

মোনালিসা। একটু আগে তুমি আমায় জিজ্ঞেস করছিলে না আমি এখনো বাইরে যাবার পোষাক পরে আছি কেন?

মিলি। হ্যাঁ—

মোনালিসা। তার কারণ আমি যাবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিলাম মা, আর হয়তো আসতাম না, তোমরা কখন ঘুমুবে তারই অপেক্ষা করছিলাম শুধু—

মিলি। যাবার জন্য? এত রাতে? কোথায় লিসা?

মোনালিসা। অরুণ হয়তো তার টু সীটার্সখানা নিয়ে এখনো আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে অফিসার্স ক্লাবে, শিশু গাছের নীচে—

মিলি। অ্যাঁ, বলিস কি তুই লিসা? ওই লোফার-টার সঙ্গে ইলোপমেণ্টের প্ল্যান করেছিলি নাকি তুই?

মোনালিসা। হাঁ মা; আমাদের সোসাইটিতে তো এটাই স্বাভাবিক, বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করা কোন এক প্রচণ্ড আবেগ যেন আমার শুভবুদ্ধিকে লুপ্ত করে দিয়েছিল, অরুণের প্রস্তাবে আমি রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যাবার আগে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে মনুষ্যের প্রেম—সে যে বলে গেল যে আমি ডাক দিলেই সে আসবে—

ত্রিবিক্রম। খুব ভালো করেছ লিসা,—পাপের পথে পা বাড়াবার মতো বিড়ম্বনা আর নেই, সারা জীবনেও আর তার প্রায়শ্চিত্ত হয় না—

মোনালিসা। ঠিক বলেছ বাবা। হঠাৎ বিদ্যুতের মতো একটা তীব্র ঝলক আমার অন্ধকারময় ভাবী জীবনটাকে উদ্ভাসিত করে দিল। সংকীর্ণ গণ্ডীর কৃত্রিমতার মধ্যেই কি জীবনের পরম সার্থকতা? পৃথিবী ব্যাপী বাতাসকে একটা ছোট ঘরে বন্দী করে রাখলে কি তা দূষিত হয়ে উঠবে না? আমি আমার সংকল্প স্থির করে নিলাম।

ত্রিবিক্রম। তবে তাই হোক মোনালিসা, তুমি তোমার মনোমত জীবনই বেছে নাও,—আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি,—সুখী হও—

মোনালিসা। (ত্রিবিক্রমকে প্রণাম করে) তুমি আমাকে আশীর্বাদ করবে না মা?

মিলি। না লিসা, আমি তা পারব না। অত্যন্ত-জীবনের পরিধির বাইরে যেতে আমি শিখিনি, তবে—

মোনালিসা। (সাগ্রহে) তবে?

মিলি। তবে তুমি তোমার পছন্দ মতো পথ বেছে নিলে আপত্তিও করব না লিসা। জীবনের জটিল, দুর্গম পথের বাঁকে কার জন্য কোথায় যে আনন্দ লুকিয়ে আছে তা আমি জানি না, তাই বাধা দিতে আমি চাই না!

মোনালিসা। এই আমার জন্মদিনের শ্রেষ্ঠ উপহার মা।

ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এলো

শেষ

দক্ষিণ ভ্যাং

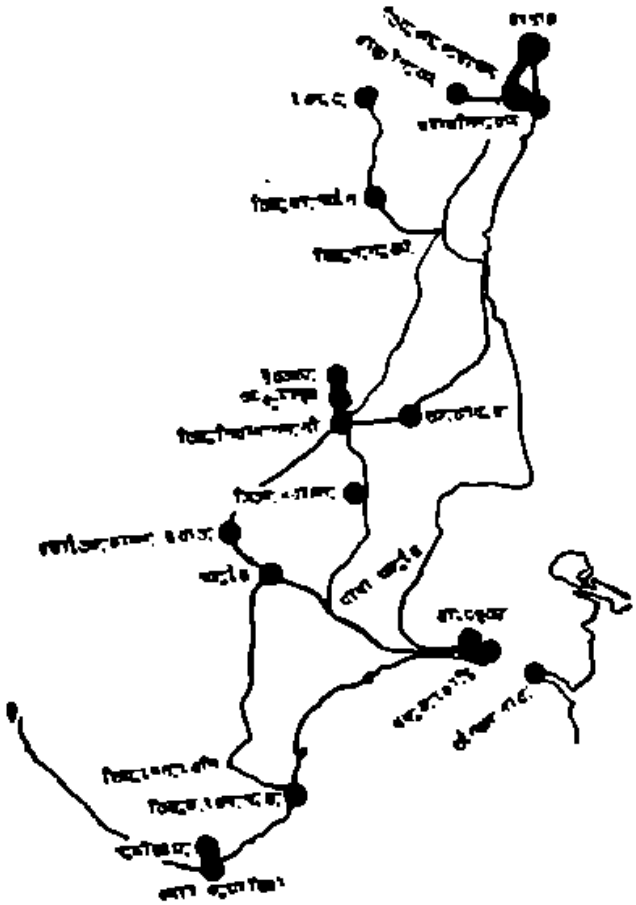

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৬

উত্তর আরকোট্ জেলার ছোট্ট একটি বসতি তিরুবণনাইমলৈ। মাদ্রাজ শহর থেকে সরাসরি বাস্ চলে। ট্রেন্‌এও যাওয়া যায়। রেলপথে মাদ্রাজ থেকে দূরত্ব ১৭২ মাইল।

বসতিটি ছোট হলেও আধুনিক জীবনযাত্রার সব উপকরণই আছে।

স্থানটি একটি শৈবতীর্থ। দ্রষ্টব্য দর্শনীয়,—হেমোলিঙ্গ অরুণাচলেশ্বরের দেবালয়।

পূর্বঘাট পর্বতমালার যে পাহাড়ের কোলে মন্দিরটি অবস্থিত সেটির নাম অরুণ গিরি, স্বর্ণগিরি, সুদর্শনগিরি ইত্যাদি। সন্নিষ্ট দেবালয়টি দু'হাজার বছরের পুরানো বলে অনুমিত।

পঁচিশ একর জমিতে বিস্তৃত মন্দিরটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৭০০ ফিট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৪০০ ফিট। প্রধান প্রবেশ পথের গোপুরমটির উচ্চতা ২১৭ ফিট। নির্মাতা বিজয়-নগররাজ কৃষ্ণদেব রায়। নির্মাণ কাল—১৫১৬ খৃষ্টাব্দে।

আনুমানিক ৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিরুবণনাইমলৈ ছিল চোল রাজ্যভুক্ত।

পরবর্তী কালে পল্লবদের রাষ্ট্রকূট, পুনরায় চোল, হোয়সল এবং রাজু রাজগণের করতলগত হয়। তারপর মুসলিম, মহারাষ্ট্রীয় ও ফরাসীগণের অধিকারে আসে। (ফরাসীদের প্রাক্তন উপনিবেশ পাণ্ডিচেরি হতে

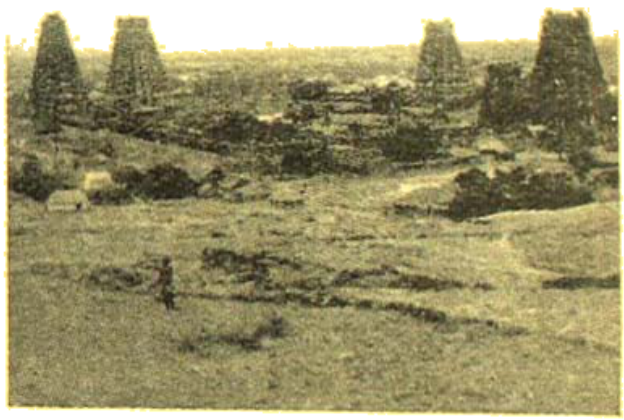

অরুণাচলম্

স্থানটির দূরত্ব মাত্র ৬৭ মাইল।) উনবিংশ শতাব্দীতে তিরুবণনাইমলৈ-এ কায়েম হয় বৃটিশ প্রভুত্ব।

অরুণাচল শৈলে বিভিন্ন সাধকদের নামানুসারে স্থনাম্রম নমঃ শিবায়, বিরূপাক্ষ, ইত্যাদি নামের অনেকগুলি গুহা

দেখা যায়। পাহাড়ের উত্তর পাদদেশে দেখা যান,—দক্ষিণে মহর্ষি রমণের আশ্রম।

অরুণাচলম্-এর দেবতা অরুণাচলেশ্বর (বা তেজোলিঙ্গ)-কে ঘিরে একটি কাহিনী আছে। কাহিনীটিতে শিব যে সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর তা প্রতিপন্নের চেষ্টা হয়েছে।

সুদূরাতীত কালের কোন এক সময়ে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কলহ উপস্থিত হলো।

বহুদিন ধরে চললো দ্বন্দ্ব। জগতের জীবকুলের অশেষ দুঃখ দুর্দশা ঘটলো।

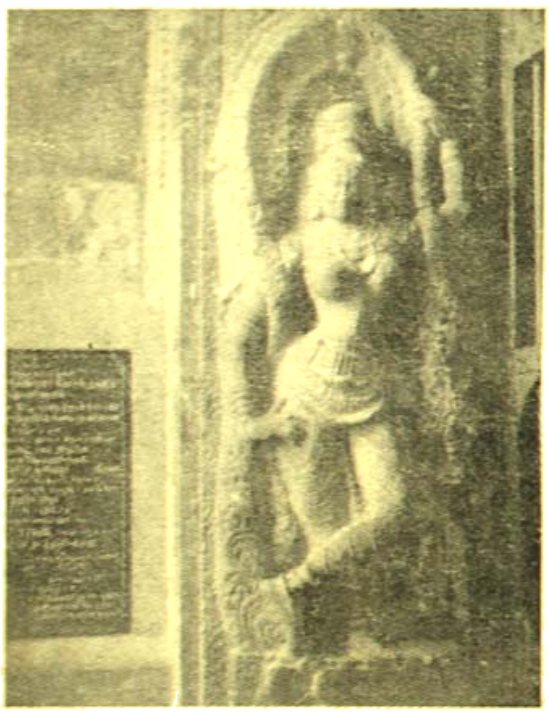

মুখ্য প্রবেশপথের মোহিনী মূর্তি

—অরুণাচলেশ্বর মন্দির

অবশেষে দেবতারা শিবকে ওই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে দিতে অনুরোধ করলেন।

শিব এক স্তম্ভ বা জ্যোতিস্তম্ভের আকারে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। এক দৈববাণী বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাকে জ্যোতিস্তম্ভটির মূল এবং শীর্ষ নিরূপণ করতে আহ্বান জানালো।

নিজেদের দ্বন্দ্ব ভুলে স্তম্ভের আদি এবং অন্ত আবিষ্কারের চেষ্টায় রত হলেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু।

বরাহ-রূপ ধরে বিষ্ণু ক্ষিতি বিদীর্ণ করে, ভূগর্ভে মূল অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

ব্রহ্মা ব্যোম মার্গে ধাবিত হলেন হংসরূপে.—শীর্ষ সন্ধানে।

বিষ্ণু বহু চেষ্টাতেও মূল খুঁজে না পেয়ে সিদ্ধান্ত করলেন যে, ঐ জ্যোতির উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার অসম্ভব। তিনি আত্মস্থ হয়ে অনুভব করলেন যে, ঐ জ্যোতি তাঁর নিজ চক্ষুতেই উৎপন্ন।

হংসরূপী ব্রহ্মা উড়তে উড়তে বহুজগৎ, অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি পার হয়েও ঐ আলোকের প্রান্ত খুঁজে পেলেন না। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো মহাশূন্য হতে একগুচ্ছ আলোকময় কেতকী মর্ত্যের দিকে নেমে যাচ্ছে। ব্রহ্মা একটি অভিসন্ধি করে গুচ্ছটি ধরে নিলেন এবং মর্ত্যে ফিরে বিষ্ণুকে কেতকীগুলি দেখিয়ে বললেন যে, তিনি জ্যোতিস্তম্ভের শীর্ষ হতে কেতকীগুচ্ছটি নিয়ে এসেছেন।

বিষ্ণু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি সেই জ্যোতির্ময় স্তম্ভের স্তব করে বললেন: হে জ্যোতির্ময়, হে অনাদি অনন্ত, আপনি কিরূপে আপনার শীর্ষপ্রান্ত ব্রহ্মাকে দর্শন করালেন! পক্ষান্তরে, আমাকে মূল দর্শন করতে দিলেন না। তখন সেই জ্যোতিস্তম্ভ হতে মহাদেব স্ব-রূপে আবির্ভূত হয়ে বললেন: বিষ্ণু, আপনিই দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নিজের মিথ্যা ভাষণের জন্য মহাদেবকে বিরক্ত দেখে ব্রহ্মার অত্যন্ত লজ্জা ও মর্মপীড়া উপস্থিত হলো। তিনি দেবাদিদেবের স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। মহেশ্বর প্রীত হলেন।

ঐ সময় থেকে অরুণাচলম-এ স্বয়ম্ভু তেজোলিঙ্গরূপে বিরাজমান হলেন দেবাদিদেব।

কার্তিক মাসের নির্দিষ্ট একটি তিথির রাতে, পূজাকালে, অরুণাচলম্ শীর্ষে এক আলোকশিখা রূপে তাঁর প্রকাশ ঘটতো।

কাহিনীটি অবশ্যই পৌরাণিক যুগে হিন্দুর অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের এক সিদ্ধান্তকে রূপক-মাধ্যমে সর্বসাধারণের অবগতির উদ্দেশ্যে রচিত।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মতে আমাদের পরিদৃশ্যমান এই

অরুণাচলেশ্বর মন্দিরে অঙ্গসজ্জা
—তিরুবণ্ণামলৈ

জগৎ পঞ্চ মহাভূত দ্বারা গঠিত। পঞ্চ মহাভূত আমরা সাধারণ জ্ঞানে মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও মাথার উপরের নীল আকাশ মনে করি। কিন্তু এগুলি নয়নগ্রাহ্য ভূত মাত্র,—মহাভূত নয়। পক্ষান্তরে, মহাভূত দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়।

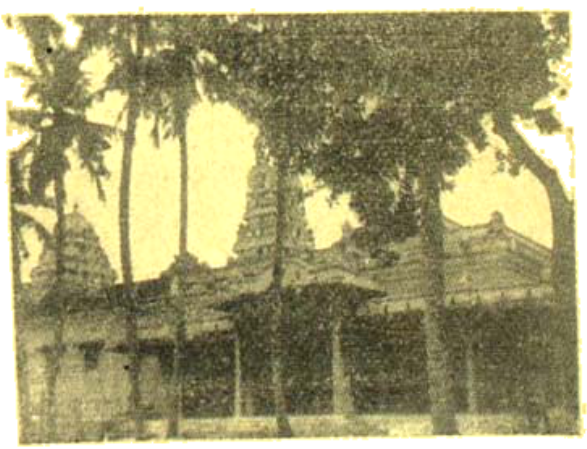

মহর্ষি রমণের আশ্রম —তিরুবণ্ণামলৈ

ভূত অর্থে বা হয়েছে বা জন্মেছে। ওই জন্ম অপরের সাহায্য বা মিশ্রণ সাপেক্ষ। কিন্তু মহাভূত স্বয়ম্ভু। মাটি অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বা দর্শনোক্ত ক্ষিতি মহাভূত নয়। কারণ, স্থূল নয়নগ্রাহ্য মাটি মিশ্রণ দ্বারা তাই। মাটিতে অপ-এর (জলের) উপস্থিতি আছে। পদার্থের গন্ধ উৎপাদন-কারী কারণ বা গুণটিই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ক্ষিতি মহাভূত। ঐ গুণ স্বয়ম্ভু।

আমরা যে জল পান করি তা দর্শনোক্ত অপ্ নয়। পদার্থের রসাত্মক গুণটিই অপ্। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জল, মহাভূত অপ্ নয়।

তেমনি, আগুন বা সূর্যালোক তেজ মহাভূত নয়। পদার্থের স্বীয় রূপ উৎপাদনকারী গুণটিই তেজ মহাভূত, যার অপর নাম জ্যোতিঃ।

ওই রূপ-উৎপাদনকারী চক্ষুঃ অতীত সূক্ষ্ম সত্তা বা গুণটির নয়নগ্রাহ্য স্থূল বহিঃপ্রকাশই অগ্নি, সূর্য ইত্যাদির আলোক।

জ্যোতি বা তেজ মহাভূত প্রতি পদার্থে বর্তমান। জীবমাত্রেরই অক্ষিগোলকে ওই জ্যোতি বিদ্যমান। দৃষ্ট পদার্থের স্ব-উৎসারিত ঐ জ্যোতির এবং অক্ষিগোলকের জ্যোতির মিলনের ফলেই দৃষ্ট পদার্থের রূপ প্রতিভাত হয়,—জগৎ প্রকাশিত হয়।

সূর্যাদির আলোকময় রূপ ওই ভাবে প্রকটিত।

[আধুনিক বস্তু বিজ্ঞানের মতে Light = 'the agency by means of which a viewed object influences the observer's eye'

উক্ত agency কথাটিই সুপ্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের 'জ্যোতি'কে ভাবান্তরে সূচিত করছে। অবশ্য ঐ agency বা জ্যোতিটির উৎসারণ দৃষ্ট বস্তু থেকেই ঘটে এ কথা light শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আধুনিক বস্তু বিজ্ঞানের সূত্রটিতে বলা হয়নি। তবু, আলোকিত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বস্তুবিজ্ঞানের উক্তিটির একটা মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় বিজ্ঞানেই একমত যে, একটি দৃষ্ট বস্তু যে গুণের দ্বারা বা যে সত্তার দ্বারা দর্শকের দৃষ্টিকে প্রভাবিত করে তাই হলো আলোক (জ্যোতি)।]

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পার্থিব বস্তু তথা কোটি কোটি মাইল দূরের

গ্রহনক্ষত্রাদিও ঐ তেজ বা জ্যোতির সাহায্যেই প্রকাশিত। জড় জগতের অর্থাৎ ভৌতিক জগতের সকল বস্তুরই আদি এবং অন্ত পরমাণু। (একটি বস্তুকে ভাঙতে ভাঙতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে যে অন্তিম অবস্থা হয় তা পরমাণু। সুতরাং পরমাণু—অন্ত।

আবার ঐ অন্তিম ক্ষুদ্রাবস্থায় বা পরমাণুর সমন্বয়েই বস্তু গঠিত হয়। অতএব, পরমাণু—আদি।)

কিন্তু একটি গুণ অবশ্যই পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত হয় না। সুতরাং, আলোচ্য রূপ-উৎপাদনকারী গুণটি (বা জ্যোতি) পরমাণু দ্বারা গঠিত নয়।

পক্ষান্তরে, পরমাণুই ঐ রূপ সৃষ্টিকারী গুণ সমন্বিত হতে, জ্যোতির সাহায্যে প্রকাশিত।

ভূত বা তার আদি তথা অন্তস্বরূপ যে পরমাণু তা ব্যতিরেকেই বিদ্যমান ওই জ্যোতি, তাই অনাদি অনন্ত। অণু পরমাণু ছাড়াই উদ্ভূত,—তাই ভূত নয় অর্থাৎ, জাত নয়। ওই জ্যোতি স্বয়ম্ভু।

জ্যোতি (তেজ) ভূত নয়, মহাভূত,—ভূতনাথ।

উপাখ্যানটিতে বর্ণিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অবশ্যই রূপক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির ত্রিগুণ। ওই ত্রিগুণ যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব।

জীবকুলের ধী সত্ত্বগুণেরই প্রকাশ। ধী বা বুদ্ধি সৃষ্টির রক্ষাকারী। বিষ্ণু সৃষ্টিরক্ষা করেন অতএব, বিষ্ণুই ধী বা বুদ্ধি।

বুদ্ধি হতে অহংকারের উৎপত্তি। অহংকার (দর্শনোক্ত 'অহং তত্ত্ব') স্থূল জগতের স্রষ্টা। যেহেতু ব্রহ্মা স্থূলজগতের সৃষ্টিকর্তা তাই ব্রহ্মা,—অহংকার।

বুদ্ধি বা অহংকার দ্বারা স্বয়ম্ভূজ্যোতির আদি-অন্ত নিরূপণ সম্ভব নয় এই কথাটিই পৌরাণিক কাহিনীটিতে বলা হয়েছে।

আদ্যন্ত হীন, জগৎ-প্রকাশক ওই জ্যোতিকে তেজোলিঙ্গ আখ্যায় পূজা করা হয় শিবমন্দিরে।

---

*[হিন্দুর অন্যান্য চিন্তা কিন্তু ওখানেই থেমে যায় নি। ঐ জ্যোতিরূপে উপাসিত ঈশ্বরকে 'পরম' বলা হয়নি। কারণ, ঐ জ্যোতি চক্ষুর অতীত হলেও সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়াতীত নয়,—মন নামক ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা তাঁর চিন্তা করতে পারছি। তাই স্বয়ম্ভু হলেও, মহাভূত হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন।

ওঁর উপরে আছেন (নির্গুণ) ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের ধারণা আমরা করতে পারি না,—তাঁর মনন সম্ভব নয়। কারণ হিসাবে, আর্ষ ঋষি, বলেছেন যে, মন তো তাঁর হতেই বিকশিত, কাজেই মন নিজে যা থেকে প্রকাশিত তাকে সে প্রকাশ করবে কি করে?

তাহলে তাঁর স্বরূপ কি?—

দ্রষ্টা তখন বলেছেন :

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

—মন দ্বারা যাঁর চিন্তা করা যায় না, মন যাঁর হতে প্রকাশিত, তাঁকেই (নির্গুণ) ব্রহ্ম বলে জানবে। (এই) যাঁকে উপাসনা করো তাঁকে নয়।]

বাংলা সাহিত্যে শীত

শ্রীঅতুলেন্দু গুপ্ত

নিসর্গ দর্শন বোধহয় আমাদের কবিদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই। নতুবা তাঁরা ইংরাজী সাহিত্যের শীতকে বাংলা দেশে আমদানী করেন কেন? পত্রহীন, পুষ্পহীন, পক্ষীহীন যে শীত, সে তো আমাদের দেশের নয়। যে বর্ণনা বিলাতের শীত সম্বন্ধে খাটে তা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে চালানো হয় কেন? আমরা কি ইংরাজী নকলনবীশ হয়ে এতটা অধঃপাতে গেছি যে চক্ষু মেলে নিজের দেশের প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখি না, অন্ধভাবে ইংরাজী-সাহিত্যের অনুকরণ করি?

এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত কবিগণ হেমন্ত ও শীতের কী বর্ণনা দিয়েছেন সেটা একবার দেখা যাক। জনৈক লেখক শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "হেমন্তে বৃক্ষাদি পত্রলজ্জা ত্যাগ করিয়া তপোমূর্তি ধারণ করে।"

এইখানে আমার প্রশ্ন, শতপথ ব্রাহ্মণ যখন রচিত হয়েছিল তখন আর্যদের বাস কোথায় ছিল, ভারতবর্ষে না মেরুদেশে? তিলকের মতে আর্যদের আদিম বাসস্থান ছিল সুমেরু অঞ্চলে। সেখানকার হেমন্ত ঋতুর সঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের বর্ণনা মিলতে পারে। কিন্তু ভারতের হেমন্ত ঋতুকে পত্র সজ্জাহীন বলে বর্ণনা করা যায় না। পাহাড় অঞ্চলে অবশ্য ভিন্ন কথা, আমি সমতলভূমির কথা বলছি। কালিদাস তাঁর ঋতুসংহারে এই সমতল ভূমির ঋতুসমূহই বর্ণনা করেছেন। তিনি হেমন্ত বা শীত ঋতুকে কোথাও পুষ্প-পত্রহীন বলেন নাই। "কমল-বনে বিলীন প্রায়" বলেও বলেছেন, "শালি ধান্য পক্ক এবে, লোধ্র পুষ্প ফুল্ল আজ।" হেমন্তকালে "প্রফুল্ল নীলোৎপল শোভিত" সরোবরে বক ও হাঁসের সমাগমও তিনি দেখতে পেয়েছেন। শীতের বর্ণনাতেও ফুলের মধু ও ফুলের মালা বাদ যায় নাই।

সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক প্রাচীন সাহিত্যে হেমন্ত ও শীতের কী মূর্তি আঁকা হয়েছে তা বিস্তারিত রূপে পর্যালোচনা করে দেখতে পারেন। আমার সে বিদ্যা নাই বলে চেষ্টা করলাম না। হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তবু একটা প্রশ্ন করি। পাতা-ঝরা শরৎ বা হেমন্ত আমাদের দেশের প্রকৃতির চেহারা নয়, তবুও হিন্দীতে শরৎ ঋতুকে 'পাতিঝর' বলে কেন? এটাও কি ইংরাজীর নকল? (Patijhar = autumn, popular Dictionary, p. 156, Malhotra's Golden pocket Dictionary, 1964 ed. p 65)

সেদিন একটি পত্রিকায় এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়লাম, "Why Leaves fall in Autumn," এ নিয়ে বিলাতে উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদের গবেষণা এ দেশী বৈজ্ঞানিক নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছেন। লক্ষ্য করেন নাই, যে পরীক্ষালব্ধ ফল বিলাতের মাটিতে সত্য তা ভারতের মাটিতে সত্য নাও হ'তে পারে। ছেলেবেলায় আমরা বহুগোপাল চট্টোপাধ্যায় রচিত পদ্যপাঠে (১ম ভাগ) ভ্রমর ও প্রজাপতির কবিতা পড়েছি। সেখানে শীতের বর্ণনায় বলা হয়েছে, "পাইয়া শিশির জল, সঙ্কুচিত তরুদল, নাহি ধরে ফুল ফল, নিরানন্দ বনস্থল, পাখী নাহি সখী সনে করে কলরব।" প্রজাপতি কোথাও মধু খুঁজে পাচ্ছে না, এমনই সর্বনাশা শীত। অথচ আমাদের দেশে শীতকালে বাগানে এবং শস্যক্ষেত্রে প্রচুর ফুল ফোটে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় মধুলোভে প্রজাপতির সমারোহ এবং শস্যলোভে অজস্র আগন্তুক পাখীর ভিড়। বরফপড়া শীতের দেশ ছেড়ে হাজার হাজার পাখী নাতিশীত ভারতবর্ষে আশ্রয় নেয় এবং বর্ণচ্ছটায় ও কাকলীতে আমাদের আকাশ বাতাস ভরে তোলে। পক্ষীতত্ত্ববিদ্ মাত্রেই সে কথা জানেন, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই তা দেখতে পান। আমার প্রস্ফুটিত বাগানে এই ঘোর শীতেও আমি রোজ কোকিল ও কোকিলা দেখতে পাচ্ছি করবীর গোটা মধ্যাহ্নে খুঁটে খাচ্ছে। তাই বলি পক্ষীহীন, পুষ্পহীন শীত আমাদের নয়।

আসলে পদ্যপাঠের কবিতাটি বহুগোপালবাবু ইংরাজী

থেকে নিয়েছেন। কিন্তু শিশুবয়সে আমাদের চেনাশোনা প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে পরিচয় না করিয়ে দিয়ে কবি যদি বিদেশ থেকে ঋতুবর্ণনা আমদানী করেন, তবে তা বিভ্রান্তি-কর হয় না কি? ছেলেবেলায় এই কবিতাটি পড়ার পর শীত সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা আমার বহুদিন ছিল। বাংলাদেশের কবিগণের সে ধারণা এখনও যায় নাই। কবিতা লিখতে গিয়ে সকলেই ছেলেবেলায়-পড়া যদু-গোপালবাবুর সেই কবিতাটি প্রায় হুবহু উদ্ধৃত করে দেন।

অন্যে পরে কা কথা! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবর্ণনায় লিখেছেন—

দেখ এল হেমন্তের দিন,
কুহেলী বিলীন কৃষণ বিহীন।

কৃষণ বিহীন হেমন্ত কি আমাদের দেশের? লেখার সময় কবি বোধহয় দার্জিলিংয়ে ছিলেন। তাই তাঁর শীত বর্ণনাও অনুরূপ হয়েছে—

পাখী বলে আমি চলিলাম,
ফুল বলে আমি ফুটিব না,
মলয় কহিয়া গেল শুধু
বনে বনে আমি ছুটিব না।
কিশলয় মাথাটি না তোলে
মরিয়া পড়িয়া গেল ঝরি'
সন্ধ্যা আসি ধূম্রবাস তার
টানি দিল মাথার উপরি।

এই যে ফুল-না-ফোটা, পাখী-না-ডাকা, কিশলয়-ঝরে-যাওয়া শীত, এটা কবি বাংলাদেশে হিমালয় ছাড়া কোথায় পেলেন?

রবীন্দ্রনাথ যে পথ দেখিয়ে গেছেন, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কবিরা নির্বিবাদে সেই পথেই চলেছেন। তার নমুনা পূর্বেই দিয়েছি, "যত কিশলয় সব গেছে ঝরে।" পরে বেবাক্কা ঠেকাতে বদলে দিয়ে লিখলাম, "যত শেফালিকা সব গেছে ঝরে।" কিন্তু বাংলাদেশের কবি-কুলের এ জ্ঞানোদয় এখনও হয় নাই। এই তো সেদিন সমরেশ বসু লিখেছেন—

"এবার? এবার তো শীত এলো।
পাখী তুই ফিরে যা।"

এই ঘোর শীতে প্রকৃতির অঙ্গে কোথাও ফুল লতা-পাতা নেই, আছে তা শুধু শীতের কাঁথায় আঁকা।

"পাখী, সেই দেখে যেন ডাকিস না···

কিন্তু পাখীটা ডাকছে কেন? বারণ করেছিলাম যে!

ওহ!! পাখীটা না, ওর প্রতিধ্বনি এখনও বাজছে।" অর্থাৎ পাখীটা শীতের সুরুতেই পালিয়ে গেছে, শুধু তার ডাকের প্রতিধ্বনি এখনও কবির কানে বাজছে। কবি মনোকর্ণে না শুনছেন, বাস্তবে তা নেই। অথচ একটু কষ্ট করে চোখ কান খুললেই তিনি দেখতে পেতেন শীতের পাখী সশরীরে প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান, এবং তাদের কিচির মিচির শুনবার জন্য মনোকর্ণের প্রয়োজন নাই, সাধারণ কর্ণই যথেষ্ট!

তারপর দেখুন দিনেশ দাসের কবিতা, "শেষ কার্তিকের হাওয়া"। একেবারে শেলীর Ode to the Western windএ বর্ণিত ইংরোপের ভয়াবহ দুর্জয় শীতের চেহারা:—

"শুধু কান্না নিয়ে এল কার্তিকের হাওয়া
দীর্ঘশ্বাস গৃহস্থের অঙ্গনে অঙ্গনে
পাতায় হলুদ রং ধরে
ফুলের পাপড়ি, কুঁড়ি ঝরে অকারণে।
পার্ক থেকে পাখীগুলো উড়ে গেল প্রায় সব
তাদের শেষের গান ঝরে পড়ে শুকনো ফুলের মত।
মরা ডালে শিরশিরে হাওয়া বাসা বাঁধে
গাছগুলো চুপচাপ একা একা আহত, আনত।
সকালের সাদা কুয়াশায়
কালো কালো ছায়ার মতই কাক সাঁতরায়:
কখনও বা পাতা ঝরা নিমগাছে বসে
একটানা ডাকে আর যন্ত্রণা ছড়ায়।
বিকেল না হ'তে হ'তে ছায়া মেলে ডালপালা,
কুয়াশা পাতার রাত্রি স্মৃতি হয়ে জাগে—
ঈশ্বর কি তবে মৃত?
পৃথিবীর কাঁদবার পালা।"

বাঙালী বাবু-কবি কলিকাতার শীতেই কাবু। হায়, কেমন করে তাঁদের বোঝাই শীতের যে করাল রিক্ত মূর্তি তাঁরা আঁকেন ভারতবর্ষে তা সত্য নয়। এখানকার শীত

ফলে ফুলে পল্লবে শব্দে পাখী ও প্রজাপতিতে সমৃদ্ধ। বিশেষতঃ বাংলা দেশে।

আবার মহম্মদ মিত্র লিখছেন,

"পাতারা কোথায় যায়"—

পাতারা কোথায় যায়! পাতাদের দেহে
কি এক যন্ত্রণা আছে, হাওয়ায় হাওয়ায়
মৃত ইচ্ছারা ভাসে স্বরচিত স্নেহে
গাছেরা আকাশ ছোঁয় পাতার বিভায়
রক্তের সংকেত টুকু কেবা রাখে মনে
জানে না অচ্ছায় গাছ পাতারা কোথায়।

যে ঋতুতে কবি এই প্রশ্ন করছেন, তার জবাব চোখ মেললে তিনি নিজেই দেখতে পেতেন। চোখ বুজে কবিতা লিখতে লিখতে তিনি জানতে চেয়েছেন, "পাতারা কোথায় যায়?" চোখ খুলে দেখুন না কেন শীতের সময় পাতারা প্রায় সকলেই যথাস্থানে আছে, ডালে ডালে। তাদের ঝরার সময় বসন্ত কাল। ফাল্গুন মাসে আমরা প্রতি বছরই দেখি নিমপাতা, বটপাতা, অশ্বত্থপাতা, আমপাতা বেলপাতা, মহুয়াপাতা, ইত্যাদি রাস্তার ধারে স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে, অথচ কোঁটিয়ে দেবার লোক নাই। ঝাড়ুদারেরা তখন মিউনিসিপাল কমিশনারদের বাংলোর ঝরাপাতা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত, পাবলিক রোড সাফ করার ফুরসৎ তাদের কোথায়? তাগিস কড়াই মটর ভাজিয়েরা সেই পাতা সযত্নে কুড়িয়ে বোঝা বেঁধে নিয়ে যায়, নতুবা বসন্তঋতুতে জন সাধারণের পর্ণসমাধি ঘটত সন্দেহ নাই। কবিরা যদি তাঁদের কল্পনার কুজ্ঝটিকা ভেদ করে এ দৃশ্য দেখতে না পান তবে আমার কাছে জেনে নিন, আমি চর্মচক্ষে প্রতিবৎসরই এটা দেখতে পাই।

কবিরা না হয়, কল্পনায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকেন, প্রকৃতির প্রকৃত রূপ দেখতে না পেয়ে মনগড়া বর্ণনা রচনা করেন। কিন্তু গদ্য লেখকরাও কি তাই? "বিষন্ন ঋতু" প্রবন্ধে লেখক লিখছেন—

"অগ্রহায়ণ আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে আসিয়াছে শীতের দক্ষিণ হাওয়া।...শীতের চেহারাটাই আসলে ঈষৎ বিষন্ন। ঘড়ির কাঁটা যতই সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে, পৃথিবীর চেহারাও যেন ধীরে ধীরে ধূসর হইয়া যায়। দুপুরের শুব্ধতায় নিঃসঙ্গ কাকের কণ্ঠস্বরকেও তখন বড় করুণ বড় ক্লান্ত মনে হয়।"

এ যেন সেই "পাখী বলে আমি চলিলাম" এর প্রতিধ্বনি। লেখকের মনে বোধহয় snow queen গল্পে বর্ণিত বরফের উপর নিঃসঙ্গ কাকের চিত্র ফুটে উঠেছিল। সম্পাদককে বলি, এ দেশে শীতের বিহঙ্গজীবন মোটেই নিঃসঙ্গ নয়। পক্ষীতত্ত্ববিদ প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত তো কলিকাতাতেই থাকেন, তাঁকে একবার প্রশ্ন করে দেখুন। অথবা চোখ মেলে নিজেই দেখুন। দেখুন দেখি শীতের কলিকাতায় কিঙা, হাঁড়িচাচা, কানাকুয়া, টিয়া, নীলকণ্ঠ, হলুদে পাখী, বাশপাতি, বুলবুল, বালিহাঁস, মৌচুরী ইত্যাদি অজস্র পাখী আসে কিনা? খাস কলিকাতার না পান, শহরতলী অঞ্চলে তো নিশ্চয় পাবেন।

লেখক ঐ একই সুরে আবার লিখছেন—

"হাওয়ার তলোয়ারে শান পড়িয়াছে, ময়দানে গাছের পাতা পড়িতেছে।... দিনের আলো হঠাৎ নিভিয়া যাওয়ার মধ্যে যে একটা গভীর বিষন্নতার ছোঁয়া আছে" ইত্যাদি।

আমি বলি না যে শীতকালে কোনো গাছের পাতা ঝরে না। কিন্তু যেটুকু ঝরে তা বসন্তকালের তুলনায় কিছুই নয়। শীতে যদি নিমপাতা পড়ে শতকরা পাঁচ ভাগ, বসন্ত আসতে আসতে ঝরে যায় বাকী পঁচানব্বই ভাগ।

পাটনায় আমাদের বাড়ীতে এক সার নিমগাছ আছে: ফাল্গুন মাসে সারা খেলার মাঠ পাকা নিমপাতায় ভরে যেতে আমরা সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। নিজের চক্ষুকে তো আর অন্যের কথায় অবিশ্বাস করতে পারি না। শীত ঋতুতে নিষ্পত্র হয় যে গুটি কয়েক গাছ, তার মধ্যে পাই শুধু জিওল গাছ এবং আর একটা নাম না জানা বুনো গাছ। শেষোক্ত গাছটি সম্বন্ধে অনেককে প্রশ্ন করে শেষে জানতে পারলাম হিন্দীতে ওকে বলে গর্মদার গাছ। দানাপুরে দোনা নালার পাশে পাশে কয়েকটা আছে। শীতকালে জামরুল ও আমড়ার পাতা হলুদ হতে সুরু করে, কিন্তু ঝরে শীতের প্রায় শেষে। আমলকীর এবং শিমুলের বেশ কিছুটা পাতা শীতেই ঝরে যায়। এই গোণা গুণতি কয়েকটি গাছ নিয়ে তো আর শীতের বর্ণনা হয় না। শীতের গাছ সাধারণতঃ সবুজ

পল্লবিতই থাকে। শীতেই ফোটে ফুলের রাণী গোলাপ। অতসী, কুন্দ, মৌলফ জবা, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদির বর্ণসমারোহ শীতকালেই। ফুলের প্রদর্শনী, ফুলের প্রতিযোগিতা সমস্তই পৌষমাসে হয়। শীতে শস্যের প্রাচুর্য তো সর্বজনবিদিত। যে কথা সকলেই জানেন ও স্বচক্ষে দেখতে পান, অপরকে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে কেন জানি না। ঐ লেখক পরে তাঁর পূর্বধারণা সংশোধন করে বলেছেন—

"শীত ঋতুকে, অন্ততঃ বাংলা দেশে, জরাগ্রস্ত ও পক্ষকেশ এক বৃদ্ধ বলিয়া কল্পনা না করিলেও চলে। শীতে নিমের মাথা পাতা ঝরাইয়া নেড়া হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গেই দেখা যাইবে রক্তকরবী আর বকুলের পল্লব সমারোহ একটুও ফাঁকা হইয়া যায় নাই। তবু স্বীকার করিতে হইবে ফুল ও কিশলয় বিশেষভাবে বসন্ত ঋতুরই অভিধি।"

এ যেন ভয়ে ভয়ে শীত ঋতুর কাছে পাওয়া ফুল ফল উপহারের জন্য কুণ্ঠিত ধন্যবাদ। কিন্তু এই "কিন্তু-কিন্তু" ভাব কেন? শীতের মহিমা জোর গলায় ঘোষণা করার সংসাহসের অভাব? অন্য লেখকদের দিকে তাকিয়ে লেখক বোধহয় Precedence (নজীর) খুঁজছেন, পাচ্ছেন না বলে দ্বিধাগ্রস্ত। লিখতে গিয়েও কলম সরছে না, পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে।

সম্প্রতি দেখতে পেলাম, বিমল ঘোষ (মৌমাছি) লিখছেন, "গ্রামে যাবার সব চেয়ে ভাল সময় এই শীতকালটাই—এখন গ্রাম দেশে সবার ঘরেই নতুন চাল, নতুন গুড়, আলু কপি কড়াইশুঁটির ভাল ভরপুর।" অন্যত্র, "শুধু যে তাহলে পৌষ সংক্রান্তির পিঠে খেয়েই পেট ভরবে তা নয়, মনও ভরবে চোখও জুড়োবে—মাঘের কুয়াশা মাখা ভোরে রোদে কপি কড়াইশুঁটির ক্ষেত দেখে, মাঘের সকালের মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে।"

আর এক জায়গায় এক লেখক লিখেছেন "শীত যাহাকে রিক্ত করিয়া দিয়াছিল, সেই পৃথিবীকে সে (বসন্ত ঋতু) এবার পত্র পুষ্পে নূতন করিয়া সাজাইয়া তোলে।"

লেখককে ভেবে দেখতে বলি, শীত ঋতু যদি এতই বৈভবময় হয়, তবে চাষারা কেন বলে, 'এলো পৌষ যেও না?' কেনই বা লোকে কথায় বলে, কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ? প্রাচুর্যের ঋতু বলেই শীতকালে পৌষপার্বণ হয় এবং তা প্রবাদ বাক্যে দাঁড়িয়েছে।

প্রত্যেক কার্তিক অগ্রহায়ণ পৌষে কলিকাতার মৃদু শীতে অতিরিক্ত হা হুতাশ করা কবিদের মধ্যে একটা এপিডেমিক অথবা গতানুগতিক ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের লেখা পড়লে মনে হয় শীতের তথাকথিত রিক্ততা ও সংহার মূর্তি যেন তার ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বাংলা দেশে অনধিকার প্রবেশ করেছে। শীত এলেই চারদিকে গেল গেল রব উঠে যায়। ফুল গেল, পাতা গেল, পাখী গেল, সবই গেল। যদি সবই যায় তবে শুধু বরফপড়াটুকু বাকী থাকে কেন? কল্পনার দৌলতে সেটাও আমদানী করুন বঙ্গকবিবৃন্দ!

এই কল্পনাদর্বস্ব কবিকুলের গড্ডলিকা প্রবাহে মিশে গিয়ে আমাদের মতো ক্ষুদ্র লেখকের চিন্তার স্বাধীনতা লোপ পেতে বসেছে। এর প্রতিবাদে আমি আমার ছাত্রদের একবার একটা রচনা লিখিয়েছিলাম। তাতে গতানুগতিকতা ত্যাগ করে দৃঢ় ভাষায় শীতের জয়গান করেছিলাম। মূল ইংরাজী রচনার কয়েক লাইন অনুবাদ করে প্রবন্ধ শেষ করি :—

"শীতকালে যত ফুলের বর্ণ সমারোহ এমন আর কোনও ঋতুতে নয়। ফুলের রাণী গোলাপ এই সময়ে ফোটে। সেদিন রাজেন্দ্রনগরে মিনার্ভা নার্সারীর গোলাপবাগান দেখলাম। লাল, সাদা, হলুদ, গোলাপী গোলাপের ছড়াছড়ি দেখে মনে হল, হায়, কবিকুল বসন্তের গুণ-গানেই বিভোর। একবার শীতের ঐশ্বর্যের দিকে ফিরেও তাকান না! সৌন্দর্যে ও প্রাচুর্যে ভরপুর এমন ঋতু আর কোথায় আছে?

"গোলাপের পরই আমার ভাল লাগে "স্বর্ণবৃষ্টি" নামধেয় সুন্দর লতাটি। বাগানের বেড়ায় ভরন্তায়িত স্বর্ণের স্রোত বইয়ে দেয় এই লতার কুসুম স্তবক। পৌষ মাসে একবার পাটনা হাইকোর্টে গিয়ে দেখুন, প্রত্যেক আদালায় সোনার হার দুলছে আর উকীল মক্কেলদের নীরস কাজে কিছুটা সরসতা আমদানী করছে।

"শীতের পাখীর কথাই বা কত বলব? কবিদের প্রিয় কোকিল শীতেও দেখা যায় কিন্তু বড় একটা

ডাকে না। আর ডাকলেও খুব কুহু নয়, কিন্ কিন্! কিন্তু তাতে কী? প্রকৃতির ভাণ্ডারে আরও অজস্র পাখী আছে যারা সংগীতে ও বর্ণচ্ছটায় শীতের দিনগুলি আমোদিত করে। নীলকণ্ঠ ও মাছরাঙা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় ময়ূরকেও হার মানায়। হলদে পাখী দেখতেও সোনালী হলদে, স্বরও সুমিষ্ট। প্রকৃতির গ্র্যাণ্ড অর্কেস্ট্রা বাজাতে আসে আরও অনেক পাখী নানা বিচিত্র সুরের পর্দা কণ্ঠে নিয়ে। কয়েকটা শীতের পাখীও তাদের কণ্ঠস্বরের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

বসন্ত বৌরী (বসন্তের পূর্বেই আসে):—কুড়রুক—কুড়রুক!

জোকারে পাখী:—পিপ্-পিপ্!

কিঙা:—টুইট্-টুইট্!

হুপো ("বনফুল"-এর নামর দিয়েছেন "মোহনচূড়া"):—হুপো পো!

কানাকুয়া:—গুপ্ গুপ্!

বুলবুল:—কি কি উ!

ঘুঘু:—কু-কুউ-কুঃ!

হাঁড়ি চাচা:—কে-কে-কে!

টিয়া:—টে-টে-টে!

দোয়েল:—(সুন্দর শিস্ দেয়, আওয়াজ অনুকরণীয়)।

"ফুলের মধু এবং পাখীর গানে যদি আপনার পেট না ভরে, তবে ধানাপুরের দীয়ারা অঞ্চলের গ্রামে গিয়ে দেখে আসুন শীতের ফসলে কত রকম শস্যের প্রাচুর্য। যদি কখনও ধান গমের অবস্থা হয় তথাপি দীয়ারার লোকে না খেয়ে মরে না। শীতের হরেকরকম সবজী তো তারা ফলায়ই, তাছাড়া ধানের বিকল্পও বহুবিধ: শামা, চীনা, কৌনী, মৌনী, কোদো, মহুয়া—জিনোর, শকরকন্দ, সুথনী ইত্যাদি। কালোবাজারীরা যতই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করুক না কেন, প্রকৃতি এখনও অকৃপণ হাতে তাঁর শস্য-সম্ভার ঢেলে দিয়েছেন এই দীয়ারার নদীচরে।

"ধানের বিকল্পে যত শস্য হয় সে সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য ছড়া প্রচলিত আছে। গোঁদাই-চৌধার এক চাষার মুখে শোনা সেই ছড়াটি পাঠকবর্গকে এখানে উপহার দিলাম—

কৌনী সৌনী আংনা ভুলৌনী
শামা আধি রাত।
কোদো বেচারা ক্যা করে কী
কাটে সারা রাত।

—"অর্থাৎ কৌনী ও মৌনীর ধানা এত সহজপাচ্য যে খেয়ে আঙিনা পার হতে না হতে লোকে ভুলে যায় কী খেয়েছে। শামা ধানের চাল সন্ধ্যায় খেলে অর্ধরাত পার করে ক্ষুধা লাগে। কিন্তু কোদোর চাল খেলে সারা রাত ভরা পেটে কেটে যায়।"

"সর্বশেষে শীতের আর হাওয়ার কথা। কবিরা যখন শীতকে কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার বলে বর্ণনা করেন তখন সেটা হয় অতিরঞ্জন। শীতের তিনমাস উজ্জ্বল দিবালোকেই কাটে বেশী, মেঘলা বা কুয়াশার অন্ধকার সাময়িকভাবে পাওয়া গেলেও। শিশিরপাত হয় রোজই, কিন্তু বৃষ্টি কদাচিৎ। অধিকাংশ দিনই সূর্যের আভা আকাশের নীল স্ফটিকে ঠিকরে পড়ে। সেই সূর্যকিরণে ধারাস্নান করে শরীর মন আমোদিত করার প্রশস্ত সময় হল শীত ঋতু। হায়, আমি কবি নই, নতুবা মুক্তকণ্ঠে শীতের প্রশস্তি গাইতাম।"

পরিশিষ্ট:—

এই লেখাটি শেষ করার পর কে, এ, আব্বাসের প্রবন্ধ "If Winter Comes" (বেহার হেরা, ৫ই ২৬-১২-১৯৬৬) পড়লাম। লেখক দুঃখ করে লিখছেন বর্তমান শীতের প্রকোপে পঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি জায়গায় ঠাণ্ডায় জমে লোক মারা গিয়েছে। এই প্রদেশগুলি সমুদ্রতট থেকে দূরবর্তী হওয়ায় বাংলা ও বিহারের চেয়ে এদের শীত ও গ্রীষ্ম দুইই অপেক্ষাকৃত বেশী। তা সত্ত্বেও আব্বাস সাহেব লোকের মৃত্যুর জন্য আর হাওয়াকে ততটা দায়ী করেন নাই যতটা করেছেন আমাদের ভয়াবহ দৈন্যকে, আমাদের আর্থিক অবস্থা এমনই শোচনীয় যে জীবনধারণের উপকরণের সব কয়টিরই অভাব—বাস্তু, পরিচ্ছদ এবং আশ্রয়। অনাহারে বা আর্ধাহারে শরীর যদি দুর্বল হয় তবে পৌষের শীতই বলুন বা জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্মই বলুন শরীরের পক্ষে মারাত্মক। শুধু কি তাই? ঋতু পরিবর্তনের সময়েও, অর্থাৎ শরৎ ও বসন্তকালেও, এমন শরীর টিকতে পারে না।

অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন জীবন কোনও ঋতুতেই নিরাপদ নয়। তবে আর প্রকৃতি দেবীকে দোষ দিয়ে লাভ কী? দোষ দিতে হলে সেই সব মুনাফাখোরদিগকে দিতে হয় যারা প্রকৃতিদেবীর বদান্যতাসত্ত্বেও কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করেন এবং দরিদ্র জন সাধারণের প্রাণনাশের কারণ হন। শীতের মহিমা প্রচারের আসল অন্তরায় এরাই!

ঘুম

শৈলেন রায়

বাইরে তখনও তুমুল বৃষ্টি।

গাড়ী বারান্দার নীচে বড় গাড়িটা থামতেই ড্রাইভার পেছনের দরজা খুলে দিল। সাদা পোষাক পরা লম্বা ছিপ ছিপে যে মহিলাটি নেমে সোজা সিঁড়ি ভেঙে ওপরের দিকে পা বাড়ালো তাকে আগে কেউ এ বাড়ীতে দেখে নি।

দেখার কথাও নয়।

এসেছে এ বাড়ীর ডাকে—নেহাৎ দরকারে। নার্স সে।

বাড়ীর কর্ত্তা, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। ধনী, শিক্ষিত কিন্তু স্বাস্থ্যবান নয়। ঘুন ধরা স্বাস্থ্য তবুও টেনে টুনে এই চুয়াল্লিশ বছর চালিয়েছিলো কোন রকমে। কিন্তু আর যেন চলছেনা।

রক্তের চাপে দুদ্দুম ছট্‌ফটিয়ে উঠেছে। প্রাণান্ত হয়েছে শিল্পী নমিতার। নিজের হাতে স্বামীর সেবা করে পুণ্য অর্জন করার লোভ কতটা আছে নমিতার তা জানা যায় নি। তবে নিজের হাতে, নিজের চোখের সামনে ভাল মন্দ যা হয় হোক। তবু তো কাউকে দোষারোপ করতে হবে না সারাটা জীবন ধরে। অনেকটা এই রকম মনের ভাব নমিতার। নাওয়া খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে চেয়ার টেনে বসে আছে অমিতাভর মাথার কাছে। একান্ত যখন না পারছে আলতোভাবে পাশের খাটে শুয়ে শুয়ে তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কখনও বা চোখ বুজে কান সজাগ রেখে।

ঘুম নেই, ঘুম নেই। নমিতার চোখের ঘুম কোথায় উড়ে গেলো?

ঘুমিয়ে আছে অমিতাভ। অসুখ হ'লে ঘুম যেন তার আরও বেড়ে যায়। কোন চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, অফিসের ফাইলের জঞ্জাল নেই, লোকজনের ভীড় নেই। একটা ধীর মন্থর গতি—নিশ্চিন্ত আলস্য।

আর তা ছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, নমিতার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পরতে পারে অমিতাভ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। যত নিশ্চিন্ত হয় অমিতাভ ততই যেন উদ্বেগে ভরে ওঠে নমিতার মন। যার নিজের সম্বন্ধে কোন চিন্তা নেই—তার জন্যে চিন্তা করে করেই ঘুম নেই নমিতার চোখে।

আজ প্রায় এক মাস হ'তে চললো। ঘুম নেই নমিতার চোখে।

ঘুম নেই—ঘুম নেই।

মেয়ে তপু মাঝে মাঝে এসে মাকে তাড়া দেয়—তুমি চান করে খেয়ে এসো মা। আমি বরং বসি একটু।

কতই বা বয়স। তেরো কি চোদ্দ। এর মধ্যেই যেন কত কি বুঝতে শিখেছে। বাবার বুকে হাত বুলোতেই অমিতাভ চোখ মেলে তাকাল। হাসি ফুটে উঠলো মুখে, চোখে।

—'এখনও ব্যথা করছে?'

ঘাড় নেড়ে জানালে অমিতাভ ও তেমন কিছু নয়।

এই নিয়ম। তপু জিজ্ঞাসা করলে এই ভাবে ঘাড় নাড়ে অমিতাভ। শুধু শুধু ওর ছোট মনটা চিন্তায় ভরিয়ে দিয়ে লাভ কি? সবার চিন্তা নিজের মধ্যে টেনে নেবার জন্যে তো নমিতাই আছে। তার চিন্তা, তপুর চিন্তা—সবার চিন্তা!

নমিতা চিরদিনই এরকম। যখন বিয়ে হ'লো কতই বা বয়েস তার? ষড় জোড় ষোল কি সতেরো। সবে বিলেত থেকে ফিরেছে অমিতাভ। নমিতার বাবার টাকায়। বলতে গেলে নমিতার বাবাই গড়ে তুলেছেন অমিতাভকে। যখন শিবপুর থেকে ভালো ভাবে পাশ ক'রে বেরুলো এমন একটা দিনে এলেন চারু মাসী।

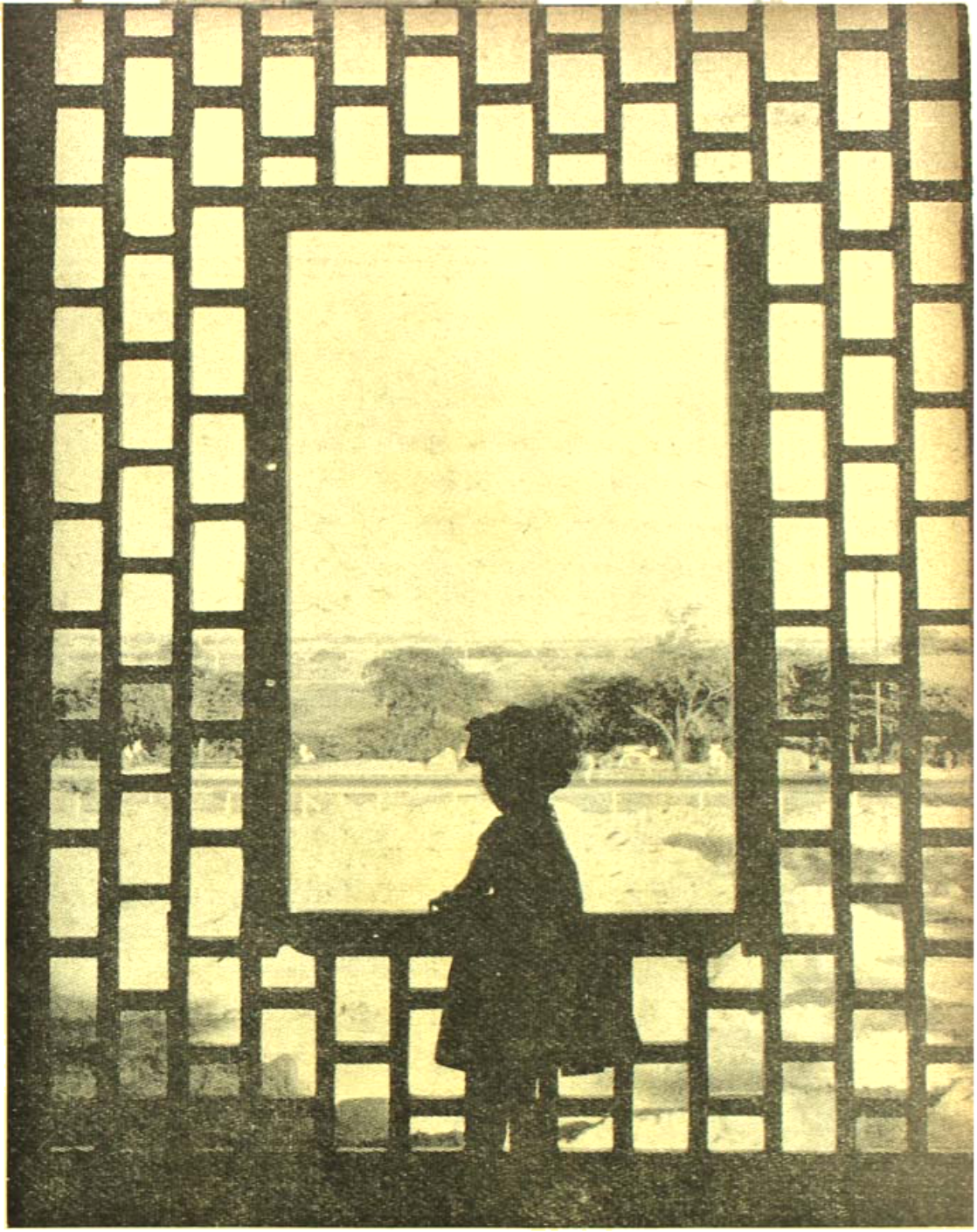

অবরুদ্ধ

ফটো : মানসরঞ্জন কুণ্ডুচৌধুরী

আলোয় কালো

ফটো : অমিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মার সম্পর্কের বোন। বিয়ের কথা নিয়ে। মেয়ে সুন্দরী লেখাপড়াও মোটামুটি জানে। সব চেয়ে বড় কথা, চারু মাসীর গলা খাদে নেমে এসেছে ততক্ষণে, অমন সাঁদালো শ্বশুর। হিরে হয়ে যাবে অমিতাভর।

সত্যি হিরে হ'য়ে গেলো অমিতাভর শ্বশুরের টাকায়। বিলেত গেলো, ফিরে এসে তাঁরই দৌলতে মোটা টাকার চাকরি হ'লো, বিধবা মায়ের মুখে হাসি ফুটলো।

কিন্তু হাসি ফুটলো না অমিতাভর মুখে।

পেছনে ফেলে আসা ক'টা দিনের স্মৃতি বার বার এভাবে সামনে এসে দাঁড়ায় কেন, গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া একটা মুখ বার বার মনের আনাচে কানাচে উঁকি মারে কেন ?

দরজার বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে বড় হাসপাতালের বড় নার্স সুপর্ণা রায়। খাটের পাশের টেবিল লাইটের আলো এসে পড়েছে রুগীর মুখে। খুব স্পষ্ট নয়—ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা। বর্ষা-ভেজা কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখার মত। অস্পষ্ট, ছায়া ছায়া।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। অপর্ণা রায় দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছে রুগীর খাটের কাছে। চোখ বুঁজে পড়ে আছে অমিতাভ। পাশে চেয়ারের ওপর বসে নমিতা তন্ময় হ'য়ে রুগীর শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করছে।

রোজই করে

নার্স নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে চার্ট তুলে নিয়েছে। ডাক্তারের নির্দেশ মনোযোগ সহকারে পড়ে নিচ্ছে।

ডাক্তার এলেন, সুপর্ণার পরিচিত, ভাল করে পরীক্ষা করে হাসিমুখে নমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন—কোন ভয় নেই। ভাল আছেন উনি। আর তাছাড়া যাঁর হাতে ওঁর ভার পরলো, আপনি এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন।

বলেই হাসিমুখে সুপর্ণার দিকে তাকালেন। সুপর্ণা ওঁর ব্যাগটা হাতে তুলে দিতে দিতে ছোট একটা 'থ্যাঙ্কউ' জানালো।

রাত তখন গভীর। সমানে বৃষ্টি পরে চলেছে তখনও। এর যেন বিরাম নেই—ছেদ নেই। ঘরের আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরের করিডরের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, আবছা আবছা আলো ভালো, করে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু অনুভব করা যায় সব কিছু।

পাশের খাটে নমিতা শুয়ে আছে। এই এক মাসের মধ্যে এভাবে শোয়নি সে কোনদিন, কেমন যেন ভরসা পেয়েছে নিজের মনে।

ঘুম আসছে। সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন ঝিমিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছে নমিতার সমস্ত চেতনা। ঘুমিয়ে পরছে নমিতা।

ছোট ছোট নিশ্বাস টাইমপিসটার তালে তালে ওঠা নামা করছে। ঘুমের ঘোরে ওপাশ ফিরেছে নমিতা। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছে তার সমস্ত চেতনা।

তা না হ'লে এক হাত দূরে একটি নাটকের শেষ অঙ্ক বিস্ময় চকিত দৃষ্টিতে দেখতে পেতো সে।

দুর্বল দু'টি হাতের মাঝে নেমে এসেছে সুপর্ণা রায়ের মুখ। কানের কাছে টাপরের অবরুদ্ধ আওয়াজের মতন ক্ষ্যাস ক্যাসে আওয়াজ—'বলো, ক্ষমা করেছো তুমি ?

আরও নীচে নেমে এসে রুগীর বুকে মাথা রেখে গভীর যত্নে দুরদুরুর ধুকধুকি শুনছে বুঝি বড় হাসপাতালের বড় নার্স সুপর্ণা রায়!

মৈমনসিংহ গীতিকা

শ্রীজগবন্ধু নাথ

আজ বাংলাসাহিত্যের ডালি ফুলেফলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু একদিনে বাংলা সাহিত্য বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিতে পারে নাই। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আসন লাভ করিয়াছে। আমরা আজ বর্তমান লইয়া ব্যস্ত। অতীতের দিকে আমরা তাকাইয়াও দেখি না। আজ আমরা অতীতকে ভুলিয়াছি। যদি একবার অতীতের বাংলা-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি; তাহা হইলে দেখিতে পাইব বাংলা সাহিত্যের অতীতের ইতিহাস আজও আমাদের আনন্দের খোরাক যোগাইতে পারে। সাহিত্যের পরিচয়ের চেয়ে বড় কথা রস। আর ঐ রসলাভে যে আনন্দ, উহাতেই সাহিত্যের সার্থকতা। অতীতের বাংলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে "মৈমনসিংহ" গীতি কবিতার কথা মনে পড়ে।

মৈমনসিংহ গীতিকবিতাগুলি শিক্ষিত সাহিত্যিকদের সৃষ্টি নহে। ঐগুলির স্রষ্টা বাংলার অশিক্ষিত গ্রাম্য কৃষক। তাহারা তাহাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম রসে মিশাইয়া ঐ গীতি-কবিতাগুলি সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ গীতি কবিতা-গুলির মধ্যে আখ্যানকাব্য, নাটক ও গীতিকবিতার রস পরিবেশন করিয়াছেন। আখ্যানকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কাহিনীর অবিচ্ছিন্ন গতি ও ঘটনার সুসংবদ্ধ বিন্যাস। মৈমনসিংহ গীতি কবিতাগুলির মধ্যে কোন রকম অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা নাই,, অপূর্ব এক সংযম ফুটিয়া উঠিয়াছে। মৈমনসিংহ গীতি কবিতাগুলির মধ্যে নাটকীয় গুণ বর্তমান। এখানে ঘটনাগুলি জীবন্ত; আর আছে নাটকীয় সংঘাত। তাছাড়া ঘটনার অবগুণ্ঠতা ও কাহিনীর নিটোল সমগ্রতা গীতিকবিতাগুলির গৌরব বাড়াইয়া দিয়াছে। পল্লী-কবির মধ্যে কঠোর সংযম সত্যি বিস্ময়ের বিষয়। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এই সংযমের অভাব বড় বেশী চোখে পড়ে।

মৈমনসিংহ বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা। ইহা দুইটি ভৌগোলিক বিভাগ দ্বারা বিভক্ত। দুইটি বৃহৎ বিভাগে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। জিলার মধ্যভাগ দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হইয়া এই বিভাগকে সুস্পষ্ট করিয়াছে। পূর্বাঞ্চল বিস্তৃত জলাভূমির দ্বারা আচ্ছন্ন। ইহা "হাওর" নামে পরিচিত। এই জলাভূমি দ্বারা আচ্ছন্ন, বিভিন্ন নদ নদী প্লাবিত বিস্তৃত নিম্নভূমি অঞ্চলেই মৈমনসিংহগীতিকার জন্ম। তাই মৈমনসিংহ গীতিকার প্রধান অবলম্বন প্রকৃতি ও সমাজ। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, আর সমাজ অপ্রত্যক্ষ স্থান লাভ করিয়াছে। এখানে বাংলা দেশের পল্লীপ্রকৃতি অপূর্ব সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কদম বৃক্ষ, কেয়াফুলের ঝাড়, মান্দার গাছের ডালে ঘেরা কদলীবন, বকুলফুল প্রভৃতি চিত্রগুলি সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কোথাও বর্ণনার বাহুল্য নাই; অথচ বারবার কৃষক হৃদয়ে উপরে নীল আকাশ ও নীচে প্রকৃতির অপূর্ব লীলা চিত্র দোলা দিয়াছে। আমরা পূর্ববঙ্গের পল্লী জীবনকে পাইয়া থাকি মৈমনসিংহ গীতিকার কবিতাগুলির মধ্যে।

এই গীতিকাগুলিতে ধর্ম ও সমাজ নিরপেক্ষ স্বাধীন মুক্ত প্রেমের জয়গান গাওয়া হইয়াছে। এখানে হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ নাই। লেখকদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর মানুষ সহজ ও সরলভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। কোন জায়গায় দেখি হিন্দু নায়ক মুসলমান নায়িকা; আবার কোথাও মুসলমান নায়ক হিন্দু নায়িকাকে দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমান যে বহু শতাব্দী ধরিয়া পরস্পরের সহিত প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতেছিল, তাহার প্রমাণ এই গীতিকাগুলি। মৈমনসিংহগীতিকার চরিত্রগুলি হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়। কারণ হিন্দু সমাজ নীতিও ইহাদের মধ্যে অস্বীকৃত হইয়াছে।

এই সকল চরিত্রের মধ্যে একটি মাত্র সুর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা হইল মানুষ। এখানে ধর্ম প্রধান নয়,—এখানে মানুষই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। মানুষের স্নেহ প্রেম সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কোন রকম উচ্ছ্বাস নাই, আবেগ নাই। ইহারা কোন বিশিষ্ট সমাজের শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। লোকসাহিত্যে যে ধর্ম নিরপেক্ষ মানবিক উপাদান প্রাধান্যলাভ করে, মৈমনসিংহ গীতিকাগুলির মধ্যে সেই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। এক কথায় বলা যায় মৈমনসিংহগীতিকা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত।

এখানে স্বাধীন প্রেমের জয়গান গাওয়া হইয়াছে—যে প্রেম সমাজের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। "There is no after life for ballad characters and nothing more valuable than the happiness of earthly unions" এখানে নারীচরিত্র প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। পুরুষচরিত্র এখানে গৌণ। এই নারী-চরিত্রগুলি স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর। অপূর্ব সাহস ও সংযম ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

মৈমনসিংহ গীতিকা ও বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। মৈমনসিংহ গীতিকাগুলির প্রধান সুর লৌকিক প্রেম। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতা বিশেষ এক শ্রেণীর সৃষ্টি। এখানে বিশেষ এক ধর্মের প্রাধান্য বর্তমান। বৈষ্ণব কবিতার প্রেম অপ্রাকৃত। তাই সেই অপ্রাকৃত ও পার্থিব নরনারীর প্রণয় তৃষ্ণা পদাবলী রসে মিটিবার নয়। তাই বৈষ্ণবের গান পার্থিব জগতের জন্য নয়; ইহা বৈকুণ্ঠের জন্য। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকার প্রেম পার্থিব প্রেম। এখানে মানবিক আবেদন প্রধান। বাংলার মাটির আকর্ষণ এখানে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার মূল সুর, "দেবতারে প্রিয় করি, প্রেমেরে দেবতা।" এখানে মানবিক সুর দেবতাকে প্রিয় করিয়া দেবতার সহিত নিজেকে বিলীন করিয়া দিয়াছে। আর মৈমনসিংহ গীতিকাগুলির মধ্যে একটিমাত্র প্রশ্ন প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। তাহা হইল, "কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।" এ প্রেম দুর্বার হৃদয়ের আকুতিতে ভরা। এ প্রেম বাংলার মাটির স্পর্শে মহীয়ান্। এপ্রেম মানবিক আবেদনে ভরা। মঙ্গল কাব্যের পরিণতি মিলনাত্মক, ভাবসম্মিলনে বৈষ্ণব কাব্যের উপসংহার. আর মৈমনসিংহ গীতিকার প্রেম বিয়োগাত্মক—মানবিক আবেদনে ভরা।

মহুয়া, মলুয়া ও চন্দ্রাবতী আজ আমাদের ঘরের মানুষ। ইহারা নারী জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতার বেদনায় ভরা ইহাদের জীবন। তবুও ইহারা ভালবাসে। সমাজের বিরুদ্ধে, মানুষের বিরুদ্ধে ইহাদের কোন অভিযোগ নাই। "মহুয়া' পালার জলের ঘাটে নদীর ঠাকুর ও মহুয়ার গোপন কথোপকথনের মধ্যদিয়া মানবিক আবেদন সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। আর সব কিছু ছাপাইয়া মানবিক রস ফুটিয়া উঠিয়াছে—যাহা সাহিত্যের উপাদান। নদীর ঠাকুর যখন মহুয়ার কাছে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, তখন মহুয়া বলিতেছে—

"নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভসোদর ভাই।
স্রোতের শেওলা আইয়া ভাসিয়া বেড়ায়॥

মহুয়া স্রোতের শেওলা। কী সুন্দর প্রকাশ! ইহার উত্তরে নদীর ঠাকুর নিজেকে প্রকাশ করিয়া ফেলিল—"তোমার মত নারী পাইলে আমি করি বিয়া!" এখানে লাজলজ্জা কিছু নাই—কোন সঙ্কোচ নাই। এই আত্ম-প্রকাশের মধ্যে অপূর্ব সরলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহুয়া উত্তরে বলে—

"লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তোর।
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলে ডুব্যা মর॥"

এখানে আত্মপ্রকাশ আছে। কিন্তু মহুয়া তাহার গোপন ইচ্ছাটি গোপন করিয়া রাখিয়াছে।

উত্তরে নদীর ঠাকুর বলে,—

কোথায় পাইবাম কলসী, কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি।
তুমি হও গইন গাঙ্, আমি ডুব্যা মরি॥

নদীর চাঁদ মরিতে চায়। কিন্তু প্রকৃতির নদীতে জীবন বিসর্জন দিয়া কি লাভ? সে মহুয়ার হৃদয়-যমুনায় ডুবিয়া মরিতে চায়। প্রেমের কী অপূর্ব প্রকাশ। কোন কৃত্রিমতা নাই। অপূর্ব সরলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে এই কথা-গুলির মধ্যে!

মলুয়ার পালার মধ্যে বিষাদের সুর বাজিয়াছে। সে প্রেমিকা। সে ভালবাসিয়াছে প্রাণ দিয়া। কিন্তু চাঁদ-বিনোদের প্রতি প্রেমের জন্য তাহাকে বরণ করিতে হইয়াছে অশেষ দুঃখ। চাঁদবিনোদের সহিত তাহার

বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু সে সুখ পায় নাই। "কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?"—ইহাই তাহার জীবন-জিজ্ঞাসা কিন্তু এই জিজ্ঞাসার উত্তর সে পায় নাই। তাই তাহার জীবনে ব্যর্থতার বেদনা বড় করিয়া বাজিয়াছে। সে কলঙ্কিত জীবন হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আত্মবিসর্জন করিল। সকলকে প্রণাম করিল। তারপর বিদায় নিল এই মাটির পৃথিবী হইতে। তারপর কবি বলিতেছেন,—

"পূবেতে উঠিল ঝড় গঙ্গি উঠে খেওয়া।
এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥
ডুবুক ডুবুক নাও আর যা কতদূর।
ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর॥
পূবেতে গর্জিল খেওয়া উঠিল বিষম বাও।
কইন্যা গেল সুন্দর কন্যা মনপবনের নাও॥"

চন্দ্রাবতী প্রেমিকা ও সাধিকা। সেও সুখ পাইল না। সে চাহিয়াছিল বাঁচিতে। এই মাটির পৃথিবীর একটুকরো জায়গা আর একজন প্রেমিক; এই ছিল তাহার স্বপ্ন। কিন্তু তাহাও মিলিল না। সে শুনিল জয়চন্দ্র মুসলমান রমণীতে আসক্ত হইয়াছে। এখানে তাহার অন্তঃকরণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

"রাত্রিকালে শয়নযা বহে চক্ষের পানি।
বাসিকা ভিজিয়া ভিজে নেতের বিছানি॥"

আজ বার বার চন্দ্রাবতীর জীবনে অতীত উঁকি মারে! ছবির মত ফুটিয়া ওঠে অতীতের কাহিনীগুলি। সে শিব পূজা শুরু করিল। তথাপি ভুলিতে পারিল কি? মাটির মানুষকে না পেলে কি জীবনে সার্থকতা আসে? চন্দ্রার জীবনে আসে নাই। তাহার জীবনের এই বেদনার পরিমাপ করিবে কে? মানুষ! হয়তো তাই।

"শুধাইলে না কয় কথা মুখে নাই হাসি।
একরাত্রে ফুটা ফুল হইয়া হইল বাসি॥"

মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত "অমলা" নামক গীতিকার মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের বহু উপাদান ছড়াইয়া রহিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে যখন উপন্যাসের জন্ম হয় নাই, তখন এই গীতিকার মধ্য দিয়া যে নাটকীয় সংঘাত ও উপন্যাসের উপাদান ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের বিস্মিত করে। যে ঘাতপ্রতিঘাত উপন্যাসের চরিত্রের প্রধান অবলম্বন, তাহা এই গীতিকার মধ্যে সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ছাড়াও "কঙ্ক ও লীলা" গীতিকার মধ্য দিয়াও ঐ সকল উপাদান সুন্দর ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কঙ্ক চরিত্রটি ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া দলিল গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। ইহা ছাড়াও "কাজল রেখা" ও "রূপবতী" গীতিকাদ্বয়ের মধ্য দিয়া রূপকথার প্রকাশ হইয়াছে।

গীতিকাগুলির মধ্যে দিয়া একটা লিরিকধর্মী আবেদন আমাদের মুগ্ধ করে। এই লিরিক বাংলার প্রাণ সম্পদ। অপূর্ব এই লিরিক মাধুর্যের গুণেই এই সমস্ত গাথা যথার্থভাবে কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের প্রতি সহানুভূতির দ্বারা বাংলার পল্লীকবিগণ এই গীতিকাগুলি রচনা করিয়াছেন। নরনারীর প্রেমানুভবকে পল্লীর কৃষক কবিগণ সহানুভূতির সহিত দেখিয়াছেন। তাঁহারা এই সকল প্রেমের নৈতিক বিচার করেন নাই। তাঁহারা জানেন প্রেম অন্ধ। তাই এখানে বিচারের প্রশ্ন ওঠে না।

সবশেষে বলা যায় গীতিকার জীবন বাস্তব, ভাষা জীবন্ত। ইহা বিশেষ এক অঞ্চলের নিজস্ব প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হইয়াছে। ইহার রূপটি আঞ্চলিক। কিন্তু ইহার মধ্যে যে রস ও আবেদন আছে তাহা আঞ্চলিকতাকে ছাড়াইয়া সার্বজনীনতা লাভ করিয়াছে। ইহা আজ আঞ্চলিক সাহিত্য নহে ইহার আবেদন বাঙ্গালীসমাজেরই উপভোগ্য।

শ্যামা সঙ্গীত

শিব কেন বল উদাসী আজ
চরণ দুটি পেয়ে
উদাস হয়ে আমিও তাই
আছি মাগো চেয়ে ॥
মনের কথা রয়না মনে
তোরেই পেলে সঙ্গোপনে
ভিনটি লোকই সন্তানী যে
এমন কালো মেয়ে ॥
অন্ধকারের ওঁকারেতে
শুনিসনি কি বোল
গেয়ে শুধু মাতৃনামের
জয়ন্তী বিভোল ॥
নিত্যধামের পঞ্চদীপে
দেখনা ওরে অযাশিবে
মুক্তি কমল ফুটবে না আর
মুক্তা চরণ চেয়ে ॥

কথা—স্বামী সত্যানন্দ সুর—শ্রীব্রজেন সেন স্বরলিপি—কুমারী নমিতা দাঁ

গ ন ন | ধ প প | ক্ষ প ক্ষ্মপ | প ম গম
শি ব কে ঞ্জ ব লে | উ ষা ••• | সী মা •ন্ত
স গ গ | ম প ধপ | ক্ষ প - | - - -
চ র ণ | দু টি •• | পে য়ে - | - - -
স সগ র | স ন্ ন্ | স গ র | ম গ গ | ন ন ন
উ ঘা• স | হ য়ে • | আ মি • | ও তা ই | আ মি •
র্স র্ গর্র্ | র্সন র্স - | - - - |
মা গো •• | চে য়ে - | - - - |
র্স | নর্স ধন পধ | ম প পধ | ম প -
ম নের | ক• থা• | র য় না• | ম নে •
ধনর্স র্স - | র্স - র্রর্স | ন র্সন ধপ
হো•• রে ই | পে লে •• | স ং• গো•
ধ ন ন | র্স র্র - | র্র - র্গর্র | র্স র্র র্গর্গ
প নে • | তি ন্ টি | লো কি •• | স ন্ ধা
র্গর্গ র্স - | স ন ন | ধ প ধ | ন প - | - - -
নী• যে • | এ ম ন | কা লো • | মে য়ে • | • • •
স - - | ন প - | ন র - | ঋ - - | ন র র
অ ন্ ধ | কা রে র | ও ং কা | য়ে তে • | ও নি স
গ ন হ | গ - - | - - - | ক্ষ - - | ক্ষ - গ
নি • কি | যো • • | • • ন্ | সে যে • | ও ধু •
ক্ষ প - | ক্ষ প - | প - - | র গ র | স - -
মা • ত্ | না যে র | ক থ ন্ | ভি • ধি | ডো • •
স - - |
• • ন্
ন - - | ধ প ধ | ম প ন | পধ প - | ধ নর্স র্স
নি • ভা | ধা রে র | প ন্ ১ | ঘ্রা• পে • | যে •খ্ না
র্স - র্রর্স | ন র্সন ধপ | ধ ন ন | র্স র্র - | র্র - র্গর্র
ও যে •• | অ ন• ন্• | নি যে • | মু ক্ত ভি | ক থ •ন
র্স র্র র্গ | র্গর্গ র্স - | র্স - নর্স | ধন প ধ | ম প - | প - -
ছু ট্ যে | না• কি • | মু ক্ত তা• | চ• র ণ | চে য়ে • | • • •

গল্প

বৈমানিক

শ্রীসেবা বসু

রাত অনেক হয়েছে।

আকাশের তারাগুলো যেন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে আরো। ঝিঁঝি পোকার ডাক—আর নিশাচর প্রাণীগুলোর চলা-ফেরায় আওয়াজ বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। দূরে কয়েকটা কামান গর্জে উঠল—তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মেশিন গানের কণ্ঠ—আর পরেই বিমান আক্রমণের সংকেত ধ্বনি। সব মিলিয়ে শান্ত পরিবেশটাকে মুহূর্তে করে তুলল—অশান্তিপূর্ণ এক ভয়াবহ সৃষ্টি। প্রতিটি মিনিট ঘড়ির কাঁটার মত মানুষের জীবনের ভাবীকাল নিয়ে সুরু করল এক চরম রহস্যের।

এ রহস্যের যবনিকা পাত হ'ল বটে—তবে সে দারুণ এক শোচনীয় দৃশ্যের অবতারণা করে। সুস্থ মানুষগুলো কাতরাতে লাগল ভাঙা-ভাঙা পাখীর মত—সুখের সংসার জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল—একদল হিংস্র মানুষের হিংসার দাবানলে। আর একদল মানুষ সারি বেঁধে মৃত্যুর দুয়ারে পেতে নিল শয্যা। স্তিমিত রাত্রি ভেদ করে উঠল আর্তের অন্তিম মিনতি—সভ্য জগতের মানুষের কাছে ওরা যেন আশা করেনি এ বর্বর আক্রমণ।

—জল, একটু জল।

—না, না আমি যাব। মাতৃভূমি রক্ষার পণ করে এসেছি—মরতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মরব।

—খুলে দাও আমার চোখের বাঁধন—প্রাণ ভরে জননী জন্মভূমিকে শেষ বারের মত দেখে যাই।

—ঐ—ঐ পাকিস্তানী পররাজ্যলোভী হানাদাররা আসছে—কোথায় হাতের বন্দুক?

অনেকগুলো আর্তকণ্ঠ এক সঙ্গে প্রতিবাদ দিয়ে গর্জে উঠল রাতের বুকে। এরা সবাই জওয়ান—ভারতীয় বীর সৈনিক। গিয়াজী খাদিজী, বাপুজী আর নেতাজীর আদর্শে এরা এসেছিল পাকিস্তানী অক্ষৌশলকদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। এদের হাতের অস্ত্র বিফল হয়নি। পাকিস্তানী হামলাদারদের এরা বুঝিয়ে দিয়েছে ভারত চির-বীর-প্রসবিনী।

—কেন-কেন আমার মুখের ঢাকা খুলতে চাইছেন?

—এই ওষুধটুকু খেয়ে নিন ভাই।

—তাই?

—হ্যাঁ ভাই, ওষুধটুকু খেয়ে নিতে হবে।

—কিন্তু আমি যে—

—জানি আপনি মুসলমান—তাতে কি হয়েছে—ভারতীয়দের কাছে হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান এর মধ্যে কোন বিভেদ নেই।

বিস্মিতের মত আহত পাকিস্তানী বৈমানিক আকবর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবিকা কল্যাণীর দিকে। ওষুধটুকু খাইয়ে প্রশ্ন করে কল্যাণী, কি দেখছেন অমন করে?

—আপনাকে। ভ্রুত বলে বসে আকবর।

—আমাকে?

—আপনাকে দেখছি—আর আমিনার কথা যেন বেশী করে আমার মনে পড়ছে।

—আমিনা?

—আমার ছোট বোন। আমার অসুখ করলে ঠিক আপনার মত এমনি করেই আমার সেবা করত, যত্ন করত।

একটু হেসে কল্যাণী বলে, বেশতো দেশে ফিরে আমিনাকে বলবেন আমার কথা। উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠে আকবর, নিশ্চয়ই বলব—কিন্তু—

—কি হল?

—দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছে আমার নেই। পাকিস্তানী শাসকদের হাতে পড়ে আমাদের যে কি অবস্থা হয়েছে সে আপনি বুঝবেন না। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই অরাজকতায় দেশ যেন শ্মশান করে তুলেছে।

—তবে যে শুনি—

—যা শোনেন সব মিথ্যে। সব ঐ বর্তমানের পাকিস্তানী রাষ্ট্রনায়কদের অপপ্রচার।

—খুলে দাও, খুলে দাও আমার চোখের বাঁধন। কল্যাণী এগিয়ে যায় আর একটি আহত জওয়ানের কাছে।

—আপনি অমন করছেন কেন বলুন ত? আহত জওয়ানটির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় কল্যাণী।

—কেউ বুঝবে না, কেউ বুঝবে না আমার সে কথা। তাকে যে আমি কথা দিয়ে এসেছিলাম, শপথ করে বলেছিলাম তোমার আমার প্রেম, তোমার আমার ভালবাসা দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গ করব—

—সেত করেছেন।

—করেছি? না-না মিথ্যে কথা। যে পাকিস্তানী বর্বর দস্যুরা শান্তিকামী ভারতের শান্তি নষ্ট করেছে—যাদের ঘৃণ্য আক্রমণ থেকে মন্দির, মসজিদ্, গীর্জা, গুরুদ্বার কিছুই রক্ষা পায়নি নিরীহ মানুষের সাধের সংসার ভেঙ্গে চুরে ছারখার হয়ে গেছে—তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতেই হবে।

—বেশতো, সুস্থ হয়ে উঠুন।

—সুস্থ হয়ে উঠব—কিন্তু কতদিনে?

—এই তো আর কটা দিন। কল্যাণী জওয়ানটিকে শান্ত করে উঠে যাচ্ছিল।

—আপনি চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, কিছু চাই আপনার?

—একটা কথা জিজ্ঞেস্ করব আপনাকে?

কল্যাণী উত্তর করে, বলুন না!

—মেয়েরা কেমন বলুন ত?

—মেয়েরা?

—আমি না হয় কদিন হ'ল এইভাবে পড়ে আছি—কিন্তু সেও ত একটা চিঠি আমায় দিতে পারত।

—চিঠি!

—একটা চিঠি লিখে দেবেন আমাকে—আজই কদিন বাদে একটু সুস্থ বোধ করছি—আজ না লিখলে হয়তো আর দেখা হবে না। নিজের ত লেখবার ক্ষমতা নেই।

—কি লিখতে হবে বলুন!

—লিখে দেবেন আপনি?

—হ্যাঁ।

—তবে লিখুন, আজ প্রায় মাসখানেক হ'তে চলল আহত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে কেবলই তোমার কথা মনে পড়ছে। তোমাকে যে কথা দিয়ে এসেছিলাম তা আমি পালন করেছি—আমার বিমানের অনেক গোলা দুর্বৃত্ত পাকিস্তানীদের বহু অভিসন্ধি ধ্বংস করেছে। শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে, মুক্ত বিহঙ্গের মত বিমান নিয়ে যখন আকাশের গায়ে উড়ে বেড়িয়েছি—আর শত্রুর শক্তিকে প্রতিরোধ করেছি—তখন কেবলি ভেসে উঠেছে তোমার মুখখানি। আর তোমার যে ছবিখানা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম—সে যেন অনবরত আমায় প্রেরণা জুগিয়েছে—আর বলেছে, এগিয়ে যাও—

—কি হ'ল থেমে গেলেন? কল্যাণীর চোখ যেন কাপ্‌সা হয়ে ওঠে।

—কল্যাণী—

—কল্যাণী?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কল্যাণীকেই তো চিঠিখানা লিখছি।

—সুজয়! কান্নায় যেন ফেটে পড়ে কল্যাণী।

—কে কে তুমি? ক্ষিপ্রের মত চোখের বাঁধন খুলতে চায় সুজয়। কল্যাণী দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে সুজয়ের হাত—চিৎকার করে বলে উঠে, না গো না—ও বাঁধন আমি তোমার কিছুতেই খুলতে দেব না সুজয়—তোমার আমার প্রেম, তোমার আমার ভালবাসা ও একসঙ্গে মিশে গেছে—একসঙ্গে মিশে আছে—তাই তুমি খুব ভাগ্যিও না। ওদের কথার আওয়াজে সব যেন চাপা পড়ে যায় প্রতিও গোলা বর্ষণে। পরেরদিনের সংবাদপত্রে দেখা যায় পাকিস্তানী হামলাদারদের নির্লজ্জ আক্রমণের কাছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সব কিছু।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে, বাঙলা দেশের "পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব" কিভাবে উদ্‌যাপিত হতো —তার আগে নানান্ বিচিত্র-চিত্তাকর্ষক তথ্য-বিবরণ পাওয়া যায়, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ৺পণ্ডিত রামগর্ভ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচিত প্রাচীন পুস্তিকাখানিতে। একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির উদ্দেশ্যে, সেকালের সে সব কৌতূহলোদ্দীপক কীর্তি-কাহিনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

• • • •

(৺রামগর্ভ বিদ্যাভূষণ রচিত "পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব" পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত)

"...আজি মঙ্গলবার, সপ্তমী পূজা। লোকের আমোদের সীমা পরিসীমা নাই! এক বৎসরের পর মা এসেছেন!!! পুরোহিত মশায় পূজার উদ্‌যোগ করে, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি ক্রমশঃ সমাপন করে, রাই দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে, আবরণ দেবতার পূজা করে প্রতিমাস্থ দেবদেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা চক্ষুর্দান করতে লাগলেন। তন্ত্রধার মড়ুই-পোড়া নামুনের মত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্ত্র পড়াতে লেগেছেন। তারপর যথাক্রমে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, সিংহ, অসুর, সর্প, মহিষ, ইন্দুর, মযূর প্রভৃতি সকলেরই পূজা সাবলেন। "ছিত্তিং না ভিং ভিং" ঢাকের বোল বেজে উঠ্‌লো। একটি প্রকাণ্ড খাসী বলিদান হয়ে গেল! শেষে অঞ্জলি দেবার সময় উপস্থিত। বাইরের দালানে লোকারণ্য! নিমন্ত্রিত, অনাহূত ও দর্শকমণ্ডলীতে বহির্বাটী ব্যাপ্ত। তথাপি বাড়ির কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা সকলকেই আজ লজ্জা ছেড়ে দালানে অঞ্জলি দিতে হয়। তাতে কোন দোষ নেই, আর অন্তঃপুরে মেয়েরা বই পড়লেই যত দোষ হয়। এঁরা এই রকম সভ্যতাই ব্যবহার করে থাকেন! হা বঙ্গভূমি! একবার চেয়ে দেখ, তোমার ছেলেরা কেমন করে তোমার মুখ উজ্জ্বল করছে!!! প্রথমে বাড়ির কর্তাকে অঞ্জলি দিতে হয়, কাজেই বাড়ির ভেতর খবর গেলো। বাবু উঠবেন কি, তিনটে বাজে শয়ন করেছেন, একটা "বামাযী" উঠে গিয়েছে! হাতে মুখে আমাদের ভারতেশ্বরের ব্রাহ্মণের বহুর কথা "বাইশেতের কাছি" শুনছে। যা হোক, কষ্টে স্রষ্টে তো বাবু উঠলেন, উঠলে কি হয়, তখনও চোখ ঢুলু ঢুলু করছে, এখনও কথার আড়, ঘরে নি, ঘুমে থেকে উঠে এক ছিলিম তামাক খেতেই নেশাটি আবার তরপুর হয়ে এলো। খোয়ারির মুখ, গা মাটি মাটি করছে, হাই উঠছে ও পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। কি করেন, তিন পুরুষের পুজো! মুখে জল দিয়ে লবঙ্গ এলাচ চিবুতে চেলীর জোড় পরে অঞ্জলি দিতে দালানে উপস্থিত হলেন। বলিদানের পাঠাটি জয়হরি তর্কালঙ্কারের বার্ষিক ছিল, কিন্তু "খাসী" বলে আর দেওয়া হলো না, কাজেই দুপুরবেলার কাজের জন্যে নিম-

খানা রকমের ঝোল কর্ত্তে বলে দিলেন। ক্রমে অতিথির ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে মাগীদের রন্ধা কমে গেলে পুরুত মহাশয় বাকি হুয়ে "বেহীমাহাত্ম্য" (৫৩) পাঠ কর্ত্তে আরম্ভ করলেন। যখন ভোজন, বাবু ভোজন ক্রমে সম্পন্ন হলে, চাষা লোকদের নারিকেল লাড়ু দান করা হলো, কাঙালী বিদেয়ের পর কাঙালী ভোজন আরম্ভ হলো; কোন পাতে ভাত পড়লো, কোন পাতে ডাল পড়লো, কেউ বা "সর্ব্বনাশ হোক্ দুটি খেতে দিলে না" বলতে লাগ্‌লো। চার দিকে ভাতে ভাত! এইরূপে কাঙালী খাওয়াতের ক্রমে বেলা অবসান। সন্ধ্যাবধূ পতিবিরহে মলিন হয়ে গেলেন, কিন্তু সেই চন্দ্রকে বেশভূষায় ভূষিত হয়ে উঠতে দেখলেন, তখন আর তিনি থাকতে না পেরে শুক্ল বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হয়ে এখনকার স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব যে কেমন ধন-তন্নুর তাই দেখবার জন্য অভিসারিকা বেশ ধারণ করলেন, তারাগণও তাঁর সতীত্বের এই অবস্থান দেখে, হাসতে লাগ্‌লেন। এমন সময় বাবুর বাড়ি সন্ধ্যার আরতি-সূচক শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসি, ঢাক, ঢোল ও নহবৎ বেজে উঠ্‌লো। মেদিনী কম্পমান! ধূপ ধুনার গন্ধ ও ধোঁয়াতে একেবারে যেন মাতিয়ে তুল্লে। পুরুত মশায় প্রথমে শঙ্খধ্বনি, তৎপরে ঘণ্টা, অনন্তর পানিশঙ্খ, বস্ত্র, ও আম্রপল্লব দুর্গার সম্মুখে আন্দোলন করে আরতি সমাপন কল্লেন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ভক্তিভাবে প্রণাম করে। তার পর প্রসাদী সামগ্রী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পেয়েই সকলে বিদেয় হলো। এদিকের গোল চুক্‌লো; এখন কেবল বাবুদের বৈঠকখানায় "ইয়ার ভেদের" উদ্যোগ হতে লাগ্‌লো। বাড়িতে "গোপালে অধিকারীর" যাত্রা। ফুরোন নেই, পেলার যা হয়, এই ভরসার সঙ্গে বন্দোবস্ত। কাজেই তারা রাত ৯টা বাজতে বাজতেই আসরে নেমে খোল করতালে চাট দিতে লাগ্‌লো। ইদিকে বাবুর বৈঠকখানায় কেউ বা ভক্তিভাবে "সিদ্ধে" করছিলেন, কর্ত্তে কর্ত্তে তাঁর জীবাত্মা পরমাত্মায় সখে মিলিত হয়ে গেল, সুতরাং সেই মধুরসের বিছানাতেই তিনি "প্রিয় সেই মি গো আইচ" করে ফেল্লেন; অন্যান্য বাবুরা "বাবা! কিও বলো না, হুকোর জল পড়চে" বলে হোবুরা দিতে লাগ্‌লেন। পাঠকগণ, আমরা আজকে বাবুদের সব রকম সুখ ও সব রকম দুঃখ দেখে নয়ন সার্থক করেছি, কেবল একটী বিষয়ে বাবুদের অসহীন ছিল, আমরা তাঁদের ইয়ারকি মহলে "সব চুলো" দেখি নি, তবে যদি সময় বুঝে আসা হয়ে থাকে তো, জানাতে পারি নে। যা হোক যখন আমরা তা দেখতে পাই নে, তখন আপনারা কোথেকে দেখবেন, কাজেই ঐটিতে ঝোঁক রেখে দিন।

এরূপ বাবুর বাড়িতে যাত্রা হলে যে কত হাঙ্গাম হয়, তা পাঠকদের অগোচর নেই। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ বা দেখে শুনে বিজ্ঞ হয়েছেন, কেউ কেউ বা স্বয়ং ভুক্তভোগী আছেন। তবে যাদের কোন কথা বলতে গেলেই যেন গায়ে লাগে, তা তজ্জন্য আমাদিগকে মাপ করবেন। বৈঠকখানায় বাবুদের গট্‌রা চল্‌তেছে, এমন সময়ে আসরে কেউ নামলেন! আর বাবুদের রাখে কে? অম্‌নি নেমে এসে "বাবা রে হনু! তুই লঙ্কা পোড়ালি কেমন করে বল্?" বলে চেঁচাতে লাগ্‌লেন। শুনেই অধিকারীর চক্ষুস্থির!! কোথায় মানভঞ্জন, আর কোথায় লঙ্কাকাণ্ড! কি করে, অধিকারী কাজেই আপনি হনুমান সেজে দেখা দিলেন। তখন আর পেলার ভাবনা রইল না। গ্রামের মেয়েছেলেরা যাত্রা শুনতে এসেছিল, এসে তারা বাবুদের বড়াই দেখতে লাগ্‌লো। ক্রমে বাবুদের ভাব গাঢ় হয়ে এল। সুতরাং সকলেই হাত ধরাধরি করে হনুকে ঘেরে নাচতে লাগ্‌লেন। তাই দেখে দর্শকেরা ছির কর্ত্তে চলে গেল, যাত্রাও বেদবাসের বিশ্রাম দিলে। ইতি সপ্তমী পূজার পালা সেষ।

আজ বুধবার অষ্টমী। কলকেতার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার দিন! অনেক পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মসমাজে বড় সমাজের অনুকরণে আজকেই উপাসনা হয়ে থাকে। আমাদের ছোটবাবুও আরতির পর সমাজে যাবেন। অষ্টমী পূজাটি ঠিক সপ্তমীর মত; কেবল চক্ষুষ্কটি-যোগিনীর পূজো বেশী ভাগ। আর অষ্টমীর মহাস্নানের প্রণালীটি ঠিক কলাবৌ স্নান। আজ আবার অষ্টমী ও নবমীর সন্ধি সময়ে একটি পূজা হয়ে থাকে, তার নাম সন্ধিপূজা। এতেও সপ্তমী অষ্টমীর ন্যায় একটি পূজা হয়, বলিদান হয়, আর দীপমালা প্রদান কর্ত্তে হয়, তা আমাদের বাবুর বাড়ি তার কোনরূপ অঙ্গহীন হলো না, সকলেই যথাক্রমে সম্পন্ন হয়েছিল। বলতে গেলে পাছে পুনরুক্তি হয়, তাইতেই ক্ষান্ত হওয়া গেল।

২৮শে বৃহস্পতিবার। আজ নবমী। পূজার শেষ দিন!! পুরোহিতের কষ্টের অবসানের দিন!! আজ পূজা ও বলিদানের পর কাদামাটির সঙ্গে২ বাঙ্গালিদের সভ্যতার পরিচয় হয়ে থাকে। যাঁরা আপিসে "আমি হিঁদুয়ানি মানি নি, আমার কোন প্রেজুডিস নেই" বলে সাহেবদের সঙ্গে খানা খেয়েছেন, তাঁরা আজি কোমর বেঁধে কাদা-মেখে কাদামাটি করবেন! "হিন্দুদের কুসংস্কার গেল না" বলে যাঁরা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে দেশের লোককে "এন্-লাইটেন্" কর্ত্তে চান, তাঁদের মধ্যেও কাউকে২ আজকের কাদায় দেখতে পাই। হায়! এই রকম লোক হতেই বাঙ্গালিদের "হিপোক্রিট্" নামটি সৃষ্টি হয়েছে!! এদিকে বাবুর বাড়ি পূজা হোম শেষ হলে বলিদানের উদ্যোগ হতে লাগ্‌লো। আজ ভারি ধুম!! অসংখ্য বলিদান! প্রথমে মহিষ, তারপর ১০টি পাঁঠা, কুমড়ো, আক, শসা পর্য্যন্ত বলিদান হয়ে গেলো। বাজনার তাল ফিরলো, আরতির পর নাচের বাদ্যি বেজে উঠ্‌লো! অমনি সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ। মহিষ ছাগলের রক্ত, আর হাড়িকাটের মাটি, এই নিয়ে কাদা করে, বড়বাবু থেকে ক্ষুদে২ ছেলে পর্য্যন্ত সকলেই নৃত্য কর্ত্তে আরম্ভ করলে। "ও মা দিগম্বরী নাচো গো" বোল বেরুতে লাগ্‌লো; ক্রমে রক্তে গড়াগড়ি! তার উপর বাড়ির চাকর দু-কলসী জল ঢেলে দিলে, এই নৃত্য বেড়ে গেল; এমন কি, সে সময় যদি কোন ইংরাজ তার নক্সা তুলে নিতেন, তো বাঙ্গালিদের উপর তাঁদের যা কিছু ভক্তি আছে, তাও উড়ে যেত। এইরূপে বাজনার তালে২ নৃত্য করে আর গান গেয়ে বাবুরা গ্রামের যত পূজাবাড়ি, সর্ব্বত্রই কাদা করে শ্রীদুর্গার শ্রীতিসাধন করে বেড়াতে লাগলেন। সূর্য্যদেব আর থাকতে না পেরে মজা দেখবার জন্যে মাথার উপর উঠলেন, পাখিগুলো দুঃখে নিস্তব্ধ হয়ে বাসায় বসে রইল, পবনদেব ক্রোধে ভোঁভোঁতে২ অগ্নিবৃষ্টি কর্ত্তে লাগ্‌লেন, বাবুদের মোসাহেবদের মত ধুলোগুলো সূর্য্যের তেজে তেতে উঠে লোকের কষ্টকরূপ হয়ে উঠ্‌লো। শরতের মেঘ এতক্ষণ লুকিয়ে২ তামাসা দেখছিলেন, শেষে ছোট-লোকের এই আস্পর্দ্ধা দেখে, ধনবানের দুরবস্থার সময় চিরানুগত মোসাহেবদের যে কত দূর অবস্থান্তর হয়, তাই দেখাবার জন্যেই যেন ধুলোকে কাদা করে দিয়ে চলে গেলেন। আমাদের বাবুরাও ক্রমে কাদা মেরে স্নান করে সকলে ঘরে ফিরে এলেন। ছেলেপুলেরা যারা যারা সঙ্গে২ কাদা করেছে তাদের এক এক কাপড় ও এক এক গামছা দিয়ে সকলকেই বিদেয় করে দেওয়া হলো।...

* * *

ইতি শ্রীঅবতারবিরচিত আস্‌মানের নক্‌সাখ্যে কাব্যে
বাবুদের বাড়ির দুর্গোৎসবের নবমীপূজা
সমাপ্তে নাম প্রথমঃ কল্পঃ।

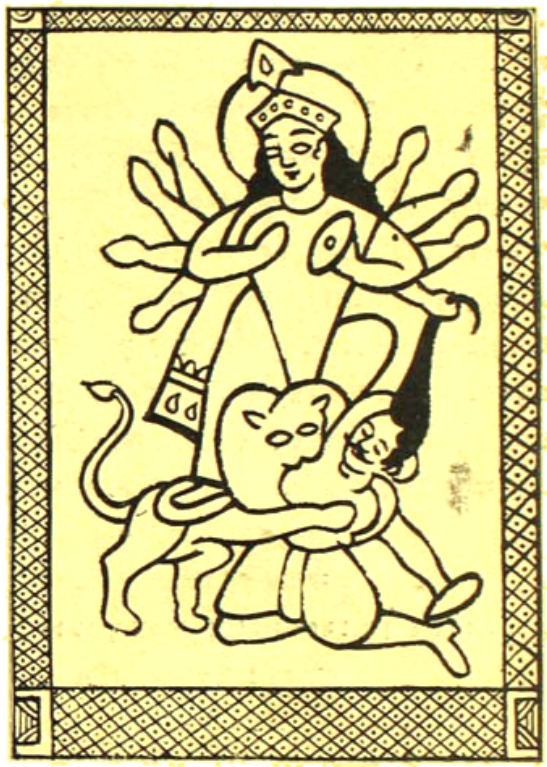

মহিষাসুর-মর্দ্দিনী শ্রীদুর্গা

(প্রাচীন কালিঘাটের পট-চিত্রের প্রতিলিপি-অনুসরণে)

এদেশী হিন্দু-সমাজের লোকজনের সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব-পালনের মতোই ইংরাজের হাতে-গড়া আজব-সহর কলিকাতায় সেকালে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিদেশী সাহেব-বিবিদের বড়দিনের উৎসবটিও রীতিমত ধুমধামে উদ্‌যাপিত হতো। সাম্প্রদায়িক হলেও, বিলাতী-সাহেবসুবোদের বড়দিনের উৎসবটি আধুনিক আমাদের দেশে যেমন সার্ব্বজনীন-পর্ব্বে পরিণত হয়ে উঠেছে, তখনকার আমলেও ঠিক তেমনটিই ছিল—তবে কিছু গোঁড়া-সনাতনী লোকজন অবশ্য সেখানে বিলাতীয় এই উৎসব-উপলক্ষ্যে এদেশী

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চক্ষুক-আনন্দ উপভোগের অদম্য আগ্রহাতিশয্য আর হৈ-হল্লা-মাতামাতি আদৌ পছন্দ করতেন না···বরং, কোনো সুযোগ পেলেই কঠোর ভাষায় তীব্র-সমালোচনা জানাতে পিছপাও হতেন না এতটুকু।

বড়দিনের মরশুমে সেকালে আমাদের দেশে দেশী-বিলাতী—সমাজের লোকজনদের জীবন ভক্তি-আনন্দ-হজুকের ত্রিধারা-স্রোতের কোন খাতে কেমন বইতো, তার একটি রঙ্গরসোজ্জ্বল-নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়—আজ থেকে একশো-পনেরো বছর আগে তৎকালীন কবি-সাহিত্যিক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ "সংবাদ-প্রভাকর" সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষ-ভাবে রচিত একটি রঙ্গ-কবিতার ছত্রে-ছত্রে। একালের অনুসন্ধিৎসু-পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণের উদ্দেশ্যে, আপাততঃ সেই প্রাচীন রঙ্গ-কবিতাটির সম্পূর্ণাংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। তবে আলোচ্য রঙ্গ-কবিতাটিতে বড়দিনের উৎসব-উপলক্ষ্যে ধুমধাম আড়ম্বরের প্রসঙ্গাদির চেয়ে সেকালের নৃষ্টিয়ভাবাপন্ন বিলাতী সাহেব-সুবো ও দেশীয় ফিরিঙ্গি সমাজের লোকজনকেই যে বিশেষ-ভাবে সমালোচনা করা হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

সংবাদ প্রভাকর

(১১ই পৌষ, ১২৫৭। ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৫০)

বড়দিন : রূপক

(পয়ার)

খ্রীষ্টের জনম দিন বড় দিন নাম।
বহুসুখে পরিপূর্ণ কলিকাতা ধাম।
কেরাণি দেয়ান আদি বড়২ বেট।
সাহেবের ঘরে২ পাঠাইছে ভেট্।
ভেটকি কমলা আদি মিছিরি বাদাম।
ভাল দেখে কিনে লয় দিয়ে ভাল দাম।
এই পর্ব্বে গোরা সর্ব্বে সুখি অতিশয়।
বাঙ্গালির বিদিরার্থে লিখি সমুদয়।
কেথলিক হল সব প্রেমানন্দে ভোলে।
শিশু ইশু কোড়ে দেয় মেরি মায় কোলে।
বিশ্বাসিক চারুরূপ দৃষ্ট মনোলোভা।
যশোদার কোলে যথা গোপালের শোভা।
সেরূপ খ্রীষ্টানগণ ভাবে চল্২।
গোড়া প্রেমে মত্ত যথা নেড়া নেড়ী দল্।
প্রভুর শোণিত মাংস কাল্পনিক করি।
আহারে আহ্লাদ পান যত মিসনরি।
টেবিল সাজায়ে সব ভাবে গদগদ।
মাংস বোলে রুটি খান রক্ত বলে মদ।
ভুবন করেছ বদ্ধ কুহকের ডোরে।
হায়রে কুমারী পুত্র, বলিহারী জোরে।
যে প্রকার খ্রীষ্টানের পূর্ব্ব প্রকরণ।
কেথলিক্ চর্চ্চে গিয়া দেখে এলো মন।
দেখিলে তাদের ভাব রাগে মন রোকে।
ধন্যবাদ দিতে হয় বঙ্গবাসি লোকে।
ওলড এক টেষ্টমেণ্ট গোলড তার বাঁধা।
কোলড করে মাথুরেরে লাগাইয়া ধাঁধা।
নিকারণ প্রটেষ্টেণ্ট বিশাপের দল।
বড়দিন পেয়ে সুখে হাস্য খলখল।
মিলেটরি সিবিল বণিক আদি যত।
ছুটি পেয়ে ছুটাছুটি আস্ফালন কত।
ঝমকে পোষাক পরি গাড়ি আরোহণে।
চর্চ্চে যান সুরূপসী স্ত্রীমতীর সনে।
বিশাপের অগ্রভাগে ঘাড় হেঁট করি।
ক্ষণমাত্র অবস্থান টেষ্টমেণ্ট ধরি।
ভজনা হইলে শেষ উঠে যেন ছুট্।
সহিস বোলাও, বগি, ভ্যাম্২ হুট।
আলয়েতে আগমন মনের খুসিতে।
অঙ্গুলির অগ্রভাগ চুষিতে২।
অনঙ্গ সম্পর্ক সুখ লুসিতে২।
প্রেমালাপে স্ত্রীমতীরে তুষিতে২।
পরস্পর নিমন্ত্রণ কতক্ষণ খানা।
টেবিলের উপরেতে কারিগুরি নানা।
বেষ্টিত সাহেব সব বিবিরূপ জালে।
আনন্দের আলাপন আহারের কালে।
শক্তি সহ ভক্তিভাবে খেয়ে মাংস মদ।
হাতে২ স্বর্গ লাভ প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ।
রসে মত্ত ছেড়ে তত্ত্ব প্রেম তত্ত্বলাভে।
হয়ে প্রীত নৃত্য গীত বিপরীত ভাবে।

বড় ২ সাহেবেরা এইরূপ ভোগে।
পেয়েছেন বড় সুখ বড়দিন যোগে॥
আম্রস শিম্রিল আদি ডিকুস্ মেণ্ডিস্।
ডিকোষ্টা ডিরোজা জোনা ডি সোজা পমিস॥
কেহ নেহ কেহ আদি টেম্সগণ যত।
ক'াকে ২ মহা ক'াকে চলে শত ২॥

পোরে ব্রেস্ হন্ ফ্রেস্ দেখা যায় বেড়ে।
বাঁকা ভাবে কথা কন কালা মুখ নেড়ে॥
পুঁইখাড়া চিহ্নভির করি সৃষ্টি নাশ।
মেম সঙ্গে নানা রঙ্গে গরিমা প্রকাশ॥
চুণাগলি অধিবাস খোলার আলয়।
তাহাতেই কতরূপ আড়ম্বর হয়।
ছাড়েন বাঙ্গালি দেখি বিলাতের বুলি।
লিচু খাও কেলাস্যান নেটিব বাঙ্গালি॥
জুতা গোড়ে প্রাণ যায় করে হেই চেই।
রুপি বিনা রুপিতার কড়াযাত্র নেই।
বড়দিনে বাবু সেজে কতরূপ খেই।
জাহাজ হইতে যেন নামিলেন এই॥
আনাকাষ্ট কনবর্ট গৃহত্যাগি যারা।
সুখে সুখ বাচিতেছে নাচিতেছে তারা॥
ছেঁড়া পচা কামিজ্ নাবিক
তার জাতা।
তাই পোরে বাবু হন্ খালি করে মাতা॥
ভাঙ্গা এক টেবিলেতে ডিস সাজাইয়া।
উত্তভাবে খানা খান বাহ বাজাইয়া॥
মনে ২ খেদ বড় কাদা হয় হেতে।
পরমান্ন পিটাপুলি নাহি পান খেতে॥
যে সকল বাঙ্গালির ইংলিস ফ্যাসন।
বড়দিনে তাহাদের সাহেবি ধরণ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণে সুখের সকার।
ইচ্ছাধীন বাগানেতে আহার বিহার॥
হায়রে সুখের দিন, শোভা কব কায়।
ইংরাজটোলায় গেলে নয়ন জুড়ায়॥
প্রতি গেটে গাঁধোহার কারিগুরি তাতে।
বিরচিত ছটা চারা দেবরাজ পাতে॥
হোটেল মন্দিরে ঢুকে দেখিয়া যাহার।
ইচ্ছা হয়, হিন্দুয়ানি রাখিব না আর॥
খেতে আর কাজ নাই ঈশগুণ গাই।
খানা সহ নানা সুখে বিবি যদি পাই॥
চারিদিগে দেখ মন অতি বেড়ে ২।
তোতে মোতে থাকি আর হিন্দুয়ানি ছেড়ে॥
অহং পেটুক।

• • •

সেকালের ভারত-প্রধানী খাঁটি-বিলাতী সাহেব-বিবি এবং খৃষ্টধর্মাবলম্বী এদেশীয় ফিরিঙ্গি-সমাজের লোক-জনদের আদবকায়দা-অনুকরণে, খৃষ্টীয় উনবিংশ-শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা-সাংস্কৃতিক-প্রগতিধারার নবালোক প্রাপ্ত "Enlightened বঙ্গ-সন্তানেরা তখন যে বিচিত্র-অভিনব উপায়ে বড়দিনের উৎসব পালন করতেন—কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রঙ্গ-কবিতায় তারও উপভোগ্য বর্ণনা মেলে। একালের পাঠক-পাঠিকাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, সে কবিতাটিরও কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

• • •

(কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত বঙ্গ-কবিতা হইতে উদ্ধৃত)

বাবুগণ কারু মন নাহি যায় ফাকা।
চুপি চুপি বয়রূপী লুকাচুরি খালা॥
বিবী সহ বিলাতীয় যোগাযোগ নানা।
কত শত আয়োজন ইয়ারের খানা॥
ফ্রেস্-ফিস্ ভরা ডিস্ মাখামাখি ভাত।
দেপাত সুপাত নয় নিপাতের পাত॥
অখিল ভরিয়া সুখে করে জল সেবা।
খেতে খেতে মেতে উঠে খেতে পারে কেবা॥
উদ্বি মধ্যে দুঃখীতর বাজী সব জেয়ে।
তবহুত মত যত বড় দিন পেয়ে॥
ভেড়া হয়ে ভুড়ি মারে টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হয় পচা শাল চেয়ে॥
কোনরূপ শিক্ষিরক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন খেনো গাঙে খেনো জলে নেয়ে॥
"এ, বি" পড়া ভবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে।
সাজায়েছে গাঁধা-গাধা ভেকুলের উপরে॥

পড়ে নি'ক উচ্চ পাঠ অল্পে মারে তুড়ি।
তাকায় ওদিকে বটে পাকায় খিচুড়ি॥
শাসনের ভয়ে নাহি যায় উপবনে।
পায়েসে আয়েস রাখি তুষ্ট হয় মনে॥
ধনের অভাবে যেই বড় দীন হয়।
বড় দিন পেয়ে আজ বড় দীন নয়॥

• • •

উপরোক্ত কবিতাটিতে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সেকালের 'বাঙালীটোলার' লোকজনের বড়দিনের উৎসব-পালনের রীতি বর্ণনা করেছেন। তবে উনবিংশ-শতকে নগর কলিকাতার 'সাহেবীটোলায়' বড়দিনের উৎসব-পর্ব্ব কিভাবে প্রতিপালিত হতো, তার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সমসাময়িক আরেকজন কবির রচিত রঙ্গ-কবিতায়। সে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে···তখনকার আমলের সুবিখ্যাত "সংবাদ সাধুরঞ্জন" সাপ্তাহিক-পত্রিকায়। প্রসঙ্গক্রমে, সে কবিতাটিরও কয়েকটি ছত্র নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

• • •

(১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "সংবাদ সাধুরঞ্জন" সাপ্তাহিক-পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

বড় দিন বটে বড় বড়র নিকটে।
বড় দীন প্রতি বড় দিন নাহি ঘটে॥
যেখানে টাকার ঘণ্ট সেইখানে ঘটা।
রমণীয় নানা দ্রব্য বিকাশিছে ছটা॥
আকণ্ঠাত হোটেলের আয়োজন ভারি।
কৈলাশ কি ইন্দ্রালয় বুঝিতে না পারি॥
নানা উপাদেয় দ্রব্য যেজের উপরে।
লোভীর আকৃষ্ট মন বিমোহিত করে॥
যে দেখেছে নয়ন স্বার্থক বলি তার।
যে খেয়েছে জন্ম তার না হইবে আর॥
বড় দিনে বড় লোকে বড়ই প্রমোদ।
বড় বড় বন্ধু লয়ে করেন আমোদ॥
বড় বড় গাড়ী চোড়ে গড়্ গড়্ রবে।
বড় বড় বাড়ী যান ভুল মনে সবে॥
বড়ই খানার ধুম যথায় তথায়।
পেটুক জনেরা সুখে পেট ভোরে খায়॥
কাঁদি কাঁদি কলা দেখি বাজারে বাজারে।
বড় বড় ভেটকি আইসে ভারে ভারে॥
রম্ভাদম রাধাগণ রম্ভা ভালবাসে।
চাঁপা রম্ভা পেয়ে সুখ সাগরেতে ভাসে॥
কমলালেবুর কথা কি বলিব আর।
নগরে বাজারে লেবু খুঁজে মেলা ভার॥
কমলার প্রিয়বন্ধু খৃষ্টিয়ান দল।
লইলা কমলা করে হাসে খল খল॥
কমলার প্রিয়জন কুতুহলে খায়।
কমলা-প্রিয়জনের অভিশয় দায়॥
বাসনা পূরিয়া সুখ ভুঞ্জিতে না পায়।
অর্থাভাবে সদা ভাবে কি করে উপায়॥

• • • [ক্রমশঃ

শেষ প্রান্তে

শ্রীঅনিল মজুমদার

'জয়পুর যাও নি, তাহ'লে আর ভারতবর্ষের দেখলে কি' বন্ধুবরের কথাটা এখনও মনে পড়ে।

তাই সেবার যখন দিল্লী গেলাম, ঠিক করলাম জয়পুর দেখাটাও এবার সেরে যাই।

দিল্লী থেকে জয়পুর খুব বেশী দূর নয়। একরাত্রির পথ।

আমেদাবাদ মেল ছাড়ে রাত দশটায়, সেবরাত্রের দিকে জয়পুর এসে পৌছয়।

খুব সুবিধে।

তাছাড়া বিটায়ারের দৌলতে রাত্রে ঘুমোবারও খুব তেমন অসুবিধা নেই।

তাই করলাম।

ট্রেন ছাড়তে তখনও দেরী আছে। এক প্যাকেট সিগারেটের সন্ধানে প্লাটফর্মে পায়চারি করছি এমন সময় রমুর সঙ্গে দেখা

'কি বিভূদা, কোথায় চলেছ?' জানতে চাইলে রমু।

জবাব দিলাম 'জয়পুর'।

রমু আমার গ্রামের ছেলে। আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। কলকাতাতেই চাকরী করে। হঠাৎ তাকে দিল্লীতে দেখে আমিও কম আশ্চর্য হলাম না।

প্রশ্ন করলাম 'তুই হঠাৎ এখানে?'

জবাব এল 'জানোনা বুঝি। আজ কাল ত আমি দিল্লীতেই থাকি।'

'বলিস কি? কতদিন?'

'তা মাস কয়েক হোল।'

কলকাতায় থাকতে প্রায়ই গ্রামে যেত রমু। তাই বললাম 'গ্রামে তাহলে আর যেতে পারছিস না'।

'কেন পারবো না। লম্বা ছুটি পেলেই একবার করে গ্রামে ঘুরে আসি। তোমরা ত গ্রাম ছেড়েই দিলে' অভিযোগ জানালে রমু।

অনেকটা তাই।

কয়েক বছর আগে একবার গ্রামে গেছলাম কিন্তু খুব তেমন ভাল লাগেনি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সেখানে অনেক কিছু হয়েছে। স্কুল হয়েছে, টিউবওয়েল হয়েছে, হাসপাতাল হয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রাম জীবনের সেই আসল রূপটুকুও যেন সে চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে।

বটতলার সে আড্ডা আর নেই। ফকরিনির ছেলে বিন্দে আর ছানার জিলিপি তৈরী করেনা। ঠাকুর দালানে বসে বুড়োরা আর হুকো টানেনা, জগা ঘুচির ছেলে আর ঢাক বাজায় না, সে নিয়েছে কারখানায় চাকরী, বংশী শানাইওলা এখন বুড়ো বয়েসে শানাই ছেড়ে সিড়ি বাঁধে, বিষ্টু পুরোহিতের ছেলে তার জাতব্যবসা ছেড়ে এখন হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারি করে।

কামারশালা উঠে গেছে, যাত্রা গান আর নেই, হরি সংকীর্তনের দলও ভেঙ্গে পড়েছে। লোকে এখন ইলেকট্রিক ট্রেনে চড়ে কাছাকাছি সহরে গিয়ে সিনেমা দেখে, গভীর রাত্রে শিস্ দিতে দিতে বাড়ী ফেরে, আর ঘরে বসে রেডিও শোনে।

বাড়ীর পুজো পার্বণ এখন উঠে গেছে, সেখানে হয়েছে 'বারোয়ারী', শুরু হয়েছিল একখানাতে এখন হয়েছে পাঁচখানা ভবিষ্যতে আরও বাড়বার আশা আছে। পুরুত আজকাল তাড়া করে আনতে হয়, গঙ্গাজল আসে এখন জীপে করে, ছেলেরা এখন চণ্ডীমণ্ডপে দল বেঁধে বসে 'সুগম' সঙ্গীত গায়, মাঝে মাঝে বিয়েটারও করে, বই হয় 'উড়ন চাকতি' না হয় 'চাদমুখো'।

একটা দারুণ ওলট-পালট।

আসল কথা পল্লীর মানুষ এখন তার নিজস্ব সীমানা ছাড়িয়ে অসীমের সাথে মিশে গেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে প্রশ্ন করলাম 'মিনুদি কেমন আছে!'

'সোনোনি বুঝি' জবাব দেয় রমু 'তিনি ত অনেকদিন গ্রাম ছাড়া।'

'গ্রাম ছাড়া!'

'হ্যাঁ। সেবারের সেই বন্যার কথা শুনেছিলে ত।'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'তাতেই তার ঘর বাড়ী সব ভেঙ্গে পড়ে। ভায়েদের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলেন কিন্তু তারপরই হোল আর এক দুর্ঘটনা। মেয়েটাও মারা গেল।'

'স্বর্ণও গেছে? কি হয়েছিল তার?'

'পুকুরঘাটে জল আনতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা যায়।'

সাপ না অভিশাপ কিছুই বুঝলাম না।

স্তব্ধ হয়ে শুনলাম সব।

মিনুদি আমার আত্মীয়া নন, তিনি আমার গ্রামেরই মেয়ে। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়, সেই সূত্রেই তিনি আমার দিদি।

বিয়ে হয়েছিল কুষ্টিয়া সাবডিভিসনের এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে। স্বামীর অবস্থা ছিল খুব ভাল। কিন্তু দেশ-বিভাগের ফলে সে গ্রাম গিয়ে পড়ে পাকিস্থানের গর্ভে। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে সর্বস্ব খুইয়ে আবার বাপের বাড়ীতেই ফিরে আসতে হয়।

সেবারও গ্রামে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছিলাম।

বাপের বাড়ীর পাশে ছোট্ট একটি চালা তুলে তাতেই বাস করছিলেন মিনুদি। সবে বিধবা হয়েছেন, বয়সের তুলনায় অনেক বুড়িয়ে গেছেন। পোষাক-আসাকও অত্যন্ত জীর্ণ।

প্রথমটা চিনতে পারেননি, পরে চিনেছিলেন। বলেন ওরে বাবা, তুই যে দেখছি মস্ত ভদ্দরলোক হয়ে গেছিস।

তিরিশ বছর বাদে দেখা।

এতদিন সহরে বাস করে ভেতরটা যা হোক না কেন বাইরেটা অনেকখানি বোপ-দুরস্ত হয়ে গেছল।

তখনই ডাক পড়ল স্বর্ণর। মিনুদির একমাত্র মেয়ে।

'ওরে, ও সন্ন কোথায় গেলি, এদিকে আয়। তোর যে এক মামা এসেছে।

ঘর থেকে ছুটে আসে স্বর্ণ।

বছর পনের বয়েস। মা বসানো মুখ। রঙটা শুধু একটু কালো।

কাছে আসতেই মিনুদি বললেন। ওকে পেন্নাম কর, সন্ন। ও আমাদের ওক্তি কাকার ছেলে বিশু। ছেলে বেলায় কি দুষ্টুই না ছিল, এখন ভদ্দরলোক হয়েছেন।

পেন্নাম সেরে তখনই ছুটে গিয়ে একখানা চাটাই এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিলে স্বর্ণ।

তাতেই বসলাম। মিনুদিও এসে আমার পাশে বসল।

তারপরই শুরু সব পুরোণো কথা। একের পর এক করে বলে যান মিনুদি। আমি আর স্বর্ণ মন দিয়ে তাই শুনি।

একবার বললেন 'এ্যাদ্দিন বাদে এলি, তোকে কি খেতে দিই বলত! ঘরে ভাজা মুড়ি আছে, খাবি।

বললাম 'কেন খাবনা, মিনুদি, ওর চেয়ে ভাল জিনিষ আর কি আছে?'

উঠে গিয়ে তখনই তিনি এক বাটি মুড়ি আর দুটো কাঁচা লঙ্কা নিয়ে এলেন। বাটিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন 'তোর গরীব দিদির বাড়ীতে এখন এর বেশী আর কিছু জুটবেনা, ভাই। শুনেছিস ত সব।'

সবই শুনেছিলাম।

তাই ইচ্ছে করেই এ নিয়ে আর কোন কথা তুলতে চাইনি। আলোচনায় দুঃখ শুধু বাড়ে, কমেনা। মিনুদিকেও দেখলাম ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সে দুরবস্থাটাকে তিনি অনেকটা মেনেই নিয়েছেন।

তাই একবার কথায় কথায় বললেন 'কি করব বল, সবই আমার কপাল, তা'নাহ'লে আর এমন জিনিষ হবে কেন?'

যে কদিন গ্রামে ছিলাম রোজই গেছি মিনুদির কাছে। স্বর্ণও আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে। নানান রকম গল্প শুনতে চাইত, মায়ের কথাতে ও মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করত।

জামাইবাবু আগেই গত হয়েছিলেন। একদিন তাঁর কথা উঠতে মিনুদি চোখের জল মুছে বললেন 'মরেনি যে ভাই, বেঁচেছে। সর্বস্ব খুইয়ে আবার এসে শ্বশুর বাড়ীতে বাস করা। একি কম ঘেন্নার কথা! সেকি আর পুরুষের প্রাণে সয়, আমরাই পারি।

মিনুদির অবস্থা দেখে ইচ্ছে হয়েছিল তাঁকে যদি কোনরূপ সাহায্য করতে পারি। একদিন কথায় কথায় তার একটু আভাসও দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তা নিতে চাননা। বলেছিলেন, 'আমার কপালের সঙ্গে আর তোকে কেন জড়াই ভাই, তুই ভাল আছিস ভাল থাক, তাতেই আমি খুশী। বরং সময় বিয়ের সময় আসিস, তাতেই আমার মস্ত সাহায্য হবে।

সে আশা আর মিটল না মিনুদির।

তার আগেই সব চলে গেল।

গার্ড সাহেব হুইশেল বাজান। ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা পড়ে। প্লাটফর্ম প্রান্তে নীল আলোটাও জ্বলে ওঠে।

গাড়ীতে চড়ে বসি।

রমু বললে 'ফেরার পথে আমার এখানে ঘুরে যেও বিভদা। আমি থাকি বিনয়নগরে।'

বললাম 'আচ্ছা'।

ট্রেন চলতে শুরু করলে। আস্তে আস্তে প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে চলে এল। নিজের বিছানাটাকে ভাল করে পেতে একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু পারলাম না।

পুরোণোদিনের কথাগুলো আবার যেন নতুন করে চোখের সামনে জেগে উঠল।

ছেলেবেলাকার কথা।

গ্রামেই থাকতাম।

সবে তখন পাঠশালায় ভর্তি হয়েছি। পণ্ডিতমশায়ের ওখানে দায় বেঁধে নামতা পড়ি। ভুল-ভ্রান্তি হ'লে কানমলা খাই। কখনও কখনও কান ধরে পাঠশালার বাইরে চড়া রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকি আর মনে মনে ভাবি কবে বড় হব, কবে এই জেলখানা থেকে মুক্তি পাব।

মিনুদির এ সব জ্বালা যন্ত্রণা ছিলনা। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা যা কিছু সবই তার মা ঠাকুমার কাছ থেকে। তাঁদের কাছে বসেই রামায়ণ মহাভারত শুনতেন। 'শিবরাত্রির দিন উপোস করতেন। শ্রদ্ধাভরে শিবের মাথায় জল ঢালতেন। সন্ধ্যেবেলা কাচা কাপড় পরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালতেন আর আমায় মাঝে মাঝে শোনাতেন 'এ সব জিনিষ তুই এখন কিছু বুঝবি না, বড় হলে বুঝতে পারবি।'

না বুঝেই কথাগুলো তাঁর মেনে নিয়েছিলাম।

তার আরও একটা কারণ ছিল।

ছেলেবেলায় অত্যন্ত দুষ্টু ছিলাম। লেখাপড়াও করতামই না। বাড়ীতে থাকতে পারতাম না। সুযোগ পেলেই ছুটতাম আমি বাগানে না হয় তেঁতুল বাগানে। কাঁচা আম আর তেঁতুল ছিল অত্যন্ত প্রিয়। আর এ সব বিষয়ে আমার সবার চেয়ে বড় সহায় ছিলেন মিনুদি। তিনিই তাকে নানা রকম মসলাপাতি দিয়ে এমন মুখরোচক করে দিতেন যা খেয়ে মনে হোত যেন অমৃত খাচ্ছি।

একদিন এই করতেই বাবার কাছে ধরা পড়লাম। বেদম প্রহার দিয়ে তিনি আমায় টেনে নিয়ে এলেন মায়ের কাছে। বললেন 'বাঁদরটাকে একটু দেখ। কাঁচা আম খেয়ে খেয়ে কি শেষ পর্যন্ত অসুখে পড়বে?'

ভেবেছিলাম মায়ের কাছে হয়ত একটু সহানুভূতি পাব কিন্তু কিছুই পেলাম না। উল্টে আরও দুঘার বা পিঠে পড়ল আর সেদিনের খাওয়াটাও বন্ধ হইল।

সন্ধ্যেবেলা ছাড়ান পেয়ে মিনুদির কাছে যেতেই যেন সব কষ্ট ভুলে গেলাম। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। সব শুনে বললেন 'খুড়ি যেন কি! একরত্তি ছেলে দুটো কাঁচা আম খেয়েছে, তার জন্যে এত?'

সেদিন মনে হয়েছিল জগতে একমাত্র মিনুদিই আমায় ভালবাসে আর কেউ না। এবং সেই ভালবাসাটা যে আমার মনের মধ্যে কি গভীরভাবে বাসা বেঁধেছিল সেটা সেইদিনই উপলব্ধি করলাম মিনুদি যেদিন বিয়ে করে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন।

সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। তখনও তাঁর ক্ষীণ রশ্মিচ্ছটা আকাশের গায়ে গায়ে ছড়িয়ে আছে।

গরুর গাড়ী চলেছে কাঁচর কাঁচর শব্দ করতে করতে।

পিছন পিছন চলেছি।

গাড়ীর সামনে বসেছেন জামাইবাবু। গায়ে এক লম্বা

গরদের পাঞ্জাবি। কোন দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই যত রাজ্যি তিনি তাঁর নতুন পায়ের জোড়া নিয়ে। রাস্তার ধুলো বালিতে পাছে জুতো জোড়া নষ্ট হয়ে যায় তাই বার বার তাকে কাপড়ের খুঁট দিয়ে পুছতেন আর গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখছেন।

সন্ধ্যে হয় হয়।

আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারিদিকে।

মাঠের বাগান ছাড়িয়ে গরুর গাড়ী এসে পৌঁছয় সাবজোলার ঘন জঙ্গলের কাছে।

আর এগুতে সাহস পাই না। সাবজোলার জঙ্গলে মাঝে মাঝে বুনো শুয়োরের উৎপাত হয়।

এগিয়ে গিয়ে জামাইবাবুর কাছে বিদায় চেয়ে বলি 'চললাম, জামাইবাবু, মিনুদিকে নিয়ে আবার আসবেন।'

'নিশ্চয়ই আসব, নিশ্চয়ই' জবাব দেন জামাইবাবু।

আশা ছিল মিনুদি হয়ত কিছু বলবেন। কিন্তু কিছুই বললেন না তিনি। শুধু একবার ঘোমটা তুলে অশ্রুসিক্ত চোখে ঘাড় নাড়লেন।

চুপ করে থাকি।

দেখতে দেখতে গাড়ীখানা সাবজোলার ঘন জঙ্গলের মধ্যে অন্তর্হিত হয়। চোখের জলে অন্ধকারও যেন আমার কাছে আরও ঘন হয়ে ওঠে।

কথা রেখেছিলেন জামাইবাবু।

এর পরে অনেকবার তিনি আমাদের গ্রামে এসেছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে আর তাঁর দেখা হয়নি। ইতিমধ্যে আমি গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছি এবং কয়েক মাসের মধ্যেই সাঁটের কলার তুলে রীতিমত সহরে বনে গেছি।

মিনুদিও আস্তে আস্তে আমার স্মৃতির দিগন্তে অন্তর্হিত হয়েছেন।

ট্রেনখানা হঠাৎ একজায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায়। ঘুমিয়ে ছিলাম কি জেগেই ছিলাম ঠিক জানিনা তবে একবার চোখ মেলে বাইরের আকাশটার দিকে তাকিয়ে মনে হয় তার ঘন কালো রঙটা যেন অনেকখানি ফিকে হয়ে এসেছে।

বুঝলাম জয়পুর আসতে আর বেশী দেরী নেই। জিনিষ পত্রগুলো সব গুছিয়ে নেই।

একটু বাদেই আসে জয়পুর।

আকাশে তখনও তুচারটে তারা দপ দপ করে জ্বলছে।

কদিন খুব ঘুরে বেড়াই জয়পুরে।

নতুন পরিবেশ আর নতুন সহরে এসে ভারী মনটাও তখন অনেকখানি হাল্কা হয়ে এসেছে। আমিও যেন জয়পুরকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছি। এর বিন্যাস, এর স্থাপত্য, কলা, শিল্প, এর ঐতিহ্য, এর ইতিহাস, সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা নতুনের সাড়া খুঁজে পাই।

বন্ধুবরকে তাই মনে মনে স্মরণ করে বলি, ভায়া, ঠিকই বলেছিলে, না এলে সত্যিই জীবনে একটা আক্ষেপ থেকে যেত।

বাঙ্গালীর সঙ্গে জয়পুরের সম্বন্ধ আজকের নয়, সেটা বহুদিনের। সেই রাজা মানসিংহের আমল থেকে। এখনও প্রত্যহ অম্বরপ্রাসাদে তাঁরই আনা 'যশোরেশ্বরী'র পূজো হয় বাঙ্গালী পুরোহিত দিয়ে। তাছাড়া বহুদিন ধরে বহু বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে এ রাজ্য অনেক বিষয়ে জড়িত।

যত দেখি ততই যেন দেখার স্পৃহা বাড়ে। দেখারও যেন শেষ হয়না। একটা জিনিষই বার বার দেখি। তবু মনে হয় আরও যেন কিছু দেখতে বাকি রইল।

সেদিন রাজপ্রাসাদের এক প্রান্তে গোবিন্দজীর মন্দির প্রাঙ্গণে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়েছে। আকাশ ঘন অন্ধকারে ঢাকা। দূরে আরাবল্লী পাহাড়ের গায়ে গায়ে ফুটে উঠেছে বিজলী বাতির আলো।

সন্ধ্যারতি চলেছে গোবিন্দজীর।

তাঁর সেই মুঠাম সুন্দর মুখখানির দিকেই এক দৃষ্টে তাকিয়েছিলাম।

হঠাৎ একদল ভিখিরী এসে সামনে দাঁড়ায়।

আবছা অন্ধকারে হাত পেতে একজন পরিষ্কার বাংলায় ভিক্ষেও চায়।

চমকে উঠি।

সামনে মিনুদি।

শতচ্ছিন্ন পোষাক, মাথার চুলে জট পাকানো, চোখে মুখে একটা অপ্রকৃতিস্থের ভাব।

'মিনুদি' বলে ডাকতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ভরসা পাই না। ঘুরিয়ে বলি 'আপনি বাঙ্গালী ?'

হি হি করে পাগলের মত হেসে ওঠেন মিনুদি। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে যেন এক ঝলক আগুন। হাসি থামিয়ে বলেন 'এ বাঙ্গালী নয় গো, কাঙ্গালী।'

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকি।

মাথা তুলতে আর তাঁকে দেখতে পাই না। মন্দির প্রাঙ্গণের বিশাল জনতার মধ্যে তখন তিনি কোথায় অন্তর্হিত হয়েছেন।

গোবিন্দজীর সন্ধ্যারতিও তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বাংলার ভগীরথ—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সগররাজার ষাটহাজার পুত্রদের অভিশাপ হতে চির উদ্ধার মানসে ঋষি ভগীরথ পতিতপাবনী, কলুষনাশিনী ভাগীরথীধারাকে বইয়ে এনেছিলেন মর্ত্যের ভূমিতে—সেই পবিত্র গঙ্গাধারায় অবগাহন করে শত শত নরনারী লাভ করছে তৃপ্তি, শান্তি অধিকারী হচ্ছে পুণ্যের। বর্তমানে যিনি আমাদের এই বাংলাদেশে তাঁর কাব্য-স্রোতে বইয়ে চলেছেন পতিত-পাবনী সুরধুনীর ধারা—তিনি হলেন বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, অমৃতস্বরের ঋষি কুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আমাদের এই দেশ পুণ্যভূমি। এদেশের পথে প্রান্তরে ধূলিকণায়, অণু পরমাণুতে ছড়িয়ে আছে বিশ্ব-মায়ের আশীর্বাদ। এদেশের আকাশে বাতাসে ব্যাপ্ত হয়ে আছে মহা-ওঙ্কার ধ্বনি এদেশের সাধকেরা দেবতাকে টেনে এনেছে অত্যন্ত নিকটে। মাতৃরূপে আহ্বান করে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছে, 'মা, আমি কিছুই চাই না শুধু তোর রাতুল-চরণে যেন স্থান পাই।' এদেশের এই যে বৈশিষ্ট্য, এই যে চিরন্তন ঐতিহ্য—একে সাধনে ধরে আছেন কবি কুমুদরঞ্জন তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিতে। আধুনিক এই যন্ত্র সর্বস্ব যুগে, প্রাণহীন মেকী সভ্যতার মূলে—প্রাচীন পবিত্র ধারাকে রূপে, রসে সঞ্জীবিত করার গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। বর্তমানকালে কবিতার নামে যে অর্থহীন দুর্বোধ্য, উদ্ভট শব্দের সমাবেশে মূল্যহীন গদ্য কবিতা ভূরি ভূরি সাময়িক পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হচ্ছে, কবিরা যেখানে সাহিত্যের নামে চালিয়েছেন ভেজালের কুৎসিত বেসাতি, সেই সময় ছন্দ, বর্ণ, ভাবের সম্ভার নিয়ে যে বিশুদ্ধ, পবিত্র কাব্যস্রোত তিনি বইয়ে চলেছেন—তার তুলনা নেই। তাঁর কবিতার স্নিগ্ধ, শীতল স্পর্শে জুড়িয়ে যায় সারা মন-প্রাণ। প্রসিদ্ধ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার যথার্থই বলেছেন, "কুমুদরঞ্জন বাংলার আসল কবি।"

কুমুদরঞ্জনের প্রকৃত পরিচয় তিনি সাধক, মরমী, সর্ব-ত্যাগী। তাঁর মন-প্রাণ সম্পূর্ণভাবে তিনি সমর্পণ করেছেন চির-আরাধ্যা, করুণাময়ী বিশ্ব-মায়ের চরণতলে। দিয়ে-ছেন ভক্তি-অর্ঘ্য,—

"জেনেছি বা হলে ইচ্ছা মায়ের, জীর্ণ পাতাও
পড়ে না ঝরি,
তিনি বিশ্বাস, তিনি নিঃশ্বাস, তিনিই মা
রাজ-রাজেশ্বরী।
মুখরিত হয়ে উঠে এ ভবন, কতদিন তাঁর অঙ্গবাসে,
তাঁহার ভালের খণ্ড চন্দ্র দেখেছি সহসা আঁধার নাশে
দেখা দেন তিনি, কথা কন তিনি, তবু প্রতি পদে
বিঘ্নবাধা,
বালিকের যে কথা তা ঠিক—ঘোরে সাথে শত
গোলকধাঁধা।"

বিশ্ব-মায়ের প্রতি এই অখণ্ড, সুদৃঢ় বিশ্বাসের বলেই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, জাগতিক দুঃখ-কষ্টই জীবনের চরম কথা নয়, তার পরিসমাপ্তি আছে। তাই জীবনের শত বিঘ্ন-বাধা, ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে তাঁর আশাবাদী মন জানতে পেরেছে—

"জীবনে অলীক নিন্দার ভার
বহা নহে নিষ্ফল।
মায়ের কৃপায় সুধা হয়ে ওঠে
অঙ্গে সেই গরল।"

পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী কবির কাছে ঈশ্বর-ভক্ত সাধু সন্তেরা এক বিশেষ মর্যাদার পাত্র। তাঁদের জীবন-বাণী তাঁর একমাত্র জাগ্রত আদর্শ, পথপ্রদর্শক। কবির অমর লেখনীতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে অমৃতপিয়াসী সাধুসন্তদের নির্মল প্রতিচ্ছবি—

"অপার্থিবের তারা কারবারী, অকথিত বাণী
তারাই কহে—
পরতপার আদেশ পালিতে পরভূতেরা দাঁড়ায়ে রহে।
কি করিতে পারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, বিশ্ববিজয়ী শিল্পপতি?
একটা অমন অকেজো মানুষ ফিরাইয়া দেয়
যুগের গতি।
এটম বোমার চেয়ে বহুগুণে পরমেণু তার শক্তিশালী
সে কোটী প্রাণীকে প্রেতত্ব নয়—দেবত্ব দিতে পারে
যে থালি।
সাধুরাই শুধু এ ভুবন নয় এ পারে ত্রিভুবনে তৃপ্তি দিতে,
তুমি জল বায়ু অন্তরীক্ষ পুণ্য করিছে অলক্ষিতে।
তাদের ভজন, তাদের সাধন সব আচরণ সৃষ্টিছাড়া,
সব শৃঙ্খল ছিন্ন করেছে—ভয়ামায়া ও লজ্জাদারা।"

কবির এই সাধক-দৃষ্টির মধ্যে কোন গোঁড়ামি, কোন সঙ্কীর্ণতা নেই। তাঁর দৃষ্টি সার্ব্বজনীন। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্মই তাঁর আদর্শ, প্রত্যেক মহাপুরুষই তাঁর প্রণম্য। তাই খ্রীষ্টান জগতের মহামানব যীশুখৃষ্টকে নিবেদন করেছেন অন্তরের অমলিন ভক্তি-নৈবেদ্য—

"খ্রীষ্টান নহি প্রভু,
তোমার ক্রুশের বেদনা যে আমি
অনুভব করি তবু।
প্রসন্নতা ও প্রসাদ তোমার চাই,
মোর দেবতার পাশেই তোমার ঠাঁই,
ক্ষমা-সুন্দর তোমার মূরতি
ভুলিতে পারি কি কভু?
ধর্ম্ম তোমার নিয়েছে যাহারা
নিয়েছে তোমায় চিনা,
সন্দেহ হয় আমার দয়াল
তোমারে নিয়েছে কি না?
তোমার কথা কি একবার তারা ভাবে?
তোমার স্বর্গে প্রবেশ তারা কি পাবে?
মমত্ব-বিহীন করিতেছে দিন,
বসুন্ধরাকে দীনা!"

কুমুদরঞ্জনের ঈশ্বরের প্রতি এই অকৃত্রিম অনুরাগ ও অবিচল নিষ্ঠা স্মরণ করে কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয় বলেছেন—

"এই যুগের বিচারে কুমুদরঞ্জনের একটি অপরাধ তিনি ভক্তকবি। ভক্তি বস্তুটি এ যুগে উপহাস্য। ভক্তি যে প্রেমেরই একটী রূপ, প্রেম যে পুষ্প, আর ভক্তি যে তাহার ফল, একথা অনেকে ভুলিয়া যান। এই প্রেম কেবল তাঁহার অভীষ্টদেবের প্রতি নয়—যাহা কিছু মহৎ, সৎ, পবিত্র, সুন্দর ও অপূর্ব্ব কবির প্রেম তাহারই প্রতি।"

ছোট-বড়, উঁচু-নীচ, ধনী-দরিদ্র—সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি কবির সমদৃষ্টি, সমান মমত্ববোধ। মানুষ মানুষই, এই তাঁর কাছে একমাত্র পরিচয়। জীবন-ইতিহাস রোমন্থন করে যখন তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো একটী ভিখারীকে শুধু একটি পয়সা দিয়ে তিরস্কার করার ছবি—তখন তাঁর অন্তরাত্মা ক্ষোভে, দুঃখে, বেদনায় আর্ত্তনাদ করে উঠলো। আদিকবি বাল্মীকির মত তাঁর অন্তর হতে উৎসারিত হলো তীব্র ব্যথা—

"একটা শুধু পয়সা দিয়ে রুকেছিলাম বড়,
আজকে তাহা বিঁধছে বুকে কুশাঙ্কুরের মত।
সাধ্য নাহি ভুলতে তো আর
শক্তি নাহি ভুলতে তো আর
জনম ধরে রয়ে গেল নিজের দেওয়া ক্ষত।
ক্ষমা চাওয়ার সময় গেছে চা'ব কাহার কাছে
ভিখারী আজ নাগাল ছাড়া—সুদূর দেশে আছে।
কথা তো সে কয়নি কিছু
করেছিল মুখটী নীচু,
মলিন দু'টি চক্ষু হলো অশ্রু-ভরা নত।"

কবির জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, সাধারণ জিনিসের প্রতি অসাধারণ সহানুভূতি, আন্তরিক ভালবাসা। তাঁর মতে বৃহতের চেয়েও ক্ষুদ্রের আবেদন বেশী মর্ম্মস্পর্শী। তাই 'ছোটর দাবী'তে তিনি লিখেছেন—

"রামায়ণের অনেক ভুলি রাবণ রাজার চিতার সাথে,
ভুলতে নারি রামের মিলন গুহক গৃহে মিতার সাথে।
ভুলি কোশল পৌরভবন
ভুলতে নারি অশোক কানন
সরমার সে সখীর প্রীতি অভাগিনী সীতার সাথে।"

ছোট ছোট টুকরো টুকরো স্মৃতিরও কি বিরাট আবেদন, তা দেখিয়েছেন—

"মনে পড়ে দূরে ছাদ হতে সেই রুমাল উড়ানো কার ?
কাঁধে ছোট নাতি, মেলা হ'তে ঘরে ফেরে শিখ-সর্দার।
আলঙ্করের সরিষার ক্ষেতে এখনো কেন যে স্মৃতি—
দাঁড়াইয়া ছিল কুবলয়-বালিকা রঙীন ঘাঘরা পরি।
চেকে আছে মন গোটা—
রামধনুকের সপ্তরঙের এই সব ছিটে-ফোঁটা।"

কুমুদরঞ্জনের এই তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, সাধারণ জিনিষের প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধ সম্পর্কে কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন—

"তুচ্ছ ক্ষুদ্র যাহা কিছু তাহাই তাঁহাকে ভাবাকুল করিয়া তোলে। কবিগুরু লিখিয়াছিলেন—

"বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটী ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দু।"

এই শিশির বিন্দুটি যিনি প্রতি প্রভাতে দুয়ার খুলিয়াই দেখিতে পান—তিনি এই কুমুদরঞ্জন।"

কবি কুমুদরঞ্জন প্রাচীনকালের সরল নিরাড়ম্বর ও পবিত্র জীবনযাত্রার প্রতি আস্থাবান। বর্তমানকালের এই প্রাণহীন মেকী সভ্যতা ও যান্ত্রিক সর্বস্ব সমাজের প্রতি তাঁর আসক্তি নেই। তাই বর্তমানযুগে বৈজ্ঞানিকেরা যে ধ্বংসলীলায় মেতেছেন, তৈরী হচ্ছে নূতন নূতন এ্যাটম বোমা মারণাস্ত্র—তাতে তাঁর অন্তর-বীণায় বেজে উঠেছে বেদনার সুর। সেই ধ্বংসকামীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন—

"বিষব্যবসায়ী, পরম বণিক, একি তব উদ্যোগ,
আনিবে প্রলয় রাত্রির দুর্যোগ ?
অপশক্তির কেন করি অর্চন
বিষাক্ত করি তুলিতেছ দেহ মন ?
ডাকিছ মৃত্যু মন্বন্তর অনন্ত দুর্ভোগ।
অমৃতপুত্র, অমৃতান্বেষী, অমৃত পিয়াসী নর
মারণমন্ত্র জপে কেন তৎপর ?
লক্ষ নরের বধে কেন উল্লাস ?
কোটী কোটী জীব কি হেতু করিবে নাশ ?
হওনা একটী মৃত পিপীলিকা
বাঁচাতে অগ্রসর।"

আধুনিক যুগে পৃথিবীতে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের ক্ষমতাপ্রদর্শনের তীব্র নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা চলেছে। আর তারই ফলস্বরূপ কৃত্রিম চন্দ্রের আবির্ভাব শূন্যপথে। কবি সেই কৃত্রিম চন্দ্রকে উপহাস করে বলেছেন—

"ও চাঁদ পাবে কি গ্রহের সমাজে স্থান ?
কাব্য কি ওরে মাধুরী করিবে দান ?
চন্দ্রভাগীর সোহাগে আদরে বাড়ি'
হতে কি পারিবে অমৃতের অধিকারী।
উদয়েতে মহাসাগরে আনিবে বান ?"

আজকের এই বস্তুসর্বস্ব যুগে মানুষ হয়ে উঠেছে বস্তুতান্ত্রিক। প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁদের কাছে মূল্যহীন—কবির কাব্য তাঁদের কাছে হেঁয়ালী, অর্থহীন, অলস-মনের কাঁচা কল্পনা। কবি এ-সম্পর্কে বলেছেন—

"কবির কর্ম বুঝিবে বন্ধু যতটুকু জানি এই দু'হারে
দুখের শিখরে সুখের অলকা সৃষ্টি করিতে সেই যে
পারে।
মহাসাগরের সোহাগ-পরশ হেরে কবি পাখিপক্ষি গায়ে
শোনে চন্দন-বনের কাহিনী নিদাঘের ঘন কদাবাতে।
প্রাসাদ-নগরী মর্মরপুরী কবে যাবে উবে স্থিরতা নাহি।
পৃথিবীর সব বস্তুর চেয়ে স্বপ্ন কবির অধিক স্থায়ী।"

কবির কাব্যদৃষ্টিতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে জননী জন্মভূমির প্রতি তাঁর একান্ত ভালবাসা। কবিশেখর কালিদাস রায়ের মতে, "কুমুদরঞ্জনের কাব্য-সৃষ্টির মূলে আছে জন্মভূমির প্রতি, বাংলার প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি গভীর প্রেম।" জন্মভূমি তার অপূর্ব রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে কবির হৃদয়কুঞ্জে। তার প্রতিটি গাছপালা, নদনদী, ধূলিকণা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য নিয়ে ধরা দিয়েছে তাঁর কাছে। অরুননদের বন্যায় ভেসে যাওয়া একটি বকুল গাছকে উদ্দেশ্য করে তাই তিনি বলেছেন—

"নন্দনে ঠাঁই হউক তোমার কল্পতরুর কাছে
গ্রামের তরুণ বৃদ্ধ বালক স্বর্গ তোমায় যাচে।
স্বর্গ থেকে বকুলতরু মর্ত্য-পানে চেয়ে
আশীর্বাদী তোমার ফুলে বুকটি দিও ছেয়ে।

মিত্র ও দৌহিত্র আমি তুলতে তোমায় নারি
আমায় করো তোমার প্রেমের উত্তরাধিকারী।"

বার বার অন্তরের তুষারশুভ্র বন্যা গ্রাস করেছে তাঁর গ্রাম, প্লাবিত করেছে তাঁর বাসগৃহ। কিন্তু কিছুতেই তিনি জন্মভূমি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে রাজী নন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ তাঁকে টলাতে পারেনি। প্রাণাধিক প্রিয় সেই জন্মভূমিকে তিনি দিয়েছেন প্রাণের নির্মল আহুতি—

"ফিরে যদি জন্মাতে হয় এই করুণা চাই
এই গ্রামেতেই দিও দয়াল ফিরে আমায় ঠাঁই।
দেবালয়ের এ অঙ্গনে
আনব আবার শুভক্ষণে
তুচ্ছ করি ইন্দ্রপুরী নন্দন-কানন।"

শুধু জন্মভূমি নয়, বাংলাদেশের ও বাঙালী জাতির সঙ্গে তাঁর আছে নাড়ীর টান। বর্তমানকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীরা যতই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার চেষ্টা করুক, বাঙালী জাতি যে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাতি—এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতবর্ষকে বিশ্বের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করার মূলে আছে বাংলার দান। কবি বাঙালীজাতির সেই গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস ভারতবর্ষের কাছে তুলে ধরেছেন—

"বাঙালী দিয়াছে ভারতকে সেরা কবি,
বাঙালী দিয়াছে ভারতকে সেরা ছবি,
বাঙালী দিয়াছে ধরণী বৈজ্ঞানিক,
বীর সন্ন্যাসী, বাগ্মী আলৌকিক,
দেছে অনশনে দৃঢ়পণে তনুত্যাগী,
দেশবন্ধু ও নেতা নেতা অনুরাগী,
বাঙালী ঘটালে অঘটন ধরা-গায়,
অবল বঙ্গল পূজারী ও দেবতায়।"

এতক্ষণ ধরে কুমুদরঞ্জনের অনন্যসাধারণ কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, কিন্তু এর চেয়েও বড় গৌরবের অধিকার তাঁর প্রাপ্য। তিনি শুধু কবি নন, তিনি যথার্থ মানুষ। কবিগুরুর ভাষায় "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।" তাঁর সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অন্তরের এই সারল্য, এই নম্রতা তাঁর কাব্যজীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় বিদ্যার ডঙ্কানিনাদ নেই, পাণ্ডিত্যের বাহাদুরী নেই, চোখ ধাঁধানো ছোটুস নেই, সস্তায় বাজিমাৎ করার আগ্রহ নেই। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠেছে যে মীড় গমক মূর্ছনা, তাই পূর্ণতা লাভ করেছে তাঁর কাব্যে। অনাবিল হৃদয়ের স্বচ্ছ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

তিনি সম্মান চান না, অর্থ চান না, যশ চান না। জনকরাজার মতো সংসারের মধ্যেও তিনি নির্লিপ্ত। তাইই প্রতিধ্বনি দেখি তাঁর সৃষ্টিতে—

"কথাতে আর গরল নাহি কথার ভয়ে হইনে ভীত
সকল কথাই আমার কাছে হয়েছে আজ কথামৃত।
নিন্দা যাঁরা করেন আমার করেন না তা বন্ধু বিনে,
ধুলায় ধূসর যে জন তারে ধূলা দেওয়া সেহের চিনে।
যাঁরা করেন সুখ্যাতি মোর—নই না—কারণ বিফল নেওয়া
ন্যাংটা নাগা সন্ন্যাসীকে পরিধানের বসন দেওয়া।
গৌরব আমি রাখবো কোথা? ক্ষুদ্র কণায় আছি টিকে,
রে ভাই ময়ূরপুচ্ছ দিতে এসো না এ টুনটুনিকে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাঁকে জগত্তারিণী পদক দিয়ে সম্মানিত করলেন, তখন তাঁর কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হলো—

"বিনা মায়ের রাঙা চরণ কিছুই চাহি না,
খোকাকে ভুলাতে কি হাতে পদক দিলেন মা?"

নির্লোভ, উদার, সর্বত্যাগী এই কবির কাব্য 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এরই প্রতিধ্বনি। স্রষ্টার অঙ্গুলি সঙ্কেতে এই পৃথিবীতে অনাদিকাল হতে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে চলেছে হাসি কান্না, জোয়ার-ভাঁটার অন্তহীন খেলা—তাই-ই মূর্ত হয়েছে তাঁর কাব্যে। রূপ হতে অরূপে, পার্থিব হতে অপার্থিবে, বিষাদ হতে আনন্দে, জড়ত্ব হতে চঞ্চলতায়, তমসা হতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হতে অমৃতলোকে উত্তরণের অবিমিশ্র কালজয়ী সাধনার ইতিহাসের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী সৃষ্টিতে।

জীবনের প্রান্তদ্বারে এসেও তাঁর সৃষ্টির বিরাম নেই আজও তাঁর মধুময় লেখনীর ধারা ভগীরথের মতো এই মর্ত্যের অবিশ্রান্ত বেগে বইয়ে চলেছেন অমৃতনির্ঝর—যে নির্ঝরে অবগাহন করে অনাবিল শান্তি ও তৃপ্তির অধিকারী হচ্ছে বর্তমান মানুষ—যে নির্ঝর সুধা আনন্দে পান করে নিরবধিকাল ধন্য হবে আগামী কালের নরনারী।

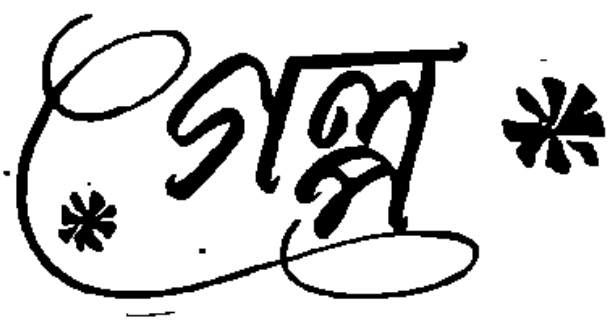

ইজ্জত

শ্রীসুনীলচন্দ্র সেন

কালোবাজারে লাল হ'লাম। মুখে রূপোর চামচ না নিয়ে জন্মেছিলাম। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। সাধারণ-ভাবে এম, এ পাশ করে সাধারণ চাকরি পেলাম। কেরাণী-গিরি। বাধল যুদ্ধ। খুলল একটা নতুন বাজার। নাম কালোবাজার। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কালোবাজারে ব্যবসা শুরু করলাম। কয়েক বছরের মধ্যেই লাল হয়ে গেলাম। দেখলাম মুখে রূপোর চামচ না নিয়ে জন্মেও বুদ্ধির দ্বারা রূপেরা উপায় করা যায়। কলকাতার সবচেয়ে দামী এবং নামী জায়গা নিউ আলিপুরে হাল ফ্যাসানের তিনতলা বাড়ী করলাম। গ্যারেজে একটা গাড়ী এলো। আর এলো ধনীর ইজ্জতের নিশান উড়িয়ে ড্রাইভার।

—তনুশ্রীকে স্কুলে না দিয়ে ভাবছি একজন গভর্নেসকে বাড়ীতে রেখে দিই। সপ্তাহে দু'দিন পড়াবেন। মাসে মাইনে দু'শো টাকা। একদিন হাসি হাসি মুখে বলে জয়শ্রী।

—আট বছরের মেয়ের মাষ্টারণীর মাইনে দু'শো টাকা। অত খরচ না করলে কি চলে না। তুমি তো বি, এ পাশ। তুমিইতো ওকে পড়াতে পারো। প্রস্তাবটার একটু অস্ফুট প্রতিবাদ জানাই।

—আমাদের একমাত্র মেয়ের পেছনে যদি মাসে দু'শো টাকা খরচ করতে না পারি তাহলে পয়সা উপায় করে লাভ কি? ঝাঁঝিয়ে ওঠে জয়শ্রী। যুক্তি অকাট্য। আমি চুপচাপ। তনুশ্রী শুধু আমাদের একমাত্র মেয়ে নয় আমাদের একমাত্র সন্তান। এবং তাও বেশী বয়সের। কালোবাজারে হঠাৎ নবাব হবার উত্তাপ চারিদিকে ছড়াতে চায় জয়শ্রী।

—'আর আমাকে পড়াবার কথা বলছিলে। আমাদের দিনের শিক্ষাপদ্ধতি আজকালকার দিনে মৃত। একেবারে ঠাণ্ডা বরফ। এখন হচ্ছে কিণ্ডার গার্টেনের যুগ। একজন কিণ্ডার গার্টেনের গভর্ণমেসের সঙ্গে কথা বলেছি। সপ্তাহে দু'দিন বুধবার আর রবিবার পড়াবেন। ভদ্রমহিলা অবিবাহিতা, খুব ভালো। তুমি অমত কোরো না লক্ষ্মীটি।'

হাসিমুখে একটু গা ঘেঁষে বসে জয়শ্রী।

—'অবিবাহিতা ভদ্রমহিলাকে বাড়ীতে আনছো। তোমার লক্ষ্মীটি ঠিক থাকলে হয়।' রসিকতা সংবরণ করতে পারলাম না।

—'ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের ওপর এবং একটা পা একটু খোঁড়া। আর তাছাড়া আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া এতো সোজা নয় মশায়।' মশায়ের দিকে চোখ পাকায় জয়শ্রী।

জয়শ্রীর চোখে চোখ রেখে হেসে ফেলি। অর্থাৎ আবেদন মঞ্জুর।

বাড়ীর পেছন দিকের বাগানে প্রায়ই নতুন নতুন গাছ ও রঙ বেরঙের ফুল দেখি। শুনলাম ভদ্রশ্রীর মাষ্টারণী নিজে বাগানের তদারক করেন। জয়শ্রী ও তনুশ্রীর মুখে মাষ্টারণীর গল্প শুনি। মা ও মেয়ে কোরাসে মাষ্টারণীর গুণের ব্যাখ্যা করে। ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে কিন্তু এই বয়সেও যৌবনের সৌন্দর্য উঁকি মারে। আর কি সুন্দর স্বভাব। আহা বেচারীর একটি পা খোঁড়া! মাঝে মাঝে বলে জয়শ্রী। কি সুন্দর পড়ান দিদিমণি। আর আমাকে খুব ভালোবাসেন বলে তনুশ্রী। ভদ্রমহিলা বুধবার এবং রবিবার দুপুরের দিকে আসেন। তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় না। কালোবাজারে লাল হয়েছি। আরো রক্তবর্ণ হবার জন্য দিনরাত তার আবর্তে পাক খাচ্ছি। এমন কি রবিবার দুপুরেও বিশ্রাম নাই। পাছে আলস্যের সুযোগে লাল আবার কালো হয়ে যায়, আলো ঢাকা পড়ে অন্ধকারে সেই ভয়ে চোখ খুলে চারিদিকে ছুটাছুটি করতে হয়।

সেদিন রবিবার। শনিবার রাত্রে একটা পার্টি ছিল। পানীয়ের মাত্রা বেশী হওয়াতে রবিবার শরীরটা ভালো ছিল না। দুপুরে বাড়ীতে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়ে-

ছিলাম। অন্তরও মনে মনে খুশি হয়েছিলো। বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো। আমার মাথাটাও টিপ টিপ করে ধরেছিলো। অন্তর নরম আঙুলের ছোঁয়ায় মাথা ধরা সেরে গিয়ে একটু তন্দ্রা এসেছিলো। হঠাৎ তনুশ্রী ছুটতে ছুটতে এসে বলে, 'বাবা মা, পিসিমণি এসো। আমার হার্টফেল করছেন।' দু জনেরই তন্দ্রা ছুটে গেলো। দু'জনে একদৌড়ে তনুশ্রীর পড়ার ঘরে গেলাম। দেখি তনুশ্রীর হার্টফেল তাঁর চেয়ারের পাশে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। তাঁর হাত দুটো সামনের দিকে বাড়ানো রয়েছে এবং হাতের ইংরেজী বই 'prestige' তখনও ধরা আছে। তাড়াতাড়ি ডাঃ মিত্রকে ফোনে ডেকে পাঠাই। আমার বাড়ীর কাছেই তাঁর বাড়ী। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি এসে পড়েন। ডাঃ মিত্র পরীক্ষা করে রায় দেন, 'করোনারী থ্রম্বসিস। সব শেষ! বেচারী মন্দাকিনী!'

'এঁকে আপনি চিনতেন নাকি! অন্তরের ব্যাকুল প্রশ্ন।

সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে চেয়ারে বসে ডাঃ মিত্র একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর শুরু করলেন বিচিত্র এক ইতিহাস।

কুড়ি বছরেরও আগে বেচারী মন্দাকিনীকে আমি প্রথম দেখি যখন ওর পা ভাঙে। আমাদের বাসা তখন শ্যামবাজারে। আমি সবে ডাক্তারি পাস করেছি। একদিন রাতে পাড়ার রামরতনবাবু দৌড়তে দৌড়তে এসে বলেন, ডাক্তারবাবু, পিসিমার আসুন। সাইকেল আমার মেয়ে মন্দাকিনীর পা ভেঙে গেছে। তৎক্ষণাৎ রামরতনবাবুকে অনুসরণ করি। ডানপিটে কুড়ি বছরের অপরূপ সুন্দরী মন্দাকিনীর ডান পায়ের হাড় দু'জায়গায় ভেঙে গেছে। এ্যাম্বুলেন্সে করে মন্দাকিনীকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে বাড়ী ফিরি। বাড়ী ফিরে এ্যাক্সিডেন্টের আসল কারণ জানতে পারি। হয়তো রামরতনবাবু কারণটা জানতেন। বন্ধুরাজ ছেলেরা নকল করে কারণ বের করে। স্কুলমাস্টার রামরতনবাবুর বাড়ীতে তাঁর ছেলের একটি বন্ধু, এ পাশ ছেলে চাকরির খোঁজে ক'দিন ধরে এসে জুটেছে। ছেলেটি মুসলমান। ছেলেটির ডাক নাম ভোলা। যুবক ভোলা এবং সুন্দরী যুবতী মি, এ পাশ মন্দাকিনী অল্পদিনের মধ্যেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সন্ধ্যার সময় ভোলা দোতলার ঘরে বসে একটা গল্পের বই পড়ছে। মন্দাকিনী ছাদে পায়চারি করছে। আকাশে অনেকক্ষণ ধরে মেঘ জমেছিলো। হঠাৎ ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামে। অনেকদিন পর প্রথম বর্ষার আমেজে খুশি মনে মন্দাকিনী ছাদ থেকে ভোলার ঘরে ঢুকে পড়ে। ভোলা হাতে স্বর্গ পায়। বাতি নিবিয়ে দরজা ভেজিয়ে দু'জনে মুখোমুখি বসে গল্প করে। বৃষ্টির দরুণ রামরতনবাবু দু'একটা টিউশনি বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে যুবক-যুবতীর ফিসফিসানি বৃদ্ধ রামরতনবাবুর কানে ঢোকে। ভোলার ঘরের দরজায় রামরতনবাবু থমকে দাঁড়ান।

এ অন্ধকারে কার সঙ্গে কথা বলছো ভোলা? রামরতনবাবু অসহিষ্ণু প্রশ্ন করেন।

—কারও সঙ্গে নয় কাকাবাবু।' থতমত খেয়ে ভোলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজা আটকে দাঁড়ায়।

—'বয়স হলেও আমি তো কানে কম শুনিনা বাবা। আমি যে মেয়েকণ্ঠ শুনতে পেয়েছি। আলোটা জ্বালো দেখি।' রামরতনবাবু অন্ধকারেই ঘরের দিকে পা বাড়ান।

—'বাতটা হঠাৎ ফিউজ হয়ে গেছে কাকাবাবু।' ভোলা আমতা আমতা করে। মন্দাকিনীকে ঠেলে দেয় ঘরের পেছনের দরজার দিকে।

—দাঁড়াও আমি একটা টর্চ নিয়ে আসি।' রেগে রামরতনবাবু তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে পড়েন।

—'পিসিমার তুমি আলমারির পেছনে লুকাও মন্দাকিনী। তোমার জন্য আমার ইজ্জত নষ্ট হোল। তোমাকে অন্ধকার ঘরে দেখতে পেলে আমি কাকাবাবুর সামনে মুখ দেখাবো কেমন করে? তোমার জন্য আমার সমস্ত জীবন নষ্ট হয়ে যাবে দেখছি।'

'ভীরু প্রেমিক হঠাৎ মন্দাকিনীর উপর ক্ষেপে ওঠে। আলো থেকে বাল্বটা খুলে ফেলে।

'রামরতনবাবু টর্চ নিয়ে এ ঘরের দিকে পা বাড়ান।

'মন্দাকিনী এক দৌড়ে ঘরের পেছন দিকের দরজা খুলে সংলগ্ন ছোট বারান্দায় দাঁড়ায়। একবার নীচে রাস্তার দিকে চেয়ে নেয়। পরক্ষণেই রাস্তায় লাফ দিয়ে পড়ে। মন্দাকিনীর ডান পায়ের হাড় দু'জায়গায় ভেঙে যায়।

'বেচারী মন্দাকিনী জীবনের প্রথম এবং শেষ প্রেমের অধ্যায়ে পা ভেঙে খোঁড়া হয়ে বাকী জীবনটা কুমারী হয়েই কাটিয়ে দেয়। ভোলাকে সেদিন থেকে আর সেপাড়াতে দেখা যায় নি। লোকে বলে ভোলা এখন মস্ত ধনী। জানেন মোহিতবাবু, জানেন মিসেস রায়, ভীরু প্রেমিকের ইজ্জত বাঁচাতে সুন্দরী মন্দাকিনীকে অনেক খেসারৎ দিতে হয়। অবশ্য তার ইজ্জতের কথা কেউ একবার ভেবেও দেখে নি। বেচারী মন্দাকিনী!'

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ডাঃ মিত্র চলে যান।

ছাইয়ে মুখ সাদা হয়ে যায় মোহিতবাবুর ওরফে ভোলার।

চেষ্টা কর

শ্রীজ্ঞান

পরীক্ষার পালা তোমাদের শেষ হয়ে গেছে, ফলও প্রকাশিত হয়েছে। যারা ভাল ফল করেছ তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি, আর যারা বিশেষ সুবিধা করতে পার নি তাদের সহানুভূতি জানাচ্ছি এবং আশা করছি যে এবারে মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে আগামী বারে নিশ্চয়ই তারা ভাল ফল করবে। পরীক্ষায় বা যে কোনও কাজে অকৃতকার্য্য হওয়াটা যদিও নিন্দনীয়, তবুও তাতে হতাশ হলে চলবে না। কোনও ব্যাপারেই আশা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। আর উচিত নয় চেষ্টার ত্রুটি করা। আশা যেমন ছাড়তে নেই, সেই রকম চেষ্টা করাও ছাড়তে নেই। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর, সফলতা আসবেই। ধৈর্য্য হারা হও না। ধৈর্য্য ধরে একাগ্রভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে যে বিষয়েই চেষ্টা কর না কেন, সাফল্যলাভ করবেই। মনে রেখ চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। ঐকান্তিক চেষ্টায় সব কিছুই করা যায়। ফেল্ করা ছেলে পরের বছর ঐকান্তিক চেষ্টায় ফার্ষ্ট হয়ে পাশ করতে পারে। রুগ্ন ছেলে আন্তরিক আগ্রহে শরীর চর্চ্চা করে সবল, সুস্থ, বলবান্ হয়ে উঠতে পারে।

জীবনের সর্ব্ববিভাগেই সাফল্য আনা যায় চেষ্টার দ্বারা, একাগ্রতার দ্বারা। আর এই চেষ্টার সঙ্গে থাকা চাই অভ্যাস—পুনঃ পুনঃ অভ্যাস। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বা চর্চ্চায় যে কোনও বিষয়ে ব্যুৎপত্তিলাভ করা যায়। পড়াশুনার যে বিষয়ে তোমরা দুর্ব্বল, সেই বিষয়ের চর্চ্চায় লেগে থাক। অনবরত চর্চ্চার সেই সেই বিষয়ের দুর্ব্বলতা তোমরা নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং পরীক্ষায় ভাল ফল অবশ্যই দেখাতে পারবে। তবে অভ্যাস বা চর্চ্চায় যেন ত্রুটি না থাকে, ফাঁকি না থাকে। আগেই বলেছি একাগ্রতা এবং ধৈর্য্য থাকা চাই, তা না হলে সম্পূর্ণ সফলতা আসবে না—হয়ত অকৃতকার্য্যও হতে পার এবং তাতে হতাশও হয়ে পড়তে পার। আর এই হতাশা তোমাদের জীবনে—পরবর্ত্তী জীবনে দারুণ দুর্গ্রহের আকারে দেখা দিতে পারে। জীবনে অসাফল্য আছেই, কিন্তু তাকে জয় করতে হবে আন্তরিক চেষ্টায়, যত্নে ও উদ্যমে। আশা করি এ বিষয়ে তোমরা মনোযোগী হবে।

প্রকৃতির খেলা

(চিত্র নাট্য)

শ্রীমতী ঝরণা দেবী

সূর্য্য, বৃষ্টি, মেঘ, চাঁদ, তারা ও আকাশ :
সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

গান

বিশ্বমাঝে মোদের খেলা
চলছে খালি অবিরত,
মোদের সাথে মেতে ওঠে
সুন্দরী গো বসুন্ধরা,
নিত্য নূতন সাজে সে যে হয় গো
কেবল পাগল পারা
মুগ্ধ হয়ে কেবল ভাবে
এই পৃথিবীর মানবেরা,
এই প্রকৃতির খেলা কেবল
চলছে খালি নিয়মমত।

সূর্য্য—ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি জেগে উঠি, পৃথিবীর মানুষেরা অপেক্ষা করে থাকে আমার জন্যে। রাতের অন্ধকার কাটিয়ে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দি আমার এই উজ্জ্বল আলো, দিন বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই উজ্জ্বল আলো তপ্ত হয়ে ওঠে, সহ্য করতে পারেনা পৃথিবীর মানুষেরা। তবুও তারা আমায় ভালবাসে ভক্তি করে দেয় তারা আমায় অর্ঘ্য, জবাকুসুম রক্ত-চন্দন দূর্বা দিয়ে।

তাদের কাণ্ড জেগে ওঠে।

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বাতারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

মেঘ—জানি গো বন্ধু জানি হে তোমার
রয়েছে অনেক শক্তি
মানবের কাছে পেয়েছ তুমি
অচল প্রেমের ভক্তি।

কিন্তু বন্ধু তুমি তো আর জান না, মানুষেরা তোমায় ভালবাসে ভক্তি করে কিন্তু তার চেয়েও তোমায় বেশী ভয় করে।

গ্রীষ্মের সময় তোমার এই তপ্ত হাওয়া যখন তাদের দেহে লাগে তখন তারা খুবই কষ্ট পায় অনেকেই সেই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়।

পৃথিবীর জীব জন্তু মানুষের তৃষ্ণার জল তুমি কেড়ে নাও। নদীর জলকে শুকিয়ে সেখানে কর তুমি মরুভূমি। তাই তোমায় তুষ্ট রাখবার জন্যে পৃথিবীর মানুষেরা দেয় তোমায় অর্ঘ্য। প্রকৃত তারা ভালবাসে আমায়। কারণ তোমার ওই অগ্নিবাণকে একমাত্র আমিই পরাস্ত করতে পারি বলে। তখন তারা গেয়ে ওঠে।

গান

মেঘ এসো, এসো হে মেঘ
আড়াল করে দাঁড়াও তুমি
ওই অগ্নি দীপ্ত দিবাকে
পড়ুক তোমার পরশ ওগো
এই পৃথিবীর বুকে।

বৃষ্টি—সে তো বটেই সে তো বটেই। নিজের গর্ব সকলেই করে তুমি শুধু থাকলেই হয়ে গেল! তুমি তো আর পৃথিবীকে ঠাণ্ডা করতে পারবে না, খালি জমাট অন্ধকার রেখে থাকবে, তপ্ত হাওয়া ঠিকই বইবে, একমাত্র পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে পারে, যদি সে পায় আমার স্পর্শ। নদীর বুকে তুমি কি দিতে পারবে এক বিন্দু জল? মরা নদীকে তুমি কি বাঁচিয়ে তুলতে পারবে কানায় কানায় জল ভরিয়ে দিয়ে? পত্রহীন গাছকে তুমি কি আবার ভরাতে পারবে পল্লবে পল্লবে? সৌন্দর্য্যে ভরিয়ে তুলতে পারবে অজস্র ফুল দিয়ে?

মেঘ—সবই তো বুঝলাম বন্ধু তুমি তো আমারই মধ্যে আছ, আমা হতেই তো তুমি সৃষ্ট। যখন আমি পৃথিবীকে অন্ধকারে ভরিয়ে দি তখনি তো মর্ত্যের মানুষেরা বুঝতে পারে তোমার আসবার সময় হয়েছে।

আমার সহায়তা না পেলে কেমন করে তোমার স্পর্শ পৃথিবীর বুকে পড়বে?

বৃষ্টি—হে বন্ধু আমার স্পর্দ্ধাকে তুমি ক্ষমা কর। এসো বন্ধু আজ আমরা হাত মিলিয়ে গান গেয়ে উঠি।

গান

আমরা একই তালে চলব
মোরা একই সুরে গাইব
মানব না যে কোনই বাধা
মানব না ;
আমরা পাগল হয়ে ছুটব
মোরা অট্ট হাসি হাসব
এমনি করে খেলব মোরা
এমনি করেই মাতব।

চাঁদ—যাও,যাও,তোমরা চলে যাও। যুগ যুগ ধরে তোমরা ধ্বংসের খেলা খেলছ এই পৃথিবীর বুকে। বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছ সারা পৃথিবী, গৃহহারা হয়েছে মর্ত্যের মানুষেরা, কত মানুষের প্রাণ নিয়ে তোমরা খেলেছ ছিনিমিনি।

তোমাদের পদশব্দে পৃথিবী কুঁকড়ে ওঠে আতঙ্কে। তবুও কি তোমরা ভাব মর্ত্যের মানুষেরা তোমাদের ভালবাসে! এ মিথ্যে তোমাদের দম্ভ, এ মিথ্যে তোমাদের অহংকার। আমার এই সুন্দর আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে চামেলী বকুল বেলা ও রজনীগন্ধা চোখ মেলে তাকায়। মন মাতান গন্ধ দিয়ে তারা আমায় সম্ভাষণ জানায়। মানুষের মনে জেগে ওঠে অফুরন্ত আনন্দের জোয়ার। দিনের কর্ম্ম ক্লান্তির পর যখন তারা আমার আলোয় এসে বসে তখন তাদের দেহে ও মনে আমার এই নরম আলোর প্রলেপ বুলিয়ে দি।

তারা—বন্ধু কতদিন আর তুমি আলো দিতে পার এই পৃথিবীর বুকে! তোমরা সকলেই সময় হিসেবে আস আবার সময় হিসেবে চলে যাও। কিন্তু আমাদের আলো চিরকাল চিরদিন ধরে প্রতি রাতে ভরে থাকে। তোমার আলোর চেয়ে আমাদের জ্যোতিঃ অনেক,.. অনেক বেশী। তুমি থাক পৃথিবীর অনেক কাছে আর আমরা থাকি তোমার থেকে অনেক দূরে।

তাই মানুষেরা আমাদের আলো পায় খুব কম। আমাদের এই সামান্য আলোতে পৃথিবী আজ ধন্য। কেন না তোমার ওই হঠাৎ আলোর ঝলকানির চেয়ে আমাদের আলোর ধার অনেক বেশী।

আকাশ—আমার খুব আনন্দ হলো তোমাদের আলোচনা শুনে। সত্যি তোমাদের পেয়ে পৃথিবী আজ ধন্য। তোমরা না থাকলে পৃথিবীর সব কিছু সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যেত। তোমাদের এই খেলা পৃথিবীকে দেয় আনন্দ। কখন সে হাসে কখন সে কাঁদে আবার কখন সে উন্মাদিনী হয়ে নাচে।

আবার কখন সে তোমাদের প্রেমের জোয়ারে ভাসে। একবার ভেবে দেখেছ কি তোমরা, তোমাদের ঠাঁই কোথায় পেলে? পেয়েছ তোমরা ঠাঁই আমার বিশাল এই বুকের 'পরে। আমার বুকে জেগে উঠেছে সূর্য্য তার অগ্নিবাণ নিয়ে। মেঘ অগ্নিবাণকে পরাস্ত করে, পৃথিবীর বুকে ভাসিয়ে দিয়েছে বৃষ্টির জল রাশি। চাঁদ আলোর পরশ ছড়িয়ে দিয়েছে, তারার আলোর মিছিল সাজিয়ে চলেছে বুকের ওপর দিয়ে। তবে শোন হে বন্ধুরা, আমার বুকের ওপরই তোমাদের সৃষ্টি। তা হলে তোমরাই বল কার শক্তি বেশী?

সকলে—সমস্বরে—তোমার, বন্ধু তোমার।

গান

আমরা আকাশের মাঝে খেলছি
ওগো নিত্য নতুন খেলা
আমরা একই সুরে ভাসাই ওগো
একটি সুরের ভেলা
আকাশ তুমি ধন্য ওগো
দিয়েছ মোদের ঠাঁই
মিলে মিশে তোমায় মোরা
শ্রদ্ধা জানাই তাই।

——

হিন্দুধর্ম্ম ও ওয়ারেন হেষ্টিংস

শ্রীভাগবত দাস বরাট,

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম স্থাপয়িতা, দৃঢ়চেতা শাসক ওয়ারেন হেষ্টিংস সমসাময়িক ইতিহাসে নানা কু খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁর শাসন দক্ষতা একদিকে যেমন ইংরাজ রাজ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় ও স্থায়িত্ব প্রদান করিয়েছিল, অপরদিকে ন্যায় নীতির বুকে কয়েকটি গুরুতর ও অমার্জ্জনীয় অপরাধ তাঁর দ্বারা

অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে মহারাজ নন্দকুমারের অন্যায় ফাঁসি ও অন্ধকূপহত্যা। যা তাঁকে বাণীর দৃষ্টান্তে তাঁকে চিরতরে এক দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করেছে। তাঁর মনুষ্যত্ববোধকে খর্ব করেছে। ফলে বিলাতের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ফক্স ও শেরিডনের উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ ওয়ারেন হেষ্টিংসকে স্বৈরাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ শাসকরূপে চিহ্নিত করেছে।

হেষ্টিংস সেই সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলেছিলেন —"অশান্তিপূর্ণ বিশৃঙ্খল ভারতবর্ষে তখন শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংস্কৃতি চাহিতেছিল। প্রধানতঃ ইহা আনয়ন করিতেই আমি চেষ্টিত ছিলাম।"

সাম্রাজ্য গড়ে যাওয়ার প্রতিদানে ইংরাজ জাতি তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ কলঙ্কের অভিযোগের অপমানই প্রদান করেছে এবং তাঁর সমস্ত উপার্জিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে নিঃস্ব করে ছেড়ে ছিল। এই উক্তিও তখন তিনি করেছিলেন। বস্তুতঃ শেষ জীবনে তাঁকে কোম্পানীর সামান্য পেন্সনের উপর নির্ভর করে ডেলস্ কোর্ড এষ্টেটে সাধারণ গ্রামবাসীর ন্যায় জীবনযাপন করতে হয়েছিল।

হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরিচয় বড় অদ্ভুত ভাবে ঘটে। কালক্রমে ইহা তীব্র অনুরাগে পরিণত হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ বাঙ্গলার গভর্ণর হন। তৎকালীন উপদ্রুত ও বিশৃঙ্খল পরিবেশে তিনি আইনের শাসন ও শান্তি আনয়নে প্রয়াসী হলেন। এই সময় হিন্দু আইন বিধি বদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে হেষ্টিংস্ হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ ও সামাজিক প্রথার সঙ্কলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই কার্য্য ব্যপদেশে যে পরিচয় সাধিত হল, তাই তাঁকে এ বিষয়ে ক্রমে শ্রদ্ধাশীল করে তুলে। হেষ্টিংসের এই প্রচেষ্টার পরেই ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের অনুশীলন আরম্ভ হয়।

ওয়ারেন হেষ্টিংস তৎকালে সামরিক ও কূটনৈতিক শক্তিবলে ভারত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেছিলেন। কিন্তু এই পরাক্রমশালী শাসকের অন্তর ভারতীয় বেদ বেদান্তের উপর শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস সোৎসাহে চার্লস উইলকিনস্ নামক ইংরাজ প্রাচ্য তত্ত্ববিদ রচিত ভগবদ্গীতার অনুবাদ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখে দিলেন। তাঁর এই অনুবাদটি তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্টকে উপহার প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে হেষ্টিংস যে প্রশস্তি বাণী লিপিবদ্ধ করেন তাহা সত্য সত্যই এই স্বৈরাচারী শাসকের ধর্মপ্রবণতা ও অন্তর্লোকের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে।

হেষ্টিংস দূরতার সঙ্গে তাঁর লিপিতে লিখেছিলেন,— বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিবার দীর্ঘকাল পরেও ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের রচয়িতাগণ মানুষের স্মৃতি অধিকার করে বাঁচিয়া থাকিবেন। জনমানস হইতে এই সাম্রাজ্যের সমস্ত কিছু গৌরব ও বৈভব মিলাইয়া গেলেও এই শাস্ত্রকারদের বাণীর ঝঙ্কার চিরদিন বিশ্বে অনুরণিত হইতে থাকিবে।

ডেলস্ কোর্ডের গ্রাম্যজীবনে দীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষ বৃদ্ধ ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতীয় শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে কাটাতেন এবং তৎকালে এই গ্রন্থ চর্চ্চাই তাঁর প্রধান উপজীব্য ছিল।

যীশুকে

শ্রীরূপক রায়

যীশু, তুমি মানবের কল্যাণের তরে,
এসেছিলে হিংসা ভরা পৃথিবীর পরে।
দুই চোখে ক্ষমা আর কল্যাণের বাণী,
ছড়ায়ে দিয়েছ দূর স্বর্গ হতে আনি।
বলেছিলে, হিংসা নয় প্রেম ভালোবাসা,
হিংসায় দলিত মনে জেগেছিল আশা।
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী তোমা চিনিলনা,
তোমার আড়ালে করে বিদ্বেষী সাধনা
তব প্রেম প্রীতি ভরা জীবনের মাঝে,
এনেদিল মৃত্যুদণ্ড নির্মম নিলাজে।
তবুও বিদায় লগ্নে, হে অন্তরতম
ভগবানে বলেছিলে' 'ইহাদেরে ক্ষমো।'

চিত্রগুপ্ত

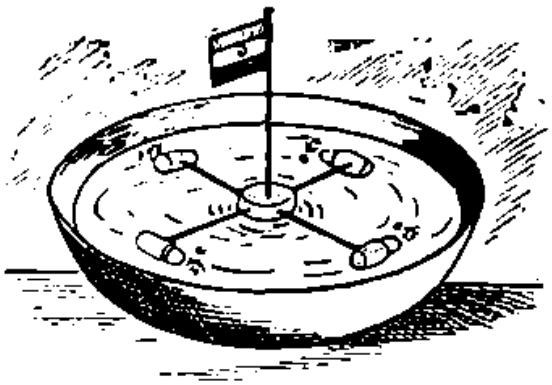

এবারে শোনো—নতুন-ধরণের আরেকটি আজব-মজার খেলার কথা। বিচিত্র-অভিনব এই খেলাটির নাম—'গামলার জলের বুকে ভাসন্ত-চক্রের স্বয়ং-ক্রিয় ঘূর্ণী-লীলা'। নামটি বিরাট এবং ঘটমট-ধরণের হলেও, এ খেলার কায়দা-কানুন কিন্তু খুবই সহজ-সোজা। একটু চেষ্টা করলেই, নিতান্ত-ঘরোয়া অল্প কয়েকটি সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে অনায়াসেই তোমরা বড়দিনের ছুটিতে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের আসরে আজব-মজার এই খেলার কারসাজি দেখিয়ে তাঁদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

এ খেলা দেখাতে হলে, যে সব সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করা দরকার—গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি অর্থাৎ, আজব-মজার এই খেলাটি দেখানোর জন্য চাই—এক গামলা জল, সমান-মাপের পাঁচ-টুকরো লম্বা 'গ্যাল্‌ভানাইজড্-তার' (Galvanized Wire), একটি গোলাকার 'কর্ক' (Cork) বা সোলার ছিপি, পাতলা-কাপড়ের বা কাগজের তৈরী পরিপাটী-ছাঁদের একটি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত ভারতীয়-পতাকা, সমান-মাপের ছোট-ছোট আরো চারটি 'কর্ক' বা সোলার ছিপি, চার টুকরো কর্পূরের ডেলা একখানি ধারালো ছুরি আর একবাক্স দেশলাই।

ফর্দ্দমতো সামগ্রীগুলি জোগাড় হলে, প্রথমেই ধারালো ছুরির সাহায্যে সমান মাপের ছোট-ছিপি চারটির মাথার দিকে বেশ গভীরভাবে গর্ত্ত করে, সেই গর্ত্তের প্রত্যেকটির ভিতরে কর্পূরের ডেলাগুলিকে একের পর এক পাকা-পোক্ত-ধরণে এঁটে বসিয়ে দাও।

এ কাজ শেষ হবার পর, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেকটি ছিপির গায়ে আগাগোড়া বেশ মজবুত-পরিপাটি ধরণে সমান-মাপের 'গ্যাল্‌ভানাইজড্-তারের' টুকরোগুলিকে একের পর এক গেঁথে জোড়া লাগিয়ে দিলেই দিব্যি সহজ উপায়ে বিচিত্র-অপরূপ ছাঁদের একটি 'ঘূর্ণী-চক্র' বানিয়ে তোলা যাবে।

এবারে দেশলাই-কাঠি জ্বালিয়ে ছোট-ছিপি চারটির ডগায়-আঁটা প্রত্যেকটি কর্পূরের ডেলায় আগুন ধরিয়ে, অভিনব ঐ 'ঘূর্ণী-চক্রটিকে' সন্তর্পণে গামলার জলের বুকে ভাসিয়ে দাও। তাহলেই দেখবে—বিজ্ঞানের বিচিত্র-বিধানে গামলার জলের বুকে ভাসন্ত ঐ 'ঘূর্ণী চক্রটি' দিব্যি স্বয়ং-সক্রিয় হয়ে উঠে সহজ সুন্দর ও সাবলীল-গতিতে ক্রমান্বয়ে ঘুরে বেড়াতে সুরু করেছে। তবে জলের বুকে ভাসন্ত এই চক্রের স্বয়ং-ক্রিয়-আজব ঘূর্ণী-লীলা কিন্তু বজায় থাকবে—যতক্ষণ ঐ ছোট-ছোট ছিপি-চারটির ডগায়-আঁটা অল্পস্থ কর্পূরের ডেলাগুলি পুড়ে নিঃশেষ না হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই—তার বেশী নয়। কারণ, অল্পস্থ-কর্পূরের দৌলতেই, জলে-ভাসন্ত 'চক্রের' গতি সঞ্চার এবং তার ফলেই, এই আজব স্বয়ং-সক্রিয়তার উদ্ভব।

এই হলো—এবারের মজার খেলাটির আসল রহস্য।

রহস্যের সন্ধান তো পেলে, এখন বরং নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে ছাখো—আজব-মজার এই নতুন খেলাটির কল-কৌশল।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি অভিনব-বিচিত্র মজার খেলার কথা বলবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

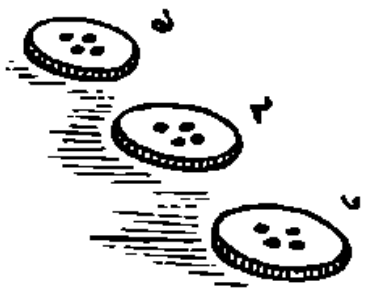

১। পয়সার আজব হেঁয়ালি:

উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে পাশাপাশি তিনটি পয়সা সাজিয়ে রাখো। এবারে মাঝ খানের···অর্থাৎ, ২নং পয়সাটিকে আদৌ স্পর্শ না করে বা এতটুকু না সরিয়ে শুধু বাকি দুটির বুদ্ধি খাটিয়ে সেটির যদি স্থান-পরিবর্তন ঘটাতে পারো তো বুঝবো—বাস্তবিকই বীতিমত বাহাদুর হয়ে উঠেছো আজকাল।···আচ্ছা তো চেষ্টা করে, এ আজব-হেঁয়ালির সঠিক উপায় স্থির করতে পারো কিনা তোমরা।

কিশোর-জগতের সভ্য-সভ্যাদের কল্পিত ধাঁধা :

দুইটি অক্ষরে নাম—
রাজার নন্দন,
উল্টাইলে হয় তার
সুগোল গঠন।
রচনা : জোনাকী বাগচী (পূর্ব্ব-পুটিয়ারী)

৩। আকাশের গায়ে ভাই দেখা মোর পাও,
শেষার্দ্ধ দিয়ে তোমরা সবলেই যাও
প্রথমার্দ্ধ ধরিতে চাও—পারো না ধরিতে,
চার অক্ষরে নাম মোর, পারো কি বলিতে ?
রচনা : বিজনকুমার ঘোষ (হাওড়া)

গত মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর

১। নীচের ছবিতে তীর-চিহ্নিত দেশলাই-কাঠি দুটিকে যথাস্থানে সরিয়ে বসালেই, সহজেই এ হেঁয়ালির মীমাংসা হয়ে যাবে।

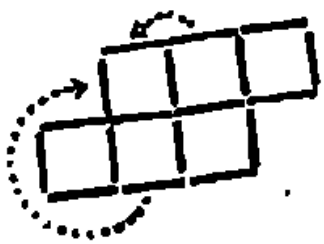

২। মগ

৩। হাজাম (নাপিত)

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

সঞ্জীব, হুঁদোঁ, পুতুল, সুধা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), রবি ও রিনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (দিল্লী), বিজয়া ও সৌরাংশু আচার্য্য (কলিকাতা), অজানা গুহ (কালিম্পঙ্), বীথা, কবিতা, প্রতিমা, মীরা, নমিতা, সুজাতা ও বনানী বসু, হরেন্দ্র, তিমির, মিহির, বারীন্দ্র ও পল্টু ঘোষ (মৌরকেল্লা), পুপু ও তুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সন্তোষ, মুরারি, সরল, সুনীল ও অমিয় (ভিসাই), অমিয়, প্রশান্ত, রাণা, অনিল, অজিত, ভুবনমোহন, রেবতী, অমৃত, মৃণাল ও বরুণ (গড়িয়া), কণীন্দ্র ও পিন্টু সাহা (কলিকাতা), হরিদাস, অরুণ, পৃথ্বীশ, নির্ম্মল, আশুতোষ, লাবণ্য, তুহিনা ও নন্দা দেবশর্ম্মা (কটক)।

গত মাসের দুইটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

রাণা ও বুনা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), ঘণ্টেশ্বর দেবশর্ম্মা (চুঁচড়া), শচীন, কল্যাণ, ইন্দ্র, রতন, বিশ্বতোষ, অজিত, বরুণ, শৈলেন (জলপাইগুড়ি), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), অশোক, বাপি, বুড়াম ও পিন্টু (বোম্বাই), শর্ম্মিষ্ঠা ও সত্যমিত্রা রায় (কলিকাতা), দেবকীনন্দন ও বিশ্বনাথ সিংহ (গয়া), কাকলী, মধুলা, পার্থ, কামদেব ও অরুণাভ চৌধুরী (রাঁচী), বীরবীর ও দীপঙ্কর নিয়োগী (কলিকাতা)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

সুনীত, পার্থ, কাজল, রমণীমোহন ও বসুন্ধরা সিংহ (ডালটনগঞ্জ), অলকা মজুমদার (ভদ্রপুর], কল্পনা ও গৌতম ঘোষ (কলিকাতা)।

কিশোর দল

শ্রীজয়ন্তকুমার গুপ্ত

আমরা কিশোর দল
দেশের সেবায় মন দিয়েছি
চল এগিয়ে চল।
আমরা কিশোর দল ॥

ধরণীরই সেবা কর্ম
মেনে নিয়েছি ইহা ধর্ম
বিপদ মোরা রুখতে জানি
আমি সেবার দল।
আমরা কিশোর দল ॥

সত্য যাহা ধর্ম তাহা
মানব মোরা সবাই ভাই
অন্যায়কে স্থান দেবনা
থাকতে দেহের বল।
আমরা কিশোর দল ॥

——

ফটো : দীপক চন্দ

বাদ্যযন্ত্রের কথা

দেবশর্মা বিরচিত

বিচিত্র ছাঁদের এই যে বাদ্য-যন্ত্রটি দেখছো— এটি হলো বহু পুরানো আমল থেকে প্রচলিত আমাদের দেশেরই এক ধরণের তার-যন্ত্র। এ বাদ্য-যন্ত্রের নাম — 'সারিন্দা'... এটি হলো বেহালা-জাতীয় তার-যন্ত্র। সেকালের বাদ্য-সঙ্গীত কলা-রসিকদের মহলে এই ধরণের 'সারিন্দা' তার-যন্ত্রের রীতিমত কদর ছিল। আজকাল অবশ্য এ বাদ্য-যন্ত্রের বিশেষ প্রচলন নেই বললেই চলে। অভিনব সুরধ্বনি সৃষ্টির জন্য 'সারিন্দা' তার-যন্ত্রটি বিশেষ উপযোগী।

আরেক ধরণের বিচিত্র-অভিনব বাদ্য-যন্ত্রের প্রচলন আজো আমাদের দেশে প্রায়ই নজরে পড়ে। সেটি হলো— সুপ্রাচীন ভারতীয় বাদ্য-যন্ত্র— এই 'জল-তরঙ্গ'। এ ধরণের বাদ্য-যন্ত্রের আদর এখনও রয়েছে আমাদের দেশের সঙ্গীত-কলারসিক সমাজে। ছোট-বড় নানা আকারের চীনামাটির তৈরী বাটিতে প্রয়োজনমতো জল ভরে লম্বা-মজবুত দুটি কাঠির সাহায্যে বিচিত্র সুর-ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়।

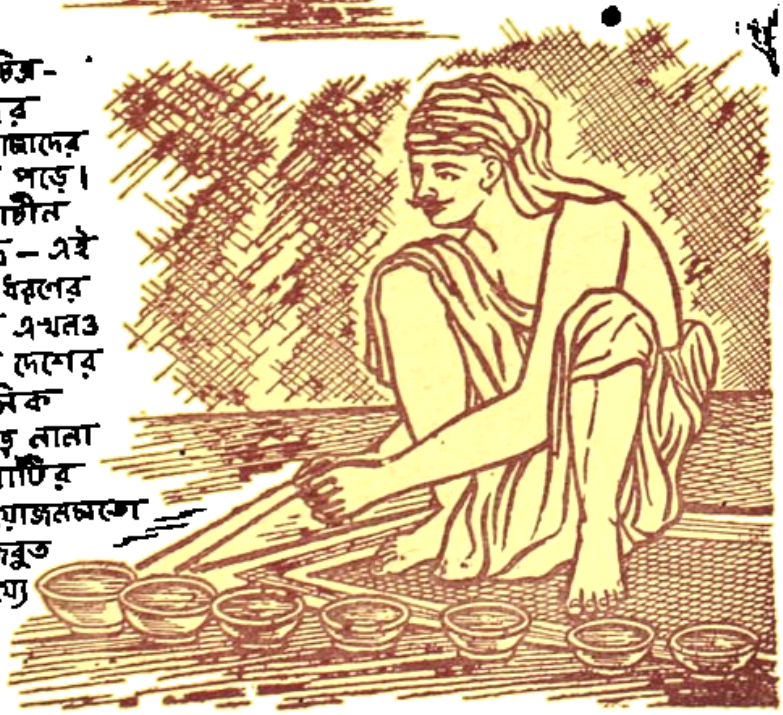

শ্রীদিলীপকুমার রায়—

গত ২৪শে ডিসেম্বর দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৪ সালের একাডেমি পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে আনন্দের সংবাদ শ্রীদিলীপকুমার রায় এ বৎসর যে কয়জনকে একাডেমির ফেলো করা হইয়াছে, তাঁহাদের অন্যতম। দিলীপকুমারের সহিত ডাঃ বি, জি র‍্যাদ, শ্রীগণেশহরি রানাডে, ঠাকুর জয়দেব সিং ও পণ্ডিত বিনায়কনারায়ণ পটবর্দ্ধন ফেলো হইয়াছেন। ভারতবর্ষের পাঠকদের নিকট দিলীপকুমারের নূতন পরিচয় দিবার নাই। তাঁহার অসাধারণ জীবন, সঙ্গীতে নৈপুণ্য, কবিতা, উপন্যাস, কথাসাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে খ্যাতি তাঁহাকে বাংলাদেশে এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত করিয়াছে। আগামী ২২শে জানুয়ারী তাঁহার ৭০তম জন্মদিন। আমরা তাঁহার আরও অধিক খ্যাতিপূর্ণ জীবন কামনা করি।

তিনজন নূতন দেশিকোত্তম—

গত ২৪শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে তিনজন নূতন দেশিকোত্তম উপাধি লাভ করিয়াছেন। (১) নবদ্বীপের অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধর শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। (২) রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, (৩) বিশ্বভারতীর কোষাধ্যক্ষ খ্যাতনামা আইনজীবী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র। এ বৎসর ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও বিশ্বভারতীর আচার্য্য শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ছাড়াও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ডঃ করণ সিং, শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, প্রধান মন্ত্রীর পত্নী শ্রীমতী ললিতা দেবী প্রভৃতি বহু মনীষী উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য্য শ্রীসুধী রঞ্জন দাস এইবার অবসর গ্রহণ করিবেন। কাজেই উপাচার্য্যরূপে তিনি তাঁহার শেষ ভাষণ দেন। নূতন উপাচার্য্য হইয়াছেন অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

ডঃ করণ সিং শুধু কাশ্মীর রাজবংশের সন্তান নহেন, তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যও তাঁহাকে দেশসেবায় করিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন শান্তিনিকেতনের শুভেচ্ছা ও বাণী সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হউক। বোলপুর ময়দানে এক বিরাট সভায় উপাচার্য্য সুধীরঞ্জন দাসকে বিদায় সংবর্দ্ধনা জানান হয়। সে সভায় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভাপতিত্ব করেন।

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা, বিশ্বভারতীর সমাবর্ত্তন ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠা উৎসব এক যাদু ধরিয়া চলিয়া থাকে এবং বহু লোককে আকৃষ্ট করে। এবার ২৩শে সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুশোককুমার সরকার শাস্ত্রীজীর হাতে তাঁহাদের প্রকাশিত কাশ্মীর গ্রন্থখানি উপহার দিয়াছেন।

সাংবাদিক ও সাহিত্য সম্মেলন—

গত ২৩শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতা ৩৮ মদঙ্গা লেনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে ৩৯নং নির্ম্মলচন্দ্র ষ্ট্রীটে কলিকাতা কর্পোরেশনের বিদ্যালয় ভবনে এক প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সম্মেলন হইয়াছিল। সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণের পর কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথিরূপে শ্রীহিরণ্ময় বসু জনগণের উপর সংবাদপত্রের প্রভাব সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করিলে অধ্যক্ষ শ্রীসুখময় বসু বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির অবনতির কারণ সম্বন্ধে এক ভাষণ দেন। তারপর সভাপতি ডাঃ শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণে বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

সম্মেলনের পূর্ব্বে মন্ত্রী বিজয়সিং নাহার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং দেবব্রত শ্রীপ্রীতিকুমার রায়চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বক্তৃতা করেন।

পশ্চিম দিনাজপুর বারগ্রামে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বিশেষ অধিবেশনে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ—মধ্যে—সভাপতি জয়ন্তক (শ্রীতারাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী)

বারাকপুর সম্মেলন—

গত ২৮শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলিকাতা ৩৪ নির্ম্মলচন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ কর্পোরেশন ভবনে বারাকপুরের অধিবাসীদের এক সম্মেলন হইয়াছিল। সভায় শ্রীমোহনকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতি, ও মুখ্যতঃ শ্রীমণিলাল বসু প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় আড়িয়াদহের খ্যাতনামা কর্ম্মী শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সভারম্ভে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন কালে বারাকপুর মহকুমার বিভিন্ন কথার আলোচনা করিয়া সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় ভাটপাড়া নিবাসী কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, হালিসহরের শ্রীগৌরীপদ গাঙ্গুলি,নোয়াপুরের শ্রীচিত্ত সরকার খোলার শ্রীকৃষ্ণচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পানীলার শ্রীঅমূল্যচক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও মহকুমাবাসীর মুখপত্র বারাকপুর পত্রিকাকে সাহায্য করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায় সভার শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় মহকুমার বহুস্থানের লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

নেতাজীর মূর্ত্তিস্থাপন—

গত ২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতা রাজভবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রাস্তার উপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর এক বিরাট মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। মূর্ত্তিটি বেদীসমেত ৩২ ফুট উচ্চ। কলিকাতা সহরে এত বড় মূর্ত্তি আর নাই। শাস্ত্রীজী ঐ অনুষ্ঠানে বলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা অনেক মহান নেতা পেয়েছি। সুভাষচন্দ্র মহানতম নেতাদের অন্যতম। এখনও তাঁকে আমরা সর্ব্বোচ্চ নেতা হিসাবে মেনে থাকি। তিনি আমাদের পথিকৃৎ। এতদিন পরে

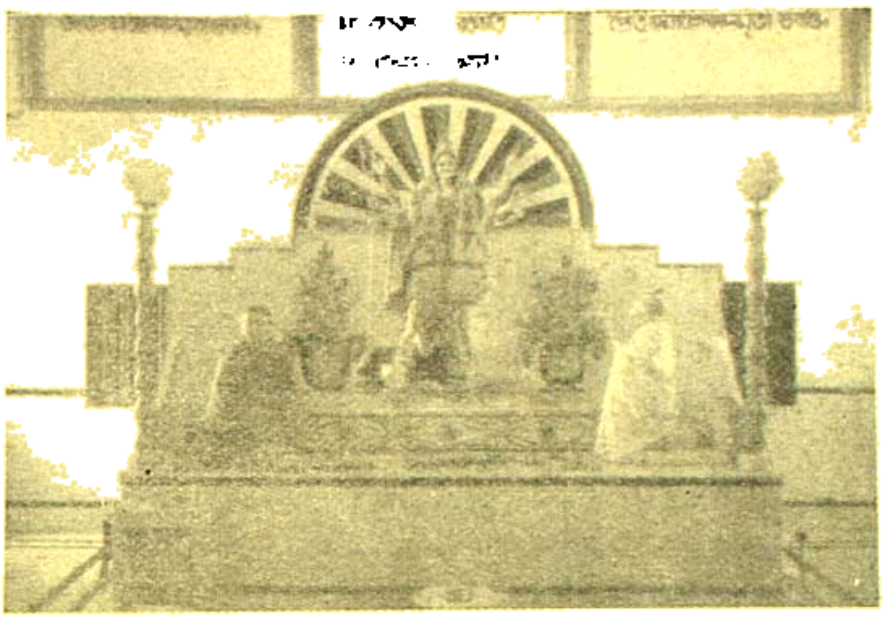

শ্রীশ্রীহৈমবতী

["মোক্ষধাম" প্রবন্ধ ১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

কলিকাতা সহরে সুভাষচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ফ্রেঞ্চেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

অস্ত্রশীল বিনিময়—

পাক-ভারত যুদ্ধ উপলক্ষে পাকিস্থানে বহু ভারতীয়কে এবং ভারতবর্ষে বহু পাকিস্তানীকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। গত ১৮ই ডিসেম্বর হইতে উভয় পক্ষই আটক করা মানুষগুলিকে নিজ নিজ দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কয়েক হাজার লোক এইভাবে দেশে ফিরিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ২৬শে ডিসেম্বর হইতে প্রায় ১০ দিনের মধ্যে বনগাঁর নিকট পেট্রাপোল কেন্দ্রে প্রহরী থাকিবে না, ভারত ও পাকিস্থানের লোক ঐ পথ দিয়া নির্বিবাদে নিজ নিজ দেশে যাইতে পারিবে।

বহুপুরাতন নাটক—

রামায়ণ নিয়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বহুকাল ধরে বহুভাবে আলোচনা চলছে। প্রায় দু'হাজার বছর আগে দক্ষিণ ভারতে 'ভাস' নামক একজন কবি সংস্কৃত ভাষায় কয়েক খানি নাটক রচনা করেছিলেন। কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি কবির গ্রন্থে তাসের উল্লেখ থাকিলেও তাসের লেখা কোন গ্রন্থের সন্ধান বহুদিন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। ত্রিবাঙ্কুরের পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ১৯০৯ সালে একটি মঠে একটি তালপাতার পুঁথি আবিষ্কার করেন। পুথিতে মলয়ালম অক্ষরে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ১৩খানি চমৎকার নাটক লেখা ছিল। পরে অন্য জায়গা থেকে তিনি আরও দু'খানি পুথি পেয়েছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন এগুলি সবই তাসের রচনা। তার পর থেকে ঐ নাটকগুলি ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত ও আলোচিত হইয়েছে।

কলিকাতা ৪৪ নং বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীরামাপদ বসু নামক এক বৃদ্ধ নাট্যরসিক তাসের তিনখানি নাটক 'স্বপ্ন বাসব দত্তা' 'মধ্যম ব্যায়োগ ও 'প্রতিমা' বাংলায় অনুবাদ করেন। প্রথম দু'খানি প্রায় দশ বছর আগে তিনি প্রকাশ করেছিলেন এবং সেগুলি সমাজে প্রশংসা পেয়েছিল।

সম্প্রতি তাঁর অনুবাদ করা 'প্রতিমা' নাটকখানি প্রকাশিত হয়েছে। এর দাম ৪টাকা ৭৫ পয়সা। দু'হাজার বছর আগে লেখা ভাসের রচিত নাটকগুলি নানা সদগুণে অপূর্ব্ব কিন্তু সংস্কৃত না-জানা পাঠকদের কাছে সেগুলি অপরিচিত। শ্রদ্ধেয় রামাপদবাবু সেগুলি বাংলায় প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

নাটকগুলি সংস্কৃত ভাষায় ভারতের সর্ব্বত্র অভিনীত হয়ে থাকে। কিন্তু এই অসাধারণ দৃশ্যকাব্য বাংলায় অভিনীত হলে আমাদের শ্রোতাদেরও আনন্দ উপভোগ করবেন। বাংলা ভাষায় আজ যে ধারায় নাটক লেখা হয় তার সঙ্গে প্রতিমা নাটকের ধারা হয়ত পৃথক। কিন্তু তা যে অপূর্ব্ব রসোত্তীর্ণ সেকথা অস্বীকার করা যায় না। আমরা রামাপদ বাবুর এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করি এবং আশাকরি বাঙ্গালী 'ভাসের' নাটক তাঁর মাধ্যমে লাভ করে ও তার অভিনয় করে সমৃদ্ধ হবে।

পরলোকে জেঃ থিমায়া—

রাষ্ট্রপুঞ্জ শান্তিবাহিনীর অধিনায়ক জেঃ থিমায়া গত ১৮ই ডিসেম্বর সকালে তাঁর নিকোশিয়ার বাসভবনে হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় সেনানী মণ্ডলীর বিচক্ষণ অধ্যক্ষ। একবৎসর পূর্ব্বে তিনি নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীবন—

বাংলা ভাষায় মহাকাব্য রচনা করা কবিদের অনেকেরই ইচ্ছা হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তারপর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃত্রসংহার, নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি বাংলা ভাষার পাঠকদিগকে চিরদিন আনন্দ দান করিতেছে। বর্ত্তমান যুগেও আমরা আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শিবাজী ও পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য রচনা করিয়া ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

তাহার দীর্ঘদিন পরে আমাদের কবিবন্ধু শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য জালালাবাদের যুদ্ধ মহাকাব্য রচনা করার পর গান্ধীজীবন মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। এখানি সুবৃহৎ। মূল্য ২৲ কলিকাতা-১২ বুক রেঞ্জ ও ১২৭ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট শোভনা প্রেস পাবলিকেশন হইতে প্রকাশিত।

বর্ত্তমান শতাব্দীর আদর্শ মানুষ মহাত্মা গান্ধী। তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া কর্ম্ম জীবন আরম্ভ করিলেও ত্যাগ, প্রেম ও সেবার দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রথম জীবনে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন, তাহার পর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান, বিহারের চম্পারণে প্রজামঙ্গলের জন্য সত্যাগ্রহ এবং ১৯২০ সাল হইতে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের নেতা হইয়া ভারতবর্ষকে পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল বটে কিন্তু তাহার কয়েকমাস পরে ১৯৪৮ সালে ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীতে প্রার্থনা সভায় বন্দুকের গুলীতে তাঁহার জীবন শেষ হইয়াছে।

১৯২১ সালের অসহযোগ, ১৯৩০ সালের লবন আইন অমান্য এবং ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন তাঁহার জীবনের বিশিষ্ট ঘটনা এবং সেই তিনটিকে বর্ণনা করিয়া কালীপদবাবু গান্ধী জীবন মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি সনাতন প্রথা অনুসারে লিখিয়াছেন—

চিরন্তনী সরস্বতীরে করি মুখে প্রণিপাত
শব্দ অর্থ রসচৈতন্যে চতুর্বর্গ স্বাদ।
বিতরি জননী সত্যাহুকৃতি ভরে
রূপে স্বরূপে রস অনুরাগে মিলাও পরস্পরে।
মানবিকতার দেব সাযুজ্যে স্বর্গ আলোক ঝরে
ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্ষের অনন্ত আহ্লাদে
তুলে মহাকাশ সাগরের বুকে আনন্দ কলনাদ।

এইভাবে তিনি কাব্যের আরম্ভ করিয়াছেন। ৫৪০ পৃঃ ব্যাপী এই মহাকাব্য একইভাবে ও ভাষায় একই ছন্দে লিখিত হইয়াছে।

কবি সাধারণভাবে সত্যদ্রষ্টা। তাহা এই কাব্যের যে কোন একটি অংশ পাঠ করিলে সম্যকরূপে উপলব্ধি ঘটে। তিনি গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সত্য, অহিংসা ও মানবিকতার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র ধর্ম্মময় জীবন তাঁহার লেখনী মুখে উজ্জলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্ত ও গান্ধী-প্রীতিসম্ভ পাঠক মাত্রই

এই গ্রন্থ পাঠ করিতে মনোনিবেশ করিবেন ততই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন অধ্যায়গুলি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। বর্তমান যুগের ঘটনাপঞ্জী লইয়া মহাকাব্য রচনার উদ্যম ইহাই বোধহয় প্রথম। গান্ধীজীর যুগ আজও শেষ হয় নাই। তাঁহার সমধর্মী ও সহকর্মী বন্ধুর দল এখনও ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের কাছে এই গান্ধী জীবন মহাকাব্য চির নূতন। ইহার সারমর্ম শুধু গান্ধীজীর ভক্তরা নহেন পাঠকমাত্রেই আনন্দ ও রসবোধের সহিত উপভোগ করিতে পারিবেন। সুবৃহৎ গ্রন্থখানির মধ্যে কোথাও রসপরিবেশের অভাব নাই। ঘটনার পর ঘটনার গতি অতি সরল ও সুন্দরভাবে গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষায় এমনভাবে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিবার সময় সিনেমার চিত্র দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়। আমরা যৌবনে গান্ধীজীকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ তথা অবতার বলিয়া মনে করিতাম। ভারত ধর্মপ্রাণ দেশ। গান্ধীজির রাজনীতির মধ্যে ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতীয়মাত্রকেই অভিভূত করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দুর্ভিক্ষ ও তাহার পরবর্তীকালের পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষকে গান্ধীজির অবস্থা হইতে দূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। সর্বোপরি গান্ধীজির অভাবিত দুর্ভাগ্যাহত মানুষের মন হইতে তাঁহার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ঘুচাইয়া দিয়াছিল। সেজন্য আজ গান্ধীজির নামে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইলেও সে ব্যবস্থার মধ্য হইতে গান্ধীজির আদর্শ অনেকদূরে সরিয়া গিয়াছে। সকল প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি গান্ধীজি দেশবাসীর সম্মুখে যে ন্যায়, সত্য ও ধর্মের আদর্শবাদ রাখিয়া গিয়াছেন আগামী দিনের মানুষ গান্ধীজীবন পাঠ করিয়া সেই আদর্শকে পুনরায় গ্রহণ করিবে এবং তাহার দ্বারা ভারতবর্ষে সকলপ্রকার কল্যাণ ফিরিয়া আসিবে।

মহাভারতীয় ভারতী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

ললাট-লিখন যুদ্ধ এলো যে,
পূর্বে তা' ভাবি নাই ;
জানি যুদ্ধের বিষময় ক্ষতি,
যুদ্ধ চাহিনি তাই ;
তবু ঘুরে ফিরে যুদ্ধের ঝড়
ভেঙে পড়ে হায়-হায় ;
বোমা-দুন্দুভি অশনি-নিনাদে
চারিদিক ভ'রে যায়।

২

ঘুরে উড়ে যায় শান্তির তাঁবু,
অহিংসা-গড়া ঘর ;
দুর্দমনীয় দুর্দৈবের
অভিশাপে বহে ঝড়।
পিছন ফিরিয়া নেবো না সে ঝড়,—
বুক পেতে তেজে লবো ;
ভীষ্মের মত শর শয্যায়
ক্ষাত্র-শহীদ হবো।

৩

কৃষ্ণের মত রথের রজ্জু
ধরি' দুর্বার হাতে
কুরুক্ষেত্র রণ গৌরব
সব্যসাচীর সাথে
রোধিব সজোরে অমোঘ বীর্য্যে ;—
পাবো না কিছুতে ভয় ;
মৈত্রী—প্রেমের মহান কাণ্ডা
যেন মোর উড়া রয়।

৪

যুদ্ধ চাহিনি যুদ্ধ এসেছে ;
দুর্যোধনেরা যত
যুদ্ধ বাধাতে ষড়যন্ত্র যে
করে হায় অবিরত।

পরিণাম তা'র—শ্মশান-বহ্নি
জ্বলিবে সর্ব্ব ঠাঁই ;
সভ্যতা হবে সমর-অনলে
হিংস্র চিতার ছাই।

৫

কি করিব তা'র ! এই দুনিয়ার
শকুনি-দুর্য্যোধন
ছল-ছুতা ক'রে বাধাবেই হায়
মানবান্তক রণ ;
শুনিবে না কোনো অহিংসা বাণী
কৃষ্ণ-সন্ধি-কথা,
সমর-সাগরে সভ্য বার ক'রে'
ডুবাবেই সভ্যতা।

৬

যুদ্ধ চাহিনি যুদ্ধ এসেছে,
এনেছে ধ্বংস-লীলা ;
কী করিব আর ! রণ-হুঙ্কার
সাথে হোক মোকাবিলা।
বিপুল বিজয়—সবই পরাজয় ;
মহাযুদ্ধের ফলে
সভ্যতা ভরে এই চরাচরে
ভয়াল অমঙ্গলে।

৭

যুদ্ধ করিতে করিতে সে কথা
কহিব শোণিত-পাতে ;
আর যেন ফিরে পৃথিবীর তীরে
রণে নর নাহি মাতে।
যুদ্ধ চাহিনি যুদ্ধ এসেছে
জানি পরিণাম তা'র ;
চাহি বা না চাহি, ধ্বংস সে করে
শুভ সভ্যতার।

৮

তাই, ক্রোধে নয়—শান্ত শোণিতে
শাণিত অস্ত্র ধরি,
অরাতি বধের আযুধে নিজেরে
পরিণত শেষে করি
হিংস্রের সাথে আপাত হিংস্র
রুদ্র বীর্য্যের টানে।
উপায় তো নাই, দুর্য্যোধনেরা
হিংসায় টেনে আনে।

৯

সহস্রবার এই হিংসার
পরিচয় দিলো নর ;
অহ্লাদী-ব্রতে মাতিবে কি তবে
তাহারা নিরন্তর !
এত বিজ্ঞান—এত বিদ্যার
এই যদি পরিণতি,
ভাবিতেও তবে ভয় হয় হায়
মানবের দুর্গতি।

১০

যুধিষ্ঠিরের বক্ষে যুদ্ধ
আসে যদি এই ভাবে
কী আর করিব ! সবই জেনে শুনে
যুদ্ধই করা যাবে।
কুরুক্ষেত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র—
রণোন্মাদের কথা ;
বারে বারে হায় মুষল-প্রসবে
ধ্বংসে যায় সভ্যতা।

১১

উপায় তো নাই, দুঃশাসনেরা
যত দিন আছে ভবে
যুধিষ্ঠিরেরও সবই জেনে শুনে
যুদ্ধ করিতে হবে।
জয় হবে জানি—সে-ও পরাজয় ;
রণে ফিরে হয় রণ
এই পরিণাম বুঝিবে না কভু
শকুনি—দুর্য্যোধন ?

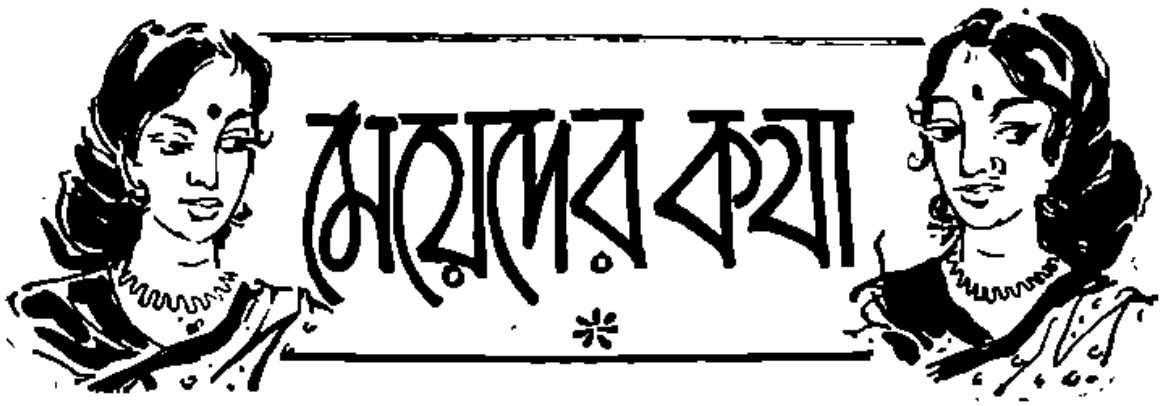

শিশু যখন কাঁদে

সুবর্ণা চট্টোপাধ্যায়

নারীর ধর্ম সম্পর্কে তো আমরা অনেক কথাই শুনে থাকি, কিন্তু কেউ তো কখনও বললনা নারী-ধর্মের পূর্ণতা মাতৃত্বে, —আর তার মাতৃত্বের পরীক্ষা শিশু যখন কাঁদে !

জীবসৃষ্টিতে নারীর দান যে অপরিমীম একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। শুধু জীব সৃজন নয়, সে জীবের পালন পোষণেও নারীর মহত্ব ও কৃতিত্ব সুপরিস্ফুট। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকালকার নারী সে গৌরবের আসন ঘৃণা ভরে পায়ে ঠেলে দিচ্ছে। গর্ভধারণ ও শিশু-পালনকে সে আর গৌরবের কাজ বলে গণ্য করছে না—তাকে ঘৃণা করছে। তার কাছে আত্মসুখ—দেহ সুখই মুখ্য—মাতৃত্ব গৌণ, অনাকাঙ্ক্ষিত ও হেয়। আত্মসুখ আর দেহ সুখের লালসায় সে আজ কি না করছে ! পারিবারিক শান্তি নষ্ট করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। জঠরের শিশুকে ফেলে দেতে তার বাধে না। শিশু-জন্ম তাদের জীবনে অভিশাপ। তারাও নারী। অবশ্য নিজেকে নারী ভেবে তারা লজ্জিত, কুণ্ঠিত, পুরুষের সঙ্গে দুরপনেয় পার্থক্যের জন্য অন্তরে অন্তরে বিধাতাপুরুষের প্রতি ক্ষুব্ধ। বিধাতার সৃষ্ট পার্থক্য অপনয়নের জন্যে তারা চিকিৎসকের অস্ত্রকেও অভিনন্দিত করে। তারা চায় গর্ভ-ধারণ যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি—শিশুর কান্না তাদের কানে বিষ ঢেলে দেয় ! তারা কী নারী ? তারা কী মানুষ ?—তারা সমাজের হ্লাদিনী শক্তি। শিশুর কান্না তারা শুনতে চায় না। শিশুর কান্না তাদের হ্লাদিনী শক্তি হরণ করে নিতে পারার ভয়ে তারা শিশু থেকে দূরে দূরে থাকে। তবু শিশুজন্ম অব্যাহত। কিন্তু এ রকম অনাচার বিশৃঙ্খল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তার পক্ষে সুষ্ঠু মনুষ্যরূপে বেড়ে ওঠবার সুযোগ কোথায় ?

শিশু যখন কাঁদে স্বভাবতঃই এগিয়ে আসে স্তন্যদুগ্ধ নিয়ে মমতাময়ী মা। শিশু যখন কাঁদে—ছুটে আসে উথলে মাতৃস্নেহ নিয়ে প্রতিটি মাতৃহৃদয়া নারী। তবেই না মানব-শিশু পৃথিবীর বুকে অভিনন্দন আর আনন্দের মাঝে সুস্থ সবল মানুষরূপে বেড়ে ওঠবার সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু ধর্মপরায়ণা, মাতৃহৃদয়া নারীর যদি অভাব ঘটে তবে শিশুর সে কান্নায় কান দেবে কে ? সুস্থ, সবল, প্রকৃতিস্থ মানুষ গড়ে তুলবে কে ?

শিশু বিরোধী মনোভাবের কি ভাবে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে আধুনিকাদের মধ্যে তা ভেবে দেখা দরকার। কেন তারা মাতৃত্বকে ভয় পায়, ঘৃণা করে, নারী জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম বলে মেনে নিতে কেন তারা অনিচ্ছুক তা বিচার করা প্রয়োজন। নারী প্রকৃতির পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব বা কুশিক্ষাই অনেক ক্ষেত্রে এর জন্যে দায়ী। সেই কুশিক্ষার আরম্ভ বিদ্যালয়ে নয়, মায়ের কোলে শৈশবে। উচ্চশিক্ষিত বড় চাকুরে স্বামীর অল্পশিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টাকারিণী আধুনিক শিক্ষিতা নারীদের প্রতি হিংসায়

অদ্যি পর্যন্ত জর্জরিতা। তার মুখে সরলা পুরুষ বিরোধী কথা। সে সর্বদা দুঃখ করে নিজের মা-বাপদের উদ্দেশ্যে গালি বর্ষণ করে—কেন তারা তাকে বি-এ, এম-এ পাশ করায় নি। করালে কি এ-দুর্দশা হ'ত? সে করে এমন স্বামীর নাকে দাড়ি মেরে চলে যেত! তার কাছে তার মেয়ে বা ছেলে কেমন শিক্ষা পাবে? তার অশিক্ষিত ভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত মনের অনেক কুকথাই মেয়ে ও ছেলেদের মন বিষাক্ত করে তুলে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে তারা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। সুস্থ জীবন বিকাশের পথে তারা এগিয়ে যায় না। স্কুল-কলেজের শিক্ষা তাদের মাতৃক্রোড়ের কুশিক্ষাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে না। মা-বাপের জীবনধারা থেকে শিশু মনে অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়, যা তাদের মনের অবচেতনে বাসা বেঁধে বসে। ডঃ সিডনি. গ্রীণ এম-ডি এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা বিশেষ করে চিন্তা করবার: "A child may consequently imagine that man's part in sex is an active brutal aggression toward the female. The role of tender love in sex, the idea of mutual giving in the act itself may completely escaps the child."

মা বাপের জীবনযাপনের পদ্ধতিই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে নারীর সম্পর্কে মায়ের মনোভাবই শিশুর জীবন-বিকাশে সহায়তা বা বিরোধিতা করে। অতএব নারী, তোমার ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে তবে এগিয়ে এসো—শিশু যখন কাঁদে।

সুপর্ণা দেবী

সচরাচর দেখা যায় যে আমাদের দেশের মেয়েরা বিবাহের পর ঘর-সংসারের ঘাম-ঘারিত্ব, আত্মীয়-পরিজনের যত্ন-পরিচর্যা এবং ছেলেপুলে মানুষ করে তোলার নানান কাজে দিন-রাত সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকার দরুন, নিজেদের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য বজায় রাখার দিকে যথাযথ দৃষ্টিদান করবার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পান না। এমনি অযত্ন-অবহেলা-উদাসীনের ফলে, অকালেই তাঁদের রূপশ্রী-লাবণ্য ম্লান হয়ে আসে এবং অল্প-বয়সেই স্বাস্থ্য-সম্পদ হারিয়ে তাঁরা প্রায়শঃ 'কুড়িতেই রীতিমত বুড়ী' হয়ে ওঠেন···নিতান্ত অসময়ে বার্ধক্যের রেখা যৌবনেই তাঁদের মুখের সোনা-মাধুরী-রমণীয়তা সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। অথচ, পাশ্চাত্য সমাজের মহিলারা কিন্তু সংসারের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, ঝঞ্ঝাট-দুশ্চিন্তার শত অসুবিধা সত্ত্বেও নিয়মিতভাবে নিজেদের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য রক্ষার দিকে নজর রাখেন বলেই, সাধারণতঃ প্রৌঢ়াবস্থাতেও তাঁদের রূপ-লাবণ্য অম্লান-অটুট থাকে···

[আমাদের দেশের মহিলাদের মতো অকালেই কুশ্রী-কুরূপা ও জরাজীর্ণা হয়ে ওঠেন না। তার কারণ, তাঁরা আমাদের দেশের মেয়েদের মতো দৈহিক-পরিচর্যার সম্বন্ধে উদাসীন নন। হাত-পা, মুখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য রূপ-লাবণ্য-মাধুরী সুদীর্ঘকাল-যাবৎ অক্ষত অটুট রাখতে হলে, নিয়মিত ব্যায়াম, আহার-বিহার, সেবা পরিচর্যার যেমন প্রয়োজন, মুখশ্রীর শোভা রমণীয়-মোহনীয় অম্লান রাখার জন্য নারীর শ্রীমুখ-পঙ্কজেরও তেমনি পরিচর্যা করা চাই।

মুখের শ্রী-সৌন্দর্য্য বজায় রাখার জন্য আজকাল পাশ্চাত্য সমাজে বিশেষ-ধরণের যে সব সেবা-পরিচর্য্যার বিজ্ঞানসম্মত রীতি প্রচলিত হয়েছে, আপাততঃ তারই মোটামুটি পরিচয় দিয়ে রাখি। আধুনিক রূপচর্চ্চাবিশেষজ্ঞদের মতে নিত্য-নিয়মিতভাবে মুখের সেবা-পরিচর্য্যার এ সব বিশেষ-রীতি অনুশীলনের ফলে, তারুণ্যের লাবণ্য-শ্রী সুদীর্ঘকাল অক্ষয়-অটুট সমুজ্জ্বল থাকবে···অসময়ে মুখে জরা-বার্দ্ধক্যের রেখা আবির্ভাবের আশঙ্কা দূর হবে · ক্লান্তি-অবসাদের ভারে চোখের কোলে কালি পড়বে না·· এমন কি, যে সব মহিলার মুখের ছাঁদে-গঠনে কমনীয়তার অভাব আছে, এ ধরণের সেবা-পরিচর্য্যার গুণে—তাঁদের মুখশ্রীও অচিরেই সুঠাম-সুন্দর রূপ-লাবণ্যোজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ-আধুনিক রূপচর্চ্চা-বিশারদেরা বলেন,—মুখের যে অংশে রক্ত-চলাচল-ক্রিয়া ব্যাহত হয়, সচরাচর সেই-অংশের ত্বক লোল হয়ে যায়···জীর্ণতার বা 'কোঁচ' (Wrinkles) দেখা দেয়। তার ফলে ; মুখের লাবণ্য শ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়···মুখের শোভা-মাধুর্য্য বিশ্রী-কদর্য্য হয়ে ওঠে। সুতরাং মুখের রূপ-শোভা অটুট-অক্ষত সুদীর্ঘস্থায়ী রাখতে হলে, সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—দাঁতগুলিকে আগাগোড়া সুস্থ-সুন্দর ঝক্‌ঝকে -পরিষ্কার রাখা। সেজন্য নিত্যনিয়মিতভাবে সকাল-বিকাল-সন্ধ্যায় অন্ততঃপক্ষে কয়েকবার বুরুশ ও মাজনের সাহায্যে বেশ ভালোভাবে মেজে-ঘষে দাঁতগুলিকে সাফ করা দরকার। তাছাড়া কোনো কিছু খাদ্য-গ্রহণের আগে এবং পরে এবং প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে দশ-বারো বার পরিষ্কার জলে দাঁত-মুখ আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ধুয়ে সাফ্ করে রাখা। কারণ দাঁতের ফাঁকে ভুক্তাবশিষ্ট খাবারদাবারের টুকরো বা কোনো রকম ময়লা জমলে, নানা রোগের উৎপত্তি ঘটে···মুখে বেয়াড়া-দুর্গন্ধ, দাঁতের গোড়ায় পাথরী-জমা, মাড়িতে ক্ষত-রক্তক্ষরণ-পূঁজ প্রভৃতি বিবিধ অস্বাস্থ্যকর-উপসর্গ দেখা দেয় তার ফলে, মুখের রূপশ্রী-লাবণ্যও অচিরেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে। যে সব মহিলার দাঁতের মাড়ি খারাপ বা যাঁদের দাঁত পানসে ও হলদে-ছোপ ধরা, নিত্য-নিয়মিতভাবে দাঁত-মাজা, ওষুধ-জলে কুল্‌কুচো-করা মুখের ভিতর সাফ-রাখার ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া ছাড়াও, তাঁদের উচিত—মাঝে-মাঝে অভিজ্ঞ দন্তচিকিৎসকের সহায়তায় দাঁতের গোড়ায় অবাঞ্ছিত-ক্ষতিকর জমাট-বাঁধা 'পাথরী' বা 'টার্টার' (Tartar) চেঁছে-ছেঁটে সাফ করিয়ে নেওয়া। এ সম্বন্ধে সজাগ-সচেতন হলে, শুধু যে দাঁতের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যই বজায় থাকবে তাই নয়, অকালে মুখশ্রী-লাবণ্য হারানোর আশঙ্কাও অনেকখানি কমবে।

তাছাড়া সংসারের নানান ঝড়-ঝাপটার ঘাপটে ব্যতিব্যস্ত হয়ে মনে যদি সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা, অসন্তোষ, রাগ, হিংসা, বিবাদ-বিষের পুষে রাখা যায়, তাহলে মুখের শ্রী-সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-শোভা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ থাকে না। এ কয়টি রিপুর তাড়নায় আমরা ভ্রূ-কুঞ্চিত করি, মুখ ভার করে থাকি···তার ফলে, মুখের উপরে চিন্তার রেখা গাঢ়-ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়···ললাটের, চোখের, গালের গড়নও ক্রমান্বয়ে অসুস্থ ও কুশ্রী হয়ে ওঠে। অনিদ্রা, অল্পনিদ্রা এবং অতিনিদ্রার ফলেও, মুখ ঝুলে পড়ে, চোখ ঝুলে ওঠে, চোখের কোলে কালি পড়ে। কাজেই মুখশ্রী কমনীয় রাখতে হলে, এ সব ত্রুটি এড়িয়ে চলাই উচিত। এ ছাড়া আহারে বিহারে অনিয়ম অনাচার, ব্যায়ামে ঔদাসীন্য প্রভৃতি আরো নানা কারণেও মুখের রূপ-লাবণ্যের প্রচুর ক্ষতি ঘটে। এ সব ক্ষতিকর উপসর্গ দূর করার উদ্দেশ্যে একালের রূপচর্চ্চা-বিশারদেরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কয়েকটি বিশেষ ধরণের সেবা পরিচর্য্যার রীতি অনুশীলনের উপদেশ দিয়ে থাকেন—স্থানাভাবের কারণে, এবারে সেগুলির বিশদ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়···আগামী সংখ্যায় সে সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করবো।

হাতের কাজ

পুঁতির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রঙবেরঙের পুঁতির সাহি গেঁথে গৃহ-সজ্জার উপযোগী নৌখিন-সুন্দর বিচিত্র ছাঁদের 'টেবিল-ম্যাটের' উপর নিম্নোল্লেখিত 'ফুলের সাজির' নক্সা-নমুনার প্রতিলিপি রচনার মোটামুটি হদিশ ইতিপূর্বেই দিয়েছি।

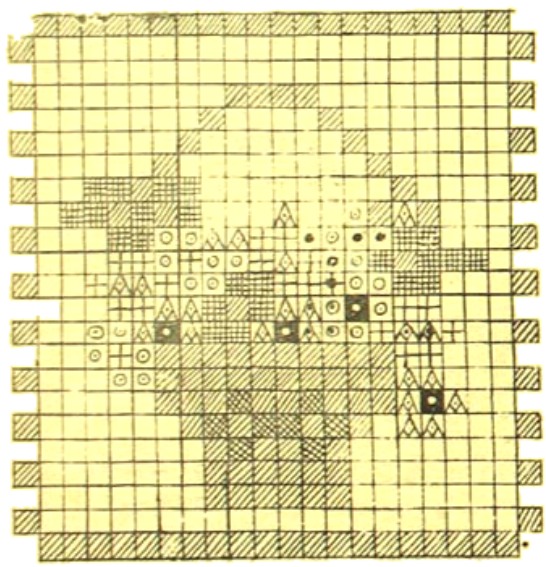

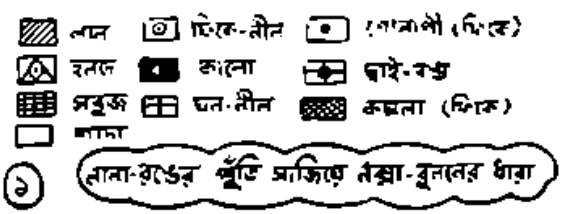

(১) নানা-রঙের পুঁতি সাজিয়ে নক্সা-বুননের ধারা

এবারে বলছি—উপরের নক্সা-নমুনার ছাঁদে 'ফুলের সাজির' প্রতিলিপি-রচনাকালে কোথায় কি-ধরণের কোন্ রঙের পুঁতি গেঁথে বসানো হবে, তারই কলা-কৌশলের কথা। নিখুঁত পরিপাটিভাবে 'ফুলের সাজির' এই নৌখিন নক্সাটিকে ফুটিয়ে তুলতে হলে, প্রথমেই নীচের-অংশের বাঁ-দিকের কোণ থেকে বরাবর লম্বালম্বিভাবে (Horizontal) 'টেবিল-ম্যাটের' উপরোক্ত নক্সা-নমুনার নির্দেশানুসারে একের পর এক বিভিন্ন-রঙের পুঁতিগুলিকে গাঁথা সুরু করে ক্রমশঃ ডান-দিকের সীমান্তে পৌঁছে 'সারি' (Line) বা 'লাইনটিকে' শেষ করবেন। এমনিভাবেই 'টেবিল-ম্যাটের' নীচের 'সারি' বা 'লাইন' থেকে সুরু করে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকের প্রত্যেকটি সারিতে রঙীন-পুঁতি গেঁথে গিয়ে, কারুশিল্প-সামগ্রী রচনা করতে হবে।

উপরের নক্সা-নমুনার ছাঁদে রঙীন পুঁতি-গাঁথার মোটামুটি রীতি হলো:—গোড়াতেই 'টেবিল-ম্যাটের' নীচের-দিকের আগাগোড়া লাল-রঙের পুঁতির সারি সাজানো 'পাড়' বা 'বর্ডার' (Border) বাদ দেওয়া অংশ…অর্থাৎ, নক্সা-নমুনার দ্বিতীয়-সারির বাঁ-দিকের কোণের লাল-রঙের পুঁতিটিকে গেঁথে নিন; তারপর নক্সা-নমুনার নির্দেশমতো আগাগোড়া লম্বালম্বিভাবে শাদা রঙের পুঁতি গেঁথে একের পর এক পাশাপাশি ২০টি ঘর ভরাট করে তুলুন এবং পুনরায় সারির ডানদিকের প্রান্তে আরেকটি লাল-রঙের পুঁতি গেঁথে বসিয়ে লাইনটি শেষ করুন। এমনি পদ্ধতিতে উপরের নক্সা-নমুনার নির্দেশানুসারে বিভিন্ন-রঙের পুঁতিগুলিকে একের পর এক সুষ্ঠুভাবে সাজিয়ে গেঁথে 'টেবিল-ম্যাটের' নীচের দিক থেকে উপর দিকের 'বর্ডার' বা 'পাড়' বাদ দেওয়া অংশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সারির 'ঘর' ভরাট করে তুলবেন…তাহলেই সহজ উপায়ে ও পরিপাটি সুন্দর ছাঁদে 'ফুলের সাজির' প্রতিলিপিটিকে ফুটিয়ে তোলা যাবে। এভাবে বিভিন্ন-রঙের পুঁতি সাজিয়ে আলোচ্য নক্সা-নমুনার নীচে থেকে উপরের অংশের খাড়াখাড়ি (Vertical) মোট ২১টি সারি গাঁথা হলে, 'টেবিল-ম্যাটের' উপরে ও নীচে—দু'দিকেই 'পাড়' বা 'বর্ডারের' 'বন্ধনী' রচনা করা দরকার …নাহলে রঙীন-পুঁতি গেঁথে-বানানো বিচিত্র-অভিনব এই নৌখিন কারুশিল্প-সামগ্রীটি মোটেই মজবুত এবং টেকসই হবে না। পুঁতির 'টেবিল-ম্যাটের' উপরে ও

নীচে 'বর্ডার' বা 'পাড়' গাঁথবার জন্য—নীচের ৩নং চিত্রে দেখানো সুতোর যে দু'টি ডগা দুই প্রান্তে বেরিয়ে রয়েছে, সারির দ্বিতীয়-পুঁতির ভিতর দিয়ে সেই ডগা সেঁধিয়ে নিয়ে গিয়ে গিট বেঁধে নেবেন। তাহলেই পাকাপোক্ত-ধরণে 'পাড়' বা 'বর্ডার' রচনা করা যাবে।

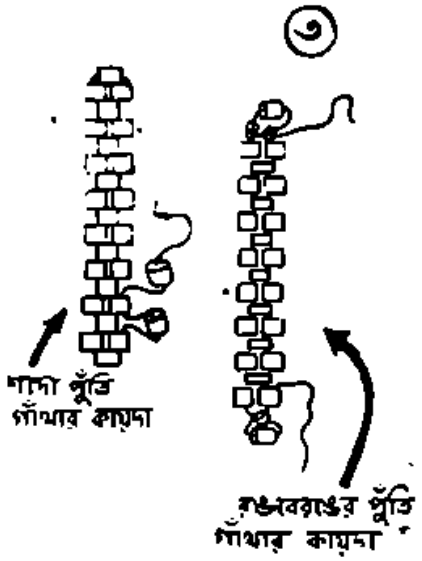

পুঁতির 'টেবিল-ম্যাটের' 'পাড়' রচনার মোটামুটি পরিচয় পেলেন···এবারে জানিয়ে রাখি—দু'দিকের 'পাড়ের' ভিতরে পরস্পর-সংলগ্ন মোট ২১টি সারিকে পাকাপোক্ত-ভাবে জোড়া দিয়ে রাখার কলা-কৌশল-রীতি। অর্থাৎ, গোড়াতেই 'টেবিল-ম্যাটের' নীচের অংশের দ্বিতীয়-সারিতে লম্বালম্বিভাবে একের পর এক মোট ২২টি 'ঘর' পুঁতি গেঁথে ভরাট করা হয়ে গেলে, নীচের দিকের সুতোর ডগাটুকু পরের-সারির পুঁতির ভিতরে প্রবেশ করিয়ে উপর দিকে বেশ কষে টেনে এনে পূর্বোক্ত-পদ্ধতিতে অপর সারির প্রত্যেকটি রঙীন পুঁতিকে নক্সা-নমুনার নির্দেশানুসারে আগাগোড়া পরিপাটি-ছাঁদে পাশাপাশি রেখে ঠাস-বুনানে সাজিয়ে গাঁথুন। এভাবে গাঁথার ফলে, ৩নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ধরণেই ঐ একটি হালিতে উপরের অংশে একটি পুঁতি এবং নীচের অংশে পাশাপাশি দু'টি পুঁতি···এমনি ছাঁদে প্রতি সারিতেই একেবারে তিনটি পুঁতি পর-পর ঠাস-বুনানে গেঁথে নেওয়া যাবে। তবে গাঁথার সময় নজর রাখতে হবে যে উপরে এবং নীচে—দু'দিকেই যেন বেশ খানিকটা লম্বা মাপে সুতোর দু'টি ডগা বজায় থাকে। কারণ, উপরের এবং নীচের—দুই প্রান্ত দিয়েই ঐ সুতোর হালি দু'দিকে টেনে-নিয়ে একের পর এক সারি গেঁথে আগাগোড়া 'টেবিল-ম্যাটখানি' রচনা করতে হবে। গাঁথার সময়, কোনো দিকে সুতোর ডগা যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে সেই নিঃশেষিত ডগার প্রান্তে লম্বা-মাপের আরেকটি সুতোর হালিকে মজবুতভাবে গিট বেঁধে জোড়া দিয়ে পুঁতি গাঁথবার সুতোটিকে অনায়াসেই প্রয়োজনানুযায়ী দীর্ঘ করে নেওয়া চলে। তবে এ-ধরণের গিট বাঁধার সংখ্যা যত কম হয়, ততই ভালো। কারণ, খুব বেশী গিট বাঁধা হলে,—সুতো কম জোর হয়ে পড়ে এবং সেজন্য কারুশিল্প সামগ্রীটিও তেমন মজবুত ও টেঁকসই হয়ে ওঠে না। কাজেই গাঁথার সময়, প্রয়োজনমতো মাপের চেয়েও কিছু বেশী লম্বা মজবুত ধরণের সুতোর হালি ব্যবহার করাই ভালো।

যে পদ্ধতিতে 'টেবিল-ম্যাট' বানানো সম্ভব, ঠিক সে রীতিতেই বিচিত্র অভিনব ছাঁদের রঙীন-পুঁতির পর্দা, ঝালর, টি-কোজি, কুশন-ঢাকা, দেয়াল-চিত্র প্রভৃতি আরো নানা রকমের সৌখিন সুন্দর কারুশিল্প সামগ্রী রচনা করা যেতে পারে। বারান্তরে, সে সম্বন্ধেও মোটামুটি হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

পশমের 'রম্‌পার

সৌদামিনী সেন

শীতের মরশুমে নানা রকমের সৌখিন-সুন্দর পশমের পোষাক-পরিচ্ছদ বোনা মেয়েদের একটা নেশা। এমন তাঁরা নিত্যই দুরেক ধরণের বিচিত্র-অভিনব 'প্যাটার্ণ'

(Pattern) খুঁজে বেড়ান। এই সব সূচীশিল্পানুরাগিণী মহিলাদের কাজের সুবিধার জন্য এবারে দুধপোষ্য-শিশুদের ব্যবহারোপযোগী পশমের 'রম্পার' বোনার নতুন-ধরণের একটি 'প্যাটার্নের' পরিচয় দিচ্ছি।

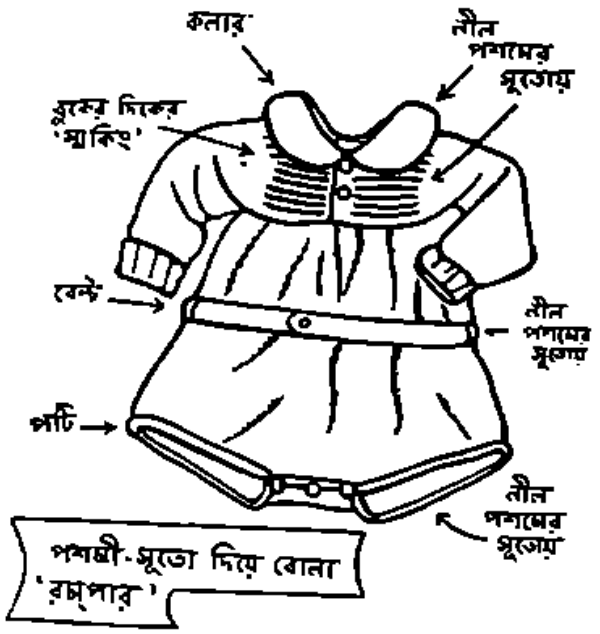

পশমী-সুতো দিয়ে বোনা 'রম্পার'

উপরের নক্সার ছাঁদে দুধপোষ্য শিশুদের ব্যবহারোপযোগী পশমের 'রম্পার' বুনতে হলে, মোট চার আউন্স পশম সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই চার আউন্সের মধ্যে—তিন আউন্স সাদা রঙের আর বাকী এক আউন্স—হাল্কা নীল রঙের '3 ply wool বা 'তিন দড়ী' পশম চাই···এবং সেই সঙ্গে আরো দরকার—১৪নং একটি ক্রুশের কাঁটা, ৮নং পশম বোনার কাঁটা একজোড়া, একখানি ছোট কাঁচি, একটি মাপ নেবার ফিতা (Measuring Tape) ও পাতলা কিছুক অথবা প্লাষ্টিকের তৈরী সাদা রঙের ছয়টি সৌখিন সুন্দর বোতাম।

উপরোক্ত বর্ণনমতো সাজ সরঞ্জামাদি সংগ্রহের পর, 'রম্পার' বোনার কাজে হাত দিতে হবে। ধরুন, আলোচ্য রম্পারটির মাপ হবে—

ঝুল (কাঁধ থেকে পায়ের ঘের পর্য্যন্ত)—১৬½" ইঞ্চি ;
ছাতি —২০" ইঞ্চি ;
হাতার ঝুল (নীচের দিকে মোড়াই না দিয়ে)—১০" ইঞ্চি ;

যথাযথভাবে মাপ নেবার পালা শেষ হলে, পশমী সুতো আর বোনার কাঁটার সাহায্যে উপরের প্যাটার্ন অনুযায়ী 'রম্পার' বুননের কাজ সুরু করবেন। তবে সে কাজে হাত দেবার আগে, আলোচ্য প্রবন্ধের বুনন পদ্ধতি প্রসঙ্গে যে সব সাঙ্কেতিক সংক্ষেপোক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলির আসল পরিচয় সুস্পষ্টভাবে জেনে রাখা বিশেষ দরকার···নাহলে শুধু যে কাজের সময় অসুবিধা ভোগ করবেন তাই নয়, অল্প বিস্তর ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে—সূচীশিল্প সামগ্রীটিও আগাগোড়া নিখুঁত পরিপাটি ছাঁদে বোনাও সম্ভব হয়ে উঠবে না। কাজেই নিম্নোল্লিখিত সাঙ্কেতিক সংক্ষেপোক্তিগুলি গোড়াতেই বেশ ভালোভাবে জেনে রাখুন।

সোঃ = সোজা ; উঃ = উল্টো ; কেঃ সোঃ = কেবল সোজা বুনে যেতে হবে ; রিঃ = রিপিট (Repeat) বা পুনরানুবৃত্তি করতে হবে অর্থাৎ, একই ধরণে পুনরায় বুনে যেতে হবে ; এঃ সঃ = দুটো ঘর এক সঙ্গে নিয়ে একটা ঘর তুলতে হবে ; সাঃ উঃ = সামনে পশম দিয়ে একটা ঘরের জায়গায় দুটো ঘর তুলতে হবে ; ষ্টঃ ষ্টিঃ = 'ষ্টকিং ষ্টিচ্' (Stocking stich) বা মোজা বোনার ধরণে বুনতে হবে ; মঃ ষ্টিঃ = 'মস্ ষ্টিচ' (Moss stitch) বা সাবু দানা পদ্ধতিতে অর্থাৎ, ১টা সোজা ১টা উল্টো পদ্ধতিতে বুনতে হবে, কিন্তু শেষের ঘরটি যাতে শেষ, তাতেই আবার আরম্ভ করতে হবে তার পরের কাঁটাতে ; ঘঃ কঃ = ঘর কমানো ; ঘঃ বাঃ = ঘর বাড়ানো।

বোনার কাজ সুরু করতে হবে—'রম্পার' অর্থাৎ জামার পিঠের দিক থেকে।

পিঠের দিক বোনার পদ্ধতিঃ

(জামার নীচের দিকের অংশ থেকে বোনার কাজ আরম্ভ করবেন। গোড়াতেই সাদা রঙের পশমে ২০টি ঘর তুলুন···তারপর চার লাইন বুনুন ষ্টঃ ষ্টিঃ। অতঃপর, ৫ম লাইন থেকে প্রত্যেকটি লাইনের শেষে ৫টি করে ঘর তুলে যান—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কাঁটাতে (বোনার কাঠিতে) ১০০টি ঘর হয়। তারপরও কিন্তু ষ্টঃ ষ্টিঃ পদ্ধতিতে বুনে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ১১½" ইঞ্চি অংশ বোনা হয়। এবারে এক লাইন সোজা বুনে, তার পরের লাইন থেকে জামার হাতার ফাঁদ তৈরী সুরু হবে। ২টি ঘর উঃ ভাবে এঃ সঃ, ৩টি উঃ, থেকে রিঃ করে যান শেষ অবধি। এখন

তাহলে কাঠিতে রইলো ৮০টি ঘর।) এইবার ১টি সোঃ ১টি উঃ প্যাটার্ণে দুই লাইন বুনুন। তবে প্রত্যেক লাইনের গোড়ায় ২টি করে ঘর বন্ধ করবেন। ৩য় লাইনের গোড়ায় এবং শেষে ১টি করে ঘর কমাতে হবে। এবারে ১টি সোঃ, ১টি উঃ প্যাটার্ণে বরাবর ৩" ইঞ্চি বুনে যান—ঘর না কমিয়ে তারপর (রম্‌পারটির সোজা দিকে) ১টি সোঃ, ১টি উঃ প্যাটার্ণে ২৬টি ঘর বুনে যান; পরের ২২টি ঘর বন্ধ করে ফেলুন; তারপর বাকী ২৬টি ঘর বুনুন—১টি সোঃ, ১টি উঃ প্যাটার্ণে। ঘরগুলো দুটো কাঠিতে ভাগ হয়ে গেলে; এখন প্রতি কাঠির গলার দিকের লাইন আরম্ভ করার প্রথমেই ১টি করে ঘঃ কঃ—যতক্ষণ না ২৬টি ঘর কমে ২০ টিতে দাঁড়ায়। এবার ঘর বন্ধ করে ফেলুন। (জামার দুই দিকের কাঁধ একইভাবে বুনবেন।)

'রম্‌পারের' সামনের দিক বোনার পদ্ধতি

'রম্‌পারের' সামনের দিকটিও অবিকল পূর্ব্বোক্ত পিঠের দিকের () ব্র্যাকেট ভুক্ত নির্দ্দেশানুসারে বুনতে হবে—হাতের ফাঁদ রচনার আগে পর্য্যন্ত যেমন পদ্ধতিতে বোনা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে। এভাবে বুননের হিসাবে আমরা কাঠিতে তাহলে পাচ্ছি ৮০টি ঘর।

হাতের ঘের—এবার ১টি সোঃ, ১টি উঃ প্যাটার্ণে বুনতে হবে। প্রথম লাইন সমান বুনে (সোজা দিকে) দ্বিতীয় লাইন সুরু করবেন। প্রথমেই ১টি ঘর বন্ধ করতে হবে, তারপর ৩৭টি ঘর ১টি সোঃ, ১টি উঃ প্যাটার্ণে, ৪টি মঃ ষ্টিঃ, তারপর, বাকী ৪০টি ঘর অন্য একটি কাঠিতে তুলে রেখে—তৃতীয় লাইন বুনতে হবে,—৪টি মঃ ষ্টিঃ, ৩৭টি ঘর ১টি সোঃ, ১টি উঃ প্যাটার্ণে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইন একবার রিঃ করুন।

বোতামের ঘর—এবারে নিম্নলিখিত নির্দ্দেশানুসারে বোতামের ঘর রচনা করুন। প্রথম ৩৭টি ঘর ১টি সোঃ ১টি উঃ প্যাটার্ণে বুনুন, তারপর ১টি মঃ ষ্টিঃ, ১টি ঃঃ সাঃ, ১টি এঃ সঃ, ১টি মঃ ষ্টিঃ। অতঃপর দ্বিতীয় আর তৃতীয় লাইন, রিঃ করে যান, যতক্ষণ না (অর্থাৎ, যেখান থেকে প্রথম ঘর কমানো সুরু হয়েছিল) ৩" ইঞ্চি বোনা হয়। এবারে পূর্ব্বোক্ত-নিয়মে আরেকটি বোতামের ঘর রচনা করুন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইন একবার রিঃ করে 'রম্‌পারের' গলার অংশ বুনতে সুরু করুন।

গলার অংশ—প্রথমেই ১৬টি ঘর বন্ধ করুন, তারপর গলার দিকে ১টি করে ঘর বন্ধ করে যান—প্রত্যেক দ্বিতীয় লাইনের গোড়ায়। এইভাবে বুনে, কাঠিতে যখন ২০টি মাত্র ঘর বাকী থাকবে, তখন ঘর বন্ধ করে ফেলবেন। এবারে যে ৪০টি ঘর আরেকটি কাঠিতে তুলে রেখেছিলেন, সেগুলিও ঠিক উপরোক্ত নির্দ্দেশানুসারে বুনে যান। কেবল বোতামের ঘর তোলার লাইনগুলোতে ৪টি ঘর চার-রকম ধরণে না বুনে, সেই চারটিকে মঃ ষ্টিঃ বুনতে হবে।

এভাবে কাজ করলেই, 'রম্‌পারের' সামনের ও পিঠের ···দু'দিকেরই অংশ বোনা হয়ে যাবে। এবারে 'রম্‌পারের' হাতা দুটি বোনার পালা। প্রয়োজনবোধে অবশ্য, 'রম্‌পারের' হাতা দুটি না বুনলেও চলে। তবে, রম্‌পারের' হাতা না বুনলে কিন্তু হাতার ধের দুটিকে ক্রুশের কাঠি দিয়ে দু'লাইন 'চেন ষ্টিচ্' (Chain Stich) করে দিতে হবে।

আপাততঃ, এই পর্য্যন্তই হদিশ দিয়ে রাখছি। কারণ, স্থানাভাবের জন্য, এবারে 'রম্‌পারের' হাতা, কলার, বেল্ট প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ বোনার পদ্ধতির বিশদ পরিচয় জানানো সম্ভব হয়ে উঠলো না। কাজেই আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে যথা-প্রয়োজন আলোচনা করবো। [ক্রমশঃ

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি, আমাদের দেশের অপরূপ-সুস্বাদু বিচিত্র এক-ধরণের মিষ্টান্ন রান্নার কথা। অভিনব-উপাদেয় এই মিষ্টান্নের নাম—'পেঁপের হালুয়া'।

প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণের উদ্দেশ্যে বাড়ীতে

নিজের হাতে পরম-মুখরোচক এই 'পেঁপের হালুয়া' মিষ্টান্ন বানানোর জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার মোটামুটি হদিশ দিয়ে রাখি। এ খাবারটি বানাতে হলে, চাই—বড় সাইজের দুটি কাঁচা পেঁপে, একটি নারিকেল, দেড়সের দুধ, আধসের চিনি, আধপোয়া ঘি, গোটা দশ বারো ছোট এলাচের গুড়ো, আট দশটি তেজপাতা এবং অল্প কিছু কিসমিস ও পেস্তা বাদামের কুচি।

এ সব উপকরণ জোগাড় হলে, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, পেঁপে দুটিকে দু ফালি করে কেটে, কুরুনীর সাহায্যে মিহি ছাঁদে কুরে নিন। তারপর সদ্য কোরা ঐ পেঁপেতে আন্দাজ মতো পরিমাণে অল্প একটু জল মিশিয়ে উনানের আঁচে রন্ধন পাত্র চাপিয়ে 'মিশ্রণটিকে' আগাগোড়া সুসিদ্ধ করে ফেলুন। 'মিশ্রণটি' সুসিদ্ধ হলে, উনানের উপর থেকে রন্ধন পাত্রটিকে নামিয়ে, কাথার মতো নরম ঝকঝকে ছাঁদের পেঁপের 'মণ্ড'টুকু পরিষ্কার একটি কাপড়ের টুকরোতে রেখে কিছুক্ষণ কোনো উঁচু জায়গায় ঝুলিয়ে রাখুন···তাহলেই সহজ উপায়ে সুসিদ্ধ পেঁপের 'মণ্ড' থেকে অপ্রয়োজনীয় জলটুকু সহজেই ঝরিয়ে নেওয়া যাবে এবং কুরো-পেঁপেও আগাগোড়া বেশ ঝরঝরে ধরণের হয়ে উঠবে। এ কাজটুকু সেরে নেওয়ার ফাঁকে, কুরুনীর সাহায্যে নারিকেলটিকেও মিহি ছাঁদে কুরে রাখুন।

এবারে উনানের আঁচে রন্ধন পাত্র চাপিয়ে, দেড়সের দুধ ভালোভাবে জাল দিয়ে তিন পোয়া পরিমাণ বানিয়ে তোলার পর, ঘন দুধটুকু অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে সযত্নে আলাদা করে সরিয়ে রাখুন। তারপর পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প একটু ঘি গরম করে, তেজপাতাগুলিকে ভেজে নিন। এভাবে ভাজার ফলে, তেজপাতাগুলির রঙ আগাগোড়া বেশ বাদামী ধরণের হয়ে উঠলে, রন্ধন পাত্রের তপ্ত তরল ঘিয়ে ইতিপূর্বে সযত্নে তুলে রাখা সু-সিদ্ধ পেঁপে আর নারিকেলের কুরো মিশিয়ে দিয়ে, খুন্তীর সাহায্যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে এই মিশ্রণটিকেও বেশ ভালোভাবে ভেজে নিন। এমনি উপায়ে 'মিশ্রণটি' আগাগোড়া ভালোভাবে ভাজা হলে, উনানের আঁচে বসানো রন্ধন পাত্রে চিনিটুকু ঢেলে দিয়ে খুন্তীর সাহায্যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন এবং রন্ধন পাত্রে ঘন দুধটুকু মিশিয়ে পুনরায় আগের মতোই খুন্তী দিয়ে 'মিশ্রণটিকে' আরো খানিকক্ষণ অনবরত নাড়াচাড়া করতে থাকুন। এভাবে পাক করার ফলে, কিছুক্ষণ বাদে রন্ধন পাত্রের দুধটুকু শুকিয়ে 'মিশ্রণটি' আগাগোড়া বেশ ঘন ঝকঝকে হালুয়ার মতো ছাঁদের হয়ে উঠলেই, রন্ধন পাত্রে ছোট এলাচের গুড়ো আর কিসমিস ছড়িয়ে দিয়ে 'মিশ্রণটিকে' আরো খানিকক্ষণ খুন্তীর সাহায্যে অবিরাম নাড়াচাড়া করতে হবে। তারপর সদ্য পাক করা হালুয়ার চেহারা বেশ ঝরঝরে ধরণের হলেই উনানের উপর থেকে রন্ধন পাত্রটিকে নামিয়ে নিয়ে খাবারটি সযত্নে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন এবং সেটি আগাগোড়া বেশ জুড়িয়ে গেলে মিষ্টান্নের উপর পরিপাটিভাবে পেস্তা বাদামের কুচি ছড়িয়ে দিন। তাহলেই দিব্যি সহজ সুন্দর উপায়ে বিচিত্র সুস্বাদু 'পেঁপের হালুয়া' মিষ্টান্ন রান্নার কাজ শেষ হবে।

অতঃপর, প্রিয়জনদের পাতে সাদরে সযত্নে অভিনব মুখরোচক এই ভারতীয় মিষ্টান্ন পরিবেষণের পালা। অপরূপ উপায়ের এই মিষ্টান্নের স্বাদ পেয়ে তাঁরা যে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

জ্ঞানতপস্বী তারকচন্দ্র রায়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হে জ্ঞান তপস্বী তুমি অমৃত সন্ধানী,
চির দিবসের ছাত্র, ভাল করে জানি।
নিরলস কর্মী, আর সংসারী মহৎ—
তব জীবনের মন্ত্র ও তৎসৎ।
তুমি কবি, দার্শনিক সুন্দর জীবন—
যত প্রেম তত প্রীতি-স্নেহ অতুলন।
কত ব্যথা অস্পৃশ্য ও অনুদ্ভূত লাগি!
হে ব্রাহ্মণ—হরিজন হরি অনুরাগী।
শাক্তও যেমন, তুমি তেমনি বৈষ্ণব—
চিত্তে তব মিলনের অনন্ত উৎসব।
এনেছিলে সাথে ভাব-তুষ্টিষ্ঠ যে মন,
এ ভারত মাগে তার পুনরাগমন।

গল্প

শেষ আহুতি

যূথিকা দাস

জীবনকে কে না ভালবাসে? সবাই নিজেকে ভালবাসে, নিজের জীবনের গতিকে ছন্দ বদ্ধ করতে সবাই জীবনের নানা প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষার সামনে দাঁড়ায়। জয়ী হবার সবার স্বপ্ন। সবার একান্ত সাধ থাকে। জীবনকে সুন্দর দেখতে ও করতে কার না সাধ?

তবু তো ছন্দ পতন ঘটে। ঘটছে প্রতিদিন। প্রতি নিয়ত অথৈ জলে খাবি খেয়ে খেয়ে কতটুকুই বা উত্তরে চলা যায়। তবু যেন সাধ সাধনা হয়েই জীবন আকাশকে ঘিরে থাকে। পথের গতি এঁকে বেঁকে চলে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ আকাশে যেমন এঁকে বেঁকে চলে, উদাস গতি অবলম্বন করে। বর্ষণই তার ধর্ম। ধরিত্রীকে বর্ষিত করে শান্ত স্নিগ্ধ করে জুড়িয়ে দেবার জন্যই মহা-সিন্ধুর বুক থেকে জন্ম নিয়ে অনাদিকাল থেকে আঁকা বাঁকা পথ ধরে ধরে আকাশে ভাসা ভাসা মেঘ।

আসলে সব মেঘ কী জল হয়ে ঝড়িয়ে পড়ে এই পৃথিবীকে শীতল করতে?

কত ছোট বড় মেঘ আকস্মিক হাওয়ায় এক নিমিষে ভেঙ্গে চুরমার হাওয়ায় মিশে যায়। মেঘ জন্মে যে ধর্ম নিয়ে তারা এসেছিল যে সাধ ও সাধনা বুক জুড়ে তাদের ছিল, এক মুহূর্তে তা তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গেল।

তেমনি জীবনের সাধ স্বপ্ন ভাঙ্গা মেঘের মত অনিশ্চিত। সব জীবনই স্বপ্নের মেলা কিন্তু তাও বুঝি নিষ্ঠুর বিধাতা এক এক সময় এমন তুফান জীবন আকাশে এনে ছেড়ে দেন যে সুন্দর সুখের জীবন চির দুঃখের সাগরে ডুবে যায়। সব স্বপ্নমেলা এক অবাঞ্ছিত অভিশাপের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কে এ দুঃখের জন্য দায়ী? কে এ দুঃখ দিল, কার কাছেই তার হিসেব নিকেশ মিলে না। দুঃখ জীবনকে কেড়ে নেয় তার আনন্দের খেলা খেলতে।

তেমনি দুঃখ কেড়ে নিল তাপসীর জীবনের সব সুখ সব সাধের মেলা। একটি রজনীর অন্ধকারে যাহা ঘটলো সেই অন্ধকার সমস্ত জীবনকে পর্দায় আচ্ছন্ন করে তাপসীকে ঢেকে ফেলে ছিল।

তাপসী শুয়ে ছিল একমাত্র পুত্রকে বুকে নিয়ে। দীর্ঘ দিন পরে বাবার কাছে ফিরে এসেছে। সনের বৎসরে পিতা রমণীমোহন দূর দেশে একমাত্র কন্যা তাপসীকে পাত্রস্থ করেন। কোথায় টাকা পয়সাপাড়ের এক অখ্যাত গ্রামের মেয়ে—পাড়ি দিল চট্টগ্রামের শহরে। স্বামী শঙ্করদেব সেই থেকে কাছে কাছেই রেখেছে তাপসীকে। দীর্ঘ দশবৎসর পরে পিতা তাপসীকে নিয়ে এসেছে। আজ তাপসীর স্বামী শঙ্করদেব আসবে বলে শ্বশুরকে চিঠি দিয়েছে।

গোয়ালন্দ থেকে ষ্টীমারে পদ্মানদী পার হয়ে যে কাঞ্চনদিঘী ষ্টেশন সেখানে রমণীমোহন নৌকা ভাড়া করে নৌকা পাঠিয়েছে জামাইকে ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসতে। সঙ্গে গেছে বাড়ির চাকর রামসুন্দর।

রাত প্রায় বারটা পর্যন্ত এসে পড়বে জামাই। তাই কারো চোখে আজ ঘুম নেই।

কিন্তু বারটার কাটা ঘড়ি পেরিয়ে গেল। তবু নৌকা বাড়ি ফিরছে না। রমণীমোহন বারবার নিজের ঘর ও উঠান পায়চারী করছেন।

তাপসীও জেগে আছে অনেকক্ষণ। ছেলে রুনুকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে তাপসীর চোখ তন্দ্রায় জড়িয়ে আছে। হঠাৎ খুট করে দরজায় শব্দ। তাপসীর ঘরে প্রদীপের আলো জ্বলছে। ভাবে রামসুন্দর বুঝি এসেছে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে বসে।

কিন্তু দরজার আস্তে করে শব্দ করে ডাকছেন রমণী-মোহন—মা তাপসী দরজা খোল।

তাপসী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বের হয়ে আসে। বাইরে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। দ্বিতীয়ার চাঁদ সন্ধ্যাকাশে কখন একটু উঁকি দিয়ে বিদেয় নিয়েছে। অন্ধকারে ঢেকে আছে সমস্ত উঠান খানা। রমণী মোহন যেন ভীতু কেমন জড়সড় হয়ে মেয়েকে ডাক দিয়ে বলেন—আয় বারান্দায় আয়। এ গুলো তুলে রাখ।

—কী বাবা? বলে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কাছে যায় তাপসী। দশ বৎসরে মাতৃহারা তনয়া। পনের বৎসরে পিতার বুক থেকে বিদেয় নিয়ে স্বামীর ঘর করতে গিয়েছে। দীর্ঘ দশ বৎসর শঙ্কর দেব ও তার মা সুলেখা দেবী তাপসীকে ছেড়ে দেয় নি। রমণী মোহনের কথা ছিল পঁচিশ ভরি সোনা ও এক হাজার টাকা যৌতুক হিসেবে দিবার। কিন্তু বৃদ্ধ রমণী মোহন কোন মতেই সোনা কেনার টাকা যোগাড় করতে না পেরে মাত্র দশ ভরি সোনায় সন্তোষ সাধিয়ে দেন। একেবারে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ। যে বন্ধু টাকা যোগাড় করে দিবে বলেছিল শেষ পর্যন্ত তার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়।

এদিকে বিয়ের দিন ধার্য্য হয়ে গেছে। শঙ্করদেব বিয়ের সভায় রমণী মোহনের চোখের জল সহ্য করতে না পেরে ও তাপসী রূপবতী বলে তাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু মাতা সুলেখা পুত্রের এ অপরাধ ক্ষমা করলেননা। স্নেহ ধরলেন এ প্রতারককে শাস্তি তোমায় দিতেই হবে বলে।

শঙ্করদেব সব কথা শ্বশুরকে জানিয়ে দাবী করলো কড়া চিঠিতে বত্রিশ ভরি সোনা পুরো করে দিতে। এবং একথাও স্পষ্ট জানিয়ে দিল—যত দিন না আপনি সোনা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবেন ততদিন আমার মা তাপসীকে আপনার নিকট পাঠাবেন না।

এ চিঠি পেয়ে রমণীমোহনের মাথায় বজ্রাঘাত পড়লো। অপমানে ও দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন! একমাত্র কন্যাকে বড় সাধ করে বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে যে এমন করে কষ্ট পেতে হবে, এমন করে পিতা ও কন্যাকে মনের কষ্টে দিন কাটাতে হবে, তা তিনি আশা করেন নাই।

আজ রমণীমোহন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পনের ভরি সোনার জায়গায় আজ চতুর্গুণ সোনা দিয়ে জামাই শঙ্করদেবকে চমক লাগাবেন। সমস্ত অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। আজ রমণীমোহনের ভাই বড় আনন্দের দিন। বড় গর্ব। অক্ষম বলে অসহায় বলে এতদিন অপমান করে একমাত্র কন্যাকে বন্দী করে রেখেছিল। আজ সেই নিষ্ঠুরতার সামনে দাঁড়িয়ে জামাইকে দেখিয়ে দেবেন রমণীমোহনও সক্ষম।

যেমন করেই হোক তারও সোনা উপায় করবার, টাকা উপায় করবার শক্তি আছে।

আজ জামাইয়ের সঙ্গে এক আহ্বান করে বুঝিয়ে দেবার দিন এসেছে কে বেশী ক্ষমতাবান।

তাই বড় আনন্দ বড় শুভ দিন আজ রমণীমোহনের।

কিন্তু একি কান্নার শব্দ যেন, তাপসী কাঁদছে কেন? আর বাইরে অপেক্ষা না করে ঘরে ঢুকে রমণীমোহন তাপসীর কাছে যায়। তাপসী প্রদীপের কাছে নিস্তব্ধ পাথরের মত বসে আছে। হাতে একটি সোনার আংটী নিয়ে। ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে প্রশ্ন করে তাপসী। বাবা এ ত ওঁর হাতের আংটী। এ বোতাম সেটও তোমার জামায়ের! এ তুমি কেমন করে পেলে? দেখি বলে মেয়ের হাত থেকে নিয়ে দেখতে নিয়ে হাত থর থর করে কাঁপে রমণীমোহনের হাত দিয়ে তুলে নিয়েও নিতে পারেন না। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে জলে। আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না রমণীমোহন। বসে পড়েন মেজেতে। মেয়ে পিতার এমন অসহায় অবস্থা দেখে প্রশ্ন করে—ব্যাপার কী বাবা খুলে বলো। এ আংটী ও বোতাম তুমি কেমন করে পেলে? আর তোমার জামাই তো এখনও এলেন না। রামসুন্দরই বা এখনও ফিরছে না কেন?

মেয়ের হাত ধরে কেঁদে রমণীমোহন বলেন—ওরা আর কোনদিন আসবে না রে—বলেই মেজেতে পড়ে শিশুর মত কাঁদতে থাকেন রমণীমোহন। তাপসীও কাঁদতে কাঁদতে প্রশ্ন করে—বলো বাবা বলো চুপ করে থেকো না। সব খুলে বলো তোমার দুটি পায়ে পড়ি। এসব তুমি কেমন করে পেলে এই দেখ আংটীতে তোমার জামাইয়ের নাম লেখা রয়েছে।

আর বোতাম—আলোর কাছে ভাল করে দেখতে

নিয়েই চিৎকার করে ওঠে তাপসী—বাবা বোতামে রক্ত কেন? এই দেখ দুটো বোতামে রক্ত মাখা। আর শুনতে পারে না রমণীমোহন। মাটিতে মাথা কুটতে কুটতে বলে আমি তোর সর্বনাশ করেছি মা। পিতা হয়ে তোর জীবনের সব সুখ আজ আমার ডাকাতরা খুন করে আমাকে ত্যাগ এনে দিয়েছে।

—খুন! এ কি বলছো বাবা?

তুমি শঙ্করদেবকে খুন করতে বলেছ?

হ্যাঁ খুন। এমনি শত শত শঙ্করদেবকে আমার দলের লোকেরা খুন করেছে। আর আমাকে তারা সোনা ও টাকার অর্দ্ধেক ভাগ দিয়েছে। পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে কী ভাবে দিনের পর দিন ডাকাতি করা যায় তার সব কৌশল দলের লোকদের শিখিয়ে দিয়েছি।

—তুমি ডাকাতের দলের সর্দার হয়েছ? কেন? কোন দুঃখে তুমি এ পথে নামলে।

—তোর শোক সহ্য করতে না পেরে, আমি যেমন করেই হোক সোনা ও টাকা জোগাড় করবোই এ প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। একমাত্র কন্যার বিচ্ছেদ আমি সইতে পারলুম না। তোর স্বামী ও শাশুড়ীর নিষ্ঠুরতা আমাকে নিষ্ঠুর করে তুললো।

আমি যেমন করেই হোক ওদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে তোকে আমার কাছে আবার আনবো এই সঙ্কল্প নিলাম।

এমন সময় একা একা থাকি এক রাত্রিতে এক ডাকাত আমার কাছে পালিয়ে আশ্রয় নিল পুলিশের নজর এড়াতে, আমার মাথায় খুন চেপে গেল। আমি ওদের সর্দার হয়ে—টাকা ও সোনা রোজগার করবার পথ খুঁজে পেলাম।

আমার একটা অঙ্গলের মধ্যে ওদের আস্তানা করে ওদের খাওয়া থাকা ও বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে তৈরী করে দিলাম। আজ সাত বৎসর আমি ডাকাতের দলের সর্দার। বাইরে আমি রমণীমোহন অসহায় দরিদ্র। ভিতরে আমি ধনী হতে থাকি তোর স্বামী ও শাশুড়ীর ক্ষুধা মিটিয়ে তোকে আমার কাছে নিয়ে আসবো বলে।

আজ দলের ডাকাতি করবার কথা ছিল পরশ্বায়। আমার জামাইয়ের নৌকা ধরে যে আমার লোকজন খুন করবে এ ত বুঝতে পারি নাই। কেন না রামসুন্দরকে তো ওরা ভালমত চিনে। এখন মনে হচ্ছে অন্ধকারে রামসুন্দরকে ওরা চিনতে না পেরে আগে খুন করেছে।

তাপসী আর শুনতে পারে না। বিছানা হতে রাহু উঠে পড়ে—জিজ্ঞেস করে মাকে—মা বাবা এসেছে?

তাপসী পুত্রকে বুকে নিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

রমণীমোহন বলে—তুই আমাকে ধরিয়ে দেখা—তুই আমাকে ফাঁসি দে। আমি আর বাঁচতে চাই না। বলে মেয়ে তাপসী ও নাতী রাহুকে বুকে জড়িয়ে ধরে। তাপসী পিতাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর বলে—বাবা আমার কী উপায় হবে—আমি কী নিয়ে কেমন করে বাঁচবো? তুমি কেন আমার জন্য এমন সর্বনাশা পথ বেছে নিলে? নাই বা আসতাম কোনদিন তোমার কাছে। আমি তো স্বামী শাশুড়ী নিয়ে সুখেই ছিলাম। কেন এমন করে করে নিজের ঘরেও সর্বনাশের বান ডেকে আনলে? রমণীমোহন চুপ—হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। তাপসী পুত্রকে বুকে নিয়ে কাঁদে। পুত্র অসহায় অবুঝ হয়ে বারবার প্রশ্ন করে—বলো না, মা কী হয়েছে? আমাকে একটি বার বলো মা বাবা কখন আসবে? নইলে আমিও কাঁদবো তোমার ও দাদুর সঙ্গে সঙ্গে।

ভাগ্যলিপি

শ্রীপঙ্কজকুমার মিত্র

স্নিগ্ধ প্রাতে সবুজ বনে ফুটলো কত ফুল—
গোলাপ যুঁই টগর পদ্ম জবা ও বকুল।
সবাই চায় তুলতে মাথা সবার উপরে;
জীবন প্রাতে উর্দ্ধে যেতে কেউ না মানা করে।

ভাগ্যলিপি ভিন্ন লেখা
আশার কথা শুনবে কে—তা?
কেউ বা যায় কবরী প্রান্তে, কেউ বা বেদীতলে,
কেউ বা মাঠে, কেউ বা ঘাটে, কেউ বা পদতলে।

মরদের মর্দ্দানী

বেহায়ার নাই লাজ, নাই অপমান…
নিকাদের আরিজুরী ভেঙ্গে খান্-খান্!
আয়ুব-ভুত্তোর তবু আস্ফালন-বাণী ··
কবরের ডালা খুলে চাদে পাকিস্তানী!

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

অবকাশরঞ্জন :

পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী"; "অপরাজিত", "অপুর সংসার", "জলসাঘর", "দেবী", "পরশ পাথর", "অভিযান", "পোষ্টমাষ্টার", "মণিহারা" ও রবীন্দ্রনাথ"—এই এগারটি চিত্র নিয়ে লণ্ডনের ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে একটি চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উৎসবটি ২২শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত চলবে।

• • •

তপন সিংহের "গল্প হলেও সত্যি"র স্যুটিং সুরু হয়ে গেছে। একাশী বছর বয়সের যোগেশ চট্টোপাধ্যায় এই ছবির একটি ভূমিকায় অভিনয় করছেন। পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের আবিষ্কার ('নায়ক' ছবির জন্য) এই অশীতিপর শিল্পীকে তপনবাবুর ছবিতে দেখা যাবে এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্ত্তা রূপে। পার্থ মুখোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি বসু ও কৃষ্ণা বসু এই চিত্রের অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন

মাত্র একটি সেটে বিন্যস্ত এই ছবির স্যুটিং এক মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হবে।

তপন সিংহ একাধারে এই চিত্রের কাহিনীকার, চিত্র নাট্যকার, পরিচালক ও সুরকার।

• • •

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের "শুধু একটি বছর" চিত্রের পরিচালকরূপে এবার দর্শকরা পাবেন উত্তমকুমারকে। এতদিন 'বন্ধু' এই ছদ্ম নামের পিছনে লুকিয়ে থেকে, এবার পরিচালকরূপে আত্মপ্রকাশ করতে প্রস্তুত হয়েছেন বহু চিত্রের নায়ক উত্তমকুমার। নায়িকা চরিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরীকে দেখা যাবে, আর অপর গঙ্গোপাধ্যায়, দীপিকা দাস প্রভৃতিও অন্যান্য ভূমিকায় থাকবেন। চিত্রটির সুরকার হচ্ছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

• • •

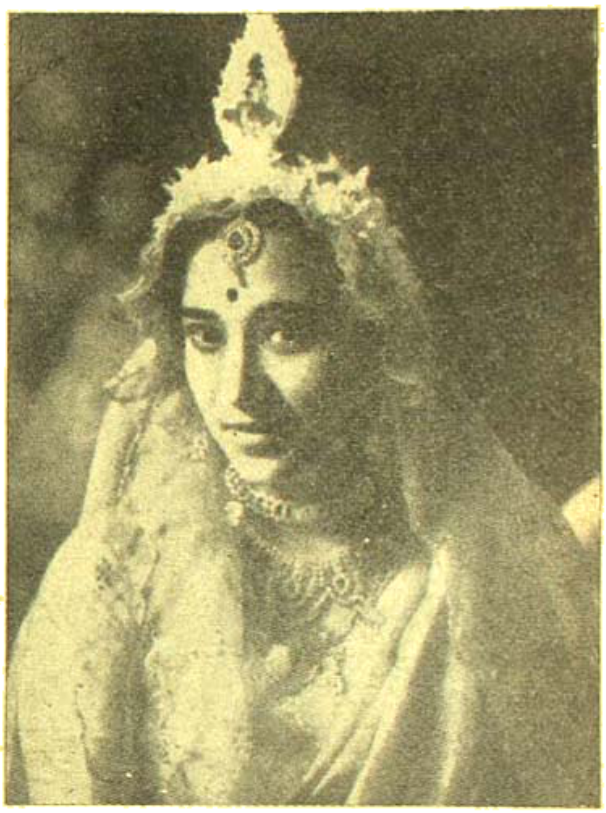

অসিত ঘোষ পরিচালিত "ফিরে চল" চিত্রে
সবিতা বসু ফটো : অবিনেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় শীঘ্রই একটি বাংলা ছবি প্রস্তুত করবেন। ছবির নাম হবে 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা।' প্রযোজনা করবেন অভিনেতার স্ত্রী শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়। ট্রায়ো ফিল্ম-এর এই ছবির প্রধান তিনটি ভূমিকায় শিল্পী হবেন—প্রসেনজিৎ (বিশ্বজিতের ছেলে), বিশ্বজিৎ ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। ফেব্রুয়ারী মাসে ছবির নিয়মিত স্যুটিং আরম্ভ হবে।

• • •

অগ্রগামী পরিচালক গোষ্ঠী নায়ক উত্তমকুমার ও নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে "শঙ্খ বেলা" নামে যে চিত্রটি নির্ম্মাণ করছেন তা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এই চিত্রের অন্যান্য ভূমিকায় আছেন বসন্ত চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল, শোভা সেন, বাণি ও নবাগত মৃণাল।

গত নভেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে এই ছবির গানগুলি রেকর্ড করা হয়েছে। সুধীন দাশগুপ্তর সঙ্গীত পরিচালনায় গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন লতা মঙ্গেশকর ও মান্না দে। চিত্রটি প্রযোজনা করেছেন অনুরাধা ফিল্মস।

• • •

হিরণ্ময় সেন পরিচালিত "পাগল ঠাকুর" চিত্রের নাম ভূমিকায় অপনকুমার ও ভৈরবীর ভূমিকায় সমিতা বিশ্বাস

ফটো : অমিয়েশ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রোগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ-এর নির্মীয়মাণ "সাংবাদিক" ছবিতে উত্তমকুমারকে এক সাংবাদিকের ভূমিকায় এবং সুপ্রিয়া চৌধুরীকে এক মহিলা ব্যারিষ্টারের চরিত্রে দেখা যাবে। এই ছবিটি পরিচালনা করছেন "নয়ের-নিমাই"-খ্যাত পরিচালক বিমল রায়। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন শ্যামল মিত্র।

• • •

জয়দীপ পিকচার্স-এর ছবি "ভানু গোয়েন্দা-জহর অ্যাসিসটান্ট"-এর স্যুটিং সম্প্রতি শুরু হয়েছে। এই হাস্যরসাত্মক চিত্রটি পরিচালনা করছেন পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী এবং সুরারোপের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্যামল মিত্র। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জহর রায় ছবির প্রধান দুই শিল্পী।

• • •

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "লীলা" চিত্রটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প অবলম্বনে চিত্রটি রচিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে শ্রীমুখোপাধ্যায় শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে বোলপুর গিয়েছিলেন। সেখানে ছবির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তোলা হয়। ছবির নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরা হচ্ছেন—বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, ছায়া দেবী, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, পদ্মা দেবী প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

• • •

কলিকাতা ও মাদ্রাজের যুগ্ম-প্রচেষ্টায় তৈরী গোপীকৃষ্ণ ফিল্মসের "পাণ্ডবের বনবাস" ছবিটি ১৪ই জানুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে। মূল ছবিটি তেলেগু ভাষায় নির্মিত হলেও বর্তমান রূপটিতে শিল্পীদের সংলাপ বাংলায় 'ডাব' করা হয়েছে এবং কিছু অতিরিক্ত বাংলা সংলাপও সংযোজিত করা হয়েছে। ছবির গানগুলি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, গীতা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও নির্মলা মিশ্র।

• • •

সম্প্রতি 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' চিত্রটির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। গান গাইবার জন্য বোম্বাই থেকে কণ্ঠশিল্পী মান্না দে কলকাতায় এসেছিলেন। অনিল বাগচী হচ্ছেন ছবিটির সুরকার। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রটি পরিচালনা করেছেন এবং নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবেন উত্তমকুমার।

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যাণ্ড ঃ

অষ্ট্রেলিয়া : ৪৭৩ রাণ (৬ উইকেটে ডিক্লেঃ বিল লরী ১৬৬, ডগলাস ওয়াল্টার্স ১৫৫ এবং টম ভিতার্স নট আউট ৫৬ রাণ। ডেভিড ব্রাউন ৭১ রাণে ৩ এবং কেন হিগ্‌স ১০২ রানে ২ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড : ২৮০ রাণ (ফ্রেড টিটমাস ৬১, কেন ব্যারিংটন ৫৩, জিম পার্কস ৫২ এবং জিওফ বয়কট ৪৫ রাণ। পিটার ফিলপট ৯০ রাণে ৫, পিটার এ্যালান ৫৮ রাণে ২ এবং নীল হক ৪৪ রাণে ২ উইকেট)

ও ১৮৬ রাণ (৩ উইকেটে। জিওফ বয়কট নট আউট ৬৩, কেন ব্যারিংটন ৩৮ এবং জন এডরিচ ৩৭ রাণ। ববু কাউপার ২০ রানে ১, ডগলাস ওয়াল্টার্স ২২ রানে ১ এবং পিটার ফিলপট ৬২ রানে ১ উইকেট)

ব্রিসবেন মাঠে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া-ইংল্যাণ্ডের ৪৮তম টেষ্ট ক্রিকেট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলাটি ড্র গেছে। মোট বরাদ্দ ত্রিশ ঘণ্টা খেলার সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জন্যে দশ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়—খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে তো খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা দেরীতে করার ফলে খেলায় জয়-পরাজয়ের আশা বিলুপ্ত হয়। দুই দলই পুরো শক্তি নিয়ে দল গঠন করতে পারেনি। অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ববি সিম্পসন ও কাস্ট বোলার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি এবং অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের সহ-অধিনায়ক কলিন কাউড্রেকে তাঁদের শারীরিক আঘাত এবং অসুস্থতার দরুণ দলভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

ব্রিসবেনের এই প্রথম টেস্ট খেলার একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা, অষ্ট্রেলিয়ার নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় ডগলাস ওয়াল্টার্সের সেঞ্চুরী (১৫৫ রান)। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে এই নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার দশজন খেলোয়াড় প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করলেন। আগের ৯জন হলেন : চার্লস ব্যানারম্যান (১৬৫ রান, আহত হয়ে অবসর), মেলবোর্ণ, ১৮৭৭ ; এইচ গ্রাহাম (১০৭ রান), লর্ডস, ১৮৯০, আর এ ডাফ (১০৩ রান), মেলবোর্ণ, ১৯০২ ; আর জে হার্টিগান (১১৬ রান), এডিলেড, ১৯০৮ ; এইচ এল কলিন্স (১০৪ রান), সিডনি ১৯২০; বিল পন্সফোর্ড (১১০ রান), সিডনি, ১৯২৪ ; আর্চি জ্যাকসন (১৬৪ রান), এডিলেড, ১৯২৯ ; নীল হার্ভে (১১২ রান), লিডস, ১৯৪৮ এবং জেফ্‌স বার্কি (১০১ নট আউট), এডিলেড, ১৯৫০—৫১। এই দশ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ব্যানারম্যান, গ্রাহাম, পন্সফোর্ড, জ্যাকসন, হার্ভে এবং ওয়াল্টার্স প্রথম ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেন। বাকি চারজন সেঞ্চুরী করেন দ্বিতীয় ইনিংসে।

প্রথম দিন বৃষ্টির জন্যে মাত্র ১৬৮ মিনিট খেলা হয়েছিল। এই সময়ে অষ্ট্রেলিয়ার একটা উইকেট পড়ে ৭৯ রান উঠেছিল। খেলায় অপরাজিত ছিলেন বিল লরি (৪০ রান) এবং কাউপার (২০ রান)।

বৃষ্টির দরুণ দ্বিতীয় দিনে একটা বলও খেলা হয়নি। এ রকম টেষ্টের পুরো একদিন খেলা না হওয়ার ঘটনা গত এগার বছরে অষ্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যাবে না।

তৃতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১২৫ রানের মাথায় চতুর্থ উইকেট পড়ে যায়। দলের এই শোচনীয় অবস্থায় নবাগত টেষ্ট খেলোয়াড় ডগলাস ওয়াল্টার্স ওপনিং ব্যাটসম্যান লরির সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলার চেহারা বদলে দেন। দলের ৩১২ রানের মাথায় লরি ব্যক্তিগত ১৬৬ রান করে আউট হন। লরি এবং ওয়াল্টার্স পঞ্চম উইকেটের জুটিতে ২৯১ মিনিটে দলের ২৮৭ রান সংগ্রহ করেন। লরি তাঁর ১৬৬ রানে ২৩টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। প্রথম দিনের খেলাতেই লরি তিনবার আউট হ'তে হ'তে কপাল জোরে রক্ষা পান। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে অষ্ট্রেলিয়ার ৩৮৪ রান দাঁড়ায় (৫ উইকেটে)। অপরাজিত থাকেন ওয়াল্টার্স (১১৯ রান) এবং ডিভাস (৩৯ রান)।

চতুর্থ দিনে অষ্ট্রেলিয়া এক ঘণ্টা খেলে। দলের ৪৫৩ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন অস্থায়ী অধিনায়ক ব্রায়ান বুথ। ওয়াল্টার্স ৩২২ মিনিট খেলে তাঁর ১৫৫ রানে দুটো ওভার-বাউণ্ডারী ও বং এগারটা বাউণ্ডারী মারেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ওয়াল্টার্স এবং ডিভাস ১৩০ মিনিটের খেলায় দলের ১১৯ রান তুলে দিয়েছিলেন।

চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের পাঁচটা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১২৭ রান সংগ্রহ করেছিল। 'ফলো-অনে'র হাত থেকে রক্ষা পেতে তাদের তখনও ৯৭ রানের প্রয়োজন ছিল। ইংল্যাণ্ডের ১১৫ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় ব্যারিংটনের সঙ্গে উইকেট-কীপার জিম পার্কস জুটি বেঁধে শোচনীয় অবস্থা থেকে দলকে উদ্ধার করেন। পার্কস (৫২ রান) এবং ব্যারিংটন পঞ্চম উইকেটের জুটিতে ৬৮ মিনিটে দলের ৭৬ রান তুলে দেন। পার্কস অষ্ট্রেলিয়ার বোলারদের বিন্দুমাত্র সমীহ না করে খেলেছিলেন। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ২৭ মিনিট আগে আলোর অভাবে খেলা শেষ হয়ে যায়।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ইংল্যাণ্ড। প্রথম ইনিংস ২৮০ রানে। ধারার শেষ হয়ে রয়ে ১৭ রান কম পড়ায় তাদের 'ফলো অন' ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করতে হয়। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৮৬ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় প্রথম টেষ্ট খেলা শেষ হলে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

ব্রিসবেন মাঠে এই নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া-ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ৯টি টেষ্ট খেলা হল। খেলার ফলাফল দাঁড়াল : অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৪, ইংল্যাণ্ডের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ২।

আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন :

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ২১তম আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে রেলওয়ে দল উপর্যুপরি ৬ বার রহিমতুল্লা কাপ এবং মহিলা বিভাগে উপর্যুপরি ৩ বার চ্যান্দা কাপ জয়ী হয়েছে। জুনিয়ার বিভাগের বিজয়ী দলের পুরস্কার নারাঙ্গ কাপ জয়ী হয়েছে গত বছরের বিজয়ী মহারাষ্ট্র।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ : রেলওয়ে ৩-২ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : রেলওয়ে ২-১ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

জুনিয়র বিভাগ : মহারাষ্ট্র ২-১ খেলায় অন্ধ্র প্রদেশকে পরাজিত করে।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন :

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ান নান্দু নাটেকার (মহারাষ্ট্র) গত তিন বছরের রানার-আপ দীপু ঘোষকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেছেন। নাটেকার শেষ বিজয়ী হয়েছিলেন ১৯৬১ সালে। এই বছরেরই পুরুষদের সিঙ্গলস সেমিফাইনালে দীপু ঘোষ এবছরের এশিয়ান এবং নেহরু ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান প্রখ্যাত দীনেশ খান্নাকে পরাজিত করে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেন। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে নাটেকার গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ান সুরেশ গোয়েলকে পরাজিত করেন। রেলওয়ে দলের কুমারী মীনা শাহ দুটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি এই নিয়ে উপর্যুপরি ৬ বার মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস : নান্দু নাটেকার (মহারাষ্ট্র) ১৫-৭ ও ১৫-৫ পয়েন্টে দীপু ঘোষকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : কুমারী মীনা শাহ (রেলওয়ে) ১১-৪ ও ১১-৭ পয়েন্টে কুমারী সরোজিনী আপ্তেকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : দীপু ঘোষ এবং বলেন ঘোষ (রেলওয়ে) ১৫-১১, ১০-১৫ ও ১৫-১০ পয়েন্টে সুরেশ গোয়েল এবং চন্দ্রকান্ত দেওরলকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কুমারী মীনা শাহ এবং কুমারী সরোজিনী আপ্তে (রেলওয়ে) ১৭-১৬ ও ১৫-৭ পয়েন্টে কুমারী অচলা কার্নিক এবং কুমারী শোভা মুর্তিকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : শোভা মূর্তি এবং আব্দুল শেখ (মহারাষ্ট্র) ১৫-৭, ৫-১৫ ও ১৫-৬ পয়েন্টে অচলা কার্নিক এবং নান্দু নাটেকারকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস : গৌতম ঠক্কর (মহারাষ্ট্র) ১৫-৪ ও ১৫—৬ পয়েন্টে মেহবুব আলীকে (অন্ধ্র) পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিঙ্গলস : কুমারী জেসি ফিলিপস (কেরালা) ১১-৬, ১০-১২ ও ১২-৯ পয়েন্টে কুমারী গ্রেস শোরকে (রাজস্থান) পরাজিত করেন।

বালকদের ডাবলস : গৌতম ঠক্কর এবং অতুল প্রেম-নারায়ণ (মহারাষ্ট্র) ১৫-৭ ও ১৫-২ পয়েন্টে সুখজিৎ সিং এবং বেদ প্রকাশকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

রোভার্স কাপ :

১৯৬৫ সালের রোভার্স কাপের ফাইনালে মফৎলাল মিলস দল (বোম্বাই) ১—০ গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত ক'রে রোভার্স কাপ জয় করেছে। বোম্বাইয়ের এই রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ১৮৯১ সালে আরম্ভ হয়েছে। সেই থেকে এ পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের বে-সামরিক দলের মধ্যে মাত্র দুটি দল রোভার্স কাপ জয়ী হল। প্রথম জয়ী হয় ক্যালটেক্স দল, ১৯৫৮ সালে। মোহনবাগান এই নিয়ে সাতবার রোভার্স কাপের ফাইনালে খেলে একবার রোভার্স কাপ জয়ী হয়েছে, ১৯৫৫ সালে। গত বছর মোহনবাগান দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে ০—১ গোলে বি এন আর দলের কাছে পরাজিত হয়েছিল। বি এন আর এ বছরের প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউণ্ডে ১—২ গোলে মফৎলাল মিলস স্পোর্টস ক্লাবের কাছে পরাজিত হয়।

এ বছরের ফাইনাল খেলার প্রথমার্দ্ধের ৯ মিনিটে মফৎলাল মিলস দলের আউট সাইড রাইট এম মেনন অপ্রত্যাশিতভাবে জয়সূচক গোলটি দেন। মোহনবাগান দলের গোলরক্ষকের হাত থেকে বলটি বেরিয়ে পোষ্টে লেগে গোলে অতর্কিতে প্রবেশ করে। মোহনবাগান শত চেষ্টা করেও গোল শোধ দিতে পারেনি। অপরদিকে মফৎলাল দল একাধিক বার গোল দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে শেষ পর্য্যন্ত গোল দিতে পারেনি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস :

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক (১৯৬২) এ্যাথলেটিক স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্র-ছাত্রী বিভাগের দলগত এবং ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। তাছাড়া একাধিক অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্ব রেকর্ড স্পর্শ এবং ভঙ্গ করেছে। বিদ্যাসাগর কলেজের সমীর চ্যাটার্জি ছাত্র বিভাগের ১০০, ২০০, ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়ে শীর্ষ স্থান লাভ করেন। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজের কুমারী গীতা নন্দী ৫০, ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হন।

ফাইনাল ফলাফল

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশীপ

ছাত্র বিভাগ : ১ম সমীর চ্যাটার্জি (বিদ্যাসাগর কলেজ সান্ধ্য বিভাগ)—২০ পয়েন্ট এবং ২য় এম এস গাঙ্গুলী, সমরেশ বসুরায় এবং আর কাঁ (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য বিভাগ)—১৩ পয়েন্ট।

ছাত্রী বিভাগ : ১ম চিত্রা গাঙ্গুলী (বিদ্যাসাগর, মহিলা বিভাগ)—২৮ পয়েন্ট এবং ২য় গীতা নন্দী (দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ)—২০ পয়েন্ট।

দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ

ছাত্র বিভাগ : ১ম বিদ্যাসাগর কলেজ (সান্ধ্য বিভাগ) —২৬ পয়েন্ট, ২য় চাকচন্দ্র কলেজ—১১ পয়েন্ট এবং ৩য় বি ই কলেজ, শিবপুর—১০ পয়েন্ট।

ছাত্রী বিভাগ : ১ম বিদ্যাসাগর কলেজ (মহিলা বিভাগ)—৬৮ পয়েন্ট, ২য় লরেটো কলেজ—২৪ পয়েন্ট এবং ৩য় দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ—২০ পয়েন্ট।

পোলো প্রতিযোগিতা :

কলকাতায় ১৯৬৫ সালের ইতিহাস পোলো এসোসিয়েশন ট্রফি (আই পি এ ট্রফি) প্রতিযোগিতার ফাইনালে আমিরদল ৪—৩ গোলে রতনাদা দলকে পরাজিত করে।

১৯৬৫ সালের এপ্রিল কাপ পোলো প্রতিযোগিতার ফাইনালে ৬১তম ক্যাভালরী দল ৭—৫½ গোলে রাজস্থান ওয়ান্ডারার্স দলকে পরাজিত করে।

এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা :

কোয়ালা লামপুরে অনুষ্ঠিত পুরুষদের তৃতীয় এশিয়ান বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে জাপান এবং দ্বিতীয় স্থান গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ান ফিলিপাইন।

চূড়ান্ত ফলাফল

১ম জাপান, ২য় ফিলিপাইন, ৩য় দক্ষিণ কোরিয়া, ৪র্থ থাইল্যাণ্ড, ৫ম কম্বোডিয়া, ৬ষ্ঠ মালয়েশিয়া এবং ৭ম ভারতবর্ষ।

সুব্রত ফুটবল কাপ :

১৯৬৫ সালের নিখিল ভারত স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় গোর্খা মিলিটারী স্কুল (দেরাদুন) এবং খ্রীষ্কে এ বি বিদ্যালয় দলকে (হাজারিবাগ) যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এই দুই দলের ফাইনাল খেলাটি ৩—৩ গোলে অমীমাংসিত ছিল।

কোচবিহার ক্রিকেট ট্রফি :

বোম্বাই ব্রিগেডিয়ার মাঠে অনুষ্ঠিত ১৯৬৫ সালের নিখিল ভারত স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল-দল প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার দরুণ গত বছরের বিজয়ী উত্তরাঞ্চল দলকে পরাজিত ক'রে কোচবিহার ট্রফি জয় করেছে।

নেহরু স্মৃতি হকি ট্রফি :

দিল্লীর হাডিঞ্জ মাঠে অনুষ্ঠিত নেহরু স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বছরের ফাইনালে শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার দল ১—০ গোলে বোম্বাই একাদশ দলকে পরাজিত করেছে।

পরলোকে বিজি :

বিজয়নগরের মহারাজকুমার ডঃ বিজয়ানন্দ গজপতি-রাজ (বিজি) ৬০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসের যে অধ্যায়ে উজ্জ্বল ইনিংসের উল্লেখ আছে বিজির কর্মবহুল জীবনের কথাও নিঃসন্দেহে সেখানে বিশেষ স্থান পাবে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে পর্যন্ত তিনি লোকসভার সদস্য অলইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের সহসভাপতি—এই ধরণের আরও অনেক সম্মানিতপদ অলংকৃত করেছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট খেলায় তাঁর অপরিমিত দানের কথা স্মরণ করে ১৯৫৮ সালে তাঁকে সরকারী 'পদ্মভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরই তিনি ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'স্যার' উপাধি বর্জন করেন।

ক্রিকেট খেলার সমালোচক, বেতার ভাষ্যকার এবং কৃতী সংগঠক হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ৪।১।৬৬ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রকাশিত হ'ল

প্রফুল্ল রায়ের

নতুন বিরাট উপন্যাস

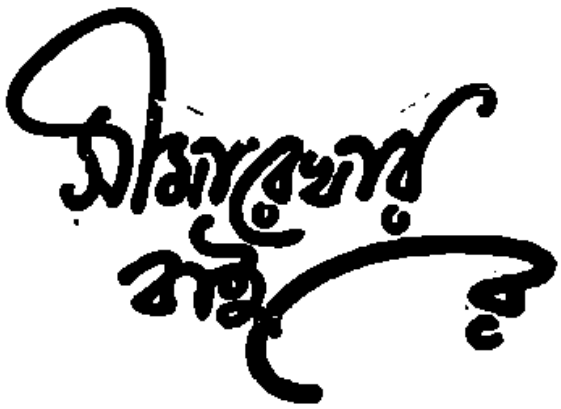

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে হুগলী জেলার দূরঅভ্যন্তর থেকে একটি যুবক জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসেছিল। তার জীবনের একটিমাত্রই মন্ত্র ছিল, 'বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।'

সারা বাঙলাদেশ, বিশেষ করে কলকাতা জুড়ে তখন অন্ধকারের সাধনা চলেছে। একদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কালোবাজারি—এদের ফলশ্রুতি হিসেবে ভিক্ষুক আর পতিতা। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির কল্যাণে উদ্দাম ভোগবাদের প্রমত্ত উৎসব। তৃতীয় আরেকটি দিক ছিল যেখানে আঘাতের পর আঘাতে সমস্ত পুরানো মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে একটা শ্বাপদের মত হামাগুড়ি দিয়ে দাঙ্গা এসে গেল—কলকাতার 'গ্রেট কিলিং'। তারও পর খণ্ডিত দেশের রক্তাক্ত দেহের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার রথ এল ঘর্ঘরিয়ে।

যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বাঙলাদেশের এই বিশৃঙ্খল অধ্যায়টি ঘিরে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার। আর সেই সর্বব্যাপী অন্ধকারে যুবকটি একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডোবা তার হ'ল না।

এত যে অন্ধকার আর নৈরাজ্য তবু এরই অন্তর্স্রোতে কোথায় যেন আলোর ক্ষীণ একটি ধারা ধীরে ধীরে বইছিল। যুবকটি হঠাৎ তা আবিষ্কার করে বসল। দেখল উনিশ শতকের রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে আজ অবধি অসংখ্য মানুষ সেই ধারাটিকে বয়ে নিয়ে চলেছেন এবং আশ্চর্য তাঁদের উত্তরাধিকার তার ওপরে এসে পড়েছে।

জীবিকার খোঁজে যে যুবক এসেছিল, কলকাতা তাকে জীবনের মহত্তর সন্ধান দিয়েছে।

এই বিশাল প্রবন্ধী উপন্যাস সাম্প্রতিক কালের একটি অনন্য সংযোজন।

দাম—দশ টাকা

এই লেখকের আরেকটি উপন্যাস : নোনা জল মিঠে মাটি (দ্বিতীয় সংস্করণ) দাম : ৮·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩·১·১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

REG. NO. C. 679—BHARATVARSHA. Phone :—34-1744. Gram :—Publicasun, Cal
Price—Single Copy—Re. 1/25 Subscriptions—Annual—Rs. 15/-. Half-yearly—Rs. 7/50.

—নূতন প্রকাশিত ভারতবর্ষি বই—

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পিপাসা

অল্পবয়সের তরুণ অধ্যাপক—আর বিদিশা একজন কলেজে-পড়া ছাত্রী। অল্পের নিরীহ, লাজুক আর মেধাবী—কিন্তু বিদিশা মুখরা, নির্ভীক আর উগ্র আধুনিকা। তারপর কবির ভাষায় ব'লতে গেলে—"না জানি কী করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে, কী ছিল বিধাতার মনে!" এর ফলে যে বিস্ফোরণের বীজ রোপিত হ'ল, তা কক্ষচ্যুত উল্কার মত ঠেলে দিলে দু'জনকে জীবনের দু'প্রান্তে। কিন্তু তাদের কলা বাহির রক্তেও কি বিদিশারই যৌবনের উত্তাপ?

দাম—৩'২০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

শতদল

সতীশঙ্কর রায়ের সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে। কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্যে অনেক কিছু করেছেন, বাড়ির চাকরকে অফিসের বেয়ারা ক'রে দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন ডাকাত পরের ধন লুটেপুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। লোকে তাঁকে ভয় ক'রতো যেন সাপ বা বাঘের চেয়েও বেশি আবার কেউ বলে মেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রেছেন—ব'লতে গেলে একেবারে পোকা ছিলেন।

উৎপলের কাছে সতীশঙ্কর এক বিষম সমস্যা। কার কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে? যে লোক প্রথম জীবনে দেশের জন্যে জেল খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন যশ ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, তিনি আবার সহসা আততায়ীর হস্তে নিহতই বা হ'লেন কেন। এই "কেন" সম্বন্ধে তাঁর সুন্দরী তরুণী বিধবা স্ত্রী-ই বা বলেন কি? দাম—পাঁচ টাকা

শক্তিপদ রাজগুরুর

জীবন-কাহিনী

মানুষের জীবনে সমস্যাও যেমন—কৌতুকও তত কম নয়। এই সমস্যা ও কৌতুকের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা দু'টি ভাগ্য-বিড়ম্বিত যুবক-যুবতীর মধুর প্রেমের কাহিনী।

ছায়াচিত্রে রূপায়িত।

দাম—৩'৫০

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মজার মজার খেলা

বিজ্ঞানের নানা রকম কল-কৌশলের সাহায্যে মজাদার খেলা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করার মত বই। দেখা ও খেলার কাজ একই সঙ্গে চ'লবে।

কিশোরদিকে উপহার দেওয়ার পরম উপযোগী।

নূতন ধরনের বাইন্ড। অসংখ্য ছবিতে ভরপুর।

দাম—৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

ভারতবর্ষ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

মাঘ ১৩৭২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

সকলের সেরা
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০
Glucose
KOLAY
QUALITY SWEETS
KOLAY TOFFEE

৫৩-তম বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

—নূতন প্রকাশিত চারখানি বই—

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পিপাসা

অশোকনুখুজ্যে তরুণ অধ্যাপক—আর বিপিন একজন কলেজের-পড়া ছাত্রী। মনোজ মিষ্টি, রাহুক আর মেধাবী—কিন্তু বিপিন দুরন্ত, নিভীক আর উগ্র আধুনিকা। তারপর কবির ভাষায় ব'লতে গেলে—"না জানি কী করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে, কী ছিল বিধাতার মনে!" এর মধ্যে যে বিদ্যুতের বীজ রোপিত হ'ল, তা কক্ষচ্যুত উল্কার মত টেনে নিলে দুজনকে জীবনের চরমপ্রান্তে। কিন্তু তাদের জন্য বাঁচিয়ে রইলো কি বিপিনদেরই যৌবনের উত্তাপ?

দাম—৩·৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সতীশঙ্কর উপাখ্যান

সতীশঙ্কর রায়ের সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে। কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্যে অনেক কিছু করেছেন, বাড়ির চাকরকে অফিসের বেয়ারা ক'রে দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন ডাকাত, পরের ধন লুটেপুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। লোকে তাঁকে ভয় ক'রতো যেন সাপ বা বাঘের চেয়েও বেশি। আবার কেউ বলে মেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রেছেন—ব'লতে গেলে একেবারে পোকা ছিলেন।

উৎপলের কাছে সতীশঙ্কর এক বিষম সমস্যা। কার কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে? যে লোক প্রথম জীবনে দেশের জন্যে জেল খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন যশ ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, তিনি আবার সহসা আততায়ীর হস্তে নিহতই বা হ'লেন কেন? এই "কেন" সম্বন্ধে তাঁর সুন্দরী তরুণী বিধবা স্ত্রী-ই বা বলেন কি? দাম—পাঁচ টাকা

শক্তিপদ রাজগুরুর

জীবন-কাহিনী

মানুষের জীবনে সমস্যাও যেমন—কৌতুকও তত কম নয়। এই সমস্যা ও কৌতুকের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা দুটি ভাগ্য-বিড়ম্বিত যুবক-যুবতীর মধুর প্রেমের কাহিনী।

ছায়াচিত্রে রূপায়িত।

দাম—৪·৫০

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

মজার মজার খেলা

বিজ্ঞানের নানা রকম কল-কৌশলের সাহায্যে মজাদার খেলা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করার মত বই। দেখা ও খেলার কাজ একই সঙ্গে চ'লবে।

কিশোরদিকে উপহার দেওয়ার পরম উপযোগী।

নূতন ধরনের লাইন। অসংখ্য ছবিতে ভরপুর।

দাম—৩

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

আপনার সুন্দর কালো
কেশের জন্য...

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যাম্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

ক্যাম্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে চুল বাড়ায়—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। এই কেশ তৈলে ক্যাম্থারাইডিসের এক্সট্রাক্ট থাকায় চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

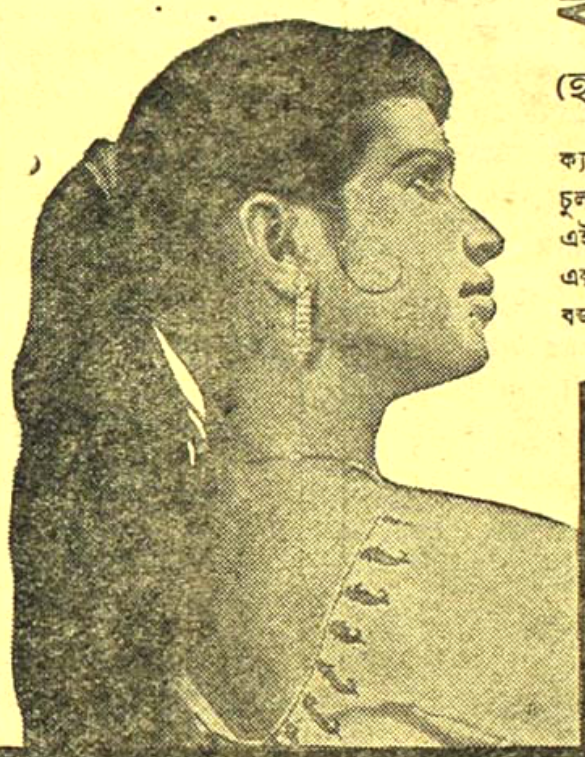

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

চালু চালু উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পিপাসা ৪·৫০
তৃতীয় নয়ন ৪·৫০

সতীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এক জীবন অনেক জন্ম ৬·৫০
নীলকণ্ঠী ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অধমতারিণী ৩৲

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

কিংবদন্তি ২·৫০

অনুরূপা দেবী

গরীবের মেয়ে ৪·৫০ বিবর্তন ৪৲
রামগড় ৪·৫০ বাগ্‌দত্তা ৫৲
পোষ্যপুত্র ৪·৫০ পথের সাথী ৩৲
হারানো খাতা ৩৲

নিরুপমা দেবী

দিদি ৫৲

পুষ্পলতা দেবী

মৌলিকার অঙ্ক ৩·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ ৩·৫০

শক্তিপদ রাজগুরু

জীবন-কাহিনী ৪·৫০
কুমারী মন ৩·৫০
গৌড়জনবধূ ৫·৫০
মণিবেগম ৬·২৫
কেউ কেরে নাই ১·৫০
কাজল পাঁকের কাহিনী ৫৲

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মনের আলোচনে ২৲

তারক

কল্‌ অফ খিু ২·৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

পরাজয় ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

কলঙ্কিনীর খাল ২·৫০

মনীষাব্রত চৌধুরী

দেবানন্দ ৪৲

শঙ্কর রায়

সীমারেখার বাইরে ১০৲
নোনা জল মিঠে মাটি ৮·৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পতনে উত্থানে ৫৲
সুধা হালদার ও সপ্তর্ষি-দাস ৩·৭৫

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অচল প্রেম ৪৲

পঞ্চানন ঘোষাল

একটি অদ্ভুত মামলা ৫৲
একটি নির্মম হত্যা ২·৫০
অবগুণ্ঠন পৃথিবী ৫৲
একটি সাক্ষী-হত্যা ৩৲
অন্ধকারের দেশে ৫৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২·৫০
স্মৃতির আসনে ২·৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মনিভার আদ্য ৪৲
সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণ-সিন্ধ্যা ৩৲
ফুলের মাশুল ১·৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিবস্ত্র মানব ৫·৫০
কার্টুন ২·৫০
দেহ ও দেহাতীত ৪৲
পত্রস্থ ১ম—২·৫০, ২য়—২·৫০
শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভূলের কসল ২৲
খেয়ালের খেসারৎ ২৲
বংশধর ২৲

ভোলা সেন

উপন্যাসের উপকরণ ২·৫০

অমরেন্দ্র ঘোষ

শব্দদীক্ষির বেদেনী ৩৲
কলিঙ্গসেনা বিজয় ২য় ৪৲

নরেশ বসু

ছিন্নবাধা ৭·৫০

মায়া বসু

অগ্নিবলয় ২·৭৫

বাণিক

মেঘের পরে আলো ৪·০০

নিতাইনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিয়ান শো ৪·৭৫

রাজপাল মুখোপাধ্যায়

কাল-কল্লোল ৪·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের মন্দিরা ৩·৫০ কালকূট ৩৲ কানু কহে রাই ২·৫০ কাঁচামিঠে ৩৲ আদিম রিপু ৩৲ গৌড়-মল্লার ৪·৫০ বিজয়লক্ষ্মী ২·৫০ বহ্নি-পতঙ্গ ৩·৫০ পঞ্চভূত ২·৫০ বিষের বন্ধী ৪·৫০ শাদা পৃথিবী ৩৲ ছায়াপথিক ৩৲ দুর্গরহস্য ৩·৫০ চুয়াচন্দন ৩·২৫

প্রবোধকুমার সান্যাল

নবীন যুবক ২·৫০ কলরব ২৲
প্রিয় বান্ধবী ৪৲
কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲

অশোককুমার মিত্র

দু'ঘণ্টা ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পদ্মরাগ ৩৲

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

অরক্ষণ পাঞ্জাবী ২৲

শৈলানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঝড়ো হাওয়া ২·৫০

বনফুল

শিতামহ ৬৲
নবএব্‌ভৎপুরুষ ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

মিলন-মন্দির ৩৲

প্রভাত দেবসরকার

অনেক দিন ৩·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

পণ্যের

প্রচারে

'প্রবাসী'র

প্রচারণী

প্রকৃষ্ট ॥

বিজ্ঞাপনের বিস্তারিত হার—প্রবাসীর ম্যানেজারকে পত্র লিখলে—সানন্দে জানানো হইবে।—প্রতি পৃষ্ঠা ১০০৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬০৲। চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের হার এবং বিশেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের বিষয় জানিতে হইলে পত্র লিখুন—কিংবা সাক্ষাৎ করুন।

ম্যানেজার

প্রবাসী প্রেস প্রাঃ লিঃ

৭৭-১-১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১৩

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে

বিজয় বৈজয়ন্তীবাহী

মোহিনী মিল্‌স লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯০৮)

১নং মিল

কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা)

২নং মিল

বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

২২ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

অনামী (২য় সং:—মহাভারত, কালিদাস, গীতা, ভক্তকৃতি, নানা ইংরাজ কবি, হিন্দি কবি প্রভৃতির কবিতার অনুবাদ, দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ গান ও কবিতা, ইন্দিরা দেবীর কবিতাগুলির অনুবাদ—সেরে ই অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির পত্রাবলী) মূল্য ৪।০

অভাজনীয় (অঘটনী উপন্যাস) ১০৲

গ্রাম্যমাল (২য় সং) ৭।০

অঘটনের ঘটা (উপন্যাস) ৬৲

দোলা (উপন্যাস—২য় সং) ৮৲

ভিখারিণী রাজকন্যা ২৷৷০

ভাগবতী কথা (কবিতা)—৪৲ **ভাগবতী গীতি**—৪৲

শ্রীচৈতন্য (কাব্যনাট্য)—৩৷০ **মহাভারতী কথা**—৩৷০

তীর্থংকর (৩য় সং)—৮৲ **দোটানা**—৩৲

ভাবি এক হয় আর (নেতাজী-কেন্দ্রিক উপন্যাস)—৮৷৷০

ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী (ধর্ম্ম ও যোগ সম্বন্ধে)—৫৲

ছাড়ার আলো (উপন্যাস)—৭৲

স্মৃতিচারণ ১ম খণ্ড—(দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশ ঘোষ, লোকেন্দ্র পালিত, সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুলপ্রসাদ সেন চরিত্রচিত্র—২য় সং: সচিত্র—৬০০ পৃষ্ঠা) ১২৲

স্মৃতিচারণ ২য় খণ্ড—(রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যতীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ, গোপীনাথ কবিরাজ, হুমায়ুন কবির, কালিদাস প্রভৃতি—সচিত্র—৫০০ পৃষ্ঠা)— ৮৷০

অঘটন আজো ঘটে (উপন্যাস—৭ম সং)—৫৲

হরিপুর মন্দির, পুরী—৪ ও কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

কুষ্ঠ ও ধবল

৬০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম্মরোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি, ব্রি, নং ৭ হাওড়া।

শাখা :—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

বহুল প্রশংসিত ও পরীক্ষিত

বক্ষ পীড়ার সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োজ্য মহাপুরুষ প্রদত্ত মহৌষধ

অমিশ্ব রেণু

মূল্য দুই সপ্তাহের জন্য ৭৲ টাকা ষ্ট্যাম্পসহ পত্রে অন্যান্য বিষয় জ্ঞাতব্য। মূল্য অগ্রিম প্রেরিতব্য।

এখানে সর্ব্ববিধ জ্যোতিষের ক্রিয়া ও ফলও মঙ্গলকিরণ্ড কবচাদি ও দুরারোগ্য ব্যাধির ধারণীয় ও সেবনীয় ঔষধ ফলতে দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ডাঃ শ্রীবিজয়কুমারত্ন ভট্টোপাধ্যায়

জ্যোতির্বিনোদ আয়ুর্বেদাচার্য—অঃশক্তি আয়ুর্বেদালয়

ডাকঘর, ধনবাদ গোঃ (বিহার)

—প্রকাশিত হইয়াছে—

অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার, এম. এ, ডি-ফিল্,

সম্পাদিত

গিরিশচন্দ্রের

প্রফুল্ল ৪, জনা ৪,

ও

দ্বিজেন্দ্রলালের

চন্দ্রগুপ্ত ৪৲

সারগর্ভ ভূমিকা, চরিত্র-আলোচনা ও টীকাসহ। ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে মূল্যবান ও অপরিহার্য সংযোজন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

লিলি বিস্কুট

সকলেই পছন্দ করেন

কয়েকটি নামকরা বিস্কুট

থিন এরারুট
বোস্টন ক্রীম
বার্লি বিস্কুট
মল্টো

লিলি
বিস্কুটের মত বিস্কুট!

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন

দেশের গান ০·৫০ জাতি গঠনে খাদ্য ০·৫০

ডাঃ হরগোপাল বিশ্বাস

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (বাংলা বিভাগ)

(ক) জানুয়ারি—মার্চ, ১৯৬৪ (খ) এপ্রিল—জুন, ১৯৬৪ (গ) জুলাই—সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

প্রতি খণ্ড ২·০০

॥ আইন সংক্রান্ত পুস্তিকা ॥

* পশ্চিমবঙ্গ ভূমি (সংগ্রহ ও গ্রহণ) (আদেশ বৈধকরণ) আইন, ১৯৬৫
* পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৬৫
* ভূমি-গ্রহণ (পশ্চিমবঙ্গীয় সংশোধন) আইন, ১৯৬৪
* পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৬৩
* হাওড়া সেতু (সংশোধন) আইন, ১৯৬৫
* পশ্চিমবঙ্গ বেতন ও ভাতা (সংশোধন) আইন, ১৯৬৫
* সারা পশ্চিমবঙ্গীয় (সংশোধন) আইন, ১৯৬৪
* কলিকাতা পৌরসঙ্ঘ (সংশোধন) আইন, ১৯৬৫ * পশ্চিমবঙ্গ দোকান ও সংস্থা (সংশোধন) আইন, ১৯৬৫

* পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ভাষা (সংশোধন) আইন, ১৯৬৪ *

প্রতি খণ্ড : ০·২৫

এবং

পশ্চিমবঙ্গ জিলা-পরিষদ আইন (১৯৬৩)	০·৬০	পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন (১৯৫৭) ...	০·৪০
পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ (সংশোধন) আইন (১৯৬০)	০·৭০	পশ্চিমবঙ্গ অ-বাসারিক নিগম আইন (১৯৬৭)	০·১৯
পশ্চিমবঙ্গ ওজন ও মাপের মান নির্ধারণ (বলবত্‌করণ) (সংশোধন) আইন (১৯৬৫)	০·২০	পশ্চিমবঙ্গ উপযোজন আইন (১৯৬৫)	০·৫০

* প্রাপ্তিস্থান *

নগদ মূল্যে বিক্রয় কেন্দ্র
প্রকাশন বিক্রয় কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট,
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড,
কলিকাতা—১

ডাকযোগে অর্ডার পাঠাবার ঠিকানা
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ,
প্রকাশন-শাখা,
৩৮, গোপালনগর রোড,
কলিকাতা—২৭

ডব্লু. বি. (আই অ্যাণ্ড পি. আর) প্রতিবি. ডি ১১৩।৬৬

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগে সত্বর আরাম দেয়।

ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগেনা।

সব সময় এ্যাক্রিমেণ্ট হাতের কাছে রাখুন।

এ্যাক্রিমেণ্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

"অপরাধ-বিজ্ঞান" খ্যাত

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষালের

—নূতন গ্রন্থ সিরিজ—

বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত-কাহিনী

লেখক তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের বিচিত্র ধরনের বড় বড় মামলাগুলির তদন্ত ও বিচারের অভিজ্ঞতা তাঁর সাম্প্রতিক-কালের এই গ্রন্থগুলিতে একে একে প্রকাশ ক'রছেন। তাঁর বলার ভঙ্গীটিও নতুন। পড়তে পড়তে মনে হবে যে, আপনি নিজেই যেন তদন্ত করতে করতে রহস্যের গভীরে প্রবেশ করে শেষ পর্যন্ত তার সমাধানের পথে এগিয়ে চলেছেন। সত্য ঘটনা যখন কল্পনাকেও হার মানায়, তখন অলীক রহস্য-কাহিনীর আর প্রয়োজন কি?

১ম পর্ব: পাগলা-হত্যা মামলার বিবরণ। (২য় সং) দাম—৩৲

২য় পর্ব: বহুবাজার শিশুহত্যা-মামলা ও খিদিরপুর মাতৃহত্যা-মামলার বিবরণ। (২য় সং) দাম—৩৲

৩য় পর্ব: অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান "রেড হাউ কেলিসিয়ন গ্যাঙ্গ" মামলার বিবরণ। দাম—৩·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

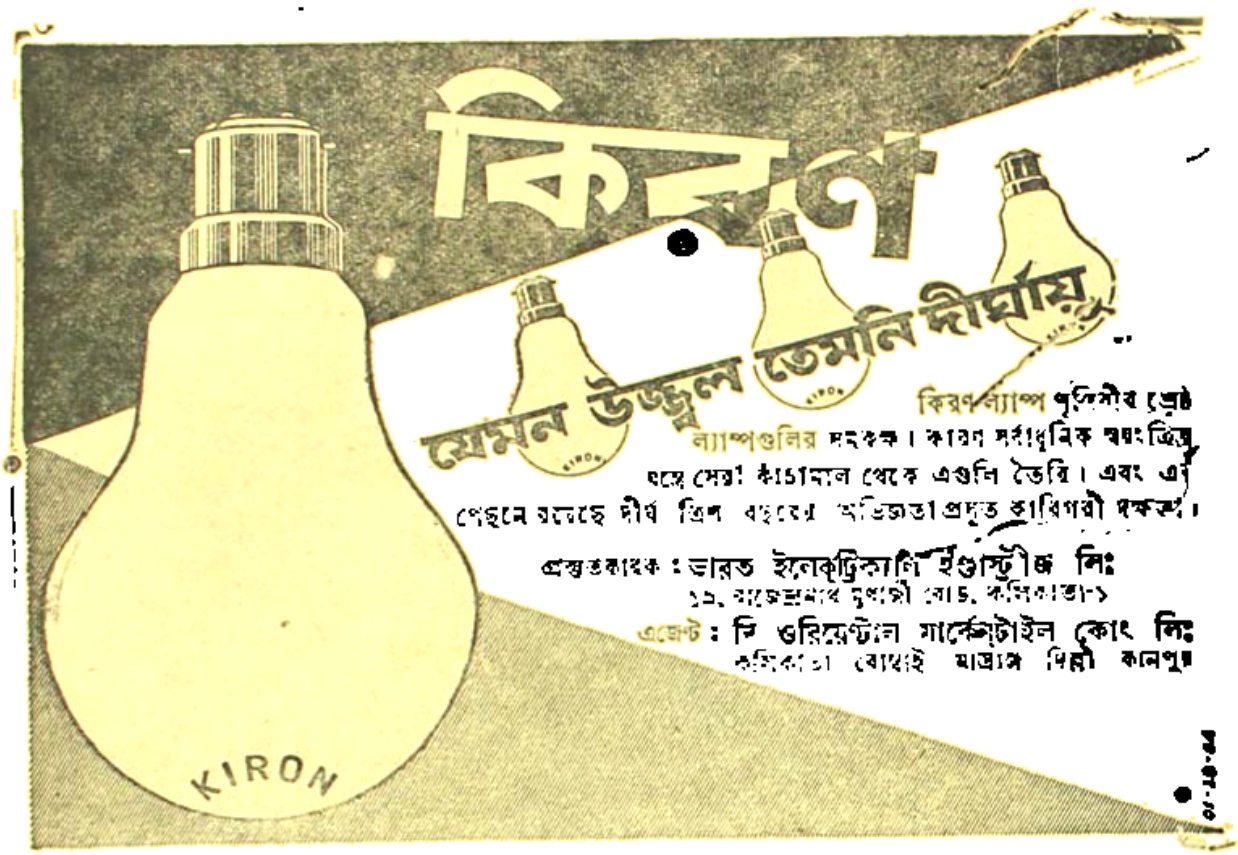

যশস্বিনী মহিলা-কথাশিল্পী

অনুরূপা দেবীর

— অমর সাহিত্য-সাধনা —

গরীবের মেয়ে (ছায়াচিত্রে রূপায়িত) **৪-৫০**

পোষ্যপুত্র ৪-৫০ **বিবর্তন ৪৲**

পথের সাথী ৩৲ **বাগ্‌দত্তা ৫৲**

রামগড় ৪-৫০ **হারানো খাতা ৩৲**

যে মহিয়সী মহিলার অবদানে বাঙলা সাহিত্যের বিগত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস সমৃদ্ধ হইয়া আছে—উপরের বইগুলি তাঁহার অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি। সৃষ্টি শক্তির বিশালতা—লিপিচাতুর্য ও চিত্ত বিশ্লেষণে মহিলা-ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

ভারতবর্ষের ইতিহাস

ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যা

মাঘ—১৩৭২

লেখ-সূচী

১। চিন্তামণিকা প্রকৃতি (প্রবন্ধ)
শ্রীরাধাবল্লভ দে ১১৩
২। মেঘনাদবধ কাব্যকথা (কবিতা)
শ্রীরবীন্দ্র গুপ্ত ১১৪
৩। অঘটনের পূর্বরাগ (উপন্যাস)
শ্রীদিলীপকুমার রায় ১১৫
৪। নারীর প্রার্থনা (কবিতা)
শ্রীবংশী মণ্ডল ... ১১৯
৫। চাইতে আমি জানিনা যে (কবিতা)
শ্রীরবী গুপ্ত ... ১১৯

চিত্র-সূচী

১। বেলুর দুর্গ, ২। জলকান্তিশ্বরের ছায়াপাল বেলুর, ৩। নৃত্যের ছন্দ (কল্যাণ মণ্ডপম্)—বেলুর, ৪। কল্যাণ মণ্ডপম্-এর অঙ্গ-শয্যা, (কুলকান্তীশ্বরের দেবালয়)—বেলুর, ৫। ব্রাহ্মণ, ৬। নৈমিষারণ্যে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, ৭। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ কর্তৃক—শ্রীশাস্ত্রীকে শপথ গ্রহণ করানোর দৃশ্য, ৮। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন রাশিয়ায় ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন জনগণের দ্বারা তাঁর অভিনন্দিত হইবার একটি দৃশ্য, ৯। বিশ্বের সর্ব্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের প্রথম মহিলা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ১০। বিমান দুর্ঘটনায় নিহত বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ ভাবা, ১১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজদূত শ্রীচেষ্টার বাউলস্

লেখ সূচী

৬। কালিদাস ও প্রকৃতি (প্রবন্ধ)
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, কাব্যতীর্থ ১২০
৭। অকলঙ্ক চাঁদ (গল্প)
শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী ... ১২৩
৮। উঠিয়াছে পূর্ণচন্দ্র গগন-প্রাঙ্গণে (অনুবাদ কবিতা)
ভূধানন্দ, শ্রীঅরবিন্দাশ্রম ... ১৩৬
৯। দক্ষিণপ্রান্ত (ভ্রমণ)
শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৭
১০। নদীমাতৃক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী ১৪১
১১। বাঙ্ময়ী (কবিতা)
শ্রীসুধাংশুরঞ্জন মল্লিক ১৪৩
১২। অবিশ্বাসী বই (গল্প)
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৪

চিত্র-সূচী

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অভিনন্দনসহ যুক্তরাষ্ট্র সফরে আমন্ত্রণ লিপি প্রদান করিতেছেন, ১৮৭ তাসখণ্ড থেকে আগত পরলোক গত প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর শবাধার বহন করিয়া চলিয়াছেন স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধানরা, ১৩। পরলোক গত প্রধান মন্ত্রীর মরদেহের পার্শ্বে ক্রন্দনরতা শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, ১৯৯ মুক্তি প্রতীক্ষিত আর, ডি, বনসলের কাঁচকাটা হীরে চিত্রে লিলি চক্রবর্ত্তী, ১৫। প্রখ্যাত চিত্র তারকা অনিল চ্যাটার্জী।

রাইকলার-চিত্র

দেবী সরস্বতী

বিশেষ চিত্র

১। শাস্ত্রী—কোপিগিন ২। জন্মদিনে শ্রীশাস্ত্রী

— শ্রীসুষমা মিত্র প্রণীত —

নিশীথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে

দাম—২৸০

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত

নিত্যকর্ম-কৌমুদী

যাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে—তাহাই নিত্যকর্ম।

ইহাতে দ্বিজোচিত সমস্ত আহ্নিক, সন্ধ্যা, আহ্নিক, সকল প্রধান দেব-দেবী পূজা, ধ্যান, প্রণাম, পুরশ্চরণ, পার্থিব শিবপূজা, তীর্থ-স্নান, সূতক ও বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সরল বাংলা ভাষায় যে ভাবে যেমন ভাবে করিতে হয়—তাহা লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি নিকটে থাকিলে কাহাকেও সন্ধ্যাহ্নিক বিষয়ের জন্য অন্যের সাহায্য লইতে হইবে না। অধিকন্তু উপযুক্ত পুরোহিত অভাবেও যজমান নিজেই ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইবেন। দাম—৩

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

—পুনরায় প্রকাশিত হইল—

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কবিভূষণ প্রণীত

আয়ুর্ব্বেদ-সোপান

শরীরং ব্যাধিমন্দিরং—অর্থাৎ আমাদের শরীর বিবিধ ব্যাধির আবাস-গৃহ। সেজন্য সাধারণ অট্টালিকার ন্যায় মধ্যে মধ্যে জীর্ণ ও অনুপযুক্ত শরীরেরও মেরামতী বা চিকিৎসা দরকার। সুতরাং তার বিশ্লিগিরি বা চিকিৎসা-পদ্ধতি সকলেরই কিছু-না-কিছু জানা থাকা প্রয়োজন।

এদেশের জল-হাওয়ায় মানুষ হওয়া ভারতীয়দের জন্য এই দেশের নিজস্ব গাছগাছড়া, মূলি-ঋষিরা যে উপায় ও চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, আমাদের পক্ষে তা-ই যে সর্বোত্তম বিধান, এতে আর সন্দেহ কি? প্রবীণতম কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের যাবতীয় গুরুত্ব তত্ত্বগুলি সরল বাঙলায় সুসংবদ্ধভাবে সাধারণের উপযোগী ক'রে প্রকাশ ক'রেছেন।

প্রতি গৃহেরই গৃহ রাখার উপযোগী অত্যাবশ্যক গ্রন্থ।

দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

লেখ-সূচী

১৩। মৃত্যু (কবিতা) স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য ১৬৮
১৪। অতীতের স্মৃতি (বিবরণ)
পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায় ১৬৯
১৫। মনোমাটির গন্ধ (উপন্যাস)
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৭৭
১৬। লালবাহাদুর শাস্ত্রী (জীবনী)
শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ১৮০
১৭। শান্তিদূত লালবাহাদুর (কবিতা)
শ্রীঅনিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৮২
১৮। শাস্ত্রীজী স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য (কবিতা)
শ্রীগোপালদাস কাব্যভারতী ... ১৮২

লেখ-সূচী

১৯। মেয়েদের কথা—
(ক) বিবাহ বিচ্ছেদ ও নারী সমাজ
শ্রীমতী মীরা রায়
(খ) প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল
ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(গ) রূপচর্চা—সুপর্ণা দেবী
(ঘ) পুঁতির কাজ-শিল্প—রুচিরা দেবী
(ঙ) পশমের পুলোভার—গিরিময়ী দেবী
(চ) রান্নাঘর—সুধীরা হালদার
২০। অচিন বনের পাখি (উপন্যাস)
প্রফুল্ল রায় ... ১৯৭

প্রতিভাবান সাহিত্যিক
শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

● পৃথ্বীরাজ
দ্বিত্রাক্ষর ছন্দ, ঐতিহাসিক নাটক। ২-৭৫ পঃ

● রক্ত তিলক
গত মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় সামাজিক নাটক। ২৲ টাকা

● সম্ভবামি যুগে যুগে
অবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাসী বিবেকানন্দে রূপান্তরের অপরূপ কাহিনী, নাটকাকারে। ২-৫০ পঃ

● রাশিয়ান শো (গল্প সঙ্কলন) ৪.৭৫ পঃ

● কাশ্মীর (ভ্রমণ কাহিনী, ৬৩ খানি ছবিসহ) ৪.৫০ পঃ

● Spiritual Socialism
মার্ক্সের ধর্মহীন সমাজবাদের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-সভ্যতার আধ্যাত্মিক সমাজবাদের বাস্তবিতাপূর্ণ আলোচনা ও পথ নির্দ্দেশ। ৪·০০

ইন্দু নিবাসিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর প্রণীত
নাট্য-গুচ্ছ
ন্যাড়াকাণা (কৌতুক-নাট্য)—বীররাজা (ঐতিহাসিক নাটক) এবং মুখের মত (প্রহসন) একত্রে ৪·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
এক জীবন
অনেক জন্ম
একই জীবনে জন্ম-জন্মান্তরের বিচিত্র অনুভূতির স্বাদ আনে যে ব্যাপক প্রেম, মৃত্যুর অন্ধকারকে যা' জীবনের দীপ্তিতে রূপান্তরিত করে, তারই স্পর্শময় বিন্যাস। পথের আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রেমাংশুর অকাল প্রয়াণ দীপার জীবন ম্লান, রুক্ষ ও কঠিন ক'রে তুলেছিল—অনেক পরে মৃন্ময়ের আবির্ভাব—মৃত্যুর অন্ধকার ছিন্ন-ভিন্ন করে যে অসামান্য আলোয় দীপার জীবন পূর্ণ ও সার্থক ক'রে তুলল, সেই অসামান্য আলোর চিরন্তন প্রেমের অপরূপ কাহিনী।
দাম—৬·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

লেখ-সূচী

২১। যখন যেমন (কার্টুন)
পৃথ্বী দেবশর্ম্মা ২০০

২২। কিশোর জগৎ ২০১

(ক) ভারতরত্ন—শ্রীজ্ঞান
(খ) সাইলাস্ মার্নার্—সৌম্য গুপ্ত
(গ) ছুটীর ঘণ্টায়—চিত্রগুপ্ত
(ঘ) ধাঁধা আর হেঁয়ালি—মনোহর মৈত্র

২৩। নৈমিষারণ্য (প্রবন্ধ)
স্বামী ভক্তিসুহৃদ শ্রমণ ২০৯

২৪। সাময়িকী ২১১

২৫। ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ (কবিতা)
পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভাস্করী ... ২১৪

২৬। শট ও পীস—শ্রী'শ' ২১৮

২৭। খেলা-ধূলা—
সম্পাদনা—শ্রীপ্রবীণ চট্টোপাধ্যায় ২২২

২৮। খেলার কথা—ক্ষেত্রনাথ রায় ... ২২২

সমরেশ বসুর নূতন উপন্যাস

ছিন্নবাধা

সর্ব বাধা-বন্ধহীন একটি সৃষ্টিশীল আত্মসন্ধানী
সাধারণ মানুষের পথ-চলার কাহিনী।

পঙ্কে তার উদ্ভব—পঙ্কিল পরিবেশেই তার পুষ্টি। কিন্তু তার অন্তরের সৃষ্টির প্রেরণা তাকে সকল প্রলোভন—সকল প্ররোচনা এবং সকল অভিজ্ঞতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে তার শাশ্বত মানবাত্মার অভিব্যক্তিকে সহজ করে দিয়েছে।

একটি বলিষ্ঠ মানুষের সংঘাতময় বাস্তব জীবন-কথা।
সুন্দর প্রচ্ছদ-শোভিত সুবৃহৎ উপন্যাস। দাম—৭·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

● মেয়াদী আমানতে (মেয়াদ অনুযায়ী) সর্ব্বোচ্চ বার্ষিক সুদ ৭½%

● সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে বার্ষিক সুদ ৪%

● রেকারিং ডিপোজিটে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করুন, আনন্দের সঙ্গে গড়ে উঠবে সঞ্চয়ের অভ্যাস।

সেবায় প্রতিশ্রুত

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা—১

দেবী সরস্বতী

চিত্র—প্রমোদচন্দ্র সিংহ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মাঘ—১৩৭২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি

শ্রীরাধাবল্লভ দে

আমাদের প্রত্যেকের ভিতর পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই তত্ত্ব রহিয়াছে। পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক হইলেও অনাদি-কাল হইতে উভয়েই নিত্য। সর্বব্যাপি চৈতন্য সত্তাই পুরুষ বা পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই দেহাবচ্ছিন্ন হইয়া অগণিত জীবে জীবাত্মারূপে বিরাজমান। আর প্রকৃতি বলিতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাকে বুঝায়। এই তিন গুণ প্রকৃতিতে যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন তাহাকে আমরা অব্যক্ত-প্রকৃতি নামে অভিহিত করি। অব্যক্তপ্রকৃতিতে কোন ক্রিয়া নাই। চৈতন্যরূপী জীবাত্মার প্রতিবিম্ব যখন মন, বুদ্ধি, অহংকারসমন্বিত চিত্তে বিম্বাভাসরূপে প্রতিফলিত হয়, তখনই প্রকৃতির তারতম্যের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি তার গুণত্রয়ের সাম্যের দ্বারা কর্ম করে। এই তিনগুণ অনবরত পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছে, মিশ্রিত হইতেছে, পরিবর্তিত হইতেছে। আমাদের বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যত কর্ম সম্পাদিত হইতেছে এ সবই প্রকৃতির গুণত্রয়ের ক্রিয়া। যখন আসক্তির মূল ও দেহ-বৃদ্ধির মূল প্রকৃতি স্বভাব রজোগুণ তমঃ ও সত্ত্বকে জয় করে অর্থাৎ রজোগুণ প্রাধান্য লাভ করে তখন মানুষ দুঃখ, কর্ম, যশ ও শ্রীলাভ করে। যখন বিবেক প্রংশকারক, আবরণাত্মক ও

আলস্যাত্মকতমোগুণ রজঃ ও সত্ত্বকে অভিভূত করে অর্থাৎ তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করে, তখন মানুষ শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা ও আলস্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে। যখন মন প্রসন্ন,ইন্দ্রিয় সকলের শান্তি, দেহের তমঃশূন্যতা হৃদয়ের সঙ্গহীনতা জন্মায়,তখন সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোকে জয় করিয়াছে অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমাদের প্রত্যেকের মনই গুণত্রয়ের বৃত্তি সকলকে সৃষ্টি করে আবার সেই সকল বৃত্তি হইতেই পরস্পর বিভিন্ন সাত্বিক রাজসিক তামসিক কর্মসমূহ প্রবর্তিত হইয়া থাকে, আবার কর্মসমূহ হইতেই অনুরূপ দেব—মনুষ্য—পশুযোনি প্রভৃতি গতি হইয়া থাকে।

মেঘনাদবধ কাব্য কথা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

বীরবাহু শোকে করি' কাব্য-প্রস্তাবনা
মেঘনাদ-প্রমীলার বিসর্জনে শেষে
সে-মহাজীবন-কাব্য ক্ষতি-ক্ষয়ে এসে
ধ্বস্ত-দৃপ্ত কাল-বহ্নি করিয়া রচনা
প্রজ্বলিত পাঠকেরে না দিয়ে সান্ত্বনা
রাবণ-প্রাক্তন-ভ্রান্ত সর্ব্বনাশে মেশে।

কেন বা এমনই হবে ? কেন যাবে ভেসে
রজোগুণাশ্রয়ী যত জীবন-সাধনা ?

ক্রমব্যাপ্ত-সত্ত্বশুদ্ধ-ভাবাদর্শহীন
রজোস্ফীত মহিমারও এই পরিণতি।
কালসিন্ধু-নৈকতের চিতানলাধীন
হবে সবই। রক্ষোরাজ এ মহানিয়তি
নির্বেদে পারে নি নিতে। হ'লে সত্যে লীন
ঘোষিত সে—"বিসর্জনই জীবন আরতি।"

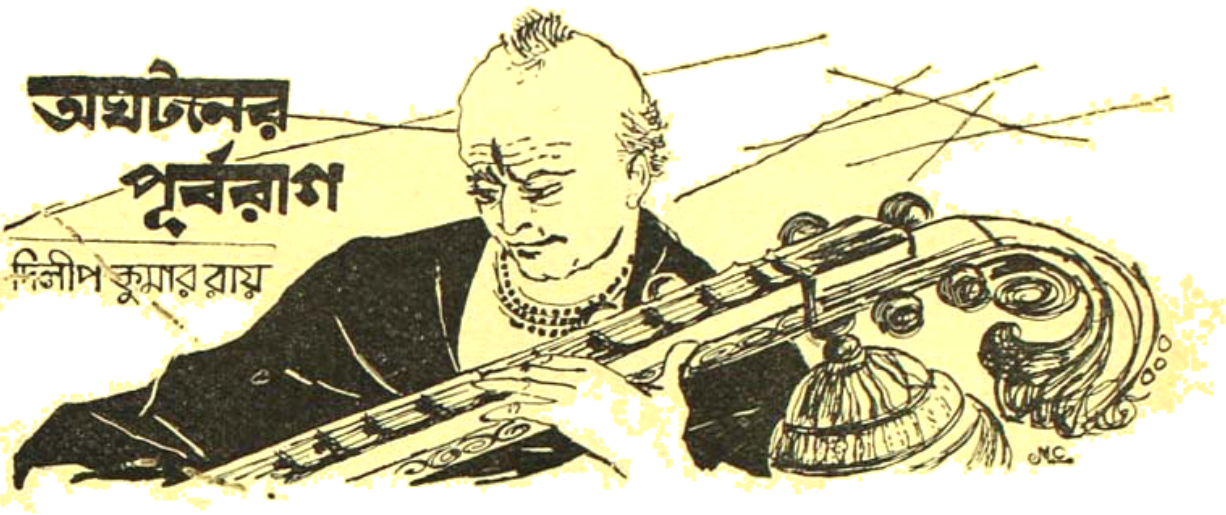

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সতেরো

সোফিয়া : "তারপর দাদা ? থামবেন না, লক্ষীটি ! "

অসিত চমকে) : ও, হ্যাঁ। মূর্ছনা আমাকে নিয়ে মোটরে উঠেই সোজা বেঁকে নিল আমার বাংলোর দিকে। আমি আশ্চর্য হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম : "তোমার বাবার কাছে যাবারই তো কথা না ? তিনি বাড়ি নেই বুঝি ?"

ও বলল : "না বাড়িতেই আছেন এখন। কিন্তু এখন তোমাকে নিয়ে ফিরলেই মা পথ আগলে দাঁড়াবেন। আর ঘণ্টাখানেক বাদে বাবা যাবেন ক্লাবে, তখন তোমাকে নিয়ে যাব সোজা সেখানেই।" বলতে বলতে মোটর পৌঁছল আমার বাংলোয়। আমাকে নামিয়ে দিয়ে ও হেসে বলল : "তুমি একটু জিরিয়ে নাও—আমি ঠিক সাড়ে দশটায় এসে তোমাকে তুলে ক্লাবে নিয়ে যাব।"

*

আঠারো

অসিত (বার্বারার দিকে তাকিয়ে) : এক এক সময়ে জীবনটা চলে যেন উল্কার ছন্দে। যেন অন্য সময়ের পিছিয়ে-পড়াটা সে পূরণ ক'রে নিতে চায় এই সব সময়ে হু হু করে এগিয়ে গিয়ে—ভাবে না একবারও অতিবেগের ফলে সে ছাই হ'য়ে যাবে কিনা।

ও আমাকে আমার বাংলোয় নামিয়ে দিয়ে যখন বাড়ী ফিরে গেল—তখন আমি বললাম এসে ফের মন-এই আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে। সেদিন মনটা আরো ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল—এই সব ওঠাপড়ার বৈতলোক পেরিয়ে যেতে। খানিকক্ষণ অবধি ভ্রামা টামা ভালো লাগে বটে, কিন্তু তার পরেই নট মন নেয় যেন বৈরাগ্যের পণ—বলে : ওঠাপড়ার পালা সাঙ্গ হোল—শান্তি চাই একলা হ'য়ে।

সে-সন্ধ্যাটা আমার মনে ধূসর আকাশে সোনালি মেঘের মতই স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন। মনে আছে চাঁদটা প্রায় রূপালি নৌকার মত থেকে থেকে মেঘের সমুদ্রে ডুব মারছিল, আবার হুশ্ করে উঠে উঁকি দিচ্ছিল স্মিতহাস্যে। যেন বলছিল ঘাড় নেড়ে : "কি গো মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম ! এখন মনটা কী চাইছে বলো তো ? খাঁচা, না আকাশ ? দু-দুটো খাঁচা ডাকছে সাগ্রহে : হেলায় হারিয়ো না এমন স্বর্ণ-সুযোগ।" মনটা কেমন ভরিয়ে ওঠে সুযোগের কথায়। সুযোগ ! না দুর্যোগ ? চাঁদের ওপরে ভারি রাগ হয়…রাহুটা করছে কী ? আসুক তো তেড়ে…আমরা তোমার নাগাল পাই না কি না তাই এ-রকম বাজে ইয়ার্কি। যাও যাও ঠাকুর ! তোমার মুরদ আমার জানা আছে গো জানা আছে। ছিলে তো মেঘের খাঁচায়। মুক্তি পেলে বেমালুমের মহলে। এখন আকাশে ভেসে ভেসে বেড়াও ফুল লতা পাতা কোকিলদের সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে শুধু নিরীহ মানুষকে ক্ষেপাতে।

অথচ এমনিই অন্ধ আমরা যে, তোমায় দেখে ভাবি যে তোমার মত ভালোমানুষ আর দুটি নেই—

চমকে উঠলাম : "কে ?"

"আমি।"

"শমিতা !"

"হ্যাঁ, শোনো—মূর্ছনা এইমাত্র বলল তোমাকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ক্লাবে নিয়ে যাবে। তাই আমি তোমাকে বলতে এলাম তুমি যেয়ো না ক্লাবে ও'র সঙ্গে—কারণ সেখানে বাবা কী অবস্থায় থাকবেন কে জানে ?" বলতে বলতে—কী কাণ্ড !—ওর উত্তর দেবার আগেই অদূরে গেটের কাছে সাধুজির আবির্ভাব !

শমিতা আরো ব্যস্তসমস্ত হয়ে বিদায় নিল, আমি ওকে গেট অবধি পৌঁছে দিলাম—ওর মোটর ও বাইরেই দাঁড় করিয়ে এসেছিল।

গেটের কাছে সাধুজিকে দেখে ও হেসে বলল, "সাধুজি, আজ যে গান শেখা হল না কাল তার শোধ তুলব কিন্তু।"

সাধুজি স্নিগ্ধকণ্ঠে হেসে বললেন : "আচ্ছা মা।"

মোটরে উঠবার সময়ে চাপা সুরে শমিতা বলল : "মা-ও তোমাকে বলতে বলেছেন তুমি রাণীদিদিদের ওখানে মিটমাট করতে চেয়ে নরম হোয়ো না মূর্ছনার কথায়। আর অবশ্য বোলো না একথা যে, আমরা বারণ করেছি, তাহলে কিন্তু ফের কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে।"

• • •

সাধুজি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হেসে বললেন : "ব্যাপার কী অমিত ? শুনলাম কী একটা গোল হয়েছে—তুমি না-কি রাণী সাহেবার ওখানে গিয়ে···তানপুরো উল্টিয়ে তবলা ফাঁসিয়ে লঙ্কাকাণ্ড ক'রে চলে এসেছ বীর হনুমানের মতন।'

"কে বললে আপনাকে ?" শুধালাম হেসে।

"মন্ত্রী সাহেব। এইমাত্র ক্লাবে যাবার সময় আমার ওখানে ঢুঁ মেরে সব ব'লে গেলেন।"

"ও—তাই বুঝি—"

"না—আমাকে তিনি তোমার কাছে পাঠান নি। আমি নিজে থেকেই এসেছি তোমাকে একটু ঘুম্‌কাতে। সাবধান !"

"খুব ভালো করেছেন, তবে ব'লে যাবেন—ও কী ?" সাধুজিও চমকে উঠলেন : বাইরে মূর্ছনার মোটরের শব্দ ! যতরকম নাটকীয় প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ কি ওং পেতে ছিল আজকের নাটালয়ের মঞ্চেই ?

• • •

সাধুজিকে দেখেই মূর্ছনার মুখ শুকিয়ে গেল। বলল : "সাধুজি—এসময়ে ?"

সাধুজি হেসে বললেন : "ভয় নেই মা, আমি তোমারই দিকে।"

মূর্ছনা আশ্বস্ত হ'য়ে বলল : "বাবা বলেছেন বুঝি আপনাকে ?"

"হ্যাঁ মা। কিন্তু অমিত এ কী কাণ্ড বাধিয়ে এলো বলো দেখি এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে ? তোমরা ঠেকাতে পারলে না কেউ ?"

আমি বললাম : "আমি সত্যি বড়ই অনুতপ্ত সাধুজি ! আমার ইচ্ছা ছিটমাট ক'রে ফেলা।"

"অনিচ্ছা কার ? শমিতার ?"

আমি বিপন্ন কণ্ঠে বললাম : "না না—"

"তবে শমিতা কী বলতে এসেছিল এই মাত্র ?"

মূর্ছনা আমার দিকে বিদ্যুৎকটাক্ষ ক'রে বলল : কে এসেছিল ? দিদি নিজে ;"

আমি আমতা আমতা করে বললাম : হ্যাঁ। কিন্তু—

মূর্ছনা বলল : "কেন আমার কাছে গোপন করছ অমিত ? আমি কি তোমার কাছে কোনো জবাবদিহি তলব করছি ? না—আমি বুঝতে পেরেছি। তাই বলা রইল যে, এখন থেকে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো—আমার কিছুই বলবার নেই। কেবল—"

"কেবল কী মা ?" বললেন সাধুজি।

"কেবল" ব'লে মূর্ছনা দাঁতে ঠোঁট চেপে বলল, "বাবাকে ক্লাবে আমি টেলিফোন ক'রে দিয়েছি—তুমি রাজী হয়েছ ব'লে।"

সাধুজি আমার দিকে চেয়ে হাসলেন : "বেচারি অমিত ! ভজন শিখতে এসে কুমোরের চাকায় পড়তে হয় জানতে না তো হে মাটির মানুষ ! কিন্তু মাটির মানুষ যারা তারাই তো ভগবানের কৃপায় মনের হাওয়া

বইতে না বইতে বাধা সরিয়ে দেয় যেমন ঝড়ে সরায় কুটোটাকে।"

মূর্ছনা হেসে উঠে বলল: "মানে? সরে না বাধা?"

সাধুজি জিভ কেটে বললেন: "অমন কথা বলতে আছে মা? সরে বৈ কি—কেবল যে ভাবে আমরা ভাবি সেভাবে না।"

আমি হেসে বললাম: "তবে?"

সাধুজি বললেন: "ঘরটা যখন ধুলোয় ভরা থাকে মানুষ থাকে মস্ত না। কারণ শুধু তো গৃহই গৃহিণী নন—যে-ধুলোর সঙ্গে অনেকদিন ঘর করা যায় যে-ধুলি-দেবীও বরণ্যা হ'য়ে ওঠেন বৈকি। কিন্তু যখন তাকে ধুলো ব'লে চেনা যায় তখনই বাধে ফ্যাসাদ—কারণ যেই যাবে তাকে সাফ করতে—দেখবে দম আসছে বন্ধ হয়ে। সব সাধনাই গোড়ার দিকের হ'ল শুদ্ধির সাধনা অসিত। তাই না তোমার ভজন—সাধনায়ও উড়ল রাত্রির ধুলো।"

মূর্ছনা ফের হাসল: "আমরা কি শুধুই ধুলো, সাধুজি?"

"তা হ'লে তো বাঁচতাম মা," সাধুজিও হাসলেন, "কিন্তু তোমরা একাধারে ঝড় বিদ্যুৎ আর অন্ধকার। শুধু দম বন্ধ ক'রেই তোমাদের সাধ মেটে না—করো ক্ষত আর অন্ধ।—কিন্তু সে কথা থাক।" আমার দিকে ফিরে: "এখন কী করবে ঠিক করেছ?"

আমি মূর্ছনাকে বললাম: "কী বলো তুমি?"

ওর চোখে ফের আগুন জ্ব'লে উঠল, বলল: "আমার যা বলবার বলেছি। আর কেন?" ব'লেই হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে গেল। আমি কী করব ভেবে না পেয়ে সাধুজির দিকে তাকাতেই তিনি বললেন: "আমার দিকে অমন করে চেয়ে করছ কী? ছুটে ওকে ফিরিয়ে আনো।"

আমি ছুটে ওকে মোটরের পাদদেশে উদ্যতমুখে ধরতেই ও হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল: "আমারই অন্যায় হয়েছে অসিত—দিদিকে আমার বলা উচিত হয় নি। তবে আমি সত্যিই ভাবতে পারি নি—সে এ-ভাবে গোলমাল মেটানোর পথ আগলে দাঁড়াবে।"

আমি বললাম: "কিন্তু সাধুজি ডাকছেন, শুনে যাও।"

ও রেগে চেঁচিয়ে বলল: "আমাকে ছেড়ে দাও অসিত—এরকম ক'রে আর যন্ত্রণা দিও না। আমি কালই চ'লে যাব—আমার মামার বাড়ী। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে এখানকার এই সব চক্রান্তে।" ব'লেই মোটরের দোরে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

হঠাৎ পিছনের কাঁকরে পায়ের শব্দ। সাধুজি এসেই ওর মাথাটি বুকে টেনে নিলেন। বললেন: "রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি এমন ক'রে কাঁদে মা! ভেতরে এসো।—কোনো ভয় নেই—বলি নি—এ-ব্যাপারে আমি তোমারই দিকে?"

• • • •

আমার গানের ঘরে ওদের নিয়ে এসে বসালাম। মূর্ছনা মুখ নিচু ক'রে রইল।

সাধুজি বললেন: "মা, এম্নি ক'রেই ঘট পাকিয়ে ওঠে জীবনে। অনেকগুলো সুতো একসঙ্গে থাকলে এ হবেই।"

মূর্ছনা মুখ তুলল: "তা না হয় হ'ল, কিন্তু ঘট পাকালে আবার খোলাও যায় না কি?"

সাধুজি হাসলেন: "না গেলে কি মানুষ ঘট পাকাত মা?"

"তাহ'লে ব'লে দিন এ-ঘট খুলবে কী ক'রে?"

"আমি বললে শুনছে কে?"

আমি বললাম: "শুনতে আমি রাজী—যদি সত্যিই তাতে ঘট খোলে।"

সাধুজি হাসলেন, বললেন: "আগে শুনি আমার এই মা-টি কী বলেন?"

মূর্ছনা বেঁকে বসল: "না সাধুজি, আমি আর কোনো কথায় থাকব না। ও নিজে যা ভালো মনে করবে তাই করুক—দিন দুনিয়ায় কে কার বলুন?"

সাধুজি বললেন হেসে: "ঠিক বলেছ মা তোমার বুদ্ধি নেই বলে কে?"

মূর্ছনা হাসল, বলল: "বলে না কে তাই বলুন।"

"ধরতে নেই মা, ধরতে নেই—লোকে কী না বলে?"

আমি বললাম হেসে: "কিন্তু সাধুজি, লোকে আজ

বলছে তো ওর সম্বন্ধে নয়, বলছে আমারই সম্বন্ধে। তাই এযাত্রা আমার দিকেই একটু নেকনজর হোক না।"

সাধুজি বললেন: "তথাস্তু! বলো এবার।"

"বলবার ভার তো আপনারই।"

"কী বলব?"

"কী করব এক্ষেত্রে?"

সাধুজীর হাসিমুখ হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল—ঠিক যেমন দমকা হাওয়ার মেঘে আকাশের মুখ আঁধার কালো হ'য়ে। বললেন: "কইতে পারি—যদি সইতে রাজি থাকো।"

"আছি।"

"ঠিক?"

আমি ঘাড় নাড়লাম: "তিন সত্যি করছি—যা বলবেন আপনি আমি করব, করব, করব।"

"তবে ফের যাও, মন্ত্রীসাহেবকে বলো—তুমি রাণী-সাহেবাকে গান শোনাতে রাজী আছ। পারবে?"

"কেন পারবে না?" বলতেই মূর্ছনার সঙ্গে চোখা-চোখি: অন্দরের বুকের মধ্যে কী একটা রুখে উঠল। মনে হ'ল ওর মুখে বাঁকা হাসি!

"সাধুজি বললেন ফের হেসে: মা আমার খুশী তো?"

"না সাধুজি।"

"কেন?"

"অনিচ্ছায় যাওয়া কি ভালো?"

"অনিচ্ছা কেন মা? ভগবানের গান গাইতে যাচ্ছে ও—যে-ই শুনুক মঙ্গল তো তারি: 'বিস্রাবণং ত্রাদৃশ-কীর্তনং হি'—তাঁর নাম-কীর্তন হবে এতেই তো রসনা সার্থক। যে-ই শুনুক ওর ভজন তার ভালো বৈ মন্দ হবে না তো।" ব'লে আমার পিঠে দুম্ ক'রে এক কিল বসিয়ে দিয়ে: "বিশেষ যখন সাক্ষেরের আমার বিদ্যে গুরুমারা!"

"কী যে বলেন—" বললাম আমি লজ্জিত হ'য়ে—"কোথায় আপনি আর কোথায় আমি!"

সাধুজির মুখ এক অপরূপ হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল, বললেন: "শাস্ত্রে বলে অসিত, সর্বত্র জয়মিচ্ছেৎ, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্!" ব'লেই মূর্ছনাকে: "অর্থাৎ মা, সব জায়গায়ই জয় চাইবে কেবল শিষ্য আর পুত্রের কাছে পরাজয়।"

মূর্ছনা এবার মন খুলে হেসে বলল: "তা যেন হ'ল কিন্তু যেখানে শিষ্য রাণীসাহেবার কাছে পরাজয় মানতে নারাজ সেখানেও তো শাস্ত্রীরা কোনো বিধান দেন নি?"

"দিয়েছেন বৈ কি মা। বলেছেন 'তৃণাদপি সুনীচেন'—সাধককে হ'তে হবে তৃণের চেয়েও হীন। আমি তো জীবনে আত্মাভিমান থেকে মুক্তি পাওয়া ছাড়া আর কোনো সাধনা জানিনে মা। যেখানেই 'আমি আমি' উৎপাত সেখানেই অপঘাত—নিশ্চয় জেনো মা। অন্তত ভজন-সাধকের সাজে না এ-অভিমান।"

মূর্ছনাই ফের আপত্তি করল: "কিন্তু ধরুন যদি তাতে রাণীসাহেবার অভিমান প্রশ্রয় পায়?"

"মা এরি নাম—উড়ো তর্ক। এরই প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠে দুর্নিবার আগাছা—যার আওতায় আনন্দের সুখপদ্ম যায় শুকিয়ে। হৃদয়ে আমাদের অহর্নিশি জপছে: আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। কিন্তু মন বুদ্ধি আত্মার হাজারো যুক্তি দিয়ে জীইয়ে রাখবে জঞ্জালকে—আঁতাকুড়কে। না মা, শোনো—এ আমার বহু-দুঃখে-পাওয়া অভিজ্ঞতা, কথার কথা নয়। তাই আমি এত জোর ক'রে বলি যে, যেখানেই দেখবে "আমি" মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে সেখানেই জেনে তাকে দাবিয়ে, করবে তাই যাতে এ "আমি"র ঘোর আপত্তি। নিষ্ঠুর হ'তে হবে মা, নিষ্ঠুর হ'তে হবে এই সব বন্ধুবেশী মহাশত্রুর প্রতি। তাদের আমল দিলেই সব মাটি।" ব'লে আমার দিকে ফিরে: "রাণীসাহেবার অভিমান? তোমার অমূলক আত্মসম্মান? ভেবে দেখলে দেখতে পাবে বাবা, এ সব বুলি শুনতে মস্ত হ'লেও ভিতরে ভিতরে ফাঁপা—মিথ্যে ওজর। আসলে, তোমার ভিতর একটা গুপ্ত অহমিকা চক্ষিশঘণ্টাই ছোক ছোক ক'রে তার খোরাক খুঁজছে। শুধু গর্বেই যে এ-খোরাক মেলে তা নয়—মিথ্যাবিনয়েও এর অরুচি নেই। তাই তো সতর্কতার এত প্রয়োজন। তাছাড়া বলো দেখি মা, রাণী-সাহেবা চিকের আড়ালে ব'সে গান শুনছেন, কি শর-শয্যায় শুয়ে গান শুনছেন, কি পর্দার হেঁচমুড় হ'য়ে গান শুনছেন—এসব অবান্তর প্রশ্ন ওঠেই বা কেন? যদি বলতে—তিনি ভগবানের গান শুনতে চান না, তাহ'লে অবশ্য বুঝতাম। যদি শুনতাম—তিনি চাচ্ছেন ঞ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরি শুনতে, তাহ'লে বলতাম যেও না। কিন্তু তিনি

ভালোবাসেন সত্যিই ভজন, ভগবানের নাম শুনতে চান : তাঁকে শোনাবে না কেন শুনি ? আর সত্যি তো রাণী-সাহেবাকে শোনাচ্ছি না—অন্তত খাঁটি ভজনগায়ক ভজন গায় ভগবানকে তার মনপ্রাণ নিবেদন করতে—যে শোনে ভক্তি ক'রে, আদর করে, সেই তার আত্মীয়।"

"কিন্তু যদি সে ভক্তি ক'রে না শোনে ?" শুধালো মূর্ছনা।

"তাতেই বা কী যায় আসে মা ? অমিত ভজন গাইছে কার সামনে এতো বাহ্য—কাকে শোনাচ্ছে এইটেই হ'ল আসল প্রশ্ন। শোনাচ্ছে সে ভগবানকে—কে ভক্তি ক'রে শুনল কে অভক্তি ক'রে শুনল এ-খেয়ালই বা তার থাকবে কেন বুঝিয়ে দেবে আমাকে ? সেই গল্প শোনো নি কি মা ? এক শেঠ পথ দিয়ে পাগল হ'য়ে ছুটেছে তার রক্ষিতা তাকে ছেড়ে অন্য এক শেঠকে ভজেছে ব'লে। জগৎ তার কাছে শূন্য হ'য়ে গেছে। একদিন চলেছে সে এক অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ এক ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর গায়ে তার পা ঠেকতেই সন্ন্যাসী হাঁকলেন : 'রে পাপিষ্ঠ ! যে ভগবানের চিন্তা করছে তার গায়ে পা ?" শেঠ করযোড়ে বলল : 'প্রভু' অপরাধ হয়েছে, কেবল একটি কথা : বেশ্যার চিন্তায় আমার বিশ্ব ভুল হ'য়ে গেছে, কিন্তু সারাংসার ভগবানের চিন্তায়ও আপনার দেখি খেয়াল আছে—আপনার গায়ে কার পা ঠেকল না ঠেকল !" ভজন যে গাইবে তার বেলাতেও অবিকল ঐ কথা। ভজনের লক্ষ্য তো শ্রোতার জয়ধ্বনি খোঁজা নয় মা ! তার একটিমাত্র লক্ষ্য—আত্ম-নিবেদন ভগবানের চরণে।" [ক্রমশঃ

নারীর প্রার্থনা

শ্রীবংশী মণ্ডল

আমাকে আকাশ দাও হে সবিতা অনন্ত নীল
আগ্নেয় শরীরে স্বপ্ন জমুক না সূর্য্যের মতন
আমাকে বাঁচতে দাও দাবদগ্ধ ছড়াক নিখিল
জ্বালাও ঘরের আলো বাঁচুক না আকাশের মন।

এ দেহ আকাশে আজ হে নারী তোমার প্রার্থনা
নিবিড় কামনা হতে ঢেলে দাও সৃষ্টির আসব
বরফ আর এক সূর্য্য প্রজ্বলন্ত পরমাণু কণা
দূর করে দাও তবে হৃদয়ের তীব্র পরাভব।

হে নারী বাঁচতে দাও আর একবার তোমার জঠরে
নিখিল মুক্তির ছন্দে বরং সে আশ্চর্য্য আলোক
ছড়াও গোপন রসে অন্তলীন ক্ষুধার নির্ঝরে
একক বিলীন কর ; ম্রিয়মাণ যত মৃত্যুশোক।

আমাকে আর একটু দাও হে নারী তমসার পারে
তোমার নির্লিপ্ত বহ্নি—জমুক সে দেহের জোয়ারে।

চাইতে আমি জানি না যে

শ্রীরবি গুপ্ত

প্রার্থনা কি চাইব বলো, চাইতে আমি জানি না যে,
সকল প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এক যেন দু'টি চরণ যাচে।
মা তোর পরশ-কুসুমগুলি
হৃদয় সাজি ভরবে তুলি,
দাও সে বীণা, দিন-রজনী বাজবে আমার সকল কাজে,
প্রার্থনা কি চাইব বলো, চাইতে আমি জানি না যে।

রাখবে যদি নয়ন ঘিরে অকূল কালোর আকাশখানি,
সব আবরণ দীর্ণ ক'রে দাঁড়াও তবে কৃপাণপাণি।
গাঁথব তোমার চরণ তলে
জীবন-মালা পলে পলে,
নয়ন ভ'রে দেখব ব'সে :
সাজিস মা তুই কেমন সাজে,
প্রার্থনা কি চাইব বলো,
চাইতে আমি জানি না যে।

কালিদাস ও প্রকৃতি

শ্রীসমীরণ চক্রবর্ত্তী, কাব্যতীর্থ

যে সকল মহাকবির লেখনীতে প্রকৃতি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে কালিদাস তাঁহাদের অন্যতম। বিভিন্ন সাহিত্যিকের দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য তাঁহাদের রচনাতে প্রকৃতি বিভিন্ন ভাবে ধরা দিয়াছেন; কিন্তু কালিদাস ও প্রকৃতির মধ্যে যে অনাবিল অনবদ্য সম্পর্কটুকু পাওয়া যায় তাহা অন্যত্র দুর্লভ। প্রকৃতির প্রতি কবির একটি বিশেষ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এবং তাহা আসিয়াছে ভারতের চিরন্তন আদর্শ হইতে।

কালিদাসের নিকট প্রকৃতি একটি সজীব পদার্থ। যেমন আমাদের চারিপাশে মানুষের জীবনযাত্রা চলিতেছে—ঠিক সেরূপ প্রকৃতিরও যাত্রা চলিতেছে, এবং তাহার আবেদন কবিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতি কবির নিকট জড় নহে, তাহা জীবন্ত। ভারতীয় আদর্শে প্রকৃতিকে সজীব ও মনুষ্যবৎ গণনা করা হইত। গাছপালারও প্রাণ আছে। তাহারাও মানুষের মতো অনুভব করিতে ও ভালবাসিতে পারে—ইহা কবি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন। আমাদের শাস্ত্রেও এইরূপ বিশ্বাসের পরিচয় আছে :—"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ।"

প্রকৃতিমাতা তাঁহার অকৃপণ স্নেহ আমাদের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছেন—আমরা বস্তুতান্ত্রিকতার মোহে প্রায়ই তাহা অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু যদি প্রকৃতিমাতার আশ্রয় নেই—তবে তিনি মাতৃতুল্য স্নেহেই আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আমাদের আত্মীয়গণ যেরূপ আমাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার, প্রকৃতিও ঠিক সেরূপ সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকে। এইরূপ আন্তরিকতার দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া কালিদাসের ন্যায় প্রকৃতিচিত্রণ দুর্লভ।

উদাহরণ স্বরূপ পাশ্চাত্য কবি শেক্সপীয়ারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য কবিরা প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে—তাহাদের নিকট প্রকৃতি মানুষের বিরুদ্ধ শক্তিরূপে চিত্রিত হইয়াছে। 'টেম্পেষ্ট' নাটকের কথাই ধরা যাক্—মানুষ প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে চাহে। কিন্তু ভালবাসা ও সহানুভূতিদ্বারা নহে, শক্তির দ্বারা। সেখানে প্রস্পেরো ও প্রকৃতির মধ্যে এই সম্বন্ধ সুপ্রকট। এরিয়েল, ক্যালিবান প্রভৃতি প্রকৃতির দিক্—তাহাদের সহিত পীড়ন ও দমনের সংগ্রাম চলিয়াছে প্রস্পেরোর। এই সম্পর্কের দ্বারা প্রকৃতি কখনোই তাহার নিকট বন্ধুভাবে ধরা দেয় নাই—সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ করিয়াছে।

সেখান হইতে কালিদাসের কাব্যকুটীরে প্রত্যাবর্তন করিলে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ নূতন আলোকে দেখিতে পাইব। এখানে প্রকৃতির সহিত বিরোধ নাই, আছে সখ্য। উদার প্রকৃতি মানবের প্রতি সহানুভূতিশীল। পীড়নের স্থান এখানে গ্রহণ করিয়াছে স্নেহ। কালিদাসের কাব্যে সর্বত্র এই মনোভাবের পরিচয় সুপ্রকট। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকে ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। এই নাটকটি কবির শ্রেষ্ঠ কীর্তি—

"কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা॥"

চতুর্থদর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্যই প্রকৃতিচিত্রণ। অন্যান্য সর্গেও তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম সর্গের কথাই ধরা যাউক। শকুন্তলাকে আমরা প্রথম দেখিতে পাইয়াছি আশ্রমতরু-মূলে জলসেচনে নিরতারূপে। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তাঁহার সঙ্গে আসিতেছেন। তৎকালীন কবিকল্পনা ভ্রাতা-ভগ্নি নির্বিশেষে তরুলতাকে পালন করিতেন। সখীদ্বয়ের কথা-বার্তা একটু উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

"অনসূয়া—হলা সউন্তলে। এসো বি তাদকস্সবস্স অস্সমপদকুসুমপি অদিত্তি তক্কেমি জেণ তোমালিআকুসুমপরি-পেলবাবি তুমং এদেসু আলবালপূরণেণবহুং নিউত্তা।

উত্তরে শকুন্তলা—হলা অনসূএ। ণ কেবলং তাদণিওও এব্ব অহিং মে সোদরসিণেহো বি এদেসু।"

অর্থাৎ অনসূয়া—কেবল তাতনিয়োগই আমার জল-সেচনের কারণ নহে, পরন্তু ইহাদের প্রতি আমার নিজেরও সহোদর স্নেহ বর্তমান। এই একটি কথাতেই প্রকৃতিপ্রীতি কি সুন্দর ফুটিয়াছে।

ঠিক এইরূপ উদাহরণ কালিদাসের অন্যত্রও পাওয়া পাওয়া যাইবে—

"অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং
পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন।
যো হেমকুম্ভস্তননিঃসৃতানাং
স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ॥"

রঘু—২য় সর্গ—৩৬

স্পষ্টতর উদাহরণ—লক্ষ্মণ সীতাকে বনবাসে রাখিয়া আসিলে আদিকবি সীতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—

'পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্
সংবর্ধয়ন্তী স্বকলাতুকল্পৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ
স্তনন্ধয়প্রীতি মবাপ্স্যসি ত্বম্।'

রঘু—চতুর্দশ—৭৮

অর্থাৎ জলপূর্ণকলসের দ্বারা আশ্রমের চারাগাছগুলিকে বর্ধিত করিয়া তুমি অচিরে পুত্রজন্মের পূর্বেই স্তনপায়ী শিশুর সুখ অনুভব করিবে।

রঘুবংশের পঞ্চমসর্গেও আশ্রমতরু সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

'সংবর্ধিতানাং সুতনির্বিশেষম্।'

কুমারসম্ভব কাব্যেও উমার অপত্যনির্বিশেষে তরুপালনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

আবার 'শকুন্তলা'তেই ফিরিয়া আসা যাউক। কেবল বৃক্ষ নহে, তপোবনের পশুপক্ষীর সহিত ঋষিকুমারীদের অনুরূপ সম্বন্ধ। আশ্রমমৃগ তাহাদের কৃতকপুত্র। মাতৃহীন এক মৃগ শিশুকে নিজ সন্তানের ন্যায় শকুন্তলা পালন করিয়াছিলেন, সেও তাঁহাকে মা বলিয়া জানিয়াছে, তাই পতিগৃহে যাইবার কালে ব্যথিতচিত্তে শকুন্তলার আঁচল টানিয়া ধরিয়াছে। সেখানে কণ্ব বলিতেছেন—

"যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণ মিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচীবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥

শাকু চতুর্থাংক

আশ্রম জীবনে প্রকৃতির প্রভুত্ব অধিক। তরুলতার যে প্রাণ আছে তাহা ইদানীং ক্রেস্কোগ্রাফের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু কালিদাস অন্তর দ্বারা যে ইহাদের প্রাণ অনুভব করিয়াছেন তাহা অনেক মধুর ও সত্য, বৈজ্ঞানিক তাহাতে যতই সংশয় প্রকাশ করুন না কেন। নাগরিকজীবনে বস্তুতান্ত্রিকতা যত বাড়িয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতিও ততই নির্বাসিত হইয়াছে। এই জন্যই কবি চাহিয়াছেন—

"যাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নব সভ্যতা……" রবীন্দ্রনাথ

সুতরাং প্রকৃতিকে পূর্ণ মহিমাতে দেখাইবার জন্য আশ্রমই ছিল কবির উপযুক্ত পটভূমিকা। সেখানে প্রকৃতিই অবলম্বন ও প্রকৃতিই ভূষণ—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।"

শাকু প্রথমাঙ্ক

তাই এই আশ্রমপরিবেশ হইতে বাহিরে আসিয়া দুষ্মন্তের সভায় ঋষিকুমার নিম্নোক্তরূপ অবস্তিবোধ করিয়াছিলেন—

"তথাপীদং শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা
অনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব।"

শাকু পঞ্চমাঙ্ক

আমরা যখন দূরদেশে যাই; আত্মীয় বন্ধুবর্গকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার রীতি আছে। শকুন্তলাও যাত্রাকালে আশ্রম-প্রকৃতিকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়াছেন। অশ্রমের তরুলতা, ফুল ফল, পশুপক্ষী, কেহ বাদ পড়ে নাই। বিদায়বৃক্ষেই প্রকৃতির সহিত তাঁহার আন্তরিকতা নূতন করিয়া চোখে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য একপক্ষীয় নহে। আশ্রমবাসিগণ প্রকৃতিকে যেরূপ আত্মীয়ের মতো

দেখিতেন প্রকৃতিও তাঁহাদের সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিয়াছে। শকুন্তলা তপোবনকন্যা অলঙ্কার কোথায় পাইবেন? তাই পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে বনদেবতাগণ তাঁহাকে আভরণরাজি প্রদান করিয়াছেন—

"অঙ্গেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্ব ভাগোদ্বিতৈঃ
দত্তান্যাভরণানি নঃ কিসলয়চ্ছায়া প্রতিস্পর্দ্ধিভিঃ।"

শকুন্তলা—চতুর্থাঙ্ক

আমাদের বিরহে আমাদের আত্মীয়বর্গ যেরূপ কাতর হইয়া থাকেন শকুন্তলার বিরহে আশ্রম প্রকৃতিও সেরূপ কাতর। তপোবনে সর্বত্র শোকের ছায়া পড়িয়াছে। বর্ণনাটি ভারী সুন্দর—

"উদ্গলিতদর্ভকবলা মৃগ্যঃ পরিচ্যুতব্যজনা মোরাঃ।
ওষরিতাশ্রুপত্রা মুঞ্চন্তি অনূয়নি বিসলতাঃ।"

শাকু—চতুর্থাঙ্ক

অর্থাৎ মৃগ তাহার মুখের গ্রাস ফেলিয়া দিতেছে, শিখী নৃত্য পরিত্যাগ করিতেছে এবং লতা পাণ্ডুপত্ররূপে অশ্রু-মোচন করিতেছে। রঘুবংশে লক্ষ্মণ সীতাকে নির্বাসন দিয়া আসিলে সীতার দুঃখে প্রকৃতির দুঃখ ঠিক এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।—

"নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষাঃ দর্ভানুপাত্তান্
বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবমন্তর্ন্যসীদদ্বিতং বনেঽপি।"

রঘু—চতুর্দশ—৬৯

শকুন্তলার এই প্রকৃতিপ্রীতিকে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস বা বাহুল্য মনে করা চলে না—স্বয়ং প্রবীণ মহর্ষি কণ্ব এই সম্পর্কে গভীর বিশ্বাসী। বিদায়কালে মহর্ষি কণ্বের কয়েকটি উক্তির মধ্যদিয়া প্রকৃতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অতি সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে। সকলের অনুজ্ঞাতে যাত্রা শুভ হইবার জন্য তিনি বলিতেছেন—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাসপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্।"

শকু—চতুর্থাঙ্ক

রবীন্দ্রনাথকৃত ইহার অনুবাদটিও দেওয়া হইল :—

"তোমাদের জল না করি দান,
যে আগে জল না করিত পান,
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু,
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে—
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়
তোমরা সকলে দেহ বিদায়।"

তপোবনপ্রকৃতিও কিন্তু মহর্ষির এই অনুরোধে মৌন হইয়া থাকিতে পারে নাই; শুভেচ্ছা জানাইয়াছে—

"রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভি-
শ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কময়ূচিতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ।"

শকু—চতুর্থাঙ্ক

উদাহরণ এইরূপ প্রচুর রহিয়াছে—উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধের আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে মাত্র। যে-কয়টি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—তাহাতেই কালিদাস ও প্রকৃতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্কটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির সহিত এরূপ প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থানই আমাদের দেশের আদর্শ। প্রাচীনভারতে এই আদর্শকে সর্বত্রই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। কালিদাস সেই প্রকৃতির কোলে জীবনযাত্রারই একটি বিস্তৃত আলেখ্য রচনা করিয়াছেন। এরূপ অনবদ্য প্রকৃতিচিত্রণ ও আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গী পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যেই বিরল।

অকলঙ্ক চাঁদ

শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী

আন্দাবধি মানুষের জীবন ইতিহাসে ছোট খাটো ভুল ত্রুটী কত বড় বড় দুর্ঘটনার কারণ ঘটাইয়াছে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। দুর্ঘটনা অর্চ্চনার জীবনেও ঘটিল।

স্বামীর মনের আভাস কিছুটা পাইলে একটু হয়ত সাবধান হইতে পারিত—কিন্তু সে সুযোগ অর্চ্চনা পাইল না। প্রতিদিনের সুখ দুঃখের অত্যন্ত জীবন যাত্রা একটা এলোমেলো হাওয়ায় ছত্রখান করিয়া দিল। চারিটি প্রাণীর সংসার। স্বামী, স্ত্রী, ননদ এবং ছোট একটি শিশু। সহরের একান্তে ক্ষুদ্র একটি বাসাবাড়ীর অতি সাধারণ দুটি কক্ষকে আশ্রয় করিয়া স্বামী স্ত্রীর মনে শান্তির সাধ মিটাইবার ঘর বাঁধিবার যে আশাটুকু ভিলে ভিলে একটু একটু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল,—একদিনে তাহা এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে কে জানিত!

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সোমনাথের বধূ হইয়া অর্চ্চনা যেদিন প্রথম এই বাসাবাড়ীটিতে সংসার পাতিল, অভাব ছিল চারিদিকেই। প্রতিবেশীর সান্নিধ্য এই অভাব বোধের দিকে কতভাবেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া যেন তাহাকে সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, অর্চ্চনা তাহাতে লজ্জা বোধ করে নাই। তাহার হাসিমুখের স্নিগ্ধ তৃপ্তি দিয়া সোমনাথের বুকে একটুখানি শান্তি দিতে কোন দিন কার্পণ্য করিয়াছে এমন কথা অর্চ্চনার কল্পনাতেও আসে না।'

সোমনাথের আয় বেশী নয়। দুটি প্রাণীর সংসার কোনরূপে চলিয়া যায়। এই অতি সাধারণ চলার গতিটুকু ভিতরে ভিতরে যে চাকুরী হারাইয়া সহসা মন্থর হইয়া পড়িবে এটুকু পূর্ব্বে জানিতে পারিলে সাবধান হইতে পারিত।

কখন নিঃশব্দে সোমনাথ সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ী আসিয়া শয্যাশ্রয় করিয়াছে প্রথমটা অর্চ্চনা টের পায় নাই।

অরুণার কথায় এ ঘরে আসিয়া অর্চ্চনা বলিল—ওকি, অমন করে শুয়ে পড়লে যে—খাবেনা?

সোমনাথ সাড়া দিল না।

ক্লান্ত স্বামীকে নিদ্রিত ভাবিয়া অর্চ্চনা তাহাকে আর বিরক্ত না করিয়া রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল। মাঝে মাঝে এমন অবস্থার অভিজ্ঞতা তাহার আছে। ননদ অরুণাকে খাওয়াইয়া স্বামীর আহার্য্যে ঢাকা দিয়া এ ঘরে আসিয়া দরজার খিল আঁটিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উঠিয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল চোখন ঘুমাইতেছে। স্বামীর গায়ে একখানি হাত রাখিয়া একটু খানি নাড়া দিল।

সোমনাথ সাড়া দিল না। অর্চ্চনা মৃদু একটু হাসিল। সারাদিন তাহার শরীরটা আজ বিশেষ ভাল নাই, একটু ঘুমাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়। আড়চক্ষে ঘুমন্ত পুত্র এবং স্বামীর দিকে একটু দৃষ্টি বুলাইয়া আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল। ঘর অন্ধকার।

পার্শ্বে সোমনাথের নড়া চাড়ার শব্দ উঠিল। অর্চ্চনা সাড়া দিল না।

—তাহার পর আরও কিছু সময় স্তব্ধতার পর সোমনাথের দিক হইতে প্রশ্ন আসিল, 'ঘুমুলে'!

অর্চ্চনা সাড়া দিল না। তাহার বোধহয় এই স্বল্প বিশ্রাম টুকুর ফাঁকে ঘুম একটু আসিয়া ছিল—সংক্ষেপে কহিল 'হুঁ'—

সোমনাথ বলিল 'মাথাটা একটু টিপে দেবে? বড্ড ধরেছে।

অস্ফুটস্বরে অর্চ্চনা জবাব দিয়াছিল—আমার শরীর ভাল নেই, ঘুমোও!

এই হইল সূত্র এবং এই সূত্রটুকুই যে এমন মূর্ত হইয়া উঠিবে, কে জানিত!

বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সোমনাথ এক সময় অকস্মাৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল 'হৃদয় হীনা'—গুরু রাতের অন্ধকার ঘরের মধ্যে সোমনাথের দৃঢ় স্বরটা অর্চ্চনার তন্দ্রার তন্দ্রিমাটুকু ভাঙ্গিয়া দিল। ইতিপূর্ব্বেও এ আড়িলের মান অভিমানের অভিনয় মাঝে মাঝে তাহাদের দুই একদিন হইয়াছে, আবার মিটিয়া সন্ধি হইয়া গেছে; এবারেও অর্চ্চনা ভাবিয়া বসিল তাহাকে জাগাইয়া রাখিবার প্রয়াস এবং পন্থা ছাড়া ইহা আর কিছু নয়। স্বামীর ছলনা সেতো জানে,—কপট গাম্ভীর্য্যে মুখ ফিরাইয়া কহিল, 'নিজের দিকটাই জানো—স্বার্থপর—

'স্বার্থপর আমি, না, তুমি!'

'তুমি'!

সোমনাথ সহসা বালিশের উপর হইতে মাথা তুলিয়া ধমকাইয়া উঠিল, সারাদিন খেটে খুটে এসে বাড়ীতেও যে একটু শান্তি পাব—তোমার কাছ হতে সে প্রত্যাশা নাই—অথচ—

অর্চ্চনার আজ শরীরটা সত্যই ভাল ছিলনা প্রত্যুত্তরে শক্ত কণ্ঠে সে বলিল,—'অথচ···কি', থামলে কেন? বল!—আমার শরীরটাও যে ভাল নেই এটুকু মুখ ফুটে বলবারও অধিকার নেই—দাসী বাঁদী—তার বেশী আর কি, কেমন!

সোমনাথ পুনরায় দুম করিয়া বালিশের উপর মাথা রাখিল তাহা অন্ধকারের ভিতর শুইয়া থাকিয়াই সে বুঝিল কিন্তু সাড়া দিল না।

সোমনাথও আর কথাটি কহিল না চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

কিন্তু এমনি অস্বাভাবিক অবস্থায় কতক্ষণ আর থাকা যায়? সহসা অন্ধকারেই অর্চ্চনা পাশ ফিরিয়া একখানি হাত স্বামীর কপালের উপর রাখিল এবং টিপিয়া দিবার প্রচেষ্টা করিতেই সোমনাথ একটু সবেগেই অর্চ্চনার হাত-খানি ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া পিছন ফিরিয়া শুইল। কোমল হাতখানি খাটের বাজুর উপর আছড়াইয়া একটু আঘাত পাইল। 'উঃ' করিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া অভিমানে অর্চ্চনা কাঁদিয়া ফেলিল।

সে রাত্রির মান-অভিমানের পর্ব্বটুকু এই,—কিন্তু দেহের ছোট-খাটো সুবিধা অসুবিধার বিচারটিকে ছাপাইয়া মনের অনুভূতি যখন বড় হইয়া উঠে; অভিমান আসিয়া ভিড় করিয়া তখনই মুস্কিল বাধাইয়া বসে। এক কোঁটা তিল, আকারে তালের মত বড় দেখায়। একরত্তি আগুনের ফুল্‌কী লঙ্কাকাণ্ড করিয়া দেয়। এমনিই হয়, এ দোষ ভালবাসাবাসির নয়। মাঝখানে রাহুর মত অভিমান আসিয়া গোল বাধায়।

সারারাত্রি কেহই আর কথাটি কহিল না। অর্চ্চনা কাঁদিল চুপি চুপি অভিমানের পাহাড় বুকে লইয়া কখন ঘুমাইয়া গেল—ঘুম ভাঙ্গিল যখন তখন একটু বেলা হইয়াছে।

খোকন শয্যা হইতে নামিয়া বাহিরে খেলা করিতেছে।

ছোট ননদ অরুণা আসিয়া অবশেষে ডাকিয়া তুলিল।

অরুণা বলিল কি ব্যাপার? আজ আর ঘুম কি ভাঙ্গবে না?—তৈরী চা জুড়িয়ে জল, অথচ তোমাদের কারও পাত্তা নাই—দাদা তো বৌদি! তার ঘুম তো এত সকালে ভাঙ্গেনা—!

অর্চ্চনা ধড়মড় করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। চোখ রাঙা—দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া অর্চ্চনা কহিল তোর দাদার এখনও চা খাওয়া হয়নি অরু?

'না।

'কি করছে?—

অরুণা বলিল 'দাদা তো বাড়ীতে নাই বৌদি'! 'নাই কিরে!' বলিয়া অর্চ্চনা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অরুণা শঙ্কিত হইল। কপালের উপর একখানি হাত রাখিয়া ভয় পাইয়া বলিল তোমার যে জ্বর হয়েছে বৌদি! গা'তো তোমার পুড়ে যাচ্ছে!

আরক্ত মুখে অর্চ্চনা মৃদু হাসিল, বলিল ও কিছু নয়—তোর দাদা বোধহয় বাজার গেছে নারে অরু?'

অরুণা বলিল বাজারের থলেটা তো পড়ে আছে, শুধু হাতে যাবে নাকি.'

অর্চ্চনা ডাকিল 'খোকা!'

'কি!'

'তোর বাবা কইরে' ?

খেলা ফেলিয়া খোকার এতক্ষণে বাবাকে যেন মনে পড়িল। মায়ের কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, বাবা কই মা !'

ততক্ষণ তিনজনে মুখোমুখি বসিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চোখ মেলিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বেলা বাড়িতে লাগিল।

পাড়ার মুদিখানাটা বড় রাস্তার মোড়ে। এ বাড়ীর অধিকাংশ জিনিষ সেখান হইতেই কেনা হয়। এ মাসের দোকানের বাকী একটু বেশীই হইয়াছে, তাগাদায় বাকী-পাওনার তাগাদা করিতে দত্ত নিজেই আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়া গলার সাড়া দিল।

দরজায় উঁকি দিয়া দত্ত ডাকিল "সোমবাবু আছেন ? কেহ সাড়া দিল না। অর্চ্চনা মাথায় কাপড় টানিয়া ঘরের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল।

অরুণা আগাইয়া আসিল। বলিল দাদা তো নেই দত্ত মশাই ! সকালে উঠে বেরিয়েছেন এখনও ফেরেন নি।

দত্ত কহিল যখনই আসি দেখা হয়না—কিন্তু এ মাসের বাকীটা একটু বেশী হয়েছে—বাকী না মিটলে আর আমি ধার দিতে পারবনা দিদিমণি !

অরুণা কহিল আচ্ছা 'দাদা এলে বলব'।

দত্ত বাহির হইয়া গেল।

অর্চ্চনা বাহির হইয়া আসিল।—বলিল উনুনটা ধরিয়ে দে অরু ! দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নে।

অরুণা একে একে করণীয় গৃহকর্ম্ম শেষ করিল। যথা-রীতি রান্না শেষ করিল। ছেলে কোলে লইয়া তাহাকে খাওয়াইল। অর্চ্চনার জন্য সুতরাং তাহার নিজের খাওয়ার হাঙ্গামা নাই, এক গ্লাস জল ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া সে বারান্দায় আসিয়া বসিল। তখন বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন। ক্রমে মধ্যাহ্ন গড়াইয়া অপরাহ্ণ এবং সোমনাথের নিয়মিত ফিরিবার সময়ও অতীত হইল।

অরুণা আসিয়া অর্চ্চনার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল।

বলিল ব্যাপারখানা কি বৌদি ! দাদার যে দেখা নাই এখনও,—রাগ করে গেছে নাকি ?

ভয়ে লজ্জায় অর্চ্চনা হেঁট মুখে বসিয়া রহিল। অবশেষে রাত্রের ঘটনাটুকুই স্বামীর না ফিরিবার হেতু, এই বিশ্বাস যখন দৃঢ়তর হইল তখন সব কথা প্রকাশ করিতেই সে বাধ্য হইল। বিনিদ্র রজনী কোন রূপে কাটাইয়া প্রভাতে অর্চ্চনা শ্রীরামপুরে তাহার দাদা কেশবকে পত্র দিল। পত্র পাইয়া কেশব পরদিনই আসিয়া ভগ্নির মুখে সমস্ত সংবাদ শুনিয়া চিন্তায় পড়িল এবং অতঃপর কর্ত্তব্য স্থির করিতে বসিল।

এক কাপ চা আনিয়া দাদার পাশে বসিল অর্চ্চনা। বলিল কি করব দাদা !

কেশব চায়ের কাপ হাতে লইয়া ভগ্নির মুখের দিকে চাহিল। বলিল আমিও তাই ভাবছি বোন, পরামর্শ দে।

আচ্ছা, একটা কথা আমায় বলবি ; লুকোবি না।

'বল'।

'সোমনাথের এই পালিয়ে যাওয়ার 'বিশেষ কারণ কিছু হয়েছিল। তুই তাকে কি কোন রকম কিছু বলেছিস ?

অর্চ্চনার মুখখানি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কহিল 'না দাদা—আমার কথায় রাগ তিনি কোন দিনই করেন নি। খোকাকে ছেড়ে একটা দিনও বাইরে থাকবার মানুষ তিনি নন্।—মাথা ধরেছিল বলে-ছিলেন কপালটা একটু টিপে দাও—আমার শরীরটা ভাল ছিলনা ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম ; কপালটা টিপে দিতে পারি নাই এই সামান্য ত্রুটিটুকুই যদি তাঁর গৃহত্যাগের কারণ হয়—তাহলে আমি আর কি করতে পারি বল দাদা ! অর্চ্চনার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

ভগ্নিকে কাছে টানিয়া কেশব সান্ত্বনা দিল—বলিল এক কাজ কর—সে যে বেশীদিন থাকবেনা, নিশ্চিত, কিন্তু যতদিন না আসে এখানেই বা থাকবি কি করে ? তার চেয়ে আমার সঙ্গে চল শ্রীরামপুরে—আমিই বা এখন করে চাকরীতে কামাই করব কদিন ?

অর্চ্চনা বলিল তোমার তো মাষ্টারী সম্বল—সংসারটিও ছোট নয়। তা ছাড়া ঠাকুরঝি,—সে হয়ত—

কেশব বলিল—অরুণা ? লজ্জা করবে ? কিন্তু এতো লজ্জার সময় নয় ভাই—

অকস্মাৎ দরজায় হাঁক দিয়া পিওন একখানা পত্র

ফেলিয়া দিয়া গেল। কেশব পত্র খানি কুড়াইয়া আনিয়া চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল।

খোলা পোষ্টকার্ডে মাত্র কয়েক ছত্র লেখা—

অর্চ্চনা, "তোমার সেবার ত্রুটিবোধেই চলে এসেছি তা নয়—তোমাদের সেবা গ্রহণের অযোগ্যতাই আমাকে এত দূরে ঠেলে নিয়ে এসেছে। চোরা-বালীর উপর বেশীক্ষণ দাঁড়ানো চলেনা ডুবে যাওয়াটাই সত্য। অফিসে চাকরী ছাটাই, বাড়ীর ছ-সাত মাসের ভাড়া বাকি,—দোকানের দেনা। তন্বির বিবাহ এবং যে নিরপরাধ শিশু বড় হচ্ছে, তাকে মানুষ করবার দায়িত্ব—সর্ব্বোপরি তোমাকে ঘরে এনে যে দারিদ্রের মধ্যে ডুবিয়েছি তার লজ্জা সহ্য করতে পারলাম না। যে ভগবান আমায় দুঃখ দিয়েছেন, সে ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন—বৃথা সন্ধান করে কষ্ট বাড়িও না। ইতি সোমনাথ।

পত্রে ঠিকানা নাই—হাজারীবাগ পোষ্ট অফিসের ছাপ-টুকু মাত্র চোখে পড়ে।

অরুণা কখন পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল মাটিতে আছাড় খাইয়া জ্ঞান হারাইল। খোকা অদূরে খেলা করিতেছিল ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অর্চ্চনা স্তব্ধ। নড়ে না, পড়ে না, কথা কহে না শুধুমাত্র চাহিয়াই রহিল।

অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেশব থামিয়া উঠিল। তাহার কল্পনাপ্রবণ মনশ্চক্ষে যেন সমগ্র দরিদ্রদেশটারই এক নগ্ন নাটকীয় রূপ এই গৃহপ্রাঙ্গণে অভিনীত হইতেছে মনে হইল। যাহার মূলে একমাত্র দারিদ্র্য এবং সমগ্র ব্যথাবিদ্ধ পরিবারেই আজ ভয়ে কাঁদে শিশু, লাঞ্ছনায় কাঁদে নারী, আর অক্ষমতার অভিশাপে মুহ্যমান পুরুষ পলায়নের পথ খোঁজে।

কেশব মুহূর্ত্ত নিজের অন্তস্তলের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল,—দেখিল সেখানেও তাই। তাহার নিজের অন্তরাত্মাও আজ যেন পুরুষের গৌরব স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করে। তাহার নিজের সংসারটিও ছোট নয়। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, মাথার উপর স্কুল মাষ্টারের জীবন সেও যাপন করে। দক্ষিণহস্তের উপার্জ্জন বামহস্ত টের পায় না।

বর্দ্ধমানের অখ্যাত এক পল্লীতে একটা পৈতৃক ভিটা অল্প সামান্য কয়েক বিঘা জমি, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান কোন রূপে চলিতে পারে কিন্তু পর পর দুই বৎসরের বন্যায় ভিটা নিশ্চিহ্ন—জমি শস্যহীন। বন্যার স্রোতে স্ত্রী পুত্র ভাসিয়া যায় নাই; স্কুল মাষ্টারের ইহাই সৌভাগ্য। মাঝে মাঝে মনে হয় ভাসিয়া যাইলেই বোধহয় ভাল ছিল পরম দয়ালের অন্বেষণ করিতে করিতে উপায় খুঁজিত। সোমনাথের এই কাপুরুষতা মনকে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু—

মীমাংসা করিয়া দিল অর্চ্চনা নিজেই। মুহূর্ত্তে কখন কোমরে কাপড় জড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। খোকাকে কেশবের কোলে দিয়া নিজে গিয়া অরুণার মাথাটা কোলে লইয়াছে। তারপর অমানুষিক শক্তিতে শুশ্রূষা করিয়া অরুণার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইল। তপ্তোৎসাহ কেশবের মুখের দিকে চাহিয়া অর্চ্চনা বলিল আমার জন্য ভেবো না দাদা। অক্ষমতার দোহাই দিয়ে যে কাপুরুষ সেই পালায়; আজ হতে আমি পুরুষ হলাম; ভগবান, তুমি আমার সহায় থেকো।

* * *

দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর কেমন করিয়া কাটিয়া গেল অর্চ্চনা ভাবিয়া পায় না। জীবনযুদ্ধে আজ সে বিজয়িনী। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে নিম্নতম শিক্ষয়ত্রীর একটি চাকুরি পাইয়াছে। খোকাকে কোন এক স্কুলে এবং অরুণাকে সেলাই শিক্ষার একটি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে। অরুণা নিজে সেলাই করিয়া উপার্জ্জন যাহা করে অর্চ্চনার হাতে তুলিয়া দেয়। পূর্ব্বের বাসা সে ছাড়ে নাই। গৃহকর্ত্তার কৃপায় বাকী ভাড়া কিস্তী মত পরিশোধ করে। নিরুদ্দিষ্ট সোমনাথের সন্ধান নাই। না থাক পলাতক স্বামীর জন্য চিন্তা করিবার তাহার সময়ও নাই।

তন্বির সন্ধান লইতে কেশব আসিল সন্ধ্যায়। মাঝে মাঝে কিছু কিছু ভাগিনেয়ের হাতে গুঁজিয়া দেয়। খোকাকে কোলে লইয়া আদর করে, চুমা খায়। তন্বির মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে সাহস দেয় এই পর্য্যন্ত; তাহার অধিক কতটুকু শক্তি তাহার আছে নিজেই জানেনা।

কেশব বলে খোকাকে মানুষ করতে পারবি? বরং ওকে আমার কাছে নিয়েই যাই?

অর্চ্চনা হাসে। ভাবনা কি দাদা যে কদিন পারি আমার

কাছেই থাক ;—হাজার হোক পুরুষ মানুষ তো ও কাছে থাকলেও সাহস, কি বল ?

কেশবের মুখে হাসি আসে না। দুটি ভাই বোন এক বৎসরের ব্যবধান মাত্র। আজকাল কেশব যেন অর্চনাকে ভয় করে—আমার বয়সে বড় না হইলে ভক্তি করিতেও পারিত এমনি মনে হয়।

অকস্মাৎ প্রশ্ন করে 'এ পাড়াটা ভাল তো রে' ! তোদের দূরে রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারি ?

অর্চনা বলে ভাল আবার কোন দেশে নাই দাদা ! মন্দ ছাড়া আমার কোথা আছে ? সব জায়গাতেই সব আছে।

কেশব প্রশ্ন করিল 'তার মানে' ?

'মানে, ভাল মন্দ চেনা শক্ত। কে ভাল আর কে মন্দ এই হ সমস্যা। যে রক্ষা করে সে ভাল, আর যে মরণের দিকে ঠেলে দেয় সে মন্দ—এইটুকুই আজ বুঝতে শিখেছি।

কেশব বাঁকা কথাটায় মোড় ফিরাইয়া দিল। বলিল আজ এখনও অরুণা ফিরল না কেন রে ?

অর্চনা বলিল এক্ষুণি এসে পড়বে। আজ তার এক বন্ধু আসবে, তুমিও থাকবে তাই তোমাকে আসতে লিখেছিলাম দাদা।

কেশব বলিল, বেশ তো, তার বন্ধু আসবে, তা আমি থেকে কি করব ?

অর্চনা বলিল 'তোমার থাকা দরকার'। আমি একা সব দায় নেবো কেন—

তাহার অসমাপ্ত কথার মধ্যেই বাইরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল অরুণা এবং তাহার পশ্চাতে প্রিয়দর্শন একটি যুবা।

অর্চনা স্মিতমুখে কহিল এসো ভাই! এত দেরী হল যে ?

যুবক কেশবের দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিল। বলিল আমার দোকানের পাশে যে খালি ঘরটা ছিল সেটা আজই ঠিক করে এলাম বৌদি !

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ—অরুণার ইচ্ছা ষ্টেশনারী দোকানের পাশে থাকবে ওর সেলাই কল। 'ও কি বলে জানো বৌদি'—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল অরুণা কখন ঘরে গিয়া লুকাইয়াছে।

অর্চনা বলিল বেরিয়ে আয় অরু ! দাদার আর দুটি-বিহারীর জায়গা করে দে। রান্নাঘর থেকে খাবারগুলো নিয়ে আয়।

অরুণার উপর আদেশ চালাইয়া অর্চনা কহিল জানো দাদা, আজ আমি নিজের হাতে তোমার আর দুটুর জন্য খাবার তৈরী করেছি, খারাপ হয়েছে বলে কেউ ফেলতে পাবে না। তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই—'ইনি আমার দাদা শ্রীরামপুরে থাকেন—সেখানকার ইস্কুলের মাষ্টার ; —আর উনি হচ্ছেন অরুণার বন্ধু শ্রীমান দুটবিহারী।'

উভয়ে নমস্কার করিল।

অরুণা দু-খানি আসন পাতিয়া দু-জনের জলযোগের স্থান করিয়া পরিপূর্ণ দুটি রেকাব নামাইয়া দিল। দুজনে আহারে মনোনিবেশ করিল।

আহারান্তে সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। এক সময় দুটবিহারী কহিল আজ আমি উঠি বৌদি ! আবার কাল একসময় এসে আপনাদের অনুমতি নিয়ে যাব।

দুটবিহারী বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে অর্চনা কেশবের দিকে আড়চক্ষে একবার চাহিয়া দেখিল। মনে হইল তাহার মুখখানা কিছু চিন্তাগ্রস্ত।

বলিল 'ছেলেটিকে কেমন লাগল দাদা'।

'ভাল'।

'ওর সঙ্গে অরুণার বিয়ে হলে কেমন হয় ?'

'ভাল।'

'তাহলে তোমার মত আছে ? মত পেলাম' ?

কেশব এইবার মুখ তুলিল। বলিল, 'আমাকে এই-জন্যেই আজ ধরে রাখলি অর্চনা ! আমার অনুমতি দেবার অধিকার আছে কিনা জানি না—যার অধিকার সে তো পালিয়েছে—তাছাড়া অরুণা বড় হয়েছে তার ইচ্ছা কি—

হ্যাঁ, তার ইচ্ছা জানতে পেরেছি বলেই তোমার কাছে শুধু আশীর্বাদ পাওয়ার জন্যেই এই অভিনয়টুকু করলাম দাদা। দুটবিহারীর পিছনের কিছুই জানি না। বাস্তু-হারা বাঙ্গালী। পড়াশুনা ছেড়েছে—মা বাপ ভাই-বোন কেউ নেই—শুধু আপনচেষ্টায় এই সহরে ছোটখাটো একটা দোকান করে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়,—অরুকে ভাল-

বাসে—অরুও ওকে দেখে বিশ্বাস করেছে,—বাস্, এর বেশী আর কি জানবো। জানার উপর আছি বিশ্বাস হারিয়েছি দাদা! অর্চনা স্তব্ধ হইয়া বসিল।

কেশব বলিল সে কথা নয়রে বোন্;—সমাজ, স্বজন, আত্মীয়—

'বাসো হয়েছে'—সমাজের কথা বলছ? সমাজ তো বড় লোকের, গরীবের জন্যে কি? অরক্ষণীয়া মেয়েকে নিয়ে সমাজ তো শুধু কসাইখানা খুলে বসেছে। দাঁড়িপাল্লার ওজনে রূপের আর টাকার হিসাব করে।—আমাদের বাঙ্গলাদেশের মেয়েগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে চালের পিঠে ছাইয়ে নিলে এদের যোগ্য সমাদর করা হয়—তাই নয় দাদা!

কেশবের চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল। তাহার পরম স্নেহস্পদা ভগিনীর বিদ্রোহিনী অন্তর আজ যে অভিমানে মাথা কুটিতেছে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার শক্তি বোধকরি আর তাহার নাই।

বলিল, 'দুঃখ করিসনে বোন, তোর সব ইচ্ছাকে সফল করে তুলতে আমি তোর পাশে রইলাম চিরদিন।'

অর্চনা হেঁট হইয়া কেশবের পদধূলি মাথায় লইল। বলিল ওদের বিয়ের একটা শুভদিন তুমি ঠিক করে দাও দাদা। সংক্ষেপে যেটুকু না করলে নয় তাই করতে হবে। আত্মীয় কেউ থাকবে না, শুধু তুমি আর বৌদি, ছেলেমেয়েরা, আর ওদের বন্ধু বলতে যারা, তারাই। অর্চনা মুখে মুখে একটা ফর্দ্দ করিয়া ফেলিল।

কেশব কহিল, 'কিন্তু'—

'সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অরুর ইস্কুলের একটা ফণ্ড আছে তাই থেকে কিছু পাওয়া যাবে কথা দিয়েছে। নুটবিহারীর নিজেরও কিছু জমা আছে এই সব থেকে হয়ে যাবে,—আমার কিছু ভাববার নাই।'

কার্য্যক্ষেত্রে তাহাই হইল। বিবাহ কোনমতে সমাধা হইল তাহার নিজস্ব কোন নিয়ম নাই। অর্থাৎ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, নিয়মের এক বিচিত্র অনুষ্ঠানে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইল।

বড় ঘরখানায় বর-বধূর বাসর! একে একে, পাড়ার যাহারা আসিয়াছিলেন বিবাহ শেষ করিয়া বিদায় লইয়া গেলেন। পাশের ছোট ঘরে কেশব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খোকাকে লইয়া ঘুমাইয়া আছে।

বাইরের বারান্দায় একপাশে শ্রান্ত অর্চনা চুপটি করিয়া বসিয়া রহিল।

কি ভাবিতেছিল সেই জানে। পাশের ঘরে নব-দম্পতির দু-একটি স্বর মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসে; অর্চনা শুধু ক্লান্ত দৃষ্টিটা নৈশ অন্ধকারে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে মেলিয়া ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ফেলিল। সে নিঃশ্বাসে যেন তার মুক্তির একটা তৃপ্তিবালা আছে।

অরুণার বিবাহের পর আরো কয়েকটি মাস কাটিয়া গেল। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে দিন একটির পর একটি করিয়া কাটিতে থাকে। অরুণা এখন স্বামীর সঙ্গে বাস করে। অর্চনাকে প্রত্যহ আসিয়া দেখিয়া যায়। খোকাকে লইয়া আদর করে আবার চলিয়া যায়।

অর্চনা বলে হ্যাঁরে, কেমন আছিস? কোন কষ্ট হয়না তো?

আনন্দ ঝলমল মুখ তুলিয়া অরুণা বলে না, ভাল আছি।

অরুণাকে কাছে টানিয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অর্চনা বলিল নুটবিহারী কি করছে, সে এলনা কেন?—

'দোকানে রয়েছে। আসতে সময় পেলনা।'

অর্চনা মৃদু হাসিল, বলিল—তোকে তেমনি ভাল বাসেতো রে?

অরুণা মাথা নত করিল। অরুণার এই লজ্জারক্ত মুখখানি তাহার বুকের প্রচ্ছন্ন আনন্দটুকুই নীরবে প্রকাশ করে। দেখিয়া অর্চনা তৃপ্তি পায়।

—কিন্তু অকস্মাৎ এক সময় অর্চনা অনুভব করে তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া অরুণা যেন কাঁদিতেছে। সবিস্ময়ে অর্চনা প্রশ্ন করিল ওকি! কাঁদছিস কেন। কিছু ঘটেছে?

অরুণা ফুপাইয়া ফুলিয়া শুধু এই টুকুই জানাইতে পারিল দাদার জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে।

অর্চনার সমস্ত শরীর এক মুহূর্ত্তে পাথরের মত কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল অবর্ণনীয় এক কঠোর স্বর। যে ঘরে উত্তাপ নাই, জ্বালা নাই,

মায়া নাই, স্নেহ নাই। সে স্বরে নারীর কোমলতা-টুকুও যেন নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে।

অরুণার অপেক্ষা বয়সে অর্চ্চনা বেশী বড় নহে। বড় হয়ত দুই অথবা তিন বৎসরের, ইহার অধিক নয়—তথাপি অবস্থাসঙ্কটে আজ যেন সে অনেক বড় এমনি মনে হয়।

কঠোরস্বরে অর্চ্চনা ডাকিল, অরু!—আমার কাছে কারও নাম দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করোনা। মনে রেখো এখানে পুরাণো দিনের কেউ আর বেঁচে নেই। এই তুমি 'নতুন তুমি!'—এ আমি 'নতুন আমি'। মিথ্যাকে চেনে আঁকড়ে ধরতে যাওয়াকে আমি ঘৃণা করি।

অরুণা ভয়ে কুণ্ঠায় বিবর্ণ মুখ তুলিয়া চাহিল। বালো মা হারাইয়া এই বৌদিকে পাইয়া মায়ের অভাব সে ভুলিয়াছে। এই স্বামী সোহাগিনীর অন্তরে এত কাল যে মধুর নিষ্ঠা সে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ একটি মুহূর্ত্তে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

অর্চ্চনা বলিল 'অরু! তুমি আমার বোন, আমার বন্ধু—এর বাইরে কিছু ভাবলে আমাকে আর পাবেনা।

অরুণা মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল তোমার কথা আমি বুঝতে পারলাম না বৌদি!

বুঝতে পারোনি? এক্ষুণি যে নামে আমাকে ডাকলে ওই নামটা আমি মুছে ফেলতে চাই।

অরুণা বলিল 'মুছে ফেলতে চাও?

'হ্যাঁ'।

অরুণা বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল 'তার মানে, দাদার নাম পর্য্যন্ত তোমার কাছে করা চলবেনা?

—হ্যাঁ চলবে না।'

কাঁদিতে গিয়া অরুণা হাসিয়া ফেলিল। এতক্ষণে সে যেন এই প্রচ্ছন্ন রসিকতা ধরিয়া ফেলিয়াছে। হাসি মুখে বলিল আচ্ছা মশাই, তাই হবে। আজ আসি বৌদি, ভয়ঙ্কর দেরী হয়ে গেল।

প্রসন্ন হাস্যে অর্চ্চনার মুখখানি ঝলমল করিয়া উঠিল। —কহিল—'উনি হয়ত, পথ পানে চেয়ে ভাবছেন, কি বল? কাল আবার আসবি তো?

'আসব' বলিয়া অরুণা বিদায় লইয়া গেল। অর্চ্চনা তাহার গতিপথের দিকে চাহিয়া একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

গ্রীষ্মের শেষ বেলা তখনও কিছুটা বাকী আছে—খোকা স্কুলের ছুটির পর খেলিতে গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই। দাঁড়াইয়া দু-একটা এলো-মেলো চিন্তার মাঝখানে আর একটা নূতন চিন্তা তাহার মনের মধ্যে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ মনেই ছিল না, মনে পড়িল।

মাঝে মাঝে স্কুলে যাইতে তাহার দেরী হইয়া যায় আজও হইয়াছিল। খোকাকে খাওয়াইয়া স্কুলে পাঠাইয়া আজ সে যখন তাহার স্কুলে পৌঁছিল, তাহার কিছু পূর্ব্বেই ঘণ্টা বাজিয়া ক্লাশ শুরু হইয়াছে। খাতার নাম সহি করিয়া মুখ তুলিতেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বাসবী দিদির সঙ্গে অর্চ্চনার চোখাচোখি হইল। তিনি কিছু কঠস্বরেই প্রশ্ন করিলেন এমন করলে স্কুলের কাজ চলে কি?—রোজই আপনার লেট্ মার্ক পড়ছে কেন?

অর্চ্চনা লজ্জিত হইল। বলিল ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে আসতে হয়—

'তা, না এলেই তো পারেন! সেক্রেটারী আপনাকে দেখা করতে বলেছেন—যান', বলিয়া গম্ভীরমুখে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

অর্চ্চনা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। তাহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট গুরুতর; তাহা না হইলে বাসবী দিদির একতার ছাড়াইয়া একেবারে সেক্রেটারীর রাঙো তলব সহজে পড়িবার কথা নয়। অদূরে সেক্রেটারীর পর্দ্দা টাঙানো ঘরখানার দিকে চাহিয়া বুঝা গেল তিনি উপস্থিত আছেন।

পা পা করিয়া অর্চ্চনা আগাইয়া গেল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে পর্দ্দা একটু ফাঁক করিতেই ভিতর হইতে আহ্বান আসিল 'ভিতরে আসুন'।

অর্চ্চনা কম্পিত পদে সেক্রেটারীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

'বসুন'।

সম্মুখের খালি চেয়ারে অর্চ্চনা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া একটা কটু আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সেক্রেটারী বলিলেন,'আমি বাইরে থাকি—আপনাদের হাতেই সব দায়িত্ব। স্কুলের ভালমন্দ সব কিছু ভার আপনাদের দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে হয়—আমাকে। কিন্তু

নিজেরাই যদি কর্ত্তব্য পালন না করতে পারেন স্কুল কমিটি তাহলে সন্তুষ্ট থাকতে পারে কি করে—বলতে পারেন ?—

আরক্ত মুখে অর্চ্চনা মাথা নত করিয়া কহিল, সংসারে দ্বিতীয় কেউ নাই—ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে আসতে একটু দেরী হয়ে যায়, এবারটা আমায় ক্ষমা করুন। আমি চেষ্টা করব।

কিন্তু হেডমিষ্ট্রেস্ আপনার উপর বিরক্ত ; আমি কি করতে পারি ? এ চাকরী আপনাকে ছাড়তে হবে।

অর্চ্চনা ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিতেই তরুণ রাশভারী সেক্রেটারীর সঙ্গে চোখে চোখে মিলিল।

মাথা নামাইয়া অর্চ্চনা কহিল—আমার অবস্থার কথা হয়ত শুনেছেন—

সেক্রেটারী বলিলেন—'শুনেছি।' কিন্তু কমিটির বিরুদ্ধে আমার একার অনুরোধ টিকবে না এবং টেকা উচিতও নয়।'

অর্চ্চনার মর্য্যাদায় আঘাত লাগিল। দুই হাত যুক্ত করিয়া কপালে তুলিল। বলিল তাহলে আমাকে অনুমতি দিন, যাই আমি !

অর্চ্চনা দরজার দিকে পা বাড়াইল।

'শুনুন !'

অর্চ্চনা ফিরিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপূর্ব্বের সমস্ত সঙ্কোচ এক মুহূর্ত্তে আর যেন কিছুই অবশিষ্ট নাই। ভয় যখন দূরে থাকে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভয় ; কাছে আসিলে তাহাকে আর ভয় করিবার কি থাকে ?—সে বলিল, 'বলুন'।

'এ চাকরী গেলে কি করবেন ?'

একটা শক্ত কথা তাহার মুখে আসিল কিন্তু সংযত কণ্ঠে বলিল এত আগে সে কথা বলা যাবেনা ; পরে জানাবো।

সেক্রেটারী হাসিলেন, বলিলেন, 'রহস্য নয়—বন্ধু হিসাবে জানতে চাইছি।—কিন্তু এখন সে সময় নয়, প্রয়োজন এবং বিশ্বাস হলে আমার বাড়ীতে জানাবেন অভয় দিলাম—। নমস্কার।'

অর্চ্চনা প্রতিনমস্কার করিয়া সেক্রেটারীর ঘর হইতে বাহির হইয়া কোন দিকে না চাহিয়া বাসায় চলিয়া গেল।

বুঝিল চাকরীর মেয়াদ ফুরাইয়াছে এবং নূতন করিয়া দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার দিন সুরু হইল।

পরদিন স্কুলে গিয়া চাকরী ইস্তফা দিয়া হিসাব চুকাইয়া লইয়া বাসায় ফিরিল। টাকা কয়টি আর দ্বিতীয়বার গণিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি নাই—বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া এক পাশে স্তব্ধ ভাবে বসিল।

খোকা বাহিরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কলকণ্ঠে কহিল 'জানো মামণি, কি হয়েছে ?

'কি রে ?'

'এক ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল।'

অর্চ্চনা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল 'কি রকম। তুমিও কি ভদ্রলোক হয়ে গেছ ?'

খোকা বলিল 'বারে আমি কি ভদ্রলোক নই নাকি ?'

কপটগাম্ভীর্য্যে অর্চ্চনা বলিল, যারা ভদ্রলোক তারা এখন করে রোজ রোজ প্যাণ্ট ছেঁড়েনা।

বারে ! ছুটে যেতে রেলিংএ খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেল, তা আমি কি করব ?

অর্চ্চনা বলিল যারা ভদ্রলোক তারা ছুটেও যায় না। তুমি ছুটলে কেন ?

তখন খোকা আসিয়া মায়ের কোলের উপর বসিল। দুই হাতে গলা জড়াইয়া বলিল—জানো মা কি হয়েছে ? আমি তো খেলছি ঘন্তুদের ভেবলা এসে বলল 'এই, তোকে ওই ভদ্রলোক ডাকছে, গাড়ীতে বসে আছে, আয়।

ভয়ে ভয়ে তো গেলাম—কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে একেবারে ভয় লাগল না।

অর্চ্চনা যেন গল্প শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেছে এমনি ভঙ্গি করিল বলিল 'তারপর ?'

ভদ্রলোক বল্লেন খোকা, তোমার নাম কি ? আমি বললাম ওই-তো আমার নাম ;—ভাল নাম অনাথনাথ ভট্ট।

'বাবার নাম'।

খোকা বলিল জানো মা ! বাবার নাম করতে কেঁদে ফেল্লাম বাবার নাম বললাম।

তিনি বল্লেন কাঁদছো কেন বাবা'।

বল্লাম বাবার জন্যে মন কেমন করছে—অনেক দিন দেখি নাই তো ; তিনি কোথায় চলে গেছেন।

অর্চনা যেন কান পাতিয়া রূপকথা শুনিতেছে বলিল 'তারপর ?'

সে ভদ্রলোক বলেন, 'তোমার মা মেয়েদের স্কুলের মাষ্টারনী ?

বল্লাম হ্যাঁ করেই তো।—তার পরে ভদ্রলোক আমার থুতনীটা একটু নেড়ে দিয়ে বলেন এই চিঠিটা তোমার মায়ের হাতে দিও—বলিয়া প্যাণ্টের পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া মায়ের হাতে দিল।

কৌতূহলী হইয়া অর্চনা পত্রখানি খুলিয়া চোখের সামনে ধরিল।

খোকা বলিল ভদ্রলোক কে জানো মা! গাড়ীটা চলে যেতেই তোলা বল্লে উনি কে জানিস ? শঙ্করবাবু, খুব বড়লোক—উঁচে তিনতলা বাড়ীখানা—খোকার বলা শেষ হইল না। দেখিল মা তখন চিঠি পড়িতেছে।

নমস্কার! বোধ হয় চিনতে পারছেন। এক কথায় আপনি চাকরী ছেড়ে দিলেন, দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করলে হয়ত কমিটি তা মঞ্জুর করতেও পারত, কিন্তু আপনি তা করলেন না। চাকরী ছেড়ে কত বড় বিপদকে মাথায় নিয়েছেন তা জানি।—কিন্তু ভালই করেছেন তাতে আপনার উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়েই গেছে। এ চিঠি আমি আপনাকে দিচ্ছি অন্য কারণে।

কর্তব্যের দায়ে যেটুকু অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যেই আপনাকে নিমন্ত্রণ করলাম। আমার গাড়ী যাবে, ছেলেকে নিয়ে নিশ্চয় আসবেন। নিঃসঙ্কোচে আসবেন—ইতি শঙ্করপ্রসাদ রায়

রাত্রে খোকাকে খাইতে দিল অর্চনা নিজে কিছুই খাইল না। খোকাকে লইয়া শুইয়া পড়িল। খোকা বকিয়া বকিয়া এক সময় ঘুমাইয়া গেল কিন্তু অর্চনার চোখে ঘুম নাই। আকাশ পাতাল চিন্তা আসিয়া তাহার নিদ্রার বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিল। অরুণা দু দিন আসে নাই হয়ত তাহার নূতন সংসার, স্বামী লইয়া বিব্রত, আসিবার সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই।

কিন্তু অকস্মাৎ মনে পড়িল সে দিন অরুণা তাহার উপর বিরূপ মনোভাব লইয়া যায় নাই তো! দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে যে নিষ্ঠুরের এতটুকু মমতা নিজের পুত্রের জন্যেও জাগিল না, দিনান্তে একবার তাহার নাম লইলেই সমস্ত আত্মীয়তা দেখান হইবে ? স্বেচ্ছায় যে তীক্ষ্ণ এতগুলি প্রাণীকে দুঃখ দিল; তাহার জন্য দুঃখ পাইবার মন সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।—ইহাতে তাহার অপরাধ কোথায় ?

ঘরে আলো জ্বালাইয়া অর্চনা ধড়মড় করিয়া কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া চক্ চক্ করিয়া অনেকখানি পান করিল। ঘুমন্ত খোকার একান্ত নির্ভর অসহায় মুখখানির দিকে চাহিয়া একটা গভীর নিঃশ্বাস বুক চিরিয়া বাহিরে আসিল। খোকাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মন দৃঢ়প্রত্যয়ে শুধু এই কথাই আবৃত্তি করিতে লাগিল,—খোকাকে মানুষ করিতে যত বড় যত বিপদই আসুক না কেন তাহার জন্য সে প্রস্তুত।

চিন্তায় কূল পাইয়া এক সময় অর্চনা শেষরাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন কিছু বেলা হইয়াছে।

আরও একটু পরে বাহিরে রাস্তায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। শঙ্করপ্রসাদের গাড়ী তাহা অর্চনা অনুমান করিয়া লইল। কোচম্যান হাঁকিল মাইজী, গাড়ী আয়া—

খোকা ছুটিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। বলিল 'যাবে না মা ?'

মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া অর্চনা উঠিয়া ঘরে গিয়া মনস্থির করিয়া ফেলিল। বাক্স হইতে জামা কাপড় বাহির করিল। বেশ পরিবর্তন করিয়া দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাথাটা ঠিক করিয়া লইল। এক সময় নিজের মুখখানার দিকে চাহিয়া মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিল। বাহিরে আসিয়া খোকার হাত ধরিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল; গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বৃহৎ অট্টালিকার গেট পার হইয়া গাড়ীবারান্দায় গাড়ী থামিতেই বর্ষীয়সী এক মহিলা আসিয়া অর্চনার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন। আদর করিয়া খোকাকে কাছে টানিয়া বলিলেন 'তোমরা উপরে চল মা! আমি যাচ্ছি'।

অর্চনা বলিল 'আপনি কে ?'

'আমি শঙ্করের মা'।

অর্চনা হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

মহিলা কহিলেন তোমার কথা আমি শঙ্করের মুখে

সবই শুনেছি। এই কাঁচা বয়সে স্বামী হারা হয়ে জীবন কাটানো—পদে পদে ভয়, প্রাণ হাতিয়ে চলা বড় শক্ত। তার মন গলিয়েছ—তোমার ভালই হবে।

বো-ভাতার হলঘর পরিপাটি সাজানো। তাহারই একখানি কোচের উপর অর্চ্চনা বসিল।

হাসিয়া শঙ্কর বলিল—এখন আমি আপনার মতই সাধারণ মানুষ, পদমর্য্যাদার পর্দ্দাটা সামনে হতে সরে গেছে। সুতরাং কথা বলবার কুণ্ঠা আসবার কোনই কারণ নাই আপনার।

অর্চ্চনা নমস্কার করিল। বলিল 'আপনার ছেলে মেয়ে কাউকে দেখছি না?

শঙ্কর হাসিয়া ফেলিল। বলিল বিয়েই হয়নি, তা ছেলেমেয়ে। ছেলে বলতে আমি মেয়ে বলতেও আমি। যেন ভাগ্য করে এসেছি, কনে জুটছে না।

শঙ্করের প্রাণখোলা অকপট হাসিতে তাহার অন্তরের স্বচ্ছলতাটুকু যেন এক মুহূর্ত্তে প্রতিভাত হইয়া উঠিল।

অর্চ্চনা সে হাসিতে যোগ না দিয়া পারিল না। বলিল 'তা আপনার কি বিশ্বাস, কনে ধর্ম্মঘটের পাতা বলে আমাকে চিনতে পেরে ধরে এনেছেন?'

শঙ্করপ্রসাদ হাসিয়া ফেলিল বলিল 'আর কথা বাড়াবেন না তাতে একে একে আমার অপদার্থতারই প্রমাণ বেড়ে যাবে। শুনুন, এখন কি করবেন ঠিক করলেন'?

'কিছুই না'।

'চলবে কি করে'?

'চলবে না।'

'তখন'?

ছেলে মুখাগ্নি করবে—ঘাট খরচাটুকু পাঁচ জনে দেবে।

কি এর জন্যে খাবারের রেকাবী সাজাইয়া মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। শেষ কথাগুলি বোধহয় কানে গিয়াছিল প্রশ্ন করিলেন কার কি হল রে?

শঙ্করপ্রসাদ শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল জানো মা, স্কুলের কাজটুকু গেছে সেই রাগে বাড়ী বয়ে ঝগড়া করতে এসেছেন।

মা হাসিলেন। বলিলেন তা নয়, সে মেয়ে এ নয়। আমি একবেলাতেই একে চিনেছি।

শঙ্করপ্রসাদ এক মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইল। বলিল এতো এক ভারি মুস্কিলের কথা মা। নারী দেশে মানুষ হাজারে হাজারে উঠ্‌ছে পড়ছে বেকার হচ্ছে সবারই দিকে কি তাকিয়ে বসে থাকতে হবে?

মা মৃদু ধমক দিলেন। তোকে উল্টো কথার যাজে বকতে হবে না!

'হবে যা হয় তুমিই কর মা—বলিয়া শঙ্করপ্রসাদ আবারে মন দিল।

মা কহিলেন—তোকে ভাবতে হবে না। পরম আদরে এই দুই মাতা পুত্রকে খাওয়াইতে লাগিলেন।

আহারান্তে কি একটা কাজে শঙ্করপ্রসাদ বাহিরে গেল। এক পাইয়া মা বলিলেন 'ওর কোন কথায় রাগ বা দুঃখ করোনা মা। ওর স্বভাবই ওই রকম একেবারে ছেলেমানুষ। ওর বাবার হাতে গড়া ইস্কুলের ও সেক্রেটারী। ইস্কুল আর সভা সমিতি এই সব নিয়ে আছে। পাঁচ জনে লেগে তোমার নামে নালিশ করে চাকরীটা ছাড়ালে এই আঘাতটা ওকে বড্ড লেগেছে। আমাকে শঙ্করী সব বলেছে, তাই তো তোমার যদি একটু উপকার করতে পারে সেই ইচ্ছা।—তা মা ভেবোনা; তুমি আমার মেয়ে, আজ হতে এ বাড়ীর তুমিও একজন।

অর্চ্চনা নত হইয়া প্রণাম করিল। যখন মাথা তুলিল তখনো তাহার দুই গণ্ডে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

বিকালের দিকে গাড়ী করিয়া অর্চ্চনা খোকাকে লইয়া যখন বাসায় ফিরিল; তাহাকে আর চেনা যায় না। খোকার নূতন পোষাক, অর্চ্চনার পরিধানে নূতন মূল্যবান শাড়ী। গাড়ী হইতে নামিয়া আসিতেই অরুণার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

অরুণা বলিল 'বাব্বা! কখন থেকে বসে আছি—তা—এমন সাজ পোষাক ক'রে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

অর্চ্চনা বলিল সব কথা কি বলতে আছে?

অরুণা বলিল, 'তা নাই বললে—কিন্তু অমন কাজটা হো হেজ ক'রে ছাড়লে, আর কিছু যোগাড় হল?

হাসিয়া অর্চ্চনা কহিল তা না হলে এমন সাজ পোষাক করে মা বেটায় বেড়াতে পারতাম?

'কি হল?

সেক্রেটারীর ইস্কুল থেকে এবার বাড়ীতে ; একেবারে সেক্রেটারীর সেক্রেটারী, বুঝলি ?

অরুণা কিছুই না বুঝিয়া অবাক হইয়া চাহিল।

অমন করে তাকাচ্ছিস কি, সত্যি। আমার চাকরীটা ছাড়িয়ে সেক্রেটারীর মনে বোধহয় ইচ্ছা হয়েছিল তাই বাড়ী নিয়ে গিয়ে মায়ের সাহায্যে কিছু উপকার করতে চান। এই দেখ শাড়ী, খোকার জামা প্যান্ট ; এমন কি ও বাড়ীর পাঁচ জনের একজন করে নিয়েছেন এঁরা আমাকে।

অরুণার মনে পুলকের আভাস জাগিল। বলিল 'সত্যি ?—তা হবে। বড় বাড়ীর গিন্নী নাকি বড় ভাল—সুখ্যাতি আছে শুনতে পাই।

অর্চ্চনা হাসিয়া বলিল সুখ্যাতি আছে কি অখ্যাতি আছে তা জানিনা, তবে আমার মত অনাত্মীয়কে স্নেহ করে সাহস দিয়েছেন এই টুকুই আমার ঢের। এ জগতে আপনার লোকও ফেলে পালায়, আবার পরও আপনার হয়। কে আপন আর কে পর চেনা মুস্কিল।

কথাটায় বোধহয় অরুণা ব্যথা পাইল। মুখখানি কিছু ভারী করিয়া তখনকার মত বিদায় লইল।

কিছু পরেই শঙ্করপ্রসাদের ভারী গাড়ীখানা দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহির হইতে সাড়া আসিল আসতে পারি ?

অর্চ্চনা নিজেকে সংযত করিয়া অভ্যর্থনা করিল, আসুন, কিন্তু গরীবের ঘরে কোথায় বসাবো ?

শঙ্করপ্রসাদ হাসিয়া কহিল বসাতে হবে না ; মায়ের ফরমাস নিয়ে বাজার করতে বেরিয়েছি আপনাকেও যেতে হবে, সময় আছে ?

'কি কিনবেন ?

মায়ের ব্রতের কিছু কিছু জিনিষ পত্র।

অর্চ্চনা বলিল খোকা ইস্কুল থেকে ফেরে নাই—তাছাড়া কেনাকাটার আমি কি জানি ? আমাকে নিয়ে গেলে কি জিনিষ পত্তরের দাম কম পাবেন মনে করেন ?

'তা পাওয়া যেতেও পারে। মিষ্টিমুখের দাম তো আছেই !

'তাহলে আপনার সেই টুকুই বড় কথা, মাকে কেন এর মধ্যে জড়াচ্ছেন !

মা যে আপনাকে সঙ্গে নিতে বলেছেন। আপনার উপর তাঁর যে অগাধ বিশ্বাস কিনা।

প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে না পারিয়া অর্চ্চনা হাসিয়া ফেলিল। বলিল আচ্ছা চলুন—কিন্তু ছেলে যে এখনও ফিরল না ?

তাকে ইস্কুল হতে গাড়ীতে তুলে নেবো।'

বাড়ী বন্ধ করিয়া দুজনে গাড়ীতে গিয়া বসিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এক সময় অর্চ্চনা বলিল, এরকমটা কিন্তু ঠিক হচ্ছেনা শঙ্করবাবু।

'কি ?'

'সহরের ভিতর দিয়ে এই রকম বসে যাওয়া ; বিশেষ, চেনা কেউ দেখলে কি ভাববে ?

শঙ্করপ্রসাদ বলিল, এত ভয় যদি—এলেন কেন ?

অর্চ্চনা মুখ নামাইল। বলিল মানুষ মানুষ। মতিভ্রম বলে একটা কথা আছে ?

শঙ্করপ্রসাদ বলিল 'আছে।' কিন্তু তাকেই বা ভয় কি—আমার মা আপনাকে অভয় দিয়েছেন না ?

একটি বড় দোকানের সম্মুখে আসিয়া শঙ্করপ্রসাদ অর্চ্চনার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিল। অর্চ্চনা চিত্রার্পিতের মত ঝুমেলারী দোকানের সাজান কেসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

অনেক পছন্দমত এক ছড়া নেকলেশ কেনা হইল। শঙ্করপ্রসাদ তাহা অর্চ্চনার গলায় পড়াইয়া দিয়া দাম মিটাইয়া দোকান হইতে বাহির হইল।

অর্চ্চনা বড় বড় দুটি চক্ষু প্রসারিত করিয়া বলিল 'মায়ের ব্রতে হার'ও লাগবে নাকি ?

'না।'

তবে হার কিনবার খেয়াল হল যে বড় ? অর্চ্চনা হার খুলিতে হাত বাড়াইল।

শঙ্কর বলিল, থাক্ থাক্, খুলতে হবেনা। যে যেখানে মানায় তার স্থান সেখানেই। যাকে বন্ধু বলেছি, এতো দান নয় ; এ আমার খেদারত।

অর্চ্চনা প্রতিবাদের সময় পাইল না। সম্মুখেই স্কুল। গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়া এক সময়ে খোকার হাত ধরিয়া শঙ্কর গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

আংশিকীয় কেনাকাটা শেষ করিয়া গাড়ী ফিরিল বাড়ীর দিকে। শঙ্করপ্রসাদ খোকার সঙ্গে অনর্গল কথা কহিয়া চলিয়াছে—আর অর্চনা তাহারই পাশে একা যেন নিজের অন্তরের অন্তস্তলে ডুবিয়া গিয়াছে। জীবনে নারীর যাহা কাম্য, তাহার জীবনে কোন দিন সে সাধ মিটে নাই। শাড়ী গহনা বিলাস বাসনা প্রথম যৌবনের কামনা তাহাকে চকিতই করিয়াছে স্বামী শুধু ভালবাসা দিয়াও তাহাকে ধরিয়া রাখিল না এতবড় বঞ্চনা প্রতি মুহূর্তে সে অনুভব করে। আর, আজ শাড়ী, গহনা, ভালবাসা এই যে প্রচুর আকর্ষণ তাহাকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিতেছে ইহার সহজ সাবলীল অন্তরালে তাহার নারী-মন যদি কোনদিন নিজেকে হারাইয়া ফেলে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবার মত আজ তাহার শক্তি কোথায়। অর্চনা গাড়ীর জানালায় মাথা রাখিয়া চোখ বন্ধ করিল; মনকে ঘুম পাড়াইতে চাহিল।

এক সময় মাথা তুলিয়া অর্চনা গাড়ীর বাহিরে দূর মাঠের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ভিতরের অপর প্রান্তে দুটি তখনও বকিয়া চলিয়াছে। তাহারই দু-একটা টুকরা কথা মাঝে মাঝে কানে আসিতে লাগিল। আজ যেন তাহাকে কিসে পাইয়া বসিয়াছে এমনি আত্মহারা হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াই রহিল।

ভিতরে তখন শঙ্করপ্রসাদ খোকাকে বলিতেছে ইস্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে যাবে; তারও পরে বাইরে বিদেশে যেখানে তোমার মন চায়—

গাড়ীর ভিতর অর্চনা সহসা আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

পথপ্রান্তে ধূলির উপর হাতে মাথা রাখিয়া কে যেন চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। দীর্ঘ, রুক্ষ, মলিন বেশ—তবু যেন চেনা চেনা।

স্তম্ভিত বদনাকল চালিতে চালিতে গাড়ী হইতে নামিয়া অর্চনা সেইস্থানে গিয়া দাঁড়াইল।

দীর্ঘ অদর্শনের মধ্যকালে যাহার নামটুকুও সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না; আজ তাহারই নিকটে অবশ হরিণীর মত আত্মসম্বিত হারাইয়া ফেলিল।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অদর্শন তাহার দৃষ্টিকে কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারিল না।

অবশেষে কাঁদিয়া-কাটিয়া লোক জড় করিয়া সকলের সাহায্যে গাড়ীতে উঠাইয়া অচেতন সোমনাথকে বাড়ী আনিয়া অক্লান্ত পরিচর্যায় সুস্থ করিয়া তুলিল।

এক সময় নিরালায় কাছে আসিয়া বলিল ভাল আছ?

আর কি করব বল!

আর কি করতে চাও! যাকে খুঁজে এত পরিশ্রম করলে, সে তো আমি নাও হতে পারি।

নাইবা হলে—কিন্তু কাকে খুঁজে কাকে ধরে এনেছি তুমি কি করে জানলে? যাকে হোক একজনকে তো ধরেছি, তাহলেই হল।

সোমনাথ বলিল তাহ'লেই খুশী তো?

অর্চনা ভ্রূ-ভঙ্গি করিয়া বলিল, 'হ্যাঁ খুশী'। কিন্তু তাহলে তুমি সহ্য করতে পারবে তো?

সোমনাথ কহিল হ্যাঁ পারব—এই আমি চোখ বুজলাম।

অর্চনা হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার ছোট বুকের ভিতরটিতে আজ কি যে এক আলোড়ন জাগিয়াছে। অবশেষে দুটি আয়ত চক্ষু মেলিয়া বলিল আবার ঝগড়া করতে বলছে?

সোমনাথ মৃদু হাসিল। কহিল, না ঝগড়া করিনি, রোদে জলে অনাহারে অনিদ্রায় নূতন মানুষ হয়ে গেছি—

অর্চনা বলিল কিন্তু আমার ভাল-মন্দ কোন খবর জানতে চাওনা তুমি?

সোমনাথ বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বলিল নিজেকে হারিয়েছিলাম, সব কিছুই হারিয়ে ছিলাম। আবার যে কোনদিন তোমাদের ফিরে পাব ভাবি নাই; আচম্বিতে কুড়িয়ে পেয়েছি। সোমনাথের দুই চক্ষে অশ্রু চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল। বলিল 'পথে যাদের ফেলে রেখে গিয়েছিলাম তাদের পথের ইতিহাস জানবার কৌতূহল দেখাবো সে অধিকার আর আমার নেই।

অর্চনা স্বামীর কোলে মুখ লুকাইল। বলিল—'সে অধিকার তোমার আছে, হারায়নি। কৈফিয়ৎ যদি কোন দিন চাও অকপটে তার কৈফিয়ৎ দেবো। তোমার উপর অভিমান করেছিলাম। মাথার ঘোমটা খুলে দিয়ে বাঁচার জন্য চেষ্টা করেছি। যাদের কাছে অনাদর পেয়েছি সেই অসম্মানেও লজ্জা পাইনি; যাদের কাছে স্নেহ ভাল-

বাসা পেয়েছি সে ভালবাসারও অমর্য্যাদা করিনি। আর কিছু জানতে চাও ?

সোমনাথ মৃদু হাসিয়া কহিল না।

অর্চ্চনা বলিল—'না !' 'না কেন' ?

সোমনাথ বলিল 'না'ই ভাল। এই না কথা দিয়েই আত্ম-সমর্পণ করছি। একবার বেকার হয়ে পালিয়েছিলাম—এবার নির্ব্বিকার হচ্ছি; কিন্তু চলবে কি করে।

অর্চ্চনা কহিল 'রক্ষে কর—এই আবার ভাবতে বসলে! চলার প্রতিকার করবার উপায় তো তোমার জানা আছে,—

সোমনাথ কহিল কি রকম ?

অর্চ্চনা হাসিয়া বলিল 'পালিয়ে গিয়ে'—

না সে আর করবার মত সাহস নেই—তবু একটা কিছু করতে হবে না কি ?

অর্চ্চনা কহিল হবে,—নিশ্চয় হবে, সে সময় অনেক পাবে,—তাহ'লে তো বাঁচি'।

সোমনাথ প্রসারিত চক্ষে অর্চ্চনার দিকে চাহিল। একসময় কহিল, খুব যে চিন্তার কারণ নাই তা তোমাকে দেখলে মনে বল পাচ্ছি :

'কি দেখলে' ? বলিয়া অর্চ্চনা একটু হাসিল।

সোমনাথ কহিল—কোনদিন একটা পিতলের আংটি দিয়েও কর্ত্তব্য করতে পারিনি'—

সহসা অর্চ্চনা সোজা হইয়া বসিল। বলিল এই হারটার দিকে নজর পড়েছে তো ? কেমন হয়েছে ?

সোমনাথ কহিল 'ভাল'। বেশ মানিয়েছে তোমায়। কবে গড়ালে ?

অর্চ্চনা হাসিল—'গড়াইনি ;—প্রিয়জনে দান করেছেন।

সোমনাথ সবিস্ময়ে বলিল—এর যে অনেক দাম বলেই মনে হচ্ছে অরু! তখন যিনি এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন, তিনিই বুঝি ?

অর্চ্চনা বলিল হ্যাঁ—ওঁরই স্কুলে চাকরী পেয়েছিলাম চাকরী গেলে ওঁরাই কৃপা করে আপনজন করে নিয়েছেন, নইলে এতদিন কি যে হত,—তুমি আর দেখতে পেতে না।

সোমনাথ সহসা গম্ভীর হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল।

অর্চ্চনা একবারে একান্ত সন্নিকটে আসিয়া বসিল বলিল 'কি ভাবছ বল না ? মুখ গম্ভীর করলে কেন, মুখভার করো না বাপু—আমি তোমাকে পেয়েছি. খুশী হয়েছি ;—এবার তুমি আমাকে বল আমি কি করলে তুমি সুখী হবে। অর্চ্চনা স্বামীকে দুটি বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিল।

বাহিরে সম্মিলিত কণ্ঠের সাড়া উঠিল।

অর্চ্চনা কহিল, নাইবা বল্লে, তোমার মনের কথা আমি শুনতে পাচ্ছি, আর বলতে হবে না।

সোমনাথ সবিস্ময়ে কহিল 'শুনতে পাচ্ছ ? কি শুনতে পাচ্ছ ?'

মৃদু স্বরে অর্চ্চনা কহিল 'তোমার আর আমার মধ্যে বাইরের কোন ব্যবধান না থাকলে তুমি নিশ্চিন্ত হবে ? এই তো ? তোমার বোন আর বোনাইকে আসতে বলেছি ওরা আসছে। করুণাকে বিয়ের সময় কিছু দিতে পারিনি ; এই হারগাছাটা গলায় আমার খোঁচা লাগে, এটা ওকে আজ দিয়ে দেবো। এক বছর প্রায়, ভাল কাপড় আমি তো পরিনে ওর জন্যেই রেখেছি ;—অর্চ্চনার মুখে চোখে হাসির আলো ঝলমল করিয়া উঠিল—

অর্চ্চনা বলিল ওরা এসে পড়েছে, আমার কাজ কত ; বলতে সময় পাব না, বলে রাখছি শোন—

যা হোক্, যেমন হোক, একটা কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা তোমার হবেই, তাই থেকে খোকাকে আমরা মানুষ করব। মোটা ভাত আর মোটা কাপড় এ আমাদের যেমন করেই হোক্ ভগবান জুটিয়ে দেবেন। বাইরে থেকে তুমি যা পারবে আনবে,—ঘরে বসে কিছু আয় করবার ক্ষমতা আমারও আছে। তুমি আদর করে আমাকে যেটুকু দেবে সেই হবে আমার সম্পদ ; আমার গৌরব। আমার তৃপ্তি তুমি—তোমার তৃপ্তি আমি—বুঝলে এবার ? বলিতে বলিতে অর্চ্চনা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মুহূর্ত্তে, সম্মিলিত কলকণ্ঠে সমস্ত ঘর মুখর হইয়া উঠিল। অর্চ্চনার অসমাপ্ত কথা তাহার মধ্যে ডুবিয়া গেল।

উঠিয়াছে পূর্ণচন্দ্র গগন-প্রাঙ্গণে

অনুবাদক—ভূমানন্দ, শ্রীঅরবিন্দাশ্রম

(মাথিয়াস ক্লাউডিয়ুস রচিত মূল জর্মন কবিতার বঙ্গানুবাদ)

১

উঠিয়াছে পূর্ণ চন্দ্র গগন-প্রাঙ্গণে
স্বর্ণ তারকাচয় করে ঝিকিমিকি
নিষ্পন্দ উজ্জ্বল ওই আকাশের গায় ;
নিম্নেতে দাঁড়ায়ে আছে কৃষ্ণ বনরাজি,
প্রান্তর হইতে উঠে ক্রমে ঊর্ধ্বপানে
শুভ্র কুয়াশার জাল আশ্চর্য্য সুন্দর।

২

কেমন নীরব এই সমস্ত পৃথিবী
গোধূলির অন্ধকারে সমাবৃতপ্রায়
সুপ্তির মাধুর্য্যময়ী কিবা মনোরমা।
একটি নিরালা ক্ষুদ্র কক্ষের সদৃশ,
দিবসের পরিশ্রান্তি তোমরা সেথায়
যাইবে ভুলিয়া লভি' সুপ্তি সুগভীর।

৩

পাও তো দেখিতে হোথা চন্দ্রের মণ্ডল ?
আধখানা মাত্র তার দৃষ্টির গোচর,
তথাপি নিশ্চয় উহা সুগোল সুন্দর !
অনেক জিনিষ তবে আছে ওরকম,
উপহাস করি মোরা সুদূর প্রত্যয়ে,
যেহেতু মোদের আঁখি দেখেনা সকল।

৪

আমরা গর্বিত যত মানব সন্তান
অলস দরিদ্র আর কত পাপে রত,
জ্ঞানের বহর অতি অল্প আমাদের ;
বুনি মোরা কল্পনার আকাশ-কুসুম,
খুঁজিয়া বেড়াই মোরা বিবিধ কৌশল,
দূরে মোরা আসি সরে লক্ষ্যস্থল হতে।

৫

তোমার মঙ্গল হস্ত দেখাইও প্রভো !
নশ্বর বস্তুতে যেন করিনা বিশ্বাস,
উল্লসিত নাহি হই যেন গর্ব বশে ;
আমরা হইতে চাই নিত্য অকপট,
পৃথিবীর বক্ষ 'পরে শুধু তোমা তরে
নিষ্পাপ শিশুর মত সদানন্দময়।

৬

অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ হও অবনত
প্রভুর নামের পুণ্য পতাকার তলে।
সন্ধ্যার শীতল বায়ু বহিতেছে বেগে।
ভগবান ! শান্তি হতে দাও অব্যাহতি,
শান্তির সহিত যেন সেবি নিদ্রাসুখ
রুগ্ন প্রতিবেশী হোক সুখী সেই সুখে।

দক্ষিণের জ্যাং

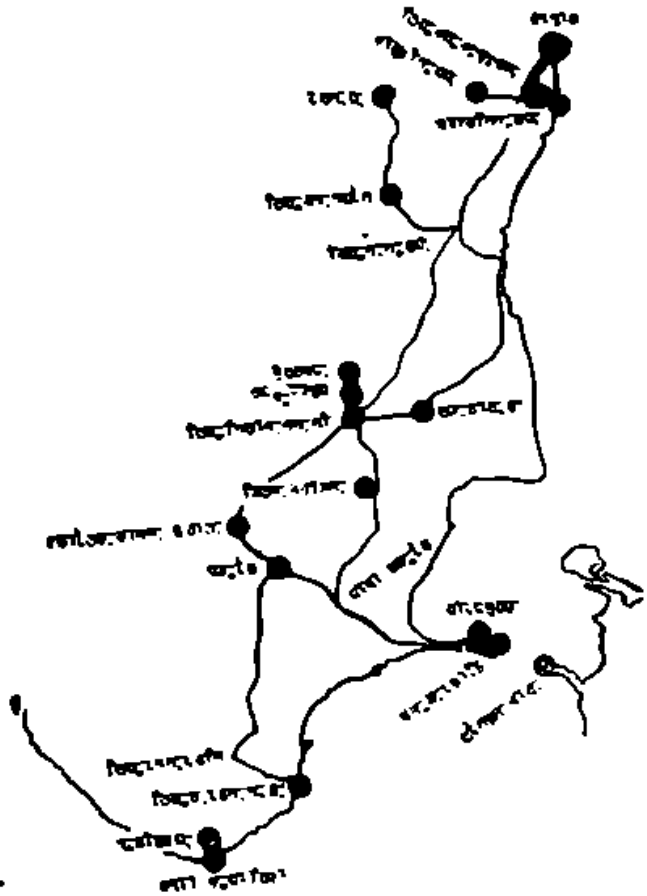

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৭

আপনাদের কলকাতার কালীঘাটে এখনো নরবলি হয় ?

প্রশ্নটা শুনে আমার চক্ষু স্থির !

তিরুবরণ্‌পামলৈ থেকে বেল্লুর্-এর পথে ছুটে চলেছে তিরুপতি এক্সপ্রেস্। আমাকে নিয়ে কামরাটায় মোট তিনটি যাত্রী। অল্পবয়সী চেকার ভদ্রলোক আমায় উত্তরভারতের আগন্তুক দেখে কৌতূহলী হয়ে বসে পড়েছিলেন। হাতে কাজ না থাকায় গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন।

কথায় কথায় হঠাৎ ওই অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলেন।

তাঁকে আমার সাধ্যমত বোঝালাম যে, তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ অলীক।

তিনি বললেন, বৃটিশরা যখন কলকাতায় আসে তখন ঐ রকম বলি চলতো বলে কোন ইংরেজের লেখায় তিনি নাকি পড়েছিলেন।

: আপনি তো কলকাতারই লোক ?—পরের প্রশ্ন।

বললাম : হ্যাঁ।

তিনি তাঁর ধারণা প্রকাশ করলেন : তাহলে তো আপনি মারওআরী।

ভদ্রলোকের এরূপ ধারণার কারণ আছে। কারণ এই যে, কলকাতা থেকে যাঁরা হামেশাই দক্ষিণ ভারতে যাতায়াত করেন তাঁদের মধ্যে মারওআরীরাই সর্বাধিক। ব্যবসার কাজে সারা বছরই এঁদের এতদঞ্চলে গতিবিধি দেখে দেখে চেকার্ বেচারী সিদ্ধান্ত করে বসেছেন যে, কলকাতা আগত এবং ধুতি পরা হলেই মারওআরী।

এ ধারণা তো তবু ভাল। মাদ্রাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকের ধারণায় কলকাতা মারওআরীদের দেশ !

কলকাতার অনেকেই যেমন দাক্ষিণাত্যের মানুষ মাত্রকেই মাদ্রাজী ভাবেন সেই রকম।

প্রকৃতপক্ষে সেখানে তমিল্, তেলেগু, কন্নটর্, তুলুবর্, কোঙকণর্, কুর্গী ইত্যাদি কত গোষ্ঠীর মানুষই তো আছে।

রাত সওয়া দশটায় গাড়ী পৌঁছলো উদ্দিষ্ট স্টেশন-এ।

উত্তর আর্কাট্ মাদ্রাজ প্রদেশের একটি জেলা।

আর্কাট্ নামটি অতি প্রাচীন। সংস্কৃত সাহিত্যে যার উল্লেখ পাওয়া যায় 'বড়ারণ্য' নামে, সেই বড়ারণ্যই তমিল্ ভাষায় আর্কাট্। তমিল্‌র আরু বা আর্ শব্দের অর্থ ষট্ এবং কাট্ (কাট) অর্থে অরণ্য।

উক্ত জেলার যে স্থানটি দেখতে এলাম তার ইংরেজী নামকরণ হয়েছিল—Vellore। সঠিক তমিল্‌র নামটি বেল্লুর্। ব'টি অন্তঃস্থ হওয়ায় উচ্চারিত হয়—ওএলুর্।

স্থানীয় লোকেরা এখনও স্থানটিকে বলেন—রায় ওরমূর। তাতে এলূর (অর্থের গোদাবরী জেলার একটি শহর) বলে ভ্রমাত্মক না ঘটে।

বেলূর নামটির উৎপত্তি হয়েছে বেরলপট্টি হতে। তামিল ভাষায় বেরল্ কথাটির অর্থ বাবলা গাছ। পট্টির অর্থ বসতি।

বেলূর শহরের উপকণ্ঠে ঐ নামের একটি স্থান এখনও বর্তমান।

বেরলূর শব্দের অর্থ বাবলা গাছের গ্রাম।

রায় বেরলূর নামটির রায় শব্দটি বিজয় নগরের রায় রাজগণের অধিকারভুক্তির কথা স্মরণ করাচ্ছে।

স্থানটির দ্রষ্টব্য,—দুর্গ এবং জলকান্তীশ্বর দেবালয়।

দুর্গটি ইংরেজদের ভারতে আগমনের কিছুপূর্বে এক

বেরলূর দুর্গ

ইটালিয়ান স্থপতি নির্মাণ করেছিলেন বলে অনেকের ধারণা।

কিন্তু তা ঠিক নয়। কোনও ইটালিয়ান স্থপতির ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণের বহুপূর্বে বোম্মি বেড্ডি (নাদুড়) নামে তন্ত্রাচলম্ নিবাসী এক ব্যক্তি মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বোম্মি তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের অত্যাচারে তন্ত্রাচলম্ ত্যাগ করে বেরলূরটিতে আসেন এবং চোল রাজের অনুমতি নিয়ে বাস করতে থাকেন। তখন এ অঞ্চল ছিল চোল রাজগণের অধীন।

বোম্মির আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যময়ী এক গাভী ছিল। তার স্তন বৃত্ত ছিল পাঁচটি।

একদিন বোম্মি দেখতে পেলেন যে, গাভীটি শুকনো এক পুকুরের মাঝে একটি বল্মীক স্তূপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো এবং সেই স্তূপ হতে পঞ্চ-শির এক সরীসৃপ বেরিয়ে এসে গাভীটির স্তন্য পান করতে লাগলো।

সেই রাতেই বোম্মি স্বপ্নে জানতে পারলেন যে, ঐ সরীসৃপ ছত্রধরী শঙ্করদেব, মহাদেব।

মহাদেব বোম্মিকে প্রচুর ধনরত্ন ও একটি লিঙ্গ মূর্তির সন্ধান দিলেন।

ধনরত্ন পেয়ে বোম্মি মূর্তিটির জন্য মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করলেন। ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ আরম্ভ এবং ন' বছরে সমাপ্তি হলো।

বিগ্রহের নামকরণ হলো—জলকান্তীশ্বর।

জলকান্তীশ্বরের দ্বারপাল—বেলূর

মন্দিরটির নির্মাণে প্রধান স্থপতি ছিলেন বদরিকাশ্রমের এক অধিবাসী। তাঁর কিশোর পুত্র তাঁকে খুঁজতে এসে বলে যে, অসমাপ্তাবস্থায় নির্মাণ আরম্ভ হওয়ায় মন্দিরটির অস্তিত্ব থাকবেনা।

বোম্মি ঐ কথা শুনে মন্দিরটিকে সুরক্ষিত করবার জন্য মন্দিরকে ঘিরে এক দুর্গ রচনা শুরু করলেন।

দুর্গ নির্মাণ শেষ হতেই তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, মন্দির সমেত দুর্গটি দেবকীন্ কোটটৈ-এর বিজয়নগররাজ-বংশীয় বেঙ্কটদেব মহারায়লুর হাতে সমর্পণ করতে হবে।

তদনুসারে ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে বোম্মি বেঙ্কটেশ্বর মন্দির সহ দুর্গটি বেঙ্কটদেব মহারায়লুর হাতে সমর্পণ করলেন।

তখন হতে স্থানটিতে রায়বংশের প্রভুত্ব স্থাপিত হলো এবং নামকরণ হলো—রায়বেলুর্।

বেঙ্কটদেব মহারায়লুর সময় হতে প্রায় তিনশ' বছর ধরে ঐ বংশের রাজারা বেলুর-এ আধিপত্য করেন :

বেঙ্কটদেব মহারায়লু	১২৯৫	১৩২৫ খৃঃ অঃ
কৃষ্ণদেব „	১৩২৫	—১৩৫৫ „ „
বাসুদেব „	১৩৫৫	—১৩৮৪ „ „
অশ্বদেব „	১৩৮৪	—১৪০০ „ „
বেঙ্কটদেব (২য়) „	১৪০০	—১৪২৮ „ „
বাসুদেব (২য়) „	১৪২৮	—১৪৪৬ „ „
কৃষ্ণদেব (২য়) „	১৪৪৬	—১৪৬০ „ „
অশ্বদেব (২য়) „	১৪৬০	—১৪৮৮ „ „
প্রহদেব „	১৪৮৮	—১৫২৬ „ „
বাসুদেব (৩য়) „	১৫২৬	—১৫৪৭ „ „
বেঙ্কটদেব (৩য়) „	১৫৪৭	—১৮৮৬ „ „

শেষ রাজা তাঁর জামাতা কৃষ্ণদেবকে হত্যা করবার জন্য এক রক্ষক ও তার সহকারীকে নিয়োগ করেন। রক্ষক শিশুটিকে হত্যা না করে গোপনে পালন করতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব সিংহাসন অধিকার করেন।

তিনি তাঁর পালক ও তার সহকারীকে দুটি দুর্গ প্রদান করেছিলেন। বেলুর্ হতে কিছু দূরে আজও ঐ দুর্গ দুটির অস্তিত্ব আছে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি বেলুর্ বিজাপুরের সুলতানের কবলিত হয়।

বেলুর্-এর প্রথম মুসলমান শাসক,—খান খাঁ। দ্বিতীয় শাসক, মোহম্মদ খাঁ। মোহম্মদ খাঁর ছেলে আবদুল্লা খাঁ জলকান্তীশ্বর মন্দিরের এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করে এবং দেবতার পূজা বন্ধ করে দেয়।

কিছুকাল পরে মারাঠা শিবাজী রাও বেলুর্ অভিযান করেন।

পথে শেভ্বাক্কম্ গ্রামে তিনি এক বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখীন হন।

একটি পাথর হতে রক্তক্ষরণ হতে দেখে শিবাজী রাজা স্তম্ভিত হয়ে যান। রাতে স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, ঐ পাথরটি গণপতি।

গণেশ শিবাজীকে বেলুর্ অভিযানে সাফল্য অর্জনের জন্য সর্পযজ্ঞ করতে বললেন।

নৃত্যের ছন্দ (কল্যাণ মণ্ডপম্)—বেলুর্

শিবাজী শেভ্বাক্কম্-এ গণেশের একটি মন্দির নির্মাণ করে রক্তস্রাবী পাথরটির একটি বিগ্রহ স্থাপন করলেন। তারপর বেলুর্ সন্নিহিত পালর্ নদীতটে এসে একটি বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ ও সর্পযজ্ঞ করলেন।

সর্পযজ্ঞের ফলে বেলুর্ দুর্গে অসংখ্য সাপের আবির্ভাব ঘটলো। আবদুল্লা এবং তার সৈন্য-সামন্ত প্রাণ ভয়ে দুর্গ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলো। বিনা যুদ্ধে বেলুর্ শিবাজীর অধিকারে এলো।

জলকান্ঠীশ্বরের পূজার পুনঃপ্রচলন হলো।

অওরংজেবের সেনাপতি, জুল্‌ফিকার খান-এর আক্রমণে থকোজীর ছেলে দুর্গ ছেড়ে পালানোর ফলে আবার জলকান্ঠীশ্বরের পূজা বন্ধ হয়ে যায়।

একুশ বছর পরে মারাঠা শ্রীনিবাস রাও দুর্গটি দখল করেন।

তিন বছর পরে, ১৭০৮ সালে, দিল্লী হতে আসেন হাউস খাঁ। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দের বিতাড়িত করেন।

কল্যাণ মণ্ডপম্-এর অঙ্গসজ্জা।
(জলকান্ঠীশ্বর দেবালয়)—বেলুর্

তখন থেকে কুটিশদের অধিকারচ্যুতির পূর্বপর্যন্ত বেলুর্-এ স্থায়ী মুসলিম আধিপত্য চলে।

দুর্গটির প্রধান দ্রষ্টব্য জলকান্ঠীশ্বর মন্দির। আর মন্দির মধ্যে কল্যাণ মণ্ডপম্।

কারু শিল্পকলার নানা নিদর্শনে সমৃদ্ধ এই মণ্ডপটির সৌন্দর্যে বিদেশীরা, বিশেষ করে ইংরেজরা এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, কয়েক হাজার টন পাথরের মণ্ডপটিকে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী লণ্ডন-এ স্থানান্তরিত করতে মনস্থ করেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে পরিকল্পনা রূপায়িত হয়নি।

টিপু সুলতান কিছুদিন এই বেলুর্ দুর্গে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর নামে দুর্গের একটি মহল চিহ্নিত হয়েছে।

অধুনা বেলুর্ বা ইংরেজী বানানে ভেলোর (vellore) বলে পরিচিত এই নগরটির সারা ভারতে প্রসিদ্ধি ঘটেছে এখানের আমেরিকান মিশনারীদের পরিচালিত হাসপাতালটির সুচিকিৎসার জন্য।

বেলুর্ থেকে বিকেল চারটের ছাড়ে মাদ্রাজের বাস্। আমার ভ্রমণ-সূচীতে বাকী আর একটি জায়গা—কাঞ্চীপুরম্। তারপর স্বস্থানে প্রস্থান।

কাঞ্চীপুরম্ যাওয়া মাদ্রাজ থেকেই সুবিধাজনক। তাই তাড়াহুড়া করে ধরলাম বাস্‌টা।

শহর এলাকার বাইরে যেতেই চোখে পড়লো কতকগুলি কৃষ্ণচূড়ার গাছ। সবগুলিই কুসুমিত,—পড়ন্ত রোদে উজ্জ্বল।

ওরা মনে করিয়ে দিলো কলকাতার ময়দানের কথা।

অনেকদিন হলো বেরিয়েছি।

কতদিন কলকাতা ছাড়া! কলকাতায় থেকে কলকাতাকে অনেক অশ্রদ্ধা করি, সমালোচনা করি, অথচ, কেন জানিনা কলকাতার কথা মনে করে আর বেড়াতে ভাল লাগছিল না। গত দুদিন থেকে শুধু এক চিন্তা পেয়ে বসেছিল,—কবে আবার কলকাতার পথে হাঁটতে পাবো। অবসর সময়ের অলস মুহূর্তগুলো কাটাতে পারবো কলেজ ষ্ট্রীট-এর পুরণো বইয়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে,—কিংবা পার্কের বেঞ্চে বসে বসে।

দূরে না গেলে বোঝা যায় না কাকে সঠিক ভালবাসি, —কে আমায় ভালবাসে। কলকাতার জন্য আমার এ দুর্বলতার কথা তো আমি কলকাতায় জানতাম না!

চলন্ত বাস্-এর জানলার ধারে বসে ভাবছিলাম ওই সব আকাশ পাতাল।

ক্রমে সন্ধ্যা হলো।

ড্রাইভার বাস্-এর ভিতরের আলোকগুলো জেলে দিলেন। যাত্রীদের অধিকাংশেই মুক্তকর মাথায় ঠেকালেন।

রাত সাড়ে আটটায় আবার পা দিলাম মাদ্রাজের মাটিতে।

[ক্রমশঃ

নদীয়ার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি

অধ্যাপক শ্রীশিবনারায়ণ চক্রবর্তী

বিভক্ত ও সংকীর্ণ রাজ্য—পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ইহার অন্যতম কারণ এই যে পূর্বপাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এই জেলায় পাকিস্তানত্যাগী বহু উদ্বাস্তু পরিবার আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। নদীবহুল পূর্ববঙ্গের জলবায়ু ও মাটির সংগে ভাগীরথী, জলাঙ্গী, চূর্ণী, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতির পলিপড়া অঞ্চলে নদীয়ার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে, এজন্য এবং বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান হিসাবে ঐ দেশের অনেকের নদীয়ার প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। এই সকল বাস্তুহারা পরিবারের সুষ্ঠু জীবনযাত্রা, স্থায়ী বসবাস ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উপর নদীয়া তথা পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনবলের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষিকার্য পশুপালন ও বিভিন্ন বৃহৎশিল্প কুটিরশিল্প প্রভৃতি স্থাপনের প্রভূত সম্ভাবনা রহিয়াছে, যাহা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

ইতিহাসের আলোচনায় দেখা যায় পাঠান আমলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতিতে সর্বতোভাবে নদীয়া বাংলাদেশের পীঠস্থান ছিল এবং সেদিন নদীয়ার সংস্কৃতিই ছিল বাংলার সংস্কৃতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় নদীয়ার সেই সংস্কৃতি ও গৌরবের দিন এখন বিগত হইয়াছে; শিক্ষা, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ আজ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশ হইতে যথেষ্ট পিছাইয়া পড়িয়াছে, এই অবনতি ও পতনের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে বাংলার এই প্রান্তের নদীনালাগুলির অবস্থা। পূর্বভারতের প্রধান নদী গঙ্গা বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে আসিয়া এই নদীয়া, মুর্শিদাবাদেই বিভিন্ন ধারায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। গংগার সেই বিভিন্ন ও বহুমুখী স্রোত সেদিন বাংলা দেশকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইহার শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতিও বহুলাংশে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। নদীয়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি নামগুলি সম্ভবতঃ সেদিনের সেই নদী-সমৃদ্ধিরই বিশেষ পরিচায়ক এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সময়েও যে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ ভাগীরথী পথে সপ্তগ্রাম হইয়া নবদ্বীপ পর্যন্ত আসিত, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ নদীয়ার বর্তমান দুরবস্থা সুরু হইয়াছে এই সকল নদী নালা মজিয়া ও শুকাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। দেশের নদী খাল, বিল মজিয়া যাওয়ার ফলে সেখানকার কৃষি নির্ভর অর্থনীতি সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক বিপর্যস্ত হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক এবং সেই মজা নদীর দেশে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য মারী রোগ অতি সহজে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নাই এবং ইহার পরবর্তী ধাপেই সুরু হইয়াছিল স্বাস্থ্য জীবিকা প্রভৃতির দায়ে এখানকার ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ক্রমশঃ দেশত্যাগ।

তাই মনে হয়, নদীয়ার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় ইহার নদীনালার আশু সংস্কার সাধন। বর্তমানে নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতির পার্শ্বস্থ ভাগীরথীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, বৎসরের অধিকাংশ সময় মূল গংগার স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত থাকার দরুণ উহা অগভীর ও স্রোতোহীন স্বচ্ছ জলাশয় মাত্রে পরিণত হয়। ভাগীরথীর এই দুরবস্থার ফলে উহার শাখা নদীগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ভাগীরথীর ও উহার শাখানদীগুলির এইরূপ শোচনীয় অবস্থার জন্য নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের Water level অত্যন্ত নীচে নামিয়া গিয়াছে; ফলে এ অঞ্চলে

পুকুর, ইঁদারা প্রভৃতি যথেষ্ট গভীর না হইলে উহাতে বৎসরের বারোমাস জল থাকে না। বাতাস ও মাটির পর্যাপ্ত আর্দ্রতা রক্ষিত না হওয়ায় জমির সূক্ষ্ম ও মূল্যবান সার অংশ ক্রমশঃ বিভিন্ন পথে দূরীভূত ও নষ্ট হইয়া ভূমিক্ষয় বা Soilerosion ঘটাইতেছে এবং অন্তর্দিকে মাটি ও বাতাসের আর্দ্রতার অভাবে গ্রীষ্মশীত ও তাপ উভয়ের তীব্রতা অর্থাৎ extremity of climate ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

অতএব গঙ্গাবাঁধ কিংবা অন্য কোন উপায়ে এই অঞ্চলের নদীগুলিকে বৎসরের অন্ততঃ অধিকাংশ সময় সজীব ও চালু রাখিতে পারিলে দেশের কৃষিকার্য, ভূমিসম্পদ বনজসম্পদ স্বাস্থ্য বাসের বাণিজ্য প্রভৃতি বহুলাংশে উন্নত ও সংরক্ষিত হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, সেই সঙ্গে হুগলী, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলা এবং সর্বোপরি কলিকাতা বন্দরেরও বিশেষ উপকার হয়, আর নদীপথে যাতায়াতের সুবিধার ফলে নদীয়া জেলায় বড় বড় কলকারখানা ও যন্ত্রশিল্প স্থাপনের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, দেশের নদীনালা ও সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনের সম্বন্ধ এর একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কিছুদিন পূর্বে কম্বোডিয়ান গভর্মেণ্ট আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য লইয়া সেই দেশের ৬০০। ৭০০ বৎসর পূর্বে মজিয়া ও শুকাইয়া যাওয়া সমস্ত নদী নালা খাল প্রভৃতি আবার নূতন কাটাইতেছেন। তাহারা আশা করিতেছেন ইহাতে ঐ দেশের কয়েক লক্ষ লোকের উপযোগী ধান্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং অনেক ক্ষেত্রে বোরো ধানের চাষও সম্ভবপর হইবে আশা করা যায়। পশ্চিমবাংলার সর্বোপরি ও সর্বশেষ সমস্যা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যও এই অঞ্চলের নদীগুলি বালি অপসারণ (desilting) খনন (dredging) প্রভৃতিদ্বারা গভীর করা এবং মজিয়া যাওয়া খালগুলি পুনরায় কাটান বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে স্বাভাবিকভাবে নদী ও খালপথে বর্ষার জল নিকাশের সুযোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে এবং বর্তমানের ন্যায় বালুকাগ্রস্ত ও অগভীর নদীতে জল স্ফীতির ফলে সহর, জনপদ প্রভৃতি প্লাবিত হইবার বিশেষ ভয় থাকিবে না। বস্তুতঃ নদী নালার সংখ্যা ও গভীরতা বৃদ্ধি ছাড়া বন্যানিয়ন্ত্রণের অপর কোনো স্থায়ী ও গুরু পরিকল্পনা আছে বলিয়া মনে হয় না।

দেশবিভাগের ফলে নদীয়া মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির লোকসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহাদের অন্ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং সমগ্র দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই অঞ্চলে কিছু কিছু বৃহৎ যন্ত্রশিল্প ও কলকারখানা স্থাপনের আশু প্রয়োজন অনুভূত হয়। দেশের কয়লা, লোহা প্রভৃতি খনিজ এলাকা হইতে দূরে অবস্থিত এখানকার যন্ত্রশিল্পের সম্ভাবনা আলোচনা করিতে হইলে উত্তর প্রদেশ পঞ্জাব উত্তর-বিহার প্রভৃতি রাজ্যের কথা চিন্তা করিতে হইবে। কয়লা লোহা ও অন্যান্য খনিজের অভাবে উত্তর প্রদেশে ইস্পাত সিমেন্ট প্রভৃতি উৎপাদন অথবা বড় বড় engineering কলকারখানা ইত্যাদি স্থাপনের কোনো সুবিধা নাই,—আছে প্রধানতঃ কৃষিজাত দ্রব্যের শিল্প সম্ভাবনা। তাই সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে বড় বড় ও অসংখ্য চিনির কল, তেলের কল, টায়ারি ও অপরাপর বহু যন্ত্রশিল্প। নদীয়া মুর্শিদাবাদেও আখচাষ বিশেষ আশাপ্রদ এবং দর্শনা পলাশী প্রভৃতি জায়গায় চিনির কলও দু'একটা আছে। সুতরাং আখচাষের উন্নতিও পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা এখানে একাধিক বড় বা মাঝারি চিনির কল দাঁড় করান খুবই সম্ভব, মনে হয়। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগ হইতে অর্থ ঋণ লইয়া বীরভূম জেলায় আহমদ পুরে, National Sugar Mills Ltd নামে একটি কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গের চিনির চাহিদা বার্ষিক ১৪৪,০০০ টনের মধ্যে পলাশীর কারখানায় উৎপন্ন হয় মাত্র ১০,০০০ টন, অবশিষ্ট চাহিদার জন্য আমাদের বিহার উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ চিনির কল হইতে আখের ছিবড়া ও স্থানীয় বাঁশ ঘাস প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া এখানে দুই চারিটা কাগজের কলও চলিতে পারে। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মোহিনী মিলস্ অতিরিক্ত বাংলার গর্বের বস্তু ছিল। তাই বর্তমানে এই জেলায় নূতন করিয়া কয়েকটি মিল চালু করা উচিত। ইহা ছাড়া কলিকাতা ও নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলে পর্যাপ্ত দুধ মাখন ছানা ইত্যাদি সরবরাহের জন্য একাধিক "হরিণঘাটা'র এবং মাংস ডিম ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পোল্ট্রী পশুপালন প্রভৃতি শিল্প সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও সর্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের বিশেষতঃ চিনি, গুড়, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ,

ছানা, ঘি প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে এবং এ বিষয়ে কৃষিপ্রধান নদীয়া জেলার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে। ইহা ছাড়া তাঁত, মাটির কাজ প্রভৃতি এখানকার কুটিরশিল্পের উন্নতি বিধান ও খেজুর গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি, তাল গুড় তৈরী, তামাক চাষ, বিভিন্ন ফল ও সব্জীর চাষ প্রভৃতি কৃষি কাজ ও শিল্প সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গের এই অনগ্রসর প্রান্তকে সর্বতোভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিতে পারে। জনসাধারণের অন্নবস্ত্র বাসস্থান ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পাকা বনিয়াদের উপরই দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইমারত গড়িয়া ওঠে। আজিকার উন্নয়ন নদীয়া প্রান্তরে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি ও যন্ত্র শিল্পের বিরাট উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দেশের প্রত্যেক অংশ ও প্রান্তকে সমভাবে উন্নত এবং সমৃদ্ধ করিতে ইচ্ছুক—বিশেষ বিশেষ অংশের বদলে। গণতন্ত্রের একক হিসাবে তাই প্রত্যেক নদীয়াবাসীর উচিত এখানকার সর্বপ্রকার শিল্প সমৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা বিষয়ে অবহিত হওয়া এবং এ বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

বার্দ্ধক্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জরা এসে করেনিতো নীরস এ জীবন!
এখনো যে বুকে আসে অমৃত প্লাবন।
অধর যে তেমনি মেদুর,
শ্রাবণ আজও তেমনি মধুর,
রামধনু যে তেমনি করে আজও আকর্ষণ।

২

নেয়নি কেড়ে পৃথিবী তার সমস্ত বিভব,
আজও তাহার ভালবাসা করছি অনুভব।
প্রাতে রাঙা সূর্য ওঠে,
আবীরের সে বন্যা ছোটে
রঙিয়ে যেন এ দেহ মন আনে সে উৎসব।

৩

পরপারের যাত্রী আমি গমনে উৎসুক
সন্ধ্যারতি তেমনি শুচি স্নিগ্ধ করে বুক।
কাকলী গুঞ্জনে, গানে,
কি আনন্দ আনে প্রাণে
অমৃতের যে পুত্র আমি অনন্ত মোর সুখ।

৪

অনুবন্ত শহর বুকে শিউলি যে ছড়ায়,
মানস সরে নীলোৎপলের ভিড় কমেনা হায়।
মোর জীবনে শ্রীপঞ্চমী—
ফুরায় না যে, তাকে নমি,
বসন্ত মাধবী গুচ্ছে মালক ভরায়।

৫

বন্ধুর পথ কোথায় টানে পাইনে আমি টের?
মনে হয় যে এ যেন পথ রাজদূত যজ্ঞের।
চারিদিকে শঙ্খধ্বনি—
শুভাবানা, ক্ষীর নবনী
বংশীরব দেয় জানিয়ে এ পথ অমৃতের।

অবিশ্বাসী নই

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

খবরের কাগজে সুবাসিনীর নাম বড় অথবা ছোট কোন অক্ষরে কখনও বেরোয় নি, কিন্তু এখনকার মহিলা-সমাজের শীর্ষস্থানীয়া মিসেস ছায়া চক্রবর্তীর সঙ্গে যখন ওর তুলনা করি—থাক সেই সব পরচর্চায় আমার কি দরকার?

এই ত বিশ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। সুবাসিনীর দিনগুলো কি আনন্দেই না কাটত! অধিকি বিধবা বলে মাঝে মাঝে মনটা যে খারাপ তার হয় নি তা নয়, কিন্তু সধবা সে যে ছিল তা এখন মনেই পড়ে না। লোকমুখে শুনেছে যে, তার বিয়ে হয়েছিল খুব ভালঘরে; বাবা তার বিয়েতে কোন রকম পণ না নিয়ে বড়ঘরের মত ধান দিয়ে বিয়ে দিয়েছিল এবং তার স্বামীর চেহারা যেটুকু আবছা মনে পড়ে তাতে তার বেশ ভালই লাগে। ইয়া ধারাল চেহারা, বুকের ছাতি এবং হাতের গুলি দেখবার মত, মাজাঘাজা রং, এতখানি চওড়া সোনার বিছে-পদক হাতে, দু'হাতের আঙুলে চার চারটে আংটি। হুঁকো বা বিড়ি সে খেত না, ভদ্দর লোকের মত সিগারেট খেত, কি সুন্দর সেই গন্ধ তবে স্বামীকে দেখে সুবাসিনীর বড়ই ভয় করত, এবং এইটুকুই তার মনে আছে। খুলনার গাঁয়ে তার শ্বশুরের ছিল মাছের আড়ৎ। শ্বশুর বুড়ো হয়ে আর সুন্দরবনে মাছ ধরতে যেতে পারত না, তার স্বামী এবং দেওররাই নৌকো দিয়ে বেরুত, এবং আড়তে থাকত শ্বশুর। এ ছাড়া অন্য সব জেলেদেরও ধারন দেওয়া থাকত। তারাও ওদের হয়ে মাছ ধরতে যেত। হাপর-ভর্তি মাছ এনে সেই সব জেলেরা সুবাসিনীর শ্বশুরের কাছে জমা দিত, সুবাসিনীর শ্বশুর সেই মাছ দূর দূর সহরে হাপরসমেত চালান দিত, ঘরে ওদের মা-লক্ষ্মী বাঁধা ছিলেন। এ সব জিনিষ সুবাসিনীর নিজের চোখে দেখা না থাকলেও মা-জেঠাইয়ের মুখে ক্রমান্বয়ে শুনে শুনে পরে তার মনে হোত, এ বুঝি তার নিজেরই প্রত্যক্ষ ঘটনা।

তবে এগুলো সবই দু'দিনের খেলা। বিয়ের পর সে একবার মাত্র শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিল। শ্বশুর শাশুড়ীর আদর যত্ন সে যথেষ্টই পেয়েছিল, কিন্তু বাড়ীর জন্য এতই মন কেমন করত যে, লুকিয়ে লুকিয়ে সে কেঁদেছে,—এই-টুকুই তার মনে পড়ে। দিন কতক পরে বাবা গিয়ে যেদিন তাকে নিয়ে এল, সেদিন যেন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে-ছিল। কিন্তু সেদিন কি সুবাসিনী জানত যে শ্বশুরবাড়ী ত্যাগ করে তার সেই চলে আসাটাই তার পক্ষে চিরকালের মত শ্বশুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসা? কোন্ দিন কোন্ কাজটা যে মানুষের জীবনের শেষ কাজ হয়ে দাঁড়ায়, তা কি কেউ কখনও টের পায়? এর মাসখানেক পরেই সুবাসিনীদের বাড়ীতে একদিন খুব ছুটোছুটি হল, কান্না-কাটিও হোল। বাবা না-খেয়ে সকালে খবর পাওয়া মাত্রই যে-লোক খবর এনেছিল তার সঙ্গে হন্ত-দন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। পরের দিন বাড়ী ফিরে উঠোনেই ছাতা ফেলে ধুলোর ওপোর বসে কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগল, মা এবং জেঠাই মা ভাঁড়ঘরে মরা-কান্না জুড়ে দিলে, সুবাসিনীরও খুব কান্না পেতে লাগল। তার অনেকক্ষণ পরে মা তাকে অনেক গালাগালি করে পুকুর ঘাটে নিয়ে গিয়ে মাটী দিয়ে সিঁথের সিঁদুর ঘষে ঘষে ধুয়ে দিলে, হাতের নোয়া খুলে পুকুরের জলে ফেলে দিলে, পাড়ার মেয়ে, বউ, ঝিরী সকলেই এসে হা-হুতাশ করলে, এবং সেই দিন থেকেই সুবাসিনীর বৈধব্যজীবন সুরু হোল। তখন সে অবশ্য খুব ভালভাবে বোঝেনি, তবে এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে সেদিন তার দুঃখ হলেও মনে মনে একটা

সান্ত্বনাও সে পেয়েছিল এই ভেবে যে, হয়ত তাকে আর দু' এক মাসের মধ্যেই এ বাড়ী ছেড়ে সেই 'তাদের বাড়ী'তে যেতে হবে না। এটা সেদিন মন্দের ভাল বলেই তার মনে হয়েছিল।

তারপর একে একে অনেকগুলো দিন,—গোটা কতক বছরই কেটে গেছে। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ঐ রাক্ষসী-বউকে তাদের ছিটে মাড়াতে দেবে না বলে শাসিয়ে দিয়েছিল। বাবাও বলেছিল যে মেয়েকে খাওয়া-পরা দেবার ক্ষমতা তার আছে, অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী বিয়ের চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য সুবাসিনীর জীবনে সহজ ও স্বাভাবিক হয়েই এসেছিল।

এরপর সুবাসিনীর মনে পড়ে বসন্তদার কথা। সুবাসিনীর বয়স তখন কতই বা? হয়ত তের কি চোদ্দ বছর!

সেবার ওদের গ্রামে,—শুধু ওদের গ্রামে কেন, পাশা-পাশি বিশ পঁচিশ খানা গ্রাম বন্যায় ভেসে গেল। কত লোকের ঘর-বাড়ী পড়ে গেল, কত মানুষ গরু, বাছুর যে ভেসে গেল তার কোন সংখ্যাই রইল না। যেমন জল, তেমনি ঝড়, বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ল, নদীর ঘাটে বাঁধা নৌকাগুলো কতক দড়ি ছিঁড়ে ভেসে গেল, যেগুলো ভাল-ভাবে বাঁধা ছিল সেগুলো জলের ধাক্কায় আছড়ে-আছড়ে ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেল। ওদের উঠানের নারকোল গাছটা ভেঙ্গে পড়ল ওদের ধানের গোলার ওপোর, সঙ্গে সঙ্গে গোলা ভেঙ্গে সমস্ত ধান উঠোনের ওপোর ছড়িয়ে পড়ল এবং বন্যার স্রোতে সমস্ত ধান ভেসে গেল। বাবা জেঠা, জ্যাঠতুত ভাই, এবং ওরা সকলে মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করেও বিশেষ কিছুই বাঁচাতে পারল না। দেশশুদ্ধ হাহাকার পড়ে গেল, তবে ভগবানের দয়ায় ওদের ঘরগুলো বেঁচে গেল, তাই ওরা একেবারে নিরাশ্রয় হয় নি, উপরন্তু ওদের জেলেপাড়ার অনেকেই ওদের ঘরে এবং দাওয়ায় এসে আশ্রয় নিলে। ওঃ, সে সব কি দিনই-না গেছে! সে কথা সুবাসিনীর ভাল ভাবেই মনে আছে।

এই ভয়ানক দুর্ঘটনার দু'তিন দিন পরেই স্বদেশী-ছেলেরা নৌকা নিয়ে ওদের গাঁয়ে এসে হাজির হোল। খদ্দরের হাত-কাটা পাঞ্জাবী পরা মালকোচা-মারা ভদ্র লোকের ছেলেরা চিঁড়ে গুড় পুরাণ কাপড় এই সব নিয়ে গাঁয়ের দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করবার জন্য নেমে পড়ল। ভাঙ্গা বাঁধের ঢিপির ওপোর এবং উঁচু উঁচু জায়গায় যেখানে একখানি মাত্র কাপড় ও বড় বড় চৌকা সম্বল করে নিরাশ্রয় লোকেরা অনাহারে বৃষ্টির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল সেইখানে তারা চুহাতে খাবার, কাপড়, কম্বল বিলি করতে লাগল, ওদের মত যাদের বাড়ী তখনও টিকে ছিল তাদের বাড়ীতে এসেও কার কি দরকার সমস্ত খবর নিতে লাগল, অসুস্থ লোকদের ঔষধ পথ্য দিতে লাগল, গ্রামের লোকেরা এ সব ছেলেদের দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে লাগল, এমন কি ওদের দেখাদেখি গাঁয়ের ছেলেরাও হাতাহাতি করে আধভাঙ্গা বাড়ীগুলো মেরামত করতে সুরু করে দিলে।

পাঁচসাতদিন এইভাবেই কাটল; তারপর শুরু হোল ব্যাপকভাবে জ্বর, নিউমোনিয়া এবং পেটের অসুখ। বন্যার জল তখন সরে গেছে, কিন্তু কারুরই ঘরে তখন বিশেষ কিছুই নেই; এমন কি যে-সুবাসিনীরা কখনও খাওয়ার দুঃখ কি তা জানত না, তাদেরও অবস্থা তখন সঙ্গিন। ঐ স্বদেশী ছেলেরাই তখন একমাত্র সম্বল। গাঁয়ে একজন মাত্র হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, সে আর কতদিক সামলাবে! স্বদেশীরাই সহর থেকে ডাক্তার আনালে, কিন্তু ডাক্তারবাবু থাকবে কোথায়? সুবাসিনীর বাবারই অবস্থা ওদের সকলের মধ্যে মন্দের ভালো। সুবাসিনীদের সদরের ঘরে সেই ডাক্তারবাবুর আস্তানা হোল, সেই সঙ্গে আরও দুজন স্বদেশী ছেলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সেই ঘরেই রইল। এতে সুবাসিনীর বাবার সম্মান আরও বেড়ে গেল। সদর থেকে হাকিমরা যখন গ্রামের কাজ দেখতে আসত তখন এই বাড়ীতেই তারা বসত, চৌকীদার থেকে দফাদার পর্যন্ত সকলেই এ বাড়ীতে হামে-হাল হাজিরা দিত।

কিন্তু ঐ সব স্বদেশীওলাদের নিয়ে কি মুস্কিল! ওরা কিনা স্বচ্ছন্দে সুবাসিনীর বাবাকে বলে, ভাল ভাত আপনার বাড়ীতেই চুটিয়ে দিন, আমাদের খেতে কোন আপত্তি নেই। চাল ডাল অবশ্যি তারাই এনেছিল।

সুবাসিনীর মা ও জেঠাইমা বেঁকে দাঁড়াল। তারা বল্লে, সে কি গো, ভদ্দরলোকের ছেলেদের ভাত রান্না করে দেব, তারা আমাদের হাতে খাবে, সে আমরা পারবো না।

বাবা বল্লে, ওরা যখন বল্‌ছে, আর ওরা ত হোটেলে-হোটেলে খায়—

জেঠাই মা বাবাকে ধমক দিয়ে বলে, যেখানে যা যায় সেখানে তা যাক্। আমরা যেমনতেন বামুন কায়েতকে ভাত রেঁধে দিয়ে পরকালে নরকে যেতে পারব না। কথায় বলে, আমাদের ছোঁয়া জলই চলে না, আর কিনা—

বাবা বলে, জল ত তোমরা দিচ্ছই—

জেঠাই মা বলে, জল ঠিক আমরা ত দিচ্ছি না, ঐ মেয়েটাই যা দেয়। তা ও ছেলেমানুষ, ও না হয় জল দিতে পারে, কিন্তু তা বলে—

ডাক্তার বাবুকে বাবা যখন ভয়ে ভয়ে কথাটা বলে, তখন তিনি হো হো করে হেসে উঠে বলেন, ওঃ, এই কথা; তা বেশ ভাল, আমরা না হয় নিজেরাই রান্না করে খাব। বলেই বলেন, বসন্ত তুমি রাঁধতে পারবে না?

বসন্ত ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এইখানেই থাকবে বলে এসেছিল। সে বলে, দরকার হলেই পারব।

ডাক্তার বলেন, ঠিক আছে, আমার এই সুবাসিনী-মা সাহায্য করবে, আর বসন্ত রাঁধবে, কেমন হে বসন্ত, পারবে না?

বসন্ত বলে, খুব পারব; কিন্তু সুবাসিনীর কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল।

জেঠাই বলে, যাক না, কিটকী-মেয়ে বাবুদের কাজে সাহায্য করুক, তাতে লজ্জা কি, কিন্তু খবরদার, ভাত ফুটে গেলে সেই ভাত ছুঁয়েছ বলে যদি শুনি, তাহলে কিন্তু রক্ষে রাখব না।

আজকে যে বসন্তদার দেশ জোড়া নাম, সেই বসন্তদার সঙ্গে এমনি করেই সুবাসিনীর প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

তারপর সেই সর্ব্বনেশে বর্ষা কেটে গিয়ে শরৎ, হেমন্ত শীত সমস্ত ঋতুই একের পর এক এসেছিল, গাঁয়ের লোক বন্যার কথা ভুলেছিল, মহামারীর কথা ভুলেছিল, অগ্রহায়ণে নতুন ফসল পেয়ে বর্ষার খাওয়া ভাব ভুলেছিল, কিন্তু বসন্তদা এ গ্রামকে ভোলে নি। বর্ষার ঠিক পরেই স্বদেশীদের কে যেন গুরুদেব ওদের গাঁয়ে এসে একদিন কত ভাল ভাল বক্তৃতা দিলেন। ঐ বসন্তদা এবং আরও অনেকে ঢোল পিটিয়ে পাঁচখানা গাঁয়ের লোককে জানিয়ে গেল যে অমুকদিন অমুক জায়গায় বক্তৃতা হবে। গাঁয়ে তখন স্বদেশীওলাদের জয়জয়কার। প্রায় সব লোকই ওদের সাহায্য পেয়েছে। সকলেই এসেছিল এবং ওদের ভাল ভাল কথায় দেশশুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য। কিন্তু কি যে ওঁরা বলেছিল, তা সুবাসিনীরা ঠিক বুঝতে পারে নি। তবে যে সমস্ত, ভদ্দরলোকের ছেলেরা গাঁয়ের বিপদে-এমন প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তারা যা তাদের গুরুরা যে ভাল কথাই বলবে সে বিষয়ে কারুর কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

এর পর সুবাসিনী শুনলে, তার বাবা এবং জেঠা এক সঙ্গে ঠিক করেছে যে, তাদের সদরের যে ঘরখানায় এতদিন ডাক্তারবাবু ছিল সেই ঘরখানা স্বদেশী কাজের জন্য যতদিন দরকার ততদিন স্বদেশীদের হাতেই থাকবে। জেঠা বলে, ভালই ত রে ছোটু, বড় বড় লোক সব আসবে, বিপদে আপদে ডাকতে হাঁকতে—ধর না কেন,—ঐসব দফাদার চৌকীদার হাতের মুঠোর থাকবে—

বাবা বলে, আর সদরের হাকিমরা! যেনাদের এজলাসে গিয়ে বলির পাঠার মত কাঁপতে হয়, তেনারা এসে আমার মাদুরে বসে ত গেল!

জেঠা বলে, নিক্ষর, পাঁচখানা গাঁয়ের লোক দেখুক, তারা আসুক—

অতএব সুবাসিনীদের সদরের ঘরে দেশের কাজ করার জন্য বহাল রইল বসন্ত চক্রবর্ত্তী এবং আরও দু'তিনটি ছোকরা যারা মাঝে মাঝে চলে যেত, এবং তাদের বদলি অন্য লোক মাঝে মাঝে আসত এবং যেত। মাঝে মাঝে বাবা-পঞ্চাননের মাঠে বসন্তদার বক্তৃতা হোত, অন্য লোকেরও বক্তৃতা হোত, পাড়াঘরের অনেক ছেলে-বুড়ো নিয়ে এখানে ওখানে আসর বসত। দেখতে দেখতে সেতলাতলায় সন্ধ্যের পর ছেলে-বুড়ো দশ বিশজনকে নিয়ে হোল একটা স্কুল, সন্ধ্যের পর সংকীর্ত্তনও হোত মাঝে মাঝে। কোথাও কারুর বাড়ী অসুখ-বিসুখ হলে বসন্তদা' দলবল নিয়ে সেখানে গিয়ে কাঁপিয়ে পড়ত, রোগ না সারা পর্য্যন্ত রোগী ছেড়ে আসত না কেউ। অনেক সময় পুকুরের পানা পরিষ্কার করত, বর্ষাকালে ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী থেকে ইটপাটকেল এনে পাড়ার সমস্ত ছেলে জড়ো করে গান গেয়ে গেয়ে দুরমুষ দিয়ে গ্রামের রাস্তা পিটিয়ে দিত; নালার ওপোর তালগাছের গুঁড়ি ফেলে তার ওপোর পুরাতন বাড়ীর ভাঙ্গা বেড়া নতুন বাঁশ এবং মাটী ফেলে এমন সাঁকো বানাতো যে সাইকেল ত বটেই গরুর

গাড়ী পর্যন্ত অবাধে চলে যেত। সুবাসিনীরা অবাক্ হয়ে দেখত। বসন্তদারা যে কাজেই হাত দেয় সেখানেই সোনা ফলে কিন্তু একটা পয়সাও তারা কারুর কাছে দাবী করে না। পাড়ার বুড়োরা গৌরব করে বলত ওরা আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তারা একটা লাভও হয়েছে, আমরা বসন্তদের পেয়েছি।

এর পর সুবাসিনীরা বসন্তদার প্রতিপত্তি দেখে ক্রমে ক্রমে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। ওরা হাজার হোক ভদ্দর লোকের ছেলে ত! ওরা অবাধে বড়লোকের বাড়ী, জমিদারের বাড়ী, মহাজনের গদিতে গাঁয়ের পাঁচটা গরীবের জন্য দরবার করত; যে মহাজন কখনও কারুর এক আধলাও সুদ ছাড়ত না, তারাও ওদের কথা ফেলতে পারত না। বিনা সুদে বকেয়া পাওনা কিস্তিবন্দী করতে বাধ্য হোত। হাজার হোক ভয় ছিল ত, সদরের হাকিমরা ঐ সব স্বদেশীওলাদের কথা শুনত যে! মনে মনে চটলেও মুখে ওদের কথা অমান্য করার সাধ্যি কারুর ছিল না। দেশে-ঘরে অনেক বড় বড় কাজিরা ওদের সালিশীতে কত সহজে আপোষ হয়ে যেত। আর সেই সঙ্গে সুবাসিনীদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। সবাই জানত, স্বদেশীওলারা ওদের হাতের মুঠোয়। যদিও ওর বাবা জেঠারা নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে বলাবলি করত যে, ছেলেরা খুব ভাল বটে কিন্তু এতটুকু এদিক ওদিক হবার যো নেই, ওদের ঘিরে কোন রকম সুযোগ সুবিধে করানো যায় না, কিন্তু গাঁয়ের লোক তা জানত না, তারা মনে করত সুবাসিনীরা তলে তলে যা বলবে, বাবুরা তাই করবে। তা সে যাই হোক সুবাসিনীর ছিল সকলের চেয়ে বেশী খাতির। দূর দূর গ্রামে কোথায় কোন বিধবার ওপোর তার জাতিরা কি অত্যাচার করেছে, কার জমির ওপোর কে দু'হাত বেড়া সরিয়ে এনেছে, কার পুকুরের মাছ কে একজন প্রবল প্রতিপক্ষ টানা জাল দিয়ে সব ধরিয়ে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে, সমস্ত নালিশ সেই সহায় সম্বলহীনরা দৌড়ে এসে সুবাসিনীর কাছে জানিয়ে কেঁদে পড়ত,—সুবাসিনী বলত তার বসন্তদাকে আর অমনি বসন্তদা বেড়িয়ে পড়ত সেই অসহায়কে নিয়ে। বসন্তদার কি ক্ষমতা। প্রত্যেক গাঁয়ে ছেলেদের নিয়ে যে সব নৈশস্কুল এবং লাঠিখেলা কুস্তি লড়ার আখড়া খুলেছিল, সেই সব ছেলের দল গিয়ে দাঁড়াত প্রত্যেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এগিয়ে-আসা বেড়া নিঃশব্দে পিছিয়ে যেত, বিক্রী-হয়ে যাওয়া মাঠের ধান লটকে বাধ্য হয়ে প্রকৃত মালিকের হাতে পৌছে যেত, অত্যাচারী স্বামী ঠাকুরের দরজায় মাথাঠুকে প্রতিজ্ঞা করত আর কখনও বউকে অমন ভাবে মারবে না। এমনি ধারা কত কাজ যে অবাধে হয়ে যেত, তার ঠিক নেই।

এর পর বসন্তদা সুরু করলে গ্রাম-রক্ষী দল। আশে পাশে তিনখানা গ্রামে একমাসে চারাটে ডাকাতী হয়ে গেল। শোনা গেল ডাকাত দলে ছিল পনর বিশ জন লোক। সড়কী, টাঙ্গি, ছোরা এই সব নিয়ে তারা গৃহস্থদের অনেক জখম করে একেবারে সর্ব্বস্ব লুঠে নিয়ে গেছে। বসন্তদা যখন গাঁয়ের ছেলেদের নিয়ে গ্রামরক্ষী দল খুলবে বলে ঠিক করলে, তখন প্রবীণরা অনেকেই আপত্তি করেছিল, বলেছিল আমাদের এই ছেলেরা কতটুকুই বা কি করতে পারবে। কিন্তু বসন্তদার কথার চোটে সকলের সব আপত্তি ঝড়ে উড়ে গেল, আর ছেলেদের দলে কি ফুর্ত্তি নতুন খাতায় সকলের নাম লিখে কে কোনদিন রাত্রি কটা থেকে কটা পর্য্যন্ত পাহারা দেবে সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। সুবাসিনী সেই প্রথম শুনল, পাহারা দেবার নাম 'ডিউটি'। সদর থেকে পুলিসের দারোগা এসে সুবাসিনীদের বাইরের ঘরের দাওয়ায় মাদুরে বসে বসন্তদাকে উৎসাহ দিয়ে বলে গেল, চালিয়ে যান আপনার পার্টি, আমরা পেছনে রইলুম, যা দরকার হয় সমস্ত সাহায্য দেব। গাঁয়ের লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে ভালই হোল, তিন ক্রোশ দূরে থানা, কিন্তু বসন্তরা ত হাতের কাছেই রইল, নির্ভয়ে রাত্তিরে ঘুমানো যাবে। সুবাসিনীর জাঠতুত ভাই এবং গাঁয়ের অন্যান্য সমস্ত ছেলে পালা করে রাত্তিরে গ্রাম-গ্রামান্তর ঘুরে বেড়াত। সমস্ত বাড়ীতে বলে দেওয়া হোল, কোন রকম ভয় পেলেই শাঁখ বাজিয়ে দেবে, তাহলেই আমরা এসে পড়ব। যে সব ছেলেদের সাইকেল ছিল, তারা সাইকেল নিয়ে রাত্তিরে ছোট ছোট গ্রামরক্ষী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে লাগল। সেই প্রথম বসন্ত দা' কোথা থেকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য একখানা সাইকেল আনালে এবং নিজে সারা রাত সেই সাইকেলে চেপে সর্ব্বত্র তাদারক করে বেড়াতে লাগল। তারপর বহুদিনের মধ্যে আর

কোন ডাকাতির খবর পাওয়া যায় নি। সিঁদেল চুরিও সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এমনি ভাবে এক বছরের ওপোর কেটে গেল। বসন্তদা নিজে রান্না করে খায় সুবাসিনী দূর থেকে রান্নার জোগাড় দেয়। আর সে রান্নাও কত সহজ। বাটীর ওপোর বাটী বসিয়ে কেমন একটা গোল বাল্‌তির মধ্যে সব সাজিয়ে কাঠের উনানে আধঘণ্টা চোখ বুজে খালি জাল দিয়ে যাওয়া তারপর সেই বাল্‌তিটা নামিয়ে বাটীগুলো বার করে নিলে এক সঙ্গে ভাত ডাল তরকারী সমস্তই পাওয়া যায়। দু'তিন জনে পেট ভরে খেতে পারে এমন সব জিনিষ। বসন্তদা বলে, ওর নাম কুকার। সুবাসিনী বিকেলে এক সময় সেই কুকারের বাটীগুলো মেজে দিত। জেঠাইমা এমন বোকা, জেঠাইমা কুকার বলতে পারত না বলত কুকুরের বাটী। সুবাসিনীরা হেসেই খুন। বলে, কুকুর নয় জেঠাইমা, কুকার। জেঠাইমা বলে, ওই-ওই হোল।

বসন্তদা রোজ ভোর বেলা ঘুম থেকে ওঠে! কখন যে ওঠে তা সুবাসিনীরা টেরও পায় না। হয়ত রাত্তিরে ডিউটি থেকে ফিরে আর বিছানায় শোয়ই না। তারপর পুরুত ঠাকুরের মত কত সব মন্তর পড়তে পড়তে পুকুর ঘাটে চলে যায়। একেবারে স্নান সেরে ফিরে এসে ভিজে ছোলা আর গুড় খায়, কোনদিন বাতাসা ভিজানো জল এবং দুধ ভেজানো। তারপর বাইরের দাওয়ায় বসে লোক জনের কথা বলে। সকালের দিকে এ গাঁয়ের এবং ভিন গাঁয়ের লোকও আসে। লোক যে কতই আসে! সকালে বিকেলে লোকের শেষ আর নেই। আর বসন্তদার কি অসীম ধৈর্য্য! কার কি হয়েছে সমস্তটুকু মন দিয়ে শুনে কাকে কি করতে হবে সমস্ত ভঙ্গ ভঙ্গ করে বলে বুঝিয়ে দেবে, না তা নিজেই চল তার সঙ্গে। ওরই ফাঁকে এক সময় চাল ডাল তরকারী দিয়ে কুকার সাজিয়ে দিলে। তরকারী গুলো প্রথম থেকেই সুবাসিনী কুটে ধুয়ে দিত,মাছ থাকলে তাও সুবাসিনী কুটে দিত। আজকাল সুবাসিনীই কুকারের তলায় কাঠের জ্বাল দিয়ে দেয়, যা জেঠাইমা কোন আপত্তি করে না, বলে কিসে না কিসে জ্বাল দিচ্ছে জ্বালভাত কিছুই ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে আর দোষ কি! পাড়ার ছেলেরা বসন্তদার সাইকেল ধুয়ে মুছে তেল দিয়ে পরিষ্কার করে দিত। কিন্তু বসন্তদার কি অন্যায়! মুসলমান ছেলেগুলোর সঙ্গেও এমন মাখামাখি করত যে, দেখলে গা জ্বালা করে! একই মাদুরে মুসলমানের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে বসন্তদা অম্লান বদনে কথা কইত। সুবাসিনীর পিসি একবার ওদের বাড়ীতে এসেছিল। সে বলেছিল বসন্ত বোধ হয় খিরিষ্টান, ওর এতো থালাবাটী সুবাসী মাছে এটা কি ভাল! কথাটা সত্যি ভাববার মত.—কিন্তু না, তাই বা কি করে হবে? গঙ্গায় যে পৈতে হয়েছে, আর রোজ সকালে পুরুতঠাকুরের মত মন্তর পড়ে যে! সুবাসিনীর কতকগুলো মন্তর শুনে শুনে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। বসন্তদা কখন আস্তে আস্তে বলত 'অনেক বাহুরবক্ত্রনেত্রম্' অথবা যখন বলত 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী', তখন সুবাসিনীর এত ভাল লাগত যে সে তন্ময় হয়ে শুনত। এই ভাবে যে মন্তর পড়ে সে কি খিরিষ্টান হতে পারে? কিন্তু তবুও যেন কেমন একটা ধোকা লেগে যায়। কিন্তু ধোকা স্থায়ী হয় না, ধোয়ার মতই উড়ে যায়।

একদিন সকালে সুবাসিনী বাড়ীর বাসি-পাট সেরে যথারীতি বসন্তদার বাইরের ঘরে এসে অবাক্ হয়ে গেল। বসন্তদা তখনও ওঠে নি। একি? এতদিনের মধ্যে কোনদিন ত এমন ব্যাপার সে দেখে নি! ঘরের দরজা খোলা, এবং ভেতরে ঢুকে সে দেখলে, বসন্তদা তখনও বিছানায় শুয়ে,—কেমন ছট্‌ফট্ করছিল।

সুবাসিনী ডেকেছিল, বসন্তদা, বসন্তদা—

বসন্ত এ পাশ ফিরে বলেছিল, কে, সুবাস?

তুমি এখনও ওঠো নি?

বসন্ত বলেছিল, না সুবাস, উঠতে আজ পারছি না, ভয়ানক জ্বর হয়েছে।

সে কি? সুবাসিনী সেদিন সত্যিই চমকে গিয়েছিল। বসন্তদার যে মানুষের শরীর, সে শরীরের যে কোন ক্ষয়-ক্ষতি হতে পারে, তা ওরা কোনদিন ভাবতেই পারত না। সেই বসন্তদার অসুখ! কি করবে কিছু ঠিক করতে না পেরে সুবাসিনী দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে বাবার কাছে গিয়ে বসন্তদার অসুখের কথা বলতেই বাবা ওর সঙ্গেই দৌড়ে এসে বসন্তর ঘরে ঢুকে কি হয়েছে সমস্ত শুনে তখনই বেরিয়ে গিয়ে সেই হোমিওপ্যাথ

ডাক্তারকে খবর দিয়েছিল। ডাক্তার এসে তখনই ওষুধ দিয়েছিল কিন্তু সেবার বসন্তদা সহজে সেরে উঠতে পারে নি। প্রায় দশ পনরদিন ভুগেছিল।

ওর বাবা বলেছিল, বাবু, তোমার দেশে কে কোথায় আছে বল, একটা খবর দি।

বসন্তদা বলেছিল, দেশ ত এইখানেই, আর তোমরাই ত আপন লোক!

ওরা তবুও পীড়াপীড়ি করেছিল। বসন্তদা বলেছিল, সামান্য একটু সর্দ্দিজ্বর, মিছামিছি বাড়ীতে খবর দিয়ে সকলকে ব্যস্ত করে কি লাভ?

পাড়ার ছেলেরা দিনরাত সেবা করেছে। স্বদেশী-ছেলেরা অন্যত্র থেকে এসে পড়ল কয়েক দিনের মধ্যেই। সুবাসিনীর কাজের অন্ত ছিল না। দিনরাত তাদের ফাই-ফরমাস নিয়েই লেগে থাকতে হোত। ছেলেরা বলে, বড় ডাক্তারকে খবর দিই। বসন্তদা বলেছিল, না যে-ডাক্তার গ্রামের সকলকে দেখে সেই দেখবে, সকলের যা অবস্থা, তারও সেই অবস্থাই হবে। টাকা পয়সা পাড়ার ছেলেরা এবং স্বদেশী ছেলেরা কোথা থেকে আনত, সুবাসিনী জানত না, কিন্তু এটা সে জানত যে, বসন্তদার যখন যা দরকার হোত, তা যেন কোথা দিয়ে এসে পড়ত। গ্রামের লোকেরাও দুধ, পসা, আন্ডা, খই ইত্যাদি বসন্তদার যা দরকার অকাতরে জোগান দিত। একজন মুসলমান ত বড় এক বোতল মধু দিয়ে গেল। তার কাজ ছিল সুন্দরবন থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করা।

সেদিনকার সেই দিনগুলো স্মরণ করে সুবাসিনীর আজ কী-ভালই-না লাগে! সারাটা দিন এবং অনেকখানি রাত পর্য্যন্ত সে সব সময় বসন্তদার কাছেই থাকতে পেত। রাত যখন গভীর হোত, তখন অন্য ছেলেরা বসন্তদার ঘরে বিছানা করে শুয়ে পড়ত, এবং সুবাসিনী বাড়ীর ভেতর চলে যেত। আবার ভোরবেলায় উঠেই বসন্তদার মুখ ধোবার গরম জল এসে হাজির হোত। রাত্রেও দু'একদিন উঠে চুপিসাড়ে বসন্তদার বন্ধ দরজার বাইরে কান পেতে শুনে গেছে ভেতরে কেউ কোন কথা বলছে কিনা, বসন্তদা উঠছে কি না, এই সব।

একটু সুস্থ হওয়ার পর বসন্তদা প্রথমেই খবর নিলে, রাতের ডিউটি ঠিকমত চলছে কিনা, সন্ধ্যের স্কুলগুলোয় যথারীতি কাজ চলছে কি না, পাড়ার লোক কবে কে এসেছিল, কারুর কোন বিপদ আপদ হয়েছে কিনা এই সমস্ত। সকলের সমস্ত খবর নিয়ে বসন্তদা আবার স্থির হয়ে শুয়ে পড়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে সুবাসিনী আস্তে আস্তে বলেছিল, বসন্তদা, একটু দুধসাবু নিয়ে আসব।

বসন্ত বলেছিল, আন।

তক্ষুণি পাতার জ্বাল দিয়ে সুবাস দুধসাবু এনে বসন্তকে দিয়েছিল।

তারপর যেদিন বসন্ত পথ্য করবে, সেদিন সুবাসিনী বলেছিল, বসন্তদা, আজ তোমাকে উঠতে দেব না, আমি ত জানি,আমি ঠিকভাবে কুকার সাজিয়ে ভাত ফুটিয়ে দেব।

বসন্ত বলেছিল, দাও।

সত্যি, বসন্তদা কি ভাল লোক, আর যেন একেবারে ছেলেমানুষ। সুবাসিনী যা বলে, সে কখনও 'না' বলে না।

সেদিন সুবাস কুকারের বাটী খুলে থালায় ভাত, বাটীতে মাছের ঝোল সব গুছিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল। সুবাসের বাবা একটি কথাও বলে নি, জেঠাইমা ও মা বলেছিল, হোক যে যাক, আতুরে কোন নিয়ম নেই।

এমনি করেই সুবাসিনীর জীবনটা বোধহয় তার ছোট্ট শিশুভাই বসন্তদাকে নিয়ে কেটে যেতে পারত, এবং সেইটেই বোধহয় সবচেয়ে সুখের হোত, কিন্তু কোথা দিয়ে কি যে হোল, সে কিছুই বুঝতে পারলে না। সহর থেকে মাঝে মাঝে যে সব স্বদেশীওয়ালারা আসত, তারা সেবার এসে বসন্তকে কি সব কথা বল্লে, বসন্তও তাদের কথায় মেতে উঠল। গ্রামের লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বল্লে, সামনের বাইশ তারিখে আমাদের হাটবার আছে, কিন্তু ঐদিন হাট বন্ধ করতে হবে, কোন দোকান খোলা হবে না।

সে কি? হাট বন্ধ হবে কেন? পাড়ার সকলেই জিজ্ঞাসা করেছিল।

বসন্তদা বলেছিল, হরতাল। কলকাতায় স্বদেশীদের ওপোর ইংরেজরা কি যেন অত্যাচার করেছে, তারই প্রতিবাদে গান্ধী মহারাজ বাইশ তারিখে সব বন্ধ করতে বলেছেন।

এবং যা ঠিকমত বিশ্বাস করা যায় না, সেই রকমই হয়েছিল। বসন্তদার লক্ষ্মীরা, কুস্তি ও লাঠি খেলার ছেলেরা, নৈশস্কুলের সকলেই ভোর থেকে ঘুরে ঘুরে হাটের সমস্ত দোকান, কলুদের ঘানিঘর, কামারের কামারশালা, তাতী-পাড়ার তাঁতের কাজ সবস্তই বন্ধ রেখেছিল। মুসলমান-পাড়ার কয়েকটি দোকান তারা সহজে বন্ধ করে নি, সেখানে বসন্তদার দল গিয়ে বকাবকি, ঝগড়া-ঝগড়ি করে অবশেষে সেগুলো জোর করে বন্ধ করিয়েছিল।

এবং সুবাসিনী শুনেছিল যে, ঐ মুসলমানপাড়ার দোকান জোর করে বন্ধ করান'র জন্য দু'দিন পরে থানা থেকে পুলিস এসে বসন্তদার সঙ্গে দেখা করে অনেক বকা-বকি করে শেষে বসন্তকে সঙ্গে করে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন সুবাসিনী সত্যিই ভয় পেয়েছিল।

এর পর পুলিস মাঝে মাঝেই ওদের গাঁয়ে আসতে সুরু করে। এবার কিন্তু পুলিসের ভাবগতিক অন্যরকম মনে হতে লাগল। তারা বসন্তদাকে আগের মত খাতির আর করত না।

একদিন ওর বাবা এবং জেঠা দুপুরে খেতে বসে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে, বসন্তকে আর ওদের ঘরে রাখা উচিত হবে না। ছোটদারোগা সেই কথাই জেঠাকে বলেছিল।

কিন্তু মুস্কিল হোল আঠভুত ভাইকে নিয়ে। সে রীতিমত বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, কেন বসন্তদা কি চোর না ডাকাত, যে পুলিস বললেই ওঁকে তাড়াতে হবে? অন্যান্য ছেলের দল জেঠাকে বলেছিল, তাড়াও না দেখি, আমরা আছি না?

উভয় সংকট! শেষে অনেক ভেবে বাবা বলেছিল, 'থাক্ গে থাক্, পুলিস এলে বলব যে, আমরা পারছি না, তোমরাই ওদের উঠিয়ে দাও।

একথা শুনে সুবাসিনী নিজেই সেদিন ক্ষেপে গিয়েছিল। তখন ত আর ছোটটি ছিল না, কিন্তু বাবার মুখের ওপোর সে কিছুই বলতে পারেনি। কতক্ষণে বসন্তদা ফিরবে, কতক্ষণে তাকে এই কথাটা বলার সুযোগ পাবে সেই সুযোগের অপেক্ষায় সে ছট্‌ফট্ করেছিল।

এবং বলেছিল পরদিন ভোরবেলায় বসন্তদা স্নানে যাওয়ার পূর্ব্বেই। বসন্তদা কোনরকম বিরক্ত না হয়ে হাসিমুখেই বলেছিল, ঠিক আছে আমি দু'একদিনের মধ্যেই দেখেশুনে নিয়ে চলে যাব।

সেদিন যেন সুবাসিনী কেঁদেই ফেলেছিল। ঝপ্ করে বসন্তদার হাতটা ধরেই সে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলেছিল, না বসন্তদা, তুমি যাবে না, যাবে কেন? যে যা বলে বলুক, তুমি এ ঘর থেকে যাবে না। এরপর বসন্তদা স্নান করতে চলে গিয়েছিল।

সেদিনের কথা সুবাসিনীর বেশ মনে পড়ে। বাবা, জেঠা, আঠভুত ভাই, আত্মীয়-স্বজন সকলের তুলনায় বসন্তদাকে যে কত বেশী নিজের লোক বলে মনে হোত, তা সামান্য কথা দিয়ে সে বোঝাতে পারবে না। সেদিন তার কাছে দুনিয়া একদিকে আর বসন্তদা একা একদিকে। এবং আজও পর্য্যন্ত সুবাসিনীর মনের ভাব ঠিক সেই রকমই আছে। সে নিজের জীবনমৃত্যু পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে বসন্তদার কাছে কাছেই থাকতে চায়, কিন্তু দুঃখ এই যে বসন্তদা আর সেই স্বদেশীওলা-বসন্তদা নেই, সে বদলে গেছে।

সেদিনের সেই ঘটনার পর কত বড় ঝড় বিপর্য্যয় যে গেছে, তা একসঙ্গে ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। পুলিসের পর পুলিস আসত, লাঠিখেলার আখড়া, কুস্তির ক্লাব সমস্ত বন্ধ হয়ে গেল, গাঁয়ের কত ছেলেকে যে থানায় টেনে নিয়ে গেল,—কেউ কেউ মুচলেকা দিয়ে চলে এল, কেউ কেউ আটকে পড়ল। বসন্তদা একদিন চলে গেল, তারপর আর ফিরে এল না। লোকমুখে শোনা গেল, তার ফাটক হয়ে গেছে। তার দোষ, সে নাকি ইংরেজকে তাড়াবার জন্য দল পাকাচ্ছিল। পৃথিবীর রাজা ইংরেজ, যার রাজ্যে সূর্য্যদেব পর্য্যন্ত বাঁধা আছে, অস্ত যেতে পারে না, সেই ইংরেজকে ওরা তাড়াবার চেষ্টা করেছে। জেঠা বলে, সব ত ঠিক হোল, এখন ছেলেরা যদি ভালয় ভালয় ঐ সব দুষ্টুবুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে মন দিয়ে বিষয় কর্ম্ম করে তবেই ত বুঝি। ভাল ভাল করে বসন্তকে মাথায় তোলা হয়েছিল, কিন্তু সেই বসন্ত যে এত সাংঘাতিক তা জানব কি করে, গাঁয়ের ছেলেগুলোর মন মাথা সব একদম্ বিগড়ে দিয়েছে সে।

সুবাসিনীর কিছু ভাল লাগত না। সে অন্য সকলকে লুকিয়ে বসন্তদার ঘরে ঢুকে একা বসে বসে কাঁদত; বাইরে

কাজের সাড়া পেলেই ঘর-দোর ঝাঁট দেবার ভাব করত। তার খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। অন্তরা কেউ কিছু মনে করেছিল কিনা, সে জানে না, কিন্তু মা এবং মাসিমা সুবাসিনীর আর একবার বিয়ে দেবার কথা তুলেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, এ রকম বিয়ে দেবার কথা আগেও কয়েকবার হয়েছিল, কিন্তু সুবাসিনীর বাবা তেমন গা' করেনি। বলেছিল, অমন ভাল ঘর-বরই যখন ওর বরাতে সইল না, অমন জোয়ান ছেলেই যখন সুন্দর-বনে বাঘের খাবার শেষ হয়ে গেল, তখন আবার বিয়ের চেষ্টা করে কি হবে। ওর বাবা মাঝে মাঝে সহরে যেত, ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করত, মেয়েদের দ্বিতীয় পক্ষে বিয়েটা ওদের সমাজে চলিত থাকলেও সে ঠিক মন দিয়ে জিনিষটা নিতে পারে নি। তা ছাড়া গাঁয়ের মাথা হোল' তারাই, সে চাইত একটা ভদ্রস্থানা ধরণের ছেলেদের সমাজে চালু করবে, আবার অন্য পক্ষে চিকণ-কালো স্বাস্থ্য-বতী মেয়ের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝেই তার সেই বামুন-কায়েত হবার সংকল্প ভেসে যেত এবং মুখে জোর করে কিছু না বলেও মনে মনে ভাল ছেলের সন্ধান করত, কিন্তু কাউকেই পছন্দ হোত না। পরে তার একটা মস্ত সুবিধে হোল, সুবাসিনী নিজেই ঘোরতরভাবে আপত্তি করে উঠত। সুবাসিনী নিজে কিন্তু তার আপত্তির কারণটা কাউকেই মুখ ফুটে বলে নি, এবং সে ত বলাও যায় না। মনে হলে নিজেরই এমন লজ্জা করে যে, আপনা হতেই সে ঘাবড়ে যায়। তার মনে হোত যে, সে যদি বিয়ে করে শ্বশুর ঘরে চলে যায়, তা হলে বসন্তদাকে কে দেখবে? সারাটা দিন এবং রাত্তিরেও যে লোকটা গাঁয়ের লোকের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করছে, তার ঘর ঝাঁট দেওয়া, কলসীতে জল ভরে দেওয়া, কুকারে রান্না করা এবং কুকারের বাটি ধেকে দেওয়ার কাজ সুবাসিনী যদি না করে দেয়, তাহলে সে বাঁচবে কি করে। সুবাসিনীর এত নজর এবং যত্ন সত্ত্বেও সে ত মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। বর্ষায় শেষে ম্যালেরিয়া তার হবেই, এবং সুবাসিনী যদি এ বাড়ীতে না থাকে তাহলে সকলের সহায় বলে যে লোকটা পরিচিত হয়ে উঠেছে সেই সম্পূর্ণ অসহায় বসন্তদার কি হবে? অতএব সে যে-কোন বিয়ের প্রস্তাব শোনামাত্রই ক্ষেপে যেত এবং তার বাবা খুসি মনেই মেয়ের সেই প্রতি-বাদকে প্রশ্রয় দিত, মেয়ের বামুন-কায়েতী মনোভাব লক্ষ্য করে মনে প্রাণে আনন্দই পেত। কিন্তু এবার যখন সুবাসিনীর বিয়ের কথা উঠল, এবং সুবাসিনীর পিসি এসে মাকে ও জেঠাইকে বলে যখন সেই দাবী জোরদার করে তুললে, তখন সুবাসিনী নিজে আপত্তি করার মত খুব একটা মনের জোর আর পেলে না। কারণ তার ত করবার মত কোন কাজই আর নেই। বসন্তদা সেই কত-দিন আগে চলে গেছে, এবং আর কোনদিন আসবে কিনা তাও ত কেউ জানে না। তবে আর সুবাসিনী কি নিয়ে থাকবে! তা হলে বিয়ে যদি হয়ই তবে হোক্।

অতএব সুবাসিনীর বাবা আর কোন অজুহাত পেলে না। বিশেষ করে পাশের গাঁয়ের যে ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ এল, সে ছেলেটা মন্দ নয়। বাপের এক ছেলে সে, হাটে একটা ভাল মুদির দোকান আছে তার বাবার। অনেক-দিন সে বসন্তদার সঙ্গে কাজ করেছিল এবং সেই সূত্রে সুবাসিনীদের সঙ্গে তার বেশ জানাশুনাও হয়েছিল। ছেলেটা এতদিন ধরে বিয়ে করতে কিছুতেই রাজী ছিলনা, সোজাসুজি বলে দিয়েছিল, সে বসন্তদার মত দেশের কাজ নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেবে। লাঠির আখড়ায় সে ছিল একজন ওস্তাদ, নৈশ স্কুলে ইংরাজী পর্যন্ত পড়েছিল, কিন্তু শেষকালে বাপের পীড়াপীড়িতে পুলিসের খাতায় মুচলেকা দিয়ে এখন বেশ কিছুদিন ধরে অন্য সমস্ত ছেড়ে মুদীর দোকানই দেখছে এবং তার বাবা এসে সুবাসিনীর বাবার কাছে বলে গেছে যে, কত ভাল ভাল মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, সে কিছুতেই রাজী হয় নি, কিন্তু সুবাসিনীর কথা তুলতে সে এখন রাজী হয়েছে। অতএব দু'মাস পরে এই অগ্রহায়ণের প্রথম বারো দিন বাদ দিয়ে যে-দিন পাওয়া যাবে সেই দিনেই ওদের চার হাত এক করে দেওয়া যাবে। এ-বাড়ী ও-বাড়ী দু পক্ষই কথা দিয়েছে। ছেলের বাবা তিনখানা রূপোর গয়না দেবে, সুবাসিনীর বাবা পণ ত নেবেই না, উপরন্তু একখানা সোনার গয়না এবং আরও দু'একখানা রূপোর গয়নাও দেবে বলে স্বীকার করেছিল। ভদ্রলোকদের প্রথম পক্ষের বিয়ে যেমন হয়, তেমনি ভাবে পুরুতঠাকুর ডাকিয়ে ওদের পণপত্র পর্যন্ত হয়েছিল। এর পর আশ্বিন মাসে পুজোর সময় সে পক্ষ থেকে সুবাসিনীর জন্য ভাল শাড়ী এবং এক

হাড়ী মিষ্টি যেদিন এসেছিল সেদিন সুবাসিনীর বাবা সত্যিই খুব খুশি হয়েছিল, বলেছিল, দেখ, কেমন ভদ্রলোক এরা, যা-তা ঘরে মেয়ে দিচ্ছিনা। ওদের তরফ থেকেও বরের জন্য ভাল ধুতি এবং মিষ্টি পাঠান হয়েছিল। কিউড়ী-মেয়ে সুবাসিনী এক রকম স্বেচ্ছাতেই সকলের সামনে আর যখন-তখন বেরুত না।

আশ্বিনের পর কার্তিক, তারপর অগ্রহায়ণ। সুবাসিনীর স্পষ্ট মনে আছে, অগ্রহায়ণের তিন তারিখে যখন সুবাসিনীদের বাড়ীতে ভালভাবে বিয়ে দেওয়ার জন্য পুরো-দস্তুর জোগাড় আরম্ভ হয়ে গেছে, সেই সময় দুপুর বেলা সাইকেল নিয়ে এসেছিল অনন্তদা, মানে, অনন্তগোপাল রায়। অনন্তদা ছিল বসন্তদার এক ভক্ত, অনেকবারই এ বাড়ীতে এসেছিল সে, সুবাসিনী তাকে খুব ভালভাবেই জানে।

সদর ঘরের দাওয়ায় সাইকেলখানা দাঁড় করিয়ে অনন্ত এদিকে চাইতেই ভেতরের ঘরের জানলা দিয়ে সুবাসিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। স্নান কাল ভুলে সুবাসিনী যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই ছুটে সদরে বেরিয়ে এসে-ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করেছিল বসন্তদার খবর এবং অনন্তর কাছে যা শুনেছিল তাতে ও চোখে অন্ধকার দেখেছিল। অনন্ত বলেছিল যে, বসন্তদা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে বটে, কিন্তু শরীর একদম ভেঙ্গে গেছে, বিছানা থেকে উঠ্‌তে পর্যন্ত পারে না, ভালভাবে সেবা শোনা করতে না পারলে বসন্তদা বাঁচবে না।

সুবাসিনী কোন রকম চিন্তা না করেই বলেছিল, বসন্তদাকে এক্ষুনি নিয়ে এস, আমি তাকে সারিয়ে তুলব।

ম্লান মুখে অনন্ত বলেছিল, আমরা কি করে? এতদূর ত আনা যাবে না। তারপর সহরে সে যেখানে আছে সেখানে ডাক্তার ওষুধ, ফল সমস্ত পাওয়া যায়, এখানে আনলে চিকিৎসা হবে কেমন করে। তুমি যদি সেখানে যেতে পার, তাহলে তোমার হাতে বসন্তদার সেবা করার ভার তুলে দিতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হই।

দাঁত দিয়ে নিজের আঙুল কামড়ে সুবাসিনী বলেছিল, আমি যাব? আমাকে কি যেতে দেবে? আমি যে—

অনন্ত বলেছিল, যাবে কিনা সে তোমার ইচ্ছে, কিন্তু বসন্তদা আমাকে দিয়ে বলে পাঠালে যে, সুবাস যদি আসে তাহলে এ যাত্রা আমি নিশ্চয়ই বেঁচে উঠব। তাই তোমাকে বলতে এলুম।

বড় বড় চোখ দুটো অনন্তর দিকে তুলে সোজাসুজি চেয়ে সুবাসিনী বলেছিল, বলেছে—মানে, বসন্তদা আমাকে ডেকেছে, তাহলে—তাহলে আমি যাব, আমি যাব, কিন্তু—কিন্তু সে কোথায়, কোন জায়গায়, কার সঙ্গে যাব, কে আমায় নিয়ে যাবে?

অনন্ত বলেছিল, বসন্তদা এখন আছে খুলনা সহরের কংগ্রেস আপিসে। যেতে তুমি আমার সঙ্গেও পার, কিন্তু বাড়ীতে জিজ্ঞাসাবাদ না করে তুমি কি ভাবে যাবে? পালিয়ে যাওয়া ত ভাল না। বাড়ীতে না জানিয়ে গেলে বসন্তদা রাগ করবে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে একটু ভেবে নিয়ে সুবাসিনী বলেছিল, জিজ্ঞাসা করে যেতে গেলে যাওয়া হবে না, ওরা ছাড়বে না, আমাকে এমনিই যেতে হবে। কিন্তু—কিন্তু কি করে যাব, সে যে অনেক পথ, আবার দু'খানা নদী পার হতে হবে। বাবার সঙ্গে সুবাসিনী দু'তিনবার গিয়েছিল, পথঘাটের ধারণা ছিল তার।

বাসি, সুবাসি—ভেতর থেকে মায়ের গলা শোনা গিয়েছিল।

আচ্ছা তুমি যাও, আমি নিশ্চয়ই যাব, বলেই সুবাসিনী দৌড়ে বাড়ীর ভেতর চলে গিয়েছিল। অনন্তদাও সাইকেলে উঠে বেরিয়ে পড়েছিল।

বাবা, জেঠা, এবং জাঠতুত ভাইয়েরা দুপুরে কেউই বাড়ীতে ছিল না। কিন্তু ও-বাড়ীর পিসি এবং তারও ও-ধারে ছোট ঠাকুমা সাইকেলে চড়ে অনন্তকে আসতে, কথা কইতে এবং যেতে দেখেছিল। যাবার সময় ছোট ঠাকুমা অনন্তকে একবার ডাকও দিয়েছিল, কিন্তু অনন্ত সেই ডাক বোধ হয় শুনতে পায় নি, কিম্বা শুনেও শোনে নি।

মা জিজ্ঞাসা করেছিল, বাইরে কি করছিলি রে?

সুবাসিনী সত্য কথাই বলেছিল। বসন্তদার কাছ থেকে সে এইটুকুই শিখেছিল যে, হয় সত্য কথা অকপটে বলবে, আর না হয় ত জোর গলায় বলবে, 'বলব না', কিন্তু মিথ্যে কখনও বোলো না।

সুবাসিনীর কথা শুনে মায়ের মন আঁৎকে উঠেছিল। বসন্তদার অসুখের জন্য মনটা একটু খারাপ হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গেই সে যখন শুনেছিল যে, বসন্তকে দেখ্‌বার জন্য ওরা 'বাদি'কে ডাকতে এসেছে তখন মা একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিল। বিকেলে বাবা জেঠা সকলে মিলে বেশ কিছু রাগারাগি করে সুবাসিনীকে যথেষ্ট ভয় দেখিয়ে শাসিয়ে দিয়েছিল যে, ওসব মৎলব মন থেকে মুছে ফেল।

সন্ধ্যের পর আঠভুত দাদা সুবাসকে আড়ালে পেয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, বসন্তদা কোথায় আছে অনন্তদা কিছু ঠিকানা দিয়েছে যে?

সুবাস বলেছিল দিয়েছে। বলেছে, খুলনা সহরের কংগ্রেস আপিসে। তারপর আকুল আগ্রহে দাদাকে বলেছিল, আমাকে নিয়ে যাবে দাদা, আমি না গেলে বসন্তদা বাঁচবে না।

আঠভুত ভাই চিন্তাকুল হয়ে বলেছিল, সেটা কি করে হবে? আচ্ছা দেখি।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে আঠভুত ভাই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, বলেছিল দূর গাঁয়ে যাওয়ার দরকার আছে। বাবা কাকার নিষেধ না শুনেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সুবাসিনীর মনে আছে, সে রাত্রে সে সারারাত ঘুমোয় নি। বসন্তদা কেমন আছে কে জানে? কে তাকে দেখ্‌ছে, হয়ত রাত্রে তেষ্টায় জলটুকু দেবার লোক পর্যন্ত নেই। হয়ত বসন্তদা মাঝে মাঝে সুবাস সুবাস করে ডাকছে, হয়ত—হয়ত—

সে আর ভাবতে পারে নি।

পরের দিন অনেক বেলায় আঠভুত ভাই ফিরে এসেছিল। সুবাসিনীর দৃঢ় বিশ্বাস, দাদা বসন্তদাকেই দেখতে গিয়েছিল। বসন্তদা কেমন আছে কথাটা জানবার জন্য তার মনটা ছট্‌ফট্‌ করছিল কিন্তু দাদাকে আড়ালে পেয়ে যে জিজ্ঞাসা করবে সে সুযোগ সে কিছুতেই পাচ্ছিল না। শেষে দুপুরে দাদা যখন পুকুরে স্নান করতে যাচ্ছিল তখন সে তাকে ধরলে। বলে বসন্তদাকে দেখতে গিয়েছিল?

দাদা কোন ভণিতা না করেই বলে, গিয়েছিলুম, কিন্তু অবস্থা বেশ ভাল নয়। বাঁচে কি না সন্দেহ।

সুবাসিনী বলেছিল, আমাকে নিয়ে যাবে দাদা? আমি একবার দেখব।

দাদা বলেছিল, শুধু দেখা নয়, সেইখানে কিছুদিন থেকে সেবাশুশ্রূষা করলে তবেই ঠিক হয়। কিন্তু—

সুবাস বলেছিল, কোন কিন্তু নয় দাদা, আমি যাব, আমি সেখানে থাকব, বসন্তদাকে সারিয়ে তুলব।

চিন্তিতমুখে দাদা বলেছিল, থাকবি ত বটে, কিন্তু তাতে যে কি ভয়ানক বদ্‌নাম হবে, তা কি ভেবেছিস্?

কিসের বদ্‌নাম? বলেই সুবাসিনী ধমকে গিয়েছিল। সে জানত যে পাড়ার কেউ কেউ সুবাসিনীর সঙ্গে বসন্তর অবাধ মেলামেশায় বদ্‌নাম দিয়েছিল, কিন্তু প্রথমতঃ বসন্তদা এবং তার দলের ভয়ে এই বদ্‌নামের বীজ দানা বাঁধতে পারে নি। এরপর বসন্তর সাগ্‌রেদ ওস্তাদ লাঠিবাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন তাকে বিয়ে করবে বলে সব ঠিক করে ফেলে তখন সেই বদ্‌নামের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন যদি সামনের তের তারিখের বিয়ের দিন ঠেলে সে সহরের কংগ্রেস আপিসে গিয়ে বসন্তদার সেবায় লেগে যায়, তাহলে সেই বদ্‌নাম যে আবার জোরদার হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই আর নেই।

কিন্তু যেতে তাকে হবেই, সুবাস মনে মনে ভেবেছিল। নিজের জীবনটা এমন কিছুই নয়, কাজটাই চিরস্থায়ী, এই সব কথা সে বসন্তর কাছেই শিখেছিল। বসন্তদা যদি দেশের জন্য নিজের ভালমন্দ সমস্ত ভুলে পরের কাজে ডুবে থাকতে পারে, তাহলে সুবাসই বা নিজের ভালমন্দ বিসর্জ্জন দিয়ে বসন্তদার কাজে নিজেকে সঁপে দিতে পারবে না কেন?

না হয় সে নিজেকে ডুবিয়েই দেবে, কিন্তু যাবে কি করে? দাদা কি নিয়ে যাবে? ইচ্ছে থাকলেও সে নিয়ে যেতে পারবে কি?

হেঁটে যাওয়া যায় না? হয়ত যায়। কিন্তু পথে যে দু'দুটো নদী আছে! নদীর ঘাটে যে সমস্ত মাঝি আছে তারা সকলেই বাবার চেনা-পরিচিত লোক। তাকেও বেশ ভালভাবেই চেনে। একলা নদী পার হতে চাইলে পার করে ত দেবেই না, উল্টে জোর করে ধরে বাবার কাছে এনে পৌঁছে দেবে। এবং তারপর? কাজও হবে না, উল্টে মা জেঠাই সকলে মিলে তাকে একেবারে বন্দী করে ফেলবে।

ভাবনার কূলকিনারা নেই। ভাবতে ভাবতে সুবাসিনীর

চোখে জল এসে গিয়েছিল। সেদিন তার ইচ্ছে হচ্ছিল চেঁচিয়ে গলা ছেড়ে বসন্তদাকে সাড়া দিয়ে বলতে, বসন্তদা, তুমি কিছু ভেব না, আমি যাচ্ছি, আমি নিশ্চয়ই যাব, আমি—কিন্তু মুখ ফুটে সে কিছুই বলতে পারে নি, এক একবার শুধু মনে হয়েছিল, সে কি পাগল হয়ে যাবে!

রাত্তিরটা পুরো কাটল না ঘুমিয়ে। সকালে একরাশ অবসাদ নিয়ে সে যখন গোহাল ঘরে কাঁচি নিচ্ছিল তখন শুনতে পেলে মা হাসতে হাসতে জেঠাইকে বলছে, শুনেছ দিদি, বাসি আজকাল রাত্তিরে আর ঘুমুতে পারে না, বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসছে—

জেঠাই বলেছিল, হবেই ত, সোমত্ত বয়েস, আর তা ছাড়া আজকালকার মেয়ে; জানা-বর, বড় ঘর, ছট্‌ফট্‌ ত করবেই। তোর চলে দুইও করতিস্‌।

মা বলে, যাঃ, তারপর ওরা দুজনেই হাসতে হাসতে নিজেদের কাজে চলে গিয়েছিল। কথাগুলো শুনে সুবাসিনীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল।

সেদিন বিকালে আচমকা দাদা সুবাসকে একলা পেয়ে চুপি চুপি বলে, আজ রাত্তিরে যাবি? খেতে ভয় করবে না ত?

সুবাসিনী হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। বলেছিল হ্যাঁ যাব, কিন্তু কখন দাদা?

দাদা বলেছিল, ভোর রাত্তিরে। বাগানে যাবার নাম করে কাপড় গামছা দু'খানা বেশী নিয়ে ভোর বেলা দক্ষিণের মাঠে জোড়া বটতলায় আসিস্‌, আমি নিয়ে যাব।

সেই থেকেই সুবাসিনীর বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করতে লাগল। যত ভয়, তত আনন্দ। সে যাবে তার বসন্তদার সেবা করতে। তাকে শুশ্রূষা করবে, সারিয়ে তুলবে বসন্তদা আবার আগের মত সুস্থ সবল হয়ে দেশের কাজ করবে, সে হবে বসন্তদার ডান হাত। কিন্তু অন্য দিকে ভয়ও কম নয়। বাবা কি বলবে? মা জেঠাই কি বলবে? এই যে বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে, এরই মধ্যে এত টাকা খরচ করে নানা রকম কাপড়, জামা, গয়না, বাসন এত সব জিনিষ কেনা হয়েছে, এ সবের কি হবে! সেই কেইই বা কি বলবে! সুবাসের মনে যাই থাক, দেশ-গাঁয়ের লোক ত বলবে, সুবাসিনী পালিয়ে গেছে। সেটাই বা শুনতে কি রকম লাগবে! ছি ছি,—কিন্তু ছি ছি করলে ত চলবে না, যেতে তাকে হবেই। তারপর কথা হচ্ছে, সে যদি কোন কারণে সহর অবধি পৌঁছাতে না পারে! সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল না:, তা সম্ভব নয়, দাদার সঙ্গে যাবো, ভয়টা কিসের! এমনি ভাবে কত রকম এলোমেলো চিন্তা করতে করতে কি ভাবে যে সারাটা দিন এবং রাত্তির কেটে গেল তা এখন সুবাসের মনেও পড়ে না, কিন্তু এইটুকুই মনে আছে যে, সে তার এই অতি-আকাঙ্ক্ষিত যাত্রার জন্য মনে মনে তৈরীই হচ্ছিল।

ভোর রাত্তিরে দাদা দাঁড়িয়েছিল সাইকেল নিয়ে। কাপড়ের পুঁটলীটা ওর হাত থেকে নিয়ে সাইকেলে রেখে বললে, পেছনে উঠে বস্‌।

ওমা সেকি, আমি কি তোমাদের মত সাইকেল চড়তে পারি? আঁৎকে উঠে সুবাস বলেছিল।

দাদা বললে, খুব পারবি। ওঠ্‌।

সে বলেছিল, না দাদা, তুমি গাড়ীতে চল, আমি তোমার সঙ্গে ছুটে ছুটে যাব।

দাদা বললে তবে বাড়ী ফিরে যা, যেতে হবে না।

সুবাস দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দাদার সাইকেলের পেছনের কেরিয়ারে উঠে বসেছিল! কিন্তু সাইকেল চলার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হতে লাগল সে এখনই পড়ে যাবে। দাদা বুঝতে পেরে বললে, আমায় কাঁধ ধরে বোস্‌, পড়িস নি যেন।

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কথা সে সকলের সঙ্গেই বলে বটে, কিন্তু কোন পুরুষ মানুষকে সে কখনও স্পর্শ করেছে বলে মনে পড়ে না, এমন কি বাপ দাদাকেও নয়। সেই সুবাস দাদার কাঁধ ধরে যাবে, তাও কি আবার হয় না কি?

হঠাৎ গাড়ীতে একটা ঝাঁকুনি দিলে। সুবাস পড়তে-পড়তে দাদার পিঠ ধরে সামলে নিলে। দাদা আর একটা ঘষক দিয়ে বললে, কাঁধ ধরে বোস বলছি, না হলে পড়ে মরবি।

অগত্যা ভয়ে-ভয়ে সে দাদার কাঁধ ধরে কাঠ হয়ে বসে রইল। আলোআঁধারি ভেদ করে সাইকেল ছুটতে লাগল। ভয়ে তখন সুবাসীর গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

সূর্যের প্রথম আলো দেখা গেল নদীর ধারে।

সুবাসীকে নামিয়ে দিয়ে দাদাও সাইকেল থেকে নামল। তারপর নিঃশব্দে জলের ধারে নেমে একটা বাঁধা জেলে ডিঙ্গি খুলে দাদা বললে, চলে আয়।

সুবাসী ডিঙ্গিতে উঠতেই দাদা লগি ঠেলে ডিঙ্গিটা জলের মধ্যে এগিয়ে দিলে।

সুবাস বলেছিল, গাড়ী নিলে না দাদা, গাড়ী যে পড়ে রইল।

থাক্, দাদা আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে লগি ঠেলে এগিয়ে চলল।

নদীর মাঝ বরাবর গিয়ে দাদা বললে, আমি তোকে ওপারে পৌঁছে দিয়ে এখনই ফিরে আসব ডিঙ্গি নিয়ে।

তাহলে? আমি যাব কি করে? মিশ্রিত ভয় ও বিস্ময়ে সুবাসী প্রশ্ন করেছিল।

সুবাসীর মুখের দিকে চেয়ে দাদা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলেছিল, ওখান থেকে আর একজন নিয়ে যাবে। সে তোর আরও আপনার লোক।

সে কে দাদা? তীব্র কৌতূহলে সুবাসী প্রশ্ন করেছিল।

ঐ দেখ্, ও কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে, আঙুল তুলে দাদা দেখিয়ে দিলে, ওপারে কোণের ধারে সাইকেল হাতে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

ভীত কণ্ঠে সুবাসী বলেছিল, কে ও? না না, আমি ওর সঙ্গে যেতে পারব না, আমি—

বাধা দিয়ে দাদা বলেছিল, চিনতে পারলি না? কিন্তু চিনলে তখন আমাকে আর ভালই লাগবে না রে।

অপেক্ষাকৃত সহজ কণ্ঠে সুবাস বলেছিল, কে দাদা? অন্ধকারে ঠিক ঠাওর পাচ্ছি না, কে ও বল না?

দাদা বলেছিল সবুর কর, দেখতে পাবি।

মিনিট পনের পরেই নৌকা এসে ডাঙ্গায় ঠেকল। সাইকেলধারী লোকটি জলের ধারে আসতেই দাদা বলেছিল, নাও হে কেষ্ট, তোমার আপনার লোককে এনে পৌঁছে দিলুম।

দাদার কথা বলার আগেই সুবাসিনী কেষ্টকে দেখেছিল। দেখেই যে সেই ঘাড় হেঁট করেছিল আর মুখ তুলতে পারে নি। কিন্তু কেন যে এমন একরাশ লজ্জা এবং জড়তা এসে ওকে পঙ্গু করে ফেলে তা ও যেন বুঝতেই পারলে না। ঐ কেষ্টর সঙ্গে ও কত কথাই না বলত! যখন সে বনস্থলীর কাছে দেশের কাজের জন্য যেত, তখন ত কোন লজ্জাই ছিল না, কিন্তু এখন কেন এমন হয়?

কেষ্ট চাপা গলায় সুবাসকে বলেছিল, এস, বলেই দাদার হাত থেকে কাপড়ের পুঁটলী নিয়ে সাইকেলের রডে বাঁধতে সুরু করেছিল।

সুবাস অনুযোগ করে দাদাকে বলেছিল, তুমিও চল না দাদা।

দাদা বলে, নারে, ওদিকে বাড়ীর ব্যাপার সামলাতে হবে, তারপর এই ডিঙ্গিটা যেখান থেকে এনেছি সেখানে ঠিক ভাবে বেঁধে রাখতে হবে, আমার কি এখন যাওয়া চলে, পরে যাব।

সাইকেলটা সোজা করে ধরে কেষ্ট বলে, ওঠো, পারবে ত?

দাদা বলে, নিশ্চয়ই পারবে, এতটা রাস্তা সাইকেলেই এল।

সুবাসের তখন প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা। এতটা রাস্তা সে দাদার কাঁধ ধরে এসেছে. কিন্তু সে ত দাদা, এখন এই কেষ্টর কাঁধ ধরে সে কি ভাবে যাবে!

কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে বেরিয়ারে উঠতে গিয়ে আবার সরে এসে বলে, দাঁড়াও।

কেষ্ট বলে, কি বোল?

সুবাসিনী হেঁট হয়ে দাদার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলে। হাসতে হাসতে দাদা বলে, তোর বোল কি রে? তুই ত এর আগে কখনও আমার পায়ের ধুলো নিস্ নি বলেই হাসতে হাসতে সুবাসের মাথা ধরে নেড়ে দিয়েছিল।

সাইকেল থেকে কেষ্ট বলে, এবার চলি দাদা—

দাদা বলে, দুর্গা দুর্গা,—বনস্থলীকে বলিস, আমি যদি পারি তাহলে আজ বিকেলে নয় হয় ত কাল দুপুরে নিশ্চয়ই যাব।

কেষ্ট সাইকেল চালাতে চালাতেই উত্তর দিয়েছিল, আচ্ছা।

প্রথম-প্রথম বাধো-বাধো ঠেকলেও একটুখানি পরেই সুবাসিনী বেশ সহজভাবে সাইকেলে যেতে লাগল। পথের ধারে পাখিদের প্রভাত কূজন সরবে আরম্ভ হয়ে গেছে।

এ-পারে ভাল রাস্তা। কেষ্ট বেশ জোরেই সাইকেল চালাচ্ছিল। পথে কোন লোকই ছিল না, ভিজে ভিজে রাস্তার ওপোর দিয়ে সাইকেলের টায়ারের একটানা আওয়াজ এবং দুধারের গাছ থেকে পাখীদের নানা রকম শব্দে সুবাসীর মনটা তখন বেশ ভালই লাগছিল। কি ছিল এবং কি হবে কোন চিন্তাই তার মনে তখন ছিল না।

একটা গ্রামের ধারে এসে কেষ্ট গাড়ী থামিয়ে সুবাসকে বলেছিল—নামো।

সাইকেল থেকে নেমে সুবাস বলেছিল, আর একটা নদী আছে না? কেষ্ট বলেছিল, আছে। এখানে একটা দোকানে সাইকেল রেখে নদী পার হব।

এই নদীটা আগের নদীর চেয়েও অনেক বেশী চওড়া। খেয়াঘাটের পাড়ে মুড়ি মুড়কী ও জিলাপীর দোকানে কেষ্ট সুবাসকে নিয়ে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে এসে হাজির হোল। বৃদ্ধ দোকানদার তখন দোকানের সামনে ছড়া-কাঁট দিচ্ছে।

দোকানদারকে কেষ্ট বল্লে, ঠাকুর্দ্দা, আমার সাইকেলটা রইল—আমি দুপুরের দিকে নিয়ে যাব।

দোকানদার কোমর সোজা করে মুখ তুলে বল্লে, অ, কেষ্ট বুঝি, তা তুই এই সাত সকালে কোথায়—বল্‌তে বলতেই সুবাসের দিকে নজর পড়াতে একটু বিস্মিতভাবে বলেছিল, সঙ্গে কে? তোর—

তোমার নাংবৌ ঠাকুর্দ্দা, চিন্‌তে পারলে না? কেষ্ট হেসেছিল, সুবাসিনী শিউরে উঠল।

'অ—', বৃদ্ধ কিছুক্ষণ সুবাসের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, বেশ বেশ, ভাল, তোর যে মতিগতি ফিরেছে, বিয়ে করে সংসারী হয়েছিস্, এ-ও খুব ভাল হয়েছে, কিন্তু—কিন্তু কবে বিয়ে হোল রে, তোর বাবা ত এই সেদিনও বলেছিল, বিয়ে হবে, কিন্তু কবে হোল? কিছু ত জানতে পারলুম না!

দোকানের ভেতর সাইকেলটা ঠেলে দিয়ে কেষ্ট বল্লে, এত তাড়াতাড়ি বিয়ে হোল ঠাকুর্দ্দা যে, আমিও জান্‌তে পারি নি!

এবার ঠাকুর্দ্দা হো হো করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বল্লে, এবারে শালা বেশ বলেছিস্, তুইও জানতে পারিস নি; তা ভাল ভাল, তা হলে অজান্তেই বিয়ে হয়ে গেছে বল্।

সুবাসিনীকে সঙ্গে নিয়ে কেষ্ট চলতে চলতেই বলেছিল, ঠিক তাই ঠাকুর্দ্দা, তা এখন সময় নেই, পরে কথা বলব, এখন বড্ড ব্যস্ত আছি।

নদীর ধারে গিয়ে দেখা গেল খেয়া নৌকা ওপারে চলে গেছে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে নৌকাটার ফিরে আসার জন্য। নদীর ঘাটে তেমন কোন লোকও নেই।

কাপড়ের পুঁটলীটা সুবাসের হাতে দিয়ে কেষ্ট বল্লে, একটু দাঁড়াও, আমি এখনই আসছি। কেষ্ট প্রায় ছুটতে ছুটতেই চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে সুবাসিনীর হাতে একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বল্লে, ঐ কোপের ধারে গিয়ে তোমার মাথায় একটু সিঁদুরটুকু দিয়ে এস।

সুবাস যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় চোখ দুটো তুলে তীক্ষ্ণ মত প্রশ্ন করলে, কেন? সিঁদুর কি হবে?

নইলে নানা লোকে নানা কথা বলবে, চট্ করে ওধারে গিয়ে সিঁদুর পর, অন্য কেউ না দেখতে পায়। তারপর ভালভাবে ঘোমটা দিয়ে থাকবে।

জিনিষটা উপলব্ধি করে সুবাসিনী পায়ে পায়ে কোপের ধারে এগিয়ে গিয়েছিল। কাগজ থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে লাগাতে গিয়ে তার ডান হাতটা ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠেছিল। মনে পড়ল, একদিন ছেলেবেলায় এই সিঁথি থেকেই পুকুর ধারের ঘাটী ঘষে তার মা নিজের হাতে সমস্ত সিঁদুর মুছে দিয়েছিল। সিঁদুর পরে মাথায় ঘোমটা তুলে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল।

আস্তে আস্তে দু' পাঁচজন লোক এসে জুটতে লাগল। কেষ্ট ওদের অনেককেই চেনে, তাদের সঙ্গে দু-একটা কথাও কইলে। ওদেরই মধ্যে একজন বেশ অন্তরঙ্গভাবে একটা বিড়ি নিয়ে কেষ্টর দিকে এগিয়ে ধরলে। কেষ্ট অল্প হেসে বল্লে, না ভাই, ও ত চলে না।

বিড়িশুদ্ধ হাতটা সরিয়ে নিয়ে সে বল্লে, ও, তুমি তা'-হলে এখনও বসন্তদার হুকুম মেনে চল্‌ছ।

সুবাসিনীর মনে পড়ল, বসন্তদা তার দলের সব ছেলেকেই বলেছিল, কোন রকম নেশা করবে না। বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু দরকার তা ছাড়া আর অন্য কোন রকম বিলাস বা নেশা না করার বিরুদ্ধে বসন্তদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

খেয়া নৌকা এপারে এসে ভিড়ল। যাত্রী নেমে যাওয়ার পর এ পারের লোক নৌকায় উঠতে লাগল। কেষ্ট সুবাসের সঙ্গে কোন কথাই কইলে না, যেন একদম অচেনা সে, কিন্তু সুবাসের ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সুবাস ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় নৌকায় উঠল, একটু পরে উঠল কেষ্ট। নৌকার মাঝি থেকে আরম্ভ করে অনেকেই সুবাসের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল, কেউ কোন কথাই বলে নি, স্ত্রীলোক যাত্রীও আর কেউ ছিল না, সুবাস চুপ করে একধারে বসে রইল।

ওপারে নেমে যাত্রীরা একটা করে পয়সা মাঝিকে দিয়ে যে যার কাজে চলে গেল, কেষ্ট হাসি মুখে মাঝিকে দুটো পয়সা দিয়ে ইসারায় সুবাসকে দেখিয়ে দিলে। মাঝি হাসি মুখে একবার সুবাসের দিকে চেয়ে বলেছিল, বুঝেছি বুঝেছি, শুনেছিলুম আগেই, কিন্তু লুচি-চিনি পেলুম না। বড্ড ফাঁকি দিয়েছ।

বড়লোকের বিয়ের এদেশের সবচেয়ে বড় মাহুষী ভোজ ছিল লুচি-চিনি।

কেষ্ট বলে,হবে হবে,তার নেই সে এক সময় হলেই হোল।

মাঝি বলেছিল, হাঁা, আজ না হলেও ছেলের মুখে-ভাতের সময়—কি বল কেষ্টদা, বলে হাসতে লাগল। এতক্ষণে ওপারের দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা এ-পারে আসার জন্য খেয়া নৌকায় উঠতে সুরু করেছিল।

সুবাসের হাত থেকে কাপড়ের পুটলীটা নিয়ে কেষ্ট আগে আগে হেঁটে চলেছিল, পেছনে ঘোমটা দেওয়া সুবাসিনী ধীরে ধীরে অনুসরণ করেছিল।

একটু এগিয়ে বাজারের ধারে গিয়ে ওরা যখন ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে তার মধ্যে উঠে বসল তখন সুবাস মাথার কাপড় সরিয়ে কেষ্টকে বলে, সাইকেলটা আনলে না কেন কেষ্টদা, মিছামিছি গাড়ী ভাড়ার পয়সা নষ্ট করলে কেন?

মিটি মিটি হাসতে হাসতে গম্ভীর গলায় কেষ্ট বলে, এপারে এসে বেলা আটটার সময় তুমি কি সাইকেলে চড়ে যেতে পারতে? আর তা ছাড়া মনে রেখ, আমি আর তোমার কেষ্টদা নই।

জিভ্ কেটে সুবাসিনী সেই যে ঘাড় হেঁট করেছিল, আর সহজে সে মুখ তুলে চায় নি।

ঘোড়ার গাড়ীতেও প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। তারপর পাওয়া গেল শিবের রাস্তা। শিবের রাস্তায় পড়ার একটুখানি পরেই কেষ্টর নির্দেশ অনুযায়ী গাড়ী থামল।

দুরু দুরু বুকে বসন্তর তরুপোষের ধারে এসে সুবাসিনী যখন দাঁড়াল, তখন অনন্তদা বসন্তর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থার্মোমিটার ঝাড়ছিল। ওর দিকে মুখ তুলে অনন্ত বললে, এসো।

সুবাস কোন কথা বলতে পারে নি, চাপা গলায় কেষ্ট বললে, এখন কেমন আছে?

অনন্ত কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই অতি কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে বসন্ত বলেছিল, কে?

কেষ্ট একটু ঝুঁকে পড়ে বললে, আমি কেষ্ট এসেছি; সঙ্গে কাকে এনেছি দেখ।

অনেক চেষ্টায় চিৎ হয়ে বসন্ত বললে, সুবাস, তুই এসেছিস্, বলেই বসন্ত চোখ বুজল। যেন এইটুকু চেষ্টায় সে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

অনন্ত বললে, ডাক্তারের নিষেধ, নড়াচড়া এমন কি কথাবার্ত্তাও যেন না বলে। ওঃ, কি দুর্ব্বলই যে হয়েছে তা আর কি বলব!

সুবাস সেদিন বসন্তদার তরুপোষের ধারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার বসন্তদা কি বাঁচবে?

একটু সামলে নিয়ে বসন্ত ফের চোখ খুলেছিল। ধীরে ধীরে বলেছিল, বাড়ীর লোক ছাড়লে, তোকে আসতে দিলে? বলেই চোখ বুজে ফেলেছিল।

কেষ্ট বললে, তোমার কোন ভাবনা নেই বসন্তদা, ও-ও—, মানে ও এখন আমার পরিবার।

বসন্তদা আর একবার চোখ খুলে ওদের দুজনের দিকে চেয়ে দেখে বলেছিল, তাই বুঝি, তা বেশ বেশ! ম্লান হেসে পুনরায় সে চোখ বুজেছিল।

কেষ্টর দিকে চেয়ে চাপা গলায় অনন্ত বলেছিল, হয়ে গেছে? কবে হোল? তারপর বসন্তকে বলেছিল, বসন্তদা, একবার থার্মোমিটার দেব যে।

দাও, চোখ বুজেই বলেছিল বসন্ত। কিছুক্ষণ পরে বোধ হয় যেন কেষ্টকে লক্ষ্য করেই বসন্ত বলেছিল, আমি ত বড়, তোরা ত আমায় দাদা বলিস, আশীর্ব্বাদ করি তোরা সুখী হোস্।

থার্মোমিটার দেখে খাতায় অঙ্কটা লিখে রেখে অনন্ত কেষ্টকে বললে, দু'ঘণ্টা অন্তর জ্বর দেখে লিখে রাখতে বলেছে ডাক্তার। তা সে যাক, তোমরা অতদূর থেকে আসছ, হাত মুখ ধুয়ে একটু সুস্থ হয়ে নাও। একটু থেমে বললে, কেষ্টদা, আমাদের সুবাস বৌদি এখন কিছুদিন থাকবে ত এখানে? সুবাসবৌদি কথাটা শুনেই সুবাসিনী সেদিন ঘাড় হেঁট করে নিয়েছিল।

কেষ্ট বললে, নিশ্চয়ই, সেইজন্যেই ত ওকে নিয়ে এলুম।

বসন্ত আর একবার চোখ চেয়ে কেষ্টকে বলেছিল ওর কোন অসুবিধে হবে না ত, তোমার বাবার কি এতে মত আছে?

কেষ্ট সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল, আছে।

একটু পরে বসন্ত কেষ্টকে বলেছিল, তুমিও তাহলে থেকো এখানে, অন্য কোন মেয়েছেলে নেই, একা ওর অসুবিধে হবে।

কেষ্ট বলেছিল, সে সব ঠিক হয়ে যাবে বসন্তদা, তুমি ওসব কিছু ভেবো না।

এর পর প্রায় দেড়মাস ঘনে-মানুষে টানাটানির পর সেদিন বসন্ত অরপথ্য করে বাইরের বারাণ্ডায় মাদুর পেতে শেষ পৌষের শীতে গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে রোদ্দুরটায় বসেছিল, সেদিন সে কেষ্ট ও সুবাসিনীদের অনেক কথাই একে একে শুনেছিল। সুবাসিনীর কংগ্রেস অধিবেশন আসার কয়েকদিন পরেই সুবাসিনীর বাবা এবং কেষ্টর বাবা দুজনে একসঙ্গে এখানে এসে অনেক রাগা-রাগি করে গেছে, কিন্তু অনন্তদের ভয়ে কোন কিছুই করতে পারে নি, বিশেষ করে সুবাসিনীর কান্নাকাটিতে। সুবাসিনী স্পষ্ট বলে দিয়েছিল যে, তাকে জোর করে নিয়ে গেলে সে গলায় দড়ি দেবে না হয়ত' জলে ডুবে মরবে। তার পর কেষ্ট এসে বলেছিল, বাবাকে ছাড়তে হয় সেও স্বীকার কিন্তু সুবাসের গায়ে কোন আঁচড় সে লাগতে দেবে না। পুরুত ডেকে বিয়ের চেয়েও অনেক বড় বিয়ে তাদের হয়ে গেছে, এবং বাবা যদি তাড়িয়েও দেয়, তাহলেও তারা স্বামী-স্ত্রী আজীবন বসন্তদার কাছ নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেবে ইত্যাদি। সুবাসিনীর বাবা বলে গেছে যে, সে মনে করবে তার মেয়ে মরে গেছে।

সব শুনে বসন্তদা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। শেষে বলেছিল, কাজটা ভাল করনি সুবাস। তোমার বসন্তদা বাঁচলেই বা কি আর মরলেই বা কি? কিন্তু গুরুজনদের মনে কষ্ট দিয়ে আমার কাছে এসে—

সহরে দেড়মাস বাস করে ডাক্তার থেকে সুরু করে নানালোকের সাথে মেলামেশা করে সুবাসিনী তখন বেশ একটু সাবলীল হয়েছিল সব দিক দিয়ে। পরিষ্কার বলেছিল, আমাদের কথা আমরা বুঝব বসন্তদা, সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমাকে যে আমরা সারিয়ে তুলতে পেরেছি এই ঢের। তুমি বাঁচালে হাজার হাজার লোক বাঁচবে, কিন্তু আমাদের ভালমন্দয় কারুর কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

বসন্ত ম্লান হেসে চুপ করে ছিল, কোন উত্তর দেয়নি।

তারপর আরও কিছুদিন পরে সন্দেহ হোল কেষ্টকে নিয়ে; সে ত আর এ মুখো হয় নি অনেকদিন। ব্যাপার কি?

বসন্ত তখন ঘোরাফেরা করতে সুরু করেছে। ওষুধ খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। মনে-মনে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, সুবাসিনীকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। কংগ্রেসের মধ্যে প্রবীণরা সকলেই ভাবতে লাগলেন যে, একা একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে এখানে এতগুলি ছেলের মাঝখানে থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই। প্রথমতঃ দৃষ্টিকটু, দ্বিতীয়তঃ এখানকার কংগ্রেস দলের বদনামও হতে পারে।

সব দিক ভেবে কেষ্টর কাছে অনন্তকে পাঠানো হোল। অনন্ত ফিরে এসে যা খবর দিলে তা একেবারেই হতাশার।

কেষ্টর বাবা সোজা বলে দিয়েছে যে, কেষ্ট যদি ফের ওমুখো হয়, কিংবা কুলত্যাগী মেয়েটাকে বউ বলে বাড়ীতে আনতে চেষ্টা করে তাহলে সে কেষ্টকে ত্যাজ্যপুত্তুর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। বিষয় সম্পত্তি বা দোকানে তার কোন অধিকারই আর থাকবে না। এইতে কেষ্ট এত ভয় পেয়ে গেছে যে সে আর অনন্তর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করে নি। অন্য লোকের মুখ দিয়ে অনন্তকে বলে দিয়েছে যে, সে আর এদিকে আসতেও পারবে না, বা অন্য কিছুই করতে পারবে না, বসন্তদা যেন মনে করে যে কেষ্ট মরে গেছে। সব শুনে বসন্তদা গম্ভীর হয়ে বলেছিল, ওই না

খানার মুচলেখা দিয়ে পালিয়ে এসেছিল। অনন্ত বলেছিল, হাঁ।

ক'দিন ধরে নানারকম দুশ্চিন্তার পর সুবাসিনী বলেছিল, বসন্তদা, এখানে ত আমাকে নিয়ে অনেকেরই অসুবিধা হচ্ছে. তাহলে এবার আমাকে ছেড়ে দাও, আমি না হয়—

বসন্ত বলেছিল, তুমি যাবে? কিন্তু কোথায় যাবে? তোমার বাবা কি তোমায় নেবে?

সুবাসিনী বলেছিল, চেষ্টা করে দেখব, যদি নেয় ভালই, না হয়ত—আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

মাটীর দিকে দৃষ্টি রেখে বসন্ত বলেছিল, দেখ্ সুবাস, তোর বসন্তদা এখনও এত অক্ষম হয় নি যে তার বোনের ভার সে নিতে পারবে না! তুই আমাকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিস্, সেটা অন্যে জানুক আর নাই জানুক, আমি ত জানি। প্রাণ থাকতে আমি তোকে ছাড়ব না, তাতে যার যা খুসি হয় বলুক। আমরা দুই ভাইবোনে আজীবন দেশের কাজই করব, তবে তোর যদি সংসার করতে ইচ্ছে হয়, তা হলে খোলাখুলি বলবি, ভাল ছেলে দেখে আমি তোর আবার বিয়ে দেব।

সেদিন সুবাসিনী ধীরে ধীরে বলেছিল, বসন্তদা, সিঁথির সিঁদুর একবার মুছেছিল, তখন আমি কিছুই জানতুম না, কিন্তু আবার যেদিন নদীর ধারে সূর্য্যের দিকে মুখ করে নিজে হাতে ওর দেওয়া সিঁদুর নিয়ে পরেছিলুম সেদিন থেকে সেই—সিঁদুরই তোর পরে আসছি। আশীর্ব্বাদ কর বসন্তদা, যেন এই সিঁদুরই মাথায় নিয়ে বাকী জীবনটা তোমার এবং দেশের সেবায় কাটিয়ে দিতে পারি।

সুবাসিনীর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে বসন্ত বলেছিল, এগিয়ে আয় ত।

সুবাসিনী ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল, বসন্ত ওর মাথায় হাত দিয়ে মনে মনে কি আশীর্ব্বাদ করেছিল সুবাসিনী তা জানে না; সে কিন্তু হেঁট হয়ে বসন্তর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। বসন্তদা কোনদিন কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেয় না, সেদিন কিন্তু সুবাসিনীর পায়ে হাত দেওয়ায় সে কোনরকম আপত্তিই করে নি।

এর পর কত রকম উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে ওদের দিন, মাস এবং বৎসরগুলো যে কেটেছে, সে কথা সুবাসিনীর ঠিক মত মনেই পড়ে না। বসন্তদার সঙ্গে সে কলকাতায় গেছে, সেখানে মহিলা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। নিরক্ষরা, নীচ জাতীয়া পল্লীবাসিনীকে কেউ ঘৃণা করেছে, কেউ অনুকম্পা দেখিয়েছে আবার কেউ বা সগোত্রীয়ের মতন আচরণ করেছে। পুরুষের মধ্যে যারা ওর দেহসৌষ্ঠবে আকৃষ্ট হয়েছে বলে অণুমাত্রও সন্দেহ করেছে, নির্ম্মম আঘাতে সেই সব লোভীদের চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে ওর এতটুকুও দ্বিধা হয় নি। লেখাপড়া না জানলেও শুচিয়ে কথা বলতে শিখেছে, চরকা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে। গ্রামসেবিকাদের অন্যতম হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে সেবা এবং প্রচার করে বেড়িয়েছে এবং ওর জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে সেই দিন যেদিন ও কলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করার সুযোগ পেয়েছিল। সবই বসন্তদার কৃপায় হয়েছিল। হাজার হাজার দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেও ও বেশ বুঝতে পারত যে বসন্তদা ওর কথা এক মুহূর্ত্তও ভুলত না, ছোট বোনটির দিকে বসন্তদার দৃষ্টি ছিল সদা জাগ্রত।

এর পর ঘনিয়ে এসেছিল আরও কঠিন এবং কঠোর সব দিন। সুবাসিনী শুনেছিল, বিলাতে ইংরেজ এবং জার্ম্মানীর লড়াই বেধেছিল। বসন্তদারা সকলেই একটা কিছু ভয়ঙ্কর সংকল্প নিয়ে ব্যস্ত। তারা দাবী তুলেছিল, ইংরেজকে ভারত ছেড়ে যেতে হবে। ইংরেজও সহজে যাবে না। ধর পাকড় সুরু হয়ে গেল। কোথায় কখন কি অবস্থায় কি কাজ করতে হবে, বসন্তদা দলের সব ছেলেদের সে বিষয়ে তালিম দিতে লাগল, কতকগুলি মেয়েকে নিয়ে কোথায় কি করতে হবে সেই ভার পড়েছিল সুবাসিনীর ওপোর। কিন্তু বেশী দিন সেই সব কাজ ওকে করতে হয় নি। সুবাসিনী তখন ছিল মেদিনীপুরে, বসন্তদা বর্দ্ধমান না কোথায় যেন ছিল ঠিক মনে পড়ে না। মেদিনীপুর থেকেই সুবাসিনী শুনেছিল যে বসন্তদাদের সমস্ত দলকে পুলিশে আটক করেছে। শুনে সুবাসিনী মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল, কারণ মেদিনীপুরে সে তখন চোখের সামনেই পুলিশের গোলাগুলি এবং অত্যাচার দেখছিল। তার মনে একটা প্রচণ্ড ভয় ছিল পাছে তার বসন্তদার দৈহিক কোন ক্ষতি হয়। সুস্থ শরীরে বসন্তদা আটক হয়েছে শুনে সে খুসিই হয়েছিল, ভেবেছিল বসন্ত

এই সমূহ বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। আর তা ছাড়া একথাও সে শুনেছিল যে, মহাত্মা গান্ধী থেকে সুরু করে সমস্ত বড় বড় নেতাদেরই পুলিশ আটক করে জেলে রেখেছে তারা, ওর বসন্তদাও ঐ সব নেতাদের সঙ্গে এক সঙ্গে একই জেলে আটক আছে। তাহলে ওর বসন্তদা আরও বড় আরও উঁচুদরের হয়ে জেল থেকে একদিন না ফিরবে। সেদিন সেদিন তার ইংরেজ দেশ ছেড়ে পালাবে আর সেদিন বসন্তদাকে ফিরে পেয়ে ওর যে কি আনন্দই হবে! সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর রাত্রে চেটাই পেতে শুয়ে পরের দিন কোথায় কি করতে হবে, কাকে কি বলতে হবে, কি ভাবে ওদের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই সব চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল ভাবেই ওর মনের মধ্যে আর একটা চিন্তার ধারা অব্যাহত থাকত যে, যেদিন বসন্তদাকে আবার ও নিজের সামনে পাবে সেদিন ও কি ভাবে তার কথা সব শুনবে এবং তার দেওয়া দায়িত্ব ও কিভাবে পালন করেছে সেই পরিচয় আনুপূর্বিক ভাবে দিয়ে ওর কর্তব্য ও কেমন করে সম্পাদন করেছে তার হিসাব নিকাশ করবে।

কিন্তু এই ভাবে সুবাসিনীদের বেশী দিন কাটে নি। মেদিনীপুরেই পুলিশ ওদের দলকে দল আটক করে। হাসিমুখে নানারূপ দৈহিক নির্যাতন সহ্য করেও তার দলের কোন সংবাদই পুলিশকে দেয় নি এটাই ওর পরম গৌরব বলে ও মনে মনে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিল। তারপর বিচার এবং কারাবাস। দিনের পর দিন মাসের পর মাস এক মেয়ে কারাজীবনে সুবাসিনী মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলেছে কিন্তু সন্ধ্যার পর নিজের কম্বল শয্যায় একান্তে শুয়ে যখন সে আপন মনে তার বসন্তদার সঙ্গে গুজ গুজ করে কথা বলত, তখন তার মনেও হোত না যে বসন্তদা তার কাছ থেকে বহু বহু মাইল দূরে অন্য এক কারাগারে আবদ্ধ হয়ে আছে এবং তার আর এ জীবনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কোন সুযোগই মিলবে না।

কিন্তু কয়েক বছর পরেই সেই সুযোগ ওরা আবার পেয়েছিল। ইংরেজের জেল থেকে সমস্ত স্বদেশী কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং খালাস পাবার কিছুদিন পরেই ও বসন্তদার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, বসন্তর কাছে ও ঠিক নিজের চেয়ার যেতে পারে নি, বসন্তই ওর কাছে খোঁজ করে এসেছিল। প্রথম ও কোন কথাই বলতে পারে নি, ওর চোখে জল এসে পড়েছিল, গলাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বসন্তই প্রথম কথা বলেছিল। বলেছিল, সুবাস, তোর চেহারা এত খারাপ দেখছি কেন রে, জেলে খুব কষ্ট দিয়েছিল বুঝি? কোন অসুখ বিসুখ করেছিল না কি?

সেদিন ও ঘাড় নেড়ে বলেছিল, না।

বসন্ত বলেছিল এবার আর ভয় নেই যে এবার আমরা স্বাধীন হতে পারব বলেই মনে হয়ে!

ধরা গলায় ও শুধু বলেছিল, শুনেছি।

এর পর বসন্ত ওরা থাকবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল কলকাতায় ওদেরই এক মহিলা সমিতির ঘরে। এক-তোলায় ছিল সেই মহিলা সমিতির দোকান, নানারূপ কুটীর শিল্পের জিনিষ খাদি কাপড় সিলিণ্ডার আচার নানা-রকম বড়ি পাপর ইত্যাদি সেখানে বিক্রয় করতে হোত, এবং সেই সঙ্গে দোতলার ঘরে বসে নেতাদের ফরমাস অনুযায়ী তিনরঙা ধ্বজা গান্ধী টুপি এ সবও তৈরী করতে হোত। সুবাসিনী তখন সেলাইয়ের কল চালিয়ে এই সব ছোট খাট জিনিষ সেলাই করতে শিখে নিয়েছিল।

এই ভাবেও কেটে গিয়েছিল এক বছরের ওপোর। এ'মাসে ছ'মাসে এক একদিন দু'পাঁচ মিনিটের জন্য সে বসন্তদার দেখা পেত বাকী সময় শুনত, বসন্ত খুব ব্যস্তভাবে নানা স্থানে ঘোরাঘুরি করছে। আজ দিল্লী কাল বোম্বাই পরশু হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় শান্তির ব্যবস্থা এই সব কাজে বসন্তদা আপ্রাণ খাটছে এই রকম খবরই সে পেত। একদিন শুনলে যে বসন্তদা গান্ধীজীর সঙ্গে নোয়াখালিতে পায়ে হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন ওর এক সহকর্মিণী ওকে একখানা খবরের কাগজের ছবি দেখিয়ে নিজ্ঞাসা করেছিল, গান্ধীজীর সঙ্গে কার ছবি ছাপা হয়েছে দেখ্‌ত, সেদিন মহাত্মাজীর পাশে বসন্তদাকে ছবির মধ্যে দেখে ওর বুকখানা গর্ব হাত ফুলে উঠেছিল। বসন্তদা তাহলে দ্বিতীয় গান্ধীজী হয়ে উঠেছে। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল, বসন্তদার যেন কোন বিপদ না হয়।

তারও বেশ কিছুদিন পরে একদিন বসন্তদা এল ওর সঙ্গে দেখা করতে। বসন্ত বলেছিল, সুবাস, তোমার কাছে

একটা দরকারী কথা বলতে এলুম, একটু মিরিবিলিতে বলতে চাই।

কথার ভঙ্গিতার সুবাসিনী ভীত হয়েছিল, তবে কি বসন্তদার কোন বিপদ হয়েছে নাকি?

অনন্তদা বলেছিল, সুবাস, তুমি নিশ্চয়ই জান ইংরেজ কংগ্রেসের হাতে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই দেশ শাসন করার ভার নিচ্ছে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের আজীবন কর্মী-রাই ভোটের জোরে এক একটা জায়গা থেকে নির্বাচিত হয়ে সেই শাসনভার গ্রহণ করবে। বসন্তদা কংগ্রেসের ওপোরওয়ালাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিজের জন্ত ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়েছে, কিন্তু আমাকে কোন জায়গা দিতে রাজী হচ্ছে না, তুমি যদি—অনন্তর কথায় বাধা দিয়ে সুবাস বলেছিল, সেকি অনন্তদা, বসন্তদা তোমাকে জায়গা দিতে চাইছে না, এও কি হয় নাকি? তুমি—তুমি এতকাল—

হতাশার মুদ্রায় হাত ঘুরিয়ে অনন্ত বলেছিল, তাই ত দেখছি। তুমি ত জান সুবাস, বসন্তর জন্ত এতকাল ধরে আমি কি করেছি! আর এও জেনে রাখ যে, বসন্তকে এই লাইনে আমি-ই প্রথম এনেছি। এ সব হয়ত তুমি শোননি, কারণ তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগের ব্যাপার সব, কিন্তু শুনে রাখ, বসন্তদা কলেজে আমার এক ক্লাশ ওপোরে পড়ত। ওর বাড়ীতে ওকে কেউ দেখতে পারত না। ওর বাবা সামান্ত চাকরী করতেন, কিন্তু সেই সামান্ত আয় সত্ত্বেও বসন্তর মা যখন পাঁচটি ছেলেমেয়ে রেখে মারা যান তখন বসন্তর বাবা ফের বিয়ে করেন। বসন্তই হল বড় ছেলে, ও তখন স্কুলে পড়ত। তারপর ও যখন ম্যাট্রিক পাশ করে, তখন ওর বাবা ওকে চাকরীতে ঢোকার জন্ত জোর করেন। কিন্তু বসন্তদা কিছুতেই চাকরীতে না ঢুকে নিজে ছেলে পড়িয়ে নিজের খরচ চালাবে এই রকম স্থির করে কলেজে ভর্তি হয়। দু'বছর পড়েও ছিল, কিন্তু ছেলে পড়ানর কাজ ওর শেষের দিকে ছিল না, এবং তাই এ পরীক্ষায় ও ফেল করল। শেষে সংসার ওর পেছনে এমনভাবে লাগল যে, ও আর বাড়ীতে টিকতে পারছিল না। এই সময় আমরা সব ছিলুম সুভাষ বোসের দলে মানে এখন যাকে তোমরা নেতাজী বলছ। একটা বন্যাত্রাণের কাজের জন্ত সুভাষ-বাবু তখন কলেক্টিভার খুঁজছিলেন। আমি তখন বসন্তদাকে সেই দলে ঢুকিয়ে দিই এবং বসন্তদা সেই কাজ নিয়ে চলে যায়। আমার পরীক্ষার বেশী দেরী ছিল না বলে আমি ওদের দলের সঙ্গে সেবার যেতে পারি নি বটে, কিন্তু সহরে থেকে টাদা তোলার কাজে নিরলসভাবে সাহায্য করলুম তারপর আমার পরীক্ষা হয়ে গেল এবং আমি বি এ পড়তে ঢুকলুম। এরও কিছুদিন পরে আমার বাবা মারা যান, আমার মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। দাদা সামান্ত মাইনের চাকরী করতেন, দু'তিনটে ছেলেমেয়েও হয়েছিল। দাদা বললে, আর পড়াতে পারব না, যে কোন একটা চাকরীতে ঢুকে পড়। ঢুকেও ছিলুম চাকরীতে, কিন্তু একদিন সেই চাকরী থেকে পালাতে বাধ্য হলুম। তারপর সুভাষবাবুর দলের একজন আমাকে জোর করে কংগ্রেস ভলান্টিয়ার দলে টেনে আনে। সেই থেকে আমি এই দলেই আছি এবং বসন্তদার সঙ্গে প্রায় একই সঙ্গে বরাবর কাজ করেছি, পুলিশের মার খেয়েছি, জেল খেটেছি। কিন্তু আজ যখন ভোটের কথা উঠছে, তখন বসন্তদাই বলছে, আমি নাকি ভোটে দাঁড়াবার উপযুক্ত নই, এবং বসন্তদা আমাকে আর আমল দিতে চাইছে না।

সুবাসিনী অবাক হয়ে এই সব কাহিনী শুনেছিল। বসন্তদার বাড়ীর কথা এর আগে ও কোনদিনও শোনে নি, এমন কি বসন্তদার বাল্যজীবন বলে যে কিছু একটা থাকতে পারে, তাও ও যেন ভাবতে পারত না। সব কথা শুনে ও বলেছিল, আমি কি করতে পারি অনন্তদা?

অনন্ত বলেছিল, তুমি যদি বসন্তদাকে আমার জন্ত একটু বলে দাও তাহলে ও বোধ হয় তোমার কথা ফেলতে পারবে না।

মনে মনে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করে সুবাসিনী বলেছিল, তাই বুঝি? বেশ, তাহলে আমি তোমার জন্ত নিশ্চয়ই বলব, কিন্তু—কিন্তু বসন্তদার দেখাই যে পাই না! কি করে বলব?

অনন্ত বলেছিল, সেজন্ত তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার নাম করে আমি বসন্তদাকে ডেকে দেব। যে কোন কাজই থাকুক না কেন, তুমি ডেকেছ শুনলে বসন্তদা সব কাজ ফেলে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করতে আসবে।

পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুবাসিনী সেদিন অনন্তদাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, বসন্তদার দেখা পেলেই সে এ বিষয়ে বলে অনন্তদার একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দেবে।

এর কয়েকদিন পরেই একদিন দুপুরে বসন্তদা এসে হাজির হয়েছিল। কোন রকম ভনিতা না করেই জিজ্ঞাসা করেছিল, কি ব্যাপার সুবাস? তুমি আমায় ডেকেছ কেন? তুমি নাকি অসুস্থ?

সুবাসিনী নিজের কুশল সংবাদ দিয়ে অনন্তর জন্য যথা-সাধ্য সুপারিশ করেছিল।

শুনেই অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে বসন্ত বলেছিল, ও, এ তাহলে সমস্তই অনন্তর কাণ্ড। এইজন্যেই সে আমাকে —বসন্ত আর কিছুই বলে নি।

উৎসুক হয়ে সুবাসিনী সেদিন বসন্তদাকে বলেছিল, তাহলে অনন্তদার ব্যবস্থা তুমি করবে ত? সে এলে তাকে কি বলব?

গম্ভীর হয়ে বসন্ত বলেছিল সুবাস, এ সব হোল হাই পলিটিক্স, তুমি এসব কিছুই বুঝবে না। অনন্ত যে কি, তার নতিগতি যে কোন দিকে যাচ্ছে, তা তুমি কিছুই জান না, শুনলেও বুঝবে না। আমি বলছি, তুমি এ সবের মধ্যে থাকবে না। কাকে কি দেওয়া হবে অথবা হবে না, সে সব ওপোর থেকে সাব্যস্ত হবে, এ সব বিষয়ে তোমার কোন কথা বলা উচিত নয়, এইটুকুই মনে রেখ।

বন্ধুর সামনে সুবাসিনী কেমন যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গিয়েছিল। অনন্তদার জন্য ব'লে সে কি খুবই একটা অন্যায় কিছু করেছে!

বসন্তদা চলে গিয়েছিল এবং তারপর দিনই যখন অনন্তদা এসেছিল তখন সুবাসিনী তার দিকে ভালভাবে চেয়ে দেখতে পর্য্যন্ত পারে নি। ধীরে ধীরে সব কথা সে অবশ্য বলেছিল, শুনে অনন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, থাক্, এ পর্ব্ব তাহলে চুকল।

সুবাসিনী মুখ তুলে বলেছিল, কি পর্ব্ব অনন্তদা?

সুবাসের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অনন্ত আপন মনেই বলে উঠেছিল, ওরে পথিক, পথ-চলা তোর অনেক বাকী, অনেক বাকী-ই।

অনন্তর ভঙ্গী দেখে সুবাসিনী যেন একটু ভয়ই পেয়েছিল, বলেছিল কোথাকার পথ চলা অনন্তদা।

অনন্ত আর একটা নিঃশ্বাস ফেলে যেন বুকখানা খালি করে নিয়ে সুবাসিনীকে বলেছিল, সুবাস, হয়ত, তোমার সঙ্গে আর আমার শিগ্‌গির দেখা নাও হতে পারে, কিন্তু— কিন্তু বসন্তদা যদি জিজ্ঞাসা করে তা হলে যেন বোলো না যে, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করেছি। বলবে, সে আসে নি।

এবার সুবাসিনী রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। মিথ্যাকে সে এতকাল ঘৃণা ক'রেই এসেছে, সেই মিথ্যা সে বসন্তদার কাছে কেমন করে বলবে? ধীরে ধীরে বলেছিল, যদি বসন্তদা জিজ্ঞাসা করে তুমি এসেছিলে কি না, তাহলে কি হবে?

অনন্ত বলেছিল, স্পষ্ট বলবে, সে আসে নি।

সুবাস বলেছিল, কিন্তু মিথ্যে কথা কি করে বলব অনন্তদা, তোমরাই ত শিখিয়েছিলে—

হাসি-হাসি মুখে অনন্ত বলে, ও-সব পুরাণো নীতিকথা ছেড়ে দাও। বসন্তদা নিজেই এখন ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে।

সে কি? অবাক-বিস্ময়ে সুবাসিনী অনন্তর দিকে চেয়ে ছিল।

হ্যাঁ ভাই। তোমার বসন্তদা লোকটি সোজা নয়, সাবধানে বুঝে-সুঝে চলবে ওর সঙ্গে।

কেন অনন্তদা, আমার সঙ্গে—

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অনন্ত বলেছিল, ও এখন নিদারুণ স্বার্থপর, সুবিধাবাদী হয়ে উঠেছে। এই আমাকে যেমন দূরে সরিয়ে দিলে, তেমনি ওর যেদিন দরকার হবে, সেদিন তোমারও যে কোন রকম সর্ব্বনাশ করতে ওর এতটুকুও আটকাবে না। আচ্ছা, এখন চলি, আমার কথা মনে রেখ। অনন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং সুবাসিনীর মনে হোল সে যেন অতল জলে তলিয়ে যাচ্ছে। এর পর সারাটা দিন সে সহকর্ম্মিণীদের সঙ্গে পর্য্যন্ত ভালভাবে কথা কইতে পারে নি।

ওর গাম্ভীর্য্য দেখে ওর এক সহকর্ম্মিণী টিটকারী দিয়ে বলেছিল, ওর কি আর আমাদের মত চুনোপুঁটির সঙ্গে মেলামেশা করা সাজে, ও যে বড় গাছে বাসা বেঁধেছে। বসন্তদা ওর হাতের লোক।

এর পরও যখন সুবাস নীরব ছিল তখন অপর একটি মেয়ে টিটকারী দিয়ে বলেছিল, কি ভাই, তুমি কি আর আমাদের সঙ্গে কথাই কইবে না, কিন্তু মনে রেখ, বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে রাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ'। এতেও সুবাসিনী কোন উত্তর দেয় নি, তার ডাগর চোখ দুটি একবার তুলে ধীরে ধীরে আবার নামিয়ে নিয়ে নিজের হাতের কাজে মন দিয়েছিল।

এর পর বসন্ত অনেক দিন আসে নি, সুবাসকে কোন মিথ্যা কথাও বলতে হয় নি।

বেশ কিছুকাল পরে বসন্ত একদিন এসেছিল, পায়ে হেঁটে নয়, জীপ গাড়ীতে। এসেই কর্তাদের বসবার ঘরে বসে সেখানেই চা খাবার ইত্যাদি আনিয়ে খেতে খেতে সে সুবাসিনীকে ডেকে পাঠিয়েছিল। এ-বাড়ীতে এসে বসন্ত এ রকম ব্যবহার এর আগে কোনও দিনই করে নি। সে আসত খুবই সাধারণ হয়ে, অন্তরঙ্গ ভাবে। আগে আগে প্রথমেই এসে সুবাসিনীদের কারখানা ঘরে অর্থাৎ যেখানে সেলাই, বোনা, চরখা কাটা হোত, সেই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইত, সুবাসের সঙ্গে বিশেষ কোন কথা থাকলে তাকে ডেকে সিঁড়ির সামনের চাতালে দাঁড়িয়ে দু' চারটে কথা বলে আবার চলে যেত, কিন্তু তার এই আজকের ব্যবহারটা সুবাসিনীর ভাল লাগে নি। সুবাসিনী টের পেয়েছিল যে, বসন্তদা এসেছে কিন্তু এ-ঘরে না-আসার জন্য কেমন একটা চাপা অভিমান যেন তাকে পেয়ে বসেছিল, সে বেশ চেষ্টা করেই নিজের কাজে ঘাড় গুঁজে বসেছিল। শেষে যখন নন্থ অর্থাৎ দোকানে কাজ করার জন্য যে ছোকরাটা এখানে বেশ কিছুদিন যাবৎ বহাল ছিল,সে এসে খবর দিলে সুবাসিনী দিদিমণিকে বাবু ডাকছেন। তখন সবশুদ্ধ মিলিয়ে তার মনে সে বেশ একটা আঘাতই পেয়েছিল। সেই সেদিনেই সুবাসিনীর প্রথম মনে হয়েছিল যে, সে একজন খোর-পোষ পাওয়া কর্মচারী মাত্র এবং বসন্তদা, না-না বসন্তবাবু ওপোরওয়ালা মনিব ছাড়া আর কিছুই নয়।

পায়ে-পায়ে ধীরে-ধীরে সুবাসিনী অফিস ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বসন্ত তখন টেবিলে খাতা রেখে কি যেন লিখছিল। টেরও পেলে না যে সুবাসিনী এসেছে।

সুবাস দেখলে, তার বসন্তদা অনেকখানি বদলে গেছে। খাবারের প্লেট এবং চায়ের কাপ ডিস টেবিলের এক কোণায় পড়ে রয়েছে, বসন্তদা সোনা বাঁধানো কলমটা হাতে নিয়ে আপন মনে কি যেন লিখছিল। ধোপদোরস্ত খদ্দরের পাঞ্জাবী, তার ওপোর আবার কাঁধে চাদর, টেবিলের তলা দিয়ে পা দুটো দেখা যাচ্ছে, সেই পুরাতন অভ্যাস চঞ্চল ছিল না পায়ে, তার বদলে অত্যন্ত চকচকে এলবার্ট জুতো, চেহারাটাও বেশ ভাল হয়েছে। বেশ ভরাট মুখ, কালো পেশের চশমা, এক কথায় বলতে বসন্তদাকে আর যেন ঠিক বসন্তদা বলে মনেই হয় না। সুবাসিনীর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। ওদের পাশের গাঁয়ের বারোয়ারী দেওলা পুজোয় ও যখন বাবার সঙ্গে গিয়েছিল, তখন দেখেছিল ওদের জমিদারকে। জমিদার বাবু নিজের ঘোড়ার গাড়ী থেকে নেমে যখন ঠাকুর প্রতিমার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন ওরা সকলেই সভয়ে পথ ছেড়ে দূরে দূরে সরে দাঁড়িয়ে দেখেছিল ও প্রণাম করেছিল। বসন্তদার আজকের এই চেহারাটার সঙ্গে সেই ছেলেবেলা তার দেখা জমিদারবাবুর চেহারার কোথায় যেন সাদৃশ্য ছিল। অজ্ঞাতসারেই সুবাসিনীর মনে হয়েছিল, এই বাবু মশাইটি তার বসন্তদা, না অন্য কেউ!

কলম রেখে ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজিয়ে বসন্ত যখন মুখ তুলে চেয়েছিল তখনই সে সুবাসিনীকে দেখতে পেয়েছিল। দেখেই বলেছিল, এই যে সুবাস, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এস।

কথা শোনা মাত্রই সুবাসিনীর সমস্ত সংকোচ কেটে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল না, এ তার বসন্তদাই বটে, খোলস যাই হোক, বসন্তদা ঠিকই আছে।

নিঃসঙ্কোচে সুবাসিনী টেবিলের ধারে এসে দাঁড়াল। ঘণ্টার শব্দ শুনে নন্থ ছেলেটাও পেছন পেছন ঘরে ঢুকল।

বসন্ত নন্থর দিকে চেয়ে কাপ ডিসগুলো দেখিয়ে দিলে। নন্থ সেগুলো ওপোর ওপোর সাজিয়ে তুলে নিয়ে চলে গেল। সুবাসিনীর মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, বসন্তদা নন্থকে দিয়ে এঁটো বাসনগুলো পাঠিয়ে দিলে, কই তাকে ত বলে না, সুবাস এগুলো নিয়ে যাও।

বসন্ত বলে, তারপর সুবাস, কেমন আছ বল। নানা ঝঞ্ঝাটে এত ব্যস্ত ছিলুম যে, অনেকদিন এদিকে আসতেই পারিনি, তা কেমন আছ, এদিককার খবর কি?

ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা রেখে নিজের আঙুলের নখটি দেখতে দেখতে চাপা গলায় সুবাস বলে, ভাল।

কলমটা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বসন্ত বলেছিল, শোন সুবাস, ভোটের জন্য দাঁড়াচ্ছি, এখানে নয়, অনেক দূরে, মফঃস্বলে। এখনই সেখানে গিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। সেখানকার অফিসে সব সময়ই অনেক লোকজন আসবে যাবে, তাদের খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত ঐ অফিস বাড়ীতেই করা হচ্ছে। তোমাকে আমি সেইখানেই নিয়ে যেতে চাই, তুমি রান্না-উঁড়ার, খাওয়া-থাকার চার্জে থাকবে, মানে ঐ সব তার তোমাকে নিতে হবে, পারবে ত?

সুবাস চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

ওর মুখের দিকে চেয়ে বসন্ত বলেছিল, কি, হোল কি তোমার? শরীর খারাপ নাকি? এ রকম মিইয়ে গেছ কেন? তোমাকে যেতে হবে এবং এই সব কাজ করতে হবে, বুঝেছ?

করব, আস্তে আস্তে সুবাস উত্তর দিয়েছিল।

হাঁ, এই ত চাই, কিন্তু ওরকম করে কথা কইছ কেন? জোরের সঙ্গে কথা বল। উৎসাহের সঙ্গে কাজ কর। এ আমাদের স্বাধীন দেশ, এখন সমস্ত কাজই আমাদের ঘরের কাজ, নিজের কাজ বলে নিতে হবে। এখনই ত আমাদের আসল দায়িত্ব। তোমার বসন্তদাকে ভোটে জয়ী করতে হবে, তবে না কথা!

হঠাৎ যেন সুবাসিনী দেহে মনে বল পেয়ে গেল। ঘাড় তুলে বলেছিল যাব বসন্তদা। যে দিনেই বলবেন সেই দিনেই যাব।

আবার বলবেন কেন, এত তাড়াতাড়ি কি আমায় নইবে যে? বসন্ত হাসতে হাসতে বলেছিল।

মুখ তুলে বসন্তর দিকে চেয়ে সুবাসিনী বলেছিল, কবে নিয়ে যাবে বসন্তদা, আজই যাব না কি?

হাসিমুখে বসন্ত বলেছিল, কবে কোথায়, কিভাবে এ সব কি তোর বসন্তদা আগে থেকে কখনও বলে রে, যখন যা করতে হবে তখনই সেটা টের পাবি, তার আগেও না, পরেও নয়। শুধু বলুম, তৈরী থাকিস, যখন যেখানে ডাকব, তখনই সেখানে যেতে হবে।

চেয়ার ছেড়ে বসন্ত উঠে দাঁড়াল। ওরা দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

পুরাতন ধাঁচওয়ালা বড় একটা বাড়ীর বাহির-মহলে বসন্তর নির্ব্বাচনী অফিস। হেটড়া এবং বৈঠকখানায় অনবরতই লোকের ভিড়। বাইরে বাড়ীর দুয়ারে সব সময়ই দু'চারখানা জীপ গাড়ী আসছে এবং যাচ্ছে। পোষ্টার, প্ল্যাকার্ড, হ্যাণ্ডবিল, ভিনরঙা ধ্বজা, মেগাফোন, মাইক সুবাসিনী যতই দেখে ততই তার মনটা আনন্দে দুলে ওঠে। এ সবই তার বসন্তদার জন্য, এ ছাড়া আরও একজন লোকের নাম সে শুনছে, সে সরোজবাবু। বসন্তদা বাংলাদেশের জন্যে এবং সরোজবাবু দিল্লীর জন্য দাঁড়িয়েছেন। ছেলেরা এখানে সর্ব্বদাই আলাপ আলোচনা করছে, সকালে এবং বিকালে গ্রাম-গ্রামান্তরে মিটিং করছে। বসন্তদা এবং সরোজবাবুর নাম করে চেঁচাচ্ছে। এমন একটা হৈ হল্লোড় করে দিন কাটছে যে সুবাসিনী সব দেখে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মনে সর্ব্বদাই কেমন একটা উল্লাস, একটা অখণ্ড উত্তেজনা ছিল।

ভোর পাঁচটা থেকে বেলা একটা পর্য্যন্ত সে রান্না এবং উঁড়ার নিয়ে ব্যস্ত থাকত। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে একটু বসতে না বসতেই আবার চা খাবার পালা। চা মুড়ি সিঙ্গাড়া পাঁপরভাজা প্রচুর পরিমাণে তৈরী করে বাইরের ঘরে পাঠানো হোত, তারপর দলে দলে ছেলেরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় চলে যেত। আবার ভিড় হোত রাত্রি আটটা থেকে। খাওয়ার পর্ব্ব চুকতে সেই যায় নাম রাত্রি বারোটা। তারপরও সুবাসিনী দেখত, বসন্তদা বাইরের ঘরে কয়েকজনকে নিয়ে কত সব আলাপ করত। দুটো টাইপ কল ঠক্ ঠক্ করে রাত্রি একটা দেড়টা পর্য্যন্ত কি সব ছাপত। আবার একটা কল ছিল এমন যে একবার করে হাতল ঘুরোলেই একখানা করে লেখা কাগজ বেরিয়ে এসে এক এক গোছা কাগজ তৈরী হয়ে যেত। সেই সব কাগজ ওরা থাক দিয়ে দিয়ে টেবিলে গুছিয়ে রাখত। বিশ্রাম নেই, ঘুম নেই, বসন্তদা দিনরাত ভোটের কাজে লেগেছিল! একই বাড়ীতে বাস করেও দু'চারদিনের মধ্যে হয়ত বসন্তদার সঙ্গে সুবাসিনীর এক আধবার মাত্র দেখা হোত। হয়ত এক সপ্তাহ পরে একদিন মাত্র

বসন্তদা জিজ্ঞাসা করলে, কি রে, কোন অসুবিধা নেই ত! সুবাসিনীর অনেক কিছু বলার মত থাকলেও পাছে এতরকম কাজের মধ্যে বসন্তদার আবার কোন নতুন দুর্ভাবনা হয় সেই ভয়ে সে বরাবরই ঘাড় নেড়ে বলত, না, সব ঠিক আছে।

কিন্তু সুবাসিনী জানত, সব ঠিক ছিল না। ভাঁড়ারের যোগাড় সে সব সময় ঠিকমত পেত না, রান্নার জন্য যে দু'জন রাঁধুনী বহাল ছিল, তারা তার কথা সবসময় ঠিকমত শুনত না, কয়েকজন কর্ম্মী সুবিধে পেলেই এটা ওটা চুরি করে বাইরে চালান দিত, এ ছাড়া আরও কয়েকজনকে তার বিশেষ রকম সন্দেহ হোত তাদের চালচলন দেখে। তারা গুজ্ গুজ্ করে দর্ব্বদাই কি যেন পরামর্শ করত এবং ওকে হঠাৎ দেখলেই থতমত খেয়ে প্রথমে চুপ করে যেত এবং তারপরই এদিক ওদিক সরে পড়ত। কিন্তু এটাও সে লক্ষ্য করত যে, 'বসন্তদাকে বলে দেব' বলে রাগারাগি করলে অনেক কাজের সুরাহা হয়ে যেত। এ ছাড়া কোন কিছু সুযোগ সুবিধে আদায় করার জন্য কেউ কেউ সুবাসিনীর কাছে উমেদারীও করত। এখানকার অনেকেই তাকে 'আপনি' বলে কথা কইত। প্রথম প্রথম 'আপনি' শুনে তার বেশ লজ্জাই করত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেটা যে শুধু সয়েই গেল তা নয়, অচেনা কোন লোক বিশেষতঃ কম বয়েসী কেউ তাকে তুমি বললে সে বেশ বিরক্তই হোত। এই সব নানারূপ সুবিধা অসুবিধার মধ্যেও সুবাসিনীর দিনগুলো এই নির্ব্বাচনী ক্যাম্পে ভালই কেটে-ছিল, কারণ সকাল বিকাল দুবেলাই সে বসন্তদাকে দেখতে পেত, যেমন পেত তার বাবার বাড়ীতে, এবং এখানে সে বুঝতে পারত যে এই বিরাট যজ্ঞের মধ্যে সে নিজে একজন মধ্যমণি। খাওয়া এবং কে-কোথায়-শোবে তার ব্যবস্থা সে না করলে সবই যানচাল হয়ে যাবে এটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারত। এই গুরুদায়িত্ব বহন করার দুর্জ্জয় আনন্দ সে মনে মনে ভালভাবে উপভোগ করত।

ওরই ভেতর একদিন সন্ধ্যেবেলা বসন্তদা ওর ভাঁড়ারের দরজার সামনে এসে ডাকলে, সুবাস! সুবাস তখন কি যেন গুছোচ্ছিল, তাড়াতাড়ি সামনে এসে বলেছিল, কি দেব বসন্তদা!

হাসিমুখে বসন্ত বলেছিল, কিচ্ছু দিতে হবে না, কিন্তু শোন। কাল ভোরবেলা, মানে সাড়ে ছ'টার মধ্যে তুমি বেশ ভাল রকম ব্যবস্থা করে সকলকে খাইয়ে নেবে। কালই আমাদের আসল দিন। আমরা সাড়ে ছ'টার সময় সবাই বেরিয়ে পড়ব। তারপর বেলা এগারটার সময় খালি গাড়ীগুলো এখানে ফিরে আসবে। ড্রাইভারদের ভাত খাইয়ে কাগজের প্যাকেটে লুচি তরকারী এবং দুটো করে দরবেশ দিয়ে তিনশ' প্যাকেট তৈরী করে রাখবে। সেই প্যাকেট কোন্ ড্রাইভার কতগুলো নেবে সে সমস্ত দিবের শঙ্করের কাছে থাকবে। সে গুছিয়ে গাড়ীতে তুলে দিয়ে যাবে। তারপর তোমরা নিজেরা খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে বেলা তিনটে নাগাদ ডালভাত এবং মাংসের ঝোল তৈরী করবে দু'শো লোকের জন্য। আমরা সবাই ফিরব সন্ধ্যে নাগাদ। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে অনেকেই চলে যাবে, পঁচিশ ত্রিশজন হয়ত রাত্রে এখানে থাকবে। এই সব ব্যবস্থা গুছিয়ে করবে।

সুবাসিনী ঘাড় নেড়ে বলেছিল, আচ্ছা, তারপর প্রশ্ন করেছিল, কালই বুঝি ভোটের শেষ দিন?

বসন্ত বলেছিল হ্যাঁ, একটু থেমে বলেছিল, ভগবান মুখ তুলে চাইলে কাল জিতব, আর না হলে—

বসন্তর কথা চাপা দিয়ে সুবাস বলেছিল, তুমি নিশ্চয়ই জিতবে বসন্তদা। কোন ভয় নেই, আমার মন বলছে তুমি জিতবে। এত চেষ্টা কখনও বিফলে যাবে না।

ম্লান হেসে বসন্তদা বলেছিল, দেখা যাক্ কি হয়। আমাদের বিরুদ্ধে সমস্ত জমিদারগোষ্ঠী যে দাঁড়িয়েছে, তা জানিস্।

শুনেছি বসন্তদা, ওদের গাড়ীও দেখেছি এবং চিৎকারও শুনেছি, কিন্তু ওদের আর কতন লোক।

অনেক লোক আছে রে, অনেক লোক আছে। ওদের যে মেলা টাকা, টাকা দিয়ে সকলকে বশ করছে।

এসব কথা সুবাসিনী কিছু কিছু শুনেছিল। জোর করে সমস্ত উড়িয়ে দিয়ে সে বললে, বসন্তদা, ওসব কোন ভাবনা কোরো না, তুমি নিশ্চয়ই জিতবে, তোমাকে কেউ হারাতে পারবে না।

বসন্ত সুবাসিনীর কালো মুখখানার দিকে চেয়ে তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে বলেছিল, তার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক সুবাস, তুই ত আমার বড় ভরসা রে, বলে চটী জুতো

টানতে টানতে বাইরের ঘরে চলে গেল। যেতে যেতেও আর একবার বলেছিল। খাবারের বন্দোবস্ত যা বলুক, সব যেন ঠিকমত হয়, ভালভাবে নজর রাখবি।

নিশ্চয়, সুবাস পেছন থেকে দু'পা যেতে যেতে উত্তর দিয়েছিল।

এর তিন দিন পরে সুবাসরা এ বাড়ীতে যে ক'জন ছিল তারা সকলেই সারাদিন উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাতে লাগল। আজই খবর বেরুবে, কার জিৎ, কার হার। এক একবার লোকমুখে এক একটা উড়ো খবর আসছিল, এবং সুবাসরা একবার পুলকিত এবং তখনও বা হতাশ হয়ে পড়ছিল। দেওয়ালে ঝোলান মা কালীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সুবাস মনে মনে কতবার কত কি যে মানসিক করেছিল, তার কোন ইয়ত্তা নেই, শেষে আর একবার করে মানসিক তোল, মা, বসন্তদা যেন জয়লাভ করে, সুবাস তা হলে কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে বুক চিরে রক্ত দেবে। একবার মনে হচ্ছিল, আজই কালীঘাটে গেলে হোত কিন্তু বসন্তদা আজ দু'দিন ধরে বাড়ীতেই ছিল না, কোথায় যে ঘুরছে কে জানে। সুবাস শুনেছিল, বসন্তদা সহরে আছে, যেখানে ভোটের গণনা চলছিল। কখন যে ফিরবে কে জানে? মা কালীর পূজোর জন্য সে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

বিকালে হঠাৎ জমিদারদের একখানা জীপ গাড়ীতে একদল ছেলে হৈ হৈ করে চেঁচাতে চেঁচাতে এদের বাড়ীর চার পাশে ঘুরে চোঙ্গা মুখে বলতে লাগল, 'ভোটে জিতেছে কে, নরেনবাবু, ভোটে জিতেছে কে, নরেনবাবু। নরেনবাবুকী জয়, নরেনবাবু কি জয়।' সুবাস তার দুই কানে হাত চাপা দিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল মা কালীর ছবির সামনে। আকুল আগ্রহে কেঁদে পড়েছিল, মা, একি কথা শুনছি মা, আমাদের সব চেষ্টা কি বিফলে যাবে মা? আমার বুক-চেরা রক্ত তুই নিবি না মা। মুখ তুলে দেখ মা, বসন্তদাকে জিতিয়ে দে মা। সুবাসিনীর দুই চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে তার বুকের কাপড়খানা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছিল।

রাত্রি আটটার সময় অল্প খবর এল। বসন্তবাবু কি জয়, সরোজবাবু কি জয়, কংগ্রেস কি জয়, মহাত্মা গান্ধী কি জয়। বন্দেমাতরম্। ছেলের দল আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। সুবাসিনী চোখের জল মুছে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল, সামনে যাকে পেলে তাকেই জিজ্ঞেস করলে, খবরটা ঠিক ত।

দু'জন চেনা ছেলে সাইকেল চড়ে ঝড়ের বেগে এসে ওদের বাড়ীর হাতায় ঢুকেই বলেছিল, সুবাস দিদিমণি, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন, ওঁরা সব আসছেন, আজ কিন্তু আমাদের লুচি মাংস খাওয়াতে হবে।

আপনভুলে সুবাসিনী তাড়াতাড়িতে ওদের একজনের হাতই ধরে ফেলেছিল। 'সত্যি বলছেন তো বসন্তদা জিতেছে ত।

হাঁ হাঁ হাঁ, বসন্তদা জিতেছে, জিতেছে, জিতেছে, ছেলেটির মুখে চোখে আনন্দ যেন উপচে পড়ছিল।

তবুও যেন সুবাসিনীর সন্দেহ কাটে না। বলেছিল, তবে যে নরেনবাবুদের দল বিকেলে—

অল্প ছেলেটি বলে, হাঁ, বিকেল পর্যন্ত ঐ রকম খবরই ছিল, কিন্তু তারপর তিনখানা বাক্সখুলে দেখা গেল, বসন্তদাই জিতেছে। খুব বেশী না হলেও অল্প ভোটে জিতেছে।

অল্প ছেলেটি বলেছিল, বেশীকম বুঝি না, জিতেছে ত, বাস্, তা হলেই হোল। আজ রাত্তিরে লুচিমাংস খেয়ে সারারাত জেগে কাটাবো, আজ শোয়া নয়, ঘুম নয়, কিচ্ছু নয়—

ওদের হাত ছাড়িয়ে সুবাসিনী দৌড়ল মা কালীর ছবির সামনে। মা, মুখ তুলে চেয়েছিল মা,—হঠাৎ সুবাসিনী দেখতে পেলে, তার চোখ দিয়ে সে স্পষ্ট দেখলে, পটের মধ্যে প্রতিমা হাসছে। সুবাসিনী অবাক হয়ে দেখতে লাগল, এবং তার পরেই ভূমিষ্ঠ হয়ে মেঝের ওপর চিপ্ চিপ্ করে মাথা ঠুকে প্রণাম করেছিল।

গলায় অনেকগুলো ফুলের মালা দিয়ে বসন্ত এল একটা জীপ গাড়ীতে। গাড়ীটার সামনে পেছনে আশে পাশে কয় কয়ে পনর বিশজন ছেলে তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল আহ্লাদে আটখানা হয়ে। ওদের দেখেই সুবাসিনী মনে মনে প্রমাদ গণল। সর্ব্বনাশ! ওরা যে লুচি মাংসের ফরমাস্ দিয়েছে তা সে সব যোগাড় কই? ময়দাও নেই, ঘি-তরকারীও বিশেষ কিছুই নেই, শঙ্কর কোথায় গেল, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কি করা যায়! রান্নার লোক

ছুটোর ছুটী হয়ে গেছে ভোটের পরের দিন সকালেই, কিন্তু সে না হয় সুবাস নিজেই বেঁধে খেলত, কিন্তু জোগাড় কই ?

কাকেই বা কথাগুলো বলা যায়, বসন্তদাকে সবাই মিলে এমন ভাবে ঘিরে আছে যে, তার কাছেও কোন কথা বলা সম্ভব নয়, আর এ সময় এসব কথা বলাও উচিত নয়, সুবাসিনী অপার দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল।

কিন্তু বসন্তদা যেন অন্তর্যামী। ঐ ভিড়ের মধ্যে বসন্তদা একটি ছেলেকে ডেকে কানে কানে কি যেন বলে দিলে। সে তখনই উঠে বসন্তদার জীপটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জীপ ফিরে এল এবং তা থেকে নামল একটি ছোকরা, তার হাতে দুটো বড় বড় হ্যাণ্ডল ব্যাগ। নেবেই একে ওকে কি যেন জিজ্ঞাসা করে সোজা এসে দাঁড়াল সুবাসিনীর কাছে, বলে, আপনি কি সুবাস দিদিমণি।

সুবাসিনী বলেছিল, হ্যাঁ।

সে হ্যাণ্ডল ব্যাগ দুটো ওর হাতে দিয়ে বলেছিল, এতে সব চায়ের সরঞ্জাম আছে। আপনি চা তৈরী করুন, চাঁদুদা দোকান থেকে গরম গরম খাবার ভাজিয়ে নিয়ে এখনই আসবেন।

সুবাসিনীর ধড়ে প্রাণ এল। ব্যাগ দুটো নিয়ে ভিতরে ঢোকার উপক্রম করতেই ছেলেটি বলেছিল, ব্যাগ দুটো দোকানের, এখনই খালি করে ওগুলো ফেরৎ দিন, আমি নিয়ে যাব।

কিছুক্ষণ পরেই তেমনি চিৎকার করতে করতে আর একখানা জীপে সরোজবাবুকে এক রাশ মালা পরিয়ে বাড়ীর মধ্যে এনে তুলল। বসন্তদা দেউড়ী থেকে বেরিয়ে দুহাত বাড়িয়ে সরোজবাবুকে আলিঙ্গন করল। সরোজবাবুও বসন্তকে আলিঙ্গন করে বেশ জোর গলায় বলেছিল, এ জন্য কিন্তু আপনারই বসন্তবাবু, না হলে এই keen competetion-এ—

পাশে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধের দিকে দেখিয়ে বসন্তদা বলেছিল, জয় এঁদের। এঁর এই বাড়ীখানা না পেলে কোথায় দাঁড়াতুম বলুন ত ?

বৃদ্ধ বলেছিল, ছি ছি ছি, এ সব কি বলছেন। এ ত সব আপনারেই জিনিষ। আমার এই ভাঙ্গা বাড়ীতে এতগুলি দেশসেবকের পায়ের ধুলো পড়ল—

সুবাসিনী শুনেছিল, এই বাড়ীর বৃদ্ধ মালিকটিও এখানকার অন্যতম জমিদার এবং ভোটে দাঁড়িয়েছিল যে নরেনবাবু তার জ্ঞাতি কাকা। পাছে ভাইপো ভোটে জিতে আরও বড় হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় এই অক্ষম বৃদ্ধ ভাইপোর শত্রুদের যথাসম্ভব সাহায্য করেছিল।

পরদিন সকালে গাইবের ভিড় জমবার আগেই সুবাসিনী বসন্তর সামনে এসে বলেছিল, বসন্তদা, আমাকে একবার কলকাতায় যেতে হবে—আর, আর গোটাকতক টাকাও চাই।

বসন্ত মুখ তুলে বলেছিল, কেন রে, কি ব্যাপার ? কলকাতায় গিয়ে টাকা নিয়ে কি করবি ?

সুবাসিনী ঘাড় হেঁট করে বলেছিল, দরকার আছে।

কি দরকার বলই না শুনি। একটু থেমে বলেছিল, এমন কি কথা যা তোর বসন্তদাকেও বলা যায় না।

সুবাসিনী ধীরে ধীরে উত্তর দিয়েছিল, কালীঘাটে যাব, মা কালীর পুজো দেব।

হাসতে হাসতে বসন্ত বলেছিল, কেন রে ? হঠাৎ মা কালীর পুজো ? এত ভক্তি বেড়ে উঠল কেন ?

সে বলেছিল, মানসিক আছে। আমাকে যেতেই হবে।

বসন্ত বলেছিল, দূর দূর, ও সব পাগলামি করতে হবে না।

সুবাসিনী জেদ করে বলেছিল, না বসন্তদা, আমাকে যেতেই হবে।

বিরক্ত হয়ে বসন্ত বলেছিল, আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে'খন। যে কোন সময় গেলেই হবে।

সুবাসিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে বসন্ত সুবাসিনীর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, কার জন্য মানসিক করেছিস্ শুনি। যত সব বাজে ঝঞ্ঝাট—

জিভ কেটে সুবাসিনী বলেছিল, ও রকম কথা বোলো না বসন্তদা, আমি এই ভোটের জন্যই মানসিক করেছিলুম। আমি—বলতে বলতে সুবাসিনী থেমে গিয়েছিল।

ভোট ত হয়ে গেছে, এখন আবার কি ?

ছিঃ কেটে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে সুবাসিনী বলেছিল ছি, ছি এমন কথা কি বলতে আছে? মায়ের দয়ায় ভালোয় ভালোয় উৎরে গেছে, এবার মায়ের মানসিক পুজো যত শীঘ্র পারি দিতে হবে ত?

হাসতে হাসতে বসন্ত বলেছিল, হবে'খন হবে'খন, যখন হোক্ হলেই হোল।

সুবাসিনী কাতর ভাবে বসন্তদাকে অনুনয় করে বলেছিল, বসন্তদা, নিজের জন্ত তোমার কাছে কিছুটি চাইনি, আজ আমার একটা কথা রাখতেই হবে। তুমি আমার সঙ্গে যদি কালীঘাটে যাও, তাহলে ত আর কথাই নেই, না হলে আমার জন্ত বন্দোবস্ত করে দাও, আমি পুজো দেওয়া না হলে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না।

আচ্ছা রে আচ্ছা, আগে কলকাতায় যাই, তারপর কালীঘাটে যাওয়া যাবে, ব্যস্ত হোস্ নি।

এর কয়েকদিন পরেই জমিদার বাড়ী ছেড়ে বসন্তরা জিনিষপত্তর যা নেবার মত ছিল সমস্ত নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল। সুবাসিনী আশা করে রইল যে কলকাতায় গিয়েই মায়ের পূজাটা মনের মত করে সেরে ফেলবে।

কিন্তু কলকাতায় এসে নারী সমিতির ঘরে চোকার পরে বসন্তর দেখা আর যেনেই না। সে যে কোথায় কোথায় ঘুরছে, সুবাসিনী তার কোন পাত্তাই আর পায় না।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

মৃত্যু

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

একী মৃত্যু!
একী নিষ্ঠুরতা তব একী নির্দয়তা!
পাক-ভারত রাশিয়ার জনগণ
গুণগান করে যাঁর আজ,
সারা পৃথিবীর জনগণ সাফল্যে যাঁহার
বিস্ময়ে রয়েছে স্তব্ধ,
তুমি তাঁরে ছিনিয়ে যে নিলে
ক্রূর হেন সম।
সারা পৃথিবীর মাঝে চলেছে যখন
হিংসা বিদ্বেষ
আর নারকীয় হত্যা ও লুণ্ঠন,
ভারতের একটি মহান্ হৃদয়
জ্বালাতে চাইলো শুভ শান্তিদীপ শিখা,
যার আলো শুধু
ভারতে ও পাকিস্তানে নয়
ছড়িয়ে পড়তো সে যে মার্কিণে-রুশে,
ভিয়েট্ নামে চীনে।
তুমি সেই শান্তিদীপ
পূজারীকে নিলে কেড়ে
তাঁর মাতৃভূমি পৃথিবীর
স্নিগ্ধ বক্ষ থেকে।
কিন্তু মৃত্যু!
মানুষের মাতৃভূমি ধরিত্রীকে
চেননি এখনও,
তার বুকের ভিতরে আছে
প্রাণের নিঃসীম উৎস।
তুমি যারে হেনেছ আঘাত
ধরিত্রী যে তারে
করে সঞ্জীবিত, করে উজ্জীবিত।
সেই বারংবার
অসংখ্য অনন্তরূপে লাভ করে
জন্ম নব নব।
আজি যে শান্তির দূতে
কেড়ে নিলে তুমি,
ধরিত্রীর বক্ষে তাঁরে
লক্ষরূপে দেখিবে অচিরে।

শাস্ত্রী—কোসিগিন

গত বৎসর মে মাসে শ্রীশাস্ত্রী যখন মস্কো গিয়েছিলেন তখন এই চিত্র গৃহীত হয়। উহাতে শ্রীশাস্ত্রী ও সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীকোসিগিনকে লেনিনগ্রাড ষ্টেশনে সমবেত লেনিনগ্রাডস্থ রেল ষ্টেশনে গার্ড অব অনার পরিদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে।

জন্মদিনে শ্রীশাস্ত্রী

লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে তাঁর গত জন্মদিনে শিশুদের দ্বারা মালাভূষিত হতে দেখা যাচ্ছে।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে ইংরেজের হাতে-গড়া সহর কলিকাতায় সেকালের বিলাসী-সৌখিন সহরে-সমাজের লোকজনেরা দুর্গাপূজা প্রভৃতি সার্ব্বজনীন-পর্ব্বোৎসবের মতোই বিপুল অর্থব্যয়ে, ধুমধাম-আড়ম্বরে আর বেলেল্লা হৈ-হল্লোড় হজুক আর বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদে মেতে কিভাবে পুণ্য বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে সোৎসাহে সরস্বতী পূজার শুভানুষ্ঠান পালন করতেন, তার নিখুঁত মনোরম কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পাওয়া যায়—খৃষ্টীয় ১০৬৯ সালে 'নিশাচর'ছদ্মনামে, তৎকালীন-সাহিত্যিক ৺ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'সমাজ কুচিত্র' শীর্ষক পুস্তিকায়। অধুনা-দুর্লভ এই প্রাচীন পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র (মুদ্রিত পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৮ মাত্র) হলেও, বিষয়বস্তু বর্ণনা এবং সমসাময়িক-সমাজের চিত্র-রূপায়ণের নৈপুণ্যে অনবদ্য-অপরূপ। আলোচ্য পুস্তিকাখানি রচিত হয়েছিল—সেকালের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক তথা বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অভিনব-সৃষ্টি 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' গ্রন্থের ধারানুসরণে··· রচয়িতার মুখ্য-উদ্দেশ্য—খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা সহরের সামাজিক রূপবর্ণন। একালের অনুসন্ধিৎসু-পাঠক পাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণের উদ্দেশ্যে, প্রসঙ্গক্রমে, সেকালের এই চিত্তাকর্ষক উপভোগ্য পুস্তিকার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

('নিশাচর' ছদ্মনামে ৺ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'সমাজ কুচিত্র' পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত)

···সহরে সরস্বতী পূজোর উদ্যুগ হতে লাগ্‌লো। অনেক বাড়ির প্রতিমে একনেটে হয়ে গ্যালো। লোকেরা আমোদের খইচুর হয়ে ছুটে কেটে বেটে পড়্‌তেন।···

···এদিকে মাঘ মাস শেষ হয়ে এলো। ফাল্গুন মাসের প্রথম দিনেই মা বীণাপাণি পৃথিবীতে আবির্ভূতা হবেন। দশ দিন থাকতেই সহর যেন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেচে। সোনাগাজী, বাগবাজার, সিমলা, মেছোবাজার, গরাণহাটা, বাঁশতলা, মাধাঘষা, চোরবাগান, সিদ্ধেশ্বরীতলা, চাঁপাতলা, হাড়কাটা, সেণ্ট জেম্‌স চর্চ্চ, বৌবাজার, গুড়ের মা, ইমামবাগ, চাঁদনী ও জানবাজার প্রভৃতি পীঠস্থান সকল যেন গম্‌গম্ কচ্চে। দিন নাই, রাত নাই, ঝাঁক ঝাঁক পীল ইয়ারের দল ঐ সকল তীর্থে সমাগত হচ্চেন। ঐ স্থানেই অনেকের আফিশিয়াল চেম্বর ও আরটিফিশিয়েল ট্রেনিড অ্যাকাডেমী! প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা জাকালো গার্ডেন ফিট করে, উদ্যানেই

কল টেনে ট্রাইঅ্যাঙ্গেল একে জিওমেট্রী নূতন নূতন প্রপোজিসন প্রভ কচ্চেন! অ'লভেত্রা গুপ্তভাবে লঙ্কা বস্ত আক্কারম্ কচ্চে। সরস্বতী পূজোর দারে পড়ে, অনেকে হাতে পাতে বিলক্ষণ পুরস্কার লাভ করেছেন।...

• • ক্রমে রাত্রি হয়ে পড়্লো। আজ অমাবস্যা। সরস্বতী পূজোর আর পাঁচ দিন আছে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, তথাপি ইয়ারদলের শঙ্কা অথবা বিরামের নাম নাই। • • ইতিমধ্যে রাস্তার চৌকিদারের পদশব্দের স্থলে পাল ইয়ারদের হুতো ও ছড়ি সবষ্টিটিউট! বেকার কুকুরেরা একচেটের ডাক্চে, এখন বৌ কথা কও ও কোকিলেরা তাহাদের লোপারকী কচ্চে। সকল বেস্যাবাড়ির দরজাতেই প্রায় হুড়ি, হেঘুড়ি, চৌঘুড়ি খাড়া রয়েচে। গৃহমধ্যে লাল-পানির চক্‌চক, চেন'চুরের ছপ্‌ছপ ও বোতল গেলাসের ঠনঠন শব্দ শুনা যাচ্চে। কোথাও এক বাবু তাঁহার প্রিয়তমা বিবিকে চাবুক বসিয়েছেন,সে তাহার মা তা, দাসী, দরোয়ানের নাম করে উচ্চৈঃস্বরে রোদন কচ্চে, আর বাবুকে অনবরত গালাগাল দিচ্চে। বাবু পুনরায় "বগি ছইপ্" কসিয়ে পালাচ্চেন। কোথাও ভোরা (ভেদ) ও চেস্তা (বমি) আগমন করাতে বোধ হচ্চে যেন, গগনমণ্ডলে বসন্ত মেঘে গর্জ্জন কচ্চে। কোথাও এক বাবু তাহার বধুর বাতাইন থেকে একখান পাছাপেড়ে কাপড়, একটা তেলের বাটি, একটা ধন্তার নুখনল, একখানা লৌহের বক্সা, আর একটা কল্কী হুকো চুরি করে প্রস্থান কচ্ছিলেন, দরোয়ান তাকে ধরে গোল করাতে ছয় বাড়ির লোক একত্র হয়ে তাকে বিলক্ষণ প্রহার করে, অবশেষে পাহারাওয়ালার হস্তে সমর্পণ করে দিলে। অনেক পাহারাওয়ালার যেমন শিক্ষা ও যেমন অভ্যাস, তদনুসারে এগারটি আধলা পয়সা পেয়ে ছেড়ে দিয়ে গালো। কোথাও বা এক বাবু বিবিকে সুরাপানে মত্ত ও ক্লরোফরমযোগে অচেতন করে সমস্ত অলঙ্কারগুলি লয়ে পলায়ন করেছেন বিবির মুখ দিয়ে প্রকাশ হলো, সে রাত্রি তাহার ঘরে দু জন অগ্রগামী পাড়ার ঠাকুর ছিলেন। ঠাকুর চোর অনেক আছেন, কিন্তু পুলিস ইহাদিগকে ঠাকুরগোষ্ঠী বলে ভয় করে চলে থাকেন। সরস্বতী পূজোর খরচের কল্যাণে অনেক স্থলে গাঁটকাটা, রাহাজানি, সিঁধ, হত্যা, ডাকাতি, ছুরাচুরি ইত্যাদি ঘটনা হচ্চে। সহর টল্‌মলে। ওদিকে কল্‌কেতার মনিমর্কেটের তাপমানে ৯৮॥০ ডিগ্রী পারে চাপিয়ে উঠলো! এই দারুণ উত্তাপের প্রকৃত কারণ আগ্নেয়গিরির ধাতু ও অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় অপ্রকাশিত রয়েচে; কিন্তু এদেশের দু-এক জন সুক্ষদর্শী এয়েছেন, ফেড সাহেব ও ব্যাঙ্ক ইহার কারণ।

...আজ প্রতিপদ। পূজার আর দিন নাই। কারি-করেরা বামুনবাড়ির পুরুতদের মত রঙের চেঙারি মাথায় করে এবাড়ি ওবাড়ি ছুটোছুটি কচ্চে। কুমোরটুলীর নবদা সরস্বতীরা বেধড়ক বিক্রি হয়ে মুটের মাথায় উঠলেন। কুমোরেরা শেষকালে আর যোগাতে না পেরে, বাড়তি দোমেটে করা জগদ্ধাত্রী ঠাকুরুণের হাতী ও সিংহী ভেঙে দুখানি হাত জেটে ও ঘাড় বেঁকিয়ে সাদা করে স্থান পূর্ণ কচ্চে! রাজপথ যেন সরস্বতীময় বোধ হচ্চে। ডাকের সাজকর, মিঠাইকর, সোলার পদ্মফুল ও গাঁদাফুলের দোকানে আজ অনঙ্গত খদ্দের। ফৌজদারী বালাখানার রেড, হোয়াইট, ব্লু ও পর্পেল ঝাড়লাণ্ঠনেরা খাতায় খাতায় ভাড়ায় বেরিয়েচে। বেকার বাবুরা মহা ব্যতিব্যস্ত। রাধাবাজারের সঙ্গে কমিশন ধরে একটা বন্দোবস্ত করা হচ্চে।

কল্‌কেতা সহরের সকলই সৃষ্টিছাড়া। এখানে গৃহস্থ বাড়ির চেয়ে বেস্যাবাড়ির সরস্বতী পূজোর সংখ্যা ও জাক জমক শতগুণে অধিক। অনেক বড়মানুষ নিজ বাড়িতে বুট ও বীরখাণ্ডী বরাদ্দ করে, মুদীর দোকানে বরাৎ দিয়ে, দু হাজারী ভোড়া নিয়ে নূতন বাড়িতে হাজির হলেন। এখানকার বাবু, পূজো, ধর্ম্ম, ঠাকুর ও বেস্যাদিগকে ধন্যবাদ!

আর্কফলানিন্দিত চৈতন্যচক্ষা ও বর্ণমালানিন্দিত উপাধি-ধারী ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার প্রোগ্রাম স্থির কর্ত্তে ব্যস্ত হলেন। যাঁদের তিন পুরুষের মধ্যে টোলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই অদ্য তারা স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে গোবর মেটিয়ে খোলার ঘর বেড়ে টোল ফেঁদে বস্‌লেন। মন্ত্র ও ঔষধপাত ছাত্র সংগ্রহ করা হলো। কেহ কেহ কোন বড়মানুষের আস্তাবল ঘিরে নিয়ে এক এক মেটে বাঁশাশাশি খাড়া করে দিলেন। বাছা বাছা বড়মানুষ ঘর দরোজায় যাওয়া আসা হতে লাগলো। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, কালিদাসের মেঘদূত রিফাইন করা অশুদ্ধ কুয়াতে নূতন বিয়ে করা কনের ঘর্ম্মনী দুধের মত উথলে উঠলো, মুগ্ধবোধ

ব্যাকরণের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হতে লাগলো। গঙ্গামৃত্তিকা ও রুদ্রাক্ষমালারা প্রগ্রামের ভীষণ ভূমিকম্পে জড় সড় হয়ে টোলের মধ্যে প্রবেশ করে। সেখানে আশুবলওয়ালাদের পেটে নাকে, কানে, হাতে, বুকে, কপালে ও কণ্ঠে উঠে আড়ষ্ট হয়ে রইলো। কোঁচানো গরদ্ চেলীর জোড়া, ধোয়া নয়নসুকের জোড় ও নামাবলীরা হড়ির আদলে রাধাকৃষ্ণের দোলের মত দুলতে লাগলো। আজ আমাদের নবীন অধ্যাপক মহাবিক্রমদের অভূতপূর্ব্ব চটক দেখে কে?

ব্রাহ্মণ

(১৮০৭ সালে অঙ্কিত প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি অবলম্বনে)

এদিকে বেঙ্গালয়ে ছোট ছোট মেয়েদের তালিম দেওয়া আরম্ভ হলো। তবলা, মন্দিরে ও তানপুরা বাজতে লাগলো। কুমারীদের নাম ফিরিয়ে নাম রাখার এই এক সময়। জন্মভূমিতে যারা খুদী, চাপী, কুদুনী, সাওরি ও ভূতি নামে বিখ্যাত ছিল, এখন তাদের নাম গোলাপ, টগর কামিনী, আতর, হেনেরা। অনেকের টুকনী গ্রহণের বয়স হওয়াতে প্রতিনিধির দ্বারা তার লাঘবের চেষ্টা হচ্চে। সেই সকল প্রতিনিধির নাম কমল, কুমুদ, আদর, মোহিনী, কুসুম, সাবরা, লক্ষ্মী ও টেবা। রয়মঙ্গলা ও উচ্ছবা প্রভৃতি দূর বাইরেরা ছেড়ুয়াদের সঙ্গে কুমারীগণকে নূতন নূতন গীত, সোনারংয়ের মত ছাকা ছাকা কথা ও "সুচা, সুচা, নিচ, নিচা" প্রভৃতি সাঙ্কেতিক বাক্য অভ্যাস করাচ্চে। সহরে এখন পূর্ব্বের মত নামজাদা মেয়েমানুষ দুর্লভ হয়ে পড়েচে। আজকাল সোনাগাজীর বিখ্যাত স্বর্ণবাই যা কিছু কলঙ্কেতার মান রেখেছেন।

এদিকে বাবু ও পেশাদার যাত্রা, পাঁচালি, খেমটা, হাফ আখড়াই ও ফুল আখড়াই দলের তালিম হচ্চে। অনবরত তানপুরো, সারঙ্গ, বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গ বাজচে। স্পিরিট চরস ও গাঁজা অবিশ্রাম চলচে। গায়কদের সাধা গলায় সুস্বর চাৎকারে বাক্‌বাণী আর এ তিন দিনও অপেক্ষা কর্ত্তে পাচ্চেন না। আজি যেন আসরে মূর্ত্তিমতী হন তন হয়েছেন!.....

...ওদিকে তালিম, তামিল, ও মওলা দিচ্চেই দুদিন কেটে গ্যালো। রাস্তার ধারের পোড়ো বাড়িতে কাঁকড়াচুলো যাত্রা-ওয়ালাদের মওলার "হুঁ হুঁ হুঁ" শব্দ থাম্‌লো। আজ বুধবার হাটবাজার আরম্ভ হলো। বেলোয়ারী চুড়ি, মেটে ও চীনের সিন্দুর, মিসি, একদচের গেজেট ও বাঙলা খবরের কাগজ মোড়া মাথাংবারা আকুড্ডের উপর তক্তার গায় ফুল ও চৌকি চোঙে রাস্তাপানে চেয়ে হাসতে লাগলো। ফেরী-ওয়ালারা আজ বেগুনে বস্ত্র ময়ূরপুচ্ছ বেগুনে চুড়ো ও চিত্রকরা বাড়ি নিয়ে, বাড়ি বাড়ি ঘুর্চ্চে। আবীর, আম্র মুকুল, অম্র ও ধবের শীষেরা তাহাদের হাঁড়ির ভিতর থেকে উঁকি মারচে।

ক্রমে বেলা দুই প্রহর। ... বাড়ি বাড়ি প্রতিমে নামানো আরম্ভ হয়েচে। এক বাড়ির বিবির আগে উচ্ছুগ্গু হয় নাই, দিন গ্যালো দেখে তিনি তাঁহার বাবুর গলায় অভিমানে গামছা দিয়েছেন। বাবু তাঁর পিতামহীর সিঁদুক ভেঙে দুহুড়া চাঁদী কাটা পৈচে ও একটা সিঁদুর চুপড়ি চুরি করে তাড়াতাড়ি মাটির কাজ আরম্ভ করে দিলেন। পটোরা একেবারে খড়, মাটি, মুও, মাজনখড়ি, ভাঙা বেল, হাঁসের ডিম ও রং নিয়ে নায়েকবাড়ি উপস্থিত হয়েছে। চুণীরা চোল, কাঁসি ও সানাই করাচ্চে। আচার্য্যি ও মালীরা গাঁদাফুল, বিল্বপত্র, দোপাটি পদ্ম ও দুর্ব্বো সংগ্রহের ধুমে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্চে। মিঠাইওয়ালা, ব্রাহ্মণ, ময়রাওয়ালা খোটা, ফুলুরি ও চেনাচুরওয়ালা মুসলমান, সন্দেশ ও বীরখণ্ডীওয়ালা ময়রা, ধবি ও

দরওয়ালা, গোয়ালা ও শুঁড়ীদের এক দণ্ড নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নাই। বাবুর বাড়ির দরওয়ান, খানসামা ও আরদালীরা নূতন নূতন পোষাক, উর্দ্দি পরে এবাড়ি ওবাড়ি কচ্চে। মোসাহেব ও উমেদারেরা আজ বিষের যার বাবুর কাছছাড়া হচ্চে না। ইংরাজি স্কুলের আউট্ ষ্টুডেণ্ট জাঠারা সে দিন ক্রিষ্টমাস্ ও বিলিতী নব বৎসর উপলক্ষে অনেক প্রকার আমোদ করে উৎসবে উঠেচেন, সুতরাং তাঁদের আর বড় একটা আড়ম্বর দেখা যাচ্চে না। তথাপি কতকগুলির ভিতরে ভিতরে বাগান, বিবি ও শুঁড়ীর সঙ্গে ক্রেডিটে বন্দোবস্ত হয়ে রয়েচে।

একজন ব্রাহ্ম মাটির সরস্বতীর চুড়োর উপর "ওঁ তৎ সৎ" লিখে পোত্তলিকদের ঢাক ঢোলের পরিবর্ত্তে পিয়ানো এবং হারমোনিয়ম বাজিয়ে দু দণ্ড আমোদ কর্ব্বেন স্থির করেছেন। তিনি এজন্য দোষী হতে পারেন না। যখন ব্রাহ্ম শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্ম অন্নপ্রাশন, ব্রাহ্ম জাতকর্ম্ম, ব্রাহ্ম সূতিক-পুজো ও ব্রাহ্ম উপনয়ন প্রভৃতি চল্‌চে, তখন ব্রাহ্মমতে সরস্বতীপুজো ও দুর্গোৎসব না হতে পারে কেন? হতভাগা দুর্গা ও সরস্বতীরা তবে কি অপরাধ করেছেন! • • •

লোকের উৎসাহ ও হৈরৈকার আমোদের পারাকাষ্ঠা দেখে দিনকর যেন কাতর মনে রক্ত মেখেই অস্ত গেলেন। সন্ধ্যাবধূ সরস্বতীরে ধূমলবর্ণ বস্ত্র পরিধান কর্ত্তে দেখে ঈর্ষা-ভরে নীলবসনে অবগুণ্ঠিতা হয়ে পৃথিবীরে আলিঙ্গন কল্লে। • • • •

ক্রমে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজের দরোজাং ব্রাহ্ম ও ধর্ম্মকদের গাড়ীর আমদানী হতে লাগ্‌লো। বাদ্যযন্ত্র ও উপাসনার সামগ্রী উপস্থিত হলো। গ্যাস জেলে দিয়ে "জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ, বক্তৃতা পাঠ ও পাখোয়াজ বাজিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত আরম্ভ করা হলো। • • •

দুজন বিক্রমপুরী বাবু আজ নূতন কল্‌কেতা দেখতে এসেছিলেন। মেছোবাজারের পোড়া দর্শনই তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। মস্ত একটা তেতালা বাড়িতে আলো জলচে ও গানবাজনা হচ্চে দেখে, গুড্ গুড্ শব্দে উপরে উঠ্‌তে লাগলেন। ব্রাহ্ম যাচ্চেন মনে করে প্রহরীরা বারণ করে না। তাঁরা সমাজ ঘরে ঢুকেই হতাশ হলেন! এক জন বল্লেন, "এখানে তা নয়, আমরা যাবার লাগে আইচি।" দ্বিতীয় বাবু "জয় বাগ্বা!" বলেই নেমে গেলেন। • • •

ওদিকে বাড়ীর দুটি নেমে গেলে পর, হারমোনিয়ম থাম্‌লো, পাখোয়াজের চাটি এবং ওঁ তৎ সতের সঙ্গে সমাজ ভঙ্গ হলো। অকপট ধর্ম্মাবলম্বীরা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কল্লেন। ছদ্মবেশী তপস্বীরা সরস্বতীপুজোর কাঁকে গিয়ে মিশ্‌লেন! এতক্ষণের পর পালের চটক বেরুলো। উড়ে বেহারাদের কল্যাণে অনেক এমটি হাউস্ আরমানী, য়িহুদী ও ইংরেজী বিবিতে পরিপূর্ণ হয়ে গ্যালো! এই সকল খালি বাড়ি বিলিতি সভ্যতের কষ্টিপাথর ও বদমায়েসির প্রধান আখড়া।

বুধবার এইরূপে বিদায় হলেন। আজ বৃহস্পতিবার। চতুর্থী। পূজোর পূর্ব্বদিনটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যায়। আসর সাজানো, দেবীঘট, নারকেলের মুচি ও আম্রশাখা সংগ্রহ কর্ত্তেই দিন শেষ হলো। রাত্রিতেও অনেক কাজ গুছিয়ে রাখা হলো। অনেকের নিদ্রাই হলো না। রেভিনিউটের মত কুলবাবুর বাঁক গড়া গড়া শুয়ে পড়লেন। কিন্তু শয়ন কর্ত্তে কর্ত্তেই শৃগাল, কাক ও কুক্কুট ডেকে উঠলো। ভোরের শুস্‌স্ ও স-করতালি "জোমকালী" ইত্যাদি শব্দ শুনা গেল। উড়ুনে কাক, জলের ভারী, গঙ্গাস্নানের যাত্রী, বেতো বুড়ো ও স্কাভেঞ্জারের গাড়ি চতুর্দ্দিকে বেরুলো। ডাক্তারেরা প্র্যাক্‌টিসে বেরুলেন। বাড়ি ২ চাক ঢোল ও রোশনচৌকি বেজে উঠ্‌লো। বেস্যালয়ের সকলে শয্যাত্যাগ করে গাত্রোত্থান কল্লেন। একটি কামিনী হাই তুলে আলস্য ভাঙ্গে দেখ্‌লেন, তিনি তাঁর দোলন নথের বিলিতী মুক্তোর নোলকটী তক্ষণ করে ফেলেচেন। যাঃ!!

আজ শুক্রবার। শ্রীপঞ্চমী। পাঠকগণ মনে করুন,— আশ্বিন মাসের শারদীয় পঞ্চমীর মত এ পঞ্চমীর তত বাহাল্য নাই, তথাপি সহরে আমোদের স্রোত বয়চে না। পাঠশালার ছোট ছোট ছেলেরা সকাল সকাল কাপড় ছেড়ে, কেউ নেয়ে, ধোত, কলম ও দপ্তর ধুয়ে জাবের বোল, যবের শীষ মুখে দিয়ে, সাজিয়ে দিচ্চে। কুল খাবার আহ্লাদে চন্দনের টিপ পরে, পুষ্পাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত ভট্‌চায্যিদের উমেদারি কচ্চে। ইংরাজী স্কুলের

পিতামহ স্কলারেরা তাদের "অর্থোডক্স্, হিপোক্রিট" বলে উপহাস কচ্চেন। তারা তাতে ভ্রুক্ষেপও কচ্চে না। সংস্কার আছে, সরস্বতী না খেলে বালকেরা যদি কুল খায়, বিদ্যায় অশুভ দৃষ্টি পড়ে। ক্রমে বেলা হয়ে পড়্লো। "আলু পটোল উচ্ছে, চাই ভালো ঘোল, কাপড়ওয়ালা আয়া যেম সাব, ছানা মুরগী চাই" প্রভৃতি ফেরিস্থর কর্ণমধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে লাগলো। পরামাণিক, শিপ্-সরকার, রেলওয়ে ও কোন কোন সদাগরের বাড়ির কেরাণী পাগড়ি বেঁধে বেরিয়েচে। ইহাদের কোন পার্ব্বণেই প্রায় অবকাশ নাই। দালালেরা এক কানে কলম, আর এক কানে পেন্সিল গুঁজে, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলেচেন। রাজপথ পাগড়ি, সেলর, রুল কাঁধে কালো পুতুল, কোম্পানির কাগজের বেওার, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি, নেড়ে, হকার, কুকুর ও জুয়াচোরে পুরে গ্যাচে।

ওদিকে পুজো আরম্ভ হয়ে গ্যালো। ধূপ, দীপ, ঘণ্টা ও ঢাক ঢোলের গন্ধে ও শব্দে চার দিক মাতিয়ে তুল্লে। বারাঙ্গনা পল্লীর কথাই এক স্বতন্ত্র। সেখানে সহরের রকমারি আমোদের ও আমোদপ্রিয় দলের মানচিত্র অঙ্কিত হয়েচে। হিন্দুধর্ম্ম যেন ইয়ং বেঙ্গলদের ভয়ে, ধুনো, শাঁক, গঙ্গাজল ও পবিত্রতায় আচ্ছাদিত হয়ে ঐ সকল কুঞ্জে লুকিয়ে রয়েছেন! পালে পালে মেষপালের ন্যায় বাবুর পাল অনবরত ঘুরচেন। এক একটা বুলডগ্ তাঁহাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে যাচ্চেন। ইহারা বলেন, আমরা সখের খাতায় বর্দ্ধমানের মহাতাপচাঁদ ও কলকেতার জয়মিত্র অপেক্ষাও সরেস। কিন্তু যে দিন জয়কৃষ্ণ খালাস হন, সে দিন অনেকের নিষ্কণ্টক বাবুগিরির ভূমিকম্প হয়েছিল। এদেশের জাতিভেদ ও সমাজ বন্ধনকে ধন্যবাদ। আজ অনেক ব্রাহ্মণ গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ নিয়ে, তিলক কেটে, গামছা নিয়ে বেশ্যাদের দ্বারে দ্বারে আতপ চাল, বীরখণ্ডী ও ছোলা সংগ্রহ করে বেড়াচ্চেন। ইহাদের অনেকে ন্যায়লঙ্কার, শিরোমণি ও বাচস্পতি।

একদিকে সরস্বতীপুজো হয়ে গ্যালো। ঢাক ঢোল বেজে উঠলো। ছেলেরা নৈবিদ্যির ধারে দাঁড়িয়ে সচন্দন ফুল বিল্বপত্র নিয়ে "সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং" বলে অঞ্জলি দিলে। ফুল কানে গুঁজে বীরখণ্ডী ও কুল খেলে। সূর্য্যদেব মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিমে একটু গড়িয়ে পড়লেন। পরামাণিক ও রিপুর কর্ম্ম শেষ পাক ধুয়ে ফিরে গ্যালো। গুড়ুম্ করে একটার তোপ পড়লো। পথে কোর মাথানো কাপড় পড়া ছোঁড়া ও আধখানা বুকখোলা ঝি করা ছুঁড়ীগুলো গাড়ির ভিড় ঠেলে এবাড়ি ওবাড়ি ঠাকুর দেখে বেড়াচ্চে। যাত্রাওয়ালার মুটেরা তারে করে মুখোস, চোলক ও বাখারির হাতী নিয়ে ছুটে যাচ্চে। বওয়াটে মিন্সেগুলো হো হো শব্দে তাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুচ্চে। ক্রমে দুটো, তিনটে চারটে ও পাঁচটা বেজে গ্যালো; সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। রাস্তার গ্যাসের লাঠন মাথায় খুঁটিয়া মই কাঁধে মুটেদের হাত ধরে মহানগরীকে মণিহার উপহার দিতে লাগলো। গলির ভিতরের ছেলের আলোরা জোনাক্ পোকাদের স্পর্দ্ধা করে মিড়্ মিড়্ করে জ্বলে উঠ্লো। দেবীশালার আসরের ঝাড় জ্বেলে দেওয়া হলো। চার দিকে বাঁধা রোশনাইয়ের খোল্তা দেখে কুমুদিনীনাথ যেন, অভিমানে শরীরের দু ভাগ ঢেকে তৃতীয়াংশ বিকাশ করেন। প্রতিমে দর্শনের সময় উপস্থিত হলো। আরতি হয়ে গ্যাচে, বাজনাবাদ্দি চুপ করেচে। এমন সময় বাবুদের কোচ্ম্যানেরা কপিধ্বজ জুড়ে আন্লে। বাবুরা সন্মৌলদ্দৌ তাহাতে আরোহণ করেন। শুকৃষ্ণপরা আয়দালীরা শ্বেত চামর কাঁধে ঝুলিয়ে পেছনে উঠ্লো। দু একজন কেনা রাজার আশা-সোঁটাবরদারেরা কোচ্-বাক্সে বসলো। লোকের ভিড়, গাড়ির শব্দ ও সহিসের "সাম্নেওয়ালা, সকড়ওয়ালা" চীৎকারে রাস্তা দুর্গম করে তুল্লে। ইতিমধ্যে এক জন মোসাহেব ছোঁড়া উড়্নির পাগড়িবাঁধামুদ্ধ তড়াক করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে, বেশ্যা পরস্পর পানের দোনা কিনে নিয়ে গেলেন।

দর্শকেরা এইরূপ রাজবেশে দশ বাড়ির ঠাকুর দেখে আমোদ করে বেড়াতে লাগ্লেন। এক এক বাড়ির বড় কর্ত্তা প্রতিমের সম্মুখে জনতার ছল করে দর্শকদের আলিঙ্গন দিয়ে তুল্লেন। আদরের সামগ্রী যেরূপে গ্রহণ কর্ত্তে হয়, কল্কেতার বাবুরা তাহা বিলক্ষণ জানেন। আতরদান্ গোলাবপাশ হাতে এক এক জন সম্বোধর প্রায় সকল বাড়ির প্রতিমের সম্মুখে হাজির আছেন। তাঁরা নিমন্ত্রিত-গণের মুখে, বুকে গোলাপ বৃষ্টি কচ্চেন, আর আড়ে আড়ে হাসচেন। * * *

এক এক বাড়িতে নিকষুষ গোছের পাঁচালি, এক বাড়িতে উমেশ মিত্তের (গোপালে উড়ের) যাত্রা, এবং অনেক বাড়িতে হাফ আখড়াই আসর হয়েছে। কেবল এক এক জন খাস হিঁদুর বাড়িতে কবি নেমেছে। কোন কোন বাড়ির কর্ত্তারগিন্নি পাত্র টেনে আপনারাই আসর রেখেছেন। এক বাবু তালে তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে জড়িত জিহ্বায় নিম্নলিখিত গানটি ধরেছেন :—

তাল আড়াঠেকা

"দিবানিশি তোরো লাগি কোরে আমার দু নয়ান।"

ইত্যাদি

...

বিবি তবলা বাজাচ্চেন। বাবু নানা প্রকার সুরে "ক্যান্ লো এমন হলি প্রাণপ্রিয়সী সই ?" "অনুগত আশ্রিত তোমার।" "কড়ির লোভে কারুর কাছে যেও না দুখিনীর বাছা।" "একি ভাব দেখি বিধুমুখী কথা কও বিধু বদন তুলে।" প্রভৃতি গীত গাচ্চেন আর ঘুরে ঘুরে নাচ্চেন। ঘুরে—"বেল ফুল,—চাই বরোফ !" ফেরিওয়ালা ডাকচে। এমন সময় দক্ষিণ দিক থেকে পাঁচ জন মাতাল বাবু এসে "মদন আগুন জ্বল্‌চে দ্বিগুণ" বলেই দোর ঠেল্লেন। বাবু অমনি বাড়ির ভিতর থেকে কালোয়াতী আওয়াজে "কে এলি সুন্দরী এলি উমা এলি মা।" এই গীতটি ধরে দোর খুলে দিতে গেলেন। বিবি সাহেব অমনি পিছন দিক থেকে "আরে করচো কি ?" বলে কাপড় ধরে টানাটানি কত্তে লাগলেন। বাবু ঘাড় বেঁকিয়ে পশ্চাতে চেয়ে "কে মা শুভঙ্করি ! পদ্ম থেকে উলে এলি কোন বাপ ?" বলে বিবিকে নিয়ে প্রতিমের (সরস্বতী) উপর বসাতে চল্লেন। শুভঙ্করী হাত পা নেড়ে চেঁচিয়ে বক্তৃতা কত্তে লাগলেন। এইরূপ আধ ঘণ্টা আমোদের পর দোর খুলে দেওয়া হলো। মাতালেরা অওারটেকারের মত বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে, সরস্বতীরে দেখে "মা আমার বসে রয়েছেন যেন লঙ্কোদরী দশানন !" বলেই সাষ্টাঙ্গে নমস্কার কল্লেন। বাড়ির কর্ত্তা "কম্ হিয়ার মাই জলী ফ্রেণ্ডস্" বলে শেকহ্যাণ্ড কল্লেন। বাড়িওয়ালী বোতল ও গেলাস নিয়ে "এই এসো !" বলে রিসিভ্ কল্লেন। সকলে মদ খেলেন। বাবুদের এক জন তাঁর লক্ষ মাসীর রান্নাঘর থেকে একটি কাড়ালো লাঙ্গুলবিশিষ্ট শাদা ঘষিমুখো মেনী বেরাল চুরি করে এনেছিলেন, সেইটি মা সরস্বতীর শ্রীপাদপদ্মে উপহার দিলেন ! একটা হাসির গর্‌রা উঠ্‌লো। যার বেরাল, তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ করে বসে রইলেন। আর এক বাবু তাস খেল্‌তে খেল্‌তে উঠে এসেছিলেন, তাঁর বগলে একখানা তাস ছিল, তিনি সেই তাসখানা আছড়ে ফেলে, ঘাড় হেঁট করে বল্লেন, "এই এসো ! আমার এবার চিত্তেশ্বরের চৌকা। ছোট বউ তুরুপ কর, মন্দোদরী পাদ দে যা। আমি বিবি ধরি।" অবশেষে সকলে মিলে :—

গীত

তাল আড়াঠেকা

"সখী সঙ্গে রঙ্গে কে মা বিরাজো রাজকুমারী !
বীণাযন্ত্র করে ধরা, শিরে চূড়া শুভঙ্করী।

... ...

...মাতলামি পেশাটি বড় আমোদের পেশা। মাতালেরা সকল মজলিশেই যাওয়া আসা করে থাকেন। কাজেই ভাল ভাল কবিদের বাঁধা ভাল ভাল গীত ও কবিতা অনেক-গুলি কণ্ঠস্থ আছে। আজ সময় পেয়ে (সরস্বতী পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নৌঘিন-মজলিশে) এক জন বল্লেন, "ভাই ! আর বছর সেই—রাধাবাজারের সভাকান্ত বাহাদুরের—(শ্রীবিষ্ণু !!) সভাবাজারের রাধাকান্ত বাহা-দুরের বাটীতে তিনজন ইয়ার বাবু সেই বেশ্যাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাবাজীর ছাপাকরা—দূর শোক্ নাম আসে না—সেই মোহিনীবাবুর মেয়েমানুষটির নাম কি হ্যাঁ ? (দ্বিতীয় বাবু বল্লেন, "ইন্দুমতী।") ঐ বটে ! ঐ বটে ! ইন্দুমতী বিলাস নাটক, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ইন্দু কি খাস্ নাটক পড়্‌ছিলো, তাইতে যে সব তারারাণের নাম আছে, তারি কটা ছেড়ে দিই" :—

সরস্বতীকে পুনর্ব্বার হেরিয়া

গীত

রাগিণী সুহিনী বাহার। তাল তিওট

"রমণী শিরোমণি, রূপে মুনিমনো হরে।
ত্রিভুবন-মনোলোভা, ধরাতে না শোভা ধরে।

... ...

ললিত লাবণ্য কায়, চোলে যেতে গোলে যায়,
বিধি বুঝি এ কারায়, গোড়েছে নবনী দরে।"

নৃত্য।

(থেই, থেই, থেই, তাথেই, তাথেই,
ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা, ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা।)

গীত

শ্যামাবিষয়।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

"কে রে, বামা, বারিদবরণী, ত্রিশূল তালে ধরেছে ভবানি,
ইত্যাদি

নৃত্য।

(তিনাক্ ধাঁধা, তিনাক্ ধাঁধা, ধাঁ ধাঁ ধাঁ
তিতুড় তিতুড়। ধাঁ ধাঁ ধাঁ-তিতুড় তিতুড়।)

গীত।

শ্যামাবিষয়।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

"কে রে, বামা, ষোড়শী রূপসী, সুবেশী, এ, যে,
নহে মানুষী,
ইত্যাদি

..

গীত।

নাচের তালে হাফ আখ্‌ড়াই।

"দুর্গাবাড়ি, দুর্গাপুজা, বড় দেখি জাঁক রে।
মঙ্গলেতে মঙ্গলার, যাত্রী কাঁকে কাঁক রে॥
ইত্যাদি

গীত।

জড়িত জিহ্বার।

নাচিতে নাচিতে।

"ও মা, দিগম্বরি—! নাচো গো! শ্যামা, রণ মাঝে!
পতির বুকেতে পদ, যোগিনী যোগায় মদ,
মা গো মা! দেখে মরি লাজে॥
ও মা দিগম্বরি!—
(কোন্ ছায় তোম্! বাবা, কোন্ ছায় তোম্!
ওঁড়ে মা ভবানী, তোলা বোম্ বোম্ বোম্।

ভজন।

"কোহি আওকো না মানো বাবা,
না মানো দেবী দেবা।
একি মনসে, কালী মাইকো, পাওমে করো সেবা॥
বাবা, পাওমে করো সেবা॥
যব্ হি দেখা, আয়ে মনমে, তেসসে করো ভোগ।
ছোড় দেও সব, ধুস্তুরো বাৎ, তুলা যাগ যোগ॥
বাবা, তুলা যাগ যোগ॥
আব্ কি নারী, পর্ কি নারী, যেহি মেলে সঙ্গ।
নেহি ছোড় দেও, ক্যা খুসি হায়, কাম দেও কি রঙ্গ॥
বাবা, কাম দেও কি রঙ্গ।
ইত্যাদি

...

গীত।

তাল জলদ কাওয়ালি।

"নেশাতে ঢুলু ঢুলু করিছে নয়ন।
কোথা রহিল আমার সে বিধুবদন॥
ইত্যাদি

... ...

এই জমাট্ আখ্‌ড়াইয়ের পর এক জন একটি কামিনী মণিকে ধরে, "বাওয়া! তুঁ একটি গাওনা বা!" বলে অনুরোধ করেন। বাওয়া তখন খোলা প্রাণে বুঁদ হয়েছিলেন, অনুরোধ পড়বা মাত্র তৎক্ষণাৎ "কেমন মাসীর বোনপো তুমি দেও দেখি আজ গেঁথে মালা।" গাইতে গাইতে ঝুমুর আরম্ভ করে দিলেন।

ওঁরা যেরূপ রমণীমণি, কোন স্থানই অগম্য নেই, সুতরাং তিনিও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তৈরি করা এই গান গাইলেন :—

রাগিণী বাহার। তাল খেম্‌টা।

"দিন্ দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাত্ পোয়ানো ভার।
হোলো পূর্ণিমেতে অমাবস্তে, তেরো পহর অন্ধকার॥
এসে বিন্দাবনে বোলে গেল, বামী বষ্টমী,
একাদশীর দিনে হবে, জন্ম অষ্টমী,
আর ভাদ্দর মাসের সাতুই পোষে
চড়ক পূজার দিন এবার॥
সেই মরমা মাগী মরে গেল, বুকে মেরে শূল,

বাবুনগুলো ওষুধ নিয়ে বাবার বোঝে চুল,
কাল বিষ্টি জলে ছিষ্টি ভেসে,
পুড়ে হলো ছারখার।
ঐ সুদ্যিমামা পুব্ব দিকে আস্তে আস্তে যায়,
উত্তর হবিন্ কোণ থেকে আজ, বাতাস লাগতে গায়,
সেই রাজার বাড়ির টাট্টু ঘোড়া,
শিং উঠেছে দুটো তার।
ঐ কলু রামী, ধোপা শ্যামী নাচতেছে কেমন,
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে কখন,
কাস্ কামরূপেতে কাগ মরেছে,
কাশীধামে হাহাকার।

পাঁচটি বাবুর পক্ক মুখ থেকে এককালে "কেয়াবাৎ, জীতা রও, বলিহারী বাবা!" প্রভৃতি শোভাস্তুতী উপহার পড়তে লাগ্‌লো। এক জন এক পাশ থেকে আড়নয়নে চেয়ে করতালি দিলেন।

চার দিকে এইরূপ আমোদ চলচে, ওদিকে নগর আলোময় এ সময় কি সখের প্রাণের উড়ুক্ষু বিহঙ্গমদিগকে গৃহপিঞ্জরে রুদ্ধ করে রাখবার সময়? চিৎপুর রোডের মহাপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রিটের এক জন বাবু আপনার গবাক্ষ দিয়ে নগরের শোভা দেখে আর স্থির থাকতে পারেন না। বিশেষতঃ তিনি এই কতক্ষণ দশ জন গ্রাসক্রেতা নিয়ে মন খুলে আমোদ করেছেন। দেখতে দেখতে হুড়মুড় করে সিঁড়ির কপাট খুলে ফেল্লেন। তাঁর বৃদ্ধ পিতা শব্দ পেয়ে দরোজা খুলে তাঁকে ধল্লেন। বাবু পিতার গলা ধরে বল্লেন, "কে ও দাইডিয়ার বাবা! আজ তোমাদের ছাড়া হবে না ভাই। আজ তোমারে আমার মাথাঘষার নূতন বাড়িতে আমোদ করে যেতে হবে। কুই হুজ্‌লি!" বৃদ্ধ এই কথা শুনে দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে তার হাত ছাড়িয়ে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করেন। অন্তঃকরণ দুঃসহ পরিতাপে দহন হতে লাগলো। বাবু আড়ষ্ট হয়ে "শালার বাবা পালালে?" বলে টলতে টলতে নেমে গেলেন। হা হতভাগ্য কলকেতা! সরস্বতী একচেটে না হলে এই সকল অবও ছেলে আজো বেঁচে আছে দাখো?

আমোদের রাত্রি দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়, এই নিমিত্তই যেন বিভাবরী সাঁ সাঁ করে স্থানে প্রস্থান করেন। ক্রিয়াবাড়ির লোকেরা পরদিন সকালে যেন ঝড়নাড়া বাঁশের মত দেখাচ্চেন। আমোদের খোঁয়ারিতে চক্ষু মহাদেবের মত ঢুলু ঢুলু কচ্ছে। তার পর বৈকালে পুলিসের পাসের নিয়ম মতে মাকে বিসর্জ্জন করে নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁরাও বাঁচলেন, সরস্বতীরও এক বৎসরের মত হাড় জুড়ুলো। সরস্বতী পূজা সমাপ্ত।

জলেমাটির গন্ধ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্যামলই আগে গিয়ে ভিতরে ঢুকল। সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুভ্রা এল পিছনে পিছনে।

শ্যামলকে বলতে দিয়ে নলিনী বললেন, 'কি ব্যাপার শ্যামল, এত রাত্রে যে।'

শ্যামল বলল, 'রাত কোথায় মাসীমা। এই তো ডিউটি দিয়ে ফিরছি।'

ক্যালকাটা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই অফিসে কাজ করে শ্যামল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ডিউটি পড়ে। সান্ধ্য কর্তব্য সেরে এখন ওর বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে।

নলিনী বললেন, 'তা জানি। যেমন তুমি তেমনি তোমার চাকরি। ভগবান মানুষকে তার মন বুঝেই ধন দেন।'

মায়ের এই রূঢ়তায় শুভ্রা ক্ষুণ্ণ হল। মা অবশ্য শ্যামলকে পছন্দ করেন না তা সে জানে। শ্যামল পড়াশুনোয় বেশি-দূর এগোতে পারেনি। আই এস-সি, পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছে। অবশ্য তার আগে বাড়িতে কাউকে না বলে কাকে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। মার ধারণা শ্যামল বড় উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের যুবক। কল-কারখানায় কাজ করে। ওর সঙ্গী-সাথীরাও তেমন ভদ্র নয়। শুভ্রাদের সঙ্গে শ্যামল যে যোগাযোগ রাখে, বাড়িতে যখন তখন আসে মা তা পছন্দ করেন না। বিশেষ করে বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মা যেন আরো বেশি খুঁৎখুঁতে হয়ে-ছেন। পাছে এই ধরণের মেলামেশার পাচার কেউ তাঁর মেয়েদের নামে কিছু বলে সেই হয়েছে মার সবচেয়ে আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তা। কিন্তু মা এটুকু বুঝতে পারেন না যে ভালো-মন্দ বুঝবার বয়স তার যথেষ্ট হয়েছে। আর যে কোন ধরণের আলাপ পরিচয় আর বন্ধুত্বের মানেই প্রণয় নয়।

শিপ্রা বলল, আপনাকে এক কাপ চা করে দেব নাকি শ্যামলদা?'

শ্যামল যে চায়ের কথায় বেশ একটু উৎসাহী হয়ে উঠল তা বেশ বুঝতে পারল শুভ্রা। কিন্তু বোধ হয় তার মার কথা ভেবেই উৎসাহ দমন করে বলল, 'না-না, এত রাত্রে আর চায়ে দরকার নেই। চলি মাসীমা।'

নলিনী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ এসো। কত রাত হয়ে গেল দিনের বেলায় এসো।'

কিন্তু চলি বলেই যে শ্যামল উঠে দাঁড়াল তা নয়। বরং উঠবার তার কোন গরজই দেখা গেল না। শুভ্রা আর শিপ্রার সঙ্গে গল্প করবার সে যেন এই একটি পরম উপযুক্ত সময় বেছে নিয়েছে।

শ্যামল বলল, 'তারপর তোমার ইন্টারভিউর কি হল শুভ্রা?'

'কি আবার হবে। দিয়ে এলাম।'

'হবে চাকরি!'

'আশা তো করি।'

'অত দূরে ওই এক পাড়াগাঁয়ে তুমি রোজ ট্রেনে করে যাতায়াত করতে পারবে?'

এবার শ্যামল নলিনীর সহানুভূতি পেল। হয়তো সহানুভূতি পাওয়ার জন্যেই এই প্রসঙ্গ সে তুলেছে। চালাক তো কম নয়।

নলিনী বললেন, 'তাই দেখ বাবা মেয়ের গোঁয়ার্তুমি দেখ। কলকাতায় যেন মূল নেই। পাড়াগাঁ ছাড়া ওর মাষ্টারি জুটল না।'

শুভ্রা বলল, 'কই আর জুটল মা। যখনই জুটবে তখনই ছেড়ে দেব। এতো আর বর দিয়ে চাকরি করছিনে।'

শিপ্রা মাকে চটাবার জন্যে বলল, 'জানো মা দিদির ভিতরে ভিতরে আরো অনেক রকম ইচ্ছে আছে।'

নলিনী একটু সন্দিগ্ধ চোখে মেয়েদের দিকে তাকালেন 'কী ইচ্ছা শুনি?'

শিপ্রা গম্ভীরভাবে বলল, 'দিন কয়েক ভেলি প্যাসেঞ্জারি করবে দিদি। তারপর ওখানে হষ্টেলে থাকবে।'

নলিনী রাগ করে বললেন, 'তা হলে আমি বাড়ি ছেড়ে দেব।'

আচ্ছা মেয়ে একখানা। বোনের ওপর ভারি রাগ হল শুভ্রার। অনর্থক অনাসৃষ্টি ঘটাবার একজন।

বোনের দিকে একবার ভ্রূকুটিকে তাকিয়ে মাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে এবার শান্ত করবার চেষ্টা করল শুভ্রা। 'তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি মা? আমি বোনকে তোমাকে ছেড়ে সেই পাড়াগাঁয়ের বোর্ডিং হষ্টেলে পড়ে থাকতে যাব? দূরেই যদি থাকব তাহলে তো ভালো কোন জায়গায় চাকরি নিয়ে যেতে পারতাম। দূরে যাব না বলেই তো—'

নলিনী বললেন, 'দূরে যেতে তোমাকে দিচ্ছে কে?'

শিপ্রা ফোড়ন দিল, 'দিদির বিয়ের সময় কী করবে মা?'

'সে আলাদা কথা।'

শিপ্রা বলল, 'নাকি বিয়ে দিয়েও ঘরে ধরে রাখবে। কিন্তু বাড়তি একখানা ঘরও তো নেই যে ঘরজামাই-টরজামাই কেউ এসে থাকবে। কি বলুন শ্যামলদা।'

শ্যামলের কিছু বলবার আগেই নলিনী মেয়েকে কড়া ধমক দিয়ে উঠলেন,'আচ্ছা বাচাল হয়েছিস তো। যা আমার সামনে থেকে সরে যা। আমি সইতে পারিনে এসব।'

শিপ্রা সরে গেল না। শুধু মুখ নিচু করে রইল। শুভ্রার কোন সন্দেহ রইল না ও নিশ্চয়ই হাসছে। লুকিয়ে লুকিয়ে হাসছে।

বাচাল প্রগল্‌ভ বোনের ওপর শুভ্রার মাঝে মাঝে ভারি রাগ হয়। ও যেন কাউকে গ্রাহ্য করেনা, কাউকে গুরুত্ব দিতে চায় না। হাসি কৌতুকে সবই উড়িয়ে দেওয়া যেন ওর স্বভাব। কিন্তু নিজের এই ছোট বোনটিকে ভালোওবাসে শুভ্রা। ওর সারল্য আর চটুলতা বাড়ির গুরু গম্ভীর পরিবেশকে অনেকখানি লঘু করে দেয়। শিপ্রা হাসি-কৌতুকে বাড়িটাকে প্রাণবন্ত করে রাখে। ও না থাকলে এ বাড়িতে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার কষ্ট হত।

শ্যামলও মুখ টিপে টিপে হাসছিল। তপু একটু আগে উঠে চলে গেছে। বড় ঘুমকাতুরে ছেলে। গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

আরো খানিক রাতে শ্যামল উঠে দাঁড়াল, 'চলি মাসীমা। শুভ্রা চলনা, দোরটা দিয়ে আসবে।'

মা পছন্দ করছেন না তা জেনেও শুভ্রা শ্যামলকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল।

রাস্তায় নামবার আগে শ্যামল বলল, 'তুমি তাহলে সেই গাঁয়েই মাষ্টারি নেবে।'

শুভ্রা বলল, 'যদি দরকার হয় নেব। তোমার অত দুশ্চিন্তা কিসের।'

শ্যামল বলল, 'বাঃ রে আমার আবার কিসের দুশ্চিন্তা? আমার তো সুবিধেই হবে। আমি তোমাকে রোজ হাওড়া ষ্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব। কোন কোন দিন হয়তো তোমার সহযাত্রী হয়ে একই সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসব।'

শুভ্রা হেসে বলল, 'ভারি সখ দেখছি। তোমার বুঝি অফিস-টফিস কিছু নেই।'

শ্যামল বলল, 'আমার অফিসের তো কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কখনো সকালে কখনো দুপুরে কখনো রাত্রে। তোমার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে ফাঁক খুঁজে নিতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না। ফাঁকে যদি না পাই ফাঁকি দেব—কামাই করব।'

শুভ্রা ছদ্ম গাম্ভীর্যের ভঙ্গিতে বলল, 'অত দুষ্টুমিতে কাজ নেই। এবার ভালো ছেলের মত বাড়ি যাও তো।'

শ্যামল হেসে বলল, 'এরই মধ্যে ঝিরিমিরিগিরি শুরু করে দিলে। তবু তো এখন পর্যন্ত মাইরি পাওনি।'

মায়ের গলা শোনা গেল 'শুভ্রা!'

শুভ্রা আর দাঁড়াল না। শ্যামলকে বিদায় দিয়ে দোর বন্ধ করে ভিতরে চলে গেল। তারপর একটু বিরক্ত হয়েই বলল, 'অমন ডাকাডাকি করছিলে কেন মা! দেখলেই তো, আমি দোরের কাছে রয়েছি। বাইরে কোথাও যাই নি।'

নলিনী উত্যক্ত হয়ে বললেন, 'বাইরে না গেলেইবা কি। এত রাত্রে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কি তোর গল্প করার সময়! রাস্তার পাশে ঘর। লোকে দেখলে বলবে কি? এতখানি বয়স হল এম-এ পাশ করলি—কিন্তু কোন আক্কেল-বুদ্ধি আর হলনা।'

শুভ্রা চটে উঠে বলল, 'আক্কেল-বুদ্ধির অভাব কোথায় দেখলে শুনি?'

'অভাব নয় তো কি? এই একটা বাজেমার্কা ছেলের সঙ্গে এত রাত্রে তুই সদর দরজায় গিয়ে গল্প জুড়ে দিলি। তুই আবার আক্কেল বুদ্ধির বড়াই করছিস!'

শুভ্রা আরক্ত মুখে বলল, 'আমি কোন অন্যায় করিনি মা। কিন্তু তুমি একেবারেই শ্যামলদাকে দেখতে পার না। ওকে দেখলেই তুমি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠো। অথচ ও আমাদের কত উপকারী। বাবার অসুখের সময় কত কি করেছে। তারপর তিনি চলে যাওয়ার পরেও ও আমাদের অনেক উপকার করেছে। যখন যে কোন দরকারে ওকে আমরা ডাকলেই ও সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। সে সব কথা ভুলে গেলে চলবে কেন মা?'

নলিনী এবার ভারি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। উত্তেজিত স্বরে বলতে লাগলেন, 'ভুলিনি বাছা ভুলিনি। সবই মনে আছে। সে যেমন উপকার করে, এটা ওটা করে দেয় আমিও তেমনি বাড়িতে এলে তার আদর যত্ন করি। যখন যা ঘরে থাকে সামনে ধরে দিই। কিন্তু তাই বলে যখন তখন হুট হাট করে বাড়ির মধ্যে ঢুকবে? কেন তোর শিছনে শিছনে ঘুরবে? যেখানে সেখানে তোর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেবে? এ-সব কি ভালো?'

শুভ্রা বলল, 'তোমাকে তো বলেছি মা, ভালোমন্দ বুঝবার বয়েস আমার হয়েছে। আর তুমি যা ভাবছ মোটেই তা নয়। ওর সঙ্গে মোটেই আমার সে ধরণের কোন সম্পর্ক নেই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

কথায় কথায় হয়তো বেশি রুঢ় হয়ে পড়েছিল শুভ্রা। মা সেইটুকুর জন্যেই আড়ালে গিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

এই আর এক বিপদ হয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মার স্পর্শকাতরতা অনেক বেড়ে গেছে। ওঁকে কিছু বলবার জো নেই। বললেই হয় রাগ করে চেঁচামেচি করবেন নয়তো ঘরের কোণে বসে বসে কাঁদতে থাকবেন।

অনেক কষ্টে মাকে শান্ত করে খাইয়ে ঘুমুতে পাঠিয়ে তবে নিজে শুতে যেতে পারল শুভ্রা।

শিপ্রা আর সে একই বিছানায় শোয়। শুতে এসে দেখল শিপ্রা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। লাইব্রেরী থেকে আনা উপন্যাসখানা এক পাশে খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

মৃদু হেসে বইখানা বন্ধ করে রাখল শুভ্রা। তারপর হাত বাড়িয়ে সুইচ অফ করে দিল।

অন্ধকারে সারাদিনের অভিজ্ঞতাটা ছাড়া ছাড়া ভাবে মনে পড়তে লাগল। রামবাবুর সৌজন্যের আতিশয্য, কেতকীর ঠাট্টা-তামাসা, ট্রেনে যাতায়াত, শ্যামলকে নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তার কথা ভেবে হাসি পেল শুভ্রার। এক পাড়ায় থাকে ছেলেবেলা থেকেই ওর সঙ্গে আলাপ। কিন্তু আলাপ মাত্রই। তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার সত্যিই কোন কারণ নেই মার। বলা যায়না শ্যামলের মনে হয়তো একটু দুর্বলতা আছে। হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়েও মাঝে মাঝে সেটুকু প্রকাশ পায়। কিন্তু শুভ্রা তাকে কখনোই প্রশ্রয় দেয়নি—দেবেওনা। অসম্ভব কোন কল্পনা শ্যামলের না করাই উচিত।

স্কুলের কাজটারই বা কি হবে? যতদূর মনে হয় রামবাবু তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠাবেন। শুভ্রা কি করবে? কাজ নেবে কি নেবেনা? স্থির কোন সিদ্ধান্তে আসবার আগেই শুভ্রার দুচোখ ভেঙে ঘুম নেমে এল। [ক্রমশঃ

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের চেষ্টায় মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্থান প্রদেশে তাসখণ্ড সহরে এক অসাধারণ বৈঠকের আয়োজন হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সহিত পাকিস্থানের ১৮ বৎসর ব্যাপী বিবাদ মিটাইবার জন্য কোসিগিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁকে তাসখণ্ডে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীজী ও আয়ুব খাঁ গত ৪রা জানুয়ারী সোমবার সেখানে যাইয়া উপস্থিত হন। তাহার পর ৮দিন ধরিয়া কোসিগিনের সম্মুখে উভয় পক্ষ আলোচনা করেন। ৮দিন প্রত্যহ ১০।১২ ঘণ্টা করিয়া আলোচনা করিবার পর ১০ই জানুয়ারী বিকালে উভয় পক্ষ এক যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়া দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটাইবার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু সেইদিন রাত্রিতে সেখানে সহসা শাস্ত্রীজীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। কাজকর্ম ও আহারাদি সারিয়া তিনি রাত্রি প্রায় ১১টায় নিদ্রামগ্ন হন। হঠাৎ ১টা ২৫ মিনিটে তাঁহার বুকে দারুণ যন্ত্রণা হয় এবং সাত মিনিট পরে ১টা ৩২ মিনিটে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদ তখনই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং অল্পক্ষণের মধ্যে দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের নিকট ও দিল্লী ১০নং রাজপথের শাস্ত্রীজীর পরিবারবর্গের নিকট খবর পৌঁছিয়া যায়। তখনই সারা ভারতের লোক খবরটি জানিতে পারে ও মঙ্গলবার সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতের মানুষ খবর জানিয়া শোকে অভিভূত হয়।

সারা ভারতের দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায় এবং মঙ্গল ও বুধবার দুইদিন সকল সরকারী ও বেসরকারী অফিস, আদালত সমস্ত বন্ধ ছিল।

শাস্ত্রীজীর সহিত কেন্দ্রের দুইজন মন্ত্রী স্বর্ণসিং ও ওয়াই. বি. চ্যাবণ তাসখণ্ডে গিয়েছিলেন। কোসিগিনের সহযোগিতায় ও সকলের চেষ্টায় তাঁর মৃতদেহ পরদিন মঙ্গলবার বেলা ছ'টার সময় বিমানযোগে দিল্লীতে আনা হয়। তাসখণ্ডে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সহচর রামনাথ ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার শেষ কথা 'হাম বাপ, হাম রাম, হাম ভাইয়া'। কোসিগিন শাস্ত্রীজীর মৃতদেহের সহিত দিল্লীতে আসিয়াছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী হইয়া শাস্ত্রীজি ১৯৬৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর প্রথম কলিকাতায় আসেন ও ময়দানে জনসভায় বক্তৃতা করেন। ১৯৬৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তিনি শেষবার কলিকাতায় আসিয়া নেতাজীর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। ইহার মধ্যে ১৯৬৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭ সালের ১১ই জানুয়ারী দুর্গাপুর কংগ্রেসের সময় ও ঐ বৎসর ১লে অক্টোবর যুদ্ধের মধ্যে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। গত ২৩শে ডিসেম্বর তিনি কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে যাইয়া বিশ্বভারতী বিশ্বালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

মঙ্গলবার বেলা দুইটা হইতে বুধবার সকাল ১০টা পর্য্যন্ত তাঁহার মৃতদেহ দিল্লীতে রাখিয়া দেওয়া হয় ও তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদার সহিত বুধবার বিকালে দিল্লীর যমুনাতীরে শান্তিবন নামক স্থানে তাহা অগ্নিদগ্ধ করা হয়।

১৯০৪ সালে ২রা অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের বারাণসী জেলায় এক গ্রামে তাঁহার জন্ম। কাশী বিদ্যাপিঠে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে ও ১৯৩০ সালে লবণ আন্দোলনে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৩৫ হইতে ৩৮ উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক, ১৯৩৭ সালে উত্তরপ্রদেশ আইনসভার সদস্য থাকিবার পর ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এবং ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি পুনরায় কারাবরণ

করেন। ১৯৪৬ সালে পুনরায় আইন সভায় যাইয়া প্রথমে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারি তারপর উত্তর-প্রদেশ কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির সেক্রেটারি ও ১৯৪৭ সালে উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ১৯৫১ সালে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন ও ১৯৫২ সালে রাজ্যসভার সদস্য হইয়া কেন্দ্রে রেলমন্ত্রী নিযুক্ত হন। রেলদুর্ঘটনার জন্য ১৯৫৬ সালে মন্ত্রীপদ ত্যাগ করিয়া ১৯৫৭ সালে তিনি আবার নির্বাচিত হইয়া কেন্দ্রে পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী হন।

১৯৫৮ সালে তাঁহাকে কেন্দ্রে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী করা হয় ও ১৯৬১ সালে কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে তাঁহাকে ১৯৬১ সালে কাছাড় দৌত্য, ১৯৬১ সালে কেরল দৌত্য ও ১৯৬৩ সালে স্পেশাল দৌত্য করিতে হয়। ১৯৬৩ সালে কামরাজ-পরিকল্পনায় তিনি মন্ত্রীপদ ত্যাগ করেন। ১৯৬৪ সালে ফেব্রুয়ারীতে পুনরায় তিনি দপ্তরহীন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। সেই সময় তাঁহাকে কাশ্মীর-দৌত্য করিতে হইয়াছিল।

১৯৬৪ সালের জুন মাসে নেহরুর স্থানে তিনি সংসদে কংগ্রেসের নূতন নেতা নির্বাচিত হন। ঐ বৎসর তাঁহাকে কমনওয়েলথ নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগদান করিতে হয়। ১৯৬৫ সালে শাস্ত্রীজী নানা প্রয়োজনে সোভিয়েট রাশিয়া, বুলগেরিয়া, ইংলণ্ড, কানাডা, ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করেন ও লণ্ডনে আয়ুব খাঁর সঙ্গে কচ্ছ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। আগষ্ট মাসে পাকিস্থানের সহিত ভারতের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৯৬৬ সালে তাসখণ্ড গমন পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে।

২৩ বৎসর বয়সে ললিতা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বর্তমানে তাঁহাদের চার পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান। ১৯২৬ সালে তিনি এলাহাবাদে পৌরসভার সদস্য হইয়া ৭ বৎসর পৌর সভায় ও চার বৎসর Improvement trust-এ তাঁহাকে কাজ করিতে হয়। ১৯৩০ সাল হইতে ৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি এলাহাবাদে কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৯৩৭ সালে আইন সভায় নির্বাচিত হইয়া সে কার্যে ধীরে ধীরে যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন।

সন্তরণ, ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস খেলায় তাঁর বেশ আগ্রহ ছিল। তিনি হিন্দীতে মাদামকুরির এক জীবনী লিখিয়াছিলেন।

সর্বাপেক্ষা পরিতাপের কথা তাঁহার ৮৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিত আছেন। শাস্ত্রীজীর জীবন-কথা এতই বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বিভিন্নমুখী কর্মে সমৃদ্ধ যে তাহা সংক্ষেপে বলা কঠিন। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি জীবনের নিম্নতম ধাপ হইতে ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ পদ ভারতের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। নেহরুজী বিরাট ধনীর একমাত্র পুত্র। প্রথম জীবন হইতেই তিনি বিলাতে উচ্চ শিক্ষা এবং কর্ম সাফল্যের সকল সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কাজেই নেহরুজীর মৃত্যুর পর এক অতি সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করায় তাঁহার সাফল্য সম্বন্ধে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু শাস্ত্রীজী ধর্মভীরু লোক বলিয়া তাঁহার সকল কাজ ভগবৎকৃপায় সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

সারা পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের সহিত বন্ধুত্ব রাখার যে নীতি পালন করিতেন তাহা আজ ভারতবর্ষকে এক অতুলনীয় মর্যাদার স্থান দান করিয়াছে। গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় প্রতিদিন তাঁহার বীরত্বপূর্ণ কথা ও কার্য ভারতের সকল মানুষকে উৎসাহ দান করিত। চীন কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইলে আমরা কিছু ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছিলাম বটে কিন্তু আগষ্টমাসে পাকিস্থানের আক্রমণ ভারতবর্ষকে জয়যাত্রার পথে আগাইয়া দিয়াছিল। এক সঙ্গে নানা স্থানে পাকিস্থানের সহিত ভারতকে যুদ্ধ করিতে হইলেও ভারতবর্ষ কোথাও পরাজয় স্বীকার করে নাই। বরং বহুস্থানে পাকিস্থানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ঘাঁটি দখল করিয়া ও সেখানে স্থায়ীভাবে ভারতীয় সৈন্য বহাল করিয়া ভারতবর্ষ বিজয় গৌরবে সম্মানিত হইয়াছে। তাহার ফলেই শাস্ত্রীজী তাসখণ্ডে যাইয়া আয়ুব খাঁকে তাঁহার মতে মত দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এ ব্যাপারে শাস্ত্রীজীকে কিরূপ বিরাট সাহায্যদান করিয়াছেন এবং অপর পক্ষে শাস্ত্রীজী কিরূপ ভীষ্মবুদ্ধি ও ধৈর্যের দ্বারা

কোসিগিনকে ভারতবর্ষের পক্ষে সকল কথা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে সকলেই বিস্মিত হইবেন।

শাস্ত্রীজী তাঁহার জীবনের শেষ আট দিন তাসখণ্ডে বসিয়া কোসিগিন ও আয়ুব খাঁর সহিত যে আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইলে জগতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচনা করিবে।

শুধু তাই নয় ভারতবর্ষের সহিত পাকিস্থানের এই আপোষ মীমাংসা সারা জগতের রাষ্ট্রনায়কদের মনে এক নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়াছে ও তাহার ফলে আমেরিকা এখনই নানাভাবে ভারতকে সাহায্য দানের কথা বলিয়া বর্ত্তমানের বিপন্ন অবস্থা হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

লালবাহাদুরের মৃত্যু ভারতের এক অপূরণীয় ক্ষতি করিল বটে কিন্তু তাঁহার জীবনের বিশেষ করিয়া শেষ আট দিনের কার্য্য ভারতকে পৃথিবীতে এক অপূর্ব্ব সম্মান ও মর্য্যাদার স্থান দান করিয়া তাহাকে বহুভাবে উপকৃত করিল।

শাস্ত্রীজীর নশ্বর দেহ না থাকিলেও ভারতবাসী বিশ্বাস করে তিনি ভারতের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন। তাঁহার শেষ কৃত্যে যোগদান করিবার জন্য ও তাঁহার মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১২ই জানুয়ারী বুধবার সারা বিশ্বে বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কগণ দিল্লীতে সমবেত হইয়াছিলেন। কোসিগিন তাঁহার ৮ দিনের বন্ধু শাস্ত্রীজীর প্রতি যে শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্য্যাদা দান করিয়াছেন তাহা জগতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে।

শান্তিদূত লালবাহাদুর

শ্রীঅনিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভূস্বারে শান্তির বারি,
নিঙারিয়া অন্তরের সুধা ;
প্রত্যয় ও প্রেম মন্ত্রে,
বাঁধিবারে বিক্ষুব্ধ বসুধা,—
যাত্রা তব হল সুরু,—
সুরু হ'তে সুদীর্ঘ পথের,
দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য পথ দুঃখ দুর্যোগের—
রাত্রি দিন ক্লান্তি অবসাদে,
নিরলস সাহস নির্ভরে।
আজ আনিয়াছ তব
জীবনের অন্তিম নিশীথে,
কঠোর তপস্যা লব্ধ শেষ দান
মৃত্যুর-অমৃতে।
স্বদেশে কল্যাণ তরে
মুক্ত করি পথ,
আনিয়াছ প্রাণ গঙ্গা
সযত্নে দু'কূলে ভগীরথ।
তাই তো একান্ত কাছে
রচিয়াছি সমাধি তোমার,
হে প্রমূর্ত্ত, মূর্ত্তি অনন্তার।

শাস্ত্রীজী স্মরণে প্রণাম

শ্রীগোপালদাস কাব্যভারতী

ভারতের প্রাণকেন্দ্রে একি নৈশ ঝড়
শৈত্যের প্রবাহ শুধু ঘর্মে কলেবর
সিক্ত, প্রাণে হাহাকার করুণ আশ্বাস,
প্রকৃতির মর্ম্মভেদি বহে দীর্ঘশ্বাস।
'তলগা' হ'তে শোকধারা গঙ্গা যমুনায়,
প্রবাহিত হইতেছে মিলন বন্যায়।
রাশিয়া ও ভারতের পথে ও প্রান্তরে,
শোকাচ্ছন্ন নরনারী কাঁদে অশ্রুনীরে।
'তাসখন্দ' বৈঠকের স্মরণীয় স্মৃতি,
মিলনের সুমহান একি পূর্ণাহুতি!
মৈত্রী প্রেম করুণার রাখিয়া স্বাক্ষর,
চির-শান্তি লভিলে হে অমর ভাস্বর।
জ্যোতির্ম্ময় লোকে আজ তোমার বিশ্রাম,
অনন্ত মানসের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

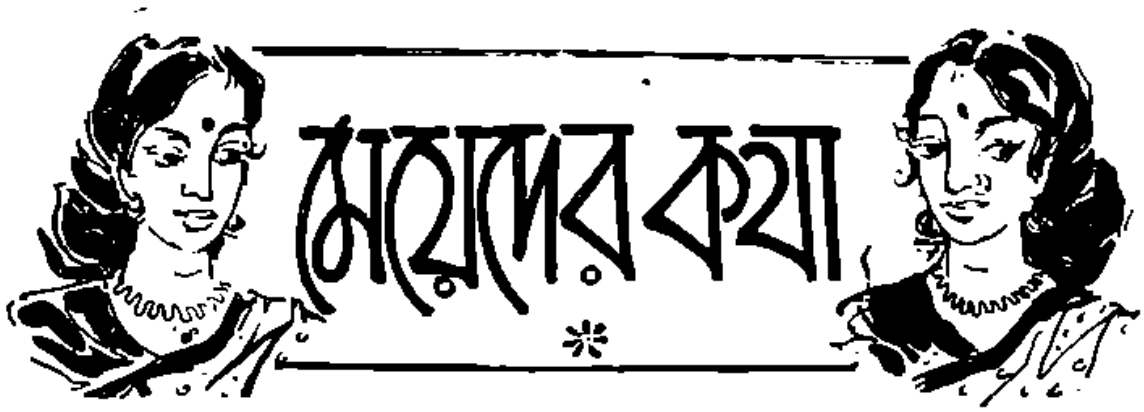

বিবাহ বিচ্ছেদ ও নারীসমাজ

শ্রীমতী মীরা রায়

সাম্প্রতিক বিবাহ বিচ্ছেদ আইন সমাজে চালু হওয়ায় নিঃসন্দেহে সমাজে একটা বিরাট বিপ্লবের সূচনা করেছে। হিন্দু বিবাহ যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এটাই অতি প্রাচীন যুগ থেকে হিন্দুদের কাছে স্বীকৃত হয়ে এসেছে, বিবাহে জন্ম-জন্মান্তরের আত্মিক সংযোগ—এই সংযোগ আজ আইনের এক কলমের খোঁচায় এত সহজে ভঙ্গুর হয়ে দাঁড়াতে পারে এটা যেমন একাধারে সমস্তাজর্জরিত হিন্দু সমাজের কাছে এক পরম বিস্ময়স্বরূপ, অন্যদিকে আধুনিক যুগোপযোগী স্বীকৃতি পেয়ে আজ এই বিচ্ছেদ বিধি এক মহাসমস্যাপূরণের চরম সত্যের রূপ নিয়েছে। দাম্পত্য জীবনের বহুবিধ জটিল ও সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা এই আইনের সাহায্যে সামাজিক ও লৌকিকভাবে শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায় খুঁজে পেয়েছে। অধুনা প্রগতিশীল নারীসমাজ এই আইন প্রচলনে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন—কারণ নিগৃহীত ও অপমানিত দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে নারী জীবনের মুক্তি নিঃসন্দেহে এঁদের কাছে পরম প্রার্থিত বস্তু।

স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, যেটাকে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হিসাবে ধরা যেতে পারে, সেটা নয় নারীর মধ্যে চিরকালের বস্তু—বর্তমানে এর রূপটি আরও কঠিনভাবে জীবনের প্রতিপদে ফুটে উঠছে। মানব চরিত্রের বিভিন্নমুখী বৃত্তি-গুলো অনুশীলন করে দেখলেই ধরা পড়বে এর কারণ কি। কোন মানুষের সঙ্গে অপর একটি মানুষের চিত্তবৃত্তির সমগুণ বজায় থাকতে পারেনা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ ঘটে থাকে। সুতরাং যেহেতু 'হৃদয়ং হৃদয়ং তব' বলে মন্ত্র পড়ে বিবাহ করা হয় সেই হেতুই যে হৃদয় দুটি সত্যকারের এক হয়ে যায় তা হয়না, বিপরীতমুখী বৃত্তিগুলি ঠিকই স্ব স্ব নিয়মাধীনে কার্যকরী হয়। এসব ক্ষেত্রে একটু ধৈর্য্যের অভাব ঘটলেই মত বিরোধ বা মনোমালিন্য ঘটা খুব স্বাভাবিক। আগেকার যুগে দাম্পত্য কলহ বা মতবিরোধ নিশ্চয়ই ঘটত, কিন্তু এ যুগের মত তখন বিবাহ বিচ্ছেদ আইন চালু ছিল না এবং বিবাহ একটা জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করায় স্বামী-স্ত্রীর মত বিরোধ সম্পর্কটা বিচ্ছেদের পর্যায়ে আসবার মত এতখানি কঠিন রূপ ধারণ করত না। সে যুগে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে মানসিক ভাবে মত বিরোধিতা করলেও সর্বতোভাবে সে স্বামীর উপর নির্ভরশীলা থাকত এবং হাসিমুখেই স্বামীর সব দোষ ত্রুটি বা অন্যায় আচরণ মানিয়ে নিত। অপর পক্ষে স্বামী ও যতই অত্যাচার বা অবিচার করুক সংসার থেকে স্ত্রীকে চিরজীবনের মত উচ্ছেদের কথা চিন্তাতেই আনতে পারত না। সাধারণতঃ ধর্মভীরু হিন্দুর মনে এইটাই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে অগ্নিদেবতা সাক্ষী করে এই যে বিবাহ সংস্কার এটা আজীবনের, এমন কি জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক, একে মুছে অস্বীকার করা যায় না। এই পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানকে উড়িয়ে

দেবার মত বেপরোয়া মনোবল আগেকার যুগে দুর্লভ ছিল। যদিও সেকালে অত্যাচারিতা স্ত্রী পরিত্যক্তার সংখ্যা সমাজে কম ছিলনা, কিন্তু এতে স্বামী-স্ত্রীর চিরন্তন সম্পর্কটা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত না। অবশ্য এটার তখন প্রয়োজনও ছিলনা, কারণ পুরুষ এককালীন বহু বিবাহ করবার অধিকারী ছিল সুতরাং অমনোমত স্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে অশান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন থেকে মুক্তি পেতে পারত।

কিন্তু পারিপার্শ্বিক শিক্ষা, অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদিতে মানুষের সহজ বৃত্তিগুলো ক্রমশঃই জটিল হতে জটিলতর হয়ে উঠতে লাগল, কাজেই সমস্যাও ক্রমে গুরুতর আকারে দেখা দিতে লাগল। মানুষের মন সমস্যাকীর্ণ সমাজ ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে বহুবিধ ঘাত প্রতিঘাতের তাড়নায় তার সুকোমল বৃত্তিগুলোর অপচয় ঘটিয়ে ফেলতে লাগল, ফলে মনের শান্তি, ক্ষমা, ধৈর্য্য ইত্যাদি সংসার গঠনের অত্যাবশ্যক গুণগুলো ক্রমেই লোপ পেয়ে নীতি পুস্তকের পাতায় স্থান পেল।

এর ওপর স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপকতা নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পথ সুগম করে দিল। যেখানে পুরুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কাছে নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিপদে লেনদেনের হিসাব নিকাশ চাইল সেখানে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়াল। এই সংঘাতমূলক তিক্ততা থেকে নর-নারীর জীবনকে মুক্তি দেবার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজনরূপে দেখা দিল। সরকার এই আইন প্রচলন করার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের স্ত্রী বর্ত্তমানে বহু বিবাহ রীতিও রহিত করলেন। মোটের ওপর বিচার করলে দেখা যাবে এই আইনের উদ্দেশ্য মঙ্গলজনক। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতের বর্ত্তমানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই আইন কতদূর প্রযোজ্য হওয়া উচিত অথবা প্রযোজ্য হলেও কতখানি সুফল প্রসব করতে পারবে।

বিবাহ বিচ্ছেদ আইন কতকগুলি কারণের ওপর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দিচ্ছে। প্রথম কারণ হচ্ছে স্বামী অথবা স্ত্রী যদি পরস্পর ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে তাহলে অভিযোগকারী বা অভিযোগকারিণীর কোর্টে আবেদনক্রমে এবং ঐ অভিযোগ প্রমাণিত হলে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্ভব হবে। অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ যদি পাগল হয়, যৌনরোগগ্রস্ত অথবা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয় তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ পাওয়া যাবে। স্বামী অথবা স্ত্রী যদি ধর্ম্মান্তরিত হয় অথবা সাত বৎসর একাদিক্রমে নিরুদ্দিষ্ট থাকে, সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে থাকে। দুই বছরের বেশী স্বামী-স্ত্রী (Judicial Separation ডিক্রী পাবার পর) পরস্পর সঙ্গরহিত হয়ে বসবাস করে থাকে তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্ভব হবে। সামগ্রিকভাবে সমাজের মঙ্গল চেয়ে সরকার বিবাহ বিচ্ছেদ আইনতঃ সিদ্ধ করেছেন কিন্তু শুধু আইন প্রণয়ণ করলেই সমস্যার সমাধান হবেনা। দেখতে হবে দেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনধারায় এবং সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা অনুশাসিত গণজীবনে এই আইনের উদ্দেশ্য সত্যই আকস্মিক বিপ্লব না ঘটিয়ে সুদূরপ্রসারী শুভময় ফল প্রসব করছে কিনা, আরও দেখতে হবে এই আইন শান্তিপূর্ণ প্রগতিশীল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদাসম্পন্ন সমাজজীবন গঠনের উপযোগী হচ্ছে কিনা।

মানবিকার দরবারে বিচারপ্রার্থী হলে বলা যেতে পারে উপরিউক্ত কারণগুলির বর্ত্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদ মঙ্গলজনক হবে—নারী ও পুরুষ উভয়েই অবাঞ্ছিত দাম্পত্য জীবনের বিষময় পরিণতি থেকে অব্যাহতি পাবে এবং পারিবারিক শান্তিবৃদ্ধির পথে সহায়তা করবে। পুরুষের পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সংকট বা সমস্যা সে রকম কিছু দেখা দেয় না কারণ 'অবাঞ্ছিত স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে সে পুনর্বিবাহ করে সুখী হতে পারে, এতে সে আশ্রয়চ্যুত, সামাজিক মর্য্যাদাচ্যুত অথবা স্বীয় সন্তানসন্ততি থেকে বঞ্চিত হয় না। স্বামী স্ত্রীকে বিতাড়িত করে নিজে ঠিক পূর্বেকার গৌরবময় মর্য্যাদায় ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু নারীর দিকে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্নে নানান বাধা ও বিপত্তির প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম ও প্রধান সমস্যা নারীর ক্ষেত্রে দেখা দেয় তার লতিকাবৃত্তি সম্পন্ন মনের জন্য ও তার আর্থিক পরাধীনতার জন্য। আমাদের দেশে বেকার সমস্যা একটি গুরুতর সমস্যা, বর্ত্তমানে নারী ও পুরুষের সমাজ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে জনগণের জীবনে

দেখা দিয়েছে। চাকুরী বা স্বাধীন অর্থকরী জীবিকা উপার্জনের পথ কি নারী কি পুরুষ উভয়ের কাছে আজ দুর্লভ হয়ে উঠেছে। এসব ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রী কোন অর্থ সঙ্গতি বা কোন একটা নির্ভরশীল আশ্রয়ের উপর নির্ভর করবে এটা স্থির নাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ স্ত্রীর পক্ষে সুফলদায়ী হয় না। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদে নারীর আর্থিক পরনির্ভরতা প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু নারী একটি নিরাপদ ও নির্ভরশীল আশ্রয় ছাড়া একক থাকতে পারে না এবং যেহেতু এই রকম আশ্রয় সে স্বামী গৃহে পেয়ে থাকে এজন্য প্রায় অধিকাংশ নারী স্বামী গৃহের ও স্বামীর শত লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করেও স্বামী গৃহ পরিত্যাগ করতে সাহসী হয় না—স্বামীগৃহ ছাড়লে তার ভবিষ্যৎ আশ্রয় কি, তার জীবিকার উপায় কি এ-গুলো বিষম প্রশ্ন হয়ে নারী জীবনে জিজ্ঞাসার রূপ নেয়। যাদের স্বীয় কোন অর্থসঙ্গতি নেই তাদের কথা বাদই দিলাম। যাদের নৈত্রিক অর্থসঙ্গতি আছে তারাও একটি নির্ভরশীল সুনিশ্চিত আশ্রয়ের অভাবে স্বামীগৃহ ছাড়তে ভরসা পায় না কারণ নারী জীবনে অর্থটাই সবচেয়ে বড় কথা নয় তার সতিকারবৃত্তিসম্পন্ন মন সর্বদাই একজনকে আশ্রয় করে ধরে থাকতে চায়—পিত্রালয়ে আর্থিক স্বাধীনতা থাকলেও স্বামীর শূন্যপদ পূরণ করবার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি সেখানে কেউ থাকে না। পিতা চিরদিন বর্তমান থাকে না, পরবর্তী জীবনে ভাই অথবা অন্যান্য আত্মীয়বর্গের উপর দায়স্বরূপ হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করা কোন নারীর পক্ষে কাম্য নয়, তদুপরি সবচেয়ে বড় কথা সামাজিক সম্মান। স্বামী গৃহত্যাগিনী নারী যতই পিতৃধনে ধনবতী হয়ে পৃথক হয়ে অথবা পিত্রালয়ের অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বসবাস করুক না কেন স্বামীগৃহে বসবাসের মর্যাদা ও সম্মান হারিয়ে তাকে জীবনধারণ করতে হয় কারণ আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এখনো এতদূর উদার হয়নি যাতে করে সে স্বামীত্যাগিনী নারীকে পূর্ব নারীত্বের মর্যাদা দিয়ে যথাযথ গৌরবের আসন দান করতে পারে। তাই এখনো প্রায় শতকরা নব্বইজন নারী পৃথক আর্থিক সঙ্গতিসত্ত্বেও স্বামীগৃহের অপমানকর জীবন নীরবেই মেনে নেয় তবু বিচ্ছেদের প্রশ্ন মনে আনতে পারে না। এর মধ্যেও আশার আলো তাকে বাঁচিয়ে রাখে—হয়ত স্বামীর মন একদিন ফিরবে, হয়ত সংসার আবার জোড়া লেগে আবার সুখের হবে কিন্তু একবার বিচ্ছেদ আসলে সে সংসার জোড়া তো আর লাগবেই না উপরন্তু সে কোথায় গিয়ে সারা জীবনের মত আশ্রয় নিয়ে দাঁড়াবে? কে দেবে তাকে নিরাপদ সম্মানজনক স্থায়ী আশ্রয়? এ সকলের চেয়েও যে সমস্যাটি নারী-জীবনে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুতর হিসাবে দেখা দিয়েছে সেটি হল নারীর মাতৃত্ব। বিবাহ বিচ্ছেদে নারীজীবনের চরম বেদনাদায়ক অধ্যায় লুকিয়ে আছে তার সন্তানের ওপর পূর্ণ অধিকার চ্যুতিতে। মাত্র পাঁচ বছরের পর্যন্ত শিশু মার কাছে থাকবার আইনতঃ অধিকার পায়, তদুর্দ্ধ বয়স্ক সন্তান সন্ততি পিতার তত্ত্বাবধানে মানুষ হতে থাকবে, মা কোর্টের নির্দেশানুযায়ী নিজ সন্তানকে মাঝে মাঝে দেখতে পাবে। এরপর সন্তান-সন্ততিরা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হলে নিজ নিজ বিবেচনা ও বিচারানুযায়ী মা ও অথবা বাবাকে নির্বাচন করে যার কাছে থাকতে ইচ্ছে করবে তার কাছে থাকবে। সাধারণতঃ মাকে সন্তানের ওপর দাবীদাওয়া পরিত্যাগ করে স্বামীগৃহ ত্যাগ করতে হয়। এই হিসাবে বিবাহ বিচ্ছেদ নারী জীবনে নিশ্চয় এক বিরাট অভিশাপ বহন করে আনে। নারী স্বামী পরিত্যাগ করতে পারে কিন্তু নিজ সন্তানকে কোনমতেই পরিত্যাগ করতে চাইবে না। সন্তানকে তার পিতৃ পরিচয়ে অধিষ্ঠিত রাখতেই হবে নাহলে তার সামাজিক মান মর্যাদা থাকে না অথবা পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য নারী তার সকল অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করেও পুত্র-কন্যাকে সমাজে সম্মানজনক ভাবে অধিষ্ঠিত করতে চায়। সন্তান বর্তমানে বিবাহবিচ্ছেদ নারীজীবনে প্রায়ই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাচীন যুগে এই মনোভাব প্রায় প্রতিটি নারীই পোষণ করত। কিন্তু আধুনিক যুগে মানুষের মন ক্রমেই আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। নারীও আর স্বামী সন্তানের স্বার্থ রক্ষা করে নিজের জীবনকে অত্যাচার অবিচারের পায়ে বিলিয়ে দিতে স্বীকৃত নয়। একালে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক নারী সব কিছু বাধা সংস্কার অস্বীকার করে বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ গ্রহণ করছে নতুন জীবনের অজানা শান্তির আশায় দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু

উভয়েরই প্রশ্ন তাদের জীবনেও গভীর দাগ রেখে যাচ্ছে, সুখ কোথায়, শান্তি কোথায়? না, যেখানে নারী-জীবনে বাস্তবিক এতগুলো সমস্যা এসে দাঁড়ায় সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদে শান্তির ও সুখের পথ নেই। এইটুকুই সম্ভব হয় অবাঞ্ছিত দাম্পত্যজীবনের নিত্য তিক্ততার হাত থেকে সাময়িক মুক্তি, তিক্ততার সাময়িক মুক্তি এই হিসাবে হয়, বিচ্ছেদের পর নারীজীবনে আরও উৎকট সমস্যা নতুন তিক্ততার জ্বালা নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে।

বিবাহবিচ্ছেদ আইন নারীজীবনে একটিমাত্র ক্ষেত্রে চরম কল্যাণকর হয় যেখানে নারী তার অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে অপর একজন যোগ্য পাত্রকে বিবাহ করতে পারে এবং সুখী হতে পারে, বিবাহবিচ্ছেদ আইন এইসব ক্ষেত্রে নারীর ভাগ্যকে চ্যালেঞ্জ করবার একটি সুবর্ণ সুযোগ দেয়। যেখানে স্বামী নিগৃহীতা নারী কোন পুরুষের মধ্যে নিজের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকবার একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা খুঁজে পায় যেখানে তারা উভয়ে একটি যৌথ সুখময় জীবন গড়ে তোলবার প্রয়াসী হয় বিবাহবিচ্ছেদ আইন এইসব ক্ষেত্রে সেই নারীজীবনে শুভময় আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ চিরাচরিত নিগৃহীত দাম্পত্য জীবনের মুক্তির পর সে আর একটি নতুন জীবন গড়বার সুযোগ পায়। এতে হয়ত সামাজিক মর্য্যাদার প্রশ্ন ও পূর্ব স্বামীর সন্তান ত্যাগের প্রশ্ন ঠিকই থেকে যায় কিন্তু মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় কথা ও সমস্যা অর্থনৈতিক নির্ভরতা ও মেয়েমানুষের জীবনের আরও বড় কথা নিরাপদ স্থায়ী আশ্রয় এ দুটোই সেই দ্বিতীয়বার বিবাহেচ্ছু নারী পেয়ে যায় বলে তখন পূর্বেকার স্বামী ত্যাগে সন্তান ত্যাগে বা সামাজিক মর্য্যাদাহানির ও অন্যান্য যে সকল সমস্যা আগে সেগুলো উপেক্ষণীয় হয়ে যায় কারণ সব মানুষেরই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল সুষ্ঠুভাবে 'বাঁচা'। আগে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে চায় তারপর মান সম্মান সন্তানসন্ততি ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীচিত্তেও এই 'বাঁচার' তাগিদ সবচেয়ে বেশী তাই স্বামীগৃহে আত্মিক মৃত্যু ঘটিয়ে সে শুধু অন্যান্য সব কারণগুলোকে বড় করে দেখে 'জ্যান্ত মড়া' হয়ে থাকতে রাজী নয় এমন অন্য কাজের মধ্যে এই 'বাঁচার' সম্ভাবনা পেলে সেইখানেই চলে যেতে চায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ এখানে ছাড়পত্র জারী করে এই নারী জীবনে সহায়তার কল্যাণ আনছে। কিন্তু যেখানে অবিবাহিত বাঙালী কন্যার বিবাহই আজকাল এক বিরাট সমস্যা, এদের জন্য সুপাত্র বাজারে দুর্মূল্য, সেখানে স্বামী নিগৃহীতা নারীর উদ্ধারের জন্য কোন সুপাত্র অগ্রবর্তী হয়ে বিবাহের প্রস্তাব করতে পারবে এমন উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন পাত্র সমাজে দুর্লভ। কদাচিৎ তখনও যদি কেউ দয়াপরবশেই হোক বা নিজ পছন্দানুযায়ীই হোক এমন একটি নারীকে উদ্ধার করবার জন্য বিবাহ করতে চায় তখনই বিবাহ আইনের সুফল সেই নারী পরিপূর্ণভাবে পেয়ে থাকে।

অন্য কোন ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা নারী জীবনে বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে সুফলদায়ী হয়না। যেখানে নারী আর একটি 'বেঁচে' থাকবার মত সুষ্ঠু আর্থিক নির্ভরশীল আশ্রয় পাচ্ছেনা সেখানে হাজার রকমে অত্যাচারিত হলেও সে সে-গৃহের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও সে স্বামী ও স্বীয় সন্তান সন্ততিগুলিকে পরিত্যাগ করতে পারেনা। কাজেই বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্ন অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান আইনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে Judicial separation এর ব্যবস্থা থাকায় নারীর পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের সুযোগ গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজনও ঘটে না। অত্যাচারিত স্বামীর হাত থেকে মুক্তি নিয়ে স্ত্রী পৃথকভাবে বসবাস করতে পারবে, এতে সে আজীবন স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণনিমিত্ত আর্থিক সাহায্য পাবে এবং স্বামীর সন্তান-সন্ততির ওপর মার সম্পূর্ণ অধিকার বজায় থাকবে। সুতরাং স্ত্রী নির্যাতনের মত বিবাহ বিচ্ছেদের দায়ী এনে স্বামীর অর্থ ও সন্তানেরও দায়ী কখনই হারাতে রাজী হবে না, অমনোমত দাম্পত্য জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে স্বামীর টাকা নিয়েই আলাদা থাকতে পারবে। সুতরাং অবাঞ্ছিত দাম্পত্য জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য Judicial separationই যথেষ্ট। বিবাহ বিচ্ছেদ তখনই প্রয়োজন হয় যখন স্বামী অথবা স্ত্রী পুনর্বিবাহের সুযোগ পায়। তাও উভয় পক্ষ যদি রাজী না হয় বিবাহ বিচ্ছেদ সহজে সম্ভব হয় না। পূর্বলিখিত কারণগুলি আদালতে উপযুক্ত প্রমাণসহ দাখিল করতে না পারলে কোর্ট বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেয় না। সে

সব ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী কেউ বিচ্ছেদ পাবনা পূর্বেকার গ্লানিময় জীবনেই ফেরৎ যেতে হয়, অবশ্য দুজনে রাজী হলে বিবাহ বিচ্ছেদ সহজ সাধ্য হয়। কিন্তু এই সব অবস্থায় স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করতে চায় তাহলে যে যাকে ত্যাগ করতে চায় সে বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী হবে না ফলে প্রতিপক্ষকে বহু কোর্টঘর করে নাজেহাল হয়ে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে কারণ পূর্বলিখিত কারণগুলি কোর্টে প্রমাণসহ উপস্থাপিত করতে প্রতিপক্ষকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। তাই অবাঞ্ছিত স্বামী ও স্ত্রী যদিও দ্বিতীয়বার কাউকে বিবাহ করতে চায় তখন প্রতিপক্ষ যদি বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী না হয় তাহলে দ্বিতীয়বার বিবাহেচ্ছু স্বামী অথবা স্ত্রীর পক্ষে বিচ্ছেদ পাওয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, ফলে দ্বিতীয়বার বিবাহ দ্বারা স্বামী বা স্ত্রী যদি সুখী হতে চায় তা সম্ভব হয়না। এখানেও দেখা যাচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ফলপ্রসূ হচ্ছে না। কাজেই বর্তমান যুগপরিস্থিতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন খুব স্বল্পক্ষেত্রে সীমিত পরিধির মধ্যে কার্যকরী হচ্ছে —এর বিস্তার ঘটবে যখন মানুষের মন আরও পালটাবে, সমাজ ব্যবস্থা পালটাবে, নারীর শিক্ষা ও আর্থিক সমস্যার সমাধান ঘটবে। যতদিন না দেশের সংগঠনমূলক নীতি এমনভাবে রচিত হচ্ছে যাতে করে নারী পুরুষের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সমান আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক সুখ সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারে, ততদিন বিবাহ বিচ্ছেদ নারী জীবনে সর্বাঙ্গীণভাবে গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান রীতিনীতি প্রচলিত থাকলে নিগৃহীত স্ত্রীর স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণের টাকা নিয়ে (যেটুকু আইন অনুমোদন করছে) পৃথকভাবে বসবাস করাই একমাত্র শান্তির পথ। বিবাহ বিচ্ছেদ কতকগুলি ক্ষেত্রে মানবতার বিরুদ্ধগামী হয়। যেখানে স্ত্রী পাগল বা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সেখানে স্বামী এই কারণগুলি দেখিয়ে বিচ্ছেদ পেতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার দারুণ সংকট মুহূর্তে যদি তার স্বামী তাকে ত্যাগ করে এটা কোন সভ্য নারীসমাজ অনুমোদন করবে? তার এই অসহায় মুহূর্তের সঙ্গী কে হবে? দৈহিক ত্রুটি বা অনিচ্ছাকৃত রোগজীবনের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ আইন যে কতদূর মানবিকতা বিরুদ্ধগামী সেটা অক্ষম নারী জীবনে জাজ্বল্যমান হয়ে দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে স্বামীরা সহজেই Judicial separation পেয়ে যেতে পারে।

প্রসূতি-পরিচর্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-বি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অনেক সময় বিশেষ কারণে শারীরিক-গোলযোগের ফলে, কোনো কোনো প্রসূতিকে নানা রকম দুর্ভোগ-কষ্টও ভোগ করতে হয়। এ সব দুর্ভোগ-কষ্টের অন্যতম হলো—প্রসূতির 'স্তন-স্ফীতি' উপসর্গ ··অর্থাৎ, আমাদের দেশের 'মেয়েলী ভাষায়' যাকে বলা হয়—'ঠুনকো' রোগ। এ উপসর্গের কারণ.—স্তনের দুগ্ধবাহী-নালীগুলি অবরুদ্ধ থাকার ফলে, স্বাভাবিকভাবে দুগ্ধধারা-নিষ্কাশিত হতে পারে না বলেই, সন্তান-প্রসবের গোড়ার দিকের চার-পাঁচদিন সময়কালে প্রসূতির স্তন স্ফীত এবং রীতিমত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে আবার সন্তান-প্রসবের বেশ কিছুদিন পরেও প্রসূতিকে এ উপসর্গের ফলে, কষ্টভোগ করতে দেখা যায়। এমনি ধরণের 'ঠুনকো' রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই, প্রসূতির পক্ষে —নিয়মিতভাবে তিন-চার ঘণ্টা অন্তর গরম জলে সেঁক অথবা কর্পূর মেশানো গরম তেল মালিশ করে আক্রান্ত-স্তনকে সযত্নে পরিচ্ছন্ন তুলোর 'প্যাড্' (Cotton-pad) দিয়ে ঢেকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখা ভালো। তবে নজর রাখা দরকার স্তনের 'বোঁটা' বা চুচুক যেন ব্যাণ্ডেজের ভিতরে ঢাকা না থাকে···সর্বদাই বাইরে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়। তাছাড়া ব্যাণ্ডেজের তুলো ভিজে গেলেই, সেটিকে অবিলম্বে বদলে দেওয়া হয়।

প্রসূতির স্তন থেকে অযথা দুধ গড়িয়ে পড়তে সুরু করলে, অল্প একটু জলে সামান্য কয়েক ফোঁটা বিশুদ্ধ 'অ্যালকোহল' বা 'রেকটিফায়েড্ স্পিরিট' (Purified Alchohol বা Rectified spirit) মিশিয়ে, সেই 'মিশ্রণ' দিয়ে স্তনের 'বোঁটা' বা 'চুচুক' বেশ পরিচ্ছন্নভাবে

মার্জনা করে সযত্নে সংবাহন করা প্রয়োজন। প্রসূতির স্তনের 'বোঁটা' বা 'চুষী' খস্‌খসে বা কঠিন-ভাব ধারণ করলে, অল্প একটু 'টয়লেট লানোলিন' (Toilet Lonoline) অথবা বিশুদ্ধ রেড়ীর তেল (Purified cesstor oil) ও অলপাইয়ের তেল (Purified Olive Oil) আধা-আধি-পরিমাণে মিশিয়ে, 'মিশ্রণটিকে' সযত্নে স্তনের 'বোঁটায়' বা 'চুষীতে' প্রলেপন করা উচিত। এছাড়া প্রসূতির সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেও সবিশেষ দৃষ্টিদান করা একান্ত প্রয়োজন এবং প্রসূতি যেন কোনো ধরণের 'জন্ম-নিরোধক' বস্ত্র-আবরণী বা কাঁচুলী ব্যবহার না করেন, তারও যথাযথ-ব্যবস্থাবলম্বনের দরকার। কারণ, ইতিপূর্বেই বলেছি—গর্ভাবস্থার শেষের দুইমাস স্তনের যথাযথ যত্ন নেওয়া হলে, প্রসূতির স্তনের 'বোঁটা' বা 'চুষী' এভাবে অসময়ে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়ে দুর্ভোগ-অসুবিধার সৃষ্টি করবে না। এবং সদ্যোজাত শিশু স্তন দুগ্ধপানে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে প্রসূতির স্তন সংবাহন, স্তন মার্জনা প্রভৃতি রীতির যেমন উল্লেখ করেছি, সেই সব নিয়ম যথাযথ ভাবে মেনে চললে, স্তনের গোলযোগ-উপসর্গাদির বিশেষ কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তাছাড়া ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু যখন স্বাভাবিক-উপায়ে ও সুদক্ষভাবে স্তন পান করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এবং নিজেই মাতৃ স্তন্যের 'তেলা' পর্য্যন্ত অংশ মুখে নিয়ে চুষতে পারবে, তখন স্তন্যদানকালে প্রসূতির স্তনের 'বোঁটা' বা 'চুষী' এভাবে সঙ্কোচনের সম্ভাবনাও লোপ পাবে।

'টুনকো' রোগের উপসর্গ ছাড়াও, অনেক সময় প্রসূতির স্তনের 'বোঁটায়' বা 'চুষীতে' বা অথবা ব্যথার উদ্ভব ঘটে। এ-ধরণের উপসর্গ দেখা দিলে, কি উপায়ে তার প্রতিকার করা যায়, ইতিপূর্বেই সে প্রসঙ্গালোচিত হয়েছে। কাজেই সে সম্বন্ধে বিশদ-আলোচনার পরিবর্ত্তে, আপাততঃ, কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিধি অবলম্বনের মোটামুটি হদিশ দিয়ে রাখি। প্রসূতির স্তনের 'বোঁটায়' বা 'চুষীতে' উপরোল্লিখিত উপসর্গের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই, অবিলম্বে প্রতিকারের যথোচিত ব্যবস্থা করা দরকার। অর্থাৎ, প্রত্যেকবার শিশুকে স্তন্য দানের পর, প্রসূতির উচিত—সযত্নে গরম জলে স্তন ধুয়ে ও নরম শুকনো কাপড়ে ভালোভাবে মুছে, পরিষ্কার 'সার্জিক্যাল গজ' (Surgical Gauge) কাপড়ে আচ্ছাদন করে রাখা। স্তনের 'বোটায়' বা 'চুষীতে' কাটা দাগ' দেখা দিলে, 'টিংচার বেঞ্জোয়িন্' (Tincture Benzoine Compound) লাগালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। তবে 'টিংচার বেঞ্জোইন্' লাগানোর আগে, স্তনের 'বোঁটাটিকে' বিশুদ্ধ 'অ্যাল্‌কোহল্' অথবা 'রেকিটিফায়েড্ স্পিরিট' দিয়ে ভালোভাবে মুছে পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া এবং শিশুকে স্তন্য দানের সময়েও প্রসূতির স্তনের 'বোঁটাটিকে' অনুরূপ পদ্ধতিতে মুছে 'টিংচার বেঞ্জোয়িনের' স্পর্শ মুক্ত করে নেওয়া একান্ত দরকার। প্রসূতির স্তনের 'বোঁটায়' কাটা দাগ নিরাময় হয়ে উঠতে যদি বিলম্ব ঘটে, তাহলে বাজারের ভালো ডাক্তারখানা থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো প্রসূতির স্তনের 'বোঁটায়' ঢাকা দেবার উপযোগী রবারের 'ঢাকনী' (Rubber made nipple-shield) ব্যবহার করে শিশুকে স্তন্য দেওয়াই উচিত। এ-ধরণের রবারের 'ঢাকনী' ব্যবহারের সময়, স্তন্য দানের আগেই অল্প একটু দুধ দিয়ে 'ঢাকনীটিকে' ভিজিয়ে নরম করে নিলে, শিশুর পক্ষে, স্তন্য পান করার বিশেষ সুবিধা হয়।

প্রসূতির স্তনে ফোড়া দেখা দিলে, সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ ধাত্রী এবং সুচিকিৎসকের পরামর্শ ও সাহায্য নেওয়া একান্ত আবশ্যক। ফোড়ার অবস্থা বুঝে তাঁরা সময় থাকতেই ঔষধ অথবা অস্ত্রোপচার—যেমন প্রয়োজন, সেইমতো ব্যবস্থাদি করবার সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এমন কি, অস্ত্রোপচার করা যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, তাহলে বিচক্ষণ ধাত্রী-চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী শিশুকে স্তন্য অথবা কৃত্রিম দুধ পান করানোর যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এ উপসর্গের ফলে, শিশুকে স্তন্যদান করার রীতি হলো—আক্রান্ত-স্তনের বদলে, অপর যে স্তনটি সুস্থ আছে, সেটির দুধ পান করানো···এই দুধের পরিমাণ যদি কম ও শিশুর ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও পুষ্টির পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হয়, তাহলে বাকীটুকু সুচিকিৎসকের পরামর্শানুসারে কৃত্রিম-দুধ পান করিয়ে, অপরিহার্য্য এই অভাবের ক্ষতিপূরণ করা যেতে পারে।

অনেকের ধারণা—আকারে বড় এবং পরিপুষ্ট স্তনেই দুধ বেশী মেলে। এমন ধারণা রাখা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ, প্রসূতির স্তন আকারে বড় এবং সুপুষ্ট হলেই যে

বেশী দুধ মিলবে—তার কোনো স্থিরতা নেই। অনেক সময় বরং দেখা যায় যে ক্ষুদ্রাকৃতি-স্তনেও শিশুর আহারোপযোগী পর্যাপ্ত দুধ মেলে এবং পরিপুষ্ট বৃহদাকার স্তনে পরিমিত দুধের একান্ত অভাব ঘটে।

অনেকে আবার অভিমত প্রকাশ করেন যে স্তন্য-দুগ্ধ ছাড়াও শিশুদের প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অল্প-সল্প ফলের রস পান করানো প্রয়োজন। কথাটা আংশিকভাবে স্বীকার্য হলেও, সদ্যোজাত-শিশুদের সে এভাবে নিত্য-নিয়মিত ফলের রস পান করাতেই হবে—এমন কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। তবে কোনো কোনো ধাত্রী ও চিকিৎসক অবশ্য বিশেষ-ক্ষেত্রে শিশু সপ্তাহ-তিনেক বয়সের হয়ে উঠলে চায়ের চামচের এক-চামচ পরিমাণে অল্প-একটু কমলা লেবুর (Orange Juice) অথবা গাজরের (carrot) রস পান করানোর বিধান দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া প্রসূতি যদি প্রত্যহ নিয়মিত এবং পরিমাণমতো শাক-সব্জী প্রভৃতি আহার করেন, তাহলে তাঁর স্তন্য-দুগ্ধেও যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ বজায় থাকে···কাজেই শিশুর পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে, আর নতুন করে অতিরিক্ত-খাদ্যপ্রাণ জোগানোর ব্যবস্থাদির আবশ্যক হয় না। তবে আজকাল অধিকাংশ প্রসূতিই বিবিধ কার্য কারণে শিশুকে স্তন্য দুগ্ধের পরিবর্তে কৃত্রিম-দুগ্ধ পান করাতে বাধ্য হন বলেই, এমনি আলাদাভাবে কমলা লেবু বা গাজরের রস খাইয়ে অতিরিক্ত-খাদ্যপ্রাণ জোগানোর যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

স্তন্য বা কৃত্রিম দুগ্ধ, ফল বা সব্জীর রস পান করানো ছাড়াও, শিশুকে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে জল খাওয়ানো একান্ত দরকার। তবে শিশুর পানীয়-জল, সর্বদাই ফুটিয়ে বিশুদ্ধ ও শীতল করে নিতে, পরিচ্ছন্ন দুধের বোতল (Feeding Bottle) ভরে অথবা চায়ের চামচের সাহায্যে সযত্নে সাবধানে অল্প অল্প পরিমাণে খাইয়ে দেওয়া উচিত। দিনে-দিনে বয়োবৃদ্ধির ফলে, শিশু ক্রমশঃ নয় মাসের হয়ে উঠলে, চামচ বা ঝিনুকের সাহায্যে তাকে দুধ, ফলের রস প্রভৃতি পান করানো চলবে।

শিশুদের কোলে-পিঠে তুলে নাড়াচাড়া করা, শোয়ানো জামা-কাপড় বদলানো, স্নান, তৈল-মর্দন, অঙ্গ প্রসাধন, স্তন্য দান, আহার করানো প্রভৃতি প্রত্যেকটি ব্যাপারেই প্রসূতিকে সবিশেষ সাবধানে ও সযত্নে কাজ করতে হবে। শিশু সুস্থ সবল সুপুষ্ট না হয়ে ওঠা পর্যন্ত···অর্থাৎ, সাত আট মাস বয়সের আগে, তাকে বসানো বা দাঁড়ানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। তার ফলে—শিশুর শারীরিক ক্ষতি ও অপকারের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে···এমন কি, অসময়ে এ সব অপচেষ্টা ও আগ্রহাতিশয্যের কারণে শিশুর শিরদাঁড়া, ঘাড়, পায়ের হাড় প্রভৃতি জন্মের মতো বিকৃত ও অথর্ব হয়ে যেতে পারে। কাজেই শিশুর সুস্থ-সুন্দর স্বাভাবিক পুষ্টিলাভের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা স্মরণ করে, প্রত্যেক প্রসূতিরই এ সম্বন্ধে সদা-সচেতন থাকা একান্ত দরকার।

প্রসঙ্গক্রমে প্রসূতি-পরিচর্যা ও শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞা সুপ্রসিদ্ধা ধাত্রী শ্রীযুতী কুপার যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আমাদের দেশের মহিলাদের অবগতির উদ্দেশ্যে, তার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া যেতে পারে।

সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে বিচক্ষণ ধাত্রী শ্রীমতী কুপার বলেন,—যে কোনো কারণেই হোক, প্রসূতির পক্ষে, শিশুকে স্তন্য-দানের রীতি হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। তার ফলে, শিশু এবং প্রসূতি—উভয়েরই যথেষ্ট অপকার ঘটে। কারণ, মাত্র এক সপ্তাহকাল মাতৃ দুগ্ধ পানের ফলে, শিশুর যতখানি উপকার হয়, শত চেষ্টা-পরিশ্রমে কৃত্রিম-খাদ্য দিলেও ততখানি পুষ্টিসাধন করা যায় না। এ প্রসঙ্গে ধাত্রী শ্রীযুতী কুপার, পাশ্চাত্য-সমাজের প্রসূতিদের মতামত-সঙ্কলন করে যে হিসাব দিয়েছেন, সেটি থেকে সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে—ওদেশের মায়েরা অসময়ে শিশু সন্তানদের স্তন্য দান বন্ধ করার বিবিধ অজুহাতের বিচিত্র দৃষ্টান্তের। সে সব দৃষ্টান্তের সারাংশ আলোচনা করে দেখলে, আমাদের দেশের মহিলারা প্রসূতি পরিচর্যা ও শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের হদিশ পাবেন।

সুদীর্ঘ ধাত্রী জীবনের অভিজ্ঞতায় শ্রীযুতী কুপার দেখেছেন যে সন্তান প্রসবের পরেও, স্তনে যথোচিত দুগ্ধ সঞ্চারের অভাবে বহু প্রসূতিই বিশেষ উদ্বিগ্ন আকুল হয়ে ওঠেন। শ্রীযুতী কুপারের মতে, এক্ষেত্রে প্রসূতির কর্তব্য—অভিজ্ঞ ধাত্রী বা চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ এবং তাঁদের নির্দেশ মতো ধৈর্য ধরে পাঁচ ছয় সপ্তাহ সযত্নে দুগ্ধ সঞ্চারের বিবিধ প্রক্রিয়ার অনুশীলন ও অপেক্ষা করে দেখা।

কোনো কোনো প্রসূতি তাঁর 'জলবৎ তরলং' স্তন দুগ্ধের কারণে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। এ উপসর্গে প্রসূতিদের বিচলিত হবার হেতু নেই। কারণ, মানবী দুগ্ধ, গরুর দুধের মতো গাঢ় ঘন না হলেও পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে অতুলনীয়।

এ ছাড়াও শ্রীমতী কৃপার আরো যে সব বিচিত্র তথ্য-বিবরণের হদিশ দিয়েছেন, আগামী সংখ্যায় সে প্রসঙ্গে আলোচনা করার বাসনা রইলো। (ক্রমশঃ)

— ~

সুপর্ণা দেবী

আধুনিক রূপচর্চা-বিশেষজ্ঞদের মতে, মহিলাদের মুখের শ্রী-সৌন্দর্য-লাবণ্য ও তারুণ্য-শোভা অক্ষয়-অটুট এবং দীর্ঘস্থায়ী রাখার জন্য, বিশেষ ধরণের যে সব সেবা-পরিচর্য্যার রীতি অনুশীলন করা প্রয়োজন, এবারে তারই মোটামুটি পরিচয় দিই।

সংসারের নানান্ ঝামেলা···দুঃখ-অশান্তি···অভাব-দুশ্চিন্তার দাপটে অথবা সৌখিন-বিলাসিতার অবাধ-উচ্ছৃঙ্খল মোহোন্মাদনায় মেতে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকার দরুণ, আধুনিক সমাজের অনেক মহিলাই নিজেদের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য বজায় রাখার দিকে যথাযথ দৃষ্টিদান করবার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বা ফুরসৎ পান না। কাজেই নানা রকম অনিবার্য্য কারণে এবং নিয়মিত ব্যায়াম সাধন, আহার-বিহার, বিশ্রাম-নিদ্রা, দৈহিক পরিচর্য্যার অবাধ অবহেলা অথবা ঔদাস্যের ফলে, নিতান্ত অকালেই তাঁদের রূপ-শ্রী-লাবণ্য ম্লান-জীর্ণ হয়ে আসে এবং অল্প-বয়সেই স্বাস্থ্য-সম্পদ হারিয়ে তাঁরা যৌবনেই রীতিমত বুড়ী হয়ে ওঠেন···অসময়ে বার্দ্ধক্যের রেখা দেখা দেবার দরুণ তাঁদের মুখের শোভা-মাধুরী-কমনীয়তারও সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা এবং আহারে-বিহারে নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষার ফলে, স্বাস্থ্য সম্পদ বজায় থাকলেও, কোনো কোনো মহিলার মুখ যৌবনেই জরাজীর্ণ ও কদর্য্য হয়ে ওঠে। এ-ধরণের অকাল জীর্ণতা ও কদর্য্যতার কারণ—মুখের রূপশ্রী লাবণ্য বজায় রাখার উপযোগী সেবা পরিচর্য্যা এবং যথোচিত যত্ন গ্রহণ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য। হাত, পা, কোমর, বুক প্রভৃতি দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুঠাম সুন্দর সুপুষ্ট সবল রাখার জন্য বিশেষ ধরণের সেবা পরিচর্য্যা ও ব্যায়ামাদি অনুশীলনের যেমন প্রয়োজন, মুখের শ্রী-সৌন্দর্য্য লাবণ্য শোভা রমণীর মোহনীয় অক্ষয় অটুট রাখতে হলেও, নিত্য নিয়মিতভাবে তেমনি সেবা পরিচর্য্যা আর যত্ন করা চাই।

অপরিমিত আহার-বিহার, অত্যধিক আলস্য বিশ্রাম নিদ্রা প্রভৃতি বিবিধ কারণে, শরীরে অথবা মেদ বৃদ্ধির দরুণ, নিতান্তই অকালে যৌবনাবস্থায় মহিলাদের মধ্যে অনেকের চিবুকের নীচের অংশ 'দু' 'থাক্' হয়ে পড়ে। তার ফলে, তাঁদের কণ্ঠের শ্রী ও শোভা নষ্ট হয়। পাশ্চাত্যের রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞদের মতে, এভাবে চিবুক 'দু' 'থাক' হওয়ার ইংরাজী নাম—'ডবল-চিন্' (double-chin)। এ ধরণের উপসর্গের আবির্ভাব ঘটলে—মহিলাদের মুখের কমনীয়তা লোপ পায়···মুখখানি অথথা ভারী ও পাকা দেখায় এবং ধারণা হয় যে বয়সও যেন বেড়ে গেছে অনেকখানি।

একালের রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে চিবুক এমনি 'দু-থাক্' হয়ে ওঠে—আহার-বিহার আর শয়নের দোষে। কাজেই এ সম্বন্ধে যদি গোড়াতেই সচেতন ও মনোযোগী থাকা যায়, তাহলে নিয়মিত অভ্যাসের ফলে, শুতে-বসতে চলতে-ফিরতে, খাওয়াদাওয়া করতে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের যেমন কোনো অভাব অসুবিধা হবে না, চিবুকের এবং কণ্ঠের সুঠাম শোভারও তেমনি এতটুকু বৈকল্য ঘটবে না। পাশ্চাত্যের আধুনিক রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞদের মতে, অকালে চিবুক 'দু-থাক্' হয়ে ওঠার কদর্য্য উপসর্গের

উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে—সর্ব্বদা মাথা ও বুক সিধা-সমান ও খাড়াভাবে রেখে বসা, দাঁড়ানো এবং চলা-ফেরা করবেন। মাথা যদি একান্তই হেলানোর প্রয়োজন হয় তো দেহের পিছন-দিকে···মুখের দিকে মাথা কখনো যেন না ঝোঁকে—এতটুকু না। তাছাড়া চিবুকও যেন কখনো সামনের বা নীচের দিকে হেলানো না থাকে—সে সম্বন্ধেও সদা-সচেতন থাকা দরকার। শয়নের সময়েও সতর্ক থাকা চাই। উঁচু বা শক্ত বালিশ মাথায় দিয়ে শুলে, পিঠের মেরুদণ্ডের সঙ্গে সমান রেখায় মাথা রাখা যায় না—ঘাড় একটু বাঁকাভাবে হেলে থাকে। তার ফলে, মুখে নানা 'বলি রেখার দাগ' (wrinkles) এবং চিবুকের তলার দিকে 'ভাঁজ' বা 'খাক্' (folds) পড়ে। এ কারণেই চিবুকটি ক্রমশঃ 'দু'-খাক্' বা 'ডবল চিন্' (double chin) হয়ে ওঠে। এ ধরণের সৌন্দর্য্য-হানিকর উপসর্গ নিবারণের উদ্দেশ্যে, পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ-আধুনিক রূপচর্চ্চা-বিশারদেরা নিত্য-নিয়মিতভাবে কয়েকটি বিশেষ ধরণের 'ঘরোয়া' ব্যায়াম অনুশীলনের সুপরামর্শ দিয়েছেন—আগামী সংখ্যায় সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

আপাততঃ, আধুনিক রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞের প্রস্তাবিত 'ডবল-চিন্' (double chin) বা 'দু' খাক্ চিবুক'—উপসর্গ নিবারণের উপযোগী, বিশেষ ধরণের কয়েকটি 'ঘরোয়া' ব্যায়াম ভঙ্গীর হদিশ দিয়ে রাখি। বিশেষ ধরণের এই ব্যায়াম ভঙ্গীর রীতি হলো—দু' হাতের চেটোয় বা তালুতে প্রথমে অল্প একটু ক্রীম (cream) অথবা পমেড্-ভ্যাসেলিন্ (pomade vaseline) কিম্বা নারিকেল বা জলপাই তেল (Cocoanut Oil or Olive oil) চেলে, হাতের 'চেটো' বা 'তালু' দুটিকে তৈলাক্ত করে নেওয়া। তারপর ডান হাতের আঙুলগুলি মুঠো করে জোরে চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে চিবুকের তলা থেকে সুরু করে ঘাড়ের পিছন পর্য্যন্ত রগ্‌ড়ে ঘষুন। অতঃপর, বা-হাতের আঙুলের মুঠোর সাহায্যে অনুরূপ ভঙ্গীতে বিপরীত দিক থেকে···অর্থাৎ, ঘাড়ের পিছন দিক থেকে ক্রমশঃ চিবুকের তলা পর্য্যন্ত জোরে চাপ দিয়ে ঘষবেন। কয়েক মিনিট এমনিভাবে বার বার রীতি বদল ও অবিরাম 'মর্দ্দন' (massaging) বা 'ঘষাঘষি' করে এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি অনুশীলন করতে হবে। প্রত্যহ রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে দশ পনেরো মিনিটকাল এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি অনুশীলনের ফলে, চিবুক ও কণ্ঠে রক্ত চলাচল ক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে এবং অনাবশ্যক মেদস্ফীতি বা চর্ব্বি বাহুল্য লোপ পায়···'ডবল চিন্' বা 'দু' খাক্ চিবুক' দেখা দেবারও আশঙ্কা থাকে না।

নাকের গড়নে দোষ থাকলে, বিশেষ পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার ছাড়া সে দোষ কাটে না—এমন ধারণা অনেকেরই মনে বদ্ধমূল। এ ধারণাও কিন্তু যথার্থ নয়। আধুনিক রূপ-চর্চ্চা বিশেষজ্ঞদের মতে, নাকের বহু দোষ ত্রুটি অনায়াসেই শোধরানো···এমন কি, নিখুঁত সুন্দরও করে তোলা যায় —নিত্য নিয়মিতভাবে তাঁদের নির্দ্দেশানুযায়ী বিশেষ ধরণের কয়েকটি সহজ সরল 'ঘরোয়া' ব্যায়াম অনুশীলন ও সেবা পরিচর্য্যার ফলে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সুঠাম দেহ, কুঞ্চিত কেশদাম, স্বর্ণাভ, আয়ত চোখ, সুন্দর মুখ-শ্রীর অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো মহিলার নাকের উপর দিকটি চাপা আর মুখের সঙ্গে যেন মিশে রয়েছে এবং নাকের ডগাটিও বড়ির মতো উঁচু-বেয়াড়া ছাদের। এ ধরণের দৈহিক গঠনত্রুটির ফলে, তাঁদের মুখশ্রী সৌন্দর্য্যের শোভা-মাধুরী ব্যাহত হয় অনেকখানি। তবে একালের রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞেরা এ ত্রুটি সংস্কারের উপযোগী বিশেষ ধরণের যে সব ব্যায়াম অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছেন···প্রসঙ্গক্রমে তার একটি সহজ-সরল দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ব্যায়াম ভঙ্গীটির মোটামুটি রীতি হলো:—মুখ-খানি সিধা সমান রেখে, নাকের দুই পাশে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী—এদুটি আঙুলের সাহায্যে নাসাগ্রভাগ চেপে ধরে মৃদুভাবে ঘষে ঘষে আঙুল দুটিকে ক্রমশঃ গালের উপর পর্য্যন্ত টেনে নামিয়ে আনতে হবে। এমনিভাবে নামিয়ে আনার পর, নাসাগ্র-ভাগে ধীরে ধীরে দু' আঙুলের সাহায্যে মৃদু-চাপ ও মোচড় দেবেন। এমনি পদ্ধতিতে অন্ততঃ মিনিট দশেককাল ব্যায়ামের এই বিশেষ ভঙ্গীটি উপর্য্যুপরি কয়েকবার অভ্যাস করা আবশ্যক।

এ ব্যায়ামটির সঙ্গে সঙ্গে, অনুরূপ ধরণের আরেকটি ব্যায়াম ভঙ্গীও নিত্য-নিয়মিতভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন। এ ব্যায়াম ভঙ্গীর রীতি হলো—দু'হাতের

মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়ে নাকের দুই পাশ মৃদুভাবে চেপে, উপর থেকে নীচে, এবং নীচে থেকে উপরে—এমনিভাবে কিছুক্ষণ কয়েকবার জোরে জোরে ঘষে অভ্যাস করা চাই। উপরোক্ত তর্জনীর মতো এ ব্যায়াম ভঙ্গীটিও নিত্য নিয়মিত অন্ততঃ পক্ষে, মিনিট দশেককাল সময়ে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

এভাবে নিত্য-নিয়মিত ব্যায়াম অনুশীলন ও সেবা-পরিচর্য্যার দিকে সচেতন দৃষ্টি রেখে দৈহিক গঠন ত্রুটির সংস্কার সাধন ছাড়াও, গায়ের বর্ণ ও ত্বক লাবণ্যোজ্জ্বল মসৃণ, কোমল কমনীয়, মনোরম সুন্দর আর দীর্ঘস্থায়ী করে তোলার উদ্দেশ্যেও, একালের রূপচর্চ্চা বিশারদেরা সহজ-সরল কয়েকটি বিশেষ ধরণের রীতি পালনের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের মতে, আহারে-বিহারে অনিয়ম, অনাচার যথোচিত বিশ্রামের অভাব, অনিদ্রা এবং অতি নিদ্রা প্রভৃতি কারণের ফলেই, সচরাচর গায়ের বর্ণ ও ত্বক অকালেই জীর্ণ ম্লান ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে···অল্প বয়সেই চোখের কোলে কালি পড়ে, আঁখি-পল্লব বেয়াড়াভাবে কুঁচ্‌কে-ঝুলে যায়···মুখের শ্রী-শোভা যাদুরীও নষ্ট হয়। কাজেই এ সব উপসর্গের কবল থেকে মুখশ্রী সৌন্দর্য্যের লাবণ্য-শোভা অক্ষত অটুট ও যথাযথভাবে বজায় রাখতে হলে, নিত্য-নিয়মিত স্নান এবং স্নানের পূর্ব্বে বেশে-মুখে সর্ব্বাঙ্গে ঘষে ঘষে তেল মাখা, স্নানের সময় ঠাণ্ডা অথবা ঈষৎ উষ্ণ জলে সাবছা, ধুঁতুলের খোসা কিম্বা কড়া-বুরুশ দিয়ে বেশ জোরে-জোরে ঘর্ষণ মর্দ্দন করে হাত, পা, গলা, বুক, পিঠ, কাঁধ, মুখ মার্জ্জনা করা আবশ্যক। গায়ে সাবান মেখেও এভাবে অঙ্গ মার্জ্জনা করতে পারেন। তবে নিত্য সাবান না মাখলেও ক্ষতি নেই। কারণ, এভাবে ঘর্ষণ-মর্দ্দনে শুধু যে দেহের ঘর্ম্ম-ক্লেদ-কালিমা পরিষ্কার হবে তাই নয়, উপরন্তু সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চলাচল ক্রিয়া অব্যাহত থাকার ফলে, গায়ের বর্ণ লাবণ্যোজ্জ্বল ও ত্বক আগাগোড়া কোমল কমনীয় থাকবে বরাবর। এ-ধরণের সেবা পরিচর্য্যা সত্ত্বেও, যদি চোখের কোলে কালিমা বা আঁখি পল্লবের তারাক্রান্ত ভাব বিদূরিত না হয়, তাহলে আধুনিক রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞের নির্দ্দেশানুযায়ী নিতান্ত সহজ সরল পদ্ধতির অভিনব কয়েকটি 'ঘরোয়া' ব্যায়াম অনুশীলনে সে সব উপসর্গ অচিরেই লোপ পাবে···মুখে-চোখে লাবণ্য এবং তারুণ্যশ্রীর দীপ্তি আবার ফুটে উঠবে।

মুখশ্রী সৌন্দর্য্য মনোরম শোভামণ্ডিত করে তোলার উদ্দেশ্যে, আধুনিক রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞরা সচরাচর বিশেষ ধরণের যে সব ব্যায়াম বিধি অনুশীলনের নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন, আগামী সংখ্যায় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিচয় দেবো। [ক্রমশঃ

হাতের কাজ

পুঁতির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

রঙীন-পুঁতির সারি গেঁথে গৃহ সজ্জার উপযোগী সৌখিন সুন্দর ছাঁদের বিচিত্র নক্সাদার 'টেবিল ম্যাট্' (Table Mat) বানানোর কলা কৌশল রীতির মোটামুটি পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দিয়েছি। এবারে বলছি—অনুরূপ পদ্ধতিতে রঙ বেরঙের পুঁতির সারি গেঁথে ছোট ছেলে-মেয়েদের ব্যবহারোপযোগী অভিনব ছাঁদের সৌখিন সুন্দর 'কোমর বন্ধনী' বা 'বেল্ট' (Belt) রচনার কায়দা কানুনের কথা। রঙীন পুঁতি গেঁথে বানানো এই 'বেল্ট' বা 'কোমর বন্ধনীর' চেহারাটি দেখতে কেমন ছাঁদের হবে, ১৯৩ পৃষ্ঠায় ১নং চিত্রে তার সুস্পষ্ট নমুনা মিলবে।

এমনি ছাঁদের পুঁতির 'বেল্ট' বা 'কোমর বন্ধনী' বানানো খুব একটা দুঃসাধ্য কঠিন কাজ নয়। যে-পদ্ধতিতে পুঁতির সারি গেঁথে 'টেবিল ম্যাট' বানানো সম্ভব, ঠিক তেমনি রীতিতেই উপরোক্ত 'কোমর বন্ধনী' বা 'বেল্ট' রচনা করা যেতে পারে। তবে এ-ধরণের সৌখিন 'কোমর-বন্ধনী' রচনার জন্য, 'টেবিল ম্যাটের' সময়ে যেমন ছোট সাইজের রঙীণ পুঁতি ব্যবহার করা হয়,

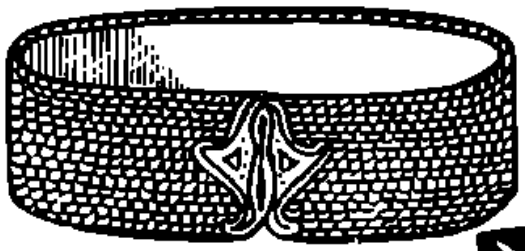

১

পুঁতির তৈরী বেল্ট বা কোমর-বন্ধনী

তার চেয়ে বড় সাইজের পুঁতি ব্যবহার করাই উচিত। তাছাড়া এই বড় সাইজের পুঁতিগুলি যদি গোল ছাঁদের (Round Beads) না হয়ে, সরু 'নল' বা 'পাইপের' (pipe) মতো লম্বা গড়নের হয়, তাহলে এ ধরণের সৌখিন 'কোমর-বন্ধনীটির' শ্রী শোভা আরো বেশী মনোরম সুন্দর দেখাবে। কাজেই এ কাজের পক্ষে, 'নল' বা 'পাইপের' মতো লম্বা ছাদের রঙীন পুঁতি বেছে নেওয়াই ভালো।

'নল' বা 'পাইপের' মতো লম্বা ছাঁদের রঙীন পুঁতি সংগ্রহ করা ছাড়াও, এ ধরণের 'কোমর বন্ধনী' বানানোর জন্ত দরকার—প্রয়োজনমতো মাপের একফালি মজবুত নরম ক্যাম্বিশ কাপড়। এ কাপড়টি নেবেন—চওড়ায় ১৷″ কিম্বা ২″ ইঞ্চি এবং লম্বায় যে কোমরের জন্ত 'কোমর বন্ধনীটি' বানানো হবে, সেই কোমরের মাপে। ধরুণ, উপরের ১নং চিত্রে যেমন নমুনা দেখানো হয়েছে, সেই ধরণের 'কোমর বন্ধনীটির' মাপ লম্বায়—২১″ ইঞ্চি এবং চওড়ায়—১৷″ ইঞ্চি। এই মাপের 'কোমর বন্ধনীর' জন্ত, বাজারে যে 'পেনিলোপ' মার্কা ৫০নং ক্যানভাস্ বা ঐ জাতীয় ক্যাম্বিশ পাওয়া যায়, ২১″ ইঞ্চি বহরের সেই ক্যানভাস্ কিনে আনবেন। ক্যানভাসের উপর পুঁতির সারি গেঁথে সেলাইয়ের জন্ত দরকার—শক্ত সাদা সুতো। এজন্ত, বাজারে সাদা রঙের যে 'ডেন্টাল ফ্লশ্' (Dental Floss) বা 'দাঁতালো সুতো' পাওয়া যায়, সেই সুতো নিলেই 'কোমর বন্ধনী' রচনার কাজে সুবিধা হবে বিশেষ এবং কারুশিল্প সামগ্রীটিও বেশ মজবুত ও টেঁকসই হয়ে উঠবে। তবে পুঁতি গাঁথার আগেই, অল্প একটু মোম (Wax) মাখিয়ে যদি সেলাইয়ের সুতোটিকে পাকিয়ে নেন, তাহলে সে সুতো সহজে কেটে বা ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না এবং আগাগোড়া বেশ মজবুত ও টেঁকসই ধরণের হয়ে উঠবে।

পুঁতিগুলি কিনতে হবে—কারুশিল্পীর প্রয়োজন এবং রুচি অনুসারে নক্সা মতো রঙ মিলিয়ে···বাজারের ভালো দোকান থেকে বাছাই করে নিয়ে। পাশের ১নং চিত্রের নমুনা মতো ২১″ ইঞ্চি লম্বা মাপের এই 'কোমর বন্ধনী' রচনার জন্ত—২ হালি 'বা' গোল্লা' রঙীন পুঁতি কিনলেই চলবে। তবে সাবধান ছুঁচের দাঁতালো, এ সব পুঁতি গাঁথার কাজ করা যাবে না···এ কাজের জন্ত বাজারে আলাদা ধরণের যে ছুঁচ পাওয়া যায়, সেই ছুঁচ কিনে আনতে হবে। ছুঁচ কেনবার সময় বিশেষভাবে দেখে নেবেন যে সে ছুঁচে যেন সহজেই পুঁতি গাঁথা চলে। উপরোক্ত নমুনা মতো ছাদে রঙীন পুঁতির 'কোমর-বন্ধনী' রচনার জন্ত অবশ্য ১২নং ছুঁচই বিশেষ উপযোগী হবে।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ করে নেওয়ার পর, ক্যাম্বিশ কাপড়ের উপর রঙীন পুঁতি গেঁথে নক্সার কাজ সুরু করবার পালা। ধরুন, আলোচ্য 'কোমর বন্ধনীর' উপরের এবং নীচের কোণে, আলাদা আলাদাভাবে তিনটি শাদা-রঙের বাহারী ফুলের নক্সা ফুটিয়ে তোলা হবে। ফুলগুলি সারি দিয়ে সাজানো···অর্থাৎ, নীচের ২নং চিত্রে যেমন নমুনা দেখানো হয়েছে, অবিকল তেমনি ধরণে। তবে প্রত্যেক

২

নক্সা-রচনার রীতি

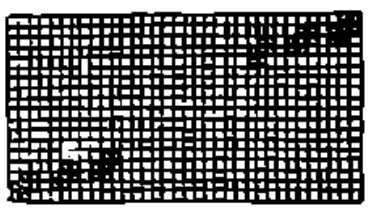

সারির মাঝে শুধু ১″ ইঞ্চি করে ফাঁক থাকবে। এ নক্সাটি ফুটিয়ে তুলতে হলে,—ক্যাম্বিশ কাপড়ের উপর যে কোনো রঙের পুঁতির সারি গেঁথে 'জমি' বা 'পশ্চাদ্‌পট' (Background) রচনার পর সেই জমির বুকে 'কোমর বন্ধনীর'

উপরের ও নীচের অংশের দুই প্রান্তে সাদা রঙের বাহারী ফুলগুলিকে বসাতে হবে। তবে কাজের সময় ব্যক্তিগত সুবিধানুযায়ী কারুশিল্পী অবশ্য গোড়াতেই বাহারী ফুলগুলি বসাবার পর চমৎকার আগাগোড়া পছন্দ-মতো রঙের পুঁতির সারি গেঁথে ভরাট করে, অথবা প্রথমেই জমিটিকে বানিয়ে তুলে, তারপর ফুলগুলি গেঁথে সাজিয়ে নিতে পারেন।

ধরুন, আলোচ্য নমুনানুযায়ী 'কোমর বন্ধনীর' 'জমি' রচনার জন্য—ফিকে নীল রঙের এবং 'বাহারী ফুলের' জন্য —সাদা রঙের পুঁতি বেছে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রঙের এই পুঁতিগুলিকে ক্যাম্বিশ কাপড়ের উপরে পাকাপোক্ত-ভাবে সাজিয়ে গেঁথে নেবার আগে, চওড়ার দিকে ২৪টি ঘর থাকে, এমনি হিসাবে ক্যাম্বিশ কাপড়ের টুকরোটি আগা-গোড়া পরিপাটি নিখুঁতভাবে ছাঁটাই করে নিন। এই ২৪ ঘর থেকে, দু'ধারে, ৩ ঘর করে, ৬ ঘর মুড়ে সেলাই করে ফেলুন। তারপর বাকী ১৮টি ঘরে পুঁতি গেঁথে নক্সা রচনা করুন। 'কোমর বন্ধনীর' লম্বা দু'দিকেও উপরোক্ত প্রথায় দু'ধার মুড়ে সেলাই করে নেবেন। কাজেই, এভাবে কাজ করতে হলে, 'কোমর বন্ধনীর' লম্বা দিকেও ৩ ঘর করে, ৬ ঘর বাড়তি অর্থাৎ, ২১″ ইঞ্চির চেয়েও কিছু বেশী লম্বা ক্যাম্বিশ কাপড় হাতে দরকার। রঙীন পুঁতির নক্সাদার সৌখিন 'কোমর বন্ধনী' রচনার জন্য—'ক্যাম্বিশ কাপড়' ছাঁটাইয়ের এই হলো মোটামুটি রীতি। তবে কারুশিল্পীর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কলা-রুচি, এবং প্রয়োজনানুযায়ী অভি-রুচি অনুযায়ী, এ রীতির হেরফেরও করা যেতে পারে।

স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ, এটুকুই হদিশ দিয়ে রাখলুম। আগামী সংখ্যায় ক্যাম্বিশ কাপড়ে রঙীন পুঁতি-গুলিকে গেঁথে সেলাই করে 'কোমর বন্ধনী' বানানোর সচিত্র সরল কলা-কৌশল পদ্ধতির কথা আলোচনা করার বাসনা রইলো।

[ক্রমশঃ

পশমের পুলোভার

হিরণ্ময়ী দেবী

[অনিবার্য্য কারণে গত সংখ্যায় মুদ্রিত 'পশমের রঙ্গীন' প্রবন্ধের শেষাংশ এবারে প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। পরে যথাসময়ে সে প্রবন্ধের পুনরালোচনা করা হবে।]

এ বছর শীত বেশ ভালই পড়েছে···তাই শীতের উপযোগী নতুন ছাঁদের একটি সৌখিন সুন্দর হাতা বিহীন পশমের পুলোভার (sleeveless woolen pullover) রচনার মোটামুটি হদিশ দিচ্ছি। এ পুলোভারটি নিতান্তই সাধাসিধা অথচ মনোরম প্যাটার্ণের এবং প্রমাণ মাপের পুরুষদের পক্ষে ব্যবহারোপযোগী পরিচ্ছদ। এটি বুনতেও খুব বেশী পরিশ্রম ও সময় লাগবে না।

আপাততঃ, বোঝবার সুবিধার জন্য ধরে নেওয়া যাক্ যে এই পুলোভারের মূল হবে,—২১″ ইঞ্চি, এবং ছাতির মাপ হবে—৩৮″ ইঞ্চি। কাজেই উপরোক্ত মাপ অনুসারে এ পুলোভারটির রচনা কার্য্যে পশম লাগবে—৬ আউন্স। তবে এ কাজের জন্য অবশ্য "৪ প্লাই" বা চার হালির পশমী সুতো বাছাই করে নেওয়া ভালো। পশমী সুতোর রঙ, গাঢ় নীল (Navy Blue) হালকা বা গাঢ় ছাই বর্ণ (Light or Dark Grey colour), গাঢ় লাল (Scarlet-Red), গাঢ় অথবা হালকা বাদামী, (Dark or Light Brown), ফিকে সবুজ (pale green) কিম্বা হালকা হলদে (pale yellow) হলেই সাধাসিধা

চাঁদের এই পুলোভারটির শ্রী সৌষ্ঠব আরো বেশী পরিপাটি সুন্দর ও মানানসই দেখাবে। তবে পশমী সুতোর রঙ এবং পুলোভার ছোট বড় মাপ যে উপরের নির্দেশমতোই মেনে চলতে হবে, এমন কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। যাঁরা এ পরিচ্ছদটি বুনবেন, তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি এবং প্রয়োজনানুসারেই, পশমী সুতোর রঙ ও পুলোভারের মাপ জোখ নির্দ্ধারণ করে নেওয়াই ভালো। কাজে হাত দেবার পূর্ব্বেই পছন্দমতো রঙের পশমী সুতো বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলোভারটি বোনবার জন্য চাই—৮নং 'ষ্ট্রেট-নেডেড' (Straitnoid) কাঠি একজোড়া এবং ছুঁচালো-মুখ মাথাওয়ালা ১০ নং বোনার কাঠি দুই জোড়া।

এ সব উপকরণ সংগৃহীত হবার পর, রঙীন পশমী সুতো ও বোনবার কাঠির সাহায্যে নিম্নোল্লিখিত নির্দ্দেশানুসারে পুলোভার রচনার কাজে হাত দিতে হবে। তবে কাজের সুবিধার জন্য নিম্নোল্লিখিত নির্দ্দেশ সূচীতে যে সংক্ষিপ্ত সঙ্কেতোক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, আপাততঃ, সে সম্বন্ধে মোটামুটি ইঙ্গিত দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, সোঃ—সোজা, উঃ—উল্টো; রিঃ—রিপিট বা পুনরাবৃত্তি করা; ঘঃ কঃ—ঘর কমানো; ঘঃ বাঃ—ঘর বাড়ানো ইত্যাদি।

পশমের রঙীন সুতো দিয়ে পুলোভার বোনবার সময়, গোড়াতেই পরিচ্ছদের পিঠের দিকটি রচনা করতে হবে। এভাবে রচনার রীতি হলো—পুলোভারের 'তলা' বা নীচের অংশ থেকে বুনতে সুরু করা। প্রথমে ১০নং কাঠিতে ৯৮টি ঘর তুলুন। তারপর ২॥" ইঞ্চি বুনুন—১টা সোঃ, ১টা উঃ পদ্ধতিতে। অতঃপর ৮নং কাঠির সাহায্যে প্যাটার্ণ বোনা সুরু করুন।

প্রথম লাইন আগাগোড়া সোঃ বুনে যান। দ্বিতীয় লাইন ২টো সোঃ ● ১০টা উঃ, ২টা সোঃ। এবারে ●-চিহ্ন থেকে বাকী ঘরগুলি রিঃ করুন। এর পর থেকে ঐ প্রথম এবং দ্বিতীয়—এ দুটি লাইনের নিয়মানুসারে আরো ৮লাইন পর পর বুনুন। এভাবে বুনে, একাদশ লাইনে আগাগোড়া সোজা বুনবেন। তার পরের ৩টা লাইন বুনবেন গার্টার-ষ্টিচ্ সূচীশিল্প পদ্ধতিতে—অর্থাৎ, প্রত্যেকটি লাইন সোঃ বুনে।

এইভাবে মোট যে ১৪ লাইন বোনা হলো—এটি হচ্ছে আসল প্যাটার্ণ। এই প্যাটার্ণটি এবার আগাগোড়া রিঃ করে যান···তবে খেয়াল রাখবেন—প্রত্যেক পঞ্চম-লাইনের গোড়ায় এবং শেষে ১টি করে ঘর বাড়িয়ে যেতে হবে। তারপর যে বুনন চলবে, তার প্রত্যেক চতুর্থ লাইনের গোড়ায় আর শেষে (at both ends) ১টি করে ঘর বাড়িয়ে যাবেন—যতক্ষণ না কাঠিতে ১২৮ ঘর বাকী আছে, দেখবেন। অর্থাৎ, যেখান থেকে সর্ব্বপ্রথম ঘর কমাতে সুরু করেছেন, সেখান থেকে পাঁচটি প্যাটার্ণ সম্পূর্ণ হলো কিনা দেখবেন এবং নজর রাখবেন—পরের ৬ষ্ঠ প্যাটার্ণের ৮টি লাইন বাকী থাকা চাই।

এর পরের প্যাটার্ণে প্রথম দ্বিতীয় লাইনের গোড়ায় ৬টি করে ঘর কমান। তার পরের ৪ লাইনের গোড়ায় এবং শেষে (at both ends) ২টি ঘঃ কঃ। এখন দেখবেন, কাঠিতে ১০৮টি ঘর বাকী রয়েছে। এবারে ঘর না কমিয়ে বরাবর বুনে যান, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গোড়া থেকে ১০টি প্যাটার্ণ সম্পূর্ণভাবে বোনা শেষ হয়। তারপর শেষের ৩ লাইন ষ্টকিং-ষ্টিচ সূচীশিল্প পদ্ধতিতে অর্থাৎ সোজার ঘরের রীতিতে বুনে ঘর বন্ধ করুন।

এবারে পুলোভারের ঘাড়ের দিকটিকে সুখদানের পাল্লা সুরু করতে হবে। গোড়াতেই ৬ লাইনের প্রত্যেকটিকে ১২টি করে ঘঃ কঃ। এভাবে বুনে গোড়ার ৬ লাইন শেষ হলেই দেখবেন, কাঠিতে ২৬টি ঘর বাকী ঘর আছে। এই ২৬টি ঘর এবারে বন্ধ করে ফেলুন। তাহলেই পুলোভারের পিঠ বা পিছনের দিক ও ঘাড়ের অংশ বোনার কাজ সম্পূর্ণ হবে।

অতঃপর, পুলোভারের সামনের অংশ বোনার কাজে হাত দিতে হবে। তবে স্থানাভাবের কারণে, এবারে তার বিশদ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হলো না···আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ইঙ্গিত দেবো। [ক্রমশঃ

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—বাঙলাদেশের অভিনব বিচিত্র এক ধরণের আমিষ তাতীয় খাবার রান্নার কথা। সুস্বাদু মুখরোচক এই আমিষ খাবারের নাম—'দই-চিঙড়ী'। ছুটির দিনে অথবা বাড়ীতে কোনো উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে, আত্মীয়-বন্ধু, অভিথি অভ্যাগতদের পাতে নতুন ধরণের এই উপাদেয় 'দই-চিঙড়ী' খাবার পরিবেষণ করে অল্প আয়াসে এবং স্বল্প ব্যয়ে অনায়াসেই প্রচুর পরিতৃপ্তি দিয়ে রীতিমত সুনাম কিনতে পারবেন।

আট দশজনের আহারোপযোগী 'দই-চিঙড়ী' খাবারটি রান্নার জন্য যে সব উপকরণ জোগাড় করা দরকার, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খাবারটি রান্নার জন্য চাই—দশ-বারোটি চিঙড়ী মাছ, আধ ছটাক ঘি, একপোয়া টক দই, প্রয়োজনমতো পরিমাণে কিছু চিনি, নুন, ও গরম মশলা, ৪।৫টি কাঁচা লঙ্কা, ৩।৪টি পেঁয়াজ, এক টুকরো আদা, ৪।৫টি আলু এবং চায়ের কাপের এক কাপ জল।

ফর্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগেই, চিঙড়ী মাছগুলিকে পরিপাটিভাবে ছাড়িয়ে, ধুয়ে সাফ্ ও টুকরো করে কেটে নিন। তারপর বঁটি বা ছুরির সাহায্যে কাঁচা লঙ্কা আর আলুগুলিকেও টুকরো করে কুটে রাখুন। এ কাজ সারা হলে, পেঁয়াজ ও আদা মিহি-ছাঁদে বেটে নিন।

এবারে উনানের আঁচে রন্ধন পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে ঘি গরম করে নিন এবং সেই তপ্ত তরল ঘিয়েতে আদা ও পেঁয়াজ বাটা ছেড়ে, অন্ততঃ ৪।৫ মিনিটকাল সযত্নে খুন্তীর সাহায্যে নাড়াচাড়া করে 'মিশ্রণটিকে' আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ভেজে ফেলুন। এভাবে ভেজে নেবার পর, 'মিশ্রণটিতে' আন্দাজমতো পরিমাণে নুন, চিনি ও গরম মশলা ছেড়ে কয়েকবার খুন্তী দিয়ে নাড়াচাড়া করে, চায়ের কাপের এক কাপ জল মিশিয়ে রন্ধন পাত্রের মুখ ঢাকনি চাপা দিয়ে রাখুন। এভাবে কিছুক্ষণ উনানের আঁচে বসিয়ে রাখার ফলে, 'মিশ্রণটি' বেশ ফুটন্ত হয়ে উঠলেই, রন্ধন পাত্রে চিঙড়ী মাছ, আলু আর কাঁচালঙ্কার টুকরোগুলি ছেড়ে দিয়ে, সব উপকরণগুলিকে একত্রে সু-সিদ্ধ করে নিন।

উপকরণগুলি সু-সিদ্ধ হয়ে গেলে, রন্ধন পাত্রে দইটুকু মিশিয়ে দিয়ে, 'মিশ্রণটিকে' অন্ততঃপক্ষে, আরো মিনিট ৪।৫ মিনিটকাল উনানের আঁচে বসিয়ে রাখুন। তবে খেয়াল রাখবেন, 'মিশ্রণটি' যেন খুব বেশীক্ষণ এমনিভাবে ফুটানো না হয়···বেশী ফুটলেই, খাবারটি বিস্বাদ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কাজেই রান্নার সময়, এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

'মিশ্রণটিকে' কিছুক্ষণ এমনিভাবে ফুটিয়ে নেওয়ার পর, উনানের উপর থেকে রন্ধন পাত্রটিকে নামিয়ে নিয়ে সযত্নে পরিচ্ছন্ন শীতল কোনো জায়গায় রেখে দেবেন। তাহলেই সুস্বাদু উপাদেয় 'দই-চিঙড়ী' খাবারটির রান্নার কাজ শেষ হবে।

অতঃপর, প্রিয়জনদের পাতে সযত্নে পরিবেষণের পালা! ···অভিনব মুখরোচক এই আমিষ খাবারটির সুস্বাদে তাঁরা যে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের অভিনব সুস্বাদু আরেকটি ভারতীয় খাবারের রন্ধন প্রণালীর কথা আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিন

আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল দীপেনের। ঘুম ভাঙলেও তার স্নায়ুগুলো এখনো সম্পূর্ণ সজাগ নয়; চেতনা আর নিশ্চেতনার মধ্যে সেগুলো যেন দোল খাচ্ছে।

এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে, কিভাবে আছে—প্রথমটা কিছুতেই মনে করতে পারল না দীপেন। শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত, ছয় ঋতু বারো মাস ভারী লেপই হোক আর পাতলা চাদরই হোক, কিছু একটা দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে অর্থাৎ মুড়ি দিয়ে শোবার অভ্যাস তার। কাল রাতে একটা দিকের চাদর গায়ে দিয়ে শুয়েছিল সে। চাদরের মধ্যে ছায়া ছায়া তরল অন্ধকার। প্রথমটা দীপেনের মনে হল কলকাতার পার্ক সার্কাসে তাদের সেই বাড়িটিতেই শুয়ে আছে।

এদিকে চাদরের ভেতরে অন্ধকারটা দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আর অন্ধকার যত কেটে যাচ্ছে ততই দীপেনের আপসা স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। বিদ্যুৎচমকের মত একে একে তার সব মনে পড়ে গেল। বার শ মাইল পাড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরের কূল থেকে আরবসাগরের তটে ছুটে এসেছে সে। পাঞ্জাবি ড্রাইভার তাকে সিন্ধী হোটেলে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ল, আপাতত সেখানেই শুয়ে আছে সে। আরো মনে পড়ল, এই বিশাল শহর থেকে অজানা সাগরের সেই অচেনা মুক্তোটিকে অর্থাৎ নীলা চৌধুরীকে খুঁজে বার করার জন্যই তার এতদূরে পাড়ি জমানো।

অতএব গা থেকে চাদরটাকে একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে পড়ল দীপেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় টোকা পড়ল। একটু চমকে দীপেন বলল, 'কৌন?'

বাইরে থেকে উত্তর এল, 'আপকি চায় পানা সাব—'

বোঝা গেল, বয়টা এসেছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল দীপেন। বয়টা ভেতরে ঢুকে এক পেয়ালা চা টী-পয়ের ওপর রেখে ব্যস্ত পায়ে দরজার দিকে ছুটে পালাল। আর সেই সময় একটা কথা মনে পড়ে গেল দীপেনের। নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, 'এই শোন—'

ঊর্ধ্বশ্বাস গতিকে থমকে দিয়ে বয়টা ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দীপেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জী সাব—'

'এখান থেকে আজেরী কতদূর।'

'পন্দর বিশ মাইল হবে।'

কি একটু ভেবে দীপেন বলল, 'তা হলে তো বেশ দূর।'

'জী।' বয়টা মাথা নাড়ল।

'আচ্ছা, আজেরীতে কিভাবে যাওয়া যায়?'

'চার্চ গেট টিশন থেকে টিরেন (ট্রেন) মিলবে। আন্ধেরী টিশনে নামতে হবে।'

'ট্রেন কি খুব দেরিতে ছেড়িতে চাড়ে?'

'জী নহী। পাচ দশ মিনিট পর পরই পেয়ে যাবেন। লুকাল (লোকাল) টিরেন (ট্রেন)।'

'আচ্ছা তুমি যাও। হাঁ, ভাল কথা; এখুনি আমার ব্রেকফাষ্ট দিয়ে যাবে। আধাঘণ্টার মধ্যে আমি বেরুব।'

'জী—' বয়টা আর দাঁড়াল না। উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল।

আর দীপেনও টুথ ব্রাশে পেষ্ট লাগিয়ে বাথরুমে নিয়ে ঢুকল।

শুধু মুখই ধোয়া নয়, এই সকালবেলাতে একেবারে স্নানটাই সেরে ফেলল দীপেন। আন্ধেরী যাচ্ছে, সেখান থেকে কখন ফিরতে পারবে তার কোন স্থিরতা নেই। অতএব স্নান করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। স্নানটা সারা থাকলে দরকার হলে বাইরে দুপুরের খাওয়া সেরে নেওয়া যাবে।

যাই হোক স্নানের পর ব্রেকফাষ্টের পালা চুকিয়ে ফেলতে খুব বেশি সময় লাগল না। তারপর গত রাত্রের ধুলিধূসরিত পোশাক বদলে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল দীপেন।

ইতিমধ্যে সূর্যটা কখন যেন পূব আকাশের ধনুরেখা বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। হেমন্তের সূর্য, কিন্তু তার সর্বাঙ্গে এখনও যেন বৈশাখেরই দাহ।

এই হেমন্তে বাঙলাদেশের সকালগুলো যখন কুয়াশার আর হিমে বিষণ্ণ হয়ে থাকে তখন সুদূর বোম্বাইতে তার ছিটেফোঁটাও আবিষ্কার করতে পারল না দীপেন।

বয়টার কাছ থেকেই চার্চ গেট ষ্টেশনের নিশানা জেনে নিয়েছিল। নির্দেশ অনুযায়ী হেঁটে চলেছে দীপেন।

এদিকে বোম্বাই শহরের ধমনী রাতের নিশ্চিন্ত বিশ্রামের পর আবার চঞ্চল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ফুটপাথে এরই মধ্যে মানুষের চলমান স্রোত; রাস্তার বাকখান দিয়ে ছুটেছে গাড়ির চল।

মানুষের সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে একসময় চার্চ গেটে এসে পৌছুল দীপেন। তারপর একখানা টিকিট কেটে আন্ধেরীর ট্রেনে গিয়ে উঠল।

ট্রেনেও ঠাসাঠাসি ভিড়। তবু ভাগ্যই বলতে হবে। ওরই মধ্যে এককোণে জানালার প্রান্ত ঘেঁষে বসার মত কয়েক ইঞ্চি জায়গা দখল করতে পারল দীপেন।

মাথার ওপর অবারিত আকাশ; প্রখর-দহন সূর্য কিংবা ট্রেনের উদ্দাম ভিড়—কোনদিকেই লক্ষ্য ছিল না দীপেনের। দূরমনস্কর মত সে ভাবছিল।

সোনারপুরের রমাদেবী আন্ধেরীর একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন। আঠারোর বি নীলকান্ত ঘোষী রোড। ওখান থেকে প্রতি মাসে নীলা চৌধুরী তাঁদের নামে টাকা পাঠিয়ে থাকে। দত্তসাহেবকে সে খবর দিতে তিনি বলেছিলেন আন্ধেরীর ঐ বাড়িটিতে দীপেনকে হানা দিতে হবে। নীলার প্রতি মুহূর্তের সংবাদ জানতে হলে তার কাছাকাছি থাকা দরকার। অতএব দীপেন যেন ওখানেই একটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে নেয়।

দীপেনের ভাবনার মধ্যেই কখন যেন একসময় ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। দীপেন এত অন্যমনস্ক যে সে সম্বন্ধে তার খেয়াল ছিল না।

ইলেকট্রিক ট্রেন বাতাসের সমুদ্রে সাঁই সাঁই ঝড় তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। নিজের হৃদপিণ্ডে সেই ঝড়েরই প্রতিধ্বনি যেন শুনতে লাগল দীপেন। আঠারোর বি নীলকান্ত ঘোষী রোডে পৌছে সে কী দেখবে, কি ভাবে গৃহীত হবে, অজানা সাগরের সেই অচেনা ঝিনুকটিকে আদৌ খুঁজে পাবে কিনা—এসব কথা যত ভাবল ততই অসহ্য উত্তেজনায় আর অপরিমেয় স্নায়ুভীতিতে তার সমস্ত ধমনী যেন আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল। অস্তিত্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দুরন্ত তরঙ্গে অবিরাম দোল খেতে লাগল যেন।

স্টেশনের পর স্টেশন পেরিয়ে সাবার্বণ ট্রেন একসময় আন্ধেরী পৌছে গেল। ষ্টেশনে নেমে জিজ্ঞেস করে করে নীলকান্ত ঘোষী রোডের সেই ঠিকানাটা যখন দীপেন আবিষ্কার করল হেমন্তের সূর্য তখন মহারাষ্ট্রের মধ্যাকাশে এসে পড়েছে।

বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে দীপেন স্তম্ভিত। সোনারপুরে নীলাদের যে পুরনো স্থবির বয়োজীর্ণ দোতলা বাড়িটা দেখেছিল তার সঙ্গে এর মিল খুঁজতে যাওয়া নিতান্তই

বিড়ম্বনা। আধুনিক স্থাপত্যরীতির এই সুচারু এবং বিশাল বাড়িটাকে বাড়ি বললে বোধ হয় মর্যাদা দেওয়া হয় না। বলা উচিত প্রাসাদ। সামনের দিকে বিস্তৃত বাগান। যার একপ্রান্তে অসংখ্য মরসুমী ফুলের সমারোহ। ফুলগুলোর সবাই কুলীন বিদেশিনী; তাদের মধ্যে দেশী অস্ত্যজদের জায়গা হয় নি। আরেক প্রান্তে টেনিস কোর্ট। টেনিস কোর্ট এবং ফুলবাগানের মাঝখানে নিয়ত উচ্ছ্বসিত একটা ফোয়ারা। ফোয়ারাটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে বাদামী সুড়ির চমৎকার পথ।

সোনারপুরের সেই ভয়াবহী প্রায়ান্ধকার বাড়ির মেয়ে এখন একখানা প্রাসাদের বাসিন্দা—এ বিস্ময়টা কিছুতেই সামলে উঠতে পারছে না দীপেন। তার সমস্ত ভাবনাটাই কেমন যেন জট পাকিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।

এই বাড়িটাই কি? পকেট থেকে ডায়েরী বার করে ঠিকানাটা আরেকবার মিলিয়ে নিল দীপেন। ডায়েরীতে যা আছে এ বাড়ির গেটের পাশে পেতলের একখানা প্লেটে সেই একই ঠিকানা লেখা। নাঃ, সংশয়ের কোন অবকাশই নেই। নির্ভুলভাবে এই বাড়িটাই।

এখন কী করবে দীপেন? কী করা উচিত?

ঠিকানা সম্বন্ধে সংশয় কেটে গেছে। তবু নীলা চৌধুরী যে এ বাড়িতেই থাকে তা পুরোপুরি বিশ্বাস করার মত সাহস নিজের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তার সমস্ত ভাবনাটা যখন বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানে দোলায়িত ঠিক সেই সময় সুরহীন মোটা গলা শোনা গেল, 'কিসকো মাংতা সাব?"

চকিত দীপেন মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল। দেখা গেল, গেটের ওপারে দীর্ঘদেহ সিখ দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। যেরকম আশ্চর্য রুক্ষ লোকটার; প্যান্টের ক্রীজ উদ্ধত এবং নির্ভুল।

উত্তর দিতে খানিকটা সময় লাগল দীপেনের। একটু সামলে নিয়ে সে বলল, 'আচ্ছা, এ বাড়িতে কারা থাকে?

দারোয়ানটা বলল, কারা আর থাকবে? যাদের বাড়ি তারা থাকে। মালী ড্রাইভার নৌকররা থাকে।

দীপেন বুঝল ওভাবে প্রশ্ন করাটা বোকামিই হয়েছে। এবার একটু ভেবে সে বলল, 'এ বাড়ির মালিক কে?'

'নীলা চৌধুরীজী।'

'নীলা চৌধুরী!'

'জী।'

বিস্ময়ে এবং উত্তেজনার প্রথমটা বিমূঢ় হয়ে পড়ল দীপেন। বিস্ময়ে, কেননা এত বড় একটা প্রাসাদের অধিকারী সোনারপুরের রমাদেবীর মেয়ে নীলা চৌধুরী! আর উত্তেজনাটা অন্য কারণে। প্রায় বিনা পরিশ্রমেই অচেনা কিছুকটাকে বার করা যাবে।

কাঁপা ব্যগ্র সুরে দীপেন বলল, 'নীলা চৌধুরীজীর সঙ্গে আমি একটু দেখা করতে চাই।' 'লেকেন—এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করল, দারোয়ানটা।

'লেকেন কী?'

'নীলাজীর সঙ্গে তো দেখা হবে না।'

আশাভঙ্গের আশঙ্কায় দীপেনের গলা একটু যেন তীব্রই শোনাল, 'কেন?'

দারোয়ান জানালে, 'নীলা জী এখানে থাকে না।'

'তবে যে একটু আগে বললে যাদের বাড়ি তারা এখানে থাকে!'

'ও ঠিক বাত। তবে কয়েকমাস ধরে নীলা চৌধুরীজী এখানে থাকে না।'

'তবে কোথায় থাকে?'

'ও আমি জানি না।'

এই মুহূর্তে কী বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না দীপেন। তার মনে হল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তীরে ওঠার মুখে কে যেন ধাক্কা দিয়ে তাকে আবার অথৈ জলে ফেলে দিয়েছে। দিশেহারার মত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল দীপেনের। তৎক্ষণাৎ সে প্রশ্ন করল, 'নীলা চৌধুরীজী তো থাকে না। নৌকর-চৌকর বাদ দিয়ে তা হলে আর কে থাকে?'

'নগিনদাসজী—নগিনদাস পারিখ।'

'আমি নগিনদাসজীর সঙ্গেই একবার দেখা করব।'

'লেকেন এখন তো হবে না।'

'কেন?'

'উনি বেরিয়ে গেছেন।

'কখন ফিরবেন?'

'সেই পাঁচটার সময়।'

একটু ইতস্তত করে দীপেন বলল, 'আমি পাঁচটার সময়ই আসব।'

দারোয়ান বলল, আপনার ইচ্ছে। [ক্রমশঃ

যখন যেমন···

গৃহানুসন্ধানী-গৃহিণী :—ইস্ !···এত ছোট ঘর !···খাট-পালঙ্ রাখবো—এমন জায়গাটুকুও নেই !···

মুনাফা-লোলুপ বাড়ীওয়ালা :—বটে ! · খাট-পালঙ্ : রাখবেন !···হেঃ !··· বলে,—লোকে আজকাল মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাচ্ছে না কোথাও···এর উপর, আপনার আবার চাই—খাট-পালঙ্ রাখবার জায়গা !···হুঁ : !···

শিল্পী : পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

ভারতরত্ন

শ্রীজ্ঞান

তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছ, যারা কোনও একটা আদর্শকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করে থাক। কেউ কেউ আবার মনে মনে এক আদর্শ পুরুষকে পূজা করেও থাক এবং তাঁর মতন হবার চেষ্টাও কর। এই রকম আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা বা আদর্শ পুরুষের মতন হবার ইচ্ছা যে সত্যই প্রশংসনীয় তাতে কোনও সন্দেহই নেই—বিশেষ করে সেই আদর্শ ও আদর্শ পুরুষ যদি সত্যই আদর্শনীয় হন। এই রকম আদর্শ পুরুষের পূজা সর্বদেশে ও সর্বকালেই চলে আসছে। অতীতে একে বীর-পূজা বলত। তখন সাধারণতঃ লোকে বড় বড় যোদ্ধা ও সেনাপতিদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করত। কিন্তু আজকাল যোদ্ধাদের যুগ আর নেই—এখন লোকে যুদ্ধের চেয়ে শান্তিকেই বড় করে দেখে। শান্তিই লোকের কাম্য বলেই বিশ্ব-শান্তির জন্যে এখন সংগ্রাম চলছে। যুদ্ধের বিভীষিকা, যুদ্ধের ভীষণতা বর্তমান বিশ্বের মানবকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে যুদ্ধের দ্বারা কোনও কল্যাণ সাধিত হয় না—এমন কি বিজয়ী ও বিজেতার মধ্যেও প্রভেদ থাকে না। যুদ্ধের পর জেতাকেও বিজেতার মতন নানা দুরবস্থায় পড়তে হয়। তারপর এখনকার এই পরমাণবিক বোমার যুগে যুদ্ধ যে কি ভীষণ ক্ষতি সাধন করতে পারে তার ধারণা সকলকারই আছে। তাই বিশ্ব-জুড়ে সাধারণ লোকে আজ চাইছে শান্তি—যুদ্ধের বিভীষিকার হাত থেকে চাইছে নিষ্কৃতি। আর যাঁরা যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার জন্য, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করে চলেছেন, সেই শান্তির দূত, মহান পুরুষদের লোকে এখন পূজা করবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে, তাঁর আদর্শকেই অনুসরণ করবে। এই রকম একজন ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। তিনি নিজ দেশের শান্তি ও বিশ্ব-শান্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তারপর তাঁর ওপর তাঁর আরব্ধ কার্যের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন, ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীও সেই শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ দৃঢ়তার সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে গেলেন।

সামান্য ঘরে জন্মগ্রহণ করে, সামান্য অবস্থা থেকে নিজ কর্মদক্ষতায়, সততায় ও চরিত্রবলে শাস্ত্রীজী বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডেমোক্রেটিক দেশের প্রধান মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং যে স্বল্পকাল প্রধান মন্ত্রীরূপে তিনি কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন তার মধ্যেই তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, প্রমাণ করে ছিলেন তাঁর পুরুষকার, তাঁর দৃঢ়তা, তাঁর সত্যের প্রতি, শান্তির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, আর ক্লান্তিহীন কর্তব্যবোধ। দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে, শান্তি প্রতিষ্ঠার অদম্য আগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই মহান কর্মযোদ্ধা, শান্তি-যোদ্ধা দূর বিদেশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর অমর আত্মা মহাশান্তি লাভ করল

মহান বর্ষের অবসানে! পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সৌহার্দ্য স্থাপন করে বিশ্ব-বিখ্যাত 'তাসখন্দ চুক্তি' স্বাক্ষর করে এই মহাপ্রাণ শান্তি-দোতা চিরশান্তি লাভ করলেন। এ রকম মহান মৃত্যু কদাচিৎ দেখা যায় কদাচিৎ কেউ এ রকম মহান শান্তি-শহীদের সম্মান পায়! শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সারা বিশ্ব যাঁর শোকে অভিভূত চিত্তে অশ্রুপূর্ণলোচনে অবনত মস্তকে সম্মান জানাল, সেই মহাসম্মান লাভ কদাচিৎ কারুর ভাগ্যে ঘটে থাকে। শান্তি প্রচেষ্টায় প্রাণদানকারী শহীদের এই মহাসম্মান সারা বিশ্বের কাছ থেকে লাভ করে গেলেন ভারতরত্ন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তিনি শুধু ভারতেরই রত্ন ছিলেন না, তিনি বিশ্বরত্ন! তাঁকে হারিয়ে সারা বিশ্ব তাই আজ ব্যথায় মুহ্যমান!

শাস্ত্রীজী আজ নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ, যে আদর্শ তিনি অনুসরণ করে গেছেন, তাঁর সেই শান্তির আদর্শ আজ সারা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর আদর্শ, তাঁর চরিত্রবল, তাঁর দৃঢ়তা আজ সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। তোমাদেরও উচিত আজকের এই অশ্রুসজল দিনে, বিষাদের দিনে, শাস্ত্রীজীর আদর্শকে অনুসরণ করা। শাস্ত্রীজীর মধ্যেই তোমরা পাবে তোমাদের আদর্শ পুরুষকে, তাঁকেই তোমরা কর তোমাদের পরম পূজ্য মহান বীর। আর চিরস্মরণীয় করে রাখ, চিরপূজ্য করে রাখ, চির উজ্জ্বল করে রাখ তোমাদের মনের মণিকোঠায় এই মহান রত্নকে, ভারতরত্ন শাস্ত্রীজীকে।

***

জর্জ এলিয়ট

রচিত

সাইলাস মার্নার্

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ওদিকে নববর্ষ বরণ উপলক্ষ্যে গ্রামের জমীদার বাড়িতে রঙবেরঙের ফুল পাতা, আর আলোর মালায় স্বর্গের ইন্দ্রপুরীর মতো সাজানো সুপ্রশস্ত বৈঠকখানায় সেই রাত্রে সাড়ম্বরে খানা পিনা, নাচ গান ধুমধাম আর নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতদের ভীড়ে আনন্দোৎসবের আসর তখন রীতিমত জমজমাট···জমীদার ড্যান্‌স্ স্বয়ং সে আসরে উপস্থিত থেকে সকলের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখছেন···তাঁর মেজোছেলে ড্যান্‌সি সে আসরে অনুপস্থিত থাকলেও জমীদারের ছোট ছেলে কিশোর বয়সী বব মহানন্দে বাঁশী বাজিয়ে নেচে লোকজনের মন মাতিয়ে তুলেছে···বড় ছেলে গড্‌ফ্রে অবশ্য নাচ গানের আসর থেকে দূরে বারান্দার নিরিবিলি কোণে সরে এসে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে—ন্যান্‌সি লামিটারের সঙ্গে বল্ নাচের সুযোগের জন্য···এমন সময় সবাইকে চমকে দিয়ে দমকা ঝড়ের মতো উস্কোখুস্কো বেশে উদ্বেগাকুলভাবে হঠাৎ সেই আনন্দ মুখর উৎসব বৈঠকে ছুটে এসে হাজির হলো গাঁয়ের বুড়ো তাঁতী সাইলাস্ মার্নার্···সাইলাসের কোলে ছেঁড়া কম্বলের টুকরোয় সযত্নে জড়ানো ফুটন্ত ফুলের মতো ফুটফুটে সুন্দর ছোট্ট একটি শিশু কন্যা। অসময়ে সাইলাসকে আচমকা এভাবে আসরে ছুটে আসতে দেখে লোকজনেরা সবাই অবাক!···ব্যাপার কি? অজানা অচেনা ছোট্ট ঐ ফুটন্ত ফুলের শিশুটিকে কোলে

নিয়ে সাইলাস্ হঠাৎ এত রাতে এমনভাবে এখানে ছুটে এসেছে ?···কোনো অঘটন ঘটেছে নিশ্চয়···তাই সে এভাবে···

আদরের লোকজন সবাই রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠলো···এমন কি, জমীদার ক্যাস্, গ্রামের মাতব্বর মিঃ ক্র্যাকেনট্রপ, পাশের গাঁয়ের বিশিষ্ট অতিথি মিঃ লাটিমার, রাতেলো গ্রামের প্রবীণ ডাক্তার কিম্বস এবং সমবেত ভদ্রমহিলাদের অনেকেই আগ্রহভরে এগিয়ে এলেন আগন্তুক সাইলাসের কাছে—কোনো বিপদ আপদ ঘটেছে কিনা, তারই খোঁজ খবর জানতে। তাঁদের দলে এগিয়ে এলো না কেবল জমীদারের বড়ছেলে গড্‌ফ্রে! কারণ, সাইলাসের কোলে ছেঁড়া কম্বলের টুকরোয় জড়ানো ফুলের মতো ফুটফুটে ছোট্ট শিশুটিকে দেখেই গড্‌ফ্রের আর চিনতে বাকী রইলো না যে সেটি তারই নিজের কন্যা! আদরে লোকজনের ভীড়ের মাঝে এমন অতর্কিতে সাইলাসের কোলে নিজের মেয়েটিকে দেখবামাত্রই গড্‌ফ্রে চমকে উঠলো···ভয়ে আতঙ্কে ছমছম করতে লাগলো তার মন।···সর্বনাশ!···মলিও তাহলে এসেছে এই রাতেলো গ্রামে—লোকজনের কাছে গড্‌ফ্রের সঙ্গে তার গোপন পরিণয়···ফুটফুটে এই দুধের শিশুর জন্ম-বৃত্তান্ত সব কিছু কীর্তি কাহিনী ফাঁশ করে দেবার মতলবে!···এখন উপায়?···এদিকে ন্যান্সির সঙ্গে গড্‌ফ্রের বিবাহের ব্যবস্থাও প্রায় ঠিক···সে বেচারী জানে না গড্‌ফ্রের জীবনের এ সব বেয়াড়া ইতিহাস···কেবলমাত্র হতভাগা ড্যান্সি ছাড়া গ্রামের লোকজন···এমন কি কাক-পক্ষীটিও কেউই জানে না গড্‌ফ্রের এ সব গোপন কীর্তি-কলাপের বিন্দু বিসর্গও। সকলেই তাকে সজ্জন হিসাবে খাতির—রীতিমত খাতির করে!···এখন ঘুণাক্ষরেও মলির মুখে যদি তার এই কেলেঙ্কারীর আসল পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহলে রূপসী ন্যান্সিকে বিবাহ করা তো দূরের কথা—সমাজে কারো সামনে গড্‌ফ্রে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না···জমীদার ক্যাস্‌ও হয়তো বংশমর্যাদা রক্ষার খাতিরে তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাজ্যপুত্র করবেন···হয়তো নিরুদ্দিনের মতো রাতেলো-গ্রাম ত্যাগ করে দূরে অন্যত্র কোথাও গিয়ে আত্মীয় বন্ধু সবাইকে ভুলে নিতান্তই নিঃসঙ্গভাবে বাকী জীবনটুকু অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশায় কাটাতে হবে!

লোকনিন্দা কুৎসা অপবাদ আর ভাগ্য বিপর্যয়ের উদ্বেগ আশঙ্কায় গড্‌ফ্রের মন অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠলো···তবে, পাছে কারো মনে সন্দেহ জাগে, তাই কোনোমতে নিজের ঘাবড়ানি উদ্বেগভাবকে সংযত করে আদরের লোকজনের দলে ভিড়ে এগিয়ে এলো সাইলাসের কাছে।

জমীদার ক্যাস্ অবাক হয়ে সাইলাস্‌কে শুধোলেন,—ব্যাপার কি হে···এমন অসময়ে এখানে এসে হঠাৎ?···কোলের ঐ একরত্তি শিশুটিকেই বা পেলে কোথায় তুমি?···

সাইলাস্ ব্যাকুল-কণ্ঠে জবাব দিলো,—আমি এসেছি—ডাক্তারের খোঁজে···ডাক্তার সাহেবকে দরকার···এখুনি!

গ্রামের পাদ্রী মশাইও হাজির ছিলেন আদরে—জমীদার ক্যাসের পাশেই···কৌতূহলভরে তিনি শুধোলেন,—ডাক্তারকে দরকার!···কেন, কি হয়েছে?

বিচলিত কণ্ঠে সাইলাস্ বললে,—একটু আগেই এই দুধের বাছাকে আসন্নতা কুড়িয়ে পেয়েছি আমার ঘরের কোণে! অচেনা এক মহিলা···হয়তো এই বাছারই মা···আমার ঘরের কাছেই বাইরে পাথর-কাটা খাদের পাশে বরফে ঢাকা পথের মাঝে কন্‌কনে শীতে হিমে ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে অসাড় অচৈতন্য অসহায় অবস্থায় একা পড়ে রয়েছেন···হয় তো বেঘোরেই প্রাণ হারিয়েছেন!···তাই তাঁকে দেখবার জন্য ডাক্তার সাহেবকে ডাকতে এসেছি!···যদি এখনও বাঁচানো যায় তাঁকে কোনোমতে!

সাইলাসের কথা শুনে গড্‌ফ্রে শিউরে উঠলো! তার ধারণা হয়েছিল যে প্রসূতি এই হিমে বরফে ঠাণ্ডায় জমে মলি হয়তো এতক্ষণে প্রাণ হারিয়েছে। কাজেই গড্‌ফ্রের সুনাম বজায় রাখার পথ আপাততঃ তো নিষ্কণ্টক। পরে ড্যান্সি রাতেলো গ্রামে ফিরে এসে যদি কোনোদিন আবার মলির সঙ্গে গড্‌ফ্রের গোপন বিবাহের ব্যাপার নিয়ে কলঙ্ক প্রচার রটনার চেষ্টা করে তো মোটা টাকা আর দামী দামী জিনিষপত্র ঘুষ দিলেই সে গোলমাল ধামা-চাপা দিয়ে রাখা যাবে!···ঘুণাক্ষরেও, লোকজন কেউই আর গড্‌ফ্রের কেলেঙ্কারীর কাহিনী জানতে পারবে না···ইতিমধ্যে ন্যান্সির সঙ্গে গড্‌ফ্রের বিবাহও চুকে যাবে···

বিরহের পর প্রয়োজন হলে—সুযোগ-সুবিধামতো স্থানটিকে কোনো এক সময় এ সব কথা বুঝিয়ে বললেই চলবে···তাহলেই হাঙ্গামা বাধবার আর বিশেষ তেমন আশঙ্কা থাকবে না!···তারপর গ্রামেরই কোনো গরীব গৃহস্থ সজ্জন পরিবারকে নিয়মিত মাসহারা দিয়ে অনায়াসেই মণির শিশু কন্যাকে মানুষ করে তোলার বন্দোবস্ত করা যাবে।···কিন্তু এতক্ষণ এমন অসহায় অবস্থায় বরফে আচ্ছন্ন উন্মুক্ত জনশূন্য পথের প্রান্তে পড়ে থেকেও মণি যদি না প্রাণ হারিয়ে থাকে, তাহলেই সর্ব্বনাশ!···গ্রামের লোকজনের সেবা যত্ন চিকিৎসায় মণি যদি আবার সুস্থ হয়ে উঠে দুঃখে আক্রোশে তাদের সবাইকার কাছে গড্‌ফ্রের চলনার কাহিনী ফাঁস করে দেয়···

আতঙ্কে উদ্বেগে গড্‌ফ্রের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো···দেহের রক্ত হিম হয়ে গেল।

আসরের কয়েকজন বয়স্কা মহিলা ইতিমধ্যে কৌতূহল-ভরে এগিয়ে এসে ফুটফুটে সেই অজানা অচেনা শিশুটিকে আদর করে সাইলাস্‌কে বললেন—আহা বেচারী!···কার দুধের বাছা এই ছোট্ট মেয়েটি!···মা হারা···এমন অসহায় ···কে ওকে দেখাশোনা করবে এখন?···তা বেশ তো বাপু··তুমি বরং ও বেচারীকে এখানে আমাদের কাছেই রেখে যাও! বাড়িতে কি-চাকরের তো অভাব নেই··· তাদেরই ওকে···

বয়স্কা মহিলাদের মুখের কথা শেষ হবার আগেই সাইলাস্ আবেগভরে ছোট্ট শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষিপ্তকণ্ঠে জবাব দিলে,—না, না, কারো হাতে তুলে দেবো না একরত্তি এই দুধের বাছাকে!···আমি একে কুড়িয়ে পেয়েছি···আমার ঘরেই এসেছে, নিজে···আমিই দেখা-শুনো করবো···মানুষ করে তুলবো একে!·

সাইলাসের কড়া জবাব শুনে মহিলারা তো স্তম্ভিত! ···আচ্ছা বেয়াড়া বেয়াদপ অসভ্য গোঁয়ার যা হোক এই বোকা হাঁদারাম!···এতটুকু সুবুদ্ধিও যদি ঘটে থাকতো তবু!···এমন বাউণ্ডুলে হতভাগা বুড়োর হাতে পড়ে যা-হারা অসহায় দুধের বাছাটার দেখছি, শেষ পর্য্যন্ত দুঃখ দুর্দ্দশার আর সীমা থাকবে না!···যাকগে বাপু···আচমকা কুড়িয়ে পাওয়া অজানা অচেনা কোথাকার কোন পরের বাছা···তার দায় দায়িত্বের ভার নিয়ে মিছে ঝামেলা বাড়ানোর দরকার কি শুধু শুধু!···তার চেয়ে বরং সাইলাস বুড়োর যখন এতই দরদ এত মাথা ব্যথা ঐ এক কোঁটা বাচ্চাটার জন্য···তখন সে-ই ভোগ করুক মেয়ে মানুষ করে তোলার যত কিছু জ্বালা যন্ত্রণা···দুর্ভোগ ঝঞ্ঝাট!···কাজ কি বাপু আমাদের এ সব নিয়ে অনর্থক দুশ্চিন্তা কুড়োনোর!···

এমনি নানান্ মন্তব্য করে রাগে-অপমানে ফুঁশতে ফুঁশতে মহিলারা সদলে বিরক্তভাবে সাইলাসের কাছ থেকে দূরে সুসজ্জিত বৈঠকের আরেক কোণে সরে গেলেন। তাছাড়া নববর্ষ-বোধনের আনন্দোৎসবের মাঝে অচেনা শিশু-কন্যাকে কোলে নিয়ে ছন্নছাড়া সাইলাসের আচম্‌কা-আবির্ভাবে রস-ভঙ্গ ঘটার ফলে, আসরের লোকজন সবাই রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছিলেন—তাই চটপট সেই বেয়াড়া আবহাওয়ার জের পাল্টে নাচ-গান, খানা-পিনার আসর আবার পুরোদমে জমিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে, জমীদার ক্যাসের পরামর্শে গ্রামের মাতব্বর মিঃ ক্র্যাকেন্‌ট্রপকে সঙ্গে নিয়ে সাইলাসের পিছু পিছু কন্‌কনে-ঠাণ্ডা হিমের রাতে রাগে-বিরক্তিতে গজ্ গজ্ করতে করতে ডাঃ কিথল বেরুলেন পাথর-কাটা খাদের পাশে পথের প্রান্তে অসাড়-অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকা অপরিচিতা-অসহায়া সেই মহিলাটিকে দেখতে উদ্বেগে উত্তেজনায় আকুল হয়ে আনন্দোৎসবের আসর ছেড়ে গড্‌ফ্রেও চললো তাঁদের দলে যোগ দিয়ে। গ্রামের সীমান্তে পাথর-কাটা খাদের পাশে যাবার সময় তাঁরা অচৈতন্যা-মহিলাটিকে শুশ্রূষা করবার জন্য সাইলাসের পড়শিনী ডলি উইন্‌থ্‌পকেও সঙ্গে ডেকে নিয়ে গেলেন।

পাথর-কাটা খাদের সীমানায় পৌঁছে গড্‌ফ্রের উদ্বেগ কাতর অবস্থা দেখে ডাঃ কিথল আর ডলি তাকে বাড়ী ফিরে যাবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও, সে সেখান থেকে নড়লো না। গড্‌ফ্রের অবিচলতা দেখে সবাই ঠাওরালো—বনেদী-জমীদারের ছেলে···ননী-মাখার শরীর!···নিতান্ত অচেনা হলেও, অচৈতন্য দুঃখী-মহিলাটির মর্ম্মান্তিক দুর্দ্দশা দেখে দুঃখে-শোকে এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছে যে তাঁই ছেড়ে আর কোথাও নড়তেই চাইছে না! কাজেই তারা ঘুণাক্ষরেও ধারণা করতে পারলো না যে গড্‌ফ্রের সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার আসল উদ্দেশ্য কি।

হাড়-কাঁপানো হিমে-ঠাণ্ডার কষ্ট-অসুবিধা তুচ্ছ করে এত রাতে গড্‌ফ্রের এভাবে পাথর-কাটা খাদের পাশে হাজির থাকার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল—মলি তখনও পর্য্যন্ত বেঁচে আছে, না মারা গিয়েছে···তারই সঠিক সন্ধান স্বয়ং যাচাই করে নেওয়া। গ্রামে জমীদার-বাড়িতে খবর দিতে যাবার আগেই সাইলাস নিজেই অচৈতন্য মলিকে কুয়াশাচ্ছন্ন পথ থেকে তুলে নিয়ে এসে শুশ্রূষার জন্য সযত্নে তার কুটিরে শয্যার উপরে শুইয়ে রেখে দিয়েছিল। কাজেই ডলি উইনথ্রপের সঙ্গে সাইলাসের কুটিরে হাজির হয়ে শয্যায় শায়িত অসাড়-অচৈতন্য অপরিচিতা-মহিলাটিকে বেশ ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখে বাইরে বেরিয়ে এসে গড্‌ফ্রের সামনে দাঁড়িয়ে ডাঃ কিথল দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে হতাশ-কণ্ঠে জবাব দিলেন,—কোনো আশাই নেই!···সব শেষ হয়ে গেছে!···হিমে ঠাণ্ডায় বরফে জমে নিতান্তই বেঘোরে মেয়েটি প্রাণ হারিয়েছে বহুক্ষণ আগেই!··· লোকজন ডেকে কবর দেবার ব্যবস্থা ছাড়া এখন আর কিছু করবার নেই আমাদের!···

ডাঃ কিথলের জবাব শুনে গড্‌ফ্রে কিছুক্ষণ পাথরের মূর্ত্তির মতো স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলো···তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে উদ্বেগাকুল-কণ্ঠে প্রশ্ন করলো,—মেয়েটি কে···চিনতে পারলেন?···

ডাক্তিলোর ভঙ্গীতে ডাঃ কিথল জবাব দিলেন,—আমাদের গ্রামের কেউ নয়·· হয়তো কোনো ভিখারী—দুঃখী-গরীবের ঘরের বৌ-ঝি! পুরোনো ছেঁড়া শত তালি দেওয়া পোষাক পরিচ্ছদের নমুনা দেখে তো তাই ঠাওর হয়!···তবে, পথের ভিখারী হলেও, মেয়েটির হাতের আঙুলে দেখলুম বেশ সুন্দর একটি বিয়ের আংটি পরানো রয়েছে! ···কে জানে—ঐ আংটির রহস্য কি!···যাই হোক, বাইরে এই কনকনে ঠাণ্ডায় আর মিছে কষ্টভোগ করে লাভ নেই·· চলো এবার চটপট বাড়ি ফেরা যাক, আদরে সবাই আমাদের ফেরবার আশায় আকুল হয়ে রয়েছেন! তাছাড়া অজানা-অচেনা দুঃখী-গরীব সামান্য একটা পথের ভিখারী-মেয়ে···পথে পড়ে বেঘোরেই প্রাণ হারিয়েছে—এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে—কাজেই এ নিয়ে এমন কাতর হলে কি চলে!—এ সব বাজে ভাবনা রেখে, বরং এসো—আপাততঃ ফেরা যাক্ আমাদের আদরে—নাচ-গান, হৈ-হল্লা ফুর্ত্তিতে মশগুল হয়ে বাকী রাতটুকু দিব্যি মজাসে জমজমাট করে তুলে মনের আনন্দে নতুন বছরকে আরেক দফা বন্দনা জানানো যাবে'খন।— তারপর কাল সকালে লোকজন ডেকে ঐ ভিখারী-মেয়েটিকে যথানিয়মে কবর দেবার ব্যবস্থা করলেই চলবে!

কথাটা শেষ করেই গ্রামের মাতব্বর ক্র্যাকেন্‌ট্রপকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ কিথল ফিরে চললেন নববর্ষের আনন্দোৎসব-মুখর গ্রামের জমীদার-বাড়ির দিকে। গড্‌ফ্রেও স্তব্ধভাবে এগুলো তাঁদের পিছু-পিছু। সঙ্গীদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবার পথে গড্‌ফ্রে কৌতূহলভরে সাইলাসের কুটিরের উন্মুক্ত-দরজার ফাঁকে উঁকিদিয়ে দেখলো—ডলি উইন্‌থ্রপ সযত্নে শয্যায় শায়িত মলির মাথাটিকে বালিশের উপর শুইয়ে রেখে শুভ্র-চাদরের আবরণে তার প্রাণহীন দেহটিকে ঢেকে দিচ্ছে এবং ঘরের আরেক কোণে জ্বলন্ত আগুনের চুল্লীর সামনে মা-হারা কিশু-কন্যাকে কোলে বসিয়ে সাইলাস তাকে সাদরে একবাটি পরিজ খাওয়াতে সুরু করেছে। এ দৃশ্য দেখে গড্‌ফ্রের মন দুঃখে-অনুতাপে মমতা মায়ায় দুলে উঠলো···সে ছুটে এসে হাজির হলো সাই-লাসের ঘরে···সাইলাস্‌কে শুধোলো,—ছোট্ট এই মেয়েটিকে কাল গীর্জ্জায় নিয়ে যাবে তো?···

গড্‌ফ্রের প্রশ্ন শুনে সাইলাস্ যেন ক্ষেপে উঠলো। তীব্র-দৃষ্টিতে গড্‌ফ্রের পানে তাকিয়ে বিরক্তি ভরে সে বললে,—কেন?···তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?···

সাইলাসের রুক্ষ ভাব দেখে গড্‌ফ্রে অপ্রতিভ হয়ে বললে,—না, না···সে কথা বলছি না আমি!···তবে শুনেছি—গ্রামের লোকেরা বলে, তুমি নাকি ধর্ম্ম কর্ম্ম মানো না···সারাক্ষণ তাঁত-বোনার কাজ নিয়েই মেতে থাকো নিজের এই নিরালা ঘরে! তাছাড়া বে-থাও করোনি···একা একাই জীবন কাটে তোমার!···কাজেই মা হারা ঐ একরত্তি বাচ্চাটাকে তুমি কি মানুষ করে তুলতে পারবে?

কথাটা শুনে সাইলাস্ ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবলো···তারপর সহসা সদ্য মা-হারা সেই অসহায় শিশু-কন্যাকে সযত্নে বুকে তুলে নিয়ে সদীপ্ত-দৃষ্টিতে গড্‌ফ্রের পানে তাকিয়ে সে জবাব দিলে,—নিয়তির বিচিত্র-লীলায়

নিজের হাতে ছাড়িয়ে এই দুধের বাছা আমার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে···আমিই একে দেখাশুনো করবো···মানুষ করে তুলবো! সম্ভবতঃ, মা ছাড়া অভাগা এই শিশুর বাবা কিম্বা আত্মীয়স্বজন কারো কোনো হদিশ নেই!··· কাজেই যতদিন এই অনাথ-শিশুর কোনো আপন-জন এসে দাবী না জানায়, ততদিন একে আমার কাছেই রাখবো—আর কারো হাতে সঁপে দেবো না!···বিশাল এই দুনিয়াতে আমিও যেমন একলা···এ শিশু বেচারীও ঠিক তাই!·· দুজনেরই কেউ নেই কোথাও!···

সাইলাসের কথায় অনুশোচনায়-লজ্জায় গডফ্রের দু'চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠলো! মনে-মনে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো···ক্ষণিক-দুর্বলতার মোহে মত্ত হয়ে একবা সে যা অন্যায়-অপরাধ করেছে, তার পরিণামেই নিষ্পাপ-সুন্দর এই অসহায় শিশুকে—গডফ্রের নিজের সন্তানকেই আজ এমন মর্মান্তিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে!···বাপ হয়ে আপন-সন্তানের দুর্ভোগ-বহরটার এই লোচনীয় দৃশ্য চোখে দেখা যায় না···অথচ, আসল-পরিচয় প্রকাশ করে দুধের বাছাকে যে আবার সযত্নে কোলে তুলে নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, কুৎসা-অপবাদ-লোকনিন্দার ভয়ে সে সৎ-সাহসটুকু দেখাবারও সাধ্য নেই বনেদী জমিদার-পুত্র-গডফ্রের! কাজেই মনের ভাব মনেই চেপে রেখে শুধু একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে,—আহা, বেচারা!···কী পোড়া-বরাত নিয়েই যে দুনিয়াতে এসেছে!·· বাঁচার মতো বাঁচবার সুযোগটুকুও···

আবেগে-অশ্রুতে গডফ্রের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো··· কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে জামার পকেট থেকে একটা সোনার মোহর বার করে সাইলাসের হাতে গুঁজে দিয়ে বললে,—এটা রাখো!···পোষাক-আশাক কিনে দিও···শীতে বড্ড কষ্ট পাচ্ছে বেচারী!···

এই বলেই গডফ্রে আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ালো না···সাইলাসের কুটির ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এলো পথে··· তার সঙ্গী ডাঃ কিসল আর ক্র্যাকেন্‌ট্রপের কাছে!···

[ক্রমশঃ

চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের আরেকটি আজব মজাদার বিজ্ঞানের খেলার কিছু দেখানোর কায়দা কৌশলের পরিচয় দিচ্ছি। অভিনব বিচিত্র এই খেলাটির নাম—'রঙবেরঙের ঘূর্ণী-চাকা'। এ খেলার সহজ সরল কায়দা-কৌশল রপ্ত করে, ছুটির দিনে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের আসরে ঠিক-মতো দেখাতে পারলে, সবাইকেই রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে। তবে আজব-মজার এই বিজ্ঞানের কারসাজি দেখানোর জন্য, তোমাদের অবশ্য গোড়াতেই বিশেষ ধরণের কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে নিতে হবে। বলা বাহুল্য, এ সব সাজ-সরঞ্জাম তোমরা বিনা খরচেই বাড়ীতে বসে নিজেদের হাতে টুকিটাকি কয়েকটি ঘরোয়া সামগ্রীর সাহায্যে অনায়াসেই বানিয়ে নিতে পারবে।

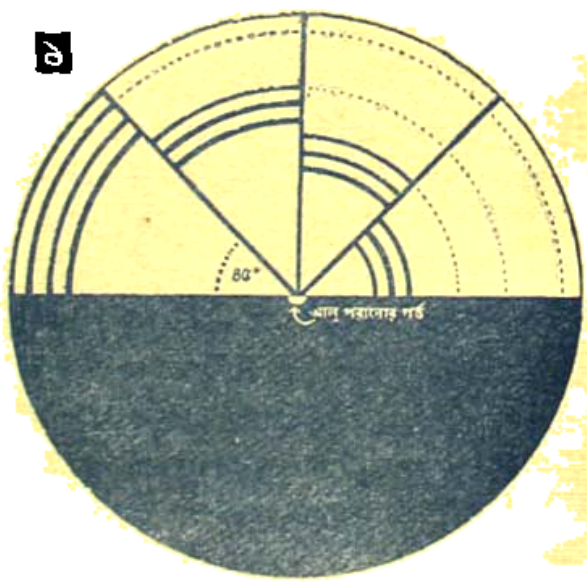

আপাততঃ শোনো—কি উপায়ে এই আজব মজার খেলা দেখানোর সাজ-সরঞ্জাম···অর্থাৎ, 'রঙবেরঙের ঘূর্ণী-চাকা' রচনা করতে হবে, তারই কলা-কৌশলের কথা।

প্রথমেই, বেশ মজবুত, মোটা এবং বড় সাইজের এক-খানি সাদা রঙের কার্ডবোর্ডে নিখুঁত পরিপাটি ছাঁদে ২০৬ পৃঃ ১নং ছবিতে দেখানো নমুনা অনুসারে অন্ততঃ ৪" ইঞ্চি ব্যাস (Diameter) মাপে একটি 'বৃত্ত' (circle) এঁকে নাও। 'বৃত্তটি' এঁকে নেবার পর, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি ধরণে 'বৃত্তের' অর্দ্ধেক অংশ আগাগোড়া কালো-রঙ দিয়ে ভরাট করে তোলো এবং বাকী অর্দ্ধাংশকে সমান মাপে চার ভাগে ভাগ করে নিয়ে, প্রত্যেকটি ভাগে নিখুঁত পরিপাটিভাবে কালো-রঙের রেখা টেনে ১নং ছবির নির্দ্দেশমতো পাশাপাশি ও বিভিন্ন থাকে তিনটি 'বৃত্তাংশ' (Arcs) রচনা করো। এভাবে বিভিন্ন 'থাকে' সাজানো 'বৃত্তাংশ' রচনার সময় অবশ্য ১নং ছবিতে দেখানো 'বিন্দু চিহ্নিত' অংশগুলি (Dotted Lines) না আঁকলেও চলবে···ছবির 'বিন্দু-চিহ্নিত' অংশগুলি এঁকে দেখানো হয়েছে আসলে, তোমাদের বোঝবার ও হিসাবমতো বিভিন্ন 'থাকে' সাজিয়ে 'বৃত্তাংশে রেখা' রচনার সুবিধার জন্য। যাই হোক, এভাবে 'বৃত্তটিকে' সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে রঙে রেখায় এঁকে নেবার পর, কাঁচির সাহায্যে কার্ডবোর্ডখানিকে 'বৃত্তের' মাপ অনুসারে আগাগোড়া পরিপাটি ছাঁদে ছাঁটাই করে নাও।

এবারে সদ্য ছাঁটাই করা কার্ডবোর্ডের ঐ গোল চাকতির ঠিক মাঝখানে ছোট একটি 'গর্ত্ত' (Hole) রচনা করে, সেই গর্ত্তের ভিতরে সরু মজবুত একটি কাঠি বা পেরেক অথবা তারের লম্বা টুকরো প্রবেশ করিয়ে, সেটিকে বেশ পাকাপোক্তভাবে এঁটে জুড়ে রেখে দাও ঐ কার্ডবোর্ডের চাকতির সঙ্গে—সচরাচর ছোট ছেলেমেয়েদের খেলবার লাট্টু বা ঘূর্ণী চাকতিতে যেমন 'আল্' পরানো থাকে, অবিকল তেমনি ধরণে। এ কাজ সহজেই কিভাবে হাসিল করা যাবে, পাশের ২নং ছবিতে তলার দিকে দেখানো 'ঘূর্ণী-চাকতির' নক্সাটি দেখলেই তোমরা আরো সুস্পষ্ট বুঝতে পারবে।

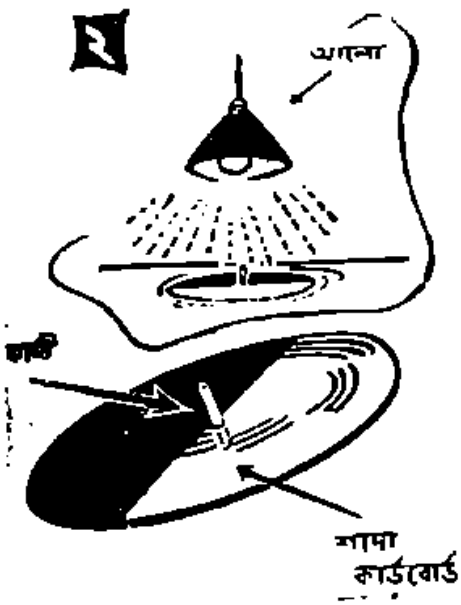

এমনিভাবে গোড়াতেই, দর্শকদের অলক্ষ্যতে 'ঘূর্ণী-চাকতি' বানানোর কাজটুকু শেষ করে, আসরে আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে খেলার কসরৎ দেখাতে হবে। দর্শকদের আসরে খেলা দেখানোর সময়, পাশের ২নং ছবির নীচের ভাগে যেমন নমুনা দেওয়া রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে ঘরের ছাদ থেকে ঝুলন্ত একটি বিজলী বাতির নীচে টেবিল সাজিয়ে রেখে, সজোরে কয়েক পাক্ দিয়ে লাট্টুর মতো বন্-বন্ করে ঘুরিয়ে দাও কাঠির-আল্-পরানো কার্ডবোর্ডের তৈরী ঐ 'ঘূর্ণী-চাকতিকে'! তাহ'লেই বিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যময় বিধিনিয়মানুসারে, সকলেই সবিস্ময়ে দেখতে পাবেন যে সাদা রঙের কার্ডবোর্ডের বুকে কালো রঙের ছোপ আর রেখার আঁচড় টেনে রচিত আজব ছাঁদের 'ঘূর্ণী-চাকার' গায়ে রঙবেরঙের যাদু-আভা ফুটে উঠেছে!

এই হলো—'রঙবেরঙের ঘূর্ণী-চাকা' খেলাটির অভিনব মজার কসরৎ।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি নতুন খেলার মজার কলা-কৌশলের পরিচয় দেবার ইচ্ছা রইলো।

মনোহর মৈত্র

ত্রিভুজের হেঁয়ালী ঃ

২০৮ পৃঃ ছবিতে যে ত্রিভুজটি দেখছ, ঠিক তেমনি, ছাঁদে, কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে সমান-মাপের ২-টি ত্রিভুজ

বানিয়ে ফেলো। এবারে ঐ ২-টি ত্রিভুজের টুকরোকে

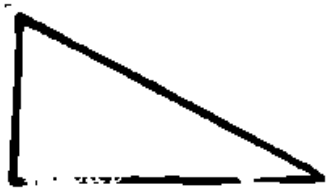

মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে এমন কায়দায় পাশাপাশি এবং উপরে-নীচে সাজিয়ে বসাও যে সেগুলি এভাবে জড়ো করে রাখার ফলে, দিব্যি নিখুঁত পরিপাটি ধরণের একটি 'চতুষ্কোণ' (a complete square) রচিত হয়ে যায়। যদি এ কাজটি তোমরা সহজেই হাসিল করতে পারো, তাহলে তোমাদের রচিত সেই সঠিক উপায়টির অবিকল-নক্সা অবিলম্বে আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিও। এ হেঁয়ালির সঠিক-সমাধান করতে পারলে, আগামী সংখ্যায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে সবাইকে জানিয়ে দেবো, সেই সব কৃশলী কিশোর কিশোরীদের নাম-ধাম-পরিচয়।

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২। পাঁচ বর্ণের শব্দ এক···সম্পদ বিশেষ,
দুই ভাগে করি ভাগ—করো তো নির্ণয়!
প্রথম অংশকে লোকে কিরীট-ই কয়,
দ্বিতীয় অংশকে ভাই, পুরী বলা হয়।
রচনা : বিজনকুমার ঘোষ (জগৎবল্লভপুর)।

৩। শির কেটে দিয়ে দেখ,
শির তবু রয়···
শেষাক্ষর হরে নিলে,
কাঁচ-পাত্র হয়।
রচনা : শ্যামাপ্রসাদ দাস (কয়াপাট)।

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর :

১। নীচের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি

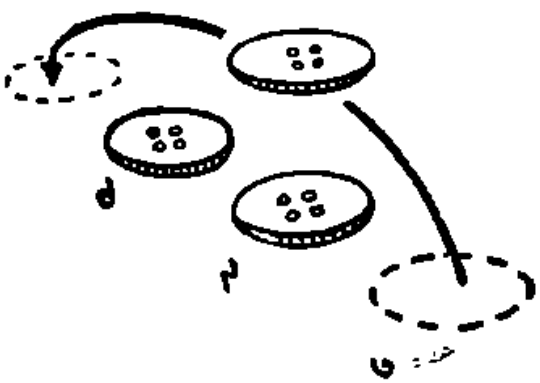

ভাবে ৩নং পয়সাটিকে সরিয়ে ১নং পয়সার আগে বসিয়ে দিলেই, এ হেঁয়ালির সঠিক সমাধান করতে পারবে।

২। ধ্রুব।

৩। ছায়াপথ।

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

কুসু মিত্র (কলিকাতা), নন্দা, চিত্রিতা, ফুলকুল, মিনতি, পার্থ, কল্যাণ, শিবাজী ও বাপ্পা রায় (গড়িয়া), শ্যামাদাস, ঋণী ও ঋষি দেবশর্মা (উত্তরপাড়া), বিজয়া ও সৌরাংশুকান্ত আচার্য্য (কলিকাতা), সজীব, সুনীরা, পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), ঋিষি ও রবি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), বেবু, রীণা, মীনা, সুশান্ত ও সুকু বন্দ্যোপাধ্যায় (নিউ দিল্লী), ফণীন্দ্র ও রোচনা দাহা (কলিকাতা), নির্ঝর,পৃথ্বীশ,মনতোষ,নীলমণি ও আশুতোষ সান্যাল (বর্দ্ধমান), পুপু, টুটন ও রাজা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সত্যেন্দ্র, মুরারি, সঞ্জয় ও সুনীল (ভিলাই), রাণা ও বুনা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), অশোক, সুমিতা, বুতাম ও পিন্টু (বোম্বাই), বাপি চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), মীরা ও মীন (কাশ্মীর), মুনমুন, কুমকুম, সৈন্তক ঘোষ সন্তু, খুকু, মন্টি, গাব্বু, মন্টা, টুটু, বুটু, ও টুক সিংহ (মদনপুর), মিতা ও মলয় মজুমদার (আগডলা)।

গতমাসের ছুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), দেবকীনন্দন ও বিশ্বনাথ সিংহ (গয়া), শর্ম্মিষ্ঠা ও সত্যমিত্রা রায় (কলিকাতা), ইন্দ্র, কল্যাণ, শচীন, রজত, বিশ্বতোষ, বিমল, দেবেন, মিহিরলাল, সুধীশ ও বিমান (কলিকাতা), পিম্, রিম্, ইম্, টিক, গিম্ ও থিক্ (ইছাপুর), অমিয়, প্রশান্ত, অমৃত, রাণা, কৃষ্ণলাল, অনিল, সুনীত, ভিনকড়ি, পিন্টু, অজিত, হরিদাস ও অজয় (কলিকাতা), সুধাংশু ও অলকা মুখোপাধ্যায় (কাঁচড়াপাড়া), হিমাংশু, খুকী, হারাণচন্দ্র ও সীতাংশু (সন্তোষপুর), কবি, অবীশকুমার ও অমিতাভ (লক্ষ্ণৌ), লীলা ও পরিতোষ মিত্র (কলিকাতা), অলকা মজুমদার (ভদ্রপুর), সত্যশ্রী উকিল (বোলপুর), মমতা চক্রবর্ত্তী (ধুবড়ী), জোনাকী বাগ্‌চি (কলিকাতা)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

অজিত, বিকন, উমানাথ, অগবন্ধু, পরিমল, রঞ্জিত, সমীর, পশুপতি, হীরেন, নিতাই ও তারাপদ (পশ্চিম পুটিয়ারী), রীতা, গীতা, মিতা, গীতা, সুদেব, বুদেব ও বলদেব চৌধুরী (অরপুর), কুমার, ভাস্কর, সোম, সুরূপা, অসুরূপা, শতরূপা ও অপরূপা দেববর্ম্মা (কাশী), রণবীর ও বীপঙ্কর নিয়োগী (কলিকাতা), গৌতম ঘোষ (কলিকাতা),

নৈমিষারণ্য

স্বামী ভক্তিকুসুম শ্রমণ

নৈমিষারণ্য ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থ সমূহের অন্যতম ; ইহা উত্তর-প্রদেশের অন্তর্গত সীতাপুর জেলায় পুণ্যতোয়া স্বচ্ছ-সলিলা হিমপ্রধারা বরত্রোতা গোমতীর তীরে অবস্থিত। এই সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পুরাকালে শৌনকাদি ঋষিগণ স্বর্গলোক প্রাপ্তি কামনায় সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞক্ষেত্রে যদৃচ্ছাক্রমে সমুপস্থিত শ্রীসূতগোস্বামীকে তাঁহারা অতীব হৃষ্টচিত্তে প্রণতি সহযোগে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাকাররূপে বরণ করিলেন এই বিবরণটি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধেই দৃষ্ট হয় ;—যথা :—

ওঁ নৈমিষেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত ॥ ১ ॥
ত একদা তু মুনয়ঃ প্রাতর্হুতহুতাগ্নয়ঃ।
সৎকৃতং সূতমাসীনং পপ্রচ্ছুরিদমাদরাৎ ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল বদরিকাশ্রমে সম্যাপ্রাশে। দ্বিতীয় অধিবেশন স্থান গঙ্গাতীরে শুকর-তলে ; এই পরমার্থপদ ভূমিতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রায়োপবেশনরত মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে একসপ্তাহ-কাল শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন শ্রীসূতগোস্বামী যিনি সেই শ্রৌতবাণী নৈমিষারণ্যে ষষ্টিসহস্র ঋষির নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন। সুতরাং নৈমিষারণ্য ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন ক্ষেত্র।

ভাগবতধর্ম্ম নির্ম্মৎসর পরমহংসকুলের নিরন্তর অনু-শীলনীয় প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরমধর্ম্ম। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—কর্ম্মিগণের এই ত্রিবর্গের স্থানতো তথায় নাই-ই, মোক্ষ-কামী জ্ঞানিগণের মোক্ষাভিলাষও তথায় নিরস্ত হইয়াছে। প্রোজ্ঝিত-কৈতব শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীধরস্বামী লিখি-য়াছেন—"প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরূপী কৈতবমিতি"। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন :—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব।
তারমধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥

বারাণসী যেরূপ মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণের কেবলা-দ্বৈতবাদের স্থান বলিয়া একসময়ে প্রসিদ্ধ ছিল, তদ্রূপ নৈমিষারণ্য ছিল আস্তিক পরমহংস ত্রিদণ্ডিস্বামিগণের অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের স্থান। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ কাশী-বিদ্যালয় ও নৈমিষারণ্য বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। নৈমিষারণ্যের সেই লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার-কল্পে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই তীর্থে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখারূপে "শ্রীপরমহংস মঠ" স্থাপন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সমগ্রবিশ্বে প্রচার করিয়াছেন :

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ
গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ ॥

অর্থাৎ, শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রসমূহের (বেদান্তদর্শনের) প্রকৃত ভাষ্য মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমগ্র বেদার্থ দ্বারা সমর্থিত।

উক্ত শ্রীপরমহংস মঠ ব্যতীত নৈমিষারণ্যে নিম্নলিখিত স্থানসমূহ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য :—

১। ললিতাদেবীর মন্দির
২। চক্রতীর্থ
৩। শ্রীসূতগোস্বামীর গদী
৪। শ্রীব্যাসদেবের গদী
৫। গোমতী নদী
৬। দশাশ্বমেধ ঘাট
৭। পাণ্ডব কিল্লা
৮। হনুমান গড়ী
৯। স্বামী নারদানন্দের আশ্রম
১০। শ্রীনরসিংহ মন্দির তথা অহোবিল মঠ
১১। রামানুজ কোট।

প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 'নৈমিশ' শব্দের তথ্য লিখিয়াছেন :—

" 'নৈমিশ' শব্দের আকর-নির্ণয়ে বায়ুপুরাণ বলেন,—ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমি অর্থাৎ চক্রপরিধি যেদেশে কুণ্ঠিত হয়, সেই মুনিপূজিত পবিত্র তপোময় বন-ভূমিই 'নৈমিশ'। মানবের অক্ষজজ্ঞান যে স্থলে গমন করিয়া প্রাকৃত জ্ঞানসীমার অবধি লাভ করে, তৎসন্নিহিত অধোক্ষজের সেবাভূমিতে মনশ্চক্র বা প্রাকৃতজ্ঞান স্তব্ধ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনীয় বাস্তব-বেদ্য চিন্ময় ভূমির বিশিষ্ট ক্ষেত্রদর্শন-ভঙ্গ দেবপ্রেরিত সুদর্শনের নেমি যথায় কুণ্ঠিত, তাহাই 'নৈমিষ'। 'নৈমিষ'-শব্দে বকার গ্রহণ করিলে বরাহপুরাণ-লিখিত গৌরমুখ-ঋষির প্রতি ভগবানের বাক্য

নৈমিষারণ্য মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

আকর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। ভগবান নিমিষ-কালমধ্যে এই অরণ্যে দানব বধ নিহত করেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'নৈমিষারণ্য' হইয়াছে। বিজয়ধ্বজ বলেন, নিমিষ—ঋষিসেব্য ফল; নিমিষ নামক ঋষির তপোভূমি নৈমিষ; নেমি-শব্দে তিনশ বৃক্ষও বটে। তিনিশ-বৃক্ষ-পূর্ণ বনকেও নৈমিষারণ্য বলে। মানবের কামাদি শত্রুগণ দানব। ভক্তিবাসনা-বিশিষ্ট জনগণ যে-স্থলে হরিকথার কীর্ত্তন-শ্রবণাদিদ্বারা প্রাকৃত বিষয়ভোগ-বাসনা পরিহার করেন, সেই স্থলই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ক্ষেত্র 'নৈমিষারণ্য'। বীররাঘব 'নৈমিষ' পাঠে 'ভগবানের সান্নিধ্যবিশিষ্ট' অর্থ করিয়াছেন। অনিমিষ-শব্দে বিষ্ণু। বিষ্ণুর ঈক্ষণ, প্রাকৃত-চক্ষুর আবরণপাত্রের ন্যায় বাধাপ্রাপ্ত হয় না। বিষ্ণুক্ষেত্র অপ্রাকৃত, তথায় জীবের অবিদ্যা তদ্রূপবৈভব-বৈকুণ্ঠবস্তুকে আবরণ করিতে সমর্থ হয় না। বিজয়ধ্বজ বলেন,—যেখানে নৃসিংহদেবাদির আবাসস্থল, তাহাই অনিমেষ-ক্ষেত্র।"

বর্ত্তমান শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমূহের সভাপতি ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ নৈমিষারণ্যের মাহাত্ম্য সর্ব্বসাধারণের নিকটে দেদীপ্যমান রাখিবার নিমিত্ত এই পুণ্য তীর্থে শ্রীপরমহংস মঠে একটি সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ-সহ ১২৬৫ সালের ২৯শে অক্টোবর তথায় শুভ বিজয় করিয়া ঐ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন সভায় এক গবেষণাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়াছেন। উত্তর প্রদেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রাণ রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাস মহোদয় প্রস্তাবিত মন্দিরের শিলান্যাস করিয়াছেন। তৎকালে তিনি ভারতের পারমার্থিক রহস্যতার বিশেষভাবে উদ্ঘাটনপূর্ব্বক ভারতে এবং সমগ্র পৃথিবীতে বাস্তব সুখ শান্তি ও আনন্দ প্রদানে বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, আমাদের রাজ্য Secular state। Secular state বলিতে ধর্ম্মশূন্য-রাজ্য নহে। এ রাজ্যের সকল ধর্ম্মসমূহের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন-ই ইহার কার্য্য। কোনও ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া বাস্তব সত্যের প্রচারে সাহায্য দ্বারা দেশের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধন করাই রাষ্ট্রনায়কগণের কার্য্য হইবে।

তাসখণ্ড সম্মিলন শেষ—

গত ৪র্থ জানুয়ারী হইতে ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট শ্রীকোসিজিনের উদ্যোগে রাশিয়ার অন্তর্গত উচ্‌বেকিস্থানের প্রধান নগর তাসখণ্ডে ভারতের সহিত পাকিস্থানের বিরোধের মীমাংসার জন্য বৈঠক হইয়াছিল। শ্রীকোসিজিন সর্ব্বদা বিভিন্ন বৈঠকে উপস্থিত থাকিয়া আলোচনার সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী সদলে এবং পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সদলে আটদিন তাসখণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। সুখের কথা এই আলোচনার কাশ্মীর সমস্যার কথা তুলিতে দেওয়া হয় নাই।

এই আলোচনা-আলোচনা ব্যর্থ করিবার জন্য আমেরিকা ইংলাণ্ড, চীন প্রভৃতি দেশ যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। ১০ই জানুয়ারী বিকালে শ্রীকোসিজিনের সম্মুখে উভয় পক্ষ অর্থাৎ শাস্ত্রী ও আয়ুব খাঁ এক যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ঐ বিবৃতিতে বলা হইয়াছে দুই দেশের স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে আলোচনা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে উভয় দেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহারা মনে করেন ভারত ও পাকিস্থানের ৬০ কোটি লোকের কল্যাণের জন্য এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অত্যাবশ্যক।

এই আলোচনা অনুসারে শক্তিপ্রয়োগ না করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের বিবাদ মিটাইবার জন্য তাঁরা দায়িত্ববদ্ধ। উত্তেজনা বজায় রাখা উভয় দেশের স্বার্থের পরিপন্থি। উভয় রাষ্ট্রনেতা একমত হয়েছেন যে, দুই দেশের সমস্ত সশস্ত্র ব্যক্তিদের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নিজ নিজ দেশে সরিয়ে আনা হবে ও গত ৫ই আগষ্ট সৈন্যরা যেখানে ছিল সেখানে চলে আসবে।

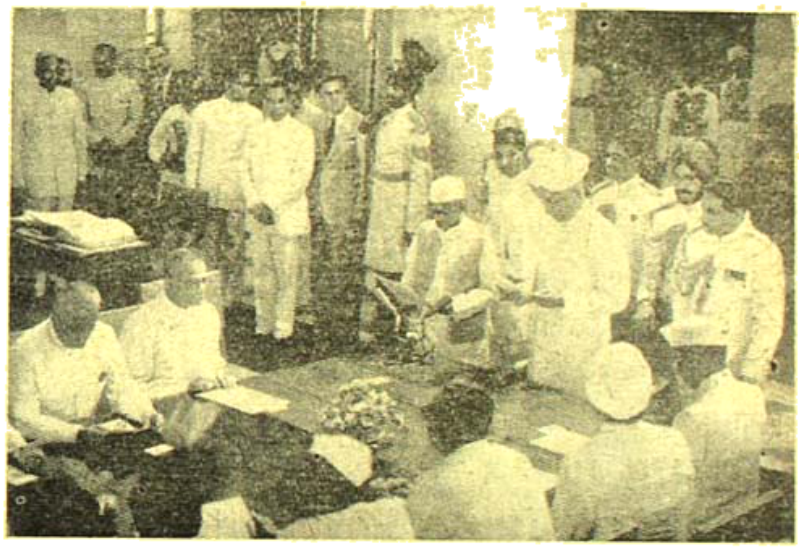

গত বৎসর ৯ই জুন তারিখে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। চিত্রে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণ কর্তৃক শ্রীশাস্ত্রীকে শপথ গ্রহণ করানোর দৃশ্য দেখা যাইতেছে।

ভারত ও পাকিস্থান কেহ অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে প্রচারে উৎসাহ দেবে না ও যাতে দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন হয় এমন কাজ করবে। ভারত ও পাকিস্থানের নিজ নিজ দেশের হাইকমিশনার যথাস্থানে ফিরে যাবে এবং কূটনৈতিক মিশন-

গত ৫২সর শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন রাশিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন জনগণের দ্বারা তাঁর অভিনন্দিত হইবার একটি দৃশ্য।

গুলি স্বাভাবিক কাজ করবে। এ সম্পর্কে ১৯৬১ সালে ভিয়েনায় যে চুক্তি হয়েছিল তাঁরা তা মেনে চলবেন।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক, যোগাযোগ, পুনঃপ্রবর্তন, সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রভৃতি বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি আছে তাঁরা সেগুলি কার্যে পরিণত করবেন। উভয় দেশ বন্দী বিনিময়ের নির্দেশ দেবেন, উদ্বাস্তু বে-আইনি প্রবেশ প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন এবং উভয় পক্ষ এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে বাস্তুত্যাগ নিবারিত হয়। আটক সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিষয়ে উভয় পক্ষে আলোচনা হবে।

বিভিন্ন যুক্ত ভারতীয় পাকিস্থানী সংস্থা গড়ে তুলে তাঁরা ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির করবেন।

হালখণ্ড বৈঠকে উভয় পক্ষের সন্তোষজনক ফল হওয়ায় এই বৈঠক আয়োজনের জন্য উভয়ে সোভিয়েট সরকারের প্রশংসা করেন ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। উজবেকিস্থানে তাঁরা সকলের কাছে যে আদর ও অভ্যর্থনা লাভ করেছেন তার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ১০ই জানুয়ারী বিবৃতিতে শাস্ত্রী ও আয়ুব খাঁ স্বাক্ষর করেছেন। বিকালে তাসখণ্ডের সময় এই বিবৃতি স্বাক্ষরিত হয়।

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে গত ১৮ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া যে বিরোধী মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে তাসখণ্ড বৈঠকে তাহার পূর্ণ সমাধান না হইলেও আলোচনার যে পথ প্রস্তুত হয় সকলেই তাতে আনন্দিত হইয়াছেন।

রাশিয়ার নেতা শ্রীকোসিজিনের চেষ্টায় এই আলোচনা সম্ভব হওয়ায় সারা বিশ্বের মানুষ তাঁর কাছে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ—

বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ ইংলণ্ডের এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টর অব ল উপাধি লাভ করিয়াছেন। বিশেষ পণ্ডিত ভিন্ন কেহ এই উপাধি লাভ করেন না।

রেশন কমিবে না—

কিছুদিন হইতে গুজব রটিয়াছিল যে, সপ্তাহে যে পরিমাণ চাউল ও গমজাতীয় জিনিষ দেওয়া হয় সরকার তাহা কমাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে যে পরিমাণ রেশন দিতেছেন তাহা আর কমান হইবে না। জনসাধারণ এই সংবাদে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন।

দুর্নীতির দায়ে সরকারী কর্মচারী—

৯ই জানুয়ারী দিল্লীর খবরে প্রকাশ দুর্নীতির অভিযোগে গত নভেম্বর মাসে ১৩৬জন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২১জন গেজেটেড অফিসার এবং ১১৫জন অন্যান্য কর্মচারী। বহু ডাক্তার ও কারখানার নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী এই দলে আছেন।

জাপানী সহযোগিতায় ধানকল—

গত ২৪শে ডিসেম্বর বর্দ্ধমান জেলার মেমারীতে জাপানের সহযোগিতায় ও সরকারী উদ্যোগে প্রথম এই একটি ধানকল খোলা হইয়াছে। এই ধানকল নির্মাণ করিতে ১৫ বিঘা জমির উপর ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। জাপানের কনসাল জেনারেল মেমারীতে যাইয়া কলের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বের সর্ব্ববৃহৎ গণতন্ত্রি দেশের
প্রথম মহিলা প্রধান মন্ত্রী
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

বিমান দুর্ঘটনায় নিহত বিশ্ব-বিখ্যাত ভারতীয়
পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ ভাবা

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের রাজদূত শ্রীচেষ্টার বাওলেস্ প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন সহ যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ লিপি প্রদান করিতেছেন।

তালখন্দ থেকে পালাম বিমান বন্দরে আগত পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর শবাধার বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধানরা ও অন্যান্য অফিসররা।

পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর মরদেহের পার্শ্বে ক্রন্দনরতা শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু।

কানাডা হইতে খাদ্যশস্য—

গত ৩০শে ডিসেম্বর কানাডার প্রধানমন্ত্রী শ্রীপিয়ার্সন জানাইয়াছেন কানাডা ভারতবর্ষকে ৭৯০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য সরবরাহ করিবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে এই খাদ্য পাঠান হইবে। গুঁড়া দুধ, রান্নার তেল প্রভৃতিও আসিবে।

ভারতের সাহায্যে বৃটিশ ঋণ—

বৃটিশ সরকার বিনা সুদে ভারতকে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ দেবেন। গত ২০এ ডিসেম্বর দিল্লীতে এ সম্বন্ধে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এদেশের ব্যাতু ব্যবহারকারী শিল্প সমূহের উন্নয়নের জন্য এই ঋণ পাওয়া যাবে।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের দান—

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ভারতের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এবং কলিকাতা মেট্রোপলিটন যোজনা সংস্থার গবেষণার সাহায্যে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। রাজস্থানের পিলানি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গুজরাটের বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ সাহায্য পাইবে।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ২রা জানুয়ারী হুগলী জেলার রিষড়ায় তাঁর পুত্রের বাড়ীতে ৯৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সারাজীবন ঢাকায় কংগ্রেস আন্দোলন করিতেন। দেশ-বিভাগের পরও দীর্ঘকাল তিনি ঢাকায় ছিলেন।

ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী বদল—

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ছয় জন অর্থমন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন (১) সন্মুখম্ চেটি, (২) জন মাথাই, (৩) সি, ডি, দেশমুখ, (৪) টি, টি, কৃষ্ণমাচারি, (৫) মোরারজি দেশাই। (৬) কৃষ্ণমাচারি (২য় বার) (৭) শ্রীশচীন্দ্র চৌধুরী কয়দিন থাকেন দেখা যাক।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—

গত ৩১শে জানুয়ারী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সভা পতিত্ব করেন। উপাচার্য্য ডঃ ত্রিগুণা সেন স্নাতকদের আশীর্ব্বাদ করেন এবং যোজনা কমিশনের শ্রীঅশোক মেটা ভাষণ দেন। ৭১টি পদক ও ১৫ জনকে ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হয়। টেলি-কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছেন।

লেঃ জেনারেল কুলবন্ত সিং—

ভারতের এককালীন সৈন্যাধ্যক্ষ কুলবন্ত সিং গত ২রা জানুয়ারী ৬০ বৎসর বয়সে নয়াদিল্লীতে হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুবৎসর জম্মু ও কাশ্মীরের সেনাবাহিনীর নেতা ছিলেন। ১৯৪৮ সাল হইতে তাঁহাকে সেনাপতি করা হইয়াছিল।

অর্থ বিভাগের নূতন রাষ্ট্রমন্ত্রী—

শ্রী সি, এম পুনাচা গত ২রা জানুয়ারী অর্থদপ্তরে রাজস্ব ও ব্যয় বিভাগের নূতন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বহু দিন পার্লামেন্টের সদস্য আছেন।

নূতন এক টাকার নোট—

১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ভারতের বাজারে নূতন এক টাকার নোট ছাড়া হইয়াছে। নূতন নোট পুরাতন নোট অপেক্ষা আকারে সামান্য ছোট হইবে। নূতন নোটে অর্থ বিভাগের সচিব শ্রী এস, ভূতলিঙ্গমের স্বাক্ষর থাকিবে। পুরাতন একটাকার নোটও চালু থাকিবে।

বিমল রায়—

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক বিমল রায় ৮ই জানুয়ারী ভোর ৪টার সময় বোম্বাইয়ের সহরতলী বান্দ্রায় তাঁর বাসভবনে ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, তিন কন্যা ও এক পুত্র বর্ত্তমান। বিমল রায় তাঁহার চিত্র সমূহের জন্য মস্কো, চেকোশ্লোভাকিয়া ও অন্যান্য দেশ হইতে আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ফিল্ম ল্যাণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার সহ-সভাপতি এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির সভাপতি ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের পর তিনি নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করেন ও প্রমথেশ বড়ুয়ার দেবদাস চিত্রে আলোক শিল্পী হন। তাঁহার বিখ্যাত উদয়ের পথে চিত্র এখনও সর্ব্বত্র সুখ্যাতি লাভ করে। তাঁহার দো বিঘা জমিন, মা সুজাতা প্রভৃতি দর্শকদের বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

কাপড়ের কল সমস্যা—

পশ্চিম বাংলার কাপড়ের কলগুলি বর্ত্তমানে তীব্র

বিপদের মধ্যে পড়িয়াছে। সকল কলেই অতিরিক্ত কাপড়ের গাঁট স্তূপীকৃত। কয়েকটি মিলের কর্মীরা কর্মহীন। সোদপুরের একটি কটন মিল কয়েক সপ্তাহ বন্ধ হইয়া আছে। কাপড়ের রপ্তানী কমিয়া যাওয়ায় এবং Bank-এর ঋণদান ব্যবস্থা সঙ্কুচিত হওয়ায় গত নভেম্বর মাসে পশ্চিমবাংলায় ১১টি কাপড়ের কলে ১২০৮৯ কোটি গাঁট কাপড় জমিয়াছিল। সোদপুরে যে মিলটি বন্ধ হইয়াছে তাহার ২২৫জন কর্মী বেকার বসিয়া আছে। অন্য দুইটি মিলের ৩০০জনের উপর কর্মীর নোটিশ দেওয়া হইয়াছে ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে বাংলাদেশের ভীষণ ক্ষতি হইবে।

ডাঃ এন, ডি, গ্যাডগিল

পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ এন, ডি, গ্যাডগিল গত ১২ই জানুয়ারী রাত্রি ১টার সময় ৭০ বৎসর বয়সে হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা, পাঞ্জাবের প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রের প্রাক্তন মন্ত্রী নরহরি বিষ্ণু গ্যাডগিল ১৮৯৬ সালে রাজস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পুণায় উকীল ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৭ হইতে ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত তিনি দিল্লীতে পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৮ হইতে ১৯৬২ পর্য্যন্ত তিনি পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ছিলেন। পুণায় ফিরিয়া তিনি পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের কাজ করিতে ছিলেন। শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর পরদিন পরলোক গমন করায় তাঁহার মৃত্যুর কথা অধিক আলোচিত হয় নাই।

নূতন অর্থসচিব—

পশ্চিমবাংলার সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও ব্যবসায়ী শ্রীশচীন্দ্র চৌধুরী কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন অর্থসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীটি. টি. কৃষ্ণমাচারি পদত্যাগ করায় ঐ পদ খালি হইয়াছিল। বহু বৎসর পরে বাংলার একজন M. P. অর্থসচিব নিযুক্ত হওয়ায় বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইয়াছে, চৌধুরীমহাশয়ের বাড়ী হুগলী জেলার জনাইয়ের নিকটস্থ বাকুলা গ্রামে। তাঁহার পিতা প্রবোধ চৌধুরী মহাশয় নিজ অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্ম্ম কুশলতার দ্বারা ভারতবিখ্যাত কোম্পানির প্রধান পরিচালক হইয়াছিলেন। এই চৌধুরী পরিবার নানা কারণে বাংলাদেশে সুপরিচিত। তাঁহাদের দান, সহাশয়তা, ও মধুর ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করে। বর্ত্তমানে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন, উদ্বাস্তু মন্ত্রী শ্রী এস. কে. দে, রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপূর্ণেন্দু নস্কর ও ডাঃ মনোমোহন দাস কাজ করিতেছেন। আমরা শ্রীচৌধুরীকে অভিনন্দিত করি এবং আশা করি তিনি বাংলার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবেন। অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার সমস্যার সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

পি, এস, নটরাজ পিল্লাই—

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবীণ নেতা লোকসভার কংগ্রেসী সদস্য পি, এস, নটরাজ পিল্লাই ১৩ই জানুয়ারী রাত্রিতে ত্রিবান্দ্রমে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এক সময় ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬২ সালে নির্দ্দলীয় সদস্যরূপে লোক সভায় নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিয়া ছিলেন।

পাঞ্চেন লামার দুর্গতি—

চীন কর্ত্তৃক তিব্বত অধিকারের পর তিব্বতের প্রধান ধর্ম্মগুরু দালাই লামা ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। অপর ধর্ম্মগুরু পাঞ্চেন লামাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া চীনারা আটকাইয়া রাখিয়াছিল। সম্প্রতি দিল্লীতে খবর আসিয়াছে চীনারা পাঞ্চেন লামার উপর নানারূপ অত্যাচার করিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম গুরুরা বিবাহ করেন না চীনারা জোর করিয়া একটি চীনা মেয়ের সহিত পাঞ্চেন লামার বিবাহ দিয়াছে, তিনি প্রথমে বিবাহ করিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহাকে কিছুকাল জেলে আটক রাখিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করে। জাতিসঙ্ঘে পাঞ্চেন লামা বিষয়টি জানাইয়াও কোন প্রতিকার পান নাই।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ (২১)

সূর্য্য হইতে ভিন্ন সে নয় সূর্য্যদেবতা নয়
সূর্য্য তাঁহারে জানেনা তবু সে সূর্য্য শরীরে রয়
সূর্য্যের মাঝে নিয়ন্তা হয়ে
অমৃত রূপেতে যায় সেই বয়ে
তোমার আমার শরীর মধ্যে অভেদ তিনিই হন
অন্তরযামী অন্তর মাঝে অমৃত ধরে রন।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ (২২)

আকাশ অর্থে ব্রহ্মে বুঝায় লক্ষণ দেখো তার
এই জগতের আশ্রয় তিনি তিনিই সবার সার
আকাশ হইতে উদয় তাঁহার
আকাশে অস্ত হয় তাই তাঁর
আকাশ সমান বিরাট বৃহৎ আকাশ পরম গতি
এখানে আকাশ ব্রহ্মে বুঝায় জীবের যেমন পতি।
তাইত শ্রুতিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আকাশেরে বলিয়াছে
অনন্ত রূপে ব্রহ্ম স্বরূপে এখানে বর্ণিয়াছে
সূর্য্যের মত হইয়া প্রকাশ
সবাকারে যেই করেন প্রকাশ
সেই ব্রহ্মই আকাশের সাথে সূর্য্যের মত রয়
তাঁহার জ্যোতিতে উজলি ভুবন হইল জ্যোতির্ময়।

অতএব প্রাণঃ (২৩)

সমস্ত জীব প্রাণেই বিলীন প্রাণ হতে তাহা হয়
অতএব প্রাণঃ বলিয়া এখানে ব্রহ্মের কথা কয়
প্রাণরূপে সেই রাজে
যাহার পরশে বাঁচে
প্রাণরূপে সেই সকল জীবেতে আপনি মূর্ত্ত হয়
আনন্দময় ব্রহ্ম সবেতে প্রাণরূপ হয়ে রয়।

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ (২৪)

জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ জানিও ব্রহ্মই তাহা হয়
চরণের আর অভিধান কথা উল্লেখ তাই রয়
স্বরূপ উপরে জ্যোতিরূপে রয়
প্রণীপ্ত হয়ে জ্যোতির্ময় হয়
এর চেয়ে বড় এর চেয়ে ছোট কোনখানে কিছু নাই
এই সেই জ্যোতি পরম পুরুষে প্রকাশি উজলি তাই।
এইখানে জ্যোতি সূর্য্য অগ্নি কখন জানিও নয়
চরণ বলিয়া ত্রিপাদে বুঝায় স্বর্গেতে যাহা রয়
বলেছে শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যদি এইভাবে পূজা কর
তবে হবে তুমি বিখ্যাত আর হবে সুন্দরতর
মোক্ষ লভিবে ব্রহ্মে জানিলে
হবে কিছু ভালো এভাবে পূজিলে।

ছন্দোঽভিধানান্ন ইতি চেৎ ন

তথা চেতোঽর্পণ নিগদাৎ তথাহি দর্শনং (২৫)

ছন্দের কথা হইয়াছে বলা জ্যোতিতে ব্রহ্ম নয়
ইতি চেৎ যদি ইহা বলা যায়, না বলিয়া পুনঃ কয়।
এরূপে চিত্ত সমাধান করো এই কথা বলিয়াছে,
তবু দর্শন বিশেষে তাহাতে অন্যত্র এরূপ আছে।

গায়ত্রী রূপে রয়
সব গায়ত্রীময়

গায়ত্রীরূপে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মের পূজা করো
সেই ব্রহ্মের মাঝেতে মনেরে সমাধান করি স্মরো
গায়ত্রীরূপে চারিপাদ আর অক্ষর হয় ছয়
ব্রহ্মেরও জেনো চারিপদ একে জগৎ সৃষ্ট হয়
বাকি তিনপদ স্বরগেতে রয় স্বরগ উজল করি
তাই ত হেথায় গায়ত্রীরূপে ব্রহ্মমনেরে স্মরি।

ভূতাদি পাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং (২৬)

ভূত প্রভৃতির উল্লেখ আছে পাদের বা ব্যাপদেশ
এতে বোঝা যায় গায়ত্রীশব্দ নহে ছন্দের লেশ
বুঝায় ব্রহ্ম ধনে
দেখো সেই অতুলনে

গায়ত্রী মানে প্রাণী প্রতিটিই পৃথিবীও সেই হয়
পুরুষের দেহে গায়ত্রী যেন পুরুষ হৃদয়ময়।
প্রাণীরা সকলে পৃথিবী ও দেহ হৃদয়ও সেইজন
গায়ত্রীর যেন চারিপাদ হতে অংশ ইহারা হন।
লক্ষ্য ব্রহ্মকেই
তিনি ছাড়া কিছু নেই।

উপদেশভেদাৎ ন ইতি চেৎ ন উভয়স্মিন্নপি
অবিরোধাৎ (২৭)

উপদেশ ভেদে যদি মনে কর হইতে পারে না তাহা
ধীর স্থির চিত্তে দেখহ বিচারি প্রভেদ নাহিক তাহা
ব্রহ্মেতে তিন ভাগ
স্বর্গেই তাহা থাক
স্থির শব্দের সপ্তমী দ্বারা বিভক্তি দেখা আছে
স্বরূপে থাকিয়া তবুও যেমন অবর্গ উপরে রাজে।

প্রাণভৃচ্চানুগমাৎ (২৮)

প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম অনুগমন করিয়াছে
কৌষীতকিকে ইন্দ্রও প্রতর্দ্দনকে তা বলিয়াছে
বলেন আমিই প্রাণ
আমি আনন্দঘন
অজর অমৃত প্রাণই চিরদিন এ প্রাণ ব্রহ্মময়
তাঁহারে গণিলে মৃত্যু বিনাশ নিমেষেতে পায় লয়।
কহেন ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বর নাও মোর কাছে
কহিলেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞানই আমার পরাণ যাচে
সবচেয়ে হিততম
পেতে আগ্রহ মম
যাহারে জানিলে মৃত্যু, বিনাশ দূরেতে সরিয়া রয়
ইহা ছাড়া আর মুক্তি লাভের উপায় নাহিক হয়।
এতে বোঝা যায় ইন্দ্র বলেন ব্রহ্মের কথা শুধু
অতুলন সেই ব্রহ্মলোকের আনন্দময় মধু।

ন বক্তুরাত্মোপদেশাৎ ইতি চেৎ
অধ্যাত্ম সম্বন্ধ ভূমা হি অস্মিন্ (২৯)

যদি মনে হয় প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম নয়
বক্তুরাত্মোপদেশাৎ বলে যদি হেথা তাহা কয়
যদি কেহ মনে করে
ভুল হল যেন পরে
ব্রহ্মের সাথে অধিক বরং এই যেন দেখা যায়
প্রত্যগাত্মা শব্দের অর্থ অধ্যাত্ম সর্ব্বব্যাপী সে কয়
তাইত ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলেন আমিই প্রাণ
আমি সে আত্মা প্রাণরূপে সব জীবেতে বিদ্যমান।
রথের চাকার নেমির মতন
মধ্যেতে রহে নাভি অরগণ
নেমিকে ধরিয়া অরগুলি রয় অর সে নেমিকে ধরে
সেইরূপ ভূতমাত্রাগুলিকে প্রজ্ঞা ধারণ করে
প্রজ্ঞারে প্রাণ ব্রহ্ম রূপেতে ধারণ আবার করে
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ও ব্যোম পঞ্চ ভূতেরে ধরে।
পাঁচটি বিষয় জ্ঞান
প্রজ্ঞার অবধান
পাঁচ ইন্দ্রিয় গুণজ্ঞান সব যার দ্বারা লাভ হয়
ব্রহ্মই সব জ্ঞানের আকর শঙ্কর এই কয়।

বাদ্যযন্ত্রের কথা

দেবশর্ম্মা বিরচিত

এ বাদ্য-যন্ত্রটি তোমরা আজকাল প্রায়ই দেখতে পাও··· এটি হলো — পাশ্চাত্য সৌখিন- সমাজে সঙ্গীত- কলারসিকদের বিশেষ- জনপ্রিয় সুর-সাধনার উপকরণ। এ বাদ্যযন্ত্রটির নাম — 'পিয়ানো'। এ বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে খুবই সুন্দর উপায়ে অপরূপ- বিচিত্র মনোরম- অভিনব সুর-লহরী সৃষ্টি করা যায়। ইউরোপের সঙ্গীত- জগতে এ বাদ্য- যন্ত্রটির বহুল- ব্যবহার বহুদিন থেকেই প্রচলিত।

●

ভেরী বা শিঙার মতো ছাঁদের এই যে বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রটি দেখছো — এটি হলো, আমাদের দেশের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের নাগা-রাজ্যের পার্ব্বত্য-অধিবাসীদের অভিনব এক- ধরণের বাঁশী- জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

●

পাট ও পীঠ

শ্রীশ্রী—

অবলম্বনে :

পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি হবে খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" উপন্যাস অবলম্বনে। পরিচালক-প্রযোজক হরিসাধন দাশগুপ্তর কাছে সংরক্ষিত এই উপন্যাসের চিত্রস্বত্ব সম্প্রতি প্রযোজক আর, ডি, বন্‌সল্ ক্রয় করেছেন বলে জানা গেছে।

• • •

প্রযোজক আর, ডি, বন্‌সলের পরবর্তী চিত্র হবে একটি বেশ্যা গল্প অবলম্বনে। চিত্রটির নাম হবে "নীরব সাক্ষী" এবং ছবিটি পরিচালনা করবেন অজয় কর। তীর্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সুবাস সেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন। চিত্রটির বহির্দৃশ্যের বেশীর ভাগই বোম্বাই-এ এবং তার আশেপাশে গৃহীত হবে।

• • •

বি-এন-প্রোডাকসন্স প্রযোজিত 'অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী' ছবিতে কমা গুহঠাকুরতাকে এবারে এক মহিলা কবিয়ালের ভূমিকায় দেখা যাবে। ছবির নায়ক-ভূমিকায় থাকবেন উত্তমকুমার। কমা অভিনয় করবেন মহিলা কবিয়াল অনেশ্বরীর চরিত্রে। আর অনিতবরণকে দেখা যাবে কবিয়াল ভোলা ময়রা রূপে।

একদা বাংলা দেশে কবির লড়াই খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পর্তুগীজ হরণ ছাড়া অ্যান্টনী এক তরুণীর উৎসাহেই এক বাঙালী কবিয়ালে রূপান্তরিত হন। তার পর তাঁর পরিচয় দাঁড়ায় অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী।

চন্দননগরের গোন্দলপাড়া এবং মুর্শিদাবাদে এই ছবির কয়েকটি বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে।

ছবির কয়েকখানি গান ইতিমধ্যে রেকর্ডিং হয়েছে অনিল বাগচীর সংগীত পরিচালনায়। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিত্রের পরিচালক।

• • •

সুরকার-প্রযোজক হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থ হিন্দী চিত্র হচ্ছে "বিবি অওর মকান"। শহরের গৃহ-সমস্যা এই ছবির মূল বিষয়বস্তু। ছবিটি পরিচালনা করছেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। গত সেপ্টেম্বরে ছবির স্যুটিং আরম্ভ হয়েছে। চিত্রটির প্রধান শিল্পীরা হলেন :— বিশ্বজিৎ, কল্পনা, শশধর, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, জগদেব, আশিসকুমার, মেহমুদ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরসংযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

• • •

মহালক্ষ্মী চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম নিবেদন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'-এর চিত্ররূপ দেবেন পরিচালক বীরেশ্বর বসু।

'বিসর্জন'-এর বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে রূপদান করবেন— অজিত চট্টোপাধ্যায় (গোবিন্দ মাণিক্য), কমল মিত্র (রঘুপতি), নবাগত আনন্দ মুখোপাধ্যায় (জয় সিংহ), দীপ্তি রায় (গুণবতী) ও শর্মিলা বিশ্বাস (অপর্ণা)। অন্যান্য চরিত্রে আছেন তরুণ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি।

সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন বিমেন চৌধুরী।

• • •

চিত্রলীপের "বাসিকা-বধূ" চিত্রের নায়িকাসহ ছয়টি বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী নতুন। "অতিথি"-খ্যাত পার্থ মুখোপাধ্যায় ছবির নায়ক। সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ছবির গান রেকর্ড করা হচ্ছে।

• • •

গায়ত্রী পিকচার্সের প্রথম প্রচেষ্টা "বসন্ত সেনা" চিত্রটির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এর কাহিনী রচিত হয়েছে শূদ্রক রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক "মৃচ্ছকটিক" অবলম্বনে। চিত্র-নাট্য লিখেছেন বিপ্রদাস ঠাকুর। ছবির বহির্দৃশ্য উজ্জয়িনীতে গ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় এই নাটক রাশিয়া ও

মুক্তি প্রতীক্ষিত আর, ডি, বংসলের
"কাঁচ কাটা হীরে" চিত্রে
লিলি চক্রবর্ত্তী

আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে অভিনীত হয়ে প্রশংসা লাভ করেছে।

• • •

ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর একটি কাহিনী অবলম্বনে এ-ভি-এম সংস্থা একটি হিন্দী ছবি করছেন। ছবিটির প্রধান কয়েকজন শিল্পী হচ্ছেন—কুমুদ ছাগানি, সুনীল, বলরাজ সাহনি, নিরুপা রায় ও মনোমোহন কৃষ্ণ। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারে-লাল সুরযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

• • •

মাধবী মুখোপাধ্যায় "ট্রায়ো ফিল্মসে"র-এর প্রথম ছবির প্রধান নারী চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন। বিশ্বজিৎকেও এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। সুরারোপের দায়িত্ব নিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ।

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে "ছোট্ট জিজ্ঞাসা"র নিয়মিত চিত্রগ্রহণ সুরু হবে বলে জানা গেছে।

• • •

দিলীপ নাগের পরিচালনায় "বধূ বরণ" ছবির শুটিং ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে শুরু হয়েছে। ডি, এম, প্রোডাকসনসের এই চিত্রের প্রণয়ী-প্রণয়িনীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন অসীম বিশ্বাস ('প্রথম প্রেম' ছবির পরিচালক) ও তাঁর স্ত্রী রাখী বিশ্বাস। দুজনেরই চলচ্চিত্রে অভিনয় এই প্রথম। ছবির অন্য তিনটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন অভী ভট্টাচার্য, প্রদীপকুমার, বিকাশ রায় প্রভৃতি। সুরকার কমল দাসগুপ্ত সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

• • •

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেদার রাজা' কাহিনীটিকে চলচ্চিত্রে রূপদানের আয়োজন করেছেন পরিচালক বলাই সেন। তপন সিংহের চিত্র-নাট্যের ভিত্তিতে গঠিত এর কেন্দ্র চরিত্রে অভিনয় করবেন রাধামোহন ভট্টাচার্য।

• • •

"শতদল" চিত্রের প্রথম বাংলা ছবিটির নামকরণ করা হয়েছে 'অভিনন্দন'। ভূপেন রায়ের পরিচালনায় বোম্বাইয়ে ছবিটি তোলা হবে এবং মুখ্য দুটি চরিত্রে অভিনয় করবেন বিশ্বজিৎ ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। নচিকেতা ঘোষ এই চিত্রের সুরকার।

• • •

লিলিয়ান্ রুথ-এর বহু পঠিত উপন্যাস "আই উইল ক্রাই টুমরো"র ভিত্তিতে প্রখ্যাত অভিনেত্রী ও, পি, গাঙ্গুলী রচিত একটি কাহিনীকে চলচ্চিত্রায়িত করার আয়োজন করেছেন ফ্রীন প্লে প্রোডাকসন্স। ও, পি, গাঙ্গুলী ছবিটি পরিচালনা করবেন। বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত তারকাকে এই চিত্রের প্রধান নারী চরিত্রে দেখা যাবে আশা করা যায়।

• • •

উত্তরপ্রদেশ ফিল্ম সোসাইটি বিমল রায়-কৃত কয়েকটি চলচ্চিত্র নিয়ে একটি উৎসবের আয়োজন করছেন। উৎসবে শ্রীরায়ের অন্যান্য ছবির সঙ্গে দেখানো হবে: "দো বিঘা জমীন," "দেবদাস" "বিরাজ-বৌ" ও "বন্দিনী"।

• • •

"জয় ভারতী ফিল্মস" নামে দিল্লীর একটি সংস্থা চলচ্চিত্র প্রযোজনায় ব্রতী হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রয়াস হচ্ছে "বিজয়" নামের একটি ছবি। ভারত-পাকিস্তানের বিরোধ এই হিন্দী ছবিটির বিষয়বস্তু। এর শুটিং কলকাতার ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গত জানুয়ারী মাসে সুরু হয়েছে। ছবির ছয় খানি গান কলকাতার টেক্‌নিশিয়ান্স ষ্টুডিওতে সম্প্রতি রেকর্ড করা হয়েছে।

ছবির কাহিনী-রচয়িতা বিখ্যাত সাংবাদিক এম, ডি, বাসড়িয়া। দিল্লির সুদর্শন রাবর ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রধান কয়েকটি চরিত্রে আছেন—রাজেন্দ্র কাপুর, বেণুকা, জওহর কনপুর, রাজেন্দ্র বরমা, বীরাজ। শ্রীকান্ত বাগড়িয়া ছবির প্রযোজক।

• • •

ভারত সরকার পুণায় জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভ্ বোর্ডের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন।

তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারীর নেতৃত্বে আট সদস্যযুক্ত এই কমিটিতে রয়েছেন: সর্বশ্রী জে, বি, এইচ ওয়াদিয়া; বি, ডি, গর্গ · জে, এন, সরকার; এইচ, ডি, বারাও; বি, এন, রেড্ডি এবং ফিল্ম ইনষ্টিট্যুট-এর অধ্যক্ষ, ফিল্ম ডিভিশনের প্রধান প্রযোজক ও আর্কাইভ্-এর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কিউরেটর।

• • •

জন্ হাস্টন্ পরিচালিত এবং অভিনীত "দি বাইবল্" চিত্রটি নিউ ইয়র্কের একটি বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করতে চলেছে। ক্রিস্টফার ক্রাই এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ৭০ মিলিমিটারে তোলা এই রঙিন চিত্রের প্রধান শিল্পীরা (হাস্টন্ ছাড়া) হলেন: পিটার ওটুল, জর্জ স্কট, আভা গার্ডনার, রিচার্ড হ্যারিস, ষ্টিফেন বয়েড, মাইকেল পার্কস প্রভৃতি।

১৯৬৩ এবং ১৯৬৪ এই দু-বছর সময় ধরে চারটি মহাদেশের নানা জায়গায় ছবিটির শুটিং হয়েছে। আর বলা বাহুল্য, সারা পৃথিবীর চিত্রামোদীরা এর মুক্তির অপেক্ষায়।

নিউ ইয়র্কের যে-প্রেক্ষাগৃহে ছবিটির প্রথম প্রদর্শনী হবে, তার নাম 'লোজ স্টেট'। প্রেক্ষাগৃহের কর্তৃপক্ষ ছবিটির পরিবেশক-সংস্থা টোয়েনটিয়েথ সেনচুরি ফক্সকে নগদ ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার (৬৪,১৮,৫৭১ টাকা) অগ্রিম দিয়েছেন। প্রেক্ষাগৃহের তরফ থেকে চিত্র-পরিবেশককে দেওয়া অগ্রিম টাকা হিসাবে এই অঙ্কটি একটি রেকর্ড।

• • •

লরেন্স ওলিভিয়ের-এর 'ওথেলো'র চিত্ররূপকে চলচ্চিত্র সমালোচকগণ একটি 'মাষ্টারপিস্' রূপে আখ্যাত করেছেন। ছবিটি শীঘ্রই মুক্তি পাবে।

• • •

প্রখ্যাত চিত্র তারকা
অনিল চ্যাটার্জি

লণ্ডনের সিনেমা ম্যানেজাররা ধর্মঘট করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। কারণ তাঁদের ওপর এই নির্দেশ এসেছে যে, রবিবারের 'শো' দু'ঘণ্টা আগে আরম্ভ করতে হবে। অর্থাৎ বেলা ৪—১৫ মিঃ এর বদলে ২-২৫ মিনিটে। সুতরাং ধর্মঘটের ঘোষণা।

ম্যানেজাররা বলেছেন, এই নতুন নির্দেশের ফলে অধস্তন কর্মচারীদের চেয়ে তাঁদের আয় কমে যাবে—কেননা ওই সব কর্মচারীকে বাড়তি কাজের জন্য প্রচুর বাড়তি টাকা দিতে হবে।

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ডেভিস কাপ লন্ টেনিস :

১৯৬২ সনের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়া ৪—১ খেলায় স্পেনকে পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি দুবার এবং মোট ২১ বার ডেভিস কাপ পেয়ে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্ব্বাধিকবার কাপ জয়ের রেকর্ড করেছে। অপরদিকে স্পেনের এই প্রথম ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা।

এই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনাল খেলার আয়োজন হয়েছিল অষ্ট্রেলিয়ার অন্যতম সহর সিডনির হোয়াইট সিটি কোর্টে। মোট পাঁচটি খেলার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হয় তিনটি সিঙ্গলস এবং ডাবলসের খেলায়। চারটি সিঙ্গলসের মধ্যে দুটি সিঙ্গলসে স্পেন জয়ী হয়।

প্রথমদিনের দুটি সিঙ্গলসে অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হয়ে ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় দিনের ডাবলসে জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়া ৩—০ খেলায় অগ্রগামী হয়ে ডেভিস কাপ পায়। খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায় তৃতীয় দিনের বাকি দুটি সিঙ্গলস্ খেলার গুরুত্ব কমে যায়। তৃতীয় দিনের প্রথম অর্থাৎ খেলার তৃতীয় সিঙ্গলসে স্পেন জয়ী হলে খেলার ফলাফল দাঁড়ায় ৩—১। অষ্ট্রেলিয়া শেষ সিঙ্গলসে জয়ী হয়ে ৪—১ খেলায় স্পেনকে পরাজিত করে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

সিঙ্গলস খেলা

ফ্রেড ষ্টোলে (অষ্ট্রেলিয়া) ১০—১২, ৩—৬, ৬—১, ৬—৪ ও ৭—৫ গেমে ম্যানুয়েল সান্তানাকে (স্পেন) পরাজিত করেন।

রয় এমার্সন (অষ্ট্রেলিয়া) ৬—৩, ৬—২ ও ৬—২ গেমে জুয়ান গিসবার্টকে (স্পেন) পরাজিত করেন।

ডাবলস খেলা

জন নিউকম্ব এবং টনি রোচি (অষ্ট্রেলিয়া) ৬—৩, ৪—৬, ৭—৫ ও ৬—২ গেমে ম্যানুয়েল সান্তানা এবং লুইস আরিলাকে (স্পেন) পরাজিত করেন।

সিঙ্গলস খেলা

১৯৬৪ সালের আমেরিকান সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান ম্যানুয়েল সান্তানা (স্পেন) ২—৬, ৬—৩, ৬—৪ ও ১৫—১৩ গেমে ১৯৬৪—৬৫ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান রয় এমার্সনকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত ক'রে স্পেনের কিছুটা মুখ রক্ষা করেন।

ফ্রেড ষ্টোলে (অষ্ট্রেলিয়া) ৬—২, ৬—৪ ও ৮—৬ গেমে জুয়ান গিসবার্টকে (স্পেন) পরাজিত করেন।

এই আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় ডেভিস কাপ জয় লাভ করার গুরুত্ব টেনিস খেলায় বিশ্ব খেতাব জয়ের সমতুল্য। টেনিস খেলায় বিশ্ব প্রতিযোগিতা নেই, তার অভাব এই ডেভিস কাপ পূরণ করেছে। এ পর্য্যন্ত মাত্র এই চারটি দেশ ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে—অষ্ট্রেলিয়া ২১ বার (১৯১০ সালে ওয়াক-ওভার), আমেরিকা ২০

বার (১৯০১ সালে ওয়াক-ওভার), গ্রেটবৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার।

দলীপ ট্রফি :

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ১৯৬৪ সালের দলীপ ট্রফি আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল দল এক ইনিংস এবং ২০ রানে মধ্যাঞ্চল দলকে পরাজিত করে দলীপ ট্রফি জয় করেছে। প্রতিযোগিতার সূচনা থেকে মোট তিনবার ফাইনালে গেলে দক্ষিণাঞ্চল দল এই প্রথম দলীপ ট্রফি জয়ী হল। ভারতবর্ষের টেষ্ট খেলোয়াড় এম. এল. জয়সীমা দক্ষিণাঞ্চল দল এবং প্রাক্তন টেষ্ট খেলোয়াড় ডি এল অরটেকার মধ্যাঞ্চল দল পরিচালনা করেছিলেন।

ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া :

মেলবোর্ন মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ৪৮তম টেষ্ট সিরিজের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলাটি ড্র যায়। খেলার দ্বিতীয় দিনে ৩২৮ রানের মাথায় অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়। চতুর্থ দিনে ৫৫৮ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা ২০০ রানে অগ্রগামী হয়। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৪২৬ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যাণ্ড মাত্র ১০ মিনিট খেলার সময় হাতে পেয়েছিল। এই সময়ে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না পড়ে ৫ রান উঠেছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার নবাগত টেষ্ট খেলোয়াড় ডগলাস ওয়ালটার্স এই দ্বিতীয় টেষ্টের দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১১৫ রান) করেন। ফলে তিনি তাঁর টেষ্ট খেলোয়াড় জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করলেন। ডগলাসের আগে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম এবং দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় সেঞ্চুরী করেছেন মাত্র দু'জন—অষ্ট্রেলিয়ার বিল পন্সফোর্ড (১২০ ও ১২৮ রান) এবং ইংল্যাণ্ডের হার্বার্ট সাটক্লিফ (১১৫ ও ১১৬ রান), ১৯২৪—২৫ সাল।

মেলবোর্ন মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড—অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলার ফলাফল বর্তমানে দাঁড়াল : খেলা ৩৯, অষ্ট্রেলিয়ার জয় ২০, ইংল্যাণ্ডের জয় ১৫ এবং খেলা অমীমাংসিত ৪।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অষ্ট্রেলিয়া : ৩২৮ রান (বব কাউপার ৯৯, বিল জন্সী ৮৮ এবং বব সিম্পসন ৫৯ রান। বেরী নাইট ৮৪ রানে ৪, জেক রোস্স ৯২ রানে ৩ এবং ডেভিড এ্যালেন ৫৫ রানে ২ উইকেট)

ও ৪২৬ রান (পিটার বার্জ ১২০, ডগলাস ওয়ালটার্স ১১৫, লরী ৭৮ এবং সিম্পসন ৬১ রান। জিওফ বয়কট ৩২ রানে ২, কেন ব্যারিংটন ৪১ রানে ২ এবং নাইট ৬১ রানে ২ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড : ৫৫৮ রান (জন এডরিচ ১০৯, কলিন কাউড্রে ১০৪, জিম পার্কস ৭১, কেন ব্যারিংটন ৬৩, ফ্রেড টিটমাস নট আউট ৫৬ এবং জিওফ বয়কট ৫০ রান। গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী ১৩৩ রানে ৫ এবং টম ভিভার্স ৪৬ রানে ২ উইকেট) ও ৫ রান (কোন উইকেট না পড়ে)।

এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা :

কলকাতার সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত দশম এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলস খেতাব পান তরুণ খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় তাঁর এই প্রথম খেতাব জয়। তিনি ফাইনালে গত তিন বছরের চ্যাম্পিয়ন রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন। এই দশম প্রতিযোগিতার তিনটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে খেতাব জয় করেছেন রাশিয়ার কুমারী ভিউ সুমে।

সংক্ষিপ্ত ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : জয়দীপ মুখার্জি (২নং বাছাই) ৬—৪, ৮—৩, ও ৬—২ গেমে রমানাথন কৃষ্ণানকে (১নং বাছাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জাপানের ওশাকু ইশিগুরো এবং কেজি ওয়াতানেব (৩নং বাছাই জুটি) ৪—৬, ৬—৩ ও ৩—২ গেমে রমানাথন কৃষ্ণান এবং নরেশ কুমারকে (১নং বাছাই জুটি) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : রাশিয়ার কুমারী ভিউ সুমে (৩নং বাছাই) ৬—৩, ১—৬ ও ৬—১ গেমে আমেরিকার কুমারী ক্যারোল গ্রোসেনকে (১নং বাছাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কুমারী ভিউ সুমে এবং কুমারী ক্যারোল গ্রোসেন ৬—২ ও ৬—০ গেমে বেগম এফ. এ. খান এবং কুমারী রীতা সুরাইয়াকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কুমারী ভিউ সুমে এবং আলেক-

জ্যাকার হেয়েহেজী (বাশিয়া) ২—৬, ৬—২ ও ৬—৩ গেমে কুমারী ক্যারোল প্রেসেস (আমেরিকা) এবং কালোগারোপোলমকে (গ্রীস) পরাজিত করেন।

ডুরাণ্ড কাপ :

১৯৮৫ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ২—০ গোলে পাঞ্জাব পুলিশ দলকে পরাজিত ক'রে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় যে-সাম্মিলিত দলের পক্ষে সর্বপ্রথম উপর্যুপরি তিন বছর ডুরাণ্ড কাপ জয়ের রেকর্ড করেছে। মোহনবাগানের আগে উপর্যুপরি ডুরাণ্ড কাপ জয় করেছে মাত্র দুটি রেজিমেন্ট—এইচ এল আই (১৮৯৩-৯৫) এবং ব্ল্যাকওয়াচ (১৮৯৭-৯৯)। মোহনবাগান এই নিয়ে ৬বার ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হল—১৯১৩, ১৯১৯, ১৯৯০ (ইষ্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে যুগ্ম-বিজয়ী) এবং ১৯৬৩-৬৫ সালে। ক'লকাতা থেকে ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছে এই তিনটি দল—মোহন-বাগান ৬বার, ইষ্টবেঙ্গল ৪ বার এবং মহমেডান স্পোর্টিং ১বার। ভারতীয় দলের মধ্যে প্রথম ডুরাণ্ড কাপ জয় করে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৪০ সালে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রদর্শনী ফুটবল :

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রখ্যাত স্লোভান ব্রাতিস্লোভ ফুটবল দল তাদের অনন্য ক্রীড়া-চাতুর্যে আই এফ এ একাদশ দলকে ৫—১ গোলে এবং মোহনবাগান দলকে ৫—০ গোলে পরাজিত করে। এই খেলা দুটির আসর বসেছিল ক'লকাতার রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ামে।

ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া :

সিডনি মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড—অষ্ট্রেলিয়ার ৪৮তম টেষ্ট সিরিজের তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস এবং ৯৭ রানে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে বর্তমানে ১—০ খেলায় এগিয়ে গেছে। ১৯৬৪-৬৫ সালের টেষ্ট সিরিজের মোট পাঁচটি খেলার মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়। এই সিরিজের এখনও দুটি টেষ্ট খেলা বাকি—চতুর্থ এবং পঞ্চম টেষ্ট খেলা। পাঁচ দিনের বরাদ্দ এই তৃতীয় টেষ্ট খেলা চতুর্থ দিনের ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট খেলার পরই শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনে ৪৮৮ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। তৃতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২২১ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ২৬৭ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে। চতুর্থ দিনে অষ্ট্রেলিয়া মাত্র ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট খেলেছিল। মাত্র ১৭৪ রানের মাথায় অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

সিডনি মাঠে এই নিয়ে ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ৩৯টি টেষ্ট খেলা হল তার ফলাফল দাঁড়াল : অষ্ট্রেলিয়ার জয় ২০, ইংল্যাণ্ডের জয় ১৬ এবং খেলা অমীমাংসিত ৩।

অষ্ট্রেলিয়া আলোচ্য টেষ্ট খেলায় শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ১৯৫৬ সালে ম্যাঞ্চেষ্টারের চতুর্থ টেষ্টে 'ফলো-অন' করার পর ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া এই প্রথম 'ফলো-অন' করলো। অষ্ট্রেলিয়ার নিয়মিত অধিনায়ক রবি সিম্পসন হঠাৎ অসুখে পড়ায় তাঁর জায়গায় সহ-অধিনায়ক ব্রায়ান বুথ অষ্ট্রেলিয়া দল পরিচালনা করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার শেষ ইনিংস পরাজয় ঘটেছিল ১৯৫৬ সালের ৪র্থ টেষ্টে (ম্যাঞ্চেষ্টার)—এক ইনিংস এবং ১৭০ রানে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যাণ্ড : ৪৮৮ রান (বারবার ১৮৫, এডরিচ ১০৩, বয়কট ৮৪ এবং এ্যালেন নট আউট ৫০ রান। হুক ১০৫ রানে ৭ এবং 'কলপট ৮৬ রানে ২ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া : ২২১ রান (কাউপার ৬০ এবং টমাস ৫১ রান। ব্রাডমন ৬৩ রানে ৫), এ্যালেন ৪২ রানে ২ এবং স্নোস ৫১ রানে ২ উইকেট) ও ১৭৪ রান (ডগলাস ওয়াল-টার্স নট আউট ৩৫ এবং লরী ৫৩ রান। টিটমাস ৪০ রানে ৪ এবং এ্যালেন ৭৭ রানে ৪ উইকেট)

ভারতীয় স্কুল বনাম লণ্ডন স্কুল :

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় স্কুল বনাম লণ্ডন স্কুল দলের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় স্কুল দল ৯০ রানে জয়ী হয়ে টেষ্ট সিরিজে ১—০ খেলায় 'রাবার' জয় করেছে। টেষ্ট সিরিজের প্রথম চারটি টেষ্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি।

ভারত সফরে লণ্ডন স্কুল ক্রিকেট দলের খেলার ফলাফল : মোট খেলা ১২, জয় ১ (মাদ্রাজ স্কুল দলের বিপক্ষে এক ইনিংস ও ৭৮ রানে), পরাজয় ১ (৫ম টেষ্টে ৯০ রানে) এবং খেলা ড্র ১০।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগৌরকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ৩।২।৬৬ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রকাশিত হ'ল

প্রফুল্ল রায়ের

নতুন বিরাট উপন্যাস

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে হুগলী জেলার দূরদরান্তর থেকে একটি যুবক জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসেছিল। তার জীবনের একটিমাত্রই মন্ত্র ছিল, 'বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।'

সারা বাঙলাদেশ, বিশেষ করে কলকাতা জুড়ে তখন অন্ধকারের সাধনা চলেছে। একদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কালোবাজারি—এদের ফলশ্রুতি হিসেবে ভিক্ষুক আর গণিকা। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির কল্যাণে উদ্দাম ভোগবাদের প্রমত্ত উৎসব। তৃতীয় আরেকটি দিক ছিল যেখানে আঘাতের পর আঘাতে সমস্ত পুরানো মূল্যবোধ ধ্বসে হয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে একটা স্বাপদের মত হামাগুড়ি দিয়ে দাঙ্গা এসে গেল—কলকাতার 'গ্রেট কিলিং'। তারও পর খণ্ডিত দেশের রক্তাক্ত দেহের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার রথ এল ঘর্ঘরিয়ে।

যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বাঙলাদেশের এই বিশৃঙ্খল অধ্যায়টি ঘিরে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার। আর সেই সর্বব্যাপী অন্ধকারে যুবকটি একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডোবা তার হ'ল না।

এত যে অন্ধকার আর নৈরাজ্য তবু এরই অন্তর্স্রোতে কোথায় যেন আলোর ক্ষীণ একটি ধারা ধীরে ধীরে বইছিল। যুবকটি হঠাৎ তা আবিষ্কার করে বসল। দেখল উনিশ শতকের রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে আজ অবধি অসংখ্য মানুষ সেই ধারাটিকে বয়ে নিয়ে চলেছেন এবং আশ্চর্য তাঁদের উত্তরাধিকার তার ওপরে এসে পড়েছে।

জীবিকার খোঁজে যে যুবক এসেছিল, কলকাতা তাকে জীবনের মহত্তর সন্ধান দিয়েছে।

এই বিশাল কলেবর উপন্যাস সাম্প্রতিক কালের একটি অনন্য সংযোজন।

দাম—দশ টাকা

এই লেখকের আরেকটি উপন্যাস : **নোনা জল মিঠে মাটি** (দ্বিতীয় সংস্করণ) দাম : ৮·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

REG. NO. C. 67,—BHARATVARSHA. Phone :—34-1744. Gram :—Publicasur, Cal.
Price—Single Copy—Re. 1/25. Subscriptions—Annual—Rs. 15/-. Half yearly—Rs. 7/50.

— প্রকাশিত হইল —

শক্তিপদ রাজগুরুর বিপুল-কলেবর নূতন উপন্যাস

বাসাংসি জীর্ণানি

একদিকে কালজীর্ণ পুরাতন জমিদারী-তন্ত্রের পতন—অপরদিকে শিল্প-সমৃদ্ধ নূতন যান্ত্রিক যুগের উত্থান। প্রাচীন আরণ্যক পরিবেশের স্বর্গরাজ্যে রূপান্তর। হারানোর বেদনা আর প্রাপ্তির আনন্দে কম্পমান, ভাঙা আর গড়া, সমস্যা ও সমাধানের অভিনব বৈচিত্র্যে দোদুল্যমান একদল নর-নারী। তারকরত্ন আর অতুল কামার, অশোক আর প্রীতি, ভুবন আর কদম-বৌ, গোকুল আর পাঞ্চু দাস কারিগর আর মিষ্টি, অবিনাশ আর নিতে বাউরী, জীবন আর মণিমালা, প্রণাম্ভ আর রাঠী, সতীশ আর এমোকালী, সনাতন আর গঙ্গামণি—এরকম আরো অনেকেই এই উপন্যাসে ভিড় ক'রে এসেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রই মনে দাগ কাটার মত। কিন্তু ভাষাহীন নারাণ ঠাকুর লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

পরিবর্ত্তনের পটভূমিতে জীবনের নূতন মূল্যায়ন।

চেনা-জানা পরিবেশে নূতন ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা এমন একখানি জীবন্ত উপন্যাস অনেকদিন বাঙলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়নি।

দাম—চৌদ্দ টাকা।

—অন্যান্য উপন্যাস—

গৌড়জন বধূ	৫-৫০
কেউ ফেরে নাই	৭-৫০
কাজল গাঁয়ের কাহিনী (২য় সং)	৫,
মণিবেগম (৩য় সং)	৬-২৫
কুমারী মন (২য় সং ছায়াচিত্রে রূপায়িত)	৩-৫০
জীবন-কাহিনী (ছায়াচিত্রে রূপায়িত)	৪-৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

11 FEB 1966

ভারতবর্ষ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ফাল্গুন ১৩৭২

সবার সেরা
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০
KOLAY THIN ARROWROOT BISCUIT
Glucose
KOLAY QUALITY SWEETS
KOLAY TOFFEE

৫৩তম বর্ষ
দ্বিতীয় খণ্ড
তৃতীয় সংখ্যা

—নূতন প্রকাশিত চারখানি বই—

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পিপাসা

অল্পবয়স্কা তরুণ অধ্যাপক—আর বিদেশী একজন ছাত্রের প্রেম-পত্র ছাপা। অধ্যাপক নিরীহ, লাজুক আর মেধাবী—ছাত্র বিদেশী যুবতী, নির্ভীক আর উগ্র আধুনিকা। তারপর কবির ভাষায় ব'লতে গেলে—"না জানি কী করিয়া মিলন হ'ল লোহে, কী ছিল বিধাতার মনে!" এর ভেতর যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হ'ল, তা কক্ষচ্যুত উল্কার মত টেনে নিলে দু'জনকে জীবনের দু'প্রান্তে। কিন্তু তাদের কলঙ্ক রাত্রির রক্তেও কি বিদেশীরই যৌবনের উত্তাপ?

দাম—৩'৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সতীশঙ্কর উৎপলের

সতীশঙ্কর রায়ের সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে। কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্যে অনেক কিছু করেছেন, বাড়ির চাকরকে অফিসের বেয়ারা ক'রে দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন ডাকাত, পরের ধন লুটেপুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। লোকে তাঁকে ভয় ক'রতো যেন সাপ বা বাঘের চেয়েও বেশি। আবার কেউ বলে মেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রেছেন—ব'লতে গেলে একেবারে পোকা ছিলেন।

উৎপলের কাছে সতীশঙ্কর এক বিষম সমস্যা। কার কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে? যে লোক প্রথম জীবনে দেশের জন্যে জেল খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন যশ ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, আবার সহসা আততায়ীর হস্তে নিহতই বা হ'লেন কেন? এই "কেন" সম্বন্ধে তাঁর সুন্দরী তরুণী বিধবা স্ত্রী-ই বা বলেন কি? দাম—পাঁচ টাকা

শক্তিপদ রাজগুরু

জীবন-কাহিনী

মানুষের জীবনে সমস্যাও যেমন—কৌতুকও তত কম নয়। এই সমস্যা ও কৌতুকের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা দু'টি ভাগ্য-বিড়ম্বিত যুবক-যুবতীর মধুর প্রেমের কাহিনী।

ছায়াচিত্রে রূপায়িত।

দাম—৪'৫০

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

মজার মজার খেলা

বিজ্ঞানের নানা রকম কল-কৌশলের সাহায্যে মজাদার খেলা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করার মত বই। দেখা ও খেলার কাজ একই সঙ্গে চ'লবে।

কিশোরদিকে উপহার দেওয়ার পরম উপযোগী।

নূতন ধরনের সাইজ। অসংখ্য ছবিতে ভরপুর।

দাম—৩

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

আপনার সুন্দর কালো

কেশের জন্য...

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে চুল বাড়ায়—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। এই কেশ তৈলে ক্যান্থারাইডিসের এক্সট্রাক্ট থাকায় চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

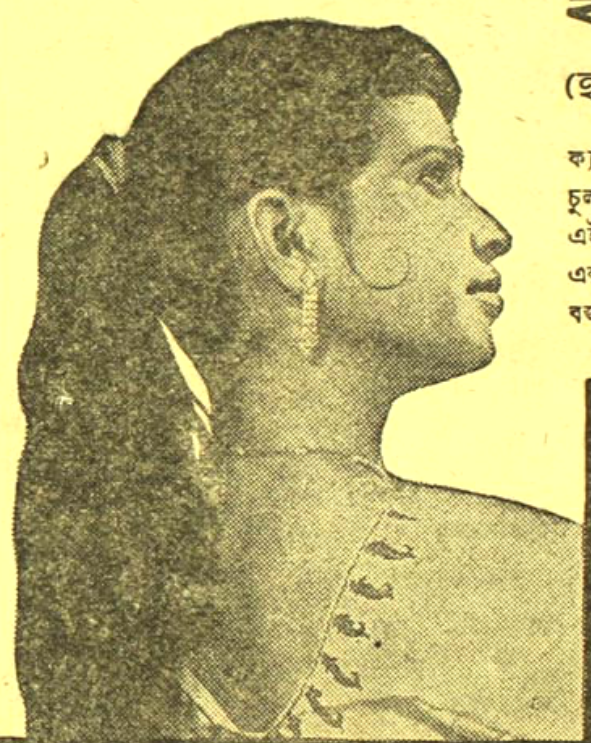

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ● বোম্বাই ● কানপুর

ভাল ভাল উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ

অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায়

পিপাসা ৪-৫০
তৃতীয় নয়ন ৪-৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এক জীবন অনেক জন্ম ৬-৫০
নীলকণ্ঠী ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অগ্নিমঞ্জরী ৩৲

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

দিব্যদৃষ্টি ২-৫০

অনুরূপা দেবী

গরীবের মেয়ে ৪-৫০ বিবর্তন ৪৲
রাজগড় ৪-৫০ বাগ্‌দত্তা ৫৲
পোষ্যপুত্র ৪-৫০ পথের সাথী ৩৲
হারানো খাতা ৩৲

নিরুপমা দেবী

দিদি ৫৲

পুষ্পলতা দেবী

নীলিমার অঙ্ক ৩-৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ ৩-৫০

শক্তিপদ রাজগুরু

জীবন-কাহিনী ৪-৫০
ঘুমাকী মন ৩-৫০
গৌড়জনবধূ ৫-৫০
মণিবেগম ৬-২৫
কেউ কেরে নাই ৭-৫০
কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৫৲

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মনের অগোচরে ২৲

তারুণ্য

কাল্ অফ্ থিং ২-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

পরাজয় ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

একদিঘীর খাল ২-৫০

মনীষাধব চৌধুরী

দেবাশিস্ ৪৲

প্রফুল্ল রায়

সীমারেখার বাইরে ১০৲
নোনা জল মিঠে মাটি ৮-৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পতনে উত্থানে ৫৲
সুধা হালদার ও সম্প্রদায় ৩-৭৫

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অচল প্রেম ৪৲

পঞ্চানন ঘোষাল

একটি অদ্ভুত মামলা ৫৲
একটি নির্মম হত্যা ২-৫০
অধুনাতন পৃথিবী ৫৲
একটি মাত্রা-হত্যা ৩৲
অন্ধকারের দেশে ৫৲

গৌরীপ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২-৫০
মুক্তির আসাদ ২-৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মহত্যার অধিকার ৪৲
সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বয়ং-সিদ্ধা ৩৲
ভুলের মাশুল ১-৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিচিত্র মানব ৫-৫০
কার্টুন ২-৫০
দেহ ও দেহাতীত ৪৲
পত্তর ১ম—২-৫০, ২য়—২-৫০
শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভুলের ফসল ২৲
খেয়ালের খেসারৎ ২৲
বংশধর ২৲

ভোলা সেন

উপন্যাসের উপকরণ ২-৫০

অমরেন্দ্র ঘোষ

পদ্মদীঘির বেদেনী ৩৲
দক্ষিণের বিল ২য় ৪৲

সমরেশ বসু

ছিন্নবাধা ৭-৫০

মায়া বসু

অগ্নিবলয় ২-৭৫

বার্ষিক

মেঘের পরে আলো ৪-০০

নিতাইনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিয়ান শো ৪-৭৫

রামপদ মুখোপাধ্যায়

কাল-কল্লোল ৪-৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের মন্দিরা ৩-৫০ কালকূট ৩৲ কাকু কহে যাই ২-৫০ কাঁচামিঠে ৩৲ আদিম রিপু ৩৲ গৌড়-মল্লার ৪-৫০ বিজয়লক্ষ্মী ২-৫০ বহ্নি-পতঙ্গ ৩-৫০ পঞ্চভূত ২-৫০ বিষের বন্ধী ৪-৫০ মায়া পৃথিবী ৩৲ ছায়াপথিক ৩৲ দুর্গরহস্য ৩-৫০ চুয়াচন্দন ৩-২৫

প্রবোধকুমার সান্যাল

মরীম যুবক ২-৫০ কলরব ২৲
প্রিয় বান্ধবী ৪৲
কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲

অশোককুমার মিত্র

দু'ঘণ্টা ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চরাত্র ৩৲

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

অকাল পাঞ্জাবী ২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঝড়ো হাওয়া ২-৫০

বনফুল

শিতামহ ৬৲
অগ্নীশ্বর ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

মিলন-মন্দিরে ৩৲

প্রভাত দেবসরকার

অনেক দিন ৩-৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পণ্যের

প্রচারে

'প্রবাসী'র

প্রচারণী

প্রকৃষ্ট ॥

বিজ্ঞাপনের বিস্তারিত হার—প্রবাসীর ম্যানেজারকে পত্র লিখলে—সানন্দে জানানো হইবে।—প্রতি পৃষ্ঠা ১০০৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬০৲। চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের হার এবং বিশেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের বিষয় জানিতে হইলে পত্র লিখুন—কিংবা সাক্ষাৎ করুন।

ম্যানেজার

প্রবাসী প্রেস প্রাঃ লিঃ

৭৭-২-১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে

=বিজয় বৈজয়ন্তীবাহী=

মোহিনী মিল্‌স লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯০৮)

১নং মিল

কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা)

২নং মিল

বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

২২ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

অনামী (২য় সং—মহাভারত, কালিদাস, গীতা, উপনিষদ, মনে ইংরাজ কবি, দার্শনিক আদি গ্রন্থসমূহের কবিতার অনুবাদ, দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ গান ও কবিতা, ইন্দিরা দেবীর সুবাচনির অনুবাদ—সেরে শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির পত্রাবলী) মূল্য ৫৷৹

অভাগনীয় (অঘটনী উপন্যাস) ১০৲

ব্রাহ্মমাণ (২য় সং) ৭৷৹

অঘটনের ঘটা (উপন্যাস) ৬৲

দোলা (উপন্যাস—২য় সং) ৮৲

তিথাঙ্কিনী রাজকন্যা ২৷৷৹

তাগবতী কথা (কবিতা)—৫৲ তাগবতী গীতি—৪৲

শ্রীচৈতন্য (কাব্যনাট্য)—৩৷৹ মহাভারতী কথা—৩৷৹

জীবনকল্প (৩য় সং)—৮৲ দোটানা—৩৲

তাবি এক হয় আর (নেতাজী-কেন্দ্রিক উপন্যাস)—৮৷৹

ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী (ধর্ম ও যোগ সম্বন্ধে)—৫৲

ছাড়ার আলো (উপন্যাস)—৭৲

স্মৃতিচারণ ১ম খণ্ড—(দ্বিজেন্দ্রলাল, দিলিপ ঘোষ, লোকেন পালিত, সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অতুলপ্রসাদ সেন চরিত্রচিত্র—২য় সং সচিত্র—৬০০ পৃষ্ঠা) ১২৲

স্মৃতিচারণ ২য় খণ্ড—(রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যতীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ, যোগীনাথ কবিরাজ, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি—সচিত্র—৫০০ পৃষ্ঠা)— ৮৷৹

অঘটনের আরেক ঘটে (উপন্যাস—৭ম সং)—৫৲

হরিদাস মজিক, পুরী—৪ ও কলিকাতার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

কুষ্ঠ ও ধবল

৬০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম্মরোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭ হাওড়া।

শাখা :—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

বহুল প্রশংসিত ও পরীক্ষিত

বঙ্গ পীড়ায় সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য মহাপুরুষ প্রদত্ত মহৌষধ

অমিয় স্নেহ

মূল্য দুই সপ্তাহের জন্য ৭৲ টাকা ষ্ট্যাম্পসহ পত্রে অন্যান্য বিষয় জ্ঞাতব্য। মূল্য অগ্রিম প্রেরিতব্য।

এখানে সর্ব্ববিধ জ্যোতিষের ক্রিয়া ও দুর্লভ মন্ত্রশক্তিপূত কবচাদি ও দুরারোগ্য ব্যাধির ধন্বন্তরীয় ও দৈবীয় ঔষধ সুলভে দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ডাঃ শ্রীবিজয়রত্নমাধব চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতির্বিনোদ ত্রিকালজ্ঞ—মন্ত্রশক্তি কার্য্যালয়

রাধাবাজার, নবদ্বীপ পোঃ (নদিয়া)

—প্রকাশিত হইয়াছে—

অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার, এম. এ, ডি-ফিল্,

সম্পাদিত

গিরিশচন্দ্রের

প্রফুল্ল ৪, জনা ৪,

ও

দ্বিজেন্দ্রলালের

চন্দ্রগুপ্ত ৪৲

সারগর্ভ ভূমিকা, চরিত্র-আলোচনা ও টীকাসহ। ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে মূল্যবান ও অপরিহার্য সংযোজন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগে সত্বর আরাম দেয়।

ক্ষতস্থানে কীটাণুর সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগেনা।

সব সময় এ্যাক্রিমেণ্ট হাতের কাছে রাখুন।

এ্যাক্রিমেন্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

এক জীবন অনেক জন্ম

একই জীবনে জন্ম-জন্মান্তরের বিচিত্র অনুভূতির স্বাদ আনে যে ব্যাপক প্রেম, মৃত্যুর অন্ধকারকে যা' জীবনের দীপ্তিতে রূপান্তরিত করে, তারই মর্মস্পর্শী বিন্যাস। পথের আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রেমাংশুর অকাল প্রয়াণ দীপার জীবন ম্লান, রুক্ষ ও কঠিন ক'রে তুলেছিল—অনেক পরে মলয়ের আবির্ভাব—মৃত্যুর অন্ধকার ছিন্ন-ভিন্ন করে যে অসীমান্ত আলোয় দীপার জীবন পূর্ণ ও সার্থক ক'রে তুলল, সেই অসীমান্ত আলোর চিরন্তন প্রেমের অপরূপ কাহিনী।

দাম—৩'৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

সমরেশ বসুর নূতন উপন্যাস

ছিন্নবাধা

সর্ব বাধা-বন্ধহীন একটি সৃষ্টিশীল আত্মসন্ধানী সাধারণ মানুষের পথ-চলার কাহিনী।

পঙ্কে তার উদ্ভব—পঙ্কিল পরিবেশেই তার পুষ্টি। কিন্তু তার অন্তরের সৃষ্টির প্রেরণা তাকে সকল প্রলোভন—সকল প্ররোচনা এবং সকল জটিলতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে তার শাশ্বত মানবাত্মার অভিব্যক্তিকে সহজ করে দিয়েছে।

একটি বলিষ্ঠ মানুষের সংঘাতময় বাস্তব জীবন-কথা।

সুন্দর প্রচ্ছদ-শোভিত সুবৃহৎ উপন্যাস। দাম—৭'০০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

=শৌখিন সমাজে অভিনয়যোগ্য উচ্চ প্রশংসিত নাটকসমূহ=

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে

বিরাজ-বৌ ২৲ কাশীনাথ ২৲
বিন্দুর ছেলে ১-৫০
রামের সুমতি ১-৫০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

অকাল্মা ৪৲, প্রফুল্ল ৪৲, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ১-৫০, মলি-অন্নপূর্ণা ২৲, বুদ্ধদেব-চরিত ২৲

যমেশ গোস্বামী প্রণীত

কেদার রায় ৩৲

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ইরাণের রাণী ১-৫০
কর্ণার্জ্জুন ৩৲, কুহেলী ২৲,
সুধামা ১-২৫, অজয়া ০-৩৭

অমল সংকার প্রণীত

মসনদে মোঘল ২৲

তারক মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রামপ্রসাদ ১-৫০

যামিনীমোহন কর প্রণীত

নটমাট ০-৭৫ প্রহেলিকা ০-৭৫

নিশিকান্ত বসুরায় প্রণীত

বঙ্গেবর্গী ৩৲, পথের শেষে ও
ধর্ষিতা (একত্রে)—৫-৫০

মেবলাদেবী ৩৲,

মনোমোহন রায় প্রণীত

রিজিয়া ১-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

জ্ঞানময়ী গার্লস্ স্কুল ১-৫০

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নর-নারায়ণ ৩৲,
প্রতাপ-আদিত্য ২-৭৫,
আলমগীর ৩-৫০,
রত্নেশ্বরের মন্দিরে ০-৭৫,
ভীষ্ম ২-৭৫, বাসন্তী ০-২৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

দুর্গাদাস ২-৫০, বিরহ ২৲
সাজাহান ৩৲, মেবারপতন ২-৫০
পরপারে ২-৫০, বঙ্গনারী ২৲
চন্দ্রগুপ্ত ৪৲ পুনর্জ্জন্ম ১-০০
সীতা ২৲, সিংহল-বিজয় ২-৫০
ভীষ্ম ২-৫০, নুরজাহান ২-৫০

নিরুপমা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে

দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রণীত নাট্যরূপ

শ্যামলী ১-৫০

সচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

এই স্বাধীনতা ২৲
হর-পার্ব্বতী ১-২৫
সিরাজদ্দৌলা ২৲
ঘুপ্রিয়ার কীর্ত্তি ১-২৫

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

নাট্য-গুচ্ছ ৪-৫০

রাতকাণা—বীররাজা এবং মুখের মত একত্রে।

কানাই বসু প্রণীত

গৃহপ্রবেশ ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অহল্যাবাঈ ১৲, কালীর রাণী ২৲

মন্মথ রায় প্রণীত

মরা হাতী লাখ টাকা ১-২৫,
অশোক ২৲, সাবিত্রী ২৲,
চাঁদসদাগর ২৲, খনা ২৲,
জীবনটাই নাটক ২·৫০
কারাগার, মুক্তির ডাক ও মহুয়া
(একত্রে) ৩-৫০
মীরকাশিম, মমতাময়ী হাসপাতাল
ও রঘুডাকাত (একত্রে) ৩৲
ধর্মঘট, পথে বিপথে, চাষীর
প্রেম, আজব দেশ (একত্রে) ৪৲
একাঙ্কিকা ৫৲ নবএকাঙ্কিকা ৫৲
কোটপতি নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎ
পর্ণা—রাজনটী—রূপকথা
(একত্রে) ৩৲
সাঁওতাল বিদ্রোহ—বন্দিতা—
মেবাসুর (একত্রে) ৩৲
মহাভারতী ২-৫০

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত

সমাজ ১-২৫

রেণুকারাণী ঘোষ প্রণীত

মেবার জন্মতিথি ১-২৫

তুলসীদাস লাহিড়ী প্রণীত

ছেঁড়া তার ৩৲, পথিক ২-২৫

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রণীত

মন্ত্র-শক্তি ২৲

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ভুল ১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

লিলি বিস্কুট

সকলেই পছন্দ করেন

কয়েকটি নামকরা বিস্কুট

থিন এরারুট
বোস্টন্ ক্রীম
বার্লি বিস্কুট
মাল্টো

লিলি
বিস্কুটের মত বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

— ❀ বিবিধ গ্রন্থ ❀ —

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম ২,

শ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ

অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথবসু ২-৫০

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হে মহাজীবন (জীবনী) ৩৲

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু-অনুলিখিত

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩৲

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সচিত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।
১ম খণ্ড (২য় সং)—৭৲ ২য় খণ্ড—৪৲

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ ৭৲

পদাবলী-পরিচয় (যন্ত্রস্থ)

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

পারায়ণ (পরলোক-তত্ত্ব) ৯-৫০

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত ঐতিহাসিক গ্রন্থ

সিরাজদ্দৌলা ৬,

ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী প্রণীত

শরৎ-সাহিত্যে পতিতা ২·৫০

জাহানারার আত্মকাহিনী ৩-৫০

কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা ২৲

ডাঃ বিমলকান্তি সমদ্দার প্রণীত

রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৫·৫০

শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত

নবভারতের বিজ্ঞানসাধক

সচিত্র। দাম—১-৭৫

তারকচন্দ্র রায় প্রণীত

বাংলা দার্শনিক সাহিত্য-ভাণ্ডারে নূতন সংযোজন

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস

(১ম খণ্ড) ১০৲ (২য় খণ্ড) ১২৲

সাংখ্য ও যোগ (ভারতীয় দর্শন) ৪৲

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

৯ম খণ্ড (সমসাময়িক দর্শন)—১০৲

শ্রীপ্রবুদ্ধকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অরলিপি-কৌমুদী ২-০০ **রাগেশ্বরী (১ম)** ১-২৫

শ্রীহরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত

সামুদ্রিক-রত্ন ৬৲

পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান (সচিত্র) ৫৲

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

দিল্লীশ্বরী (সচিত্র) ২৲

রাজিয়ৎ ও নূরজাহানের জীবন-কথা।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত

কোন্ পথে ? ২-৫০

আটটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ।

দীনেশচন্দ্র সে- প্রণীত

শ্রীশ্রী ৩-৫০

উপহার দিবার উপযোগী।

ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রণীত

পঞ্চাশের পরে (স্বাস্থ্য-তত্ত্ব) ২-৫০

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

মানবতার সাগর-সঙ্গমে (সচিত্র) ৬৲

বাংলার নাটক ও নাট্যশালা ৪,

নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত

মেঘদূত ৭৲
ওমর খৈয়াম্ ৭৲

দুইখানি অনুপম কাব্য-গ্রন্থ। সচিত্র।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

কবিকবি রজনীকান্তের

বাণী ২,

কল্যাণী ১৲
লেসন্স ১-২৫

তাঁহার কবিতা বাঙালীর সাহিত্যে যুগপৎ হাস্যরস ও ভক্তিভাবের প্রেরণা যোগাইতেছে।

ভারতবর্ষের সূচী

ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা

ফাল্গুন—১৩৭২

লেখ-সূচী

১। ব্রহ্মনির্বাণ ও জন্মান্তরবাদ (প্রবন্ধ)
শ্রীমৎ অনির্বাণ ২২৫

২। ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ (কবিতা)
পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী ২২৮

৩। অঘটনের পূর্বরাগ (উপন্যাস)
দিলীপকুমার রায় ... ২৩০

৪। শাস্ত্রীজীর মৃত্যুতে মাতা ললিতাদেবীকে (কবিতা)
সুষমা মৈত্র ... ২৪০

চিত্র-সূচী

১। কমোক্ষী দেউলের কল্যাণমণ্ডপ—কাঞ্চীপুরম্, ২। একাম্রেশ্বর মন্দির—কাঞ্চীপুরম্, ৩। মহিষাসুর মর্দিনী (একাম্রেশ্বর মন্দির)—কাঞ্চীপুরম্, ৪। একটি নৃত্যভঙ্গিমা (একাম্রেশ্বর মন্দির)—কাঞ্চীপুরম্, ৫। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শঙ্কর ও সঙ্গীতশিল্পী ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খান, ৬। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক সমাবর্তনে হাওড়ার 'নৃত্যম' হইতে সুব্রতা ও কল্পনা হাজরা এবং সবিতা ঘোষ নৃত্যে প্রথম বিভাগে ডিপ্লোমা পেয়েছেন।

লেখ-সূচী

৫। নীতের বস্তু (প্রবন্ধ)
শ্রীরমেশচন্দ্র আচার্য্য ২৪১
৬। কবি এলিয়টের মৃত্যুতে (কবিতা)
শক্তি মুখোপাধ্যায় ২৪৪
৭। দেবভূমি (গল্প)—নীরদবরণ ২৪৫
৮। শিল্প-শ্রমিকের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ পন্থা (প্রবন্ধ)
শ্রীসমর দত্ত ২৪৯
৯। কবি (কবিতা)—শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত ... ২৫৬
১০। অবিশ্বাসী নই (গল্প)
শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৭
১১। আহ্বান (কবিতা)
শ্রীবিরজন চট্টোপাধ্যায় ২৭৬
১২। অতীতের স্মৃতি (বিবরণ)
পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায় ... ২৭৭

চিত্র-সূচী

বাইকলার-চিত্র
শান্তির দূত
বিশেষ-চিত্র
১। একাসনে
২। যোসর

—পুনরায় প্রকাশিত হইল—

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কবিভূষণ প্রণীত

আয়ুর্ব্বেদ-সোপান

শরীরং ব্যাধিমন্দিরং—অর্থাৎ আমাদের শরীর বিবিধ ব্যাধির আবাস-গৃহ। সেজন্য সাধারণ অট্টালিকার ন্যায় মধ্যে মধ্যে জীর্ণ ও অসুস্থ শরীরেরও মেরামতী বা চিকিৎসা দরকার। সুতরাং তার বিস্তারিত বা চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধেই কিছু-না-কিছু জানা থাকা প্রয়োজন।

এদেশের বন-জঙ্গলের মানুষ চরকা ভারতীয়দের জন্য এই দেশের ত্রিকালদর্শী মুনি-ঋষিরা যে ঔষধ ও চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, আমাদের পক্ষে তা-ই যে সর্বোত্তম বিধান, এতে আর সন্দেহ কি? প্রবীণতমা কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের যাবতীয় দুরূহ তত্ত্বগুলি সরল বাঙলায় সুসংবদ্ধভাবে সাধারণের উপযোগী ক'রে প্রকাশ ক'রেছেন।

প্রতি গৃহস্থেরই গৃহে রাখার উপযোগী অত্যাবশ্যক গ্রন্থ।

মূল্য—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

—শ্রীসুষমা মিত্র—প্রণীত

নিশীথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে

মূল্য—২৸০

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

রূপসী না সজীব বোমা? ২৲
লণ্ডনে শত্রুচক্র ২৲
মঙ্গলের রণ-ভেরী ২৲
কুহুকিনীর ফাঁদ ২৲
প্রচ্ছন্ন আততায়ী ২৲
চীনের ড্রাগন ৩-৭৫

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

লেখ-সূচী

১৩। পশ্চিম বায়ুর উদ্দেশে (অনুবাদ কবিতা)
—আদিত্য ... ২৮৪
১৪। নেশা (অনুবাদ কবিতা)
নচিকেতা ভরদ্বাজ ২৮৫
১৫। দক্ষিণভাং (ভ্রমণ)
শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৬
১৬। কাল প্রবাহ (কবিতা)
শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত ২৯০
১৭। কুমারী মন (গল্প)—শ্রীপথিক ২৯১
১৮। উপরোধ (কবিতা)—কিতীশ দেব সিকদার ২৯৪
১৯। মেয়েদের কথা— ... ২৯৫
(ক) পাশ্চাত্যধর্মের যাদশ শীল
শৈল চট্টোপাধ্যায়
(খ) প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল
ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখ-সূচী

(গ) রূপচর্চ্চা—সুপর্ণা দেবী
(ঘ) পুঁতির কাজ-শিল্প—রুচিরা দেবী
(ঙ) পশমের পুলোভার—হিরণ্ময়ী দেবী
(চ) রান্নাঘর—সুধীরা হালদার
২০। সঙ্গীত—কথা ও সুর—স্বামী সত্যানন্দ, স্বরলিপি বেতার শিল্পী—শ্রীবন্দনা দাস, বি-এ
কোবিদ-সঙ্গীতবিশারদ ৩০৬
২১। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা (প্রবন্ধ)
পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৩০৮
২২। আজকের দিনে (কার্টুন)
পৃথ্বী দেবশর্ম্মা
২৩। কিশোর জগৎ
(ক) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—শ্রীজ্ঞান
(খ) সাইলাস্ মার্নার—সোমা গুপ্ত
(গ) বিজয়ী বীর (কবিতা)—শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায়

অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কিক ও জ্যোতির্বিদ্

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতির্ণব, রাজজ্যোতিষ এম্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)

(জ্যোতিষ-সম্রাট)

অখিল ভারত ধনিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং জাতীয় রাজধানী পণ্ডিত সভার স্থায়ী সভাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। গ্রহ ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি, তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও মামলার অবিলম্বে পরিত্রাণ কঠিন রোগাদির আরামে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশস্থ মনীষীবৃন্দ তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাঁহারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মাননীয়া ভটবাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সম্বলপুরের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি, কে, রায়, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রায়বাহাদুর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়কত, কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব দিঃ এল, এম, দাস, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল স্যার কজল আলী কে-টি, চাঁদ মহারেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, কচপল।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ

মনস্কামনা কবচ—ধারণে অল্পায়াসে অসুত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তন্ত্রোক্ত)। সাধারণ—৭৸৵, শক্তিশালী বৃহৎ—২৯৸৵, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—১২৯৸৵, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি লক্ষ্যীর কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য)। সরস্বতী কবচ—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল ৯৸৵, বৃহৎ—৩৸৵। মোহিনী (বশীকরণ) কবচ ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত এবং চিরপ্রেম স্থির হয় ১১৸৵, বৃহৎ—৩৸৵, মহাশক্তিশালী ৩৭৸৵। ধনদামুখী কবচ—ধারণে অভিলষিত অর্থোন্নতি, উপরিস্থ অধিবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ৯৸৵, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৸৵, মহাশক্তিশালী—১৮৸৵ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভারতের সভাপতি জয়ী হইয়াছেন)।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী

(স্থাপিতাব্দ ১৯০৭ খৃঃ)

(রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ১০—২ (ছা), হরিতকী ষ্টীট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড) কলিকাতা—১৫। ফোন ২৪—৪০৬৫। সময়—বৈকাল ৩টা হইতে ৭টা। ব্রাঞ্চ অফিস ১০৫, গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৩৩৮৪। সময়—প্রাতে ৯টা হইতে ১১।

লেখ-সূচী

(ঘ) ছুটীর ঘণ্টাং—চিত্রগুপ্ত
(ঙ) ছুটি (কবিতা)—শ্রীতরণকুমার দত্ত
(চ) ধাঁধা আর হেঁয়ালি—মনোহর মৈত্র
২৬। বাস্তুঘুঘুর কথা—দেবশর্ম্মা বিরচিত ... ৩২০
২৫। অচিন বনের পাখি (উপন্যাস)
প্রফুল্ল রায় ৩২১
২৬। সাময়িকী ৩২৩
২৭। জলমাটির গন্ধ (উপন্যাস)
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৩২৯
২৮। স্মৃতির ব্যথা (কবিতা)—ছায়া দেবী... ৩৩২
পট ও পীঠ—শ্রী'শ' ৩৩৩
খেলা-ধুলা—
সম্পাদনা—শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ... ৩৩৫
খেলার কথা—ক্ষেত্রনাথ রায় ... ৩৩৫

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত

নিত্যকর্ম-কৌমুদী

যাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে—তাহাই নিত্যকর্ম।

ইহাতে ত্রিসন্ধ্যার সমস্ত কার্য, সন্ধ্যা, আহ্নিক, সকল প্রধান দেব-দেবী পূজা, ধ্যান, প্রণাম, স্তব-কবচ, পার্থিব শিবপূজা, তীর্থ-স্নান, তর্পণ ও বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সরল বাংলা ভাষায় যে কার্য যেমন ভাবে করিতে হয়—তাহা লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখা ত নিকটে থাকিলে কাহাকেও আরকোন বিষয়ের জন্য অন্যের সাহায্য লইতে হইবে না। অধিকন্তু গৃহস্থগণ পুরোহিত দ্বারাও যথাযথ নিত্যকর্ম করিতে সক্ষম হইবেন। দাম—৸

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

অ্যাভিমান কথাশিল্পী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

সার্থক গল্পের সংকলন

স্বপ্নমঞ্জরী

সুপাঠ্যতার সুলেখন ঃ

লেখক ছোট গল্পের ক্ষেত্রে আপন বৈশিষ্ট্যের এমন একটি বলিষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন যে তাঁর গল্প সেই বলিষ্ঠতার জোরেই বাংলা কথাশিল্পের ক্ষেত্রে আপনার যোগ্য স্থানটি অধিকার করে নিয়েছে।

এমনশক্তিশালী ছোট গল্প লেখকের কাছ থেকে আমরা ঠিক যে জিনিসটি আশা করি তিনি ঠিক সেই জিনিসটিই তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে আমাদের দিয়েছেন। বঞ্চিত নর-নারীর প্রতি তাঁর এই যে মমতা—এ ভঙ্গিমাত্র নয়, এ তাঁর স্বভাবজ ধর্ম এবং এই ধর্মকে তিনি সাহিত্য-ধর্মে রূপায়িত করেছেন অতি নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁর গল্পে কোথাও ফাঁকি নেই, কারণ তাঁর দৃষ্টিতে কোথাও ফাঁকি নেই। স্বপ্নমঞ্জরীর প্রত্যেকটি গল্পই তাঁর অন্যান্য গল্পের মতোই ভাল লাগবে। দাম : তিন টাকা।

ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী

প্রণীত

কৃষ্ণকান্তের উইলের

সমালোচনা

বঙ্কিমচন্দ্রের অমর গ্রন্থের টীকা, টিপ্পনী, সমালোচনা ও বিশ্লেষণ।

বিষয়সূচী—কৃষ্ণকান্তের উইলের নামকরণ—সমসাময়িক সমাজ—প্রধান ও অপ্রধান পুরুষ ও নারী চরিত্র—কৃষ্ণকান্তের উইলে মনস্তত্ত্ব—অভিমান—বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শন—কৃষ্ণকান্তের উইলে ব্যঙ্গচিত্র ও উহার ভাষা।

ইহা ব্যতীত আরও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা।

পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৮৮।

দাম—দুই টাকা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

THE CENTRAL BANK OF INDIA LIMITED.

(Established—December, 1911)

HEAD OFFICE—MAHATMA GANDHI ROAD, FORT, BOMBAY—1

Authorised Capital Rs. 10,00,00,000/-
Subscribed Capital ... Rs. 6,94,31,750/-
Paid-up Capital ... Rs. 4,73,40,875/-
Reserve Fund & other Reserves ... Rs. 6,74,33,209/-
Deposits as at 31. 12. 1966. ... Rs. 3,18,65,89,311/-

DIRECTORS :

Sir Homi Mody, K. B. E. (Chairman)
Cooverji Hormusji Bhabha, Esq. (Vice-Chairman).

Dharamsey Mulraj Khatau, Esq.
Chimanlal Bapalal Parikh, Esq.
Nityanand Mangesh Wagle, Esq.
Nawab Prince Mukarram Jah Bahadur.
Sir Jamsetjee Jejeebhoy,
Jaykrishna Harivallabhdas, Esq.
Nariman Kaikhushru Karanjia, Esq.
Shiavax Sorabji Khambata, Esq.
Akbar Hydari, Esq.

Branches and Pay Offices in all important Commercial Centres of India & Pakistan.

LONDON BRANCH : Orient House 42/45, New Broad Street, London, E. C. 2.

NEW YORK AGENTS : Morgan Guaranty Trust Co: of New York, The Chase Manhattan Bank.

Banking business of every description transacted on terms which may be ascertained on application.

Calcutta Main Office ... 33, Netaji Subhas Road.

LOCAL BRANCHES.

Ballygunge,	Bhowanipur,	College St	Kidderpore,
Barabazar,	Brabourne Rd.	Hatkhola	New Market,
Esplanade,	Park Street,	Bowbazar,	Shambazar,
Tollygunge,	Rabindra Sarani.	Postabazar Br.	Howrah,
			Manicktalla.

Branches in West Bengal.

Asansol, Bankura, Burdwan, Durgapur, Jalpaiguri, Kalimpong, Purulia, Raiganj, Siliguri.

Branches in Assam.

Gauhati.

Branches in Bihar.

Arrah, Bettiah, Bhagalpur, Chapra, Darbhanga, Deoghar, Forbesganj, Gaya, Jamshedpur, Jaynagar, Jharia, Katihar, Khagaria, Laheriasarai, Lakhisarai, Motihari, Monghyr, Muzaffarpur, Patna, Patna City, Ranchi, Raxaul, Samastipur, Sahibganj, Sasaram, Sitamarhi and Sewan & Dhanbad.

Branches in Orissa.

Sambalpur, Cuttack.

V. C. Patel.
GENERAL MANAGER

B. C. Sarbadhikari.
Chief Agent, Calcutta.

ফাগুন লাগার দিনে

আকাশে পলাশ দেখলেই বুঝতে হবে শীতের দিন শেষ হয়েছে। গায়ে-ঢাকা জামা আর পায়ে-ঢাকা জুতো— এই বেশ এখন বদলাতে হবে। ফাগুন লাগার দিনে চাই হাওয়া-খেলানো আরাম। পায়ের সেরা আরাম এখন বাটার স্যা-ডাল, স্লিপার, চপ্পলে। চলতি অবস্থায় পায়ের আরাম হাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা বাটার—বহু পরীক্ষাপ্রসূত নকশা, বাছাই বলিষ্ঠ উপকরণ, আর আধুনিক যন্ত্র প্রয়োগে যন্ত্র কারিগরের নিপুণ নির্মাণকৌশল। এই তথ্য পরীক্ষা করতে আসুন বাটার দোকানে। দেখুন নকশার বিচিত্র সম্ভার।

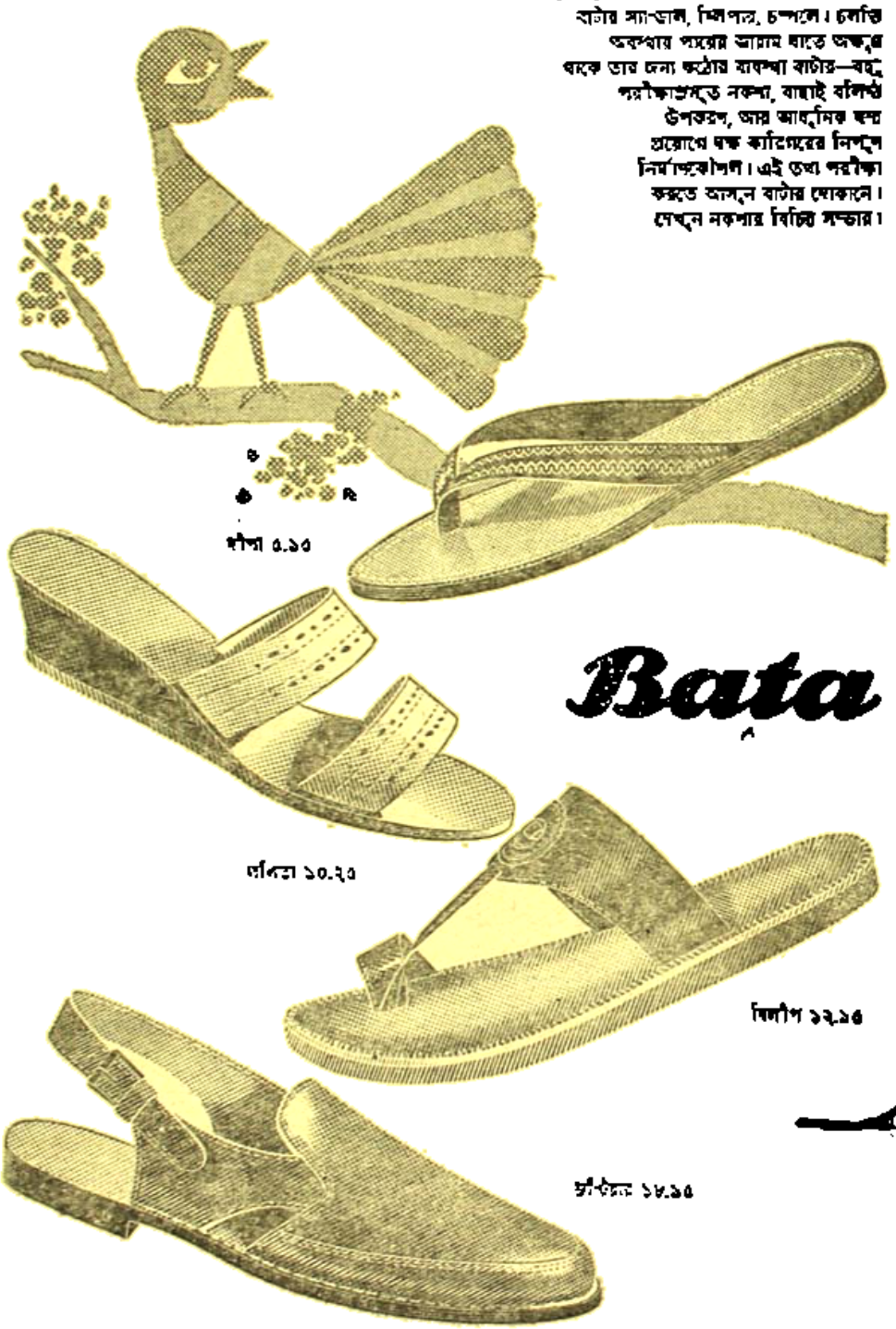

ভারতবর্ষ

শান্তির দূত

শিল্পী
অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

অপরাধ-বিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড। (যন্ত্রস্থ)

অপরাধ, অপরাধ-রোগী, অপরাধ-প্রবণতা, স্বভাব-অপরাধী, অপরাধ-বিভাগ, অপরাধ-চিকিৎসা, অপরাধ-সাহিত্য, খেউড় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় খণ্ড। (যন্ত্রস্থ)

অপরাধ-পদ্ধতি, বোগাস ম্যারেজ ট্রিকস্, ধর্মের পোশাকে প্রবঞ্চনা, ঠগী ভিখারী, মিথ্যা বিজ্ঞাপন, পকেটমার, গৃহ-চোর, রেলওয়ে ও ডাকঘরের অপরাধ, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদি।

তৃতীয় খণ্ড। দাম—৫৲

যৌনজ অপরাধ, যৌন-বোধ, প্রেম-বোধ, মিশ্র-প্রেম, প্রেম-রোগ, পরা বিদ্যা, ব্যভিচার, শ্লীলতাহানি, নারী-হরণ, ভ্রূণ-হত্যা, যৌনজ প্রবঞ্চনা, নারী-নির্যাতন, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি।

চতুর্থ খণ্ড। দাম—৪৲

রাজনৈতিক অপরাধ, বিধ্যাচরণ, পেশাগত অপরাধ, চুক্তাদি, চাটুকারিতা, উকীলকৃত অপরাধ, তেজারতি সংক্রান্ত অপরাধ ইত্যাদি।

পঞ্চম খণ্ড। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ। দাম—৬৲

অশ্লীলতা, আত্মহত্যা, অকারণ, মনোবিকার দাঙ্গাহাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, গুণ্ডামি, দ্যূতক্রীড়া, লালিয়াতি, হত্যা বা খুন, রাজনৈতিক হত্যা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ খণ্ড। দাম—৫৲

অপরাধ-নির্ণয়, অকুস্থল গমন ও পরিদর্শন, অপতন্ত্র, গ্রেপ্তার, ওয়াচ ও ট্যাপিঙ, খানা-তল্লাসী, বিবৃতি-গ্রহণ, প্রমাণ সংগ্রহ, পদচিহ্ন এবং টিপচিহ্ন, পদ্ধতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

সপ্তম খণ্ড। (যন্ত্রস্থ)

রোমহর্ষক ডাকাতি, বেনামা পত্র লিখন, অপহরণ, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধের বিজ্ঞান-সম্মত তদন্ত পদ্ধতি।

অষ্টম খণ্ড। দাম—৪৲

সাধারণ, স্বাভাবিক ও অসাধারণ উপায়ে অপরাধ নিবারণের বিভিন্নপ্রকার অভিনব উপায় সম্বন্ধে আলোচনাই এই খণ্ডের বিষয়বস্তু। তাছাড়া নিয়োগপ্রথা, জনবিক্ষোভ, পাহারা ও টহলের কার্য, আরক্ষবাহিনী এবং স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতির ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে গবেষণা করা হয়েছে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী "ভারতবর্ষ" পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবরণ

১। প্রকাশনার স্থান—২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট), কলিকাতা—৬।

২। প্রকাশনার সময়-ব্যবধান—মাসিক।

৩। মুদ্রাকরের নাম—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট), কলিকাতা—৬

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট), কলিকাতা—৬

৫। সম্পাদকের নাম—(১) শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—কাঁঠালপাড়া, ২৪ পরগণা।
(২) শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

৬। যে সকল অংশীদার মোট মূলধনের এক-শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানা—

(১) শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (২) শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (৩) শ্রীরমেন-কুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলি-কাতা-৬, (৪) শ্রীদীপেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ওরফে শ্রীপ্রদীপ-কুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলি-কাতা-৬, (৫) শ্রীমতী প্রভা দেবী—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

আমি শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১লা মার্চ,
১৯৬৬ সাল

স্বাক্ষর—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য
প্রকাশক

● মেয়াদী আমানতে (মেয়াদ অনুযায়ী) সর্ব্বোচ্চ বার্ষিক সুদ ৭½%

● সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে বার্ষিক সুদ ৪%

● রেকারিং ডিপোজিটে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করুন, আনন্দের সঙ্গে গ'ড়ে উঠবে সঞ্চয়ের অভ্যাস।

সেবার প্রতীক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেডঃ অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

যশস্বিনী মহিলা-কথাশিল্পী

অনুরূপা দেবীর

— অমর সাহিত্য-সাধনা —

গরীবের মেয়ে (ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৪-৫০

পোষ্যপুত্র ৪-৫০ **বিবর্তন** ৪৲

পথের সাথী ৩৲ **বাগ্‌দত্তা** ৫৲

রামগড় ৪-৫০ **হারানো খাতা** ৩৲

যে মহিয়সী মহিলার অবদানে বাঙলা সাহিত্যের বিগত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস সমৃদ্ধ হইয়া আছে—উপরের বইগুলি তাঁহার অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি। সৃষ্টি শক্তির বিশালতা—লিপিচাতুর্য ও চিত্ত বিশ্লেষণে মহিলা-ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

ফাল্গুন—১৩৭২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

ব্রহ্মনির্বাণ ও জন্মান্তরবাদ

শ্রীমৎ অনির্বাণ

(শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র-প্রবন্ধ)

প্রিয়বরেষু—বাইরে থেকে ঘুরে এসে আপনার চিঠিখানা পেলাম। জ্ঞান, ভক্তি আর কর্মের সমন্বয়ের একটি সুন্দর সূত্র ঠাকুর নিজেই দিয়েছেন গীতার শেষের দিকে :

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

আমি এ-কথার তুলনা পাই না। আমার প্রবৃত্তি তো তাঁরই প্রেরণায়। আর তিনি তো ছেয়ে আছেন সব কিছু—দেশে কালে ঘটনায় অঘটনে বাইরে ভিতরে—কোথায় তিনি নাই? কাজ তিনিই দিয়েছেন, শক্তির জোগানও দিয়ে চলেছেন সঙ্গে সঙ্গে। থামতে দিচ্ছেন না—না আপনাকে, না আমাকে। ব'সে ব'সে নাক টিপব, গাঁজার বুঁদ হয়ে শূন্য ব্রহ্ম অনুভব করব বা অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারে অহরহ ডগমগ থাকব বা ফুল তুলে মালা গেঁথে চন্দন ঘ'ষে তাঁকে সাজিয়ে অর্চনা করব—কিছুই তো করতে দিলেন না। তবুও সাধ যায়, অর্চনা করি। কোথায় ফুল পাব? বলি, আমার কর্মই তোমার পায়ে ফুলের অর্ঘ্য। এই যে চিঠি লিখছি, ঠাকুর! তোমাকেই লিখছি, নিজেকে গলিয়ে দিয়ে তোমার চরণ দুইটি দিচ্ছি।

এ-যাত্রায় যদি এই করাবে আমায় দিয়ে তাই তোমায় সাধ, আমি তাতে বাদ সাধব কেন? তোমার কাজ করব—এইই তোমার সেবা, এইই আমার পূজা জানব, তুমিই সব জুড়ে রয়েছ অন্তরে বাইরে—এইই আমার জ্ঞান।

এমনি ক'রেই যদি দিন কেটে যায়, থাক না। বন্ধু ধন্য তুমি। সুধা দিয়ে মারতাও যদি, বন্ধু ধন্য হরি! দেখা না দিয়ে কাঁদাও যদি, বন্ধু ধন্য হরি!

আপনি ঠিকই বলেছেন, আবার যদি জন্মাতে হয় তাতেই বা দুঃখ কি? এ-জন্মটা তো নিতান্ত বিশ্বাদ ঠেকে নি। দুনিয়াটা একেবারে বাজে তাই এইই বা বলি কি ক'রে? জন্মান্তরকে ভয় করা, জগৎকে মিথ্যা বলা—এগুলিই কুসংস্কার, এগুলিই অজ্ঞান। জন্মান্তরের বা জগতের কর্তা আমি নই। আমি তাদের সমালোচনা করতে যাই কোন সাহসে?

আসল কথাটি কি জানেন? অনেক কিছু কৃচ্ছ্র-সাধনার আড়ম্বর ক'রে কিছুই হয় না। সরল বুদ্ধিতে শেষের কথাটি বুঝে নিলেই হয়—"আমি তোমার।" যেখানে রাখো, যে-ভাবে রাখো, আমায় নিয়ে যা খুশি করো—আমি তোমার। "তুমি আমার"—এ-কথা বলার জোর আমার কোথায়? আর "তুমিই আমি"—এইই বা বলি কি ক'রে? শুধু জানি আমি তোমার, আমি তোমার। যেমন ক'রে আমায় গড়েছ, আমি তেমনি ক'রেই গড়া তোমার খেলার পুতুল। আমি তোমার খেলার পুতুল। আমি তোমার, আমি তোমার, আমি তোমার। নাস্তোব গতিরন্যথা।

সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শুধু কর্ম ক'রে কি তাঁকে পাওয়া যায়? জোরের সঙ্গেই বলব নিশ্চয় পাওয়া যায়। আমার গুরুদেবের কথা মনে পড়ে—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিন ঘণ্টা বিশ্রাম আর একুশ ঘণ্টা খাটুনি। আর খাটুনি চাষার মতো, মজুরের মতো। মনের মধ্যে অহরহ একটা ভাব—এ তোমার কাজ, যেন সুন্দর ক'রে করতে পারি। মাটি কোপাতে হচ্ছে—যেন সুন্দর ক'রে কোপাতে পারি। গান গাইতে হচ্ছে—যেমন সুন্দর ক'রে গাইতে পারি। ছাত্রদের বেদান্তের পাঠ দিতে হচ্ছে—যেন সুন্দর ক'রে দিতে পারি। স্ত্রী যেমন ক'রে স্বামীর সেবা করে, তেমনি ক'রে সেবা করা। আর তাইতে বুক ভ'রে উঠত, চোখে আলো ফুটত, শিরায় শিরায় শক্তি আর আনন্দের স্রোত বইত। তাঁর রহস্য চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন।

বাস্তবিক, গোপী না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না। ভালোবাসতে হবে ঠিক মেয়েছেলের মতো, ঠিক মীরার মতো। পুরুষভাব একেবারে বিসর্জন দিতে হবে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমি নিজেকে "পু" বলতে পারি না। একথায় তুলনা নাই।

আর পুরুষভাব যদি নিতান্তই বিসর্জন দিতে না পারি, তা হ'লে থাকব তোমার কিশোর সখা হয়ে, তোমার গোষ্ঠে তোমার সঙ্গে তোমার বেণু চরাব। এইই তো আমার কাজ। কর্ম তো নয়, গোষ্ঠলীলা। দিনের বেলায় গোষ্ঠ আর রাতে কৃষ্ণসেবা। তখন আর সখা নই, সখী—আমি তোমার সুবল, তোমার নর্মসখা—তোমার লীলার গোপন কথাটি যার কাছে তুমি উদ্‌ঘাটিত করেছ, যে একাধারে তোমার সখা আর সখী দুইই।

কিছু চাইবেন না তাঁর কাছে—মুক্তি নয়, জ্ঞান নয়, পুনর্জন্মনিরোধ নয়, সাধনার কৃচ্ছ্রতা বা ঐশ্বর্য বা বিভূতি কিছুই নয়। শুধু "আমরা তোমায় ভালোবাসি।"

আশা করি 'যে যে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ'—গীতা, ১৮।৪৬—নিজের নিজের কর্মে ব্রতী থেকেই মানুষ সিদ্ধিলাভ করে।

আপনার দ্বিতীয় পত্রখানা পেলাম। গীতার ঐ সমস্যার জবাব আপনি নিজেই দিয়েছেন। জ্ঞানের ভিতর দিয়েই হোক বা প্রেমের ভিতর দিয়েই হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাঁকে না পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বস্তুতই দুঃখী। অথচ এমনি মোহের ফের যে, আমরা যে দুঃখে আছি, সে-কথাটা বুঝতেই পারি না। ভাবি—"বেশ আছি।" এই নাম অবিদ্যা—বেশ যে নেই যা নিয়ে মেতে আছি তাই পরমার্থ নয়, তারও পরে আরও কিছু আছে—তা বুঝতে না পারা। শাস্ত্রে এটাকে বলেছে বিপর্যয়বুদ্ধি বা wrong valuation of life। আমাদের দেশে দুঃখবাদী দর্শনগুলি অবশ্য এটার উপর খুবই জোর দিয়েছে। যদিও গীতা ততটা জোর দেয় নি, তবু গোড়ার কথাটা সেও মেনে নিয়েছে। দুঃখবাদী দর্শনগুলি

অবিদ্যার একটা সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাই বাংলালো—দেহ ধরলেই যখন দুঃখ পেতে হয়, তখন আর যাতে দেহ না ধরতে হয়, তার একটা উপায় করো। বাসনা, ভোগের আকাঙ্ক্ষা—এই হল দেহ ধারণের মূলে। চিত্তে যদি বাসনা না থাকে, তা হলেই এই যে ভোগায়তন দেহ, এটা ধরবারও কোনও প্রয়োজন থাকবে না।

এই থেকে বেরিয়ে এল জ্ঞান আর বৈরাগ্যের পথ। চিত্তকে বাসনাশূন্য করবার কথা অবশ্য ভক্তও বলেন—বিষয়সুখে আর ভাগবতসুখে তাঁরাও তফাৎ করেন। কাজেই গোড়ার দিকে দুজনের পথ খানিক দূর পর্যন্ত একই—সংসারের মোহ কাটাতে হবে, বিষয়তৃষ্ণা বর্জন ক'রে তাঁর তৃষ্ণা অর্জন করতে হবে।

তা না হয় করলাম। কিন্তু ক'রে পাব কি? এইখানে এসে দুটি দর্শনের দু'রকম রায়। দুঃখবাদী দর্শন বলবে, বাসনা বর্জন করলে আর সংসারে তোমায় আসতে হবে না, তুমি শূন্যে মিলিয়ে যাবে। ভক্তের দর্শন বলবে, শূন্যে মিলবে কেন, পাবে তাঁকে—যিনি এই সব কিছু হয়েছেন।

উপনিষদে এই দুই পথের কথাই আছে। একটি হচ্ছে যাজ্ঞবল্ক্যের নেতিবাদ—যদিও তিনি একেবারে সব উড়িয়ে দেন নি—আর একটি হচ্ছে শাণ্ডিল্যের ইতিবাদ—তিনি বললেন, সবই ব্রহ্ম জেনে শান্ত হয়ে উপাসনা করো।

গীতা এই দুটি বাদের মধ্যে একটা সমন্বয় করে নিয়েছেন গোড়াতেই। প্রথমেই বলেছেন, তাঁকে পেতে হবে, তাঁতে স্থির হতে হবে, তার জন্যে যদি বলতে হয় সংসার দুঃখময়—সেটা মিথ্যা বলা হবে না। কিন্তু তাঁকে পেয়ে হাওয়া হয়ে গেলে চলবে না—ফিরে আবার এখানে আসতে হবে, তাঁর কাজ করতে হবে। এই হল ব্রাহ্মীস্থিতি। তার পর ব্রহ্মনির্বাণ? সে তো আছেই। যে দিন এখানকার কাজ ফুরিয়ে যাবে, সেদিন ব্রহ্মনির্বাণ তো আসবেই, এমন কি এখনও ব্রহ্মনির্বাণের অনুভূতি তোমার হবে—যদি তুমি নিজেকে জানো। আর নিজেকে না জানলে তাঁকেও জানা যায় না। তাই তো গীতার প্রথম দিকটায় ভগবান আত্মজ্ঞানের উপর এত জোর দিয়েছেন।

যখন নিজেকে জানলাম, তাঁকে পেলাম, তখন তাঁর কর্ম করে জীবনপাত করব। তখন আর আমি তো কর্তা নই, অকর্তাও নই—আমি তাঁর নিমিত্ত। তিনি নিজেই বলছেন, "আমি বারবার এ-পৃথিবীতে এসেছি, তুমিও এসেছ অর্জুন, কিন্তু তুমি তা জানো না, আমি জানি।" আমি যদি ঠাকুরকে পেয়ে ঠাকুরের সাধর্ম্য লাভ করতে পারি, (এটা গীতারই কথা) তাহলে তিনি যখন বারবার আসবেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর ভল্লি ব'য়ে আমিও আসব না কেন? এই একটা আশ্বাস কিন্তু গীতায় আছে তাতে পুনর্জন্মের সমস্যাটার সমাধান হয়ে যায়।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু উপদেশো বামদেববৎ (৩০)
শাস্ত্রদৃষ্ট অনুসরি এই উপদেশ দেয়া হয়
বামদেব ঋষি যেমন করিয়া বুঝায়ে সবারে কয়
ইহ নিজেকে কয়
হইয়া ব্রহ্মময়
ব্রহ্মরে যে জানে আপনি যেজন ব্রহ্ম হইয়া যায়
বামদেবও এই ব্রহ্মে জানিয়া ব্রহ্মধনেরে পায়।
বলে বামদেব আমি মনু আমি সূর্য্যও আমি হই
সবের ভিতরে বিরাজে ব্রহ্ম আমি তিনি ছাড়া নই।
জীবমুখ্য প্রাণ লিঙ্গাৎ ইতিচেৎ ন
উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ ইহ তদ্যোগাৎ (৩১)
উপনিষদের এই কথাগুলি আলোচনা হল হেথা
তাহাদের মাঝে জীবেরও প্রাণবায়ুরও রহিল কথা
বাক্যারে নয় বক্তারে জেন
মন্ত্রধনের দাতাটিকে চেন
জীবই বক্তা জীব লক্ষণ স্পষ্টই দেখা যায়
প্রাণই বক্তা জ্ঞানময়রূপে প্রাণেরেই পুনঃ চায়
প্রাণশক্তির জোরে
শরীরে ঊর্দ্ধে তোলে।
প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ।
সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ্যাধিকরণ
সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (১)
ছান্দোগ্য উপনিষদ (৩।১৪।১)
সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত,
অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ যথাক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো,
ভবতি তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্বীত মনোময়ঃ
প্রাণশরীরঃ ভারূপ।
জগৎ ব্রহ্মময় ব্রহ্মে সৃষ্টি হয়
ব্রহ্মে বিলীন ব্রহ্মে অবস্থান
শান্ত হইয়া তাই ভাবিলো সর্ব্বদাই
করো উপাসনা করো জীব তাঁর ধ্যান।
সংকল্প বিকল্পময় মানব শরীর হয়
মরণের পর জনমে সে রূপ লভে।
মনোময় প্রাণদেহ হয় নিঃসন্দেহ
তেজোময় হতে বুদ্ধিমানেতে চাহে।
বাক্যের প্রারম্ভে হেথা ব্রহ্ম বলি কয়,
মনপ্রাণ থাকিলেও ব্রহ্ম ছাড়া নয়।
ব্রহ্মের সকল গুণ বিস্তারিয়া কয়,
তাহাতে উৎপত্তি স্থিতি তাহাতে প্রলয়।
তজ্জলান শব্দ অর্থে তাঁহা হতে জাত,
তাহাতে বিলীন হয় তাঁহাতেই রত।
জীবের উল্লেখ হেথা কখনই নাই
ব্রহ্মের মহিমা শুধু গাহে সর্ব্বদাই।
বিবক্ষিত গুণোপপত্তেশ্চ (২)
বিবক্ষিত গুণাবলি ব্রহ্মে ছাড়া নাই
শ্রুতিতেও ঋষিগণ বলেছেন তাই
প্রথম সূত্রেতে শ্রুতিবাক্যে যেন আছে
তাহার পরেতে শ্রুতিবাক্যে বলিয়াছে।
সত্য সংকল্প যার ইচ্ছামাত্র হয় তাঁর
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যা হয়
আকাশের মত আত্মা থাকিয়াও নির্লেপকতা
শুধু ব্রহ্মে অন্য জীবে নয়।
অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ (৩)
অনুপপত্তেঃ অর্থ তাহার যুক্তিযুক্ত হয়না বলিয়া তাই
তু অর্থেতে নিশ্চয়, ন শারীরঃ জীব হবেনা ও তাই
পূর্ব্ব সূত্রে শ্রুতির যেমন
বলিয়াছি নানা গুণ সে যেমন
যত গুণ যেনো ব্রহ্ম ছাড়া সে কখনও কাহারও নয়
শরীরে থাকিয়া শারীর তিনিই জীবরূপে সেই রয়।
শরীর হইতে বাহিরেও জেনো ব্রহ্ম যেমন রয়
জীব সে কিন্তু শরীর বাহিরে
কোথাও নাহিক রয়।

জীবকে শারীর বলা হয় নাই
ব্রহ্ম শরীরে আবদ্ধ নাই
শরীরেতে গত জীব চিরদিন ব্রহ্ম সকল নয়
শুধুই শারীর বলিতে ব্রহ্মে যুক্তিযুক্ত নয়।

কর্ম্ম-কর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ (৪)

ব্রহ্মকর্ম্ম জীবকে কর্ত্তা উল্লেখ হেথা আছে
তাই মনোময়ে ব্রহ্মে বুঝায় জীব সেথা হবে না যে
তাই শ্রুতি কয় এই মনোময়
গুণ যাহা শুধু ব্রহ্মেতে রয়
জীবের মৃত্যু হইলে সেটুকু ব্রহ্মে গ্রহণ করে
জীবের মধ্যে যা কিছু অমর ব্রহ্ম অংশ ধরে।

শব্দবিশেষাৎ

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে—

যথা ব্রীহির্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা
এবম অয়ম অন্তরাত্মনঃ পুরুষো হিরণ্ময়ো বা জ্যোতিরধূমম।

শ্যাম ধান্যেতে তণ্ডুল যথা সূক্ষ্ম রূপেতে রয়
জীবাত্মা মাঝে সোনার বরণ পুরুষ তেমনি রয়
ধূমহীন জ্যোতি হেন উজ্জ্বল
মূরতি তাঁহার করে ঝলমল
অন্তরাত্মা বলিয়া জানিও তাঁহারে বুঝারে কয়
মনোময় সেই জীবাত্মারূপে মোদের
শরীরে রয়।

স্মৃতেশ্চ (৬)

পুরাণ এবং ইতিহাস মাঝে একথা উক্ত আছে
জীব উপাসক উপাস্য হয়ে ব্রহ্মই বিরাজিছে
তাইত বলেছে গীতায় সে কথা
মধুময় সেই মধুর বারতা
"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।
সবাকার হৃদে থাকিয়া যে জন
মায়ার দ্বারায় করেন চালন
শঙ্কর বলে জীব ও ব্রহ্মে কোন কিছু ভেদ নাই
দেহ ইন্দ্রিয় মন ও উপাধি জড়ায়ে প্রভেদ তাই
ব্রহ্ম ভিন্ন নহে কোন জীব
জ্ঞানীজন জানে প্রতি জীবে শিব
এ কথা না বুঝে এই ভেদাভেদ ভুলের সৃষ্টি যত
তিনিই স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টি সবি তাঁর অনুগত।

অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ ন ইতি চেৎ
ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ (৭)

ক্ষুদ্র আবাস স্থানে সেই জন বিরাট পুরুষ রয়
হৃদয় কমলে রাজে সেই জন সেই জন মনোময়
এষ ম আত্মা অন্তর হৃদয়ে
ইনিই আমার আত্মা যে হয়ে
হৃদয়ের মাঝে রহেন আপনি আমার হৃদয় রাজ
অণীয়ান ব্রীহের্বা যবাদ্বা মত কখন ধরেন সাজ।
ইতি চেৎ বলি আপত্তি যদি করে এই কথা কেহ
রাখিও না মনে কোন অবকাশ করিতে এ সন্দেহ
ব্যোমবৎ হয়ে আকাশেতে রয়
সূচীবৎ হয়ে সূক্ষ্ম সে হয়
হৃদয় মধ্যস্থিত সেই জন সর্ব্বগত সে হয়
কহে শঙ্কর শালগ্রামেতে যেমন শ্রীহরি রয়।

সম্ভোগপ্রাপ্তি রিতি চেৎ ন বৈশেষ্যাৎ (৮)

কেহ কেহ বলে ব্রহ্মই যদি জীবের মধ্যে রয়
জীবের সুখ ও দুঃখ তাহলে ব্রহ্মভোগ্য হয়।
হয়না জানিও তাহা
ব্রহ্ম বিশেষ যাহা
সেই প্রভেদেতে পাপ ও পুণ্য পায় সে পরশে লয়
অল্প শক্তি জীবের জানিও সুখদুখ দুই-ই হয়।
তিনি অপহত পাপ্মা যেমন সর্ব্ব শক্তিমান
সর্ব্ব যাঁহার জানা সেই তিনি তিনিই জগৎপ্রাণ
পাপলেশ যেথা নেই
শুদ্ধ সর্ব্বদাই
শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ কর্ম অধীন নয়
সাক্ষী যেমন দ্রষ্টা হইয়া জীবের মধ্যে রয়।
(মুণ্ডকোপনিষদ) তয়োরন্য পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্নন্য অভি চাকশীতি।

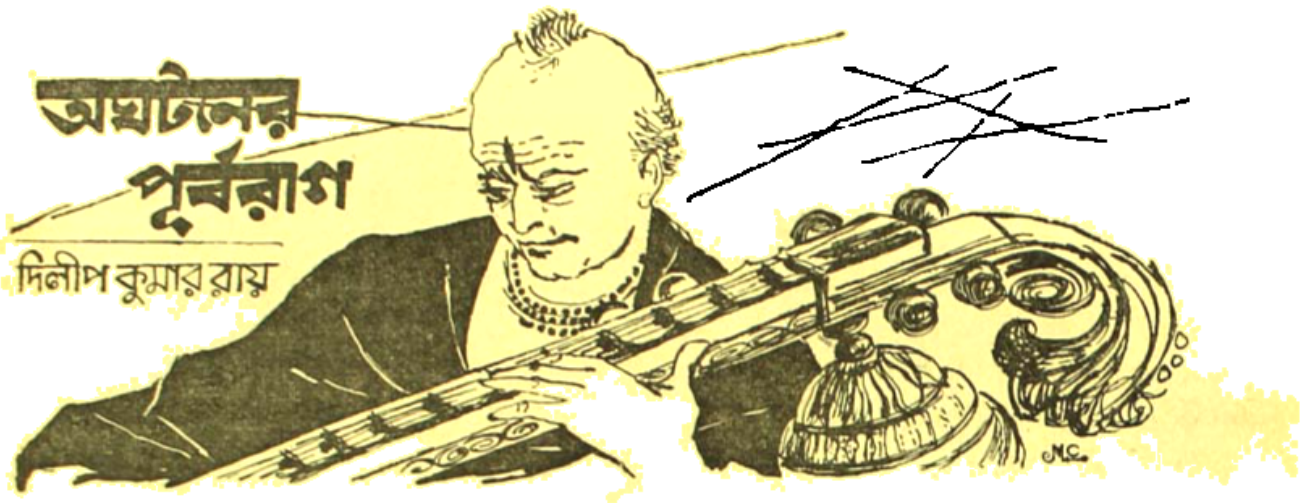

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উনিশ

বার্বারা (উৎসুক কণ্ঠে) কিন্তু থামবেন না দাদা। তারপর ? এত সুন্দর কথা—শুনলে মনে হয় যেন দৈববাণী শুনছি !

অসিত : সাধুজির কথায় আমার মধ্যে উল্টোপাল্টা ভাব জেগে উঠল দেখতে দেখতে। আমি নিজেও কেবে-ছিলাম রাণীসাহেবার কাছে ক্ষমা চেয়ে গান শোনাব তাঁকে। কিন্তু অপরের মুখে উপদেশে এই বিধানটা শুনবা-মাত্র মন কেমন যেন রুখে উঠল। কিন্তু কী বলব ভেবে না পেয়ে অশান্ত হয়ে উঠছি ভিতরে ভিতরে এমন সময়ে মূর্ছনা বলল :

"এ ধরণের কথার পিঠে কোনো কথা বলতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা সাধুজি, তবে যদি রাগ না করেন তবে জিজ্ঞাসা করতে সাধ হয় যে, সত্যিই কি ভক্ত যখন ভক্তির গান গায় তখন সে ভগবানকেই শোনায় ? আমরা তো কেউ কস্মিন্‌কালেও দেখি নি এমন জীব ! আপনি দেখেছেন কি ?"

সাধুজি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মিট মিট ক'রে বললেন : "আমার এ-মালঞ্চীটির জিভে থেকে থেকে দুষ্টু সরস্বতী ঠাকরুণ ভর করেন কী ভাবে তুমি ভুক্তভোগী জানোই তো হাড়ে হাড়ে। তখন ইনি কী রূপ নেন জানো ? স্রেফ তার্কিকের—যে তর্কের জন্যেই তর্ক করে।' ব'লেই ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন : "তবে শোনো মা লক্ষ্মী, আমার একটা স্বচক্ষে দেখা মানুষের কথা বলি।"

ব'লে একটু থেমে সুরু করলেন : "সেবার কাশীতে একটা মস্ত সঙ্গীত-কনফারেন্সে আমি ফার্স্ট হয়েছি। আমার সমাদরের আর সীমা নেই। কাশীর রাজবাড়ী থেকে আরম্ভ ক'রে হরিসভা পর্যন্ত সবাই পাঠায় ভেট নজর প্রণামী। নিমন্ত্রণের ধূমধামের হাওয়ায় আভিমানের নৌকো আমার পাল তুলে চলেছে মাঝ দরিয়ায়।

"হঠাৎ দেখা এক বাবাজির সঙ্গে। মাথা মুড়োনো, গায়ে শুধু একটা পাতলা নামাবলী, হাতে তুলসীর মালা। এসেছিলেন কাশীর গায়কমণ্ডলীর এক সভায় আমার গান শুনতে।

"এলেন—যখন আমার গান শেষ হ'য়ে গেছে। কিন্তু হাসিমুখে সোজা কাছে এসেই বললেন : বাবা, তোমার নাম শুনে এসেছি অনেক দূর থেকে—যদি একটি ঠাকুরের নাম শোনাও।'

"বাবাজির নাম আমিও শুনেছিলাম—তাই এ অনু-রোধে খুশী হ'লাম বৈ কি। কিন্তু সেদিন আসর ভেঙে গেছে—তাড়া আসরে গাইতে অহমিকায় বাধল। বললাম : বাবাজি, পরশু কাশীনরেশের রাজবাড়ীতে আমার গান হবে, যদি আসেন তবে শুনতে পাবেন।

"তিনি বললেন : যাবো বৈ কি বাবা, কিন্তু একটি কথা : সেখানে তুমি ঠাকুরের গান গাইবে তো ?

"আমি তাচ্ছিল্যভরে বললাম : 'ওসব গানটান আমি গাই না বাবাজি, তবে ভালো ভালো ধ্রুপদ খেয়াল হবে। আরো বড় বড় ওস্তাদ আসছেন।'

"বাবাজি বললেন : "ও।"

"তাঁর নিরাশ সুর শুনে আমার হঠাৎ খুব রাগ হ'ল। কিন্তু প্রকাশ না ক'রে ছোট্ট নমস্কার ক'রে ইচ্ছে ক'রেই অন্য দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে কাশীনরেশের সেক্রেটারির সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'বাবাজিটি কে?' আমার পাশে এক বৈষ্ণব ছিলেন—তিনি ব'লে উঠলেন : প্রভুপাদকে জানেন না? উনি যে শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত গোস্বামী। অতবড় কীর্তনী ভূভারতে দুটি নেই। ওঁর পদবী সুধাকণ্ঠ।"

"কীর্তনী শুনে সেক্রেটারির ঠোঁট দুটি বিদ্রূপে অষ্টাবক্র হয়ে উঠল। বললেন : 'ও।'

"আমার কের দয়া হ'ল বাবাজির উপরে। আত্ম-গৌরবের গর্বও এল, বাবাজির দিকে ফিরে বললাম : 'গোঁসাইজি, ইনি হচ্ছেন কাশীনরেশের সেক্রেটারি। যদি বলেন তো এঁকে বলি আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে—মহা-রাজকে আপনার গান শুনিয়ে আসবেন।' বাবাজি বললেন হাত জোড় ক'রে : তাঁকে গান শোনাতে পারলে, খুবই খুশী হতাম বাবা, তবে হয়েছে কি জানো? আমি এক ঠাকুরের উৎসব ছাড়া তো কোথাও যাই না। আর গাই নিজের ঘরে গৃহবিগ্রহের সামনে। সেখানে যদি কাশী-নরেশ পায়ের ধুলো দেন তবেই তাঁকে গান শোনানো সম্ভব হবে—নইলে তো হতে পারে না বাবা! ঠাকুরের মানা।'

"আমার ভারি রাগ হ'ল বললাম : "গোঁসাইজি, কাশীনরেশ যার তার ঘরে গিয়ে গান শোনেন না। তাঁকে গিয়ে গান শুনিয়ে আসতে হয়। অত বড় সমজদার সারা হিন্দুস্থানে কমই আছে।"

"বাবাজি হাত জোড় ক'রে বললেন : বাবা, রাগ কোরো না। আমি গান শোনাই তো সমজদারকে নয়—আমার ঠাকুরকে।—কিন্তু সে কথা থাক, তুমি আজকে একটিও ঠাকুরের গান শোনাবে না বাবা? অনেক দূর থেকে এসেছি যে তোমার নাম শুনে।'

"সেক্রেটারির মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠল। তিনি খাড়া বাংলায় বললেন : "গোঁসাইজি, ওস্তাদজির ঠাকুর না থাকতে পারে, কিন্তু তিনিও যার তার সামনে গান করেন না জানবেন। তা ছাড়া ভালো গান শুনতে হ'লে সময়ে আসতে হয়—যখন তখন গাওয়া চলে ঠাকুরের জন্যেই। এ আপনাদের বাংলা কীর্তন নয়—এতে তানপুরা চাই, পাখোয়াজ চাই, তবলা চাই, সারঙ্গি চাই, তোড়জোড় চাই, ভালো শ্রোতা চাই—ঠাকুরের গানে যা-তা সঙ্গত যা নেই-সঙ্গত হ'লেও চলে, কিন্তু এ হল শ্রুতির সাধের গমকের রাগের দুন চৌদুনের খেলা। বুঝলেন? যান বাড়ী যান, ওস্তাদজিকে বিরক্ত করবেন না।"

"আর বাক্যব্যয় না ক'রে বাবাজি নমস্কার ক'রে উঠে চ'লে গেলেন মালা জপতে জপতে। মুখে তাঁর ক্ষোভের লেশও দেখলাম না।

"বাড়ী ফিরে সারারাত ঘুমুতে পারলাম না। নিজের চোখে কেমন যেন ছোট হ'য়ে গেলাম। এ কী করলাম, কী করলাম? মনে পড়তে লাগল বাবাজির ভাবে-ভোলা মুখখানি, তাঁর নির্মল হাসি, প্রসন্ন কণ্ঠ!—এ আঁধার দুনিয়ায় যে মুখ সর্বদাই আলোয় ভরা তাকে ভোলাও তো খুব সহজ কথা নয়। অথচ এ নিরভিমান মানুষটির কী গভীর ঔদাসীন্য কাশীনরেশের প্রতি! যাঁকে গান শোনাবার জন্যে আমরা সবাই লালায়িত—এ লোকটি তাঁকে অম্লানবদনে ডাকল কি না তাঁর ছোট্ট কুটীরে! কোথায় পেল বাবাজি এ গভীর বৈরাগ্য—আত্ম সমাহিতি? হঠাৎ কে যেন ব'লে উঠল ভিতর থেকে—এ ভাবে ছোটাছুটি ক'রে রাজারাজড়ার চিত্তরঞ্জন করবার জন্যেই হয়ত দেবাদিদেব রাগরাগিণীর সৃষ্টি করেন নি। তবু বাবাজির ওখানে গিয়ে তাঁর গান শুনে আসতে প্রবল ইচ্ছা হ'লেও কিছুতেই যেতে পারলাম না। অথচ বাবাজি তো ছুটে এসেছিলেন শিশুর মতনই গোপালের একটি গান শুনতে। ধ্রুপদী চাল মেরে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে কী চতুর্বর্গ লাভ হ'ল আমার? পরদিন ভোর বেলা উঠেই লক্ষ্ণৌও চলে গেলাম। সেখান থেকে কাশী-নরেশের সেক্রেটারিকে তার ক'রে দিলাম যে মাপ পাব পরশু সেখানে যে গান করার কথা ছিল—এযাত্রা হ'ল না, মহারাজ যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

"এর প্রায় বছর খানেক বাদে" বললেন সাধুজি,

"একদিন সকালে চলেছি আমরা মোটরে—এলাহাবাদে গঙ্গাতীরে। হঠাৎ একটি বাড়ী থেকে শুনলাম অপরূপ কণ্ঠে কে কীর্তন গাইছে। মোটর থামিয়ে কান পেতে শুনছি—এমন সময় বাড়ী থেকে একটি সুদর্শন গৌরবর্ণ যুবক বেরিয়ে এসে নমস্কার ক'রে বলল হিন্দীতে: 'অন্দর তশরীফ লাইয়ে ওস্তাদজি, আইয়ে সাব।

"নিজের খ্যাতির কথা ভেবে পুলকিত হ'য়ে গেলাম ভেতরে।

ওহো! দেখি সেই বাবাজি—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত গোস্বামী! একটি খোল কোলে, নিজে বাজিয়েই গাইছেন কীর্তন—ঊর্ধ্বনেত্রে। চোখে বিন্দু বিন্দু জলধারা গড়াচ্ছে—পাশের এক ভক্ত দিচ্ছে মুছিয়ে। শ্রোতা অবশ্য বাঙালীই বেশি—তবে দুচারজন পশ্চিমে বইসও ছিলেন—তাঁরা আমি আসতেই সশব্যস্তে দাঁড়িয়ে সেলাম করলেন—'আইয়ে ওস্তাদজি, আইয়ে!

"কিন্তু গোঁসাইজি ফিরেও তাকালেন না—তাঁর সামনের চণ্ডীমণ্ডপে শ্বেতপাথরের শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে গেয়ে চললেন বিখ্যাত গৌরাঙ্গ-কীর্তন—যে মহাপুরুষের কথা তোমাদের বলেছি বহুবারই:

প্রেমে গড়া তনু, প্রেমে গড়া মন যার,
প্রেমে গড়া প্রাণ, নয়নে প্রেমের ধার
আঁখিতে প্রেমের আলো
সবারে বাসিয়া ভালো
যে-তুমি চেতনা আলো—বেদনায় বসুধার,
সে তোমারে করি বন্দু, নমস্কার॥
কে বলে ধরণী কুরূপ অন্ধকার,
যেথা রূপ ধরো তুমি নাথ করুণার?
যে তুমি সবার কাছে
এসে বলো—"ওরে আছে
আছে সে হৃদয় মাঝে—প্রেমে মিলে দেখা তার,"
সে-তোমারে করি বন্দু, নমস্কার॥
জীবন সরল নয়, সে অমৃতসার,
জানি—তবে বরি চরণধূলি তোমার।
যে-তুমি বাজায়ে বাঁশি
যুগে যুগে ফিরে আসি'
দীনভবে ভালোবাসি' পরালে কণ্ঠহার,
সে-তোমারে করি বন্দু, নমস্কার॥

(আলো জ্বেলেছ···প্রভু, তুমি আলো এনেছ···মহাপ্রভু, ভালোবেসেছ···অপ্রেমের অবনীর অমায় এসে তুমি আলো জ্বেলেছ···)

"আহা সে কী গান অমিত! সত্যি, চোখের সামনে সুরে তানে যেন গৌরাঙ্গদেবের আলো-ভরা ছবি ফুটিয়ে তুললেন ভক্তকবি। গানে মধুর আস্বাদ পেয়েছি মাত্র দুচারবার—এ-স্বাদও দুর্লভ বটেই তো।—কিন্তু এ-আনন্দ তো মধু নয়, এ যে অমৃত—দুর্লভেরও বাড়া—যখন আসে—আসে করুণা হ'য়েই, নামে আকাশ-গঙ্গার মতনই কালো ধরণীর তৃষিত বুকে। যে-দিকে তাকাই দেখি চোখের জল, চিকের ভিতর থেকেও চাপা কান্নার সুর ভেসে আসে। এ-সাড়া আর ওস্তাদি গানের শোভানাল্লা, সাবাস, বাহবা? এদের থাকই যে আলাদা বাবা!

দুর্ধর্ষ ওস্তাদ পীতাম্বর কোনো দিন কোনো গায়কের কাছে মাথা নোয়ায় নি অমিত, কিন্তু সেদিন আর থাকতে পারলাম না। মনে অনেকদিনের ঘিতিয়ে-যাওয়া সেই অনুতাপ উঠল আকুলি-বিকুলি ক'রে। করেছি কী! এমন গুণীকে এমন ভক্তকে এমন কবিকে বিমুখ করেছি চাষার মতন! গান শেষ হ'তেই সবাই গোঁসাইজিকে ছেঁকে ধরল—প্রণামের সে কী ধুম। আমিও গিয়ে হেঁট হ'লাম তাঁর পায়ের ধুলো নিতে।

"বাবাজি 'আহা করেন কি ওস্তাদজি,' ব'লেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি অনুতপ্ত কণ্ঠে বললাম: 'মনে আছে গোঁসাইজি?'

বাবাজি প্রণয়কণ্ঠে বললেন: 'আহা আপনাকে মনে থাকবে না ওস্তাদজি?—ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন যে—ওরে, ওর মুখেই শুনবি তুই একদিন হরিনাম।'

আমি বললাম: 'নাম-টাম তো জানি না গোঁসাইজি, জানি এক আধটা ভজন। গোঁসাইজি হেসে বললেন: 'সে-ই তো হরিনাম বাবা। আহা ভজন—মীরা কবীর দাদু তুলসীদাস সুরদাস'—ব'লে কপালে কৃতাঞ্জলি ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে চোখ মুছে—'নাম করলেও পুণ্য যে!—আর ও-তো সবই এক বাবা, কীর্তনও যা ভজনও তাই, গির্জের

সাহেব-মেমরা যে যীশু-ভজনা করেন সে-ও তাই। একই হৃদয় ডাকছে আকুল হৃদয়ে তাঁকে, যিনি"—ব'লেই বাবাজি সুর ধরলেন :

'কিয়ে মানুষ পশু পাখিরে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ'—তাছাড়া বাবা, হিন্দি বাংলা তো একই মায়ের দুই ছেলে—পিটোপিটি—তফাৎটা কোথায় ?—এসো বাবা এসো ঐখানে আমার কুটীরে এসে দুটো নাম শোনাও—তোমার নাম কে না শুনেছে—এসো, বড় ভাগ্য আমার যে তোমার দর্শন মিলল।"

'কী যে বলেন আপনি'—ব'লে তোর ক'রেই ওঁর পায়ের ধুলো নিলাম। কী দীনতা ও উদারতা! মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

"পায়ে হেঁটেই চলেছি বাবাজির সঙ্গে। তাঁর হাতে হরিনামের মালা সর্বদাই ঘুরছে। কাছেই গঙ্গাতীরে একটি রাধাবল্লভের মন্দির। বাবাজি ধুলোর ওপরেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। তারপর মুখে আর কথা নেই—কেবল ঠোঁট নড়ছে : 'গৌর গৌর গৌর।'

"ছোট্ট একখানি কুটীর! শুনলাম মন্দির আর এই কুটীরটি বৃন্দাবনের এক শেঠ গোঁসাইজির অন্তেই তৈরি করিয়ে দিয়েছেন।

"কী সুন্দর পরিবেশ! পাশ দিয়ে ব'য়ে চলেছেন মা গঙ্গা, আহা! 'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে জ্ঞানবিমুক্তিদায়িনি-তটবিহারিণি ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে' ব'লে গোঁসাইজি গেয়ে উঠলেন—সঙ্গে সঙ্গে 'একটু বোসো বাবা, একটা ডুব দিয়ে মলিন আধারটাকে শুদ্ধ ক'রে নিই'—ব'লেই দিলেন ঝাঁপ। মিনিট পাঁচেক একটু সাঁতার কেটেই উঠলেন—তখন পরণে শুধু কৌপীন।

"কুটীরে এসে বসলাম দুজনে। চারদিকে অগুন্তি কৌতূহলী মানুষ ঠেলাঠেলি করছে। গোঁসাইজির ভক্তরা সামলাতে পারছে না।

'গাও বাবা, এবার একটু নাম শোনাও' বললেন বাবাজি!

'বললাম : 'আপনার কাছে গাইবার কী যোগ্যতাই বা আছে আমার বাবাজি ?'

"বাবাজি স্নিগ্ধ হেসে টুক ক'রে বললেন : ঠাকুরের গান ঠাকুরকে শোনাবে এতে যোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে কী ক'রে ? আর গঙ্গাপূজা কি গঙ্গাজলে ছাড়া হ'তে পারে বাবা! গাও।"

"সাধুজি চোখে মুছলেন।"

* * *

মোটরে যখন মূর্ছনার সঙ্গে বেরুলাম—তখন রাত প্রায় দশটা। আমাদের বেরুনোর কথা ছিল পরে নটায়, কিন্তু সাধুজির জন্যেই দেরি হ'য়ে গেল।

সত্যি সেদিন মনটা যে কী বিমল আনন্দে ভ'রে গিয়েছিল মন্ত্রীসাহেবের কাছে ক্ষমা চাইব ভাবতে! আর কেবলই মনে হচ্ছিল, আমাদের আত্মাভিমানকে বিদায় দিলে এ-সুখ কত সহজেই মেলে! অথচ কেন যে পারি না কিছুতেই! কেন বৃথা ঘুরে মরি মিথ্যে মরীচিকার লোভে? আর কাকে দমন ক'রে? কী পাই এই অন্ধ অহমিকার তামসিকতায়? আত্মহত্যা বলে আর কাকে?

কিন্তু গাড়িতে দেখলাম ওর মুখ ম্লান। বললাম : "কী হয়েছে মূর্ছনা?"

ও বলল : "মনে শান্তি পাচ্ছি না অসিত, মনে হচ্ছে যেন তোমার ওপর জোর খাটাচ্ছি—যা তুমি করতে চাওনি স্বেচ্ছায়—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম : "কেন অকারণ এমন বাজে কথা ভেবে মন খারাপ করছ বলো তো? আমি বুঝতে পেরেছি কী অন্ধ আমি, অথচ জ্ঞানের গুমরে মাটিতে পা পড়ে না।"

"এমন কী আর অন্ধ?"

"অন্ধ না? সাধুজি যা বললেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয় কি? ভজন গাওয়ার অভিমানকেও পুষে রাখব, অথচ লোকের কাছে সম্মান চাওয়ার ফর্দে এক আধলা পাওনা কম হ'লে চক্ষে আঁধার দেখব। তাহ'লে ওস্তাদি গান আর কী এমন দোষ করেছিল বলো দেখি?—না মূর্ছনা, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, আমার ভুলটা তোমার দরুণই টের পেলাম এ-ভাবে।"

ও ছোটর খানিক। স্থানটি খুব নির্জন। দুপাশে কেবল গাছ। বলল "তুমি বড় ভালো অসিত! সত্যি কত সময়ে তোমাকে কত বিঁধেছি বাক্যবাণে! আমাকে ক্ষমা করবে না?" ব'লে ও এক হাতে আমার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে আমার কাঁধে মাথা রাখল। দুজন গাড়িতে সন্ধ্যার আলোয়

বালচীপুরের ফুটফুটে আকাশের নিচে ওর মুখখানি কী মিষ্টি যে দেখায়! সত্যি বলতে কি, ওকে সুন্দরী মনে হয়েছে আমার বহুবারই, কিন্তু ও যে মিষ্টি হ'তে পারে—কখনো মনে হয় নি। শমিতা সুন্দরী ছিল না, কিন্তু ছিল মিষ্টি—লাবণ্যময়ী! তাই মূর্ছনার সব মনোরোচক হ'লেও প্রাণারাম ছিল—আমার কাছে অন্ততঃ—শমিতাই। দুঃখ হ'ত সে বড় বেশি চুপচাপ থাকত ব'লে। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই আমার মন টানত। দুর্লভার সেই চিরন্তন মাদকতাই হয়ত। কে জানে?

অমিত আবিষ্ট মন্থর সুরে ব'লে চলে: কিন্তু সে-রাতে যেমন সবই বদ্‌লে গেল আমার চোখের সামনে—মনের সামনে। মনে হ'তে লাগল ওরই কথাটা ঘুরে ঘুরে: সত্যি, মনে মনে ওকেও তো আমি কত সময়ে কত দোষই দিয়েছি অকারণ! বাস্তবিক অপরকে বিচার ক'রে মনে গ্লানি আসেই, তবু বিচার না ক'রে থাকতে পারি না তো!

ভাবতে ভাবতে মন যখন খুব দুর্বল হ'য়ে এসেছে ঠিক সেই সময়ে মনের মধ্যে আকুল প্রার্থনার সুর বেজে উঠল, মনে মনে ডাকলাম: "ঠাকুর, আমি বড় দুর্বল—রক্ষা করো।" বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘোর মতন ঘনিয়ে এল। পরে দুমেলে গুরুদেবের কাছে শুনেছিলাম যে এর নাম চেতনার পটপরিবর্তন—যা উপর থেকে আসার আলোর এক আশ্চর্য দর্শন—যাকে তোমরা বলো vision."

সোফিয়া ও বার্বারা একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকে উৎসুক নেত্রে। একটু থেমে অমিত ব'লে চলে:

আজও আশ্চর্য হ'য়ে ভাবি—কত সময়ে ঠাকুরের কৃপা আমাকে রক্ষা করেছে এই ভাবে। একেই তোমরা বলো মিরাক্ল—এ-যুগে যা না কি ঘটে না, ঘটতেই পারে না বলেন তোমাদের বহুধর্মী বুদ্ধিবাদীরা। কিন্তু কৃপা যে পায় সে জানে যে অঘটন চিরদিনই ঘটেছে ও ঘটতে বাধ্য, কেন না আমরা যখন ইচ্ছে ক'রে ঠুলি প'রে অন্ধ থাকি তখন এই অঘটনের আঘাতেই সে-ঠুলি খ'সে পড়ে। সেদিনও এ-দৃশ্য এসে আমাকে বাঁচালো ঠাকুরেরই কৃপায়। নৈলে হয়ত টাল সামলাতে পারতাম না। তাই শোনো বলি।

দেখলাম—আমি চলেছি আবছা গোধূলির আলোয় যেন এক পার্বত্য রাস্তায়—তার একধারে পাহাড় অন্যধারে খাদ—অতল গহ্বর। তার উপর রাস্তা পিছল, ও খাড়া উঠেছে উপর দিকে। পা টলছে, গা কাঁপছে ভয়ে—অথচ কে যেন ঠেলে দিচ্ছে—ভয় কোরো না পথ অন্ধকার হয় হোক—তাঁর নামকে সম্বল ক'রে যে, তীর্থপথে চলে তাকে আলো দেখান তিনি নিজে এসে। আমি সুরু করলাম নাম। অমনি হঠাৎ সামনে খুলে গেল এক অপরূপ জ্যোতিঃপ্রপাতের দৃশ্য। সে যে কী শুভ্র জ্যোতি কী বলব? অথচ তার আলোয় তাপ নেই—শুধুই সোনালি জ্যোতি।

সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম সাধুজির একটি প্রিয় গান যা তাঁর কাছেই শিখেছিলাম দুতিন দিন আগে। স্পষ্ট শুনলাম তাঁর অপরূপ কণ্ঠ সেই আলোর ঝর্ণার ওপার থেকে ভাকছে গেয়ে:

আলো যখন ঝল্‌কে ওঠে কালো মেঘের অন্তরালে
ঘুম ভাঙা চোখ ভাবে—
ভোরের পরাণ কে টিপ রাতের ভালে!
গায় পাখি: যে উষার হাসে,
বিদ্যুতেও সেই বিলাসে,
তিমিরে যে ঘুমকে থাকে—ভয়কে বেড়ায় ছলন জালে,
কালোর পটেই ফোটায় আলো চিরন্তনী সাঁঝসকালে।

গানের সুরে আকাশ ছেয়ে যায়! সঙ্গে সঙ্গে আমার সব ভয় কেটে গিয়ে মনে হয়—আমি দুর্বল কে বলে? আমি সব পারি—ব'লে গান গেয়ে ছুটে চললাম একটুও না টলে সেই আলোর দিকে।

কতক্ষণ এ ভাবে ছিলাম মনে নেই। যখন চেতনা ফিরে এল, দেখি—মূর্ছনা হাতজোড় ক'রে সামনে ব'সে বলল: "আহা কী গানই শোনালে অমিত, এমন গান তো আর কখনো শুনি নি তোমার মুখে!" বলেই হেঁট হয়ে আমার পায়ের ধুলো নিল—

খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। সেই ঘোর মতন অবস্থা—ঠিক ঠাহর পাচ্ছিলাম না সত্যিই আমি কোথায়।

একটু পরে সাড় এলে বললাম: "কী ব্যাপার মূর্ছনা? হঠাৎ আমাকে প্রণাম করলে কেন? তোমাকে তো কোনোদিন কাউকে প্রণাম করতে দেখি নি!

ও গাঢ়কণ্ঠে বলল: "না অসিত। প্রণাম আমি করি না—এক সাধুজিকে ছাড়া। তোমার কণ্ঠে তাঁরই গান শুনলাম—আর সত্যি বলছি, এ-গান তাঁর মুখে শোনার পরেও মনে হ'ল তুমি যেন এর এক নবরূপ দিলে। তাই প্রণাম করেছি।" বলেই গাড়ী ষ্টার্ট দিল।

আমার দুর্বলতা তখন কেটে গেছে। বললাম হেসে সহজ সুরেই: "ধন্যবাদ। কিন্তু এখন কোথায় চলেছি আমরা?"

ও বলল: "বাঃ! ক্লাবে! মনে নেই তুমি বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে একটা মিটমাট করতে রাজী হয়েছ? কোথায় আছ তুমি? এ-মাটির রাজ্যে না hanging garden-এ?'

তখন ওকে বললাম আমার দর্শনের কথা।

ও বলল: "ও! তাই এ-সুর বেজে উঠল তোমার কণ্ঠে! সত্যি অসিত, তোমার ভাবাবেশের এ গান তোমার মুখে না শুনলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না এ দর্শন। ভাবতাম—বানিয়ে বলছ।" বলেই বলল: না না, মুখ ফস্‌কে ব'লে ফেলেছি, কিছু মনে কোরো না, লক্ষ্মীটি! যা হবার হ'য়ে গেছে। আমিও দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলাম। বেঁচে গেছ শুধু তুমি নয় আমাকেও বাঁচিয়ে দিয়েছে তোমার এই ভাবের গান। চলো যাই এখন।"

আমি বললাম: "কিন্তু রাত যে অনেক হ'ল।'

ও বলল; "এগারটা কি আর রাত? ক্লাব ভাঙে রাত দুটোয়। চলো। যথেষ্ট সময় আছে মিটমাটের।"

আমি বললাম: "কিন্তু তাঁকে কি বলেছ যে আমি অনুতপ্ত—তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতেই যাচ্ছি?"

"অনুতপ্ত বলি নি, তবে বলেছি তুমি দুঃখিত হয়েছ—মিটমাট করতে চাও।"

কুড়ি

সোফিয়া: ড্রামা বটে!

বার্বারা: And with a vengeance!

তপতী (হেসে): এখনই ড্রামার কি! এ তো সবে প্রথম অঙ্ক। কিন্তু এবার আর থেমো না, দাদা। দ্বিতীয় অঙ্কের পরে আরো তিনটি অঙ্ক আছে মনে রেখো।

অসিত: মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছ। আমি গল্প বলতে গিয়ে প্রায়ই এত অপ্রয়োজনীয় অবতারণা করি—

বার্বারা বলল: দোহাই দাদা আপনি সংক্ষেপ করবেন না টীকাটিপ্পনি বাদ দিয়ে। আপনার অপ্রয় আপনার বিচিত্র গল্পের রসালের কাজ করে—এটুকু ভুলবেন না!

অসিত (হেসে): আচ্ছা, কিন্তু তাতে গল্পের বহর বেড়ে গেলে দায়িত্ব তোমাদের, মনে রেখো।—হাঁ কতদূর বলেছি?

তপতী: মূর্ছনা মোটর থামিয়ে অঘটন ঘটতে দেখে ধ'রে ছুটল ক্লাবে দাদাকে নিয়ে।

অসিত: হাঁ। কিন্তু মোটর থামিয়েছিল যে এমন চমৎকার এক কুসুমতন রোমান্টিক জায়গায় যে, কেউ গন্তব্য ক্লাবে যেতে আমাদের কারুরই মন সরছিল না। তবে সব নাটকেই প্রতি অঙ্কের শেষে ব্যাপারটা ঘনিয়ে ওঠে ব'লে পরের অঙ্কে দর্শকেরা একটু হাল্কা কিছু চায় তো। সুতরাং নাটকীয় তৌলীত্বের রসভঙ্গ হবার ভয় নেই।

মন্ত্রীসাহেব তুলালীকে দেখেই উঠে তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে দুটি গালে সাহেবি কায়দায় পুরস্কার দিয়ে আমাকে খাতির ক'রেই বসালেন নিজের চেয়ারের সামনে। আদরিনী বসলেন তাঁর চেয়ারেরই প্রশস্ত হাতায় আদুরে পিতার কাঁধে হাত রেখে।

মন্ত্রীসাহেব পাশের বোতল থেকে লালপানি আর একটু ঢেলে আমাকে বললেন: এ সব আসে?"

আমি হেসে বললাম: "না স্যর। আমি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়ে গোড়ায়ই একটু ভুল করে ফেলেছি। আমাদের জন্যে মনু ঋষির শাসন বড় সাংঘাতিক: ব্রাহ্মণস্য সুরাং পীত্বা অগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ—

মন্ত্রীসাহেব দুহাত তুলে বললেন: "spare me the scdriptures please! শাস্ত্র মানতে গেলে জীবনে fun থাকে না। আর এ কী fun জানো না তো! young man, you don't know what you are missing—but but it's not too late to mend, don't you know!"

মূর্ছনা টুকল: "বাবা! কেন মিথ্যে সময় নষ্ট করছ? কাজের কথা হোক যে জন্যে ওকে নিয়ে এসেছি।"

মন্ত্রী সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে বললেন: "ও—বটে বটে।

খেয়াল ছিল না। By the way তোকে offer করা হয় নি—champagne ?"

মৃদুলা এবার লাল হ'য়ে উঠল, বলল আতপ্ত কণ্ঠে : "আঃ। কী যে করো বাবা! আমার যে ভালোমন্দ সব না জানো না কি ? তাছাড়া তুমি যে টেলিফোনে কথা দিলে—আজ রাতে খাবে না ?"

মন্ত্রী সাহেব একগাল হেসে বললেন : "couldn't resist the temptation, my dear! তবে সাক্ষাৎ বার্ণার্ড শ বলেননি কি—the best way of resisting a temptation is to yield to it ? হা হা হা !"

মৃদুলা শাসিয়ে বলল : "oscar wild—বার্ণার্ড শ নয়। যাক গে—কাজের কথা হোক। দুপুর বাজে মনে রেখো—ঐ দেখ, ওরা পাততাড়ি গুটোচ্ছে।

"আচ্ছা আচ্ছা—Okay. To business—" ব'লেই আমার দিকে তাকিয়ে : "Here is to business—long live business and—and to your health, my boy !"

মৃদুলা বোতল সরিয়ে নিয়ে বলল : "ব্যস্, আর না।"

* * *

মন্ত্রীসাহেবই প্রথম পাড়লেন কথাটা : "It is very good of you, অমিত !"

আমি কুণ্ঠিত সুরে বললাম : "না sir, it is the least I can do for you,"

মন্ত্রী সাহেব বললেন : "কিন্তু মনে রেখো আমরা জোর করতে চাই নে একটুও—"

"তা জানি স্যর, সেজন্যে আরো ধন্যবাদ। কিন্তু আমি মন স্থির করেছি ভেবে চিন্তেই, ঝোঁকের মাথায় ব'লে বসি নি যে—মানে—রাণী সাহেবার কাছে অ্যাপলজি—"

"না না অ্যাপলজি চাইতে হবে না হে—সে ব্যবস্থা আমি করব—ওটা কি জানো entirely a matter of formality—এ-ও বুঝলে না ?"

"বুঝেছি স্যর, কেবল আমার তরফের কথাটা হ'ল এই যে, ক্ষমা চাওয়াটা আমার কাছে কর্তব্য—সব দিক দিয়েই—কারণ—আমি……মানে, যখন অপরাধ করেছি—"

"Don't be silly, my boy ! দোষ আমার কি ? একটা ভুল বোঝা বৈ তো নয়—এ-ও বুঝলে না ? I mean—"

আমি বাধা দিয়ে বললাম : "যদি শুধু ভুল বোঝাই হয় তাহ'লেও এ ভুল বোঝার ফলে যখন আপনাদের সব'ইকেই কম বেশি ভুগতে হ'ল তখন তার দায়িত্বও তো আমারই।"

মন্ত্রী সাহেব প্রায় তর্কের সুরে বললেন : "না, না আমারই বোঝা উচিত ছিল—কেন না but for my blunder—তবে কি জানো ? সরকারি চাকর যারা তারা বেসরকারি মাইকলজি প্রায়ই কেমন যেন—how shall I put it—ধরতে পারে না, ফস্কে যায়—এ-ও বুঝলে না ?" বলে হেসে উঠলেন হা হা ক'রে।

মৃদুলা ব'লে উঠল : "বাবা !—"

আমি বুঝলাম, তাই ওকে কুণ্ঠা থেকে বাঁচাতেই ঝটিতে বললাম : এটা বুঝতে আমাকে বেশ পেতে হয় নি স্যর ! কিন্তু তবু যখন আপনি আমার ভালো ভেবেই আমাকে রাণী সাহেবার ওখানে পাঠিয়েছিলেন তখন আমার ও রকম একটা 'সীন' ক'রে আসা—"

মন্ত্রী সাহেব বাধা দিয়ে বললেন : "না না, ওখানে তোমার কোনো গল্‌তিই হয় নি—not the slightest—কারণ when one is in a huff—বুঝলে না—" বলেই ফিস ফিস ক'রে "তাছাড়া man-slaughter-ও অনেক সময় ক্ষমা করে যদি আসামী খুন করে থাকে in a fit of passion কারণ passions are blind as bats—এ কে না জানে বলো ? we are all mortals—নৈলে কি আর John Keats বলতেন—" বলেই বোতলটা টেনে নিয়ে :

Like angels' visits short and bright
Mortality is too weak to bear them long."

মৃদুলা ফোড়ন দিল : John Keats নয় John Norris—কিন্তু তুমি আর খেও না বাবা !"

"Oh—I'm sober as a judge—কে বলেছিলেন যেন ? মিল্টন না ?" ব'লেই আমার দিকে ফিরে : But where was I ?"

আমি বললাম : "আপনি আমাকে খানিকটা ডিকেন্টই

করছিলেন যে, রাগের মাথায় সীন ক'রে তত অপরাধ করিনি আমি। কিন্তু আপনি খুব ভালো জজ হ'লেও আমি ব্যাপারটাকে ঠিক আদালতের বিচারের মতন মনে করতে পারছি না। আমার কথা হ'ল—অপরাধ যখন করেছি তখন ক্ষমা চাওয়া আমার কর্তব্য।"

মন্ত্রীসাহেবের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল; আমার পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললেন: "you are a corker, my boy!—তবে অ্যাপলজি তোমাকে যাতে চাইতে না হয় সে-ব্যবস্থা আমি করব। বলছিলাম ওটা একটা formality বৈ তো নয়!—" ব'লেই কের ফিশ ফিশ ক'রে: "কি জানো? ওঁরা যে mediaeval যুগের মানুষ বুঝতেই তো পারছ?—তাই ভাবেন যারাই ওঁদের কাছে যায় তারাই, মানে, যায় হাত পাততে আর কি—for little favours—এ-ও বুঝলে না?—কাজেই অন্য-রকম কোনো অতিথি যখন হঠাৎ আসে ওঁরা চিনতেই পারেন না।—ওঁদের খুব দোষ দেওয়াও যায় না। বরাবর এই-ই দেখে এসেছেন তো—কাজেই ভাবেন সবাই আসে ওঁদের কাছে প্রসাদ পেতে। And therefore it follows—as the night the day—যে, যেখানেই কেউ আসে বন্ধুভাবে, সেখানেই ঘটে গণ্ডগোল আর কি।—This world is a queer place my boy, এখানে favour চেয়েছ কি ডুবেছ। of course আগেকার দিনের নবাব বাদশাদের কথা বলছি না যাঁরা—জানোই তো—আর্টিস্টদের মুখে এক-একটা নতুন রাগ শুনবামাত্র বখশিশ দিতেন গলার মোতির মালা খুলে। কিন্তু we look before and after and pine for what is not—বলেছেন না বাইরণ?

মূর্ছনা বলল: "না বাবা, শেলি, শেলি—কিন্তু—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—I beg your pardon—শেলিই বটে—তবে—where was I?"

"আপনি বলছিলেন যে একালে সব বদলে গেছে"—

"বদলে গেছে—ইয়া—that's it—বদ্‌লে গেছে—যাবে না?—যে-যুগে idol হ'লেন রূপ্ রূপ্ রূপ্‌চাঁদ সেখানে sermon and service বদ্‌লে যাবে না—হাঃ হাঃ হাঃ—"

ব'লে হঠাৎ মূর্ছনার মুখের দিকে তাকিয়েই আমার দিকে ফিরে খাপে নামলেন: "কিছু মনে কোরো না অমিত, তবে সত্যিই এ-যুগে মুখে যে যাই বলুক না কেন—মনে মনে who is not sick of this রূপচাঁদ ঠাকুর—দিন কিনে নিল কে? ফ্রেস্ক নয়, মিউসিক নয়, পোয়েট্রি নয়, পেন্টিং নয়—তাজমহল নয়—কিনে নিল ঐ গোল গোল চাকতি—that disc of argent omnipotence—কে বলেছেন যে?—" বলেই ফের বোতলের ছিপি খুললেন।

মূর্ছনা গেলাসটার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল: "আজ আর না বাবা, লক্ষ্মীটি!"

"Just one more—I promise—ব'লেই আমার দিকে তাকিয়ে: "I'll tell you what, my poppet সেদিন পড়ছিলাম মূর্ছনার একটি favourite বই, নাম—frailty—লিখেছেন বিখ্যাত সুরবর্দি—তিনি বলেছেন আমাদের এ হ'ল vulgar age—"

মূর্ছনা টুকল: "সুরবর্দি নয় বাবা গল্‌স্‌বর্দি, আর frailty নয় fraternity."

"I beg your pardon, গল্‌স্‌বর্দিই বটে—বুঝলে অমিত! বয়েস হ'লে creative faculty থাকে বটে, কিন্তু retentive faculty যায় বুজে—but where was I?"

আমি হাসি চেপে বললাম: "বলেছিলেন গল্‌স্‌বর্দি, দুঃখ করেছেন এযুগটা vulgar age"—

"ইয়া—le mot juste বলে না ফ্রেঞ্চরা?—vulgar ছাড়া কী বলো?—when no sentiment is too sacred for these commercial exploiters—যারা সব sacred সম্বন্ধের আক্র দিল খুলে—বিশেষ এই রেডিও and talkie—the logical culmination of cold-blooded arabice—কী? না, the husvand kisses the bride—অম্‌নি ক্লিক্—ক্যামেরায় তোলো কেননা kissing-এর ছবিই সব চেয়ে ticklish—এও বুঝলে না? Talkie এসেছে, এবার হবে Feelie—কে বলেছেন যে?

মূর্ছনা লজ্জিত হ'য়ে বলল: "অলডাস হক্সলি। কিন্তু বাবা, আর—"

"না না আর খাব না—Just one sip—I promise not a drop more—কিন্তু এ desperate villainous age—এ—but where was I?"

মূর্ছনা বলল হেসে: "সেটা এবার আমরাও ভুলে গেছি—কিন্তু বাবা, রাত হয়ে যাচ্ছে—তাই কাজের কথাটাই হোক না এবার। তুমি রাণী সাহেবাকে বলবে তো যে অসিত গান গাইতে চায়?—"

"you bet I will"—ব'লে মন্ত্রীসাহেব টেবিলে মারলেন ঘুঁষি।

"আঃ—কী করো বাবা? এ বাড়ী নয়—ক্লাব মনে রেখো। শোনো—ভালো ক'রে ভেবে বলো—তুমি বললে রাণীসাহেবা বুঝবেন তো?"

মন্ত্রীসাহেব কের অহৈতুকী হাসি হেসে উঠলেন: "বুঝবেন না? I am thick and thin with her, don't you know?" মুখটা তাঁর বেশ গর্বোজ্জ্বল হয়ে উঠল "তা ছাড়া She is a fine creature—a thing of beauty is a joy for ever—as sang John Morris—দেখ্, এবার একেবারে bull's eye!"

মূর্ছনার মুখ ঈষৎ লাল হয়ে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললাম: "তাহলেও যদি আপনি বলেন তো আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখতেও রাজি আছি।"

আমার পিঠে বিরাট থাপ্পড় মেরে তিনি বললেন: "you are a jewel of a boy, my precious!—tharge will all thy chivalry—কে বলেছেন যেন? Sir Thomas Browne না?—or was it Thomas Carlyle?

"না বাবা, Thomas Campbell—কিন্তু chivalryর কথা থাক্—"

"থাকবে কেন? Call gold gold and spade a spade, এও বুঝলে না অসিত? হয়েছে কি জানো? I can bet যে, রাণীসাহেবা ঠিক ঠিক জেনে বেরিয়ে আসতেনই আসতেন—যদি রাজবাড়ীর সবাই হাঁ হাঁ ক'রে না ছুটে আসত। when all is said and done, you know you just can't swim against the tide—কি জানো?" ব'লেই আরো অন্তরঙ্গতার খাদে সুর নামিয়ে: "রাজারাণী শুধু দেখতেই, এও বুঝলে না;" ব'লে কেঁদে হেসে উঠলেন। লর্ড বলে কাকে? না যে নিজের চাকরদের মনে করে লর্ডের লর্ড। নইলে কি আর সাক্ষাৎ মিল্টন ব'লতেন—nobody is a hero to his valet? জানো না তো কী ভয়ে ভয়ে থাকেন মনিবরা আজকাল? প্রজারাই তো রাজা। ওরা ধরে ফেলেছে, মনিবদের Cat-গুলো are all out of the bag, thanks to these poking proletariates—নবাব! ধোৎ! শুনতেই নবাব—ভেতরে মান-সম্ভ্রম দিল জবাব—হাঃ হাঃ—সাজা সাজা punishment my friend—নবাবি is the cross idiots have to bear, বুঝলে না? কাজেই রাণীসাহেবা করেন কী বলো? তাঁর তো বেজায় ইচ্ছে, দারুণ ইচ্ছে—ভালো গাইয়ের কাছে ব'সে গান শুনতে—She adores musicians more than the music—especially the musicians with a non-foollsh face—don't blush my little sage—you must look at life in the face—কী বলছিলাম? হাঁ। তাঁর তো খুবই ইচ্ছে তাঁর advanced প্রজাদের সঙ্গে এক আসনে বসবার। কিন্তু বলেছ কি ঐ প্রজারাই সবাই মিলে তাঁকে পুলি পোলাও চালান দিয়েছে, এও বুঝলে না? স্নেহ সেন্টালিটি বলে আর কাকে? এ যুগে নবাব বেগম উজির কোতোয়াল সবাই ভয়ে তটস্থ—পাছে তাঁবেদাররা মুচকে হাসে, পাছে বলে, এঃ—ইনি আবার—" চোখ মিটমিটি করে—এও বুঝলে না বন্ধু! The world is a stage—don't you know, as Byron has said—'

"বাইরন নয় বাবা, শেক্সপীয়র—"

"ও একই কথা রে মেয়ে, একই কথা। যার নাম চাল ভাজা তারই নাম মুড়ি—এ-ও বুঝলি না—হোঃ হোঃ হোঃ।"

মূর্ছনার মুখ লজ্জায় কালো হ'য়ে এল, কোনোমতে চোখের জল সামলে বলল: "যাক গে বাবা, অসিত রাণীসাহেবার কাছে গাইলে আমার মনে হয় ভালোই হবে—সাধুজিও অসিতকে বলেছেন রাণীসাহেবার কাছে গিয়ে মিটমাট করা উচিত। কেবল দিদিই বাগড়া দিচ্ছে।"

মন্ত্রীসাহেব চ'টে বললেন: "দিদি! How dare she—"

আমি বললাম: "না না, সে ঠিক মানা করে নি,

আপনি রাগ করবেন না। আমি কথা দিচ্ছি আমি যাইব নিশ্চয়ই !"

মন্ত্রীসাহেবের মুখ তৎক্ষণাৎ স্বচ্ছ হ'য়ে এল, উল্লসিত হ'য়ে বললেন : "you are a priceless chappy—a la wodhouse, তুমি আমাকে এনে দিলে কী জানো ? victory when—when stark defeat was staering me in the face, বহু ধন্যবাদ।" ব'লেই মূর্ছনাকে : "আমি এখনি তোর মাকে টেলিফোন ক'রে বলছি একথা—"

মূর্ছনা বলল : "লক্ষীটি বাবা ! এখন বোলো না। তাহ'লে ফের আবার বাধবে—"

"বাধবে ?"—সাহেব উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলেন—"বাধলই বা। I care a fig—" ব'লেই আমাকে : "but I must say again you are a pearl—a diamond of the first water টেনিসনের কথা মনে পড়ে : let the dead past bury its dead—তবে—হয়েছে কী জানো ? it is all the blessed custom of the royalty—ওরা ভাবেন—honour বুঝি দুই লোকের হাতে chastityর চেয়েও অপলকা। ওরা তো জানে না—the great Tolstfoy বলেছিলেন না—

'Honour and shame from no condition rise
Act well your part—there all the honurjies !
হা হা হা…"

মূর্ছনা আমাকে একরকম জোর করেই ক্লাব থেকে বাইরে টেনে নিয়ে এল। মোটরে ব'সেই ফের ভেঙে পড়ল। আমার কোলের উপর প'ড়ে কাঁদতে লাগল।…

'বাবা এরকম হ'য়ে যেতেন না অসিত, যদি-যদি মা—বাবার কথা একটিবারও ভাবতেন—

* * *

ওদের ওখানে পৌঁছলাম দুপুররাতে। কিন্তু গিয়ে—সে আর এক কাণ্ড !

মোটরটা গেটের মধ্যে ঢুকতেই দেখি দোতালার বারান্দায় মাসিমা রেলিং-এ ভর ক'রে ঝুঁকে। মোটর গেটে ঢুকতেই নেমে এলেন নিচে।

"কী ব্যাপার মাসিমা ?"

"শমিতা ভারি কাঁদছে।"

মূর্ছনা বলল : দিদি ?"

"হ্যাঁ—আর তোরই জন্যে।"

"আমার।"

"নইলে কার ?—কেন তুই অসিতকে ধ'রে নিয়ে গেলি ক্লাবে জোর ক'রে ? ও যাইতে চায় না—"

মূর্ছনা রেগে বলল : "দিদি কি তোমাকে তাই বলেছে নাকি।"

মাসিমা ঝংকার দিয়ে উঠলেন : "ন্যাকা মেয়ে ! কিছুই যেন জানেন না। এসব আবার কেউ কাউকে বলে না কি ?"

বলতে বলতে আমরা উঠে এলাম। বারান্দায়ই বসলাম তিনটি বেতের চেয়ারে। মাঝখানে একটা মহীশূরী চন্দনকাঠের টেবিল। একটি শ্বেতপাথরের গেলাসে সরবৎ ঢাকা রয়েছে। মূর্ছনা বলল, কিন্তু মুখ আড় করে।

আমি বললাম : "আবার নতুন কিছু ঘটেছে না কি মাসিমা ? শমিতা কাঁদছে কেন ?"

মাসিমা বললেন : "থাক গে বাবা ওসব—সরবৎ খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হও আগে। ওদের কথা ওরাই জানে কাজ কী তোমার আমার এসবের মধ্যে থেকে !

মূর্ছনা বলল : "এ-কথাটা যদি too late হবার একটু আগে বুঝতে মা !"

মাসিমা ওর দিকে সবিস্ময়ে তাকাতেই ও বলল : "অত আশ্চর্য হবার ভঙ্গি নাই বা করলে মা ! মানুষ কেউ অন্ধও নয়, কালাও না। তবে অসিত একটু জেগে ঘুমোয় এই যা বাঁচোয়া তোমাদের—"

মাসিমা রুষ্ট কণ্ঠে বললেন : "তোর আস্পর্ধা তো কম নয় যে মেয়ে !"

মূর্ছনা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বলল : "মা বাবার কী করেছ তুমি,অসিত খানিকটা দেখে এসেছে স্বচক্ষে। নিজেকে যে চালাতে জানে না তার সাজে না মেয়ের ওপর ভর করা। আমি ঢের সয়েছি, আর না। কালই আমি চলে যাব কাকার ওখানে দিল্লিতে—হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। তুমি থাকো তোমার আদরের সতী লক্ষীকে নিয়ে"—ব'লেই আঁচলে মুখ ঢেকে কান্না চাপতে চাপতে চ'লে গেল।

মাসিমা চেঁচিয়ে ডাকলেন : "শোন্—এই মেয়ে !—শুনে যা—"

কিন্তু মূর্ছা ফিরল না।

• •

বর্বারা : তারপর ?

অসিত : মাসিমা মূর্ছার পিছু নিলেন। আমি একলা চুপ ক'রে ব'সে।···বাস্তবিক আমার মনে হল যেন এটা বাস্তব জগৎ নয়—কেমন যেন ছায়া ছায়া ভাব। সে বলে বোঝাতে পারব না। উল্টোপাল্টা স্রোত যে এভাবে হুড়মুড়িয়ে আসতে পারে মাত্র একটা দিনে—এ আমি নিজে অমন আবর্তের মধ্যে না পড়লে বোধহয় বিশ্বাসই করতে পারতাম না। কি একটা ছবিতে দেখেছিলাম যে, চার্লি চ্যাপলিন এক বিরাট জাহাজখানায় ঢুকে আচম্‌কা একটা ছোট্ট ছিটকিনি সরিয়ে ফেলতে না ফেলতে একটা প্রকাণ্ড man of war খড়্ খড়্ খড়্ খড়্ ক'রে ডাঙা থেকে সমুদ্রে পাড়ি দিল আর জাহাজের খালি মাল্লারা শুরু করল চিৎকার !···রাণী সাহেবার ওখানে গান গাইব না বলার ফলে যা ঘটল সেটা কি এ লণ্ডভণ্ডের চেয়ে একটুও কম সঙ্গিন ?"

বার্বারা : তারপর ?

অসিত : খানিক বাদে মাসিমা ব'লে পাঠালেন একটু বসতে, তিনি এলেন ব'লে। আমার সম্বিৎ এল। ফের একটা গণ্ডগোল বেধেছে। টের পেয়ে বুদ্ধিমানের মতন উঠে প'ড়ে তৎক্ষণাৎ চম্পট। [ক্রমশঃ

শাস্ত্রীজীর মৃত্যুতে মাতা ললিতা দেবীকে

সুষমা মৈত্র

জল জলে সিঁদুরের টিপ
কপালে তোমার দেখব না
মাগো ললিতা আমরা আর
এ বেদনা বক্ষে সহে না।
সেই লাল পেড়ে শাড়ী
সিঁদুরে ঠোঁট তোমার হল চিরতরে
ম্রিয়মাণ—ভাবিতে হৃদয় বিদরে।
তোমার বৈধব্য সইতে না পারি।
তবু বলব মাতা,
যে বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন শাস্ত্রীজী
সে গৌরব বিশ্বভুবন জোড়া
এ মৃত্যু এনেছে তাঁর অমরতা।
বিশ্ব-জুড়ে এক সুরে গায়
মহা-মানব শান্তির দূত শাস্ত্রীজী কী জয় !
জীবন পণে সাধিলে দেশের হিত !
স্বর্ণাক্ষরে নাম তাঁর ইতিহাসে হবে লিখিত।
মা ললিতা দেবী,
শোকে তোমাকে কী সান্ত্বনা দেব আর
এ শোক যে আমাদের সবার !
তবু বলব—
বীরের মৃত্যুতে স্বামীর তোমার
তুমিও হয়েছ জগতে অমর।

দাঁতের যত্ন

শ্রীরমেশচন্দ্র আচার্য্য

বিশুদের স্কুলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারবাবু ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। সদর হাসপাতালে দাঁতের ডাক্তারবাবুকে দিয়ে দাঁত ভাল করে পরীক্ষা করতে বিশুকে উপদেশ দিয়েছেন। বিশুর মা বলেন—"দুধে দাঁত ক'টা আর ক'দিনইবা থাকবে, তার জন্য সদর হাসপাতালে দাঁতের ডাক্তারবাবুর কাছে পরীক্ষা করতে যাবার কি দরকার? উপরন্তু সদর হাসপাতাল ত আর কাছে নয়।" বিশুর বাবা বলেন—"দাঁতের ডাক্তারবাবুকে দেখাতে গেলেই দাঁতের ডাক্তারবাবু বলবেন—দাঁত তুলতে হবে।" তখন বিশু বলে—"আমার দাঁতের যন্ত্রণাই ভাল, আমি দাঁত তোলাব না।" সুতরাং ডাক্তারবাবুর কাছে আর দাঁত পরীক্ষা করাতে যাওয়া হ'ল না। এইভাবে দাঁতের যত্ন না নিয়ে আমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে দাঁতের রোগ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। দাঁতের সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্যই যত্ন না নেবার প্রধান কারণ। কিরূপে দাঁতের ব্যবহার করতে হয় এবং দাঁত কি ভাবে রক্ষা করতে হয় সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করছি।

চোয়ালের দুই পাটিতে বত্রিশটি ক'রে দুধে দাঁত চার মাসের পর থেকে দু' বৎসর পর্য্যন্ত উঠতে থাকে। মায়ের পেটের মধ্যে শিশু যখন ছয় সপ্তাহের তখন থেকেই দাঁতের কুঁড়ি বা অঙ্কুর আরম্ভ হয় এবং মায়ের পেটের মধ্যে শিশু যখন ষোল সপ্তাহের তখন দাঁতের কুঁড়ির calcification আরম্ভ হয়। জন্মাবার আগেই মাড়ির মধ্যে দাঁতের কিছুটা অংশ তৈরী হয়ে যায়। শিশুর দাঁত যাতে প্রথম থেকে ভালভাবে গজে উঠতে পারে সেজন্য গর্ভ অবস্থায় এবং শিশুকে স্তন দেওয়া পর্য্যন্ত মাকে দুধ, মাখন, শাকসব্জী, বাদাম, ফরাসবিন্, গাজর, লেবু প্রভৃতি খাওয়ান প্রয়োজন।

কুঁড়িটি দুধে দাঁত একটির পর একটি করে ছয় থেকে বার বৎসরের মধ্যে নিজে থেকেই পড়ে যায়। দুধে দাঁতগুলি ভালভাবে রক্ষা করবার চেষ্টা করা দরকার, কেননা শিশু এই সময় দ্রুত বাড়তে থাকে। শরীরের বাড় ও মনের উন্নতি দুধে দাঁতের উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। শিশুর স্বাস্থ্য ও বাড়ের পক্ষে সুষমাযুক্ত পূর্ণ খাদ্য এবং তার হজম ও পরিপাক করবার মত প্রয়োজনীয় আর কিছুই নেই। ভাল করে চিবিয়ে খেলে হজম ও পরিপাক করায় সহায়তা করে। খাদ্যবস্তু উপযুক্তরূপে চীর্ণ হলে দেহের, দাঁতের ও দাঁতের শিকড়ের পুষ্টি হয়। দাঁতের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির জন্য কিছু ব্যায়ামও দরকার। তাড়াতাড়ি খেলে এই ব্যায়ামের ব্যাঘাত ঘটে। খাদ্য যথোচিত ভাবে চিবাতে হলে অন্ততঃ কুড়ি মিনিট ধরে আহার করা আবশ্যক। আহারের শেষে অনেক সময় খাদ্যের কণা দুই দাঁতের মাঝখানে আটকে থাকে। মুখ ধোবার পরও পরিষ্কার হতে চায় না। দাঁত পরিষ্কার করার জন্য আহারের শেষে আঁশ-ওয়ালা বা ক্ষারবিশিষ্ট যে কোন একটি ফল যেমন শশা, গাজর প্রভৃতি খাওয়ার অভ্যাস করা ভাল।

আমরা শিশুদের হাতে আদর করে চুষি-কাঠি দিয়ে থাকি। অনবরত চুষি-কাঠি চোষার ফলে মুখের সামনের দিক দেবে যায় এবং দাঁত অসমান হয়। কোন কোন শিশু যখন মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেয় তখন কোন প্রতিকার না করার ফলে তার চোয়াল খাটো হয়ে যায় এবং দাঁত অসমান হয়। শিশু তার নিজের আঙ্গুল যখন অনবরত চুষতে থাকে আমরা বাধা দিই না। ফলে অনেক সময় দাঁত তাড়াতাড়ি নড়ে যায় ও সময়ের আগেই শিশু ফোকলা হয়, মুখের কিছুটা বিকৃতিও ঘটে। কখন কখন শিশুকে উপুর হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা যায়। তখন শিশুকে চিৎ করে ঠিকভাবে শুইয়ে দেওয়া দরকার। কেননা চোয়ালের উপর অথথা চাপ পড়ে এবং দাঁত অসমান হয়ে যায়। এই সমস্ত কু-অভ্যাসের ফলে ১২।১৩ বছরের মধ্যে সমস্ত দুধে দাঁতগুলি পড়ে গিয়ে যখন আক্কেল দাঁত ছাড়া ৩২টি দাঁতের বাকী ২৮টি স্থায়ী দাঁত উঠে পড়ে তখন মুখ বন্ধ করলে দেখা যায় যে দুই চোয়ালের দাঁতগুলি ঠিক সমানভাবে পড়ছে না। অসমান দাঁতের ফলে ভালভাবে চিবান যায়

না। মুখের কিছুটা বিকৃতি হতে পারে, কথা বলতে অনেক সময় অসুবিধা হয়, এমন কি ভবিষ্যৎ জীবনে Gingivitis এবং pyorrhoea হবার আশঙ্কা থাকে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মিষ্টি খাবার খেতে ভালবাসে। চিনি, গুড়, লজেন্স, চকলেট প্রভৃতি সুযোগ পেলেই যখন তখন খায়। এই সমস্ত মিষ্টি খাদ্য খাবার পর ছেলেমেয়েরা পরিষ্কার করে কি মুখ ধোয়? এমন কি ভাত খাবার পরও অনেককে পরিষ্কার করে মুখ ধুতে দেখা যায় না। ফলে খাদ্যবস্তুর কণাগুলি দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে লেগে থাকে। অপরিষ্কার মুখে ঐ খাদ্যকণাগুলি ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই গেজে ওঠে। মুখের মধ্যে Lactobacillus Acidophylus প্রভৃতি অনেক রকমের বীজাণু আছে। তাদের গায়ে আঠার মত আচ্ছাদন থাকায় ঐ সমস্ত অপরিষ্কার জায়গায় উহারা লেগে থাকে ও এসিড উৎপাদন করে। প্রথমে মুখের লালা এই এসিডকে তরল করবার চেষ্টা করে। অনবরত এসিড উৎপাদনের ফলে লালার প্রতিরোধ শক্তি একেবারে কমে যায়। দাঁতের যে অংশটা সাদা চকচকে তাকে এনামেল বলা হয়। অপরিষ্কার জায়গাগুলিতে অনবরত এসিড লেগে লেগে এনামেলের ক্ষয় হতে আরম্ভ করে। ক্ষয় একটু বেশী হলে খুব ছোট ছোট গর্তের আকার ধারণ করে। একবার গর্ত হয়ে গেলে বীজাণুগুলি এই ছোট ছোট গর্তগুলিকে বড় করবার চেষ্টা করে এবং গর্তের মধ্যে বেশী করে এসিড তৈরী করে। ফলে এনামেল ভেদ করে মাঝখানের আবরণ Dentineএর ক্ষয় আরম্ভ হয়। এনামেলের ক্ষয় হলে দাঁত সির্ সির্ করে। তারপর দাঁত কন কন করতে আরম্ভ করে। দাঁত যখন প্রথম সির্ সির্ করে তখনই দাঁতের ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে দাঁত ভরাট করা দরকার। দাঁত যখন কন্ কন্ করতে থাকে এবং খাবারের কণা গর্তের মধ্যে ঢুকলেই যন্ত্রণা হতে থাকে তখনই বুঝতে হবে গর্তটা বেশ বড় হয়েছে এবং বীজাণুগুলি ভিতরের আবরণ pulpএ পৌঁছে গিয়েছে। এই pulpএর মধ্যে পুষ্টিরস বাহক শিরা, অপ্রয়োজনীয় জিনিষ বাহক ধমনী, স্নায়ু প্রভৃতি থাকে। বীজাণুগুলি শিরা স্নায়ু প্রভৃতিকে নষ্ট করে ফেলে। তারপর দাঁতের গোড়ায় ফোড়া হয়। ফোড়ার ছোঁয়াচ রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দেহের অন্যান্য অংশে চলাফেরা করে। বীজাণুগুলি যেখানে আশ্রয় নেয় সেখানকার টিস্যুগুলিকে প্রথমে দুর্বল করে তারপর রোগাক্রান্ত করতেও পারে। এদিকে দাঁত দিয়ে খাবার চিবান যায় না। শিরার মধ্য দিয়ে দাঁতের যে পুষ্টিরস আসতো তাও ঐ দাঁত গ্রহণ করতে পারে না। ফলে দাঁত একেবারে ক্ষয়ে যায়। তখন আমরা বলি—দাঁতটি পোকায় খেয়ে গেছে। দাঁত পোকায় খেয়ে গেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং চোয়ালের পূর্ণ বৃদ্ধি হতে পারে না। ফলে দাঁতগুলি অসমান হয়ে যায়।

মুখ অপরিষ্কার থাকলে মুখের মধ্যেকার বীজাণুগুলি মাড়িরও ক্ষতি করে। প্রথমে মাড়ি লাল হয়—ফোলে—তারপর টিপলে ব্যথা করে। কখন কখন রক্তও পড়ে। একে Gingivitis বলে। এই সময় দাঁতের ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া দরকার। এই অবস্থাকে যদি আমরা উপেক্ষা করি এবং মুখ পরিষ্কার না রাখি তা'হলে অনবরত মাড়ি ফুলে থাকার দরুণ দাঁতের শক্তি কমে যায়। দাঁত মাড়ি থেকে সরে আসে। ফলে ছোট থলির সৃষ্টি হয়। তখন বীজাণুগুলি, পূঁষ এবং খাদ্যকণা এই থলির মধ্যে জমা হয়। এই থেকে দাঁতের পাথর (Tartar) তৈরী হয়। পাথরগুলি মাড়ির প্রদাহের সৃষ্টি করে। তারপর বড় থলি তৈরী হয় এবং ছোঁয়াচ Periodontal membraneএ বিস্তার করে। ক্রমশ Alveolar Boneএ প্রবেশ করে। দাঁতের ক্ষয় হয় এবং থলি বড় হতে থাকে। এইভাবে দাঁতের চারদিক দিয়ে অনেক থলি তৈরী হয় এবং মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে। এই অবস্থাকে pyorrhoea বলা হয়।

এই সমস্ত রোগের হাত থেকে মুক্ত হতে গেলে মুখের ভেতর সব সময়ই পরিষ্কার রাখা দরকার। শিশুর দুধে দাঁত উঠতে আরম্ভ করলে শিশুর মাকেই দাঁত পরিষ্কার করার ভার নিতে হবে—যতদিন সে নিজে নিজে দাঁত মাজতে না শেখে। এক পোয়া ফুটান জল ঠাণ্ডা করে তার মধ্যে চায়ের চামচের আধ চামচ লবণ মিশালে নুন গোলা জল তৈরী হয়। পরিষ্কার ন্যাকড়া এই নুন গোলা জলে ভিজিয়ে নিয়ে মাকে তাঁর আঙুলে জড়িয়ে নিতে হবে। যে ক'টি দাঁত বার হয়েছে সেই ক'টি দাঁত, নুন গোলা জলে ভিজান পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে মা পরিষ্কার করে

খেয়েন। প্রত্যেকবার খাওয়ানর পর এইভাবে দাঁতগুলি, দুই মাড়ি, তালু, জিহ্বা, দুই গালের ভিতর দিক ও দুই ঠোঁট পরিষ্কার করে দিতে হবে। কুড়িটা দুধে দাঁত উঠে যাবার পর ছোট বুরুশ বা নরম দাঁতন ব্যবহার করা যেতে পারে। শিশুর জন্য ছোট এক লাইন কুঁচিওয়ালা বুরুস, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য দু'লাইন কুঁচি-ওয়ালা বুরুস আর প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য তিন লাইন কুঁচি-ওয়ালা বুরুশ ব্যবহার করা যেতে পারে। কুঁচির গোছা-গুলি ফাঁক ফাঁক হবে এবং কুঁচিগুলি মাঝারি রকমের শক্ত হবে। বুরুশ ব্যবহার করতে হলে প্রথমে বুরুসটা সাবানজলে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবেন। উপরের পাটির দাঁত পরিষ্কার করতে হলে বুরুসের কুঁচি সোজা করে গাল ও মাড়ির মধ্যে রাখুন। তারপর বুরুশ মাড়ির দিকে ফিরিয়ে মাড়ি ও দাঁত চেপে দাঁতের মাথা পর্যন্ত অর্থাৎ নীচের দিকে নিয়ে যান। নিচের পাটির দাঁত এর বিপরীত ভাবে লাগিয়ে উপরের দিকে চালিয়ে যান। ভিতরের দিক মাজতে হলে উপরের দাঁতের জন্য বুরুসের কুঁচি সোজা করে তালুর উপর ধরে মাড়ি ও দাঁতের উপর দিয়ে বুরুসটি টেনে নিন। নীচের দাঁতের জন্য তালুর উল্টো দিকে ধরে টেনে নিতে হবে। কষের দাঁত মাজতে একবার ভেতরের দিকে ও একবার বাইরের দিকে ও আড়াআড়ি ভাবে টানবেন। সব সময় মনে রাখতে হবে যে বুরুসের কুঁচি মাড়ির উপর রেখে দাঁতের যেদিক দিয়ে খাবার কামড়ান বা গুঁড়া করা হয় সেই দিকে ঘোরাতে হবে। যে দিক দিয়ে খাদ্য কামড়ান বা গুঁড়া করা হয় দাঁতের সেই অংশগুলি ভাল করে ঘসে সাফ করতে হবে। দাঁতগুলির প্রত্যেকটি স্থান অন্ততঃ দশবার করে বুরুস করবেন। প্রত্যেক চোয়াল আলাদা করে বুরুস করবেন। জিহ্বার উপর ৪।৫ বার হাল্কাভাবে বুরুস চালিয়ে জিহ্বা পরিষ্কার করবেন। দাঁত মাজবার সময় বুরুস মাঝে মাঝে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেবেন। দাঁতের উপর সবুজ, হলদে বা কাল ছোপ পড়লে বুঝতে হবে পরিষ্কার করে দাঁত মাজা হচ্ছেনা। প্রত্যেকের জন্য আলাদা বুরুস ব্যবহার না করলে অন্যের ব্যারামের ছোঁয়াচ লাগতে পারে। তখনই এক জনের ব্যবহৃত বুরুস আর একজন ব্যবহার করবেন না। বুরুস ব্যবহার করবার পর ওটা পরিষ্কার করে ধুয়ে নুনগোলা জলে ভাল করে ভিজিয়ে নিন। তারপর এমন ভাবে ঝুলিয়ে রাখুন যাতে রোদ ও বাতাসে শুকিয়ে যায়। অপরিষ্কার বুরুস ব্যবহার করা বিপজ্জনক। রোজ নতুন নরম দাঁতন একইভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত নুনগোলা জল ছাড়া অন্য কোন মাজন ব্যবহার করা উচিত নয়। দু' বৎসরের পর যে মাজনে কোন ঔষধগুণ নেই তা ব্যবহার করা যেতে পারে। একভাগ লবণ বা Table salt এবং দু'ভাগ খাবার সোডা বা Baking Soda মিশিয়ে ভাল মাজন তৈরী করা যায়। মাজন এমন হওয়া উচিত যাহা দাঁত ও মাড়ি ভালভাবে পরিষ্কার করতে পারে। দাঁত মাজবার উদ্দেশ্য হচ্ছে—দাঁত, মাড়ি প্রভৃতি মুখের ভেতরের সব জায়গাগুলি ভালভাবে পরিষ্কার করা। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে যে খাদ্য কণাগুলি আটকে থাকে তা অপসারিত করা এবং মাড়ির রক্ত সঞ্চালন যাতে ভালভাবে হয় তার জন্য মৃদুভাবে মাড়ি মর্দন করা। অন্ততঃ ৫ মিনিট ধরে ভোরে ঘুম ভাঙবার পর একবার আর রাতে শোবার আগে মাড়ি ও দাঁত মাজবেন। প্রত্যেকবার খাওয়ার পর নুনগোলা জল অথবা পরিষ্কার জল দিয়ে মুখের মধ্যে পরিষ্কার করা উচিত।

দাঁত রক্ষার জন্য যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম ও বিশ্রাম দরকার তেমনি বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য ভাল সুষমাযুক্ত খাদ্যও দরকার। দাঁতের পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং রক্ষণের জন্য শিশু এবং ছেলে মেয়েদের প্রত্যহ ১ থেকে ১.৪ গ্রাম Calcium দরকার, ১ থেকে ১.৫ গ্রাম phosphorus দরকার, ৪০০ থেকে ৮০০ International units Vitamin D দরকার। ৬০ থেকে ৮০ মিলিগ্রাম Vitamin C দরকার, ৩৫০০থেকে ৬০০০ International units Vitamin A দরকার। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দাঁতের পুষ্টি ও রক্ষণের জন্য প্রত্যহ ১.৫ থেকে ২ গ্রাম Calcium, ১ থেকে ১.৫ গ্রাম Phosphorus, ৪০০ Int. units Vitamin D, ১০০ থেকে ১৫০ মিলিগ্রাম Vitamin C এবং ৬০০০ থেকে ৮০০০ Int. units Vitamin A দরকার।

Vitamin D ব্যতিরেকে calcium এবং phosphorus-এর metabolism ভাল হয়না অর্থাৎ মুক্ত হোন গায়ে

না লাগালে উক্ত লবণগুলি দেহে গৃহীত হয় না। খাদ্যে এই খাদ্যপ্রাণের অভাব থাকলে হাড় বা দাঁত শক্ত হয় না। দাঁত ভালভাবে গড়ে উঠতে পারে না এবং ভবিষ্যতে দন্ত-পীড়া দেখা দিতে পারে। সূর্য্য-কিরণ দেহের চামড়াতে লেগে আপনা থেকেই খাদ্যপ্রাণ D-এর সৃষ্টি করে। এই জন্য শিশুদের গায়ে তেল মাখিয়ে এক ঘণ্টা আন্দাজ সকালের সূর্য্যকিরণ গায়ে লাগানর ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে। অবশ্য Cod-liver oil, fish liver oil, ডিমের কুসুম, মাছের ডিম, টাটকা নারকোল তেল, টাটকা পালং শাক, টাটকা মটর সুটি প্রভৃতি-তেও খাদ্য-প্রাণ D পাওয়া যায়। বাদাম, ফয়সবিন, বরবটি, মাখন, ডিম, দুধ, পালংশাক, মটরসুটি, গাজর, ওলকপি, পিঁয়াজ, টাটকা পলতা, সর্ষের শাক, সোয়াবিন, নারকোল, মূলো, আলু, শঁসা, রসুন, পুঁটি ও মৌরলা মাছ প্রভৃতিতে calcium থাকে। এর অভাবে দাঁত বা হাড় শক্ত হয় না। পনির, দুধ, বাদাম, ফয়সবিন, ডিম, লিভার, মটরসুটি, লঙ্কা, মাছের মাথার ঘি, আকরোট, পালংশাক, কুমড়া, মূলো, পিঁয়াজ, ওকরা, শঁসা, পাকা-কলা প্রভৃতিতে phosphorus থাকে। এর অভাবে হাড় বা দাঁত শক্ত হয় না। আমলকী, লেবু, কমলা লেবু, টমাটো, পেয়ারা প্রভৃতিতে খাদ্যপ্রাণ C থাকে। এই খাদ্য-প্রাণের অভাবে দাঁতের মাড়ি ফোলে এবং সহজেই মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে। লিভার, ডিম, দুধ, গাজর, হলদে শাকসব্জী, মিষ্টি আলু, পালংশাক, সরষের শাক, টমাটো, প্রভৃতি-তে খাদ্যপ্রাণ A থাকে। এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়, দাঁত-পুষ্ট হয় না এবং লালাস্রাব কমে যায়। সুতরাং দাঁতের উপযুক্ত পুষ্টিসাধনের জন্য উপযুক্ত খাদ্য প্রত্যহ যাপ মত খেতে পারলে, দাঁতের অসুস্থতা বোধ করলে সময়মত দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে এবং মুখের ভিতর সব সময় পরিষ্কার রাখতে পারলে আমরা অন্ততঃ শতকরা ৯০ ভাগ দাঁতের রোগ থেকে রেহাই পেতে পারি।

কবি এলিয়টের মৃত্যুতে

শক্তি মুখোপাধ্যায়

মানুষের মৃত্যু হয় : সেজন্য মানুষের শোক
এবং সহানুভূতি দিয়ে
মৃতের বন্দনা করি
মহিমা কীর্তন করি
দুঃখও দণ্ডায়মান হয়ে।
তারপর দুঃখ শোক ভুলে যাই, সুন্দরের স্মৃতি
শুধু মনে থাকে।
মহৎ কীর্তির জন্য তবু পৃথিবীতে
কেউ কেউ আজও অমর।

কিন্তু আমরা আজ হারালাম যাকে
তিনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম কবি।
তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতর মানুষ
পরিল ছদ্মবেশ ছেড়ে
সূর্যের আলোর সামনে আসতে পেরেছিল।
একটি হৃদয় নিয়ে প্রকাশিত বিস্তারিত
অসংখ্য হৃদয়
পরাধীন পাপবোধ থেকে
মুক্ত হয়েছিল।
মাটির পৃথিবী থেকে যে জীবন দীপ
নির্বাপিত হল,
এসো, আমরা হৃদয়ের অমলিন
শোকাশ্রু নিয়ে
সে-প্রদীপ জ্বালি।
একটি অনির্বাণ প্রদীপের নীচে
অসংখ্য শুদ্ধমুক্ত মন
উদ্ভাসিত হোক।

দেবভূমি

নীরদবরণ

অমল বারান্দায় বসে দেখছে বড়ো হাওয়ার খেলা। ইউ-কেলিপ্টাসের তন্বী দেহটা কি রকম দোলাচ্ছে; তার আলু-থালু দীর্ঘ চুলের রাশিও শিরশির শব্দে কী রকম হেলছে, দুলছে! নীচের আকাশ গাঢ় নীলাভ, উপরাংশে ধূসর মেঘের তন্তুজাল বিক্ষিপ্ত। এহেন উদাসী সন্ধ্যায় অমলের মনে উথলে উঠল তার বাল্যের, উদয় যৌবনের স্মৃতি। তার ভাবতে আশ্চর্য লাগল কি করে একটি মেয়ের দুটি অতর্কিত কথায় তার জীবনের মোড় গেল ফিরে এবং নানা বিচিত্র, অকল্পিত পথে ঘুরে ঘুরে চাকা এসে থামল পার্বত্য প্রদেশের পল্লীগ্রামে। নারীর কোন নিহিত শক্তি, না অমলের আপন অন্তরের উন্মত্ত বহ্নি, না অদৃশ্য কোন শক্তি—কার এই প্রভাব?

চাটগা সহর ভীষণ উত্তেজিত। চাঁদপুরে গুলি, আসাম কুলি, রেলওয়ে কুলির ধর্মঘট ইত্যাদি ব্যাপারে যতীন সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন। চাটগা চাঁদপুর গোয়ালন্দের রেলপথ বন্ধ। নানা ফন্দী ফিকির করে পুলিশের পাশ সংগ্রহ করে ঘোরালো পথে অমল কলকাতায় এসে পৌঁছেছে, কলেজে পড়ছে। ক্লাস কয়েকমাস চলতে না চলতেই অসহযোগ আন্দোলন দেখা দিল কলকাতায়। মিটিং, হরতাল দৈনন্দিন ব্যাপার। এই চাঞ্চল্যকর অবস্থায় অমল একদিন দেখা করতে গেল তার দূর-সম্পর্কীয়া বোনের সাথে। সে কলেজের ছাত্রী, কাকীমার বাসায় থেকে পড়াশুনা করে।

"আরেঃ, অমলদা যে! কোত্থেকে উদয় হলে? কত বছর তোমায় দেখিনি বলো ত? সেই যে পারুর বিয়েতে এসেছিলে, তারপরে নিরুদ্দেশ! এখন? একেবারে খদ্দর পোষাকে!" সুতপা বলে গেল এক নিশ্বাসে।

"এখানে কলেজে পড়ছি।"

"তাহলে দুতিন মাস পরে আসছ দেখা করতে? এখনো তেমনি মুখচোরা রয়েছ?"

"আসব, আসব করে হয়ে ওঠেনি। চারদিকে যে ভীষণ গোলমাল! ধরপাকড় সুরু হয়েছে, ছাত্রদের বুঝি ডাক পড়ল!"

"তাই নাকি? তুমিও সাড়া দেবে ত তাহলে? আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারব আমাদের অমলদাও জেলে গেছে। আচ্ছা, চল উপরে।" বলে সুতপা অমলের হাত ধরে নিয়ে গেল তার কাকীমার কাছে। "কাকীমা, কাকীমা, দেখ কে এসেছে। আমি অমলকে বলছি সে যদি জেলে যায়—"

"জেলে যাবে কেন? ওসব কি অলক্ষুণে কথা বলছিস্?" বলে কাকীমা অমলের দিকে তাকালেন যেন উত্তরটা তার হাতে।

"অমল বলছে যে ছাত্রদের হয়ত জেলে যেতে হবে, নেতাদের ডাক আসলেই। তাই বলছিলাম সেও—"

"কিন্তু সে যাবে কেন এত ছেলে থাকতে? মা'র একটিমাত্র ছেলে সে: তোদের গৌরব বাড়বে তার মা'র কষ্টে? না, অমল করে ক্ষেপাতে নেই। আর, অমল, অমল করে ডাকছিস্ যে বড়! সে তোর বড় না?"

"তারী ত বড়! ছোটবেলায় তাই ত ডাকতাম, সে ত আমার হাতে মানুষ, কখনও দাদা, কখনও সাধা কত কি সম্বোধন করেছি, তাই না?"

অমল হাসে আর মেয়েটির তেমনি প্রগল্ভ শিশুপনায় মুগ্ধ হয়। কাকীমার আদর আপ্যায়নে তুষ্ট হয়ে হষ্টেলে ফিরল রাত প্রায় ৮টায়। সারাটি পথ সুতপার ছায়া ছিল তার সঙ্গী, তার সহজ স্নেহ, প্রাণের নির্মল জোয়ার। সর্বোপরি তার আবেগভরা কণ্ঠের 'তুমিও সাড়া দেবে

ত?' কথাগুলি কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। কিন্তু তার মা! যাকে কলকাতায় পর্যন্ত আসতে দিতে চায়নি সে ছেলে গেছে শুনলে মার প্রাণে কী ভীষণ আঘাত লাগবে! এমনি ভেবে কেটে গেল অনেক রাত। শেষে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় না ভুলে ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু ঘুমেও সেই দ্বন্দ্ব। স্বপ্নে দেখল যেন সে নিশ্ছিদ্র আঁধার পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে, পথের শেষ নেই, থামবার উপায় নেই। পথের দুধারে যত ছায়ামূর্তি ভিড় করে দাঁড়িয়ে। থামলেই তাদের কবলগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য। বহুদূরে ঊর্ধ্ব আকাশে হীরার একটি উপলখণ্ড জ্বলছে।

সপ্তা-দুপ্তা পরে কলকাতা নগরী সরগরম। স্তম্ভিত সমুদ্র যেন ক্ষিপ্ত, বিক্ষুব্ধ। বাসন্তী দেবী, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বোস প্রভৃতি দেশনেতা গ্রেপ্তার! ছাত্র শিবিরে রণডঙ্কা বেজে উঠেছে। একজন নেতা অমলদের হস্টেলে হাজির হয়ে বললেন, "কর্তব্য পরিষ্কার। সরকারের এই Challange আমাদের নিতে হবে, আপনারা তৈরী?" বিকেলবেলা সঙ্গীদের মাঝে মিটিং বসল, প্রস্তাব করা হল হরতালে যারা যারা যোগ দেবে, খাতায় তাদের নাম সই করা হোক। খাতাটি হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। অমল দৃঢ়হস্তে লিখে দিল নিজের নাম, সেইই ছিল দলের কনিষ্ঠ। এটা যে অবশ্য পালনীয় প্রতিশ্রুতি নয়, এমন ধারণা অমলের হয়নি।

পরদিন গোপনে বই ভিনিষপত্র গুছিয়ে, মাকে একখানা চিঠি লিখে অমল শান্তমনে বন্ধুদের মেসে উপস্থিত হল। এক মস্ত দুঃসাহসিক কাজে নামছে, ফলাফল যার অনিশ্চিত; কাজেই পূর্বভাগে বন্ধুদের কাছে বিদায় নিতে হবে। মা'র চিঠিটাও তাদের জিম্মায় রেখে যাবে। উদ্দেশ্য খুলে বলতেই একটি তরুণ ছেলে বলল, "অমলদা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।" অমল তার কথায় কান দিলনা, কিন্তু সত্যি যখন সে সঙ্গ নিল, অমল তাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারল না। আলহার্ট স্ট্রীট কংগ্রেস অফিসে নাম রেজেষ্ট্রি করে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক বের হল, বুকে ব্যাজ, হাতে খদ্দরের পতাকা। 'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি' মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে অমলের দল পিকেটিংএ অগ্রসর হল। মুখে হিন্দি বুলি, 'খদ্দর প'রো, যুবরাজের পরিদর্শন বয়কট করো, স্বরাজ চাই' ইত্যাদি তারস্বরে চীৎকার করে চলেছে সবাই, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার দিয়ে হাওড়ার দিকে। প্রথমতঃ ও উৎসাহে ওঠানামা করছে; গোরা সার্জেন্ট দেখলে মারে, তাদের পার হয়ে গেলে ওঠে। তাদের হাতের বড়া লাঠি কোথায় বসিয়ে দেবে কে জানে! ভেতো বাঙালী রাতারাতি একদম কর্পোরেশন স্ট্রেশন বিশ্বাস বা যুধিষ্ঠির হওয়া যায় না। রাস্তার বিপুল জনসমাগম সাহস দেয় বটে কিন্তু লাঠির গুঁতো, আক্রমণ হলে তারাই আবার পলায়ন নীতি অনুসরণ করে আগে। অমলের ভয় আবার তার তরুণ সঙ্গীটির জন্যে, কিন্তু সে যেন নির্ভীক, শান্ত, সমাহিত! জনতার কী অসম্ভব উন্মাদনা। উপরে বালাখানা, মা বোনদের হুলুধ্বনি, খই, পুষ্পবৃষ্টি, নীচে প্রতিধ্বনি, মাঝখান দিয়ে চলেছে স্বেচ্ছাসেবকের বাহিনী। 'বাংলাদেশের হৃদয় থেকে জননী' বের হয়ে যেন তাঁর সন্তানদের এগিয়ে দিচ্ছেন সমরাভিমুখে। এমনি একদিন এসেছিল ১৯০৫ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন অগ্নিমন্ত্রের ঋষি। এবার চিত্তরঞ্জন! 'কাঁপাইয়া জলস্থল, কাঁপাইয়া গগনতল' ধ্বনিত হচ্ছে বন্দেমাতরম!

এমনি ধারায় বিজয় গর্বে অমলের দল ফিরে এল রাইটও শেষ করে পুলিশের বিনা প্রশ্নে। তাদের ভাগ্যে কেন এই ব্যতিক্রম কে জানে! উত্তেজনায় যেহেতু অবসন্ন বন্ধুরা ছাড়া কেউ ঘুণাক্ষরে এই গোপন যুদ্ধ ঘোষণা টের পেলনা। হস্টেলে এসে খবর পেল যে অঙ্গীকারবদ্ধ সঙ্গীদের মাঝে একজন ছাড়া বাকী সবাই বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। রাতে শুয়ে শুয়ে সেদিনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার নেশায় অমল দুলতে লাগল। কোথাথেকে পেল এই শক্তি, এই সাহস। সুতপার দৈব প্রবোধিত কথাগুলি, বন্ধুদের সশ্রদ্ধদৃষ্টি, জনতার সম্বর্ধনা তাকে গৌরবে মণ্ডিত করল, অন্যদিকে মার বিষন্ন মূর্তি চেষ্টা করল তাকে নিরস্ত করতে, কিন্তু সে যে এখন দেশমাতৃকার স্পর্শকাতর সন্তান!

পরের দিন সকালে রীতিমত ক্লাস করে বেলা তিনটায় তরুণ সঙ্গীটি সহ আবার রওনা হল পিকেটিংএ। এবার গ্রুপে দু একজন সাধারণ মজুর। মন বলছে, আজ শ্রীঘর অবার্য। হাঁক ডাক দিয়ে চলেছে ভয়মুক্ত কণ্ঠে ও পদক্ষেপে। স্ট্রাণ্ড রোডে পৌঁছে দেখল অনতিদূরে বাগানে বসে দুতিনটি সার্জেন্ট চা কি অন্য কিছু পান করছে। ঝকঝকে পোষাক

ঝলমলে বোতাম, চকচকে জুতো। হাতের লাঠি টেবিলের উপর ন্যস্ত। 'বন্দে মাতরম' ডাক শুনে তারা এগিয়ে এল, রূঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করল 'কি বলছ তোমরা?' উত্তরে রুষ্ট হয়ে বলল 'বেশ চলে এসো!' গলির ভেতরে হাজতে পুরে তালা দিয়ে তারা বীরপদে অদৃশ্য হল। ক্ষণিকের জন্যে অমল একটা শক পেল, কিন্তু পূর্বাগত অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গ এবং তরুণ ভাইটির স্নিগ্ধ হাসিতে বিষাদের ছায়া মিলিয়ে গেল। অন্যদের সাথে 'গান্ধী আন্দোলন' ছাড়া অন্য কোন মার্জিত যোগসূত্র খুঁজে পেল না। সন্ধ্যার নাগাদ এল পরিপাটি ভোজ। মাড়োয়ারী ভাইদের প্রেরিত অপ্রত্যাশিত উপাদেয় ভোজনশেষে রাত্রে সকলকে এক অন্ধকূপ ভ্যানে ছাগলের মত পুরে কোথায় নিয়ে চলল গোরার দল। বন্দেমাতরম চীৎকার শব্দে রাস্তা কাটিয়ে ভ্যান চলেছে। গোরার দল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, কোনমতে উদ্যত লাঠি সামলায়। অবশেষে গাড়ী এসে থামল বিশ্ব-বিশ্রুত আলিপুর জেলে।

ফটক পার হয়ে অন্দরে ঢুকতেই 'কারাগার অভ্যর্থনা' করল অমলদের, অন্ধকার কেন্দ্রী বন্দে মাতরমের কলকণ্ঠে। তারপর শোনা গেল যে চিত্তরঞ্জন ও সুভাষ বোসদেরও ওখানে রাখা হয়েছে। স্তিমিত বিজলী আলোয় বিরাট এক ভূতুড়ে দালান নজরে পড়ল, তার জানলায় জানলায় ছায়ামূর্তি সব দাঁড়িয়ে। তারা আগত ভলানটিয়ারদের জিজ্ঞেস করছে তাদের বন্ধুদের খবর। 'অশোক তমোহর তোরা আছিস ওখানে?' আর তেমনি নীচ থেকে তব তালাস। হঠাৎ হুকুম এল বসে যাও, বসে যাও; ডিনারের সময়। কোনমতে লোহার থালাটি অনস্পর্শ করিয়ে বলা গেল আর কে কি দিয়ে গেল আঁধারের মাঝে রহস্যময় রইল। সামান্য মুখে দিয়ে সবাই আশ্চর্য হয়ে ভাবল এও সম্ভব। এ যে মাংসের স্বাদ কিন্তু মাংস বলে কোন পদার্থ নেই, আছে ঝোল! ক্ষিদের জ্বালায় তাতেই ঝালের স্বাদ লাভ করে সবাই ঢুকল সেই দালান গহ্বরে। দরজার ঝনাৎ শব্দে তালা পড়ল। যাত্রীদের আগমনে আগে থেকেই হল অর্ধেক ভর্তি। প্রায় তিন চার শ' লোকের একত্র সমাবেশ। স্বল্পালোকে অনুমান হল স্বদেশী বস্তা সকলশ্রেণীকে তাসিয়ে এনেছে। মাষ্টার-ছাত্র, মজুর-মালিক, হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী সবাই আলিপুর দ্বীপে নির্বাসিত কিন্তু তাতে দুঃখের পরিবর্তে উল্লাস; মায়ের ডাকে মিলেছে সব'ই। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্।'

সকালে ঘুম ভাঙল আবার ঝনাৎ শব্দে যখন দরজা শিকলমুক্ত হল। দিনের আলোয় পরস্পরের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। কে একজন বলল, জান, এই সেই জেল যেখানে শ্রীঅরবিন্দ আবদ্ধ ছিলেন এক বছর আর সত্যেন কানাই তাদের কথা না জানে কে? আমাদের পরম সৌভাগ্য তাদের পায়ের চিহ্ন ধরে এখানে এসেছি। আর একটি আশ্চর্য আবিষ্কারের খবর কানে কানে ঘুরে বেড়াতে লাগল যে মহাত্মাগান্ধীর জ্যেষ্ঠপুত্র হীরালাল তাদের দলভুক্ত।

লপসী নামক এক অপরূপ প্রাতরাশ সেরে সবাই রওনা হল বিচার স্থল লালবাজারের উদ্দেশে। সারা-দিন কাটল বিচারের অপেক্ষায়। সরকার যে জাল পেতেছে, তাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে কলকাতা শহরের বিপুল জনসংঘ। বিচারকের মুহুরুৎ নেই; দু চারটা প্রশ্ন, জবাব, ধড় বা মুক্তি। দুপুর বেলায় হাজতের বাইরে চোখ পড়তেই অমল আশ্চর্য হয়ে দেখল বন্ধুবান্ধবেরা হাজির। সুভাষ কি তাদের মধ্যে নেই? দু একজন মুরুব্বী অমলদের প্রলোভন দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। সেদিন তাদের বিচার চল না, হল কেবল তুষি ভোজন কোন দেশসেবকের প্রসাদে। দ্বিতীয়দিন ডাক পড়ল; পূর্বশিক্ষানুসারে দলের সবাই হাকিমের প্রশ্নের এক জবাব দিল, I have nothing to say! হাকিম চটে রায় দিলেন ন'মাস সশ্রম কারাদণ্ড!

সুরু হল কারাবাস। কিন্তু এ ধরণের কারাজীবন পৃথিবীতে বিরল। বিরাট হল্লা, বিপুল উন্মাদনা; কত অজানার সাথে জানাজানি! এই হট্টমন্দিরে হীরালালজীর শান্ত করুণ চেহারা, স্নিগ্ধ কণ্ঠ, ভাবালু চোখ দুটি যেন কোন ভ্রষ্ট দেবতার। এই যৌবন জল তরঙ্গের প্লাবনে কর্তৃপক্ষ দিশেহারা হয়ে গেল। শত শত ভদ্র কয়েদীদের কোথায় স্থান দেবে, কি কাজ দেবে, কি ভাবে অভ্যর্থনা করবে? কর্তারা সকালে ভিজিট দিয়ে চলে যায়, সাহেব-দের টুকটুকে লাল আপেলের মত মুখ। তাদের পরিদর্শন প্রতীক্ষায় সবাই ধৈর্যসহকারে দাঁড়িয়ে থাকে আর পৃষ্ঠ-প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত ঢেউ কূলের উপর ফেটে পড়ে। অল্প দিনের মধ্যেই জেলের ক্ষুদ্র সাজানো বাগান ধ্বসিত·

যথিত বিচ্ছিন্ন হল; দত্ত মার্জন কাজে তালপালা বিক্ত নিমগাছ তিক্ত কণ্ঠে নালিশ জানাল; তেলাপোকা, কটিং ইন্দুর-সিদ্ধ লপসী, অপাচ্য তরকারী, বস্তাপচা চালের দুর্গন্ধ ভাত, তাদের সঙ্গাজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনায়িত হয়ে ছুটল সরকার ও দেশনেতৃবৃন্দসমীপে। তদন্ত সুরু হল, ফলে অভাবনীয় পরিবর্তন। সুড়ি সুড়ি এল কট-কাতলা, আলু পটল কপি, ঘি সুজী! স্বদেশীসেবক নিযুক্ত হল রান্নার কাজে। যুদ্ধ আপাতত থামল; সরকার চাণক্য-নীতি প্রয়োগে সর্ববিবাদের উৎপত্তিস্থল উদরদেবতাকে তুষ্ট করে শান্তিপর্বের প্রতিষ্ঠা করলেন। কৌরবংশ এই নীতি জানত না বলে ধ্বংস হল। অন্যদিকে, হীরালালজির কাছে আসত প্রচুর ভেট, এতে গান্ধীজির পুত্র, তাতে বন্ধু। আম, লিচু, চাটনী জাতীয় রসাল বস্তু কি তাঁর উপভোগ্য? পলকে সব উপযুক্ত স্থানে উধাও হয়ে যেত। সাধারণ কয়েদীর জন্যে কারও স্বদেশ প্রেম উথলে উঠত কিনা সন্দেহ। একদিন কাতারে কাতারে মাছ ভাজা পড়ে আছে, হঠাৎ একটি কয়েদী ছোঁ মেরে একটুকরো মাছ তুলে নিতেই স্বদেশী সেবক তাকে ধরিয়ে দিল। বেচারীকে কী নির্মম প্রহার দিল তার ঊর্দ্ধতন কয়েদী প্রভু। লঘুপাপের গুরুদণ্ডে স্বেচ্ছাসেবকটি অত্যন্ত অনুতপ্ত হল।

এমনিধারা নবাবীহাল বেশিদিন চলতে পারেনা, রাজার ভাণ্ডারও শূন্য হয়ে যাবে। উপরন্তু, কর্তৃপক্ষের ভীষণ ভয় স্বদেশীদের সংস্পর্শে এসে সাধারণ কয়েদীরা যদি স্বাধীন হয়ে ওঠে। কাণাঘুষা শোনা গেল যে মত সাধব করে মুক্তির ব্যবস্থা চলছে। অমলদের শাস্তি সাত মাস থেকে নামল ছ মাসে। লোক সংখ্যা কমতে লাগল। পরিবেশ স্থিতি লাভ করল; জাগল একটা আদর্শের ভাব। নানা গম্ভীর আলাপ আলোচনা, এমন কি ধ্যানধারণা। চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বোসের আত্মত্যাগের, এই আলিপুর জেলে শ্রীঅরবিন্দের এক বছর বাস ও তাঁর অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর বসুদেব দর্শন, দন্তোন-কানাইর অবিস্মরণীয় দেশপ্রেমের কাহিনী অমলদের উদ্বুদ্ধ করত। তাদের সম্মিলিত সরস্বতী পূজায় নিমন্ত্রিত হয়ে সুভাষবোসের আগমন, তাঁর আর্য-সন্তানসম দৌম্য-গৌরকান্তি, সাধারণ খদ্দরবেশ, অন্তরঙ্গতা সকলকে বাঁধল রাখীবন্ধনে।

অপর পক্ষে, সাধারণ কয়েদীদের সাথে পরিচয় গভ ঘনিষ্ঠ হল ততই জেল-জগতের নিগূঢ় রহস্য, কিন্তু জীবন-কাহিনী উদ্ঘাটিত হতে লাগল। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম, পশুর অধম খাওয়া-দাওয়া, ব্যবহার, কয়েদী আইনতন্ত্রের রাজত্ব, কঠোর শৃঙ্খলা, সামান্য ত্রুটিতে কঠিন শাস্তি। ফলে শঙ্কা, সন্দেহ, অবিশ্বাসের বিষাক্ত হাওয়া, চুরি, শঠতা, এমন কি জুয়াখেলা পর্যন্ত গোপনে প্রচলিত, পুলিশের সহযোগিতায়। একটি কয়েদী দেখালে সে কি কৌশলে কণ্ঠনালীতে টাকা লুকিয়ে রাখে, অথচ রীতিমত কথাবার্তা বলে যায়। আর একটি কয়েদীর পিঠে কত বেতের দাগ, কিন্তু তবুও তাকে দাবেত্তা করতে পারা যায়নি। তেমনি কত কাবুলিওয়ালা, Jean vol Jeanএর করুণকাহিনী অন্তধারায় বয়ে যাচ্ছে কে জানে।

এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অমল ছ-মাস পরে এল, বেশ একটা পরিবর্তন নিয়ে। চেহারায় চরিত্রে ফুটে উঠেছে স্থিরতা ও দৃঢ়তা। মেরুদণ্ড শক্ত, স্নায়ু স্বচ্ছ, দৃষ্টি উজ্জ্বল। তাকে দেখে বন্ধুদের চোখে শ্রদ্ধা জাগল; সুতপারাও অবাক। জেল জীবনের খবর শুনে সুতপা হাল্কা সুরে বলল, তাহলে তারী ত বীরত্ব দেখিয়েছ। আমরাও সে রকম বীর হতে পারি। কোথায় আমরা ভাবলাম বীরভূমের রোগা হাড় সর্বস্ব চেহারা নিয়ে ফিরে আসবে আর আমরা নিউ মার্কেট থেকে ফুল কিনে গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করব, আর তুমি কিনা নবে'র জামাই হয়ে ফিরে এলে। কাকীমা একটু স্নেহতিরস্কার করলেন দেশের মা'র তাকে রক্তমাংসের মাকে সে অবহেলা করেছে বলে। সুতপার বোনেরা অমলদের বীর উক্তি I have nothing to say, বারবার আবৃত্তি করে বুঝিয়ে দিল যে যদিও তারা কোর্টে যায়নি, তবুও সব বিবরণ তাদের কানে পৌঁছেছে। অমল এতে তৃপ্ত হল।

মেসে ফিরে এসে ভাবল ততঃ কিম্? প্রথম, দেশ; মা অপেক্ষা করে রয়েছেন। তরুণ ভাইটিসহ রওনা হল দেশের দিকে। ছেলেটি সত্যিই ভাই, জেলে সব সময় ছায়ার মত অমলের সাথে থাকত, তার বাদন-পত্র ধুয়ে দিত, কম্বলপাতা বিছানায় প্রায় জড়াজড়ি হয়ে শুত। সব সময় ছিল শান্ত, স্নিগ্ধ চলন, বলন ও ব্যবহার। জীবনের অনিশ্চিত পথযাত্রায় দুদিনের সঙ্গী দিয়ে যায় দিগন্তের আলো ও সৌরভ। ট্রেনে অমল তাকে

জিজ্ঞেস করল, "তুই এখন কি করবি? আবার স্কুলে ঢুকবি?"

"গোলামখানায় আর নয়! তুমি কি করবে?"

"কই, সে কথা ত ভেবে দেখিনি।"

"তবে আমার কথা ভাবছ যে বড়?"

অমল একেবারে অপ্রতিভ! শুধু বলল, "আমায় ভুলিস না। প্রয়োজন হলে তোকে যেন পাই।" কিন্তু অমলের মন বলল, এই তাদের শেষ দেখা।

মা যেন হারানিধি ফিরে পেলেন। এমনভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন,ছেলে যেন নচিকেতার মত মৃত্যুর গৃহ থেকে ফিরে এসেছে। কিছুদিন অবসর ভোগ করে সে পল্লী-সংগঠন কাজে যোগ দিল। জেলে গিয়েছিল কতকটা ভাবের আবেগে, ফিরে এসেছে দেশের প্রতি একটা প্রকৃত টান নিয়ে; কাজের উপলক্ষে দেশের সাথে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। দেখল দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রোগ, চিকিৎসার অভাব। মনে পড়ল তার ছোট ভাইটির কথা: কেমন সুন্দর সুস্থ চেহারা, চিকিৎসার অভাবে অল্প দিনের মধ্যে না ফুটতেই ঝরে গেল! অমল পথের ইঙ্গিত পেল।

ছাত্রদের ননকোঅপারেশন পর্ব শেষ! সবাই স্কুল কলেজে ঢুকছে। অমল ঢুকল ডাক্তারীতে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, যদিও ডাক্তারির প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ ছিল না। ডাক্তারী কোর্স নাকি ভীষণ শক্ত, প্রলোভনও তাতে প্রচুর। তাই প্রথম থেকে অচল প্রতিষ্ঠ হয়ে লক্ষ্যভেদে তৎপর হল। দু-চারবার সুতপাদের বাড়ী যাতায়াত করেছে। যদিও সুতপা মেহাভিধ্যে কোন কার্পণ্য করেনি তবুও তাদের ব্যবহারে একটা আড়ষ্টভাব, ভয় সঙ্কোচ অমলকে পীড়া দিয়েছে। যখন জানতে পারল যে কোন 'স্বদেশী'র সাথে সুতপার হৃদ্যতা তার অভিভাবকের অভি-প্রেত নয়—অমল নির্মম হাতে নিজের দুর্বলতার সূত্র ছিঁড়ে ফেলল। এই আঘাত কোন এক মঙ্গল হস্তের বিধান বলে সে মেনে নিল এবং স্থির করল সেই বিধানে সে কোনদিন হস্তক্ষেপ করবে না; কিন্তু আমাদের ইচ্ছাই কি সব? অন্য শক্তি যে আমাদের চালায়, খেলায় তার কতটুকু বুঝি? বন্ধে সে বাড়ী যাচ্ছে। গোয়ালন্দ ষ্টীমারে রেলিং ধরে যাত্রীদের যাতায়াত, কোলাহল দেখছে শুনছে, এমন সময় টান পড়ল তার সার্টে। চোখ ফেরাতেই খিল খিল হাসি এবং কেবিনের দিকে অঙ্গুলি সংকেত। অনতিদূরে সুতপা কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে। সুতপা হাস্যমুখে তাকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে। অমল এগিয়ে গেল।

"কি ব্যাপার? এমন তন্ময় হয়ে কি দেখছিলে? টুলি এক দৃষ্টিতে তোমায় চিনে ফেলেছে। এসো, এসো, ভেতরে এসো। আমাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াও না যে! অবশ্য তার জন্যে আমরাই দোষী, কিন্তু আর দণ্ড দিচ্ছি। বল, এখন কি করছ।" অমল নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "তার আগে বলল, তোমরা একলা—"

"দূর বোকা! বাবা সে ধরণের মানুষ? ওই দেখ হাবা গোবিন্দ দাঁড়িয়ে আমাদের পাহারায়!"

"সে জন্যে বুঝি ডাকতে সাহস হল?"

সুতপা গলাটা হঠাৎ করে খুব মৃদু সুরে বলল, "তুমি জান, আমরা কত অসহায়। নইলে আমরা কি দেশকে কম ভালবাসি? তোমায় যে জেলে যেতে উদ্দীপ্ত করেছিলাম, সেটা কি শুধুই খেলার ছলে? আমাদের কোন স্বাধীনতা দিয়েছ তোমরা? শুধু কি তাই? পুরুষেরা ভাবে মেয়েরা এতই অবলা যে তাদের একটা লাঠি না হলে চলবে না. সে লাঠি বুদ্ধিই হোক, কড়িই হোক বেতই হোক, বাঁশই হোক। যাক্‌গে, পুরুষ প্রকৃতির উপর মতবা করে অমূল্য সময় নষ্ট করবনা। বল, এখন কি পড়ছ?

'কি পড়ছি জান না?'

'না, না, তা নয় গো বুদ্ধিমান। কি বিষয় পড়ছ?'

'ওঃ, মরা কাটা।'

'ভয় দেখাচ্ছ? ও ভয়ে কম্পিত নয় নারীর হৃদয়। কিন্তু তুমি না ফুলের গন্ধে গুঞ্জন করতে?'

'মরাও ফুল।'

'বাঃ, বেশ বোল ফুটছে ত। বিদ্যা সুরু হতে না হতেই এতখানি অনুরাগ! very good augury! কপেলামি রেখে সত্যি বল ত প্রথম যেদিন মরার মুখোমুখি হলে কোন বিকার হয়নি? শুনি, কেউ কেউ ভয় পায়, বমি করে—

'রাতে স্বপ্ন দেখে, ভূত পিশাচের দল তেড়ে আসে, অন্ততঃ পক্ষে জীবনে ধিক্কার, বৈরাগ্য আসে এই ত?'

'থাম, থাম! আমি seriously জানতে চাই, আর তুমি করছ দুষ্টুমি! সত্যি কোথাকার কোন মড়া, হাড়ি না ডোম—'

'মরার আবার জাত আছে নাকি ?'

'অন্ততঃ গন্ধটা ত আছে, আর সে গন্ধ ফুলের নয় !'

'গন্ধ আছে, তবে ওষুধের ! ইনজেকশন দিয়ে শবের শরীর শক্ত ও রোগহীন করা হয়। দেখবে, তার শিরা উপশিরা কী সুন্দর সিঁদুর রাঙা ! আর ছেলেরা,—দু একটা মেয়ের থাকও পাবে, যারা মুখে রুমাল গুঁজে, দিব্যি আরামে শবের পাশে বসে কেটে চলেছে তার নাড়ী, শিরা উপশিরা, স্নায়ুর তন্তুজাল। কোন দূর গন্ধোত্রী থেকে নেমে এসে শতধা বিভক্ত হয়ে ধমনীর এক শাখা গেল উত্তরে, অন্যটি দক্ষিণে, কোনটি পূর্বে, পশ্চিমে—এমনি ধারায় বয়ে চলে রক্তগঙ্গা দেহাধারে ! এসব তত্ত্ব বের করে ছেলেদের কী উল্লাস ! স্নায়ুর সাথে শিরার কি সম্পর্ক, মাসতুতো না পিসতুতো ভাইবোন, না, অন্য কোন আত্মীয়তা, কোন মাংসপেশী এসে সে সম্পর্কে জট পাকায়, এসব রসের বিজ্ঞান কি তোমাদের হেগেল শঙ্কর দর্শনে মিলবে ? বলবে সব ঝুট হ্যায় !'

সুতপা হাসি সম্বরণ করতে পারল না। বলল, বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি ! এমন রসের হলে আমিও ডাক্তারী পড়তাম। আচ্ছা সত্যি বল ত কেন পড়ছ ডাক্তারী ? তোমার ত ওদিকে বেশি ঝোঁক ছিল না।'

'জীবিকা।'

'জীবিকার ত তোমার ভাবী ভাবনা। আর সবেধন কালোমণি !'

'তুমি ত পদ্মরাগ, তুমি কি করবে ? নারীর এত পড়াশুনার দৌড় ত শেষ পর্যন্ত বা-নয়ের কণ্ঠশোভা বর্ধন করা !'

'ঠিকই অনুমান করেছ। বাবার নাকি তাই ইচ্ছে। আমার ইচ্ছা বিলাত যাওয়া, কিন্তু আমরা যে খাঁচার পাখি তোমরা মুক্ত বিহঙ্গ। আচ্ছা, চল আপাতত পদ্মার মুক্ত হাওয়ায় পাল তুলে দেওয়া যাক।'

অসীম আকাশ, বিশাল জলধি, বিপুলা পৃথিবী। সূর্যদেব ভুবন ভ্রমণ শেষে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হচ্ছেন। যেমনি তাঁর উদয়, তেমনি তাঁর অস্ত ; নিয়ে আসেন অনন্ত আলোর ভাণ্ডার, দিয়ে যান উজাড় করে শেষ সৌন্দর্য-সম্ভার। সুতপা ও অমল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, দুজনেই আত্মহারা ! অমল বহুবার এই পদ্মা পার হয়েছে, শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায়, কিন্তু এমন অপূর্ব দৃশ্য তার চোখে পড়েনি যেন ? ভরা পাল নৌকা, চরে চরে গাঙ পাখির শাদা ঝাঁক, তীরে তীরে সবুজ সোনালী শস্যের ক্ষেত, ঘাটে ঘাটে কলসী-ভরণা গ্রাম্যবধূ—কোথায় লুকিয়ে ছিল প্রকৃতির এই অনাবিল সহজ সৌন্দর্য ? সুতপা নির্বাক, দিগন্তে তার ধ্যানমগ্ন দৃষ্টি, চিত্রার্পিত ছবি। কোথায় গেল তার পূর্ব মুহূর্তের কৌতুক ? এই দুই মুহূর্তের মাঝে যে ব্যবধান অমল তার সেতুবন্ধন খুঁজে পেলনা। বিরাট কালো পাখা মেলে যখন রাত নেমে এল, তখন সুতপার ধ্যান ভাঙল এবং বলল, 'চলো, কিছু খাওয়া যাক। চাঁদপুর এসে গেল। তারপর কবে দেখা হবে কে জানে ! তুমি থাকবে তোমার মরা বাঁচা কাটাকাটি নিয়ে, আমি থাকব মায়ার জগতে।'

অমল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ; রহস্য সে বেশি বোঝে না। তার প্রকৃতিতে দর্শন, মিষ্টিক জাতীয় বস্তু কম, কিন্তু আনন্দ আছে। খাওয়া শেষে সে নিজের জায়গায় ফিরে এল আনন্দে ভরপুর হয়ে। যেন এমন অপূর্ব সম্পদ কিছুর স্পর্শ পেয়েছে যাতে ঘর-বাহির, আলো-আঁধার, মাধুর্যে পূর্ণ, যেন এক নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে। চাঁদপুর পৌঁছে সুতপাদের তত্ত্ব নিয়ে সে আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবার যখন দৃষ্টিগোচর হল তখন সে তার গ্রামের ডাক্তার ; রিক্ত, রুগ্ন দৈবাধীন দেশবাসীদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করেছে তার দেশসেবার মন্দির। পুঁজি সামান্য, দাবী অশেষ কিন্তু তার হৃদয়ের সেবা ও যত্ন দশটা গ্রামের অভাব যৎকিঞ্চিৎ পূরণ করেছে। হোমিওপ্যাথ, কবিরাজদের উপর কঠিন পীড়ায় আস্থা রাখতে পারে না বলে লোকজন তার শরণ নেয় ; তবে সৌভাগ্যক্রমে অধিকাংশ অসুখই প্রকৃতি নিজেই সারিয়ে দেয়, ডাক্তার একটু কিতার বা কম মিকশ্চার দিয়ে সাহায্য করে মাত্র।

এই কর্মরত জীবনে খবর এল সুতপার বিয়ে। বর গুণবান, রূপবান ও ধনবান, সরকারের পদস্থ কর্মচারী। মুক্তাক্ষরে লেখা স্বয়ং সুতপার চিঠি এল অমলের কাছে। তাদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দুঃখপ্রকাশ, অমলের জীবনব্রতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তার নারীজীবনের পরম শুভ মুহূর্তে অমলের স্নেহাশীর্বাদ প্রার্থনা—এই হল চিঠির মর্ম।

কিন্তু চিঠিটা পড়ামাত্র অমলের মন কি এক অজানা বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সুন্দর লেখার ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি অদ্ভুত কালো দাগের আভাস পেল। চোখের ভুল মনে করে দৃষ্টি পরিষ্কার করে আবার পড়ল, না, কোন ভ্রম নেই। তবে কি তার বিকৃত মনের ছায়া? সুতপাকে সে ভালবাসে, সুতপা ভালবাসার সম্পদ, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, সে ভালবাসার স্বাধিকার প্রমত্ততা সজ্ঞানে অনুভব করেনি ত! তবে কি কোন অশুভ পরিণামের সঙ্কেত? এক পলকে ভেসে উঠল তাদের বালোর সখ্যের কাহিনী। প্রথম পরিচয়ের মধুর শেফালি-স্মৃতি।

অমলের মামার বাড়ীর উঠানে ছিল একটি শিউলি গাছ। ভোরে অজস্র ফুল মাটিতে বিছিয়ে দিত তার কোমল শ্বেত পরশ। শীতের কুয়াশায় সেই পরশ কুড়িয়ে নিতে এসে সুতপা লক্ষ্য করে কে একজন তার ফুলের অংশীদার। 'কে তুমি?' বিস্ময়ে শুধায়। পরিচয় পেয়ে বলল, ওঃ, তাহলে আমিই চোর! কাল এসেছ বুঝি? কিন্তু এত ফুল নিয়ে ছেলেমানুষ তুমি করবে কি? অমল মৃদু হেসে বলল, 'ফুলের গন্ধ আমার ভাল লাগে।' উত্তরে প্রীত না হলেও সুতপা বলল, আচ্ছা, তাহলে ভাগাভাগি হোক। তুমি সামান্য কিছু নিয়ে বাকী সব আমায় দাও! আমার ঠাকুরমা বৃদ্ধপূজা করেন কিনা, ফুল না হলে পূজা হয় না, বুঝলে? এই যাঃ, সাজিটি গেছি ভুলে; যাও, আমার আঁচল ভরে দাও। আর চল সঙ্গে, আমায় বাড়ী পৌঁছিয়ে দেবে। এমনি করে তাদের পরিচয় বাড়ে। রোজ ভোরে গ্রামের সুপ্ত পথে বেতঝাড়ের পাশ কাটিয়ে, জোড়াপদ্ম-পুকুরের মাঝখান দিয়ে অশথ গাছ ছাড়িয়ে, গড় ধরে ধরে চলত তাদের পায়ের ধ্বনি আর সুতপার গল্প। তার ঠাকুরমার কথাই বলত বেশি; রোজ সকালে বিকালে তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিহারে যান। বিকেলে অনেকক্ষণ ধরে বুদ্ধের নাম জপ করেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকেও যোগ দিতে হয়। কোন কোনদিন জপতে জপতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঠাকুরমার জপ শেষ হয় না। কী চমৎকার সুরেলা তাঁর গলা। 'শোন, একদিনের অদ্ভুত ঘটনা!' সুতপা অমলের হাত ধরে বলতে সুরু করল, বিহারে বিরাট বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ শেষ হয়েছে—দেখেছ ত মূর্তিটি? বুদ্ধের একপাশে ইন্দ্র, শচী, ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতা, অন্যপাশে আনন্দ ও অন্যান্য শিষ্যবর্গ। পরের দিন মূর্তির উৎসর্গ করা হবে। কয়েকজন উপাসক-উপাসিকা বিহারে রাত কাটাচ্ছেন। অকস্মাৎ মাঝরাত্রে তাদের ঘুম ভেঙে যায় এবং তারা শোনে, মন্দিরে সমবেত কণ্ঠে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্রপাঠ চলেছে।

কোন কোন দিন সে অমলের দেশের কথা শুনতে চাইত। অমল আবার মুখচোরা। সুতপা মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলত—কিন্তু অমলের পাহাড়ের দেশ, রাঙা-মাটির পথ, উচ্ছামতীর হাঁটুভাঙা জল, কর্ণফুলীর ফুলে ওঠা স্রোত তার মনে রঙ ধরাত। অমল সেই রহস্যলোকের সন্তান বলেই বুঝি তার উপর জন্মেছিল সুতপার মায়া! একদিন খেলার মাঝে সুতপা হঠাৎ অমলের গলায় বকুল-ফুলের মালা পরিয়ে দিল। তার বন্ধুরা খিল খিল করে হেসে উঠল, "করলি কি তুই? ওর গলায় মালা দিলি?" সুতপা নির্বিকারকণ্ঠে বলল, "ওদের কথায় কান দিওনা, তোমার গল্প ভাল লাগে, তাই মালাটা দিলাম।" অমল কোনমতে লজ্জা চাপে।...

সেই সুতপার বিয়ে! সময়ের নদী বয়ে গেছে কত বিচিত্র অজ্ঞাত পথ দিয়ে। স্রোতের ফুলের মত ভেসে সুতপা উত্তীর্ণ হয়েছে এক আনন্দলোকে, আর আর্তের সেবা নিরত সে, অন্তপারে। দুইপারের মাঝে ক্ষীণ বন্ধন। হঠাৎ অমলের খেয়াল হল এসব কি কথা ভাবছে সে এবং সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গলসূচক চিহ্নগুলি স্মরণ হতেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "ভগবান, তাকে রক্ষা করো।"

দূর গওগ্রাম থেকে বিয়েতে উপস্থিত হওয়া অমলের পক্ষে সম্ভব হল না। সে একটি কঠিন সন্ন্যাস রোগী নিয়ে ব্যস্ত, তারজন্যে ছয়সাত মাইল দূরে পার্বত্য অঞ্চলের মিশনারী হাসপাতালের সাহেব ডাক্তারকে ডাকা হয়েছে। আশ্চর্য এই জার্মান ডাক্তারটি! ভদ্র ব্যবহার, মধুর স্বভাব! আধ আধ বাংলায় জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কি হয়েছে? কত দিন জ্বর হয়েছে? কোথায় ব্যথা?' এমন শান্ত সুস্থতায় রুগীর অর্ধেক অসুখ সেরে যায়। সাত সমুদ্র পার হয়ে কোথায় পার্বত্য জাতির মাঝে গড়েছে সেবা প্রতিষ্ঠান। নীচে বয়ে যাচ্ছে পার্বত্য নদী, উপরে পাহাড়, মাঝখানে ঝকঝকে ছোট্ট হাসপাতাল। আর এই সহজ

সবে অভিমানহীন সাহেবটি। অমলেরও অভিলাষ এমনি আদর্শে নিজেকে তৈরী করে।

রোগ শোক দুঃখপূর্ণ এই পৃথিবীতে সুতপার দাম্পত্য-জীবনের খবর নানাসূত্রে অমলের কাছে এসে পৌঁছত। সুতপার স্বামীর অনেক গুণ, একদিকে বিচক্ষণ কর্মচারী, অন্যদিকে বন্ধু বৎসল, আমোদপ্রিয় ও সজ্জন। বাড়ীতে নিত্য বন্ধুদের পানের আসর, খেলাধূলা, সাহিত্যচর্চা, সহরে নানা অনুষ্ঠানের কর্মী বা উদ্যোক্তা। বছরে স্বামী স্ত্রীর দেশ ভ্রমণ, স্বল্পায়ু মরজীবনে যতখানি আনন্দ আহরণসম্ভব, সে যেন নিঃশেষে পান করে নিতে চায়। বছর দুই এমনি সুখের হিল্লোলে গান গেয়ে চলল তাদের যুগলজীবন। একদিন অতর্কিতে দুর্নীচক্রের গতি গেল থেমে। পক্ষাঘাতের আক্রমণে সুতপার স্বামী চোখ বুজল। পক্ষাঘাতে সুতপা পাথর হয়ে গেল, অমল যখন উপস্থিত হল, তখন সব শেষ। সুতপা নির্বাক, নির্বিকার, তার মুখ যেন একটি মুখোস। কারও দিকে দৃষ্টি নেই; মন্ত্রের মত নিজের কর্তব্য করে যাচ্ছে। এই কঠোর তাপসী মূর্তি দেখে অমলের অন্তর কেঁপে উঠল। বুঝতে পারল সমগ্র শক্তি দিয়ে সুতপা নিজেকে সংহত করে রেখেছে এর পরিণতি ভয়াবহ এবং এও বুঝল তার উদ্ধারের ভার স্বয়ং নিজের হাতে, অথবা যেই হাত থেকে এই আঘাত নেমে এসেছে, সেই হাতে। মানুষ নিরুপায়। তাই অমল নীরবে বিদায় নিল।

দুতিন মাস পরে সুতপার জরুরী চিঠি পেয়ে অমল তার সাথে দেখা করতে এসেছে। দুঃসময়ের ডাকে, সাড়া দিতেই হবে। সুতপা ছোটভাই ও চাকরাণী নিয়ে একলা থাকে। তার চোখের পল্লবে তখনও কালো ছায়া। সুতপা তাকে বলল, 'তোমায় বৃথা ডাকিনি; সেদিন যখন চলে গেলে, নিশ্চয় ভাবনি যে এ বাড়ীতে এত শীঘ্র তোক পড়বে। অথচ আমার কোন আত্মীয়বন্ধু নেই, যার শরণ নিতে পারি! এতদিন কিভাবে দিন গেছে, তুমি অনুভব করতে পারবে; এখন এমন কাউকে চাই, যার কাছে প্রাণটা খুলতে পারি। জানতাম তুমি আসবে!' অমল নীরব শুধু, তার চোখ দুটি সন্ধ্যা তারার দিকে নিবদ্ধ।

"জান, আমি তার দেখা পেয়েছি?"

"কার?" চমকিত হয়ে তাকাল অমল।

"স্বপ্নে সে দেখা দিল। অবিকল তার চেহারা; মুখটা বিষণ্ণ। বলল, 'সু, তোমার কথা উপেক্ষা করতাম বলে তুমি ব্যথিত হতে, আমি জানি, কিন্তু প্রত্যেকের প্রকৃতি, ধর্ম আলাদা। চেষ্টা করেও আমার স্বভাব বদলাতে পারি নি এবং তার জন্যে আমার দুঃখ নেই মোটেই, কেবল তোমার বিষাদই আমায় পীড়া দিচ্ছে। তুমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাও এবং জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোল। আমি তোমায় সে সুযোগ দিইনি!'

অমলের কাছে বস্তু জটীল হয়ে উঠল; সাগ্রহে অপেক্ষা করে রইল ব্যাখ্যার জন্যে। সুতপা বলল, 'কিছু বুঝতে পারছ না নিশ্চয়। খুলে বলি। তার ছিল দারুণ প্রাণ চাঞ্চল্য; অফিসের বাইরে তিলমাত্র সময় সে স্থির থাকতে পারত না। কোন দুর্দমনীয় শক্তি যেন তাকে অনবরত দোলা দিচ্ছে, সমুদ্রের ঢেউএর অস্থির দুরন্ত দোলা। কিন্তু সমুদ্রের পক্ষে যেটা স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশেষতঃ তার মত ক্ষীণকায় লোকের পক্ষে, সেটা হতে পারে অপরিমিত ব্যয়। কতবার তাকে সতর্ক করেছি, অনুনয় বিনয় করেছি প্রাণের অধীর আবেগকে সংযত শান্ত করতে, কিন্তু স্রোতের বেগ কতক্ষণ বালির বাঁধন মানে? এতে শুধু যে তারই ক্ষতি হত তা নয়, আমারও পাল্লা দিয়ে চলতে হত বলে আমি হাঁফিয়ে উঠতাম। মেয়েরা, অন্ততঃ আমার মত মেয়েরা চায় স্থিতি, আর তোমরা চাও বোধহয় অশ্রান্ত গতি, কিন্তু গতিকে স্মৃতির মাঝে ধরে না রাখলে আয় থেকে যে ব্যয় বেশি হয়। তাতেই আমার দারুণ আশঙ্কা হত, যদি প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। জানি না তার প্রাণপুরুষ টের পেয়েছিল কিনা যে, সে দীর্ঘায়ু নিয়ে আসেনি, তাই জীবনকে নিঃশেষে পান করতে চাইল।" বলতে বলতে সুতপা নিজেকে হারিয়ে ফেলল। সংযত হয়ে বলল, "এখন আমার কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে পরামর্শের জন্যে তোমায় ডেকেছি। বাবা মা কি চাইবেন, অনুমান করতে পারছ নিশ্চয়। জীবনকে সুন্দর করে গড়বার কোন স্বাধীন পথ আছে কি?"

অমল অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমাদের দেশে শিক্ষিতা মেয়েদের স্বাধীন জীবিকার কোন পথ খোলা নেই, একটি ছাড়া।"

"বল।"

"স্কুল টিচার। তুমি ভালভাবে পাশ করেছ, উপযুক্ত চাকরী পেতে পার।"

"কিন্তু এখানে ত সম্ভব নয়। তারও আদেশ অন্যত্র চলে যাওয়া।" অমল প্রায় জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল স্বপ্নের মূল্য কতখানি। কিন্তু কারও বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া উচিত নয় ভেবে বলল, "তাহলে বাইরে যাবে? পারবে অপরিচিত প্রবাসের কঠোর চাপ একলা বইতে?"

সুতপা মৃদু হেসে বলল, "উপায় কি? বাংলাদেশ যদিও আমার প্রাপ্য, অবস্থার বিপর্যয় তা শুনছে কই? অধিকন্তু এই দুই বছরে ঘুরে ঘুরে নানা পরীক্ষা পাশ করেছি। অন্য কোন উপায় যখন নেই, সমুখে যা পাই তাই গ্রহণ করতে হবে। নয় কি?"

অমল রাজী হতে সাহস পাচ্ছে না, স্নেহের দুর্বলতার জন্যে হোক অথবা অনিশ্চিত সম্ভাবনার ভয়েই হোক। অথচ অজানার পথে সুতপাকে পা বাড়াতেই হবে; সাময়িক নির্জনতাও তার পক্ষে দরকার। গভীর যেখানে ক্ষত ও ক্ষতি, নির্জনতাই কোন কোন প্রকৃতির পক্ষে একমাত্র প্রলেপ যা সেই ক্ষত সারাতে পারে। অবশ্য নিঃসঙ্গতার বিপদও কম নয় কিন্তু যে শক্তির জোরে সুতপা সঙ্কটে ও শ্মশানে ভেঙে পড়েনি, আশা করা যায় সেই শক্তি তাকে রক্ষা করবে।

উত্তরদেশের কোথাও একটা শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে সুতপা দেশ ছাড়ল। তারপর কোন খোঁজখবর নেই; মধ্যযুগের কনভেন্ট জীবনের মত সে যেন জগতের অস্তিত্ব ভুলে গেছে। অমল যতই উদ্বেগ অনুভব করুক, উপযাচক হয়ে কোন তত্ত্ব নেওয়া তার উচিত নয়। তবুও তার মনের কোণে বিশ্বাস জেগে রয়েছে যে একদিন সংবাদ আসবেই। সে প্রত্যাশা পূর্ণ হল প্রায় বছর খানেক পরে, যখন সেই সুন্দর মুক্তাক্ষর বহন করে এল সুতপার চিঠি। আনন্দে ও উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে চিঠি খুলতেই তার চোখে পড়ল একটি শুষ্ক গোলাপ ফুল, সযত্নে ঔজ করা, দুটি পাতা শুদ্ধ। আবার ফুল! অভ্যাসানুযায়ী ফুলটি নাকের কাছে নিয়ে নিশ্বাস নিতে লাগল সে। তখনও যেন সদ্য গোলাপের একটি সূক্ষ্ম গন্ধ তার গায়ে জড়িয়ে আছে। চিঠির ঠিকানাটায় নজর পড়তেই অবাক হয়ে গেল। আশ্রম! অমল পড়ল, 'দুঃখ আমার অসীমপাথার পার হয়েছে, জীবনে শান্তি পেয়েছি! এ যে কী পাওয়া তুমি বুঝবে। বরাবর অন্তরালে আমার মঙ্গল কামনা করে গেছ এই প্রত্যয়ে তোমায় খবরটি দিলাম। মা জননী, যিনি এই আশ্রমের জীবন্ত বিগ্রহ, তাঁর স্পর্শে অতীত মুছে গেছে। তাঁর আশীর্বাদপূতঃ একটি ফুল পাঠালাম, শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করো। কোনদিন ইচ্ছা হলে এদিকে ঘুরে যেও। আস্তে আস্তে এই দেবভূমির কথা কিছু কিছু জানাব।"

—সুতপা

চিঠিটা পড়ে অমল অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। দুচার ছত্র মাত্র লেখা, কিন্তু এমন একটা আলো, শান্তি ও পবিত্রতার পরিমল ছড়িয়ে রয়েছে যে যেন অন্য এক জগতের সে চিঠি। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগল অনেক: কে এই মা? তাঁর কি এমন শক্তি আছে যে মৃত্যুশোক মুছিয়ে দিতে পারে? সে অবিশ্বাসই বা করবে কি করে, যখন সুতপার নিজের অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে? আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এ রকম অভিজ্ঞতা ত বিরল নয়। শোকে সন্তপ্ত লোক বুদ্ধের সান্নিধ্যে শোক ভুলেছে, নূতন জীবন পেয়েছে। চণ্ডাশোক ধর্মাশোক হয়েছে, যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধেও নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্তমান যুগে কোন নারীর পক্ষে সে রকম শক্তিলাভ সম্ভব? কে তিনি? কি রকম দেখতে? কি রকম তাঁর আশ্রম, দেবভূমি?

উত্তরে সে লিখল: "এ রকম সুখবর জগতে দুর্লভ। যে জায়গায় মানুষ প্রিয়ের মৃত্যুশোক ভোলে, তার মাহাত্ম্য অস্বীকার করবার উপায় নেই এবং যিনি এই অঘটন ঘটাতে পারেন, তিনি যে আমাদের জগতের অধিবাসী নন একথা বলা বাহুল্য। তাঁর আশ্রয়ে তোমার জীবন সুন্দর হয়ে ফুটুক এটাই বরাবর চাইব। আমি গ্রহণ করেছি দেশ-দেবার পথ, যৌবনের প্রথম উদয়ে তুমিই দিয়েছিলে সেই প্রেরণা। যদি তার চাইতে বৃহত্তর ও মহত্তর ডাক আসে, পিছপাও হব না।"

শিল্প-শ্রমিকের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ পন্থা

শ্রীসমর দত্ত

বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আদর্শের প্রভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রভাবান্বিত হয়েছে। কার্ল মার্কসের মতে ট্রেড ইউনিয়ন এমনই এক সাংগঠনিক কেন্দ্র যা শ্রমিক শ্রেণীর সংহতশক্তির উৎসমূল। মার্কস্ ধনতান্ত্রিক সমাজের সমগ্র কাঠামোটির বিশদ ব্যাখ্যা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সমাজ একটি গতিশীল বস্তু, এর মধ্যে স্থির কিছুই নাই। বেগবান সমাজের অবস্থা তাই পরিবর্তন সাপেক্ষ। কিন্তু এই পরিবর্তন (যা একটী পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার ভাঙনের পরই সম্ভবপর) তা আপনা আপনি ঘটে না বা অকারণে ঘটেনা। সমাজের মানুষের কর্তব্য উপযুক্ত কারণে এবং উপযুক্ত সময়ে এই পরিবর্তনের কাজে সাহায্য করা। (মার্কসের শ্রেণী সংগ্রাম এবং ইতিহাসের বস্তুতন্ত্রী ব্যাখ্যার ফলে এমনই এক শ্রমিক আন্দোলন সংস্থার সৃষ্টি হয়, যা ধনতান্ত্রিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা ক'রে বিপ্লব অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হয়।) লেনিন ট্রেড ইউনিয়নকে শিক্ষা-সংস্থা বলে আখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁর মতে একটী ট্রেড ইউনিয়ন রাষ্ট্র পরিচালনা শিক্ষার, সাম্যবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের এবং সাম্যবাদ প্রচারের কেন্দ্র। অন্যদিকে সিডনি ও বিয়েট্রীস্ ওয়েবের মতে ট্রেড ইউনিয়ন বেতনভুক কর্মচারীগণের এমনই এক সংগঠন যার উদ্দেশ্য কর্মচারীবৃন্দের চাকুরীর অবস্থার উন্নতি সাধন করা এবং কর্মচারীগণের সাংগঠনিক শক্তির বাঁধন ক্রমশঃ শক্ত করে এবং মালিক শ্রেণীর একনায়কত্বের দাপট অতিক্রম ক'রে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা। ওয়েবদের ব্যাখ্যা অনুসারে 'পরিচালনা' কথাটীর অর্থ এই যে, যে অবস্থার মধ্যে শ্রমিকগণকে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হবে শুধু সেই অবস্থা জনিত সুবিধা অসুবিধা এবং সেই অবস্থা কেন্দ্রিক নীতি নির্ধারণে তাদের মতামত প্রকাশের আংশিক অধিকার থাকবে। কিন্তু জি, ডি, এইচ কোলের মতে ট্রেড ইউনিয়নের চরম উদ্দেশ্য শ্রমিকগণ কর্তৃক শিল্প সংস্থার নিয়ন্ত্রণ, কোল বলেছেন যে শিল্প সংস্থা নিয়ন্ত্রণের দাবির সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি অথবা কাজের ঘণ্টা কমানো অথবা ঐ ধরণের কোন দাবির পার্থক্য নাই। এগুলী বিপরীতধর্মী দাবি। শ্রমজীবী মানুষের মূলগত সমস্যা দূর করতে হ'লে যে ব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় তা হ'ল শিল্প সংস্থাগুলিকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণে এনে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সেগুলিকে পরিচালনা করে একচেটীয়া লাভ সংক্রান্ত মোড়াঘোরা সমস্যার সমাধান করা। কানিসনের (cunnison) ধারণায় ট্রেড ইউনিয়ন বেতনভোগী কর্মচারীগণের একটী একচেটিয়া সঙ্ঘ (monopolistic combination of wage-earners)। এই সঙ্ঘবদ্ধ কর্মচারীগণ অর্থ উপার্জন এবং শ্রম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে মালিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করে এবং মালিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থাতেই সামূহিক লাভের জন্য তারা তাদের সাংগঠনিক শক্তি দৃঢ়তর করে। অধ্যাপক কুহনের (prof. Kuhon) অভিমতে ট্রেড ইউনিয়নের দুটি দিক। একটি সমষ্টিগত লাভের দিক এবং অন্যটি উৎপাদন যন্ত্রে শ্রমিকগণ কর্তৃক অধিকার স্থাপনের দিক। কুহন বলেন যে সমষ্টিগত লাভের পথ অথবা উৎপাদন যন্ত্রে অধিকার স্থাপনের পথ—যে পথই শ্রমিকগণ বেছে নিক্‌না কেন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীগণকে সকল অবস্থাতেই সাংগঠনিক শক্তিতে দৃঢ় হ'তে হবে। তবে অধ্যাপক কুহন সামূহিক লাভের দিকের উপর অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন।

এমনিভাবে কালে কালে পরিবর্তিত আদর্শের পটভূমিকায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কলা কৌশল এবং কর্মধারার পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষেও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের

ধারার পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভারতবর্ষের অর্থনীতির সার্থক রূপায়ণে বর্তমান কালে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা কি রকম হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে কোন একটি ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় অধ্যাপক এস, এন, মেহ্‌রোত্রা (prof, S. N. Mehrotra) রচিত Role of Trade unionism in Indian Economy) শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত নিম্নোক্ত অংশটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য :—

".....trade unions in a growing economy and under democratic planning have to assume new responsibilities and must be prepared to discharge them. Besides undertaking the work of national reconstruction through execution of different plans, they are the vital instruments of the social set up and of equalization of income in society by increasing the workers share in the national income, Thus trade unions are pluralist in character."

তাই স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তীকালে পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির সার্থক রূপায়ণের জন্য ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়নগুলির দাবি-দাওয়া আদায় করার আন্দোলনে লিপ্ত হওয়া ছাড়াও সংগঠনমূলক কর্ম্মে বিশেষভাবে ব্যাপৃত হওয়া উচিত, কিন্তু শ্রমিকগণ যদি সদা-সর্ব্বদা অভাব অভিযোগের জাঁতা-কলে পিষ্ট হয় তাহলে তারা গঠনমূলক কর্ম্মে অংশ গ্রহণ ক'রে জাতীয় উন্নয়নের পথ রচনার প্রেরণা কখনই পাবে না। এর জন্য চাই শ্রমিকশ্রেণীর অভাব অভিযোগ সত্বর নিরাকরণের সুস্পষ্ট সরকারী নীতি।

শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন, শিল্পে শান্তি-প্রতিষ্ঠা এবং উন্নততর শিল্পোৎপাদনের উদ্দেশ্যে যে সকল নীতি এতদিন ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুসৃত হয়েছে তার মধ্যে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নৈনিতালে অনুষ্ঠিত ষোড়শ ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনে গৃহীত আচরণবিধি (Code of Discipline) বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য, এই আচরণ বিধি গ্রহণকালে শ্রমিক, মালিক এবং সরকার পক্ষের প্রতিনিধিগণ এই মর্ম্মে একমত হ'ন যে শ্রমিকগণের অভাব অভিযোগগুলিকে যদি সহানুভূতির সঙ্গে যতশীঘ্র সম্ভব দূর করবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলেই শিল্পে বহু অভীপ্সিত শান্তি স্থাপন এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে উত্তরোত্তর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রচলন করা সম্ভব হবে। সেইজন্য এই ত্রিপাক্ষিক সভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে শ্রমিক মালিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে একটি অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ পন্থা (grievance Procedure) যথা সময়ে রচিত, গৃহীত এবং অনুসৃত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই প্রসঙ্গে ভারত-সরকারের শ্রম-মন্ত্রণালয় কর্ত্তৃক রচিত একটি খসড়াও এই অধিবেশনে অনুমোদিত হয়। ঐ খসড়ায় অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ পন্থার মূল নীতিগুলি নির্দ্দেশিত হয়। নীতিগুলি এইরূপ :—

(ক) অভাব অভিযোগ সম্বন্ধীয় বিরোধ নিষ্পত্তির বিভিন্ন পর্য্যায়গুলি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হবে।

(খ) প্রত্যেক পর্য্যায়ে কর্ম্ম সমাধানের সময় নির্দ্ধারিত হ'বে।

(গ) শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের প্রতিনিধিগণের সম্মেলনে একটি অভাব অভিযোগ সমিতি (grievance committee) গঠনের ব্যবস্থা থাকবে।

(ঘ) শিল্প বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রয়োজন অনুসারে স্বেচ্ছামূলক সালিশী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হবে।

মূল নীতিতে একথাও বলা হয়েছে যে মালিক প্রদত্ত কোন আদেশকে কেন্দ্র ক'রে যদি অভিযোগের সৃষ্টি হয় তাহলে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদেশটিকে প্রত্যাহার করবার অথবা এ সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত হবার পূর্ব্বমূহূর্ত্ত হ'বে শ্রমিক কর্ত্তৃক আদেশটিকে আগে মেনে নেওয়া তারপর এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা চালানো।

যদিও এই প্রণালীটি শ্রমিকগণের অভাব অভিযোগ দূরীকরণে এখনও বিশেষ খ্যাতি লাভে সমর্থ হয়নি তথাপি কয়েকটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রণালীটি ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে। আমেদাবাদে টেক্সটাইল লেবার এসোসিয়েশন্ এই প্রণালীটি গ্রহণ ক'রে গত ১৯৬০-৬১ সালে ২ ৯১২টি অভিযোগের মধ্যে ১৭১৮৯টির সন্তোষজনক মীমাংসা সংশ্লিষ্ট মালিক পক্ষের সঙ্গে ক'রে নিতে সক্ষম হয়েছে।

ক'লকাতার চতুষ্পার্শ্বের পাট শিল্প কেন্দ্রগুলিতে এই

প্রণালীটি প্রচলিত হয়েছে। তবে যোড়শ শ্রম সম্মেলনে গৃহীত নীতিগুলির সঙ্গে এই শিল্প ক্ষেত্রে গৃহীত প্রণালীটির বেশ কিছু পার্থক্য আছে। যা হোক্ শ্রমিকগণের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণে এই পন্থার মূল আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অব্ সিভিল্ এষ্টাব্লিশমেণ্টের শ্রম বিভাগ শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষের স্বার্থে যেভাবে কাজ করে চলেছে তা উল্লেখনীয়। এই প্রতিষ্ঠানের শ্রমবিভাগে ১৯৪৬ সালে ১৯টি, ১৯৪৭ সালে ৩৬৬টি, ১৯৪৮ সালে ৩৪৮টি এবং ১৯৪৯ সালে ২৫৬টি অভিযোগ গৃহীত হয়। প্রতি বছরেই গৃহীত অভিযোগগুলির অধিকাংশই সন্তোষজনক ভাবে মীমাংসিত হয়।

সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফট্ (বাঙ্গালোর), ভাশনাল কোল ডেভালাপমেণ্ট কর্পোরেশন (রাঁচী) এবং বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী (জামসেদপুর), সিম্পসন্ গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ (মাদ্রাজ), পশ্চিমবঙ্গের ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়ম কোম্পানীতে এই প্রণালীটির মাধ্যমে শ্রমিকগণের অভাব অভিযোগ দূরীকরণের কাজ বেশ ভাল-ভাবেই চলেছে।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে বিশেষ ক'রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, ইউরোপের ইতালীতে এবং গ্রেটবৃটেনে এই

অবিশ্বাসী নই

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাঁচ সাত দিন এমনিই কেটে গেল।

একদিন হঠাৎ সুবাসিনী ওদের সহকর্মী তার কাছে যেন শুনলে যে আগামী শনিবার অমাবস্যা তিথি। কথাটা কি প্রসঙ্গে যে উঠেছিল, তা ওর মনে নেই, কিন্তু শোনা মাত্রই ও মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল যে ঐ দিন মায়ের পূজো দিতে হবে।

কিন্তু খরচ? নগদ টাকা ত ওর কাছে কিছুই ছিল না। যদি শনিবারের মধ্যে বদলদার দেখা পাওয়া না যায়! ও মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল, যদি কোন সুবিধেই না হয়, তা হলে ওর বাবার দেওয়া কানের সোনার মাকড়ী বিক্রী করে অথবা বাঁধা দিয়ে যে ক'টা টাকা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে ও মায়ের পূজো সেরে আসবে।

কিন্তু কাকে দিয়ে মাকড়ী বিক্রী করাবে? শুক্রবার সন্ধ্যে পর্য্যন্ত কোন রকম সুবিধে করতে না পেরে শনিবার ভোর বেলা একাই শুধু হাতে কাউকে কিছু না বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং কলেজ হাঁটে এসে যে বাস্‌খানা কালীঘাটে যাবে বলেছিল, সেইখানায় চেপে বসেছিল। কিছুদূর যাবার পর কণ্ডাক্টর যখন পয়সা চেয়েছিল তখন ও বলেছিল যে, নগদ পয়সা ওর নেই অথচ ও কালীঘাটে যেতে চায়।

তখন কলকাতায় রিফিউজীদের ভিড়, এবং রিফিউজী-দের সে আমলে সকলেই সাহায্য করার চেষ্টা করত। কণ্ডাক্টর ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল কালীঘাটে কোথায় যাবেন?

ও বলেছিল, মায়ের বাড়ীতে।

কণ্ডাক্টর কি বুঝেছিল ও জানে না, সে কিন্তু টিকিটের জন্য কোন রকম তাগিদ না করেই অন্য যাত্রীর কাছ থেকে টিকিটের পয়সা নিতে সুরু করেছিল।

কালীঘাটের মোড়ে বাস থেকে নেমে পথ-চলতি লোকদের জিজ্ঞাসা করে সুবাসিনী মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই একজন খালি-পা খালি-গা পুরোহিত গোছের লোক ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ও পূজো দিতে চায় কিনা? ও তাকে বলেছিল যে ও মুক চিত্তে বক্ত দিয়ে মায়ের মানসিক পূজো উদ্‌যাপন করবে। লোকটা একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল, এতে ত অনেক খরচ পড়বে মা, তা তুমি কত টাকা এনেছ। ও বলেছিল, নগদ টাকা ত কিছুই আনতে পারি নি বাবা, কিন্তু আমার কানের এই মাকড়ী দুটো আছে এরই একটা বিক্রী করে যা পাব—

লোকটা ভেবে-চিন্তে বলেছিল, মুস্কিল। একটা মাকড়ী ত এখানে কেউ কিনতে চাইবে না, তবে দুটোই যদি দাও—

ও বলেছিল কেন, সোণারের দোকানে একটা মাকড়ী ওজোন করে—

সে লোকটা বলেছিল, না মা, একটা মাকড়ী দিলে আর কিইবা পাবে, তাতে ত পূজোর খরচই উঠবে না, তবে দুটো দিলে পঁচিশ ত্রিশ টাকা পাবে, তা থেকে পূজো সেরে হাতে নগদও কিছু থাকবে, আর তা ছাড়া আজকের এই ভাল তিথি, শনিবার, অমাবস্যা আজ যদি তুমি—

একটু ভেবে নিয়ে সুবাস বলেছিল, বেশ, তবে দুটোই দেব। সোণারের দোকানেই চলুন।

সে বলেছিল, মাকড়ী দুটো দেখুন ত মা, একটু দেখি।

রাস্তার ধারেই দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কথা হচ্ছিল। ও বলেছিল, দোকানে গিয়েই দেখব, দোকানেই চলুন না কেন।

নেই তবে কলেজ ষ্ট্রীটের অমুক প্রতিষ্ঠানে খবর দিলে ভাল হয়। একটু থেমে বলেছিল, আমার নাম সুবাসিনী। ভোটে জিতেছে যে বসন্ত চক্রবর্তী তিনি আমার দাদা।

সবিস্ময়ে মহিলাটি কি যেন লিখে নিয়ে উঠে গেল।

অনেকক্ষণ পরে কোট প্যাণ্ট পরা দু'জন লোক এসে ওকে পরীক্ষা করে ওদেরই মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, বসন্তবাবু আপনার কে হন?

ও ধীরে ধীরে উত্তর দিয়েছিল, দাদা।

সারাদিন এবং রাতও কেটে গেল। পরের দিন সকালে সেরা অবস্থাতেই কারা যেন জল ঢেলে ওর মাথা ধুইয়ে চুল আঁচড়ে বিছুনি করে দিলে। তারপর সেরা অবস্থাতেই নল দেওয়া কাপে করে কি যেন খেতে দিলে। এর একটু পরেই ওর কানে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর। চোখ চেয়ে দেখলে বসন্তদা ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। আশে পাশে দু'তিন জন প্যাণ্ট পরা লোক এবং কালকের সেই মহিলাটি, যে ওর নাম জিজ্ঞাসা করেছিল, সেও দাঁড়িয়েছিল। বসন্তদা প্যাণ্ট কোট পরা লোকদের সঙ্গে কথা কইছিল।

ও যে একবার চোখ চেয়ে দেখেছিল সেটা বোধহয় বসন্তর নজরে পড়েনি। ও স্পষ্ট শুনলে, বসন্ত বলছে বোমটোম কিছু নয়, খুলনার কংগ্রেস ক্যাম্পে এসে জুটেছিল এবং দাদা বলে ডাকত, এই পর্যন্ত। তা সেখান থেকেই ও আমাদের সঙ্গে কাজ-টাজ করে, এবং মহিলা শিল্পাশ্রমে থাকে। তাছাড়া যাবেই বা কোথায়, ওর ত কেউ কোথাও নেই।

তারা বলেছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরাও ঐ রকমই ভেবেছিলুম।

বসন্ত বলেছিল, মেয়েটি খুবই ভাল এইটুকু বলতে পারি, তবে ও হঠাৎ এরকম কাজ কেন করতে গেল—

সুবাসিনী আর থাকতে পারে নি; চোখ চেয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল, বসন্তদা—

ঝুঁকে পড়ে বসন্ত বলেছিল, এই যে সুবাস, আমি এসেছি। কেমন আছিস্ এখন?

সুবাসিনী বলেছিল, ভাল। তা তুমি—

ওর কথা চাপা দিয়ে বসন্ত বলেছিল, আচ্ছা সুবাস, তুমি, তুমি নিজের বুকে ছুরি মেরে—

ক্ষীণ হাসি হেসে সুবাসিনী বলেছিল, মানসিক করা ছিল যে বসন্তদা, তোমার ভোটের জন্য, তুমি ভুলে যেতে পার, কিন্তু—

ও—তা হলে, তা হলে তুমি আত্মহত্যা করতে যাও নি, তুমি—

না বসন্তদা, আমি তোমাকে বলেছিলুম ত—সুবাসিনী ক্লান্তি ও বিরক্তিতে আর কিছু বলতে পারে নি।

ডাক্তারদের দিকে চেয়ে বসন্ত ইংরাজীতে বলেছিল, you see, it is not a case of suicide। সুবাসিনী ইংরেজী বুঝতে পারে নি, কিন্তু বুঝেছিল যে, ডাক্তাররা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল।

এর পর সুবাসিনীকে গাড়ীতে শুইয়ে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভুগে ছিল সে অনেক দিন কিন্তু শেষকালে ভালভাবে সেরেও উঠেছিল। সেরে উঠে শুনেছিল যে, আত্মহত্যার দায়ে সে প্রথমে পুলিসের হাতে আসামী হয়ে পুলিসের তাঁবে ছিল, শেষে বসন্তদা তাকে ওখান থেকে ছাড়িয়ে অন্য হাসপাতালে এনে চিকিৎসা করিয়ে ভাল করে তুলেছে। কিন্তু রোগশয্যায় জ্ঞান হওয়ার পর ওর সম্বন্ধে বসন্তর কথাগুলো শুনে পর্য্যন্ত ওর মনটা মাঝে মাঝে কেঁদে উঠত; কিন্তু কথাগুলো যে মিথ্যা নয়, খাঁটি সত্য, সেটাও সে বিচার করে দেখে ঠিকই বুঝত, কিন্তু তবু যেন কেন তার মনটা একেবারে ফাঁকা উদাস হয়ে যেত। সত্যিই ত, সে ত বসন্তদার কেউ নয়!

তিন মাস পরে সুবাসিনী আবার মহিলা শিল্পাশ্রমে ফিরে এল। বুকের ঘা' এবং সেপ্‌টিক জ্বরে ভুগে সে নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তার ওপোর সে বসন্তর লোক, এই সব কারণে তাকে আশ্রমের সকলেই মৌখিক খাতির করত, কিন্তু অন্য কথাও সে অন্যান্য মেয়ের কানাঘুষা থেকে কিছু কিছু বুঝতে পারত। একদিন এক কাহিনী শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সুবাসিনীকে কেউ স্পষ্ট কিছু বলে নি, কিন্তু এর ওর কাছ থেকে টুকরো টুকরো কথা শুনে সে একদিন বিরক্ত হয়ে ঐ মেয়েদেরই মধ্যে একজনকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করে বসল, তোমরা আমাকে কি মনে কর বলত? সেই মেয়েটির সঙ্গেই ওর সবচেয়ে বেশী হৃদ্যতা ছিল।

সে বলেছিল, আমি কিছু মনে করি না ভাই, তবে এরা সব অনেক যা-তা বলে।

কি বলে? সুবাসিনী প্রশ্ন করেছিল।

মেয়েটি বলেছিল, সে কিছু নয়। এ সব তুমি ছেড়ে দাও ভাই।

সুবাসিনী তাকে ছাড়ে নি, নিতান্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

সে তখন আস্তে আস্তে বলেছিল, সুবাস দিদিমণি, আমি একথা আদৌ বিশ্বাস করি না ভাই, কিন্তু এরা কেউ কেউ বলে যে—

মেয়েটি থেমে গিয়েছিল, সুবাসিনী পুনরায় জেদ করেছিল শোনবার জন্য।

মেয়েটি বলেছিল, এরা বলে, বসন্তদা নাকি তোমার সঙ্গে সেইদিন কালীঘাটে মালা বদল করে বিয়ে করবে বলে কথা দেওয়াতে তুমি কালীঘাট গিয়েছিলে, কিন্তু বসন্তদা গেল না দেখে তুমি নিজের বুকে ছুরি মেরে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিলে।

সুবাসিনী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এ কথা যে কেমন করে উঠতে পারে তা সে কল্পনাও করতে পারলে না।

এরপর আরও অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। সুবাসিনী মনে মনে বারম্বার প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সে এইখানেই থাকুক কিম্বা অন্য যেখানেই যাক, ভবিষ্যতে আর কখনও বসন্তদার নামও উচ্চারণ করবে না। বসন্তদা নিজেই ত বলেছে, ওর কেউ কোথাও নেই। সত্যিই ত ওর কেউ কোথাও নেই। কিন্তু কার জন্যে যে ওর এই অসহায়, নিঃসম্বল অবস্থা সেটা কি একবারও বসন্তদার মনে হয় না! ওর কি চিরদিনই এই অবস্থা ছিল! ওর বাবা কি ওকে খেতে দিতে পারত না? কেষ্টর ঘরে গেলে কি ওর এই ভিখারীর অবস্থা হোত? ওর কি কর্ম্মশক্তি নেই? পুলিশী জুলুমের আমলেও কি সুচারুরূপে ও কাজ করে যায় নি? অমানুষিক অত্যাচার স্বীকার করেও ও কি বসন্তদার নির্দ্দেশ মত পুলিশের কাছে সব কিছু গোপন রাখতে সক্ষম হয় নি? ভোটের সময় ক্যাম্পের আভ্যন্তরীণ কার্য্যভার কি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করতে পারে নি! ভোটের দিন বসন্তদার অন্তর্ধানের জন্য ওর মত মনে প্রাণে এতখানি আকুতি কি আর কেউ করেছিল? কিন্তু বসন্তদা নিজেই ত বলেছে, বোনটোন্ কিছুই নয়! সত্যিই ত, বসন্তদা বামুন, ভদ্রলোক, সুবাসিনী ছোটলোকের মেয়ে, পাড়াগেঁয়ে। আকাশের চাঁদ আর পুকুরের পেওলার যে তফাৎ ওদের মধ্যে ব্যবধান ত সেই রকমই অপরিমিত। আশ্রমের মেয়েরা যে মাঝেমাঝেই বলত, 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ', কথাটা খুবই সত্যি। অনেকদিন সুবাসিনী উদাস হয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকত। রাস্তা দিয়ে ট্রাম, বাস, কত রকমের গাড়ী, হাজার হাজার মানুষ অবিরত ধারায় চলে যেত। সুবাসিনী সেই দিকে দেখতে দেখতে আকুল হয়ে উঠত। ভাবত, এত যে হাজার হাজার লোক দিনরাত অনবরত ছুটোছুটি করছে, এদের প্রত্যেকেরই ঘর আছে, বাড়ী আছে, আপনজন, আত্মীয়জন আছে, ভালোর-মন্দর সুখে-দুঃখে এদের সকলেরই জীবন ভরপুর হয়ে আছে, কিন্তু তার ত কিছুই নেই! তা হলে সে আছে কেন?

বহুদিন পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে গেল। বসন্তদা যখন সুবাসদের বাড়ীতে থাকত, তখন সে একদিন দলের ছেলেদের বলেছিল, সকলেরই জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, একটা লক্ষ্য আছে, যেদিন তার উদ্দেশ্য ফুরিয়ে যায় সেদিন তাকে ভগবান পৃথিবী থেকে সরিয়ে নেন। এ পৃথিবীতে উদ্দেশ্যহীন ও কর্ম্মহীনরা আবর্জ্জনা স্বরূপ। পৃথিবীতে জঞ্জালের কোন ঠাঁই নেই। সুবাস সেদিন বসন্তদার ঘরে মাটী লেপ্‌তে লেপ্‌তে কথাগুলো শুনেছিল, এতদিন পরে আজ আবার সেই সব কথাই মনে পড়েছিল। এখন তার জীবনের কোন সার্থকতাই নেই, তাহলে সে এখন পুরোপুরি কালতু, আবর্জ্জনা মাত্র, তবে সে এখনও বেঁচে আছে কেন?

দিনের পর দিন এলোমেলো কত কথাই যে ওর মনে হোত তার কোন ইয়ত্তা নেই। ও খালি ভাবত আর ভাবত, কারুর সঙ্গে বিশেষ কোন কথাও বলত না, অন্যেরাও ওর সঙ্গে মেলামেশা করার চেষ্টা করত না।

একদিন সন্ধ্যার পর দোকানে দু'তিনজন পুরুষ কর্ম্মীর উত্তেজিত আলোচনা ও শুনতে পেলে। সেদিন ও নিচের দোকানে বসে খদ্দরের জামা, কাপড়, গায়ের কাপড়, পর্দ্দার কাপড় সমস্ত জিনিষ ঠিকমত ভাঁজ করে থাক্

থাক্ করে আলমারীতে সাজিয়ে তুলছিল। ওদের আলোচনায় ও প্রথম তেমন কানই দেয় নি, কোন কিছুতে কান না দেওয়াই ওর ইদানীন্তনকালের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পরিচিত নাম কানে যেতেই ও প্রথমে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল, পরে হাতের কাজ ফেলে তাদের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেছিল।

খবর যা পেলে তাতে ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। নারকোলডাঙ্গা না কোথায় যেন এক জায়গায় এক মিটিংএ মিনিষ্টার বসন্ত চক্রবর্তী বক্তৃতা দেবার সময় ভিড়ের মধ্যে খুব গোলমাল সুরু হয়েছিল এবং সেই ভিড় থেকে একজন সবেগে বক্তৃতা মঞ্চের দিকে উঠে এসে এক হাতবোমা ছুঁড়েছিল। তাতে মিনিষ্টার সাহেব খুব জখম হয়েছেন এবং সেখান থেকেই তাঁকে কোন এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আকুল আবেগে সুবাসিনী জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে—কবে এটা হয়েছে।

যারা বলছিল, তাদের মধ্যে একজন বলে, আজই হয়েছে, এই বিকেলে?

ও বলেছিল, বসন্তদা কেমন আছে? আমি দেখতে যাব।

তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলেছিল, তুমি যাবে কি করে? দেশের সমস্ত বড় বড় লোক তাকে ঘিরে রয়েছে। পুলিশে পুলিশে সমস্ত জায়গাটা ছেয়ে রেখেছে, তোমাকে সেখানে ঢুকতে দেবে কেন?

ও জেদ্ করে বলেছিল, বসন্তদার এতবড় বিপদ, আর আমি যাব না? এও কি হয় না কি? তারপর ও বলেছিল, যে বসন্তদাকে এ ভাবে মারলে, সে কে? বসন্তদার এমন শত্রু কে হতে পারে?

ওরাই বলেছিল, সে লোকটা ধরা পড়েছে। তার নাম যেন কি?

অপর লোক বলেছিল, তার নাম অনন্ত, অনন্তগোপাল রায়।

এঁ্যা অনন্তদা—সুবাসিনী আঁৎকে উঠেছিল!

তারাও বিস্মিত হয়েছিল। বলেছিল, তুমি অনন্তকে চেন?

সুবাসিনী বলেছিল, চিনব না? ওরা যে পরম বন্ধু ছিল! বসন্তদা আর অনন্তদা বরাবর একসঙ্গে আমাদের দেশে কাজ করত। অনন্তদাকে খুব ভালভাবেই আমি চিনি।

তারা পরস্পর কি যেন ইঙ্গিত করে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সুবাসিনী চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। দোকানের ম্যানেজার কিছুক্ষণ পরে সুবাসিনীকে বলেছিল, কাপড়চোপড় সমস্ত গুছানো হয়ে গেছে কি? এবার দোকান বন্ধ করব।

সুবাসিনী এক কথায় কেটে জবাব দিয়েছিল, কাপড় গুছাতে পারবো না, আপনি আমার বসন্তদার কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন।

নাকে ঝুলে-পড়া নিকেলের চশমার ওপার দিয়ে দোকানের ম্যানেজার সুবাসিনীর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, বসন্তদার কাছে, মানে মিনিষ্টার বি চক্রবর্ত্তীর কাছে? সে আমি কি করে নিয়ে যাব? আর তা ছাড়া কাপড় গুছোতে পারবে না মানে? তুমি এখানে কি করতে আছ?

সুবাসিনী বলেছিল, আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না? তা হলে দেখি, কে নিয়ে যেতে পারে। বলেই কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্রুতপদে দোকান থেকে বেরিয়ে ওপোরে উঠে গেল।

কিন্তু ওপোরে উঠে সুবাসিনীর চৈতন্য হোল, সে অসহায়। কাকেই বা বলবে, কেই বা তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু ওপোরে গিয়ে সে বুঝলে যে, খবরটা ইতিমধ্যেই ওপোরে পৌঁছে গেছে এবং দুর্ঘটনার বিষয় সকলেই শুনেছে, সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

সুবাসিনী নিজের মাদুরের ওপোর চুপ করে বসে রইল। তার কেবলই মনে হতে লাগল যে, বসন্তদা কি এখনও বেঁচে আছে! এই ত কিছুদিন আগে গান্ধীজীকে কারা গুলি করে মারলে, বসন্তদাও ত গান্ধীজীরই মতন। বসন্তদা যদি না বাঁচে। সুবাস আর ভাবতে পারে নি। তার দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছিল। এরপর খেতে বসার জন্য সকলেই যখন তাকে ডাকাডাকি করলে তখন সে কোন উত্তরও দিলে না, খেতেও গেল না। অন্যান্যরা সকলেই খেতে চলে গিয়েছিল।

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা কিম্বা একটু বেশীও হতে

পারে। সুবাসিনী নিজের মাদুরে শুয়ে আকাশ পাতাল কত কি ভাবছিল, এমন সময় নীচে রাস্তায় একখানা ভারী গাড়ী দাঁড়াবার শব্দ হোল। এ রাস্তায় গাড়ী চলা বা গাড়ী দাঁড়ানো এমন কিছুই নয়, কিন্তু রাত বেশী বলে শব্দটা সুবাসের কানে স্থান পেয়েছিল কিন্তু মনে সে কিছুই করে নি। কিন্তু এরই অল্প পরে কারা যেন ডাকাডাকি করে এদের অংশের দরজা খুলিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল। সুবাসের মনে তখন অসহায় অবস্থা। সে অন্ধকার ঘরে চোখ চেয়ে শুয়ে শুয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল। বসন্তদা কি তাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী পাঠিয়েছে? ঠিক তাই, বসন্তদা যে সুবাসের অন্তর্যামী।

সত্যিই তাই। এ-ঘরের দরজা খুলে ওদের বড়দি'মণি, অর্থাৎ যে ক'জন মেয়ে এখানে থাকে তাদের দেখাশুনা করার জন্য যে মেট্রন আছেন তিনি ঘরে ঢুকে খুট করে সুইচ টিপে আলো জ্বেলেই দেখলেন সুবাস নিজের মাদুরে বসে আছে, অন্য সমস্ত মেয়েরা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বড়দি'মণি সুবাসকে বলেছিল, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে একবার বাইরে এস, তোমার সঙ্গে কথা কইতে এসেছেন দু'জন।

সুবাস একটু বিস্মিত হোল না; সে জানে বসন্তদা তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি কাপড় গুছিয়ে বেরিয়ে এসে অফিস ঘরে ঢুকেই চমকে গেল। পুলিসের পোষাকপরা দুজন লোক দুখানা চেয়ারে বসে আছে।

ঘরের দরজায় এসে ও একটু ভয় পেয়ে গেল। পুলিস কেন?

পুলিসের মধ্যে যাঁকে বয়সে একটু বড় বলে মনে হোল তিনি ওকে দেখে বলেছিলেন, তোমার নাম সুবাসিনী?

সুবাসিনী ভয়ে ভয়ে ঘাড় নেড়েছিল।

একখানা খালি চেয়ার দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন, বোসো।

সুবাসিনী চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি অনন্ত-গোপাল রায়কে চেন?

সুবাস ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল। পূর্বের অভ্যাসমত সুবাসিনী পুলিসকে শত্রু বলেই জানত, এবং পুলিসের কাছে কোন কথা না বলার অভ্যাসই তার ছিল।

পুলিস প্রশ্ন করলে, অনন্তগোপাল রায়ের সঙ্গে তোমার শেষ দেখা হয়েছে কবে?

সুবাসের মনে পড়ল অনন্তদা তাকে শেষ দেখার দিন বলেছিল, সে যেন সেই সাক্ষাৎকারের কথা বসন্তদাকে না বলে। সুবাসিনী সেই নিষেধাজ্ঞা স্মরণ করে বলেছিল, বহুদিন আগে, ঠিক মনে নেই।

পুলিস জেরা করে বলেছিল, একটু ভেবে বলুন।

সুবাসিনী চোঁক গিলে বলে, বোধহয় খুলনার কংগ্রেস অফিসে। কথাটা মিথ্যে নয় বলে সুবাসিনী মনকে প্রবোধ দিলে।

কতদিন আগে?

তা প্রায় তিন চার বছর হোল।

পুলিস অফিসার বলেছিলেন, এ বাড়ীতে আসার পর অনন্তর সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?

বোধ হয় হয়েছিল, তবে সে না-দেখারই মত।

সেটা কি রকম?

সুবাসিনী চুপ করে রইল।

পুলিস অফিসার গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, দেখুন, যা জানেন সত্যি কথা সোজা করে বলুন, না হলে সমূহ বিপদে পড়বেন।

সুবাসিনী নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, মুখে তার অল্প হাসির রেখাও যেন ফুটেছিল।

অন্য পুলিস অফিসারটি বয়স্ক লোকটিকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, না না, এখানে লুকোচুরী বা রাগারাগির কথা নয় সুবাসিনী দেবী, মনে রাখবেন কেবলমাত্র আপনার মুখের কথায় মিনিষ্টার বি, চক্রবর্ত্তীর মানে আপনার বসন্তদার ভাল মন্দ নির্ভর করছে। সেই জন্যই এত রাত্রে—

সুবাসিনীর সমস্ত দেহটা কেঁপে উঠেছিল। বড় বড় চোখ দুটো সেই পুলিসের দিকে তুলে সুবাসিনী অধীরভাবে বলেছিল, বসন্তদা কেমন আছে? আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন?

সে লোকটি সহৃদয়তার সঙ্গে বলে, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যই ত বসন্তবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ব্যাপারটা সব ঠিকমত না শুনে ত নিয়ে যাওয়া যায় না—

সুবাসিনী জেদ ধরে বলে, আমি যাব, এখনই যাব, আমাকে নিয়ে চলুন—

পুলিস অফিসার বলেছিল, বেশ চলুন, কিন্তু অনন্তবাবুর ব্যাপারটা কি বলুন ত শুনি। আচ্ছা, বসন্তবাবু অনন্তবাবু ওঁরা ত বন্ধু ছিলেন?

অধীর আগ্রহে ঘাড় নেড়ে সুবাসিনী উত্তর দিলে, হ্যাঁ।

কিন্তু আপনার সঙ্গে শেষ যেদিন দেখা হয়, সেদিন অনন্তবাবু বসন্তবাবুর সম্বন্ধে কি বলেছিলেন?

সুবাসিনী সতর্ক হয়ে গেল। কোন উত্তরই দিলে না।

পুলিস অফিসার খুব মৃদুভাবে সুবাসিনীকে বলে, বলুন, এতে আপনার কোন অনিষ্ট হবে না।

সুবাসিনী ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের আঙুল নিজেই দেখতে লাগল।

পেছন থেকে বড়দিমণি একটু কাঁদের সঙ্গেই বলেছিল, বল্ না, যা জানিস্ বল্।

সুবাসিনী তবুও নিরুত্তর।

পুলিসের লোকটি এবার হেসে ফেললে, বলে, দেখুন, আপনি হয়ত ভুল করছেন। আগেকার কথা ভুলে যান। দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। কংগ্রেস আর পুলিস এখন এক হয়ে গেছে। কংগ্রেসের ভালর জন্য এবং বসন্তবাবুর ভালোর জন্যই আপনাকে এই সব প্রশ্ন করছি, আপনি যা জানেন বিনা দ্বিধায় বলুন।

সুবাসিনী ঘাড় তুলে বলেছিল, সত্যি কথা বলতে আমার কোন ভয়ই নেই, বসন্তদাই আমাকে সত্য কথা বলতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সত্য কথা সবই আমি আপনাদের কেন, সকলের কাছেই বলতে পারি, যদি বসন্তদা আমাকে সব কিছু বলতে বলেন। তাঁর কাছে নিয়ে চলুন, তাঁর হুকুম পেলে যা জানি সমস্তই বলব।

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক অফিসারটি 'হুঁ' বলে উঠে দাঁড়ালেন, বলেন, চল হে, এখন ওঠা যাক্—

অন্য অফিসারও উঠে দাঁড়ালেন। সুবাসিনী শেষ চেষ্টা করল, বলে, এখন কি বসন্তদার কাছে আমি যেতে পারব?

প্রবীণ ব্যক্তি গম্ভীরভাবে বলেছিল, না। তারপর মেট্রনের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। বড়দি'মণি সুবাসিনীকে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েই ঘর থেকে টেনে এনে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বিড় বিড় করে বড়দি'মণি কি যেন বলেও ছিল। সুবাসিনী সেই গজ্‌গজানিতে কান দেয় নি।

কিন্তু পরের দিন বেলা ন'টার সময় সুবাসিনীর সেই সৌভাগ্যই হয়েছিল। হাসপাতালে যাবার জন্য বসন্তদাই গাড়ী পাঠিয়েছিল। চাপরাশীর মত পোষাক পরা একজন লোক এসে বড়দিমণির সঙ্গে দেখা করে সুবাসিনীকে গাড়ী চড়িয়ে নিয়ে গেল। যাবার সময় বড়দি'মণি ঠোঁট উল্টে বলেছিল, ঘেন্নাও করে না! আর একটা মেয়ে পেছন থেকে অস্ফুটকণ্ঠে বলেছিল, যার সঙ্গে যার মজে মন—

হাসপাতাল বটে! কিন্তু কি সুন্দর বাড়ী! যেন বড়-লোকের, না—না, রাজারাজড়ার বাগান বাড়ী! বাড়ীর ভেতরেই বড় বড় রাস্তা, কত সব গাছ, সুন্দর শ্বেতপাথরের বড় সিঁড়ি, চওড়া বারান্দা, তার পাশেই একখানা খুব বড় ঘর। সেই ঘরের মাঝখানে সোনা-বাঁধানো চকমকে এক-খানা খাট, সেই খাটে বুক পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে বসন্তদা। আশে-পাশে চার পাঁচজন লোক, সকলেই দাঁড়িয়ে; তার মধ্যে কাল রাত্তিরের সেই পুলিস সাহেবও দাঁড়িয়ে ছিল। সুবাস কোন দিকে না চেয়ে সোজা খাটের পাশে গিয়ে একেবারে বসন্তর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, বসন্তদা—বলেই সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল।

ওর দিকে ক্লান্ত চোখের চাউনি ফিরিয়ে বসন্ত বলেছিল, কে সুবাস, তুই এসেছিস্, বোস্। খাটের পাশের দাঁড়ানো একজন লোক একটা চেয়ার এগিয়ে সুবাসিনীকে বলেছিল, বসুন।

সুবাসিনী চেয়ারের হাতল ধরেই দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সুবাসিনী বলেছিল, কেমন আছ বসন্তদা, কোন কষ্ট হচ্ছে?

বসন্ত চোখ চেয়ে ম্লান হেসে বলেছিল, না। সুবাসিনীর মনে হোল, খুলনার কংগ্রেস অফিসের অসুস্থ বসন্তদাই বটে!

প্রবীণ পুলিস অফিসার বসন্তকে বলে, স্যার, এঁর জবানবন্দীটা—

বসন্ত বলে, হ্যাঁ। একটু থেমে সুবাসকে বলে, অনন্তর কথা যা জানিস ওঁদের কাছে সব বলিস্। ওঁরা আমাদেরই লোক রে।

সুবাস বলে, আচ্ছা। তারপর বলে, বসন্তদা, আমি তোমার কাছে থেকে দেখাশুনা করতে চাই।

বসন্ত আর একবার চোখ চেয়ে দেখলে। বলে, ঠিক আছে। অফিসারদের বলে, ও আমার কাছেই থাকবে।

তারা বলে, আচ্ছা স্যার।

দিন পনের পরে বসন্তদা হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরে গেল। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সুন্দর বাড়ী। দরজার সামনে লালপাগড়ী পাহারাওয়ালা, ঝোলা জামা পায়ে চাপরাসী। সুন্দর মোজেইক করা সিঁড়ি দিয়ে ওপোরে উঠে দক্ষিণের বড় একটা ঘরে খাটের ওপোর বসন্তদাকে শুইয়ে দেওয়া হোল। সুবাসিনী সেই হাসপাতাল থেকে বরাবরই বসন্তদার সঙ্গে রয়েছে। দিন রাত অক্লান্তভাবে বসন্তদার সেবাশুশ্রূষা করছে, ঠিক ঠিক সময়ে খাবারদাবার এনে পৌঁছে দিচ্ছে। অবশ্য খাবার এবং ওষুধ ইত্যাদি খাওয়ানর ভার ঠিক তার ওপোর নেই, সে কাজ তিনজন নার্স পালা করেই করে। দিনরাত নানারকম গাড়ী করে নানারকম লোক আসে। তাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোকই নীচে থেকে কথাবার্ত্তা বলে চলে যায়, কেউ কেউ ওপোরে এসে খাটের পাশে চেয়ারে বসে দু'চার মিনিট কথাও বলে। সকাল বিকাল একজন মস্তবড় নামকরা ডাক্তার আসেন, বসন্তদাকে পরীক্ষা করেন, ও নতুন নতুন ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা করেন। আগন্তুকদের মধ্যে সুবাসিনী কয়েকজনকে চিনেও নিয়েছে। তারা কেউ বসন্তদার আপন ভাই, কেউ বৈমাত্রেয় ভাই, কেউ ভগ্নী, মামাতো বোনও আছে একজন। বসন্তদা তাদের পছন্দ করে কি করে না, সুবাসিনী ঠিক বুঝতে পারে না, তারা কিন্তু নিয়মিতভাবেই আসে। প্রথম প্রথম দু'একদিন থেকেও গিয়েছিল ওরা। সুবাসিনী ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেও গিয়েছিল, কিন্তু কেমন যেন বুঝতে পারলে, ওরা তাকে আমল দিতে চায় না। চাকর, চাপরাসী, মোটর ড্রাইভাররা সকলেই সুবাসকে যিদ্যিমি বলত, ওরা কিন্তু নাম ধরে ডাকতেও যেন রাজী হোত না। এমন কি বসন্তদার এক ভাদ্র-বৌ এবং সেই মামাত বোন ওরা দুজনে সুবাসিনীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করতে রাজী হোত না। একদিন সুবাস নিজের কানেই শুনেছিল, বসন্তদার মামাত বোন কাকে যেন ওর পরিচয় দিতে বলেছিল, ওটা আমাদের বাড়ীর পুরান ঝি, খুব বিশ্বাসী বলে দাদা ওকে তাড়ায় নি। কথাটা যে তার সম্বন্ধেই বলা হয়েছিল, সেটা সুবাস প্রথমে বিশ্বাসই করে নি, কিন্তু পরে নিশ্চিতভাবে বুঝে কেমন যেন উদাস হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে সে আপন মনেই বলেছিল, তা ত বটেই, আমি ত ওদের কেউ নই।

বসন্তদা সেরে উঠেছে। নিজের পায়ে হেঁটে বাইরের বারান্দায় বসছে। নার্সরা চলে গিয়েছে। এখন সুবাসই বসন্তদার চা জলখাবার ইত্যাদি নিজ হাতে আনে, খাওয়া, আবার এঁটো পাত্রগুলো উঠিয়ে নিয়ে যায়। বড় আনন্দেই সুবাসের দিন কাটে।

ধীরে ধীরে বসন্তদা সুস্থ হয়ে উঠেছিল, কেবল বাঁদিকের পায়ে, কোমরে এবং হাতে অনস্তর বোমার দাগগুলো রয়ে গেল। স্নানের পূর্ব্বে বারান্দায় বসে তেল মাখবার সময় বসন্ত হাসি মুখে কাকে যেন বলেছিল, অনন্তকে আমার আপন ভাইয়ের চাইতেও আপন বলে মনে করতুম, তাই তার ছাপ আমায় চিরদিনই বহন করতে হবে। কথাটা সুবাসের কানে যেতে সুবাস ভেবেছিল, ছোট ভাই-ই যদি হবে, তাহলে বেচারাকে ভোটের সময় আমল দাও নি কেন? অবশ্য মুখ ফুটে কোন কথা সে বলেনি।

তিন চার মাস এমনি ভাবেই কেটে গেল। বসন্তর আত্মীয়রা বোধ হয় এ বাড়ীতে তেমন আমল পেল না, কাজেই তাদের আসা-যাওয়া আস্তে আস্তে কমে এল। বাইরে বাইরে বহু লোকই আসে যায়, মাঝে মাঝে কয়েকজনকে নিয়ে খুব খাওয়া-দাওয়া আমোদ আহ্লাদও হয়, কিন্তু অন্দরে একচ্ছত্র আধিপত্য সুবাসের। বাইরে করা চাকর বাঁধুনীরা সকলেই সুবাসের অধীনে; গৃহস্থালীর খরচপত্র, কেনাকাটা, বাজার করা সমস্তই সুবাসের হাতে। বসন্তদা মাঝে মাঝে বাইরে যায় দু'চার দিনের জন্য, কখনও বা দশ পনের দিনের জন্যও যায়। সে সময় বসন্তদার দরকারী জিনিষপত্র গুছিয়ে দেওয়া থেকে সব কাজই সুবাসের হাতে, তারপর বসন্তদার অনুপস্থিতিতে কে কি করবে সমস্তই সুবাসের মত নিয়ে হয়। টেলিফোনে কথা কইতেও সুবাস বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কেউ জিজ্ঞাসা করে মিনিষ্টার সাহেব কবে ফিরবেন, কেউ বলে, স্যার এলে বলবেন আমি অমুক কোন করেছিলুম, কেউ প্রশ্ন করে

আপনি কি মিসেস চক্রবর্তী ? টেলিফোনে কত লোক কত রকম কথা বলে, সে সমস্তর উপযুক্ত উত্তর দিতে সুবাসিনী শিখে নিয়েছে। সারাটা দিন রাত হয়ে আছে সুবাসিনীর মনের মত কাজ দিয়ে। বুক খালি-করা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে গিয়ে সুবাসিনীর আজ মনে হয়, ঐ সময়টাই বোধহয় ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত।

মুহূর্তই বটে! সেই সুখের মুহূর্ত যে কত শীঘ্র শেষ হয়ে গেল তা যেন সুবাসিনী ঠিকমত অনুধাবন করতেই পারে না!

এলেন ছায়াদেবী। তা আসুন, এ রকম কত মহিলাই ত বসন্তদার কাছে এসেছেন। কেউ এসেছেন নিজের কাজে, কেউ দেশের কাজে, কেউ কত রকম সমস্যা নিয়ে, বসন্তদা সকলের সঙ্গেই ভালভাবে ব্যবহার করেছে, কিন্তু ছায়াদেবী আসার কিছুদিন পর থেকেই সুবাসের কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হতে লাগল! অথচ শিক্ষিতা সুন্দরী এবং উচ্চস্তরের যারাই বসন্তর কাছে এসেছে তাদের মধ্যে একমাত্র এই ছায়াদেবীই সুবাসের সঙ্গে প্রথম থেকে যে রকম অমায়িক মিষ্টি ব্যবহার করেছে এ রকমটা এর আগে অন্য কেউই করে নি। পল্লীগ্রামের নিরক্ষরা কালো-কালো সুবাসিনীকে ছায়াদেবী প্রথম দিন থেকেই বন্ধুভাবে, অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করেছিল বলেই সুবাসের বিশ্বাস। সে যখন দিদি বলে সম্বোধন করে সুবাসের কাছ থেকে এক বাটী চা চেয়ে নিয়ে তার পাশে মেঝের বসে চা খেতে খেতে নিজের ঘরোয়া সুখ দুঃখের গল্প করত, তখন সুবাসিনী সত্যিই তাকে আপন ছোট বোন বলে ভালবেসে ফেলেছিল এবং ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারে নি যে ছোটে-খেতা এই মেয়েটির পদ্মোমুখের অন্তরালে কি এক প্রচণ্ড বিষফুল লুকিয়ে ছিল।

ছায়া প্রায় রোজ তারিখেই আসত। বসন্তদা অফিস থেকে ফেরবার পূর্বে এলে যতক্ষণ বসন্তদা না ফেরে প্রায় ততক্ষণ সে সুবাসেরই কাছে থাকত। বসন্তদা কি ভালবাসে, কি করে, কি পেলে খুসি হয়, বসন্তদার পূর্ব জীবনের কাহিনী, বেশভূষার ইতিবৃত্ত সমস্তটুকু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুবাসের কাছ থেকে জেনে নিত। বসন্তদা যখন কলকাতার বাইরে যেত তখনও সে আসত। মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে কীর্তন গান গেয়ে সুবাসিনীর মনোরঞ্জনও সে করত। একদিন সেই আগ্রহ করে সুবাসিনীকে নিয়ে গিয়েছিল এক জনসভায়, সেখানে বসন্তদা দীর্ঘ এক বক্তৃতা করেছিল, এবং আরও দু'একজন নেতা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সুবাসিনী এতকাল বসন্তদার কাছে ছিল কিন্তু কোন দিনই সে কোন বড় মিটিং-এ বসন্তদার বক্তৃতা শোনে নি। সুবাসিনী নিজেদের গ্রামের ছোটখাটো সভায় বসন্তদার বক্তৃতা শুনেছিল বটে, কিন্তু পরে সে বাড়ীর বাইরে কোথাও যায় নি, যেতে ইচ্ছেও তার হয় নি। বিরাট মিটিং-এ বসন্তর বক্তৃতা শুনে সুবাস অবাক হয়ে গিয়েছিল এবং আরও অবাক হয়েছিল ছায়াদেবীর ভাষণ শুনে। বাড়ী ফিরে সুবাসিনী ছায়ার হাত ধরে বলেছিল, কি করে অত লোকের সামনে অমন সুন্দর সুন্দর কথা বলে তাই, আমি হলে ত ভয়েই মরে যেতুম। ছায়া অল্প হেসে বলেছিল, তুমিও পারবে দিদি যদি একটু চেষ্টা কর। সুবাস বলেছিল, আমরা মূর্খ মানুষ, ঘর গেরস্তালির কথাই বলতে পারি, অত সব দেশের কথার কি জানি বল? ছায়া বলেছিল, কেন, 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় তুমি ত পিছিয়ে থাক নি তাই। সুবাস চুপ করে গিয়েছিল।

একদিন এই ছায়া এক অদ্ভুত কাজ করে বসল। চারগাছা সোনার চুড়ি এবং একছড়া সোনার হার এনে সুবাসকে বলেছিল, দিদি, আমি একটি কাজ করব, তুমি কিন্তু আপত্তি করতে পারবে না, বা কাউকে বলতেও পারবে না যে আমি করেছি।

সুবাসিনী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি কাজ?

ছায়া বলেছিল, আগে প্রতিজ্ঞা কর, তারপর বলব।

কৌতূহলী সুবাস সরল বিশ্বাসে প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল।

প্রতিশ্রুতি আদায় করে ছায়া সুবাসিনীর হাতটা টেনে ধরে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চুড়ির প্যাকেট বার করে হাতে চুড়ি পরিয়ে দিতেই সুবাস অবাক্ হয়ে বলেছিল, একি, এ সব আমায় পরাচ্ছ কেন ভাই?

মুখ টিপে হাসতে হাসতে ছায়া বলেছিল, আমার খুসি। আমার দিদিকে আমি পরাচ্ছি তোমার তাতে কি?

এর উত্তরে কি বলা যায় ভেবে ঠিক করার পূর্বেই

সুবাসের মাথাটা টেনে ধরে ছায়া ওর গলায় সোনার হার পরিয়ে দিয়েছিল।

বিস্ময়ের ওপোর বিস্ময়! হারের চকচকে লকেটটার দিকে দেখতে দেখতে সুবাস বলেছিল, এর যে অনেক দাম, আমার জন্য এত খরচ করলে কেন ভাই? আমি ত এর দাম দিতে পারব না।

ছায়া বলেছিল, দাম নিচ্ছে কে? আমার ভাল লেগেছে আমি করেছি। তুমি কিন্তু খবরদার কাউকে বলতে পারবে না যে, আমি দিয়েছি। এমন কি তোমার দাদাকেও তুমি কিচ্ছুটি বলতে পারবে না।

সুবাস বলে, বা রে! তুমি দিয়েছ এ কথা যদি না বলি তা হলে বসন্তদা যদি জিজ্ঞাসা করে কোথায় পেয়েছি, তখন কি বলব?

বলবে, আমার ছিল।

মৃদু হেসে সুবাস বলে, তাও কি হয় নাকি? বসন্তদা বিশ্বাস করবে কেন? তার ত অজানা কিছুই নেই।

ছায়া বলে, আচ্ছা বেশ, তোমার যা খুসি হয় তাই বোলো। কিন্তু—কিন্তু এক কাজ কর না কেন? তুমি এখন ওগুলো তোমার বাক্সয় রেখে যাও, বসন্তদা ত আর তোমার বাক্স খুলে দেখতে যাচ্ছে না। পরে তখন ধীরে-সুস্থে দাদাকে জানিও।

বেশ একটু চিন্তান্বিত ভাবে সুবাসিনী বলেছিল, না না ছায়া, সে বড় বিশ্রী হবে। বসন্তদা কি মনে করবে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে তুমি বরং এগুলো ফিরিয়ে নাও। এ সবে আমার কোন দরকারও নেই, লোভও নেই।

সুবাসের হাত ধরে ছায়া খুব করুণ ভাবে বলে, না দিদি, তুমি আমাকে বিমুখ কোরো না। ভালবেসে তোমাকে যা দিলুম, তুমি ভালভাবেই সেটাকে নিও। না হলে আমি বড় কষ্ট পাব।

সুবাস নিরুত্তরে হাতের চুড়িগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল! কিন্তু সেইদিনই সন্ধ্যার সময় অন্য কেউ দেখার আগে সুবাসিনী চুড়ি ও হার খুলে তার ছোট বাক্সটির মধ্যে তুলে রেখেছিল। কেমন যেন লজ্জা ও সংকোচ হয়। এ সব পরে সে লোকের সামনে বেরুবে কি করে?

সন্ধ্যার পর থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসন্তদা কাগজ-পত্র নিয়ে নীচের অফিস ঘরে কাজ করে। সে সময় আরও দু'চারজন লোক থাকে, তারাও লেখাপড়ার কাজ করে, ছায়া দেবীও ওদের সঙ্গে থাকে। সুবাস চাপরাসীর হাত দিয়ে দুজন, তিনজন, চার জনের মত চা জলখাবার পাঠিয়ে দেয়। তারপর কোনদিন রাত দশটা, কোনদিন এগারটা, হয় ত বা সাড়ে এগারটার সময় বসন্তদা ওপোরে উঠে আসে। সেই সময় দোতলার বারান্দায় বসন্তদার খাবার টেবিলে দেওয়া হয়। টেবিলে ভাত খাওয়া নিয়ে প্রথম প্রথম সুবাসের খুবই অস্বস্তি হোত। বাইরে বাইরে যেখানে যা হবার তা হয়েছে, কিন্তু বাড়ীতে নিয়মিতভাবে টেবিলে ভাত খাওয়াটা হিন্দুর ঘরে—একথা সে বসন্তদাকে বলেও ছিল, কিন্তু বসন্তদা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর যেদিন ছায়া দেবী চাপরাসীকে দিয়ে মুর্গি আনিয়ে নিজে হাসিমুখে মিনিষ্টার সাহেবের জন্য মুর্গি রান্না করতে উনানের ধারে এসে বসল, সেদিন সুবাসিনী সত্যই ক্ষুব্ধ হয়েছিল। গম্ভীরভাবে ছায়া বলেছিল, শরীরটা ত আগে রাখতে হবে, দিন রাত এই খাটুনী, ডাক্তার বলেছে—

সুবাসিনী বসন্তদার কাছে কথাটা তুলতে বসন্তদা রুক্ষ-ভাবে বলেছিল, সব ব্যাপারে তোর মাথা ঘামাবার কি দরকার? সুবাস মাথা হেঁট করে চলে এসেছিল।

এর পরেই এল একটা বেঁটে গেছের লোহার আলমারী। সুবাস অবাক হয়ে গেল, যখন শুনলে ওটা আলমারী নয়। ওটা উনুন, ওর নাম কুকিং রেঞ্জ। দোতলার ছোট ঘরে সেই উনুনটা বসান হোল এবং ছায়া ঠিক করে দিলে যে ঐ উনুনে বসন্তদার খাবার তৈরী হবে এবং একতলার উনুনে যেমন রান্না হয় তেমনি হবে অন্য সকলের জন্য। দোতলার রান্নাঘরের ভার সুবাসের ওপোর পড়ল না। ছায়া বলে, না দিদি, ও-সব ইলেকট্রিকের বিপজ্জনক জিনিষ, তুমি নাগলাতে পারবে না, ওখানে কাজ করার জন্য অন্য লোক আসবে।

এবং অন্য লোক এলও বটে। সে মুসলমান। সুবাসের মনটা কেমন ভেঙে হয়ে গেল। মুসলমান বাবুর্চি নিয়মিত ভাবে রান্না করে এবং ছায়া প্রায় রোজ তারিখেই বসন্তদার খাবার টেবিলে তত্ত্বাবধান করার নামে এক সঙ্গে খেয়েও নেয়। সুবাস সে সময়ে কাছাকাছি এলে বেশ বুঝতে

পারে যে, দাদা কি ছায়া কেউই তার উপস্থিতি পছন্দ করছে না।

কিন্তু এই অস্বস্তিকর অবস্থার চরম হোল সেই দিন, যেদিন বসন্তদা সুবাসকে ডেকে বলে, সুবাস তুই তোর ঘরটা ছেড়ে দিস্ ত, ছায়া যেন ও ঘরে কি সব রাখবে বলছে।

এ বাড়ীর দোতলায় তিনখানা বড় ঘর, একখানা ছোট। মাঝের সব চেয়ে বড় ঘর খানার সঙ্গে আছে বাথ রুম। হাসপাতাল থেকে আসার দিন থেকেই বসন্তদা বড় ঘরটায় থাকে এবং ওর ঠিক পাশের ঘরটাতেই বসন্তদার নির্দ্দেশ মত সুবাসের জায়গা হয়েছিল। অন্য ঘরটা সাজানো থাকত বিশেষ কোন মাননীয় অতিথির জন্য। এ ছাড়া দোতলার ছোট ঘরটায় কুকিং রেঞ্জ বসিয়ে ছায়া দেবী ওটাকে রান্নাঘরে পরিণত করে ফেলেছিল। কাজেই ওপোরে আর ঘর কোথায়? নীচেও ত ঘরের অভাব। বসন্তদার শোবার ঘরের নীচের ঘরটা বসন্তদার আফিস ঘর হয়ে আছে, পাশের ঘরে আগন্তুকদের বসার ঘর, এ পাশের ঘর অর্থাৎ ওপোরের অতিথির জন্য যে-ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে তার নীচের ঘর হোল অতিথিদের ডিনার খাবার ঘর। কুকিং রেঞ্জের নীচের ছোট ঘরটায় ড্রাইভার এবং চাপরাসীরা শোয়, উঠানের ধারের আউট হাউসে চাকর ঠাকুর থাকে, তা হলে সুবাস থাকবে কোথায়? ছোটের আমল থেকে, আজ পর্য্যন্ত যে সুবাসিনী সকলের খাওয়া ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে দিত, সেই সুবাসিনী আজ নিজেই থাকবার উপযুক্ত কোন জায়গা খুঁজে পেলে না।

শেষে এর মীমাংসা করে দিলে মিনিষ্টার সাহেবের চাপরাসী ধুরাজ। ধুরাজ হিন্দুস্থানী, বয়সে প্রবীণ, বিচারাদি করতে বেশী দেরী নেই তার, বড় নিরীহ এবং ভাল লোক। প্রথম থেকেই সে যেন সুবাসিনীর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। বাঙ্গালীর মত বাংলা বলত সে বলেছিল, দিদিমণি, আপনার ব্যবস্থা করে দিই ছাতের চিলে কোঠায়। ঐ সিঁড়ির ঘরে যে সব বাজে জিনিষ আছে, সেই সব সাফ্ করে ওখানে আপনি থাকুন।

সুবাস ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল। কোন কিছু ভাববার ক্ষমতাও তার ছিল না।

কিন্তু সিঁড়ির ঘরে একটা লোক ভালভাবে পা ছড়িয়ে শুতে পারে না। কারণ সিঁড়ির ঘরে দুটো জলের ট্যাঙ্ক ছিল। একটা খাবার জলের একটা ধোপা জলের। পাশের জল পাছে রোদ্দুরে গরম হয়ে যায় সেই জন্য ট্যাঙ্কগুলো বসান হয়েছিল সিঁড়ির ঘরে। কিন্তু নিজের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সুবাসিনী কোন দিনই চিন্তা করে নি। আরও তার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা মনেও এল না। সিঁড়ির ঘরে মাদুর পেতে পা গুটিয়ে শুয়ে শুয়ে সুবাসিনীর কেবলই মনে হতে লাগল, ভোর বেলা বসন্তদাকে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে কে দেবে? ভোর বেলা খালি পেটে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া যে তার অভ্যাস এবং অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর থেকে সেই জল যে সুবাসই প্রত্যহ এগিয়ে দেয়।

সকালে ওপোর থেকে নেমে এসে সুবাসিনী কথঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করল। সে বুঝলে, বসন্তদা একলা নেই। সুবাস যে ঘরে থাকত, সেই ঘরে ছায়া দেবী রয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনটা ওর কেমন যেন বিষিয়ে গেল। মনে হোল তাহলে এ বাড়ীতে সুবাসের কোন প্রয়োজনই আর নেই। এবার থেকে বসন্তদার সমস্ত ভার তাহলে ছায়া দেবীই নিজের হাতে তুলে নিয়েছে!

অভ্যাসমত নীচে নেমে এসে হাত মুখ ধুয়ে ঠাকুরকে চাল ডাল বার করে দিয়ে চাকরকে বাজার থেকে কি আনতে হবে সেই সমস্ত ফরমাস করে টাকাও সে দিয়েছিল, তারপর বসন্তদা এবং ছায়াদেবীর চা জলখাবার তৈরী করে অভ্যাসমত ট্রেতে সাজিয়ে ওপোরেও নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিজে বসে থেকে বসন্তদাকে খাওয়াতে আর পারে নি। কেমন একটা নীরব প্রত্যাখ্যান ওর মনের মধ্যে প্রবল এক নিষেধ হয়েই ওকে যেন সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ছায়া কোন কথা বলে নি'। ট্রে-থেকে টিপট তুলে বসন্তদার কাপে চা ঢালতে ঢালতে ওর দিকে পেছন ফিরে ইংরেজীতে বসন্তদাকে কি সব বলে সে হাসতে লাগল, সুবাস ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ধীরে ধীরে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এস বটে, কিন্তু বরাবরই উৎকর্ণ হয়ে ছিল, এই বুঝি বসন্তদার ডাক শুনতে পাবে, এই বুঝি বসন্ত বলবে, সুবাস, কোথায়ে, কিন্তু মিনিষ্টার বি চক্রবর্ত্তী সেদিন নীরবই ছিলেন, সুবাসের কথা তাঁর মনেও পড়েনি।

এমনইভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। এক বাড়ীতে বাস করেও বেশ কয়েকদিন বসন্তদার সামনেও গিয়ে দাঁড়াবার কোন সুযোগই পায় নি। কিন্তু সেদিন যে ওকে যেতেই হবে, ওর খরচের টাকা ফুরিয়ে গেছে।

সকাল সাড়ে সাতটার সময় বসন্তদা রোজই নীচের অফিস ঘরে নেমে আসে। সাড়ে সাতটার আগে থেকেই দু'চারজন আসতে সুরু করে, এবং বসন্তদা স্নান ও প্রাতরাশ সেরে এই সময় নীচে নেমে আসে। কাজেই এই সময় সুবাস যদি ওপোরের ঘরে এসে টাকা চেয়ে না নেয়, তা হলে চাকরকে বাজারে পাঠাবে কি করে।

বারান্দায় বসন্তর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ একটু দ্বিধাজড়িত স্বরে সুবাস ডাকলে, বসন্তদা! বসন্ত এবং ছায়া দুজনেই ওর দিকে চেয়ে দেখলে। সুবাসের মনে হোল, ও যেন বসন্তদার কাছ থেকে বহু দূরে নিতান্ত অপরিচিতার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বসন্তদা উত্তর দিলে, কি? পূর্ব্বের মত 'কি যে সুবাস' না বলে শুধুই বল্লে, কি? নিরক্ষরা সুবাসের কানেও এই পরিবর্ত্তনটা রুক্ষভাবে ফুটে উঠল।

মেঝের ওপোর দৃষ্টি রেখে সুবাস বলেছিল, খরচের টাকা ফুরিয়ে গেছে, তাই—

বসন্তদা ছায়াকে লক্ষ্য করে বলেছিল, দেখ ত ছায়া।

ছায়া দেবী এগিয়ে এসে বলেছিল, দিদি, দাদা বলছিলেন যে খরচ বড় বেশী বেশী হচ্ছে, আর তা ছাড়া তুমি ত লিখতে জান না দিদি যে, হিসেব লিখে রাখবে, তাই এখন থেকে চাকরদের খরচটরচ যা কিছু দিতে হবে, দাদা বলেছিলেন—সে সমস্ত আমিই দেব। মানে—

সুবাস ঘাড় নেড়ে বলেছিল, আচ্ছা। তারপর সে পায়ে পায়ে ওখান থেকে নিঃশব্দে চলে এসেছিল।

তা হলে এ পর্যন্তও চুকল। সুবাসিনীর অজ্ঞাতেই তার বুক খালি করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সেদিন পড়েছিল।

সেইদিনই, কিম্বা তার দু'একদিন পরে সুবাসের ঠিক মনে নেই, বসন্তদা আহারাদি শেষ করে এগারটার সময় অফিসে যাবার জন্ত তৈরী হয়ে সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছিল তখন যেন কি কারণে সুবাস সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপোরে উঠতে গিয়ে দেখতে পেলে বসন্তদা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে নামছে। সুবাসিনী অবাক হয়ে বড় সিঁড়িটার এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে হটাৎ বলে ফেলে বসন্তদা তুমি বিড়ি খাচ্ছ?

বসন্ত ওর মুখের দিকে চেয়ে কোন কথা না বলে নীরবে নীচে নেমে গেল। পেছন পেছন ছায়াদেবী ভ্যানিটি-ব্যাগ দুলিয়ে বসন্তকে অনুসরণ করলে।

সারাটা দিন সুবাসের মনটা অত্যন্ত ভারী হয়ে রইল। তাহলে কি বসন্তদার সম্বন্ধে সে যা শুনেছিল, সবই সত্যি? এই কদিন আগে ধুরাজ চাপরাশী কথা প্রসঙ্গে সুবাসকে বলেছিল, মিনিষ্টার সাহেব কোন এক পার্টিতে মদ খেয়ে শেষে বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন। কথাটা শুনে সুবাস হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, ধুরাজ, একথা আর যে বিশ্বাস করে করুক, আমি করি না। বসন্তদা মানুষ নয়, দেবতা। ওঁর শিক্ষায় আমাদের গাঁয়ে বিড়ি তামাকের দোকান পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর সেই লোক আজ মদ খাবে? এ হতেই পারে না। ধুরাজ চুপ করে গিয়েছিল।

আর একদিন ধুরাজ ও ড্রাইভারের কথাবার্ত্তা থেকেই সুবাসিনী অনুমান করেছিল, বসন্তদা নাকি কোন একজন বড় ব্যবসাদারের কাছ থেকে মোটা রকমের ঘুস খেয়ে কি একটা কাজ করে দিয়েছে। সেদিন সুবাসিনী বেশ কড়া-ভাবে ওদের ধমকে দিয়েছিল। সুবাসের ধমক খেয়ে ধুরাজ একটি কথাও বলে নি, ড্রাইভার শুধু হেসে সরে গিয়েছিল।

সারাটা দুপুর সুবাসের কোন কাজ নেই। আগে সে বসন্তদার ঘর-দোর ঝেড়ে মুছে, জুতোয় কালি দিয়ে, কুঁজোয় জল ভরে, গেরস্থালির নানা রকম টুকিটাকি কাজ করে কোথা দিয়ে যে দিন কাটাত তা ঠিক টেরও পেত' না, কিন্তু যেদিন থেকে চিলে-কোঠায় আশ্রয় নিতে সে বাধ্য হয়েছে তার পরদিন থেকেই তার দুপুরের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। ছায়াদেবী দোতলার তিনখানা ঘরে তালা বন্ধ করে বেরিয়ে যায়। সুবাস তালা দেখে কিছুটি বলে নি, যেন কিছুই হয় নি এমনই সহজভাবে জিনিষটা মেনে নিয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যের সময় রান্নাঘরের সামনে বসে সুবাস তরকারী কুটছিল, ছায়াদেবী ওপোর থেকে কি সব কাগজপত্র হাতে নিয়ে নামতে নামতে সিঁড়ির পাশে

রান্নাঘরের সামনে সুবাসকে দেখে মিষ্টি গলায় আস্তে আস্তে ডাকলে, দিদি।

সুবাস চেয়ে দেখেছিল।

ছায়া তেমনি মধুর কণ্ঠে বলেছিল, একটু শোন না দিদি।

তরকারীর হাতটা বঁটির পেছনে মুছে সুবাস উঠে দাঁড়াতেই ছায়া দু'পা এগিয়ে রাঁধুনীর দৃষ্টির বাইরে এসে সুবাসকে মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, দাদাকে সিগারেট খাওয়া নিয়ে ওভাবে বলতে গেলে কেন? দাদা খুব রাগ করেছেন!

সুবাস প্রথমটা চুপ করে রইল, শেষে বলে, উনি কোন রকম নেশা করা পছন্দ করতেন কিনা, এমন কি গ্রামের ছেলেরা পর্য্যন্ত ওঁর কথায়—

হাসিমুখে ছায়া বলেছিল, সে সময়ের কথা ছেড়ে দাও দিদি। এখন ওকে সর্ব্বদাই বড় বড় লোকের সঙ্গে থাকতে হয়—

সেজন্য নেশা করতে হবে? সুবাসিনী উত্তর দিয়েছিল।

ছায়া বলেছিল, সে কথা আমি কি জানি ভাই! উনিই আমাকে যা বলতে বলেন, তাই বলছি। আর হ্যাঁ, উনি বলেছেন, তুমি ওঁকে ওরকম 'তুমি' 'তুমি' করে কথা বল কেন? ওঁর সঙ্গে যখন তখন কথা কইতে যেও না। আজ উনি খুব বিরক্ত হয়েছেন। কথাগুলো শেষ করেই ছায়া তাড়াতাড়ি অফিস ঘরের দিকে চলে গিয়েছিল। সুবাসিনী ধীর পায়ে আবার এসে তরকারী কুটতে বসেছিল।

হঠাৎ মনে পড়ল আর একদিনের কথা, যেদিন নারী-সমিতির দোতলার অফিস ঘরে সুবাসিনী বসন্তকে সমীহ করে কথা বলতে বসন্ত বলেছিল, আবার 'বলতেন' কেন, এত ভদ্রতা কি আমায় সইবে রে? কুমড়ো কুটতে কুটতে হঠাৎ আঙুলটা কেটে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়তে লাগল।

সুবাসিনী চুপ করে বসে বসে কাটা আঙুলের রক্ত-ঝরা দেখছিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর তরকারী নিতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মেঝেয়-পড়া রক্ত দেখে আৎকে উঠে বল্লে, দিদিমণি—

সুবাস কোন উত্তর দেয় নি।

ঠাকুর ঘটিভর্ত্ত জল এনে আঙুল ধুইয়ে কাটা জায়গায় পানে-খাবার চুণ লাগিয়ে চা-ছাঁকবার ন্যাকড়া থেকে একটা কালি ছিঁড়ে আঙুলটা বেশ চেপে চেপে বেঁধে দিলে। বল্লে, কি করে কাটল দিদিমণি?

সুবাস বলেছিল, কি জানি?

ঠাকুর বলেছিল, তুমি ত বেশ লোক দিদিমণি? কাটবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে বলতে হয় ত, তা নয় চুপ করে বসে আছ?

সুবাস কোন উত্তর দেয় নি।

ঠাকুর বলেছিল, যাও দিদিমণি, আজ তুমি উঠে যাও, বাকী তরকারী আমি কুটে নিচ্ছি।

বঁটী ছেড়ে সরে বসতে বসতে সুবাসের মনে হোল, এখানেও তার কোন কাজ নেই। ঠাকুর নিজেই কুটনো কুটে নিচ্ছে।

কোথা দিয়ে কদিন কি ভাবে কাটল, সুবাসের ঠিক মনে পড়ে না, কিন্তু বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। কখন কি খায়, কখন কোথায় বসে থাকে, রাত্রে ঘুমায় কি ঘুমায় না, সুবাসের কিছুই মনে থাকে না। এক একবার সিঁড়ি দিয়ে বসন্তদা ওঠানামা করে, ছায়া দেবী যাতায়াত করে সুবাস ওদের ঠিকমত চিন্‌তেই পারে না, ওরাও যেন অচেনার মত চলে যায়। একমাত্র যোগাযোগ ছিল সকালে চা ও জলখাবার নিয়ে যাওয়ার সময়; সেটা সুবাস এখনও নিয়ে যায়। কিন্তু সে সময়ও বসন্তবাবু দেখা দেন না। স্নানের ঘর থেকে বসন্তদা, বেরিয়ে আসা মাত্রই ছায়া দেবী মিষ্টি গলায় সিঁড়ির সামনে এসে ডাক দেয়, ঠাকুর, চা দিয়ে যাও। ছায়া ঠাকুরকে ডাকে, সুবাস ডাকে না, কিন্তু ছায়ার আহ্বানে ঠাকুর কোনদিনই সাড়া দেয় না, সুবাসই নিয়মিতভাবে নিঃশব্দে চায়ের ট্রে নিয়ে ওপোরে যায়। দোতলায় সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে থাকে ছায়া। সে এগিয়ে এসে ট্রে-শুদ্ধ চা নিয়ে মিষ্টি হেসে বলে, তুমি আবার কষ্ট করে আনলে কেন দিদি। সুবাস বলে, কষ্ট আর কি? ছায়া বসন্তদার ঘরের দিকে এগিয়ে পড়ে, সুবাস সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে নেমে আসে। এটাও বাঁধা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক কথা, এক কাজ, একই রকম মুখভঙ্গী, এক দিনের সঙ্গে অন্য একটি দিনের কোন প্রভেদ নেই। এইভাবে সকালের আহার পর্ব্ব চুকবে, তারপর দুপুরে এবং রাত্রে বসন্তদার রান্না ওপোরেই কুকিং রেঞ্জে হয়, সে খবর নীচের তলায় কারুর কাছেই পৌঁছয় না।

কিন্তু নীচের তলায় সুরু হোল বেশ একটু অসন্তোষ। পূর্ব্বের তুলনায় আহার্য্যের একেবারে চরম অবনতি। নীচে রান্না হয় পাঁচজনের জন্য। ঠাকুর, চাকর, দুয়ারে চাপরাসি অর্থাৎ দিনরাত যে বাড়ীতে থাকে,ড্রাইভার এবং সুবাসিনী। এদের দুবেলা খাবার জন্য দৈনিক বাজারের বরাদ্দ ছায়া দেবী বেঁধে দিয়েছেন আট আনা, এবং এদের জন্য আসে সব চেয়ে মোটা চাল, চাপরাসী ও ড্রাইভারের রাত্রির জন্য আটা। এরা যদি সকালে মুড়ি খেতে চায় তাহলে ঐ আট আনা থেকেই মুড়ি কিনতে হবে, হাসিমুখে ছায়া দেবী সেই উপদেশই চাকরকে দিয়েছেন, কারণ বাজার করে সেই চাকরই। ওপোরের বাজার করে বাবুর্চ্চি এবং ছায়া দেবী নিজেও প্রায় নিয়মিতভাবে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে অনেক কিছু কিনে কুলির মাথায় চড়িয়ে মোটর অবধি আসেন, এবং বাড়ী পৌঁছবার পর ড্রাইভারকেই বলা হয় সেগুলো একেবারে ওপোরে তুলে দেবার জন্য। ড্রাইভার বলে যে সে সেই তরিতরকারী, মাছ এবং মুরগীর মাংস ওপোরে বরফ আলমারীতে তুলে দিয়ে আসে। সুবাস ড্রাইভারের কাছেই শুনেছে যে, ওপোরে একটা আলমারী এসেছে যার ভেতরটা একেবারে ঠাণ্ডা বরফ। শুনেছে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু সে আলমারীও আজ পর্য্যন্ত চোখে দেখে নি।

কিন্তু খাবার কষ্ট যত বাড়ই হোক না কেন, সুবাস এমন কিছুই বোধ করে নি। হয় তার খাওয়া সম্বন্ধে তেমন কোন ধাঁদ ছিল না, কিম্বা ঠাকুর দয়া করে হয়ত ওরই মধ্যে একটু যত্ন করে ওকে দিত। তবে একটা জিনিষ, খাবার ব্যাপারে যার যত অসন্তোষই হোক না কেন, মুখ ফুটে কেউ কিছুই বলত না, কারণ ছায়াদেবী নাকি এমন কথাও বলেছেন যে, নীচের রান্নাঘর বন্ধ করে দিলেও হয়। চাপরাসী সরকার থেকে মাইনে পায়, তাকে খেতে দেবার কথা নয়, ড্রাইভার অনেক বাড়ীতে তোলা মাইনেতে থাকে, খেতে আর কে দেয়; চাকরের কি-ই বা এমন কাজ, তাকে ছাড়িয়ে দিলেই ত হয় এবং এরা যদি না থাকে তা হলে ঠাকুরের দরকারই বা কি, যেহেতু সাহেবের জন্য তো বাবুর্চ্চিই রয়েছে। বাবুর্চ্চি সকালে সাতটার পূর্ব্বেই আসে, রান্না সেরে দুপুরে বাড়ী চলে যায়—আবার রাত্তিরে আসে, সাহেবকে খাইয়ে দিয়ে ফের চলে যায়। সুবাসিনীর কথা ছায়া কিছু বলে নি, সে যে বাড়ীতে থাকে তা ছায়ার বোধহয় মনেও থাকে না।

একদিনের কথা। রাত বেশ গভীর হয়েছে, হয়ত একটা কি দুটো। সুবাসিনী ছাতের টিনে কোঠায় মাদুর পেতে শুয়েই ছিল। হয়ত ঘুমাচ্ছিল কিম্বা জেগেও থাকতে পারে, এইভাবেই সে ঘুমোয়, কিম্বা হয়ত জেগেও থাকে। হঠাৎ ঘরের দরজায় টুক্ টুক্ করে কে যেন ঘা দিলে। সুবাসিনী কান পেতে শুনল, প্রথমে কোন সাড়া দেয় নি। তারপর মৃদুকণ্ঠে কে যেন ডাকলে, দিদি।

গলাটা ছায়ার মত। ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। আবার ডাক এল, দিদি।

সুবাস উঠে বসে বল্লে, কে?

একবার দরজাটা খোল না।

দরজা খুলে সুবাস দেখলে, ছায়া।

কি? সুবাস জিজ্ঞাসা করলে।

একবার নীচে এস দিদি, ওঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে।

একরাশ উদ্বেগ নিয়ে সুবাস যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই ছায়ার পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

এতদিন পরে বসন্তদার শোবার ঘরে ঢুকে সুবাস দেখলে, বসন্তদা ইজি চেয়ারে শুয়ে আছে এবং ঘরে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ।

কি হয়েছে বসন্তদা, একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে সুবাস প্রশ্ন করেছিল।

চোখ চেয়ে বসন্ত বল্লে, কে, সুবাস?

সুবাসিনী বসন্তর কপালে হাত দিয়ে বল্লে, কি হোল বসন্তদা? ছায়া পাশে দাঁড়িয়েছিল।

বসন্ত বল্লে, এমন কিছু হয় নি, তবে পেটটা বড় খারাপ হয়েছে রে। তাই—

ছায়া বল্লে, দিদি, বিছানার চাদরটা কলতলায় ফেলে এখনই যদি ওটাকে সাফ্ করা যায়—না হলে শুকিয়ে গেলে—

সুবাস দেখলে চাদরটা নোংরা হয়ে গেছে।

কিন্তু বিছানার দিকে নজর দিয়ে সুবাস আরও একটা পরিবর্ত্তন দেখতে পেলে। আগে ছিল বসন্তদার

একলা শোবার মত একখানা খাট, কিন্তু এখন সেই খাটের সঙ্গে লাগিয়ে আর একখানা খাট পাতা হয়েছে। না—না ঠিক তা নয়, বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য পাশের ঘরে যে দুখানা এক রকমের খাট ছিল, সেই দুখানা এ ঘরে এনে জোড়া দিয়ে একসঙ্গে পাতা রয়েছে।

সুবাস তাড়াতাড়ি খাট থেকে দু'জোড়া পাৎলা মাথার বালিশ টেবিলের ওপোর ফেলে চাদরখানা সন্তর্পণে গুটিয়ে নিয়ে কলতলায় চলে গেল এবং বাথরুমের এক কোণে চাদরখানা ফেলে এ ঘরে এসে দেখলে চাদরের তলায় মোটা কাপড়ের ওয়াড় দেওয়া রবারের যে গদি পাতা ছিল সেই জোড়া গদির একখানার ওয়াড়ও নোংরা হয়েছে। ইতস্তত করতেই ছায়া বল্লে, ঐ ওয়াড়টা খুলে নাও দিদি। ওটাও কাচতে হবে। সুবাস গদিটাকে জোর দিয়ে টানতে গিয়ে দেখলে গদিটা নিতান্তই হাল্‌কা। গদিটাকে মেঝের ফেলে ওয়াড়ের বোতাম খুলে গদিটাকে টানাটানি করে ঠিক সামলাতে পারছিল না দেখে বসন্তদা বল্লে, একটু ধর না কেন ছায়া, ও একলা সামলাতে পারছে না। ছায়া চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল, যেন শুনতেই পায় নি। সুবাস গদির ওয়াড় খুলে মেঝের ফেলে গদিটা পরীক্ষা করে দেখলে সেটায় কোন দাগ লাগে নি। তখন সেটাকে আবার খাটে পেতে দিয়ে ওয়াড়টাও নিয়ে গেল বাথরুমে। ছায়া দরজার কাছ অবধি এসে বল্লে, এখনই একবার জল দিয়ে ভাল করে কেচে দিও দিদি, নইলে শুকিয়ে গেলে—

সুবাস নিরুত্তরে চলে গেল, কিন্তু এক মিনিট পরেই হাত ধুয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে শুনতে পেলে বসন্তদা খুব আস্তে আস্তে বলছে, কাজটা ভাল হোল না, জোড়া খাট-খানা—

ছায়া বল্লে, থাক্ গে, যা হয়েছে বেশ হয়েছে।

সুবাস ঘরে ঢুকতেই ছায়া ব্যস্ত হয়ে বল্লে, ডাক্তার এখনও এল না কেন? অনেকক্ষণ ত হয়ে গেল। বলতে বলতেই পাশের ঘরে অর্থাৎ সুবাস আগে যে ঘরে থাকত সেই ঘরে চলে গেল।

সুবাস বসন্তর ইজি চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে বল্লে, এখন কেমন আছ বসন্তদা—

বসন্ত বল্লে, ভাল। একটু থেমে বল্লে, পেটে এখনও খুব কষ্ট হচ্ছে রে—

ছায়া ও-ঘর থেকে একখানা পাট-করা স্বজনী এনে এ-ঘরের খাটে ফেলে সুবাসকে বল্লে, ঠিক করে পেতে দাও না দিদি, আমি ততক্ষণ ওঁর মাথাটা একটু টিপে দিই।

সুবাস ছায়ার দিকে না চেয়েই খাটে চাদর পাতলে, একজোড়া মাথার বালিশ টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বিছানায় মাথার দিকে ঠিক মাঝামাঝি পেতে দিলে। অন্য জোড়া মাথার বালিশ টেবিলেই পড়ে রইল! ছায়া বসন্তর হাত ধরে তাকে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলে।

সুবাস মৃদু স্বরে বললে, একটু পায়ে হাত বুলিয়ে দেব দাদা?

বসন্ত বল্লে, দাও।

সুবাস খাটের কোণে উঠে বসে বসন্তদার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তার মনে পড়ল খুলনার কংগ্রেস অফিসের কথা। এ বাড়ীতেও এই কিছুদিন আগে বসন্তদা যখন প্রথম হাসপাতাল থেকে এসেছিল সেই সেদিনের কথাও মনে পড়ল। ছায়া তখন কোথায়?

ছায়া বসন্তর মুখের কাছে এসে বল্লে, জল দেব কি, একটু বরফ জল?

বসন্ত বল্লে, না।

তাহলে মাথা টিপে দিই। বসন্ত কোন উত্তর দেয়নি। ছায়া খাটের অপর দিকে উঠে বসে বসন্তর মাথায় এবং কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

একটু পরে বসন্ত চোখ চেয়ে বলেছিল, সত্যি সুবাস, গত জন্মে তুই আমার বোন ছিলি! যতবার অসুখে পড়েছি, তোর জন্যই সেরে উঠেছি রে।

ছায়া বল্লে, আপনি একটু ঘুমান ত—

বসন্ত কিছুক্ষণ নীরব থেকে বল্লে, সুবাস আমার নিবেদিতা, ভগিনী নিবেদিতা। আমার জন্য জীবনের সব কিছুই ও যেন নিবেদন করে দিয়েছে!

ছায়া চট করে বিছানা থেকে নেমে বল্লে, আর একবার ফোন করি, ডাক্তার এখনও আসছে না কেন, ব্যাপার কি?

ফোন করার জন্য ওঘরে যাবার সময় টেবিলের ওপোর থেকে অপর জোড়া মাথার বালিশ নিয়ে ছায়া বেরিয়ে গেল। নীচে রাস্তায় একখানা মোটর থামবার শব্দ হোল।

নিশুতি রাত! কোথাও কোন শব্দ নেই। গাড়ী-খানা থামতেই বোঝা গেল নিশ্চয়ই ডাক্তার এসেছে। ছায়া দ্রুত এ ঘরে এসে সুবাসকে বলে, দিদি, নীচে গিয়ে দরজা খুলে ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও ত।

বসন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল, ওপোর থেকে কনষ্টেবলকে বলে দিলেই ত হয়, আবার দরকার কি?

বন্ধুমের সুরে ছায়া বলে, না না দিদি, তুমি যাও, রাত্তিরে চেঁচামেচি ভাল নয়—। নীচে মোটরের দরজা খুলে আবার বন্ধ হোল।

সুবাস নীচে নেমে গেল।

সিঁড়ির দুটো করে ধাপ এক সঙ্গে লাফাতে লাফাতে ডাক্তার উঠে এলেন। টেবিলের ওপোর ব্যাগ রেখে মিনিষ্টার সাহেবের খাটের ধারে দাঁড়িয়ে ডাক্তার রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি হোল তার?

পেছন পেছন সুবাস এসে দরজার পাশে দাঁড়াতেই ছায়া খুব নীচু গলায় বলে, তুমি বাইরে যাও, রোগীর ঘরে ভিড় করা ভাল নয়।

সুবাস পায়ে পায়ে বাইরে বালানে এসে দাঁড়াল। মনে মনে অপমানবোধ সে করেনি যে তা নয়, কিন্তু ডাক্তারের মতামত শোনার জন্য সুবাস তখন এমনই উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে যে, কে তাকে কি বললে সে বিষয়ে ওর কোন হুঁসই ছিল না।

ডাক্তার ভেতরে কি কথা বলে সুবাস কিছুই শুনতে পেলে না। অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার ব্যাগ হাতে বেরিয়ে আসতেই সুবাস ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির কাছ অবধি এসে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু।

মুখ ঘুরিয়ে ডাক্তার বলে, ভাল, ভয়ের কিছু নেই।

ওষুধ-পত্তর? সুবাস প্রশ্ন করলে।

খাইয়ে দিয়ে গেলুম। বাকী রাত্তিরটা শান্তিতে ঘুমুবেন। তারপর ভোরেই আমি আবার আসব। ডাক্তার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

বসন্তদার ঘরের দরজার কাছে আসতেই ছায়া তাড়া-তাড়ি এগিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলে, তুমি শোও গে দিদি। ডাক্তারবাবু বলেছেন এখন যেন কোন কথাবার্তা না বলেন। আর তা ছাড়া আমি ত জেগেই রইলুম।

সুবাস ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপোরে উঠতে উঠতে শুনতে পেলে, কনষ্টেবল নিচে দরজা বন্ধ করলে এবং ডাক্তারের গাড়ী ষ্টার্ট দিলে।

ওপোরে গিয়ে সুবাস অনেকক্ষণ ছাতের প্যারাপেট ধরে দাঁড়িয়ে রইল। শেষে এক সময় নিজের ছোট্ট ঘরটিতে ঢুকে মাদুরের ওপোর বসল। বসেই রইল অনেকক্ষণ। বসে বসে হঠাৎ সে বুঝতে পারলে, দোতলার ঘরে চাবি পড়েছে কেন। দুখানা খাট এক সঙ্গে পাতা রয়েছে, দু'জোড়া মাথার বালিশ পাশাপাশি, পাছে কেউ এ-সব দেখে সেই জন্যই দোতলায় সব সময় চাবি দেওয়া থাকে। উঃ, বসন্তদা ছিল দেবতা, তার এই পরিণতি!

খোলা দরজা দিয়ে সুবাস দেখলে, আকাশ আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠল। পাখিরা ডাকতে সুরু করলে। এবার রাস্তায় জল দেওয়া হবে, লোক চলাচল সুরু হবে, সকাল হবে, কিন্তু—

সুবাসিনী উঠে দাঁড়িয়ে মাদুরটা টুকে ঝেড়ে গুটিয়ে ট্যাঙ্কের গায়ে ঠেসান দিয়ে রেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। দোতলায় সিঁড়ির দরজা তখনও ভেতর থেকে বন্ধ, কাজেই বসন্তদার খবর পাওয়া গেল না। ও একতলায় নেমে কল-ঘরে চলে গেল।

খানিক পরে দোতলায় এসে সিঁড়ির দরজা খোলা পেয়ে সুবাস নিঃশব্দে বসন্তদার ঘরের দরজায় দাঁড়াতেই দেখলে দরজার দিকে চেয়ে বসন্তদা শুয়ে আছে। ওকে দেখে বসন্তদাই আগে কথা কইলে। বলে, দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আয়।

সুবাস ভেতরে এসে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বলে, রাত্রে আর কোন কষ্ট হয়েছিল?

বসন্ত বলে, না। একটু থেমে বলে, ডাক্তারের ওষুধটা ভাল, আর কোন কষ্ট হয়নি, বা আর আমাকে উঠতেও হয়নি।

পাশের ঘরে অর্থাৎ যে ঘরে সুবাস আগে থাকত সেই ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। বসন্তদা বলে, দেখ্ ত, বোধ হয় ডাক্তার।

ডাক্তারই বটে। সুবাসের উত্তর শুনে ডাক্তার বলে, তাহলে তারকে বলে দেবেন, আমি আটটা নাগাদ যাব। আর সকালে লেবুর রস দিয়ে পাৎলা একটু ঘোল দেবেন, তারপর আমি ভালভাবে পরীক্ষা করে যা দরকার হয় করব।

সুবাস এ-ঘরে এসে বসন্তদাকে ডাক্তারের কথা বলে বললে, তাহলে ঘোলের ব্যবস্থা করি।

বসন্ত বললে, এত ভোর বেলা তুই পাবি কোথা? আগে দোকান খুলুক, তারপর আমি মুখ-টুক ধুয়ে নি। তুই ততক্ষণ এ খানে বোস্।

সুবাসিনী বসন্তদার খাটের পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।

বসন্ত চুপি চুপি বললে, হ্যারে, ছায়া তোর সঙ্গে কিছু খারাপ ব্যবহার করে?

সুবাস বললে, কই, না ত।

ঘোষের নীচের রান্নাঘরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক হচ্ছে ত?

সুবাসের মনে পড়ল, অনেকদিন পরে অসুখ থেকে একটু সেরেই সুবাসদের গ্রামের বাড়ীতে বসন্তদা শুয়ে শুয়েই এই রকম সুরে সারা গাঁয়ের খবর নিয়েছিল।

কিরে, চুপ করে আছিস্ যে?

সুবাস বললে, না দাদা, সব ঠিক আছে।

হাসিতে চোখ বুজে একটু পরে বসন্ত বললে, ছায়ার কাছে আমি সব খবর পাই। নিজে যে দেখব তা আর সময় পাই না যে।

সুবাস চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। হঠাৎ বললে, জল দেব? সকালে জল খাবে ত?

বসন্ত বললে, নাঃ, আজ আর জল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তারপর বললে, আচ্ছা দে।

সুবাস এক গেলাস জল গড়িয়ে দিলে। উঠে বসে জল খেয়ে বসন্ত বললে, আজকাল আর সকালে জল খাই না। তারপর বসে বসেই বললে, আমার এই সব শুকনো খাওয়া ঠিক সহ্য হচ্ছে না রে সুবাস। আমি ভাবছি, এবার সেই আগের মতই খাওয়া-দাওয়া শুরু করব। নইলে রোজ রোজ মাংস, ঘি-ভাত এ-সব কি আর—বলে সুবাসের দিকে মুখ তুলে বসন্তদা ম্লান হাসি হাসলে।

তা খেলেই ত পার, সুবাস উত্তর দিলে।

খুট করে বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ হোল। তারপর একখানি মাত্র কাপড়-পরা অবস্থায় ছায়া এসে ঘরে ঢুকেই হঠাৎ যেন চমকে উঠে সুবাসকে বললে, ওঁর ঘুম ভাঙালে ত? ডাক্তার বার বার করে বলে গেল—

বসন্ত বলে, না, ঘুম আমার ভেঙেই ছিল। আমিই ওকে ডেকেছি।

ও, ছায়া পাশের ঘরে ঢুকে গেল। সুবাস চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল।

এক মিনিটের মধ্যেই ছায়া ও ঘর থেকে এসে সুবাসকে বেশ একটু গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি বিছানার চাদরটা কাল রাত্তিরে ধুয়ে দাও নি, আজ কি ও থেকে দাগ উঠবে? একটু সুড়েমির জন্য দামী চাদরটা—

আমি এখনই সাবান দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছি, ব্যস্ত হয়ে সুবাস উত্তর দিলে।

বসন্ত বলে, থাক না ওসব। সোজা ধোপার বাড়ী পাঠিয়ে দিলেই—

গৃহকর্ত্রীর মেজাজে ছায়া বলে, না, এ রকম নোংরা অবস্থায় ও সব জিনিষ ধোপাকে দেওয়া যায় না।

সুবাস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেদিন দুপুরে বসন্তদা অফিসে যায় নি। বেলা তিনটে নাগাত ছায়াদেবী পায়ে পায়ে ওপোরে উঠে দেখলে সুবাসিনী নিজের মাদুরটিতে বসে পরণের কাপড়টা সেলাই করছে। ছায়া সুবাসের পাশেই বসে পড়ল।

এর পূর্ব্বে কোনদিনও ছায়া চিলে কোঠায় এসে এভাবে বসে নি। সুবাস একটু শঙ্কিত হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল, বসন্তদা এখন কেমন আছে?

ছায়া বলে, ভাল, ঘুমুচ্ছেন। একটু থেমে বলে, কাপড় ছিঁড়ে গেছে বুঝি?

হ্যাঁ।

একটু নীরব থেকে ছায়া বলে, আচ্ছা দিদি, তোমার বাবার বা স্বামীর বা শ্বশুরের নাম ঠিকানা বলতে পারবে কি?

কেন? সুবাস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল।

ছায়া বলে, ওঁরা বোধ হয় সকলেই এখন এদেশে চলে এসেছেন, কারণ খুলনায় এখন অবস্থাপন্ন হিন্দু আর বড় কেউ নেই। তাই নাম ঠিকানাটা পেলে আমাদের পুনর্ব্বাসন বিভাগের সাহায্যে ওদের খবর-টবর বোধহয় নেওয়া যেতে পারে।

সুবাস চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল।

তাদের দেখতে ইচ্ছে হয় না? ছায়া প্রশ্ন করলে।

নীরবে ঘাড় নেড়ে ছায়া বলেছিল, না।

কেন? এবার ছায়ার বিস্মিত হবার পালা।

সুবাসকে নীরব দেখে ছায়া বলে—বাবা অথবা স্বামীর ওপোর এত অভিমান ভাল নয় দিদি। সাময়িকভাবে ঝগড়া হলেও—

সুবাস নীরব। ছায়া বলে, আর তা ছাড়া ওঁদের যদি কোন দুঃখু অভাব থাকে তা হলে তুমি মেয়ে, তোমার ত উচিত, বসন্তদাকে বলে ওঁদের সাহায্য করা।

হাতের সেলাইটার দিকে দেখতে দেখতে সুবাস বলেছিল, বাবা সোজা বলেছে, তার মেয়ে মরে গেছে। স্বামী সংসার দিয়ে অস্বীকার করেছে। শ্বশুর নেই। তার দোকান লুঠ হবার সময় গুণ্ডারা তাকে খুন করে ফেলেছে।

কে বলে? এ খবর তোমায় কে দিলে?

তেমনই ঘাড় হেঁট অবস্থায় সুবাস বলে, বসন্তদার কাছেই শুনেছিলুম, অনেকদিন আগে। বাবা কলকাতায় এসেছিল, বসন্তদার সঙ্গে দেখাও হয়েছিল, কিন্তু বসন্তদার কাছ থেকে কোন সাহায্য না নিয়ে, এমন কি সরকারী সাহায্য পর্যন্ত কিছু না নিয়ে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না।

স্বামী? ভাই? ছায়া প্রশ্ন করেছিল।

সুবাস তেমনই ধীর কণ্ঠে বলেছিল, আপন ভাই নেই, জাঠতুত দাদা ছিল, তাকেও গুণ্ডারা দেশেই কেটে ফেলেছে, আর স্বামীর কথা লোকমুখে শুনেছি, বোধ হয় মুসলমান হয়ে ঐ দেশেই বাস করছে।

অ,—তা এ সব কবে শুনলে ভাই?

অনেকদিন আগে। বসন্তদার কাছে শুনেছি, আবার দেশের অনেকে আমার খোঁজ করে এসেছিল, তাদের কাছেও শুনেছি।

তা তোমার দেশের লোকরা এখন সব কোথায় আছে?

জানি না। তারা এসেছিল বসন্তদাকে বলে কিছু সুযোগ সুবিধে আদায় করার মতলবে। আমি বলেছিলুম, সকলের যা হবে তোমাদেরও তাই হবে, আর তা ছাড়া বসন্তদা কারুর জন্য বাড়তি কিছু করাও পছন্দ করে না। সেইজন্য তারা আমার ওপোর রেগে যা তা বলে চলে গেছে। তাদের আর কোন খবর আমি জানি না।

হতাশ হয়ে ছায়া জিজ্ঞাসা করেছিল, এ সব কবে শুনলে? তখন তুমি কোথায় থাকতে?

নারী সমিতির ঘরে। আমি ত বহুদিন ঐখানে ছিলাম কি না।

ও! ছায়া যেন একটু আশান্বিত হোল! বলে, আচ্ছা দিদি, তোমার এত গুণ, এত বুদ্ধি, তারত ছাড় আন্দোলনের সময় তুমি যা করেছ সে ত অসাধ্য সাধন, তা তুমি এভাবে এখানে মিছামিছি সময় নষ্ট করছ কেন? তুমি যদি বল, তাহলে আমি তোমাকে ঐ রকম কোন আশ্রম কিম্বা কোন রিফিউজী ক্যাম্প কিম্বা কোন গ্রাম-সেবিকার দলে, একটা বড় কোন পদ দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারি। এতেই সত্যিকার দেশের কাজ হবে। আমাদের পুনর্বাসনমন্ত্রী আমার খুব বন্ধু লোক, বসন্তদাকেও খুব শ্রদ্ধা করে, সে বলছিল, বিশ্বাসী কাজের লোকের অভাবে সরকারের অনেক চেষ্টা বানচাল হয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি এরকমধারা কোন কিছুর ভার নিয়ে—

সে আর হয় না, ছায়ার মুখের ওপোর ম্লান দৃষ্টি রেখে সুবাস বলে, যখন যা করেছি, তখন তা হয়েছে। এখন বয়সও হয়ে গেছে, আর তা ছাড়া নিজের নামটা পর্য্যন্ত লিখতে পারি না। এ যুগে আর আমায় মানবে কে?

ছায়া চুপ করে রইল। একটু পরে সুবাস বলে, দাদা বলে', গুরু বলে', দেবতা বলে' ঐ বসন্তদাকেই চিনে ছিলুম। এখন এইখানেই পড়ে থাকি, যদি কখনও কোন-দিন ওঁর কাজে লাগতে পারি, তাহলে তাই করব। না হলে এখন আর কোথায় কি কাজে লাগব বল? এই ত ধর না কেন, কাল রাত্তিরে ত দাদার একটু উপকারে এলুম। এই ঢের।

চোঁক গিলে ছায়া যেন নিজেকে সামলে নিলে। বলে, না না, তা বলছি না, দাদার কাজে তুমি ত থাকবেই। তবে অন্যদিক দিয়ে দেশের কাজ করলে যথেষ্ট উপকার হোত, আবার দাদার যখনই দরকার হোত, তখনই দাদার কাছেও এসে পড়তে পারতে।

সুবাসিনী চুপ করে রইল। তার হাতের সেলাইও

বন্ধ রইল। ইতস্তত: করে ছায়া বলে, তা বলে কি দাদাকে এ কথা বলব না কি?

সুবাস বললে, না ভাই, ওকে আর এ সব নিয়ে বিরক্ত করে কি লাভ? তবে যদি মনে কর, তাহলে আমি না হয় আমার নিজের ব্যবস্থা দেখে নিয়ে চলেই যাব।

একলা মানুষ কোথায় যাবে?

সুবাসের মুখে সেই পুরাতন ম্লান হাসি। একটু পরে বললে, যে দেশে জন্মেছিলুম, সেখানকার সব লোকের যা হয়েছে আমারও তাই হবে! মা, জেঠাই, বাপ, দাদা, সত্যই এদের তুলনায় আমি কি তিক্ত, যে আমার জন্য বড় বড় লোকদের বিরক্ত করে উঁচুদরের ব্যবস্থা কিছু করতে হবে?

ছায়া উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আবার বসে পড়ে সুবাসের কাঁধে হাত দিয়ে বললে, দিদি, তুমি কিন্তু সত্যি খুব উঁচুদরের। তুমি বল যে তুমি লেখাপড়া জান না, কিন্তু তুমি এত সব শিখলে কোথায় ভাই। অনেক শিক্ষিত লোকও এ সব বোঝে না।

ঘাড় হেঁট করে সুবাস বলেছিল, সবই বসন্তদার কাছে শিখেছি ভাই। দেশে আমাদের বাড়ীতে থাকার সময় বসন্তদার যখন খুব অসুখ হয়েছিল তখন বাবা বলেছিল, তোমার আপনার লোকদের খবর দি এবং সহর থেকে বড় ডাক্তার আনাই। বসন্তদা কি বলেছিল জান, বলেছিল, তোমরাই আমার আপনার লোক, আর সকলের অসুখে যে ডাক্তার দেখে, আমার অসুখেও সেই দেখবে।

তড়াক্ করে উঠে দাঁড়িয়ে ছায়া বলেছিল, বোধ হয় ওঁর ঘুম ভেঙেছে, অনেকক্ষণ হোল ও, বলেই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গিয়েছিল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আহ্বান

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বন্ধু, তোমার পথ বন্ধুর, কথা উঠেছে জোর,
কলঙ্কে যামিনী কুটিলা কামিনী, আঁধার অতি ঘোর।
ফুঁসিছে নাগিনী, গর্জিছে বাঘিনী, কিল্বিষমুখর রাতি—
গরজায় বাজ, হায় পথ মাঝ নিভায়ে ফেলেছে বাতি।
কোথা ধ্রুবতারা, ওগো পথহারা, কেমনে পাইবে দিক—
নদী তোলপাড়, উথাল পাথার, হাল ধরে
রেখ ঠিক্।

• • •

বন্ধ ও ধেয়ে, ছিন্ন-ভিন্ন, খণ্ড বঙ্গদেশ
পুব-পশ্চিম নাম নিয়ে শুধু, পড়ে আছে তার শেষ।
তবুও ভাবিছ আবার দাঁড়াবে, ফিরিবে আপন গেহে—
মা বলে ডাকিবে, সন্তানে মায়, জড়াইবে পুনঃ স্নেহে।
ভাইকে বলিবে, ভাইটি আমার, কোলে
টেনে নেবে বোনে—
পুরাতন কথা সৌধ্য ও গাঁথা, আবার আসিছে মনে?

• • •

আজ এই যে, এ, মহাজাতির পড়িতেছে ঘন শ্বাস
বাঁচাইবে তারে কেবা আজি বল, দিবে কেবা আশ্বাস।
পার যদি তুমি দাঁড়াও আবার, দাঁড়াও বিশ্ব মাঝে
পার যদি এস, গরিমা সে নিয়ে, এস ফিরে নব সাজে।

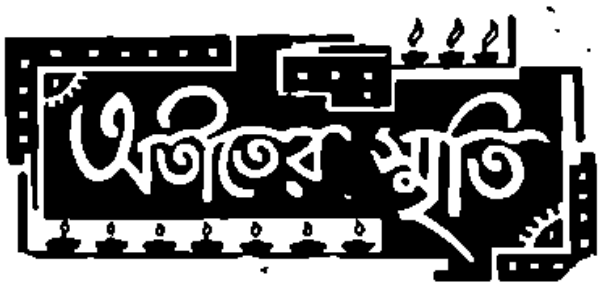

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, অন্নপ্রাশন-উপনয়ন-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মাদি এবং দুর্গোৎসব, মহরম, বেড়া-ভাসান, বড়দিন সরস্বতী-পূজো প্রভৃতি বিবিধ পালে-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে, ইংরাজ বণিক-শাসকদের হাতে-গড়া আজব-শহর কলিকাতায় দেশী-বিলাতী সমাজের বিলাসী-সৌখিন রসিক-প্রিয় অধিবাসীরা সেকালে যেভাবে অবাধ-স্ফূর্ত্তি আর উচ্ছৃঙ্খল-বেপরোয়া আমোদ-প্রমোদের নেশায় মেতে অকাতরে মুঠো-মুঠো টাকা-পয়সা উড়িয়ে জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সবাই একজোটে মিলে-মিশে রীতিমত ধুমধাম-আড়ম্বরে ও উদ্দাম হৈ-হুল্লোড়-বেলেল্লাপণার দোরগোল-হাপটে তাঁদের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানগুলিকে সরগরম করে তুলতেন তেমনি বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রাচুর্য্যের দেখা যেতো—তখনকার আমলের স্নানযাত্রা, রাসলীলা, চড়ক-পূজো প্রভৃতি বিভিন্ন পর্ব্বোৎসব প্রতিপালনের সময়েও। একালের মতো সেকালেও, কোম্পানীর প্রধান বাণিজ্য-উপনিবেশ আর ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠে গঙ্গা বা ভাগীরথী-নদীর পশ্চিম-উপকূলে সুসমৃদ্ধ-পল্লীনগরী শ্রীরামপুরের সন্নিকটে জনবহুল মাহেশ-গ্রামাঞ্চলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর রথ ও স্নানযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতি বছরই রীতিমত ধুমধাম-সমারোহ হতো। তখনকার আমলের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদের কাছে মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ছিল বিশিষ্ট একটি তীর্থস্থান এবং সেজন্য এখানে নিত্যই জনসমাগমও হতো প্রচুর। তবে সচরাচর দুনিয়ার সকল তীর্থস্থানেই যেমন দেখা যায়, এক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটতো না এতটুকু। অর্থাৎ, মাহেশের পুণ্য-পীঠস্থানে-সমাগত আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যে প্রকৃত দেবদর্শনাভিলাষী-ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত ছিলেন তাই নয়, বরং তাঁদের এই প্রবল-ধর্ম্মোন্মাদনা আর তীর্থ-দেবদর্শনের দুর্ব্বার-দুর্ব্বলতার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে বর্ণচোরা-স্বার্থান্বেষী বহু অনাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, দুষ্কৃতিপরায়ণ, অর্থলোলুপ কৌতুক-প্রিয় বিলাসী-সৌখিন অভিযাত্রী এসে নিজেদের ভীড় জমিয়ে তুলতেন—এই সব সার্ব্বজনীন-মহোৎসবের লীলা-ক্ষেত্রে। সেকালে রথ ও স্নানযাত্রার সময়ে মাহেশে কি ধরণের উৎসব সমারোহ আর বিপুল জনসমাগম হতো, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী কালী-প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' গ্রন্থে তার সুস্পষ্ট-নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। একালের অনুপস্থিৎসু-পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহল-নিবারণের উদ্দেশ্যে, আপাততঃ সেকালের সে সব কীর্ত্তিকলাপের বিচিত্র তথ্য-বিবরণের কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

* * *

(৺কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

* * * ক্রমে স্নানযাত্রা এসে পড়লো। স্নানযাত্রাটি পরবের টেক্কা, তাতে আমোদের চূড়ান্ত হয়ে থাকে,

সুতরাং স্নানযাত্রা উপলক্ষে গুরুদাস বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মাথা খাওয়ারও অবকাশ রইল না; ক্রমে আরো পাঁচ ইয়ার জুটে গ্যালো। স্নানযাত্রায় কি রকম আমোদ হবে, তারি তদ্বির পরামর্শ হতে লাগ্‌লো; * * * সম্বৎসরের আমোদটি বন্ধ করা কোন ক্রমেই হতে পারে না বলেই নিতান্ত গরিবে থেকেও গুরুদাসকে স্নানযাত্রার খাবার আয়োজন করতে হয়!

এদিকে পাঁচ ইয়ারের পরামর্শে সকল রকম জিনিষের আয়োজন হতে লাগ্‌লো—গোপাল দৌড়ে গিয়ে একখানি বজরা ভাড়া করে এলেন। নবীন আতুরী, আনিস, রঘু ও পাঁচার ভার নিলেন। ব্রজ ফুলুরি ও বেগুনভাজার বায়না দিয়ে এলেন—গোলাবি খিলির দোনা, মোম বাতি ও মিঠে কড়া তামাক ও আর আর জিনিষপত্র গুরুদাস স্বয়ং সংগ্রহ করে রাখলেন। কাল রাত্তিরের জোয়ারে নৌকোয় ওঠা হবে স্থির হলো।

পূর্ব্বে স্নানযাত্রার বড় ধুম ছিল—বড় বড় বাবুরা সিমেন কলের জাহাজ বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচখ্যালা হতো, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যাম্‌টা ও বাইয়ের হাট লেগে যেতো! কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুতর, কামারি, কামার ও গন্ধবেণে মশাইরাই যা রেখেছেন, মধ্যে মধ্যে দু চার জন ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন কোন ছোকরা গোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রার আমোদ করেন বটে।

ক্রমে সে দিনটি দেখতে দেখতে গ্যালো। ভোর না হতে হতেই গুরুদাসের ইয়ারেরা সেজে গুজে তৈরি হয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। গোপাল এক জোড়া লাল রঙের এইকীং (মোজা) পায়ে দিয়েছিলেন, পেতলের বড় বড় বোতাম দেওয়া সবুজ রঙের একটি কতুই ও গুলবাহার চাকাই উড়ুনি তাঁর গায়ে ছিল, আর একটি বিলিতী পেতলের পিন আঁটিও আঙ্গুলে পরেছিলেন—কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিনতে পারেন নাই বলেই খুব পায়ে আসা হয়। নবীনের ফুলদার চাকাই চাদরখানি বহুকাল ধোপার বাড়ি যায় নি, তাতেই যা একটু ময়লা ময়লা বোধ হচ্ছিল, নতুবা তাঁর চায় আঙ্গুল চ্যাটালো কালাপেড়ে ধোপদস্ত ধুতিখানি সেই দিন মাত্র পাটভাঙ্গা হয়েছিল—মেরজাইটিও বিলক্ষণ ধোপো ছিল। ব্রজর সম্প্রতি ইংরাজি কর্ম্ম হয়েচে, বয়সও অল্প, সুতরাং আজো ভালো কাপড় চোপড় করে উঠতে পারেন নি, কেবল গত বৎসর পূজোর সময় তাঁর আই ন সিকে দিয়ে যে ধুতি চাদর কিনে ছাঁট তাই পরে এসেছিলেন, সেগুলি আজো কোরা থাকায় তাঁরে দেখতে বড় মন্দ দেখায় নি। * * *

* * * পূর্ব্বে স্থির হয়েছিল, রাত্তিরের জোয়ারেই যাওয়া হবে, কিন্তু স্নানযাত্রাটি যে রকম আমোদের পরব, তাতে রাত্তিরের জোয়ারে গেলে স্নানযাত্রার দিন বেলা দুপুরের পর মাহেশ পৌঁছুতে হয়, সুতরাং দিনের জোয়ারে যাওয়াই স্থির হলো।

এদিকে গির্জ্জের ঘড়িতে টুং টাং, টুং টাং করে দশটা বেজে গ্যালো। নবীন, ব্রজ, গোপাল ও গুরুদাস খেয়ে দেয়ে পানতামাক খেয়ে, তোবড়া-তুবড়ি নিয়ে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বেরুলেন। তাঁর মা একখানি পাখা ও দুটি ঘামি কিনে আনতে বলেন, তাঁর স্ত্রী পূর্ব্বের রাত্তিরে একটি চিত্তির করা হাঁড়ি ঘুনসি ও গুরিয়া পুতুল আন্‌তে বলেছিল, আর তাঁর বিধবা পিসির জন্য একটি খাজা কোয়াওলা ভাল কাঁঠাল, কানাইবাঁশী কলা ও কুলী বেগুন আন্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

গুরুদাসের পোষাকটিও নিতান্ত মন্দ হয় নি, তিনি একখানি সরেস গুলবাহার উড়ুনি গায়ে দিয়েছিলেন, উড়ুনিখানি চল্লিশ টাকার কম নয়—কেবল কাটের কুচো বাধবার দরুন চার পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচে গেছলো—তাঁর গায়ে একটি লাল বিলিতী চাকা প্যাটনের পিরান ছিল, তার ওপর বুল্‌ রঙের একটি হাপ চায়নাকোট—তিনি "বেঁচে থাকুক বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে" পেড়ে এক শান্তিপুরে কয়েদে ধুতি পরেছিলেন, জুতো জোড়াটিতেও রূপোর বকলস দেওয়া ছিল।

ক্রমে গুরুদাস ও ইয়ারেরা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে পৌঁছিলেন। সেখায় কেদার অগ, হরি ও নারাণ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল; তখন সকলে একত্র হয়ে বজরায় উঠলেন। মাজিরা গুটকী মাছ, লঙ্কা ও কড়ায়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতে বসেছিল। জোয়ারও আসে নাই; সুতরাং কিছু ক্ষণ নৌকো খুলে দেওয়া বন্ধ রইলো।

কিন্তু পাঁচো ইয়ার নৌকায় উঠেই আমোদ জুড়ে

দিলেন। গোপাল সন্তর্পণে জবাবির চৌপদের পোষাক ছিপিটি খুলে ফেল্লেন। ব্রজ এক ছিলিম গাঁজা তৈরি করে বস্‌লেন—আতুরী ও জবাবিরা চলতে সুরু হলো। ফুলুরি ও বেশুনভাজীরা সে কালের সতী স্ত্রীর মত আতুরী দের সহগমন কত্তে লাগলেন—মেজাজ গরম হয়ে উঠলো একদিকে নারাণ ও কেদার বাঁধার সঙ্গতে—

"হেসে খেলে নেও রে যাদু মনের সুখে।
কে কবে, যাবে সিঙ্গে ফুঁকে।
তখন কোথা রবে বাড়ি, কোথা রবে ছুড়ি,
তোমার কোথা রবে ঘড়ি, কে তায় টাঁকে।
তখন জুড়ো ছেলে দেবে ও চাঁদমুখে।"

গান জুড়ে দিলেন—ব্রজ গাঁজায় দম মেরে আড়ষ্ট হয়ে জোনাকি পোকা দেখতে লাগলেন, গোপাল ও গুরুদাসের স্ফূর্ত্তি ধাথে কে।

এদিকে সহরেও স্নানযাত্রার যাত্রীদের ভারী ধুম পড়ে গ্যাচে। বুড়ি বুড়ি মাগী, কলাবউয়ের মত আধ হাত ঘোমটা দেওয়া খুদে খুদে কনে বউ ও বুকের কাপড় খোলা হাঁ করা ছুঁড়ীরা রাস্তা জুড়ে স্নানযাত্রা দেখতে চলেচে; এমন কি রাস্তায় গাড়ি পাল্‌কি চলা ভার, আজ সহরে কেরাঞ্চী গাড়ির ঘোড়ায় কত ভার টানতে পারে, তার বিবেচনা হবে না, গাড়ির ভেতর ও পেছনে কত তাংড়াতে পারে, তারই তক্‌রার হচ্ছে এক একখানি গাড়ির ভেতর দশ জন, ছাতে দু জন, পেছনে একজন ও কোচবাক্সে দু জন একুনে পোনের জন, এ সওয়ায় তিনটি করে আঁতুড়ে ছেলে ফাও। গেরস্তর মেয়েরাও বড় ভাই, শ্বশুর, ভাতার, ভাদ্দরবউ ও শাশুড়ীতে একত্র হয়ে গ্যাচেন। জগন্নাথের কল্যাণে মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দাবন—অনেকেই কেষ্ট সাজবেন!

গঙ্গারও আজ চূড়ান্ত বাহার; বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজ্‌গিজ্ কচ্চে, সকলগুলি থেকেই মাতলামো রং, হাসি ও ইয়ারকির গর্‌রা উঠ্‌চে। কোনটিতে খ্যামটা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন; মধ্যে চাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের মত ও তেলের কুপোর মত শরীর। দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলি ও কোমরে গোট, ফিন্‌ফিনে

পরীর পট

(প্রাচীন কালিঘাটের পট-চিত্রের প্রতিলিপি অবলম্বনে)

ধুতি পরা ও শৈতের গোচ্চা গলায়—মৈমনসিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার সরকারী দাদা ও পাতান জাকাতের সঙ্গে খোকা সেজে জাকামি কচ্চেন; বয়েস ষাট পেরিয়েচে, অথচ "রামকে" 'আম' "দাদাকে" ও "কাকা"কে 'কাঁকা' বলেন—এঁরাই কেউ কেউ রঙ্গপুর অঞ্চলে 'বিদ্যোৎসাহী' কর্‌লান, কিন্তু চক্র করে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও বাগা চারটে অবধি পুজো করেন। অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে সূর্য্যোদয় দেখেচেন কিনা সন্দেহ!

কোন পিনেসে এক দল সহরে নবা বাবুর দল চলেচেন, ইংরাজি ইস্পিচে লিড্‌নি মরের শ্রাদ্ধ হচ্চে, গাওনার সুরে জলও জমে যাচ্চে।

কোন পান্‌সিখানিতে এক জন তিনকাকুনে নবশাখ-

বাবু মোসাহেব ও মেয়েমানুষের অভাবে শিবতো ভাই, তারে ও ছোট ভাইটিকে নিয়ে চলেছেন—বাঈ নাই, গোলাবী খিলি নাই, এমন কি, একটা খেলো হুঁকোরও অপ্রতুল—তবু এমনি খোস্‌মেজাজ, এমনি সক যে, পানসির পাটাতনের তক্তা বাজিয়ে গুন গুন করে গাইতে গাইতে চলেছেন, যেমন করে হোক কায়ক্লেশে শুদ্ধ হওয়াটা চাই।

এদিকে আমাদের নায়ক গুরুদাসবাবুর বজরায় মাজিদের খাওয়া দাওয়া হয়েচে; দুপুরের নমাজ পড়েই বজরা খুলে দেবে, এমন সময় গোপাল গুরুদাসকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "ভাখ্ ভাই গুরুদাস! আমাদের আমোদের চূড়ান্ত হয়েচে, কিন্তু একটার অন্তে বড় ফাঁক ফাঁক ঠাওরাচ্চে; সবই হয়েচে, কেবল মেয়েমানুষ না হলে তো স্নানযাত্রায় আমোদ হয় না! যা বল, যা কও"—অমনি কেদার "ঠিক বলেছ বাপ!" বলে কথার খি ধরে নিলেন; অমনি নারাণ বলে উঠলেন, "বাবা, যে নৌকোখানায় তাকাই, সবগুলি খাল ভ.া, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরিবিলি! আমরা যেন বাবার পিণ্ডি দিয়ে গয়া কাশী যাচ্চি।"

গুরুদাসের মেজাজ আলি হয়ে গ্যাচে, সুতরাং "বাবা ঠিক বলেচ। আমিও তাই ভাব্‌ছিলেম; ভাই! যত টাকা লাগে, তোমরা ভাই কব্‌লে একটা মেয়েমানুষ নে এসো, আমি বাবা তাতে পেচ্‌পাও নই, গুরুদাসের সাদা প্রাণ!" এই কথা বল্‌তে না বল্‌তেই নারাণ, গোপাল, হরি ও ব্রজ নেচে উঠ্‌লেন ও মাজিদের নৌকো খুল্‌তে মানা করে দিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন।

এদিকে গুরুদাস, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা চীৎকার করে—

"যাবি যাবি যমুনা পারে ও রঙ্গিনী।
কত দেখ্‌বি মজা ত্রিবেণীর ঘাটে নামা বামা ঝোকানী।
তিনে দেবো মাতা ঘষা, বারুইপুরে ঘুনসি খাসা,
উভয়ের পু-রাবি আশা, ও সোনামণি॥"

গান ধরেচেন, এমন সময় মেকিন্টশ বর্ন্ কোম্পানির ইয়ার্ডের ছুতরেরা এক বোট ভাড়া করে রাঁড় নিয়ে আমোদ কত্তে কত্তে যাচ্ছিল; তারা গুরুদাসকে চিনতে পেরে তাদের নৌকো থেকে—

"চুপে থাক্ থাক্ থাক্ রে ব্যাটা কানায়ে তারে।
গরু চরাস্ লাঙ্গল ধরিস্, এতে তোর ম্যাতো মনে॥"

গাইতে গাইতে হুহুরে ও হরিবোল দিয়ে সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গ্যালো; গুরুদাসেরাও দুইও ও হাততালি দিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর নৌকায় মেয়েমানুষ না থাকাতে সেটি কেমন ফাঁক ফাঁক বোধ হতে লাগলো! এদিকে বোটওয়ালারাও চেপে দুইও ও হাততালি দিয়ে তাঁরে যথার্থই অপ্রস্তুত করে দে গ্যালো।

গুরুদাস নেশাতেও বিলক্ষণ পেকে উঠেছিলেন, সুতরাং ওরা ঠাট্টা করে আগে বেরিয়ে গ্যালো, ইটি তিনি বরদাস্ত কত্তে পাল্লেন না। শেষে বিরক্ত হয়ে ইয়ারদের অপেক্ষা না করে টল্‌তে টল্‌তে আপনিই মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা—

"আয় আয় মকর গঙ্গাজল।
কাল গোলাপের বিয়ে হবে সৈতে যাবো জল।
গোলাপ ফুলের হাতটি ধরে, চলে যাবো সোহাগ করে,
ঘোম্‌টার ভিতর খ্যাম্‌টা নেচে ঝম্‌কমাবে মল॥"

গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

ঘণ্টাখানেক হলো গুরুদাস নৌকা হতে গ্যাচেন, এমন সময় ব্রজ ও গোপাল ফিরে এলেন। তাঁরা সারা সহরটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেচেন, কিন্তু কোথাও এক জন মেয়েমানুষ পেলেন না; তাঁদের জানত ও সহরের ছুটো গোছের বাছতে বাকী করেন নাই। কেদার এই খবর শুনে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, * * * ও অত্যন্ত দুঃখে এই গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

হৃৎপিঞ্জরের পাখী উড়ে এলো কার।
ত্বরা করে ধর্ গো সখি দিয়ে পীরিতের আধার।
কোন্ কামিনীর পোষা পাখী, কাহারে দিয়েছে ফাঁকি,
উড়ে এলো দাঁড় ছেড়ে শিকলিকাটা ধরা তার॥

এমন সময় গুরুদাসও এসে পড়লেন—গুরুদাস মনে করেছিলেন যে, যদি তিনিই কোন মেয়েমানুষের সন্ধান নাই পেলেন—তাঁর ইয়ারেরা একটা না একটাকে অবশ্যই জুটিয়ে থাকবে। এদিকে তাঁর ইয়ারেরা মনে করেছিলেন, যদিও তাঁরাই কোন মেয়েমানুষের সন্ধান কত্তে পারেন না, গুরু-

একাসনে

ফটো : শীধর ১৮

দোসর

প্রচ্ছদ : রথীন চক্রবর্তী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ধানবাবু আর ছেড়ে আসবেন না। এদিকে গুরুদাস নৌকোয় এসেই মেয়েমানুষ না দেখতে পেয়ে মহাদুঃখিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু নেশার এমনি অনির্বচনীয় ক্ষমতা যে, তাতেও তিনি উৎসাহহীন হলেন না; গুরুদাস পুনরায় ইয়ারদের স্তোক দিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন।

* * * *

গুরুদাস পুনরায় সহরটি প্রদক্ষিণ করেন—সিঁদুরেপটী, শোভাবাজারের ও বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীতলাটাও দেখে গ্যালেন, কিন্তু কোনখানেই সংগ্রহ কত্তে পারেন না—শেষে আপনার বাড়িতে ফিরে গ্যালেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলেচি যে, গুরুদাসের এক বিধবা পিসি ছিল। গুরুদাস বাড়ি গিয়ে তাঁর সেই পিসিকে বল্লেন যে, "পিসি! আমাদের একটি কথা রাখতে হবে।" তাঁর পিসি বল্লেন, "বাপু গুরুদাস! কি কথা রাখ্‌তে হবে। তুমি একটা কথা বল্লে আমরা কি রাখবো না! আগে বল দেখি কি কথা?" গুরুদাস বল্লেন, "পিসি, যদি তুমি আমাদের সঙ্গে স্নানযাত্রা দেখ্‌তে যাও, তা হলে বড় ভাল হয়। দেখ পিসি, সকলেরই একটি দুটি মেয়েমানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্চে, কিন্তু পিসি আমাদের একটিও মেয়েমানুষ জুটে উঠে নাই—দেখ পিসি যদিই বা কেমন করে যাওয়া হয়, আমার নিজের জন্য যেন না হলো, কিন্তু পাঁচো ইয়ারের মুখ নিরিমিষ্যি রকমে যেতে মন সচ্চে না তা পিসি আহ্লাদ কত্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কার সাধ্যি তোমারে কেউ কিছু বলে।" পিসি এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে গাঁই গুঁই কত্তে লাগলেন, কিন্তু মনে মনে যাবার ইচ্ছাটাও ছিল, সুতরাং শেষে গুরুদাস ও ইয়ারদের নিতান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে ভাই-পোর সঙ্গে স্নানযাত্রায় গ্যালেন।

ক্রমে পিসিকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদাস ঘাটে এসে পৌঁছিলেন; নৌকার ইয়াররা গুরুদাসকে মেয়েমানুষ নিয়ে আস্‌তে দেখে হুর্‌রে ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বাহবা হামাহার ধ্বনি কত্তে লাগলো। শেষে সকলে নৌকায় উঠেই নৌকো খুলে দিলেন। দাঁড়িরা কসে ঝপাঝপ্ ঝপাঝপ্ করে দাঁড় বাইতে লাগলো, মাজি হাল বাগিয়ে ধরে সজোরে খেয়ার কিঁকে মাত্তে লাগলো। গুরুদাস ও সমস্ত ইয়ারে—

"ভাসিয়ে প্রেমতরী হরি যাচ্চে যমুনায়
গোপীর কূলে থাকা হোল দায়।
আরে ও! কদম্বতলায় বসি বাঁকা বাঁশরী বাজায়,
আর মুড়কে হেঁসে নয়নঠারে কুলের বউ ভুলায়।
হরুর্ হো! হো! হো!"

গাইতে লাগলেন, দেখতে দেখতে নৌকোখানি তীরের মত বেরিয়ে গ্যালো।

বড় বড় যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আজ দুপুরের জোয়ারে নৌকো ছেড়েচেন। এদিকে জোয়ারও ঘরে ঘরে এলো, ভাঁটার সারানী পড়লো—নোঙ্গর করা ও পোঁটায় বাঁধা নৌকোগুলির পাছা ফিরে গ্যালো—ছেলেরা ডিঙ্গি চড়ে বেউতি জাল তুলতে আরম্ভ কল্লে, সুতরাং যিনি যে অবধি গ্যাচেন, তাঁরে সেইখানেই নোঙ্গর কত্তে হলো—তিলকাঞ্চনে বাবুদের পানসি, ডিঙ্গি, ভাউলে, বজরা ও বোট বাজারে পোই জায়গায় ভিড়োনো হলো—গয়নার যাত্রীরা কিনেরার পাশে পাশে লগি মেরে চল্লেন। পেনেটি কামারহাটি কিম্বা খড়দয়ে জলপান করে খেয়া দিয়ে মাহেশ পৌঁছুলেন!

ক্রমে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, অভিসারিণী সন্ধ্যা অন্ধকারের অনুসরণে বেরুলেন, * * * নোঙ্গর করা ও কিনারার নৌকোগুলিতে গঙ্গাও কথনাতীত শোভা পেতে লাগলেন, * * * কোনখানে বালির খালের নীচে একখানি পিনাস নোঙ্গর করে বসেচেন—রকমারি বেরঙ্গ চলচে, গঙ্গার চমৎকার শোভায় মৃদু মৃদু হাওয়াতে ও ঢেউয়ের ঈষৎ দোলায়। কারু কারু শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে, কেউ বা ভাবে মজে পূরবী রাগিণীতে—

"যে যাবার সে যাক্ সখি আমি তো যাবো জলে।
যাইতে যমুনাজলে, সে কালা কদম্বতলে,
আঁখি ঠেরে আমায় বলে, ধলা দে রাই
আমার গলে!"

গান ধরেচেন, কোনখানে এইমাত্র একখানি বোট নোঙ্গর কল্লে—বাবু ছাতে উঠলেন, অমনি আর আর সঙ্গীরাও পেছনে পেছনে চল্লো; একজন মোসাহেব মাজিদের জিজ্ঞাসা করেন, "চাচা! এ ঘাটটার নাম কি?" অমনি বোটের মাজি হুজুরে সেলাম ঠুকে "আইগে কাশীপুর কর্ত্তা! এই রতন বাবুর ঘাট" বলে বকসিসের

উপক্রমিকা করে রাখলে। বাবুর দল ঘাট শুনে হাঁ করে দেখতে লাগলেন; ঘাটে অনেক বউ ঝি গা ধুচ্ছিলো, বাবুদের চাওনি, হাসি ও রসিকতায় ভয় ও লজ্জায় জড়সড় হলো, দু' একটা পেত্নে মানষেরও পরিচয় জানাতে ত্রুটি করে না—মোসাহেব দলে মাধেন্দ্র ঘোষ উপস্থিত; বাবুর প্রধান ইয়ার রাগ ভেঁজে—

অনুগত আশ্রিত তোমার।
রেখো যে মিনতি আমার॥
অন্য কথা হলে, যাচিতাম পলালে,
এ কথা না মলে, পরিশোধ নাই।
অতএব হার, ভার তোমার,
দেখো যে করো নাকো অবিচার॥

গান জুড়ে দিলেন—সন্ধ্যা আহ্নিকওয়ালা বুড়ো বুড়ো ঝিনুষেরা ফুদে ফুদে ছেলে, নিছর্মা মাগীরা ঘাটের উপর খাতা রেঁধে দাঁড়িয়ে গ্যালো; বাবুরাও উৎসাহ পেয়ে সকলে মিলে গাইতে লাগলেন—মড়া খেকো কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠলো, চরন্তী শোয়ারগুলো মহলা ফেলে ভয়ে ভোঁৎ ভোঁৎ করে খোঁয়াড়ে পালিয়ে গ্যালো।

কোন বাবুর বজরা বরানগরে পাটের কলের সামনেই নোঙ্গর করা হয়েছে, গাঁয়ের বওয়াটে ছেলেরা বাবুদের রঙ্গ ও সঙ্গের মেয়েমানুষ দেখে ছোট ছোট নুড়ি পাথর, কাদা ও মাটির চাপ ছুড়ে আমোদ কত্তে লাগলো, সুতরাং সে ধারের খড়খড়েগুলো বন্ধ করতে হলো—আরো বা কি হয়!

কোন বাবুর ভাউলেখানি রাসমণির নবরত্নের সামনে নোঙ্গর করেছে, ভেতরের মেয়েমানুষরা উঁকি মেরে নবরত্ন দেখে নিচ্চে।

আমাদের নায়ক বাবু গুরুদাস বাগবাজারের গোলের আশেপাশেই আছেন; তাঁদের বাঁয়ার এখনো আওয়াজ শুনা যাচ্চে, আতুরী ও আনীসদের বেশীর ভাগ আনা-গোনা হচ্চে—আনীস ও রমেদের মধ্যে যাঁরা গেছলেন, তাঁরাই ডুবো হয়ে বেরিয়ে আসচেন—ফুলুরি ও গোলাপী বিলিয়ে দেবতাদের মত বর দিয়ে অন্তর্ধান হয়েচেন, কার কার তপস্যার ফললাভও হয়েচে—স্নেহময়ী পিসী আঁচল দিয়ে বাতাস কচ্চেন, নৌকোখানি অন্ধকার।

এমন সময় ঝম্ ঝম্ করে হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি এলো, একটা গোলমেলে হাওয়া উঠলো, নৌকোর পাল্কাগুলি দুলতে লাগলো—মাজিরা পাল ও চট মাথায় দিয়ে বৃষ্টি নিবারণ কত্তে লাগলো, রাত্তির প্রায় দুপুর!

সুখের রাত্তির দেখতে দেখতেই যায়—* * * পূর্ব্ব দিক ফরসা হয়ে এলো, "জোয়ার আইচে" বলে মাজিরা নৌকো খুলে দিলে—ক্রমে সকল নৌকোর সার বেঁধে মাহেশ ও বল্লভপুরে চল্লো। সকলখানিই এখনো রং পোরা, কোন কোনখানিতে গলাভাঙ্গা সুরে—

"এখনও রজনী আছে বল কোথা যাবে রে প্রাণ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর হোক নিশি অবসান॥
যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত,
কুমুদী মুদিত হতো, শশী যেতো নিজ স্থান॥"

শোনা যাচ্চে। কোনখানি কফিনের মত নিঃশব্দ—কোন-খানিতে কান্নার শব্দ—কোথাও নেশায় গোঁ গোঁ ধ্বনি।

যাত্রীদের নৌকো চল্লো, জোয়ারও থেকে এলো, মাঝারা তাল ফেলতে আরম্ভ করে—কিনারায় সহরের বড়মানুষের ছেলেদের টুকপি ধোপার গাধা দেখা দিলে। ভট্টাচায্যিরা প্রাতঃস্নান কত্তে লাগলেন, মাগী ও ঝিনুষেরা লজ্জা মাথায় করে কাপড় তুলে * * * বসেচে, তরকারির বাজরা সমেত হেটোরা বদ্দিবাটী ও শ্রীরামপুরে চলো, আড়খেয়ার পাটুনীরে সিকি ও আধ পয়সার পার কত্তে লাগলো, বদর ও হকর গাজীর ফকিরেরা ভিক্ষের চড়ে ভিক্ষে আরম্ভ কল্লে * * *

যে সকল বাবুদের খড়দ, পেনেটি, আগড়পাড়া, কাঁকুড়-হাটী প্রভৃতি গঙ্গাতীর অঞ্চলে বাগান আছে, আজ তাঁদেরো ভারী ধুম, অনেক জায়গায় কাল শনিবার ফলে গ্যাচে, কোথাও আজ শনিবার, কাল কফিনই জমাট বন্দোবস্ত—আয়েস ও চোহেলের দ্বন্দ! বাগানওয়ালা বাবুদের মধ্যে কার কার বাচ খ্যালাবার জন্য পান্সি তৈরি, হাজার টাকার বাচ হবে, এক মাস ধরে নৌকোর গতি বাড়াবার জন্য তলায় চরবি ঘষা হচ্চে ও মাজিদের লাল উর্দ্দি ও আঙ-রেক্কার বাদশাই নিশেন সংগ্রহ হয়েচে—গ্রামের ইয়ার দল, খড়দর বাবুরা ও আর আর ভদ্রলোক মধ্যস্থ! বোধ হয় বাণী মহিন্দর নফর—চীনেবাজারের ক্যাবিনেট মেকর—ভারি মৌখিন—সখের সাগর বল্লেই হয়!

এদিকে কোন কোন যাত্রী মাথেশ পৌঁছলেন, কেউ কেউ নৌকোতেই রইলেন, দুই এক জন ওপরে উঠলেন—ঘাটে লোকারণ্য, বেদিমণ্ড হতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত লোকের ঠেল মেরেচে ; এর ভেতরেই নানা প্রকার দোকান বসে গ্যাচে, ভিক্ষিরীরা কাপড় পেতে বসে ভিক্ষে কচ্চে, গায়েনরা গাচ্চে, আনন্দলহরী একতারা, খঞ্জনী ও বাঁয়া নিয়ে বষ্টুমরা বিলক্ষণ পয়সা কুড়ুচ্চে। লোকের চম্‌রা ঘাটের ধুলো ও রোদের তাত একত্র হয়ে একটি চমৎকার মেওয়া প্রস্তুত হয়েচে ; অনেকে তাই দিল্লীর লাড্ডুর স্বাদে সাধ করে সেবা কচ্চেন।

ক্রমে বেলা দুই প্রহর বেজে গ্যালো। সূর্য্যের উত্তাপে মাথা পুড়ে যাচ্চে ; গামছা, রুমাল, চাদর ও ছাতি ভিজিয়েও পার পাচ্চে না। ০ ০ ০

ক্রমে বেলা প্রায় একটা বেজে গ্যালো। জগন্নাথের আর স্নান হয় না—দশ আনীর জমীদার "মহাপয়" বাবুরা না এলে জগন্নাথের স্নান হবে না। কিন্তু পচা আদা কালে তরা, তাঁদের আর আসা হয় না. ক্রমে যাত্রীরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো, আশ পাশের গাছতলা, আমবাগান ও দাওয়া দরজা লোকে ভরে গ্যালো, অনেকের সর্দ্দিগর্ম্মি উপস্থিত, কেউ কেউ শিঙ্গে ফুক্‌লেন, অনেকেই ধুতরো ফুল দেখতে লাগলো। ভাব ও তরমুজে রণক্ষেত্র হয়ে গ্যালো লোকের ব্যয় দ্বিগুণ বেড়ে উঠলো, সকলেই অস্থির। এমন সময় শোনা গ্যালো, বাবুরা এসেচেন। অমনি জগন্নাথের মাথায় কলসী করে জল ঢালা হলো, যাত্রীরাও চরিতার্থ হলেন! চিড়ে, দই, মুড়ি, মুড়কি, চাটিম কলা বেদার উঠতে লাগলো ; খোস্ পোষাকী বাবুরা খাওয়া দাওয়া কল্লেন। অনেকের আমোদেই পেট ভরে গ্যাচে, সুতরাং খাওয়া দাওয়া আবশ্যক হলো না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনটে, শেষে চারটে বেজে গ্যালো! বাচখ্যালা আরম্ভ হলো—কার নৌকা আগে গিয়ে নিশেন নেয়, এরি তামাসা দ্যাখার জন্য সকল নৌকোই খুলে দেওয়া হলো, অবশ্যই এক দল জিতলেন ; সকলে জুটে হাততালি ও জিতের বাহবা দিলেন, স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো। সকলে বাড়িমুখো হলেন, যত বাড়ি কাছে হতে লাগলো তত্তই সম্বিবোধ হতে লাগলো। শেষে কাশীপুরের চিনির কল, বালির ব্রিজ, কেউ পার হয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে উঠলেন, কেউ বাগবাজার ও সাইরিটোলার ঘাটে নাবলেন। সকলেরই বিষণ্ণ বদন—ম্লান মুখ ; অনেককেই ধরে তুলতে হলো ; শেষ চার পাঁচ দিনের পর আমোদের নাগাড় মরে—ফিরতি গোলের দরুন আমরা গুরুদাস বাবুর নৌকোখানা বেছে নিতে পারেম না।

* * [ক্রমশঃ

সাহিত্য সংবাদ

পশ্চিম বায়ুর উদ্দেশ্যে

—আদিত্য

[P. B, Shelleyর 'Ode to the West wind'এর ভাবানুবাদ]

(১)

মৃতপত্রগুলি—
যেন সবে অপ্সরীরা প্রায়,
ভয়ে উঠে দুলি'
পশ্চিম-বাতাস ওরা—তাহার ভয়েতে,
সব দূরে ধায়।
হে পশ্চিম বায়ু!
যেন তার নিঃশেষিত আয়ু
সেই বীজ মাটির কবরে
মনে হয় হিমপূর্ণ ঘরে
কাটায় সে কাল,
মন্দ তার ভাল্।
জেনো শুধু তোমার শাসনে
তাঁর অন্তর কেঁপে ওঠে ভয়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কিন্তু অবশেষে—
তব ভগ্নী বসন্ত গো—আসে মৃদু হেসে,
তার আগমনে,
আনন্দের সাড়া জাগে, প্রান্তরে
ও বনে।
আমি জানি পাঠায়েছ তাঁরে,
তাই বারে বারে
যদি আজি হে বিদ্রোহী—
শোন আজি শোনো—
শুনিবে কি হায়?

(২)

মুমূর্ষু সে পত্রপুঞ্জ মত
বর্ষণের, অশনির অপ্সরীরা যত
ঝরে-পরে তোমার'পরেতে—
যৌবন দেবেরে যেন পূজিত আসিয়া
ঝড়ের অলকা আজি উঠে উচ্ছ্বসিয়া,
তোমার ভয়েতে।
পশ্চিম বাতাস তুমি শোকের সঙ্গীত
এই বরষের!
এ নিশার নভঃ আজি সমাধি গম্বুজ
পশ্চিম বায়ের।
বৎসরের শেষ দিনে, ও গগন হ'তে
ঝরিয়া পড়িবে, কালো বৃষ্টি, অগ্নি, শিলা,
যেন এক স্রোতে।
শোনো ওগো শোনো কথা হে পশ্চিম বায়!

(৩)

ভূমধ্য সাগর যবে তন্দ্রামগ্ন হ'য়ে—
স্বপ্নে দেখে অতি পুরাতন প্রাসাদেরে,
শুধু তোমা তরে,
স্বপ্ন টুটে আজি তাঁর—তন্দ্রা যায় ছেড়ে।
সুগভীর পারাবার তোমার গর্জ্জনে—
পথ করে দেয় দেখো কত ভয় মনে,
সমুদ্রের পুষ্পবৃক্ষ তব কণ্ঠস্বরে,
আত্ম-সমর্পণ করে—বলে 'নাও ধরে'।

তুমি মহা শক্তিমান হে পশ্চিম বায়ু—
শোনো ওগো শোনো ॥
(৩)
শৈশবের চঞ্চলতা—জাগে মোর মনে,
জানিতাম—তবে ওগো তুমি মোর সনে,—
পারিবেনা আঁটিয়া উঠিতে—
পারিবেনা মোরপ্রাণ লুটিতে,
আজ মোর সেই দর্প নাই,—
আমি শুধু চাই—
তোমার সামান্য শক্তি—হে পশ্চিম বায়ু।
আজি হ'লে মৃতপত্র-সম
কিম্বা ঐ কৃষ্ণ জলধর,
বহন করিতে তুমি, কোন চিন্তা ছিলনা গো মম,
জানি আমি পাব'না এ বর।
হে পশ্চিম বায়ু দেখ—আজি ঢেউ হ'লে—
তোমার বেগেতে ব্যথা পাই পলে পলে,
হায় জানি হ'বে না'ত তাহা
তার চেয়ে শক্তি দাও—আমি চাই যাহা
হে পশ্চিম বায়ু—
শোনো তুমি শোনো !!
(৪)
হে পশ্চিমবায়ু মোরে, লও ক'রে বীণা—
হইয়াছে যেমন বনানী,
পত্র মোর ঝরে যাবে,—জানি
ওগো জানি
বলো—ওগো তা করিবে কিনা ?
হে অধমা প্রাণে এস মোর,
যে চিন্তারা ছিল মৃত—তার খোল ডোর।
ছড়াও গো বিশ্বমাঝে তাহা
আমার অন্তরে মৃত চিন্তা ছিল যাহা—
সে চিন্তার ভাষা আজি দাও কবিতায়,
হে পশ্চিম বায়ু।

নেশা

নচিকেতা ভরদ্বাজ

[বোরিস পাস্টেরনাকের Intoxication কবিতা অবলম্বনে]

আঁশ্চি লতার আলিঙ্গনে উইলো গাছের তলায়
তুমি আমি আমরা দুজন—ভোরের হাওয়ার
মাতাল দিনে আশ্রিত আজ—অন্বেষিত অন্ধকারে—
লুকিয়ে আছি মৌন তোমার বর্ষাতির ঢাকায়
একটু থানিক, আমার দুটি বন্ধ বাহুর অন্তরালে
তোমার
নতুন শরীর অবাক মন শুদ্ধ কী ভংকারে !
আমার ভুল। অথবা সে নিবিড় ঝোপঝাড়ের—
অরণ্যের গাছেরা কেউ আইভি-আলিঙ্গিত—
মোটেই না। মধুর এক মুগ্ধ আবেশের—
মত্ততায় মদির বুঝি : আমরা শুধু দুজন
বেশ, তাহলে বর্ষাতিটা করনা বিস্তৃত—
মাটির 'পরে, আশে-পাশে কেউ তো নেই—
বর্ষা ঝড় থেমে গেছে কখন।

দক্ষিণ ভ্যাং

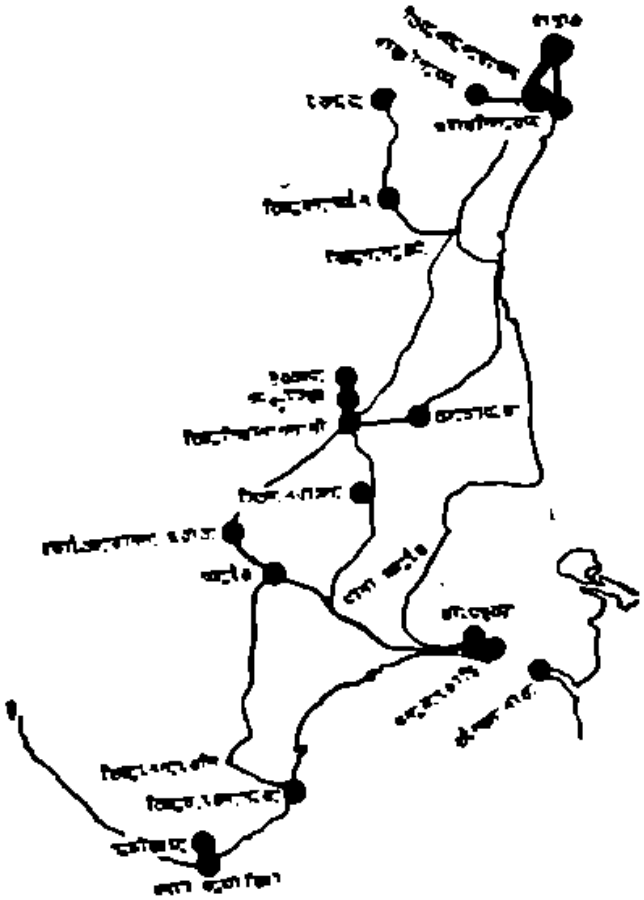

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৮

মাদ্রাজ থেকে কাঞ্চীপুরম্ মাত্র ৬৪ মাইল পথ।

বাস্-এ যেতে যেতে স্মরণ করছিলাম সেই বহুশ্রুত শ্লোকটি,—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

ওই সপ্তপুরীর অন্যতম পুরী—কাঞ্চীপুরম্। যার অপর নাম, দাক্ষিণাত্য কাশী।

দক্ষিণের এই ঐতিহাসিক নগর ও বিখ্যাত পুণ্যধামটির সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের অনেকের পরিচয় না থাকলেও কয়েক বছর আগে বাঙ্গালী মেয়েদের যথেষ্ট পরিচয় ঘটে গেছে কঞ্জীভরম্ শাড়ীর প্রাদুর্ভাবে।

কঞ্জীভরম্ কথাটি কাঞ্চীপুরম্-এরই ইংরেজী রূপান্তর।

কাঞ্চীপুরম্ অর্থে, কাঞ্চননগর।

উত্তরাপথে প্রাচীনকালে একটি প্রবচন ছিল—নগরেষু কাঞ্চী; অর্থাৎ নগরের মধ্যে কাঞ্চী। এমনই ছিল কাঞ্চীর বৈশিষ্ট্য। আর একটি বিষয় এথেকে সূচিত হয় যে, কাঞ্চীর সঙ্গে উত্তর ভারতের তখন নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। বর্তমানে সে যোগাযোগ অনেকাংশে বিনষ্ট। শুধু কাঞ্চী কেন, দক্ষিণাপথ ও উত্তরাপথের মধ্যের দূরত্ব যেন প্রাচীন যুগের চেয়ে বেড়ে গেছে। দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও তাই অতি ক্ষীণ এবং সীমিত হয়ে পড়েছে।—

: মণি স্বামী? পিছনের সীট-এর এক ভদ্রলোকের প্রশ্নে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলো।

ভদ্রলোকের প্রশ্নের অর্থ—কটা বেজেছে মশায়?

বললাম: পদ্দে মুকাল্। অর্থাৎ, পৌনে এগারটা। আমার সামনের আসনে ছিলেন শুভ্রকেশ সুধীজন,—শ্রীযুক্ত নটরাজন। মাদ্রাজে বাস্-এ ওঠা থেকে একটু আগে পর্যন্ত আমার সঙ্গে ইংরেজীতে নানা আলাপ আলোচনা করছিলেন। আমার তমিল্ বলতে শুনে তিনি অবাক হলেন।

তাঁকে বললাম: আপনি যা ভাবলেন তা নয়। মোটেই তমিল্ জানিনা। পথ চলায় কুলি ও গাড়ীওয়ালাদের, আর হোটেল্-এর চাকরদের বোঝাবার জন্য দু চারটে শব্দ মুখস্থ করেছি মাত্র।

নটরাজন তঞ্জাবুর-এর ব্রাহ্মণ এবং শৈব। উত্তর ভারতের কণৌজী ব্রাহ্মণদের মত তমিলনাড়ুতে তঞ্জাবুর ব্রাহ্মণদের প্রসিদ্ধি।

নটরাজনের সঙ্গে কথায় ও গল্পে পথের দূরত্ব যেন কমে গিয়েছিল।

: আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা কাঞ্চী পৌঁছবো। আপনি শুধু বেড়াতে যাচ্ছেন, না কি মুখ্য উদ্দেশ্য তীর্থ যাত্রা?—নটরাজন-এর পাশের যাত্রীটি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন।

: দেখতে যাচ্ছি এই মাত্র।

তীব্র শিস্-এর আওয়াজ আমাদের আলোচনায় ছেদ ঘটালো। বাসটা থেমে পরলো।

কাঞ্চীর বাস্ থামবার জন্য শিস্ দিয়েছিলেন। মাদ্রাজ শহরে এবং মাদ্রাজের দক্ষিণে অনেক জায়গাতেই এখনও শিস্ দিয়ে বাস্ ছাড়া ও থামানোর রীতি দেখা যায়।

নটরাজন-এর সামনের সীট-এর এক বছর পঁচিশের তরুণ অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন: যাই বলুন, কলকাতার বেঙ্গলীরা সব ব্যাপারেই ভয়ানক বাঙ্গালা করে। কথায় কথায় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে।

প্রসঙ্গতঃ তরুণটি জানালেন, তিনি কলকাতায় তাঁর ভগ্নীপতির কাছে চারমাস থেকে এসেছেন। আরও দুজন যাত্রী তার কথার প্রতিধ্বনি করলেন। নটরাজন ওঁদের মন্তব্যে অস্বস্তির সঙ্গে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

বললাম: আপনারা ঠিক বুঝবেন না যে স্বাধীনতার জন্য শুধু ফাঁসিকাঠে ও বন্দুকের গুলিতে আত্মাহুতিই নয়, পরাধীনতা হতে মুক্তির জন্য প্রদেশটার দু'তৃতীয়াংশ ত্যাগ করে কি দুর্দশা আজ তার অধিবাসীদের!

অনেক দূরে থাকায় আপনারা শুধু দেশটার ভাগ বাটোয়ারার কথাটাই শুনেছেন কিন্তু তার ফলগুলির সঙ্গে আপনাদের তো পরিচয় নেই। বাস্তুহারা কথাটাই আপনারা শুনেছেন, চাক্ষুষ করেন নি।

দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবাঙ্গলায় আজ বাঙ্গালীর বাসের অভাব, চাষের জমির অভাব,তাছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যে স্থান নেই, স্থানীয় ইণ্ডাষ্ট্রি বা শিল্প সংস্থাগুলি তাদের নয়।

সমস্যা জর্জরিত আর্ত বাঙ্গালীর অসহিষ্ণুতার আওয়াজ বহুদূরের মানুষের কাণেও পৌঁছচ্ছে কিন্তু তাদের কান্নার শব্দ পৌঁছয় না। তাই আমরা অসহিষ্ণু।

নটরাজন্ উদ্দীপিত হয়ে বললেন: ঠিক কথা, ঠিক কথা।

যাঁরা ইতিপূর্বে তরুণটির কথার প্রতিধ্বনি করেছিলেন তাঁরা এবার ঘুরিয়ে মাথা নেড়ে নটরাজনকে সমর্থন জানালেন।

(দক্ষিণাপথে 'হাঁ' বা সমর্থক সূচক ভঙ্গী প্রকাশে, ডাইনে, বাঁয়ে, ঘুরিয়ে মাথা নাড়ানোই রীতি। বাঙ্গলায় তথা উত্তর ভারতে যা নেতিবাচক)।

একজন প্রশ্ন করলেন: বেঙ্গলীরা তো চাপাটি খায়?

: না। আপনাদের মত আমরাও শাদম্ খাই। উপকূলবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বাঙ্গলা হতে কেরল পর্যন্ত সবাই শাদম্ (ভাত) খায়।

: আপনাদের মাতৃভাষা তো হিন্দী,—তাই না?

: না, না। আমাদের মাতৃ-ভাষা বাংলা।

: ও! আচ্ছা, আপনাদের ওখানে অনেক দেবস্থান আছে?

: আছে। শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, গণেশ সকলেরই পূজা হয়। তবে, আপনারা যেমন প্রধানতঃ শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা করেন আমরা সেক্ষেত্রে মাতৃ-পূজা করি।

: আমরাও শিব মন্দিরে দেবীর পূজা করি।—আপনাদের ওদিকে নিশ্চয় এত কোলিল্ নেই? অন্ততঃ মাদ্রাজের মত এত পুরনো সব কোলিল্ নেই।

: ছিল। কিন্তু বারবার বৈদেশিক আক্রমণের ফলে বেশীর ভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই মন্দির মাধ্যমে প্রাচীন ভারতকে দেখতে হলে আসতে হয় দক্ষিণ ভারতে।

: বেঙ্গল্-এ দীপাবলী উৎসব আছে?

: আছে। তবে, আমাদের সবচেয়ে বড় পূজা ও উৎসব দুর্গা পূজা। আপনারা যাকে নব-রাত্রি বলেন।

: কি আশ্চর্য! আমাদের নব-রাত্রি আপনাদের দুর্গাপূজা?

: হ্যাঁ। তফাৎ এই যে, আমরা মূর্তি গড়াই।

: পোঙ্গল্ হয়?

: হ্যাঁ। আমাদের দেশে তার নাম পৌষ-পার্বণ।

: কবে হয়?

: মোটামুটি বলা যায় ১৪ই জানুয়ারি।

: আশ্চর্য, আমাদের সূর্য পোঙ্গল্ যে ঐ দিনেই!

: হ্যাঁ। কারণ, ওই দিনটি উত্তরায়ণ সংক্রান্তি।

সূর্য ঐ দিনে উত্তর গোলার্ধে অভিমুখী হন, অর্থাৎ আমরা যে গোলার্ধে বাস করি সেই অংশে আসতে শুরু করেন।

আপনাদের মতই আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় তিথি গণনা ইত্যাদি হয় সূর্যকে ভিত্তি করে। আপনাদের নববর্ষ এবং আমাদের নব-বর্ষও খুবই কাছাকাছি। আপনারা মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন হতে নববর্ষ গণনা করেন, আর আমরা করি তার পরের দিন থেকে।

: কি অদ্ভুত মিল!—আচ্ছা, আপনাদের ঐ পৌষ-পার্বণে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে?

: থাকে। পৌষ-পার্বণের মস্ত আকর্ষণ পিঠা ও সরু চাকলি।

: শেষের কথাটা কি বললেন? আর একবার বলুন।

: কেন বলুন তো?

: কথাটা যেন তমিল্‌র মনে হলো!

: ঠিকই ধরেছেন। আপনাদের শোরুং চাকুলিই বাঙলার সরুচাকলি। কে জানে কোন অতীতে কেমন করে, দক্ষিণাপথ হতে গিয়ে পড়েছিল শোরু চাকুলি (চালের পাতলা পিঠা) আর কালক্রমে হয়ে গিয়েছিল সরু চাকলি।

: এরকম আর কোন কথা জানা থাকলে বলুন না।

: বিশেষ জানা নেই। কারণ, আমি তো ভাষা-বিজ্ঞানী নই। দু'একটা মাত্র জানি।

আপনাদের পিল্লৈ পূর্ব ভারতে উড়িষ্যায় গিয়ে পিলা, আর আমাদের বাঙলায় হয়েছে পিলে। বাংলায় আমরা ছেলে শব্দটির সঙ্গে জুড়ে বলি,—ছেলে পিলে। আপনাদের পিল্লৈ শব্দের এবং পিলা বা পিলের অর্থ একই। বাচ্চা বা শিশু বোঝাতে কথাটি ব্যবহৃত হয়।

আপনাদের চিচ্চী বা ছিছ্ছী বাংলায় ছি ছি। দুয়েরই অর্থ এক। আমাদের পণ্ডিতরা ছিছিকে সংস্কৃত হতে জাত নয় বলেন। তাহলেই প্রশ্ন জাগে ওটি এলো কোথা থেকে?—

আপনারা fifty sixকে তমিল-এ কি বলেন?

: ঐম্বত্তারু।

: কিন্তু, ছপ্পন্নম্ কথাটির মানে কি?

: ওটি আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি না। তবে, ওরও অর্থ fifty six।

: তমিল-এ বহু সংস্কৃত শব্দ আছে কিন্তু ঐ শব্দটি তো সংস্কৃত নয়। তাহলে এটি এলো কোথা হতে?

: আমার জানা নেই। আপনি জানেন?

: আমাদের বাংলায় ছাপ্পান্ন (ছাপ্পান্নটি) কথার অর্থ আর আপনাদের ছপ্পন্নম্-এর অর্থ এক, এইটুকুই জানি।—

নটরাজন্ বললেন: কত মিল আমাদের মধ্যে অথচ আমরা জানি না। খুঁজলে হয়তো আরও কত কিছুই বেরিয়ে পড়বে।

: নিশ্চয়। যদি আমরা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্তে গিয়ে, সেখানের মানুষের খাদ্যাদির পার্থক্য আর ভাষার বৈষম্য দেখেই চেঁচিয়ে না উঠি, এবং পরিবর্তে তাদের ও আমাদের জীবন যাত্রার সাদৃশ্যগুলো খুঁটিয়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো, কি সুন্দর এক ঐক্যের বাঁধনে আমরা বাঁধা।

সাম্য খুঁজলে সাম্য চোখে পড়বে,—প্রভেদ খুঁজলে প্রভেদ।

: খুব সত্যি কথা। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব তখনই বেড়ে ওঠে, যখন একে অপরের সঙ্গে তাদের পার্থক্যটাই খুঁজতে থাকে। পরিবর্তে যদি সাদৃশ্য খুঁজতে থাকে তাহলে সখ্য বেড়ে ওঠে,—আত্মীয়তা জন্মায়।—নটরাজন্ বললেন।

কথায় কথায় আধঘণ্টা কেটে গিয়েছিল।

আমরা পৌঁছে গেলাম কাঞ্চীপুরম্।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত কাঞ্চী-পুরম্ ছিল পল্লবরাজের রাজধানী।

পল্লব বংশের রাজাদের মধ্যে মহেন্দ্র বর্মণ ও রাজ-সিংহ (নরসিংহ বর্মণ ২য়) অতি উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে কাঞ্চীতে রাজত্ব করেছিলেন চোল, ও বিজয়নগরের হিন্দু রাজগণ। তবে পল্লবরাজের রাজত্ব-কালেই কাঞ্চীর বিশেষ সমৃদ্ধি ও প্রসিদ্ধি লাভ ঘটেছিল।

কাঞ্চীর তিন মাইল দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিতা নদী—পালর্। যার পৌরাণিক নাম—বেগবতী।

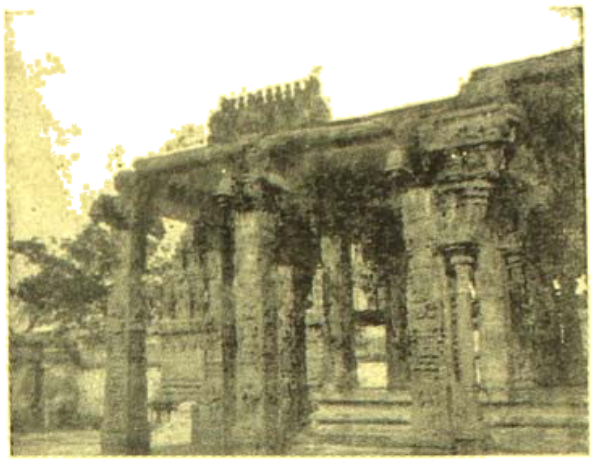

কামাক্ষী দেউলের কল্যাণমণ্ডপ—কাঞ্চীপুরম্

কাঞ্চীর এক অংশ বৃহৎ কাঞ্চী বা শিব-কাঞ্চী এবং অপর অংশ বিষ্ণু-কাঞ্চী বা ক্ষুদ্র কাঞ্চী।

শিব-কাঞ্চীর মুখ্য দেবালয়—একাম্রেশ্বরের মন্দির। আর বিষ্ণু কাঞ্চীর,—বরদ রাজ মন্দির।

শিব-কাঞ্চীর অপর উল্লেখযোগ্য দেবালয়টি কৈলাসনাথের। উভয় কাঞ্চীর মধ্যপথে আছে কামাক্ষী মন্দির। কামাক্ষী দেবী দুর্গা।

বঙ্গারু কামাক্ষী অর্থাৎ স্বর্ণ-কামাক্ষী নামে দেবীর এক সুবর্ণময়ী মূর্তি ছিল। ১৭৮০ সালে মুসলিম আক্রমণকারীদের হাত হতে রক্ষার জন্য মূর্তিটি তঞ্জাবুর-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আচার্য শঙ্কর এই দেবী মন্দিরে কামকোটি-পীঠ নামে এক আসন স্থাপন করেছিলেন। সেটিও ঐ সময়ে অপসারিত হয়েছে কুম্ভ-কোণম্-এ।

আচার্য শঙ্কর কাঞ্চীতে কিছুকাল তাঁর অদ্বৈত দর্শন শিক্ষা দিয়াছিলেন।

জনশ্রুতিতে প্রকাশ যে, কামাক্ষী মন্দিরে শঙ্করের সমাধি আছে। কিন্তু সে সমাধি যে কোথায় তা কেউই জানে না। পক্ষান্তরে, হিমালয় ক্রোড়ে কেদার তীর্থই আচার্যের অন্ত্যেষ্টি ও সমাধি-ক্ষেত্র এই মতটিই সমধিক স্বীকৃত।

মনে হয় আচার্য কিছুদিন কাঞ্চীতে বাস করেছিলেন বলেই তাঁর অনুগামীরা হয়তো এখানে তাঁর একটি সমাধি রচনা করেছিলেন।

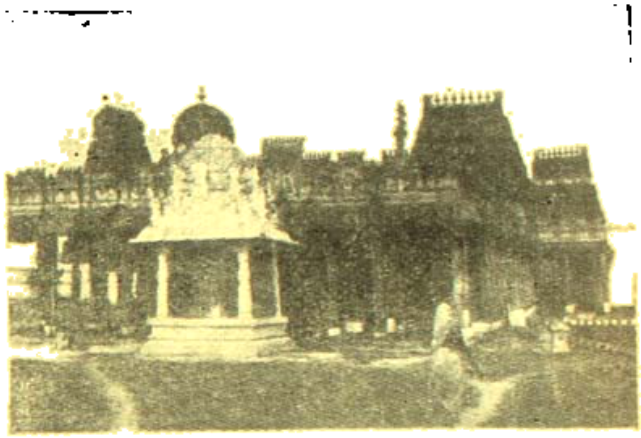

একাম্রেশ্বর মন্দির—কাঞ্চীপুরম্

কামাক্ষী মন্দিরের শিলালিপি হতে দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কিছুই জানা গেছে।

একাম্রেশ্বরের মন্দিরটি বিশ্বকর্মা নির্মিত বলে এখানের পাণ্ডাদের ধারণা। পল্লবরং রাজগণের সময়ে, অষ্টম শতাব্দীতে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত বলেই অনুমিত।

একাম্রেশ্বর বা একাম্রনাথ একটি স্বয়ম্ভূলিঙ্গ।

দক্ষিণাপথে পাঁচটি স্বয়ম্ভূলিঙ্গ আছেন। চিদম্বরম্-এ

মহিষাসুরমর্দিনী (একাম্রেশ্বর মন্দির)—কাঞ্চীপুরম্

আকাশ লিঙ্গ, কালহস্তীতে বায়ু-লিঙ্গ, তিরুবরণ্‌গাইলৈ-এ তেজ-লিঙ্গ, তিরুবনইক্‌ কোয়িল-এ অপ্‌ লিঙ্গ এবং এখানে ক্ষিতি বা পৃথ্বী-লিঙ্গ,—একাম্রনাথ।

লিঙ্গ মূর্তিটির স্থাপনা সম্বন্ধে স্থানীয় পুরোহিতরা বলেন যে, দেবী পার্বতী বালুকা দিয়ে মূর্তিটি নির্মাণ করে শিবকে স্বামীরূপে প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করেছিলেন।

একাম্রেশ্বর দেবালয়ের প্রধান প্রবেশ পথটি দক্ষিণ গোপুরম্‌-এর মধ্য দিয়ে। গোপুরমটির উচ্চতা ১৯২ ফিট্‌। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফতেহ্‌পুরের বুলন্দ দরওয়াজা ১৩৪ ফিট্‌ এবং কলকাতার মনুমেন্ট ১৬৫ ফিট্‌। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায়লু গোপুরমটি নির্মাণ করেন।

মন্দিরের গর্ভগৃহের সুমুখে বিশাল মণ্ডপ। মণ্ডপটির দেওয়ালে, অনেক উঁচুতে তিনটি গবাক্ষ আছে। ১২ই অথবা ১৩ই ফেব্রুয়ারি সকাল ছটা হতে সাতটার মধ্যে ঐ গবাক্ষ-গুলির মধ্যেরটি দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশ ও সমস্ত মণ্ডপটি অতিক্রম করে, আনুমানিক তিনশ ফিট্‌ দূরের গর্ভগৃহ মধ্যে লিঙ্গমূর্তির উপর প্রক্ষিপ্ত হয়।

স্থাপত্য ও জ্যোতির্বিদ্যার এরূপ বিস্ময়কর যুক্তকৌশল অতি অল্পই দেখা যায়।

একটি নৃত্যভঙ্গিমা (একাম্রেশ্বর মন্দির)—কাঞ্চীপুরম্‌

[কয়েক বছর পূর্বে কন্যাকুমারিকায় গান্ধী-ভবন নামে গান্ধীজীর স্মৃতি সৌধে ঐ কৌশলের অনুকরণে ছাদের একটি ছিদ্রপথে সূর্যালোক প্রবেশ করিয়ে গান্ধীজীর মূর্তিতে প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা হয়েছে।]

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

কাল প্রবাহ

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত, এম-এ

সৃষ্টির ব্যাকুলতায় অনাদি অনন্তকাল,
বিশ্বের প্রাণ প্রবাহ এগিয়ে চলে প্রতিনিয়ত
অনিয়ন্ত্রিত।
বার্গসোঁর "ইলান্‌ ভাইটাল"।
নহে কোন আকস্মিক শিখা সম্পাতে,
শুধু এক নিরাসক্ত নির্মোহ গতিতে
অবিরাম চলে এই কালপ্রবাহ।
নব নব সৃষ্টির সঞ্চয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে
অনন্ত তরঙ্গের মাঝে—
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের সীমা চিহ্ন হারা।

অবিশ্রান্ত চলে এই প্রাণপ্রবাহ
আপনার গতিতে আপনি মথিত
বিশ্বের প্রাণ প্রবাহ—উন্মত্ত উধাও
অজানা নিঃসীম শূন্যে।
ধাবমান নব নব সৃষ্টির উন্মেষে,
অজ্ঞাত গতি পথে বাধা বন্ধহারা।
অন্ধ এই যাত্রাপথে বিচ্ছুরিত
জড় ও চেতনা।
নব নব সৃষ্টি পথে
বেগবান হয়ে ওঠে নতুন আবেগে।

গল্প

কুমারী মন

শ্রীপথিক

জয়িতা ভাবতে চেষ্টা করছিল শোভন এখন কি করছে। জয়িতার চোখের সামনে ভেসে উঠল 'স্বপ্ননীড়' বাড়ীখানা। 'স্বপ্ন নীড়' শোভনের অনেক স্বপ্নের অনেক আশার আশ্রয় স্থল। লাল মাটীর আকা বাঁকা গ্রাম্য পথ। পথের ধারে পুরান বটগাছ। একটা শেওলা জমা পুকুর। তারই পাশে 'স্বপ্ননীড়' বাড়ীটা।—একটা ঘর। মাটীর দেওয়াল। খড়ের চাল। সামনে এক ফালি বারান্দা। তারপর ফাঁকা মাঠ। রুক্ষ অনুর্বর ভূমি। দু' একটা তাল খেজুর ও অন্যান্য গাছ। মাঝখানদিয়ে লালমাটীর আঁকা বাঁকা পথটা। শোভন 'স্বপ্ননীড়'এর বারান্দায় বসে পথের দিকে হয়তো চেয়ে আছে। তার রোগক্লিষ্ট ক্লান্ত দেহটাকে হয়তো ক্ষণে ক্ষণে ঘরের বিছানায় এলিয়ে দিচ্ছে। জানালা দিয়ে পথ দেখছে। বিষণ্ণ ভাবে বার বার পথ চেয়ে হয়তো ভাবছে—জয়িতা এখনও ফিরছেনা কেন?—জয়িতা সকালে এ পথ দিয়েই এসেছিল। কিন্তু শোভন জানেনা তার জয়িতা আর এ পথ দিয়ে ফিরবেনা।

জয়িতার চোখের সামনে ভেসে উঠল আরও একটা বাড়ীর ছবি। আরপুলি লেনের ২২।২ ডি-এর বাড়ীটা। দোতলা বাড়ী। নূতন। মোজাক করা। ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি। সাজান ড্রয়িং রুম। দামী সোফা সেট। মা বাবা। ছোট ভাইবোন। ঠাকুর চাকর। সবই ছিল। তবু জয়িতাকে একদিন সে বাড়ী ছেড়ে আসতে হয়েছিল। স্বেচ্ছায় আশ্রয় নিয়েছিল কোলকাতারই এক ফ্লাটে। অখ্যাত এক গ্রামে। সেখান থেকে এ 'স্বপ্ননীড়ে'। কিন্তু আজ জয়িতা আবার ফিরে চলেছে ২২।২ ডি আরপুলি লেনের সেই বাড়ীটাতেই।

জয়িতা জানে তাকে দেখে তার মা বাবা সব দুঃখ ভুলে যাবেন। তাঁদের মুখ দুখানি হাসিতে খুসীতে ঝলমল করে উঠবে। জয়িতার হাত দু'খানি ধরে বলবেন—জয়ি মা এসেছ! বুকে টেনে নেবেন। ছোট ভাইবোনগুলো চারপাশে এসে ভীড় করে দাঁড়াবে। না বলা কথায় চোখে মুখে আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে তাকে সোহাগ করবে। মনে পড়ে আরও একটা দিনের কথা। সেদিন এ চোখমুখ-গুলোতেই জয়িতা দেখেছিল বিষাদের করুণ ছায়া। অশ্রু লেখা। কাপড়ের আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে মা গাড়ীতে উঠেছিলেন। বাবা বিষণ্ণ ভাবে মাথা নীচু করে গাড়ীতেই বসে ছিলেন। ড্রাইভার গাড়ী চালাল। মনে পড়ে গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে মায়ের সেই অশ্রু সজল চাহনী। মা আর কোনদিন সেই বাড়ীতে ফিরে এসে-ছিলেন কিনা জয়িতা জানেনা। জয়িতারা কিন্তু পাড়ি জমিয়েছিল সেই বাড়ী ছেড়ে দূরে তার পর দিনই।

দেশ ছেড়ে তারা এসে উঠেছিল আরপুলি লেনের এই বাড়ীটাতেই। তাদেরই নূতন বাড়ী। তখন আর জয়িতার বয়সই বা কত?—নয় দশ বৎসর। ক্লাস ফাইভে পড়ত। স্কুলের গাড়ীতে আসত। মাঝে মাঝে নিজেদের গাড়ীতেও যেত। জয়িতার তখন এত ভাই বোনও ছিলনা। সে সংসারে জয়িতাই তখন স্বপ্নের পরী। অভাবের সংস্পর্শ কোনদিন পায়নি। প্রয়োজনের আগে না চাতেই অনেক কিছু পেয়েছে। অপর্যাপ্ত। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা অসন্তোষের অস্পষ্ট রেখা রয়ে গিয়েছিল। সেটাকে তখনও বুঝতে পারেনি জয়িতা। বুঝেছিল।—বুঝেছিল আরও একটু পরে আরও একটু বড় হলে।

মা বলতেন—জয়ি, তুমি এত ছুটাছুটি করোনা। আস্তে চলো। আস্তে বলো। মা বলতেন—জয়ি, তুমি বারান্দার রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িওনা। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িওনা। ছাদে আর উঠো না। মা বলতেন—স্কুলে গিয়ে রাস্তায় বের হয়োনা। দোকানে

জিনিষ কিনতে যেওনা। স্কুলের গাড়ী থেকে নেমে সোজা ঘরে চলে আসবে। কারওদিকে তাকিওনা। অমিতার অবাধ চলার স্থান ছিল পড়ার ঘর, শোবার ঘর, ভিতরের বারান্দা, ছাদঘর এমনি আরও দু' একটা স্থান। নীচের ড্রয়িং রুম, অন্যান্য ঘর যাতে কর্মচারী অতিথি প্রভৃতিরা আসে যায় থাকে সেদিকে গেলে মা বলতেন—ওদিকে যেওনা। বাবার বন্ধু অথবা পরিবারের পরিচিত কেউ এলে মা বলতেন—ওদের সাথে কথা বলোনা। দিদিমণি পড়াতে আসতেন। মা মাঝে মাঝে অমিতার বই খাতা-পত্রগুলো নাড়াচাড়া করতেন। তার মধ্যে কোন কোন দিন এমন দু একটা বইও থাকত যা অমিতা তার ক্লাসের বন্ধুদের কাছ থেকে আনত পড়বে বলে। মা বলতেন—এ বই পড়োনা। ফিরিয়ে দিও। পরদিনই অমিতা দেখত সে বইয়ের অনেক অনেক গুণ বেশী নূতন বইয়ের আমদানী হয়েছে তার পড়ার টেবিলে। তবে সে বই নয়। প্রথম প্রথম অমিতা দেগুলো খুলে নিয়ে যেত বন্ধুদের দেখাবার জন্য। ওরা কিছু বলত না। শুধু মুখ টিপে হাসত। মা বলতেন—পড়ো। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়তে পারত না। অমিতা নাড়াচাড়া করত। পাতা উল্টাত। যেন কেমন কেমন লাগত। স্কুলের পোষাক ছিল নির্দ্দিষ্ট। তাছাড়াও প্রচুর জামা কাপড় জুতা আসত অমিতা'র জন্য। সেগুলো পছন্দ করে আনতেন মা বাবাই। আরও অনেক কিছুই আসত প্রয়োজন অপ্রয়োজনের। বাড়ীর বাইরে যাবার সুযোগ অমিতা খুব কমই পেত। কখনও মা বাবার পছন্দ কোন বই এলে, কদাচিৎ কোন আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে দেখা করতে গেলে। বাড়ীতে ভাল রেডিও সেট ছিল। বাজত খুবই কম। মাঝে মাঝে মা বাবা অমিতাকে পাশে বসিয়ে রেডিও খুলে বলতেন—শোন।

অমিতা আরও একটু বড় হলো। স্কুলের ক্লাসের গণ্ডী আরও কয়েকটি পার হলো। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরল। ফ্রক থেকে শাড়ীর আকার ও আয়তন যতটুকু বেশী অমিতার প্রতি মায়ের দৃষ্টিও ঠিক ততখানিই বা তার চেয়েও কিছু বাড়ল। অমিতার মনের অসন্তোষ ও ইচ্ছার অঙ্কুরিত গাছটাও এতদিনে বেশ বড় হয়ে উঠেছিল তার অলক্ষ্যেই। অমিতার প্রতি তার মায়ের যে এত লক্ষ্য, প্রতি মুহূর্তে চলায় বলায় যে এত শাসন, বাধা নিষেধ সেগুলো অনেক সময়ই অমিতার খুব ভাল লাগত না। ইচ্ছা হতো তার চলা বলার এ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী ছাড়াও অন্য একটা জগৎ গড়ে উঠুক। গণ্ডীবদ্ধ জীবনে সে যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠেছিল। ইচ্ছা হতো বারান্দার রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকগুলোকে দেখে। পাশের বাড়ীগুলোকে দেখে। ইচ্ছা হতো—ছাদের উপরে উঠে খোলা আকাশের মুক্ত হাওয়া গায়ে লাগায়। পড়ন্ত বেলায় নীল আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। জ্যোৎস্নারাতে চাঁদের আলোতে ঘুরে বেড়ায়। ইচ্ছা হতো—সেও তার বন্ধুদের মতন নিজের পছন্দ মতো জামা কাপড় পরে। বই পড়ে। রেডিও শোনে। মাঝে মাঝে সিনেমায় যায়। স্কুলের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে যায়। তাদেরও নিয়ে আসে। গাড়ী করে বেড়াতে যায়। আরও কত কি।

ইচ্ছা হতো। অসন্তোষের ছায়ায় তার সমস্ত মনটা ভরে যেতো। অমিতা কিন্তু সে ইচ্ছাকে, সে অসন্তোষকে মনে স্থান দিত না। অমিতাই জয়ী হতো। তারপর এমন একদিনও এলো যেদিন তারাই অমিতার উপর জয়ী হলো। প্রথম প্রথম অমিতার মনে হতো তার এত শত নিষেধ ও শাসন এ সবের মূল বুঝি একমাত্র মা-ই। কিন্তু পরে বুঝতে পারল মা বাবা দু'জনই এ সম্বন্ধে সদা জাগ্রত। বাবার দিন তালিকা বাইরেই বেশী। তাই মা একাই সে দায়িত্ব নিয়েছেন। এতে তার মনটা যেন আরও কেমন মুষড়ে যেত।

ইদানীং অমিতা বুঝতে পেরেছে তার প্রতি মা-বাবার এত কড়া নিয়ম, এত লক্ষ্য রাখার কারণ কি! বাবা কোলকাতা থাকেন অনেক দিন হতে। মা আর অমিতা একই সময় কোলকাতা এসেছে দেশ থেকে। অমিতা অবুঝ। মা তা নন। কোলকাতা সম্বন্ধে বাবার ধারণা খুব ভাল নয়। বাড়ী ছাড়া বাইরের লোক সম্বন্ধেও বাবার ধারণা উঁচু নয়। বাবা সে ধারণাই মায়ের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাই মায়ের সদা জাগ্রত দৃষ্টি অমিতার প্রতি। কোলকাতার এত সবের মধ্যে অমিতা যেন খারাপ না হয়ে যায়। কোলকাতার অলিতে গলিতে প্রেমের বাসা। তাই অমিতা যেন কখনও সে প্রেমে না পড়ে।

অমিতা সবই বুঝত। এ বাড়ীর এ ভাবটাতে অমিতার মনটা যেন মুষড়ে যেত। ঘৃণা বিতৃষ্ণা ও বিদ্রোহে ভরে উঠত। তবু মনে হতো তার মা বাবার চেয়ে তাকে কেউ বেশী ভালবাসে না। সে ভালবাসা স্বর্গীয়। এ বাড়ীটা স্বর্গীয় ভালবাসাতেই ভরপুর। সে ভালবাসা যেন অনেক উপরে। তার ধরা ছোঁওয়ার বাইরের। কিন্তু এতে মানবীয় ভালবাসার অভাব। সে মানবীয় ভালবাসার জন্যই তার মনটা যেন মাঝে মাঝে কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠত। তার মনটা যেন সব কিছুর মধ্যে এই মানবীয় ভালবাসাকেই খুঁজে মরত।

এ মানবীয় ভালবাসা অমিতা খুঁজে পেয়েছিল শোভনের মধ্যে। শোভন অমিতার কলেজের ইকনমিক্সের অধ্যাপক। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে অমিতা কলেজে যাবে, এটাও অমিতার মা বাবার কারোরই অভিপ্রেত ছিল না। তাঁদের মনে আশঙ্কা ছিল কলেজে গিয়ে মেয়ে না জানি খারাপ হয়ে যায়। অথচ অমিতা শেষ পর্যন্ত কলেজে ভর্ত্তি হলো। সেটা মা বাবার সৎপাত্র লাভের মহিমায়। কারণ অধুনা সৎপাত্ররা অর্থ ও রূপের সাথে বিদ্যাও যাচাই করতে লেগেছে। এ না হলে তাদের আভিজাত্য নাকি অতল তলে ডুবতে বসে।

কলেজে যাতায়াতের অল্পদিনের মধ্যেই শোভনের সাথে অমিতার পরিচয়। শোভনও ছিল সে কলেজে নবাগত। পাশ করার পর সবে মাত্র অধ্যাপনায় ব্রতী হয়েছে। কেমন করে অমিতা শোভনের মধ্যে মানবীয় ভালবাসা খুঁজে পেয়েছে সে অনেক কথা। তবে তাদের একদিন আলিপুর কোর্টের সিভিল ম্যারেজ রেজেষ্ট্রি অফিসে দেখা গিয়েছিল। সেখান থেকে তারা উঠল এসে এক-ডালিয়া রোডের একটা ফ্লাটে। অমিতার মা বাবা যেদিন এটা বুঝতে পারলেন সেদিন আর তাঁদের দুঃখের সীমা ছিল না। তাঁরা যা ভেবেছিলেন তাই হলো। সতর্কতা অবলম্বন করেননি বলে দুঃখ নয়। দুঃখ হলো এত সতর্কতা অবলম্বন করেও অমিতাকে এ পথ হতে উদ্ধার করা গেল না।

প্রথমটা মেয়ের উপর অভিমান হয়েছিল। অভিমান হয়েছিল কোলকাতার উপর। অভিমান হয়েছিল শোভনের উপর। পরে সব অভিমান ত্যাগ করে অনেক অনুসন্ধান করে একডালিয়া রোডের ফ্লাটে এসেছিলেন অমিতার মা একদিন। মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে। মেয়ে ফেরেনি। ফিরে গিয়েছিলেন অমিতার মা-ই কাপড়ের আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে। ড্রাইভার গাড়ী চালিয়ে দিয়েছিল। অমিতার মা বার বার সাশ্রুনয়নে মেয়ের দিকে ফিরে ফিরে দেখছিলেন। অমিতা দাঁড়িয়ে ছিল নিশ্চলভাবে পথের পাশে।

তার পরদিনই অমিতারা একডালিয়া রোডের বাড়ী ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছিল সুদূরে। অমিতার মা বাবা ভেবে পেলেন না ঐশ্বর্য্য প্রাচুর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত মেয়ে কিসের দুঃখে শোভনের মত ছেলের সাথে দেশান্তরী হলো। শোভনের ধন জন বলতে কিছুই ছিল না। অধ্যাপনাই ছিল তার জীবিকার একমাত্র পথ।

কোলকাতা ছেড়ে তারা চলে এসেছিল এক গ্রামে। দূরে। জীবিকার জন্য পথ খুঁজে নিয়েছিল শিক্ষকতা।

গ্রামের সেদিনগুলো ছিল তাদের সোনালী রঙে ভরা। জীবনের যে একটা আনন্দ আছে, প্রাণের যে একটা সজীবতা ও স্বচ্ছতা আছে, তা অমিতা জীবনে প্রথম অনুভব করেছিল। সাঁঝ সকালে দু'জনে ঘুরে বেড়াত গ্রামের মাঠে শ্যামল শস্য ভরা ক্ষেতের পাশ দিয়ে। নদীর ঘাসে বসে গল্প করত। অমিতার অনেক অনেক দিনের না বলা কথা। শোভনের কতলতা।

কিন্তু বিধাতা সুখ দেন না। অমিতার জীবনের সে সুখের দিনগুলোও করুণ ছায়ায় মিলিয়ে গেল। শোভনের ক্যানসার হলো। চাকরী ছাড়তে হলো। আবার পাড়ি জমাল দূরে। অজানা অচেনার মাঝে। 'স্বপ্ননীড়'—সে আশ্রয়।

জীবনের যে স্বপ্ন দেখেছিল অমিতা 'স্বপ্ননীড়'-এ এসে অনুভব করল জীবনটা স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন স্বপ্নই। জাগতে পেলেই তা মিলিয়ে যায়। অভাব ছিল, অনটন ছিল। প্রয়োজন ছিল অর্থের। বাঁচার জন্য। শোভনের চিকিৎসার জন্য। কিন্তু কোথায় পাবে? তবু ত্রুটী করেনি অমিতা। শোভনকে যে তার বাঁচাতেই হবে। নিজেকে যে তার বাঁচতেই হবে! কাজ নিয়েছিল পাশের গ্রামের মেয়েদের স্কুলে। শোভনের চিকিৎসার জন্য একে একে খুলে দিয়েছে তার সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কারগুলো। রুগ্ন শোভন ঘরের

বারান্দায় বসে বসে তাকিয়ে থাকত দূরে মাঠের পানে। নীল আকাশের পানে। স্বপ্ন দেখত অতীতের কোলে ফেলে আসা দিনগুলোর। স্বপ্ন দেখত ভবিষ্যতের আরও কোন একটা সোনালী দিনের। তাই কাগজ হাতের কাঁপা কাঁপা রেখায় বারান্দার দেওয়ালে অতি সযতনে লিখে রেখেছিল 'স্বপ্ননীড়'।

কিন্তু সে স্বপ্নও মাঝে মাঝে আবছা হয়ে আসত। শোভন বলত—জয়িতা তুমি আবার ঘরে ফিরে যাও। মা বাবা তোমায় আদরের সাথেই গ্রহণ করবেন। বড়লোকের ঘরের মেয়ে তুমি। আমার সাথে এসে কেবল দুঃখই পেলে! সুখ তোমায় দিতে পারিনি। দিতে পারব এমন প্রত্যাশাও আর নেই। আমার জীবন দুঃখ দিয়েই ভরা। তাই দুঃখ আমার জন্য নয়, দুঃখ তোমার জন্য। সুখের আশায় তোমায় ঘর ছাড়া করে দুঃখই দিলাম কেবল! জয়িতা দেখত শোভনের জলভরা চোখ দুটো ছলছল করে উঠত। জয়িতা শোভনের হাতে হাত রেখে বলত—দুঃখ করোনা শোভন। তোমার পাশে আছি এই আমার স্বর্গের সুখ।

কিন্তু আজ?—সে স্বর্গের সুখ যেন মন হতে কোথায় মুছে গেছে। দুঃখের আঘাত যেন আর সইতে পারছেনা জয়িতা। তাই স্বপ্নের সুখের কল্পনা পিছনে ফেলে চলেছে আবার আহুপুলি লেনের সে বাড়ীতেই। 'স্বপ্ননীড়'-এর স্বপ্নে আর কোনদিন ফিরে যাবেনা। গাড়ী চলেছে। জয়িতা বসে বসে ভাবছে—ফেলে আসা দিনের ফেলে আসা কথা। না আসার দিনের অজানা কথা। সকাল বেলা বের হবার সময় শোভনকে বলে এসেছে—মফঃস্বল সহরে যাচ্ছে বড় ডাক্তারের কাছ থেকে তার জন্য একটা ওষুধ আনতে। শোভন জিজ্ঞাসা করেছিল—টাকা? জয়িতা কোন উত্তর দেয়নি।

গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে ইন্ করলো। ট্যাক্সিতে উঠে বললো—আহুপুলি লেন।

জয়িতা আবার ফিরে এলো।

হাতে ওষুধের শিশি! শোভন জয়িতার আসার আভাস পেয়েই বিরক্তির স্বরে বললো—এত দেরী হলো কেন?—তারপরেই ক্লান্তি ভরা অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলো—কটা বাজে? জয়িতার হাতের ঘড়িটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল শোভন।

শোভন অন্ধকারে অনুভব করলো ঘড়িটা হাতে নেই। শোভন বুঝতে পারল জয়িতার ফিরতে এত দেরী হলো কেন? শোভনের চিকিৎসার জন্য এ ঘড়িটা জয়িতা আগেই বিক্রী করতে চেয়েছে। কিন্তু শোভন বার বারই বাধা দিয়েছে। আজ জয়িতা সে বাঁধন ভেঙেছে। শেষ সম্বল এ ঘড়িটা বিক্রী করেই জয়িতা তার জন্য ওষুধ এনেছে।

অন্ধকার। শোভনের সামনের অন্ধকার আরও অন্ধকার হয়ে এলো।—আনন্দে না দুঃখে?

উপরোধ

কিতীশ দেব সিকদার

ফুল নয়
দুঃখ দিয়ে মালা গাঁথ নারী
অশ্রুময়
এই মালা কণ্ঠে নিতে পারি
হেসে হেসে
রক্তজবা স্মৃতি ভালবেসে।
স্মৃতি কার?

প্রতিদিন কোন মুখায়ব
বৃত্তাকার?
বুকে এঁকি অন্ধ উৎসব
চুল বাঁধে
কাল্পনিক প্রীতির বিবাদে!
স্মৃতি কাঁদে,
শরীর পড়েছে ধরা ফাঁদে?

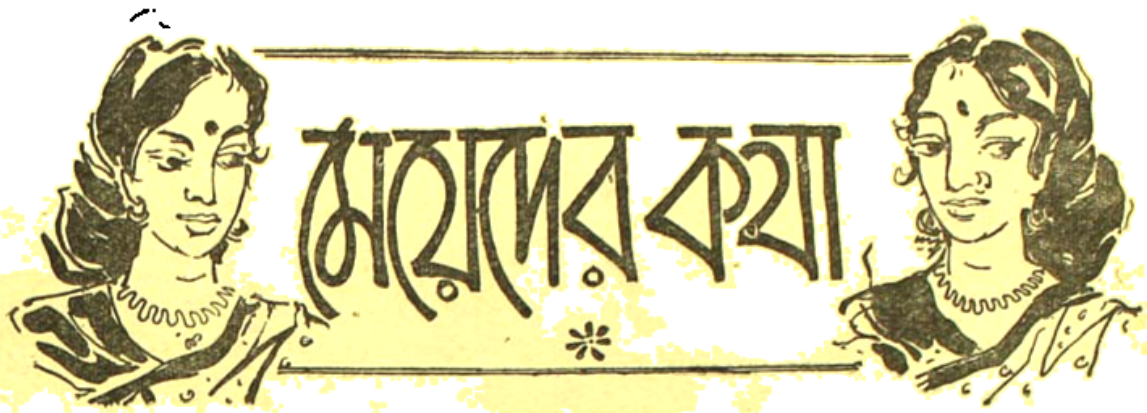

দাম্পত্য ধর্ম্মের দ্বাদশ শীল

শৈল চট্টোপাধ্যায়

গত সংখ্যায় এই বিভাগে শ্রীমতী মীরা রায় বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তারই সূত্র ধরে বলতে চাই যে আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে বিবাহ বিচ্ছেদের স্থান নেই এবং আমাদের সামাজিক কাঠামোতেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যের এই বিচ্ছেদ একেবারেই বেমানান। অনেকে হয়ত বলবেন আজকালকার স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রগতি ও স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে ক্ষেত্রবিশেষে স্ত্রীদের স্বামীর সহিত বিচ্ছেদের অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু শিক্ষিতা ও স্বাধীনচেতা নারীর কাম্য কি স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, না প্রেম-প্রীতিভরা মিলিত জীবনের মধুময় পরিবেশে শান্তিপূর্ণ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা? সকলে নিশ্চয়ই একবাক্যে বলবেন এইরূপ শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রাই কাম্য। তবে আজকাল শিক্ষিত ও শিক্ষিতা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এত সংঘাত, এত দ্বন্দ্ব কেন? কেন এই স্বর্গীয় ধর্ম্মবন্ধনকে অস্বীকার করবার চেষ্টা? একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে এই আধুনিকযুগের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রীরা দাম্পত্য জীবনের মূলগত অর্থ কি, নীতি কি ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ! শুধু তাই নয় এই তথাকথিত শিক্ষিত ও শিক্ষিতা স্বামী-স্ত্রীরা ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধা করতে, ধর্ম্মের অনুশাসনকে অস্বীকার করতে যতটা পটু, দাম্পত্য জীবনে কি ভাবে চললে সংসার শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে, স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল অটুট থাকবে, সে বিষয়ে ততটাই অপটু। বিবাহ কি? দাম্পত্য জীবন কি ভাবে নির্ব্বাহ করতে হয়? দাম্পত্য জীবনের আদর্শ কি? ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আজকালকার আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রীদের জ্ঞানও খুবই সীমাবদ্ধ। দাম্পত্য জীবনে কয়েকটি মূল নীতি সাধারণভাবে মেনে চললেও সংসারে শান্তি ও স্বস্তি বাজায় থাকবে এবং বিচ্ছেদের কোনও সম্ভাবনাই দেখা যাবে না। এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছুটা আলোচনা এবারে করছি।

নারী ও পুরুষের মিলনেই মানবের পূর্ণতা। পুরুষের পৌরুষ বীর্য্য ও নারীর কোমল প্রকৃতি ও কমনীয় ভাব,—পুরুষের গৌরব ও রমণীর লজ্জাশীলতা, পুরুষের উদারতা ও নারীর স্নেহ প্রবণতা, পুরুষের শ্রমশীলতা ও নারীর সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের সংমিশ্রণেই মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ। তাদের মধ্যে এই প্রকারের গুণের সমাবেশ রয়েছে বলেই তাদের পরস্পরের প্রতি এত আকর্ষণ, এত প্রেম, এত ভালবাসা। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের জন্যেই ভগবান তাদের অন্তরে প্রেম, আসঙ্গ লিপ্সা, কামনা প্রভৃতি দিয়েছেন। নারী পুরুষের মিলনে যে প্রেমের সাধনা হয় তাতে উভয়ের জীবন মধুময় হয়ে উঠে। তাদের কামনা বাসনা চরিতার্থ হয়ে সন্তান জন্ম সম্ভব করে, সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করে। দাম্পত্য প্রেমই বিশ্বজনীন প্রেমের উৎস—ইহাতেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। এ সকল থেকে বুঝা যায় যে স্ত্রী পুরুষের

দাম্পত্য মিলনে ভগবানের মহান, পবিত্র ও কল্যাণময় অভিপ্রায় বর্ত্তমান রয়েছে। নারী-পুরুষের মিলন ভগবানের বিশেষভাবে অভিপ্রেত, তাই এই মিলনকে সুখময় ও শান্তিময় করে ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করা উচিত। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ ও সুখময় দাম্পত্য জীবন যাপন করতে হলে দম্পতিকে কতকগুলি বিশেষ বিষয় মনে রাখতে হবে। এই বিষয়গুলি এখানে উল্লেখ করছি। আশা করি আমার বিবাহিতা ভগ্নীরা এইগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়বেন এবং নিজেদের জীবনে এগুলি কার্য্যকরী করবার জন্য সচেষ্ট হবেন।

১। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পালন করতে হবে।

২। স্বামীস্ত্রীর এমন শিক্ষা, দীক্ষা ও যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয় যেন তারা দাম্পত্য জীবনের সম্যক সার্থকতা সম্পাদন করতে সমর্থ হয়।

৩। পতি ও পত্নীর পক্ষে সাধারণতঃ এক ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া প্রয়োজনীয়। আহার, বিহার, চলা, ফেরা প্রভৃতি বিষয়ে তাদের রুচি ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪। তাদের পরস্পরের প্রতি পবিত্র ও বিশুদ্ধ প্রেম থাকা আবশ্যক।

৫। বিবাহকালে তারা পরস্পরকে মনপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক পরস্পরের সহধর্ম্মী ও সহধর্ম্মিণী হয়ে পরস্পরের সুখ ও কল্যাণের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করছে বলে, ভগবানের সমীপে ও আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। তারপরে কায়মনোবাক্যে সে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যে বদ্ধপরিকর হতে হবে।

৬। পতি ও পত্নী কেবল ইন্দ্রিয় ভোগে নিরত না হয়ে প্রেমের সাধনায় মগ্ন হলে জীবন অধিকতর আনন্দের ও কল্যাণের হবে।

৭। পতি ও পত্নী সর্ব্বদা পরস্পরের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকবে।

৮। পতি ও পত্নী পরস্পরকে সকল বিষয়ে সুখী করতে ও সুখী রাখতে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা চেষ্টা করবে। কখনও কোন বিষয় নিয়ে পরস্পরের সহিত কলহ ও অভিমান করা অত্যন্ত অন্যায়।

৯। পতির বয়স পত্নীর বয়স অপেক্ষা অধিক হওয়া বিহিত। সকল বিষয়ে পত্নীর পতি অনুগামী হওয়া কর্ত্তব্য। সকল অবস্থায় পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ পতির অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ হলে যা সুবিবেচনা সঙ্গত বলে স্থিরীকৃত হবে তদনুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য।

১০। পতি ও পত্নী পরস্পরের সহিত পরামর্শ করে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের সকল বন্দোবস্ত করবেন। যাতে তাদের কারো প্রাণে আঘাত লাগে কিংবা বিরক্তি জন্মায় পতি ও পত্নীর এমন কোন কথা কিংবা কাজ করা অনুচিত।

১১। সকল বিষয়ে পতি ও পত্নীর পক্ষে পরস্পরের প্রীতি ও সন্তোষজনক কার্য্য করা এবং অপ্রীতি ও অসন্তোষজনক কার্য্য না করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

১২। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীদিগকে নিজ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীবৎ মনে করা এবং তাঁদের প্রতি তদনুসারে বিহিত কর্ত্তব্য পালন অত্যাবশ্যক।

মোটামুটিভাবে উল্লিখিত উপদেশাবলী পালন করবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলেও স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-জীবন তথা তাদের সংসার সুখ শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

——

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-বি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অনেক সময় ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয় প্রভৃতি ব্যাধি অথবা কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে প্রসূতির পক্ষে, শিশু-সন্তানকে স্তন্যদান না করাই উচিত। কারণ, রোগাক্রান্ত মাতার স্তন্য-দুগ্ধ পানে শিশু-সন্তানেরও যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কাজেই এ সব ক্ষেত্রে, অজ্ঞতা বা অবিবেচনার ফলে, সুস্থ-সন্তানকে স্তন্যদানে অথবা অসুস্থ করে না তুলে, শিশুর মঙ্গলার্থে প্রসূতির উচিত—নিজের স্তন্য-দুগ্ধ গেলে বার করে ফেলে দেওয়া এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক-ধাত্রীদের পরামর্শা-

সুসারে সাময়িকভাবে শিশুকে যথোচিত পরিমাণে কৃত্রিম-দুগ্ধ পান করিয়ে সুস্থ সবল রাখা। তাহলে মাতার রোগ আর সহজে নীরোগ শিশুতে কোন রকমে সংক্রামিত হবার বিশেষ তেমন আশঙ্কা থাকে না এবং শিশুর পুষ্টি-বৃদ্ধি ও স্বাস্থোন্নতি অটুট অব্যাহত রাখাও সম্ভব হয়। তবে শিশুকে কৃত্রিম-দুগ্ধ পান করানোর সময়—পুরো-মাত্রায় দেওয়ার পরিবর্তে, বিচক্ষণ ধাত্রী বা চিকিৎসকের উপদেশমতো প্রয়োজনানুযায়ী পরিমাণে কতকটা জল মিশিয়ে হালকা করেই দেওয়া আবশ্যক। সাময়িক রোগভোগের পর, প্রসূতি সুস্থ-সবল হয়ে উঠলেই, অভিজ্ঞ ধাত্রী বা চিকিৎসকের বিধানমতো, পুনরায় শিশু-সন্তানকে নিয়মিত-ভাবে স্তন্যদান করাই ভালো।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে, সন্তান-প্রসবের দু'-তিনমাস পরেই, অনেক প্রসূতির মাসিক-ঋতু দেখা দেয় এবং শিশুর অমঙ্গল-আশঙ্কায় এজন্য তাঁরা কেউ কেউ এই বিশেষ-কয়েকটি দিনের জন্য সাময়িকভাবে শিশুকে স্তন্যদান করা থেকে অথবা বিরত থাকেন। আধুনিক ধাত্রী-চিকিৎসক-দের মতে, এমন ধারণা পোষণ করা, প্রসূতির পক্ষে, শুধু ভুলই নয়, রীতিমত অন্যায়ও বটে। কারণ, তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে এ-অবস্থায় সাময়িক-গোলযোগের ফলে, প্রসূতির শরীর দুয়েকদিন কাহিল-দুর্বল ও অসুস্থ বোধ হলেও, এই স্বাভাবিক কায়িক-বৈকল্য, অচিরেই নিরাময় হয়ে যায়। কাজেই সেজন্য অযথা শিশু-সন্তানকে স্তন্যদান করা মুলতবী রাখা ঠিক নয়···বরং, এ ব্যবস্থার ফলে, নিয়মিত অভ্যাস অনুযায়ী মাতৃ-দুগ্ধপানের অভাবে, শিশুর যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া, প্রসূতির এই সাময়িক দুর্ভোগকালে, শিশু যদি দুয়েকদিন মাতৃদুগ্ধ পান করার ফলে অল্প-বিস্তর অস্বস্তি-অসুবিধা বোধ করে, সেজন্য চিন্তিত হবার বিশেষ কোনো কারণ নেই···শিশুর এ অস্বচ্ছন্দতা অচিরেই দূর হয়ে যাবে! এমন কি, শিশু যদি খিটখিটে মেজাজী হয়ে ওঠে, বা তরল-দাস্ত করে, তাহলেও প্রসূতির দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার প্রয়োজন নেই। তবে এই সাময়িক শারীরিক-গোলযোগের সময়, প্রসূতির স্তন্য-দুগ্ধের পরিমাণ যদি কমে যায়, তাহলে শিশু-সন্তানকে মাতৃ-দুগ্ধের অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী পরিপূরক খাদ্য হিসাবে, বাড়ীতে টাটকা গরুর দুধ থেকে ছানা বানিয়ে, দিনে তিনবার ছানার জল খাওয়ানো ভালো।

অনেক সময় কোনো কোনো প্রসূতি অনুযোগ জানিয়ে থাকেন যে নিতান্তই মানসিক কারণে তাঁরা শিশু-সন্তানকে যথাযথভাবে স্তন্যদান করতে পারেন না। এ ধরণের অনুযোগ—বাস্তবিকই অযৌক্তিক বোধ হয়। কারণ, নিজের শিশু-সন্তানকে, স্তন্যদুগ্ধ দান করান—এ পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্ব-সমাজে সর্বকালেই দেহে মনে সুস্থ ও স্বাভাবিক সকল মায়েরই প্রকৃতিগত ঐকান্তিক বাসনা এবং সহজাত-ধর্ম। সৃষ্টির আদি-যুগ থেকে আজও পর্যন্ত প্রসূতি ও শিশু-সন্তানের এই সম্পর্ক অব্যাহতকাল অব্যাহত রয়েছে। কাজেই, চিরাচরিত এই স্বাভাবিক রীতির ব্যতিক্রম ঘটতে দেখলেই, স্বতঃই প্রশ্ন জাগে যে—প্রসূতির দৈহিক বা মানসিক সুস্থতার সম্ভবতঃ কোনো গোলযোগ বা বিকার বৈকল্যাদি উপসর্গের উদ্ভব হয়েছে। তাই এ-ধরণের মানসিক উপসর্গাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে, প্রসূতিকে অবিলম্বে অভিজ্ঞ বিচক্ষণ ধাত্রী-চিকিৎসক দেখিয়ে তাঁদের পরামর্শানুসারে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। তবে সাংসারিক কারণে দুশ্চিন্তা বা শারীরিক ব্যাধির ফলে, প্রসূতির পক্ষে যদি সন্তানকে স্তন্যদান করা একান্তই অসুবিধাজনক বা অসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সে সব ক্ষেত্রে, মাতৃ-দুগ্ধের বদলে শিশুকে কৃত্রিম দুগ্ধ পান করানোই বিধেয়। ধাত্রী-চিকিৎসকদের মতে, সুস্থ-স্বাভাবিক সকল প্রসূতিরই অবশ্য সম্ভবপর হলে, শিশু সন্তানকে কৃত্রিম দুগ্ধের বদলে অন্ততঃ সাত-আটমাস বয়স পর্যন্ত স্তন্য-দুগ্ধ পান করানোই উচিত। কারণ, জননীর স্তন্যদুগ্ধই হলো—শিশু সন্তানের সব চেয়ে উপকারী ও পুষ্টিকর খাদ্য এবং পানীয়। তবে যদি কোনো বিশেষ-কারণবশতঃ, প্রসূতির পক্ষে শিশুকে এভাবে সাত-আটমাসকাল যাবৎ স্তন্যদুগ্ধ দান করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে পাঁচ ছয়মাসকাল স্তন্যদুগ্ধ দেওয়া উচিত। অনেকক্ষেত্রে আবার এমনও দেখা যায় যে কোনো কোনো প্রসূতি অত্যধিক-সন্তানানুরাগের ফলে, নিজের দৈহিক অসুস্থতা বা রোগ-ভোগ সত্ত্বেও, পরম নিষ্ঠাভরে সঙ্গে নিয়মিতভাবে শিশুকে তাঁর স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়ে থাকেন। এভাবে

শিশুকে অসুস্থা জননীর শুদ্ধ দুগ্ধ দান করা কিন্তু খুবই অনুচিত। কারণ প্রসূতির এই অযৌক্তিক আগ্রহাতিশয্যের ফলে, উপকারের পরিবর্তে শিশুর অপকারই ঘটে থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। কাজেই শিশু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী সকল প্রসূতিরই এ সম্বন্ধে সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

কোনো কোনো প্রসূতি অনেক সময় অনুযোগ-জানিয়ে থাকেন যে তাঁর শিশু সন্তানের পক্ষে স্তন্য দুগ্ধ ঠিকমতো পরিপাক বা সহ্য করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না বলেই, শেষ পর্য্যন্ত নিতান্ত বাধ্য হয়েই কৃত্রিম দুগ্ধ দানের সহায়তা নিয়েছেন। এ ধরণের যুক্তি কিন্তু আধুনিক ধাত্রী চিকিৎসকদের কাছে সব সময় গ্রহণযোগ্য হয় না। কারণ, তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে—প্রসূতির স্বাস্থ্য ভালো থাকলে এবং তিনি নিয়মিতভাবে যথোচিত খাদ্য গ্রহণ করলে, তাঁর স্তন্য-দুগ্ধ শিশু-সন্তানের শারীরিক পুষ্টির পক্ষে, সাধারণতঃ এমন অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে না। তবে উপরোক্ত কারণগুলি যথাযথভাবে বজায় থাকা সত্ত্বেও শিশুর পক্ষে যদি প্রসূতির স্তন্যদুগ্ধ পরিপাকের গোলযোগ ঘটে, তাহলে সে ক্ষেত্রে বিশেষ নজর রাখা দরকার যে শিশুকে দুগ্ধপান করানোর ব্যাপারে কোনো দোষ ত্রুটি হচ্ছে কিনা। শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান করানোর ব্যাপারে কোনো দোষ ত্রুটি ঘটলেই, প্রসূতির উচিত—অবিলম্বে অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ ধাত্রী বা চিকিৎসকের উপদেশ-পরামর্শানুসারে, তার সংশোধন ও যথোচিত সুব্যবস্থা অবলম্বন করা। সাধারণতঃ দেখা যায় যে অজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতার ফলে, অনেক প্রসূতিই স্তন্যদানকালে শিশুর শারীরিক-পুষ্টির প্রয়োজনানুযায়ী দুগ্ধপান করানোর দিকে সবিশেষ নজর রাখেন না··· এবং অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই তাঁরা শিশুকে—হয় কম, অথবা বেশী পরিমাণে দুধ খাইয়ে থাকেন। এজন্য স্তন্যপায়ী-শিশুর শারীরিক-স্বাস্থ্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া শিশুকে অনাবশ্যক তাড়াতাড়ি স্তন্যদুগ্ধ পান করানোর দোষে, শিশুর পরিপাক শক্তিরও বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং পাকাশয়ে বায়ু-প্রবণতা··· এমন কি, অজীর্ণতার উপসর্গ দেখা দেয়। এ সব ক্ষতিকর উপসর্গের উপদ্রব বাঁচিয়ে শিশুর স্বাস্থ্য, পরিপাক শক্তি এবং দৈহিক পুষ্টি অব্যাহত রাখতে হলে, প্রত্যেক প্রসূতিরই কর্ত্তব্য—শিশুকে সযত্নে ও ধীরে ধীরে যথোচিত সময় ব্যয় করে ধৈর্য্য ধরে স্তন্যদুগ্ধ পান করানো।

অনেক সময় শিশু পরিচর্য্যা সম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার অভাবে এবং শিশু সন্তান বেশী কাঁদে বলে, কোনো কোনো প্রসূতি সন্তানকে অন্যায়ভাবে 'রবারের চুষি' দিয়ে ভুলিয়ে রাখার বেয়াড়া অভ্যাসও ধরিয়ে দেন। স্তন্যপায়ী শিশুকে এভাবে 'চুষি' দিয়ে ভুলিয়ে রাখা রীতিমত অনুচিত। কারণ এই 'চুষি খাওয়ার' কদ-ভ্যাসের ফলে, অবোধ শিশু অযথা চুষি কাঠি টেনে টেনে তার শরীরের সামর্থ্য ক্ষয় করে অকারণ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। কাজেই অহেতুক চুষি টানার পর শিশুকে স্তন্যদান করলে, সে বেচারীর তখন আর স্বাভাবিকভাবে প্রসূতির স্তন্য-দুগ্ধ পান করার উপযোগী তেমন বিশেষ আগ্রহ বা ক্ষমতাও থাকে না। এ কারণে শুধু যে শিশুরই স্বাস্থ্যহানি ঘটে তাই নয়, প্রসূতির স্তন্য দুগ্ধেরও ক্রমশঃ স্বল্পতা ঘটে···এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে অকালেই শুকিয়ে যায়। অভিজ্ঞ-আধুনিক ধাত্রী এবং চিকিৎসকদের মতে, সুস্থ-স্বাভাবিক শিশুকে সাধারণতঃ, আট নয়মাসকাল নিয়মিতভাবে স্তন্যদানের পর, আটমাস বয়স থেকে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ কৃত্রিম দুগ্ধ পানে অভ্যস্ত করে তুলে, যদি স্তন্য পানের ব্যবস্থা মুলতুবী রাখা যায়, তাহলে প্রসূতি ও সন্তান—কারোরই স্বাস্থ্যের বিশেষ কোনো গোলযোগ বা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না। শিশু ছয়মাস-বয়সের হলে, স্তন্য-দুগ্ধদান বন্ধ না করলেও, অভিজ্ঞ ধাত্রী-চিকিৎসকদের পরামর্শমতো, তখন থেকেই তাকে অল্প-স্বল্প বার্লির জল ও শাক-সব্জীর ঝোল এবং 'পরিজ' খাওয়ানোর অভ্যাস সুরু করানো ভালো।

তবে সময়ের আগে শিশুকে স্তন্য দুগ্ধপানের অভ্যাস ছাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিলে একেবারে আচমকা স্তন্য দান বন্ধ করে পুরোপুরি কৃত্রিম-দুগ্ধ পান করানো বিধেয় নয়। এ সম্বন্ধে আধুনিক ধাত্রী-চিকিৎসকেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রসূতির স্তন্য দুগ্ধের স্বল্পতা ঘটলে, শিশুকে প্রথমে স্তন্য-দান করে, তারপর প্রয়োজন-মতো পরিমাণে কৃত্রিম দুগ্ধ পান করানোই উচিত। সাধারণতঃ অন্ততঃ পাঁচ-সাত সপ্তাহকাল যাবৎ এই ভাবে এবং ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে কৃত্রিম-দুগ্ধ পান অভ্যাস করিয়ে

শিশুকে স্তন্য-দান বন্ধ করে দেওয়াই সমীচীন। তবে বিশেষ কোনো কারণ বা জরুরী প্রয়োজনবোধে, এতখানি সময়ের পরিবর্তে অন্ততঃ দুই তিন সপ্তাহকালের মধ্যেও দুগ্ধদান বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে।

শিশুকে স্তন্য দুগ্ধদানের অভ্যাস ছাড়ানোর মোটামুটি রীতি হলো—গোড়ার দিকে, দিনে একবার স্তন্য দান মুলতুবী রেখে, ধীরে ধীরে পর্য্যায়ক্রমে, দুইবার তিনবার এবং এমনি উপায়ে সম্পূর্ণভাবে স্তন্য-দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ ও তার বদলে কৃত্রিম-দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করা। তবে এভাবে অভ্যাসের পরিবর্ত্তনের জন্য পর্য্যায়ক্রমে তিন থেকে সাত দিন পর্য্যন্ত সময় নেওয়াই সমীচীন। শিশু সুপুষ্ট হয়ে ক্রমশঃ নয়-মাস বয়সে পদার্পণ করলে, তাকে চামচের সাহায্যে অথবা চুমুক দিয়ে দুগ্ধপানের অভ্যাস করানো ভালো। তবে এ বয়সের আগে বা প্রয়োজনবোধে তারও পূর্ব্বে স্তন্যদান বন্ধ করতে হলে, শিশুকে 'ফিডিং বটল্' (feeding bottle) বা দুধের বোতলে ভরে কৃত্রিম দুগ্ধ খাওয়ানো উচিত। শিশুর দন্তোদ্গম হলে অবশ্য, এভাবে বোতলে ভরে দুধ না খাওয়ানোই যুক্তিযুক্ত। শিশু দশমাস বয়সের হয়ে উঠলে, স্তন্য দুগ্ধদান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ এবং রাত দশটায় সময়ের দুধ-খাওয়ানোর রীতিটি ত্যাগ করানো চাই। কারণ, এ বয়সের শিশুর পক্ষে, সাধারণতঃ, সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছয়টা—অর্থাৎ প্রায় বারো ঘণ্টাকাল বিশ্রাম ও নিদ্রার আবশ্যক। তবে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে দুধের পরিমাণ বাড়িয়ে ও জলের মাত্রা কমিয়ে দেওয়া দরকার। এ ব্যবস্থার সময় শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিপাক-শক্তির দিকেও সজাগ-দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

সুপর্ণা দেবী

মহিলাদের মুখশ্রী সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ অটুট, দীর্ঘস্থায়ী এবং লাবণ্যশোভায় মনোরম রাখতে হলে, আহার বিহারে নিয়মানুবর্ত্তিতা, যথোচিত বিশ্রাম, নিদ্রা, আর নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা করা বিশেষ আবশ্যক। হাত, পা, বুক, পিঠ, কোমর, প্রভৃতি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সুঠাম সুন্দর ও সুস্থ সাবলীল রাখার জন্য, নিত্য নিয়মিত বিশেষ সেবা পরিচর্য্যার যেমন প্রয়োজন, মুখের শ্রী সৌন্দর্য্য লাবণ্য মোহনীয় অটুট রাখতে হলেও চোখ, নাক, মুখ, গাল, চিবুক, কণ্ঠ, ললাট প্রভৃতিরও তেমনি যত্ন পরিচর্য্যা করা চাই। মুখের এই সব বিভিন্ন অংশের সেবা-পরিচর্য্যার সম্বন্ধে আধুনিক রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞেরা সচরাচর যে বিশেষ-পদ্ধতি অনুসরণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন, ইতিপূর্ব্বে গত সংখ্যাতেই আলোচনা প্রসঙ্গে তার মোটামুটি হদিশ দিয়েছি। রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞদের উপদেশমতো যে নিয়ম-গুলি মেনে মুখের পরিচর্য্যা করলে, তারুণ্যের লাবণ্য-শ্রী সহজে ম্লান বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না···মুখে, গালে ও ললাটে অকাল-বার্দ্ধক্যের জীর্ণ-রেখা বা কুঞ্চনের কদর্য্য চিহ্ন দেখা দেবে না—স্বাস্থ্যহীনতার ফলে, চোখের কোল বসে যাওয়া কিম্বা কালিমা আবির্ভাবের আশঙ্কা থাকবে না। এমন কি, যে সব মহিলার মুখের ছাঁদে বা গঠনে কমনীয়তার অভাব, এ পদ্ধতিতে নিত্য নিয়মিত সেবা পরিচর্য্যার দৌলতে, তাঁদের বেছাঁদ মুখও ক্রমশঃ সুঠাম সুন্দর ভরাট নিটোল হয়ে উঠে লাবণ্য-শ্রীতে ঝলমল করবে। তবে

এ সব বিধি মেনে চলার সঙ্গে সঙ্গে মুখের সেবা পরিচর্য্যার জন্য, আধুনিক রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞেরা বিশেষ ধরণের যে কয়েকটি সহজ সরল ব্যায়াম-পদ্ধতি অনুশীলনের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলিও নিয়মিত পালন করা দরকার। প্রসঙ্গক্রমে, এবারে আমরা মুখের সেবা পরিচর্য্যার উপযোগী সেই সব ব্যায়াম পদ্ধতির কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গীর মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি। এ ব্যায়াম ভঙ্গীগুলি নিয়মিত অভ্যাস করা—খুব একটা শ্রমসাধ্য কঠিন কাজ নয়···এর জন্য প্রয়োজন শুধু—আন্তরিক প্রচেষ্টা আর ঐকান্তিক-নিষ্ঠা···তাহলেই অচিরে স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন ও দৈহিক লাবণ্য-শ্রী লাভ করা সম্ভব হবে।

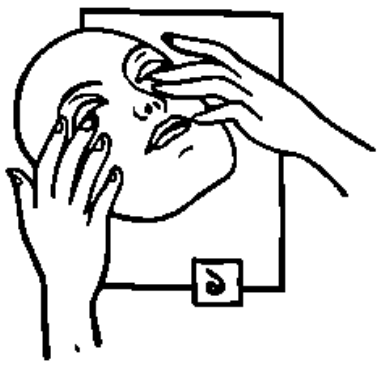

আধুনিক রূপচর্চ্চা বিশেষজ্ঞেরা সচরাচর মহিলাদের মুখের ও চোখের শোভা-মাধুরী অক্ষুণ্ণ রাখার উপযোগী বিশেষ ধরণের যে ব্যায়াম পদ্ধতি অনুশীলনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন, উপরের ১নং চিত্রে সেই ভঙ্গীটির মোটামুটি হদিশ মিলবে। এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি অনুশীলনের রীতি—দুই চোখের দৃষ্টি উপর দিকে স্থিরভাবে নিবদ্ধ রেখে, ১নং চিত্রের ভঙ্গী অনুসারে দুই চোখের নীচে ধীরে ধীরে এবং খুব আলতোভাবে দুই হাতের দুটিমাত্র আঙুলের মৃদু চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ 'ম্যাসাজ' (Massage) বা 'মর্দ্দন' করতে হবে। তবে এভাবে আঙুলের মৃদু চাপ দিয়ে চোখের নীচের অংশভাগ 'ম্যাসাজ' বা 'মর্দ্দন' করবার সময়, নজর রাখবেন—মুখের ত্বকে যেন টান না পড়ে এবং দুই আঙুলের চাপ যেন বেশী না হয়। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি অভ্যাসের ফলে, দুই চোখের পারিপার্শ্বিক পেশী-স্নায়ুগুলির রক্ত চলাচল ক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং অকালে চোখের কোলে কালি পড়া, কুঞ্চন রেখার আবির্ভাব ও দৃষ্টিক্ষীণতার আশঙ্কা দেখা দেয় না। এ ব্যায়ামটি নিত্য নিয়মিত অন্ততঃপক্ষে, দশ পনেরোবার সময়ে অভ্যাস করা ভালো।

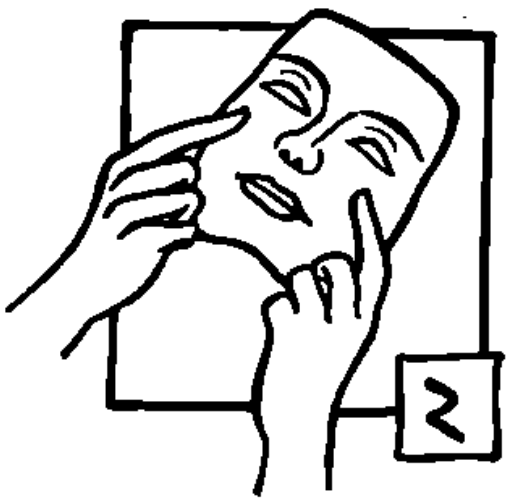

মহিলাদের মুখের, গালের ও নাকের গঠন সুঠাম সুন্দর ছাঁদের করে তোলার জন্য, উপরের ২নং চিত্রের নমুনা অনুযায়ী ব্যায়াম ভঙ্গীটি বিশেষ উপযোগী। এ ব্যায়াম অনুশীলনের রীতি—পূর্ব্বোক্ত ধরণে মুখটিকে উপর দিকে উঁচুভাবে রেখে, দুই গালে দুই 'চিকের' বা 'Cheek Bones'-এর উপর দুই হাতের দুই তর্জ্জনীর মৃদু-আলতো চাপ দিয়ে 'ম্যাসাজ' বা 'মর্দ্দনের' ভঙ্গীতে হাতের আঙুল দুটিকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে টেনে নিতে হবে। তবে খেয়াল রাখবেন—এভাবে 'মর্দ্দন' বা 'ম্যাসাজের' সময়, হাতের আঙুল দুটি নাসাগ্রের সমরেখায় আসামাত্রই একসঙ্গে দুটি আঙুলই সরিয়ে নেওয়া চাই। এমনি রীতিতে, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সকালে ও রাত্রে শয্যাত্যাগ ও শয্যা গ্রহণের সময় অন্ততঃ দশ পনেরোবার সযত্নে এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি অভ্যাস করলে, মুখের লাবণ্য শ্রী ক্রমশঃ কমনীয়, মনোরম ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠবে।

৩০১ পৃঃ ৩নং চিত্রে বিশেষ ধরণের যে ব্যায়াম ভঙ্গীটির নমুনা দেখানো হয়েছে, আঁখি পল্লবের দোষ ত্রুটি নিবারণ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পক্ষে, সেটি খুবই উপযোগী। এ ব্যায়াম ভঙ্গীটিও প্রত্যহ নিদ্রাভঙ্গের পর এবং নিদ্রাগমনের আগে নিয়মিতভাবে অন্ততঃ পনেরো কুড়িবার সযত্নে অনুশীলন করা প্রয়োজন। ব্যায়ামের এই বিশেষ ভঙ্গীটি অনুশীলনের রীতি—দুই চোখ মুদ্রিত করে, চোখের পাতার

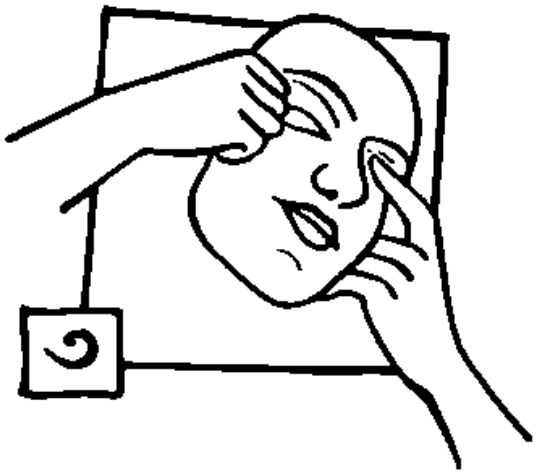

উপর সামান্য একটু 'ক্রীম' (Face Cream) মাখিয়ে, মুদ্রিত চোখের দুটি পাতার উপর দুই তর্জনীর আলতো মৃদু চাপ দিয়ে অন্ততঃ দশ পনেরোবার সযত্নে ধীরে ধীরে 'ম্যাসাজ' বা 'মর্দ্দন' করতে হবে। এভাবে 'ম্যাসাজ' বা 'মর্দ্দনের' ফলে, চোখের পাতা ও দুই চোখের ভিতরের স্নায়ুগুলিতে রক্ত চলাচল ক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত হয়…আঁখি পল্লবের সৌন্দর্য্যশ্রী রমণীর মনোরথ হয়ে ওঠে এবং দৃষ্টি শক্তিও সুস্থ-সতেজ, আর দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে।

স্থানাভাবের কারণে, মুখশ্রী সৌন্দর্য্যের শোভা বৃদ্ধির উপযোগী বিশেষ ধরণের আরো কয়েকটি সহজ সরল ব্যায়াম ভঙ্গীর সচিত্র বিবরণ এবারে প্রকাশ করা সম্ভব হলো না…আগামী সংখ্যায় সেগুলির পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

—

হাতের কাজ

পুঁতির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় ক্যাম্বিশের লম্বা কালির উপর, নানা রঙের পুঁতি সাজিয়ে, সেগুলিকে সাজিয়ে রেখে অভিনব পদ্ধতিতে ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যবহারোপযোগী সৌখিন সুন্দর বিচিত্র ছাঁদের যে কোমর বন্ধনী বা বেল্ট রচনার যে আলোচনা সুরু করেছিলুম, এবারে তার বাকী পরিচয় …অর্থাৎ, কাপড়ের গায়ে রঙীন পুঁতিগুলিকে কি উপায়ে সহজ সুন্দর নিখুঁত পরিপাটি ধরনে ও পাকাপাকিভাবে সেলাই করে বসানো যায়—সেই রীতির মোটামুটি হদিশ দিচ্ছি।

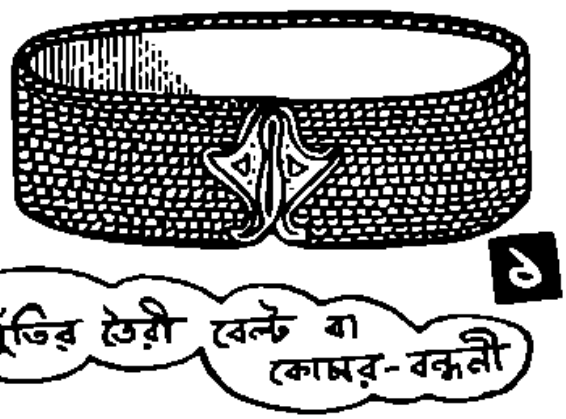

১

পুঁতির তৈরী বেল্ট বা কোমর-বন্ধনী

উপরের নক্সা-নমুনার ছাঁদে ক্যাম্বিশের কালির উপর রঙীন-পুঁতির সারি সেলাইয়ের জন্য চাই—প্রয়োজনমতো মাপের এক টুকরো কার্পেট বোনার কাপড়। কোমর বন্ধের আকার অনুযায়ী ক্যাম্বিশের লম্বা কালিটি যেমন

ছাঁদে ছাঁটাই করা হবে, কার্পেট বোনার কাপড়ের টুকরোটিকেও অবিকল সেই মাপে ছাঁটা কাট করে নিতে হবে। কারণ সমান মাপে ছাঁটাই করা এই কার্পেট বোনার কাপড়ের টুকরোটিকে, ক্যাম্বিশের লম্বা কালির গায়ে সেঁটে বসিয়ে রেখে ছুঁচ সুতোর ফোঁড় দিয়ে একের পর এক ঘর তুলে কার্পেটের নক্সা রচনার ভঙ্গীতেই রঙ বেরঙের প্রত্যেকটি পুঁতিকেই যথাযথভাবে সারিতে সাজিয়ে গেঁথে অভিনব ছাঁদের সৌখিন বোনার বন্ধনীকে আগা গোড়া রচনা করতে হবে। ক্যাম্বিশে পুঁতিগুলি সেলাই করতে হবে যেখানে আড়াআড়ি এবং খাড়াখাড়িভাবে

নক্সা-রচনার রীতি

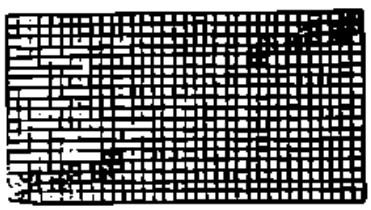

সুতোর যোগ সন্ধি ঘটেছে—সেখান থেকে। উপরের ২নং ছবিটি দেখলেই—এ যোগ সূত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মিলবে। সেলাই পড়বে—ক্যাম্বিশের কালির গায়ে সেঁটে বসানো কার্পেট বোনার কাপড়ের উল্টো পিঠে। পুঁতি সেলাইয়ের কাজ সুরু করতে হবে—বাঁ দিকের মাথার প্রান্তভাগ থেকে। পাশের ১নং চিত্র দেখলেই বুঝতে পারবেন—কোথা দিয়ে কি ভাবে ছুঁচ সুতোর ফোঁড় দিয়ে কার্পেটের কাপড়ের উপর একের পর এক রঙীন পুঁতি-গুলিকে সুষ্ঠু সুন্দর উপায়ে সারিতে সাজিয়ে গেঁথে সেলাই করতে হবে।

পুঁতি বোনা হলে, সব পুঁতি যাতে পরিপাটিভাবে এক দিকে হেলে থাকে,—সেজন্য বুনতে বুনতে কার্পেটের কাপড়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বোনা শেষ হলে, নীচে থেকে উপর দিকে উঠে একের পর এক প্রত্যেকটি সারি বুনে যাবেন। তাহলে, কাজও সহজ হবে এবং বুননটিও আগা-গোড়া বেশ নিখুঁত পরিপাটি ছাঁদের দেখাবে। এ ছাড়া আরেক রীতিতেও সেলাইয়ের কাজ করা চলে। সে রীতিটি হলো—কার্পেটের কাপড়ের পিছন-দিক দিয়ে সুতো টেনে এনে, প্রথম সারির উপরকার পুঁতির পাশ থেকে বুনে অপর সারি সেলাইয়ের কাজ করা।

পুঁতি সাজিয়ে সেলাইয়ের কাজ সুরু করবার আগে, নক্সাটি কাপড়ের উপর যথারীতি এঁকে বা ছকে (Tracing) নেওয়াই ভালো। তবে প্রয়োজনবোধে অথবা সূচীশিল্পে যথেষ্ট দক্ষতা অভিজ্ঞতা থাকলে অবশ্য, ছাপানো নক্সার প্রতিলিপি দেখেও, এ কাজ করা যায়। তাহলেও নিখুঁত পরিপাটিভাবে নক্সা রচনার জন্য—সর্ব্বদাই কার্পেট সূচী-শিল্পের পদ্ধতি মতো ঘর গুণে যথাযথ হিসাব করে একের পর এক রঙীন পুঁতি সাজিয়ে গেঁথে সেলাইয়ের কাজ করাই উচিত। এমন কি, কাজের সুবিধার জন্য—সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে পুঁতি গাঁথার আগে, কাপড়ের উপরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে প্রয়োজনমতো 'রঙীন-খড়ি' (coloured chalk) বা পেন্সিলের সূক্ষ্ম-রেখা টেনে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে নেওয়াও ভালো—তাহলে ভুল বা নক্সা বোনবার সময় ঘর ভুল হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

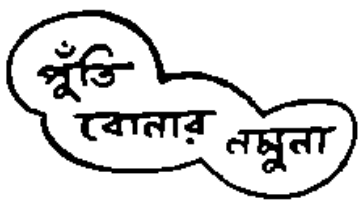

পুঁতি বোনার নমুনা

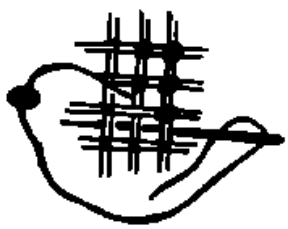

৩

ক্যাম্বিশের কালিটি আগাগোড়া পরিপাটি ছাঁদে রঙীন পুঁতি গেঁথে সেলাই এবং নক্সার আশপাশের জমিটুকু পুরোপুরি ভরাট করার কাজ শেষ হলে, মানানসই রঙের সাটিন কাপড়ের 'কালি' বা 'পাড়' (Lining or border) বসিয়ে, 'কোমর-বন্ধের' কিনারাগুলি সুচারুভাবে মুড়ে সেলাই করে নেবেন। তারপর, 'কোমর-বন্ধের' দুই প্রান্তে, সৌখিন মানানসই ধরণের দুটি মজবুত 'আকড়া' বা 'ক্ল্যাস্প্' (Clasps) সেলাই করে নিলেই,

পুঁজির এই বিচিত্র কারুশিল্প-সামগ্রী রচনায় পালা শেষ হবে।

'কোমর-বন্ধ' ছাড়াও রঙীন পুঁতি গেঁথে এ প্রণালীতে আরো বহু দৌখিন সুন্দর বিচিত্র অভিনব কারুশিল্প সামগ্রী তৈরী করা যেতে পারে। যারান্তরে সে সম্বন্ধে আরো কিছু হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

পশমের পুলোভার

হিরণ্ময়ী দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় হাতা-বিহীন যে পশমী পুলোভার বোনবার হদিশ দিয়েছি, সেটির চেহারা—দেখতে কেমন ছাঁদের হবে, নীচের ছবিতে তার মোটামুটি নমুনা পাওয়া যাবে।

উপরের নমুনামতো ছাঁদে পশমী পুলোভারের পিছনের দিক বা পিঠের অংশ কি উপায়ে বুনতে হবে, ইতিপূর্ব্বেই তার হদিশ দিয়েছি। এই পুলোভারের বাকী অংশগুলি কিভাবে রচনা হবে এবারে তার পরিচয় দিই।

পুলোভারের পিঠের অংশ রচনার জন্য যে-রীতি অনুসারে কাজ করেছেন, সুমুখের অর্থাৎ বুকের, দিকটিও আগাগোড়া তেমনি ধরণেই বুনে যান। এভাবে বুনে, যখন দেখবেন—কাঁটিতে ১১৮ ঘর বাকী, তখন পুলোভারের গলার অংশ বোনবার পালা সুরু করবেন।

পুলোভারের গলার অংশ বোনবার রীতি হলো—এক লাইনে ৫৯ ঘর বুনে যান। তারপর আরেক বাণ্ডিল পশমী সুতো নিয়ে, আগের বুনানী সুতোর সঙ্গে জোড়া দিন। দুটি পশমী সুতোকে এভাবে জুড়ে নেবার পর, আবো ৫৯ ঘর বুনবেন। দু'ধারের ৫৯টি ঘর একই-রীতিতে বুনবেন, তবে গলার দিকে প্রতি ৩য় বেং ৪র্থ লাইনে—১টি করে ঘর কম; তাহলেই দেখবেন—পিঠের দিকের পুট-হাতার মুলের সঙ্গে সামনের দিকের পুট হাতার মুল বেশ সমানভাবে মিলে গেছে। তাছাড়া আরো দেখবেন—দু'দিকে এখন আর ৩৬টি ঘর বাকী। এই ৩৬টি ঘর না কমিয়ে বুনে যান। তবে নজর রাখবেন—শেষের ৪ লাইন কিন্তু এ কয়টি লাইনের চেয়ে যেন সামান্য লম্বা-ধরণের হয়। কারণ, এ লাইনের ঘর কমানো হয়নি।

এবারে পুলোভারের কাঁধের অংশটি পরিপাটি নিখুঁত ছাঁদে বোনবার জন্য, হাতের ফাঁদের দিকে—প্রত্যেকটি লাইনের গোড়ায় ১২টি করে ঘর কমিয়ে, সমস্ত ঘরগুলি বন্ধ করবেন।

তারপর উল্টো-দিক অর্থাৎ, পুলোভারের ভিতরের দিক থেকে কাঁধের অংশের সুমুখ-ভাগ বা বুকের দিক এবং পিছন ভাগ বা পিঠের দিক, পাকাপোক্তভাবে সেলাই করে জুড়ে দিন। এ কাজ সারা হলে, পুলোভারটিকে পুনরায় সোজা করে নিয়ে, ভালোভাবে পাট করে কাঁধের এই সেলাই করে জুড়ে দেওয়া অংশটির উপর কিছুক্ষণ ভারী ওজনের কোনো বই বা ঐ ধরণের অন্য কোনো পরিচ্ছন্ন জিনিষের চাপ দিয়ে রাখলেই—জোড় লাগানো জায়গাটি বেশ পরিপাটি সুন্দর ছাঁদের দেখাবে।

এ কাজটুকু শেষ করে, পুলোভারের দুদিকের হাতার পটি দুটিকে সুচারুছাঁদে বুনে ফেলতে হবে। পুলোভারের হাতার পটি বোনবার জন্য—পোষাকের সোজাদিকে ১০নং

কাঠি দিয়ে ৮৬টি ঘর তুলুন। প্রথম ৮ লাইন বুনবেন—১টি সো:, ১টি উ: রীতি অনুযায়ী। তারপর ঘর বন্ধ করে দেবেন। এবারে ১০ নং কাঠি দিয়ে পুলোভারের ঘাড়ের দিকে গোল করে ২০০টি ঘর বুনুন। তারপর বুনে যান—১টি সো:, ১টি উ: রীতিতে। তবে এভাবে বুনে গিয়ে ১০ম লাইনের পর থেকে প্রতি ২য় লাইনে দু'দিকে ১টি করে ঘ: ক: নিয়ে, ঘর বন্ধ করবেন। তাহলেই উপরের নক্সা নমুনামতো ছাঁদে হাতা-বিহীন পশমী পুলোভার বোনার কাজ শেষ হবে।

বোনার পালা শেষ হবার পর, সুচীশিল্প কলার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, পুলোভারটিকে পরিপাটিভাবে সমতল টেবিল বা পাটার সহযে বিছিয়ে রেখে, পশমী পোষাকটির উপর ঈষৎ-সিক্ত পরিচ্ছন্ন মোলায়েম একটি কাপড় ঢাকা দিয়ে, কাপড়ের উপর গরম-ইস্ত্রি চালান। তাহলে পুলোভারের যাবতীয় কোঁচকানো বেয়াড়া দাগ মিলিয়ে যাবে এবং সদ্য-বোনা পশমী পোষাকটি আগাগোড়া বেশ নিখুঁত সমান হয়ে উঠবে। সযত্নে ইস্ত্রি চালিয়ে, পশমী পোষাকটিকে আগাগোড়া বেশ পরিপাটি সমান করে নেবার পর, পুলোভারের সামনের ও পিছনের আলাদা আলাদা অংশ দুটির 'কিনারা বা পাশ' পাকাপোক্তভাবে সেলাই করে একত্রে জোড়া লাগিয়ে নিতে হবে। এমনিভাবে পুলোভারের সামনের ও পিছনের অংশ দুটিকে সেলাই দিয়ে জুড়ে নেবার পর, পুনরায় পোষাকটির উপর ঠাণ্ডা-ইস্ত্রি চালিয়ে, কোঁচকানো অসমান জায়গাগুলিকে সমান-সিধা করে নিন। তাহলেই, সহজ-সুন্দর উপায়ে পশমী পুলোভার রচনার কাজ শেষ হবে।

—

রান্নাঘর

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—ভারতের দক্ষিণাঞ্চল অধিবাসীদের বিশেষ প্রিয় অভিনব-মুখরোচক বিচিত্র এক-ধরণের আমিষ-জাতীয় খাবার রান্নার কথা। দক্ষিণ-ভারতের এই উপাদেয় আমিষ জাতীয় খাবারটির নাম—'ভাজা চিঙড়ী মাছ।' ছুটির দিনে বা বাড়ীতে কোনো উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে, অল্প খরচে এবং সামান্য পরিশ্রমে আত্মীয় বন্ধু আর অতিথি অভ্যাগতদের সাদরে আপ্যায়ন করতে হলে, দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় বানানো অপরূপ সুস্বাদু এই ভাজা 'চিঙড়ী মাছ' খাবারটি পরম উপযোগী।

চার-পাঁচজনের আহারোপযোগী অভিনব মুখরোচক এই আমিষ জাতীয় খাবারটি রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটি মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, দক্ষিণভারতীয় প্রথায় 'ভাজা চিঙড়ীমাছ' খাবার বানানোর জন্য চাই—তিনপোয়া চিঙড়ীমাছ, আধখানা নারিকেল, মাঝারি সাইজের একটি পেঁয়াজ, চার পাঁচটি শুকনো লঙ্কা, গোটা কয়েক তেজপাতা, চায়ের চামচের এক চামচ গুঁড়ো হলুদ, বড় চামচের দুই চামচ ঘি এবং চায়ের চামচের পৌনে এক চামচ গুড়ো নুন।

ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি সংগৃহীত হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, চিঙড়ী মাছগুলির খোশা ছাড়িয়ে পরিপাটিভাবে ধুয়ে সাফ এবং বেশ ডুমো ডুমো ছাঁদে টুকরো করে কেটে, সেগুলিতে হলুদ আর নুন মাখিয়ে রাখুন। তারপর পেঁয়াজটিকে খোশা ছাড়িয়ে মিহি ছাঁদে কুটিয়ে নিন এবং নারিকেলটিকেও কুরুনীর সাহায্যে খুব মিহি ধরণে কুরে ফেলুন। এ কাজ সারা

হলে, মিহি ছাঁচে কুরে রাখা নারিকেল ও শুকনো লঙ্কা-গুলিকে একত্রে বেটে 'লেই' বা 'মণ্ড' বানিয়ে, চিংড়ী মাছের টুকরোগুলিতে ঐ 'লেই' বা 'মণ্ড' মাখিয়ে নিন।

এবারে উনানের আঁচে রন্ধন পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে উপরোক্ত ঐ 'লেই' বা 'মণ্ড' মাখানো চিংড়ী মাছের টুকরোগুলি ছেড়ে, যথাসম্ভব অল্প একটু জল মিশিয়ে সেগুলিকে আধসিদ্ধ করে নিয়ে রন্ধন-পাত্র থেকে তুলে সযত্নে একটি পরিষ্কার পাত্রে নামিয়ে রাখুন। তারপর রন্ধন পাত্রটিকে পুনরায় উনানের আঁচে চাপিয়ে সেই পাত্রে ঘি গরম করে নিন এবং সেই তপ্ত তরল ঘিয়েতে পেঁয়াজের কুচিগুলিকে বেশ ভালোভাবে ভেজে ফেলুন। এভাবে ভেজে নেবার ফলে, পেঁয়াজের কুচিগুলি আগা গোড়া বেশ বাদামী রঙের হয়ে উঠলে, রন্ধন পাত্রে আধসিদ্ধ চিংড়ী মাছের টুকরোগুলিকে ছেড়ে বাদাম 'মিশ্রণটিকে' উনানের আঁচে বসিয়ে রেখে আরো কিছুক্ষণ ভাজুন। তাহলেই চিংড়ী মাছের টুকরোগুলি ক্রমশঃ বেশ তপ্ত সোনার মতোই উজ্জ্বল বাদামী রঙের হয়ে উঠবে এবং দক্ষিণভারতীয় প্রথায় 'ভাজা চিংড়ী মাছ' খাবার রান্নাও কাজ শেষ হবে।

এবারে উনানের উপর থেকে রন্ধন পাত্রটি নামিয়ে নিয়ে সদ্য পাক করা 'ভাজা চিংড়ী মাছ' খাবারটিকে পরিচ্ছন্ন একটি পাত্রে সযত্নে তুলে রেখে যথাসময়ে প্রিয়জনদের সাদরে পরিবেষণ করুন। অভিনব মুখরোচক এই দক্ষিণ-ভারতীয় আমিষ খাদ্যের সুস্বাদ গ্রহণ করে, তাঁরা যে পরম পরিতৃপ্ত ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

আগামী সংখ্যায় এই ধরণের আরেকটি বিচিত্র উপাদেয় ভারতীয় খাবারের রন্ধনপ্রণালীর হদিশ দেবার চেষ্টা করবো।

শিল্পী—শম্ভু রায়

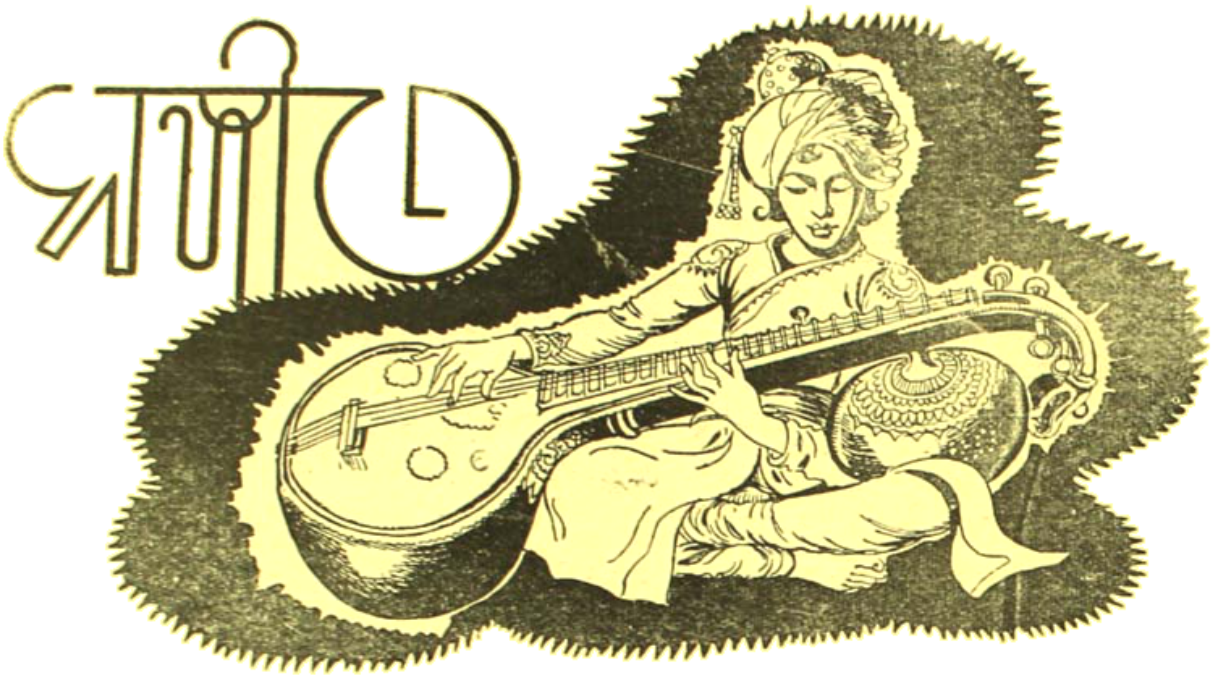

যুগে যুগে একি করুণা ভরে
এসেছ নামি ধূলার ঘরে ॥
নব অরুণের বারতা গাহি
এসেছ আলোর তরণী বাহি
এনেছ কমল ফোটার বাণী
আমার বদ্ধ আঁধার ঘরে ॥
নয়ন জুড়ানো কাজল আঁকি
জাগালে জাগিনি নয়ন ঢাকি
জানি গো জানি তবু যে জানি
পরাণের সে যে আমারি তরে ॥

কথা ও সুর—স্বামী সত্যানন্দ, স্বরলিপি—বেতারশিল্পী শ্রীবন্দনা দাস বি. এ, কোবিদ, সঙ্গীতবিশারদ

× • × •
ধ ধ নি | ধপ ধ প প | - রে ম ম | ম প মপ ধ-
যু গে যু গেস স এ কি স ক রু ণা ত স রেস স
- ধ ধ নি | ধপ ধ প - | - ম গ গ | প - ম -
স এ সে ছ নাস স মি স স ধূ লা র ঘ ং রে স

× ০ × ×

- ম ম ম | ধ - ণসা - | সা সা সা সা | সা নি রেসা -নি

s ন ধ ণ ক s শে s র বা র তা গা s হিs ss

- নি নি নি | নি ধ ণানি - | নি ধ ধ নি | পধ নি ধ -

s এ নে ছ আ s লো s র ক ত র ী বাs s হি s

- ধ ধ নি | ধপ ধ প প | - রে ম ম | -ম প মপ ধ

s এ নে ছ ঝs s ম ল s ফো টা র বা s শিs s

- ধ ধ নি | ধপ ধ প - | - ম গ গ | প - ম -

s আ মা র ঘs ন্ ধ s s আঁ ধা র ঘ s রে

× ০ × ০

- ম ম ম | ধ পধ ধনিসা - | - সা সা সা | সা নি রেসা -নি

s ন য় ন জড়ি s মোss s s কা জ ল ঐা s কিs ss

- নি নি নি | নি ধ ণা নি - | - ধ ধ নি | পধ নি ধ -

s আ গা লে আ গি নি s s ন য় ন টs s কি s

- ধ ধ নি | ধপ ধ প - | - রে ম ম | ম প মপ ধ

s আ নি গো আs s নি s s ত বু বে আ s নিs s

- ধ ধ নি | ধপ ধ প প | - ম গ গ | প - ম -

s গ হা ধ ঘs s দে বে s আ মা র ি ত s রে s

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা

পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান কালে পশ্চিম বাংলায় যে সব পূজা পার্বণ বা মেলা অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এখানে এই পূজায় জাঁক জমক, উৎসব মুখর পরিবেশ, দেশ-বিদেশের লোক সমাগম সব মিলিয়ে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তাতে আজকালকার চলিত প্রথা অনুযায়ী এই উৎসবকে সহরের জাতীয় উৎসব বলে অভিহিত করা চলে।

এই সহরে যে প্রথায় পূজার ব্যবস্থা করা হয় তাতে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই সহরের বিভিন্ন পূজা প্রাঙ্গণে সমাবেত হতে বাধ্য হয়। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র ২০০।৩০০ গজ দূরে দূরে বিরাটাকারের বিভিন্ন মণ্ডপের দেবী প্রতিমা, তার উপর আধুনিক যুগের উপযোগী বৈদ্যুতিক আলোকমালার আকর্ষণীয় ব্যবস্থা, বিভিন্ন মণ্ডপের আশে পাশে দোকানপাট ও মেলার ব্যবস্থা, কোথাও বা কোনও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, এই সব মিলিয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় তাথেকে যে কোনও দর্শকের মনে স্বভাবতঃই ধারণা হয় যে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা খুবই প্রাচীন ও ঐতিহ্য পূর্ণ।

চন্দননগরের এই পূজা যাঁরা দেখেছেন তাঁদের পক্ষে এই পূজার মূল যে অপর কোথাও থাকতে পারে এটা সচরাচর মনে আসেনা। কারণ যে কৃষ্ণনগরে বাংলা দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম পূজা অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও চন্দননগরের চেয়ে জাঁক জমক অনেক কম। ফলে আজকালকার হুগলী, হাওড়া বা বর্দ্ধমান জেলায় যে সব নতুন ধারণায় পূজা হয় সেটা এই চন্দননগরের পূজার প্রভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে গ্রহণ করা যায়।

এই সহরের অধিবাসীরা অনেকেই দাবী করেন যে কৃষ্ণনগরের সঙ্গে সঙ্গে এখানেও পূজার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি এই ধারণা তথ্যভিত্তিক বলে গ্রহণ করা যায়? কৈ ইতিহাসের পাতায় তার সাক্ষ্য মেলে কি? ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারের প্রতিমা—১৩৭২

এই পূজার প্রবর্তক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাই বলে এমন কোনও নিদর্শন পাওয়া গেলনা যাতে কৃষ্ণচন্দ্র ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর জীবিতকালে যে এই পূজার অনুষ্ঠান করেন এমন কোনও ঘটনা হতে পারে। এর পরিবর্তে বরং একটা বিরুদ্ধ মত জানা যায় যে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মৃত্যুর প্রায় তার পাঁচ বছর পরে

কৃষ্ণচন্দ্র নিজের রাজবাটীতে এই পূজার প্রথম প্রচলন করেন।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চন্দননগর দখল করার আগে এখানকার চাউল ব্যবসার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। আর তার পরেই এর ব্যবসায়িক খ্যাতি বিলুপ্ত হয়। তাই কেমন করে বিশ্বাস করা যায় যে ১৭৮০।৮১ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে যে পূজা অনুষ্ঠিত হল তার অনুকরণ করতে কোনও চাউল ব্যবসায়ী আবার কি জন্যে কৃষ্ণনগর যাত্রারম্ভ করলেন। তারপর যে পূজা প্রায় ৩০ বছর ধরে বাইরে কোথাও প্রচলন করার ব্যবস্থা করা হয়নি এমনকি কৃষ্ণনগর সহরের মধ্যেও প্রচলন হয়নি, তা আবার কেমন করে চন্দননগরে প্রবর্তিত হয়?

পূজার পদ্ধতির আলোচনা করলে বেশ সহজেই জানা যায় যে চন্দননগরের পূজা ৪ দিনের; তাই এর কোনও যোগ সূত্র থাকতে পারেনা কারণ কৃষ্ণনগরের পূজা মাত্র ১ দিনের। নদীয়ার রাজপরিবার কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে প্রায় তিন পুরুষ ধরে এই পূজা শুধু তাঁদের রাজবাড়ীতেই সীমাবদ্ধ রাখেন। বাইরে কোথাও এর প্রচলন করার ব্যবস্থা করেননি। এ সত্ত্বেও কি করে কৃষ্ণনগরের সঙ্গে সঙ্গে চন্দননগরে পূজা প্রচলন হয় বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে?

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে এই পূজা প্রচলিত হওয়ার প্রায় ৩০ বছর পর এই হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণেরা বারোজন সদস্য নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করেন এবং এই সমিতির তত্ত্বাবধানে জগদ্ধাত্রী পূজার ব্যবস্থা করেন। এই বারোজন সদস্যযুক্ত সমিতি থেকে পূজার নাম 'বারোয়ারী' দেওয়া হয় আর তাই সমগ্র বাঙ্গালী সমাজ এই বারোয়ারী পূজার নামটী গ্রহণ করেন এখানকার পূজার নাম করণ থেকে।

গুপ্তিপাড়ার পূজা ৭ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই পূজা বারোয়ারী বা আজকালকার ভাষায় সার্ব্বজনীন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। তাই চন্দননগরের পূজার সঙ্গে গুপ্তিপাড়ার পূজার সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ।

কৃষ্ণনগর রাজপরিবার পূজার প্রবর্ত্তক হলেও এই সহরের পূজার সঙ্গে চন্দননগরের পূজার কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে একটি সন্দেহ থেকে যায় যে কৃষ্ণনগরের প্রবর্ত্তিত পূজা, তাও আবার গুপ্তিপাড়ার পদ্ধতিতে, কেমন করে বাংলা দেশে নতুন পূজা প্রবর্ত্তনের উপযোগী এত উন্নত জনপদ বা সমাজ থাকা সত্ত্বেও মা জগদ্ধাত্রী হঠাৎ চন্দননগরের চাউল বা বস্ত্র ব্যবসায়ীদের পূজার দেবী হিসেবে আসন অলঙ্কৃত করলেন কেন।

ইতিহাস অনেক গৌরবময় অধ্যায়কে বিস্মৃতির অতলে স্থান করে দিয়েছে। তাই আজ চন্দননগরের এই পূজাকে যারা খুবই বড় একটা উৎসব বলে মনে করেন তাঁরা ভুলে যান যে সেখানকার পূজা তখনকার দিনে যে কোনও সহরকে প্রভাবিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাই তাকে ভুলে যাওয়া চলেনা তার প্রভাবকে। হুগলী জেলায় যখন ১ মণ চালের দাম ১ টাকা ছিল, যখন যান বাহন বলতে নৌকা বা গোযান, জনবসতির হার বর্গমাইলে মাত্র ২৫০ জন, সেই সময়ে গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণেরা ৭০০০ টাকা চাঁদা তুলে ৭দিন ধরে পূজা, উৎসব, দরিদ্র নারায়ণ সেবা প্রভৃতি পরিচালনা করেন এবং প্রতিদিন জনসমাগম ১৫ থেকে ২০ হাজার পর্য্যন্ত হয়। তুলনা মূলক ভাবে অর্থের মূল্যায়ন করলে বা পরিবেশ বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে আজকের চন্দননগরের পূজা একটা বড় উৎসব ধরলেও গুপ্তিপাড়ার তখনকার দিনের পূজার তুলনায় খুব একটা বড় কিছু নয়। কারণ এখনকার দিনে এই সহরের বিভিন্ন বারোয়ারী মিলে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ ও পূজা বা উৎসবের অনুষ্ঠান সে তুলনায় কিছুই নয়। আরো যখন আধুনিক যান বাহনের ব্যবস্থা ও এককলে জনবসতি বর্গমাইলে ২০,০০০ তখন তিন থেকে পাঁচ লাখ জনসমাগমও খুবও বড় কথা নয়।

থাক সে কথা, এখন কৃষ্ণনগরের পূজার কথায় ফিরে আসা যাক। কৃষ্ণচন্দ্র পূজার প্রবর্ত্তন করেন শুধু রাজবাটীতে এবং এই ভাবে তাঁর পুত্র ও পৌত্র পূজা পদ্ধতি অনুসরণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্র ১৬ বছর বয়সে সৈন্যিক জমীদারীর অধিকারী হন। এ ঘটনা ১৮০২ খৃষ্টাব্দের। এর পরবর্ত্তী কোনও সময়ে তিনি তান্ত্রিক মতে এই পূজার প্রচলন করেন এবং তাঁর এই নতুন প্রথায় পূজা প্রচলনের বিধান দেন তখনকার খ্যাত নামা এক পণ্ডিত যার নাম হচ্ছে চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি।

তাই স্থানীয় জনশ্রুতি যে ইতিকথা আছে তার প্রতিবাদ স্বরূপ বলা যায় যে কেমন করে চন্দননগরের চাউল ব্যবসায়ে খ্যাতি, কৃষ্ণচন্দ্র ও ইন্দ্রনারায়ণের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এর সঙ্গে চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণির পূজার বিষয়ে নির্দেশ এই সব একই সময়ের ঘটনা বলে আজকের সুধীসমাজ মেনে নিতে পারলেন। আর ইন্দ্রনারায়ণ মারা যাওয়ার পর মনে হয় অনেক প্রতিপত্তিশালী চন্দননগরবাসী বা ইন্দ্রনারায়ণের পুত্ররাও নিশ্চয়ই খুশী হননি যে কৃষ্ণচন্দ্রের আর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু অর্থাৎ রবার্ট ক্লাইভ কি ভাবে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কামান দেগে ইন্দ্রনারায়ণের বিরাট বাড়ীটি ধূলিসাৎ করেন। তাই এসময় বা এর পরবর্তী কোনও সময়ে কারও কৃষ্ণনগরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখার আগ্রহ আসতে পারেনা।

চন্দননগরের চাউল ব্যবসার খ্যাতি সে ত অবলুপ্ত হয়েছে রবার্ট ক্লাইভের আগমনের আগেই। কারণ ক্লাইভ চন্দননগরের দিকে অভিযান চালাতে যখন এই সহর থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে তখনই দেশীয় ব্যবসায়ীরা সহর ত্যাগ করেন। কাজেই কৃষ্ণচন্দ্রের জগদ্ধাত্রী পূজা প্রবর্তনের পর কোন চন্দননগরের ব্যবসায়ীর কৃষ্ণনগরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন থাকতে পারেনা।

তার উপর আরও এক জনশ্রুতি আছে যে পণ্ডিত তর্কচূড়ামণি নাকি চন্দননগরের অধিবাসী বা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এই পণ্ডিত অপরাপর ব্রাহ্মণদের সহ ব্রহ্মত্রদান নামে কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের দেওয়া একটি গ্রামে বাস করেছেন রাজা রুদ্রের সময় থেকে অর্থাৎ প্রায় সাতপুরুষ ধরে। এ হেন পণ্ডিতকে চন্দননগরের বাসিন্দা বলে দাবী করা চলে না।

স্থানীয় জনশ্রুতির মধ্যে যেটুকু গ্রহণ যোগ্য সে হচ্ছে এই যে এই সহরের আদিপূজা, ছোট বাজারের নীচু পটিতে অনুষ্ঠিত, তার প্রথম প্রচলন করা হয় গুপ্তিপাড়ার পদ্ধতিতে এবং বারোয়ারী পূজা হিসাবে। নিশ্চিতভাবেই সেটা গুপ্তিপাড়ার পূজার কয়েক বৎসর পরে। এই জেলার একজন ইতিহাসকারের মতে এই সহরে পূজার প্রবর্তক বলে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক স্থানীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীর নাম শোনা যায়। এ তথ্যও সত্য হওয়া সম্ভব। তবে পুরোহিত বংশের বিবরণ অনুযায়ী এখানকার পূজাটি যে চন্দ্রচূড়ের বিধান দেওয়া পূজার আগেই প্রবর্তিত হয় তাও প্রমাণ করা সম্ভব।

চন্দ্রচূড়ের এই পূজার বিধান দেওয়ার সময় কোন-মতেই ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের আগে হওয়া সম্ভব নয়। অথচ এখানকার আদিপূজার পুরোহিত বংশের ইতিহাস সংগ্রহ করলে জানতে পারা যায় যে এই একই পরিবার গত সাত-পুরুষ ধরে পৌরোহিত্য করছেন এবং গাণিতিক হিসাবে তাঁদের প্রথম পুরুষের পূজার সময় ১৭৯২ থেকে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে কোন বছরে। অর্থাৎ এটাও অনুমান করা চলে যে গুপ্তিপাড়ার অব্যবহিত পরেই এখানে পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই আদি পূজাটি প্রায় ১৭০ বছর ধরে চলছে। তাই এখানকার পূজাকে আজ দুই শতাব্দীর পুরাতন বলে গ্রহণ করার কোন কারণ নাই।

চন্দননগরের পূজার এই হচ্ছে ঐতিহাসিক তথ্য ও ইতিকথার দ্বন্দ্ব। এখন দেখা যাক কিভাবে এই পূজা সহরে প্রসার লাভ করেছে। প্রথম পূজাটি অর্থাৎ নীচু-পটির পূজার প্রায় ৪০ বৎসর পরে বাগবাজারে একই ধরণের পূজা প্রবর্তিত হয়। বাজারের চৌধাথার পূজাটির প্রচলন হয় প্রায় ৬৩ বছর আগে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু পারিবারিক পূজারও প্রচলন হতে থাকে। বারোয়ারী বা সার্ব্বজনীন পূজা ধীরে ধীরে আরও বিভিন্ন এলাকায় বাড়তে থাকে, এমনিভাবে ৩০ বছর আগে অনুষ্ঠিত ৬টি বারোয়ারী। পরে অর্থাৎ ২০ বছর আগে পূজার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১২টিতে। গত বৎসর শুধু চন্দননগরের মধ্যেই পূজার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০টি, এমনি করে বিভিন্ন পাড়ার মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব এসে যাওয়ায় ক্রমশঃ একদিকে যেমন পূজা সংখ্যার বেড়েছে অপরদিকে তেমনি প্রতিমাগুলিও ২১ বছর আগের ১৪ ফুট উচ্চতা থেকে ক্রমশঃ বেড়ে বর্ত্তমানে ২৫ থেকে ২৮ ফুটে এসেছে।

আগে পূজার সঙ্গে আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা ছিল, পুতুল নাচ, কবি গান, যাত্রা, বাজি পোড়ান। বিশেষ করে বাজি পোড়ানর খ্যাতি অনেকের কাছে। ফরাসী শাসনের আমলে জাতীয় উৎসব ১৪ই জুলাই যাকে Fête de Nationale বা প্রাচীন ফরাসী ভাষায় Festee de Nationale থেকে বাংলা "ফেস্তা" বাজী পোড়ানর অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে প্রায় ১০০ বছর ধরে। তাই এই

সহরে সেই 'ফেস্তা' বলে বাজী পোড়ানর ধুমধাম জগদ্ধাত্রী পূজাতেও প্রচলন ছিল। আর একটি প্রথা ছিল প্রতিমাকে মানুষের কাঁধে তুলে গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্ট্রীটে নাচান হত, সঙ্গে চলত বাজনা ও বাজীপোড়ান।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে হুগলী জেলার গঙ্গাতীরবর্ত্তী অন্যান্য ফরাসী বা পর্ত্তুগীজদের অনুকরণে 'ফেস্তা' কথাটি প্রায় ১০০ বছর ধরে ব্যবহার করেছে শুধু বাজী পোড়ান সহ উৎসবকে বোঝাতে। গত ২০।২৫ বছর ধরে কিন্তু এই 'ফেস্তা' কথাটি একেবারে প্রচলনের বাইরে চলে গেছে। এই কথাটির এখন স্থান হয়েছে ঐ গুপ্তিপাড়ার বারোয়ারী জগদ্ধাত্রী পূজার মত ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়ে।

ইতিহাসের দিক থেকে খুব বেশী প্রাচীনত্ব না থাকলেও আজকের দিনের পরিবেশ ও লোকের রুচি অনুযায়ী বিচার করলে এটাকে পশ্চিমবাংলার একটি বড় উৎসব বলে স্বীকার করতেই হবে। যেখানে মহানগরীর অভ্যন্তরে এক বিরাট আকার কালী প্রতিমার দর্শক আকর্ষণ করার জন্য হাজার হাজার পোষ্টার বিলি করা সত্ত্বেও ২ দিনে মাত্র ১ লক্ষের মত দর্শক হয় আর সেই ভিড় সামলাতে কলকাতার পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষকে দক্ষিণ এলাকার ৪।৫টি রাস্তার যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করেও ভিড় ঠিক মত আয়ত্বে রাখা সাধ্যাতীত হয়ে পড়েছিল, সেখানে এই সহরে বিসর্জ্জনের দিনে ৩ থেকে ৪ লক্ষ লোকের ভিড় বেশ দক্ষতার সঙ্গে তত্ত্বাবধান করা হয়।

অতীতের পুতুল নাচ, কবিগান, ঝাড়-লণ্ঠন, গ্যাসের বাতি ও মানুষের কাঁধে করে প্রতিমা বয়ে নেওয়া ও মানুষের কাঁধে বসেই ঠাকুর নাচান এ সবই লুপ্ত হয়েছে শুধু মাত্র মানুষের রুচি বদলে গেছে বলে। তাই আধুনিক যুগে স্থান পেয়েছে বৈদ্যুতিক আলো ও সমঞ্জস, মাইকের গান; লরির উপর প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা। বহু দিনের খ্যাত বাজী পোড়ানও বন্ধ হয়েছে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে। কারণ গত ৩০ বছরে এই সব সহরের জন সংখ্যা বর্গমাইলে ১০ হাজার থেকে একেবারে ২০ হাজারে এসেছে, মেলায় লোক সমাগমও ক্রমাগত বেড়ে বর্ত্তমানে ৩ লক্ষের বেশী হয়ে দাঁড়ায়, এ অবস্থায় বাজী পোড়ান মোটেই দর্শকদের স্বার্থে উপযোগী নয়।

বাজী পোড়ান বন্ধ হলেও এর আকর্ষণী শক্তি মোটেই কমেনি, বরং বেড়েছে। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র এই সহরের বিভিন্ন পাড়ায় বিশেষভাবে আলোকমালায় সজ্জিত পূজামণ্ডপ, প্রতিমা, অনেকদূরের লোককেও হাতছানি দিয়ে টেনে আনে। এই উৎসবের নিশ্চয়ই একটি সম্মোহিনী শক্তি আছে। নাহলে দূরের কোনও যায়গা থেকে দর্শকেরাও পথ শ্রান্ত হয়েও চিন্তা করেন যে যদি মোটর বাস বা রেল গাড়ীর সময় আরও বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিত তবে হয়ত আরও দু একটা না-দেখা প্রতিমা দেখে যাওয়া যেত। সহরের বেশ কিছু সংখ্যক বাড়ীতে পূজা উপলক্ষে আত্মীয় ও বন্ধুদের সমাগম হয়। শুধু এই ভাবে সহরের জনসংখ্যা ৭০ হাজার থেকে প্রায় দেড় লক্ষে দাঁড়ায়। সবচেয়ে বেশী জনসমাগম হয় বিসর্জ্জনের দিনে। এদিন আরও অতিরিক্ত ২ লক্ষের মত দর্শকের সমাগম হয়।

প্রায় চার মাইল পথ ধরে একটির পর একটি প্রতিমা লরির উপর শোভাযাত্রা করে চলে। প্রতিটি প্রতিমা খুবই বড় আর সঙ্গে রয়েছে নানা রকমের আকর্ষণীয় আলোর খেলা, গ্যাস বেলুন, নানারকমের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পুতুলের সাহায্যে পৌরাণিক কাহিনী স্মরণকরানর ব্যবস্থা। এসব আজকালের দিনে অতি আধুনিক আধা-নাস্তিক মানুষকে আকর্ষণ না করে পারেনা। তাই দেখতে পাওয়া যায় স্ত্রী-পুরুষ এমনকি ছোট ছোট বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত ৫।৭ মিনিটের মত ঝিমিয়ে নিয়ে আবার একটি নতুন প্রতিমার বাজনার আওয়াজে জেগে ওঠে।

সবচেয়ে অবাক হয়ে যেতে হয় একটা ব্যাপার দেখে যে, যে কৃষ্ণনগরের পূজা ২০০ বছরেরও বেশী প্রাচীন এবং যে সহরে এখনও ১০০টির বেশী পূজা হয়, সেই সহরের লোকেরাও এখানে বিসর্জ্জনের দিন এসে হাজির হয়। আর সেই গুপ্তিপাড়ার লোকেরাও আসে। অথচ মজা এই যে তারা অনেকেই হয়ত জানেনা যে ঐ সব যায়গার পূজাকে অনুসরণ করেই আজ এখানকার পূজা বা উৎসব এত বড় আকারে এসেছে। এখানকার পূজার ভালভাবে প্রসার মাত্র গত ৩০ বছরের হলেও ইতিমধ্যে এখানকার পূজার অনুকরণ চলেছে হুগলী হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্য্যন্ত। নতুন যে সব

স্থানে এই পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার ফলে চন্দননগর ছাড়া বর্তমানে অপর কোন জায়গার দাবী স্বীকার করা যায় না। পূজা ও উৎসবের পরিবেশ থেকে সত্যিই পশ্চিম-বাংলার একটা খুব বড় আকারের উৎসব বলে একে স্বীকার করা চলে।

আধুনিক যুগের উপযোগী করে যে উৎসবের আয়োজন প্রতি বছর করা হয়ে থাকে তাতে হিন্দুত্বের মধ্যে ধর্মীয় ভাব বজায় রাখতে সাহায্য করে খুবই। তবে একটা অনুরোধ চন্দননগরবাসীদের উদ্দেশ্যে করে রাখা বিশেষ প্রয়োজন মনে করছি। আধুনিক যুগের কলকব্জার সাহায্য নিয়ে যেমন তাঁরা মু-উচ্চ প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন, তেমনি ক্রেণের (crane) সাহায্যে যদি মায়ের মূর্তি বিসর্জনের ব্যবস্থা করেন তবেই উৎসবটি সর্বাঙ্গে সুন্দর হয়। কারণ মা জগদ্ধাত্রীকে বিসর্জনের সময় বাঁশ বা কাঠের গুঁতো দিয়ে আঘাত করে গঙ্গা বক্ষে নিক্ষেপ করার দৃশ্যটি সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙ্গালী মনকে বড় ব্যথা দেয়! এ ব্যবস্থার পরিবর্তন খুবই প্রয়োজন।

পুণ্যতোয়া গঙ্গা অনেক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে আবার অনেক নতুনকেও সৃষ্টি করেছে। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী মায়ের কাছে প্রার্থনা যে এখানকার পূজার গরিমা আবার যেন গুপ্তিপাড়ার পূজার মত বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে না যায়।

আজকের দিনে···

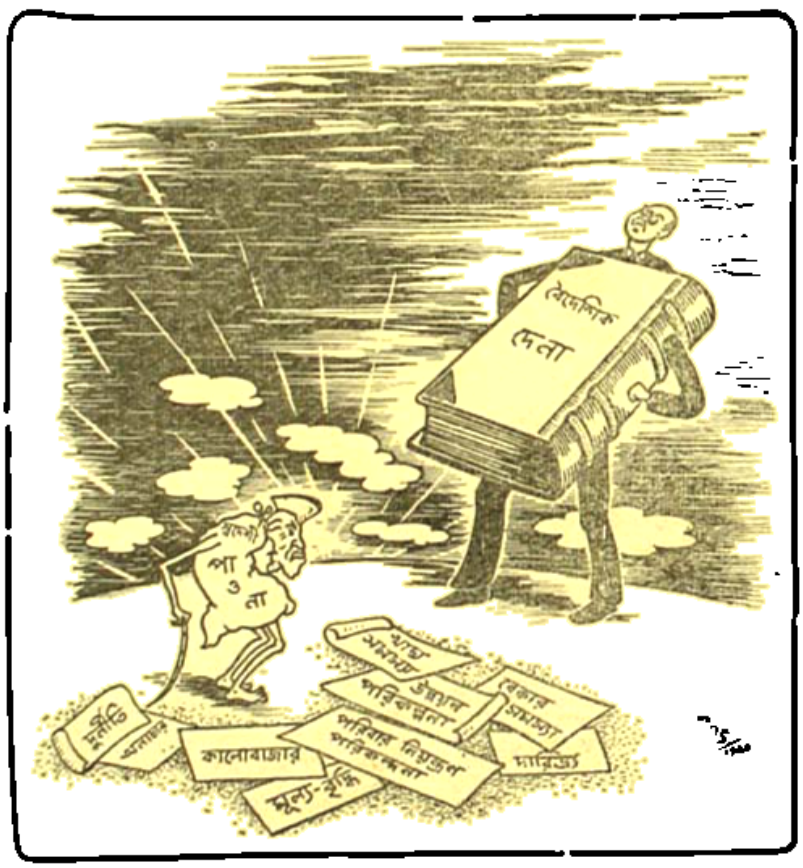

নতুন যুগের ভোরে—
না হয় যেন যে-হিসাবে
মেশটা বতুর, ওরে।

শিল্পী : পৃথ্বী দেবশর্মা

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

শ্রীজ্ঞান

তোমাদের মধ্যে অনেকে আছ যারা পড়াশুনায় খুবই আগ্রহান্বিত এবং মনোযোগ সহকারে সর্ব্বসময় লেখাপড়ায় ব্যাপৃত থাক। এটা যে খুবই প্রশংসনীয় তাতে সন্দেহ নেই এবং এদেরই আমরা "ভাল ছেলে" বলে থাকি। কিন্তু পড়াশুনার সঙ্গে শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতিও মনোযোগ দাও তো? সর্ব্বসময় কাজ করা এবং খেলাধূলা একদম না করা (All works and no play) মোটেই প্রশংসনীয় নয় কিন্তু। লেখাপড়ার মাধ্যমে মনের উন্নতি হয়, আর স্বাস্থ্য ও ব্যায়ামচর্চ্চায় দেহের উৎকর্ষ সাধিত হয়। দৈহিক সুস্থতা যে কত প্রয়োজনীয় তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। দেহ সুস্থ থাকলে মনও প্রফুল্ল থাকে এবং প্রফুল্ল মন সব-কাজেই বসে যায়, কাজ করে আনন্দ পায়—সে কাজ পড়াশুনাই হোক বা অন্য কোনও রকমেরই হোক। তবে একথা মনে করনা যে পড়াশুনার ফাঁকি দিয়ে খেলাধূলা করতে হবে বা শরীরচর্চ্চায় মনোনিবেশ করতে হবে! লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতে হবে, শরীরকে গড়ে তুলতে হবে সুস্থ, সবল ও কষ্টসহিষ্ণু করে। বিদ্যা যেমন মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ, তেমনি স্বাস্থ্যও মানুষের বিশেষ ঐশ্বর্য্য! জান তো ইংরাজীতে বলে—Health is wealth! সুতরাং বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও মনোযোগী হও।

চাণক্য শ্লোকে আছে—"...বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" বিদ্বান ব্যক্তি সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা, ভক্তি লাভ করেন। তেমনি সু-স্বাস্থ্যের অধিকারীও সকলের প্রশংসা লাভ করে থাকেন। তাই তোমরা বিদ্বান হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যবান হবারও চেষ্টা কর। মনের দুর্ব্বলতাকে জয় করতে হলে, দেহের দুর্ব্বলতাকে জয় করতে হলে, শরীর গঠন করতে হবে, স্বাস্থ্যচর্চ্চা করতে হবে। বলিষ্ঠ শরীর হলে মনও সুস্থ, সবল থাকবে—অহেতুক ভয়ে বিচলিত হবে না, কোনও নোংরামী বা দুষ্ট চিন্তা মনকে স্পর্শ করবে না। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীর চর্চ্চা করে তোমরা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ শরীরে সুস্থ ও সবল মন নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চল, জীবনকে উপভোগ কর, বাঁচার মত বাঁচ। জীবনে উন্নতি করতে হলে, প্রতিষ্ঠিত হতে হলে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কোনটাকেই অবহেলা কর না।

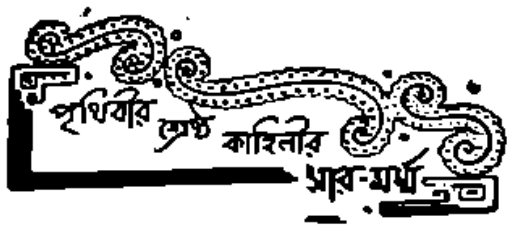

জর্জ এলিয়ট্

রচিত

সাইলাস মার্‌নার্

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সাইলাসের কুটীর থেকে পথে বেরিয়ে গড্‌ফ্রে এসে গ্রামের মাতব্বরদের দলে যোগ দিতেই, ডাঃ কিষল্ কৌতূহলভরে প্রশ্ন করলেন,—কি হে, ঐ অভাগী মেয়েটি কে···এবং ওর সঠিক পরিচয়ই বা কি—কিছু ঠাওর করতে পারলে ?

আসল কথাটা চেপে রেখে কোনো কিছু না জানার ভাণ করে, গড্‌ফ্রে জবাব দিলে,—আমি যাকে ভেবেছিলুম, সে নয় !···বোধহয়, ভিন্ গাঁয়ের কোনো ভিখারী মেয়ে··· বড়দিনের পার্ব্বণে রুজি-রোজগারের সন্ধানে প্রচণ্ড এই হিমে ঠাণ্ডার পথে বেরিয়েছিল···এমন বেঘোরে যে প্রাণ হারাবে···ধারণাই করতে পারেনি তখন ! আহা···অমন ফুটফুটে সুন্দর ঐ একরত্তি মা-হারা শিশুটি !···কি কপাল বেচারীর !···এমন দুধের বয়সে মা হারিয়ে···ভাগ্যিস্, খামখেয়ালী পাগলা ঐ সাইলাস বুড়ো ছিল···নাহলে, কেই বা ওকে দেখতো শুনতো—মানুষ করে তোলার ঝক্কি-ঝামেলা সইতে রাজী হতো, বলুন !·· যাই হোক, অভাগী শিশুর বরাতে, এ তবু একটা মন্দের ভালো ব্যবস্থা হলো··· অন্ততঃ, দুনিয়াতে কোনোমতে বাঁচবার সুযোগ জুটলো !·· তবে যে বেয়াড়া আর হাড়-কঞ্জুষ সাইলাস্ বুড়ো···অজানা অচেনা, আচমকা পথে কুড়িয়ে পাওয়া একরত্তি ঐ দুধের বাছাকে সে কদিনই বা এমনভাবে নিজের কাছে রেখে দায়-দায়িত্বের সব ভার নিয়ে যত্নে আদরে মানুষ করে তুলবে —সেইটেই হলো, ভাববার কথা !···কিন্তু সাইলাসের মতো অমন একালসেঁড়ে-কুণো লোক যে স্বেচ্ছায় ঐ মা-হারা কুড়োনো মেয়েটিকে বুকে তুলে নেবে—এটা খুবই আশ্চর্য্য ব্যাপার !

গড্‌ফ্রের জবাব শুনে গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা জমিদার বাড়ীর আনন্দ-খুশির উৎসব আসরে ফিরে যাবার পথে চলতে চলতে একবাক্যে রায় দিলেন,—তা যা বলেছো হে, ব্যাপারটা বাস্তবিকই বড় অদ্ভুত ঠেকছে !···সাইলাস্-বুড়োর মতো লোক যে হঠাৎ এমন কাণ্ড করে বসবে— এমনটি তো ভাবতেও পারিনি ঘুণাক্ষরে !···দেখা যাক্— বেনো-জলের এই বোঝার শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়োয় !···

• • • •

পরের দিন সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসার আগেই, নিতান্তই অনাড়ম্বরভাবে র‍্যাভেলো গ্রামের গির্জ্জার বাগিচার এককোণে নিঃস্ব অভাগিনী অপরিচিতা মলির প্রাণহীন দেহটিকে কবর দেওয়া হলো। মলির চিহ্ন পরিচয়টুকু এমনি-ভাবে লোকের নয়ন মনের সুমুখ থেকে চিরতরে লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গড্‌ফ্রেরও দুর্ভাবনা ঘুচলো। কুৎসা অপবাদ লোকলজ্জার আশঙ্কায় গ্রামের কারো কাছেই সে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি—অভাগিনী মলির সঙ্গে তার গোপন-সম্পর্কের কলঙ্ক-কাহিনী···এমন কি, মা-হারা নিঃসহায় সেই ছোট্ট শিশু-কন্যার,আসল পরিচয়ও জানালো না কাকেও ! গড্‌ফ্রের ভয় শুধু তার নিরুদ্দিষ্ট ভাই ডান্‌সিকে···কেবলমাত্র ডান্‌সি ছাড়া দুনিয়াতে আর কেউই ভিন্‌গাঁয়ের বাসিন্দা দুঃস্থা অপরিচিতা লোকান্তরিতা মলির সঙ্গে গড্‌ফ্রের গোপন বিবাহের কলঙ্ক ইতিহাসের বিন্দুবিসর্গও জানে না ! কাজেই গ্রামের লোকজনের কারো মনেই এতটুকু সন্দেহ জাগলো না···এমন কি কেউ এ সম্বন্ধে কোনো খোঁজ-খবরও করলো না। বরং গড্‌ফ্রের কথামতো সবাই বিশ্বাস করলো যে নিতান্তই ঘটনাচক্রে কোথাকার কে একটা অজানা অচেনা ভিখারিনী হিমে-ঠাণ্ডায় প্রচণ্ড তুষারপাতের ফলে র‍্যাভেলো গ্রামের প্রান্তে নিরালা পথে পড়ে অসহায় অবস্থায় বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে এবং সেই অভাগিনীর অনাথা শিশুকন্যা বেচারীকে পথ

থেকে কুড়িয়ে এনে পাগলাটে খামখেয়ালী সাইলাস্ বুড়ো মমতাভরে নিজের জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় দিয়েছে বলেই মা-হারা দুধের বাছার বরাতে কোনোমতে দুনিয়াতে টিঁকে থাকবার সুযোগ মিললো।

বাস্তবিকই সেবারে সাইলাস্-বুড়োর মোহর-চুরির দুর্ঘটনায় গ্রামের লোকজন সবাই যেমন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, এবারেও পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া নামগোত্রহীনা এই মা-হারা শিশু-কন্যাটিকে সযত্নে-স্নেহে তার নিজের জিম্মায় রেখে মানুষ করার তোলার অদ্ভুত আগ্রহ-নিষ্ঠা দেখে প্রত্যেকেই ঠিক তেমনি অবাক হলো। কঞ্জুষ-বরকুপো-অমিতক আর বেয়াড়া-পাগলাটে ধরনের লোক বলে সাইলাস্‌কে এতকাল গ্রামের লোকজন কেউই বিশেষ সুনজরে দেখতো না···তবে আচমকা সেই মোহর-চুরির ব্যাপারের পর থেকে পাড়া-পড়শীদের কারো-কারো মনে অবশ্য বেচারী সাইলাস্-বুড়োর জন্য বেশ একটু মায়া-মমতা আর সহানুভূতির ভাব জেগেছিল···কিন্তু এবারেকোথাকার কোন এক অজানা-অচেনা পথের ভিখারিনীর অনাথ-অসহায় অভাগী-আতুর শিশু-কন্যাকে হঠাৎ এভাবে স্বেচ্ছায় বুকে তুলে নিয়ে নিজের সন্তানের মতোই যত্নে-আদরে লালন করবার এমন আজব-খেয়াল আর এতখানি আন্তরিক অনুরাগ দেখে সকলেই রীতিমত অবাক হয়ে গেল···এমন কি, ক্ষ্যাপা বাউণ্ডুলে হাড়-কিপটে জোলা ভাঙী সাইলাস্ বেচারীর উপর সারা গাঁয়ের গিন্নীবান্নী মহিলাদের দরদ আর শ্রদ্ধা বেড়ে উঠলো অনেকখানি। মহিলারা তো ভেবেই আকুল···গ্রামের প্রান্তে নিরালা-ছোট কুটীরে নিতান্তই একা নিঃসঙ্গভাবে দুঃখে কষ্টে দিন কাটে সাইলাসের···তাছাড়া বয়সও হয়েছে তার যথেষ্ট··· দুরছাড়া আইবুড়ো পুরুষমানুষের অগোছালো সংসার··· ঘরকন্নার পানে নজর রাখতে সে ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি নেই···তার উপর তাঁত বোনার কাজকর্মের হরেক রকম ঝক্কি ঝামেলা তো নিত্যই লেগে রয়েছে!···কাজেই এত সব হাঙ্গামা আর অসুবিধার মাঝে সাইলাস্ বেচারী যে একা কিভাবে মাত্র দু'বছর বয়সের একরত্তি ঐ মা-হারা দুধের বাছাকে নিজের হাতে নাওয়ানো খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, পোষাকপরিচ্ছদ পরানো,দেখাশুনোর ঝক্কি সামলে আদর যত্নে মানুষ করে তুলবে—সেইটেই হলো মস্ত দুর্ভাবনার কথা।

তাই সাইলাস্ বেচারীকে বাচ্চা সামলানো আর ঘর করার খুটিনাটি কাজে সাহায্য করতে আর পরামর্শ দিতে পাশের বাড়ীর গিন্নী ডলি উইন্‌থ্রপের মতোই পাড়া পড়শী আরো অনেক ঘরণী মহিলা প্রায়ই এসে হাজির হতেন—গ্রামের প্রান্তে নিঃসঙ্গ অসহায় সেই ঘরছাড়া ভাঁতী বুড়োর পর্ণ-কুটীরে। সাইলাস্‌ও বরাবর সংসারে একা একাই জীবন কাটিয়েছে এতকাল···বিয়ে থাও করেনি···কাজেই ছেলেপুলে মানুষ করবার রীতি নীতি সম্বন্ধে তার বিশেষ কোনো ধারণা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে পথে কুড়িয়ে পাওয়া নামগোত্রহীনা মা-হারা সেই দুধের শিশুটি ছিল তার নয়নের মণি···বড় আদরের ধন। তাই তার নিজের বুদ্ধির দোষে বা অভিজ্ঞতার অভাবে অভাগী একরত্তি শিশু কন্যাটির সেবা পরিচর্যার ব্যাপারে কোনো কষ্ট অসুবিধা না ঘটে, সেজন্য সাইলাস্ সদাই উদ্বিগ্ন থাকতো এবং ডলি উইন্‌থ্রপ্ আর পাড়া পড়শী অন্য সব পাকা গৃহিণীদের পরামর্শমতো সন্তান লালনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজ পরম নিষ্ঠায় নিখুঁতভাবে পালন করে চলতো। ডলি আর গ্রামের অনেক গিন্নীবান্নীরা নিত্যই তাঁদের সংসারের কাজের ফাঁকে সামান্য ফুরসৎ পেলেই সাইলাসের কুটীরে এসে মা-হারা ছোট্ট শিশু কন্যাটির খোঁজ খবর নিয়ে যেতেন। এমন কি, সাইলাস্ তার ঘরে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলে, অনেক সময় তাঁরা নিজেরাই সযত্নে স্নেহে শিশুটিকে যথারীতি নাওয়ানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, পোষাক পরিচ্ছদ বদলানো ঘাটে-বাটে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, খেলনা পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে রাখা, মজার মজার গল্প শোনানো, ছড়া শেখানো, ছেলেমানুষী বায়না আবদার ও দুষ্টুমী দুরন্তপনার ঝক্কি ঝামেলা সামলানো···আরো কত সব ব্যাপারের যে তদ্বির তদারক করতেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। এছাড়া অনেকে আবার মমতাভরে সেই ফুলের মতো ফুটফুটে সুন্দর ছোট মেয়েটির জন্য মাঝেমাঝে নিজেদের বাগানের ফল ফুল সব্জী, বাড়ীতে বানানো কেক, প্যাটি চপ কাটলেট পুডিং—কত কি ভালো ভালো খাবার-দাবার হাতে সেলাই করা জামা, টুপি, ইজের, মোজা, শেল, কাঁথা, বালিশ—হরেক রকমের দরকারী জিনিষ এনেও সাদরে উপহার দিয়ে যেতেন। তাঁদের এই সরল সহায়তার

দৌলতে, সাইলাসের অগোছালো সংসারে মা-হারা ছোট মেয়েটিকে আদর যত্নে, স্নেহে মমতায় মানুষ করে তোলার কোনো অসুবিধা বা অভাব অভিযোগের কারণ ঘটতো না এতটুকু···এমন কি, সেই শিশু কন্যার সেবা শুশ্রূষা আর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দিকে সাইলাসের আন্তরিক আগ্রহ অনুরাগ দেখে কারো বোঝবারও সাধ্য ছিল না যে সে তার নিজের সন্তান নয়—পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া কোথাকার দামান্য কে একটা পরের মেয়ে। দেবশিশুর মতোই ফুটফুটে সুন্দর অনাথ অসহায় অভাগা সেই ছোট মেয়েটি যাতে এতটুকু দুঃখ কষ্ট না পায়···বরাবর সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে, আনন্দে মানুষ হয়ে উঠতে পারে—এই ছিল সাইলাসের দারাক্ষণের ধ্যান জ্ঞান চিন্তা! তাই সে নিজে ঘোর নাস্তিক, ঈশ্বর অবিশ্বাসী, হলেও গ্রামের পড়শী গির্জা ডসি উইনথ্রপের কথামতো পথে কুড়িয়ে পাওয়া অজ্ঞাতকুলশীলা শিশুটিকে শেষ পর্যন্ত রাত্তেলো গ্রামের গির্জার পাদ্রী মিঃ ম্যাদির কাছে নিয়ে গিয়ে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করলো না। দীক্ষার দিন থেকেই সে তার স্বর্গতা ছোট বোনের নামানুসারে পথে কুড়িয়ে পাওয়া সেই মা-হারা একরত্তি মেয়েটিরও নাম রাখলো—এপি।

সাইলাসের নিঃসঙ্গ ছন্নছাড়া নিরানন্দময় জীবনে ফুলের মতো সুন্দর ফুটফুটে শিশু এপির আকস্মিক আবির্ভাব—সত্যিই স্মরণীয় মুহূর্ত। স্নেহ মায়া ভালবাসায় ভরা যে জীবন থেকে সরে এসে সাইলাস্ এতকাল সমাজ সংসার দুনিয়ার সব কিছু ভুলে নিরালা নির্জনে একাকী দিন কাটাচ্ছিল, বিধাতার বিচিত্র বিধানে কোথা থেকে অজানা অচেনা মা-হারা এই অসহায় শিশু কন্যাটি হঠাৎ তার আশ্রয়ে এসে হাজির হতে, প্রবহমান সেই ধারা-স্রোতের গতিবেগ যেন আগাগোড়া বদলে দিলো—এমনই দুর্বার সে জোয়ারের টান! কি যেন এক অভিনব মায়ায় একরত্তি শিশু এপি তার নিজের জীবনের সঙ্গে সাইলাসের জীবনকেও ধীরে ধীরে সহস্র বাঁধনে বেঁধে ফেলতে লাগলো। (ক্রমশঃ)

বিজয়ী বীর

শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায়

উপর ঘরে কেউ ছিলনা, হঠাৎ কিসের শব্দ।
ব্যাপারখানা দেখতে গিয়ে হলাম আমি স্তব্ধ।
কানকাটা এক হুলোমুখো মস্ত পালের গোদা
ঢুকে গেছে ঘরের মাঝে—যে ঘরে শোন্ দাদা।
আয়নাখানা খাড়া ছিল ড্রেসিং টেবিল 'পরে,
বানর মহারাজের ছায়া সেথায় নড়ে চড়ে।
অবাক হ'য়ে দেখল চেয়ে নিজের ছায়া 'পরে,
ভাবলে বানর, দলের কেহ এলো বুঝি ঘরে।
কানকাটা তার, হুলোমুখো, মুখটি তাহার পোড়া,
হাত পা নেড়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝে, খাড়া।
তাই না দেখে রেগে গিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে,
অমনি দেখে হুলোবেটিও মুখ ভেংচি কাটে।
যেমনি দেখা বাগিয়ে ঘুঁসি আপনা 'পরে ধাক্কে,
ঝন্‌ঝনিয়ে কাঁচগুলো তার মেঝের তেড়ে পড়ে।
জয়ী হ'য়ে বুক ফুলিয়ে বানর মহারাজা
এক লাফেতে ঢুকে গেলো বনের মাঝে, সোজা।

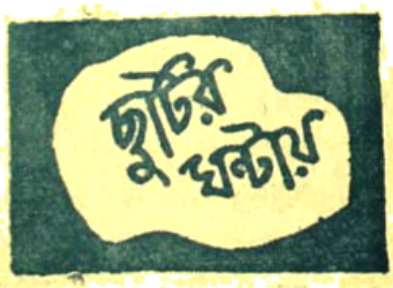

চিত্রগুপ্ত

ইস্কুলের পড়াশোনা তৈরীর অবসরে আর ছুটির দিনে ঘরে বসে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের জমজমাট মজলিশ জমিয়ে তুলে, সে-আসরে বিজ্ঞানের বিচিত্র মৌলতে আরও মজার যে সব খেলার কায়দাকি দেখিয়ে সবাইকে তোমরা রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো, এমন অনেক রকম

কলা-কৌশলের পরিচয় ইতিপূর্বেই পেয়েছো। এবারেও তেমনি ধরণের আরো কয়েকটি আজব-মজার কেরামতী দেখানোর অভিনব কায়দা-কানুনের হদিশ দিচ্ছি। বিজ্ঞানের এ সব বিচিত্র কারসাজি দেখিয়ে তোমরা নিজেরাই যে শুধু আমোদ পাবে তাই নয়, অপরকেও আনন্দ দিতে পারবে প্রচুর·· এবং সেই সঙ্গে সহজ সরল উপায়ে ক্রমে ক্রমে জানতে, বুঝতে আর শিখতে পারবে—নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নানান্ রহস্যময়-তথ্যের আসল মর্ম কি!

আপাততঃ আজব মজার যে দুটি খেলার কথা বলছি, সেগুলি আসলে—বিবিধ রাসায়নিক উপাদানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার বিচিত্র কারসাজি। কাজেই এ কারসাজি দেখানোর জন্য বিশেষ ধরণের কয়েকটি রাসায়নিক উপকরণাদি জোগাড় করা দরকার। এ সব রাসায়নিক উপকরণ বাজারে যে কোনো ভালো ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যায় এবং দামও খুব বেশী নয়।

প্রথমেই যে মজার খেলাটির কথা বলছি, সেটির নাম—'হাতের তালুর উপর অদৃশ্য আগুনের ধুম-বাষ্প সৃষ্টি'। আসরে আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে এ খেলায় আজব কারসাজি দেখানোর সময়—হাতের তালুর উপর সামান্য একটু গুঁড়ো চুণ (Lime or calcium) আর অল্প-একটু 'অ্যামোনিয়াম্ ক্লোরাইড' (Ammonium-chloride) রাসায়নিক ওষুধের গুঁড়ো একত্রে মিশিয়ে নাও। তাহলেই দেখবে—কিছুক্ষণ বাদে বিজ্ঞানের আজব-নিয়মে হাতের তালুতে মিশিয়ে রাখা গুঁড়ো পদার্থটুকু বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গিয়ে শুধু ধুম-বাষ্প উঠছে। চোখের সুমুখে এমন আজব কাণ্ড ঘটতে দেখে, আসরের দর্শকের অনেকেরই হয়তো আশঙ্কা জাগবে যে খেলোয়াড়ের হাতের তালু পুড়ে গিয়ে বিরাট ফোস্কা পড়েছে···তখন দিব্যি হাসিমুখে তাঁদের কাছে এগিয়ে এসে তোমার হাতের তালুটিকে সামনে মেলে ধরো। অবাক-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে তাঁরা চেয়ে দেখবেন যে তোমার হাতের তালুর কোথাও এতটুকু পোড়া দাগ বা ফোস্কার চিহ্নমাত্রও নেই···খেলা দেখানোর আগে যেমন অমত স্বাভাবিক ছিল, অবিকল তেমনি রয়েছে—কোনো অনিষ্ট হয় নি—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এভাবে অদৃশ্য আগুনের ধুম-বাষ্প সৃষ্টির ফলে।

১

এ খেলাটি দেখানোর পর, দর্শকদের আসরে, তোমরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আরেকটি আজব মজার কারসাজিও দেখাতে পারো। সে খেলাটির নাম—'হাতের তালুর উপর হরেক রকমের রঙ ফুটিয়ে তোলার কারসাজি'।

২

অভিনব বিচিত্র এই দ্বিতীয় খেলাটির জন্য—আসরে আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে 'হাতের তালুতে রঙ-সৃষ্টির আজব কারসাজি' দেখানোর আগেই, বাজারের ভালো ওষুধের দোকান থেকে খানিকটা 'মার্কুরিক-ক্লোরাইড' (Mercuric chloride) আর 'পোটাসিয়াম্-আইয়োডাইড' (Potassium Iodide) রাসায়নিক-ওষুধের গুঁড়ো কিনে এনে রেখো। এ ওষুধের গুঁড়ো যেন বেশ শুকনো-ঝরঝরে ধরণের হয়—সেদিকে নজর রাখা দরকার।

আসরে দর্শকদের সামনে 'রঙ-সৃষ্টির আজব কারসাজি' দেখানোর সময়, এ দুটি রাসায়নিক ওষুধের গুঁড়ো হাতের তালুর উপর রেখে একত্রে বেশ ভালোভাবে ঘষে-ঘষে মিশিয়ে নাও। তাহলেই দেখবে—বিজ্ঞানের বিচিত্র নিয়মে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দৌলতে অল্পক্ষণের মধ্যেই হাতের

আজকে ছবেক-রকমের আজব-রঙ ফুটে উঠতে সুরু করেছে।

এই হলো—এবারের মজার-খেলা ছুটির মোটামুটি কলা-কৌশল।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরো কয়েকটি আজব রঙীন বিজ্ঞানের খেলার কায়দা-কানুনের কথা বলবার বাসনা রইলো।

ছুটি

শ্রীতরুণকুমার দত্ত

ঘর ছেড়ে হঠাৎ সেদিন
এলাম সংগোপনে,
অনেক দিনের বন্ধু আমার
ডাকছিল আনমনে।
চলতি পথে ক্ষণিক থেকে
আঁখি মেলে চাই,
আকাশ বুকে রং লেগেছে
আরতো কিছু নাই।
দিগন্তে আজ মহাযিলন
শুধুই রঙের মেলা,
কিসের ধারে একা বসি
দেখছিনু সেই খেলা,
আলতো ছোঁয়ায় হঠাৎ আমার
বন্ধু এসে ডাকে
মন যে আমার সুদূর নভে
সবুজ গাছের ফাঁকে।
শুধুই খেলা সবার বুকে
এই যে চলার পথে,
কাজের চাপে হারিয়ে নিজে
যাইবে কেবল ভাতে।
কেন জানি হঠাৎ আমার
লাগলো বড় ভালো,
তাই তো আমি সঙ্গী ছেড়ে
দেখছিনু সেই আলো।
বন্ধু আমার কেন তুমি
দিলে হেথা টুটি,
মনের সাধে রঙের খেলা
আজকে তাদের ছুটি।

মনোহর মৈত্র

সারি সাজানোর হেঁয়ালী ঃ

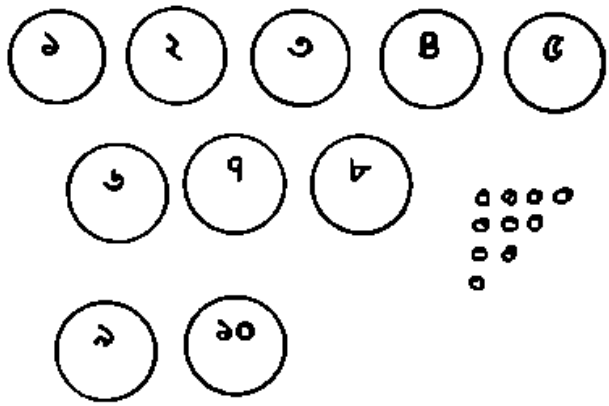

উপরের ছবিতে তিন-সারিতে যে দশটি বোতাম বা চাকতি সাজানো রয়েছে, মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে সেই বোতাম বা চাকতি দশটিকে এমন কায়দায় চার-সারিতে সাজিয়ে বসাও যে আড়াআড়ি, লম্বালম্বি, এবং কোণা-কুণিভাবে প্রত্যেকটি সারিতেই যেন সংখ্যায় চারটি করে বোতাম বা চাকতি সমান-লাইনে পাশাপাশি বসান থাকে। কিভাবে এই দশটি বোতাম বা চাকতিকে উপরোক্ত চার-সারিতে সাজিয়ে বসানো যাবে, তার সঠিক কায়দাটির নক্সা এঁকে যদি চটপট আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দাও তো, বুঝতে পারবো তোমাদের বুদ্ধি কত খানি প্রখর হয়ে উঠেছে দিনে দিনে।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

নামে মোর—তিন অক্ষর···
দুই নয়ন-শোভাকর।

শেষাক্ষর দিলে বাদ,
কুড়ে-লোকের ঘোর প্রমাদ!
প্রথমাক্ষর ছাঁটলে ভাই,
গলে জল হয়ে যাই।
মধ্যমাক্ষর হলে ক্ষয়,
কাল পাবে আজকে নয়!

রচনা : সুলতা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

৩।

চার অক্ষরের কথা—হিন্দুদের নানান্ পাল-পার্বণও শুভ কাজে মঙ্গল-সূচক প্রতীক-চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রথম দুই অক্ষরে বাঙালীদের এক শ্রেণীর পদবী বিশেষ এবং শেষ দুই অক্ষরে জলের স্রোত বোঝায়। দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষরে তরল মাদক-পানীয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষরে অমৃত বোঝায়। চতুর্থ ও তৃতীয় অক্ষরে বৈষ্ণব-কাব্যের নায়িকা এবং হিন্দুদের বিশিষ্টা এক দেবীর নাম হয়।...বলো তো, কথাটি কি?

রচনা : গৌতম ঘোষ (কলিকাতা)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির'

উত্তর ঃ

১। নীচের নক্সাতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি-ভাবে কুড়িটি ত্রিভুজকে সাজালেই খুব সহজে চতুষ্কোণ রচনা করা যাবে।

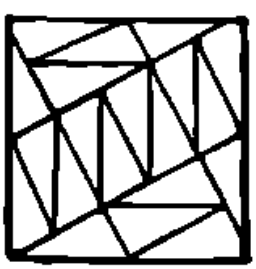

২। শিশির
৩। তাজমহল

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক

উত্তর দিয়েছে :

পুপু, তুষিন ও রাজা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সন্তোষ, রঞ্জন, সুনীল, মুরারি ও অমিয় (চিলাই), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (দিল্লী), বুবু ও বিবু আচার্য্য (কলিকাতা), কবি, লাড্ডু ও অমিত হালদার (লক্ষ্ণৌ), পুতুল, সুমা, হাবলু, টাবলু, নিপু ও খোকা (হাওড়া), রুমী ও পিন্টু সাহা (কলিকাতা), রিমি ও রুনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), অমিয়, প্রশান্ত, অনিল, সুনীত, অজিত, পল্টু, অমৃত, মৃণাল, বরুণ, ভুবন-মোহন, কৃষ্ণলাল ও তিনকড়ি (গড়িয়া), রাণা, বুনা, গৌর ও লিপি মুখোপাধ্যায় (চুঁচুড়া), শোভনা, শীতাংশু, সুধাংশু ও হারানচন্দ্র দেবশর্ম্মা (শিলিগুড়ি)।

গতমাসের ছটি ধাঁধার সঠিক

উত্তর দিয়েছে :

শচীন, কল্যাণ, রজত, বিশ্বতোষ, ইন্দ্র, শৈলেন্দ্র, দেবেন, হরিদাস ও অজয় (কলিকাতা), পদ্মিষ্ঠা ও সন্মিত্রা রায় (মুর্শিদাবাদ), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), মনতোষ, নীলমণি, পৃথ্বীশ, নির্ম্মল, আশুতোষ, রঞ্জিত, অমূল্য, উমানাথ ও সুনীল (বর্দ্ধমান), বাপ্পা ও শিবাজী রায় (কৃষ্ণনগর), তনু, বাপি, নন্দা, ছোটন, মিনতি, বাবলু, পার্থ, কল্যাণ, পাপু, টুটুল, অঙ্কি, বুলবুল, সঙ্কিতা ও টুনটুন (পুটিয়ারী), বাপি, বুতাম, পিন্টু, সুমিতা ও অশোক গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), আশা, খোকন, ইন্দু, সখী, খুকু ও পুলু (কলিকাতা), গাবলু, বুচু, রুমীশ্র, মণিকা, সনৎ ও শোভা লাহিড়ী (পাটনা)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক

উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), রেণুকা, মালতী, কমলা, বিভা, মোহন, সতী, বাহাদুর, মণিলাল ও পণ্ডিত (নিউদিল্লী), দুর্গাদাস, রেণু, প্রণব, শকুন্তলা, পদ্মিনী ও শোভনলাল সেন (রাণাঘাট), মণীন্দ্র, ভক্তি, আরতি, শিশির, কোহিনুর, প্রেমাংশু, বীরেন্দ্র ও নচিকেতা রায়-চৌধুরী (জয়পুর), লালানা, সোমপ্রকাশ, ধর্ম্মসেন, শুক্লা, দ্বিজেন, রঙীন, চন্দ্রিমা, দিবাকান্তি, প্রনীলা, প্রদোষ ও প্রদীপকুমার (ধুবড়ী), লালু, বাচ্চু, কুমকুম, বুবু ও লালটু সিংহ (কলিকাতা), জোনাকী বাগচী (পূর্ব্ব-পুটিয়ারী)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি—স্থানাভাবের কারণে, এ-বারের সংখ্যায় 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তরদাতাদের সকলের নামধাম প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। বাকী নামগুলি যথারীতি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

'কিশোর-জগৎ' পরিচালক

বাদ্যযন্ত্রের কথা

দেবশর্ম্মা চিত্রিত

বিচিত্র-ছাঁদের এ তার-যন্ত্রটি দেখছো— সেটি খুবই প্রাচীন আমলের—খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ১৮৫০ বছরেরও আগেকার সমাজের সুসভ্য-উন্নত 'বেদাউইন্' বা 'বেদুইন্' জাতির জনপ্রিয় বাদ্য-বিশেষ। প্রাচীন মিশর-রাজ্যের সমৃদ্ধ-সংস্কৃতি-কলানিপুণ অধিবাসীদের সঙ্গে আরবদেশীয় এই 'মরুবাসী-যাযাবর' বেদুইনদের ছিল বিশেষ সৌহার্দ্য। সঙ্গীত-কলায় এঁরা ছিলেন উভয়েই অনুরাগী।

খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ১৩০০ বছর আগে মিশর-রাজ্যের সুসভ্য-প্রাচীন সৌখিন-অভিজাত সমাজে বিচিত্র-গড়নের এই তার-যন্ত্র আর এভিনেট-ছাঁদের 'তে-তার' বীণ-বাদ্যের সুর যোগে সঙ্গীত-সুর-লহরী সৃষ্টি করাই ছিল— সেকালের কৃষ্টি-কলাবিদ্ শিল্প-রসিকদের বিশেষ-প্রিয় রীতি।

খৃষ্ট-জন্মের ২৩৩১ বছর আগে প্রাচীন মিশর রাজ্যের অধিবাসীদের সুর-সঙ্গীত চর্চ্চার বিশেষ-প্রিয় বাদ্য-যন্ত্র ছিল এই ধরণের বিচিত্র-ছাঁদের তার-বাঁধা বীণা আর নল্-গড়নের বাঁশী। মিশরের প্রাচীন সৌখিন-সমাজে এই দুটি বাদ্য-যন্ত্রের রীতিমত কদর ও রেওয়াজ ছিল।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বেলার বয়েস এখন কত ?

অভ্যাস বশে মাথার ওপর একবার তাকাল দীপেন। নাঃ, সূর্যটা এখনও মধ্যাকাশে পৌঁছয় নি। পরমুহূর্তে হাতঘড়িটা দেখল সে। দশটা বেজে তিরিশ মিনিট।

নগিনদাস পারিখ ফিরবেন সেই পাঁচটার সময়। দীপেন একবার ভাবল, বোম্বাইতে ফিরে দুপুরের খাওয়া সেরে পরিপাটি একখানা দিবানিদ্রা দিয়ে আসবে কিনা ? পরক্ষণেই কিন্তু সিদ্ধান্তটা নাকচ করে দিল সে।

সাড়ে দশটা থেকে পাঁচটা—মোট সাড়ে ছ ঘণ্টা সময়। দীপেন স্থির করল এই সময়টা আন্ধেরীর পথে পথেই কাটিয়ে দেবে সে। নীলা চৌধুরী নামে অজানা বনের অচেনা পাখিটার যে ঠিকানার সূত্র নিয়ে সে এখানে এসেছে, ঘুরেফিরে একবার দেখাই যাক না সেই পরিবেশটা কেমন ?

দারোয়ানটা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে দীপেন বলল, 'আচ্ছা এখানে হোটেল-টোটেল কিছু আছে ?'

বিশ্লেষণী চোখে দীপেনকে আরেকবার দেখে নিয়ে দারোয়ানটা বলল, 'আছে। লেকেন—'

'কী ?'

'ও সব গরীব লোকদের জন্যে। আপনার মতন আমীর লোকের ওখানে খেতে খুব কষ্ট হবে।'

দীপেন হাসল, 'কষ্ট যদি হয়ই কি আর করা যাবে ! না খেয়ে তো থাকতে পারা যাবে না। হোটেলগুলো কোনদিকে ?'

এমন পরিচ্ছন্ন চেহারা যার, পরণে যার এত দামী নিখুঁত সুট—সে কিনা সস্তা গরীব হোটেলে খেতে যাবে ! দারোয়ানটা বলল, 'আপনি জানেন না সাহাব, ঐ হোটেল-গুলো কি নোংরা আর গান্দা। এদিকে সেদিকে যত কারখানা আর ফিল্মী ষ্টুডিও আছে—সে-সব জায়গার কুলী আর মজুররা ওখানে খেতে আসে। ওখানে না গিয়ে আপনি যদি খোড়াসে ওখলিফ করে দুটো টিলা পিছিয়ে যোগেশ্বরী যান—'

'যোগেশ্বরীতে যাব কেন ?'

'সেখানে ভাল হোটেল আছে।'

'ভালর দরকার নেই। তুমি এখানকার হোটেলগুলোর পথ বলে দাও।'

পরোপকারের উৎসাহটা স্তিমিত হয়ে গেল দারোয়ানের। 'জগতে কারো ভাল করতে নেই'—এই সার কথাটা মনে মনে সে হয়ত ভাবল। তারপর নিস্পৃহ সুরে ডান দিকে আঙুল হেলিয়ে বলল, 'ঐ দিকে গেলে দেখতে পাবেন সারি সারি টিনের চালার মাঝি আর মানুষ ভনভন করছে। ওগুলোই হোটেল।' মুখে এই বলল। মনে মনে হয়ত বলল, 'ভাল কথা তো কানে নিলে না। যাও শালা, কুলীমজুরের সঙ্গে গুঁতোগুতি করে ভোজ খাও গে—'

দীপেন আর কিছু না বলে রাস্তায় নামল।

বোম্বাই শহর থেকে মাইল পনের কুড়ি দূরে এই অঞ্চলটা এখনও পুরোপুরি শহরে হয়ে উঠতে পারে নি। এখানে বাড়ির চাইতে ফাঁকা জায়গাই বেশি চোখে পড়ে। ইতস্তত ডোবা, পুকুর, খানাখন্দ, ঝোপঝাড় চারদিকে ছড়ানো। এমন কি এই প্রাক্‌দুপুরেই ঘুঘুর ডাক কানে আসছে। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন নির্জনতা। জায়গাটা মানুষকে জুড়িয়ে দেয় যেন।

চারদিক দেখতে দেখতে সোনারপুরের কথা মনে পড়ে গেল দীপেনের। বোম্বাইয়ের এই শহরতলীকে ঘিরে সোনারপুরের স্মৃতিই বুঝি ছড়িয়ে রয়েছে।

সম্প্রতি বোম্বাই ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট এ অঞ্চলটার অভিভাবক হয়েছে। ফলে পুরণো বাড়িঘর ভাঙা পড়ছে। শতখাকে ঘোরা আঁকোবাঁকা সর্পিল গলিগুলোকে সরল রেখায় প্রসারিত চওড়া চওড়া হাইওয়ের চেহারা দেবার চেষ্টা চলেছে। রাস্তায় রাস্তায় সবেমাত্র খোয়া পড়েছে। এখনও রোলার দিয়ে সেগুলোকে সমান করে পীচের চাদর পরানো হয় নি। সুতরাং রাস্তাগুলো অসমতল, কুমীরের পিঠের মত কর্কশ।

এলোমেলো পায়ে লক্ষ্যহীনের মত ডান দিকে এগিয়ে চলল দীপেন। অনেকক্ষণ হাঁটার পর সিনেমার ক'টা ষ্টুডিও চোখে পড়ল। তারপর ফাউন্টেন পেনের কারখানা, বিস্কুট তৈরির কারখানা, ছোটখাটো মেশিন শপ, ষ্টীল রোলিং ক্যাক্টরি ইত্যাদি ইত্যাদি একে একে দেখা দিতে লাগল।

খানিকটা আগে যে নির্জন ছায়াচ্ছন্নতা থেকে দীপেন এসেছিল তার সঙ্গে এই জায়গাটার বিন্দুমাত্র মিল নেই। দীপেন যেন অন্য ভুবনে এসে পড়েছে। এখানে চিমনির ধোঁয়া, ব্যস্ততা, ভিড়, ধুলো, ট্রাক চলার অবিশ্রান্ত আওয়াজ—সব ঠাসাঠাসি হয়ে আছে।

দুপুর পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল দীপেন। তারপর দারোয়ানের নির্দেশমত টিনের চালার প্রায়ান্ধকার নোংরা হোটেলে কুলী-মজুরদের সঙ্গে পাশাপাশি আসন পেতে চাপাটি, ডাল, মাংস, ভাল আর মরিচের আচার খেয়ে দাম চুকিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে এসে হাতঘড়িটা দেখল দীপেন। দেড়টার মত বেজেছে। পশ্চিম আকাশের ঢালু বেয়ে সূর্য খানিকটা ঢল খেয়ে নীচে নেমে গেছে।

এখনও সাড়ে তিন ঘণ্টার মত সময় আন্ধেরীর পথে পথেই কাটিয়ে দিতে হবে। আগেরবার ডান দিকে গিয়েছিল দীপেন। এবার বাঁ দিকে চলল সে।

বাঁ দিকটা ডান দিকের একেবারে বিপরীত। নীলকান্ত ঘোশী রোডে নীলা চৌধুরীর যে ঠিকানায় দীপেন গিয়েছিল সে জায়গাটার চাইতে এখানটা আরো নির্জন। মাঝে মাঝে দু-একটা বাড়ি, কদাচিৎ এক-আধজন মানুষ চোখে পড়ে। এখানে অধিকাংশই গাছপালা, পাখি আর অসীম নীলাকাশ। গাছের ভেতর শিরিষ আর শিমুলই বেশি।

বোম্বাই নামে মুখর, অশান্ত, উত্তেজিত-স্নায়ু একটি শহরের পনের বিশ মাইলের মধ্যে এমন শান্ত নিরিবিলি একটা জায়গা যে রয়েছে তা যেন অকল্পনীয়। হাঁটতে হাঁটতে দীপেনের মনে হল, প্রকৃতির স্বদেশে এসে পড়েছে যেন!

আচ্ছন্নের মত কতক্ষণ হেঁটেছিল, দীপেনের খেয়াল নেই। যখন সে সচেতন হয়ে উঠল তখন পাঁচটা বাজতে আর সামান্যই বাকি।

এতক্ষণে নলিনদাস পারিখের ফিরে আসার সময় হয়েছে। মুহূর্তে প্রকৃতির সম্মোহন কেটে গেল। দ্রুত পা ফেলে নীলকান্ত ঘোশী রোডের দিকে হাঁটতে শুরু করল দীপেন।

কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। দারোয়ানটা তেমনভাবেই বসে ছিল। দীপেনকে দেখে উঠে সামনে এগিয়ে এল।

দীপেন বলল, 'নলিনদাসজী ফিরেছেন?'

'জী—' দারোয়ান মাথা নাড়ল, 'এই আপনি আসবার আগেই উনি এসেছেন। আপনার কথা আমি ওঁকে বলেছি। আসুন—'

দারোয়ান দরজা খুলে দিল। দীপেন ভেতরে ঢুকল।

ডাইনে টেনিস কোর্ট আর ফোয়ারা রেখে, বাঁয়ে সিমেন্টের আমলকী, মর্মর-নায়িকা এবং ছোট ছোট ছায়াকুঞ্জ ফেলে দারোয়ানটার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর চলে এল দীপেন। যেতে যেতে মনে হল, তার হৃদপিণ্ডের উত্থান-

পতন দ্রুততর হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে কোন গ্রন্থিটির রহস্যময়তার মধ্যে সে এসে পড়ল, কে বলবে।

দারোয়ানটা যে বিশাল ঘরখানায় তাকে নিয়ে এল তার আকার অনেকটা প্যারাবোলার মত। একদিকে উনিশ শতকী মেজাজ ঢালাও ফরাস পাতা। কালর ঢেওয়া তাকিয়া, বালিশ, গড়গড়া—আয়োজনের কোথাও কোন খুঁত নেই। আরেক দিকে আধুনিক রুচিসম্মত সোফা, সেটী, টীপয়ের ব্যবস্থা।

দারোয়ানটা তাকে একটা সোফায় বসিয়ে বলল, 'আমি একটা বয়কে ডেকে দিচ্ছি। সে আপনাকে স্লিপ দেবে। তাতে আপনার নাম, ঠিকানা, কী দরকারে এসেছেন—লিখে দেবেন। তা হলেই নগিনদাসজী আপনাকে ডেকে পাঠাবেন।' বলে সে চলে গেল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। স্লিপ আর পেন্সিল হাতে একটা বয়ের আবির্ভাব ঘটল। দুটো জিনিসই দীপেনের সামনে নামিয়ে রেখে বয়টা বলল, 'লিখে দিন।'

নাম লিখল দীপেন, হোটেলের ঠিকানাও লিখল। কী প্রয়োজনে এসেছে তা লিখতে গিয়ে সে কিন্তু থমকে গেল। একটু চিন্তা করে অবশেষে লিখল, যে জন্যে এসেছি সাক্ষাতে বলব।

লেখা হয়ে গেলে স্লিপ নিয়ে বয়টা চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে সে বলল, 'আসুন, আমার সঙ্গে—'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল দীপেন। তারপর বয়টার পিছু পিছু দোতলার একটি ঘরে চলে এল। এই ঘরটিও এক-তলার সেই ড্রয়িং রুমটার মত। তেমনই উনিশ শতকী আর উগ্র বিশ শতকী রুচি দিয়ে সাজানো।

প্রথমটা লক্ষ্য করেনি দীপেন। তার দৃষ্টিটা ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ধবধবে ফরাসে নিবদ্ধ হল। সেখানে আধশোয়া ভঙ্গিতে যিনি বসে আছেন তাঁর গায়ের রঙ সুগৌর, বয়েস পঞ্চাশোর্ধ্বে কিন্তু ষাটের অনেক নীচে। পৃথিবীর তিন ভাগ জল একভাগ স্থলের মত বেশির ভাগ চুলই তার কালো। এই বয়সেও শরীর বেশ মসৃণ; কোথাও কোন কুঞ্চন বা ভাঁজ নেই। চোখ দুটি আশ্চর্য উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সে দুটি জগতের কোন কিছু বিশ্বাস করে না। কিংবা খুটিয়ে খুটিয়ে বিশ্লেষণ না করে সে দুটি কিছুতেই তৃপ্ত হয় না।

কপালে চন্দনের প্রলেপ, কানে সোনার মাকড়ি, চোখে সুর্মার টান এবং কাপড় পরার বিশিষ্ট রীতিটি দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় ভদ্রলোক গুজরাটি। ইনিই কি তা হলে নগিনদাস পারিখ?

চোখাচোখি হতেই ভদ্রলোক সোজা উঠে বসলেন পরিষ্কার বাঙলা ভাষায় বললেন 'নমস্কার' দীপেন প্রতি নমস্কার জানাল।

ভদ্রলোক বললেন 'আসুন'—বলেই কি ভেবে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'থাক; এখানে না বসে চলুন সোফাতেই যাই। আপনার পরনে ট্রাউজার্স রয়েছে এখানে বসতে অসুবিধে হবে।'

'কিছুমাত্র না—' দীপেন এগিয়ে এসে ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসল।

একটু চুপচাপ। তারপর ভদ্রলোক বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

খানিকটা ইতস্তত করে দীপেন বলল, আমি নগিনদাস পারিখের সঙ্গে দেখা করতে চাই!'

'আমিই নগিনদাস।'

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে নগিনদাসকে আরেকবার দেখে নিয়ে দীপেন বলল, 'আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।'

'বেশ, আপনার প্রয়োজনের কথা শুনব।' নগিনদাস বললেন, 'তার আগে বলুন, কী খাবেন? চা না কফি?'

নগিনদাস পারিখকে কি রূপে দেখতে হবে, সে সম্বন্ধে দীপেনের দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার যে সামান্য পরিচয়টুকু পাওয়া গেছে তাতে রীতিমত সহৃদয় আর অতিথি বৎসলই মনে হচ্ছে। মনে মনে বেশ খানিকটা আরাম বোধ করল দীপেন। বলল, 'শুধু এক কাপ চা।'

'আর কিছু না?'

'আজ্ঞে না।'

ফরাসের গায়ে কলিং বেল ছিল। নগিন দাসজী সেটা বাজাতেই একটা বয় ঘরে এল। তাকে দু কাপ চা আনার নির্দেশ দেওয়া হল।

বয়টা চলে গেলে নগিনদাসজী দীপেনের দিকে

ফিরলেন, হাসির একটি দীপ্তি তাঁর মুখে সর্বক্ষণ লেগেই আছে। ওটা সম্ভবত পরিতৃপ্তির লক্ষণ। প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে পৌঁছে জীবনের সব দিকের সাফল্য বোধহয় তিনি কথায়ত্ত করে ফেলেছেন। ফলে অস্তিত্বের কেন্দ্র থেকে একটি মধুর তৃপ্তি উৎসারিত হয়ে সবসময় তাঁর সর্বাঙ্গে বিকীর্ণ হয়ে আছে। স্মিত মুখে নগিনদাস বললেন 'এবার আপনার প্রয়োজনের কথা শোনা যাক।'

দীপেন লক্ষ্য করেছে প্রথম থেকেই নগিনদাস তার সঙ্গে বাঙলায় কথা বলছেন। উচ্চারণে কিছু জড়তা থাকলেও ভাষাটা কিন্তু শুদ্ধ। কিছুটা অবাক হয়েই সে প্রশ্ন করল, 'আপনি বেশ ভাল বাঙলা জানেন দেখছি।'

মুখের হাসিটিকে আরো একটু বিস্তৃত করে প্রশংসাটুকু অনুমোদন করলেন নগিনদাস। হঠাৎ কৌতুকের সুরে বললেন, 'আপনি স্বীকার করছেন আমি ভাল বাঙলা জানি!'

'নিশ্চয়ই।'

'বাঙলা ভাষা কতটুকু আমার জানা আছে, নিজে জানি না। তবে বাঙালী দেখলে বাঙলা বলতে আমার ভাল লাগে।'

সবিস্ময়ে দীপেন বলল, 'আমি যে বাঙালী আপনি তা বুঝতে পেরেছেন?'

'পেরেছি বৈকি—'

নগিনদাস নিজেকে অনেকখানি প্রসারিত করে দিয়েছেন। দীপেনও অতএব শুধুমাত্র কাজের কথায় নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারল না। বলল, 'কী করে পারলেন সে সম্বন্ধে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

'খুব সোজা কথা।' নগিনদাস বলতে লাগলেন, অনেকদিন আমি বাঙলাদেশে ছিলাম। কলকাতার চিত্তরঞ্জনে এস্টেটে এখনও আমার পাটের ব্যবসা আছে। আমি অবশ্য সেটা দেখতে পারি না; আমার ছোট ভাই দেখাশোনা করে। বোম্বাইয়ের বিজনেস নিয়েই আমাকে পড়ে থাকতে হয়। সে যা-ই হোক, বাঙলাদেশে থাকার সময় বাঙালীদের অনেক কিছুই জেনেছিলাম। চ্যাটার্জি-ব্যানার্জি-রায়-সেন-দত্ত—এসব যে বাঙালীদের পদবী তা আমি জানি। আপনার পদবী দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনি বাঙালী; তাই আপনাদের ভাষাতেই কথা বলেছি।'

এই সময় বয়টা চা নিয়ে এল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নগিনদাসজী বললেন, 'আপনার প্রয়োজনের কথাটা এবার সেরে নিলে ভাল হ'ত। আমাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে একবার বেরুতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না দীপেন। কিভাবে কোথা থেকে শুরু করবে সেটা স্থির করতে তার সময় লাগল। মনে মনে নিজের বক্তব্যটা গুছিয়ে নিয়ে এক সময় সে শুরু করল, 'দেখুন নগিনদাসজী, কাল কলকাতা থেকে আমি বোম্বাইতে এসেছি। উঠেছি একটা হোটেলে। বোম্বাইতে কেন এসেছি, জানেন—'

নগিনদাসজী হাসলেন, 'আমার পক্ষে জানা সম্ভব না।'

'ঠিক কথা।' দীপেন মাথা নাড়ল। বলল, 'এসেছি একজনের খোঁজে?'

'তা আমি আপনাকে সে ব্যাপারে কী সাহায্য করতে পারি? আপনি বরং—'

'কী?'

'খোঁজাখুঁজির জন্যে পুলিশের হেল্প্ নিতে পারেন।'

'কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নগিনদাস তাকালেন, 'কী?'

'আমি যার জন্যে এসেছি তার খোঁজ বোম্বাই শহরে মাত্র একটি মানুষই দিতে পারে—'সোজা নগিনদাসের চোখের দিকে তাকাল দীপেন।

'সেই একমাত্র মানুষটি আমিই নাকি?'

'আমার সেই রকম ধারণা।'

একটু চুপচাপ। তারপর ঈষৎ অসহিষ্ণু সুরে নগিনদাস বলে উঠলেন, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কার খোঁজে এসেছেন বলুন তো?'

দীপেন বলল, 'নীলা চৌধুরী নামে একটি মেয়ের।'

নগিনদাস চকিত হয়ে উঠলেন, 'আশ্চর্য!'

'কী?'

'আমিও তো তাকেই খুঁজছি।'

এবার দীপেনের চকিত হবার পালা। বিমূঢ়ের মত নগিনদাসের কথার প্রতিধ্বনি করল সে, 'আপনিও তাকে খুঁজছেন!'

'হ্যাঁ। ছ'মাস হল, আমাকে এ বাড়িতে রেখে নীলা

চৌধুরী চলে গেছে। তারপর থেকে আর তার খোঁজ নেই। যেপুন দিকি পরের বাড়ি আগলে আমাকে থাকতে হচ্ছে। কি মুসকিলে যে পড়েছি! নীলা চৌধুরীকে পেলে তার বাড়ি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যেতাম।'

দারোয়ানের মুখে আগেই শুনেছিল দীপেন। সে বিস্ময় এবং বিমূঢ়তা এখনও তার কাটে নি। আস্তে আস্তে সে বলল, 'নীলা চৌধুরী এত বড় একটা বাড়ির মালিক!'

'এতে অবাক হবার কি আছে! আপনি বোধ হয় জানেন না, নীলা চৌধুরী এই বোম্বাই শহরে বিরাট বিরাট তিনটে ব্যবসার পার্টনার। তার আয় যে কত, সে সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা খুব সম্ভব নেই।'

সমস্ত ব্যাপারটাই একটা দুর্বোধ্য ধাঁধার মত মনে হল। মাথার ভেতরটা ঘুরতে লাগল যেন। দীপেন কি যে বলবে, ভেবেই পেল না।

এই সময় নগিনদাসের কি যেন মনে পড়ে গেল। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে তিনি বললেন, 'ভাল কথা, আপনি তো নীলা চৌধুরীকে খুঁজতে এসেছেন—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এই খোঁজার ব্যাপারে আপনার স্বার্থ কী?'

দীপেন হকচকিয়ে গেল। স্বার্থটা যে তার কোন সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে, তা শুধু সে নিজেই জানে। স্বর্গটা তার কাছাকাছি এসে পড়েছে। নীলা চৌধুরীর একটা হদিশ বার করতে পারলেই সেটা সরাসরি হাতের মুঠোয় নেমে আসবে! কিন্তু সে কথা তো নগিনদাস পারিখকে বলা যায় না। একটু ভেবে নিয়ে সে শুধু বলল, 'কোন স্বার্থ নেই।'

কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হল। এ জগতে নিঃস্বার্থভাবে একজনকে খুঁজতে কেউ যে বার শ মাইল পাড়ি দিয়ে আরব সাগরের এই পটে আসতে পারে, তা যেন অভাবনীয়, অন্তত নগিনদাসের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা তার উল্টো কথাই বোধহয় বলে। বাঁ চোখ অনেকখানি ছুঁচ করে তিনি বললেন, 'তবে?'

একটু ভেবে নিয়ে দীপেন বলল, 'নীলা চৌধুরী আমার আত্মীয়। তাই—'

দীপেনের কথা শেষ হবার আগে নগিনদাস বলে উঠলেন, 'আত্মীয়!'

'হ্যাঁ।'

'নীলা চৌধুরীর মা আমার মাসিমা হন।' ইচ্ছা করেই মাসতুতো বোন বলল না দীপেন। সম্পর্কটার মধ্যে খানিকটা জটিলতা ঢুকিয়ে দিল।

চোখ আরো কুঁচকে গেছে নগিনদাসের। বললেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আমি যতদূর জানি নীলা চৌধুরীর মায়ের আপন কোন বোন নেই।'

দীপেন অনুভব করল, ঘামে তার জামা ভিজে উঠেছে। অস্বাভাবিক স্নায়ুতীতিতে বুকের ভেতরটা থরথর করছে। আর সেই থরথরানির বেগ অতি দ্রুত সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। কাঁপা শিথিল স্বরে সে বলল, 'আপন বোন নন; খুড়তুতো।'

এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন করলেন না নগিনদাস। শুধু বললেন, 'তা হবে—'

দীপেন বলতে লাগল, 'মাসখানেক আগে নীলা চৌধুরীদের সোনারপুরের বাড়িতে গিয়েছিলাম। মাসিমা বললেন বহুদিন নীলাকে তিনি স্বাখেন নি। মাসিমা আমাকে বললেন যদি বোম্বাই এসে—'

নগিনদাস শেষাংশটুকু পূরণ করে দিলেন, 'নীলাকে ধরে নিয়ে যান বড় ভাল হয়। তাই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' দীপেন মাথা নাড়ল।

[ক্রমশঃ

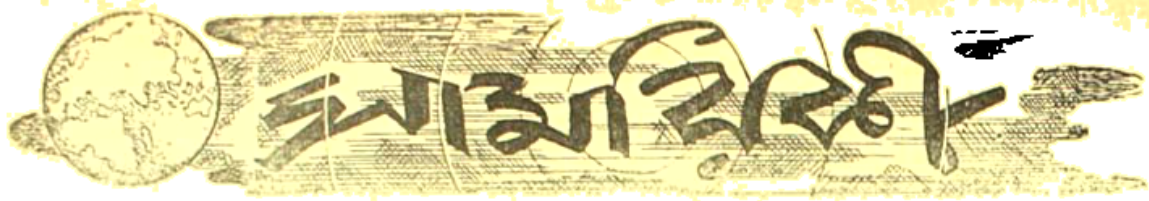

খাদ্য চিন্তা—

বায়ু ও জল ছাড়িয়া যেমন মানুষ বাঁচিতে পারে না, তেমনি খাদ্য ছাড়িয়াও মানবের পক্ষে দেহ ধারণ করা সম্ভব নহে। আর পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ছাড়া মানব দেহের পুষ্টিও হয়না —দেহ জীর্ণ হইয়া পড়ে, শরীর দুর্বল হয় এবং নানা রোগের আক্রমণে সে দেহ জীর্ণ হইয়া পড়ে। তাই খাদ্য চাই-ই এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে চাই। অবশ্য ঘাটতি কোনও খাদ্যের বদলে অন্য বিকল্প খাদ্য হইলেও চলিবে; কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ যেন ঠিক থাকে। বয়স অনুযায়ী যাহার যে পরিমাণ খাদ্য দরকার তাহাকে তাহা খাইতে দিতে হইবে। তাহা না হইলে শরীরের ক্ষয় হইবে—এ তত্ত্ব প্রায় সকল-কারই জানা আছে। আমাদের জাতীয় সরকারও নিশ্চয়ই এই সহজ, সরল তত্ত্বটি জানেন। তাই তাঁরা খাদ্যের অভাবে জনসাধারণের যাহাতে কষ্ট না হয় তাহার জন্য 'রেশনিং', খাদ্য সংগ্রহ, চাউলের বিকল্পে গম সরবরাহ, দুধের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য সন্দেশ বন্ধ, প্রভৃতি নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে চাউল প্রভৃতি খাদ্যের ঘাটতি ও কালোবাজারে চাউলের মূল্যের অসম্ভব ঊর্দ্ধগতি ঘটিতেছে। সরকার চেষ্টা করিয়াও কোনও সুরাহা করিতে পারিতেছেন না। মুনাফাখোর কালোবাজারী ও অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্য ঘাটতির এই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া নিজদিগের স্বার্থ-সিদ্ধি করিতেছেন। কিন্তু জনসাধারণের যে ইহাতে কত ক্ষতি ও কষ্ট হইতেছে তাহা ঐ অসাধু ব্যক্তিরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না, বা করিয়াও অর্থ লোভে নিজেদের সংযত করিতে পারিতেছেন না। সরকার পক্ষের ব্যবস্থাও ত্রুটি-হীন বলা চলে না। দিকে দিকে তাই অসন্তোষ ধ্বনিত হইতেছে। বিরোধীপক্ষও সরকার পক্ষকে বেগ দিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। বিরোধী পক্ষ ছাড়াও কংগ্রেস দলেরও কতিপয় ব্যক্তি এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া আন্দোলনকে জোরদার করিয়া তুলিয়াছেন। এই আন্দোলনে সরকার পক্ষ সজাগ হইয়া খাদ্য ঘাটতি অঞ্চল-গুলিতে অভাব অভিযোগ দূরীকরণে যে সচেষ্ট হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আন্দোলন হিংসার পথ লইলে জীবনহানি, সম্পত্তিহানি প্রভৃতি নানা রূপ ক্ষয়ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই পুলিশের হঠ-কারিতায় কয়েকটি তরুণের প্রাণনাশ হইয়াছে, সরকারী সম্পত্তি ও যানবাহনের ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং বহু ব্যক্তি আহত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক দেশে আন্দোলনের অধিকার সকলকারই আছে। কিন্তু অধিকার থাকিলেই তাহার সাথে দায়িত্বও বর্ত্তায়। আন্দোলন বিপথে চলিলে এবং তাহার সাথে প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটিলে সরকারপক্ষও যেমন দায়ী হইবেন, আন্দোলনের উদ্যোক্তারাও তেমনি দায়িত্ব এড়াইতে পারিবেন না। আর সাধারণ লোকেও এরূপ আন্দোলনকে মনেপ্রাণে সমর্থন করিতে পারিবেন না। তাছাড়া দেশে যদি সত্যই খাদ্যাভাব থাকে তাহা হইলে শুধু আন্দোলনের দ্বারা ফসল ফলান কি সম্ভব হইবে? দেশে প্রভূত পরিমাণে খাদ্যশস্য জন্মাইতে হইলে সমবেতভাবে সকলকেই সচেষ্ট হইতে হইবে। সেখানে সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষ বলিয়া কিছু থাকিবে না—সকলকেই একযোগে খাদ্যশস্য ফলনের কাজে লাগিতে হইবে। জমির, বিশেষ করে পতিত জমির, উন্নয়ন করিতে হইবে, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরী বন্ধ করিতে হইবে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটিলে যেমন একজাতি, একপ্রাণ হইয়া সকলকে সে আক্রমণের মোকাবিলা করিতে হয়; তেমনি এই খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের আক্রমণকেও সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষ, নির্দলীয় ও আপামর জনসাধারণ সকলে মিলিয়া একসাথে, একযোগে ঠেকাইতে হইবে। জাতির স্বার্থে, জাতির দুর্দ্দিনে আজ সকলকে এক হইতে হইবে—তবেই আসিবে এই বিক্ষুব্ধ ভারতে একতা, আসিবে নবভারতের জনতা, জাতির জীবনে ঘটিবে নব সূর্য্যোদয়, গণতন্ত্রের হবে জয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম

ডি, লিট্,—

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় "প্রাচীন ভারতে সাহিত্য-সমীক্ষা" শীর্ষক মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ রচনার জন্য সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। এই নিবন্ধের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ পদ্মবিভূষণ, ডঃ শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও ডঃ শ্রীকে, সি, পাণ্ডে, ডঃ মুখোপাধ্যায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ডঃ মুখোপাধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ডি, লিট্।

এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, ডঃ মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রজীবন বরাবরই প্রোজ্জ্বল। ইনি ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার পূর্বক 'রাধাকান্তদেব স্মৃতি স্বর্ণপদক', 'জুবিলী বৃত্তি' ও 'ঈশান বৃত্তি' লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৪৬ সালে উক্ত বিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকারীরূপে ইনি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। 'রসসমীক্ষা' নামক গবেষণা নিবন্ধ রচনা করিয়া ১৯৫৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইনি ডি-ফিল্ উপাধি লাভ করেন।

রবীন্দ্র ভারতীর সমাবর্তন—

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক সমাবর্তন বেদমন্ত্র ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়া শুরু হয়। পৌরোহিত্য করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। অনুষ্ঠানে ভাষণ অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার দীক্ষান্ত ভাষণে বলেন "—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান দান মননশীলতা ও চিন্তা-শক্তির উৎকর্ষ। ব্যবহারিক জীবনের পথে এই যেন হয় স্নাতকদের সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়।

এই দিবস বিশেষ সমাবর্তনে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শঙ্কর ও সংগীত শিল্পী ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী-খানকে অনারারি ডিগ্রি দেওয়া হয়।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে মঞ্চে উপবিষ্ট রহিয়াছেন (বামদিক থেকে)—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শঙ্কর ও সঙ্গীতশিল্পী ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খান। ফটো—রনেন ঘোষ

বার্ষিক সমাবর্তনে শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দেবনাথ, পি-এইচ-ডি এবং ৮৪জন স্নাতক ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা পাইয়াছেন।

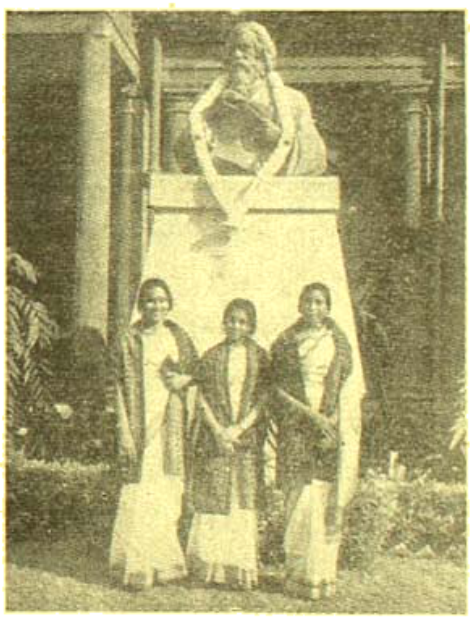

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক সমাবর্তনে হাওড়ার 'নৃত্যম' হইতে সুব্রতা ও কল্পনা হাজরা এবং সবিতা ঘোষ নৃত্যে প্রথম বিভাগে ডিপ্লোমা পেয়েছেন।

ফটো—রনেন ঘোষ

স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে সংস্কৃত সেমিনার—

বারাণসীর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে যুগ প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের শুভ-জন্মোৎসব তিনদিন ধরিয়া এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এই উৎসবে দুই দিবস ব্যাপী সংস্কৃত সেমিনার-এর আশাতীত সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৩ই জানুয়ারি ত্রিবিধপূজার দিন প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা হোম, বেদপাঠ, উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা, স্বামীজীর জীবনী পাঠ ও আলোচনা, ভজনাদি ও রাত্রে কালীপূজা হয়।

১৪ই ও ১৬ই জানুয়ারি স্বামীজীর মহাজীবনের এক বিশেষ অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। বিষয় বস্তু ছিল "বেদান্ত-ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ"। সর্বসমেত ২৫খানি রচনা পাওয়া যায় এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন ২২জন ছাত্র-ছাত্রী। ইঁহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতে শাস্ত্রী এবং আচার্য উপাধিধারী।

বারাণসীর মহারাজা মহামান্য শ্রীমান বিভূতিনারায়ণ সিং বাহাদুর শনিবার ১৫ই জানুয়ারি সভার উদ্বোধন করেন এবং ২৫জন রচনা প্রতিযোগীকে সংস্কৃত গ্রন্থ পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে ৯জন ছাত্রী ছিল। বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতি পণ্ডিত শ্রীসূর্যনারায়ণ মণি ত্রিপাঠী সভায় পৌরোহিত্য করেন।

সভায় স্বাগত ভাষণে অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দ বলেন, স্বামীজী সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং এই ভাষার বহুল প্রচার কামনা করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন এই ভাষার মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐক্য এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা সন্নিহিত রহিয়াছে। বেদান্তের বাণী মানবাত্মার অমরত্ব ও ঐক্যের বাণী এবং ইহাই বিশ্বভ্রাতৃত্বের অমোঘবাণী।

উপকুলপতি পণ্ডিত ত্রিপাঠী তাঁহার অভিভাষণে বলেন—বিবেকানন্দের বেদান্তদর্শন এবং দৈনন্দিন জীবনে তাহার প্রয়োগ—ভারতে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে এক আশার আলো আনয়ন করিয়াছে। তিনি ছিলেন ভারতের গণজাগরণের ঋষিক। তাঁহার বাণী প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মিলনসেতু স্বরূপ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এবং ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের মিলনই হইবে ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতার শাশ্বত আদর্শ।

১৬ই জানুয়ারীর সভায় পৌরোহিত্য করেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতি আর্চিস এস. এইচ. ভগবতী।

উভয় দিনের সভায় বিভিন্ন পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণের কণ্ঠে স্বামীজীর নব বেদান্ত দর্শন, ভারতের গণজাগরণ এবং সাম্য, মৈত্রী বিশ্বভ্রাতৃত্বের পথ সুগম করিয়াছে—এই কথা সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনিত হয়।

সভাপতির অভিভাষণে আর্চিস্ ভগবতী বলেন, বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় 'সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম'। এই মহা-বাক্যকে অবলম্বন করিয়া স্বামীজী আর্ত, পীড়িত, অশিক্ষিত, অবহেলিত ও অস্পৃশ্যদের প্রত্যক্ষ নারায়ণ জ্ঞানে সেবাধর্মের প্রবর্তন করেন। ইহাই ভারতের শাশ্বত প্রেমের বাণী। রামকৃষ্ণ মিশন তাঁহার প্রদর্শিত পথে 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এই নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতে এবং সমগ্র বিশ্বে সাম্য মৈত্রী এবং মানবাত্মার মহিমা প্রচার করিতেছেন। এই নব বেদান্ত মানুষকে তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম করিয়াছে।

দুই দিনের সভান্তে পণ্ডিত প্রফেসার টি, এস, ভাণ্ডারকার মহোদয় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে সভাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভার সমুদয় কার্যসূচীই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৪

শুভ্রার অনুমান মিথ্যা হয়নি। দিন তিনেকের মধ্যেই তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসে পৌঁছল। রামবাবু রেজিষ্টার্ড পোষ্টে চিঠিখানা পাঠিয়েছেন। শুভ্রা পিওনের কাছ থেকে সই করে রাখল তার চিঠি।

সঙ্গে সঙ্গে নলিনী এসে সামনে দাঁড়ালেন, 'কিসের চিঠি রে ?'

শুভ্রা বলল, 'আগে পড়তে দাও মা, পড়ে নি।' তারপর মার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'সেই যে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম মা', তার চিঠি।'

'চাকরি হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

নলিনী গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর একটু বাদে বললেন, 'তুই তাহলে নিবিই ওই চাকরি।'

শুভ্রা নরম সুরে বলল, 'রাগ কোরোনা মা। টাকার তো দরকার। এখন নিই। তারপর সুবিধে মত অন্য কাজ যখন পাব তখনই ছেড়ে দেব।'

নলিনী চুপ করে রইলেন।

শুভ্রা বলল, 'ভেবনা মা। ভয়ের কিছু নেই।'

নলিনী বললেন, 'ভয় কি আর কিছুর জন্যে করি মা ? একা একা অতদূরে যাবি আসবি, পথে কত রকম কত কি ঘটতে পারে সেই ভয়। তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল।'

নলিনীর গলাটা ধরে এল। ছল ছল করে উঠল চোখ।

মা যেন মা নয়, ছোট্ট মেয়ে। তেমনি ভঙ্গিতে শুভ্রা তাঁর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে তাঁকে আদর করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'ভাবনার কিছু নেই মা। আরো কত লোক যাবে। গাড়িতে তো আমি আর একা যাচ্ছিনা। যেতে যেতে কতজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে।'

নলিনী মেয়েকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'খবরদার। রাস্তায় যাকে পাবে তার সঙ্গেই যেন আলাপ জুড়ে দিয়োনা।'

শুভ্রা হেসে বলল, 'তুমি আমাকে কী ভাবো বলতো। আমি কি অতই ছেলেমানুষ যে যাকে দেখব তার সঙ্গেই কথা বলব?'

শিপ্রা এগিয়ে এসে বলল, 'ছেলেমানুষরা অমন কাণ্ড করেনা দিদি। করে বুড়ো মানুষরা। রাস্তায় দেখলেই কাছে ডেকে ডেকে আলাপ করে। যতক্ষণ পারে দাঁড় করিয়ে রাখে।'

নলিনী সেখান থেকে সরে গেলে শুভ্রা হেসে বলল, 'পাড়ায় তোর অমন বুড়োবন্ধু কজন আছেন রে?'

শিপ্রা বলল, 'অগুণতি। আমি তো বেছে বেছে বুড়োদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করি। খুব নিরাপদ। তাঁরা সবাই আমার পৃষ্ঠপোষক—'

শুভ্রা হেসে বলল, 'জানি কোথাকার।' কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেও একজন পৃষ্ঠপোষকের দেখা পেয়েছে। রামগোপাল বলাককে নিয়ে সেদিন শুভ্রার বন্ধু কেতকী কী ঠাট্টাটাই না করল। সাবধানও করে দিয়েছিল। সেক্রেটারীর সঙ্গে যেন বেশি মেলা মেশা না করে। তাহলে বিপদের ভয় আছে। সত্যিই কি তাই? চাকরি নেওয়ার আগে তা হলে কি ব্যাপারটা আর একটু ভালো করে ভেবে দেখবে শুভ্রা? কিন্তু পরক্ষণেই তার হাসি পেল। কেতকীর মত সেও কি পাগল? ভদ্রলোকের মধ্যে হয়তো দৌজন্যের কিছু আতিশয্য আছে। কিন্তু তাকে ভয় করতে যাবে কেন শুভ্রা? তেমন বাড়াবাড়ি কিছু দেখলে সে কি সরে আসতে পারবেনা? আর শুধু কি নিঃশব্দে সরে আসবে? প্রতিকার করে আসবেনা? কোন অন্যায়কে মুখ বুজে মেনে নেবে, শুভ্রা তেমন নিরীহ মেয়ে নয়।

রামগোপাল বাবুকে শুভ্রা চিঠি লিখে জানিয়ে দিল সে তাঁর নিয়োগপত্র পেয়েছে। আর নির্দিষ্ট তারিখেই সে কাজে যোগ দিচ্ছে।

জয়েনিং ডেট সেট করাটা কাজের ধারা নয়। শুভ্রা তাই প্রায় সকাল সাতটা থেকেই ফুলারপুর যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে লাগল। স্নান করে খেয়ে নিল। মা এরই মধ্যে তিনটে তরকারি করে ফেলেছেন। ভাল, একটা ভাজা আর মাছের ঝোল।

শুভ্রা বলল, 'এত সব করতে গেলে কেন মা। দেখ তো মিছিমিছি কী কষ্ট তোমার।'

নলিনী বললেন, 'তাইতো! কষ্টটা মিছিমিছিই তো। নিজের ঘর-সংসার হোক, ছেলেমেয়ে হোক, তখন বুঝবে কিসে কষ্ট আর কষ্ট কিসে নয়। সন্তানের সামনে খাবার জিনিস ধরে দিতে পারলে যে কী আনন্দ তখন বুঝতে পারবে।'

শিপ্রা পাশে বসে বসে দিদির ব্যস্ততা দেখছিল আর নানা রকম মন্তব্য করছিল। মার কথার জবাবে বলল, 'ও সব বুঝতে দিদির এখনো অনেক দেরি মা। গায়ে না উঠতেই এক কাঁদি ধরে তো লাভ নেই। এই তো সবে চাকরিটা পেয়েছে, বিয়ের টাকা এবার থেকে জমাতে শুরু করবে। জমে জমে যখন পাহাড় হবে তখন—'

'জানিস কোথাকার। ওর বিয়ের টাকা কি আর অমনভাবে জুটবেনা? ওকেই জোগাড় করতে হবে?'

নলিনী শুভ্রার পাতে আরো দু হাতা ভাত দিলেন।

শুভ্রা বলল, 'তুমি করছ কী মা? এই সাত সকালে এত ভাত মানুষ খেতে পারে?'

নলিনী বললেন, 'যা কাজ কর্ম জুটিয়েছ তাতে তো এই রকমই খেতে হবে। সারা দিন তো এই খেয়েই থাকবি।'

শুভ্রা হেসে বলল, 'তাই বলে কি আর তিন বেলার খাওয়া এক বেলায় সেরে খেতে পারব?'

শিপ্রা বলল, 'তুমি কিছু ভেবনা। ওদের সেক্রেটারীর হাত দরাজ। নিশ্চয়ই ভালো টিফিন-টিফিনের ব্যবস্থা করবেন।'

শুভ্রা বোনের দিকে চোখ তুলে তাকাল। সেই দৃষ্টির অর্থ শিপ্রা যেন আর বেশি কিছু বলে মায়ের মনে ভয় ঢুকিয়ে না দেয়। অমনিতেই তাঁর মনে আজগুবি যে সব আশঙ্কা আছে, তাতে সামান্য কিছু গন্ধ পেলে মা তাকে মনে মনে নানাভাবে বাড়িয়ে নেবেন। তারপর নানা কথা ভাবতে শুরু করবেন।

চোখের ইসারায় ছোট বোনকে নিরস্ত করে শুভ্রা তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠল। শোবার ঘরে ঢুকে সাদা খোলের একখানা তাঁতের শাড়ি পরল। পাড়ে অবশ্য কিছু নক্সা আছে। ব্লাউজটাও সাদাই বেছে নিল। বর্ডারে সামান্য এমব্রয়ডারির কাজ।

ঘর থেকে বেরোলে শিপ্রা বলল, 'যাবি তো ফুলে।

কিন্তু যা উর্বশীর মত সেজেছিস মনে হয় যেন বিয়েটাতে যাচ্ছিস।'

শুভ্রা বলল, 'আমার পিছনে লাগা ছাড়া কি তোর কোন কাজ নেই? সাদা শাড়ি ব্লাউজ পরলাম তাতেও উর্বশী উর্বশী করছিস।'

শিপ্রা বলল, সত্যি, তোর কোন দোষ নেই। তুই যা পরিস তাতেই তোকে মানায়। শুধু মানায় বললে কম বলা হয়, ভারি সুন্দর দেখায়।'

শুভ্রা এগিয়ে এসে সস্নেহে ছোট বোনের গাল টিপে দিল, 'তুইও সুন্দরী।'

শিপ্রা মুখ ভার করে বলল, 'থাক, আমাকে আর ভুলাতে হবেনা। আমি যে কী তা আমি জানি।'

দেখতে সুশ্রী নয় বলে শিপ্রার মনে ভিতরে ভিতরে একটা চাপা দুঃখ আছে তা শুভ্রা জানে। ওর গায়ের রং কালো মুখের ডৌলেও খুঁৎ আছে। একটু বেশি লম্বাটে। ছোট ভাই তপু রেগে গেলে ওকে ঘোড়ামুখী বলে খেঁটা দেয়। ভারি পাজী তপুটা। এখন অবশ্য লক্ষ্মীছেলের মত বই টই নিয়ে বসেছে। কিন্তু শুভ্রা চোখের আড়াল হলেই নিজমূর্তি ধরবে। পড়ায় ওর মন বসেনা, কারো শাসন ও মানতে চায় না। ছোট ভাইটিকে নিয়ে ভারি চিন্তা শুভ্রার।

বেরোবার আগে ভাই তপুকে সে সাবধান করে দিয়ে গেল, 'আমি যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন রাস্তায় নেমে পোড়োনা। মন দিয়ে পড়াশুনো কোরো। আমি কিন্তু রাত্রে এসে সব ধরব।'

তপন বই থেকে মুখ তুলে বলল, 'তুমি আবার আমার কী পড়া ধরবে দিদি। আমার পড়া ধরবার জন্যে আমার স্কুলের টিচারদাই আছেন। তুমি তোমার স্কুলের মেয়েদের পড়া ধর গিয়ে। পড়াবার জন্যে তো একটা গোটা স্কুলই পেয়ে গেছ। এখন প্রাণের আনন্দে মাষ্টারি করতে পারবে।'

শুভ্রা হেসে বলল, 'আহা, কী একখানা পাকা ছেলেই হয়েছিস তুই। ঠিক একেবারে বুড়ো ঠাকুরদা।'

তপন বলল, 'বেখো দিদি, ঠাকুরদাকে তুমিও দেখনি, আমিও দেখিনি। বাবা মার কাছে তাঁদের কথা কেবল শুনেছি। শুনে শুনে আমার যা ধারণা হয়েছে তাতে মনে হয় আমি যা পারি ঠাকুরদা তা পারতেন না। কী করে পারবেন? অত সেকেলে মানুষ।'

ছোট ভাইটির দিকে শুভ্রা একটু সস্নেহে তাকাল। অবশ্য মাথায় এখন আর তেমন ছোট নেই। বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে। বেশ উঁচুতে চৌদ্দয় পড়েছে। কিন্তু দেখতে দেখায় সতের-আঠেরর মত। কথাও বেশ পাকা পাকা।

শুভ্রা হেসে বলল, 'তুই তো কথার সাগর। তোর কথা শুনতে বসলে আমি লেট হয়ে যাব। আমি যাচ্ছি। যা বলে গেলাম তা যেন মনে থাকে।'

শিপ্রা দিদিকে বাস ষ্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিল। এখনো অফিসের ভিড় আরম্ভ হয়নি। একটু ফাঁকাই যাচ্ছে বাসটা। বাসে উঠবার আগে শুভ্রা একটু মুখ ফিরিয়ে হাসল।

শিপ্রা বলল, 'সাবধানে যাস দিদি। কিন্তু ছুটি হয়ে গেলেই চলে আসবি। পথে কোথাও দেরি করিস না।'

শুভ্রা হেসে বলল, 'যার নকল করা হচ্ছে।' বাসে উঠে জানলার ধারের লেডীজ সীটটায় বসল শুভ্রা। ভাইবোনের কথা কিছুক্ষণ তার মন জুড়ে রইল। ভাবল, প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই ওদের দুজনকে আলাদা ভাবে কিছু না কিছু কিনে দেবে। শিপ্রার জন্যে একখানা সাড়ি আর তপুর জন্যে একটা প্যান্ট আর জামা। কিন্তু তাহলে তো মাইনের প্রায় অর্ধেক টাকাই ওতে ব্যয় হয়ে যাবে।

না, এক মাসে সব হবে না।

একবার বাস বদলে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেণে উঠল শুভ্রা। তারপর জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে চলল। সেই পরিচিত পথ। দুপাশে গাছপালা, গ্রামের পথ পুকুর ঘাট। তবু ছবির মত বেশ লাগে দেখতে। আজ আর কেতকী সঙ্গে নেই। শ্যামলও আসে নি তুলে দিতে। ও কেবল মুখেই ঠাট্টা করেছিল। এতদূর আসবে। কিন্তু কোন পরিচিত মুখ দেখতে পেল না। পরিচিত যে কেউ নেই এই বেশ ভালো। সে যেন এক দুঃসাহসিক অভিযানে চলেছে। চেনাজানার বাইরে এক নতুন রাজ্য। পরিচিত কেউ নেই, তবু কেউ কেউ পরিচিতের মত তাকালেন। একবারের বেশি বেশিই তাকালেন। ওভাবে কাউকে তাকাতে দেখলে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। কেতকী একথা শুনে একদিন বলেছিল, 'তোর ভাগ্য ভালো শুভ্রা। সবাইর কি

আর অমন সৌভাগ্য হয়! বুড়ো হোক ছোঁড়া হোক কই আমার দিকে তো কেউ একবারও ফিরে দেখে না।'

হারি মহার কথা বলে কেতকী।

ষ্টেশনে নেমে একটু এদিক ওদিক তাকাল শুভ্রা। নাঃ, কাউকে দেখতে পেল না। সে কি আশা করেছিল সেক্রেটারী স্বয়ং হাজির থাকবেন? সেদিন তাঁর যে সৌজন্য দেখেছিল তাতে অবশ্য আশা করা খুব অসঙ্গত নয়। কিন্তু ভদ্রলোক হয়তো শেষ পর্যন্ত মন স্থির করতে পারেন নি। হয়তো তাঁর পদমর্যাদায় বেধেছে। আরো পাঁচজন কী ভাববে সে কথা হয় তো মনে মনে চিন্তা করেছেন।

বটগাছটার তলায় যেখানে সাইকেল রিক্সাগুলি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে চলে এল শুভ্রা।

তাকে দেখে রোগামত একটি রিক্সাওয়ালা এগিয়ে এল, 'আসুন। আপনি স্কুলে যাবেন তো? রামবাবু আমাকে ঠিক করে দিয়েছেন।'

খুশি হল শুভ্রা। রামবাবু তাহলে তাঁর শিষ্টাচারের কথা একেবারে ভুলে যাননি।

আর একটি যুবক আর একখানা রিক্সা তাড়া করল। তার হাতে কিসের যেন একটা বাণ্ডিল। তাকে শুভ্রার চেনাচেনা মনে হচ্ছিল—সে নিজেই এসে পরিচয় দিল। হেসে বলল, 'নমস্কার, চিনতে পারছেন? আমার নাম সমীরণ সুর। সেদিন রামবাবু আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার নাম সমীরণ সুর। এখানে একটা ক্লাব আছে আমি তার—'

শেষ কথাটুকু বিনয় করে অনুক্ত রাখল সমীরণ।

শুভ্রা মৃদু হেসে বলল, 'সেক্রেটারী। আমার সব মনে আছে।

সমীরণ বলল, 'আপনি বুঝি আজই জয়েন করছেন?'

শুভ্রা বলল, 'হ্যাঁ।'

সমীরণ বলল, 'চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাবে। আমিও গাঁয়েই ফিরে যাচ্ছি। আমাদের ক্লাবের অ্যানিভারসারি এগিয়ে এসেছে: তাই নিয়ে একটু ব্যস্ত। আপনাকে কিন্তু থাকতে হবে আমাদের ফাংশনে। কার্ড আমি পরে দিয়ে আসব। স্কুলের সবাইকেই নিমন্ত্রণ করব।'

শুভ্রা এসব কথার কোন জবাব দিল না। স্মিতমুখে চুপ করে রইল।

দুটি সাইকেল রিক্সা সামনের দিকে চলতে লাগল। ঠিক পাশাপাশি নয়, একটু আগে পরে চলতে লাগল।

শুভ্রার রিক্সা আগে, সমীরণের পিছনে।

[ক্রমশঃ

স্মৃতির ব্যথা

ছায়া দেবী

যে ফুল ফোটে অন্ধকারে আজকে রাতে বিজন বনে,
গন্ধটুকু জাগায় সাড়া আপন মনে সুদূর কোণে।
সুবাস ছড়ায় শুভ্রা ছায়া,
মদির নেশায় পাগল পারা,
হিয়ার প্রাণে আবেশ রচি কে রয় জেগে সঙ্গোপনে?
ছন্দ হারা কার জীবনে, কাহার স্মৃতি আকুল করে?
মর্ম বীণায় ব্যাকুল ব্যথায় কোন বিরহীর সুর যে ঝরে!
হারিয়ে যাওয়া দিনের শেষে,
ঘুম ভাঙালো কে গো এসে?
স্বপ্নপুরীর গন্ধে মেশা কাহার ছবি প্রাণের পরে!

দূর বনানী রাত্রি যাপে ওই যে নিথর গিরির তলে।
নিরেট ছায়া সজল আঁখি হারায় বুঝি মেঘের কোলে!
নিবিড় ঘন গহীন রাতে,
মন কেতকীর স্বপ্নে মাতে,
আঁধার ঘরে বাঁশীর সুরে প্রাণ যে আমার ব্যথায় দোলে!

পাট ও পাঠ

শ্রী'শ'—

॥ কাঁচ কাটা হীরে ॥

পিতা ও পুত্রের বিরোধ—আদর্শের সংঘাত, নীতির দ্বন্দ্ব!—আমেরিকা ফেরৎ কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শে শ্রদ্ধাবান, সৎ ও আদর্শবাদী পুত্র সুব্রত তার পিতা অতিরিক্ত সাহেবিয়ানা ভক্ত ও ন্যায় নীতির ধার না ধারা কট্টর ব্যবসায়ী অধিকার অসাধু ব্যবসানীতি বরদাস্ত করতে না পেরে,পিতার বিরাট সম্পত্তি ও ব্যবসা পরিত্যাগ করে অনিশ্চিতের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করল না! শেষে দিল্লীর সরকারী দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসার রূপে নিজ পিতার ব্যবসায়ের দুর্নীতির অনুসন্ধানের ভার যখন পুত্রের উপর পড়ল, তখনও অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত আদর্শবাদী সুব্রত দৃঢ় মনে নিজ কর্তব্য পালনে অগ্রসর হল এবং তখন অসুস্থ অথচ দৃঢ়চেতা পিতার মুখোমুখি তাকে শেষ বারের মত দাঁড়াতে হল। অবশ্য পিতা শেষ মুহূর্তে পুত্রকে এগিয়ে যাবার আশীর্বাদই দিয়ে গেলেন।

এই হল আর, ডি, বনশল্ প্রযোজিত ও অজয় কর পরিচালিত "কাঁচ কাটা হীরে" চিত্রের গল্পাংশ। প্রবোধ-কুমার সান্যালের গল্প অবলম্বনে চিত্র-নাট্য লিখেছেন মৃণাল সেন এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আর প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন—বিকাশ রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, ছায়া দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও সবিতাব্রত দত্ত।

বিষয় বস্তুর অভিনবত্ব না থাকলেও "কাঁচ কাটা হীরে" চিত্রটি তথ্যের অভিনব গুণে ও পরিচালনা নৈপুণ্যে একটি অনবদ্য সৃষ্টির রূপ লাভ করেছে। অভিনয়াংশে বিশেষ করে বিকাশ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। পিতা অধিকার ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এক কথায় অনবদ্য বলা চলে। উগ্র সাহেবিয়ানা ও সেইসঙ্গে মেজাজ ও গাম্ভীর্যকে তিনি স্বচ্ছন্দ রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুব্রতরূপী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। নায়িকার ভূমিকায় লিলি চক্রবর্তীর অভিনয়ও স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। পার্শ্ব ভূমিকাগুলিতে ছায়া দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও সবিতাব্রত দত্তর অভিনয়ও চরিত্রানুযায়ী হয়েছে।

ছবিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ফোটোগ্রাফী এবং দৃশ্যবিন্যাস। 'কাট্' শটের প্রাধান্যই ছবিটিতে বেশী এবং তা বেশ সুপরিকল্পিত ভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে। ইঙ্গিতবহ দৃশ্য ও শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহারও লক্ষণীয়। ছবিটিতে একটিও গান না থাকলেও ছবিটির অঙ্গহানি তাতে কিছুমাত্র হয় নি, বরঞ্চ ছবিটির বৈশিষ্ট্য এতে বেড়েছেই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আবহ সঙ্গীতের পরিমিত প্রয়োগও প্রশংসনীয় হয়েছে।

অবলুপ্তপ্রবন্ধ :

ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার চলচ্চিত্রের একটি উৎসব কলকাতায় ১৯ থেকে ৩১শে মার্চ তারিখ অবধি অনুষ্ঠিত হবে। "সিনে, সেন্টার ক্যালকাটা" এই উৎসবের উদ্যোক্তা। অনুষ্ঠানস্থল হবে "অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন্ আর্টস্" হল। ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের ক্রমবিকাশের একটি পরিচয়ও একটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখান হবে। প্রদর্শনীটি হবে এই উৎসবেরই একটি অঙ্গ। এ ধরণের চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন কলিকাতায় এই প্রথম।

• • •

'সুভাষচন্দ্র' চিত্রের প্রযোজক এ, কে, ব্যানার্জি আগামী এপ্রিলের মধ্যে এই চিত্রের কাজ শেষ করে আর একখানি আদর্শবাদী জীবনী চিত্র তৈরী করবেন বলে মনস্থ করেছেন। এই ছবি তৈরী হবে ঋষি অরবিন্দের জীবনী অবলম্বনে।

পণ্ডিচেরী আশ্রমে এই ছবির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্যের 'শুটিং' হবে।

• • •

বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী ও তাঁর দেশাত্মবোধ অবলম্বনে একখানি বড় প্রামাণ্য ছবি সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে তৈরী হবে বলে জানা গেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম ডিভিসনও এই তথ্যচিত্র প্রযোজনায় সহযোগিতা করবেন বলে প্রকাশ এবং ছবিখানি প্রযোজনা ও পরিচালনা করবেন কাজী নজরুল ইসলামের পুত্র।

নজরুল ইসলামের লেখা কবিতার মাধ্যমেই নজরুল জীবনের দেশাত্মবোধ এই ছবিতে যেমনভাবে বর্ণিত হবে।

কবির বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকালের ছোটোও এই ছবিতে সন্নিবিষ্ট হবে। বিশেষ করে কবির যৌবনের বিদ্রোহোজ্জ্বল জীবনাংশই এই প্রামাণ্য ছবিতে বিশেষভাবে রূপায়িত হবে বলে প্রকাশ।

• • •

বিখ্যাত সেতারবিদ রবিশঙ্কর পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবির সুর সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত 'তেপেনাপোতা আবিষ্কার' গল্প অবলম্বনে চিত্র-নাট্যায়িত এই চিত্রের প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করবেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, রবি ঘোষ, বিমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

• • •

সর্ব্বভারতীয় দর্শকদের জন্যে বাংলা দেশ থেকে যে হিন্দী ছবিটি প্রস্তুত করা হয়েছে, সেটি হল চারু চিত্রের "মমতা"। এই 'মমতা'ই হল বাংলার প্রথম "ইস্টম্যান্ কলার" চিত্র।

ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর 'উত্তর ফাল্গুনী' অবলম্বনে গঠিত এই 'মমতা' চিত্রটির আগামী ১১ই মার্চ বোম্বাইয়ে সর্ব্বভারতীয় মুক্তি ঘটানো হচ্ছে এবং ওই একইদিনে মহীশূরেও ছবিটি মুক্তি পাবে।

এই ছবিতে মাতা ও কন্যার দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মানে ভূষিতা সুচিত্রা সেন। সহ-অভিনেতারূপে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করবেন বোম্বাই-এর দুই বিশিষ্ট শিল্পী অশোককুমার ও ধর্মেন্দ্র। কালীপদ চক্রবর্তী, পাহাড়ী সান্যাল, ডেভিড, অমিত সেন, প্রতিমা দেবী এবং ছায়া দেবী এই চিত্রের অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে রূপদান করবেন।

'মমতা'র সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রোশন্।

• • •

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কেদার রাজা" উপন্যাসের চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক বলাই সেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ এবং আরতি মুখোপাধ্যায় ছবিটির সঙ্গীতাংশে আছেন। ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, লিলি চক্রবর্তী, কৃষ্ণা বসু প্রভৃতি।

• • •

'চলচ্চিত্রায়ন' সংস্থার প্রথম চিত্রটির নাম হল "আকাশ ছোঁয়া"। এক দুঃসাহসী সার্কাস শিল্পীর কাহিনী নিয়ে রচিত এই ছবিটি পরিচালনা করছেন রাজেন তরফদার। ছবির জন্য একটি সার্কাস দলকে তাদের সাজসরঞ্জামসহ কলিকাতায় আনা হয়েছে। সেখানে প্রত্যহ রাত্রে চিত্রগ্রহণ করা হয়। প্রধান তিনটি চরিত্রের শিল্পী হচ্ছেন—সুপ্রিয়া চৌধুরী, দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়।

• • •

রুদ্রাণী ফিল্মস-এর "৮০-তে আসিও না" ছবির কাজ শেষ হয়ে এসেছে। গৌর শীর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন শ্রীধরপ্রসাদ এবং মুখ্য চরিত্রটিতে অভিনয় করছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

• • •

পরিচালক তরুণ মজুমদার এখন তাঁর "বালিকা-বধূ" চিত্রের ইন্‌ডোর-শুটিং করছেন। প্রথম দিনে বিদ্যালয়ের ক্লাস ঘরের একটি দৃশ্য তোলা হয়েছে। পার্থ মুখোপাধ্যায় ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ছবির প্রধান দুই শিল্পী।

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া :

এডিলেড মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ১৯৬৫-৬৬ সালের তথা উভয় দেশের ৪৮তম টেষ্ট সিরিজের চতুর্থ টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস এবং ৯ রানে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে চলতি সিরিজের ফলাফল সাময়িকভাবে সমান (১—১) করে। সিডনির তৃতীয় টেষ্টে ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ২৩ রানে জয়ী হয়ে ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছিল। ব্রিসবেনের প্রথম এবং মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা ড্র ছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার স্থায়ী অধিনায়ক রবি সিম্পসন দৈহিক আঘাত এবং অসুস্থতার কারণে প্রথম এবং তৃতীয় টেষ্টে খেলেননি। চতুর্থ টেষ্টে তিনি দল পরিচালনা ক'রে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—দুর্বল শরীরে তিনি ৯ ঘণ্টা ব্যাট করে ২২৫ রান তুলেন।

প্রথম দিনে ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের ৯টা উইকেট খুইয়ে ২৪০ রান তুলেছিল। এক ঘণ্টার আগেই ইংল্যাণ্ডের তিনটে উইকেট পড়ে মাত্র ৩৩ রান দাঁড়ায়। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ব্যারিংটন এবং কাউড্রে ২৫ মিনিটে ৭২ রান তুলে দলকে শোচনীয় অবস্থা থেকে কিছুটা রক্ষা করেন।

দ্বিতীয় দিনে ২৪১ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। বাকি সময়ে অষ্ট্রেলিয়া তিন উইকেট হারিয়ে ৩৩৩ রান সংগ্রহ ক'রে ৯২ রানে অগ্রগামী হয়। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক রবি সিম্পসন এবং বিল লরী চার ঘণ্টা খেলে ২৩৪ রান তুলেন। ফলে ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলায় তাঁরা অষ্ট্রেলিয়ার তরফে প্রথম উইকেট জুটির রেকর্ড রান করেন। পূর্ব্ব রেকর্ড করেছিলেন এই জুটিই—২০১ রান (১৯৬৪ সালে ম্যাঞ্চেষ্টারে)। সিম্পসন ১৪৯ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে চা-পানের পর কিছু সময় অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস স্থায়ী ছিল। ৫১৬ রানের মাথায় তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ফলে অষ্ট্রেলিয়া ২৭৫ রানে অগ্রগামী হয়। সিম্পসন ৯ঘণ্টা খেলে তাঁর ২২৫ রানে একটা ওভার-বাউণ্ডারী এবং আঠারটা বাউণ্ডারী মেরেছিলেন। এডিলেড মাঠে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সিম্পসনের এই ২২৫ রানই অষ্ট্রেলিয়ার তরফে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রান। পূর্ব্ব রেকর্ড ২১২ রান—চোনাল্ড গ্রাভম্যান, ১৯৩৬-৩৭।

তৃতীয় দিনের বাকি ১০৫ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ড তিনটে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৬৪ রান সংগ্রহ করেছিল। ফলে 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যাণ্ডের আরও ২১২ রানের প্রয়োজন ছিল।

চতুর্থ দিনে ২৬৬ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস এবং নয় রানে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। সাতঘণ্টারও বেশী খেলার

সময় থাকতে চতুর্থ টেস্টে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যাণ্ড : ২৪১ রান (ব্যারিংটন ৬০ এবং পার্কস ৬৯ রান। ম্যাকেঞ্জী ৪৮ রানে ৬ উইকেট) ও ২৬৬ রান (ব্যারিংটন ১০২ এবং টিটমাস ৫০ রান। হক ৫৪ রানে ৪ উইকেট)।

অষ্ট্রেলিয়া : ৪১৬ রান (সিম্পসন ২১৫, লরী ১১২, টমাস ৪২ এবং ব্রাকপোল ৪০ রান। জোন্স ১১৮ রানে ৬ উইকেট)।

জাতীয় লন্ টেনিস :

১৯৬৯ সালের জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় এশিয়ান সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান জয়দীপ মুখার্জি এবং কুমারী ভিভ স্থমে (রাশিয়া) যথাক্রমে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের সিঙ্গলস খেতাব জয় করেন। এ বছরের এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় একমাত্র 'ত্রিমুকুট' বিজয়িনী রাশিয়ার ভিভ স্থমে আলোচ্য প্রতিযোগিতায় দুটি খেতাব পান—সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস। পুরুষ বিভাগের ডাবলসের ফাইনালে জয় লাভ করেন মহেশকুমার এবং শিব মিশ্র।

জাতীয় বাস্কেটবল :

১৬শ জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগের ফাইনালে সার্ভিসেস দল জয়ী হয়ে উপর্যুপরি ৯ বার টড মেমোরিয়াল ট্রফি জয়ের রেকর্ড করেছে।

পুরুষ বিভাগ : সার্ভিসেস দল ৫১—৪৮ পয়েন্টে রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : গতবছরের বিজয়ী বাংলা ৩৬—২২ পয়েন্টে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

বালক বিভাগ : মহীশূর ৬৭—৫৪ পয়েন্টে অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত করে।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা :

লণ্ডনে আগামী ১২ই জুলাই থেকে অষ্টম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ লীগ পর্যায়ের খেলা সুরু হবে। এই শেষ লীগ পর্যায়ে ১৬টি দেশ সমান ভাগে ৪টি গ্রুপে খেলবে। এই ১৬টি দেশের মধ্যে গত সপ্তম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় জুল রিমে কাপ বিজয়ী ব্রেজিল এবং আসন্ন অষ্টম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ইংল্যাণ্ড বাদে বাকি ১৪টি দেশকে প্রাথমিক পর্যায়ের লীগের খেলায় শীর্ষস্থান লাভ করে লণ্ডনের শেষ লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে। এই ১৪টি দেশ হল আমেরিকান অঞ্চলের ৪টি দেশ—আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, চিলি এবং মেক্সিকো; পশ্চিম ইউরোপ অঞ্চলের ৬টি দেশ —স্পেন, পর্তুগাল, ইতালী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং পশ্চিম জার্মানী; পূর্ব ইউরোপ অঞ্চলের ৩টি—রাশিয়া, হাঙ্গেরী এবং বুলগেরিয়া; প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে ১টি দেশ—উত্তর কোরিয়া। শেষ লীগ পর্যায়ের খেলায় প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দেশ কোয়ার্টার ফাইনালে নকআউট প্রথায় খেলে সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনালে উঠবে।

শেষ পর্যায়ের লীগ খেলা

১নং গ্রুপ : ইংল্যাণ্ড, উরুগুয়ে, ফ্রান্স এবং মেক্সিকো

২নং গ্রুপ : আর্জেন্টিনা, পশ্চিম জার্মানী, স্পেন এবং সুইজারল্যাণ্ড,

৩নং গ্রুপ : ব্রেজিল, হাঙ্গেরী, পর্তুগাল এবং বুলগেরিয়া

৪নং গ্রুপ : চিলি, রাশিয়া, ইতালী এবং উত্তর কোরিয়া।

'পদ্মশ্রী' খেতাব :

ভারতবর্ষের অষ্টাদশ প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রাক্তন ভারতীয় অলিম্পিক হকি খেলোয়াড় শ্রীধিরেন লাল 'পদ্মশ্রী' খেতাব লাভ করেছেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে ভারতবর্ষ অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক জয় করেছিল।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ৪।৩।৬৬ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রকাশিত হ'ল

প্রফুল্ল রায়ের

নতুন বিরাট উপন্যাস

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে হুগলী জেলার দূরঅভ্যন্তর থেকে একটি যুবক জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসেছিল। তার জীবনের একটিমাত্রই মন্ত্র ছিল, 'বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।'

সারা বাঙলাদেশ, বিশেষ করে কলকাতা জুড়ে তখন অন্ধকারের সাধনা চলেছে। একদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কালোবাজারি—এদের ফলশ্রুতি হিসেবে ভিক্ষুক আর গণিকা। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির কল্যাণে উদ্দাম ভোগবাদের প্রমত্ত উৎসব। তৃতীয় আরেকটি দিক ছিল যেখানে আঘাতের পর আঘাতে সমস্ত পুরানো মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে একটা শ্বাপদের মত হানাদাড়ি দিয়ে দাঙ্গা এসে গেল—কলকাতার 'গ্রেট কিলিং'। তারও পর খণ্ডিত দেশের রক্তাক্ত দেহের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার রথ এল ঘর্ঘরিয়ে।

যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বাঙলাদেশের এই বিশৃঙ্খল অধ্যায়টি ঘিরে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার। আর সেই সর্বব্যাপী অন্ধকারে যুবকটি একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডোবা তার হ'ল না।

এত যে অন্ধকার আর নৈরাশ্য তবু এরই অন্তর্স্রোতে কোথায় যেন আলোর ক্ষীণ একটি ধারা ধীরে ধীরে বইছিল। যুবকটি হঠাৎ তা আবিষ্কার করে বসল। দেখল উনিশ শতকের রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে আজ অবধি অসংখ্য মানুষ সেই ধারাটিকে বয়ে নিয়ে চলেছেন এবং আশ্চর্য তাঁদের উত্তরাধিকার তার ওপরে এসে পড়েছে।

জীবিকার খোঁজে যে যুবক এসেছিল, কলকাতা তাকে জীবনের মহত্তর সন্ধান দিয়েছে।

এই বিশাল প্রসারী উপন্যাস সাম্প্রতিক কালের একটি অনন্য সংযোজন।

দাম—দশ টাকা

এই লেখকের আরেকটি উপন্যাস : **নোনা জল মিঠে মাটি** (দ্বিতীয় সংস্করণ) দাম : ৮·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

প্রকাশিত হইল —

শক্তিপদ রাজগুরুর বিপুল-কলেবর নূতন উপন্যাস

বাসাংসি জীর্ণানি

একদিকে কালজীর্ণ পুরাতন জমিদারী-তন্ত্রের পতন—অপরদিকে শিল্প-সমৃদ্ধ নূতন যান্ত্রিক যুগের উত্থান। প্রাচীন আবেষ্টক পরিবেশের স্বর্গবাজো রূপান্তর! হারানোর বেদনা আর প্রাপ্তির আনন্দে কম্পমান, ভাঙা আর গড়া, সমস্যা ও সমাধানের অভিনব বৈচিত্র্যে দোদুল্যমান একদল নর-নারী। তারকেশ্বর আর অতুল কামার, অশোক আর প্রীতি, ভুবন আর ভীমের বৌ, গোকুল আর পাঁচু দাস, কারিগর আর মিষ্টি, অবিনাশ আর নিতে বাউরী, জীবন আর মণিমালা, প্রশান্ত আর রাঠী, সতীশ আর এমোকালী, সনাতন আর গঙ্গামণি—এরকম আরো অনেকেই এই উপন্যাসে ভিড় ক'রে এসেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রই মনে দাগ কাটার মত। কিন্তু ভাষাহীন নারাণ ঠাকুর লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি

পরিবর্তনের পটভূমিতে জীবনের নূতন মূল্যায়ন।

চেনা-জানা পরিবেশে নূতন ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা এমন একখানি জীবন্ত উপন্যাস অনেকদিন বাঙলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়নি।

দাম—চৌদ্দ টাকা

—অন্যান্য উপন্যাস—

গৌড়জন বধূ ৫-৫০

কেউ ফেরে নাই ৭-৫০

কাজল গাঁয়ের কাহিনী (২য় সং) ৫,

মণিবেগম (৩য় সং) ৬-২৫

কুমারী মন (২য় সং ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৩-৫০

জীবন-কাহিনী (ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৪-৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

প্রবাসী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

চৈত্র ১৩৭২

৫৩-তম বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ সংখ্যা

—নূতন প্রকাশিত চারখানি বই—

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পিপাসা

অনাস্বাদিতপূর্ব্বা তরুণ অধ্যাপক—আর বিদিশা একজন কলেজ-পড়ুয়া ছাত্রী। ঘনাতে নিবিড়, বাঁধুক আর নেবাই—কিন্তু বিদিশা মুখরা, নির্ভীক আর উগ্র আধুনিকা। তবুও কবির ভাষায় বলতে গেলে—"না জানি কী ক্ষণিক মিলন হ'ল দোঁহে, কী ছিল বিধাতার মনে!" এর ফলে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হ'ল, তা কক্ষচ্যুত উল্কার মত টেনে নিলে দু'জনকে জীবনের দু'প্রান্তে। কিন্তু তরুণের তপ্ত রক্তেও কি বিদিশারই যৌবনের উত্তাপ?

দাম—৩·৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সতীশঙ্কর

সতীশঙ্কর রায়ের সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে। কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্যে অনেক কিছু করেছেন, বাড়ির চাকরকে অফিসের বেয়ারা ক'রে দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন ডাকাত পরের ধন লুটেপুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। লোকে তাঁকে ভয় ক'রতো যেন সাপ বা বাঘের চেয়েও বেশি। আবার কেউ বলে মেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি ক'রেছেন—ব'লতে গেলে একেবারে পোকা ছিলেন।

উৎপলের কাছে সতীশঙ্কর এক বিষম সমস্যা। কার কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে? যে লোক প্রথম জীবনে দেশের জন্যে জেল খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন যশ ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, তিনি আবার সহসা আততায়ীর হস্তে নিহতই বা হ'লেন কেন? এই "কেন" সম্বন্ধে তাঁর সুন্দরী তরুণী বিধবা স্ত্রী-ই বা বলেন কি? দাম—পাঁচ টাকা

শক্তিপদ রাজগুরুর

জীবন-কাহিনী

মানুষের জীবনে সমস্যাও যেমন—কৌতুকও তার কম নয়। এই সমস্যা ও কৌতুকের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা দু'টি ভাগ্য-বিড়ম্বিত যুবক-যুবতীর মধুর প্রেমের কাহিনী।

ছায়াচিত্রে রূপায়িত।

দাম—৪·৫০

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

মজার মজার খেলা

বিজ্ঞানের নানা রকম কল-কৌশলের সাহায্যে মজাদার খেলা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করার মত বই। শেখা ও খেলার কাজ একই সঙ্গে চ'লবে।

কিশোরদিকে উপহার দেওয়ার পরম উপযোগী।

নূতন ধরনের সাইজ। অসংখ্য ছবিতে ভরপুর।

দাম—৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

আপনার সুন্দর কালো
কেশের জন্য...

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

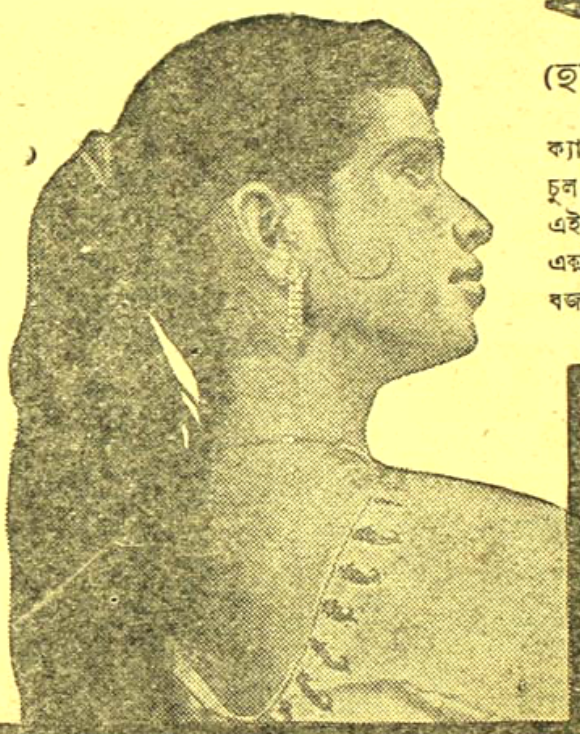

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে চুল বাড়ায়—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। এই কেশ তৈলে ক্যান্থারাইডিসের এক্সট্রাক্ট থাকায় চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ● বোম্বাই ● কানপুর

তা ম তা ম উ প ন্যা স ও গ ল্প-গ্র ন্থ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পিপাসা ৪-৫০
তৃতীয় নয়ন ৪-৫০

সুবীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এক জীবন অনেক জন্ম ৬-৫০
নীলকণ্ঠী ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নমঞ্জরী ৩৲

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

দিব্যদৃষ্টি ২-৫০

অনুরূপা দেবী

গরীবের মেয়ে ৪-৫০ বিবর্ত্তন ৪৲
রামগড় ৪-৫০ বাগ্‌দত্তা ৫৲
পোষ্যপুত্র ৪-৫০ পথের সাথী ৩৲
ছায়ালোক ৩৲

নিরুপমা দেবী

দিদি ৫৲

পুষ্পলতা দেবী

নীলিমার অঙ্ক ৩-৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ ৩-৫০

শক্তিপদ রাজগুরু

জীবন-কাহিনী ৪-৫০
কুমারী মন ৩-৫০
গৌড়জনবধূ ৫-৫০
মণিবেগম ৬-২৫
কেউ কেরে নাই ১-৫০
কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৪৲

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মনের অগোচরে ২৲

ভাস্কর

রুল্‌ অফ থ্রি ২-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

পরাজয় ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

কলঙ্কিনীর খাল ২-৫০

মনীষাধব চৌধুরী

দেবানন্দ ৪৲

প্রফুল্ল রায়

সীমারেখার বাইরে ১০৲
নোনা জল মিঠে মাটি ৮-৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পতনে উত্থানে ৫৲
সুধা হালদার ও সম্প্রদায় ৩-৭৫

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অচল প্রেম ৪৲

পঞ্চানন ঘোষাল

একটি অদ্ভুত মামলা ৫৲
একটি নির্মম হত্যা ২-৫০
অধস্তন পৃথিবী ৫৲
একটি মাত্রা-হত্যা ৩৲
অন্ধকারের দেশে ৫৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২-৫০
মুক্তির আসাদ ২-৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আপ্রানভার আদ ৪৲
সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

শচিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বয়ং-সিদ্ধা ৩৲
ফুলের মাশুল ৩-৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিবস্ত্র মানব ৫-৫০
কার্‌টুন ২-৫০
দেহ ও দেহাতীত ৪৲
গল্পত্রয় ১ম—২-৫০, ২য়—২-৫০
শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

তুলের কলম ২৲
খেয়ালের খেসারৎ ২৲
বংশধর ২৲

ভোলা সেন

হাসপাতালের উপকরণ ২-৫০

অমরেন্দ্র ঘোষ

পদ্মকৌচির বেদেনী ৩৲
দক্ষিণের বিল ২য় ৪৲

সমরেশ বসু

ছিন্নবাধা ৭-৫০

মায়া বসু

অগ্নিবলয় ২-৭৫

বার্ষিক

মেঘের পরে আলো ৪-০০

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিয়ান শো ৪-৭৫

রামপদ মুখোপাধ্যায়

কাল-কল্লোল ৪-৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের মন্দিরা ৩-৫০ কালকূট ৩৲ কানু কহে রাই ২-৫০ কাঁচামিঠে ৩৲ আদিম রিপু ৩৲ গৌড়-মল্লার ৪-৫০ বিজয়লক্ষ্মী ২-৫০ বহ্নি-পতঙ্গ ৩-৫০ পঞ্চভূত ২-৫০ বিন্দের বন্দী ৪-৫০ শাদা পৃথিবী ৩৲ ছায়াপথিক ৩৲ দুর্গরহস্য ৩-৫০ চুয়াচন্দন ৩-২৫

প্রবোধকুমার সান্যাল

নবীন যুবক ২-৫০ কলরব ২৲
প্রিয় বান্ধবী ৪৲
কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲

অশোককুমার মিত্র

দু'ঘণ্টা ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গন্ধরাজ ৩৲

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

নকল পাঞ্জাবী ২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

রাঙা ছাওয়া ২-৫০

বনফুল

শিতামহ ৬৲
নবতম পুরাণ ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

মিলন-মন্দির ৩৲

প্রভাত দেবসরকার

অনেক দিন ৩-৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩-১-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

পণ্যের

প্রচারে

'প্রবাসী'র

প্রচারণী

প্রকৃষ্ট ॥

বিজ্ঞাপনের বিস্তারিত হার—প্রবাসীর ম্যানেজারকে পত্র লিখলে—সানন্দে জানানো হইবে।—প্রতি পৃষ্ঠা ১০০৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬০৲। চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের হার এবং বিশেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের বিষয় জানিতে হইলে পত্র লিখুন—কিংবা সাক্ষাৎ করুন।

ম্যানেজার

প্রবাসী প্রেস প্রাঃ লিঃ

৭৭-২-১ বর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে

বিজয় বৈজয়ন্তীবাহী

মোহিনী মিল্‌স লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯০৮)

১নং মিল

কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা)

২নং মিল

বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

২২ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

অনামী (২য় সং—মহাভারত, কালিদাস, কীট্স, ভগবদ্গীতা, দান্তে ইয়েট্স কবি, দ্বিজেন্দ্রলাল কবি প্রভৃতির কবিতার অনুবাদ, দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ গান ও কবিতা, ইন্দিরা দেবীর সুধাগুলির অনুবাদ—শেষে শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির পত্রাবলী) মূল্য ৪৷৷০

অভাজনীয় (অঘটনী উপন্যাস) ১০৲

ব্রাহ্মমাণ (২য় সং) ৭৷৷০

অঘটনের ঘটা (উপন্যাস) ৬৲

দোলা (উপন্যাস—২য় সং) ৮৲

তিথিহারিণী রাজকন্যা ২৷৷০

ভাগবতী কথা (কবিতা)—৫৲ ভাগবতী দীক্ষা—৪৲

শ্রীচৈতন্য (কাব্যনাট্য)—৩৷০ মহাভারতী কথা—৩৷০

তীর্থংকর (৩য় সং)—৮৲ দোটানা—৩৲

ভাবি এক হয় আর (নেতাজী-কেন্দ্রিক উপন্যাস)—৮৷০

ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী (ধর্ম্ম ও যোগ সম্বন্ধে)—৫৲

ছায়ার আলো (উপন্যাস)—৭৲

স্মৃতিচারণ ১ম খণ্ড—(দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশ ঘোষ, লোকেন পালিত, সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অতুলপ্রসাদ সেন চরিত্রচিত্র—২য় সং সচিত্র—৩০০ পৃষ্ঠা) ১২৲

স্মৃতিচারণ ২য় খণ্ড—(রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যামীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ, গোপীনাথ কবিরাজ, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি—সচিত্র—৩০০ পৃষ্ঠা)— ৩৷০

অঘটনের আলেয়া ঘটে (উপন্যাস—৭ম সং)—৫৲

হরিদাস মল্লিক, পুণা—৪ ও কলিকাতার অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

কুষ্ঠ ও ধবল

৬০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম্মরোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭ হাওড়া।

শাখা :—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

বহুল প্রশংসিত ও পরীক্ষিত

বহু পীড়ার সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য মহাপুরুষ প্রদত্ত মহৌষধ

অমিক্স ব্রেণ্ড

মূল্য দুই সপ্তাহের জন্য ৭৲ টাকা ষ্ট্যাম্পসহ পত্রে অভাব লিখা আবশ্যক। মূল্য অগ্রিম প্রেরিতব্য।

এখানে সর্ব্ববিধ জ্যোতিষের ফাষ্ট ও দুর্লভ যন্ত্রশক্তিপূত কবচাদি ও দুরারোগ্য ব্যাধির ধারণীয় ও সেবনীয় ঔষধ সুলভে দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ডাঃ শ্রীবিজয়রত্নমাধব চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতিষিবোধ ভ্রমাচার্য্য—ব্রহ্মশক্তি কার্য্যালয়

রাধাবাজার, নবদ্বীপ পোঃ (নদিয়া)

—প্রকাশিত হইয়াছে—

অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার, এম. এ, ডি-ফিল্,

সম্পাদিত

গিরিশচন্দ্রের

প্রফুল্ল ৪, জনা ৪,

ও

দ্বিজেন্দ্রলালের

চন্দ্রগুপ্ত ৪৲

সারগর্ভ ভূমিকা, চরিত্র-আলোচনা ও টীকাসহ। ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে মূল্যবান ও অপরিহার্য সংযোজন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

— ❀ বিবিধ গ্রন্থ ❀ —

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম ২,

শ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ

বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথবসু ২-৫০

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হে মহাজীবন (জীবনী) ৩৲

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু-অনুলিখিত

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩৲

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সচিত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।
১ম খণ্ড (২য় সং)—৩৲ ২য় খণ্ড—৪৲

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ ৭৲

পদাবলী-পরিচয় (যন্ত্রস্থ)

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

পারায়ণ (পরলোক-তত্ত্ব) **১-৫০**

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত ঐতিহাসিক গ্রন্থ

সিরাজদ্দৌলা ৬,

ডাঃ নাথমল রায়চৌধুরী প্রণীত

শরৎ-সাহিত্যে পতিতা ২·৫০

জাহানারার আত্মকাহিনী ৩-৫০

কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা ২৲

ডাঃ বিমলকান্তি সমদ্দার প্রণীত

রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৫·৫০

শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত

নবভারতের বিজ্ঞানসাধক

সচিত্র। দাম—২-৭৫

তারকচন্দ্র রায় প্রণীত

বাংলা দার্শনিক সাহিত্য-ভাণ্ডারে নূতন সংযোজন

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস

(১ম খণ্ড) ১০৲ (২য় খণ্ড) ১২৲

সাংখ্য ও যোগ (ভারতীয় দর্শন) ৪·

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

১ম খণ্ড (সমসাময়িক দর্শন)—১০৲

শ্রীপ্রবুদ্ধকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অক্ষরলিপি-কৌমুদী ২·০০ রাগেশ্বর (১ম) ১-২৫

শ্রীহরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত

সামুদ্রিক-রত্ন ৬৲

পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান (সচিত্র) ৫৲

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

দিল্লীশ্বরী (সচিত্র) ২৲

রজিয়ৎ ও নূরজাহানের জীবন-কথা।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত

কোন্ পথে ? ২-৫০

আটটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ।

দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত

গৃহশ্রী ৩-৫০

উপহার দিবার উপযোগী।

ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রণীত

পঞ্চাশের পরে (স্বাস্থ্য-তত্ত্ব) **২-৫০**

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

মানবতার সাগর-সঙ্গমে (সচিত্র) **৬৲**

বাংলার নাটক ও নাট্যশালা ৪,

নরেন্দ্র দেব
সম্পাদিত

মেঘদূত ৭৲
ওমর খৈয়াম ৭৲
দুইখানি অনুপম কাব্য-গ্রন্থ। সচিত্র।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

কান্তকবি রজনীকান্তের

বাণী ২,

আনন্দময়ী ১৲
শেষদান ১-২৫
বহুদিন ধরিয়া বাঙালী জাতিকে যুগপৎ হাসিয়াছে ও উচ্ছ্বাসের প্রেরণা যোগাইতেছে।

=শৌখিন সমাজে অভিনয়যোগ্য উচ্চ প্রশংসিত নাটকসমূহ=

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে

বিরাজ-বৌ ২৲ কাশীনাথ ২৲
বিন্দুর ছেলে ১-৫০
রামের সুমতি ১-৫০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

জনা ৪৲, প্রফুল্ল ৪৲, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ১·৫০, নল-দময়ন্তী ২৲, বুদ্ধদেব-চরিত ২৲

রমেশ গোস্বামী প্রণীত

কেদার রায় ৩৲

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ইরাণের রাণী ১-৫০
কর্ণার্জ্জুন ৩৲, ফুল্লরা ২৲,
সুদামা ১-২৫, অজয়া ·-৩৭

অমল সরকার প্রণীত

মসনদে মোজ্জল ২৲

তারক মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রামপ্রসাদ ১-৫০

যামিনীমোহন কর প্রণীত

শিটমাট ·-৭৫ প্রহেলিকা ·-৭৫

নিশিকান্ত বসুরায় প্রণীত

বঙ্গেবর্গী ৩৲, পথের শেষে ও
ঘর্ষিতা (একত্রে)—১-৫০

দেবলাদেবী ৩৲

মনোমোহন রায় প্রণীত

রিজিয়া ১-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

জ্ঞানময়ী গার্লস্ স্কুল ১-৫০

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নর-নারায়ণ ৩৲,
প্রতাপ-আদিত্য ৩৲,
আলমগীর ৩-৫০,
রত্নেশ্বরের মন্দিরে ··৭৫,
ভীষ্ম ২-৭৫, বাসন্তী ··২৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

দুর্গাদাস ২-৫০, বিরহ ২৲
সাজাহান ৩৲, মেবারপতন ২-৫০
পরপারে ২-৫০, বঙ্গনারী ২৲
চন্দ্রগুপ্ত ৪৲ পুনর্জ্জন্ম ১-০০
সীতা ২৲, সিংহল-বিজয় ২-৫০
ভীষ্ম ২-৫০, নুরজাহান ২-৫০

নিরুপমা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে
দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রদত্ত নাট্যরূপ

শ্যামলী ১-৫০

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

এই স্বাধীনতা ২৲
হর-পার্ব্বতী ১-২৫
সিরাজদ্দৌলা ২৲
সুপ্রিয়ার কীর্ত্তি ১-২৫

নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

নাট্য-গুচ্ছ ৪-৫০

রাতকাণা—বীররাজা এবং সুখের মত একত্রে।

কানাই বসু প্রণীত

গৃহপ্রবেশ ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অহল্যাবাঈ ১৲, ঝান্সীর রাণী ২৲

মন্মথ রায় প্রণীত

মন্ত্রা হাতী লাখ টাকা ১-২৫,
অশোক ২৲, সাবিত্রী ২৲,
জীবনটাই নাটক ২·৫০, খনা ২৲,
কারাগার, মুক্তির ডাক ও মহুয়া
(একত্রে) ৩-৫০
মীরকাশিম, মমতাময়ী হাসপাতাল
ও রঘুডাকাত (একত্রে) ৩৲
ধর্ম্মঘট, পথে বিপথে, চাষীর
প্রেম, আজব দেশ (একত্রে) ৪৲
একাঙ্কিকা ১৲ নবএকাঙ্ক ৩৲
কোটিপতি নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎ-
পর্ণা—রাজনটী—রূপকথা
(একত্রে) ৩৲
সাঁওতাল বিদ্রোহ—বন্দিতা—
দেবাসুর (একত্রে) ৩৲
মহাভারতী ২-৫০

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত

সমাজ ১-২৫

রেণুকারাণী ঘোষ প্রণীত

রেবার জন্মতিথি ১-২৫

তুলসীদাস লাহিড়ী প্রণীত

ছেঁড়া তার ৩৲, পথিক ২-২৫

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রণীত

মন-প্যাঁচা ২৲

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ভুবন ১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

পোড়া, কাটা, সোকার ক্ষত এবং সংক্রামক চর্মরোগে সত্বর আরাম দেয়।

ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগেনা।

সব সময় এ্যাক্রিমেণ্ট হাতের কাছে রাখুন।

এ্যাক্রিমেন্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

যশস্বিনী মহিলা-কথাশিল্পী

অনুরূপা দেবীর

— অমর সাহিত্য-সাধনা —

গরীবের মেয়ে (ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৪-৫০

পোষ্যপুত্র ৪-৫০ **বিবর্তন** ৪৲

পথের সাথী ৩৲ **বাগ্‌দত্তা** ৫৲

রামগড় ৪-৫০ **হারানো খাতা** ৩৲

যে মহিয়সী মহিলার অবদানে বাঙলা সাহিত্যের বিগত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস সমৃদ্ধ হইয়া আছে—উপরের বইগুলি তাঁর অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি। সৃষ্টি শক্তির বিশালতা—লিপিচাতুর্য ও চিত্ত বিশ্লেষণে মহিলা-ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রতিভাবান সাহিত্যিক

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

● **পৃথ্বীরাজ**

অমিতাক্ষর ছন্দ, ঐতিহাসিক নাটক। ২-৭৫ পঃ

● **রক্ত তিলক**

গত মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় সামাজিক নাটক। ২৲ টাকা

● **সম্ভবামি যুগে যুগে**

অবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাসী বিবেকানন্দে রূপান্তরের অপরূপ কাহিনী, নাটকাকারে। ২-৫০ পঃ

● **রাশিয়ান শো** (গল্প দশকন) ৪.৭৫ পঃ

● **কাশ্মীর** (ভ্রমণ কাহিনী, ৬৯ খানি ছবিসহ) ৪.৫০ পঃ

● **Spiritual Socialism**

মার্ক্সের বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-সভ্যতার আধ্যাত্মিক সমাজবাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও পথ নির্দ্দেশ। ৪·০০

রায় নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর প্রণীত

নাট্য-গুচ্ছ

রাতকাণা (কৌতুক-নাট্য)—বীররাজা (ঐতিহাসিক নাটক) এবং মুখের মত (প্রহসন) একত্রে ৪·২০

—পুনরায় প্রকাশিত হইল—

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কবিভূষণ প্রণীত

আয়ুর্ব্বেদ-সোপান

শরীরং ব্যাধিমন্দিরং—অর্থাৎ আমাদের শরীর বিবিধ ব্যাধির আধার-ভূত। বেহদ্দ সাধারণ অট্টালিকার ন্যায় মধ্যে মধ্যে জীর্ণ ও অসুস্থ শরীরেরও মেরামতী বা চিকিৎসা দরকার। সুতরাং তার মিস্ত্রিগিরি বা চিকিৎসা-পদ্ধতি সকলেরই কিছু-না-কিছু জানা থাকা প্রয়োজন।

এদেশের জল-হাওয়াতে মানুষ হওয়া ভারতীয়দের জন্য এই দেশের ঋষিকল্প মুনি-ঋষিরা যে ঔষধ ও চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, আমাদের পক্ষে তা-ই যে সর্ব্বোত্তম বিধান, এতে আর সন্দেহ কি? প্রতিভাবান কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের ব্যবহারিক দুরূহ তত্ত্বগুলি সরল বাঙলায় সুসংবদ্ধরূপে সাধারণের উপযোগী ক'রে প্রকাশ ক'রেছেন।

প্রতি গৃহস্থেরই গৃহে রাখার উপযোগী অত্যাবশ্যক গ্রন্থ।

দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

নতুন ধরনের নতুন বই

সবেমাত্র প্রকাশিত হল

বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা

—নির্ম্মলেন্দু রায় চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যে একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। আজ পর্য্যন্ত কোনও ভারতীয় সাহিত্যে এ ধরনের প্রচেষ্টা হয় নি।

গ্রন্থটিতে কথাসাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ছত্রিশজন লেখকের ছত্রিশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বা নাটকের কাহিনীগুলি সংকলিত হয়েছে।—মূল গ্রন্থের বক্তব্য এবং উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি বজায় রেখে গ্রন্থকার চিত্তাকর্ষক ভাষায় কাহিনীগুলিকে সরস গল্পরূপে ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। লেখনীর প্রসাদগুণে ও মাধুর্য্যে প্রত্যেকটি গল্পই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও রসোত্তীর্ণ।

আলোকচিত্রসহ উক্ত বরণীয় সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছে।

আমরা নিঃসন্দেহ যে সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাই গ্রন্থটি প'ড়ে আনন্দ পাবেন।

বইখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রায় চারিশত। সাইজ—ডবল ডিমাই। মূল্য মাত্র দশ টাকা। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই প্রথম্ শ্রেণীর।

প্রকাশক ঃ

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভারতবর্ষের সূচী

ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—চতুর্থ সংখ্যা

চৈত্র—১৩৭২

লেখ-সূচী

১। বৈষ্ণব দর্শনের পরিচয় (প্রবন্ধ)
ত্রিদণ্ডীস্বামী ভক্তিবিলাসতীর্থ গোস্বামী ৩৩৭

২। ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ (কবিতা)
পুষ্পধেনু সরস্বতী, শ্রুতিভারতী ৩৪৪

৩। অঘটনের পূর্বরাগ (উপন্যাস)
দিলীপকুমার রায় ... ৩৪৫

৪। জীবন তৃষ্ণা (কবিতা)—শক্তি বসাক ... ৩৫২

চিত্র-সূচী

১। বিজ্ঞান সাধক হোমী ভাবা, ২। আবহাওয়া-বিদ্ ফ্রোয়েন্স ভ্যান্ ষ্ট্রেটোন্, ৩। ভৈরব (একাম্রেশ্বর মন্দির)—কাঞ্চীপুরম্, ৪। বৈদিক আম্র বৃক্ষ—কাঞ্চীপুরম্, ৫। বরদরাজ মন্দিরের বাস্তু-যন্ত্র—কাঞ্চীপুরম্, ৬। কৈলাসনাথ মন্দির—কাঞ্চীপুরম্, ৭। শিবের ঊর্ধ্বতাণ্ডব (কৈলাসনাথ দেবালয়)—কাঞ্চীপুরম্, ৮। আদিবাসী বাঙ্গালীর বোলান নৃত্য, ৯। হাইকোর্টের প্রধান বিচার-

লেখ-সূচী

৫। দর্শন লাভ ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি (প্রবন্ধ)
শ্রীবন্দীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৫৩
৬। পরিচিতাকে (কবিতা)
চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৩৫৪
৭। সান্ত্বনা (গল্প)—মানসী মুখোপাধ্যায় ... ৩৫৬
৮। জলে ঢেউ দিও না (কবিতা)
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৫৯
৯। পদকর্তা লোচনদাস (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক জীবনবল্লভ চৌধুরী ৩৬০
১০। অবিশ্বাসী নই (গল্প)
শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬৭
১১। বিজ্ঞান সাধক হোমীভাবা (প্রবন্ধ)
শ্রীবাসুদেব সিংহ ... ৩৭৫

চিত্র-সূচী

পতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ, ১০। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

বাইকলার-চিত্র

পাহাড়া

— শ্রীসুষমা মিত্র – প্রণীত

নিশীথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে

দাম—২৸০

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

রূপসী না সজীব বোমা? ২৲
লণ্ডনে শত্রুচর ২৲
মরণের রণ-ভেরী ২৲
কুহকিনীর ফাঁদ ২৲
প্রচ্ছন্ন আততায়ী ২৲
চীনের ভ্রাগন ৩·৭৫

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

সমরেশ বসুর নূতন উপন্যাস

ছিন্নবাধা

সর্ব বাধা-বন্ধহীন একটি সৃষ্টিশীল আত্মসন্ধানী সাধারণ মানুষের পথ-চলার কাহিনী।

পঙ্কে তার উদ্ভব—পঙ্কিল পরিবেশেই তার পুষ্টি। কিন্তু তার অন্তরের সৃষ্টির প্রেরণা তাকে সকল প্রলোভন—সকল প্ররোচনা এবং সকল জটিলতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে তার শাশ্বত মানবাত্মার অভিব্যক্তিকে সহজ করে দিয়েছে।

একটি বলিষ্ঠ মানুষের সংঘাতময় বাস্তব জীবন-কথা। সুন্দর প্রচ্ছদ-শোভিত সুবৃহৎ উপন্যাস। দাম—৭·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

লেখ-সূচী

১২। রুদ্র-সঙ্গিনীর স্বগতোক্তি (কবিতা)
শ্রীসুধীর গুপ্ত ৩৭৭
১৩। বঞ্চনা (গল্প)—অরুণ মে ৩৭৮
১৪। সমস্যার মুখে ছাত্রসমাজ (প্রবন্ধ)
কনক ধর ৩৮২
১৫। মোক্ষ-সঙ্গীত (কবিতা)
অধ্যাপক শ্রীনির্মলকান্তি বসু ৩৮৪
১৬। মাষ্টারমশাই (গল্প)
শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় ৩৮৫
১৭। মানব ও দানব (কবিতা)
শান্তশীল দাশ ৩৮৯
১৮। মেয়েদের কথা— ... ৩৯০
(ক) মেয়েদের সন্তরণ—রমাদেবী কাব্যতীর্থ
(খ) আবহাওয়াবিদ্ শ্লোয়েন্স ভ্যান ষ্ট্রেটোন্—সুষমা মৈত্র
(গ) বঙ্গের নাম সুবর্ণধেনু—শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী

লেখ-সূচী

১৯। স্বর্গের প্রজাসত্বের সাধনা (রম্যরচনা)
মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায় ৩৯৩
২০। দক্ষিণভাং (ভ্রমণবৃত্তান্ত)
শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯৮
২১। অচিন বনের পাখি (উপন্যাস)
প্রফুল্ল রায় ৪০৩
২২। বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর
কালীপদ মণ্ডল ৪১৩
২৩। রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি না রজকনীতি
শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ৪১৭
২৪। কিশোর জগৎ
(ক) ভেবে দেখ—শ্রীজ্ঞান ৪২৩
(খ) যক্ষ পর্বতের রূপকথা—শ্রীপরেশকুমার দত্ত ৪২৪
(গ) হাসিতের অভিজ্ঞতা—প্রশান্ত মৈত্র ৪২৬
(ঘ) টুকুনের বিলাপ—জয়ন্তকুমার গুপ্ত ৪২৭

"অপরাধ-বিজ্ঞান"খ্যাত
ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষালের
—নূতন গ্রন্থ সিরিজ—
বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত-কাহিনী

লেখক তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের বিচিত্র ধরনের বড় বড় মামলাগুলির তদন্ত ও বিচারের অভিজ্ঞতা তাঁর সাম্প্রতিক-কালের এই গ্রন্থগুলিতে একে একে প্রকাশ ক'রছেন। তাঁর বলার ভঙ্গীটিও নতুন। পড়তে পড়তে মনে হবে যে, আপনি নিজেই যেন তদন্ত করতে করতে রহস্যের গভীরে প্রবেশ করে শেষ পর্যন্ত তার সমাধানের পথে এগিয়ে চলেছেন। সত্য ঘটনা যখন কল্পনাকেও হার মানায়, তখন অলীক রহস্য-কাহিনীর আর প্রয়োজন কি?

১ম পর্ব : পাগলা-হত্যা মামলার বিবরণ। (২য় সং) দাম—৩৲
২য় পর্ব : বহুবাজার শিশুহত্যা-মামলা ও খিদিরপুর মাতৃহত্যা-মামলার বিবরণ। (২য় সং) দাম—৩৲
৩য় পর্ব : অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান "রেড হাউ মার্ডার" মামলার বিবরণ। দাম—৩·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

লেখ-সূচী

২৫। বোশান গীতি-নৃত্য
নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৫
২৬। স্বরূপে নদীর চেউ (কবিতা)
কুমকুম বে ৪২৯
২৭। রাতের চিন্তা—সুস্মিতা সান্যাল ৪৩০
২৮। বাংলা ও বাঙ্গালী—স্বামী সদানন্দ ৪৩১
২৯। বাউল নৃত্য ও সঙ্গীত প্রসঙ্গে—
শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য ৪৩৩
৩০। শর্বরী (গল্প)—শ্রীযমুনা ঘোষ ৪৩৫
৩১। সাময়িকী ৪৩৩
৩২। খেলা-ধূলা—
সম্পাদনা—শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ৪৪৭
৩৩। খেলার কথা—
ক্ষেত্রনাথ রায় ... ৪৪৭

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

এক জীবন
অনেক জন্ম

একই জীবনে জন্ম-জন্মান্তরের বিচিত্র অনুভূতির স্বাদ আনে যে ব্যাপক প্রেম, মৃত্যুর অন্ধকারকে যা' জীবনের দীপ্তিতে রূপান্তরিত করে, তারই ধর্মস্পর্শী বিন্যাস। পথের আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রেমাংশুর অকাল প্রয়াণ দীপার জীবন ম্লান, রুক্ষ ও কঠিন ক'রে তুলেছিল—অনেক 'পরে বসন্তের আবির্ভাব—মৃত্যুর অন্ধকার ছিন্ন-ভিন্ন করে যে অসামান্য আলোয় দীপার জীবন পূর্ণ ও সার্থক ক'রে তুলল, সেই অসামান্য আলোর চিরন্তন প্রেমের অপরূপ কাহিনী।

দাম—৬'৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

● মেয়াদী আমানতে (মেয়াদ অনুযায়ী) সর্বোচ্চ বার্ষিক সুদ ৭½%

● সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে বার্ষিক সুদ ৪%

● রেকারিং ডিপোজিটে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করুন, আনন্দের সঙ্গে গ'ড়ে উঠবে সঞ্চয়ের অভ্যাস।

সেবার প্রতীক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা—১

পাহাড়ী

শিল্পী : [illegible] চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

CALCUTTA CENTRAL

চৈত্র—১৩৭২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

বৈষ্ণব দর্শনের পরিচয়

ত্রিদণ্ডীস্বামী ভক্তিবিলাসতীর্থ গোস্বামী

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমস্ত স্মরণং
রূপং তস্যাগ্রজনৃপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।"
"আচণ্ডালাৎ সকলজগতি প্রেমভক্তেঃ প্রদাতা।
কারুণ্যাব্ধির্বসতু হৃদি স শ্রীশচীনন্দনো মে।"

সাহিত্য

'বৈষ্ণব-সাহিত্য' শব্দটি দুইটি শব্দের সমাসে সংগঠিত। মনে হয়, ব্যষ্টিগতভাবে এই দুইটির অর্থবোধ হইলে সমষ্টি-গত দুইটির অর্থবোধ হইবে। সেই জন্য আমরা প্রথমে উত্তরপদ 'সাহিত্য'টি গ্রহণ করিতেছি। ইহা 'সহিত' শব্দের উত্তর 'ষ্যঞ্' প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন; কিন্তু 'সহিত' শব্দটি দুই প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটিতে শক্ত্যর্থক 'সহ'ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ইতচ্' প্রত্যয় যোগে, অর্থ 'সম্মিলিত', 'সমভিব্যাহৃত'; আর অপরটিতে প্রাদি-সমাস দ্বারা সম (সম্যক্) হিত, অর্থ 'সম্যক হিতকর' প্রথমটি হইতে প্রাপ্ত সাহিত্যের অর্থ 'সংসর্গ', 'মিলন', এক-ক্রিয়ান্বয়িত্ব। দ্বিতীয়টি হইতে প্রাপ্ত অর্থ 'কাব্যশাস্ত্র', গদ্যময় বা পদ্যময় বা উভয়াত্মক 'রসরচনা' অর্থাৎ কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, আখ্যায়িকা প্রভৃতি রচনা। এই শব্দটি বর্তমান

কালেই প্রচুর ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীনকালে এক 'সাহিত্যদর্পণ' নামক সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থে ও পরে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি 'সাহিত্য-কৌমুদী' নামক গ্রন্থে মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুই স্থলে 'সাহিত্য' শব্দ 'অলঙ্কার-শাস্ত্র'কে উদ্দেশ করিয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"সাহিত্যে আমরা নিজের অভ্যাসকে অতিক্রম করিয়া উদারভাবে মানুষের ও বিশ্বপ্রকৃতির সহিত (সঙ্গ) লাভ করি।" এইভাবে তিনি শব্দটির দুই প্রকার অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন।

বৈষ্ণব

'বৈষ্ণবসাহিত্য' বুঝিতে 'বৈষ্ণব' শব্দের মর্মও জ্ঞাতব্য। পাণিনীর সূত্র 'দাক্ত দেবতা' অনুসারে 'বিষ্ণুরস্ত দেবতা' অর্থে 'বৈষ্ণব' পদ সিদ্ধ হয়; অথবা পাণিনীর 'অতোদম্' সূত্র অনুসারেও 'বিষ্ণোরিদং বৈষ্ণবম্' নিষ্পন্ন হইতে পারে। যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক, তাঁহারা, বা যে যে শাস্ত্রে বিষ্ণুর উপাসনাই প্রধান রূপে বর্ণিত, সেই সেই শাস্ত্র, 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত। বৈষ্ণবের সাধারণ সংজ্ঞা পদ্মপুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন—"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা পরো নরঃ। বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ।" বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যিনি বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ তিনিই বৈষ্ণব, অপরে অবৈষ্ণব। আর মূল রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্র বৈষ্ণব শাস্ত্র। বৈষ্ণবাচার্যগণ ঐ সকল শাস্ত্রের অনুসরণে যে সকল ভাষ্যাদি দিয়াছেন, যে সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্য, যেমন রামানুজীয়-সম্প্রদায়ের, মধ্ব-সম্প্রদায়ের, বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের, ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের, বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের অনুগামী বলিয়া পরিচিত বল্লভীয় সম্প্রদায়ের ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি। প্রাক্‌চৈতন্য, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীকৃত জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, আদি-চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গোকগীতাদি, গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়—ইহারা বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য

বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সাহিত্য বলিতে সকলেই শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভুর সম্প্রদায়ে তাঁহার ভক্তগণ দর্শন ও কাব্যাদি সম্বন্ধে যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের অনুবাদ, টীকাটিপ্পনীসহ যে সমস্ত সহায়কগ্রন্থ 'মহাজন-পদাবলী' নামে প্রসিদ্ধ যে সমস্ত বাংলা-গীত-সংকলন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব হইতে প্রচলিত, অথচ তাঁহা দ্বারা সমাদৃত যে সব কাব্যগীতি গ্রন্থ সেই সমস্তকে বুঝেন। সুতরাং প্রথমেই বৈষ্ণব সাহিত্য রূপে আমরা শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত গোস্বামীগ্রন্থগুলিকে ধরিব, যথা—শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীহরিভক্তি বিলাসের দিগ্‌দর্শনী টীকা, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব বা দশমচরিত, বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী নামে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের সুবিস্তৃত টীকা, শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীহংসদূত কাব্য, শ্রীবৃহদ্ভব-সন্দেশ, বৃহৎ ও লঘুগণোদ্দেশদীপিকা, স্তবমালা, শ্রীবিদগ্ধ-মাধব ও শ্রীললিতমাধব নাটক, দানকেলি কৌমুদী, ভক্তি-বিজ্ঞানশাস্ত্র শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, অলঙ্কার শাস্ত্ররত্ন শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি, শ্রীলঘুভাগবতামৃত, নাটকচন্দ্রিকা, শ্রীগোবিন্দ বিরুদা-বলী প্রভৃতি; শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্তবাবলী, বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী, মুক্তাচরিত প্রভৃতি, শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভুর শ্রীহরিনামাবলিসংবলিত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, শ্রীগোপাল বিরুদাবলী, শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ, শ্রীমাধবমহোৎসব কাব্য, শ্রীস্তবসংহিতার টীকা, শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুর দুর্গমসংগমনি টীকা, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির শ্রীলোচনরোচনী টীকা, শ্রীগোপাল-চম্পূ, ষট্‌সন্দর্ভ (তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীভক্তি ও শ্রীপ্রীতি) নামক শ্রীভাগবতসন্দর্ভ, প্রথম চারিটি সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যান সর্বসংবাদিনী, শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রম-সন্দর্ভ টীকা, শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতির সুখবোধিনী টীকা প্রভৃতি. গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের স্মৃতিবিভাগের উজ্জ্বল-রত্ন শ্রীহরিভক্তিবিলাস, সৎক্রিয়াসারদীপিকা প্রভৃতির রচয়িতা ষড়্‌গোস্বামিবর্গের অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য ও গুরু, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীনবদ্বীপশতক, শ্রীরাধারসসুধানিধি, শ্রীসঙ্গীতমাধব প্রমুখ বিভিন্ন লক্ষণাত্মক বহু গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় মহাপ্রভুর সমকালীন বা সমসাময়িক ব্রজ-গোস্বামিগণ রচনা করিয়াছিলেন। সেই সময়েই ব্রজের বাহিরেও বঙ্গদেশে শ্রীপাদ কবি কর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, আর্যশতক, অলঙ্কার-

কৌস্তুভ, দশমস্কন্ধ টীকা, চৈতন্যসহস্রনামস্তোত্র প্রভৃতি বহু-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার গুরু শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তী-পাদ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা নামে শ্রীভাগবতের টীকা করেন, যাহার মঙ্গলাচরণে 'আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং' প্রসিদ্ধ শ্লোকটি দেখিতে পাই। ইঁহাদের প্রায় এককালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অতি সুবিখ্যাত পণ্ডিতচূড়ামণি, ভক্তাগ্রণী, গৌরগতপ্রাণ, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ব্রজেই তাঁহার শ্রীগোবিন্দলীলামৃত (সংস্কৃত), সারঙ্গরঙ্গদানাম্নী কৃষ্ণকর্ণামৃতের (সংস্কৃত) টীকা আর চরিতামৃত—এই তিন অমৃত পরিবেশন করিয়া গৌরচরণাশ্রিত জনগণকে অমরত্ব দান করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের উপরিলিখিত গ্রন্থসমূহ মধ্যে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বঙ্গভাষায় লিখিত একমাত্র গ্রন্থ; তাহাও উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক ও তাহাদের দার্শনিক, বৈয়াকরণ বিচারে পরিপূর্ণ। তৎসত্ত্বেও এই গ্রন্থরাজ সংস্কৃতানভিজ্ঞ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরিত্রাতা ও হৃদয়ের ধন। এই গ্রন্থ আবির্ভাবের কিছু পূর্বে তিনখানি শ্রীচৈতন্যচরিত মূলক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লিখিত হয়। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত, যাহার বর্ণনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রায় সর্বত্র অনুসৃত হইয়াছে ও যাহার রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে 'চৈতন্য লীলার ব্যাস' ও 'ব্যাসাবতার' বলিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার 'চরিতামৃতে' পূজা করিয়াছেন। অন্য দুইখানি গ্রন্থের তিনি উল্লেখ করেন নাই। ইঁহাদের একখানি শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', অন্যখানি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। শেষোক্ত গ্রন্থটি নানা অবান্তর ও স্বকপোলকল্পিত বর্ণনায় পূর্ণ বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট অনাদরণীয় ও অনির্ভরযোগ্য। বলা বাহুল্য তখন বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হয় নাই বলিয়া এই সব এবং সে সময়ের পরেও খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত সমস্ত বাংলা গ্রন্থই পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লিখিত।

পদকর্তাদের বিবরণ

ইহার পরেই পদকর্তাদিগের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীজ্ঞানদাস ও শ্রীগোবিন্দদাসের নামোল্লেখ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (আঃ ১১।৫১-৫২) দেখা যায়। ইঁহারা স্বভাব-কবি ছিলেন। জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার পূর্বরাগ, গোষ্ঠ-বিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণলীলার পদাবলী সাধারণ সাহিত্যিকদের মধ্যে আদরণীয়।

শ্রীগোবিন্দদাসের পদাবলীর শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভু অত্যন্ত আদর করিতেন ও উহার জন্য তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ বীরভদ্র প্রভুও তাঁহার কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ও তাঁহার হাত দুইটি ধরিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' প্রভৃতি বঙ্গভাষার গীতিগ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অমূল্য নিধি; কীর্তনের মাধ্যমে নির্দোষ সাধন ভজন শিক্ষা তাঁহার অপূর্ব অবদান।

ইহাদের পরবর্তীযুগে আমরা শ্রীযদুনন্দন দাসকে দেখিতে পাই; তিনি শ্রীনিবাসাচার্য-কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর অনুগৃহীত। তিনি বিদগ্ধমাধব, শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গরঙ্গদা টীকার সুললিত পয়ারে বঙ্গানুবাদ করিয়া অনুবাদ রচনায় চিরস্মরণীয়। তাঁহার পদাবলীও বিখ্যাত এবং রসাভাসাদি দোষমুক্ত। তাঁহার পর আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যগগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের আলোক প্রাপ্ত হই। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও গৌরগত প্রাণ, ভক্তরত্ন, মহাভাগ-বত; তিনি একাধারে মহাদার্শনিক, রসবিৎ, শ্রীমদ্ভাগ-বতাদির প্রসিদ্ধটীকাকার ও কবিশ্রেষ্ঠ। তাঁহার মূলগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, ঐশ্বর্যকাদম্বিনী, মাধুর্যকাদম্বিনী, উজ্জ্বল-কিরণ, সিন্ধুবিন্দু, ভাগবতামৃতকণা, চমৎকারচন্দ্রিকা, ক্ষণদা-গীত চিন্তামণি, স্তবামৃতলহরী ইত্যাদি, ইত্যাদি; আর টীকা শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থদর্শিনী, গীতার সারার্থবর্ষিণী, উজ্জ্বলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ভক্তিসার প্রদর্শিনী, শ্রীগোপালতাপনীর ভক্তিহর্ষিণী আনন্দবৃন্দাবনচম্পুর সুখবর্তিনী, অলঙ্কার কৌস্তুভের সুবোধিনী ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাঁহার সমস্ত রচনাই সংস্কৃতে। তিনি সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরও আংশিক টীকা করিয়াছিলেন। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীঠাকুরের শিষ্যদেশীয় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ। ইনিও সংস্কৃতভাষায় বহুগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যথা বেদান্তসূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন, সিদ্ধান্তদর্পণ, বেদান্তস্যমন্তক, প্রমেয়রত্নাবলী,

সাহিত্য কৌমুদী, ছন্দঃকৌস্তুভ, গীতাভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন, ভগবদ্গীতা, লঘুভাগবতামৃতের টীকা, স্তবমালার টীকা উপনিষদ্ভাষ্য ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহাদের কিছু পরেই শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যামদাস (গ্রন্থলিখিত নাম) বঙ্গভাষায় তাঁহার সুবৃহৎ ভক্তিরত্নাকরে ব্রজ ও নবদ্বীপের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবজীবনী, সঙ্গীত শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় সুললিত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নরোত্তমবিলাস (শ্রীল নরোত্তমঠাকুরের জীবনী) গৌরচরিত চিন্তামণি, সঙ্গীতসারসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। ইহার পূর্বে শ্রীজাহ্নবাদেবীর পার্ষদশিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস রচিত হইয়াছিল, তাহাতেও শ্রীনরোত্তমাদির জীবনী ও প্রচার প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

বর্তমান যুগে (খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে) ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিভিন্ন ভাষায় শতাধিকগ্রন্থ রচনা করিয়া বৈষ্ণবসাহিত্য ভাণ্ডারে অনেক রত্ন প্রদান করিয়াছেন। এই মহাজন শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (সংস্কৃত) ভক্তিসূত্র (সংস্কৃত) হরিনাম চিন্তামণি, আত্মার সূত্র, ভাগবতার্ক-মরীচিমালা, নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতাদি রচনা করিয়াছেন। ইহার কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি, গীতমালা, ধামনভাবাবলি কার্পণ্যপঞ্জিকা, শোক শোতন প্রভৃতি গীতিসাহিত্য ও গ্রন্থগুলিতে শ্রীগোস্বামিগণ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দুর্বোধ্য সিদ্ধান্ত সমূহ বঙ্গভাষায় সম্পুটিত হইয়াছে।

শরণাগতিতে প্রধানতঃ আত্মনিবেদন, কল্যাণ কল্পতরুতে নিঃশ্রেয়সের উপদেশ, গীতমালায় শান্ত, দাস্য, ভক্তি ও শ্রীরঘুনাথদাস উজ্জ্বল ভক্তিশিক্ষা প্রভৃতি প্রকটিত। প্রতি পদেই বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্বের সুষ্ঠু নিদর্শন। শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুরকৃত আত্মনিবেদন, অরুণোদয়কীর্তন, নগর-কীর্তন, বাউলসংগীত ইত্যাদির প্রতিপদই আস্বাদ্য ও উপ-ভোগ্য। যাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা ও তাহার পবিত্র ধর্ম শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হন, এই গ্রন্থ (শ্রীভক্তিবিনোদকৃত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত) তাঁহাদিগকে প্রাথমিক উপযোগিতা দান করিবে। বৈষ্ণবধর্ম—শ্রীভক্তিবিনোদ রচিত তত্ত্বোপদেশ-দায়ক ভক্তিগ্রন্থ। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বহু দুষ্টপ্রশ্নের সমাধান ইহাতে বিদ্যমান। অনুকূল প্রতিকূলে যত যুক্তিতর্ক হইতে পারে তাহাদের উত্থাপন পূর্বক অপূর্বমীমাংসা। কাশীর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদের সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থের ইংরাজী ভূমিকায় লিখিয়াছেন—(অনুবাদ) শ্রীচৈতন্যের ধর্মীয় ও দার্শনিক উপদেশসমূহের বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমানযুগের শ্রীভক্তিবিনোদ লিখিত বৈষধর্ম, শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, mahaprabhu his life and teachings অধ্যয়ন করিলে উপকৃত হইবেন।" ঠাকুর ইংরাজীভাষাবিদ্গণের জন্য the poriades (untouchables), maths of orissa, reflection, our wants, bhagabat I' ts plilosophy Fthics and theology, প্রভৃতি পুস্তিকা লিখিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যের কিছু কথা পাশ্চাত্যদেশসমূহেও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংগে সংগে তাঁহার অনুগ প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীবর তাঁহার গ্রন্থরচনার সহচররূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন ও ঠাকুরের মনোভীষ্ট পূরণকল্পে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের বিপুল প্রচার জন্য পরিব্রাজকরূপে ভারতের সর্বদেশে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ ও বহুমঠ সংস্থাপন এমনকি রেঙ্গুন, লণ্ডন, বার্লিন প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশেও গৌড়ীয় মঠ স্থাপন এবং বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, উৎকল, আসামী ও ইংরাজী ভাষায় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক এমন কি দৈনিক পত্রিকার প্রবর্তন ও পরিচালন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত মহাপাণ্ডিত্যব্যঞ্জক ভাষ্য, তথ্য সংগ্রহ ও বিস্তৃত বিবৃতিসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি বহু সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বীয় বিবৃতি, অনুভাষ্য ও গৌড়ীয় ভাষ্যে গোস্বামিবর্গের সন্দর্ভ, সিদ্ধ নীলমণি প্রভৃতি হইতে যথেষ্ট প্রমাণোদ্ধার করিয়া গ্রন্থ সমূহের ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁহার পারমার্থিক শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী বিভিন্ন পারমার্থিকপত্রে বহুমূল্য উপদেশ সংবলিত তাঁহার প্রবন্ধা-বলী গভীর গবেষণার পরিচায়ক তাঁহার বক্তৃতাবলী, স্বীয় অনুগজনের ও আগন্তুক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রশ্নকর্তার নিকট হরিকথা অবতারণা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বহু European ও american সজ্জনের প্রশ্নের উত্তরে দার্শনিক বিচার সমূহ বাস্তবিক বৈষ্ণবধর্মনে মহামূল্যবান অবদান।

তিনি উত্তরভারতীয় ভাষার অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের জন্য ইংরাজীতে পুস্তিকা রচনা করিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন, যথা—Purport of sri Brahma Samhita, Rai Ramananda, Relative worlds, A few words on vedanta—its Outology and Morphology ইত্যাদি। তাঁহার রচিত 'পুরুষার্থ বিনির্ণয়,' 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব,' 'ধর্মে সাম্যবাদিকতা' প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন শাস্ত্র ও দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহের সার অভিনব পাণ্ডিত্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রচারার্থ তিনি পরাবিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়া 'ভক্তিশাস্ত্রী' প্রবেশিকা এবং শ্রুতি, বেদান্ত, ভাগবত, একায়ন পঞ্চরাত্র, সাহিত্য, ঐতিহ্য, সম্প্রদায় বৈষ্ণব, ভক্তিশাস্ত্র, তত্ত্ব ও রসসম্বন্ধীয় দশটি আচার্য পরীক্ষার প্রবর্তন করিয়াছেন।

বৈষ্ণবসাহিত্য উৎকর্ষে অতুলনীয়

আমাদের পুনরায় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের এই দিগ্‌দর্শনটি অতি সংক্ষিপ্ত; এই সাহিত্যের ভাণ্ডার অনন্ত। দার্শনিক জগতে যেমন শ্রীরামানুজাচার্যপাদ, শ্রীমধ্বাচার্যপাদ, শ্রীনিম্বার্কাচার্যপাদ, শ্রীবিষ্ণুস্বামীপাদ, শ্রীজীবগোস্বামীপাদ, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-পাদ প্রভৃতি মহাবৈদান্তিকগণ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদকে ছিন্নভিন্ন করিয়া খণ্ডিত করিলেও লোকের বহুসংস্কার বশে তাঁহাদের উপর শাঙ্করমতের প্রভাব বর্তমান, তদ্রূপ বৈষ্ণবকবিগণের উৎকর্ষ সত্ত্বেও লৌকিক পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ে অজ্ঞ বা উদাসীন রহিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামীর ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটকদ্বয় কবি কালিদাসের কোন নাটক অপেক্ষা নিম্নস্থানীয়? আমরা তুলনা মূলে দেখিয়াছি নিম্নই ত নয়ই, বরং বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অভিজ্ঞানশকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী প্রভৃতি নাটক হইতে শ্রীরূপপাদের নাটকদ্বয় ভাববৈচিত্র্য, বর্ণনাশৈলী, ভাষালালিত্য, ঘটনা সমাবেশ, অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার ও উপমাদি অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উচ্চ অঙ্কের বলিয়া নিরপেক্ষ বিদগ্ধজনী দ্বারা স্বীকৃত। শ্রীরূপগোস্বামী পাদের দূতকাব্য—হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, কালিদাসের মেঘদূত হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া অন্ততঃ অন্তরে স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার 'দানকেলি কৌমুদী' নামক একাঙ্ক 'ভাণিকা' নাটকের সহিত তুলনা করিবার যোগ্য নাটক আর কাহার আছে? গৌড়ীয় রসসাহিত্য তত্ত্বতত্ত্বের উৎকৃষ্ট ফল ও ভক্তিরসের বিজ্ঞান শাস্ত্র শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ন্যায় অলৌকিক মাহাত্ম্যপূর্ণ অথচ কাব্যরসে পরিপূর্ণ গ্রন্থশিরোমণির সমকক্ষ গ্রন্থ কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। আর তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি'র ন্যায় প্রেমভক্তির এমন সমুজ্জ্বল ও সুমধুর উপদেশ জগতের আর কোনও গ্রন্থে পরিবেশিত হয় নাই। ইহার পাঠ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠককে ইহার অপূর্বত্ব ও অলৌকিক মাধুর্যের বিষয়ে মুগ্ধচিত্ত হইতে হইবে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণি ভগবদ্রস-বিভাবিতবৃন্দগণের চিত্তে মধুর হইতেও সুমধুর প্রেমরসের সঞ্চার পূর্বক সুনির্মল রসের রসিক করিয়া তুলেন। মোটকথা একাধারে সাহিত্যের সকল বিভাগেই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ স্থান লক্ষিত হয়; এরূপ সর্বপ্রকার সাহিত্যে দক্ষতা পূর্বে কোনও কবির ইতিহাসে দেখা যায় না। তাঁহার অনুজ শ্রীজীবাদিও তাঁহার সমকক্ষ না হইলেও বহুলৌকিক প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণ অপেক্ষা সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই যে শ্রেষ্ঠ তাহা তুলনামূলক বিচারে প্রতিপন্ন হইবে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য-অধ্যাপনা-বিভাগের জন্য একটি নিবেদন

শ্রীব্রজধামের গোস্বামিবর্গ, তদনুগ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্গ ও ভক্তগণের বৈষ্ণব সাহিত্যে অবদান সম্বন্ধে আলোচনা জনিত উদ্দীপনায় হৃদয় উৎফুল্ল হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু একটি আনুষঙ্গিক দুঃখের চিন্তা হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে, যাহার আভাস আমরা একটু পূর্বেই দিয়াছি। সেটি লৌকিক বিদ্যভিমানী পণ্ডিতগণের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা বা উপেক্ষা। অবশ্য কোনও কোনও উদারচেতা পণ্ডিতমহাশয়ের প্রয়াসে রাজীয় পণ্ডিতসভা (বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ) দ্বারা শ্রীজীবপাদের হরিনামামৃত ব্যাকরণ পরীক্ষার বিষয়ীভূতরূপে গ্রহণ করান হইয়াছে; তদ্রূপ আর একটি বিষয়ে, যথা বৈষ্ণবদর্শনে, পরীক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু এত-দ্বারাই কি উপেক্ষা দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার অবকাশ আসিয়াছে? ইহা যেন ঠিক ক্ষুধার্ত অতিথি গৃহে

আসিলে প্রচুর অন্ন থাকা সত্ত্বেও তাহা হইতে মাত্র এক মুষ্টি পরিমাণে দানের ন্যায়। যেমন শ্রীরূপপাদের নাটক, কাব্য প্রভৃতি, শ্রীজীবপাদের শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীগোপাল-চম্পূ, শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম, শ্রীগোপালবিরুদাবলী প্রভৃতি কাব্য, শ্রীপাদ কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, অলঙ্কার কৌস্তুভ, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ প্রভৃতি কাব্য, শ্রীল রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থনিচয় কাব্যতীর্থ পরীক্ষার জন্য অন্ত্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইতেছে না? এই সভার পরমোৎসাহী উদ্যোক্তৃবর্গের নিকট আমি নিবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা শ্রোতৃমণ্ডলী হইতে বিশেষোৎসাহী সহায়কগণ লইয়া অনুগ্রহপূর্বক ঐ রাষ্ট্রীয় সভার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এই বিষয়ের আলোচনা উঠাইয়া সাধারণ কাব্যপরীক্ষার জন্য উপরি উক্ত গ্রন্থসকলের অন্ততঃ কতকগুলি পাঠ্যরূপে নির্বাচন করাইবার নিমিত্ত প্রযত্ন করুন। আর সাধারণ বেদান্ততীর্থ পরীক্ষার জন্যও শ্রীজীবপাদের (অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের আদিগ্রন্থ) ষট্ সন্দর্ভ, বিদ্যাভূষণপাদের গোবিন্দভাষ্য প্রভৃতি অনবদ্য-গ্রন্থরাজি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হউক। এইভাবে স্মৃতি প্রভৃতি পরীক্ষাতেও শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থও পাঠ্য হওয়া আবশ্যক। তবেই পণ্ডিতসমাজে এই সকলের আলোচনার মাধ্যমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রকৃত প্রচার আরম্ভ হইবে।

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসাহিত্য শ্রীল স্বরূপগোস্বামীপাদকর্তৃক বিজ্ঞাপিত "রাধাভাবদ্যুতি-সংবলিত কৃষ্ণস্বরূপ" শ্রীগৌর-কৃষ্ণেরই পরতত্ত্বত্ব স্থাপন ও তাঁহারই অভিন্নতানুসারে তাঁহার অভিন্ন যুগলতনু শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রবর্তিত ও পুষ্ট। এই কথাটি শ্রীমদ্বৈষ্ণব-শিরোমণি শ্রীল শ্রীনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা 'চৈতন্যমঞ্জুষা'র এই মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে সংক্ষেপে বলিয়াছেন—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং

রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
নিত্যং যস্যপদাব্জমস্তমভজত্তং শ্রীগুরুং নঃ পরঃ॥"

—অর্থাৎ "ভগবান নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্যতত্ত্ব (সম্বন্ধ), তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন; আর তাঁহার উপাসনা প্রণালী (অভিধেয়)—যেরূপ ব্রজবধূ গোপীগণ সম্পাদিত করিয়াছেন, তদ্রূপ; এ বিষয়ে অমল বা অভ্রান্ত প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র; আর পরম পুরুষার্থ (প্রয়োজন) শ্রীকৃষ্ণ প্রেম। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই প্রকারই মত; অতএব তাঁহাতেই আমাদিগের পরম আদর।" শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বহির্মুখ-লোকের (কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগের) নিকট সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনতত্ত্ব এইরূপে স্থাপন করিয়াছেন (চৈঃ চঃ আ ৭।১৩৮-১৪৫)—

"বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি শ্রীভগবান।
ষড়্‌বিধৈশ্বর্যপূর্ণ, পরতত্ত্ব-ধাম
স্বরূপ-ঐশ্বর্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ'।
ভগবান্—প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তের সহায়।
সেই সর্ববেদের 'অভিধেয়'-নাম।
সাধনভক্তি হইতে হয় প্রেমের উদ্গম॥
কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ।
কৃষ্ণবিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য-রস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হইতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ।
প্রেমা হইতে পায় কৃষ্ণের সেবাসুখরস॥
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব (বেদান্ত) সূত্রে পর্যবসান॥"

ভগবৎপ্রেমলাভই ভগবৎপ্রাপ্তি

গীতায় (১৮।৫৪) ভগবান বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

পূর্ব (৫৩) শ্লোকে "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"—ইহার সারার্থদর্শিনী টীকায় চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মানুভবায় সমর্থো ভবতি।" বর্তমান শ্লোকের "ব্রহ্মভূতঃ"—অর্থে তিনি বলিয়াছেন—"অনাবৃতচৈতন্যেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ, গুণমালিন্যাপগমাৎ।"—অর্থাৎ 'সাধক গুণমালিন্য দূর হইলে অনাবৃত-চৈতন্যস্বরূপে ব্রহ্মরূপ হ'ন, অর্থাৎ মায়ার ত্রিগুণমুক্ত হইলে শুদ্ধচিত্ত অবস্থায় ব্রহ্ম যেরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ, জীবও তাহাই হইয়া স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার 'ব্রহ্মভূত' অবস্থায়

পর ভগবৎ সম্বন্ধে নির্বিশেষ, নিঃশক্তিক, নির্গুণ প্রভৃতি 'নেতি' অনুভূতিমূলক অসম্যকজ্ঞানলব্ধ ভগবদ্বহির্জ্যোতির্ময় ব্রহ্মদর্শন অতিক্রমপূর্বক (৫৫ শ্লোকে কথিত) পূর্ণতর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, নাম-রূপ-গুণ-লীলা-ধামপার্ষদাদি পরিকরাত্মক ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাতে প্রেমলাভ করেন। সুতরাং ব্রহ্মভূত হইলে যে ব্রহ্মসুখ পাওয়া যায়, তাহা ভগবৎপ্রাপ্তিজনিত সুখ হইতে অনেক নিম্নস্তরের। ব্রহ্ম-সুখের অধিকারী আত্মারামগণও ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্য উদ্যোগী হ'ন। ভাগবতে বলিয়াছেন (১।৭ ১০)—

"আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।"

'শ্রীহরির এমনই গুণ যে, ব্রহ্মসুখে মগ্ন জড়জগতের হৃদয়গ্রন্থি সমূহ হইতে মুক্ত (শুকদেব, চতুঃসন প্রভৃতি) মুনিগণও তাঁহাতে ফলাভিসন্ধানরহিত নিষ্কাম ভক্তি করেন।' অর্থাৎ ভক্তিসুখ এত অধিক যে তাঁহাদের পূর্বের ব্রহ্মসুখ তাহার নিকট ম্লান হইয়া যায়। আপনাদের সকলেরই জানা আছে যে, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদের নিকট এই শ্লোকটির একটি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ২৪ পঃ)। সুতরাং দেখা গেল যে, বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম লাভই ভগবৎ প্রাপ্তি—তাহাই জীবের নিত্য প্রয়োজন।

রসভেদে প্রেম-তারতম্য

এখন বক্তব্য রসভেদে বিশুদ্ধভগবৎপ্রেমেরও কিছু তারতম্য আছে। ভিন্ন ভিন্ন রসের ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদন। পদ্যাবলীতে ৮৩ অবধৃত শ্লোকে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ বলিয়াছেন—

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং আদ্য এব পরো রসঃ।"

পঞ্চরসের মধ্যে আদি বা শৃঙ্গার রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসকে ক্রোড়ীকৃত করে। পঞ্চরস সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বক্তব্য (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৩১-৭২)—

"অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর আর।
এই পঞ্চ স্থায়ী ভাবে হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কয়েকটি (মধ্যলীলা ২৩ ৪৯-৫৩) পয়ারের তাৎপর্য এই যে, শান্তরসে রতি বৃদ্ধি পাইয়া প্রেম পর্যন্ত সীমা লাভ করে; দাস্য রসে উহা স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে; সখ্য রসে উহা স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়; বাৎসল্য রসে উহা ঐ প্রকার অনুরাগ পর্যন্ত, তবে বিশেষত্ব, এই যে, সুবল প্রভৃতির সখ্য রতিভাব পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব কেবল মাত্র মধুর রসেই বর্তমান। দ্বারকার মহিষীগণে রূঢ় এবং গোকুলে গোপীগণ মধ্যেই কেবল অধিরূঢ় মহাভাবেরও চরম অবস্থা—

"উদ্‌ঘূর্ণা, বিরহ-চেষ্টা, দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্তি, আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২৩ ৫৭।

এই দিব্যোন্মাদ শ্রীরাধারাণীতে অত্যন্ত প্রবল ও শ্রীমন্মহাপ্রভুতে তাহার বিশেষ প্রকাশ। অন্যত্র ইহা লক্ষীকৃত হয় না।

'ঐশ্বর্য'-'মাধুর্য'—বিচারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দেখাইয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৯৪)—

"ঐশ্বর্য জ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য,—কেবলার রীতি।"

তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে মধুর রসেরই প্রাধান্য, যেহেতু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাবে স্বীয় আচরণ দ্বারা তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন, গোস্বামী গ্রন্থ সমূহে তাহারই আলোচনা। ঐশ্বর্য বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইলেও এই অবতারে তিনি মধুররসের বিষয় বিগ্রহ না হইয়া তদাশ্রয়-বিগ্রহত্বের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। এ কথা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

উপসংহারে নিবেদন

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার বিষয় থাকিলেও অবকাশ-অভাবে এইখানেই আমরা আর অধিক কিছু বর্ণন হইতে নিরস্ত হইতে বাধ্য হইতেছি।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

তাত্তা চরাচর গ্রহণাৎ (৯)

কঠোপনিষদে আছে—

হন্ত ব্রহ্মা চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥

ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় যার অন্ন হইয়া রয়
মৃত্যু যাহার অন্নের সাথে ঘৃত ব্যঞ্জন হয়
কোথায় বসতি তার ?
কল্পনা মানে হার
এহেনতর মৃত্যু যাহার ভোজনোপকরণ হয়
ধ্বংসের কালে যাঁহার মধ্যে বিশ্ব জগৎ লয়।
ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় দুই সর্বশ্রেষ্ঠ হয়
তাই উল্লেখ করা হল সেথা অন্য কিছুই নয়
জীবের কর্ম ভরে
সুখ দুখ ভোগ করে
ঈশ্বর শুধু স্বেচ্ছায় করে জগতের সংহার
অসীম শক্তি আধার সেজন বলিতে সাধ্য কার ?

প্রকরণাচ্চ (১০)

ব্রহ্ম প্রসঙ্গে প্রকরণাৎ শ্রুতিতে জানিও কয়
তাই ত ইহাতে তাহার আগেতে এই শ্লোকটুকু রয়
"মহান্তং বিভু মাত্মানং
মত্বা ধীরো ন শোচতি"
মহান সর্বব্যাপীনে আত্মা তাহারে জানে যে জন
শোক তারে কভু পরশিতে নারে সেই সুধী জ্ঞানীজন।
এই কথা বলা যায়
জীব সম্বন্ধে নয়
ব্রহ্ম বিষয়ে এই কথা সার শ্রুতিতে জানিও কয়
যেই জন এই জগৎ কারণ ব্রহ্ম সে জন হয়।

গুহা প্রবিষ্টাধিকরণ

গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ (১১)

কঠোপনিষদে আছে সুকৃতস্য লোকে গুহা প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।

হৃদয় গুহার মধ্যে রাজেন দুইটি বস্তু তায়
জগতের যত কর্ম তাদের ফলভোগ করে হায়
ছায়া ও আলোর মত
ভিন্ন স্বভাব গত
ব্রহ্মবিদেরা বলেন ইহারা উপাসনা যাহা করে
পঞ্চ অগ্নি বিদ্যার দ্বারা ইহারা তাঁহাকে স্মরে।
নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়া তিনবার যাগ করে
তাহারাও যেন ইহাদের কথা বলেছে এমনি করে
যজ্ঞ কর্ম করে
স্বর্গেতে যায় পরে
পুণ্যভোগের শেষ হলে পরে চন্দ্রে পতিত হয়।
চন্দ্র হইতে যেথে, পরে ধারা ধরে যেথা বরষয়।
এই বারিধারা পানকরি তবে শস্য পুষ্ট হয়
ভোজনকারি সে পুরুষের দেহে তখন সে হয় লয়
তারপর স্ত্রীর গর্ভেতে যায়
সেথায় হইতে জন্ম যে লয়
নাচিকেত নামে ব্রাহ্মণ এক যমের কাছেতে গেল
যমের নিকট অগ্নিবিদ্যা লাভ সেই করেছিল
এই উপাসনা করে সেইজন স্বর্গে সেজন যায়
কঠোপনিষদে আছে সে আখ্যা তাই থেকে জানা যায় —
উপনিষদের মাঝে
গুহা প্রবিষ্ট আছে—
এ দুটি বস্তু আত্মা এবং পরমাত্ম যে হয়
জীবাত্মা সাথে পরমাত্মা যে হৃদয় গুহায় রয়
শ্রুতিতে কথিত আছে
তং দুর্দর্শং গূঢ় মনু প্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো
হর্ষ শোকৌ জহাতি।
সেই দুর্দর্শ ও গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট গুহাস্থিত জন
গহ্বরস্থ পুরাতন দেব আধ্যাত্ম যোগেতে দৃষ্টহন
সুধী জন জেনে তাঁরে
হর্ষ শোক ত্যাগকরে।
জীবাত্মাই কর্ম ফল শুধু ভোগকরে
সঙ্গে থাকিলেও পরমাত্মা নাহি করে
স্বয়ং শিবস্তোকথা
তবু সবে বলে যথা
ছাতা সাথে নিয়ে কেহ কভু যায়
মাথায় না দিলে বলে ছত্রধারী যায়
ফলধারী ফলদাতা এক হয়ে যায়
সঙ্গ দোষ সঙ্গ গুণ এ জন্যই কয়
গুহা প্রবিষ্টৌ
অচেতন নয়
জানিও চেতন যিনি তারি কথা কয়
হৃদয় গুহায় সেই ব্রহ্মধন রয়।

অঘটনের পূর্বরাগ

দিলীপ কুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একুশ

বিছানায় শুয়ে কিন্তু কিছুতে আর ঘুম আসে না। দেহ ক্লান্ত অথচ মাথার মধ্যে সে যে কত উল্টোপাল্টা চিন্তা··· হিজিবিজির ঘটনা!—এক একটা দিন এমন আসে মানুষের যেন হঠাৎ দশবৎসর বয়স বাড়িয়ে দিয়ে যায়। শুয়ে কেবলই মনে হতে থাকে সত্যিই কি এসব ঘ'টে গেছে চব্বিশ ঘণ্টার পরিধির মধ্যে? আর শুধু ঘটা তো নয়—সার সার অঘটনের ঘটা যাকে বলে। যেন প্রত্যেক মানুষটির চেহারা বদলে গেছে আমার চোখে। নিজের দুর্বলতা মনে হ'য়ে লজ্জা আসে বৈ কি। কিন্তু ঐ সঙ্গে মনে ছেয়ে আসে কৃতজ্ঞতা—আমি ঠাকুরকে ডাকতেই কী ভাবে বল পেয়ে গেলাম! মনে হ'ল কাউকে বলা যাবে না এই যা দুঃখ, কারণ বললে কেউই বিশ্বাস করবে না এ-যুগে যে, প্রার্থনায় অঘটন ঘটে, মূক বাচাল হয়, পঙ্গু মাউন্টেনিয়ার।

আরো, চোখের দৃষ্টি যেন বেড়ে গেল। মনে স্নিগ্ধ হয়া এল ঐ মন্ত্রীসাহেবের 'পরে—ঘাম্পেয়া কলহের জন্যে যাকে ঠাঁই নিতে হয় ক্লাবে। কত একলা তিনি। অথচ বাইরের ঠাট দেখে কে বলবে এত একলা—আর দুর্বল। দুর্বল বৈ কি! মেয়ের শাসন সত্ত্বেও যে মদ ছাড়তে পারে না—তার চোখে ছোট হ'য়ে যাবে জেনেও। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর একটা রূপ আমার চোখে প'ড়ে মনটা নরম হয়ে এল। মানুষটি সত্যিই কী সরল। বোকা সরল নয়—কারণ মন্ত্রী হিসেবে তিনি নিপুণ এ খ্যাতি তাঁর শত্রুর মুখেও শুনেছিলাম। তবু রাগ চড়তেও যেমন নামতেও তেম্‌নি—এরই তো উপনাম সরলতা। নৈলে যে আমার জন্যে তাঁকে রাজাসাহেব রাণীসাহেবার কাছে অপদস্থ হতে হবেই হবে জানতেন তাকে এত সহজে ক্ষের বরণ করলেন তো বন্ধু ব'লে। মনে পড়ল মোটরে মুহূর্মার একটা কথা: "মা যদি বাবাকে পদে পদে বিচার না করে একটু বুঝতে চাইতেন তাহলে বাবাকে মদের বোতলে কান্না ভুলতে হত না। মানুষ বদ্‌রাগ শাসনে নয় অসিত, বরলাগ শুধু দরদে ভালোবাসায়। মাকে, এই সাদা কথাটি আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি নি।"

কিন্তু ঐ সঙ্গে মনে পড়ল শর্মিতার একটি পাল্টা মন্তব্য "মাকে বাবা জোর ক'রে মেমসাহেব না করলে মার মনে এত ক্ষোভ জমত না। বাবা তাঁকে পেয়েছিলেন মুঠোর মধ্যেই। কিন্তু শুধু বেশি চেপে ধরার ফলেই মাকে হাঁপিয়ে উঠতে হয়েছিল। তাই তো সাধুজি আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। বাবা এ-হিন্দুয়ানি বোঝেন না। কিন্তু মেমসাহেব সাজলেও সাহেবিয়ানায় মার মন কোনোদিনই সায় দেয় নি। ফল যা হবার···বাবার টানে যা ওদিকে বেশি ঝুলেই পেণ্ডুলামের মতন এদিকে ঝুঁকলেন। কিন্তু তারপরই ফের ওদিকে যেতে হয় তো—পেণ্ডুলামের ধর্মই এই—তাই মায়

মন আরো খারাপ হয়। মৃদুলা বলে—বাবা দুর্বল, তাকে কষ্ট করা উচিত। কিন্তু সে জানে না যা কত বেশি দুর্বল।—

সাধুজির এ বাড়ীতে আসার পরেই মাসিমা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন একথা মনে হ'তেই হঠাৎ তাঁর জ্যোতির্ময় মুখ ভেসে উঠল আমার উত্তপ্ত মনে। আর অমনি সব তাপ যেন জুড়িয়ে গেল। তিনি সাধু সবাই বলে। ঠাকুরের দর্শন তিনি পেয়েছেন কিনা জানি না। কিন্তু তাঁর আমা কথার মধ্যে প্রতি পদে যে জোরালো সুর ফুটে ওঠে সে-সুর কোনো খাঁটি আত্মিক উপলব্ধি না হ'লে নিজেকে জানান দিতেই পারে না। (খেমে মার্গারেটকে): তোমাদের বাইবেলে বলেছে খৃষ্ট যব যখন কথা কইতেন অনেক অবিশ্বাসীরও মনে হ'ত তাঁর কথার পিছনে আলোর জোর আছে যার কাছে মন মাথা না নুইয়ে পারে না—he speaks with authority বটে তাঁরা। সাধুজি অবশ্য খৃষ্টদেবের মতন যুগাবতার নন, কিন্তু ঐ এক জায়গায় উভয়ের মিল আছে একথা সেদিন বারেবারেই মনে হ'য়েছিল। নৈলে তাঁর দুটি মৃদু ভর্ৎসনায় আমার অহঙ্কারের ফণা নত হ'ত কি? না, আমি একবার তাঁর বিধান মেনে আমার নিজের চারপাশে যুক্তিকে বাতিল ক'রে মন্ত্রীসাহেবের কাছে ধর্ণা দিতে ছুটতাম? হয় তো, সাধুদের আকর্ষণী শক্তি আমাদের কাছে টেনে মনকে অজান্তে অভিভূত করে ব'লেই তাঁদের প্রভাবে আমরা এত সহজে প্রবৃত্তির পিছুটান, অহঙ্কারের অন্ধকার, অবিশ্বাসের কাঁটাবন পেরিয়ে মুক্তিলোকের আলো ফুল ব্যাপ্তির সন্ধান পাই। কিন্তু সে অন্যকথা। এখন গল্পেরই খেই ধরি যেন।

বাইশ

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙল বেলায়—টেলিফোনের শব্দে।

চোখ কানে যেতেই শমিতার কণ্ঠ জিজ্ঞাসা করল: "কাল রাতে কেন হঠাৎ উঠে চ'লে গেলে? যা কিছু বলেন নি তো?"

আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: "মাসিমা? তিনি তো আমার দিকে প্রথম থেকেই।"

"তবে?"

"চলে এলাম···কেন···বুঝতেই তো পারো। মৃদুলা কান্নাকাটি ক'রে চলে গেল···কিন্তু এ-আলোচনা থাক না।"

"না, থাকবে না। আমার জানা দরকার।"

"কি?"

"অনেক কিছু। তুমি কখন আসছ?"

"যেমন যাই—রাতে—গান শিখতে—যদি অবশ্য আর গানের আসর বসে—মানে সাধুজি আসেন।"

শমিতার হাসির শব্দ এল, বলল: নৈলে আসবে না?"

আমি কুণ্ঠিত হ'য়ে বললাম: "সত্যি কথা বলতেও বাধে আবার মিথ্যা বলতেও মনস্তাপ আসে।"

"আমি ঘেরা করতে চাই না অমিত। তবে জরুরি কথা আছে। 'তুমি একবার আসবে—এক্ষুণি?"

একটু ভেবে বললাম: "যেতে পারি···কেবল···কি জানো? আমাকে নিয়ে তোমাদের মধ্যে পাছে ফের বাধে—"

"না, বাধবে না। ওর বেজায় মাথা ধরেছে—Migraine—এগারটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবে না।" বলেই একটু থেমে: "এক কাজ করো। To be on the safe side, আমাদের বাগানের দক্ষিণ কোণে যে বকাবি-টি আছে তার ওপাশে বেঞ্চিতে আমি ব'সে অপেক্ষা করব—সেখানে কেউ আসে না।"

"মালী?"

"তাকে আমি কোনো কাজে পাঠিয়ে দেব—যাতে দুঘণ্টার আগে সে ফিরতে না পারে।"

"আচ্ছা। আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছব।"

'ধন্যবাদ।'

• • •

ফুলটি সত্যিই মনোরম। বেঞ্চিতে ব'সে শমিতা একটা গানের সুর গুনছিল। আমি যেতেই বলল: "দেখ দেখি, পছন্দ হয়?"

"আমার জন্যে?"

সুমিতা হাসল: "নয়ত কি বাবুটির জন্যে?"

ওর সহজ হাসিতে ভরসা পেলাম। বললাম: "ধন্যবাদ,

এমন চমৎকার উপহারের মানহানি করতে চাই না। কিন্তু এত কষ্ট ক'রে—"

"সারাবছর যোগার চেয়ে কঠিন কাজ আমি করেছি অনেক—হয়ত করবও কের আজকেই।"

"মানে?"

"বোলো। বলছি।"

বেকিংহে ওর পাশে বসতেই ও আমাকে বলল: "যদি একটু খোলাখুলি কথা কই?"

আমি সহজ ভাবে হাসবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না।

"ও মেয়েলী মুখে বলল: 'কী? রাজী নও?"

"এবার একটু উদ্বিগ্ন হ'তে হ'ল বৈ কি, বললাম: "ব্যাপার কী শর্মিতা?"

ও তবু কিছু বলল না। আমি ফের প্রশ্ন করলাম, "তোমার মনে আমি কি কোনো আঘাত দিয়েছি?"

ও একটু হেসে বলল: "তা কি তুমি চেষ্টা করলেও পারো অসিত?"

আমি ওর প্রশ্ন একটু এড়িয়ে গিয়ে বললাম: "আমরা কী পারি না পারি কেউ কি জানে, শর্মিতা?"

"তোমার কি বিশ্বাস কোঁকালো শুধু ছেলেরাই?"

"না। কিন্তু মেয়েরা যখন কোঁকালো হয় তখনও—"

"কী? থামলে যে?"

"না। মুখে যা আসে সব সময়ে বলা ভালো নয়।"

শর্মিতা ম্লান হাসল: "কালকের কথা ভেবে সাবধান হচ্ছ?"

"যদি হই সেটা কি খুব দোষের বলবে? ভাবো তো কী কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হ'য়ে গেল!"

শর্মিতা বলল: "কিন্তু ও টাল সামলে নিল তো। শুধু তাই নয় তোমাকেও টলালো।"

"ও মানে? মূর্ছা?"

"নৈলে আর কে?"

"তোমার একটু ভুল হয়েছে শর্মিতা। আমি মূর্ছার কথায় টলি নি।"

ও একটু আশ্চর্য হ'ল, বলল: "তবে—কার?"

"সাবৃত্রির।" ব'লে ওকে বললাম তিনি যা যা বলেছিলেন—শ্রীমন্ত বাবাজির কথাও বাদ দিলাম না।

ও হাসল: "অসিত, আমাকে তুমি হয়ত খুব সরলা ভেবে ব'সে আছ। আমি অবলা হ'তে পারি, কিন্তু সরলার ধারপাশ দিয়েও যাই না।—কিন্তু—" ব'লে যেন একটু জোর দিয়েই বলল—"আজ একটু সরল ভাবেই কথা কইব—যদি তুমি বিশ্বাস করবে—কথা দাও।"

আমি একটু ব্যথিত হয়েই বললাম: "এমন কথা বলে? আমি কি জানি না—তুমি স্বভাবে সত্যবাদী?"

"আচ্ছা, তাহ'লে বলি আজ খোলাখুলিই—যদিও ··" ব'লে একটু থেমে কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলল: "যদিও বলতে হচ্ছে বড় দুঃখেই। কথাটা এই যে, ও জানে কাকে কী ভাবে বশে আনা যায়। যাকে বলে সহজপটুতা। তাই তোমার কাছে পিতৃভক্তির অনুরাগে চোখের জল ফেলেছে যেমন আর একজনের কাছেও ফেলেছিল। সে আমাকে বলে সব কথা—তাই জানি এ-মার্চে ও কী রকম পাকা। বাবার মতন দুঃখী কেউ নেই ভূ-ভারতে—কেউ তাঁকে বোঝে না—নৈলে তাঁর জীবন এ-ভাবে নষ্ট হ'য়ে যেতনা ···এই সব বয়ানের কেনা। বলে নি· এসব কথা ও তোমাকে?"

আমি বললাম: "এ তোমার অন্যায় শর্মিতা!"

শর্মিতা হাসল: "বলেছে কনফিডেন্সিয়ালি—এই না? আচ্ছা, যেতে দাও। আমি যা জানতে চেয়েছিলাম তোমার এই প্রতিপ্রশ্নেই টের পেয়েছি। তাছাড়া আমি তোমাকে ডেকেছি আজ বলতেই—তোমাকে দিয়ে কিছু বলিয়ে নিতে নয়। তাই শোনো।

"বলছিলাম কি—ও সাধিয়ে বলতে বেশ জানে—চোখের জলের কতখানি জোয়ারে শ্রোতাকে উজিয়ে তোলা যায় তারও পুরো খবর রাখে। কিন্তু আসলে যে-ছবিটি ও তোমার কাছে এঁকেছে বাবা যার সম্বন্ধে—তার সবটা না হ'লেও অন্ততঃ বারো আনা ওর মনগড়া। কিন্তু আসল ট্রাজেডি বাবার জীবনে আসে নি, এসেছে যার জীবনে। কারণ—মেয়েরা যতই কেন স্বাধীন হোক না, পুরুষের চেয়ে দুর্বল থাকবে চিরদিনই। তাই না থাকেও মেয়েদেরই বলতে হয়েছিল।

"কিন্তু জোর খাটানোর ফল ফলে তার প্রতিক্রিয়ায়। ও সব জানে, কেবল জানে না—মাকে কত দুঃখে চলতে হয়েছে তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধে—শুধু—শুধু বাবার মনের

মতনটি হ'তে—তাছাড়া আর কি? মা চেয়েছিলেন সত্যিই বাবাকে শ্রদ্ধা করতে—তাঁর নির্দেশে চলতে। কিন্তু বাবা মা-র হৃদয় ভেঙে দিয়েছেন দিনরাত মদ খেয়ে, মেয়েমানুষ নিয়ে, হুকুম ক'রে। নইলে কি আমার শান্তিময়ী লক্ষ্মী প্রতিমার মতন মা বছর বছর বিলেত যায় বলতাল করতে—রক্ত মাখে, সিগারেট খায়? বাবাই করেছেন মার এ-দুর্গতি—বিষবৃক্ষ নিজে হাতে বুনে সে-গাছে অমৃতফল না ফলার দুঃখে এখন মাটার সাজায় এ-বিড়ম্বনা কেন শুনি? —আর শুধু কি মা-র আত্মা ভেঙে তাকে ফ্যাশনেবল্ হবার কুশিক্ষা দেওয়া? শুধু কি জোর ক'রে লজ্জাবতী লতাকে বিলাসের টবে এনে দাঁড়ানো? না অমিত, বাবার অপরাধের তালিকার একটা সূচীপত্র বানানোও কঠিন। কী না করেছেন বাবা—মার সঙ্গে ব্যবহারে?—মার বিশ্বাস না রাখা, পদে পদে সকলের সামনে মর্যাদাহানি, দুটিশ্রীর পদে বসিয়েও পরিচারিকার মতন হুকুম করা—" উত্তেজিত হয়ে জলভরা চোখে ও বলতে লাগল: "মার দোষ নেই বলি না, কিন্তু একটা বলবই যে কাল সে-দৃশ্য দেখলে সেজন্যে ছাড়িক মা নন। আমি ছেলেবেলায়ও দেখেছি মার আসল স্বভাব কী ছিল। বিশ্বাস করবে কি যদি বলি যে, মা সে-সময়ে চেষ্টা করলেও পারতেন না একটি চড়া কথা বলতে?—বাদ-বিতণ্ডা শাপমন্যি দেওয়া তো দূরের কথা। তবে, এ-নবাবি আবহাওয়ার আর কী তুমি আশা করো?—মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্যে চাই উদার আলো হাওয়া। এসব নবাবি কুচক্রের হাজারো বিষবাষ্পে হৃদয়ের সব সুকুমার-বৃত্তিই যায় শুকিয়ে, কিম্বা বেঁচে থাকে জীবন্মৃত হ'য়ে। পদে পদে লুকোচুরি গোপনতা ষড়যন্ত্র, কানাঘুঁষো—সামনে পুষ্পবৃষ্টি আড়ালে শস্ত্রনিক্ষেপ—কী নয়? এ-আবহাওয়ায় কে মাকে টেনে আনল? বাবা কী ছিলেন আগে শুনেছ তো?"

"আই-সি-এস না?"

"হ্যাঁ। এর তুলনায় সে তো স্বর্গীয় জীবন ছিল। কেন সে-পথ ছেড়ে তিনি রাজার চাকরি নিলেন শুনি? অমিত, মানুষ নিজের নানা আচরণের নানা সাফাই-ই গাইতে পারে বুদ্ধি থাকলে—কিন্তু তাতে ক'রে তো কালো সাদা হয়ে ওঠে না।"

আমি ক্লিষ্টকণ্ঠে বললাম: সাফাইয়ের কথা তুললে যখন, আশা করি কিছু মনে করবে না যদি বলি এপক্ষে একটা কথা: শুনেছি সব ক্ষেত্রেই ভালো কর্মঠ লোকই নাকি রাজকার্যে হাত ক্ষের পরিণত বয়সে। তাই তোমার বাবা যদি আই-সি-এস ছেড়ে শেষটায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ক'রে থাকেন তাহ'লে তাতে কি সত্যিই খুব দোষ হয়?"

"হ'ত না যদি বাবার প্রকৃতি ডেস্পট-এর না হ'ত। তুমি জানো না বাবা কী ভীষণ ভালোবাসেন অথরিটি। সবাই ওঁকে মানুক—সবাই করবে শুধু হুকুম-তামিল। এযুগে আই-সি-এসের সে-রাজরাজত্ব তো আর নেই—তাই বাবা সে খোলা-হাওয়ার জীবন ছেড়ে এলেন এই কাঁটাকুটিল চক্রান্ত, নিমকহারামি আর হুজুর-হুজুরের রাজ্যে। অমিত, মনে করো কি, রাতদিন কুয়াশা জমলে আলোর ঝলমলিয়ে হ'তে পারে? কাজলের ঘরে দিনরাত কাটালে লাগবে না গায়ে কালি? মানুষের মন কত অপলক্ষ্য এ-ও কি তোমাকে ব'লে বোঝাতে হবে নতুন ক'রে? রাতদিন কিকিরফন্দির রাজ্যে বসবাস করলে সহজিয়া হতে পারে মানুষ?" ক্ষের চোখ মুছে: "মা আমার কী ছিলেন, আর আজ কী হয়েছেন! দেখলে যেন চেনাই যায় না। অথচ চোখের ওপর দেখতে হয়েছে আমাকে দিনের পর দিন—কী ভাবে মার দুর্গতি হয়েছে চাঁদমুখে নামতে নামতে। শুধু কি মাকে? মুর্ছনাকেও দেখেছি গালে রঙ মাখতে, decollete হ'তে স্কার্ট পরতে, চুরুট ফুঁকতে, টমটম হাঁকিয়ে নিরীহ পাখী শিকার করতে। এসবে ওকে দীক্ষা দিলে কে? সে-ও কি মা? আজও যদি মা ওকে ছেড়ে দেন পুরোপুরি বাবার হাতে কী অবস্থা ওর হবে কল্পনা করতেও আমি শিউরে উঠি, সত্যি বলছি। বাবার মধ্যে কি কোনো পদার্থ আছে ভাবো? মা বিবি হতে পারেন কিন্তু অমানুষ কখনোই করেন না। আর বাবা পশোন্নতির জন্যে মেয়েকেও—" ও আর পারল না চোখ চাকল আঁচলে।

* * *

এক একদিনের দৃশ্য যেন মনের পটে ছবি হ'য়ে রঙিয়ে থাকে। শমিতার সেই কান্নার দৃশ্যটি যেমন। কোনোদিনই হয়ত মুছে যাবে না এর স্মৃতি—সেই ওর প্রথম চোখে আঁচল দেওয়া···তারপর নিজের দু হাতে মুখ ডুবিয়ে কান্না নীরব কান্না···শুধু দেহের রেখায় সে-উচ্ছ্বাসের ঢেউ জেগে

ওঠা···সত্যি সে যে কী আশ্চর্য দৃশ্য, কী বলব ?—কারণ মনে হ'ল না একবারও যে আমার কিছু করণীয় আছে দেখা ছাড়া···মনে হ'ল যেন যে দেখছে—অর্থাৎ আমি—সে দৃশ্যের থেকে আলাদা·· শুধু সাক্ষী মাত্র · বিচ্ছিন্ন দ্রষ্টা। এরকম অনুভব পরে হয়েছে দু একবার কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল সেইদিনে—তাই বলছিলাম এ অভিজ্ঞতা আমার মনে চিরস্মরণীয় হ'য়েই থাকবে।'

• •

সোফিয়া : তারপর দাদা ?

অসিত : ঘোর কাটল ওর একটি দীর্ঘনিশ্বাসে। ওর দিকে চমকে তাকালাম : ও রক্তাভিটির পানে একদৃষ্টে চেয়ে। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললাম : "কিছু মনে কোরো না শর্মিতা, কথা কইতে পারি নি ব'লে। কিন্তু কী বলব বলো ?"

ও চোখ মুছে বলল : "বলতে যদি সত্যিই চাও তো বলো আমারে ও কী বলেছে। আমার এ মিনতি। তুমি না কোরো না, লক্ষ্মীটি !" আমি তখন আর পারলাম না, বললাম সব—মূর্ছা যা যা বলেছিল। শেষে বললাম : "এ আমার কাছে একটা সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা শর্মিতা। তাই এখনো ঠিক যেন ঠাহর পাই নি—একে কী ভাবে গ্রহণ করব।"

ও শুনে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "এই থেকেই তো বুঝতে পারছ যে—মেয়েরা যখন সংযম হারায় তখন··· কিন্তু থাক্, এ-দুঃখ পুরুষে বুঝবে কেমন ক'রে ?—না অসিত, দুঃখ পেয়ো না। আমি বলতে চাই নি যে···যে তোমরা স্বভাবে বেদরদী।"

আমি জোর করেই ঠাট্টার সুর ধরলাম : "বলতে হয় তো চাও নি, কিন্তু ভাবতে কি একটুও ভালো লাগে না ?"

"কী ? যে তোমরা বেদরদী ? অসিত, তা যদি লাগত তাহলে মনে করো কি তোমাকে বলতে পারতাম···যা···যা বলেছি ?···তবু—' বলে ও মুখ নিচু ক'রে রইল খানিকক্ষণ তার পরে আমার দিকে চেয়ে মুখে শুষ্ক হাসি টেনে বলল : "তবু অসিত মনে হয় যে, হয় ত···না বললেই ভালো ছিল। কেন যে বলে ফেললাম···" কথাটা ওর শেষ হ'ল না।

আমি ওর একটি হাত কুড়িয়ে নিয়ে বললাম : "আমাকে এসব বলার জন্যে তোমাকে কোনোদিন পরিতাপ করতে হবে না শর্মিতা।"

ও আমার হাত থেকে ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটু চুপ ক'রে রইল পরে বলল : "আমি কালই সাধুরির সঙ্গে রওনা হব কাশ্মীর।"

"কাশ্মীর ? কেন ?"

"এমনি। কিন্তু সেকথা থাক্। আমি তোমার কাছে একটি কথা চাই। দেবে ?"

"কী ?"

"যা যা তোমাকে হঠাৎ ব'লে ফেলেছি বলবে না কাউকে—না, কাউকেই না।"

"কিন্তু কাউকে না বললেও যদি কেউ কেউ টের পেয়ে থাকে—তাহ'লে ?" বললাম ঠাট্টা ক'রে। কেউ কেউ কথাটার ওপর জোর দিয়ে।

"না—টের পায় নি। মূর্ছা আজ ঘর থেকে বেরোয় নি। শোনো—আমি এ কথাটুকু চাইছি কেন, তার কারণ হয়ত পরে কোনো একদিন বুঝবে।"

আমার হাসি এল : "এ কারণটা আন্দাজ করতেও কি খুব বেশি কল্পনার দরকার শর্মিতা ?"

ও হাসল না, বলল : "যদি বলি—হাঁ ?"

"তাহ'লে আমিও পিঠ পিঠ বলব—না।"

শর্মিতা এবার হাসল, কিন্তু সে-হাসিতে আলোর চিহ্নও নেই, বলল : "না অসিত, একথা গোপন রাখতে চাই কেন তুমি আন্দাজ করতে পারবে না—যদি না আন্দাজ করতে পারো কাল রাতে বাবা-মার মধ্যে কী নিয়ে তুমুল ঝগড়া হয়েছিল।"

"ঝগড়া ?"

"ঝগড়ার চেয়েও বেশি—সে ঝড়।"

"কী এমন ব্যাপার শুনি ?"

"আমাদের বিয়ে। আরো শুনতে চাও ?—বাবা চান তোমাকে আমার জন্যে আর মা—মূর্ছার জন্যে। বলো তো এবার বুকে হাত দিয়ে : পারতে এ কল্পনা করতে ?" বলতে বলতে ওর চোখে জল উপচে পড়ল : "কী হীন মেয়েদের জীবন, অসিত ! আমরা যেন খেলার পুতুল—যেন আমাদের হৃদয় ব'লে, রুচি ব'লে, আদর্শ ব'লে কিছুই

নেই—আছে শুধু একটি চরম ও পরম লক্ষ্য—ব্রহ্মবিহার।" ব'লে চোখ মুছল।

নির্বাক হ'তে হ'ল বৈকি। কারণ এ যে হ'তে পারে আমি সত্যিই ভাবতে পারি নি। বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, আমাকে স্থী চাইলেন মূর্ছনার জন্যে, আর স্বামী চাইলেন শর্মিতার জন্যে—এ শুনে কেমন যেন ধাঁধা লাগল। তাছাড়া ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে আমারি দোষে ভাবতেও মন আমার কালো হয়ে এল আত্ম-গ্লানিতে।

আমার কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে শর্মিতা হঠাৎ আমার হাত টেনে নিল নিজের দুটি হাতের মধ্যে: "আমাকে ক্ষমা কোরো অসিত, কোঁকের মাথায় ব'লে ফেলেছি। সত্যি, কেন যে তোমাকে ব'লে ফেললাম এমন আজগুবি—আমি জানি না। কিন্তু এটা জানি যে, আমার মধ্যে এমন কোনো মোহ নেই যার চোখে আমি তোমাকে হারাতে পারি—যদিও মূর্ছনার কাছে হয়ত অন্যরকম শুনে থাকবেন···আর তা-ই যদি তুমি বিশ্বাস করো···" কের ওর চোখে জল ভ'রে এল···"হোক্···তাতেই বা কী আসে যায়?"

আমি আর পারলাম না, আদর করে বললাম ওর দুটি হাতই আমার কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে: "নিজেকে কেন অকারণ ক্ষতবিক্ষত করছ শর্মিতা? তোমাকে আমি কত শ্রদ্ধা করি সত্যিই কি তোমার কাছে অজানা?—তোমাকে অবিশ্বাস করব এমন কথা কী ক'রে তুমি ভাবতে পারলে?—বিশেষ আজ তুমি আমাকে যা যা বললে তার পরেও কি তোমাকে আমি সামান্য মেয়ে ভাবতে পারি?"

"ভুল করছ অসিত," ও বলল ম্লান কণ্ঠে, "আমি সামান্য মেয়ে ব'লেই এ পারলাম। অসামান্যা হ'লে প্রতিযোগিতার উচ্চাশা থাকত। তবে কি জানো অসিত? জীবন আমার কাছে এমন কিছু কাম্য মনে হয় না যার জন্যে এত কাড়াকাড়ি কামাকাটি সাজে। তাছাড়া—"

"কী?"

ও একটু ইতস্তত ক'রে বলল: "থাক্।"

"না বলতেই হবে—একটা ব'লে—"

ও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল: "আমি মন্ত্র নিয়েছি।"

আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: "মন্ত্র নিয়েছ? কার কাছে? সাধুজির?"

ও বলল: "হাঁ। তবে স্বপ্নে।" ব'লে একটু থেমে: "জানি না এসব তুমি বিশ্বাস করো কি না।"

"আমি স্থির কণ্ঠে বললাম: "শর্মিতা! তোমাকে এতদিন বলি নি কি যে এসব ব্যাপারে বিশ্বাস করবার শক্তি আমার কম হ'তে পারে কিন্তু ইচ্ছা প্রবল ছেলেবেলা থেকেই?"

ওর চোখ আনন্দে জ্বলে উঠল যেন, বলল: "বলেছিলে অসিত—কেবল—"

আমি ওর দিকে চেয়ে বললাম: "অত কুণ্ঠার কারণ নেই শর্মিতা। আমি মানুষ হয়েছি এমন গুরু ও কবির কাছে যাঁর স্মরণে ভক্তি আলো হ'য়ে উঠেছিল কবিত্বের প্রসাদে—যাঁর গান আজো আমার জীবনের পরম সম্পদ।"

"সত্যি?—আচ্ছা অসিত, একটা কথা বলবে? তুমি সংসারী হও নি কি ঐ জন্যেই?"

"কী জন্যে জানিনা নিশ্চয় ক'রে। তবে এটুকু জানি যে, সবাই সংসারী হ'তে পারে না—কেউ কেউ থাকবেই থাকবে অসংসারী—যাদের ভালো লাগবে না সংসারের চলতি ছন্দ।"

"তোমার গুরুকরণ হয়েছে?"

"না। তবে গুরুকরণে আমার বেশি আস্থা নেই—গুরুবাদ কথাটা পর্যন্ত আমার কাছে অসহ্য। তাছাড়া যে-সে গুরুবরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"কী রকম গুরু তোমার বরণীয় বলবে?"

"যাঁকে দেখে মনে হবে তিনি বলতে পারেন—বেদাহ-মেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

ও একটু চুপ ক'রে রইল মুখ নিচু ক'রে, পরে বলল হঠাৎ: "যদি তেমন গুরুর মুখোমুখি হও কোনো দিন?"

"তাহ'লে কী হবে কেমন ক'রে বলব বলো আগে থেকে? আমি জানি না তো এ-পথের কিছুই—শুধু এই-টুকু ছাড়া যে, তবু এই পথেই আমাকে যেতে হবে।" ব'লে একটু থেমে: "আর তুমি যখন বললে তখন আমিও বলি: সাধুজিই আমাকে বলেছেন যে, আমার গুরু নিশ্চিই আছেন, সময় হ'লেই দেখা দেবেন, যেমন তোমায় দিয়েছেন।"

"আনন্দে ওর মুখ চোখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। ব'লেই এবার—আমার দুই হাতই ওর হাতের মধ্যে টেনে নিল: "তোমার জন্যে আমি প্রার্থনা করব অসিত, যেন সেদিন তোমার শীঘ্রই আসে।"

আমি আর্দ্রকণ্ঠে বললাম: "কোরো শর্মিতা। কারণ আমি স্বভাবে ঘোর সন্দিগ্ধ—অবিশ্বাসী—হ'লেও বিশ্বাস করি যে, নিঃস্বার্থ প্রার্থনার ফল ফলেই কোনো না কোনো দিন।"

ও একটু চুপ ক'রে রইল, পরে বলল: "আচ্ছা, গুরু নির্দিষ্ট থাকেন একথার মানে কি?"

আমি হাসলাম: "আমি কি সর্বজ্ঞ না মুশকিলাশান?"

"তবু?"

"একটা বিশ্বাসের কথা শুধু বলতে পারি।"

"কি?"

"তোমার গুরুই ব'লে দেবেন—সময় হ'লেই।"

"দেবেন?" ওর চোখে আলো জ্বলে উঠল ফের। "তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক অসিত।" বলতে বলতে ফের ওর চোখে জল এল। বলল: "আমার ভালো লাগে না অসিত।"

আমি কোমল কণ্ঠে বললাম: "কী ভালো লাগে না?"

"কোনো কিছুই: সাজগোজ, খেলাধুলো, সাড়িঘোড়া, পার্টিক্লাব—হ্যাঁ একমাত্র গানবাজনা ভালো লাগে—কেন জানি না। তবে তাতেও মন ভ'রে ওঠে কই? আমি নানা সময়ে নানা সুর শুনি, জানো?"

"সে কি!"

"হ্যাঁ। তুমি শোনো না কখনো?"

"কী রকম সুর শোনো জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"অন্যরকম। দেখিও অনেক কিছু।"

"খোলাচোখে না ধ্যানে?"

"কখনো খোলাচোখে সামনে, কখনো চোখ বুঁজে ধ্যানে—স্বপ্নে তো দেখিই—আলো, মূর্তি—আগুনের সমুদ্র—কত কী।"

"তবে আর তোমার ওর কী শর্মিতা? এত শত অবলাদ গ্লানিই বা আসে কেন?"

"কি জানি! না—ভুল বলেছি। অবসাদ আসে কেন জানি কিছু কিছু—অনুভবে।"

"কেন?"

"জীবনে সবাই যা বাঞ্ছনীয় মনে করে আমার একটুও ভালো লাগে না ব'লে। আরো এইজন্যে যে, যা সত্যি ভালো লাগে তা আভাসে ফুটতে না ফুটতে যায় মিলিয়ে কোথায় যে! কেন যায় অসিত? কেন জীবনে এত হাতড়ে বেড়ানো, কেন জীবনে সবাই এত খোঁজে অথচ পায় না?"

আমার বুকের মধ্যে বাজিয়ে উঠল, বললাম: "সত্যি কি খোঁজে শর্মিতা? আমার মনে হয় খুঁজলে পেত।"

"কই? আমি তো খুঁজি—"

"খুঁজতে না খুঁজতেই কি মেলে কখনো। ডুব দিয়ে পৌঁছতে হবে যে অতল তলে—মণি তো ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে বেড়ায় না। সাধুজি পরশুই তো গাইছিলেন মনে নেই?—

"ডুব দেরে মন কালী ব'লে হৃদ্‌রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য—যদি দুচার ডুবে ধন না মেলে।"

"সত্যি পাওয়া যায় অসিত—ডুবুরি হ'লে।" ও আমার দুই হাত চেপে ধরল সে যে কী আগ্রহে! "সত্যি বলছ?"

"আমি মুগ্ধ হলাম ওর এই ব্যাকুলতা দেখে কিন্তু একটু বিপন্নও বোধ করলাম বৈ কি। বললাম: "তুমি আমার কাছে যেন আর্জি জানাচ্ছ শর্মিতা। বাস্তবিক পক্ষে এবিষয়ে তোমার অনুভবের গভীরতা যখন এত বেশি—"

ও ছেলেমানুষি অভিমানের সুরে বলে উঠল: "ছাই গভীরতা।—এসব তো হাল্কা মেঘের যাওয়া-আসা—এই আছে এই নেই। স্থায়ী কিছুই পাই নি আমি এসব থেকে। যা একটু আধটু আচমকা ভেসে আসে স্বপ্নে-পাওয়া সুগন্ধের মতন, হাওয়ার পাখায় উড়ে-আসা চাঁপির ঘ্রাণের মতন দেখতে না দেখতে কোথায় যে যায় মিলিয়ে! যেমি সোনা—দুহাতে চেপে ধরি কত যত্নে—মুঠো খুলি—সব বালি, বালি, ধুলো মাটি অসিত, একেবারে ফাঁকা—ফাঁকি। আলো এখানে নিত্যই খেলে ছায়াবাজি—সোনার হরিণ ডাকে কালো কাঁটার বনে—দু'পা যেতে না যেতে উঠি হাঁপিয়ে। প্রদীপ জ্বলে ক্ষণিকের জন্যে—বুঝি আঁধারকেই আরো গাঢ় ক'রে ধরতে। এই-ই কি জীবন, অসিত? এম্‌নি ক'রেই কি বেলা ব'য়ে যাবে—যা চাই নি তাকে

নিয়েই মিথ্যে কাটাব ইহকালটা? কী আছে এ তুচ্ছ বিলাসের ঝিকিমিকিতে বলো দেখি? কী নিয়ে দিন কাটায় পনের আনা মানুষ? মানি হয় না তাদের?—যখন অন্তরের অতল থেকে কেবলই বাঁশি ডাকে এমন রাতের পানে যেখানে যা সত্যি চাই তা অফুরন্ত—তার নাম প্রেমই দাও, আনন্দই দাও বা জ্ঞানই দাও।—কী—? হাসছ মনে মনে, না?"

আমার বুকের মধ্যে সিন্ধু দুলে উঠল! এ যে আমার বড় চেনা সুর—অথচ এমন ক'রে তো আমার নিজের হৃদয়ের বাঁশিতেও বাজে নি এতদিন! কে ও-ভাগ্যবতী যে সব থাকতেও এ সুরের সন্ধান পেয়েছে এমন নিবিড় ভাবে! বললাম গাঢ় কণ্ঠে: "শমিতা! আমি সত্যি কথা খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি সুভাগিনী—যে সব পেয়েও কিছুই চাইলে না। এ শূন্যতা দুর্লভ সম্পদ জেনো। প্রকৃতিতে আমি অন্ধ অন্ধ অবিশ্বাসী আত্মাভিমানী—ব্যর্থ সম্পদ নিয়ে গৌরব করি—কেন জানি না। কেবল এইটুকু জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে যে, হাতের লক্ষ্যকে যে পায়ে ঠেলে সে-ই ধন্য—মাটি কামড়ে যে প'ড়ে থাকে শুধু যে আকাশ তার কাছে থেকেও নেই তাই নয় মাটিও তার টলমল ক'রে ওঠে। তাই আমিও শুনতে পেয়েছি—তাই জানি সে-ডাকে সাড়া দেওয়া কত কঠিন।···আর সেই জন্যেই তোমাকে বলবার কিছু খুঁজে পাচ্ছি না···অন্ধকারকে আলো নয় ব'লে যে চিনেছে তার পথে আলো নিজে থেকে এসে ধরে বাতি—আর কারুর নির্দেশের দরকার নেই। আমি তোমার জন্যে কেবল প্রার্থনা করতে পারি। সে-প্রার্থনা এই যে, যে-কাঁটাপথে চলতে তুমি পা বাড়িয়েছ—সেপথেই যেন তুমি চলতে পারো—সহজ ফুলশয্যার পথ ছেড়ে। কারণ তাহলে পথের পাথেয় একা তুমি পাবে না ছিটে ফোঁটায় আমাদেরো কিছু মিলবে যেখানেই থাকি।"

কথাটা শেষ হ'ল না, শমিতা হঠাৎ ফিরিয়ে "কে?" ব'লে উঠল।

"সকালবেলায় এমন সোনার আলোয়ও মানুষ চিনতে পারছ না দিদি?"

আমি চমকে উঠে বললাম: "মুহূর্না!" সঙ্গে সঙ্গে শমিতার মুখ শাদা হ'য়ে গেল। "তুই? হঠাৎ এ সময়ে?"

মুহূর্না হাসল। "এসময়ে নয় দিদি অ-সময়ে-জানি। কিন্তু কী করব বলো—মা তোমাকে ডাকছেন বিশেষ দরকার—আশা করি ক্ষমা পাব।" [ক্রমশঃ

জীবন তৃষ্ণা

শক্তি বসাক

হয়ত পাব না ফিরে এ জীবনে সেইসব দিন
গাছের ছায়ার নীচে—
নিরাপদ ঘাসের জীবন,
মনস্কে জ্বলে ওঠে সেই মুখ,
ঘাসের মতন নরম সবুজ
ছায়ার আশ্রয়ে যার কাটিয়েছি
বহু রাত্রি দিন।
প্রেমিকার মৃত্যুর পর গাছের ছায়ার মত ছায়া
কোথাও খুঁজিনি আমি।
জানতাম সে ছায়া দুর্লভ।
নির্মম পার্থিব দাহ যন্ত্রণাদায়ক অনুভব
যখন ছড়িয়ে দিল এ জীবনে,
জ্বলে গেল কায়া, তখন পেলাম তাকে।
বনহরিণীর ভাঙাটে বাসায়
থাকত স্বামীর সাথে নিরুপম সোনার প্রতিমা,
জীবনের চিত্ত যার জানা ছিল স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা,
জানা ছিল নারীর জীবন পূর্ণ উৎসর্গে সেবায়।
বৃক্ষের মতন ধারা—
সেই শুচি কয় মহিলার
দেহের ছায়ায় আজো সঞ্জীবিত পৃথিবী, সংসার।

দর্শন লাভ ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ গত ৬ মাসেরও অধিককাল বারাকপুরে ১৮নং River side রোডে শ্রীযুক্ত রাম টাপুরিয়ার বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। আমাদের সহিত তাঁহার পরিচয় প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে। বহুবার তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান ভুমুরদহ গ্রামে শ্রীরাম আশ্রমে তাঁহাকে দর্শন করিবার ও তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। কলিকাতায়ও কয়েকটি সভায় তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি যখন মেমারিতে কয়েকমাস বাস করিয়াছিলেন সে সময়ে একাধিকবার তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলাম।

একবার তাঁহার দর্শন লাভের পর তাঁহার কৃপায় কয়েকদিন এক অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি সর্ব্বদা দেহমনকে যেন অন্য কোন লোকে লইয়া যাইত। সে কথা একবার একটি রচনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার পরম আনন্দের কথা ঠাকুর সীতারাম দাস যেখানেই থাকুন না কেন, আমার সংবাদ জানিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন।

পুরীধামে অবস্থানকালে কয়েকবার আমাকে পুরীতে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন. কিন্তু আমি অকাজ ও কুকাজের মানুষ, আমার ভাগ্যে তাঁহার আদেশ পালন করা সম্ভব হয় নাই। জব্বলপুরে মার্ব্বেল পাহাড়ের নিকট নর্ম্মদা তীরে ঠাকুর বহুক বৎসর বাস করিয়া সাধনায় দিনযাপন করিয়াছেন। সেখানকার আহ্বানেও আমি সাড়া দিতে পারি নাই। কেন জানি না জীবনে বহু সৌভাগ্য লাভ করিলেও ধর্ম্ম জীবনযাপনের প্রতি আকর্ষণ আমাকে সে পথে লইয়া যায় নাই।

সীতারামদাস দীর্ঘকাল কানপুরের নিকট বিঠুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। সেখান হইতে বহু পত্র লিখিয়াছেন। বহুলোককে কলিকাতা হইতে যাইবার সময় আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমি এমনই হতভাগ্য যে পরমেশ্বরের কৃপা লাভ করি নাই। আমার ভাগ্যে সীতারাম দর্শন হয় নাই।

হঠাৎ সৌভাগ্যের উদয় হইল। খবর পাইলাম শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথ অসুস্থ হইয়া বারাকপুরে গঙ্গাতীরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার ঠিকানা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া যখন নানাভাবে চেষ্টা করিতেছি সেই সময়ে এক শুক্রবারে টেলিফোনে খবর পাইলাম ঠাকুর আসিয়া বারাকপুরে ১৮নং River Side Road-এ বাস করিতেছেন এবং আমাকে সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

পরদিন শনিবার একাকী কলিকাতা হইতে সোজা তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সে সময়ে তিনি সারাদিন গঙ্গাতীরে একটি পাতার কুটিরে বাস করিতেন। নিকটে নাম সঙ্কীর্ত্তন হইত ও সারাদিন তিনি গঙ্গার দিকে তাকাইয়া শুইয়া থাকিতেন। প্রথমদিন অন্যান্য কথার পর তিনি সংস্কৃত ও বাংলায় গঙ্গা মাহাত্ম্য আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়দিনে আমার পরম স্নেহভাজন ভাগিনেয় শ্রীমান দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সহিত গিয়াছিল। তাহার নিকট ঠাকুরের গঙ্গাভক্তি গল্প করায় দিলীপকুমার তাহার স্বরচিত ১০।১২টি কবিতা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল এবং কথাপ্রসঙ্গে সেগুলি পড়িয়া ঠাকুরকে শুনাইয়াছিল। দিলীপকুমার সীতারামদাস সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়া তাহাও ঠাকুরকে শুনাইয়া কবিতাটি ঠাকুরকে দিয়া আসিয়াছিল।

এই সময়ে বহুদিন বিকালে বা সন্ধ্যায় তাঁহার নিকট যাইয়া কিছু সময় অতিবাহিত করিয়া আসিতাম এবং

সন্ধ্যায় উপাসনায় যোগদান করিতাম। আমার সঙ্গে অনেকেই গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মহিষাদলপুর জোলানন্দ আশ্রমের স্বামী জ্যোতিষ্কানন্দ গিরি, খড়দহের শ্রীতারাপতি ভট্টাচার্য্য, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরের শিষ্য খুলনার নিবাসী শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমান দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় সকলদিনই আমার সঙ্গী হইয়া আমার সঙ্গে যাইত। ঠাকুরের কৃপা লাভ উভয়ের বেশীদিন স্থায়ী হইল না, ৪ঠা আগষ্ট তারিখে মটর দুর্ঘটনায় আহত হইলাম ফলে দুসপ্তাহকাল প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থায় বাড়ীতে আটক থাকিতে হইল। সেই সংবাদ পাইয়া ঠাকুর প্রতি সপ্তাহে একবার বা দুইবার করিয়া আমার গৃহে লোক পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই কৃপা লাভে ধন্য হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার কথা চিন্তা করিয়াছি এবং এই অসাধারণ স্নেহ-কৃপার জন্য সর্ব্বদা অন্তর বিগলিত করিয়াছি।

যখন অল্প একটু সুস্থ হইয়াছি একদিন সৌভাগ্য ক্রমে অবসর প্রাপ্ত হইল। দ্বিপ্রহরে ঠাকুর দুইজন ভক্তসহ গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। তখনই সেই গাড়ীতে আমাকে বারাকপুরে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। বহুক্ষণ তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহার স্নেহ, কৃপার কথা স্মরণ করিয়া ফিরিয়া আসিব—গাড়ীর নিকটে আসিয়া দেখি ঠাকুর আমার আগে আসিয়া চালকের পাশে বসিয়া আছেন। তুলিলাম তিনি আমাকে পৌঁছিয়া দিয়া আশ্রম-বাজারে মহামিলন মঠে যাইবেন। গাড়ীতে নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। কাজেই কথা বলার সুযোগ ছিল না।

গাড়ী আগরপাড়া ষ্টেশনতলায় আসিলে চালককে গাড়ী থামাইতে বলিলাম এবং নিজে গাড়ী হইতে নামিবার উদ্যোগ করিলাম। ঠাকুর তাহাতে আপত্তি করিলেন। গাড়ী আমার বাড়ীর নিকট লইয়া যাইতে বলিলেন। গাড়ী শিয়ারী বৈষ্ণব ঘাট রোড দিয়া পল্লির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের সদর দরজায় উপস্থিত হইল। আমি প্রণাম করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে ঠাকুর একজন সঙ্গীকে আদেশ করিলেন সে যেন আমাকে আমার শয়ন ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসে। গাড়ীর শব্দ শুনিয়া আমার ত্রাপ্তণী পথ পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার অদৃষ্টেও ঠাকুরের দর্শন ও পদধূলি গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হইল।

তাহার পর বহুবার বারাকপুরে তাঁহার দর্শন ও সান্নিধ্য-লাভ ঘটিয়াছে। ঐ সময়ে শ্রীশ্রীনীতারাম দাসের দেহে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং শুনিয়াছি তিনি হাসি মুখে চিকিৎসককে অস্ত্র চালাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টা তাঁহাকে আচ্ছন্ন থাকিতে দেখা গিয়াছিল, তাহার পর সকলের সহিত তিনি আলাপ আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন। গঙ্গাতীরের বাস ত্যাগ করিয়া সে সময়ে ঠাকুরকে দ্বিতলের ঘরে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে।

তিনি প্রকৃত সাধক। কাজেই বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন পছন্দ করেন না। কুটিরে শুধু কাঠের উপর একটা কম্বল পাতিয়া তিনি সময় কাটাইতেন। ঘরের মধ্যেও তাঁহার অধিক পরিমাণ শয্যার প্রয়োজন হইতনা। তিনি সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন ও তাহাতেই নিজেকে নিমগ্ন রাখিতেন।

তাহার পর ১লা অক্টোবর মহালক্ষ্মী পূজার দিন হইতে প্রত্যহ আলমবাজার মহামিলন মঠে যজ্ঞ ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহা দুই মাসের অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যহ সকালে নটার সময় বারাকপুর হইতে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতেন এবং রাত্রি ৯টার পর বিশ্রামের জন্য বারাকপুরে গমন করিতেন। বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলে অপরাহ্ণে প্রসাদ গ্রহণের পর ২।১ ঘণ্টা বালীতে যাইয়া শ্রীমতী লক্ষ্মীধাতার গৃহে অবসর গ্রহণ করিয়া আসিতেন।

যজ্ঞকার্য্যে প্রতিদিন সহস্রাধিক টাকা ব্যয়িত হইত এবং প্রায় এক সহস্রলোক প্রতিদিন অপরাহ্ণে তথায় প্রসাদ গ্রহণ করিত। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনও ঐ সময় কয়েকদিন মহামিলন মঠে আগমন করিয়া-ছিলেন। এক একদিন বিশেষ করিয়া ছুটির দিন যজ্ঞস্থলে ১০ হাজার নরনারী সমবেত হইতে দেখা গিয়াছে। ঐ স্থানেই কয়েকদিন দীক্ষা প্রার্থীদিগকে দীক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সকল দীক্ষার্থীর মস্তক স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিতেন।

মহামিলন মঠের জন্য B. T. Road হইতে দক্ষিণেশ্বর যাইবার পথে দক্ষিণ পার্শ্বে সাত বিঘা জমি সংগৃহীত

হইয়াছে। ঐ স্থানে মন্দির যজ্ঞগৃহ, নাটমন্দির, অতিথিশালা ছাপাখানার জন্য গৃহ, পুস্তক প্রকাশের গৃহ প্রভৃতি শীঘ্রই নির্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সকলেই জানেন শ্রীশ্রীঠাকুর 'দেববাণী' নামক বাংলা মাসিকপত্র, 'প্রণব-পারিজাত' নামক সংস্কৃত মাসিকপত্র এবং 'মাদার' নামক ইংরাজী মাসিকপত্র নিয়মিতভাবে গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রকাশ করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার প্রেরণায় 'আর্যশাস্ত্র' প্রকাশিত হইতেছে। আর্যশাস্ত্র নাম দিয়া মনুসংহিতা প্রভৃতি সকল সংহিতা গ্রন্থ ১৮ খণ্ডে বাল্মিকী রচিত মূল সংস্কৃত রামায়ণের বাংলা প্রকাশ শেষ হইয়াছে। বর্তমানে বিষ্ণুপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগ নিয়মিত অর্থদান করায় সুলভে আর্যশাস্ত্র প্রচার সম্ভব হইতেছে। বর্তমান অবস্থায় মাত্র ২৭ টাকায় সমগ্র মূল রামায়ণ ও তাহার বঙ্গানুবাদ সত্যই অসাধারণ ব্যাপার। অন্যান্য আর্যশাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐ এক কথা বলা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী এবং তাঁহার ধারণা সংস্কৃত ভাষায় আর্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার না হইলে হিন্দুধর্ম রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। তিনি মহামিলন মঠে অবস্থানকালে ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন এবং তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণের দ্বারা কয়েক সহস্র আর্যশাস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীশ্রীনীতারামদাস (১) বেদ-ভগবান, (২) জয় ভগবান, (৩) জয় মা, (৪) আলোর দেশ, (৫) তত্ত্বতরণ, (৬) জয় গুরু প্রভৃতি ছোট ছোট পুস্তক প্রকাশ করিয়া অতি অল্প মূল্যে —তিন, চার, পাঁচ, ছয় আনা মূল্যে সেগুলি প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ পুস্তকগুলি পাঠ করিলে পাঠকের ধর্ম বিশ্বাস বাড়িবে এবং পাঠকদের সৎকর্মে প্রবৃত্তি করিয়া যাইবে।

তিনি সারাজীবন অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বেদ-বেদান্ত, পুরাণ, প্রভৃতিতে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া খুব সহজ ভাষায় সর্বসাধারণের জন্য বাংলা পুস্তক লিখিয়া থাকেন। বর্তমানে সেগুলি হিন্দী, উড়িয়া, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হইয়া সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইতেছে। সীতারাম তাঁহার তপস্যা ও আরাধনার দ্বারা ভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং নিজে ধর্ম আচরণ করিয়া ও ধর্ম প্রচার করিয়া সকলকে ধর্মের আদর্শ শিক্ষা দিতেছেন। বর্তমান যুগে মানুষের মন হইতে ধর্মভাব চলিয়া যাওয়ায় তিনি একান্তভাবে ধর্মভাব প্রচারে ব্রতী রহিয়াছেন।

বৃদ্ধ বয়সে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া আহার, নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করিয়া তিনি কাজ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই আদর্শ ভারতের সকল স্থানের লোকের দ্বারা প্রশংসিত হইতেছে এবং সকলে বিশ্বাস করেন তাঁহার কার্য বর্তমান জগতের দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটাইতে সমর্থ হইবে।

পরিচিতাকে

চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

চলেছ কোথায় ক্লান্ত পথিক
অভিমান ভুলে দেখ ফিরিক
যাতনায় ঘেরা বেদনায় ভরপুর।
তবুও বিবাগী একমনে হায়
ছুটেছ আবেগে ত্যজি আমায়
তুচ্ছ করিয়া সংসার সুমধুর!

রাখ হে বন্ধু মিনতি আমার
এসো ফিরে এসো তুমি আরবার
এ বনিতার বাহুবন্ধনে কাছে;
নিম্নে ধরণী ঊর্ধ্বে গগন
করিবে না তব দুঃখ হরণ
বিরাটের মাঝে অসীম হতাশা আছে।

ফিরিব না ওগো তরুণী তোমার আদরের অযনে;
সুদূরের ডাকে এগিয়েই যাব আমিকে মুক্তমনে।

সালমা

মানসী মুখোপাধ্যায়

রবিনসন্ রোডে সেন্ট্রাল টেলীগ্রাফ অফিসে 'তার' করতে এসে রবার্টের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই প্রথম দেখা।

আমার হাতে খুশির সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্রস্তাব করল, আমাদের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর এই সাক্ষাৎকে চল, লম্বা "ড্রাইভ্" দিয়ে "সেলিব্রেট" করা যাক।

আমি এক কথায় রাজি।

কলিয়ার-কের ভেতর দিয়ে চেঙ্গাদীর সামনে আসতে আমায় বলল, এসো কিছু মার্কেটিং করা যাক।

ও কাজে আমি কুঁড়ের শিরোমণি। জানাই, একদিনেই সব না সেরে ধীরে সুস্থে করা যাবে। চল, আজ শুধু বেড়ান যাক।

সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। 'ব্যাঙ্ক অফ্ চায়না' পেছনে ফেলে, সিঙ্গাপুর নদীর ব্রীজ পার হয়ে, 'ক্যাথে' সিনেমা ছাড়িয়ে গাড়ী যেন মনের আনন্দে ছুটে চলেছে। এয়ারপোর্ট ক্রশ করে, কাতং-এর রাস্তা ধরে আমরা সমুদ্রের ধারে এসে পড়লুম। গ্রেট রঙের সুন্দর রাস্তা সমুদ্রের ধার দিয়ে চলে গেছে। রাস্তার পাশে ও সমুদ্রের কোলে কোথাও বিরাট বিচিত্র ছাতার নিচে, কোথাও 'ওপেন এয়ারে' বসে লোকেরা 'চাও-চাও', 'ফ্রুট স্যালাড্' খাচ্ছে বা নানা রকম ড্রিঙ্ক করছে।

রবার্ট গাড়ীর স্পীড কমিয়ে স-প্রশ্নে আমার দিকে তাকাল, অর্থাৎ খাবে নাকি?

জানালুম, ফেরার পথে দেখা যাবে। এখন চল।

বায়ু কোটে যান এগিয়ে চলল। ক্রমে সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন ক্ষীণ হয়ে এলো। এবার নারকোল গাছের জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলেছি। হাওয়ায় গাছেদের মাথা এপাশে-ওপাশে দুলছে, যেন একদল অবাধ্য ছেলে কেবলি মাথা নেড়ে 'না না' বলছে।

তাদের প্রতিবাদ না শুনে আমরা বেরিয়ে গেলুম। একটু সমুদ্রের রেখার মত তারা মিলিয়ে গেল।

এবার সেই জেল দেখা গেল যেখানে যুদ্ধের পর মানুষদের গরু ভেড়ার মত পালে পালে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

রবার্টকে সে কথা বলতে সে চুপ করে শুনল।

খানিক পরে আমিই আবার বললুম, কী দিনই গেছে সে দিন। ভাগ্যে যুদ্ধ লাগার বেশ আগে চলে গেছলুম। রবার্ট, তুমি তখন কোথায় ছিলে জানা হয়নি ত?

এখানেই ছিলুম। নিচু গলায় জানাল। মানে তাঞ্জংকাতং রোডের সেই বাড়ীতে? হ্যাঁ, এখনো সেই বাড়ীতে আছি। কী সাংঘাতিক! যুদ্ধের সময় কী করে ছিলে? ···কী করলে?···কী দেখলে?···

সে চুপ। খানিক পরে যেন নিজের মনে বলল, কি দেখলুম—না?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কী দেখলে? অধৈর্য হয়ে তার দিকে তাকাই।

সে আবার চুপ হয়ে যায়। তারপর অন্যমনস্ক।

হঠাৎ লক্ষ্য করি গাড়ী যেন পাগলের মত এ রাস্তা ও রাস্তা করতে করতে এক নির্জন রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। ষ্টীয়ারিং যেন আর রবার্টের বশে নেই।

আমি প্রথমে তাকে সাবধান করে দিই। সে তবু 'ডোন্ট কেয়ার' ভাবে চালিয়ে যায়। পরে ঠাট্টা করে কিছু বলতে গেলে তার মুখ ফ্যাকাশে রূপ ধারণ করে। তারপর —ঠিক তারপরেই ঘটল সেই ঘটনা। একটি বিশেষ জায়গায় এসে যেন এক অদৃশ্য কোনো কঠিন বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গাড়ী হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল।

একটু অস্থির হয়ে পড়লুম। ব্যস্ত হয়ে খোঁজ করলুম, রবার্ট, কী হল ?

একটি ক্লান্ত জীবের মত গাড়ীর সীট-এ এলিয়ে পড়ে ঠাণ্ডা, নিচু স্বরে জবাব দিল, আমিই কী জানি কী হল ?

চা খেয়ে সাড়ে চারটের সময় বেরিয়েছিলুম। ঘড়িতে এখন প্রায় ছটা। শীতের সন্ধ্যে বলে এখনি প্রায় অন্ধকার। উঁচু জমির ওপর দৈত্যের মত লম্বা লম্বা রবার গাছ। দু-পাশের ঘন জঙ্গল যেন ভয়ে জড়সড়। কুয়াশা ঘেরা এক ফালি চাঁদ যেন আকাশের এক রহস্যময় হাসি।

ঠিক এমনি পরিবেশে রবার্ট ভূতে পাওয়া লোকের মত বকবক সুরু করে দিল।

বললুম, সিঙ্গাপুরের এ জায়গায় আগে কখনো আসি-নি, অচেনা মনে হচ্ছে।

রবার্ট জানাল, আমার কিন্তু এ জায়গা খুব চেনা।

তাই এখানে এসেছ ?

সে আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলতে লাগল, সিঙ্গাপুর তখন জাপানীরা কব্জা করে নিয়েছে। অধিকার বিস্তারের পর তাদের কাজ হল ইংরেজ, ইউরেসিয়ান ও চীনে খুঁজে বার করা। ধূর্ত ইংরাজ আগেই পালিয়েছিল। ধরা পড়লুম চীনেরা ও আমরা।

ঐ যে সামনে ধূ ধূ মাঠ দেখছ, ওখানে একদিন মস্ত একটি লেডিস্ হোস্টেল ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই হোষ্টেল হয়ে উঠল আশ্রয় কেন্দ্র। বহু মহিলা তাঁদের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ওখানে উঠেছিলেন যানের ব্যবস্থা হলেই প্রাণ নিয়ে পালাবেন এই আশায়।

সাল্‌মা বিন্‌তেও আশা করেছিল—

সাল্‌মা বিন্‌তে, সে আবার কে ?

আমার অনাগত সন্তানের ভাবি মা।

কিন্তু তুমি যে বিবাহিত এ কথা আগে কখনো জানাও নি ত ?

আমাদের বিয়ে হয়েছিল ঠিক যুদ্ধের আগে। অথচ সাল্‌মার মা-বাবাকে সে কথা আমরা দুজনে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলুম না। তাদের এক কথা, সাল্‌মার মত মেয়ে আমাদের গোপন করে এমন কাজ করবে তা চিন্তাই করা যায় না।

সত্যি, আমরাই কী আগে চিন্তা করতে পেরেছিলুম, একটু হেসে রবার্ট বলল। অফিসের ছুটি হলেই দুজনে 'ক্যাবারে'—

প্রথমেই 'ক্যাবারে' ?

হ্যাঁ, ও ওখানে নাচত।

আমার ভুরু কুঁচ পাকাতে দেখে রবার্ট তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, না না, অমন কিছু ভেবনা। সে সত্যি সত্যি ভাল মেয়ে। কত ভাল তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। সে—

অত ভাল মেয়ে ত 'ক্যাবারে' নাচতে গেল কেন ?

খুব ভাল নাচতে পারত ও আর নাচতে ভালও বাসত। ওর কাকা ক্যাবারের ম্যানেজার ছিলেন তাই সুযোগ পেয়েছিল। নয় ত ওর মা-বাবা যা গোঁড়া, ওকে ত্যাগ করত।

তেমন মা-বাপের চোখে তুমি ধুলো দিলে কী করে ?

খুসির হাসি হেসে রবার্ট বলল, ধুলো দিতে পেরেছি ভেবে তখন মনে মনে কী ফুর্তি হত, গর্ববোধও করতুম। তাই বীরের মত মাথা উঁচু করে ওর হাতে হাত রেখে আজ 'ক্যাবারে' ত কাল সিনেমা ত পরশু সী-বীচ্-এ ঘুরে বেড়াতুম।

মধুর স্মৃতির স্পর্শে উল্লাসে কখন নিজের অজান্তে রবার্ট গাড়ীতে স্টার্ট দিল তা বুঝতে পারল না। সে যেমন হু হু করে স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছে তেমনি হু হু করে গাড়ী গড়িয়ে চলল।

বীচ্-এ পাশাপাশি বসে, রবার্ট বলতে লাগল, ঢেউ গুণে গুণে কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত জানতেই পারতুম না। মনে হত আমরা দুটি যেন মুক্ত বিহঙ্গ।—ঘর বাঁধার স্বপ্নের চেয়ে ঘর ছাড়া হয়ে বোহেমিয়ানের মত চকি দিয়ে বেড়াচ্ছি।

তারপর ?

তারপর একদিন সাল্‌মা কানে কানে সেই নতুন খবর শোনাল। মা-বাবার কথা ভেবে ভয়ে খুব কাতরাল।

জানালুম, কুছ পরোয়া নেই, বিয়ে ত একদিন হবেই। চল, আজই সেরে আসি। তারপর মা-বাবাকে সব খুলে বললে তাঁরা আর রাগ করতে পারবেন না।

কিন্তু সব কেমন উল্টে গেল। সাপের মত পাক খাওয়া রাস্তার দিকে উদাস ভাবে চেয়ে রবার্ট জানাল, ওর

মা-বাবা ঠাণ্ডা মাথায় কিছুতেই ভাবতে চাইলেন না, উল্টে সাল্‌মাকে বন্দী করে ফেললেন।

বিচ্ছেদের বেদনায় প্রাণ যায় যায়। তবু সেও সহনীয় ছিল, কিন্তু সাল্‌মার ওপর মায়ের অমানুষিক অত্যাচার আমার মাথা খারাপ করে দিল। একদিন ওদের বাড়ী গিয়ে ব্যাপারটা করে ভয় দেখিয়ে এলুম। ফল হল বিপরীত। সাল্‌মার ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার সুরু হয়ে গেল।

আমার পক্ষে অসম্ভব জেনেও গোপনে সাল্‌মাকে জানালুম তোমাদেরো ত ডাইভোর্স আছে, আমার আপত্তি নেই। এ কষ্টের চেয়ে সে-ই ভাল।

উত্তরে সে জানাল, ডাইভোর্স ইচ্ছে করলে একবার ছেড়ে বার বার করা যায়, কিন্তু ভালবাসা একবারই হয়।

হিয়ার হিয়ার!

শুনে তোমার খুব ভাল লাগল ত। আমারো খুব ভাল লেগে ছিল, জানাল রবার্ট। আনন্দও হয়েছিল। কিন্তু উপায়, কি উপায়ে ওকে পাওয়া যায়।

কেন, 'ইলোপ্'।

রবার্ট একটু হেসে জানাল, না, তার আর দরকার হয় নি। সে-ই উপায় বার করল। মা-বাবাকে কৌশলে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে পালিয়ে এলো।

ততদিনে জাপানীরাও এসে গেছে। ফলে সারা দেশ লণ্ডভণ্ড। আপাতত সাল্‌মাকে ঐ লেডীস্ হোস্টেলের আশ্রয়ে রাখলুম। উদ্দেশ্যমত ব্যবস্থা হলেই দুজনে পালাব।

তখন সবাই পালাতে চায়। কে কোথায় যাবে, কি করে পালাবে তার কিছু ঠিক নেই।

সাল্‌মার সঙ্গে রোজ দেখা হয়। সন্তান ধারণের নানা উপসর্গে সে তখন অসুস্থ, তার ওপর উৎকণ্ঠা ও ভয়ে ক'দিনেই সে যেন মড়ার মত হয়ে উঠল। আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে আসি। তারপর পাগলের মত ঘুরে বেড়াই, আর কি করে পালান যায় তাই ভাবি।'

তখন কী কেউ পালাতে পেরেছিল?

পারবে না কেন, যারা প্রথম দিকে চেষ্টা করেছে, পেরেছে। পরে যাদের পয়সা ছিল প্লেনে করে পাড়ি দিয়েছে। জাহাজে যাবার প্রশ্ন তখন ওঠেনা। যদি পেট্রল পাওয়া যায় ত গাড়ী করে দুজনে দূরে কোথাও পালিয়ে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা যায়। ঘুরে তারই চেষ্টা করছিলুম।

কালো কালো মেঘগুলো যেন এক একটা জানোয়ারের মত থাবা ফেলে আকাশের আঙিনায় সতর্ক হয়ে বসে আছে। বাতাসে মড়ার গায়ের মত হিমেল ভাব। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ ভয়াল হাসির মত চমকে উঠছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা, রবার্ট সুরু করল, তেমনি আশ্বাস দিয়ে সাল্‌মার কাছ থেকে চলে এলুম। ফিরে আসার খানিক পরে এতদিনের ঘোরাঘুরি সার্থক হল। খবর পেলুম, দশ গ্যালন পেট্রল পেতে পারি। খুসি হয়ে জানালুম, তাতেই হবে, অন্তত এই অভিশপ্ত সহর ছেড়ে দূরে কোথাও পালাতে পারব। ইতিমধ্যে যুদ্ধ দেবতা নিশ্চয় প্রসন্ন হয়ে 'অ্যালাইড' পার্টিকে আশীর্বাদ করবে। আমরা হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচব।

তখন সন্ধ্যেরাত। হঠাৎ আগুনের আভায় আকাশ লালে লাল। ফটাফট্ শব্দে কানে তালা লাগার যোগাড়। তারপরই সে কী অসহায়, কাতর করুণ আর্তনাদ আর বিকট কান্নার শব্দ! পঙ্গপালের মত জাপানী সৈন্য হোস্টেল ঘিরে ফেলেছে। গাছে গাছে আগুন লাগিয়ে নারী ও শিশুদের ভয়ার্ত করে তুলেছে। দরজা খুলে তারা পালাতে গেলেই একেবারে রাক্ষসের মুখে পড়ছে। মার কোল থেকে বেয়নেটের খোঁচায় শিশুদের মেরে ফেলে দিচ্ছে। তারপর একটি অসহায় জীবকে নিয়ে পাঁচ সাত-জনে মিলে ছিঁড়ে পড়া ঘুড়ির মত সে কী টানাটানি! তাদের বুক ভাঙ্গা চীৎকারে বহু বহু দূর অব্দি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

ষ্টীয়ারিং ছেড়ে রবার্ট দেখি উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে।

তাড়াতাড়ি গাড়ী সামলে নিয়ে তাকে সরিয়ে নিজে 'ড্রাইভ্' করতে বসলুম। তারপর আস্তে প্রশ্ন করলুম, তুমি এত কাণ্ড জানলে কী করে?

পেট্রল পেয়েই গাড়ী নিয়ে ছুট দিয়েছিলুম। যেন বহুদূর থেকে রবার্ট জবাব দিল।

সাল্‌মাকে পেয়েছিলে? তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তখুনি খোঁজ করি।

দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলুম। আমার গাড়ী দেখতে

পেয়ে সে দৌড়ে চলে আসছিল, কিন্তু পৌঁছতে পারল না। তার আগেই—ওঃ—হো-হো-হো—

আর তুমি ?—

আমি, আ—আমি যেন আঠার মত গাড়ীর সীট্-এ আটকে গেলুম। তারপর, তারপর সব অন্ধকার—

কাওয়ার্ড্!

কাওয়ার্ড্, ঠিক বলেছ, কাওয়ার্ড্—কাওয়ার্ড্—ওঃ—হো-হো-হো—রবার্ট—আবার আর্তনাদ করে উঠল। তারপরই সে হাসতে সুরু করে দিল, হা-হা-হা-হো-হো-হো-হি-হি-হি—হাসি আর থামে না।

তাড়াতাড়ি তার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলুম, রবার্ট—রবার্ট!

সে একটু থমকে হাসি থামিয়ে গুম হয়ে বসে রইল।

আমার ভীষণ অনুতাপ হতে লাগল। দুঃখ মিশ্রিতরাগের মাথায় একটা মন্তব্য করে ফেলেছি বটে, কিন্তু আমার তা করা উচিত হয় নি। তার আগে রবার্ট কী ভীষণ পরিস্থিতিতে পড়েছিল, আঘাতের বেদনা তার বুকে কত বড় ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, তা তার কথা শুনে আমার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু—কিন্তু আমি এ কী করে বসলুম, ছি ছি ছি!…

লজ্জার সঙ্গে রবার্টের দিকে তাকাই। উদ্দেশ্য, ক্ষমা চাইব। না জেনে না বুঝে যে অপরাধ করে ফেলেছি রবার্ট যেন তা ক্ষমা করে।

কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলুম। এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রবার্ট নিজের মনে মুচকে মুচকে হাসছে।

তার হাত ধরে নাড়া দিলুম, নাম ধরে বার বার ডাকলুম কিন্তু তার খেয়াল নেই। তখন জোরে আবার একটা ঝাঁকুনি দিতে সে আবার হাসতে আরম্ভ করল—হা-হা-হা-হো-হো-হো-হি-হি-হি—।

রিম-ঝিম-রিম-ঝিম, নাকি সুরে কান্নার মত শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। রাত বেশ হয়েছে। আর দেরী না করে কূল স্পীডে গাড়ী চালিয়ে দিলুম।

রবার্টের বাড়ীর সামনে এসে দেখি জনমানুষের সাড়া নেই। তাকে ঠেলা দিয়ে হুঁসে আনতে গিয়ে তার গেটে ধাক্কা লেগে গাড়ী থেমে গেল।

রবার্টের হাসির তখনো বিরাম নেই। হাসতে হাসতে নামতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গড়াতে গড়াতে পাশের গর্তে পড়ে গেল।

আমার এবার চক্ষুস্থির! ভীষণ ভয় পেয়ে প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলুম।

এমন সময় রবার্টের পুরনো চাকর দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এলো। থমকে খানিক রবার্টের অবস্থা দেখল। তারপর কান্নাভাঙ্গা স্বরে আফ্‌সোস্ করে বলল, হায়, সাহেব দেখছি আবার পাগল হয়ে গেলেন!

জলে ঢেউ দিও না

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

জলে ঢেউ দিও না।
নিস্তরঙ্গ আছে—থাকুক সে স্মৃতির দুঃখ…স্মৃতি বিলাসীরা
হয়তো তাদাবে তেমা কথাকলি প্রেমে,
আঁকবে নতুন ছবি স্বপ্ন চুরি করে,
তবু সেও মুছে যাবে, মৃত্যুনীল চুম্বনের ঘোরে
মুছে যাবে অতৃপ্ত সংলাপ
অশেষ অশান্তি ফেলে রেখে—
"সুজাতা, তোমায় আমি ভালবাসিতাম।"
জলে ঢেউ দিও না,
নূপুরের অন্তরঙ্গে যৌবনের বিক্ষুব্ধ কামনা ছড়ায়
কোথায় কাকেরা ডাকে, বাঙ্ময় করে…জীবনের নামে
আবার দেখব ছবি আকাশের নীলে
ব্যর্থতার শিলালিপি মেঘেরই আড়ালে,
তবু সেও উড়ে যাবে দীঘিটাকে ঘিরে
বলে যাবে শুধু এই কথা
"জলে ঢেউ দিও না"।
স্মৃতি যারা মনে রাখে তারা মূর্খ হিসেবীর দল,
এখানে দু'দণ্ড শান্তি জীবনের ঘাটের কিনারে,
হাওয়া কাঁপে, জল নড়ে, সংবৃত চেতনা
নিরর্থক জলে তুমি ছায়া ফেল না।

পদকর্তা লোচনদাস

অধ্যাপক জীবনবল্লভ চৌধুরী, এম-এ

বৃন্দাবন-লীলায় যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনিই নবদ্বীপ-লীলায় রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীচৈতন্য, এই সিদ্ধান্ত বাংলার বৈষ্ণবসমাজে স্বীকৃতহলেও শ্রীচৈতন্যজীবনী-কারদের বর্ণনা ও ঘোষণার মধ্যে এ-সিদ্ধান্তকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক কিছুটা প্রচ্ছন্ন-ভাবে রেখে দেওয়ার প্রবণতা চোখে পড়ে। যুগ যুগ সঞ্চিত তথ্য ও তত্ত্বের নিরূপিত ধারণাকে একদিনে পরিবর্তিত করা সম্ভবপর নয়। সত্যনিষ্ঠা যত নিবিড় হোক না কেন তাকে সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরতে সময় ও সাহসের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যাঁরা সত্যকে সত্য বলে উপলব্ধি করেও তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের দ্বারা সংকীর্ণ চিত্তে তার পরিবেশনের গুরুভার নিজ হাতে তুলে নেন না তাঁদের বিরুদ্ধে সহসা অভিযোগ করা সঙ্গত নয়; এরকম নিষ্ক্রিয়-তার পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। বিশেষ করে কোন ধর্মমত বা ধর্মতত্ত্বকে পরিবেশন করতে হ'লে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। শ্রীল বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণ-দাস প্রমুখ প্রখ্যাত চৈতন্যজীবনীকারেরা শ্রীচৈতন্যকে ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্ব, অলৌকিক দিব্যজীবনের নানাদিক, অপূর্ব জীবন-দর্শন প্রভৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, ভক্তিরসামৃত অন্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাববিগ্রহকে সুনিপুণ তুলিকার রেখায় রেখায় পূর্ণ ভগবানের উজ্জ্বলরসসম্ভব দিব্যরূপে রূপায়িত করেছেন।

'রাধাভাবকান্তি দুই অঙ্গীকার করি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।'

* * *

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময় মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই একথা বলেছেন, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপচন্দ্ররূপে আমাদের সামনে উদিত হলেও নবদ্বীপের এই চন্দ্রিকার নিগূঢ় তত্ত্বের আলো, ভক্তির স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মি ও ব্রজভাবের সুস্নিগ্ধ অমৃতপ্লাবন যে পরিমাণে আছে সে অনুপাতে ব্রজলীলামাধুরীর লীলা-কৌমুদী যেন তখনও তেমন করে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভাবোন্মাদ, জীবনচর্যা যেভাবে তাঁর জীবনীগ্রন্থ সমূহে পরিবেশিত হয়েছে তা' পর্যবেক্ষণ করলে বেশ বোঝা যায় যে, এই মহাজীবনের বিশেষ একটি অতি চমৎকার মধুর অধ্যায়কে অধিকাংশ জীবনীকারই যে কোনো কারণেই হোক পরিহার করে-ছেন অতি সাবধানে!

যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্য শ্রীচৈতন্য যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন চৈতন্যভাগবতের এই সংবাদই চরম কথা নয়, চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যভাগবতের অসম্পূর্ণতাকে পরিমার্জিত করে প্রকৃত সংবাদটি পরিবেশন করেছেন—

এহত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।
যুগধর্ম প্রবর্তন নহে তাঁর কাম।
কোন কারণে হৈল যবে অবতারে মন।
যুগধর্ম কাল হৈল সেকালে মিলন। আদি, ৪

'কোন কারণে' অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা হোল তাঁর মনে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থেই—

প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।
—আদি, ৪

এখানেই শেষ নয়; আরো বিস্তারিতভাবে কবিরাজ গোস্বামী ঘোষণা করলেন—

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।

প্রেমভক্তি শিক্ষার্থে আপনে অবতরি।
রাধাভাবকান্তি দুই অঙ্গীকার করি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।

আরও বল্‌লেন—

ভটট্ট হৈয়া মনে বিচার যদি করি।
সর্বরস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।
• • •

অতঃপর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে চৈতন্যচরিতামৃতকার বিশদ ব্যাখ্যা করে জানালেন—

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।
ব্রজবধূগণে এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি।
প্রৌঢ় নির্মল ভাব প্রেম সর্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ।
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।

আর,—(১) রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দুঁহে হৈলা এক ঠাঞি।

এখানে দুইটি বিশেষত্ব—

১। রাধা ও কৃষ্ণ একাত্ম হয়েও লীলারস আস্বাদনের জন্য বিবিধ রূপ ধারণ করেছেন ব্রজলীলায়।

২। লীলারস আস্বাদনের জন্য রাধাকৃষ্ণের দ্বৈতরূপ পুনরায় অদ্বৈতরূপে প্রকটিত হয়েছে নবদ্বীপ লীলায়।

উক্ত লীলাতেই উদ্দেশ্য এক —"প্রেমরসনির্যাস করিতে আস্বাদন।" এই তথ্য বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করেছে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই তথ্যটিকে লোচনদাসই কোনোরূপ ইতস্তত না করে অকপটভাবে পরিবেশন করেছেন তাঁর চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে।

প্রামাণিকতার দিক দিয়ে শ্রীচৈতন্য জীবনী গ্রন্থ সমূহের মধ্যে কালক্রমানুসারে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' বাংলার বৈষ্ণব ধর্মজগতে সর্বজনাদৃত গ্রন্থ। চৈতন্য ভাগবতের রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ, চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল আনুমানিক ১৫৬০—৬৬ খৃষ্টাব্দ, চৈতন্যচরিতামৃতের আনুমানিক ১৬১২—১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাচীনতার দিক থেকে চৈতন্যভাগবত জ্যেষ্ঠ, তারপরেই মাত্র ১২।১৪ বছরের মধ্যেই লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের আত্মপ্রকাশ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের সময়—১৪৫৫ শক, অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল মহাপ্রভুর তিরোধানের কমবেশী তিরিশ বছরের মধ্যেই রচিত হয়েছিল, এই সময়ে লোচনদাস সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। স্বীয় গুরু নরহরি সরকারের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও সহচর শিষ্য হিসেবে লোচনদাস চৈতন্যলীলার নিগূঢ় তত্ত্ব ও রস আকণ্ঠ পান করে চৈতন্যমঙ্গলকাব্য রচনে প্রবৃত্ত হন। গ্রন্থ প্রণয়নে লোচনদাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথার মধ্যে একটির ওপরে অনেকেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, সেটি হচ্ছে 'নরহরি সরকার ঠাকুরকে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্থান দেওয়া'। আমরা কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে পারি না; আমাদের বিশ্বাস 'নাগরী-ভাব'কে কুণ্ঠাহীনচিত্তে গৌরাঙ্গভক্তের চোখের সামনে তুলে ধরাই লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল রচনার মূল কথা। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্থান পেয়েছেন গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, শ্রীনিবাস ও গদাধর, সেখানে নরহরির উল্লেখ নাই। কিন্তু তাই বলে একথা জোর করে বলা যায় না যে, গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় কবিকর্ণপুর প্রয়োজন মনে করেননি বলে অথবা নরহরি পূর্বোক্ত পরিকরদের সমকক্ষ ছিলেন না বলেই নরহরির নাম উল্লেখ করেন নি। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' নরহরি সরকার "প্রভোঃ প্রিয়ঃ" ও "মধুমতী" তত্ত্বরূপে বিশেষিত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য চরিত গ্রন্থে, লোচনদাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল' ছাড়া, নরহরি সরকার স্থান পান নাই, পান নাই তার কারণ সুস্পষ্ট। বৃন্দাবনদাস প্রমুখ চৈতন্যচরিতকারেরা

(১) বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে প্রবন্ধকারের 'বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে।

কেউই নরহরির 'নাগরী' ভাবের ভজনাকে সঙ্গত বলে মনে করেন নি। প্রশ্ন হতে পারে, বৃন্দাবনদাস না হয় 'নাগরীভাবের' সমর্থন করেননি তাঁর চৈতন্যভাগবতে, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে 'নাগরীভাবের' উল্লেখ না করার কারণ কি? আমাদের মনে হয়, মহাজীবনের মহিমা ও জীবনদর্শন তথা লীলাতত্ত্ব যতটা জনপ্রিয়তা লাভ করলে এবং গণমানসে যে পরিমাণ সুদৃঢ় রেখাপাত করলে 'নাগরীভাবের' নিগূঢ় রসরহস্য মাধুর্য পরিবেশন সম্ভবপর হয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধানের মাত্র পনেরো বিশ বছরের মধ্যে দেশকাল ততখানি প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি। এই কারণেই 'চৈতন্যভাগবতে' এই লীলারহস্য পরিবেশিত হয় নি। দ্বিতীয় কথা, লোচনদাসের 'চৈতন্য মঙ্গলে' 'নাগরীভাবের' রস পরিবেশিত হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' স্পষ্ট করে তা'র উল্লেখ নাই কেন? তা'র কারণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য লীলার তত্ত্বের দিকটাতেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন; তা'ছাড়া আরো একটা কারণ আছে। বৃন্দাবনদাস ও লোচনদাস যে বয়সে তাঁদের চৈতন্যচরিত রচনা করেছেন কৃষ্ণদাস তা'র চাইতে অনেক বেশী বয়সে চরিতামৃত রচনা করেছেন, এই কারণে সম্ভবত তিনি কোনো প্রকার ঝুঁকি নিতে চান নাই। চৈতন্যলীলার বেদব্যাস বৃন্দাবনদাস যে-বিষয়ের উল্লেখ করেন নি সে বিষয়কে প্রবীণ কৃষ্ণদাস আলোচ্য হিসেবে গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করেছেন। তা'ছাড়া তিনি হয়তো লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল জনসমাজে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা' লক্ষ করবার মানসেই তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে' মাত্র ইঙ্গিতে, তাও আবার স্বরচিত দামোদর, কবিকর্ণপুর, শ্রীমদ্ভাগবতাদির উক্তি উদ্ধৃত করে অতি সাবধানে অগ্রসর হয়েছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে ব্যাপারে ইতস্ততঃ করেছেন লোচনদাস সেই ব্যাপারেই অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

লোচনদাসের ১৮০টি নদীয়ানাগরী ভাবের পদ গৌরপদ তরঙ্গিণীতে স্থান পেয়েছে। এই পদগুলোর মধ্যে নরহরি সরকার ও বাসুদেব ঘোষের রচিত অনেকগুলো পদ আছে। লোচনের গুরু নরহরি সরকারই নদীয়ানাগরীভাবের প্রবর্তক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ মরমী পার্ষদদের অন্যতম। পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য ও সেই সঙ্গে ভক্তিরস নরহরির ব্যক্তিত্বকে অসাধারণ গুণে অলংকৃত করেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অপেক্ষা নরহরি সামান্য কয়েকবছরের বড় ছিলেন, কিন্তু নদীয়ার একই টোলে উভয়েই পাঠ করতেন বলে দুজনের মধ্যে গভীর সখ্য গড়ে উঠেছিল। এই সময়েই তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি গৌরাঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একখানি পদ রচনা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করলে ভক্তের অবস্থা কেমন হয় তা' উপলব্ধি করা যাবে নরহরি রচিত এই ক'টি ছত্রে—

বেলা অবসানে ননদিনী সনে
জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ নিরখিয়া
কলসী ভাসিয়া এনু।
কাঁপে কলেবর গায়ে এসে জ্বর
চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপের পাথারে
সাঁতারে না পাই থা।
ঘীঘল ঘীঘল নয়ন যুগল
বিষম কুসুম শরে।
রমণী কেমনে ধৈরজ ধরিবে
মদন কাঁপয়ে ডরে।
কহে নরহরি গৌরাঙ্গ মাধুরী
যাহার অন্তরে জাগে।
কুলশীল তার সকলি মজিল
গোরা চাঁদের অনুরাগে।

এটি পূর্বরাগের পদ, অর্থাৎ ইংরাজিতে বলা যেতে পারে—the first flame of love; গৌরাঙ্গের ব্যক্তিত্ব ও অপরূপ দেহলাবণ্য নরহরিকে এমনভাবে আকর্ষণ করেছে যে, তিনি সর্বস্ব পরিত্যাগ করে ব্যক্তি জীবনের অন্য সব বিষয়-বাসনাদি তুচ্ছজ্ঞান করে প্রাণপ্রিয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। নরহরি-চিত্তচোর শ্রীগৌরাঙ্গও কিন্তু এই প্রথম প্রেমের অধীর ব্যাকুলতার ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। তিনি চিত্তচোর হ'লেও চিত্তরঞ্জন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। গৌরাঙ্গ প্রেমে উন্মাদ নরহরির অসহনীয়

পূর্বরাগের অবস্থায় অবশেষে একদিন প্রেমিকনাগর গৌরাঙ্গ সত্যই তাঁর মনস্কামনা পূরণ করলেন। সেই অতি দুর্লভ মুহূর্তের কথা চৈতন্যমঙ্গলে লোচনদাস দু'টি মাত্র ছত্রে চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন—

গোরা নেত্র বাণ হানি তনু যে জারিল।
দরশে অবশ হৈল পরশে শীতল॥

এরপর থেকে নরহরির জীবনে এলো এক অভাবনীয় পরিবর্তন। একটু ঘুরিয়ে বললে 'চৈতন্য চরিতামৃতের' ভাষা অবলম্বনে বলা যেতে পারে—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা গোরা স্ফুরে।" নিজের অবস্থার কথা নরহরি নিজেই লিখেছেন—

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়নের তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা॥
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়া বিরলে বসিয়া রব।
মনের সাধেতে সেরূপ চাঁদের নয়ানে নয়ানে থোব॥
সই লো কহ না গৌর কথা!
গোরার সে নাম অমিয়ার ধাম পিরীতি মূরতি যাতা॥
গৌর সম্পদ গৌরসঙ্গ সদা যার হিয়ায় জাগে।
করে নরহরি তাহার চরণে সতত শরণ মাগে॥

শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অনাস্বাদ্য প্রেমনির্যাস আস্বাদন করে কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এই তত্ত্বটি বাংলার বৈষ্ণব সমাজে সাদরে অভ্যর্থিত হ'লেও শ্রীরাধার উজ্জ্বলরসাশ্রিত মহাভাবকে স্পষ্ট করে নরহরি সরকারের পূর্বে আর কেউ ব্যক্ত করেননি। নরহরির উপলব্ধ সত্যকে প্রাণের আরক রসে জারিত করে অকপটে ছন্দগানে অভিব্যক্ত করেছেন নরহরির শিষ্য লোচনদাস। লোচনদাসের ভাবের গভীরতার সঙ্গে প্রকাশ ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও কল্পনার অভিনবত্ব সহজেই মনের ওপরে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়। লোচনের কাছে শ্রীমন্মহাপ্রভু একাধারে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সমালিঙ্গিত যুগলমূর্তি, তাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যদাসী বৃন্দাবনবাসীদের মতো তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব লীলারস আস্বাদন করতে প্রয়াসী হয়েছেন নিজেকে নদীয়া-বিনোদিনীরূপে কল্পনা করে। এই কারণেই ইতিপূর্বে মহাপ্রভুর দিব্যজীবনের সাংসারিক গার্হস্থ্য অধ্যায়টি অন্য কেউ স্পষ্টভাবে রূপায়িত করবার অন্য এগিয়ে না এলেও লোচনদাস সে-অধ্যায়টিকে রসমণ্ডিত করে পরিবেশ করিতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে মহাপ্রভুর অনঙ্গীকার্য সম্পর্কটিকে কোনোরূপ বিকৃত না করে অতি সহজ ও সাধারণ ব্যক্তিজীবনের খণ্ড খণ্ড মুহূর্তগুলোকেও লোচনদাস সর্বজনীন বলিষ্ঠতায় শ্রীমণ্ডিত করে এক অখণ্ড ভাবসৌন্দর্যের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এই দুরূহ ব্রত পালনে যে অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা' সাহিত্যের আসরে চিরস্থায়ী সম্পদরূপে বিরাজ করবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। লোচনের নদীয়ানাগরী পদের কটি মাত্র ছত্র এখানে উল্লেখ করা গেল—

চলগো সজনি পিরীতি নগরে বসতি করিগে মোরা।
মরম না জানে ধরম বাখানে চৌরাশি ভ্রমিবে তারা॥
সদয় দুয়ারে কপাট হানিয়া বিড়কী দুয়ার খোলা।
চলগো সজনী নিশ্চিন্তে হইয়ে আঁধরে দেখিবি আলা॥

শেষের দুটি ছত্রে "আমার বাহির দুয়ারে কবাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা" ইত্যাদি অতিপরিচিত পদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মনে হয় লোচনের উক্তির মধ্যে সরলতা ও অকপটতার চিহ্ন অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন। শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি "কন্দর্পদর্পদর্পহা"; এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলারস বিষয়রস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক; একই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতে ও পদাবলী সাহিত্যে 'রমণ' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ। (২)

নবদ্বীপলীলায় শ্রীচৈতন্য লোচনের দৃষ্টিতে মদনমোহন; —তাই লোচনের প্রশ্ন—

রসিকা রমণী যে গো ধনি, রসিকা রমণী যে।
মদনমোহন গৌরাঙ্গ-বরন দেখিয়া জীবে কি সে?

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মদনমোহন রূপ দেখে শ্রীকৃষ্ণের অবরামৃত লোলুপ ব্রজললনার মতো লোচনদাসও অধীর হয়ে ওঠেন, আর ভাবেন,—

---

(২) প্রবন্ধকারের লেখা "বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণবপদাবলী" গ্রন্থে এবিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বিলাসিনীর মনে সুখ গো সজনি, বিলাসিনীর মনে সুখ।
আচাম্বু বাহু হেরিয়া দুরন্তে, পরিসর গোরার বুক।
কামিনী কামনা করে গো সজনী কামিনী কামনা করে।
শুকয়া নিতম্ব বিলাস রসের পরশ পাবার তরে॥
লোচনদাসের চিতে গো নাগরী, লোচনদাসের চিতে।
সদা আলিঙ্গিয়া গৌরাঙ্গনাগরের অধরের সুধা পিতে॥

নদীয়ানগরী ভাবে ভাবিত লোচনের অন্তরে নদীয়ানাগর শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে সর্বস্ব উজার করে দিতে ইচ্ছে জাগে, তাই কোনো একজন সমব্যথী, সমভাবের ভাবুককে ডেকে বলেন—

শুন গো মরম সই, মরম তোমার কই
না কহিলে না পারি রহিতে।
এ নবযৌবন জাতি কুল প্রাণধন
সাধ হয় গোরাচাঁদে দিতে॥
স্নিগ্ধকান্তি সুধামুখ দেখিয়া কে ধরে ধৈর্য
গরবিনীর গরব লুকায়।
হেসে শুন রঙ্গ আর কোন কোন অবলার
অনুরাগ অন্তরে বাড়ায়॥
মন তায় করে চুরি দিয়ে অনুরাগের ডুরি
আনন্দরসের বিধি গোরা।
এমন করিছে যিয়ে এদেহ গৌরাঙ্গে দিয়ে
রসের ভিখারী হই মোরা।

গৌরাঙ্গের জন্ম যখন লোচনের মিলনলিপ্সু অন্তর জুড়ে জাগে হাহাকার, সেই সময় স্বপ্নাবস্থায় অতীষ্টকে দর্শন করে কী দারুণ জ্বালায় দগ্ধ হয়েছেন তার বিবরণ দিয়ে লোচন বলেছেন—

অনেকদিনের সাধ ছিল মোর অধররস পিতে।
মনের দুঃখে ভাবনা করে শুয়েছিলাম রাতে॥
যখন আমি মাঝনিশিতে ঘুমে হৈলাম ভোরা।
তখন আমি দেখছি যেন বুকের উপর গোরা॥

কিন্তু স্বপ্নের ঘোর যখন ভেঙে যায় তখন জাগরণে বিরহের জ্বালা দ্বিগুণ হয়ে দগ্ধ করতে থাকে। কিন্তু এই ব্যর্থতার মধ্যেও লোচনের চিত্তে নিরাশার ছায়া পড়ে না, তিনি নিজেকে নিজেই প্রবোধ দিয়ে বহির্মুখী করে গৌরপ্রেমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হতে চান—

লোচন বলে কাঁদিস কেনে ঢোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ডুবায়ে ধর॥

কারণ লোচনদাস জানেন—

নিগূঢ় নদীয়া নিগূঢ় নাগরী
নিগূঢ় গৌরাঙ্গ রায়।

তাই,— লোচন কহয়ে সহজে সহজে
পরাণ মিলিয়া যায়॥

লোচনদাসের অনেক পদ গ্রামবাংলারপ্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত। লোকসাহিত্যের ভাবকেন্দ্রে ব্যষ্টি ও সমাজের প্রেরণা যে-ভাবে কর্মক্ষম হয়ে ওঠে, যে-সমষ্টিগত গভীর স্বাচ্ছন্দ্য বিশ্রাম ও একটা নির্বিরোধ অবস্থার কথা অনাড়ম্বরভাবে পরিবেশিত হয়,লোচনদাসের কাব্যে তা' সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। লোকসংগীতের সজীবতা ও মুক্ত প্রাণস্পন্দন লোচনের কতকগুলো পদকে অনবদ্য করে তুলেছে।

গৃহমাঝে শুয়ে থাকি, ঘর মৌ মৌ করে।
যে দিকে সে দিকে গোরা, দেখি নিরন্তরে॥

কিংবা,—

চাঁদ নয় চাঁদ নয় সুন্দর-কাটা ছুরী।
আকাশের চাঁদ কেন গো মন করিবে চুরী॥

অথবা,—

লোচন কহয়ে দরশি পাইলে পরাণ বাটিয়া দি।
যাহার যাহাতে মরম পশিল ভরেতে করিবে কি॥

অথবা,—

ঠারঠমকা কাঁকাল বাঁকা মধুর মন্দ হাসি।
রূপ দেখিয়া জাতিকুল হারাই হারাই বাসি॥

* * *

লোচন বলে কি করিলি চাইলি উহার পানে।
দুকূল খা'লি কুল মজালি নয়ন দিলি কেনে॥

আবার নদীয়া-নাগর গৌরাঙ্গের অঙ্গসেবার দৃশ্যটি লোচনদাস যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা'র মধ্যেও বাংলাদেশের একখানি অতি পরিচিত অন্তঃপুরিকা বিরহিণীর সাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে—

হলুদ বাটিতে গৌরী বসিল যতনে।
হলুদবরণ গোরা পড়ি গেল মনে॥
উঠিল গৌরাঙ্গ-চেউ সম্বরিতে নারে।
লোরেতে ভিজিল বাটন গেল ছারেখারে॥
কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন কিসের হলুদবাটা।
আঁখির জলে বুক ছলছল ভেসে গেল পাটা॥

শাকেতে শুকুতা দিল অম্বলে দিল বাল।
শুকনা হাঁড়িতে চাল দিয়ে তেজাইল জাল।
কোথা ছিল ননদমাগি এসে দিল তাড়া।
শুকনা কাঠে ধুমা করলি এত বিষম জ্বালা॥

প্রিয়তমের ধ্যানে বিভোরা বিরহিণীর এই সংকটকালে পদকর্তা লোচনদাস বিরহিণীর সকল সমস্যার সমাধান করে দিলেন—

লোচন বলে মরু বেকুলি ভাবছিস কেনে এতো।
হাঁড়িটা কেনে ভাঙলি নাকো দিয়ে বেড়ির গুতো॥

শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়েই নয় ভাবের দিক দিয়েও এগুলো লোকসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। লোকসাহিত্যের সংযম ও শুচিতা আর সেই সংগে অকপটতা লোচনদাসের বহুপদকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডী থেকে মুক্ত করে, গূঢ়ার্থবাচক অস্পষ্টতার বেষ্টনী থেকে উদ্ধার করে মানবিক আবেদনে সার্থক করে তুলেছে।

মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'বারমাস্যা'কে কাব্যে স্থান দিয়ে লোচনদাস উল্লেখযোগ্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। লোচনের পূর্বে বা পরে অন্য কোনো চৈতন্য-জীবনীকার বা পদকর্তা 'বারমাস্যা' সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করেছেন কিম্বা 'বারমাস্যা'কে কাব্যের উপজীব্য বলে উপযুক্ত মনে করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এদিক দিয়ে "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা" বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। এই 'বারমাস্যা'য় লোচনদাস সম্ভবত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকে সামনে রেখেই অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টায় কোথাও আড়ষ্টতা অথবা অনুকরণের সংশয় নাই, উপমা প্রয়োগেও তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন এবং মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। বৈশাখমাসের দাবদাহ অপেক্ষা কালবৈশাখীর ঝড়ের প্রচণ্ডতা কবিকে আকৃষ্ট করেছে, বিরহিণীর অন্তরের ঝড় তাই যেন নিসর্গ প্রকৃতির চণ্ডবেগের সংগে একাকার হয়ে গেছে,—তাই বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে হয়,—

বৈশাখে বিষম ঝড় এ দিয়া-আকাশে।
কে রাখে এ ভরি পতি-কাণ্ডারী বিদেশে।

আষাঢ় মাসের বিরহ বর্ণনাতেও লোচনের মৌলিকতা সুস্পষ্ট,—

আষাঢ়েতে রথযাত্রা দেখি লোক ধন্য।
আমার যৌবন-রথ রহিয়াছে শূন্য॥

আর, ফাগুন মাসে?—

ফাল্গুনের আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে।
কান্ত বিনু অভাগিনী ভাসয়ে কাহার কোলে!

লোচনদাসের কাব্যজগৎ শুধু মাত্র প্রেম-সংগীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; মূলতঃ আধ্যাত্মিক চৈতন্যবোধ লোচনের কাব্যের উৎস হলেও ধর্মনিরপেক্ষ একটা শাশ্বত মানবিক অনুভূতির প্রত্যক্ষ আবেদন কাব্যদেহের প্রতিটি অণুপরমাণুতে সুস্পষ্ট। চৈতন্য ধর্মের প্রভাব সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক সমাজের সামগ্রিক চেতনার স্পর্শে লোচনের কাব্য যে চমৎকারিত্ব লাভ করেছে সে চমৎকারিত্ব বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরল না হলেও অসাধারণ সন্দেহ নেই। বাংলার বিবাহবাসরে স্ত্রী আচার, গায়ে হলুদ, বর-কনের পাশা খেলা প্রভৃতির চিত্রের নিখুঁত রূপায়ণের সংগে সংগে আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্যুতি নিরিরোধভাবে সহাবস্থান করেছে,—

তৈল হরিদ্রা আর ললাটে সিন্দূর।
খই কদলক আর সন্দেশ তাম্বূল॥
আনন্দে মঙ্গল গায় যত নারীগণ।
প্রভু-অধিবাস করে শতেক ব্রাহ্মণ॥

এই ভাবে অধিবাস উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের বিবাহ উপলক্ষে 'জলচুরী', 'জলসই বা 'পানীতরা' একটি অন্যতম স্ত্রী আচার; এই প্রসঙ্গে—

বধূগণ রাত্রিশেষে জলকে চলিল।
নানাবিধ বাদ্য বাজে জয় হুলাহুলি।
রস ভরে রমণী চলিল ঢুলাঢুলি॥
এই মতে পানীসহি কুলবধূগণ।
প্রভাত সময়ে আইল শচীর ভবন॥

তারপর গায়ে হলুদের পালা। তখন—

নাপিতে নাপিতক্রিয়া করিল তখন।
অঙ্গ-উদ্বর্তন করে কুলবধূগণ॥
গন্ধ আমলকী সেই তৈল হরিদ্রা।
শ্রীঅঙ্গপরশে কেহো সুখে গেল নিদ্রা॥

* * *

অঙ্গ হেলি পড়ে কেহ গন্ধাজল ঢালে।
জয় জয় হুলাহুলি সুমঙ্গল রোলে।

লোচনদাসের কাব্যে হাস্যরসেরও অভাব নাই। লোকোত্তর চরিত্রের বর্ণনায় হাস্যরস কোনো স্থান পায়না, হয়তো এই রসের অবতারণায় চরিত্রের গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে এই আশংকায়ই এই রসকে বর্জন করা হয়ে থাকে। কিন্তু লোচনদাস হাস্যরসকে অপাংক্তেয় করে দূরে ঠেলে ফেলে দেননি। লোচনের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক একটি হাস্যরসাত্মক-পদের উল্লেখ করা গেল—

সাঁজ দিলায় শলতে দিলায়
গোয়ালে দিলায় বাতি।
তোমার ঘরের চোরা বাছুর
বুকে মারল লাথি।
• • •
লোচন বলে শুনো দিদি
আমি তখন কোথা।
শাশুড়ী ভুলাইতে তুমি এত জান কথা।

কৃষ্ণ-সম্ভোগচিহ্ন গোপন করবার জন্য লোচনের পরিকল্পিত শ্রীমতী এই রকম কথার চাতুর্যে শাশুড়ীর সন্দেহ চক্ষুকে এড়িয়ে যান। গুরুজনের সতর্ক দৃষ্টির পাহারায় গৃহে বন্দী প্রণয়িনীর অবস্থা, অভিভাবকের ব্যর্থতা ও প্রণয়িনীর সাফল্য বর্ণনায় স্বভাবকবি ও হাস্যরসিক লোচনদাস বলছেন—

না লয় মোর ঘটিবাটী, না লয় মোর পুরী।
যে ঘরেতে সুন্দরী গৌ, সেই ঘরেতে চুরি!
দুয়ার চেপে বসল বুড়ী চোর ধরিবার আশে।
ঠমক দিয়ে চোর পালাল, লোচন দেখে হাসে।

লোচনদাসের সহজিয়াতত্ত্বাশ্রিত পদও দুর্লভ নয়;—

সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে,
এ কথা না কহ কাকে।
সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর,
জানয়ে সকল লোকে॥
নিরীতি-নগরে মানুষ রতন,
বিরাজ সহজ-ঘরে।
ধরম করম কুলের আচার,
সেখানে যাইতে নারে॥

লোচনের একটি চমৎকার রাগাত্মিকাপদে রাগতত্ত্ব অল্প কথায় সরলভাবে পরিবেশিত হয়েছে—

রূপকে ছেবে রইবি সুখে, মদন যাবি ভুলে।
মনের মতন নাগর পাবি, কইবি কথাটি খুলে॥
খুলবি যখন দেখবি তখন রূপ স্বরূপে মাখা।
বাঁকায় বাঁকায় দেখা হলে ঘুচবে মনের ধোকা॥
• • •
মনে মনে আলো জ্বেলে থাকগে অনুরাগে।
লোচন বলে এই তত্ত্ব রাগ তত্ত্ব লাগে॥

অনুবাদক হিসেবেও লোচনদাস কৃতিমান। রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ নাটক'টি তিনি প্রাণস্পর্শিভাষার পদ্যে অনুবাদ করে অসাধারণ অনুবাদনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃত নাটকের বাংলাকাব্যানুবাদ যেন মূলকে অতিক্রম করে অমরিমায় প্রতিভাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে।

লোচনদাসের নদীয়ানাগরীভাবের পদগুলোতে সরল শব্দ-নির্বাচন গীতমূর্ছনায় মুখর হয়ে উঠেছে, সেই সংগে সংগে ভাবের গভীরতাকেও বক্ষে ধারণ করে কাব্যদেহের খণ্ড খণ্ড অংশগুলো একটি অখণ্ড রসলোকের সংবাদ পরিবেশন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রসঙ্গত লোচনদাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদটি স্মরণীয়—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
—ইত্যাদি।

লোচনদাসের কাব্যজগতে ব্যবহারিক গীত (functional song), বারমাসী লৌকিক প্রেম সংগীত (seasonal song), সম্প্রদায়গত তত্ত্ব ভাবনা, ব্যষ্টি-জীবনের নিবিরোধী চেতনা, হৃদয়াবেগের সচ্ছন্দ আলাপ বিস্তার বিস্ময়-করভাবে মিলেমিশে এক অখণ্ড সৌন্দর্যচেতনার অসাধারণ ঐশ্বর্য বিরাজমান। লোচনদাসের কাব্যে কোথাও কৃত্রিম রচনা প্রণালীর আশ্রয় নেওয়া হয় নাই, বাংলা ভাষাকে ব্রজবুলির অলংকারে আভরণে সুসজ্জিত করার চেষ্টা করা হয়নি, সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব-রহস্যের আবরণে কাব্যের আত্মাকে আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়নি। প্রকৃত পক্ষে লোচনদাসের পদগুলো যেন শরৎকালের মেঘের মতো সহজ, সুন্দর ও অনাড়ম্বর; খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশ হয়েও তা'রা যেন সমগ্রতার গৌরবে গৌরবান্বিত।

অবিশ্বাসী নই

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এরপর আরও কয়েকদিন কেটে গেছে। বসন্তদা বেশ সেরে উঠে আবার আফিস করছে। এর মধ্যে সুবাস একদিন ছায়াকে বলেছিল যে, বসন্তদা গুরুপাক খাবারের পরিবর্ত্তে নীচের রান্নাঘর থেকে খাবার কথা যে বলেছিল তার কি হবে?

ছায়া গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিল ওপোরে গুরুপাক লঘুপাক সবই রান্না করা যায়। ওর যা দরকার তা আমিই করতে পারব, সে জন্য অন্য কারুর মাথা ঘামাতে হবে না।

কথাটা সুবাসের মনঃপূত হয় নি। ভেবেছিল বসন্তদাকে একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করতে হবে, কিন্তু ওঁকে ত একলা পাওয়াই যায় না। সেই সেদিন সকালে ছায়া যখন বাথরুমে গিয়েছিল তখন সুবাস বসন্তদার ঘরে ঢুকেছিল, কিন্তু তারপর থেকে সে সুযোগ ছায়া একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে। ছায়া সর্ব্বক্ষণই দোতলার সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে রাখে, শুধু চা নেবার সময় একবার দরজা খোলে তারপরই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বাবুর্চ্চি এলে দরজা খোলে তারপরই দরজা বন্ধ। দাদা যখন নীচে নামে তখন দরজা খুলে দাদার সঙ্গে ছায়াও এক সঙ্গে নামে, অফিসে যায় একসঙ্গে, সেখান থেকে সন্ধ্যের সময় হয় একসঙ্গে ফেরে, না হয় ত ছায়া একলা ফেরে, পরে গাড়ী গিয়ে দাদাকে আনে। দাদাকে নিয়ে গাড়ী ফিরবার আগে থেকেই ছায়া নিচের অফিস ঘরে বসে থাকে; দাদা গাড়ী থেকে নামলেই দাদার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া ওপোরে উঠে আসে। ঠাকুর চাকর ড্রাইভার সকলেই মুখ টিপে হাসে, কিন্তু কেউ কিছু বলে না, বিশেষ করে সুবাসের সামনে। তাহলে দাদার সঙ্গে কথা বলার ফুরসৎ কই।

কদিন অপেক্ষা করে সেদিন সুবাসিনী মরিয়া হয়ে সিঁড়ির মুখে অপেক্ষা করেছিল। গাড়ী থেকে নেমে বসন্তদা যথারীতি আগে আসছে, পেছন পেছন ছায়া দেবী ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে, তার পিছনে ধুরাজ চাপরাসী অফিসের ফাইল নিয়ে এবং সর্ব্বশেষে ড্রাইভার বাজারের থলি সমেত। সিঁড়ির কাছে সুবাস এগিয়ে এসে ডাকলে, বসন্তদা—

বসন্ত থমকে দাঁড়িয়ে বল্লে, কি রে, কিছু বল্‌বি?

হ্যাঁ, বল্‌ছিলুম কি—

ওপোরে আয়, বসন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে লাগল। ছায়াকে অগ্রাহ্য করে সুবাস ঠিক বসন্তর পেছন পেছন উঠতে লাগল। চাকরটা উঠান থেকে হাঁ করে দেখে নিল এমন কি ঠাকুরটা পর্য্যন্ত রান্নাঘর থেকে হাতা-হাতে বেরিয়ে এসেছিল।

ওপোরের ঘরে এসে বসন্ত জামার পকেট থেকে সিগারেট কেস, লাইটার, মনি ব্যাগ সমস্ত টেবিলে রেখে জামা খুলতে খুলতে বল্লে, বল্ কি বলছিস।

ছায়া দেবী খুট করে পাখাটা খুলে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেই তখুনি আবার এ ঘরে ফিরে এল। ততক্ষণে সুবাস বলছে, বসন্তদা, তুমি যে বলেছিলে বাবুর্চ্চির গুরু-পাক রান্না তোমার ঠিক সহ্য হয় না—ওদের কথায় বাধা দিয়ে ছায়া বলে, এ তোমার ভারী অন্যায় দিদি। সারাদিন পরে অফিস থেকে ফিরতে না ফিরতেই এই সব ছোট খাট ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে এখন কি বিরক্ত করা উচিত?

সুবাস বলে, ওঁর কথাই জিজ্ঞাসা করছি, ঘরোয়া কোন কথা নয়—

রাগত ভাবে ছায়া বলে, ও কথার উত্তর ত আমি তোমায় দিয়েছি। আমার কথাটা কি বিশ্বাস হোল না?

বসন্ত বলে যাক্ যাক্ ছায়া, তুমি থেমে যাও। ও আমাকে ভালবাসে, আর ওকে আমি বলেছিলুম ত,

তা ও যদি জিজ্ঞেসাই করে তা হলে আর অন্যায় কি? সুবাসকে লক্ষ্য করে বলে, না রে, এখন আর ঐ সব গুরু-পাক কিছু খাচ্ছি না, এখন ওপোরে আমার জন্য মাছের ঝোল ভাতই হয়।

তাহলে—সুবাস বলতে গিয়েও থেমে গেল।

বসন্ত বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওপোরে যেমন চলছে তেমনই চলুক। তবে যদি কোনদিন দরকার হয়, তা হলে নিশ্চয়ই তোকে বলব বই কি। এর পর অল্প হেসে বসন্ত বলেছিল, দাদার জন্য অত ভাবিস নি রে, দাদা তোর ঠিক আছে।

তোয়ালে ও কাপড় জামা নিয়ে ছায়া এগিয়ে এসে বলে, বাথরুমে দিয়ে দিচ্ছি—

বসন্ত বলে এত ব্যস্ত কেন?

ছায়া বলে, বা রে, একটু পরেই ত ওদের সব আসবার কথা!

চেয়ারে বসে বসন্ত বলে, একটু পরে কোথায় দাতটার সময় ত, এখন ত মোটে পৌনে ছটা। তা যাক্, সুবাস কেমন আছিস্ বল। তোকে ত দেখতেই পাই না, থাকিস্ কোথায় সারাদিন?

বাড়ীতেই থাকি।

তা বটে! বসন্ত ধীরে ধীরে বলতে লাগল, আমি নিজেই এত ব্যস্ত থাকি যে বাড়ীর লোক কারুর কোন খবর রাখতে পারি না। বা আমার উদয় অস্ত কাজ হয়েছে, তাই ভাবছি, কিন্তু সময়ও যে পাই না—

কি ভাবছ বসন্তদা? সুবাসিনী বেশ শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলে।

বসন্ত বলে, ভাবছি অন্ততঃ পনেরদিনের মত কলকাতা ছেড়ে পালাব। কোথায় যাব, কাউকে জানাব না। সব কাজ থেকে ছুটী নিয়ে পনের দিন স্রেফ চুপ করে বসে থাকব। তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই, তুই যাবি ত?

হ্যাঁ, সুবাসিনী সানন্দে ঘাড় নাড়লে। ছায়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। ছায়ার গলা শোনা গেল, হ্যালো। তারপরই বলে, হ্যাঁ দিচ্ছি। ও ঘর থেকেই ছায়া চেঁচিয়ে বলে টেলিফোনে ডাকছে।

চেয়ারে বসে বসেই বসন্ত জিজ্ঞাসা করলে, কে?

ও ঘর থেকে ছায়া বলে জানি না, বলছেন খুব জরুরী।

বসন্ত বলে আঃ, কে আবার দেখি। চেয়ার ছেড়ে ও ঘরে যেতে যেতে বলে কলকাতায় এক মিনিট চুপ করে বসার যো নেই, বুঝলি সুবাস।

বসন্তদা ওঘরে চলে যাওয়া মাত্রই ছায়া দেবী এঘরে এসে খুব ব্যস্ত হয়ে বলে, বাথরুমে জল নেই যে দিদি, তাড়াতাড়ি পাম্পটা খুলে দিতে বল।

সুবাস বলে, সে কি? এই ত পনর মিনিট আগেও পাম্প চলছিল।

তা জানি না ভাই, আর একবার খুলে দিতে বল, না হলে তোমার দাদা বাথরুমে গিয়ে বিপদে পড়বে।

সুবাসিনী তাড়াতাড়ি পাম্প খোলবার জন্য সিঁড়িতে বেরিয়ে আসতেই শুনতে পেলে পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সুবাসিনী নিচে এসে পাম্প খোলার কথা বলতেই চাকরটা বলে, এই ত পাম্প বন্ধ করলুম দিদি, ওপরের ট্যাঙ্ক উপচে জল পড়ছিল।

সুবাসের মনে হোল আবার ওপোরে যায়, কিন্তু না, সিঁড়ির দরজা ঠেলতে আর ভাল লাগে না। কিন্তু কেমন যেন মনে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ বহুদিন পরে সে অনুভব করলে।

রাত্রে নিজের মাদুরখানি পেতে শুয়ে শুয়ে সুবাসের কেবলই মনে হতে লাগল, দাদা পনরদিনের জন্য আমাকে নিয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবে। সেখানে আর কোন কাজ থাকবে না, সে দাদাকে নিজের হাতে ভাল করে খাওয়াবে, যত্ন করবে, দাদার শরীরটা খুব ভাল হয়ে সেরে উঠবে। আহা, দাদাটা জীবন যে শুধু দেশের জন্য কাজ-কাজ করেই কাটালে, তার দিকে দেখার লোক কই! দাদার খাওয়ার কথা মনে হতেই সুবাস ভাবলে, দাদা এখন মুর্গি খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ইস্, ছি ছি, কিন্তু—কিন্তু দাদা যদি মুর্গি খেতেই ভালবাসে, আর ছায়া বলেছিল, ডাক্তার বলেছে ওঁর শরীরের জন্য মুরগী, মুরগীর ডিম এ সব খাওয়া দরকার, তা হলে না হয়—না হয় সুবাস নিজে ঐ মুসলমান বাবুর্চ্চির কাছ থেকে মুর্গি রান্না শিখেই নেবে। না হয় রান্না করে খাইয়ে বাসন মেজে তারপর সুবাস নিজে স্নান করে ফেলবে। দাদার যখন

দরকার! আর যদি ছায়াও ওদের সঙ্গে যায়, তা যাক্ না কেন, ও-ও ত দাদাকে খুব ভক্তি করে, ও হয়ত মুর্গি রান্না করতে জানে, তা হলে ও-ই রান্না করবে। দাদার যা চাই তা ত দিতে হবে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে অপরিসীম তৃপ্তি ও আনন্দে সুবাস সেদিন কখন যেন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দিন তিনেক পরে। সেদিন ছিল রবিবার—বেলা বারটা পর্যন্ত অফিস ঘরে বহু লোকের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে দাদা ওপোরে উঠে গেল। সুবাস আহারাদি সেরে নিয়ে বেলা একটা নাগাদ নিজের ঘরে গিয়ে অভ্যাসমত শুয়ে পড়ল। হঠাৎ তিনটে নাগাদ যখন সুবাস নিজের মাদুরে উঠে বসে কি কাজ করা যায় তাই ভাবছিল, ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে চটি জুতার শব্দ শোনা গেল। শব্দটা পরিচিত। সুবাস কান খাড়া করে শুনতে শুনতেই সিঁড়ির ওপোরের ধাপে দেখা গেল বসন্তদাকে। খুকী মেয়ের মত উৎফুল্ল হয়ে সুবাস একেবারে উঠে দাঁড়াল, বসন্তদা—

কেমন আছিস রে? শরীর খারাপ হয়েছে?

না ত, আমি ত ভালই আছি।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বসন্ত বলে, এ ঘরটা এত ছোট? আমার ঠিক জানা ছিল না রে। তা এ ঘরে রাত্তিরে শুস্ কি করে। ঘরের ভেতর উঁকি মেরে দেখে বসন্তদা বলে পা ছড়িয়ে শোয়া যায়?

হ্যাঁ, আমি ত এইখানেই শুই।

তোর বিছানা কোথায়? বসন্ত প্রশ্ন করলে।

আছে।

কই রে? মিথ্যে কথা বলিস্ নি। ঐ ত দেখছি বাক্সের ওপরে বাক্সটা রয়েছে আর পেরেকে ঝুলছে কাপড়টা, বিছানা কই?

ঘাড় হেট করে সুবাস বলে, বিছানার কি দরকার, এই মাদুর ত পাতাই রয়েছে, এইখানেই শুই।

বালিশ?

সুবাস চুপ করে রইল।

বালিশ নেই? বসন্ত প্রশ্ন করলে।

আছে; এইটে মাথায় দিই, সুবাস একটা কাপড়ের পুঁটলি দেখিয়ে দিলে।

ছি ছি ছি, এ মাথায় দিয়ে কি দিনের পর দিন শোয়া যায়! ইস্, আমার যদি একটু বলতিস্—বসন্তর কথায় অনুশোচনার ভাব ফুটে উঠল।

কথাটা চাপা দেবার জন্য সুবাস বলে, কষ্ট করে ওপোরে এলে কেন বসন্তদা, আমায় ডাকলেই ত পারতে।

ডেকেছিলুম ত। শুনলুম, শুয়ে আছিস, ঘুমাচ্ছিস। তাই ভাবলুম, দুপুরে ত কখনও ঘুমায় না, তা হলে কি শরীর-টরীর খারাপ হোল, না কি হোল—

বিস্মিত হয়ে সুবাস বলে, আমায় ডেকেছিলে? কই কেউ ত আমায় বলে নি।

নিঃশব্দ চরণে ছায়া ওপোরে উঠে এল। সিঁড়ির ওপোরের ধাপে দাঁড়িয়ে ছায়া বলে, তাই ও বলি, দাদা কোথায় গেল? এখন দেখছি, তাই বোনে গল্প হচ্ছে।

ও, তোমার ঘুম ভাঙ্গলো, বসন্ত হাসিমুখে ছায়াকে বলেছিল।

ছায়া বলে, ঘুমালুম আর কোথায়, একটু শুয়েছিলুম মাত্র।

বসন্ত বলে, শোন ছায়া। আমার ঐ হোল্ড-অলটা খুলে ওর থেকে পাৎলা তোষকটা, চাদর খানা, আর বালিশটা ওপোরে পাঠিয়ে দাও। তোমার ওপোর সকলের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি আর একটা মানুষ এ ভাবে ছাতের মেঝের একটা মাত্র মাদুর পেতে পড়ে থাকে, তুমি দেখ নি।

ব্যস্ত হয়ে সুবাস বলে, না না বসন্তদা, ও সব আমার চাই না। তোমায় ত প্রায়ই বাইরে যেতে হয়, তোমার বিছানাগুলো আমাকে দিয়ে—না না, সে হবে না।

বসন্ত বলে, তুই থাম্, তোর মোড়োলি করতে হবে না। আমি আজ কালের মধ্যে আমার একটা কিনে নেব 'খন। একটু থেমে বলে ওরে আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে, আমার জন্য তুই তোদের বাড়ীর সব চেয়ে ভাল ভাল বিছানা এনে পরিপাটি করে পেতে দিয়েছিল। তোদের সেই বিছানা বালিশে আমি কতকাল শুয়েছি বল, ও। বলেই ছায়ার দিকে চেয়ে বসন্ত বলেছিল, যাও যাও, নিয়ে এস, দেরী কোরো না।

ছায়া বলে, যাচ্ছি, কিন্তু আজ যে সাড়ে চারটের মিটিং আছে—

বসন্ত বলে মনে আছে। এখন ত মাত্র তিনটে। চারটের সময় বেরুলেই ঢের হবে।

কিন্তু খোগাড়, কাগজপত্র সব—ছায়া মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। কিছু ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি বিছানাটা আগে নিয়ে এস আমি এখানে পেতে দিয়ে তবে যাব।

ছায়া সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। এবার তার পায়ের আওয়াজ বেশ ভাল ভাবেই পাওয়া গেল।

সুবাস বড়ে, বসন্তদা,বাইরের যাবার কথা যে বলেছিলে, কবে যাবে।

কবে যাব তাই ভাবছি রে, কিন্তু শিগ্‌গির যেতে পারব বলে ত মনে হয় না। কাজের পর কাজ এত এসে পড়ছে।

কাজ তোমার কবে থাকে না দাদা? আমি ত প্রথম থেকেই দেখছি তোমার কাজের শেষ নেই।

মাদুরের এক কোণায় বসে পড়ে বসন্ত বলেছিল, এ তুই বুঝবি না সুবাস, এখন আমাদের কি অবস্থা তুই বুঝবি না। তোদের গাঁয়ের কাজ ছিল এক রকম আর এখন অন্য অবস্থা। তারপর যেন আত্ম সমাহিতের মত বলতে লাগল, তোদের গাঁয়ের কাজ ছিল কতকগুলো সরল বিশ্বাসী কর্মঠ লোককে নিয়ে তাদের দেশের উন্নতির জন্য এক সঙ্গে হৈ হৈ করে কাজ করা। দু দিনে একটা সাকো তৈরী করালুম, সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল। একটা লাঠির আখড়া হোল,ছেলের দল কুস্তি করে লেগে পড়ল। গ্রামরক্ষী দল পাহারা দিতে লাগল, দেশের ছেলে বুড়ো সকলেই তার উপকারিতা বুঝতে পারলে। সে কাজে কোন দুশ্চিন্তা ছিল না, কেবলই আনন্দ। তারপর যখন অসহযোগ করেছি তখন খালি ভাঙ্গার কাজ। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে লোকের ক্ষোভ ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছি; তাতে বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা কিছু ছিল না, অন্ততঃ আমাদের ছিল না, সেটা হয়ত আমাদের ওপোরওয়ালাদের ছিল, কিন্তু এখন?

সুবাস চুপ করে শুনছিল। বসন্তদা আত্মবিশ্লেষণের সুরে বলছে, এখন অবস্থা একেবারে অন্যরকম। যে কোন একটা কাজ করবার সময় এখন ভাবতে হয়,আজ কি হবে, এক বছর পরে কি হবে, দশ বছর পরে এর ফল কি দাঁড়াবে। সে আমলে দশ বিশ টাকা চাঁদা সম্বল করে ছোট খাট কাজ করতুম, এ আমলে কোটী কোটী টাকা নিয়ে কোন কূল কিনারা পাই না; নিজেদের দল সামলানো, অসংখ্য কর্ম্মচারীদের সামলানো, দেশের বিভিন্ন মানুষ সামলানো। সে আমলে যখন যা উচিত বলে মনে করেছি দু'চার জনের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজে নেমে পড়েছি, বাহবা পেয়েছি। এ আমলে যা করি তাইতেই পাঁচশ' রকমের সমালোচনা, হাজার রকমের নিন্দে। সে আমলে গাঁয়ের লোক সকলেই ভালবাসত, সকলকেই বিশ্বাস করতে পারতুম, এ আমলে ভাল কেউ বাসে না, বিশ্বাস কাউকেই করা যায় না। সব চেয়ে বড় কথা কি জানিস, এ আমলে যাদের সঙ্গে কাজ করতে হয়, যাদের চালিয়ে নিতে হয়, তারা প্রায় সকলেই আমার চেয়ে বিদ্যা ও বুদ্ধিতে অনেক বড়। কোন্ দিক দিয়ে যে ফাঁসিয়ে দেবে তা ঠিক বুঝতেই পারি না।

বিস্মিত হয়ে সুবাস বলেছিল, বল কি বসন্তদা, তোমার চেয়েও বিদ্যাবুদ্ধিতে বড় কেউ আছে?

হতাশ হয়ে বসন্ত বলেছিল, সকলকেই রে সকলেই। সত্যি কথা বলতে কি, ওদেরই কাছ থেকে কাজ শিখে নিয়ে ওদের চালাতে হয়। এর জন্য যে কী এক অমানুষিক দুশ্চিন্তা থাকে তা এই কাজ যে না করেছে সে বুঝতে পারবে না। গলা বাড়িয়ে বসন্তদা জিজ্ঞাসা করলে কে? ছায়া?

বালিশ বিছানা বগলে করে ছায়া উঠে এল। বোধ হয় সে কিছুক্ষণ ধরে নীচের ধাপে চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল।

কোন কথা না বলে ছায়া উঠে এসে বলে, ওঠ দিদি, বিছানাটা ঠিক করে পেতে দিই।

ব্যস্ত হয়ে সুবাস বলে, আরে না না, তোমায় পাততে হবে না। ও সব রাখ রাখ, আমি পেতে নেব'খন। তারপর যেন আপন মনেই বলে বসন্তদার যেমন কাণ্ড! এই সব ভাল জিনিষগুলো এখানে দুদিনে ধুলো ধরে ময়লা হবে—

বসন্ত বলে, তা হোক্। তুই যে এতদিন পরে মুখ

বুজে মাদুর পেতে পুঁটলী মাথায় শুয়ে থাকিস এ কথা যদি একদিনও বলতিস্—

সুবাসের হাতে বিছানা বালিশ দিয়ে ছায়া বলে, সাড়ে তিনটে বাজল।

বসন্ত বলে, হ্যাঁ, এই যে উঠ'ছি। উঠতে উঠতে বসন্ত বলে, খালি কাজ আর কাজ, বুঝলি সুবাস! সকলেই নিজের জন্ত টানছে, কিন্তু একমাত্র তোকেই দেখলুম, যে বসন্তদার জন্ত টানে।

বসন্ত ও সুবাস দুজনেই উঠে দাঁড়াল। ছায়া সিঁড়ি দিয়ে আগে আগে নেমে গেল, বসন্ত পেছন পেছন। সুবাস নামতে যাচ্ছিল, বসন্ত বলে, তুই তোর বিছানা ঠিক করে পেতে রেখে তবে নামবি। আমি দেখতে চাই যে, তুই বিছানা ঠিক করে পেতেছিস।

রাত্রি নটার পর বসন্ত আর ছায়া দু' জনেই একসঙ্গে ফিরে এল। তখনও অফিস ঘরে দু'তিনজন লোক ধরনা দিয়ে বসেছিল। ওরা দুজনেই অফিস ঘরে কিছুক্ষণ বসল। ইতিমধ্যে ধুরাজ চাপরাসী এসে কয়েক কাপ চা দিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ ছায়া একলা ভেতরে এসে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তার অত্যন্ত মিষ্টি গলায় ডাকলে দিদি!

সুবাস সাড়া দিলে, কি?

একবারে ওপোরে আসবে দিদি, একটু দরকার আছে।

সুবাস ছায়ার সঙ্গে ওপোরে এল।

ছায়া বলে, তুমি ওপোরে তোমার ঘরে চল দিদি, আমি আসছি একটা কথা আছে।

কিছুটা অবাক হয়ে সুবাস বলেছিল, কি কথা?

চল না ওপোরে, আমি এখুনি আসছি। বলতে বলতেই ছায়া দোতলায় ঢুকে গেল। দোতলার সিঁড়ির দরজা খোলাই ছিল, ছায়া ভ্যানিটিব্যাগ থেকে চাবি বার করে ঘরের দরজা খুললে। বাবুচ্চি তখন দোতলার বোধ হয় রান্না শেষ করে বাইরের দালানে টুলে বসে বসে সিগারেট টানছিল। দিদিমণিকে দেখেই জলন্ত সিগারেটটা জানলার বাইরে ফেলে দিলে। দোতলার সিঁড়ির দরজার একটা চাবি থাকে ছায়ার কাছে, অপরটা থাকে এ বাড়ীর কনষ্টেবলের হেপাজতে বাবুচ্চি এলে যে কনষ্টেবল ডিউটিতে থাকে সেই এ দরজা খুলে দিত। অন্ত কেউ সে চাবি পেত না।

সুবাস চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপোরে উঠে গিয়ে ছাতের প্যারাপেট ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

দিদি, সুবাস ছাত থেকে সরে এসে বলে, এই যে।

ছায়া একটা বড় শিশি সুবাসের দিকে এগিয়ে ধরে খুব অন্তরঙ্গভাবে বলে, এই শিশিটা তাই তুমি রেখে যাও। আমি ছাড়া আর কাউকে এ শিশি তুমি দেবে না বা দেখাবে না, বুঝলে। মানে, তোমার দাদা যদি খোঁজ করে, তাহলে তুমি কিছুতেই এ শিশি তাকে দেবে না।

কেন? কি আছে এতে? সুবাস প্রশ্ন করেছিল।

ছায়া একটু থেমে বলে, মানে অর্থাৎ তোমাকে বলতে বাধা নেই, এটা হোল তোমার দাদার জন্ত কেনা ঘুমের ওষুধ। কিন্তু ভাই, এটা-আবার বিষও বটে। একটা বড়ি খেলে ঘুম আসে, বড় জোর দুটো বড়ি। কিন্তু তোমার দাদার আজকাল রাত্রিতে ঘুম হয় খুব কম। তিনি যখন-তখন এই বড়ি খেতে চান। কিন্তু বেশী খাওয়া ত ভাল নয়, অথচ নীচে থাকলে তাকে আটকাতে পারা যায় না। তাই ডাক্তার বলেছেন, শিশিটা লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু নীচে লুকিয়ে রাখার জায়গা নেই, তাই তোমার কাছে দিয়ে যাচ্ছি।

সুবাস বলে, ঠিক আছে, আমি আমার বাক্সয় চাবি দিয়ে রেখে দিচ্ছি।

আঁৎকে উঠে ছায়া বলেছিল, না-না, খবর্দার নয়, বাক্সয় কক্ষনো রেখ না। বাক্স ছাড়া অন্ত কোথাও, ধর ঐ ট্যাকের পেছনে-টেছনে এমন কোথাও রাখ, যেখানে কেউ সন্দেহও করবে না যে, ওষুধের শিশি সেখানে থাকতে পারে। দাদা যদি ঘুমের বড়ির জন্ত তোমার কাছে খোঁজ করতে আসে তাহলে হয়ত তোমার বাক্স খুলতে চাইবে। সেইজন্ত—

অল্প হেসে সুবাস বলেছিল, ও, বুঝতে পেরেছি—

এ্যাঁ, কি বুঝলে? ছায়া সভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল।

সুবাস বলে, ঠিক আছে, দাদা জিজ্ঞাসা করলে বলব, শিশি আমি কোথায় পাব, এটা ত আমার বাক্স, তুমি দেখ না কেন, বলে বাক্সটা সামনে ধরে দেব।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছায়া বলে, হুঁ, এইটাই আমি বলছিলুম।

ছায়ার হাত থেকে সুবাস শিশিটা গ্রহণ করলে। ছায়া

বলে, কি বলব দিদি, সারাদিন নানাকাজে নানা চিন্তায় উনি এমন তিতিবিরক্ত হয়ে থাকেন যে এক মিনিট শান্তি পান না। রাত্রিতেও বোধহয় সেই সব চিন্তাই করতে থাকেন, তাই ঘুম আসতে চায় না, বড়ি খাওয়ার রোঁক চাপে, কিন্তু বেশী খাওয়া ত ভাল নয়। একটা কিম্বা বড়জোর দুটো পর্য্যন্ত খাওয়া চলে, কিন্তু হঠাৎ যদি দশ বারোটা কেউ খায়, তাহলে একেবারে শিবের অসাধ্য। কোন ডাক্তার আর সে ঘুম ভাঙাতে পারবে না।

শিশিটা ট্যাকের পেছনে লুকিয়ে রেখে সুবাস বলেছিল, তা হলে এ রকম খুনে-ওষুধ রাখ কেন ভাই?

কি করব? ডাক্তারের হুকুম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ছায়া আর একবার সাবধান করে বলে দিয়েছিল, দেখো ভাই, যেন এই ওষুধের কথা অন্য কাউকে বলে ফেলো না।

না-না, কোন ভয় নেই, সুবাস আশ্বাস দিয়েছিল।

দোতলায় কাছ বরাবর এসে সুবাস বলেছিল, কিন্তু আজই রাত্তিরে যদি একটা বড়ি খাবার দরকার হয়, যদি ঘুম না হয় একেবারেই—

ছায়া বলেছিল, দুটো বড়ি আছে ওঁর ঘরে, তারপরেও যদি খোঁজ করে, বলব নেই, কাল দোকান থেকে আবার আনতে হবে! তারপর কাল বিকেলে তোমার কাছ থেকে আবার একটা অথবা দুটো বড়ি নিয়ে যাব।

খুশি হয়ে সুবাস বলেছিল, আচ্ছা, ঠিক আছে।

ছায়া আগে আগে নামতে নামতে ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসিমুখে বলেছিল, কি করব? অসুখে সকলেই ছেলেমানুষের মত হয়ে যায়, তাই ছেলে ভুলানোর ব্যবস্থাই রাখতে হয়। উপায় কি?

ছায়া একতলায় অফিস ঘরেই ফিরে গিয়েছিল।

পরের দিন সকালে দোতলায় চা জলখাবার দিয়ে এসে সুবাস যথারীতি ঝুটনো কুটতে বসেছে। ঠাকুর রান্না ঘরে ভাত চোটাচ্ছে, এমন সময় ছায়ার বিহি গলা পুনরায় শোনা গেল। সে দুরাজ চাপরাশীকে ডাকছে।

দুরাজ জলাই-করা গেঞ্জিতে চা খাচ্ছিল। ছায়ার ডাকে বাড়া দিয়ে বাকী চা-টুকু তাড়াতাড়ি শেষ করে সে ওপোরে চলে গেল। এই সময় দুরাজকে ডাকাটা খুব অস্বাভাবিক নয়, মাঝে মাঝে সাহেবের ফাইল-টাইল দরকার হলে দুরাজের ডাক পড়ে বৈকি!

কিন্তু এক মিনিট পরেই দুরাজ নেমে এসে যখন বলে দিদিমণি, সাহেব আপনাকে ডাকছেন তখন যেন কেমন একটু অস্বাভাবিক লাগল। তবে আজকাল ত সাহেব দিদিমণির খোঁজ খবর প্রায়ই করছেন, কিন্তু দুরাজকে দিয়ে ডাকার অর্থ কি, কে জানে?

এ ভাবে হয়ত ঠাকুর কিম্বা দুরাজ ভাবতে পারে, সুবাস কিন্তু কিছুই ভাবে নি। সে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে ওপোরে ছুটেছিল, ভেবেছিল, শিগগিরই বোধহয় বিদেশে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে, সেই জন্যই বসন্তদা ডাকছে।

অনেকখানি আশা নিয়ে ওপোরের ঘরে গিয়ে সুবাস বলে, আমায় ডাকছ বসন্তদা।

বসন্ত হাতের সিগারেটে জোরে জোরে টান দিচ্ছিল। কেমন যেন ব্যঙ্গস্বরে বলে তোর চাবিটা দে ত, বাক্সটা একবার খুলব।

চাবি? সবিস্ময়ে সুবাস দেখল, বসন্তদার টেবিলের ওপোর ওর নিজের ছোট তোরঙ্গটা রয়েছে। ছায়া কিন্তু ধারে কাছে কোথাও নেই।

বাক্স এখানে কে আনলে বসন্তদা? সুবাস জিজ্ঞাসা করেছিল।

যেই আনুক, বাক্সটা একবার খোল্, আমার দরকার আছে। বসন্ত কড়া গলায় হুকুম করেছিল।

সুবাস বলে চাবি ওপোরে আছে, আমি এখনই এনে দিচ্ছি।

সুবাস ওপোরে যেতে যেতে মনে মনে খুব হেসেছিল। ছায়া দেবীর বুদ্ধির তারিফও করেছিল।

বসন্তদার নিশ্চয়ই বড়ির দরকার হয়েছে, তাই বাক্স টেনে নিয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় বড়ি?

বড়ি নিরাপদে ট্যাকের পেছনে লুকিয়ে আছে।

চাবি এনে ঘরে ঢুকতেই বসন্ত বলেছিল, খোল।

সুবাস বাক্স খুলতেই বলেছিল, কি আছে সব বার কর ত?

সুবাস হাসি হাসি মুখে ওর জামা কাপড় সমস্ত বার করে টেবিলের ওপোর রাখলে।

বাক্সর তলায় কাগজে মোড়া কি একটা রয়েছে।

দেখেই সুবাসের মনে পড়ে গেল। সেটা আর সে বার করতে চাইছে না।

ওটা কি? বসন্ত হাত বাড়ালে।

ও তোমার কিছু নয় বসন্তদা, ওটা আমার একটা— হাসিমুখে সুবাস সেই মোড়কটা চাপা দিতে চেষ্টা করলে।

বসন্ত এগিয়ে এসে মোড়কটা হাতে তুলে নিয়ে কাগজ খুলে দেখলে সোনার চুড়ি ও হার। তীক্ষ্ণ রুক্ষ কটাক্ষ হেনে বসন্ত বল্লে, এ সব কোথায় পেলি?

ও—ও আমায় একজন দিয়েছে, সুবাস উত্তর দিলে।

কে? কবে দিয়েছে? সুবাসকে নিরুত্তর দেখে বসন্ত বল্লে, কে দিয়েছে বল্, তোকে বলতে হবে।

সুবাস ঘাড় হেঁট করে নিজের পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেজেটা খুঁটতে লাগল।

গম্ভীর ভাবে বসন্ত বল্লে, এখনও বল, না বল্লে তোমার রক্ষা নেই, এটা মনে রেখ।

মুখ তুলে সুবাস দৃঢ়কণ্ঠেই বলেছিল, বলতে আমি পারব না বসন্তদা, আমাকে মাফ্ কর।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটাকে ছাইদানীতে ফেলে সুর বদলে বসন্ত বেশ একটু মিষ্টি গলায় আস্তে আস্তে ডাক্‌লে, সুবাস—

কি?

আমাকেও বলবি না? আমার কাছে তোর ত কিছুই গোপন নেই রে!

সুবাসের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। থেমে থেমে, ধীরে ধীরে বল্লে, কি করে বলব বসন্তদা, যে দিয়েছে তার কাছে আমি কথা দিয়েছি, তার নাম করব না বলে।

খুব মিষ্টি করে বসন্ত বল্লে, আমাকে বলতে দোষ নেই রে। আমাকে তুই দাদা বলে, গুরু বলে মনে করিস ত? গুরুর কাছে সব কথা খোলাখুলিভাবে বলতে হয়।

বসন্ত উৎসুক হয়ে সুবাসের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বাঁ হাতের ওপোর ডান হাতটি রেখে আঙুলের নখগুলি দেখতে দেখতে সুবাস বল্লে, বলব?

বলো, বসন্তর কথায় প্রবল এক আকৃতি।

ছায়া দিদিমণি আমাকে দিয়েছিল।

ছায়া? চমকে উঠে প্রায় চীৎকার করে উঠল বসন্ত।

ও ঘর থেকে এ ঘরে এসে ছায়া বল্লে, কি?

হুঁ। বসন্ত স্থির হয়ে নড়েচড়ে বসল। তারপর ছায়ার দিকে চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ স্বরে বল্লে, ও বলছে, এ গয়না তুমি ওকে দিয়েছ!

ছায়া মুচকে হেসে বল্লে, তা ছাড়া আর কি বলবে?

ছায়ার কাছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী সুবাস ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। তার হাত পা যে কাঁপছিল তা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল।

তোর হাত-পা কাঁপছে কেন? বসন্ত প্রশ্ন করলে।

কই না ত, সুবাস উত্তর দিলে।

গম্ভীরভাবে বসন্ত বল্লে, দেখ সুবাস, সর্ব্বনেশে পথে পা বাড়াচ্ছিস্। আমি সমস্ত খবর পেয়েছি। এই গয়না তুমি আজই ভোরে পেয়েছ—

বাধা দিয়ে সুবাস বল্লে, না বসন্তদা—

তুই থাম্। আমি জানি, আজ ভোর বেলা অনন্ত এসে পেছনের গলিতে দাঁড়িয়ে শিস দিয়েছিল। তুই বাথরুমের পেছন দিয়ে দড়ি নামিয়ে দিতে সে ঐ প্যাকেট দড়িতে বেঁধে দেয়, তুই সেটা টেনে তুলে নিয়েছিস্। কী? কিসের মতলবে এই সব কাজ হচ্ছে?

না বসন্তদা, অবাক্ বিস্ময়ে সুবাস প্রতিবাদ করতেই ছায়া টেবিলের তলা থেকে হেঁট হয়ে একটা লম্বা পেটো ঘড়ি তুলে বলেছিল, এই ঘড়িটা চিন্‌তে পার দিদি, এইটা তুমি ওপোর থেকে নামিয়েছিলে এবং পরে এটা ছাতের কোণে ফেলে দিয়েছিলে।

সুবাস অবাক হয়ে একবার ছায়ার মুখের দিকে আর একবার বসন্তর মুখের দিকে দেখে ঘাড় হেঁট করে রইল।

বসন্ত ধীরে ধীরে বলতে লাগল, যে-অনন্ত আমাকে খুন করার জন্য বোম্বা মেরে হাজত থেকে পালিয়ে আজও ফেরার হয়ে বেড়াচ্ছে, যে এখন আমার শত্রু, আমার দেশের শত্রু, তুমি এখন আমার বাড়ীতে বাস করে সেই অনন্তর সঙ্গে হাত মিলিয়েছ, তার কাছ থেকে লুকিয়ে ঘুষ নিচ্ছ। সেই জন্যই ছায়া ঠিকই সন্দেহ করেছিল যে, তোমরা আমাকে বিষ খাওয়াতেও পার। উঃ ভগবান, দুনিয়ায় বিশ্বাস আর কাউকেই করা যায় না!

ছায়া বল্লে অনন্তবাবুর সঙ্গে দিদির আগেও ত খুব ভাব ছিল না?

হ্যাঁ, ভোটের সময় সেই বিশ্বাসঘাতকটার জন্য এই সুবাসই আমার কাছে সুপারিশ করেছিল।

বসন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, দেখ সুবাস, তুই আমার অনেক করেছিস্, সেই ভেবে তোকে আমি এখনও কোন বিপদে ফেলতে চাই না, কিন্তু আমার শেষ কথা, আজ তুই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবি। আজ বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে আমি শুনতে চাই যে, তুই আর এখানে নেই।

ড্রেসিং আলমারী থেকে পাঞ্জাবীটা বার করে পরতে পরতে বসন্ত নীচে অফিস ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। সুবাস কোন কথা না বলে ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে ওপোরে উঠে গেল। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে সে বোধ হয় ভেবেছিল, নীচে নামবে, অথবা ওপোরে উঠবে!

ঠাকুর এসে ডাকলে, দিদি!

সুবাস নিজের ঘরেই বসে ছিল। চেয়ে দেখলে।

সেই কোন সকালে ওপরে উঠে এসেছ, তারপর আর নামলে না কেন দিদি? কি হয়েছে?

না, কিছু নয়, সুবাস উত্তর দিলে।

খাবে না? বেলা হয়েছে অনেক।

সুবাস মুখ তুলে ঠাকুরের দিকে চেয়ে দেখে বলে, তোমরা খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে নাও ঠাকুর। আমি কিছু খাব না।

কেন দিদি, জ্বর হয়েছে?

না, তবে শরীরটা খারাপ। তুমি যাও ঠাকুর, এখন কিছু ভাল লাগছে না।

ইতস্তত করে ঠাকুর বললে, তাহলে ডাক্তারকে দেখিয়ে একটু ওষুধ টষুধ খেলে হোত' না—

ওষুধ? সুবাসের মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হ্যাঁ, ওষুধই খাব, তবে সে ওষুধ আমার কাছেই আছে, আনতে হবে না। দেখ ঠাকুর, ওষুধ খেয়ে আমি একটু ঘুমাব, তুমি দেখো, যেন কেউ আমাকে বিরক্ত করতে না আসে। সুবাসের চোখে মুখে আনন্দ যেন উপ্‌চে পড়ছে।

ঠাকুর আস্তে আস্তে নেমে গেল। টানের পেছন থেকে সুবাস ছাদার দেওয়া শিশিটা বার করলে। আঃ, এই শিশি, ঘুমের ওষুধ! দরজাটা বন্ধ করে দি'।

খাবার জলের ঘটিটা ভর্ত্তিই আছে। এক সঙ্গে দুটো দুটো বড়ি মুখে দিয়ে জল দিয়ে গিলে ফেললে। মেঝেয় পড়ে থাকব? না, বসন্তদার দেওয়া এই বিছানা, বসন্তদার ব্যবহার করা মাথার বালিশ। সুবাস বিছানাটা পাড়লে, ধুলো ঝাড়লে, বালিশটা ঠিক করে রাখলে, আবার চারটে বড়ি খেলে, গোটা শিশিটা খেতে হবে, ঘুম না ভাঙ্গে। কিন্তু দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ থাকলে ওদের যে অসুবিধে হবে! আবার দরজা ভাঙ্গাভাঙ্গি করতে হবে। বিছানা থেকে উঠে দরজার ছিটকানীটা খুলে দিলে, দরজা কিন্তু তেমনই রইল। মাথাটা ঘুরছে, গা কাঁপছে, বিছানায় বসে বাকী অনেকগুলো বড়ি এক সঙ্গে মুখে পুরে কতক চিবিয়ে কতক জল দিয়ে গিলে শেষ করে ফেললে। আঃ এবার ঘুম। আঃ চোখের সামনে কত রকম ছায়া ভাসছে। কত কথা, কত মুখ, কত দৃশ্য একের পর এক ভেসে উঠ্‌ছে। স্পষ্ট, কাপসা, আনন্দের, দুঃখের কত চিত্র। হঠাৎ তার কান্না এল, এঁ্যা, আমি আর বাঁচব না! আমি বাঁচব না? ওগো কে কোথায় আছ, যে পার, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমি বাঁচতে চাই, আমি বাঁচতে চাই। হ্যাঁ হ্যাঁ বাঁচবই ত, নিশ্চয়ই বাঁচব, ঘুমের ওষুধ খেয়েছি, ঘুমের মধ্যেই বাঁচব! আঃ, চোখ জড়িয়ে আসছে, চোখ জড়িয়ে আসছে। কে? মা, জেঠাই? আঃ, আমার ধর মা, আর আমি তোমার অবাধ্য হয়ে একলা বাইরে যাব না মা। কে দাদা, তোমার সাইকেলটা আছে? সেই যে সেই জীবনে প্রথম এবং শেষ সাইকেল চড়েছিলুম—

বসন্তদা, তোমার সব কথাই শুনেছি, শেষ কথাও শুনলুম। তুমি বাড়ী ফিরে শুনবে, আমি চলে গেছি, অনেক—অনেক দূরে চলে গিয়েছি···

ঐ যে—ঐ মাঠ ভর্ত্তি লোক! বসন্তদা বক্তৃতা দিচ্ছে কি সুন্দর না বলে বসন্তদা। আমি শুনতে পাচ্ছি, আরে এ যে স্পষ্ট দেখতেও পাচ্ছি। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বসন্তদা বলছে, 'সব ক্ষতি সহ্য করা যায়, কিন্তু আদর্শের অপঘাত ভালবেসে যাকে বিশ্বাস করা যায় সেই বিশ্বাসের অপঘাত—

সুবাসের চোখ বেয়ে জল এল। ধীরে ধীরে সে বোধ-হয় উচ্চারণ করেছিল, আমি অবিশ্বাসের কাজ করি নি বসন্তদা, অবিশ্বাসের কাজ করিনি। বিশ্বাস কর বসন্তদা, আমি অবিশ্বাসী নই, আমি অবিশ্বাসী নই বসন্তদা—

আমি অবিশ্বাসী নই, আমি—

বিজ্ঞান সাধক হোমী ভাবা

শ্রীবাসুদেব সিংহ

বিজ্ঞানের আকাশে নক্ষত্রের আলোতে লেখা একটি নাম হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা। প্রবাসে দৈবের বশে জীবভাষা যে ক'জন ভারতসন্তানের খসে পড়েছে পরমাণু বিজ্ঞানী ডাঃ ভাবা তাঁদেরই একজন। এই অকৃতদার নিরলস ললিতকলা-প্রিয় বিজ্ঞানীর মানসিকতা সত্যই প্রতি ভারতীয় বিজ্ঞানীর অনুকরণীয়। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী তাঁর মন্ত্রীসভায় ডাঃ ভাবা'কে গ্রহণ করতে চাইলে তিনি সম্মত হন নি। কারণ তিনি জানতেন রাজনীতির সর্পিল আবর্তে নিজেকে বিকিয়ে না দিয়ে ভারতের পারমাণবিক শক্তিকে সংহত করাই হবে মাতৃভূমির শ্রেষ্ঠ পূজা। ভারতভূমিকে এই বিজ্ঞানসাধক ভালবেসে-ছিলেন মনে প্রাণে। খনিজ-সম্পদ সমৃদ্ধ ভারতের মৃত্তিকার প্রকৃত মূল্যায়ন করে তিনি চেয়েছিলেন বিজ্ঞানের ফসল ফলাতে। পৃথিবীতে যুদ্ধ নয় শান্তি, শান্তির কাজেই বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করতে হবে, এই ছিল ডাঃ ভাবার জীবনব্রত। শান্তি, প্রেম ও মৈত্রীর ত্রিশরণ মন্ত্র নিয়ে এই তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী ১৯৫৬ সনে জেনেভাতে বিজ্ঞান-সভার সতীর্থদের আহ্বান করে বললেন, "আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি শান্তি ছাড়া অন্য কাজে পরমাণুকে ব্যবহার করবো না, ব্যবহার করতে উৎসাহ দেবো না। মানুষের হাতে যে শক্তি এসেছে তা দিয়ে সভ্যতাকে আমরা ধ্বংস করবো না, তাকে কাজে লাগাবো মানুষের কল্যাণে।" গত পনেরো বছর ধরে ডাঃ ভাবার যোগ্য নেতৃত্বে ভারত পারমাণবিক শক্তি অর্জনের পথে ধীরে ধীরে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। আজ তাঁর মৃত্যুর পরে ভারতের সেই জয়যাত্রা শান্তির পথে শ্রেয়ের পথে, সমৃদ্ধির পথে, ধাবিত হোক।

১৯১০ সনে এক সম্ভ্রান্ত পারসী পরিবারে ডাঃ ভাবার জন্ম। বোম্বাইয়ে স্কুল ও কলেজের শিক্ষা সমাপন করে মাত্র সতেরো বছর বয়সে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান তিনি। সেখানে তিনি ১৯৩০ সনে মেকানিক্যাল ইঞ্জি-নিয়ারিং-এ ট্রাইপস নিলেন; কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার তিনি হলেন না। গাণিতিক পদার্থবিদ্যার গবেষণা তাঁকে অনেক বেশী আকৃষ্ট করল। গণিত শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ

বিজ্ঞান সাধক হোমী ভাবা

হয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিল কুজবল ট্রাভেলিং ফেলোশিপ। এই ফেলোশিপ নিয়ে তিনি ছুটিকে গিয়ে পেটলি, রোমে এনরিকো ফার্মি এবং আটট্রেটে কার্যারত প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যার মহারথীদের সান্নিধ্যে তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানের চর্চা করেন। মহাজাগতিক রশ্মির বিচ্ছুরণ এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় মৌলিক গবেষণার মধ্যে ডাঃ ভাবা বিজ্ঞানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৩৭ সনে তিনি বিখ্যাত পদার্থবিদ হইটলারের সঙ্গে একত্রে একটি নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। উচ্চগতিসম্পন্ন বিশেষ আপেক্ষিকবাদের আইনষ্টাইনীয় তত্ত্ব পর্যালোচনা

করে ১৯৬১ সনে মাত্র ৩১ বছর বয়সে এই তরুণ বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। সে সময়ে তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হন। দেশবিদেশের বহু বিজ্ঞানমন্দিরের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ সনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ডাঃ ভাবা ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দিরের বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হন। তিন বছর তিনি ঐ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের পরেই ১৯৪৮ সনে পারমাণবিক শক্তি সংস্থা গঠিত হয়। বিজ্ঞান-প্রেমিক জহরলাল নেহেরুর আহ্বানে তিনি এই সংস্থার কর্ণধার হলেন। নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মেঘনাদ সাহা ও হোমী জাহাঙ্গীর ভাবার নেতৃত্ব ভারতের তরুণ বৈজ্ঞানিকদের নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। তাঁরা বুঝেছিলেন গবেষণা ক্ষেত্রে এমন একটা সার্বিক প্রস্তুতি দরকার যাতে আমরা যুগ ও জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবীর গতি-প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারি। তরুণদের মধ্যে প্রতিভার অন্বেষণ এবং তাঁদের নিরঙ্কুশ বিকাশ ও বর্ধনের সহায়তা করা প্রবীণের মহান কর্তব্য। কোল্-কাতার সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এবং টাটা ইনস্টিট্যুট অব ফান্ডামেনটাল রিসার্চ (বোম্বাই) তাঁদের অন্যতম সৃষ্টি। টাটা ইনস্টিট্যুট ডাঃ ভাবার একক প্রচেষ্টা বলা চলে। এই দুই বিজ্ঞান মন্দিরে পরমাণুলোকের নব্য চিন্তাধারায় লালিত হয় তরুণ বিজ্ঞানীর মন।

ডাঃ ভাবার কর্মসাধনার তীর্থভূমি পারমাণবিক শক্তি সংস্থার একটি সংক্ষিপ্ত লেখাচিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। শ্রমশিল্প ও কৃষির উন্নতিকল্পে পারমাণবিক শক্তি কাজে লাগাবার জন্য ভারত-সরকার একটি বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বোম্বাই শহর থেকে ১৪ মাইল দূরে ট্রম্বেতে ভারতের পারমাণবিক গবেষণার স্নায়ুকেন্দ্রটি ১৯৫৪ সনে স্থাপিত হোলো। দু'হাজার মাইল এলাকা জুড়ে এর কর্মকাণ্ড। ডাঃ ভাবার উপর এই কেন্দ্র পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়। ১৯৫৬ সনের আগষ্ট মাসে ডাঃ ভাবা পরীক্ষামূলক ভাবে 'অপ্সরা' নামক পরমাণুচুল্লীর নক্সা রচনা ও নির্মাণ করেন। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে এটাই প্রথম। আজ 'অপ্সরা' ভারতের বিজ্ঞানীদের নিউট্রন ফিজিক্স বিষয়ে গবেষণা এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদনে সফলতা করছে। এরপর ১৯৬০ সনে ৪০ হাজার কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন দ্বিতীয় পরমাণু-চুল্লী তৈরি হয়—এ ব্যাপারে কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে কানাডা ভারতকে সহায়তা করেছে। তার পরের বছর ডাঃ ভাবার নেতৃত্বে 'জারলিনা' নামক তৃতীয় পরমাণু চুল্লীটি নির্মাণ করেন একদল দুরন্ত ভারতীয় কারিগর। নানা দিকে নানা জটিল বিষয়ের গবেষণা চলে এখানে। তিনটি টেষ্ট-রিয়াক্টর প্লুটোনিয়াম এবং ইউ-রেনিয়াম কারখানা, কৃষিসার উৎপাদন কারখানা, আরব সাগরের লবণাক্ত জলকে লবণ-মুক্ত মিষ্ট জলে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা আছে।

শ্রম-শিল্প ও কারিগরী-বিজ্ঞানের প্রয়োগশালার দ্রুত উন্নয়নে আলানি একটি প্রধান অন্তরায়। ডাঃ ভাবা বলেছিলেন, ভারতে মোট যে পরিমাণ কয়লা জমা আছে তা যে কোন বস্তুশিল্পে উন্নতিশীল দেশের তুলনায় খুবই কম। আর মাটির নীচের তেলও দিন দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাই ডাঃ ভাবা ভারতবর্ষের ইউরেনিয়ম এবং থোরিয়াম সম্পদকে পারমাণবিক আলানি প্রস্তুতির কাজে লাগাতে অগ্রণী হলেন। বোম্বাই শহর থেকে ৬২ মাইল উত্তরে এক জনবিরল প্রান্ত তারাপুরে গড়ে উঠলো পারমাণবিক শক্তির কারখানা '৬৩ সনের ডিসেম্বর মাসে। তারাপুর থেকে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি পশ্চিম অঞ্চলের দুই প্রদেশ মহারাষ্ট্র—গুজরাটের বৈদ্যুতিক শক্তির ঘাটতি পূরণে সাহায্য করবে। তারাপুরের পর রাজস্থানে কোটার নিকটবর্তী রাণা প্রতাপ সাগরে আর একটি কারখানা গড়ে উঠছে কানাডার সহায়তায়। এর ফলে রাজস্থানের বিভিন্ন উন্নতিশীল অঞ্চলের বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব মেটানো সম্ভব হবে। শান্তির কাজে পরমাণু শক্তির ব্যবহার পরিকল্পনা অনুসারে ডাঃ ভাবা তৃতীয় কারখানা স্থাপনের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন মাদ্রাজ প্রদেশের মহাবলীপুরমের নিকট "কল্পক্কমে"। ফ্রান্সের সহায়তায় এইটির কাজ আরম্ভ হবে। পারমাণবিক শক্তি সংস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা কেরলের থুম্বায় ইকোয়েটরিয়াল সাউণ্ড রকেট-ক্ষেপণ ঘাঁটি স্থাপন। ভারতের মহাশূন্য গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ এটি।

ঊর্ধ্বাকাশ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য কয়েকটি পর্যায়ে সাউণ্ডিং রকেট ক্ষেপণের কার্যসূচী ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর পারমাণবিক গবেষণার যে অবিশ্বাস্য রকমের সম্প্রসারণ হয়েছে তা মূলতঃ ডাঃ মেঘনাদ সাহার দূরদৃষ্টি এবং ডাঃ ভাবার কর্মক্ষমতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। পারমাণবিক বিজ্ঞানযানচিত্রে এঁরা ভারতের একটি স্থান করে দিয়ে গেছেন তাঁদের জীবনের কঠোর ব্রত সাধনার মধ্য দিয়ে। ভারতের মাটিতে একটি বৈজ্ঞানিক ভাবধারা ছড়িয়ে তুলতে চেয়েছেন দীপ্ত প্রাণের ব্যঞ্জনায়, বুদ্ধির আলোয়—সে মাটি কখনো হতে পারবেনা কোনদিন।

রুদ্র-সঙ্গিনীর স্বগতোক্তি

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

ঝঞ্ঝা-ঝঁাকর রাঙিয়ে যখন আসে
প্রলয়ঙ্কর রুদ্র নৃত্য করি'
দিগ্‌দিগন্ত দারুণ অট্ট হাসে
যদি বন্যা মহাশঙ্কায় ভরি,'—
পিঙ্গল মাঠে পাংশু বিটপীদল ;
ত্রস্ত পাখীরা শূন্য দীর্ণ করে ;
শ্বাপদও সহসা শঙ্কায় বিহ্বল
ঘোর ঘূৎকারে গহ্বরে গহ্বরে
বুক ফাটা ভয়ে দিশা-হারা হ'য়ে ওঠে।
তখন আমার বক্ষ-অন্তরালে
প্রেমারবিন্দ জানি না কেন যে ফোটে !—
দোলে সে পদ্ম প্রলয়ের তালে তালে।

(২)

ঠুন্‌কো রূপের কৃত্রিম আভরণে
একদা যে তা'রে ভুলাতে চেয়েছি ভুলে ;
বহ্নি-জ্বালায় চিতানল জ্বালি' মনে
সে পোড়ালো মোর পুষ্পকেতুর কুলে।
বহিরাবরণ এক টানে ছিঁড়ে-খুঁড়ে
সে-ই তো করিল আমারেও সঙ্গিনী ;
বক্ষ ভরেছি সে নটনাথের সুরে ;
তা'র প্রলয়ের নটরাজ-বেশ চিনি।
সকলে যখন ভয়ে হয় জড়সড়,—
বক্ষ-শোণিতে প্রলয়-তুফান জাগে ;
"ঝঞ্ঝা-ঝঁাকরে পথে বাহির কর'—"
সে মহাপ্রেমিকে ডেকে কই অনুরাগে।

(৩)

গিরি অবরোধ ঘুচালো সে গিরিজার ;
ব্যোম-কেশে তা'র লুকানো মন্দাকিনী
দেখালো সাধিয়া খুলিয়া সে জটা-ভার ;—
মহামুক্তির স্বাদ পেলো বন্দিনী।
সে-ই মহাকাল,—আমার কালেরও রাজা ;
প্রলয়ঙ্কর রূপ ধ'রে প্রাণে আসে ;—
শত প্রলয়ের তাণ্ডবে করে ভাঙা ;
সে-ই তো শিখালো কী করিয়া ভালোবাসে।
জন্ম-মৃত্যু তাহারই আলিঙ্গনে.
যুগে যুগে প্রেম-তাণ্ডবে তা'র
স্বাদে অভিনব ; নট-নৃত্যের সনে
সতী সাথে শিব একাকার অনিবার।—
প্রলয়ের প্রেম-লীলা যে চমৎকার।

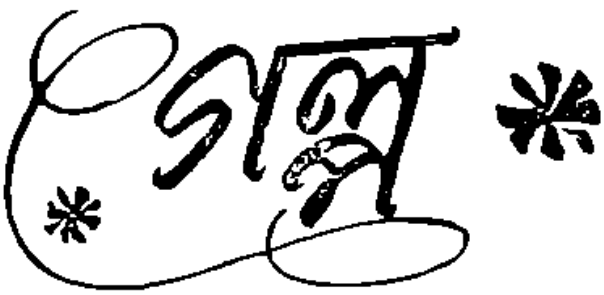

বঞ্চনা

অরুণ দে

—"একটা ছবি নেবেন ?"

—"ছবি ! কিসের ছবি ?"

—"এই মানে—খুব সুন্দর ছবি।"

—"তাই নাকি ? থাক—ও সবে আমার রুচি নেই।" বলে আমি মুচকি হাসলাম।

লোকটা কিন্তু নড়ল না। বরং দাঁত বার করে বলল, "একবার দেখুন না।" তার কথা শুনে রাগে আমার গা জ্বলে গেল।

চৌরঙ্গীর এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। লোকটা যে কখন আমার পিছু নিয়েছে আগে লক্ষ্য করি নি। এত রাতে এই সব রাস্তায় এই ধরণের লোকেরা কি ছবি বিক্রী করে তা আমার অজানা নয়। যত রাজ্যের কুৎসিত ছবি গোপনে বিক্রী করাই এদের পেশা। হয়ত এখনই কয়েক জোড়া উলঙ্গ নরনারীর ছবি চোখের সামনে তুলে ধরবে।

ভাল করে আর একবার লোকটার দিকে তাকালাম। রুক্ষ একমাথা চুল। ভাঙ্গা গাল। কোটরের ভেতর চোখদুটো জ্বল জ্বল করছে। একটা ময়লা কোট গায়ে ঝুলছে। হাতে একটা কাগজের মোড়ক। ঐ কাগজের মোড়কটার ভেতরেই বোধহয় সেই নোংরা ছবিগুলো রয়েছে।

লোকটা আবার বলল, "পছন্দ না হলে নেবেন না। একবার দেখুন—ভাল ছবি।"

ইচ্ছে হল ঠাস্ করে গালে এক চড় কসিয়ে দিই। কিন্তু আমি কিছু করবার আগেই লোকটা তার কাগজের মোড়কটা খুলে একটা ছবি আমার চোখের সামনে তুলে ধরল।

ঘৃণায় মুখ ফেরাতে পারলাম না বরং বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। হাতে আঁকা প্রকৃতির ছবি। পর পর কয়েকটা ছবি লোকটা আমাকে দেখাল। নদীতে ভাসমান নৌকা, দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, অস্তগামী সূর্যের রশ্মিতে রঞ্জিত আকাশ, চাঁদ আর সমুদ্র ইত্যাদি। প্রত্যেকটা ছবি শিল্পীর সুনিপুণ তুলির স্পর্শে অপূর্ব সুন্দর। এমন চমৎকার ছবি আমি খুব কমই দেখেছি।

"নেবেন ? খুব অল্প দাম। আপনার কি পছন্দ হল না ?" শুকনো মুখে হাসি টেনে লোকটা বলল। যেন হতাশা হাসছে।

আমি বললাম—"এ ছবি কে এঁকেছে ?

—"আমি।"

—"তুমি।"

—"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?"

সত্যি বিশ্বাস হচ্ছিল না। এই বিশ্রী চেহারার লোকটা যে এমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারে তা হঠাৎ দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

এরপর আমার লোকটার সম্বন্ধে কেমন যেন কৌতূহল হল। নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম। যা জানতে পারলাম তা সংক্ষেপে এই—লোকটার নাম নগেন বসু। চীৎপুরের এক বস্তিতে সাড়ে ছয় টাকা ভাড়ায় একটা ঘরে থাকে। সারাদিন ঘরে বসে ছবি এঁকে বিকেলে সে ছবি বিক্রীর জন্য পথে বের হয়। কোন খালি দেওয়াল পেলে সেখানে ছবিগুলি টাঙিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক লোকে সে ছবি দেখে কিন্তু কেনে খুব কম মানুষে। যেদিন দু'চারটে বিক্রী হয় সেদিন নগেন বাড়ীতে খিচুরী রান্না করে খায়। কদাচিৎ অন্য কিছু জোটে। নগেন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। তার এক ভাই কি যেন একটা বড় চাকরী করে। কিন্তু সে ভাই-এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

তার গুণের মূল্য কেউ নাকি বোঝে না। ছবিও

বড় একটা বিক্রী হয় না। আজ নাকি একটা ছবিও বিক্রী হয় নি তাই সে বাড়ী ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ পথে আমাকে দেখে কি মনে হওয়াতে ছবি কিনব কিনা জিজ্ঞাসা করেছে।

নগেনের সব কথা শুনে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনটা কেন যেন ভিজে এসেছিল। মানিব্যাগ খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট তার দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, "এটা রাখ।"

ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নগেন বলল, "মাত্র পঞ্চাশ পয়সা করে প্রতি ছবি বিক্রী করি। এর বেশি কেউ দিতেও চায় না। আপনাকে ক'টা ছবি দেব?"

—"ছবি চাই না, টাকাটা তোমাকে দিলাম।"

এক পা পিছিয়ে গেল নগেন। তার পর ভাঙা গলায় ধীরে ধীরে বলল, "আমি গরীব। আমি শিল্পী কিন্তু আমি ভিখারী নই।"

তারপর তাড়াতাড়ি ছবিগুলি গুটিয়ে নিয়ে প্রায় ছুটেই চলে গেল।

* * *

সে রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। নগেন যেন মরে গেছে। মৃত্যুর পর হাজার হাজার টাকায় নগেনের আঁকা ছবি বিক্রী হচ্ছে।...একটা বিরাট সভাগৃহে নগেনের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। দেওয়ালে মৃত নগেনের ফটো ঝুলছে। সেই ফটো ঘিরে ফুলের মালা। কে একজন মোটামত লোক সভাপতির আসন থেকে বক্তৃতা করছে। লোকটা এত জোরে বক্তৃতা করছিল যেন তার চীৎকারেই হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল।

বিছানায় উঠে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। ঠিক করলাম পরদিন নগেনের বাড়ী যাব। লোকটার কয়েকটা ছবি কেনা দরকার।

নগেন চীৎপুরের যে বস্তির নাম করছিল সেটা খুঁজে পাওয়া শক্ত হল না। নোংরা রাস্তা ঘুপচি ঘুপচি কয়েকটা ঘর। একদল মেয়েপুরুষ কি একটা ব্যাপার নিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় বচসা করছিল। তাদের কাছে গিয়ে নগেনের খোঁজ করলাম। নগেনের নাম শুনে ওরা অবাক হয়ে তাকাল। এখানে নাকি ও নামে কেউ থাকে না। নগেন কি তবে আমায় মিথ্যাকথা বলেছিল! শেষ চেষ্টা হিসাবে বললাম, "লোকটা ছবিটবি আঁকে। মাতব্বরণী, তোমরা কেউ কি চেন না?"

ছবির কথা বলতে মুহূর্তে কাজ হল। একজন মেয়ে ফিক করে হেসে বলল, "অ। সেই পাগলটাকে খুঁজছেন বুঝি? সোজা গিয়ে বাঁ দিকের ঘর।"

এগিয়ে গেলাম। নির্দিষ্ট ঘরের কাছে গিয়ে নগেনকে চোখে পড়ল। প্রায় অন্ধকার ঘর। একটা ছোট জানালা দিয়ে একটুকরো আলো উঁকি দিচ্ছে। সেই আলোতে একমনে বসে নগেন ছবি আঁকছে। বহু ছবিতে ঘরটা ঠাসা। ঘরে ঢুকে একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ নাকে এল। এমন নোংরা ঘরে বসে এমন সুন্দর ছবি লোকটা আঁকে কি করে! শিল্পীর ঘর সম্বন্ধে ছেলে-বেলায় আমার কত কল্পনাই ছিল। সব যেন মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। না খেয়ে না দেয়ে এই জাহান্নামে ঘুপচি ঘরটার মধ্যে কয়েকটা রঙতুলি নিয়ে লোকটা কিসের মোহে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে কে জানে! খ্যাতি বা সার্থকতা কোনকালে আসবে কিনা তার তো কোন ঠিকানাই নেই। এ কি নিষ্ঠুর সাধনা ওর!

আমার পায়ের শব্দ ঘরের ভেতর পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরে নগেন চোখ তুলে তাকাল। বলল, "আপনি! কি মনে করে?"

—"এই এলাম।" হাসবার চেষ্টা করলাম আমি।

—"বসুন।...তাই তো কোথায় বসাই।"

নগেনের পাশে মেঝের উপর আমি তাড়াতাড়ি ধপাস করে বসে পড়লাম। বললাম, "তোমার কোন উপকার করতে আসি নি। এসেছি তোমার ছবির আকর্ষণে। এমন চমৎকার ছবি আমি খুবই কম দেখেছি।"

—"আমার ছবি আপনার তাহলে ভাল লেগেছে"—আনন্দে নগেনের চোখ দুটো চিক চিক করে উঠল।

নগেন ওর ছবি পর পর আমাকে দেখাতে লাগল। আশ্চর্য সুন্দর সব ছবি। কয়েকটা ছবির বিষয়বস্তু রহস্যময়।

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার ছবি দেখছি বুঝতে পেরে নগেন তার একটা ছবি আমাকে উপহার দিয়ে বলল, "আমার ছবি কেউ বোঝে না, কেউ আমার মর্যাদা দেয়

না। আপনি সমঝদার লোক তাই ছবিটা আপনাকে দিলাম। দাম নেব না কিন্তু।"

—"দাম না হয় নাই নিলে কিন্তু এ ভাবে তোমার কতদিন চলবে? একটা চাকরী কর না কেন?"

—"চাকরী আমার ভাল লাগে না।"

—"তবে কি এই নোংরা বস্তিতেই চিরকাল থাকবে?"

—"না—আপনি দেখে নেবেন একদিন না একদিন আমার ছবির দাম লোকে বুঝবেই।"

মনে মনে হাসলাম। মুখ ফুটে বলতে পারলাম না যে ওর এই স্বপ্ন ব্যর্থ হবার আশঙ্কাই প্রবল। বুঝেই আমাদের শিল্পপ্রীতি, পয়সা খরচ করে ক'জনই বা আমরা ছবি কিনি—ক'জন লোকের ঘরে ছবি থাকে!

বস্তির গলির মোড়ে একটা গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। হর্ণটা বার কয়েক বেজে উঠল। নগেন কান পেতে শুনল। কিছুক্ষণ পর একজন যুবক নগেনের ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল।

"আসছি" বলে নগেন উঠে তার সঙ্গে বাইরে চলে গেল।

যুবকটিকে আমি চিনি। কমল সেন। আর্ট কলেজের ছাত্র।···নগেনের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে উঠে পড়লাম। বাইরে এসে দেখি কমল সেন নগেনকে কি যেন বোঝাচ্ছে আর নগেন মাথা নাড়ছে। আমাকে দেখে নগেন বলল, "একি! চললেন নাকি?"

—"হাঁ, আর একদিন আসব", বলে আমি এগিয়ে গেলাম।

* * *

নগেনের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। জীবনে কত মানুষই তো দেখলাম, ক্ষণকালের জন্ত তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে সাড়া জাগিয়ে আবার সময়ের স্রোতে হারিয়ে যায়। নগেনও তেমনই একজন।

প্রায় বছর খানেক পরে হঠাৎ একদিন নগেনের কথা মনে পড়ল। ঠিক হঠাৎ নয়, একজন শিল্পী বন্ধুর বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়েছিলাম। তাকে কি উপহার দেব ভাবতে ভাবতে নগেনের কথা মনে পড়ল। অল্প দামে কয়েকটা ভাল ছবি কিনে উপহার দেবার আশায় নগেনের বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হলাম। গিয়ে দেখি নগেন সেই আগের মতই একমনে বসে ছবি আঁকছে। অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে। নগেন প্রথমে আমাকে চিনতে পারল না। পরে আমি সেই "সমঝদার লোক" মনে পড়ায় একগাল হেসে উঠল।

এতদিন পরে আমার আসার উদ্দেশ্ত ব্যক্ত করলাম। নগেন বলল, "ছবি তো নেই। এই যেটা আঁকছি—আর নেই।"

ঘরের চারিদিকে তাকালাম। সত্যি তো, যে ঘর ছবিতে ঠাসা ছিল সে ঘরে একটা ছবিও নেই! বললাম, "কি ব্যাপার নগেন—সব ছবি বুঝি বিক্রী হয়ে গেছে?"

—"হাঁ, সব বিক্রী হয়ে গেছে। কমলবাবুই সব কেনেন। আজকাল আর আমায় রাস্তায় ঘুরতে হয় না।"

কিন্তু সব ছবি বিক্রী হওয়া সত্ত্বেও নগেনের এমন রুগ্ণ চেহারা, এমন মলিন বসন কেন—বুঝতে পারলাম না।

নগেনকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে ব্যাপারটা অনেকটা বোঝা গেল। কমল সেনের মত ভাল মানুষ পৃথিবীতে নাকি খুব কমই আছে। নগেনের দুঃখ দূর করার জন্ত সে নাকি সমস্ত ছবি কিনে নিয়েছে। অবশ্ত খুবই অল্প দামে—প্রতি ছবি পঁচিশ পয়সা মাত্র। এক সঙ্গে বেশ কয়েকটা টাকা পাওয়ায় নগেন মনের আনন্দে ক'দিন পেট ভরে খেতে পেরেছে। অল্প উন্নতিও হয়েছে। আজকাল নগেনকে আর নিজের ছবি হাতে রাস্তায় খদ্দের খুঁজতে হয় না। কমল সেন তার ছবির জন্ত আগেই দাম দিয়ে যায়। নগেন ঘরে বসে দিবারাত্র পরিশ্রম করে ছবি আঁকে। খুব পরিশ্রম করায় তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে।

কথা বলতে বলতে নগেন হাঁপাচ্ছিল।

বললাম, "কি হয়েছে অমন ধুঁকছ কেন? অসুখ করেছে নাকি?"

সে বলল, "অসুখ? না এমন কিছু নয়। রোজ রাতে জ্বর হয়। তা ছাড়া ভালই থাকি।"

—"ও"।

—"জানেন, ভগবান বোধহয় এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন। কমলবাবু বলেছেন আমার ছবির একটা প্রদর্শনী করবেন। নিজেও ছবি আঁকেন কিনা তাই ভাল ছবির মর্যাদা বোঝেন। খুব ভাল লোক।"

—"তোমার ছবির প্রদর্শনী হবে শুনে খুব আনন্দ

হচ্ছে। কিন্তু যে জন্য আমি এসেছিলাম—অন্য ছবি না থাকে যেটা আঁকছ সেটাই না হয় শেষ করে দাও।"

—"মাপ করবেন, আমি কমলবাবুকে কথা দিয়েছি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমি ছবি বিক্রী করব না।"

—"ও।"

কেমন যেন অপমানিত বোধ করলাম। বিরক্ত হয়ে চলে এলাম।

•

বছর পনের পর।

ইতিমধ্যে চুলে আমার পাক ধরেছে। মেয়ে বড় হয়েছে। আর্ট কলেজের ছাত্রী সে। ওর মাধ্যমেই একদিন আবার নগেনকে মনে পড়ল। কি একটা বিরাট চিত্র প্রদর্শনী থেকে মেয়েটা একটা ছবি তিনশ' টাকায় কিনে এনেছে। শিল্পীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সে মুখর হয়ে উঠল। তারই কাছে শুনলাম—এমন প্রতিভাধর শিল্পী নাকি কদাচিৎ জন্মায়। ছবির প্রথম প্রদর্শনীতেই নাকি তার নাম ডাক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ছবির দামটা শুনে অবধি আমার মনটা কিন্তু খুঁত খুঁত করছিল। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে মেয়ে বলল—কে একজন শিল্প রসিক নাকি বলেছেন সে হাজার টাকা দাম দিলেও এমন ছবির সঠিক দাম দেওয়া হয় না।

ছবিটা দেখতে চাইলাম। মেয়েটা ছবি এনে দেখাতে সত্যি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এ ছবি তো আমার অপরিচিত নয়! এ যে নগেনের ছবি!

মেয়েকে কিছু বললাম না। প্রদর্শনী কোথায় হচ্ছে জেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নগেনের সাফল্যে কেন জানি না আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল। অতবড় সাধনা কি বিফল হতে পারে? সত্যকার সাধনা একদিন না একদিন মূল্য পায়ই।

প্রদর্শনীর গেটে এসে কিন্তু হতবুদ্ধি হতে হল। বেশ বড় করেই লেখা আছে—"কমল সেনের চিত্র প্রদর্শনী। ভেতরে ঢুকলাম। কি আশ্চর্য এ সবই দেখছি নগেনের ছবি! সেই আকাশ, সেই মেঘ, সেই সমুদ্র।

একটা হৈ চৈ শুনে পেছনে তাকালাম। আটিষ্ট কমল সেনকে ঘিরে একদল লোক স্তুতিবাক্য বর্ষণ করছে। মৃদু মৃদু হাসছে কমল সেন। বলছে—"কি বা এমন এঁকেছি…"

গেটের সামনে কি একটা গোলমালের শব্দ শুনে কমল সেন কথা বন্ধ করে সেদিকে তাকাল। একটু পরে বলল, "কি ব্যাপার? অত গোলমাল কিসের?" কে একজন উত্তর দিল—"ও কিছু নয় স্যার। একটা আধ পাগলা লোক ভেতরে ঢুকতে চাইছে।"

সেই আধপাগলা লোকটা তৎক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। সকলে হৈ হৈ করে উঠল। প্রদর্শনীর পবিত্রতা বুঝি নষ্ট হয়! অন্য সকলের সঙ্গে আমিও গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। একমাথা রুক্ষ চুল মেড়ে ঘোলাটে চোখে লোকটা তখন বলছে "সব আমার—এসব ছবি আমি এঁকেছি।" তার কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

লোকটার কাছে এগিয়ে গেলাম। লোকটার হাতের কয়েকটা আঙুল নেই। চোখ ভেতরে ঢোকানো, ছেঁড়া ময়লা জামা গায়ে। প্রথমটা চিনতে পারি নি কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই খেয়াল হল—এ সেই নগেন! নগেন তখনও বিড় বিড় করে একই কথা বলে যাচ্ছে। লোক তাকে নিয়ে মজা করছে। কমল সেন একবার সেদিকে তাকাল। কিছুক্ষণ পর সে বলল, "ওহে—এ যে দেখছি বদ্ধ পাগল। ওকে রাঁচীতে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। যা খরচ লাগে আমি দেব।"

সমস্যার মুখে ছাত্রসমাজ

কনক ধর

মিশ্র একটা বিয়োগ নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর খোকা বড় বিব্রত— মিলে তো মিলে না,—ঠিক এমনি সময়ে কানে গেল তার, পাশের ঘরে ছোট ভায়ের ঘুম্-পাড়ানি গান গাইছেন মা—

"খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে?"

অমনি অংকের সমস্যা হারিয়ে গেলো কোন্ অজানায়! অতীতের অতল-তলে হারিয়ে যাওয়া এক ছবি ভেসে ওঠে খোকার চোখে;—রাত্রি তার হিম-শীতল রুক্ষকর বুলিয়ে দিয়েছে কোন এক পল্লীর জীবন ব্যস্ততায়; দূরে দূরে শিয়াল কুকুরের ডাক আর গ্রাম জুড়ে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা সুর। এমনি সময়ে···এমনি সময়ে গ্রামের পশ্চিমদিক হতে শুনতে পাওয়া গেল এক আওয়াজ—ঘোড়ার খুরের যেন! টুটে গেল নিস্তব্ধতা, পল্লীর ভেঙে গেল ঘুম! দস্যুর দল মহা উল্লাসে চালালো লুণ্ঠন—আগুনের রক্তাভ ছটায় হারিয়ে গেল চাঁদের ঝিল্‌মিলে সোনার আলো—পল্লীবাসীর আর্তচীৎকারে ডুবে গেলো ঝিঁঝিঁর ডাক!

দস্যু বর্গী! তাদের নৃশংস অভিযানের কথা মার মুখে শুনেছে খোকা—আরো শুনেছে, বড় হয়ে ইতিহাস পড়লে এগুলি পাওয়া যাবে সেখানে। ইতিহাস!—সেখানে নাকি বত্রিশ সিংহাসনের রাজা বিক্রমাদিত্য আর সংযুক্তা বিজয়ী পৃথ্বীরাজের কথাও আছে! অসীম ধৈর্যে, বিপুল ব্যাকুলতায় অপেক্ষা করে খোকা—কবে আসবে ইতিহাস পড়ার দিন!

তারপর!···

অবশ্য কৌতূহল ও আগ্রহের সংগে পড়াশোনার মধ্য দিয়ে কয়েকবছর কেটে গেল তার। কিন্তু একি, ইতিহাস পড়ে পড়ে কি পেলো সে!—এখানে যে শুধু যুদ্ধের পরে যুদ্ধ, অভিযানের পরে অভিযান, আক্রমণের পরে আক্রমণ,—রাজ্য শাসন প্রণালীর বিরাট বিরাট ফিরিস্তি;—নীরস, নিরেট, সৌষ্ঠবহীন—একটুকুও ভাবায় না, একটুকুও মনে দোলা দেয় না—শুধু মুখ বাঁধা পড়ে যেতে হয় সমানে। মার মুখে শোনা বর্গীর কথা, হলদি-ঘাটের রাণা প্রতাপের কথা, মুর্শিদাবাদের বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের কথা—ইতিহাস পড়ে তো সেগুলি তেমন দাগ কাটে না মনে! ইতিহাসের অগ্নিময়ী কাহিনী, না সাদা পাতার কালো কালির শোকলিপি!

আজকের দিনের আমরা সব (ছাত্রসমাজ) সেই শৈশব কালের খোকা—আজ বড় হয়ে ইতিহাস ও ভূগোল, সাহিত্য আর বিজ্ঞান যাই পড়ি না কেন, কোনটাই সক্ষম নয় মনের গভীরে দাগ কাটতে। শিক্ষা যদি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বিষয়ে উত্তরোত্তর কৌতূহলী না করলো, না করলো তাকে শিক্ষাবিষয়ে চরম অনুভূতিশীল—তবে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি—এই প্রশ্নই আজ ঘরে বাইরে জেগেছে।

দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই হয়ে পড়েছেন চিন্তিত—ভবিষ্যৎ বাঙলার স্বরূপ কি? একদিন যারা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্ণধার রূপে দেখা দিয়ে দেশকে চালিত করবে—সেই ছাত্র সমাজ আজ এগিয়ে চলেছে কোন্ পথে? অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, দুর্বিনীত ছাত্র সমাজের কাছ থেকে উজ্জ্বল উত্তরকাল তাঁরা আশা করতে পারছেন না। চারিদিক হতে এক নৈরাশ্য আজ শিক্ষার্থীর শিক্ষা-জীবনকে মন্থর করে তুলেছে।

সমস্যা বহুপ্রকারের, তিলে তিলে জমে জমে আজ তা বিরাট রূপ ধারণ করেছে। এর সমাধান সময় এবং ধৈর্যসাপেক্ষ। যাদের সমস্যা তাদেরই সবার আগে এগিয়ে আসার কথা। সুতরাং, প্রত্যেক ছাত্রেরই তাদের সমস্যা সম্বন্ধে আজ সজাগ হতে হবে এবং তার সমাধানে হতে হবে অগ্রণী।

দেখা যায় বয়স অনুপাতে বাঙালীর ছেলে যেন পরিণত বুদ্ধি হয় না। মনের দিক হতে বয়স অনুপাতে

আমাদের যতখানি পূর্ণতা লাভ করা উচিত—ততখানি আমরা করি না। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ যে রকম ভাবান্ তার এক ক্ষুদ্রাংশও সে রকম চিন্তাশীল নয়। চিন্তাশক্তির অভাবে আমাদের মনের বিভিন্ন দিকের দৈন্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তাদের আধিক্যে বড় বড় হুজুগে আমরা মেতে উঠি—কিন্তু চিন্তাশক্তির দুর্বলতায় এটুকুও ভাবতে পারি নে যে, হুজুগ ক্ষণস্থায়ী হলেও তার ফল জাতীয় জীবনে গভীর রেখাপাত করে। উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু উত্তেজনার পর অবসাদ দীর্ঘস্থায়ী। এমন কি কয়েকটা জীবনকেও নষ্ট করে দেওয়ার পক্ষেও তা' যথেষ্ট।

আমরা মনের দিক হতে এত কাঁচা যে, কলেজে উঠে আর্টস, সায়েন্স না কমার্স কোনটা নেবো—এই নিয়েই প্রথমে একটা বিরাট সমস্যা আমাদেরকে ভয়ানক বিব্রত করে তোলে। বুদ্ধির আরো চমৎকার পরিচয় দেই আমরা যখন সায়েন্সে ভর্তি হয়ে বলি, কি ভুলটাই না করেছি, আর্টসের মত সাবজেক্ট নেই, আর্টসে ভর্তি হয়ে বলি, সায়েন্সের তুলনা হয় না। পাশ্চাত্যের শিক্ষা প্রণালী এবং সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি নিয়ে মহা গণ্ডগোল করতে আমরা অদ্বিতীয়—কিন্তু তাদের মনের পূর্ণতার সঙ্গে আমাদের মনের তুলনা করলে আপনা হতেই মাথা নুইয়ে আসবে। তাই আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের এখন প্রয়োজন মনকে আয়ত্তে আনা, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করে ভালো-মন্দের সঠিক বিচারে যোগ্যতা অর্জন করা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই—তাদের ক্ষমতা আছে প্রচুর, কিন্তু সমস্তটাই ব্যয়িত হয় ভুলপথে, তারও ঐ একই কারণে অপরিণত বুদ্ধি। খেলার মাঠে, চায়ের রেষ্টুরেন্টে, সিনেমা-থিয়েটারে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিঃশেষে লয় পায়;—তারা যে লেখাপড়া ভালোবাসে না তা' নয়—নানান্ কাজের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তারা লেখাপড়া বিষয়ে মনোবল হারায়—প্রাণ-প্রাচুর্যের সমস্তটাই তাদের ব্যয়িত হয় নানান্ উত্তেজনাপূর্ণ কাজের মধ্য দিয়ে। এ যেন নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারা, নিজে আফিং খেয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা—উত্তেজনাপূর্ণ কাজের নেশায় ডুবে গিয়ে চিন্তাশক্তির অভাবে এতটুকু ভেবে দেখবার অবকাশ পায় না কোন অনিশ্চিতের অন্ধকার গুহায় তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ ঠেলে দিচ্ছে! এ সমস্যাটা জটিল—এদের ফিরানো কষ্টসাধ্য। সিনেমা, থিয়েটার, খেলার মাঠ, আমোদ-ফূর্তির অঙ্গে, সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়াও নীতিবিরুদ্ধ নয়, আন্দোলনের অধিকারও তাদের আছে; তবুও এটা অস্বীকার করতে পারা যাবে না যে এগুলির জন্যই অধিকাংশ ছাত্রের সর্বনাশ হয়। এ সমস্যার সমাধান এইভাবেই হয়ত কিছুটা হতে পারে—দেশে সুরুচি ও সুনীতিপূর্ণ সিনেমাশিল্পের প্রবর্তন, খেলার মাঠে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবর্তন, সভা-সমিতির হুজুগটা নিজেদের স্কুল-কলেজের মধ্যে এনে বিভিন্ন উৎসব ও মনীষিগণের জন্মতিথি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে তার নিরসন ঘটানো, আর নিজেদের শিক্ষা ব্যাপারের আন্দোলন ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকা। নিজেদের মধ্যে বলবার ও শোনবার সুযোগ পেলে অধিকাংশ ছাত্রই বোধহয় আর বাইরের হুজুগে মাতবে না। কিন্তু চায়ের রেষ্টুরেন্ট বন্ধবান্ত করা যাবে না কোন মতেই—এ বিষয়ে অভিভাবকেরা দায়িত্বশীল হবেন। আর এই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে যাদের একটু উড়ু উড়ু ভাব অথবা চরম মনোভাব দেখা যায় তাদেরকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলি ঘুরিয়ে এনে মণিমেলা, স্কাউট, ব্রতচারী প্রভৃতি ছাত্রদরদী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে দিলে বোধহয় অনেকটা ভালো ফল পাওয়া যাবে।

এবার আসা যাক্ তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র বা Backward students—যারা, তাদের মধ্যে। এদের অবস্থা নৈরাশ্যজনক। বছরের পর বছর এরা মহা আহাম্মকের মতো পরীক্ষা দেয় আর তাহা ফেল করে। এরা ক্লাসের লাষ্ট বেঞ্চে বসে গোলমাল করে অথবা পড়ে পড়ে ঘুমায়, দায়িত্বজ্ঞান বলতে এদের কিছুমাত্র নেই—লেখাপড়ায়ও এরা বিন্দুমাত্র আনন্দ পায় না। অর্থাৎ পড়ার মান এদের চাইতে অনেক উঁচুতে।

প্রথমত এদের মানসিক দিক্ হতে খুব বলীয়ান্ হতে হবে। এই বিষয়ে মনস্তত্ত্ব আমাদের প্রধান সহায়, তাই এই শ্রেণীর ছাত্রদের ইচ্ছাশক্তির উপর প্রচণ্ড জোর দিতে হবে। সকালে উঠেই হাত-মুখ ধুয়ে একটা খাতা টেনে এরা কতগুলি প্রতিজ্ঞাবাণী লিখে যাবে;—মনে করা যাক্

—(১) আমি এবার ক্লাসের ফার্ষ্ট বয় হবো। (২) বাঙ্‌লায় এবারে কম নম্বর পেয়েছি—আগামীবারে ৬০ নম্বরের উপর রাখবোই রাখ্‌বো—ইত্যাদি। এই রকম প্রতিজ্ঞাবাণী যদি প্রতিদিন সকালে উঠেই লেখা যায়, সব সময়ে যদি এগুলি আওড়ানো যায়, যদি এগুলি সম্বন্ধে কি কি তার সহায়ক হবে সে সম্বন্ধে ভাবা যায়—তবে এটা নিশ্চিত যে, তার শুভদিন আস্‌বেই আস্‌বে। প্রথমে ছোট ছোট প্রতিজ্ঞা করে মানসিক শক্তি বাড়াতে হয়। যেমন ৬টায় পড়তে বসে হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করে ফেললো ৯টার আগে পড়া ছেড়ে কোন মতেই উঠ্‌বে না। অংক মিলে না তো—না মিলা পর্যন্ত কিছুই খাবে না। এই ভাবেই মনের জোর বাড়ে। এই ভাবেই, আশা করা যায়, তাদের জীবনে সফলতা আসবে। এ'ছাড়া পৃথিবীর বড় বড় মহাপুরুষদের জীবনচরিত পাঠ করারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এদের অনেক কিছু ভাব্‌তে ও শিখ্‌তে হবে।

ভারত স্বাধীন হবার পর হতেই আমাদের অর্থাৎ ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। চারিদিক হতে ঘটনা পাকিয়ে প্রত্যেকেই আজ আমাদের বলছেন, আমরা নাকি জাহান্নামে যেতে বসেছি। এই জাহান্নামের পথ আজ আমাদের বন্ধ করতে হবে। আমরা স্বাধীন ভারতের দায়িত্বশীল ছাত্র সমাজ—আমাদের বিভিন্ন সমস্যা মিটাতে আজ আমাদেরই সবার আগে এগিয়ে আস্‌তে হবে।

মোক্ষ-সঙ্গীত

অধ্যাপক শ্রীনির্মলকান্তি বসু, এম-এ

ওপথ বড় সঙ্কটময়,—
বাসনে রে মন ওপথে তুই,
গেলে ডুববি
গভীর জলে।
ওরে— ওপথ মরীচিকাময়
কেবল মায়া সার,
বারে বারে যাবি রে
পথ ভুলে।
চাস যদি মন সুখ-শান্তি,
ফেলে দে রে কড়াক্রান্তি,
ওরে— কড়াক্রান্তি কাল হ'বে তোর,
কালরূপে গ্রাসিবে এসে।

সংসারেতে অত্যাসক্তি
দেয় না কভু ভক্তি-মুক্তি,
বাড়ে শুধু তার প্রবৃত্তি,
করে জীবে বদ্ধ অবশেষে।
দারাসুত পরিবারে
পালন ক'রে হ'বে নারে
ভবার্ণবে তরিবারে
কোনোই উপায় তোর;
ইতস্ততঃ ক'রে ক'রে
জড়িয়ে কেবল পড়বি ওরে,
বুঝবি ছিলি মায়াঘোরে
রাত্রি হ'লে ভোর।

মাষ্টারমশাই

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়

না, কোন ভুল নেই। মাষ্টারমশাইকে চিনতে আমার কোন ভুল হয় নি। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফের আড়ালে আসল লোকটাকে চিনে নিতে আমার কোন কষ্টই হ'ল না। মাথাটা উঁচু করে দুইটা দেওয়ালের ওপর রেখে যেন ধ্যানস্থ হ'য়ে রয়েছেন। সমস্ত মনটা যেন কোটরগত চোখ দুটোর মধ্যে দিয়ে নিজেকে বাহির করবার চেষ্টা করছে। বেশী কাছে যেতে পারলাম না, গায়ের বেশ খানিকটা তফাৎ থেকে দেখলাম অনেকক্ষণ ধ'রে। চারটে ফাঁসীর দেলই ভর্তি। সব শেষেরটাতেই আমার জন্যে সবচেয়ে আশ্চর্য ধরা ছিল যেন। আমার ইন্দ্রিয়গুলো চারনম্বর সেলের এই কঠিন কঠোর বাস্তবটার সামনাসামনি এসে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল। প্রায় দশটা বছর ধ'রে যাঁকে পূজো ক'রে এসেছি, মনে মনে শ্রদ্ধার নৈবেদ্য নিবেদন করেছি যাঁর পায়ের কাছে বহুবার, সেই অবিনাশ মাষ্টারমশাই ফাঁসীর আসামী! আমার নতুন চাকরী জীবনের প্রথম বিস্ময় যে এইভাবেই আসবে তা কে জানত! বোধহয় খানিকটা আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়েছিলাম। বুটের আওয়াজে চমক ভাঙল। সঙ্গের ওয়ার্ডার বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে 'হুজৌর' কিছু ভাবছেন, তাই আওয়াজ ক'রে চমক ভাঙাল। হাঁ, ফিরতে হবে।

ফিরতে হবে অতীতের দিনগুলোয়। কোয়ার্টারে ফিরে এসে চুপচাপ বসে রইলাম খানিকক্ষণ। স্মৃতির রেললাইন ধরে মন কখন চলে গেল বৈশাখের স্টেশনটায়। অবিনাশ-মাষ্টারমশাই। ইংরাজী পড়াতেন আমাদের। সকলের থেকে আলাদা ছিলেন একেবারে—আচারে ব্যবহারে, কথায়-বার্তায়, চালে-চলনে। পড়াশুনা করেছিলেন প্রচুর। বয়সের সংগে বইএর সংখ্যা পাল্লা দিয়ে চলেছিল। নিজে অনেক প্রবন্ধের সমালোচনার বই লিখেছিলেন। সাহিত্যিক মহলে প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর অনেকদিনের। হেড্‌মাষ্টারমশাই পর্যন্ত ওঁকে সমীহ করে চলতেন। বছর চল্লিশ বয়স তখন, কিন্তু দেখলে মনে হ'ত ত্রিশ থেকে বত্রিশ। ঝকঝক করছে গায়ের রঙ। সুন্দর নাক-চোখ। সব সময়ে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে আসতেন। আমাদের মনে হ'ত মূর্তিমান ব্যক্তিত্ব। ক্লাসে ঢুকলেই বুক টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে উঠত। কারুর গায়ে হাত তুলতেন না কখনও, কিন্তু মনের ওপর তাঁর অলক্ষ্য হস্তক্ষেপ। নীচের ক্লাসে পড়াতেন না। বাইরে ওঠবার আগে খুব কমই ক্লাস নিয়েছেন আমাদের। নীচের দিকে পড়বার সময় কেবলই ভাবতাম কবে অবিনাশবাবুর পড়ানো শুনতে পাব। একটা ঘটনা মনে আছে স্পষ্ট। ক্লাস নাইনে একবার ইংরিজির ক্লাস নিতে এসে পরপর দুটো পিরিয়ড্‌ কামাই ক'রে দিয়েছিলেন। পরের পিরিয়ড্‌ হেডমাষ্টারমশাইএর। উনি খানিকক্ষণ বাইরে পায়চারী ক'রে মৃদু হেসে নীচে নেমে গিয়েছিলেন। আমরাও তখন মুগ্ধ হ'য়ে পড়া শুনছি। ভিক্টোর হুগোর 'লা মিজারেবল্‌'র খানিকটা আমাদের পাঠ্যাংশে ছিল তখন। জাঁ ভাঁলজা দেখছে তার সামনে এক নতুন জগৎ। এতদিন যা জেনে এসেছে সেইটুকুই শুধু সত্যি নয়। আরও কিছু জানবার আছে। বিশপকে দেখে তার বুঝি ভুল ভাঙল। জীবনে সে আবার নতুন ক'রে বিশ্বাস করতে শিখল। অপূর্ব আবেগ দিয়ে মাষ্টার-মশাই আমাদের পড়াচ্ছিলেন তখন। বলেন, "দেখ, একটা জিনিষ তোমরাও মনে রেখ। Human Soul is the temple of the Lord—চিরকাল মনে রাখবে এই কথাটা। কোন কিছুই নষ্ট হবার নয়, আমাদের কবির ভাষায় 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা'। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান রয়েছেন, তাই কেউই খারাপ নয়। জীবনে যদি কখনও সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতও হও, তাহলেও এই সত্যটা ভুলে যেও না।" মাষ্টারমশাই চলে

গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কথাগুলো তখনও অনুরণিত হচ্ছিল মনের মধ্যে। আমরা যেন সকলে কিছুক্ষণের জন্যে মূক হয়ে গিয়েছিলাম।

আরেকদিন ছুটির পর আমরা তিন-চারজনে ওঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। মফঃস্বলের দিকে খানিকটা যেতে হয় বাসে ক'রে। সেদিনটা যেন আজও চোখের সামনে দেখতে পাই। বাড়ীতে পৌঁছবার পর কি খাতির আমাদের। মাষ্টারমশাইয়ের স্ত্রী আমাদের জন্যে নিজে হাতে নানারকম খাবার তৈরী ক'রলেন। তারপর সন্ধ্যের অন্ধকারে ছাদে গিয়ে বসলাম সকলে। মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। আর সবচেয়ে যেটা ভাল লেগেছিল আমাদের, সেটা বকুলফুলের গন্ধ। গাছটা একেবারে ছাদে এসে পড়েছে। কখনও কখনও পরিবেশ যে মানুষের মনকে কি ভাবে বদলে দেয় সেই প্রথম অনুভব করেছিলাম সেবার। আমাদের আবৃত্তি করতে বললেন মাষ্টারমশাই। তারপর নিজেই ম্যাকবেথের শেষের কিছুটা অংশ মুখস্থ বলে গেলেন। তখন ইংরেজির অর্থ বলতে গেলে কিছুই বুঝি না, তবু সেই বকুল-ফুলের-গন্ধ-ঘুমন্ত সন্ধ্যেবেলায় অপূর্ব লেগেছিল সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর। 'Life is a tale, told by an idiot, full of sound and fury signifying nothing'—লেডী ম্যাকবেথের মৃত্যুতে তাঁর স্বামীর আক্ষেপ। ম্যাকবেথের গল্পটা সেদিন আমাদের কাছে বলেছিলেন। এক সময় স্বামীর ওপর তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। কিন্তু সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে স্বামীকে বসিয়ে দেবার পর সে প্রভাব আর রইল না তাঁর। কোন যোগাযোগ রইল না দুজনের মধ্যে এবং অবশেষে একদিন স্নায়ুপীড়ায় আক্রান্ত লেডী ম্যাকবেথের মৃত্যু হ'ল। কে দায়ী? ম্যাকবেথ, নাকি লেডী ম্যাকবেথের দুর্বল রমণী মন? মাষ্টারমশাই শেষ করলেন। কিন্তু আমরা তখন কল্পনার ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছে গেছি সেই প্রাচীন রাজপ্রাসাদে, যেখানে লেডী ম্যাকবেথ ঘুমের ঘোরে চীৎকার করে বেড়াচ্ছেন: 'the sweetest perfumes of Arabia will not sweeten this little hand!' সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম যে মাষ্টারমশাইএর স্ত্রীও বেশ পড়াশোনা করেছেন, তিনি নিজে মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বলছিলেন সেক্সপীয়র সম্বন্ধে। আসবার সময় মাষ্টারমশাই বললেন, আবার আসবে। খুব খুসী হয়েছি আজকে। আমার বাড়ীটা তো দেখছ—মাত্র দুটি প্রাণী। ভীষণ ফাঁকা লাগে মাঝে মাঝে, তোমরা এলে বেশ খানিকক্ষণ কাটে গল্প-গুজব করে।

কথা রেখেছিলাম। বহুবার যাতায়াত করেছি তারপর। যত গিয়েছি ততই মুগ্ধ হয়েছি। অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু জেনেছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলেন মাষ্টারমশাইএর স্ত্রী। আমরা মাসীমা বলে ডাকতাম। রোজ নতুন নতুন জিনিষ খেতাম। আর চুপচাপ বসে ওঁর রান্নাবান্না দেখতাম। কথা বলতেন খুব কম, কিন্তু যখন বলতেন তখন অদ্ভুত মিষ্টি লাগত। বলতেন, জান, তোমাদের মাষ্টারমশাই যে অত লেখাপড়া করেন সে শুধু আমার জন্যে। প্রত্যেক মাসে জোর ক'রে ক'রে নতুন নতুন বই কেনাই। সংসার তো আছেই, তাই বলে ওঁর সাধনায় ব্যাঘাত হবে কেন? আর উনি এত পড়াশোনা করেন বলেই তো তোমরা এত সব জানতে পার ওঁর কাছ থেকে। তাহ'লে কার কৃতিত্বটা বেশী বলতো? আমার কিনা বল? খুব হাসতেন কথাগুলো বলবার পর। আমরা একবার তাঁর সামনে বসলে আর কাছছাড়া হ'তে চাইতাম না। মাঝে মাঝে বলতেন, সব সময় আমার কাছে থাকলে উনি কাদের নিয়ে থাকবেন? যাও ওঁর কাছে গিয়ে পড়াশোনা কর এবার। এই ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে মাষ্টারমশাইও ঠাট্টা করতেন। স্ত্রীকে বলতেন, এবার তুমি একটা রান্নার স্কুল খোল। আমার ছাত্রদের যেমন রান্নার দিকে ঝোঁক দেখছি, তেমনটি যদি পড়াশোনার দেখতে পেতাম··। কথা শেষ হ'ত না। মাসীমা বলতেন, তুমি থামতো। রাতদিন পড়া আর পড়া। পড়া কি পালিয়ে যাবে? তোমার ছাত্রদের কি আমি কেড়ে নিয়েছি? মাষ্টারমশাই মুচকি মুচকি হাসতেন তখন। বুঝতেন এবার মাসীমা রেগেছেন। এমনি ক'রেই কাটত। সেই ছোট্ট বয়সেও বুঝতে পারতাম যে একটা মধুর ছন্দ আছে মাষ্টারমশাই আর তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে। যেন একই সুরে বাঁধা দুটি বাদ্যযন্ত্র! সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের কিশোর জীবনে!

তারপর আমরা ভালভাবে পাস করে স্কুল ছাড়লাম। পাস করবার খবর নিয়ে মাষ্টারমশাইএর কাছে গিয়ে-

ছিলাম। গিয়ে দেখি তিনি অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে আছেন। আমরা পায়ের ধুলো নিতেই বুকের ওপর টেনে নিলেন। আশীর্বাদ করলেন প্রাণ ভরে। কথা বলবার শক্তি ছিলনা তখন, শুধু দু-চোখ দিয়ে অজস্র অশ্রুধারা বয়েছিল তাঁর। মনে ভেবেছিলাম আশীর্বাদ কি চোখের জলের মধ্যে দিয়েই সবচেয়ে সুন্দর হয়ে ঝরে পড়ে? কত ভাল লেগেছিল সেই মুহূর্তটি, সেই অবিস্মরণীয় মিলন ক্ষণটি! মাসীমা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন—সারা ক্ষণটি নির্বাক। রান্নাঘরে নিয়ে আমাদের মিষ্টিমুখ করিয়েছিলেন। বললেন আবার এস। কিন্তু যাওয়া আর হয় নি। বাবা হঠাৎ বাইরে বদলী হলেন। আমরাও চলে গেলাম। যাবার আগে মাষ্টারমশাই কিরকম আছেন সে খবর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি নি। কিন্তু এখনও মনে আছে যে ট্রেণে যেতে শুধু তাঁর আর মাসীমার কথাই ভেবেছিলাম। ভগবানের কাছে এক মনে প্রার্থনা করেছিলাম যে তিনি যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

কলেজে ঢোকবার পর নতুন পরিবর্তন এল জীবনে। পুরণো অনেক কিছু স্মৃতিই কোথায় তলিয়ে গেল। কোলকাতায় বন্ধু-বান্ধবের কাছে চিঠি দিয়ে মাষ্টারমশাই-এর কথা জানতে চাইতাম। তাদেরও তখন একই অবস্থা। অতীতটা সকলেই ভুলতে চলেছে তখন। তবু খবর পেতাম। নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছেন তিনি, তবে আর্থিক অবস্থা নাকি খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। চেহারার সে জৌলুসও নাকি হারিয়ে গেছে। ভেবে পেতাম না হঠাৎ কেন এই পরিবর্তন। আর্থিক অনটনই বা কেন? দুটি তো মানুষ, ছন্দে বাঁধা জীবন। তবে? হয়তো আত্মীয় স্বজন ঘাড়ে এসে উঠেছে! কিন্তু ঐ পর্যন্তই, ওর পর আর ভাবিনি কিছু। কিই বা ক'রতে পারতাম ভেবে। ছেলেবেলায় এককালে যাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী শিক্ষা পেয়েছি, যাঁর আদর্শ সবচেয়ে বেশী অনুসরণ ক'রেছি,তাঁকে কত সহজই ভুলে গেলাম। হয়তো এইটেই সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম, অন্যটাই ব্যতিক্রম। নতুন ঢেউ এসে আমার জীবনের পুরণো তটভূমিটাকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিল, কোন মাষ্টারমশাইএর পদচিহ্ন আবিষ্কারের চেষ্টা সেখানে কি সম্ভব?

কিন্তু এর চেয়ে মাষ্টারমশাইএর সংগে যদি আর না দেখা হত সেইটেই কি ভাল ছিল না? অসুস্থের চাদরটা সরিয়ে কেন তিনি এমনভাবে সম্মুখ হলেন? কোয়ার্টারে বসে বসে ভাবছি আর মনটা ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যাচ্ছে নিজের। ওঁর case history তখনও জানা হয় নি, তাই সম্ভব অসম্ভব নানা কথা চিন্তা করতে লাগলাম। তিনশো দুই ধারার অভিযুক্ত আসামী তিনি! খুন! কিন্তু কাকে? কি জন্যে? কোঁকের মাথায় কিছু করে থাকলে তো আর ফাঁসীর আদেশ হ'তে পারে না। তাহলে কি এইটেই বিশ্বাস করতে হবে যে ঠাণ্ডা মাথায়, আগে থেকে ঠিক ক'রে তিনি কাউকে খুন করেছেন? জীবনে যিনি নিজের চশমাটা নিজে জোগাড় করে নিতে হিমসিম খেয়েছেন, প্রয়োজনীয় বইটা চোখের সামনে থাকতেও অন্য জায়গায় সেটা খুঁজে বেড়িয়েছেন, তিনি ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করবেন? কিন্তু জীবনের রহস্য বোধহয় ঐখানেই। বাঁধা ফরমুলার মধ্যে মানুষের জীবন চলে না। কখন কি ভাবে জীবনের গতিপথ ঘুরে যায় তা কি আগে থেকে জানা থাকে? জীবনটা হয়তো একটা 'টেন্' কিন্তু ছন্দে বাঁধা নয়, 'মিষ্টিরিয়াস্ টেন্।' আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের রহস্য আবিষ্কার হবে কিন্তু মানুষের গহন মনের রহস্য? ও জিনিষটা সবচেয়ে কাছের যন্ত্রেও সবচেয়ে অনাবিষ্কৃতই থেকে যাবে চিরকাল।

চা খেয়ে অফিসের দিকে ছুটলাম। কেস্‌টা জানা দরকার। আমার মনের অবস্থা তখন শোচনীয়। সব কিছু না জানা পর্য্যন্ত স্থির থাকতে পারছিনা। নতুন ঢুকেছি জেলের চাকরীতে, তাই মনের ওপর কংক্রিটের প্রলেপ তখনও পড়েনি। সব রিপিটের মধ্যেই কিছু কিছু অভিনবত্ব খুঁজে পাই। তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনাও মনে তরংগ তোলে। কিন্তু মাষ্টারমশাইএর ইতিহাস শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। 'দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন্ হেভেন এণ্ড আর্থ....' জীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর সত্যটা নগ্নভাবে উদ্ঘাটিত হ'ল সেদিন। আমাকে সেই রাত্তিরে রহস্যের কুয়াশা-ঢাকা রাত্তিরে একা বসে বিশ্বাস করতে হ'ল যে মাষ্টারমশাই তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছেন! আর কিছু জানবার ছিল না, আর কিছু শোনবার ছিল না। এই বয়সে অনেক কিছু হয়তো জেনেছি, অনেক কিছু দেখেছি, কিন্তু এই শেষ সংবাদের চেয়ে শোকাবহ আর কিছু

শুনিনি। মাসীমাকে মনে পড়ল। কপালে লাল সিঁদুরের টিপটি পরে আছেন, মাথায় অল্প কাপড়টা তুলে দিয়েছেন, আঁচলে চাবির গোছাটি দুলছে। মুখে সেই স্বর্গীয় অনিন্দাসুন্দর হাসিটি। রান্নাঘরে বসে আমাদের জন্যে খাবার তৈরী করছেন, মাঝে মাঝে দু একটা মিষ্টি কথা বলছেন। যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী! তাঁরও মৃত্যু হ'ল এবং সবচেয়ে নিকটতম লোকের কাছ থেকে। তাহলে কল্যাণী নারীরও অপঘাত মৃত্যু হয়, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরও অকাল-প্রস্থান হয় সংসার থেকে?

অসুখে ভুগছিলেন মাসীমা কিছুকাল ধরে। দারিদ্র্য চারিদিক থেকে তার অক্টোপাশ বাহু বিস্তার করেছিল ছোট্ট সংসারটির ওপর। এই সময় মাষ্টারমশাইএর চোখ দুটো প্রায় নষ্ট হয়ে গেল। খুব বেশী পড়াশোনা করতেন রাত জেগে, তারই ফল ফলল। ভগবান চোখ দুটি নিলেন আর মূল-কর্ত্তৃপক্ষ নিলেন চাকরী। বাড়ীতে কিছু ছেলে পড়তে আসত, প্রায়-নিভে-আসা চোখ দুটি নিয়ে মাষ্টার-মশাই তাদের শিক্ষা দিতেন। সেই আয়েতেইসংসার চলতে লাগল কষ্ট ক'রে। কিন্তু চলল না এভাবে বেশীদিন। নতুন চাকরী পাওয়াও অসম্ভব—প্রথমত: দেহের বার্দ্ধক্য, দ্বিতীয়ত: দৃষ্টিশক্তির কার্পণ্য। এমন সময় মাসীমার অসুখ আরও বাড়ল। চোখ খারাপ হ'য়ে যে আঁধার নেমেছিল চারিদিকে তার থেকেও বেশী অন্ধকার ঘনিয়ে এল মাষ্টারমশাই এর সামনে। ডাক্তার এলেন যথারীতি। রায় দিলেন—যোন্ টি. বি. যেন ফাঁসীর আদেশ হ'ল আসামীর—মুহ্যমান হ'য়ে পড়লেন মাষ্টারমশাই। সেক্স-পীয়র আর মিল্টন, রবীন্দ্রনাথ আর কালিদাস যাদের তিনি সারাজীবন ধরে ঘরের আলমারীতে জমিয়ে তুলেছেন, তাদের বিদায় দিলেন একে একে। কিন্তু তবু পেরে উঠলেন না। স্ত্রীর জীবনের আশা করতে লাগল। রাত্তিরে ঘুমোতে পারতেন না তিনি—স্ত্রীর যন্ত্রণাকাতর আর্ত্তনাদ তাঁকে রাতের পর রাত জাগিয়ে রাখত। কি ক'রবেন ভেবে পেতেন না। জীবনে কারুর কাছে হাত কোনদিন পাততে হয় নি। নিজের মর্য্যাদার সর্ব্বোচ্চচূড়ায় চিরটাকাল অবিচল থেকেছেন। এখন কি ক'রে হাত পাতবেন? তবে কি রিচার্ড থার্ডের মত পালাবেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে? জীবনের যন্ত্রণায় আনন্দ করে পড়েছে বার বার, কিন্তু মৃত্যুর আর্ত্তনাদ? সে যে অসহ্য! অপরের কাছে সাহায্য নেওয়া? কিন্তু সে আরও যন্ত্রণাদায়ক। নিজের অনুপ্রেরণা দিয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁকে সম্মানের সর্ব্বোচ্চচূড়ার ওপর বসিয়ে রেখেছেন, সেখান থেকে হঠাৎ কি নামা যায়? তবু চেষ্টা করে ছিলেন, কিন্তু অসুস্থা স্ত্রী তাতে বাধা দিয়েছেন। মানুষের একটা তুচ্ছ জীবনের জন্যে তাঁর স্বামীর আত্মসম্মান ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে? দোটানায় পড়লেন মাষ্টারমশাই। রাতদিন চিন্তা ক'রতে ক'রতে পাগলের মত হ'য়ে পড়লেন। এমন সময় হঠাৎ আলোর রেখা মিলল। মরুভূমিতে মেঘের রেখা। কত সহজ একটা জীবন শেষ ক'রে দেওয়া, একটা নিভু নিভু প্রদীপকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া! সেই তো ভাল, সেই তো সুন্দর। জোগাড় করে ফেললেন বিষটুকু, স্ত্রীকে বাঁচিয়ে দেওয়ার উপকরণটুকু। কত ঠাণ্ডা মাথায় কাজ ক'রলেন। বিয়ের পরের কুড়ি বাইশটা বছরের কথা একবারও ভাবলেন না। কি হবে ভেবে? তার চেয়ে একটি মুহূর্ত্তকেই অনন্ত ক'রে রাখা যাক না কেন। যে আনন্দ অতগুলো বছরের মধ্যেও স্ত্রীকে দিতে পারেননি, সেই মুক্তির আনন্দ একটি মুহূর্ত্তের মধ্যেই এনে দিতে পারলেন। একবারও হাত কাঁপে নি কাপটা এগিয়ে দেওয়ার সময়, একবারও ছলছল ক'রে ওঠেনি চোখ স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে। কোর্টে নিজের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করেন নি মাষ্টারমশাই, বরং স্বীকারোক্তি করেছিলেন। বাঁচাবার কোন চেষ্টাই করা যায় নি।

এরপর কয়েকটা দিন আর 'জেলের' দিকে যাই নি। জেলখানা থেকে গভর্ণরের কাছে মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্যে আবেদন করা হয়েছিল। খবর এল যে সেটা নাকচ হয়ে গেছে। ভেঙে পড়লাম একেবারে। এরই মাঝখানে হঠাৎ একদিন মাঝরাত্তিরে একজন ওয়ার্ডার এসে খবর দিল যে চারনম্বর কন্‌ডেম্‌ন্‌ড্ সেলের আসামী অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ছুটে গেলাম। দেখি মাষ্টারমশাই শুয়ে আছেন, আর আপন মনে আস্তে আস্তে কিছু বলছেন। কান পেতে শুনেছিলাম কথাগুলো। কথা নয়, কবিতার লাইন।...She should have died hereafter there would have been time for such

a word···ম্যাকবেথের সেই আশ্চর্য নাটকগুলো সেই অমর কথাগুলো! সব কথা মনে নেই। কিছুক্ষণ পরেই একসময় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ডাক্তারবাবু কয়েকটা ইঞ্জেকশন দিলেন। বললেন, হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। ভয়ের কিছু নেই।

এরপর সেই দিনটি এল। সারা রাত্তির জেগে রয়েছি। তিনটের সময় ওয়ার্ডার ডাকা দিয়ে গেল। উঠলাম, ইউনিফর্ম পরলাম। তারপর সমবেত হলাম সকলে। যথাসময়ে মাষ্টারমশাইকে নিয়ে আসা হল ফাঁসীঘরে। আমি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। মাত্র শুধু একবার অর্ডারটা পড়ে শুনিয়েছিলাম। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়িতে টান পড়ল। সব শেষ হয়ে গেল। টুপিটা আগেই বেশী করে নীচের দিকে টেনে দিয়েছিলাম যদি তিনি চিনে ফেলেন।

ফিরে এলাম কিছুক্ষণ পর কোয়ার্টারে। ভাবছিলাম, ছেলেবেলার কথা। আত্মা ভগবানের দেউলে—একথা তো মাষ্টারমশাই-ই বলেছিলেন। মাসীমাকে বিষ তুলে দেওয়ার সময় একথা কি তিনি একবারও ভাবেন নি? ভাবেন নি কি যে আত্মাকে কষ্ট দিলে ঈশ্বরকেই কষ্ট দেওয়া হয়? হয়তো ভেবেছিলেন। হয়তো সেই ভেবেই যন্ত্রণার হাত থেকে মাসীমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

আকাশের দিকে তাকালাম। মাষ্টারমশাই-এর আত্মা মুক্তি পেয়ে কি এতক্ষণ স্বর্গের দিকে যাত্রা করেছে? সেখানে যে আছে অপেক্ষা ক'রে তাঁর পরণে কি চাকাই শাড়ী আর কপালে সিঁদুর?

মানব ও দানব

শান্তশীল দাশ

মানুষ মানুষকে মারবে আর বলবে আমি সভ্য জীব,
সৃষ্টি মাঝে আমি শ্রেষ্ঠ; আর সেই অভিমান নিয়ে
লেখা হবে ইতিহাস—যে-মানুষ নির্মমে নিঃশেষ
করে দেয় লক্ষ প্রাণ, জনপদ নিশ্চিহ্ন শ্মশান।
এরাও মানুষ বটে, অন্তত তা শোনাবে, আকাশে;
আসলে দানব এরা, দানবের চেয়ে হিংস্র জীব।
এদের মাঝেই আছে একই রূপে, ভিন্নরূপে নয়—
মানুষ তাদেরও নাম—তারা যুগে যুগে সভ্যতায়
ইমারৎ গড়ে তোলে; বিনিদ্র রজনী কেটে যায়
সাধনায়; সৃষ্ট হয় ধরণীতে সুন্দরের পীঠ।
ইতিহাসে লেখা থাকে মানবের কথা ঘৃণা ভরে,
মানুষের কথা লেখা সযত্নে সুবর্ণ আখরে।
মানব-দানব যারা অশ্রদ্ধায় তাদের স্মরণ
করে লোক। প্রণামের অর্ঘ্য পায় সুলভা মানবে।

মেয়েদের সন্তরণ

রমাদেবী কাব্যতীর্থ

সুন্দর স্বাস্থ্যবান দেহ সর্বকালের মানুষের চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। আজকের এই নানা জটিলতাপূর্ণ পৃথিবীতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের প্রথম এবং প্রধান সোপান হোলো সুন্দর সুডৌল স্বাস্থ্য। সুশ্রুতে আছে—

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে।

অর্থাৎ যাহার বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষের সমতা থাকে, পাচক অগ্নি সম হয়, রস, রক্তাদি সাতটী ধাতুরও সমতা ঠিক থাকে, মল মূত্র ও ঘর্ম এই তিনটি শরীর মলের সমতা ঠিক থাকে, এবং আত্মার দশটি ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা থাকে তাহাকেই সুস্থ বলে।

আজকের দিনে প্রত্যেক মেয়েকেই সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখসুবিধা বজায় রাখতে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম কোরতে হয়। যে সংসারে শৃঙ্খলা আছে, গৃহলক্ষ্মীর নিপুণ হাতের ছাপ প্রতিটি জিনিষে এবং সংসারের সকলের প্রতি মমতা-ভরা দৃষ্টি আছে, আমরা সেই সংসারের গৃহিণীকেই সুগৃহিণী বলি। কিন্তু সুগৃহিণী হোতে গেলে একটি প্রধান জিনিষ চাই যা হোলো স্বাস্থ্য। মন ও শরীর যদি সুস্থ না থাকে তাহলে সব সময়ই একটা বিরক্তিভাব এসে যায় ও তার ফলে সামান্য কারণে ঘটে ধৈর্যচ্যুতি এবং তার অনিবার্য ফল অশান্তি সংসারে বাসা বাঁধে। আমাদের দেশে বর্তমান জীবনযাত্রার নানা জটিল পরিস্থিতির উদ্বেগের মধ্যে সংসারের শ্রান্ত গৃহিণীদের এই স্বাস্থ্য থেকে প্রায়ই বঞ্চিত দেখা যায়। মহাকবি কালিদাস বোলেছেন :—

'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ'

কিন্তু আমাদের দেশের ভগ্নস্বাস্থ্য মেয়েদের পক্ষে কৈ তা সম্ভব হয়? অথচ যখন পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের দিকে তাকাই তখন দেখি তারা সংসারের সব কিছু নিপুণ হাতে সমাধা করার পরও কর্মক্লান্ত পুরুষ বাড়ী ফেরার আগেই সুবিন্যস্ত বেশবাসে প্রস্তুত হোয়ে হাসিমুখে প্রতীক্ষা করে। তারপর চলে তাদের নৈশবিহার ক্লাব, ডান্স, পার্টির আনন্দোৎসব। ওরা তো কখনও সারাদিনের কাজকর্মের পর ক্লান্ত হয় না! অবশ্য অত্যধিক পরিশ্রমে প্রত্যেকেই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়, কারণ এই ক্লান্তির মূলে রয়েছে মাংসপেশী ও স্নায়ুকেন্দ্র। মাংসপেশীর ক্লান্তি বিশ্রামে ও স্নায়ুর শ্রান্তি মানসিক দুশ্চিন্তার অবসানে উপশম হয়। মেয়েরা বিশ্রাম পেতে পারেন মুক্ত বায়ুতে বেড়িয়ে বা হাল্কা ব্যায়ামের সাহায্যে। যাঁরা বাড়ীতেই থাকেন সেই মেয়েরা অনেকেই দ্বিপ্রহরে খানিক বিশ্রাম নেন দিবা-নিদ্রার সাহায্যে, তাঁদের পক্ষে একটু হাল্কা ব্যায়ামের অত্যন্ত প্রয়োজন। একটা বয়সের পর মেয়েরা এমনিই একটু ভারী হোয়ে পড়েন তখন দেখা যায় হাল্কা ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না কোরে তাঁরা এই ভেজালের

দিনে এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের দিনে খাওয়া আরও কমিয়ে 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা' হবার স্বপ্ন দেখে, জটীল রোগ বাধিয়ে বসেন। আজকাল অজীর্ণ রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে বিশেষ করে যাঁরা সারাদিন সংসারে জড়িয়ে আছেন তাঁদের। এই দুঃখ বৈভবের দিনেও সকলের নিত্য কিছু কিছু অঙ্গ সঞ্চালন একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যহ খানিকক্ষণ হেসে খেলে হাল্কা ধরনের ব্যায়াম কোরলে পাকস্থলী ও উহার চারিদিকের পেশীর আবরণগুলির সঞ্চালন অজীর্ণ রোগ দূর কোরতে সমর্থ হয়। এখন প্রশ্ন হোচ্ছে কি সেই ব্যায়াম যা মেয়েদের সবাইকে 'তন্বীশ্যামা' না করুক অনাবশ্যক মেদ করিয়ে সুস্থ ও সুঠাম হওয়ার সহায়তা করে?

যখন 'তন্বীশ্যামাদের' যুগের পাতা ওল্টাই তখন তো কই কোনো ব্যায়ামাগারের বর্ণনা পড়ি না! দেখি না তন্বী হওয়ার জন্য কোনোরকম ব্যায়াম-চর্চ্চা, শুধু দেখি আছে জলকেলী, স্নানলীলা অর্থাৎ সন্তরণ। তাই বুঝি কবিরা স্নানলীলা নিয়ে কতশত কবিতা রচনা কোরেছেন। রবীন্দ্রনাথ বোলেছেন :

যখন বসন্তসখা বায়ু কৌতূহলে
সহাস্য কটাক্ষ করি
কৌতুকে হেরিতেছিলো মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা।
তারপর.....
সোপানে সোপানে তীরে উঠিলা রূপসী
ত্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেলো খসি
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হোয়ে আছে।

যুগে যুগে মেয়েদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল জলে অবগাহন ও সন্তরণে একযোগে ক্লান্তি এবং শ্রান্তি দুইএরই উপশম হয়। তার ফলে শরীর ও মন স্নিগ্ধ এবং প্রফুল্ল হয়। মহাকবি কালিদাস এই সন্তরণের বর্ণনা কোরেছেন—

পত্যাবরৌধঃ শতশোমহীভৃতৈঃ
বিগাহ্যমানো গলিতাঙ্গরাগৈঃ
সন্ধ্যাদ্রুঃ সান্দ্র ইবৈষ বর্ণং
পুষ্যত্যনেকং সরযূপ্রবাহঃ।

অর্থাৎ দেখ শত শত শুদ্ধান্তবাসিনী কামিনীরা সরযূর জলে কি সুন্দর অবগাহন কোরছে। তাদের অঙ্গরাগ বিগলিত হোয়ে জলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় সরযূপ্রবাহ সায়ংকালের নানা বর্ণ বিস্তার কোরে শোভা পাচ্ছে।

নির্ম্মল জলে নয়ন ধৌত হওয়ায় দৃষ্টি নির্ম্মল হয় এবং চক্ষুর শোভা যেন বর্দ্ধিত হয় যথা—

বিলুপ্তযন্তঃপুরসুন্দরীণাং
যদঞ্জনং নৌলুলিতাভিরদ্ভিঃ।
তদম্বুতীর্ণৈর্মদরাগশোভাং
বিলোচনেষু প্রতিমুক্তমাসীৎ।

অর্থাৎ ঐ দেখ বারি সুন্দরীদিগের নয়নের অঞ্জন শোভা লোপ করিয়া দিয়াছিলো। জলবিহার করিতে করিতে উহাদের নয়নে যে আনন্দের শোভা জন্মিয়াছে তাহা বারিরাশিই পুনরর্পণ করিয়াছে।

জলক্রীড়া বা সন্তরণ ক্লান্তি ও শ্রান্তি দূর করে মাতিয়ে তোলে নির্ম্মল আনন্দে। যথা :—

তীরদ্রুমৈরাহিতসংকলাপৈঃ
প্রক্ষিপ্তকেকৈরভিনন্দ্যমানম্।
শ্রোত্রেষু সংমূর্চ্ছতি রক্তমাসীৎ
গীতানুগং বারি মৃদঙ্গবাদ্যম্।

অর্থাৎ ক্রীড়ারত রমণীগণ করপল্লবের দ্বারা জলে আঘাত করায় যেমন মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায় সুখশ্রাব্য মধুরধ্বনি কর্ণকুহরে সুধাধ্বনি করিতেছে আর সেই ধ্বনির সাথে তালে তালে রমণীগণ সুমিষ্ট সঙ্গীত গাহিতেছে।

আবারও দেখি :—

উদ্ধূতকেশস্তনপত্রলেখো
বিশ্লেষি মুক্তাফলপত্রবেষ্টঃ
মনোজ্ঞ এষ প্রমদা মুখানাম্
অম্ভোবিহারা কুলিতোঽলিবেষঃ।

অর্থাৎ দেখ জলবিহারের আক্ষেপে-বিক্ষেপে প্রমদাগণের কেশদাম আলুলায়িত, পত্ররচনা বিলুপ্ত ও অলঙ্কারশূন্য দেহ এবং পরিশ্রমে মুখকান্তি ঈষদাকুলিত তবুও তাহাতে যেন মুখের শোভা বর্দ্ধিতই হইয়াছে।

ঋক্ সংহিতার ভিতরেও দেখি জলকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা কোরে বৈদিক কবি বোলেছেন :—

অপ্সুমে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানিভেষজা।
অগ্নিংচবিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ
আপঃপৃণীতভেষজং বরূথং তন্বে মম
জ্যোক্ চ সূর্যাং দৃশে।

অর্থাৎ জলের মধ্যে অমৃত জলের মধ্যে ঔষধ অতএব জলের প্রশস্তির জন্য হে দেবস্বরূপ ঋত্বিকগণ আপনারা সচেষ্ট হউন। জলের মধ্যে সকল ঔষধ আছে জলের মধ্যে বিশ্বের সুখকর অগ্নি আছে ইহা সোমদেবের বাণী সুতরাং জল বিশ্বভেষজী অর্থাৎ সকল ভেষজের আধার। হে জল-সমূহ, আপনারা আমাদের শরীরের জন্য রোগনাশক ঔষধ বর্দ্ধন করুন। রামায়ণেও দেখি শ্রান্তা, ক্লান্তা সীতাকে উদ্দেশ কোরে রাম বোলেছেন :—

'নদীংচেমাং বিগাহস্ব সীতে মত্তকলিনীং নদীম্।'

অর্থাৎ হে সীতে! সখী যেমন সখীর ভিতর আত্মনিমজ্জন কোরে তৃপ্তি পায় তুমি তেমনি করিয়া এই নদীতে অবগাহন কর।

কিন্তু—

হায় রে রাজধানী পাষাণ কায়া
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে বুক বলে
নাইকো ভালবাসা নাইকো মায়া।

আজকের মহিলা সমাজ সভ্যতার বেড়াজালে বন্দী। তাঁরা আজ গঙ্গা স্নান করেন না। এই জনবহুল শহরে মেয়েদের সন্তরণের ব্যবস্থাও খুবই কম আছে অথচ শরীর ও মন দুইই এক সঙ্গে সুস্থ রাখার জন্য মেয়েদের পক্ষে সন্তরণ একটি মনোরম ও সুন্দর ব্যায়াম। আবহমান কাল থেকে নারীজাতি তার সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তি অবগাহন স্নানে লাঘব কোরে আসছেন। তাই তার—

সদাই মনে হয় আধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো।

আবহাওয়াবিদ্ ফ্লোরেন্স ভ্যান্ ষ্ট্রেটোন্

সুষমা মৈত্র

ফ্লোরেন্স ভ্যান্ ষ্ট্রেটোন্ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে বলতে হয় তিনিই প্রথম মহিলা আবহাওয়াবিদ। বিজ্ঞান বৃক্ষের নবীনতম শাখা হচ্ছে Metcorology বা আবহবিদ্যা। এ-রকম ধরণের যে কোন বিদ্যা থাকতে পারে তা দ্বিতীয়

আবহাওয়াবিদ্ ফ্লোরেন্স ভ্যান্ ষ্ট্রেটোন্

বিশ্বযুদ্ধের আগে কেউ বিশেষ জানত না। অবশ্য আবহাওয়ার পূর্বাভাষ নিয়ে বহুদিন আগে থাকতেই গবেষণা আরম্ভ হয়েছিল এবং ব্যাপক আকারে পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু হয়েছিল। ফ্লোরেন্স ভ্যান্ ষ্ট্রেটোনের কর্মজীবন আরম্ভ হয় দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময় মার্কিণ নৌবাহিনীর অফিসার হিসাবে। এই সময় থেকেই আবহবিদ্যা নিয়ে তাঁর সক্রিয় গবেষণা সুরু হয়। আবহবিজ্ঞানের ক্ষেত্র সুদূর প্রসারী। কী কী প্রাকৃতিক কারণে বিভিন্ন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, সেটা খুঁজে বার করাই হল এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই আবহাওয়া বলতে আবার অনেক কিছু বুঝায় :—জল-ঝড়, টাইফুন, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, আরো কত কী।

চাকুরিতে ঢুকবার আগেই ফ্লোরেন্স বিজ্ঞানে পি-এইচ-ডি উপাধি অর্জন করেছিলেন। পি-এইচ-ডি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মার্কিণ নৌ-বাহিনীতে এই দায়িত্বপূর্ণ পদের শিক্ষানবীশ হিসাবে বহাল হন। দীর্ঘ ৯ মাস প্রশিক্ষণের পর তাঁকে ঐ পদের উপযুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

যদিও স্কুলে পড়ার সময় বিজ্ঞানে তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল তবুও বৈজ্ঞানিক হবার কোন বাসনা তাঁর মনে জাগে নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল সাহিত্যিক হওয়া এবং তাঁর বাড়ীর আবহাওয়া ছিল সাহিত্যচর্চার অনুকূল। ফ্লোরেন্সের মা ছিলেন দু'টি ভাষার পারদর্শিনী। আর তাঁর বাবার একমাত্র লক্ষ্য ছিল কী করে তাঁর একমাত্র সন্তান ফ্লোরেন্সকে লেখাপড়া শেখান যাবে। ফ্লোরেন্সের বাবা ছিলেন হলিউডের বিখ্যাত ফিল্ম কোম্পানী মেট্রো গোল্ডউইনের প্রতিনিধি। কোম্পানীর কাজে তাঁকে বিভিন্ন দেশে আসা-যাওয়া করতে হত এবং ফ্লোরেন্সও মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গ নিত। একবার ইউরোপ যাওয়ার সুযোগ মিলে যায় এবং ফ্লোরেন্স সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন ফরাসী ভাষা শিখে। এ ছাড়া জার্মানী, ইটালিয়ান ও স্পেনীশ ভাষার মোটামুটি জ্ঞান তাঁর মা-র কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এই পরিবেশে ফ্লোরেন্স যে কালক্রমে সাহিত্যিক হয়ে উঠবেন এটাই ছিল সকলের ধারণা। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর সাহিত্যিক হওয়া যায় না। স্কুল কলেজে পড়ে আর অনুকূল পরিবেশে থেকে যে কোন পেশাই আয়ত্ত করা যায় কিন্তু সাহিত্য বড় কঠিন জিনিষ। ফ্লোরেন্সের বাবা সে কথা জানতেন। আর এটাও তিনি জানতেন যে সাহিত্যিকরা যে বাড়ীর দোতলা ও তেতলায় বাস না নিয়ে চিলেকোঠাতেই অবস্থান করেন সেটা শুধু কল্পনার খোরাকের জন্য নয় তার পেছনে আর্থিক অসচ্ছলতাও রয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে, ফ্লোরেন্স রসায়ণ শাস্ত্র পড়বেন। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করার সময় রসায়নাগারের একজন শিক্ষক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভাল ছাত্রী হিসাবে ফ্লোরেন্সকে অনুরোধ করা হয় রসায়নাগারের প্রাথমিক ক্লাশগুলো কিছু দিনের জন্য পরিচালনা করতে। কিন্তু সেই শিক্ষক আর সেরে উঠলেন না এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করলেন যে, ফ্লোরেন্সকে ঐ পদে স্থায়ী ভাবে বহাল করার। অবশ্য এই সর্তে যে এক বছরের মধ্যে তাঁকে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ফ্লোরেন্সের বয়স তখন সবে উনিশ বছর। ১৯৩৩ সালে তিনি সসম্মানে রসায়ন শাস্ত্রে বি, এস, সি পরীক্ষায় পাশ করলেন। চাকুরি পাকা হল। সেই সঙ্গে চলল পি, এইচ, ডি উপাধির জন্য প্রস্তুতি।

স্কুল কলেজে পড়ার সময় ফ্লোরেন্স প্রায়ই গল্প কবিতা ইত্যাদি লিখতেন। কিন্তু এই বার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে গেলেন যে তাঁর লেখা আদৌ ভাল নয়। তাছাড়া ফ্লোরেন্স চিরকালই ছিলেন সত্যান্বেষী ও সত্যবাদী। সাহিত্য অলীক—তাই তিনি যে কখনও সাহিত্যিক হতে পারবেন না সেটা মেনে নিতে তিনি একটুও দ্বিধা করলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন যে বিজ্ঞানই তাঁর উপযুক্ত ক্ষেত্র। অবশ্য পরে তাঁর এ ধারণা বদলে গিয়েছিল। পরে তিনি নিজেই বলেছেন :—"ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়েই সত্যান্বেষী। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি বলতে পারি যে বিজ্ঞান যেমনি সত্যকে বাস্তবে রূপ দিতে চায়, সাহিত্য তেমনি সত্যকে খুঁজে বেড়ায়। সত্যকে যদি কেউ বিভিন্ন শ্রেণীতে, যথা—বৈজ্ঞানিক সত্য, সাহিত্যিক সত্য, ধার্মনিক সত্য ইত্যাদিতে ভাগ করার চেষ্টা করেন তাহলে সেটা ভুল হবে। সত্য অখণ্ড, অভিন্ন ও চিরন্তন।"

এই উপলব্ধি আসার পর থেকে তিনি আবার সাহিত্য চর্চা সুরু করেন। এদিক দিয়ে বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। যেমন আইনষ্টাইন বেহালা বাজাতে ভালবাসতেন, আর নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী মার্টি কোরি (Cori) ছিলেন শিল্পানুরাগী। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তিনি রসায়ন শাস্ত্রে বহু গবেষণা করছিলেন এবং বহু বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর লেখাও বের হয়। তখনই তিনি বুঝতে পারেন যে আবহবিদ্যার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। তারপর সুরু হল মার্কিণ নৌ-বাহিনীর কাজ। একথা সকলেই জানেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিণ নৌ-বাহিনী দু'টি মহা-সাগরে জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন—প্রশান্ত ও অতলান্তিক। সমুদ্রে যুদ্ধ করতে গেলে সমুদ্রের আবহাওয়া জানা একান্ত

প্রয়োজন। সমুদ্রের অবস্থার উপরে অনেক সময় নৌ-যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করে।

বিমানবাহিনী বা নৌ-বাহিনীতে একশ্রেণীর কর্মচারী থাকেন যাঁদের কাজ হচ্ছে বেতারে আবহাওয়াবার্তা পাঠানো। ফ্লোরেন্সের কাজ ঠিক এ ধরণের ছিল না। কারণ এ ধরণের কাজ করবার জন্যে পি, এইচ, ডি উপাধির প্রয়োজন হয় না। ফ্লোরেন্সের কাজ ছিল সমুদ্রের পরবর্তী অবস্থা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কীভাবে নিরূপণ করা যায় সেটা খুঁজে বার করা। সমুদ্রের অবস্থা আগামীকাল বা আগামী কয়েক ঘণ্টা কেমন থাকবে সেটা জানতে পারলে নৌ-বাহিনীর অনেক সুবিধা। সমুদ্রের আকাশে কোন্ স্থানে কিরূপ বাতাসের চাপ আছে এবং কী করে প্রতিকূল অবস্থা এড়ানো যায় সেটাও নৌ-বাহিনীর জানা দরকার। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্ :—গত বিশ্বযুদ্ধে জাপানীরা একবার মার্কিণ বিমানকে তাড়া করে। সৌভাগ্যক্রমে বৈমানিকরা জানতেন যে, অদূরে একটি শীতল বায়ু স্তর আছে। আর যেখানে শীতলবায়ু আছে সেখানে কুয়াশা থাকা অবশ্যম্ভাবী। তাঁরা বিমানগুলি নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই কুয়াশার ভেতরে আত্মগোপন করলেন। জাপানী বিমানবহর তাঁদের খুঁজে না পেয়ে ঘাঁটিতে ফিরে গেল; আর মার্কিণ বিমানবহর অক্ষত দেহে গন্তব্যস্থলে চলে গেল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেও ফ্লোরেন্স দেখলেন যে, নৌ-বাহিনী তাঁকে ছেড়েছে কিন্তু আকাশ তাঁকে ছাড়েনি —ছাড়ছে না। যুদ্ধের পরেও তিনি আবহবিদ্যার গবেষণা ছাড়লেন না। ১৯৪৬ সালে তাঁকে নৌ-বাহিনীর অসামরিক আবহ-পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয় এবং সেই পদে তিনি আজও নিযুক্ত আছেন। তাঁর পরামর্শ, তাঁর অভিমত ক্রমেই বৈজ্ঞানিক মহলে অপরিহার্য হয়ে উঠছে। আবহবিদ্যার ক্ষেত্রও ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের কোথায় কী ধরণের চাপ আছে, কোন জায়গার ধুলো ভেজস্ক্রিয়, কোন জায়গা দিয়ে ঊর্ধ্বগামী বিমান নির্ভয়ে উড়তে পারে এ সমস্ত তথ্যই আবহ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

ফ্লোরেন্স ভ্যান্ ষ্ট্রেটোনের গবেষণার ফল সব সময় জানা যায় না কারণ সেগুলিকে সামরিক কাজে ব্যবহার করাই হচ্ছে নৌ-বাহিনীর উদ্দেশ্য। এ রীতি সব দেশেই আছে। সামরিক তথ্য অসামরিক লোককে কোনকালেই জানানো যায় না। তবে একটা মামুলি উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয় যে, একবার প্রশ্ন উঠেছিল, ওয়াশিংটনে যদি বোমা পড়ে তাহলে তেজস্ক্রিয় ধুলির হাত থেকে কী করে জনসাধারণ ও খাদ্য সামগ্রীকে রক্ষা করা যায়? এর জবাবে ফ্লোরেন্স এই কথা বলেন যে একটা শহরে বোমা পড়লে শহরের প্রত্যেকটি জায়গায়ই যে সমানভাবে তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠবে তার কোন মানে নেই। কোথায় তেজস্ক্রিয়তা কম, সেটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে নিরূপণ করা যায়।

১৯৪৮ সালে আমেরিকার এরো মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের নারীশাখা ফ্লোরেন্সকে সেই বছরের শ্রেষ্ঠা নারী বলে ঘোষণা করেন। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর সম্মান অর্জন করেন। ক্রমান্বয়ে এই নবীনতম আবহবিজ্ঞানের ধাপে ধাপে উন্নতির মূলে ফ্লোরেন্স ভ্যান্ ষ্ট্রেটোনের অবদানের কথা স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। এই মহিয়সী মহিলা ১৯১৩ সালে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন।

——

যজ্ঞের নাম সুবর্ণধেনু

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

বরেন্দ্রভূমির ইতিহাসের ছোট একটা অধ্যায়!

বাংলার ইতিহাসে বরেন্দ্র ভূমির অধ্যায়ই বোধহয় সব চেয়ে বিস্ময়কর। এই বরেন্দ্রভূমিতেই বাংলায় প্রথম প্রচারিত হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম; বরেন্দ্রের জৈন সাধক ভদ্রবাহু হয়েছিলেন মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের দীক্ষাগুরু; বরেন্দ্রেই হয়েছিল রাজা নির্ব্বাচন জন সাধারণের সমবেত ইচ্ছায়; বরেন্দ্রের 'রামকেলী'-ই দিয়েছিল বৈষ্ণবধর্ম্মকে নূতন প্রেরণা। আর বরেন্দ্রেই প্রথম উড়েছিল ইসলামধর্ম্মের অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত পতাকা। শুনতে আশ্চর্য্য লাগে যে বরেন্দ্রেই একদিন হয়েছিল জাত্যন্তরিত হিন্দুকে সমাজে ফিরিয়ে নেবার জন্য সংস্কার প্রচেষ্টা এবং আরও অনেক পরে এই বরেন্দ্রেরই এক বীর রমণী হাতের শাঁখা, সিন্দুর ও বালা পাঠিয়ে ইংরাজ-

দের প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছিলেন সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধবাদীদের।

ইতিহাসের নানা ঘটনা আজ শুধু স্মৃতি হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। এক সময়ে পার্ব্বত্য মুণ জাতি বরেন্দ্রভূমে এসে অনেক অনর্থের সৃষ্টি করেছিল, বাণগড় লিপিতে তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর একদিন পাঠান সেনাপতি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি মুসলমান ফৌজ নিয়ে এখানেই এসেছিলেন এবং দিনাজপুরের দেবকোটে শাসন-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে বসেছিলেন।

তার কয়েক ক্রোশ দূরে অতীতের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে আদিনার মসজিদ, পাণ্ডুয়ার সোনা মসজিদ এবং একলক্ষী মসজিদ। আরও কিছুদূরে রয়েছে বাংলার রাজধানী গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ। তারই নিকটে রয়েছে রামকেলী—লোকে বলে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তরমূর্ত্তি প্রাণপেয়ে আলিঙ্গন ছলে মহাপ্রভুর দেহে মিলিয়ে গিয়েছিল এখানে। এখানকারই দবির খাস ও সাকর মল্লিক মহাপ্রভুর দর্শন পেয়ে রূপান্তরিত হন "রূপ ও সনাতনে"—পরবর্ত্তী কালে যাঁরা হয়েছিলেন গৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদ,—ছয় গোস্বামীর অন্যতম।

এ সবই হলো ইতিহাস। শুধু পাণ্ডুয়ার ভগ্নস্তূপের মধ্যে অতীতের সামাজিক বিপ্লবের যে কাহিনী নীরব হয়ে রয়েছে তার কথা আজ আর কেউ জানে না। কেউ জানে না সেই অনুষ্ঠানের কথা—যার নাম ছিল "সুবর্ণরেখাযজ্ঞ"। বাংলার জনসমাজও ভুলে গেছে সেই রমণীকে, যিনি শুধু সন্তানের মায়ায় নয়, প্রজারক্ষার জন্যই এই অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন—রাজশক্তির সাহায্য নিয়ে।

সে এক অতীতের কাহিনী।

পাণ্ডুয়া তখন পাঠানদের রাজধানী। বাংলা যিনি জয় করেন সেই পাঠান সেনাপতি মহম্মদ বক্তিয়ার অনেক আগেই মারা গেছেন। মারা গেছেন নাশির উদ্দিন। তোগল খাঁ, তৈমুর খাঁ;—সুলতান মুগীশ উদ্দিন কামরূপ জয় করতে গিয়ে হয়েছেন নিহত। কায়কোবাদ আর ফকরউদ্দিনও গেছেন পরপারে আততায়ীর তরবারির আঘাতে। অতবড় সুলতান সেকেন্দার শাহ—যাঁর তৈরী আদিনার মসজিদ আজও পথিকজনের বিস্ময় জাগায় ভারতের সবচেয়ে বড় মসজিদ বলে, তিনিও মারা গেছেন ছেলে গিয়াসউদ্দিনের হাতে। পাঠান সুলতানদের তপ্ত রক্তে গৌড়পাণ্ডুয়ার রাজসিংহাসন রাঙা হয়ে উঠেছিল সে সময়।

কিন্তু সিংহাসন ঘিরে যাই হোক না কেন, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতকে ধর্ম্মীয় এবং রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যেও দীর্ঘকাল একত্র বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই প্রীতির বন্ধন জেগে উঠেছিল, পরস্পর এসে পড়েছিল অতি নিকটে। একের আচার ব্যবহারে অন্যের প্রভাব এসেছিল, এর রীতিনীতি ও নিয়েছিল। মুসলমানেরা শিখল সংস্কৃত, আর হিন্দুরা ব্যুৎপত্তি হল আরবী-পার্শিতে। বাংলা কবিতা নূতন প্রাণ পেল মুসলমান কবির সুরে।

এক বৃন্তে দু'টি কুসুমের মতো পাঠান সুলতানদের স্নেহচ্ছায়ায় তখন এসেছিল হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি সমন্বয়ের যুগ।

কিন্তু সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াসের অনীতি-পরায়ণতা সেই সমন্বয়ের পথে কাঁটা ধরালো। অকর্ম্মণ্য সুলতান কড়িহীন কাব্যপাঠ আর বিলাস ব্যসনে মত্ত হয়ে পরম নিশ্চিন্তে অন্দর মহলের ক্রীড়নক হয়ে পড়লেন। তাঁর "সিন্দুকীর" জল বাংলার ঘরে ঘরে রূপসী মেয়েদের খুঁজে বেড়াতে লাগলো। অসহায়া নারীকণ্ঠের করুণ বিলাপ আর হতাশার বুকভাঙ্গা সুরে আকাশ বাতাস কেঁদে উঠলো। অবাধ লুণ্ঠন, নরহত্যা, ষড়যন্ত্র ও বাভিচার চলতে লাগলো সারা দেশ জুড়ে।

সুলতান শামসুদ্দিন নিজের হাতে নিজের কবর খুঁড়তে আরম্ভ করলেন।

সুরু হলো চক্রান্ত। অপদার্থ সুলতান শামসুদ্দিনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত গড়ে উঠলো। দেশ অরাজকতার অতলে ডুবে গেছে। সুলতানের অক্ষম শাসনে, নারী নির্য্যাতনে দেশ তখন জর্জ্জরিত। সুলতানকে রাজ্যচ্যুত করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করবার ইচ্ছায় চক্রান্তকারী হিন্দু ও মুসলমানপ্রধানেরা হাত মিলালো। সেই চক্রান্তের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন ভাতুরিয়ার জমিদার গণেশ। গৌড় সিংহাসনের স্বপ্ন দেখলেন তিনি।

অলক্ষ্যে নিয়তি হাসলো!

জমিদারেরাই তখন ছিলেন বাংলাদেশের প্রকৃত শাসন-

কর্তা। তাঁদের সেনা ছিল, সামন্ত ছিল—পরিখায় ঘেরা দুর্গ ছিল। চোর ডাকাতের বিচারের ভারও ছিল তাঁদের উপর। সুলতানকে সামান্য রাজস্ব দিলেও তাঁরা ছিলেন প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন। তাঁদের একজন ক'রে প্রতিনিধি তখন সুলতানের দরবারে থাকতেন। তাঁদের কার্য্য-কৌশলের উপরেই তখন জমিদারের মান, জমিদারীর ঐশ্বর্য্য—প্রভাব প্রতিপত্তি নির্ভর করতো। রাজা গণেশ ভাদুরিয়ার জমিদার বংশের হয়ে পাণ্ডুয়ায় এলেন। তাঁর চোখে ভাসছে তখন গৌড়ের মসনদ; ভাবছেন তিনি, কি কৌশলে করবেন সিংহাসন করায়ত্ত।

সেকালের ভাদুরিয়া—সে ছিল মস্ত একটা পরগণা। তখনকার এক একটা পরগণা ছিল যেন এখনকার এক একটা জেলা। ভাদুরিয়া ছিল তাদের মধ্যে সব চাইতে বড়। এখনকার রাজসাহী আর পাবনা—দুইটা জেলার প্রায় সবটাই তখন ছিল ভাদুরিয়া পরগণার অধীন। পরগণার প্রধান নগর একটাবিয়া। নগরের প্রাচীর ঘিরে পরিখা। পরিখার জলে কুমীর ভাসে, দুর্গদ্বারে সিপাই ঘোরে। গড়ের ভিতর হাজার সেনা কাওয়াজ করে; তাদের হাতে অসি বর্শা ঝিলিক দিয়ে ওঠে, তাদের হাতের ধনুর তীর পাখীর মত উড়ে। গণেশ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন, আর ভাবেন মানুষের পক্ষে অসাধ্য কি? মানুষ আমি, মেষের মত থাকবো কেন? গৌড়ের সিংহাসনটা কি আমার হতে পারে না?

নানাদিক ভেবে চিন্তে, সুযোগের সন্ধানে তিনি পাণ্ডুয়ায় এলেন। তাঁর সঙ্গে এলো তাঁর বড় ছেলে যদু।

সুলতান যখন শুনলেন যে, গণেশের সেনারা তীর চালাতে মজবুত, তরবারি চালাতে ওস্তাদ; আর গণেশও তাঁর সেবা করতে প্রস্তুত, তখন তাঁকে ডেকে দরবারে আসন দিলেন। বল্লেন—"আমি তোমায় দশহাজারি মনসবদার ক'রে দিলাম। উপাধি দিলাম রাজা।"

মাথা নত ক'রে কুর্নিশ করে গণেশ বল্লেন—"সুলতান, এরই নাম বিচার। গুণীকে যিনি মান দেন, সত্যকার মানীই ত তিনি।"

দিন যায়—মাস যায়—বৎসরও চলে যায়। গণেশের তীক্ষ্ণবুদ্ধি সকলেরই চোখে পড়ে! তাঁর বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, আর স্বভাব ছিল মিষ্ট। তিনি ধীরে ধীরে সুলতানের প্রিয়পাত্র হয়ে প্রধান মন্ত্রীর পদ অধিকার করলেন। এমন হলো যে তাঁকে ছাড়া সুলতানের আর চলেনা।

শুধু গণেশ নয়, সুলতানের দরবারে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিল যদুও। বলিষ্ঠ রূপবান যুবক, গলায় শুভ্র উপবীত। পেশল যৌবনান্বিত দেহ, চোখে শাণিত ঔজ্জ্বল্য। চলার ভঙ্গিতে রাজকীয় মর্য্যাদা বোধ। তার ললাটে বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রখর আলো। যে দেখে সে আর চোখ ফিরাতে পারে না।

হিন্দুর জীবনে গঙ্গার প্রভাব অপরিসীম। সম্ভব হলে যে কোন হিন্দুই ভোরবেলা গঙ্গা স্নানে যায় আর সন্ধ্যা-বেলা করে ঠাকুরের আরতি দর্শন।

প্রতিদিন প্রাতে গঙ্গায় স্নান করতে যায় যদু। হাতে স্বর্ণময় কোশা, সুললিত কণ্ঠে মধুময় সংস্কৃত স্তোত্র। নিত্য নিয়মিত নদীতে যায় যদু।

আর প্রতিদিনই সুলতানকন্যা আশমানতারা প্রাসাদের অলিন্দে অপেক্ষা করে এই সুদর্শন ব্রাহ্মণযুবকের দর্শনের আশায়। দেখে আর ভাবে এই অপূর্ব্ব সুন্দর যুবক যদি তার জীবনের সাথী হয়! দুঃসহ তৃষ্ণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে তার অতুলনীয় দুটি আঁখি। কখনো বা অশ্রু সজল হয়ে ওঠে তার চক্ষু। বুঝতে পারে, প্রতিদিন ঐ মুখ দেখতে না পেলে তার জীবনটাই বৃথা হয়ে যাবে।

একদিন চোখে পড়লো যদুর—সেই অপরূপ আঁখি দুটি। বাঁকা ভুরুর ছায়ার নীচে কাজল রেখার মাঝে দুটী মায়াবিনী তারা। দেখল তার তাম্বূল রঞ্জিত অধরে সুমধুর হাসি—কালো মেঘের মত তার অলক স্তবক। তার দেহের বৃন্তে ফুটে উঠেছে যেন অনাঘ্রাত কুসুম। যেন হেমন্তের স্বচ্ছতোয়া স্নিগ্ধ নদী, দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

যদু যেন অত রূপ মানুষের শরীরে কখনও দেখেনি। চোখ নাক মুখের অমন শ্রী যেন মানুষের হয় না। মনে হলো যদুর যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কোটি কোটি মানুষের মনের মাধুরী দিয়ে মেশানো এক কল্পনা। জগতের সকল সৌন্দর্য্য যেন তিল তিল করে আহরণ করে আশমানতারার দেহে নয়নাভিরাম তিলোত্তমার মূর্ত্তি নিয়েছে। সে যেন জগতের সকল ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক অপরূপ ছন্দময় রূপক কাব্য।

যমকে দাঁড়ায় যদু : দিনের পর দিন।

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আশমানতারার মুখ, চাঁদ যেমন পূর্ণিমায় ওঠে সমুদ্রের উদ্বেল ভাব দেখে। সুমধুর এক আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার মন।

তাতুরিয়ার রাজপুত্র যদু ঠিকই বুঝেছিল, কেন নিত্য নিয়মিত সময়ে অলিন্দে এসে দাঁড়ায় সুলতান কন্যা। আরও জানতো সে উভয়ের মধ্যেকার পার্থক্যের কথা। ব্রাহ্মণ কুমার আর মুসলমান যুবতীর মিলন শুধু অসম্ভব নয়, শুধু অশাস্ত্রীয়ও নয়—পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকাও অপরাধ। কাছে যাওয়া চলে না, কাছে পাওয়া তো যায়ই না।

কিন্তু একদিন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পায় যদু ; আর ভয় দেখা দেয় তার মনে। ভালো লাগে তারও আশমানতারার সুন্দর সেই মুখ। অনুভব করে যদু সেই সুন্দর মুখখানা যেন তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছে—আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে সে এক বেণী জড়ানো মুখের মায়ায়। এ মায়া সে কাটাবে কেমন করে ?

লোকে বলে "কথা পায়ে হাঁটে।" যদু আর আশমানতারার নীরব প্রেমলীলার কথা গড়াতে গড়াতে উঠলো বেগমের কানে। সংবাদ পেলেন সুলতান—বেগমের কাছ থেকে। বুঝলেন, এই রূপবান ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। মেয়েকে অসুখী করতে চান না তাঁরা। অমতিও দেখলেন না তাঁরা এ বিবাহে। ইলিয়াসশাহী বংশের কন্যার সাথে হিন্দুর বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের বিবাহ শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, বরণীয়ও বটে।

সুলতানের মতামত বেগম সাহেবা প্রস্তাব পাঠালেন গণেশের কাছে—সুলতান কন্যা আশমানতারার সাথে তাতুরিয়ার রাজকুমার যদুর বিবাহের।

নিয়তির পরিহাস পূর্ণ হলো।

রাজা গণেশ চোখে আঁধার দেখলেন। সহসা তাঁর চোখের সামনে সূর্য যেন নিভে এলো—আকাশ ভরা তারার মালা যেন মেঘে ঢাকলো।

একি সত্য ? এ কি সম্ভব ? এক যবনী তরুণীর কটাক্ষের কাছে এমন করে নিজের বংশ গৌরব, ব্রাহ্মণের ধর্ম, স্বজাতি নিষ্ঠা বিসর্জন দিতে হবে একটাকিয়ার রাজপুত্র যদুকে ? চণ্ডী মণ্ডপে আর পূজা হবে না, বিষ্ণু মন্দিরে আর আরতির দীপ জ্বলবে না ? নীরব হয়ে যাবে শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গের ধ্বনি ?

অসম্ভব !

কিন্তু অসম্ভবও সম্ভব হলো। রূপমুগ্ধ যদু পাঠান সিংহাসনের লোভে গণেশ কোনরূপ বাধা দেবার চেষ্টা করার পূর্বেই পীর নূর কুতুব আলমের কৌশলে ইসলামধর্ম গ্রহণ ক'রে জালাল উদ্দিন নাম নিয়ে আশমানতারাকে বিয়ে করলো। আশ্রয় নিলো সুলতানের প্রাসাদে। স্নিগ্ধ যৌবনের লাবণ্যে কলোলিত শুধু আশমানতারার মুখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে গেল জালালুদ্দিন।

বিস্ময় জাগে তার দুই চোখে। তার নিষ্পলক দৃষ্টি যেন এক মোহের ভাবে মগ্ন হয়ে থাকে সুলতান কন্যার দিকে চেয়ে। এত রূপ ! এত প্রেম ! অসহায়ের মত আশমানতারার বাহুবন্ধনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে হিন্দু রাজা গণেশের মুসলমান ছেলে জালালুদ্দিন।

তাতুরিয়ার যখন এ খবর গেল, সকলে হাহাকার ক'রে উঠলো। ভূমিকম্পে গৃহস্থের সযত্ন নির্মিত গৃহ যেমন ধূলিসাৎ হয়ে যায়, তেমনি এক মুহূর্তে হলো তাদের সকল আশার সমাধি।

শুনলেন রাণী ত্রিপুরা সুন্দরী পুত্রের ধর্মান্তর গ্রহণের কথা। এক নিমেষের জন্য তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠলো ; চক্ষু হলো অশ্রুসজল এবং দুই কম্পিত ওষ্ঠ দিয়ে ক্ষীণ আর্তনাদও শোনা গেল। পর মুহূর্তেই তাঁর চোখ ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলে উঠলো।

বলে উঠলেন রাণী—"নাজাও নৌকা। আমি পাণ্ডুয়ায় যাব,—যদুকে ফিরাতে।"

সকলে বললো—"কি করে ফিরাবেন ? পোড়ামাটী কি জোড়া লাগে ? মুসলমান কি কখনো হিন্দু হয় ?"

স্তব্ধ হয়ে গেলেন রাণী। সত্যই হিন্দু সমাজ বড় জাগ্রত ; বড় রক্ষণশীল তার প্রথা। ধর্মত্যাগীর প্রতি সে সমাজ চিরকাল ক্ষমাহীন। ধীরে মনে আসে তাঁর সত্যকাম জাবালের কথা। সত্যই যেখানে ধর্ম ; সত্যপালনে যে সমাজে জারজ সন্তানও পায় ব্রাহ্মণত্বের অধিকার, সেখানে কি পুনরায় স্থান হবে না তাঁর যদুর ? মনে

পড়ে তাঁর শক, হূণ আর গ্রীকদের কথা, যাঁদের উদার হিন্দুসমাজ হিন্দু হিসাবেই সমাজ-দেহে মিশিয়ে নিয়েছে !

ধীরে বলেন রাণী—"নিশ্চয়ই হয়। হিন্দুধর্ম্ম কখনই এত অনুদার নয়। তা ছাড়া, আজ যদি বহুকে ফিরাতে না পারি তবে হিন্দুর পক্ষে বড় বিপদ। বহুর দৃষ্টান্তে আর প্রেরণায় হাজার হিন্দু মুসলমান হবে। প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তাকে হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে আনতে হবে। নইলে উপায় নেই।"

ভেসে চলে ত্রিপুরাসুন্দরীর বজরা, নদীপথ বেয়ে। নদীর দুই তীরে বেলা শেষ নিত্য নূতন দৃশ্য, প্রভাতের সূর্য্য আর সন্ধ্যার চাঁদ দূর করে দেয় চারিদিকের আঁধার। ভোরের পাখীর কাকলীতে, আর সাঁঝের জোনাকীর আলোয় গড়ে ভোলে নিত্য নূতন ছন্দ।

যেতে যেতে ভাবেন ত্রিপুরা সুন্দরী কেমন করে কোথায় বহুকে, কি হবে তাঁর কার্য্যপদ্ধতি।

এই তো জগৎ। কালচক্র আবর্ত্তিত হতে থাকে চরম দুঃখ ও পরম আনন্দকে সমান উপেক্ষা করে, সুখ দুঃখ দুয়ের মূল্যই তার কাছে সমান। হয়তো সেইজন্যই মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব হয়, জীবন হয় না অচল। নতুবা শুধু সুখ অথবা শুধু দুঃখ থাকলে জীবন হয়ে উঠ্‌তো গুরুভার, দুর্ব্বহ। মানুষের চলার পথ হতো অন্ধকার।

রাণী পাণ্ডুয়ায় এলেন।

স্ত্রীর মুখে সকল কথা শুনে গণেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লেন। আনন্দে অশ্রু সজল হয়ে উঠলো তাঁর চোখ। বলে উঠলেন তিনি—"যদি কখনো হিন্দু বাঙ্গালী জাগে, তবে সে তোমার জন্যই জাগবে রাণী, তোমার জন্যই জাগবে। নারী যদি শক্তি না দেয়, পুরুষ কোথায় পাবে ?"

প্রশ্ন জাগে গণেশের মনে, এই বরকুণো, প্রথা ও সংস্কারে আবদ্ধ জরাজীর্ণ হিন্দু সমাজে এমন নারী জন্মালো কেমন করে ? সফল হয় যদি এর মনের কামনা নূতন যুগের সূত্রপাত হবে দেশে।

আরম্ভ হলেন তিনি। প্রায়শ্চিত্ত করানো এমন কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু···

রাজা গণেশ বলেন – "কিন্তু···।"

আর কিছু বলতে পারেন না। স্তব্ধ গম্ভীর রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে যান তিনি। প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে কোন পদ্ধতিতে হবে, তা কি ভেবেছেন রাণী ? কুপমণ্ডুকতায় আবদ্ধ হিন্দু সমাজে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীর পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তনের বিধানই বা কে দিবে ? কোথায় আছে সেই উদার হৃদয় পণ্ডিত সজ্জন ? বলতে চান গণেশ একথা রাণীকে। কিন্তু বলতে পারেন না, বলে কি লাভ ?

কোন কথাই বল্লেন না রাজা গণেশ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী যেন তাঁর মনের গোপন কথা নিজের অন্তর দিয়েই শুনতে পেয়েছেন। ধীরে কক্ষান্তরে চলে গেলেন রাণী এবং রাজা কিছু বলবার পূর্ব্বেই তাঁর সামনে দুখানা হাতে লেখা চিঠি তুলে ধরলেন। বল্লেন—"নাম সই ক'রে দাও।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন গণেশ আগেকার মতই অবিসম্বাদী রূপ। সংসারের বিপর্য্যয়ে কিছু ম্লান হলেও যেন একটা আলোর দীপ্তি জ্বলে উঠেছে রাণীর মুখে। কর্ত্তব্যে কঠোর মুখে মিলে আছে প্রশান্তি আর লালিত্য। ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। সুখী কি দুঃখী—সে প্রশ্ন আর মনে আসে না। দুচোখের শান্ত গাম্ভীর্য্য যেন সমস্ত বিচার বুদ্ধি আর আকাঙ্ক্ষাকে শিথিল করে আনে। দেখলেই শ্রদ্ধা হয়, ভরসা জাগে মনে।

উশনাচার্য্য আর কুল্লুকভট্টকে লেখা দু'খানি আহ্বান লিপির দিকে তাকিয়ে তাঁর আজীবন সহচরী রাণীকে যেন নূতন ক'রে চিনলেন রাজা গণেশ। বংশের এই শোচনীয় বিপর্য্যয়ে হিন্দুত্বের মত অসহায়া হওয়ার কথা যার, সে দিয়েছে সমাজ ব্যবস্থাপক দুই পণ্ডিতাগ্রগণ্যকে ধর্ম্ম রক্ষার আহ্বান ! হিন্দুর এই দুর্দ্দিনে তাঁদের বিধান চাই—চাই বহুর প্রায়শ্চিত্তের পদ্ধতি ;—যার ফলে বহু ত হিন্দু সমাজে ফিরে আস্‌বেই। আর একজন হিন্দুও যাতে মুসলমান হতে না পারে। আনন্দে হেসে ওঠে রাজা গণেশের দুই চক্ষু। আর কোন "কিন্তু" নেই তাঁর মনে। উশনাচার্য্য আর কুল্লুক ভট্ট—দুই প্রবীণ সমাজপতি যদি বিধান দেন বহুর প্রায়শ্চিত্তের, সে বিধান মেনে নেবে সমস্ত হিন্দু-সমাজ নত মস্তকে।

গণেশ আহ্বান লিপিতে নিজের নাম স্বাক্ষর করে দিলেন। বিশ্বাসী দূত রওনা হয়ে গেল সে চিঠি নিয়ে।

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে যদুকে? সুলতানের প্রাসাদে মুসলমান আমীর ওমরাহদের সাহায্য নিয়ে শক্তিমান হ'বার এবং পাণ্ডুয়ার মসনদ অধিকার করবার চেষ্টায় আছে জালালুদ্দিন! এখন উপায়?

স্বামীকে বললেন রাণী—"যদুকে বধ করো!"

গণেশ চমকে উঠলেন—"বধ করবো যদুকে? যে আমার বংশের দুলাল—তোমার নাড়ি ছেঁড়া ধন?'

বলে ওঠেন রাণী ত্রিপুরা—"আমার যদু মরে গেছে—জালালউদ্দিন আমার ছেলে নয়। যদি হিন্দুকে বাঁচাতে চাও, তবে আগে ওকে হত্যা কর।"

গণেশের কয়েকজন অতি বিশ্বাসী অনুচরকে ডেকে রাণী তাদের গোপনে বলেন—"এই পথে জালালউদ্দিন আসছেন মসজিদ থেকে, সঙ্গে বেশী লোকজন নেই। তোমরা বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে' শিকারের মতো ধরবে আর মুখ বেঁধে ফেলবে। তারপর হাত-পা বেঁধে অন্তঃপুরে নিয়ে আসবে আমার কাছে।"

অনুচরেরা চমকে ওঠে—"সর্বনাশ! সুলতান জালালউদ্দিন! দু'দিন বাদে মসনদে বসতে যাচ্ছেন যিনি?"

"—হাঁ! মহারাজের আদেশ।"

রাজা গণেশের নাম শুনে অনুচরেরা প্রণাম করে বললো—"ঠিক আছে। প্রাণ যায় সেও ভাল, মহারাজের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

সেদিন সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এলো, গাছের নীচে আঁধার নামল। নগরের রাজপথ হয়ে উঠ্‌লো কালো, তখন দূরে তাজামের শব্দ শোনা গেল। সুলতান জামাতা জালাল-উদ্দিন মুর কুতুব আলমের দরগায় নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন,—সঙ্গে ছিল কয়েকজন দেহরক্ষী। তাদের মুখের হাসি মুখেই রইলো তীক্ষ্ণ কয়েকটা তীর এসে তাদের বুকে বিঁধে গেল। তাজামের বেহারারা চিৎকার করে উঠ্‌লো—ডাকাত—ডাকাত—ডাকাত!

এক নিমেষের মধ্যে জালালউদ্দিনকে বেঁধে ফেলে গভীর আঁধার কানন পথে বয়ে তাকে নিয়ে এলো রাণী ত্রিপুরার সম্মুখে। যদুর মুখের আর চোখের বাঁধন যখন খুলে দেওয়া হলো, দেখল সে তার সম্মুখে বসে রয়েছেন তার মা।" দুচোখ দিয়ে তাঁর অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে অশ্রু, স্নিগ্ধায়ত মধুভাকোষন দুটি চক্ষু যেন ছল ছল করছে নির্ঝরিণী বেদনায়।

মাকে দেখে লজ্জায় অনুতাপে যদুর মুখ নত হয়ে এলো। তার অতীত জীবন যেন এক মোহময় করুণায় অশ্রু ও সৌন্দর্যময় মূর্তি ধরে তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার অশ্রুর বাঁধ হঠাৎ ভেঙ্গে ধারায় ঝরে এলো তার দুই গাল বেয়ে।

সেদিন সূর্য্য যখন রাঙা হয়ে কেবল পাটে এসে বসলো, গাছের মাথায় পাখায় পাতায় যখন ঘুমভাঙ্গা পাখী কলরব ক'রে উঠলো, তখন রাজা গণেশের প্রাসাদ শিরে ভেরী বেজে উঠলো। সাগরুদ্দিন বাদুজিদের তপ্পকে তর্পণ করে গৌড়ের মসনদে এসে বসলেন রাজা গণেশ—উপাধি নিলেন যদুজমর্দ্দন। আজিও "শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ-পরায়ণ-দনুজ-মর্দ্দনদেবের মুদ্রা পাওয়া যায় কত।

দীর্ঘকালের পাঠান রাজত্বের পর বাংলাদেশে হিন্দুর জয়পতাকা উড়লো। বাংলার আকাশ বাতাস মাতাল ক'রে ধ্বনি উঠ্‌লো—"জয়-মা কালী।"

শীতের মধ্যাহ্ন। উত্তরের হিমেল হাওয়ায় পাণ্ডুয়ানগরের গাছের পাতা সরসর মরমর রব তুলছে—দু' একটা ঘুঘু করুণ সুরে ডেকে চলেছে অকারণে। প্রাসাদে বিশ্রাম করছেন রাজা গণেশ।

ত্রিপুরা সুন্দরী বললেন, রাজা গণেশকে—"মহারাজ, এই দিনটির জন্য আমি তাতুরিয়া ত্যাগ করার দিন থেকে অপেক্ষা করে আছি।"

উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন গণেশ—'কেন বল তো?'

উত্তর দেন রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী—"যদুকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতেই হবে, নইলে হিন্দুর বড় বিপদ। পণ্ডিতদের বিধান নিতে হবে। কিন্তু পণ্ডিতদের বিধানের সঙ্গে যদি রাজশক্তির সহায়ত থাকে তবে কাজ হবে অনেক সহজ।"

স্বীকার করেন গণেশ কথার সত্যতা।

পাণ্ডুয়ার রাজসভায় পণ্ডিতদের বিচার সভা বসলো। সভায় এলেন নবদ্বীপ থেকে স্মৃতিতীর্থ। ভট্টপল্লীর পঞ্চানন, কাশী থেকে বাচস্পতি আর মিথিলা থেকে চক্রতীর্থ। এলেন উদয়নাচার্য্য আর কুলুকভট্ট। আরও কত যে পণ্ডিত এলেন তার সংখ্যা করে কে? রাজ্যের প্রাচীন ও প্রবীণ ও প্রধানগণও হয়েছেন সভায় সমাগত,

কয়েকদিন ধরে চলেছে বিচার বিতর্ক। কোন সিদ্ধান্তই হয় না।

পণ্ডিতেরা কেউ বলেন—একবার যে মুসলমান হয়েছে তার আর হিন্দু হবার উপায় নাই। আবার কেউ বলেন —"গুপ্তচর পাঠ ক'রে বন্ধু প্রাণত্যাগ করুক।" কোন মীমাংসাই আর হয় না। শেষে উশনাচার্য্য আর কুলগুরুই বিধান দিলেন—"সুবর্ণবেহু যজ্ঞ ক'রে—সোনার তৈরী গরুর মুখের ভিতর দিয়ে বন্ধুকে ঢুকিয়ে যদি পিছন দিয়ে বাইরে আনা যায়, আর প্রায়শ্চিত্ত করে সে, তবেই বন্ধু আবার হিন্দু হবে।"

মহারাণী ত্রিপুরা সমাজপতিদের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর মুখে হাসি, চোখে জল। যেন সফলতার আনন্দাশ্রু দিয়ে পা ধুইয়ে দিতে চান সমাজপতিদের। তাঁর কামনা, তাঁর বিশ্বাস, পূর্ণ হয়েছে আজ। উদার হিন্দু সমাজ সঙ্কীর্ণতা দূর করে আবার ফিরিয়ে নিতে বলেছে তার পথ-ভ্রষ্ট সন্তানকে। হিন্দুর সমাজজীবনে আসে এক নূতন প্রাণের স্পন্দন ; হিন্দুর ধর্ম্ম জীবনে এলো এক নূতন ভাব। যে ভাবের বন্যায় ভেসে যাবে সমাজের সকল ক্লেদ, পঙ্ক আর দুর্নীতি ; কেউ আর যাবে না চলে অন্য সমাজে।

সেজে উঠ্‌লো পাতুয়ানগর,—ফুলে ফলে, লতায় পাতায়। সুসজ্জিত হলো তার তোরণদ্বার। আলোক মালায় হলো বিভূষিত। চারিদিক থেকে এলো কত কুশলী স্বর্ণকার—তৈরী করলো তারা স্তূপীকৃত সুবর্ণ দিয়ে বিশাল এক গেহু। পুষ্পাভরণে সজ্জিত হলো তার দেহ।

নগরের কেন্দ্রস্থলে উন্নত মণ্ডপে তৈরী হলো যজ্ঞশালা, ঘৃতাক্তে অহরহঃ সমুজ্জ্বল। উপরে চিত্রিত চন্দ্রাতপ :— লাল নীল রেশমের ফুল আঁকা। পার্শ্বপীঠে লাল গালিচার আস্তরণ। মাথার উপরে বেলোয়াড়ী ঝাড়। বেদীতলের দ্বারপথে সুসজ্জিত পূর্ণকুম্ভ।

যজ্ঞ আরম্ভ হলো। হরিদ্রা আর চন্দনের কোঁটা কেটে মুণ্ডিতমস্তক আলাদুদ্দিন এসে বসলো যজ্ঞবেদীতে। মন্ত্র পাঠ ক'রে যজ্ঞকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দিলেন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ, প্রণীত, প্রণীত অগ্নিদেবতা, আমাদের পূজা গ্রহণ কর। পূর্ণ হোক, ধন্য হোক আমাদের এই অনুষ্ঠান।

চারিদিকে বেজে ওঠে বাদ্যযন্ত্র। উল্লাসে হরিধ্বনি দিয়ে ওঠে জনতা। তাদের উচ্চকণ্ঠ ভেদ করে ধ্বনিত হয়, পুরোহিতের মন্ত্র—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।

হে অগ্নি, তুমি আমাকে সুপথে নিয়ে চলো। হে দেব, আমাদের পাপপুণ্য ভালমন্দ কোন কিছুই ত তোমার অজ্ঞাত নয়। তুমি আমাদের পাপদূর ক'রে পুণ্যের পথ দেখাও। হে দেব, তোমাকে প্রণাম।

যজ্ঞের ধোঁয়ায় চারিদিক আঁধার হয়ে উঠলো। চন্দন কাষ্ঠে ঘৃতের আহুতি শত সহস্র শিখায় জ্বলে উঠলো। ঘোর রোলে বেজে চললো শঙ্খ, ঘণ্টা, সানাই আর জগ-ঝম্প। বিচিত্র এক উন্মাদনায় জেগে উঠলো সকলের মন।

পাতুয়ার রাজপ্রাসাদে যেন মহাপূজার আয়োজন। রাণী ত্রিপুরা যেন দশভুজা হয়ে দশহাতে অন্ন দিচ্ছেন, বস্ত্র দিচ্ছেন—যে যা চাচ্ছে তাকে তাই দিয়ে পরিতুষ্ট করছেন। শত শত সধবা এসে তাদের শাঁখা দিলেন, সিন্দুর দিলেন। ঘরদালানে ব্রাহ্মণ ভক্ত—পণ্ডিত কত খেতে বসেছেন। মহারাণী নিজ হাতে পরিবেশন করে তাঁদের খাওয়াচ্ছেন। রাজকর্ম্মচারীরা প্রত্যেকের জন্য প্রণামী ব্যবস্থা রেখেছেন। চারিদিকে বেজে উঠ্‌ছে সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দরোল।

ভবুও উৎসবের অবসর মুহূর্ত্তে অনুভব করেন রাণী ত্রিপুরা, তাঁর মনে যেন একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে। সে কাঁটা কিছুতেই তিনি তুলতে পারছেন না তাঁর মন থেকে। তাঁর হৃদয়ে, তাঁর সমস্ত সত্তায় যেন কাঁটাটা মিশে রয়েছে। সে কাঁটা সুলতানকন্যা আলমানতারার বিরহ বিধুর মুখ। তার হৃদয়ের ব্যথা রাণী অনুভব করেন নিজের মন দিয়ে। আবার আশঙ্কা জেগে ওঠে তাঁর মনে, লাবণ্যময়ী সে মুখচ্ছবিকে ভুলে যেতে পারবে কি বন্ধু? রমণীসুলভ লাবণ্যের মোহে সে কি আবার পথ ভুলে যাবে? সব কিছু ভছনছ হয়ে যাবে আবার?

মনের ব্যথা, হৃদয়ের আশঙ্কা, মনে চেপে রেখে তিনি যজ্ঞের কাছে নিজেকে সঁপে দেন। শুনতে পান যজ্ঞকুণ্ড ঘিরে তখনো মন্ত্রপাঠ হচ্ছে—

"ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধী·····"

উপলব্ধি করেন ত্রিপুরা সুন্দরী, যেন পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের সূর্য্য পর্য্যন্ত সকল কিছুই অমৃতে অভিষিক্ত হয়ে মধুময় হয়ে উঠেছে—চারিদিকে বয়ে যায় মধুময় শান্তির ধারা। প্রার্থনা করেন তিনি, বহুর জীবন যেন মধুময়—শান্তিময় হয়ে ওঠে।

সকল বিধি বিধান পালন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু হলো বহু। হিন্দুর রক্ত স্রোতোধারা ছিল তার ধমনীতে; বিচিত্র পার্ব্বণানুষ্ঠানে জেগে উঠ্‌লো তার কুলক্রমাগত মনোবল। ঘৃত হরিদ্রা চন্দন আর সমিধ্ আহুতি দিয়ে যজ্ঞমুণ্ড প্রণাম করে সে লুটিয়ে পড়লো মায়ের পায়ে। চোখে তার অবিরল ধারা। অনুতাপের অগ্নিস্রোত যেন তার দু'চোখ দিয়ে ঝরতে লাগলো।

সস্নেহে তাকে তুলে নিলেন মাতা—জড়িয়ে ধরলেন বুকের মাঝে। আর তাঁর দুচোখ দিয়ে অঝোর ধারায় নামলো অশ্রু আনন্দের আবেগে। তাঁর বহু ফিরে এসেছে, সার্থক হয়েছে তাঁর যজ্ঞের অনুষ্ঠান!

ইতিহাসের আমোঘ নিয়তিতে পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতা মহেন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত ক'রে আবার পাণ্ডুয়ার মসনদে বসেছিল বহু। লাবণ্যময়ী আসমানতারার প্রেমালিঙ্গনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আবার নিয়েছিল সে জালালুদ্দিন উপাধি। তার মৃত্যুর পরে হিন্দুবিধবার সাজে আশ্রয় নিয়েছিল আসমানতারা ভাতুরিয়াতে শ্বশুরের ভিটায়। হিন্দু বিধবার নিষ্ঠা ছিল তার সে জীবনে। সে অন্য কথা। অনেক পরে এসেছিল সে জীবন।

আজও আছে ধ্বংসস্তূপে আচ্ছন্ন ইতিহাসের শ্মশানভূমি পাণ্ডুয়ানগরীতে একলক্ষী মসজিদ, হিন্দু মাতার মুসলমান সন্তান সুলতান জালালুদ্দিনের কবর বুকে নিয়ে। জনহীন জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানের স্তব্ধতা মাঝে মাঝে ঘুচে যায় কৌতূহলী পথিকের চরণ সম্পাতে। পাশাপাশি শায়িত তিনটি কবরের দিকে তাকিয়ে তারা বহু আর আসমানতারার অপরূপ প্রেমাভিনয়ের কথাই শুধু স্মরণ করে থাকে। কিন্তু তখন কি একবারও কারো মনে হয় সেই রমণীর কথা, যিনি এই পাণ্ডুয়াতেই স্বজাতির মুখের দিকে চেয়ে এক বিচিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন; ফিরিয়ে এনেছিলেন জাত্যন্তরিত সন্তানকে আবার নিজের ধর্ম্মে?

সমাজবিপ্লবে ত্রিপুরা সুন্দরীর এই অপূর্ব্ব অবদানের কথা আজ পাণ্ডুয়ার ধ্বংসস্তূপের ভিতর একেবারে নীরব হয়ে চাপা পড়ে আছে। ভুলে গেছে সেই বীররমণীর কথা আত্মবিস্মৃত হিন্দু সমাজ, কিন্তু পাণ্ডুয়ারই ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাঁর রিয়াজ-উস্-সালাতিনের পাতায় পাতায় লিখে রেখেছেন এই অপরূপা রমণীর অপরিসীম স্বধর্ম্ম নিষ্ঠার কথা। তিনি লিখেছেন নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগের বাসনায় রাজা গণেশ নিজেও ইসলামধর্ম্ম অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন; রাণী ত্রিপুরা সুন্দরীর প্রস্তাবই তাঁকে সে ইচ্ছা দমন করতে বাধ্য করে। ত্রিপুরা সুন্দরীর স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠাতেই মুসলমান শাসনাধীন বাংলা দেশে "যদুজমর্দ্দনদেব" আর "মহেন্দ্রদেব" হিন্দুর পুণ্যতীর্থরূপে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন, মুখর রৌপ্যমুদ্রা আজও দিচ্ছে তাঁদের পরিচয়।

আর আছে উত্তরবঙ্গের বাল্মীকি অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণে ত্রিপুরা সুন্দরীর সমাজ বিপ্লবের স্মৃতি—

"বল কহি জাতি যদি লঞ্চ যবনে।
ছয় প্রাণ অহ যদি করাএ ভক্ষণে"
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জনে।
ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে গোয়াংস ভক্ষণে।"

বাংলার সমাজজীবনে রাণী ত্রিপুরার দান তাই আজ মাথা লুটিয়ে স্বীকার করতে হয়। প্রার্থনা জাগে মনে, বাংলার ঘরে ঘরে প্রদীপের শিখার মত যেন আবার জেগে ওঠে এই রমণীর স্মৃতি পূজা প্রতি সন্ধ্যায়। তাঁর আদর্শ যেন ছড়িয়ে যায় দূরে দূরান্তরে!

স্বর্গের প্রজাস্বত্বের সাধনা

। রম্য রচনা ।

মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

"আরে ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! আজকাল ছেলেমেয়েদের কি আর ঠাকুর দেবতার প্রতি কোন ভক্তিশ্রদ্ধা আছে! কেবল পার্থিব সুখের দিকেই দৃষ্টি।

আরে পৃথিবীর সুখই কি সব? আজকের এই আনন্দ স্ফূর্তি তো দুদিনের। তোমাদের এই দেহ কি চিরকাল থাকবে—যে কেবল দৈহিক সুখের জন্য, সাজসজ্জার জন্যে দিনের অর্দ্ধেক খরচ করো আর অর্দ্ধেক খরচ করো ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ করে? আরে বাবা, এসব কিছুই থাকবে না, কিছুই সঙ্গে যাবে না। তাই বলি তোমরা পার্থিব সুখের কথা ভুলে সেই পরম ব্রহ্মের চিন্তায় মন দাও, নৃত্যলে।"

আমাদের "স্বল্পং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে, অবাঞ্ছিত, অতিথির, সমিতি নীতিবিরুদ্ধ বক্তৃতা শুনে সকলে তাঁর দিকে আক্রমণের ভঙ্গিতে তাকালো। আর সর্ব্বকনিষ্ঠ সভ্য তার ছাপ্পু করা চুল কাঁকিয়ে বললে, থাক্ দাদু থাক, ওসব উপদেশ দিদিমাকে দিন। তাঁকে বলুন খুব করে মালা ঘুরিয়ে নাম জপ করে আমাদের স্বর্গে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করতে। আমাদের মত অধার্মিকদের কাছে আপনার অমূল্য বাণী ছড়িয়ে আমাদের স্বর্গের পথ সুগম করা সম্ভব হবে না।"

"তুই থাম্ ছোড়া! তোর দিদিমাকে আর এসব কথা বলে দিতে হয় না। দেখগে যা তিনি দিনরাত কেবল স্বর্গে যাবার চেষ্টা করছেন ঠাকুর ঘরে মাথা কুটে। ঈশ্বর ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। তোমাদের সুন্দরীদের মত কেবল মুখে রং মেখে, নাইলন শাড়ী পরে পরী সেজে বেড়ান না। তাঁর মতো ধর্মপরায়ণা সতী-সাধ্বী স্ত্রী আর তোমাদের পেতে হবে না।"

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, "ঠিক বলেছেন দাদু, দিদিমার আর আপনার দিকেও দৃষ্টি নেই। তিনি খালি ভাবছেন কি করে ভগবানের মোসাহেবী করে, ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যে একটুকরো জমির মৌরসি পাট্টা পাওয়া যায়। আর কি করে সেখানে গিয়ে চিরযৌবনা অপ্সরী হয়ে, চিরনবীন অপ্সরের সঙ্গে নৃত্য করে দিবারাত্র কাটানো যায়।"

"কি বল্লি! আমার কথা ভুলে পরপুরুষের সঙ্গে নাচবার জন্য ভগবানের মোসাহেবী কোরছে তোদের দিদিমা?"

রাগে ক্ষোভে থেই থেই করে নাচতে লাগলো সত্তর বছরের পাক্কাবুড়ো দাদু।

আমি বহু কষ্টে তাঁকে থামিয়ে বলি—"আহা ভুল কোরছেন দাদু। আমি পরপুরুষের কথা বলিনি, আর স্বর্গে যাঁরা থাকেন তাঁরা কি আর মর্ত্যের পুরুষের মতো? তাঁরা হচ্ছেন ঈশ্বরের অনুগ্রহপুষ্ট অপ্সর, আর সেই অপ্সর হয়ত আপনি স্বয়ং। দিদিমা কি শুধু আর নিজের জন্যে আজি পেশ কোরছেন! আপনিওতো পাবেন স্বর্গের প্রজাস্বত্ব জমি।"

আমার কথা শুনে, দাদু তার কানে আঙুল দিয়ে চোখ বড় করে, নাক ফুলিয়ে বললেন, "চুপ কর, তোরা চুপ কর, তোরা অধার্মিক হেজ্জু হতে পারিস্, কিন্তু আমি তোদের কথা শুনে আর দেবতাদের কোপে পড়তে চাই না।"

"আচ্ছা, আমি অন্যায় কথা কি বল্লাম দাদু। আপনাদের ধর্মগ্রন্থে স্বর্গরাজ্যের কি বর্ণনা দেওয়া আছে বলুন। সেখানে কেউ বুড়ো হয় না, জীবিকার জন্যে দশটা পাঁচটা বাসে ঝুলতে ঝুলতে অফিস যেতে হয়না, বেকারেরা চাকরীর জন্যে অফিসে অফিসে উমেদারী করে বেড়ায় না, মা বাবার প্রতি কর্ত্তব্য কোরতে হয় না, ছেলে-মেয়েদের বাপমার নিষেধ মেনে চলতে হয় না, মেয়েদের সন্তান পালনের দায়িত্ব নিতে হয় না। কারণ সেখানে দুটি মাত্র শ্রেণী আছে, তারা অপ্সর আর অপ্সরী।

"এই অপ্সর-অপ্সরীরা কারো গর্ভজাত নয়। মর্ত্যের মানুষেরা অনেক পুণ্য সংগ্রহ করে স্বর্গে গিয়ে এই চির-যৌবনের অধিকারী হয়েছেন। তাদের কাজ হল, খালি নাচ গান করে জোড়ায় জোড়ায় ফুলে ভরা বৃন্দাবনে প্রেমালাপে মগ্ন থাকা। খিদে পেলে হাত বাড়ালেই আঙুরের থোকা, ফলে ভরা থালা হাতে এসে পড়ে। (বোধ হয় মর্ত্যের মানুষেরা দোতাদের যে ভেট পাঠায় সেই সব ফলের থালা।) সেখানে কোন অপ্সর, অপ্সরীকে নিজের সম্পত্তি মনে করে রোষের কশায় না আর পুরোনো প্রিয়াকে পুরীর মধ্যে বন্দী করে একপাল ছেলেমেয়ের ভার দিয়ে নতুনের দিকে তাকায় না। কারণ অপ্সরী চিরনতুনা, চিরযৌবনা হয়ে নিত্য নবরূপে অপ্সরের সামনে উপস্থিত হয়। আর অপ্সরও চির-নতুন হয়ে খালি মন ভোলানো প্রাণ দোলানো গান গেয়ে অপ্সরীর মনোরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত থাকে। বলুন এই তো স্বর্গরাজ্যের মোটামুটি চেহারা!"

আমার কথা শুনে দাদু আর দাঁড়ান না, রাগে গরগর কোরতে কোরতে ছাতাগাঠির জন্যে হাত বাড়ালেন। বুঝলুম দাদু খুব রেগেছেন। আমার অবিমৃষ্টকারিতার জন্যে মাফ্ চেয়ে বহু ষষ্টে আবার বসালাম—তারপর বললাম—

আচ্ছা দাদু, মনে করে দেখুন সেই এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন আপনার বলিরেখা হীন মুখের সৌন্দর্য্য দেখে, অনেক মেয়ে মনে মনে আপনাকে তার হৃদয় মন সমর্পণ করে বসতো, যখন বসন্তের কোকিল-এর ডাকে আপনার বিরাট প্রশস্ত নির্ভাজ বুকে যেন কিসের এক জ্বালা অনুভব কোরতেন, কোন লাল টুকটুকে পায়ের মলের রুমঝুম শব্দ শুনে আপনার বিশবছরের মন অজানা আনন্দে লাফালাফি করতো সেই নরম পায়ের স্পর্শ পাওয়ার জন্যে। ঠিক তখন, এক শুভ মুহূর্তে আপনার রেখাহীন কপালে চন্দনের ফোটা এঁকে, গিলে করা পরদের পাঞ্জাবী, চুনোট করা জরি পাড় ধুতি পরে কানে আতর মাখা তুলো গুঁজে, ঢুকলেন ফুলে ভরা ঘরে, আর দেখলেন চতুর্দশী কিশোরী, লাল বেনারসী শাড়ী তার অপরূপ দেহে জড়িয়ে বসে আছেন সলজ্জ ভঙ্গীতে আপনার অপেক্ষায়। (আমাদের অধুনা দিদিমা) তখন তাঁর সেই মদন অর্দ্ধেক চাঁদের মত কপাল, দিগন্তের কোণে কালো পাথরি ডানার মত টানা ভ্রু, দীঘির জলের মত টলটলে বিরাট কালো চোখ, গোলাপী কপোল, আর গোলাপের পাপড়ীর মত ঠোঁট দেখে কি আপনার মনে হয়েছিলো যে এই পার্থিব সৌন্দর্য্যের কোন মূল্য নেই। মনে কি হয়েছিলো এর থেকে ঢের ভালো ভগবানের নাম নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করা?

আমার কথা শুনে দাদুর রাগ জল হয়ে গেল, আর সেই পুরানো দিনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে বললেন, সে তুই ঠিক বলেছিস। তোদের দিদিমা যে কি অপরূপ দেখতে ছিলো তা আর বলে বোঝানো যায় না। আর আমি?

আমিও কম সুন্দর ছিলাম নারে!—আমার মত সুপুরুষ এখন আর কোন ভরাটে পাওয়া যাবে না, এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু তা বলে তোদের মত এমন ঠাকুর দেবতাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করি নি, ঠাকুর দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা ছিলো আমাদের প্রচুর, তোদের মত এমন বকাটে বম্বেটের মত গো-ব্রাহ্মণদের অভক্তি করিনি।

না—তা করেননি তবে ভেবে দেখুন যখন দুপুরবেলা যে যার ঘরে ঘুমুচ্ছে, আপনি তখন চুপে চুপে পা ফেলে, বার মহল থেকে অন্দর মহলে এলেন, দিদিমাও কপট নিদ্রা ছেড়ে আপনার পায়ের শব্দ শুনে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন, এমন সময়ে—আপনাদের তিনপুরুষের পুরুত-ঠাকুর এসে তাঁর উপদেশের পুঁথি খুলে বললেন—ওহে বাবু এই তর দুপুরবেলা এমন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে, না ঘুরে, এসো খানিক বেদবেদান্ত নিয়ে আলোচনা করে স্বর্গের পথ আবিষ্কার করি। তখন আপনার কি এই মদনার মত টেরি কাটা চুল ঝাঁকিয়ে বলতে ইচ্ছে জাগেনি যাও হে বাপু তিনকেলে বিটকেলে বামুন তুমি নিজে বেহস্তে যাও, আমার আর সঙ্গে নিতে হবে না, আমি এখানেই স্বর্গ রচনা কোরব আমার প্রেয়সীকে নিয়ে।

আপনি যে পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছিলেন তা আর বল না, কারণ—

দিন—যায়—যায়, বছরও ঘুরতে লাগলো, আর

আপনাদের দুজনের মধ্যে নতুন অতিথির সংখ্যা বাড়তে লাগলো। এখন আর হাত বাড়ালেই দিদিমা লজ্জাবতী লতার মত লজ্জায় আঁখিপল্লব করেন না, বরং নথ নেড়ে মুখ ঝামটে বলে ওঠেন, "আহা মুখপোড়া দিনকের রকম দেখ না! আমি মরছি একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে নাজেহাল হয়ে, আর উনি আসছেন ফাকামী করতে, যাও হে বাবু, তাড়াতাড়ি বাজারে যাও, ইঁদারা পেট খারাপ ওর জন্যে কাঁচকলা এনো, তোঁদার জন্যে মিছরি এনো, তখলের কাসি, পথে ডাক্তারের কাছ থেকে একটু ঔষধ আনবে, নেড়ীর জন্যে কিনে, পুঁকির জন্যে আলতা, বুঁচির জন্যে একটা নোলক তৈরী করতে দিয়ে আসবে সাঁকরার দোকানে, বুঝলে?

আপনি স্বর্গ গড়ার কথা ভুলে নোলক গড়তে কত লাগবে সেই হিসেব কোরতে লাগলেন।

ঠিক তখনই আপনার মুখ দিয়ে বেরুলো পৃথিবী অসার, এখানে বাস করে কোন সুখ নেই, এখানে সবই অনিত্য অশাশ্বত, এখানে সবই ক্ষণিক, সবই ক্ষণিকের হাহাকার। আপনি হয়ে উঠলেন এক মস্ত দার্শনিক। কিন্তু দার্শনিক হলেও সব কিছু ছেড়েছুড়েও আপনার নিস্তার নেই, দিদিমার তন্ত্র বাগবিস্তারের ফল আপনার পৃথিবীকে একেবারে নরক বানিয়ে ছাড়লো। আর প্রকৃতির রোদ, জল, ঝড়ের আঘাতে আর গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্তের ঝাপটায় দিন দিন আপনি কন্দর্পকান্তি হারিয়ে আমদিতে পরিণত হলেন। এবার এখানের সুখের আশা ছেড়ে পূর্ব্বপুরুষের গুরুদেবের বর্ণিত স্বর্গে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আর দিদিমা যখন দেখলেন তাঁর গর্ত্তে ঢোকা চোখের কটাক্ষে আপনার হৃদয় এফোর-ওফোর করে দিতে পারছেন না বরং অন্য ষোড়শী তরুণীদের দিকে আর নয়নে তাকাচ্ছেন, তখন তিনিও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সাজসজ্জা ফেলে, দোলা চলে গেলেন ঠাকুর ঘরে। কিন্তু আপনাকে চুপে চুপে বলি শুনুন! দিদিমা নিস্বার্থভাবে এই ঠাকুর ঘরে মাথা খোঁড়েন না। উনি এই দেবতাদের মোসাহেবী করে স্বর্গরাজ্যের স্থায়ী প্রজা অর্থাৎ অপ্সরী হয়ে অনন্তকাল ধরে নাচ গান করে সুখের পায়রার মত থাকবার জন্যেই ইহকালের চিন্তা ছেড়ে পরকালের আখের তৈরী কোরছেন ঠাকুর ঘরে গিয়ে, বুঝলেন?

দাদু দুর্বাসার মত চোখে আগুন জেলে আমার দিকে তাকালেন, ভাগ্যি এটা সত্যযুগ নয়, তাই আমি ভস্ম হোলাম না, কিন্তু দাদুকে আর সেখানে বসানো গেল না, ছাতা-লাঠি না নিয়েই হন হন করে চলে গেলেন। তার হচ্ছে, কে জানে, বিবাগী হলেন না তো?

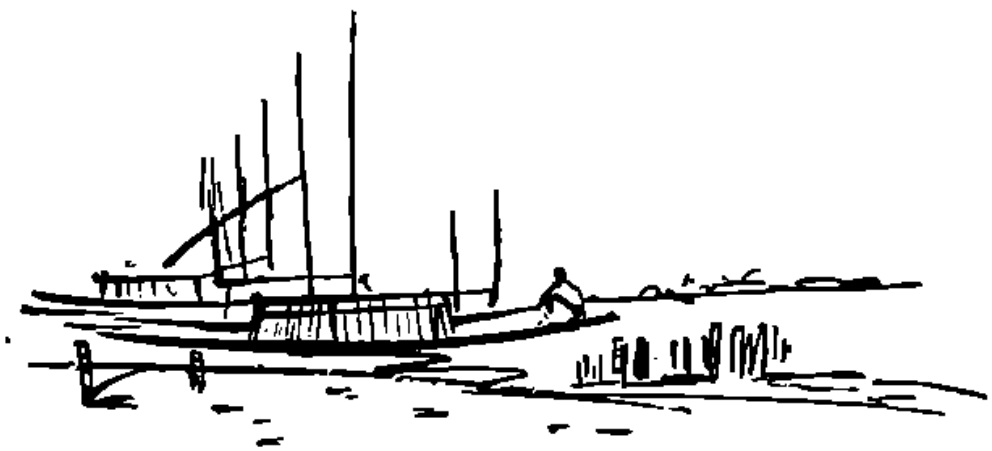

দক্ষিণের অ্যাং

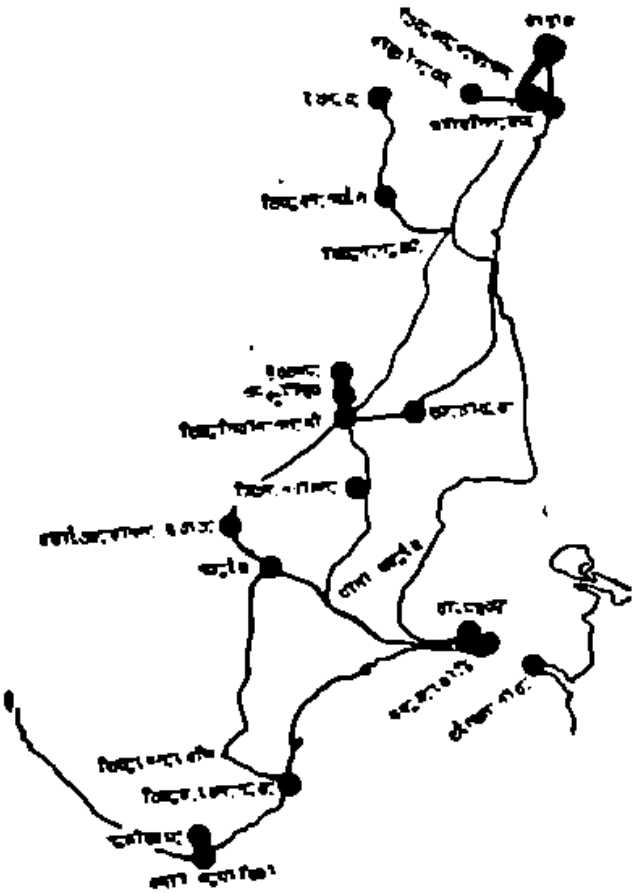

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একাম্রেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে অতি প্রাচীন একটি আমগাছ আছে। গাছটিকে বলা হয় বৈদিক আম্রবৃক্ষ। গুঁড়ির কাছে মূল কাণ্ডটির পরিধি প্রায় ৩০ ফিট্। কটু, কষায়, অম্ল ও মধুর এই চার রসের ফল হয় গাছটিতে। তাই চতুর্বেদ-এর স্মরণে গাছটির নাম হয়েছে—বৈদিক আম্রবৃক্ষ।

সম্ভবতঃ গাছটি চার কলমী। যেমন দু জাতের গাছের মিশ্রণে দো-কলমী হয়। দৈব কিছুর যোগাযোগ নাও যদি থাকে তো এই চার কলমী গাছটিকে প্রাচীন

ভৈরব (একাম্রেশ্বর মন্দির)—কাঞ্চীপুরম্

ভারতের উদ্ভিদ বিজ্ঞানে গায়েনিটার সাক্ষী বলা যেতে পারে। [প্রখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডঃ তারক মোহন দাসের 'আমার ঘরের আশে পাশে' বইটিতে এই গাছটির উল্লেখ আছে।] প্রবাদ আছে যে, গাছটিতে প্রত্যহ একটি করে আম পাকতো আর তাই দিয়ে দেবতার ভোগ হতো। এক আম্র সেবী দেবতার সেই থেকে নাম হয়েছে একাম্রেশ্বর বা একাম্রনাথ। বর্তমানে অবশ্য আর ওই ধরণের ফল পাকেনা।

স্থানীয় জনসাধারণ ও মন্দিরের পুরোহিতদের ধারণায় গাছটির বয়স দেড় হাজার বছর।

১৯৪৬ সালের শেষের দিকে বোটানিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া কর্তৃপক্ষের এক পরীক্ষার মাধ্যমে স্থির হয়েছিল যে, গাছটির বয়স প্রায় সাত আটশ বছর।

পূর্বকালে এই মন্দিরটিতে উৎসবাদিতে দেব সমক্ষে দেবদাসীদের নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা ছিল।

তমিল্‌র নাড়ুর অন্যান্য আরও অনেক মন্দিরে এই ব্যবস্থা ছিল।

প্রতিটি মন্দিরেই থাকতেন একাধিক দেবদাসী। ব্রাহ্মণ কন্যারা ঐ জীবনে ব্রতী হতেন।

বৈদিক অশ্ব বৃক্ষ—কাঞ্চীপুরম্

কন্যার বয়ঃ সন্ধি উপস্থিত হলে শাস্ত্রাচার সম্মত রীতিতে দেবতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হতো এবং তখন হতে তিনি দেবদাসীরূপে পরিগণিত হতেন।

দেবদাসীরা উৎসবাদিতে মন্দিরে দেবসমক্ষে নৃত্য-গীতাদি পরিবেশন তো করতেনই উপরন্তু, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, পারিশ্রমিকের পরিবর্তে সাধারণ্যেও আবির্ভূতা হতেন। আর্থিক দুর্গতিগ্রস্তা হলে কিংবা মন্দির হতে বিতাড়িতা হলে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বা বিপথ-গামিনী হতেন।

দেবদাসীর বৃত্তি গ্রহণ সমাজে স্বীকৃত ছিল। (অধুনা চিত্রাভিনেত্রীর বৃত্তি গ্রহণ যেমন স্বীকৃতি পেয়েছে।) দেবদাসীদের নৃত্য, নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী নিয়মিত ছিল।

তমিল্‌র প্রদেশে নারীর সংখ্যাধিক্য হওয়ায় যুদ্ধের সঙ্গে বিবাহের আশঙ্কা এবং তৎকালীন বাল-বিধবাদের বিড়ম্বিত জীবনের ত্রাসই সম্ভবতঃ অনেককে দেবদাসীর বৃত্তি গ্রহণে প্রবৃত্ত করতো। দেবতার সঙ্গে পরিণীতা হওয়ায় তাঁদের জীবনে বৈধব্য আসতো না।

সে যাই হোক, দেবদাসীরাই বাঁচিয়ে রেখে গেছেন তমিল্‌র বৃহির অনন্য নৃত্যকলা-ভরত নাট্যম্।

বিষ্ণু-কাঞ্চীতে বরদরাজ মন্দিরটির সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য আকর্ষণ শত স্তম্ভ মণ্ডপটি।

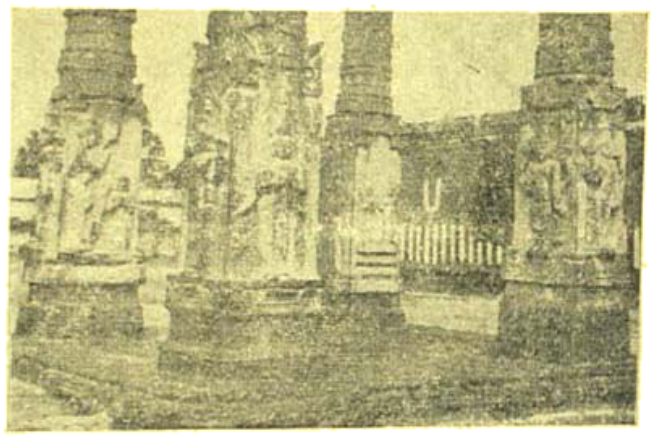

বরদরাজ মন্দিরের বাহ্য দৃশ্য—কাঞ্চীপুরম্

বরদরাজ—বিষ্ণু। শতস্তম্ভ মণ্ডপে তাঁর কূর্মাবতারের বিশাল এক কূর্মমূর্তি। স্তম্ভগুলির প্রত্যেকটি বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর প্রতিকৃতি শোভিত।

বৈকুণ্ঠ পেরুমাল্ মন্দিরটি কাঞ্চীর অন্যতম প্রসিদ্ধ মন্দির। এটিও বিষ্ণু মন্দির।

পল্লবরাজ পরমেশ্বর বর্মণ এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা। অঙ্গের শিলা চিত্রগুলি দেবালয়টিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করেছে।

নগর সীমানার বাইরে আছেন কৈলাস নাথ।

কাঞ্চীতে পল্লবরাজগণের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির মধ্যে তাঁর মন্দিরটিই সর্বপ্রাচীন। প্রতিষ্ঠাতা,—রাজসিংহ বর্মণ। মন্দিরটি বেলে পাথরে তৈরী।

প্রাচীর সংলগ্ন কুলুঙ্গীগুলিতে বহু প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। বেদীর ভাগই মহাদেবের বিভিন্ন রূপে ও ভঙ্গীতে অবস্থানের আলেখ্য। সবচেয়ে মনোহর শিবের ঊর্ধ্ব-

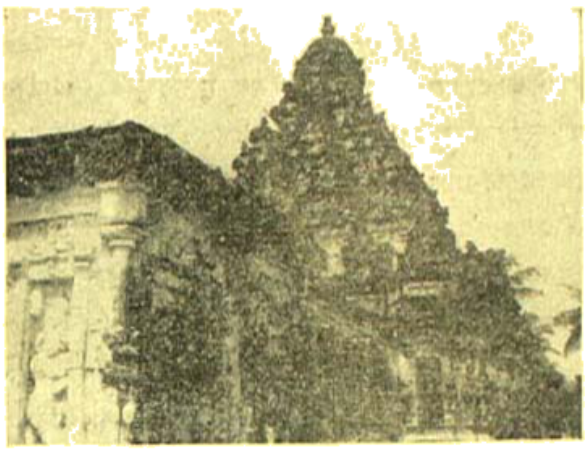

কৈলাসনাথ মন্দির—কাঞ্চীপুরম্

তাণ্ডব। শিব নাচছেন, গণ বা সেবক নাচছে, আর তার সঙ্গে নন্দী বৃষও নাচছে!

কাঞ্চী রেল ষ্টেশন হতে প্রায় ২। মাইল দূরে, বেগবতীর অপর পারে আছে কতকগুলি জৈন মন্দির। অঞ্চলটি

শিবের ঊর্দ্ধতাণ্ডব (কৈলাসনাথ দেবালয়)—কাঞ্চীপুরম্

জৈন কাঞ্চী নামে পরিচিত। একটি প্রাকারের মধ্যে অবস্থিত জৈন আচার্য চন্দ্রপ্রভ, বর্দ্ধমান ইত্যাদির মন্দির এবং একটি অতি প্রাচীন গাছ এখানের প্রধান দ্রষ্টব্য।

শোনা যায়, ঐ গাছটির নীচেই মহাবীর বর্দ্ধমান সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

মন্দিরের মূল বহির্দ্বার বন্ধ ছিল।

আমার রিক্‌শ চালক কাছের একটা বাড়ী থেকে একজন মহিলাকে ডেকে আনলো।

যার উদ্যোগে প্রথমে বুঝতে পারিনি যে, ওগুলি হিন্দু মন্দির না জৈন মন্দির। কারণ, প্রথম মন্দিরটির সামনে রয়েছে অরুণ স্তম্ভ বা গরুড় স্তম্ভ।

অনেকের ধারণায় এটি আদিতে শিব মন্দির ছিল।

মন্দির-পুরী কাঞ্চীর অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে আলা উদ্দিন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর ও অওরংজেবের সেনাপতি জুলফিকার্ খান্ অনেকগুলির ধ্বংস সাধন করলেও, যেগুলি বর্তমান তার মধ্যে মণিকণ্ঠেশ্বর, অষ্ট ভুজম্, কুমার কোট্টম্, পুণ্যকোটীশ্বর, মুক্তেশ্বর, পাপহরেশ্বর, ত্রিকাল-জ্ঞানেশ্বর, অভিরামেশ্বর, ঐরাবতেশ্বর ইষ্টসিদ্ধেশ্বর, দক্ষেশ্বর, ভৈরবেশ্বর, বলভদ্রেশ্বর, বীর রাঘবেশ্বর, বাণাসুরেশ্বর, অনন্ত পদ্ম নাভেশ্বর ইত্যাদি উল্লেখনীয়।

চীনা পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ কাঞ্চীপুরম্ পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর বিবৃতিতে প্রকাশ, কাঞ্চীতে বৌদ্ধদের বাস ছিল। কাঞ্চীতে জন্মেছিলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মপাল।

চাণক্যেরও জন্মস্থান কাঞ্চীপুরম্।

কাঞ্চীর কথা লিখতে গিয়ে প্রথম পাতাতেই একটা ভুল করেছি। বাঙলা সন অনুযায়ী গত শতাব্দীতে কাঞ্চীর সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ঘটেছিল। সে পরিচয় ঘটিয়ে ছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, তাঁর অন্নদা মঙ্গল কাব্যের বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীতে। বিদ্যার প্রণয়ী সুন্দর ছিল কাঞ্চীর রাজতনয়।

। ১৯ ।

সন্ধ্যা হয় হয় এমনি সময়ে ফিরলাম মাদ্রাজে। পথে পড়েছিল শ্রীপেরম্বদুর্, আচার্য শ্রীরামানুজের জন্মস্থান। তখানে নামা হয় নি।

চব্বিশ ঘণ্টা মাদ্রাজে কাটিয়ে, উঠলাম কলকাতার গাড়ীতে, গাড়ী ছাড়লো নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট পরে। ধীরে ধীরে রাতের নগরী মাদ্রাজ দূরে সরে যেতে লাগলো। এক সময়ে হয়ে গেলো অদৃশ্য। তার আলোকের কণ্ঠহার ডুবে গেলো অন্ধকারে।

সে আমায় ডেকে ছিল গোপনে, বিদায় দিল গোপনে। অনেকেই জানলো না আমার আসা যাওয়া।

রাত প্রায় ন'টায় মাদ্রাজের সীমানা পেরিয়ে অন্ধ্রে ঢুকলো ক্যালকাটা মেল্।

পরদিন রাত সাড়ে দশটায় অনেক পিছনে ফেলে গাড়ী পৌঁছলো ইছাপুরম্।—উড়িষ্যা-অন্ধ্র সীমান্তে উড়িষ্যার প্রথম ষ্টেশন।

ঘুমের অবকাশে রাতটা পার হয়ে গেলো।

ভোর হলো।

অরুণোদয় দেখবার জন্য জানলার ধারে বসলাম। মনে পড়ে গেলো রামেশ্বরম্-এ দেখা সূর্যোদয়।

লাল আকাশের দিকে চেয়ে মনটা কেমন যেন আতুর হয়ে উঠলো।

ভাবনা হলো,—আবার কি যেতে পারবো পিছনে ফেলে-আসা অকূলে!

যেখানের মাটিতে এ ক'দিন হেঁটেছি,—যেখানের বায়ুতে প্রাণ ধরেছি, তৃপ্তি মন ভরেছি,—যেখানের মানুষরা আমার সহবাহক হয়েছে অন্ন জল, যান বাহনে করে স্থান থেকে স্থানান্তরে পৌঁছে দিয়েছে নিরাপদে,—তাদের সঙ্গে বুঝিবা নিজের অজ্ঞাতে আমার এক বন্ধন গড়ে উঠেছিল। তাই হয়ত মনটা ব্যথাতুর হয়ে উঠলো।

দক্ষিণ ভারতে আমার পরিচিত যাঁরাই বেড়াতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মুখে খাওয়া দাওয়ার কষ্ট আর ভাষার দুর্বোধ্যতার অনুযোগ শুনেছিলাম। শুনেছিলাম উত্তরের সঙ্গে অনেক পার্থক্যের কথা। সত্যই আছে ভাষার বাধধান, আহারাওয়ার তারতম্য। আছে আচার আচরণের বৈষম্য, খাদ্যের পার্থক্য, আর বেশ ভূষা ও রীতি নীতির প্রভেদ। কিন্তু জীবনের তাতে তো কিছুই আসে যায় না। জীবন সমানে চলেছে।

ওখানেও মানুষের সুখ দুঃখ আছে,—তারাও দুঃখে কাঁদে, আনন্দে হাসে। শিশুরা খেলনা নিয়ে মেতে থাকে। গ্রামের কালো মেয়েটির কাজল-কালো চোখে লজ্জার ঢেউ খেলে।

ওখানেও চাষী হল চালিয়ে মাটির বুকে খোঁজে মানুষের আহার। বর্ষের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়,—পূজা দেয়,—মানত করে।

সংসারের অবসর প্রাপ্তা কর্ত্রী বাচ্চা নাতিকে নিয়ে, বাড়ীর বাইরের দাওয়ায় বসে কাটান কর্মহীন বেলা। ডাক-পিয়ন দেখলেই যুবতী বধূটি ছুটে যায় প্রবাসী স্বামীর চিঠির আশায়।

তাইতো প্রশ্ন জাগে—প্রভেদ কোথায়? দুর্বোধ্যতা কোথায়?

জীবন দেবতা নটেশ্বর নটরাজের নৃত্যছন্দের কোথাও এতটুকু বিচ্যুতি নেই, ছেদ নেই, ভেদ নেই, নেই ক্লান্তি। তাঁর আনন্দ-তাণ্ডব সমানে ও সর্বত্র একই ছন্দে চলেছে। সৃষ্টি বেয়ে চলেছে, জীবন বয়ে চলেছে সেই আনন্দের অনুগামী হয়ে। সেই আনন্দের অন্বেষণেই হতেই মানুষের ছুটোছুটি,—আমার এই ছুটে যাওয়া।

জানার শেষ হয় না। দেখারও শেষ হয় না। তবু, বহু অজানাকে জানা হলো, অদেখাকে দেখা হলো। অনেক দেখায়, অনেকের দেখায়, আমি যে কত ক্ষুদ্র তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে, হারিয়ে যাচ্ছে,—সীমিত গণ্ডীর মাঝে নিজেকে ঘিরে এতদিনের গড়ে ওঠা মস্ত 'আমি'।

ঘরে ফিরে চলেছি।

কি নিয়ে?—

ধার করা কথায় বলি: পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি সিক্ত যূথীর মালা।

নিয়ে এসেছি নব মালিকা। নূতন সুরভি সিক্ত এক সঞ্চয়। সে সঞ্চয়, বিরাটের মাঝে আত্মহারা হওয়ার অনুভূতি। সে সুরভি, ভারতের মহামানবের কাছে আত্ম-নিবেদনের।

পথের ক্লেশ, গাড়ীর ভিড়ের চাপ, অনিদ্রার পীড়া, ঘরমুখো হতেই হারিয়ে গেছে। সব গ্লানির স্মৃতি হারিয়ে স্মরণের সুখ স্মৃতিটুকুই নিয়ে চলেছি।

ট্রেনটা খুব জোরে ছুটছিল।

ছুটে চলে গেলো একটা ষ্টেশনের নামের ফলক।

নিজের অজ্ঞাতেই চেঁচিয়ে উঠলাম—অলেখর।

: What happened,

বামনের সীট্-এর কলকাতা প্রবাসী মাদ্রাজী ভদ্রলোক আমার হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠার কারণ জানতে চাইলেন।

বললাম: ইউ গো বেঙ্গল্ আরম্ভি কিয়ড্!—এখান থেকে আরম্ভ হলো বাঙ্গলা দেশ।

সমাপ্ত

(সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত।)

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

এরপর অনেকক্ষণ স্তব্ধতা।

নীলা চৌধুরীর যে সামান্য হদিসটুকু পাওয়া গিয়েছিল, বিদ্যুৎচমকের মত একবার দেখা দিয়েই তা বিলীন হয়ে গেছে। বোম্বাই শহরে নীলার এই ঠিকানাটাই ছিল দীপেনের হাতে শেষ পারানির কড়ি। তার বিশ্বাস ছিল এখানে এলে নীলাকে পাওয়া যাবে এবং তার জোরেই দিল্লীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজারিটা মুঠোর ভেতর নেমে আসবে। কিন্তু এখানে এসে এত বড় একটা আশাভঙ্গ হয়ে যাবে, কে তা ভাবতে পেরেছিল!

এখন কী করবে দীপেন? চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের এই বিশাল-ব্যাপ্ত শহরের মাঝখান থেকে নীলা চৌধুরীকে কেমন করে খুঁজে বার করবে? দীপেন একবার ভাবতে চেষ্টা করল, উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে-পশ্চিমে প্রসারিত এই শহরটির আয়তন কত? কমপক্ষে এক শ বর্গ মাইলের মত অবশ্যই। বাড়ির সংখ্যা এখানে কত? দু-তিন লাখ তো হবেই।

নীলা চৌধুরীর খোঁজে এতগুলো বাড়ির প্রতিটিতে যদি সে হানা দিতে চায় তা হলে কত বছর কত যুগ লেগে যাবে? পরমায়ু যে ক'বছর বাকি, তাতেও বোধহয় কুলিয়ে উঠবে না। সুতরাং এখন কী করণীয়? দত্ত-সাহেবকে একটা চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানাবে নাকি? তিনি কী উত্তর স্থান তারই প্রত্যাশায় থাকবে? তাঁর নির্দেশ এলে না হয় পরবর্তী কর্তব্য ঠিক করা যাবে। বিচিত্র এক অস্থিরতার মধ্যে দীপেনের মন দুলতে লাগল।

হঠাৎ নগিনদাস ডেকে উঠলেন, 'আচ্ছা—'

অন্যমনস্ক দীপেন মুখ তুলে তাকাল।

নগিনদাস বললেন, 'আপনি এ বাড়ির ঠিকানা কোথায় পেলেন?'

'ঐ যে বললাম মাসখানেক আগে নীলাদের সোনার-পুরের বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম। নীলার মা, মানে আমার মাসিমাই এই ঠিকানাটা দিয়েছেন।' দীপেন বলল।

'তা বটে, তা বটে—' চোখ দুটো দ্রুত ঝরে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন। 'নীলা চৌধুরীর মা যে আপনার মাসিমা আর এক মাস আগে আপনি যে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না।'

নগিনদাসের সেই দৃষ্টিটার সামনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল দীপেন। এ ব্যাপারে আর কিছু বলল না সে। নগিনদাস এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেলেন, 'আচ্ছা লাহিড়ী সাহেব—'

'বলুন—'

'নীলা চৌধুরীকে তো আপনার খুব দরকার?'

নগিনদাসের প্রশ্নটার মধ্যে ঠিক কোন সুরের রণন

আছে, বুঝতে পারল না দীপেন। কিছুটা দ্বিধান্বিত সুরে বলল, 'আজ্ঞে হাঁ।'

নগিনদাস আবার প্রশ্ন করলেন, 'যেমন করে হোক নিশ্চয়ই তাকে আপনি খুঁজে বার করবেন, তাই না?'

'খুঁজবার চেষ্টা করব।'

'যদি তাকে পেয়ে যান—' এই পর্যন্ত বলে আচমকা থেমে গেলেন নগিনদাস।

'পেয়ে গেলে কী?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দীপেন তাকাল।

'দয়া করে আমাকে একটু খবর দেবেন।'

নগিনদাস বললেন, 'কেন, সে কথা তো একটু আগেই আপনাকে বলেছি। মনে নেই বোধহয়। বেশ, আরেক-বার বলছি। আপনার মত নীলা চৌধুরীকে আমিও খুঁজে বেড়াচ্ছি।' একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন, 'এই বাড়িটার দায় আমার মাথায় চাপিয়ে ন' মাস হল নীলা যে কোথায় চলে গেছে, কে জানে। ঘরের মত এটাকে আমি আর আগলাতে পারছি না।'

দীপেন কোন উত্তর দিল না।

নগিনদাস কিছুক্ষণ কি ভেবে বললেন, 'একটা কথা বলতে আপনাকে খুব সঙ্কোচ হচ্ছে—'

'কী কথা বলুন তো?' তীক্ষ্ণ চোখে দীপেন তাকাল।

'আপনি যদি কথা রাখেন, কিছু মনে করবেন না—

'না-না, আপনি অসঙ্কোচেই বলুন।'

'তা অভয় যখন দিলেন তখন বলি—'

নগিন দাসের ভণিতাটা খুব ভাল লাগছে না। ওর ওপর তাড়াতাড়ি ধমনিকা নামাবার জন্য দীপেন কিছুটা নীরস সুরেই বলল, 'হাঁ, বলেই ফেলুন।'

দীপেনের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নগিনদাস তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না। নিজের গভীরে খানিকক্ষণ মগ্ন হয়ে থেকে এক সময় আস্তে আস্তে শুরু করলেন, 'আপনি তো নীলা চৌধুরীকে খুঁজবেন। এই খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনার সময় নষ্ট হবে।'

দীপেন বলল, 'তা একটু হবে বৈকি।'

'টাকা পয়সাও খরচ হবে।'

'হবে বলেই তো মনে হয়।'

'আমার ইচ্ছা আপনার যা খরচ-টরচ হবে তা আমিই দেব—'

দীপেন চকিত হয়ে উঠল। বাড়ির দায়িত্ব ফিরিয়ে দেবার জন্য নগিনদাস পাগিল কি এতই অস্থির হয়ে উঠেছেন যে টাকাপয়সা পর্যন্ত দিয়ে নীলা চৌধুরীকে খুঁজে বার করতে চান? না কি এই টাকা দেওয়াটা ঘুষেরই ছদ্মবেশ!

শুধুমাত্র বাড়ি ফেরত দেবার জন্য নগিনদাসের আগ্রহ এত বিপুল হয়ে উঠেছে, ব্যাপারটা ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে কি নগিনদাসও আরেক ধরনদাহেবের মত দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় কোন কারণে নীলা চৌধুরীকে তিনিও খুঁজে বেড়াচ্ছেন!

নগিনদাসের গলা আবার শোনা গেল, 'লাহিড়ী সাহেব—'

মুখ ফিরিয়ে দীপেন তাকাল, 'বলুন—'

'তা হলে আপাতত হাজার দুয়েক টাকা আপনাকে দিই। পরে আবার—'

'না, ধন্যবাদ, টাকার দরকার নেই।'

একটু যেন আহত হলেন নগিনদাস, 'টাকার ব্যাপারে আপনি কি কুণ্ঠিত হচ্ছেন? কুণ্ঠার কিন্তু কিছুই ছিল না।'

দীপেন রূঢ়স্বরেই বলল, 'আপনার এখানে নীলার খোঁজেই এসেছিলাম; টাকা নিতে নয়!'

নগিনদাস ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আপনি খুব রাগ করেছেন, বুঝতে পারছি। আমি কিন্তু সেভাবে টাকার কথাটা বলতে চাইনি। হয়ত যেভাবে বললে আপনার আত্মসম্মানে লাগবে না, সেভাবে বলতে পারিনি। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন।'

দীপেন উত্তর দিল না।

অনেকক্ষণ নীরবতা। ঘরের দূরপ্রান্তে যে সুদৃশ্য ওয়াল-ক্লকটা রয়েছে তার কাঁটা দুটো টিক টিক করে সময়ের সমুদ্রে অবিরাম দাঁড় বেয়ে চলল।

এক সময় দীপেন বলে উঠল, 'আচ্ছা নগিনদাসজী—'

ভদ্রলোক যেন উন্মুখ হয়েই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন, 'বলুন—'

'একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।'

'কী ব্যাপার ?'

'একটু আগে আপনি বলেছেন, নীলা চৌধুরী এই বিরাট বাড়িটার মালিক। তা ছাড়া এই বোম্বাই শহরে তিন চারটে কি ব্যবসা যেন তার আছে।'

'হ্যাঁ, বলেছি। কিন্তু তাতে কী হয়েছে ?'

'আমি ভেবে উঠতে পারছি না, এ সব কি করে সম্ভব হল!' দীপেনের চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে অস্থিরতার ছোঁয়া লাগল যেন।

নগিনদাস হাসলেন, 'আপনার এরকম ভাবনার কারণ কী ?'

'কারণ যে কী, আপনি যদি নীলা চৌধুরীদের সোনারপুরের বাড়িটায় একবার যেতেন আর তাদের সংসারের ইতিহাস শুনতেন তা হলেই বুঝতে পারতেন।' বলে থামল দীপেন। একটুক্ষণ কি ভেবে আবার শুরু করল, 'ইণ্ডিয়া পার্টিশান হবার পর ইষ্টবেঙ্গল থেকে ওরা ওয়েষ্টবেঙ্গলে আসে। দেশে থাকতে ওদের বেশ স্বচ্ছলতা ছিল। কিন্তু ওয়েষ্টবেঙ্গলে নীলারা শোচনীয় অবস্থার মধ্যে এসে পড়ে। প্রথমে ছিল রিফিউজি ক্যাম্পে ; সেখানে সরকারী সাহায্যে ওদের সংসার চলত। তারপর অবশ্য কলকাতার দক্ষিণে সোনারপুর বলে একটা জায়গায় বাড়ি ভাড়া করে উঠে যায়।'

নগিনদাস বললেন, 'সোনারপুর আমি চিনি।'

'চেনবারই কথা। আপনি তো অনেকদিন কলকাতায় ছিলেন।'

নগিনদাস কিছু বললেন না।

দীপেন বলতে লাগল, 'সোনারপুরের সেই বাড়িটা এক পোড়ো হানাবাড়ির মত। সেখানে একখানা ঘরে নীলা চৌধুরীর বাবা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। মায়ের কাপড়ে হাজারগণ্ডা তালি। ছোট বোনটোনগুলো স্কুলে যায় না। সংসার তাদের চলে কি চলে না। অথচ—'

'কী ?'

'এমন একটা ফ্যামিলি থেকে বেরিয়ে এসে নীলা যে কেমন করে এত বড় বাড়ির, এত ব্যবসা-পত্তরের মালিক হয়েছে সেটা আমার কাছে ধাঁধার মত লাগছে।'

নগিনদাস বিচিত্র হাসলেন। উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্ব আওড়াবার মত ভঙ্গি করে বললেন, 'জগতে কে যে কখন কী হয়ে বসে, কে বলতে পারে!'

কথাগুলো যেন শুনতে পায় নি দীপেন। কিছুটা অন্যমনস্কের মত সে বলল, 'আচ্ছা নগিনদাসজী, নীলা চৌধুরীর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ ?'

মনে মনে সম্ভবত সময়ের একটা হিসেব কষে নিয়ে নগিনদাস বললেন, 'তা বছর নয় দশেক হবে।'

'কোথায় আলাপ হয়েছিল ?'

'কোথায় মানে ?'

'মানে এই বোম্বাইতে না অন্য কোন জায়গায় ?'

'অন্য জায়গায়। ন' দশ বছর আগে আমি একবার কলকাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে এক পার্টিতে নীলা চৌধুরীর সঙ্গে আমার আলাপ।'

'কিভাবে আলাপ হয়েছিল, মনে আছে ?'

'না।'

বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল যেভাবে উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে আসল তথ্যটুকু বার করে নেয় সেইভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগল দীপেন, 'কেউ কি নীলার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ?'

কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে কি ভাবলেন নগিনদাস। মুখ দেখে মনে হল, তাঁর স্মৃতি কোথাও সাড়া দিচ্ছে না। আস্তে আস্তে তিনি বললেন, 'নাঃ, মনে করতে পারছি না।'

'আচ্ছা—'

'বলুন—'

'কলকাতায় নীলা চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হবার পর আর ক'দিন দেখা হয়েছে ?'

'ঐ একদিনই। কলকাতায় আর তাকে দেখিনি। তবে—'

'কী ?'

'বোম্বাইতে তার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে।'

'কলকাতায় আলাপ হবার কতদিন পরে বোম্বাইতে তাকে দেখেছেন ?'

একটু ভেবে নিয়ে নগিনদাস বললেন, 'তা বছর দুই তিনেক পর তো হবেই।'

দীপেন বলল, 'এখানে তাকে কোথায় দেখলেন ?'

একটু ইতস্তত করলেন নগিনদাসজী। বিব্রাবিত সুরে বললেন, 'সে একটা খারাপ জায়গায়; আপনার শুনে কাজ নেই।'

'শোনার দরকার আছে, আপনি বলুন।'

তবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন নগিনদাসজী। তারপর খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বললেন 'তবে শুনুন; নীলা চৌধুরীর সঙ্গে মহালক্ষ্মীর রেসকোর্সে দেখা হয়েছিল।'

'রেস কোর্সে!' সবিস্ময়ে দীপেন বলল, 'সেখানে কী করছিল নীলা!'

বিচিত্র অর্থময় একটু হাসলেন নগিনদাসজী,'রেস কোর্সে লোকে কী করতে যায়? নিশ্চয়ই গীতাপাঠ করতে নয়!'

'নীলা রেস খেলতে গিয়েছিল!'

এবার আর কোন উত্তর দিলেন না নগিনদাসজী। সম্ভবত তিনি যা বলেছেন তার চাইতে আর বেশি কিছু বলা বাহুল্য মনে হল তাঁর।

দীপেন এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল, 'আচ্ছা নগিনদাসজী, নীলাকে এত দিন পর দেখে চিনতে পেরেছিলেন?'

নগিনদাসজী কিছু বললেন না। শুধু করে হেসে উঠলেন শুধু।

দীপেন বলল, 'হাসলেন যে!'

'নীলা চৌধুরীকে একবার যে দেখেছে সে ঐ রূপ ঐ চেহারা জীবনে কোনদিন ভুলতে পারে না।' হাসি থামিয়ে সংক্ষেপিতের মত এবার বললেন নগিনদাসজী।

একটু ভেবে দীপেন বলল, 'নীলাকে এতদিন পর তো দেখলেন; তারপর কী হল?'

'তারপর আর কী হবে!' তবে লঘু সুরে নগিনদাসজী বলে গেলেন, 'আমি নিজে এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপটা নতুন করে ঝালিয়ে নিলাম। কলকাতায় ক' বছর আগে তার সঙ্গে যে পরিচয় হয়েছিল সে কথা বললাম। স্মৃতিকে উস্কে দিতে নীলাও আমাকে চিনতে পারল তারপর রেসকোর্স থেকে বেরিয়ে দুজনে দুজনের ঠিকানা নিয়ে বিদায় নিলাম। কথা ছিল সময় করে নীলা একদিন আমার বাওয়ার ফ্ল্যাটে আসবে; আমি তারপর যাব। মিথ্যে বলব না লাহিড়ীবাবু, আমিই আগে তার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। কোথায় গিয়েছিলাম জানেন?'

'কোথায়?'

'এই যেখানে বসে আমরা এখন কথা বলছি অর্থাৎ এই বাড়িটায় এসেছিলাম।' নগিনদাসজী বলতে লাগলেন, 'এখানে এসে আমার তাক লেগে গিয়েছিল।'

'কেন?'

'দেখলাম বাঙালী মেয়েটা অথাক কাণ্ড করে বসে আছে। কিছু মনে করবেন না লাহিড়ীবাবু; আপনারা বাঙালীরা বেজায় কুঁড়ে। তা ছাড়া মোটেও রিস্ক নিতে জানেন না। শুধু পরের কাছে নৌকরি করতে ভাল বাসেন। সেদিক থেকে নীলা চৌধুরী বাঙালী হলেও তার জাত আলাদা। এখানে এসে দেখি এই বাড়িটার মালিক হওয়া ছাড়া তিন চারটে বড় বড় কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে বসেছে সে।' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন নগিনদাসজী।

এদিকে জানালার বাইরে দ্রুত পা ফেলে সন্ধ্যা নেমে আসতে শুরু করেছে। আকাশটা গাঢ় শীতল ছায়ায় এই মুহূর্তে আচ্ছন্ন। সূর্যটা এখন আর কোথাও নেই; অদৃশ্য আরবসাগরের কালীদহে সে ডুব দিয়েছে। একটা বয় এসে খুট করে বোতাম টিপে আলো জ্বালিয়ে গেল। আলোটা উগ্র নয়, খুব নরম আর সুখদায়ক, চোখকে তা পীড়িত করে না; শীতল একটি স্পর্শের মত সব কিছুকে তা যেন স্নিগ্ধ করে রাখে।

নগিনদাসজীই আবার বলে উঠলেন, সেদিনের পর প্রায়ই আসতাম এখানে। নীলা চৌধুরীও আমার ফ্ল্যাটে যেত। যাতায়াত করতে করতে ঘনিষ্ঠতাও হয়ে গিয়েছিল। তারপর দেখুন না, কিছু না বলে-কয়ে হঠাৎ এই বাড়ির দায়িত্ব আমার চাপিয়ে দিয়ে সে উধাও হয়েছে।'

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল দীপেন। অতর্কিতে রমাদেবীর সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। ব্যস্তভাবেই সে বলল, 'আচ্ছা নগিনদাসজী—'

'বলুন—'

'মাসিমার কাছে শুনেছি, এই ঠিকানা থেকে তাঁর নামে প্রতি মাসে কিছু টাকা যায়! টাকাটা কে পাঠায় আপনি জানেন?'

'জানি। এতকাল টাকাটা নীলাই পাঠাত। ইদানীং

ছ' মাস ধরে আমি পাঠাচ্ছি। নীলা আমাকে পাঠাতে বলেছে। তা হঠাৎ টাকার কথা বললেন যে?'

'বিশেষ একটু দরকার আছে। আচ্ছা নগিনদাসজী—'

'বলুন—'

মাসে মাসে ঐ টাকাটা কোথায় পাঠানো হয়, আপনি জানেন?'

'নিশ্চয়ই জানি।' নগিনদাসজী গলার স্বরে অনেকখানি জোর ঢেলে দিয়ে বললেন,—নং গঙ্গাদাস মুখার্জি রোড। ভবানীপুর। প্রতি মাসে নিজের হাতে আমি মনি অর্ডার ফর্ম ফিল আপ করি।'

'অনুগ্রহ করে ভবানীপুরের ঐ ঠিকানায় টাকা পাঠাবেন না।'

'কেন বলুন তো?' এবার নগিনদাসজীর অবাক হবার পালা।

দীপেন বলল, 'ঐ টাকার ব্যাপারে নীলাদের সংসারে খুব অশান্তি চলছে। [ক্রমশঃ

শিল্পী শম্ভু রায়

বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর

কালীপদ মণ্ডল

সাহিত্য সত্যের দর্পণ। যা সত্য তা সুন্দর। সেই সত্যকে কোন ভাষার মাধ্যমে গল্পে, কাব্যে, ছন্দে, অলংকারে রূপ দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। যুগে যুগে দেশে দেশে সাহিত্যের রূপান্তর ঘটে; কালের গতিতে তার কষ্টিপাথরে বিচার, অনাদর, সংকোচন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। দেশের সমাজ-চিত্রকে তুলে ধরাই শুধু সাহিত্যের কাজ নয়, তাকে আরো গভীরে প্রবেশ করতে হয়। জ্ঞান ও ধ্যানের মধ্যদিয়ে তাকে সত্যের সন্ধান করতে হয়, দিকভ্রান্ত নাবিকের সঠিক দিক নির্ণয় করে দিতে হয় তাকে। মানুষের বহুমত, তাই বহু 'ইজিম্'। মানুষ সেই 'ইজিম্'কে কেন্দ্র করে দল বাঁধে। একজন আর-একজনকে দলে টানতে চেষ্টা করে। স্ব স্ব দলের, মতের গুণ কীর্তন করে। চা ও কফির পেয়ালায় তর্কের ঝড় ওঠে। কিন্তু, সাহিত্য দল ও মতের ঊর্ধ্বে থেকে তার আপন লক্ষ পথে বিচরণ করতে থাকে সত্য ও সুন্দরকে রূপ দিতে। সে কাউকেও পরোয়া করে না, রাজরোষ, বন্ধু বিচ্ছেদ, জীবন মৃত্যু সংঘাত—সব কিছু সে নির্বিকারচিত্তে মাথা পেতে নিয়ে যা সত্য ও সুন্দর তাকেই তুলে ধরে সকলের সম্মুখে। গল্পে বা কাব্যে যে লেখার মধ্যে ছন্দ আছে, বাকচাতুর্য আছে, কিন্তু মানুষের প্রাণের কোন স্পর্শ নেই, সে-লেখাকে সাহিত্যিক মর্যাদা দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে হয়—'জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশ দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলেছে।... জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে। সে বিশেষ করে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি জীবনের সাক্ষর না পায়, যদি সে বিশেষকালের বিশেষত্ব মাত্র প্রকাশ করে বা কেবলমাত্র রচনা কৌশলের পরিচয় দিতে থাকে, তাহলে সাহিত্যে সেই রসের সকল বিকৃত বা শুষ্ক হয়ে যাওয়া যায়।"

দেশে দেশে মানুষের মধ্যে জাতিগত ও ভাষাগত বৈষম্য আছে, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, এবং ধর্মীয় বিভেদ আছে, কিন্তু সমস্ত বিভেদকে অতিক্রম করেও সকল দেশের 'মানুষ' এক, এ কথা আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। একটি বাঙালী ছেলে বা মেয়ের মুখের হাসি বা ক্রন্দনের যে অভিব্যক্তি একটি জাপানী বা জর্মানী বা বিশ্বের যে কোন প্রান্তের ছেলে মেয়ের হাসি কান্নার মাধুর্য বা বিষণ্ণতা একই। মানবতার এই-যে মৌলিক সত্তা ইহা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যও তেমনি। দেশ ও জাতিকে অতিক্রম করে সাহিত্যের চিরন্তন আবেদন মানবতার মৌলিক সত্তাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতি জানায়। কালিদাস, সেক্সপীয়র, গোটে, টলষ্টয় ও রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন দেশের কবি-সাহিত্যিক, বিচিত্র তাঁদের সাহিত্য সম্ভার, বহুত্র রঙের তুলি দিয়ে অঙ্কিত তাঁদের চিত্র, যুগে যুগে দেশ দেশান্তরের মানুষের সেখানে আনাগোনা; কারণ মানুষের সকল রকম চরিত্রের যাচাইবাছাই হয়েছে সেখানে। ইহা এক মহামিলন ক্ষেত্র। কালের পরিবর্তনের সংগে হয় তো সেখানে রূপের বিচিত্র রূপান্তর ঘটেছে, কিন্তু মৌলিক সত্তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। ইহা সার্বজনীন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সর্বপ্রথমে বিশ্বদরবারে উপস্থাপিত করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে সার্বজনীন আবেদন চলছে—তা রবীন্দ্রনাথেরই দান। অবশ্যি রবীন্দ্রনাথকে আমরা এত সহজে পাইনি। রাজা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়ার সাধনা শুরু হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মাইকেল বঙ্কিম তার পীঠভূমি রচনা করে গেলেন। সেই 'হোমানলের' মধ্যে থেকেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, চিত্রাঙ্কনে—সর্বপ্রকারে আমাদের ভরিয়ে দিলেন। কুসংস্কারের অর্গল ভেঙে দিয়ে পশ্চিমের

আলোক-কে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায়। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলাদেশে 'কল্লোল' যুগের সাহিত্যিকদের আবির্ভাব। সেদিন তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় বাংলাসাহিত্যের নতুন নতুন দিক দেখা দিল। এই প্রসঙ্গে বাংলা গদ্যকাব্য সম্বন্ধে একটু কথা বলবো। বাংলাসাহিত্যে গদ্যকাব্যেরও প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। বহুদিন থেকে তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন। এক সময়ে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে তাঁর ত্রিমাত্রান্ত ছন্দকে ভেঙে গদ্যকাব্যে রূপ দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু 'ছন্দের যাদু' সত্যেন্দ্রনাথ যে কোন কারণেই হোক তা করতে পারেন নি বা করেননি। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম এই গদ্যকাব্য লেখেন 'লিপিকা'য়। তিনি বলেন যে, কাব্য-ভাষার একটা ওজন ও সংযম আছে, গদ্যের কোন বাঁধ-বিচার নেই, সে যেন বুক ফুলিয়ে চলে। তাইবলে গদ্য-কাব্যের গতি উচ্ছৃঙ্খল নয়, বরং সংযত পদক্ষেপ। তার রসাস্বাদনই বড় কথা। জীবানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু এবং আরো কয়েকজন বাংলা গদ্যকাব্যের মন্দাকিনী প্রবাহিত করলেন; কিন্তু পাঠক তা সহজে গ্রহণ করতে পারলেন না। আজও তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। ডঃ অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু এবং আরো কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিক বিশ্বপথিক হয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। সুখের বিষয়, বাংলাসাহিত্যে বর্তমান ইংরেজী ফরাসী, রুশ ও জাপানী প্রভৃতি নানা ভাষার অনুবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে। অনুরূপভাবে বাংলাভাষার সেরা বইগুলির বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হলে বাংলাসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হবে। জর্মান কবি গোটে বলেছিলেন যে, যিনি একটি মাত্র ভাষা জানেন তিনি কোন ভাষাই জানেন না। অর্থাৎ যে-মানুষ একটি মাত্র সাহিত্য জানে তাকে সাহিত্যিক বলা যায় না। সাহিত্যের তুলনা-মূলক আলোচনা না করলে তার ভাল মন্দ বিবেচিত হয় না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলবো, আমরা আঞ্চলিক ভাষা শিখবার কোন চেষ্টা করিনা। বাংলাদেশের পাশেই আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা। বাংলা-ভাষার সঙ্গে এ সব আঞ্চলিক ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে, একটু চেষ্টা করলেই অনেকে তা সহজেই আয়ত্ত করতে পারেন। আমরা সুদূর পরপারের ভাষা ও সাহিত্যের বরং কিছু কিছু খবর রাখি, কিন্তু ঘরের দুয়ারের ওপাশের ভাষা ও সাহিত্যের কোন খবর রাখিনা। ইহা আমাদের বড় লজ্জার কথা। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে আঞ্চলিকভাষা ও সাহিত্যের কতটুকু উন্নতি হয়েছে, তার জীবনস্রোত কোন্ পথে প্রবাহিত হচ্ছে আমরা জানিনা, অনুবাদের মাধ্যমে তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলে আমাদের অকল্যাণ হওয়ার কোন কারণ নেই। কেহ কেহ হয়তো বলবেন, বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য আমাদের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের চেয়েও উন্নত, সুতরাং উন্নততর ভাষা ফেলে আমরা অন্য ভাষার চর্চা ক'রে সময়ের অপচয় করবো কেন? পূর্বেই বলেছি, আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ আছে, কাজেই সে ভাষা আয়ত্ত করতে বিদেশী ভাষার তুলনায় সহজতর হবে এবং সময়ও কম লাগবে।

আমরা কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি বাংলাসাহিত্যের ধারা যেন স্তিমিত হয়ে গেছে। এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁরা সস্তা উপন্যাস লিখে সাহিত্যের হাটে ব্যাপারি করছেন। একই বিষয়বস্তুকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু নাম বদল করে পাঠকদের পাতে পরিবেশন করছেন, পাঠকরাও তেমনি যেন দায়সারা গোছের হয়ে তা গলাধঃকরণ করছেন। মানুষের জীবন দিনের পর দিন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিক আবিষ্কৃত হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেন নাভিশ্বাস উঠেছে। চতুর্দিকে চাপা অসন্তোষের তুষানল জ্বলছে! 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচায়' মত শ্রেণীর সাহিত্যিক কোন কোন বিত্তবান গোষ্ঠীর আশ্রয় নিয়ে খেয়াল খুশী মত সাহিত্য রচনা করছেন। সেখানে বিত্তশালীদের বাহবা পেলেই তাঁরা কৃতার্থ হন। দেশের বড় দুর্দিন। এমন দুর্দিনে দেশ চায় কোন সত্য সন্ধানীকে—যিনি অন্ধকারে আলোক বর্তিকা তুলে ধরবেন। মনেহয়, বাংলাদেশে সেই রকম সাহিত্যিকেরই একান্ত অভাব। যাঁদের আমরা একদিন বলিষ্ঠ সাহিত্যিক বলে আশা করেছিলাম, বড় দুঃখের বিষয়, আজ তাঁদের লেখনী যেন স্তব্ধ! মুষ্টিমেয় কয়েক-জন ব্যতীত আর সকলে যেন স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

ইহা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের দুর্দিনের কথা। সাহিত্য ধ্যানীমনের সাধনা। ইহা কোন কালের স্রোতে দাঁড় ও হাল বিহীন ভাবে ভাসিয়ে দেওয়ার নয়। তরুণ উদীয়মান সাহিত্যিকরা যদি এ বিষয়ে অনুশীলন ও হৃদয়ের সংগে অনুধাবন করেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যের কল্যাণ হবে।

রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি না রজকনীতি

শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়

রাষ্ট্রনীতি আর রাজনীতি নিয়ে দেশের ভিতর বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। একদল বলছেন—আমরা যা বলছি ও করছি তাই ঠিক এবং ন্যায় সঙ্গত। অন্য দল বলছেন—তোমাদের কথা ও নীতি সবই ভুল এবং অন্যায়। রাজনীতির শুভ নিশুম্ভের দ্বন্দ্ব চিরকালের। একদলের নীতি ও মতবাদ আর একদলের কাছে অত্যন্ত বাজে এবং জঘন্য। রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে যদি দ্বন্দ্ব চলতো তাতে আমরা দল-নিরপেক্ষ সাধারণ মানুষ উপভোগ হয়তো করতুম, মজাও দেখতুম, কোন দল বা গোষ্ঠিকে তারিফ করতে কার্পণ্য করতুম না। কিন্তু যখন দেখি যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আহার-বিহার, চলাফেরা সবই এই রাজনৈতিক শক্তির অগ্নিপরীক্ষায় কোণঠেসা হয়ে পড়েছে, তখন আর আমরা স্থির থাকতে পারি না।

সকালে কাগজ খুললেই দেখি পুলিশের গুলিতে অসংখ্য আহত আর নিহতের সংখ্যা আর তার পাশেই চোখে পড়ে উন্মত্ত জনতার কোপে পুলিস, নিরীহ দমকল কর্মী ও এ্যাম্বুলেন্স কর্মীর নির্যাতন ও জাতীয় সম্পত্তির হানি; তখন বুঝতে পারি না এটা রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি না রজকনীতি। গণ-দেবতা কি চান তা তিনিই জানেন। আমরা সাধারণ মানুষ তার হদিশ পাই না। রাজনীতির পাঞ্জা লড়াই যদি শুধু নেতা বা রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তা হলে পৃথিবী কত সুখের ও শান্তির হত। আমরা সাধারণ গৃহস্থজনগণ ধনে প্রাণে মারা যেতুম না। এই অগ্নিমূল্যের দিনে দ্বিগুণ তিনগুণ দাম দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হত না।

হিসাব-নিকাশের দিন এলে হয়তো দেখা যাবে এই রাজনীতির ধাপ্পাবাজীর জনতাকেই বেশী মূল্য দিতে হয়েছে। কার দোষে? তা বিচার করবার মত বিদ্যা বুদ্ধি যাঁদের আছে তা নিয়ে চুলচেরা বিচার হয়তো তাঁরা করবেন। কিন্তু আমরা সাধারণমানুষ যুক্তি ও নীতির চেয়ে হৃদয়কে বড় বলে মনে করি। তাই আমরা যে সকল সম্ভাবনাময় অমূল্যজীবন অকালে ঝরে গেল, তাদের জন্য সহানুভূতি, সমবেদনা এবং দুঃখ ছাড়া আর কিছু করতে পারবো না। কত বাপ-মা হয়তো পুত্রহারা হলেন, কত স্ত্রী হয়তো স্বামীহারা হলেন, কত ছেলে-মেয়ে হয়তো পিতৃহীন হলেন! কিন্তু কেন? কার দোষে?

বিরোধ যা আছে তার মীমাংসা একদিন নিশ্চয়ই হবে। গোল-টেবিলের পাশে বসে খানাপিনা এবং হাসি-ঠাট্টাও হয়তো চলবে। কিন্তু এই শহীদদের জন্য একবিন্দু জলও সেদিন হয়তো কারো চোখে আসবে না। সদ্য সদ্য কয়েকটি বেদীতে তাঁদের জন্য মালা দেওয়া হবে। পৌরসভা বা অন্য কোন সভায় দুই মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁদের আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। সরকারের তরফ থেকেও দুঃখ প্রকাশ করে সমবেদনা ও সহানুভূতি জানিয়ে মৃতের পরিবারবর্গকে কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তারপর সব ঠাণ্ডা ও নিঝুম। ভবিষ্যতে এঁদের কথা দেশের লোক হয়তো মনেই রাখবে না আর এঁদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার জীবনসংগ্রামের নিষ্পেষণে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরবে। কেউ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কিছু দেবে এবং কেউ বিদ্রূপ ও উপহাস করে ফিরিয়ে দেবে, এই তাঁদের ললাটের লিখন! আর নেতারা তখন তাঁদের জয়রথ সগর্বে চালিয়ে ক্ষমতার উচ্চশিখরে পৌঁছে যাবেন।

কিন্তু কাদের ত্যাগে? কাদের জীবনের মূল্যে?

ভেবে দেখ

শ্রীজ্ঞান

এবার তোমাদের দৃষ্টি একটি বিশেষ সমস্যার দিকে আকর্ষণ করছি। তোমরা যে যুগে জন্মেছ সেটাকে সমস্যার যুগ বললে অত্যুক্তি করা হবে না নিশ্চয়ই। বিশেষ করে বর্তমানে যে সব সমস্যার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি তার গুরুত্বও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। নানা রকম অভাবে অভিযোগে আজ দেশের মানুষ উত্তাক্ত হয়ে উঠেছে। এর আশু প্রতিকার সবাই প্রার্থনা করছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যখন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে, শান্তভাবে ও সকলে সমবেত হয়ে এই সব সমস্যার সমাধানের উপায় বার করতে হবে এবং সে উপায়কে সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হবে একতা ও ঐকান্তিক চেষ্টায়; ঠিক তখনই দেখা যাচ্ছে যে এই সব গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্যে যা সব চেয়ে দরকারী সেই শান্তিরই ব্যাঘাত হচ্ছে সবচেয়ে বেশী! ফলস্বরূপ আসল সমস্যার সমাধান কিছুই হচ্ছে না, কিন্তু অন্যান্য নানা নতুন সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

আমাদের দেশের খাদ্য ঘাটতি বা খাদ্যসমস্যার সমাধান উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারাই হতে পারে, কিন্তু সেদিক দিয়ে কাজ না করে অন্য উপায়ে অশান্তির মধ্যে দিয়ে যে কি করে তা হতে পারে আমরা বুঝে উঠতে পারি না। এই অশান্তির মধ্যে দিয়ে আমরা কি লাভ করছি জানি না, কিন্তু প্রধান লোকসান যে হচ্ছে ছাত্রদের শিক্ষার সে কথাটা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই। এর ওপর দেখা গেছে এই আন্দোলনে একটি বিশিষ্ট অংশ নিয়েছে স্কুলের ছাত্ররা! খাদ্য সকলকারই দরকারী তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই খাদ্যের সমস্যাটার সমাধান বড়দেরই করবার কথা—স্কুলের ছাত্রদের নয়! তার ওপর আন্দোলন যখন হিংস্র পথ নিয়েছে তখন তো ছাত্রদের সরে আসা একান্তই দরকার; কারণ ছাত্র-সমাজ কখনও উন্মত্ত হিংস্রতাকে সমর্থন করতে পারে না।

ছাত্রদের প্রধান কর্ম বিদ্যাভ্যাস। লেখাপড়া ভাল করে করতে পারলে তবেই পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ মিলবে। কিন্তু গোড়াতেই যদি এ ভাবে বাধা পড়তে থাকে তাহলে উন্নতির আশা কোথায়? এখন দেশের সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ—কতদিন বন্ধ থাকবে তার স্থিরতা নেই; কারণ স্কুল, কলেজ খুললেই দেখা যাচ্ছে একদল ছাত্র ট্রাইক্ করে আবার বিদ্যালয়গুলি বন্ধই শুধু করে দিচ্ছে না—পথে বেরিয়েও নানা গোলমাল করছে। সুতরাং শান্তি বজায় রাখতে স্কুল, কলেজও বন্ধ রাখতে হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলি বন্ধ থাকায় পরীক্ষা গ্রহণও সম্ভব হচ্ছে না—অনির্দিষ্টকালের জন্য সমস্ত পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। এতে শত শত ছাত্র-ছাত্রীর যে কত ক্ষতি হচ্ছে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তরলমতি অল্পবয়স্ক ছাত্রদের বিশেষ ভেবে চিন্তে কাজ করবার ক্ষমতা থাকে

না—অপরে যা বোঝায় তাই তারা বোঝে, তাই তারা করে। ফলাফল যে কি হতে পারে, তাদের যে কত ক্ষতি হতে পারে—এ সব বিষয়ে তারা চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু তাদের কাজের ফলে অঘটন যা ঘটবার তা ঘটে যায়; এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের বৃহত্তর ছাত্র-সমাজ! তোমাদের, ছাত্রদের এই যে বিরাট ক্ষতি, এর পূরণ তবে কি দিয়ে? পূরণ করবে কে?—এ ক্ষতি অপূরণীয়! এ ক্ষতির পরিণাম তোমাদেরই ভুগতে হবে। তাই আজ তোমাদের বলব যে তোমরা স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখ এ ভাবে নিজেদের ক্ষতি করে কি লাভ করবে? ভেবে দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের জড়িয়ে পড়া উচিত নয়, যে বিষয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার কথা নয়, যে সমস্যার সমাধান তোমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, সেই সমস্ত ব্যাপারে অপরের প্ররোচনায় আগুয়ান হয়ে এসে জড়িয়ে পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে, নিজেদের তথা ছাত্র-সমাজের এই অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করা কি যুক্তিযুক্ত? ভেবে দেখ, স্কুলের ছাত্রদের এক শ্রেণীর এই যুক্তিহীন কার্যকলাপ তোমরা অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করতে পারছ কি? ভেবে দেখ, নিজেদের আসল কর্তব্য লেখা-পড়ায় অবহেলা করার পরিণামে কি ফল ফলতে পারে?—এ সমস্তই তোমাদের আজ ভাববার সময় এসেছে; এবং ভেবে শুধু নিজেরা সরে থাকলেই হবে না, বিপথগামী বন্ধুদেরও নিরস্ত করতে হবে, বোঝাতে হবে, শেখাতে হবে, পরিবর্তন আনতে হবে তাদের চিন্তাধারায়। তবেই তোমরা এবং ছাত্র-সমাজ এক বিরাট ভাঙনের হাত থেকে, ধ্বংসের হাত থেকে, রক্ষা পাবে।

***

যক্ষ পর্বতের রূপকথা

শ্রীপরেশকুমার দত্ত

অতিশপ্ত দেশ অয়স্তগড়।

নীল আকাশের চাঁদোয়ার নীচে শুভ্র তুষার কিরীটিনী শ্যামল অরণ্য বেষ্টিত নীল পর্বতমালা, গৈরিক নদী, নীলাঞ্জনা হ্রদ, আর রূপালী ঝরণার দেশ অয়স্তগড়। আশ্চর্য সে দেশের লোক, নৃত্য, হাসি আর গান ছাড়া তারা আর কিছু জানে না।

অভিশাপ নেমেছে সেই স্বপ্নপুরীর দেশে। দশ বছর তারা ভুলেছে গীত আর হাসি, থেমে গেছে নৃত্যের নূপুর নিক্কণ।

রাজা বিশ্বজিৎ যখন স্বর্গত হলেন তখন যুবরাজ অভিজিৎ নাবালক। রাজ্যের শাসনভার হাতে নিলেন মন্ত্রী রুদ্রপাণি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর অভিসন্ধি বুঝতে প্রজাদের বিলম্ব হ'ল না। শিকার অজুহাতে অভিজিৎকে পাঠালেন গুরুগৃহে, রাণী মন্দাকিনী বন্দিনী হলেন তাঁর নিজের প্রাসাদে। বিলাস ও পাশাচারের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিলেন রুদ্রপাণি, রাজ্যে সুরু হল রাজকর্মচারীদের চরম নিপীড়ন। দুর্দশার শেষ রইল না প্রজাদের।

দশ বছর পর বিদ্যা ও অস্ত্র শিক্ষা সমাপ্ত করে অভিজিৎ রাজধানীতে ফিরে এসে, দেখলে সমস্ত রাজ্যের প্রজারা রুদ্রপাণির কবল থেকে পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনা করছে।

রাজসভায় অভিজিৎ প্রবেশ করতে ক্ষণকালের জন্য গম্ভীর হল রুদ্রপাণির বদন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করে রাজসভায় আসন দিলেন। তারপর বললেন, রাজপুত্র অভিজিৎ, তোমার নাবালকত্বের জন্য দশ বছর আমি বাধ্য হয়ে রাজ্য শাসনের গুরু-দায়িত্ব বহন করে এসেছি। এবার অভিষিক্ত হয়ে তুমি তোমার পিতার সিংহাসনে আরোহণ কর।

রাজসভার চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে রুদ্রপাণি বললেন, কিন্তু তার পূর্বে তোমার একটি মহৎ কর্তব্য সমাপন করতে হবে রাজপুত্র! দু'বছর হল এক যক্ষ আমাদের

দেবী মহাচণ্ডীর মন্দিরের ঐশ্বর্যভাণ্ডার থেকে মহামূল্য মহামণি অপহরণ করে নিয়ে গেছে। রাজসিংহাসনে বসার পূর্বে উত্তরের যক্ষ পর্বতের মন্দির থেকে সেই মহামণি ফিরিয়ে আনতে হবে। যদি ব্যর্থ হও তবে তুমি রাজসিংহাসনে বসার অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। চিরদিনের জন্য এ রাজ্য থেকে নির্বাসিত হবে। বিলম্ব নয় রাজপুত্র, এই মুহূর্তে তোমাকে যাত্রা করতে হবে—তার পূর্বে তুমি তোমার জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না।

রাজপুত্র দেখতে পেলে না, দীর্ঘ গুম্ফের আড়ালে অতি সূক্ষ্ম হাসলেন রুদ্রপাণি।

রাজকুমার অভিজিৎ এগিয়ে চলল একা। এগিয়ে চলল এক অজানা দুর্গম পথে অভিযানে। পাষাণপুরীর বাতায়নে দাঁড়িয়ে নিভৃতে সংগোপনে অশ্রুমোচন করলেন মন্দাকিনী। তিনি পূর্বেই জেনেছিলেন মন্ত্রী রুদ্রপাণির উদ্দেশ্য। বুঝলেন তাঁর পুত্র অভিজিৎ আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। কারণ উত্তরের যক্ষপর্বত থেকে কোনোদিন কোনো মানুষই ফিরে আসেনি। অসীম অলৌকিক ক্ষমতাবান যক্ষ, নরমুণ্ডের অঞ্জলি দেয় তার মন্দিরের বিগ্রহের চরণে। যক্ষকে হত্যা করবার অস্ত্রের সন্ধান এ পৃথিবীতে কেউ জানে না।

কিন্তু এ সমস্ত কোনো কিছুই জানত না রাজপুত্র। জীবনে ভয় ভয় কাকে বলে জানে না। তবু তার বারবার মনে হল সে এক ভয়ঙ্কর বড়যন্ত্রের ফাঁদের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করলে, যেমন করেই হোক সে ফিরিয়ে আনবে রাজ্যের মহাচণ্ডীর মহামণি। তার জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত দান করতে কুণ্ঠিত হবে না।

সারাদিনের পথশ্রমের পর অপরাহ্নের সূর্য যখন পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে তখন অভিজিৎ ক্লান্ত হয়ে বসল এক রূপালী ঝরণার পাশে। ঝরণা কুলুকুলু গান গেয়ে সানন্দে অভ্যর্থনা করলে রাজকুমারকে। মাথা থেকে হলদে পালক দেয়া উষ্ণীষ নামিয়ে ঝরণার মিষ্টি জল অঞ্জলিভরে পান করলে অভিজিৎ। নীলাভ স্বচ্ছ জলে খেলা করছিল সোনালী, রূপালী, লাল, হলুদ বিচিত্রবর্ণ ছোটো ছোটো মাছ; রাজকুমারকে দেখে তারা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ল। ঝরণার জলে স্নিগ্ধ হল রাজপুত্রের ক্লান্তদেহ। বন থেকে ফল আহরণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলে রাজপুত্র। তারপর ঝরণার কল্ কল্ ছল্ ছল্ গান শুনতে শুনতে একটি শিলাখণ্ডে মাথা রেখে শয়ন করতে না করতেই নিদ্রিত হয়ে পড়ল। নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখলে, তার মা রাণী মন্দাকিনী যেন তার শিয়রে এসে বসেছেন। দু চক্ষে তাঁর অবিরল অশ্রুর ধারা।

স্বপ্নভঙ্গে উঠে বসল রাজকুমার। তবে কি সত্যিই সে আর কোনদিন ফিরে যেতে পারবে না তার মায়ের কাছে। কিন্তু ফিরে যেতে যে তাকে হবেই, উদ্ধার করতে হবে তার বন্দিনী মাকে, মুছিয়ে দিতে হবে তাঁর অশ্রু।

সহসা পিছনে তাকিয়ে অভিজিতের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে দেখলে রূপালী জোৎস্নায় তার শিয়রের কাছে বসে রয়েছেন এক শুভ্রশুভ্রকায়ী দৈবিক বসন সন্ন্যাসী। রাজকুমারের মনে হল কোথায় যেন সে দেখেছে তাঁকে, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারলে না।

রাজপুত্রকে আরও বিস্মিত করে, সন্ন্যাসী বললেন, যে কাজে তুমি বেরিয়েছ, তা বড় কঠিন কাজ অভিজিৎ। যক্ষকে বধ না করে মহাচণ্ডীর মহামণি উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কিন্তু যক্ষ অবধ্য। কোনো মানুষের সাধ্য নয় তাকে বধ করা। যক্ষের পর্বতে গিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ জীবন্ত ফিরে আসেনি। কিন্তু তুমি রাজার পুত্র; চেষ্টা না করে তো তুমি ফিরে যেতে পারবে না। তার জন্য যদি প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তার জন্যও তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সন্ন্যাসী তাঁর ঝোলা থেকে একটি অতি ক্ষুদ্র পেটিকা বার করলেন, তারপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একটি রক্তবর্ণ তিলক এঁকে দিলেন রাজপুত্রের ললাটে। তারপর একটি ক্ষুদ্রাকার দণ্ড অভিজিতের হাতে দিয়ে বললেন, এই দণ্ডটি সব সময় তোমার কাছে রেখে দেবে।

আশ্চর্য! রাজপুত্রের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দণ্ডটি হাতে স্পর্শ করা মাত্র দেহে যেন শত অশ্বের শক্তি অনুভব করলে। শরীরের সমস্ত ক্লান্তি মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

সন্ন্যাসী বললেন, এসো অভিজিৎ আমাদের এখন অরণ্যের মধ্যে এক পাহাড়ের গহ্বরে যেতে হবে। সেখানে বাস করে এক তাপিনী। মনে রেখো তার মতো ভয়াল

হিংস্র নারী আর দুটি নেই। প্রাণে তার দয়া, মায়া, মমতার লেশমাত্রও নেই। মানুষের শরীরের অস্থি নিয়ে সে খেলা করে। মন্ত্রের শক্তিতে সে মানুষের প্রাণ অপহরণ করতে পারে।

রাজপুত্র বললেন, কিন্তু এই রমণীর কাছে আমাদের কি প্রয়োজন সন্ন্যাসী?

সন্ন্যাসী এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক মাত্র এই ডাকিনীই জানে যক্ষের মৃত্যুবাণের সন্ধান। সেই মৃত্যুবাণ ছাড়া তুমি কোনো দিনই যক্ষকে বধ করতে সক্ষম হবেনা।

রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাসী এক অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সন্তর্পণে চলতে চলতে সন্ন্যাসী বললেন, সাবধান, অভিজিৎ! দেখা মাত্রই ডাকিনী আমাদের প্রাণনাশ করতে উদ্যত হবে। তাই আড়াল থেকে আমাদের কাজ করতে হবে। তার ঘটার মধ্যে লুকানো আছে একটি মৃদ্রাকার মন্ত্রপূত অস্থি খণ্ড। সেটি তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারলেই সে একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু একমাত্র নিদ্রার সময় ছাড়া কোনো সময়ই সে কাছ ছাড়া করেনা সেটিকে।

কথা বলতে বলতে তাঁরা গভীর অরণ্যের মধ্যে এক বিশাল পর্বতের পাদদেশে পৌঁছলেন। অকস্মাৎ একটি বিশাল শাল্মলি বৃক্ষের তলে থমকে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী। উভয়ে দেখলেন একটি গুহার বাইরে ধাউ ধাউ করে আগুন জ্বলছে—আর একটি শীর্ণকায়া বৃদ্ধা সেই অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসে একটি হরিণের ঝলসানো প্রকাণ্ড পা চিবুচ্ছে। বড়ো বড়ো গজ দাঁতগুলো তার রক্তিমাভ আগুনে ঝক্‌ঝক্ করছে—পিঙ্গল চোখগুলো তার ঠেলে বেরিয়ে আসছে আর মোটা ঠোঁটটা নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। ডাকিনী আহারে এমনই মগ্ন যে, সে জানতেও পারলে না তার পিছনে দু'টি মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে অভিজিৎ দেখলে ভুক্তাবশিষ্ট কয়েকখণ্ড মাংস নিয়ে গুহার মধ্যে প্রবেশ করলে ডাকিনী। তারপর সেগুলিকে ঘর করে রেখে শয়নের উদ্যোগ করলে। বোধ হয় ক্লান্তি ও গুরুভোজনের জন্য অল্পক্ষণের মধ্যেই তার নাসিকাগর্জন শোনা গেল। রাজপুত্রের হাত চেপে ধরে সন্ন্যাসী বললেন, এই উপযুক্ত মুহূর্ত রাজপুত্র। এইবার তোমায় গুহার প্রবেশ করে ডাকিনীর শিয়রের কাছে রক্ষিত সেই মন্ত্রপূত অস্থিখণ্ড নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু অতি সন্তর্পণে তোমায় এই কাজ করতে হবে, অস্থিখণ্ড হস্তগত করার পূর্বে যদি কোনো রকমে ডাকিনী জেগে ওঠে তবে আর তোমার রক্ষা নেই। দীর্ঘ তীক্ষ্ণ নখের সাহায্যে ডাকিনী তোমার প্রাণনাশ করবে।

অন্ধকার গিরি গুহার অভ্যন্তরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রুদ্ধশ্বাসে এগিয়ে গেল অভিজিৎ। মনে হল যেন সে মৃত্যু-গহ্বরে প্রবেশ করলে। গুহার প্রবেশ মুখে তখনও ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে।

গুহার বাইরে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন সন্ন্যাসী। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে গেল। কোথায় রাজপুত্র! তবে কি ডাকিনী তাকে শ্বাসরোধ করে বা মন্ত্রবলে হত্যা করলে। ভাবলেন, তিনি একবার গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখবেন কিনা! হঠাৎ দেখলেন প্রায়ান্ধকার গুহার মধ্যে থেকে কে দ্রুত ছুটে আসছে। পরক্ষণেই একটা প্রচণ্ড বিকট চীৎকারে গিরিগুহা আর গিরি অরণ্য প্রকম্পিত হয়ে উঠল। সন্ন্যাসী দেখলেন রাজপুত্রের পিছনে উন্মত্ত রাক্ষসীর মতো ছুটে আসছে ডাকিনী। মন্ত্রপূত অস্থিখণ্ডটি হাতে নিয়ে অভিজিৎ সন্ন্যাসীর কাছে এসে দাঁড়াতে তিনি বললেন, কোনো ভয় নেই রাজপুত্র, ডাকিনী এখন তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। অস্থিখণ্ডের অভাবে এখন ও শক্তিহীনা। এখন ওর কাছে জেনে নাও চপল গুহার পথ, সেই গুহার মধ্যে আছে যক্ষের মরণবাণ, অঙ্গুরীয়ক, দুর্ভেদ্য বর্ম আর পুষ্পক রথ।

রাজপুত্রের প্রস্তাব শুনে, ডাকিনী পিশাচীর মতো নখ-দন্ত বিকাশ করে ছুটে এলো। কিন্তু রাজপুত্র কিছুমাত্র ভয় পেলে না। বরং ডাকিনীকে সতর্ক করে দিলে, ঠিকানা না বললে, সে তার অস্থিখণ্ড অদূরবর্তী হ্রদের জলে নিক্ষেপ করবে। এবারে বিলাপ শুরু করলে ডাকিনী। মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে দুহাতে শণের দড়ির মতো মাথার জট ছিঁড়তে ছিঁড়তে রাজপুত্রকে অভিশাপ দিতে লাগল। কিন্তু যখন দেখলে রাজপুত্র কিছুতেই তার অস্থিখণ্ড ফিরিয়ে দিলে না তখন উঠে বসে তাকে গালি দিতে দিতে পাহাড়ের আর এক প্রান্তের দিকে এগিয়ে চলল। সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাজপুত্রও তাকে অনুসরণ করলে। কিছুদূর এগিয়ে তাঁরা

হ্রদের শেষ প্রান্তে একটি ছোটো গিরিগুহার কাছে এসে পৌঁছল। ডাকিনী তার অশ্বিখণ্ড ফিরে চাইলে।

কিন্তু সন্ন্যাসী ডাকিনীকে কঠিনকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন সকলের প্রথমে গুহার দিকে এগিয়ে যেতে, আর অভিজিৎকে বললেন তার তরবারি কোষমুক্ত রাখতে। নিঃশব্দে কিছুদূর অগ্রসর হতেই দেখা গেল অন্ধকারে জ্বলছে দুটি তীব্র ভয়ঙ্কর আলোকবিন্দু। মুহূর্ত মধ্যে সেই দুটি আলোক বিন্দু ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সম্মুখবর্তী ডাকিনীর ওপর। রাজপুত্র দেখলে একটি প্রকাণ্ড নেকড়ে মুহূর্তে ডাকিনীকে খণ্ডবিখণ্ড করে হিংস্র মূর্তিতে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হচ্ছে। মুহূর্ত মধ্যে উদ্যত অগ্নিমুখে নেকড়েকে বিদীর্ণ করলে রাজপুত্র। প্রচণ্ড চীৎকারে গিরি অরণ্য প্রকম্পিত করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সেই মৃত্যুহারী নেকড়ে। এবার নিঃশঙ্কচিত্তে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দ্রুত গুহার মধ্যে এগিয়ে গেল অভিজিৎ। কিছুদূর অগ্রসর হতেই সবিস্ময়ে দেখলে একটি বিশাল সিন্দুক। সন্ন্যাসীর নির্দেশে কৌশলে সেটির ডালা খুলে ফেলতেই দেখলে একটি শর, একটি বর্ম ও একটি অঙ্গুরীয়ক। আর সিন্দুকের অপর পাশে একটি আশ্চর্য রথ। সন্ন্যাসীর সাহায্যে রাজপুত্র রথ, বর্ম, শর ও অঙ্গুরীয়কে নিয়ে গুহার বাইরে এসে দাঁড়াল।

অভিজিৎ সবিস্ময়ে দেখলে ডাকিনীর পাশে যেখানে সে কিছুক্ষণ পূর্বে নেকড়েটিকে পড়ে থাকতে দেখেছিল সেখানে পড়ে রয়েছে একটি প্রাণহীন কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড মনুষ্যদেহ।

মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে অভিজিৎকে নিয়ে সন্ন্যাসী রথে চড়ে বসলেন। অভিজিৎ সবিস্ময়ে দেখলে রথ ধীরে ধীরে গর্জন করে আকাশে উঠতে আরম্ভ করল। নীচে স্থিরচিত্রের মতো পড়ে রইল অরণ্য, পর্বত, নদী।

উড়ন্ত রথ দ্রুত উড়ে চলল উত্তরের বরফাচ্ছাদিত পাহাড়ের দিকে। নীচে জ্যোৎস্নাস্নাত নদী, গিরি, অরণ্যের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল অভিজিৎ। রথ এক সময় জ্যোৎস্না-মাখা রুপালী মেঘের মধ্যে প্রবেশ করল। সহসা রাজপুত্র উৎকর্ণ হয়ে শুনলে, মেঘের মধ্যে অনেক দূর থেকে শন্ শন্ করে কি একটা শব্দ ভেসে আসছে। তাড়াতাড়ি কটিবন্ধ থেকে তরবারি কোষমুক্ত করলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই লক্ষ্য করলে, তার রথের পাশ দিয়ে উড়ে চলেছে সহস্র সহস্র বাদুড়ের পরী। ভয়ঙ্কর সুন্দর। তাদের পাখার শব্দে বাতাস মুখর হয়ে উঠল। পরীদের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠা বললে, আমরা তোমার শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি রাজপুত্র! যক্ষ আমাদের অনেক বোনকে বন্দী করে মন্দিরে হত্যা করেছে। নিষ্ঠুর যক্ষের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর রাজপুত্র। রাজপুত্র দেখলে তাদের চোখে জল।

পরীরা যেমন দ্রুত এসেছিল তেমনি দ্রুত রথ অতিক্রম করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজপুত্র সহসা দেখলে উড়ন্ত রথের গতি মন্থর মন্দীভূত হয়ে এলো, তারপর নীচের দিকে নামতে শুরু করল। রথ এখন উত্তরের সর্বোচ্চ শিখরের ওপর নেমে এসেছে। সন্ন্যাসী এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, চেয়ে দেখ রাজপুত্র, পর্বতপাত্রের অরণ্যের মধ্যে ওই সেই যক্ষের মহা প্রাচীন মন্দির। ওই মন্দিরের মধ্যেই রয়েছে মহাচণ্ডীর মহাযন্ত্র।

রাজপুত্র দেখলে, মন্দিরশীর্ষে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে রক্ত পতাকা। মন্দিরপ্রাঙ্গণে নিদ্রিত রয়েছে এক বিশাল পুরুষ। ঘন কৃষ্ণ তার গাত্রবর্ণ। আর তার পায়ের কাছে শায়িত রয়েছে এক বিরাট কৃষ্ণকায় কুকুর। সন্ন্যাসী অভিজিৎকে আড়ালে দিয়ে বললেন, এটি এখনই আড়ালে সরে যাও, নতুবা যক্ষ তোমার দিকে তাকালেই তুমি পঙ্গু হয়ে যাবে। হাতের ধনু তোমার ক্ষমতাও তোমার থাকবে না। তারপর একটিমাত্র অগ্নিবাণে তোমায় ভস্মে পরিণত করবে।

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হতে না হতেই সহসা রাজপুত্র দেখলে রথের শন্ শন্ শব্দে জেগে উঠেছে সেই প্রকাণ্ড কালো কুকুর। আকাশের দিকে মুখ তুলে বিকট গর্জনে প্রকম্পিত করে তুলেছে নির্জন রাত্রির মহানিস্তব্ধ গিরি অরণ্য। আর সেই শব্দে একটা বিকট হুঙ্কার করে দাঁড়িয়ে উঠেছে সেই বিরাটবপু পুরুষ। আর সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রের দিকে লক্ষ্য করে শর নিক্ষেপ করতে শুরু করেছে। রাজপুত্রও তৎক্ষণে তুলে নিয়েছে তার দুর্ভেদ্য ঢাল। তবু রাজপুত্রের মনে হল তার চারিদিকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে আর বলসে যাচ্ছে তার সর্বাঙ্গ।

মনে হল এখনই হয়ত তাদের রথ ঘাই পাই করে মাটিতে উল্টে নীচে পড়ে যাবে। রাজপুত তাড়াতাড়ি তার ধনুকে যজ্ঞের মৃত্যুবাণ যোজনা করলে। সন্ন্যাসী বললেন, সাবধান রাজপুত্র, লক্ষ্য যদি ব্যর্থ হয় তবে আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। রাজপুত্র স্তব্ধ লক্ষ্য স্থির করলে। সহসা সন্ন্যাসী চেপে ধরলেন রাজপুত্রের হাত। গর্জন করে উঠলেন, কার দিকে শর লক্ষ্য করছ রাজপুত্র? ওই পুরুষের দিকে না, স্তব্ধ শর নিক্ষেপ কর ওই কুকুরের দিকে।

রাজপুত্র স্তম্ভিত হয়ে বললে, সেকি বলছেন সন্ন্যাসী!

সন্ন্যাসী আবার গর্জন করে উঠলেন, আর সময় নেই, যা বলছি তাই কর অভিজিৎ। রাজপুত্র আর দ্বিরুক্তি না করে সন্ন্যাসীর উপদেশ মতো কুকুরের দিকে সেই মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করলে। প্রচণ্ড চীৎকারে আকাশ বাতাস কম্পিত করে মন্দির প্রাঙ্গণে লুটিয়ে পড়ল সেই প্রকাণ্ড কুকুর। আর পরমুহূর্তে চারের হুঙ্কার নিক্ষেপ করে মহা আতঙ্কে বনের মধ্যে অন্তর্হিত হল সেই বিরাটপুরুষ। কিন্তু রাজপুত্রের বিস্ময়ের তখনও বাকি ছিল। দেখলে সেই সাঙ্ঘাতিক কুকুর ধীরে ধীরে মনুষ্যদেহে পরিণত হল। রাজপুত্র এবার বুঝলে সন্ন্যাসীর উপদেশের অর্থ।

রথ তখন পর্বতগাত্রের মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। অভিজিৎ দেখলে মন্দির প্রাঙ্গণের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে ছিন্নভিন্ন নরকঙ্কাল।

সন্ন্যাসী বললেন, আর ভয় নেই রাজপুত্র, কুকুররূপী মহাপাপী স্বয়ং প্রাণত্যাগ করেছে। এসো, এবার আমরা মন্দিরের মধ্যে থেকে উদ্ধার করি সেই অপহৃত মহামণি।

রাজপুত্র মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলে, অদ্ভুত-দর্শন বিগ্রহের পদতলে তখনও পড়ে রয়েছে একটি সদ্য ছিন্ন নরমুণ্ড।

সন্ন্যাসীর উপদেশ মতো মন্দিরের বিগ্রহের তলদেশের একটি বিশাল সুড়ঙ্গপথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে অভিজিতের চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। সেখানে থরে থরে সাজান রয়েছে অপরিমিত স্বর্ণ আর মহামূল্য মণিমাণিক্য। পৃথিবীতে সে ঐশ্বর্যের বুঝি কোনো তুলনা সম্ভব নয়। সন্ন্যাসীর নির্দেশে স্বর্ণপেটিকায় রক্ষিত মহা চণ্ডীর মহামণি উদ্ধার করলে অভিজিৎ। তারপর আবার মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়াল। সন্ন্যাসী রাজপুত্রকে সতর্ক করে দিলেন, মহাচণ্ডীর নিষেধ এক মুঠো ছাড়া স্বর্ণপেটিকা উন্মুক্ত করে মহামণি আর কোনো মানুষ দর্শন করবে না।

রাত্রির তখন শেষ যাম। সন্ন্যাসী বললেন, এসো অভিজিৎ রাত্রি শেষ হবার পূর্বেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। উৎসুক রথে তাঁরা দ্রুত উড়ে চললেন। সহসা আকাশ পথে শন্ শন্ শব্দে অভিজিৎসমাকে উঠল। সন্ন্যাসী বললেন, পরীরা তোমার অভিনন্দন জানাতে আসছে রাজপুত্র। অভিজিতের কণ্ঠে তারার মালা পরিয়ে দিয়ে পরীরা বললে, রাজপুত্র তুমি সত্যিই বীর।

যে জলাধার পাশে সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা হয়েছিল সেখানেই আবার রথ এসে নামল। সন্ন্যাসী বললেন, রাত্রি এখনও শেষ হয়নি অভিজিৎ, তুমি ক্লান্ত, বিশ্রাম কর। সত্যই ঘুমে দু চোখ জুড়ে আসছিল অভিজিতের। জলধারার পাশে কোমল তৃণশয্যায় শয়ন করতেই নিদ্রা এসে তার সমস্ত ক্লান্তি আর শ্রান্তি দূর করে দিল।

রাজপুত্রের ঘুম ভাঙল সূর্যের খর কিরণে। সূর্য তখন দিগন্তের অনেক ওপরে। কিন্তু কোথায় সন্ন্যাসী! কোথায় সেই উড়ন্ত রথ, বর্ম, অঙ্গুরীয়ক। রাজপুত্রের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তবে সমস্তই কি স্বপ্ন। সারা রাত্রি সে কি শুধু স্বপ্ন দেখেছে! কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলে বুকের কাছে তখনও পড়ে রয়েছে সেই স্বর্ণপেটিকা।

কিন্তু মনের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করেও যখন সন্ন্যাসীকে আর দেখতে পেলেনা তখন রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলল অভিজিৎ।

অভিজিৎ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজধানীতে বিষাদের ছায়া নেমেছিল। কারণ তিনি যে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, সে পথ থেকে সেদিন পর্যন্ত কেউ ফিরে আসেনি। তাই রাজপুত্রের প্রত্যাবর্তনের সংবাদে প্রজাদের বিস্ময়ের, আনন্দের আর সীমা রইল না।

রাজসভায় সভাসদবর্গ উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী কত্রপাণি। সভার এক কোণে রাজপুত্রের ক্লান্ত বিষণ্ণ মূর্তি দেখে তাঁদের নিশ্চিত ধারণা হল, সে ব্যর্থ হয়ে কোনো প্রকারে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে।

গোপনে কুটিল হাসলেন কত্রপাণি। মুহূর্তে নিজের অভিসন্ধি স্থির করে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কোথায় মহা-চণ্ডীর মহামণি অভিজিৎ। যদি দেখাতে না পারো তবে

তুমি জয়গড়ের রাজসিংহাসনে আরোহণ করবার অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। আর দেবী মহাচণ্ডীর আদেশে অবিলম্বে এ রাজ্য থেকে নির্বাসিত হবে।

শান্তকণ্ঠে অভিজিৎ বললে, এনেছি রুদ্রপাণি সেই মহামণি। কিন্তু তা দেখাতে পারব না।

সভাসদদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে আবার বুটিল হাসলেন রুদ্রপাণি। কঠিনকণ্ঠে বললেন, তুমি ভাগ্যবান অভিজিৎ। কিন্তু মনে কোরোনা তোমার চাতুরী আমরা বুঝতে পারি না।

অভিজিৎ অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললে, এই মহামণি দর্শন করা নিষেধ রুদ্রপাণি। আমাদের মহা অমঙ্গল ঘটবে।

সভাসদরা বললেন, আমাদের মঙ্গল চিন্তা তোমায় করতে হবেনা অভিজিৎ। যদি মহামণি দেখাতে না পার এই মুহূর্তে তোমায় রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে সোনার কৌটাটি রুদ্রপাণির হাতে তুলে দিলে অভিজিৎ।

রুদ্রপাণিকে ঘিরে দাঁড়ালেন কৌতূহলী সভাসদরা। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে অভিজিৎ দেখলে অকস্মাৎ এক তীক্ষ্ণ মর্মভেদী চীৎকারে দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ইতস্ততঃ ছুটতে শুরু করেছেন তাঁরা। সিংহাসনে পড়ে রয়েছে রুদ্রপাণির প্রাণহীন দেহ আর বাকি সকলে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছেন।

সংবাদ পেয়ে মন্দির থেকে ছুটে এলেন মহাচণ্ডীর পূজারী। দুর্লভ মহামণি সযত্নে গ্রহণ করে রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করে বললেন, পাপের শাস্তি মানুষ লাভ করবেই রাজপুত্র!

রাজপ্রাসাদের নির্জন কক্ষে বন্দিনী জননীর কাছে ছুটে গেল অভিজিৎ। দীর্ঘদিন পর পুত্রকে দেখে আনন্দে উন্মাদ হয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মস্তক চুম্বন করে সাশ্রুলোচনে আশীর্বাদ করলেন রাণী মন্দাকিনী।

রুদ্রপাণির দুঃশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে তখন সমস্ত রাজ্যব্যাপী উৎসব শুরু হয়ে গেছে।

— —

হাসিতের অভিজ্ঞতা

প্রশান্ত মৈত্র

প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে এক পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি মরে যাবার আগে তাঁর ছেলে হাসিতের জন্য একটুকরো কাগজে কি যেন লিখে হাসিতের মায়ের হাতে দিয়ে বল্লেন যে, হাসিত যখন বড় হবে তখন সে এইটি পড়ে পৃথিবীতে সবচেয়ে জ্ঞানী লোক হবে। হাসিত জন্মালে লোকে তার হাত দেখে বল্ল যে সে খুব জ্ঞানী ও ধনী হবে। যদি সে জীবনে এক বিরাট ফাঁড়া কাটাতে পারে। হাসিত যতই বড় হতে লাগল ততই সে অলস হতে থাকে। কোন কাজে মন লাগে না। তাই তার মা তাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। সংসার চালাবার জন্য সে একদল কাঠুরেদের সঙ্গে যোগ দিল। একদিন একটা গাছ কাটতে কাটতে হঠাৎ হাসিতের কুড়াল এক বিরাট পাথরে লাগল। তখন তারা সবাই সেটা টেনে তুলে দেখল এক বিরাট গর্ত আর তার নীচে অনেকগুলো মাটির কলসী। হাসিত নীচে নেমে সেগুলো সব উপরে তুলে দিল। কলসীগুলো মধুপূর্ণ ছিল। এই সুযোগে তারা হাসিতকে পাথর চাপা দিয়ে সরে পড়লো। এবং মধু বিক্রী করে তারা সবাই ধনী হয়ে গেল। হাসিত নিরুপায় হয়ে বসে পড়লো। হঠাৎ একটা আলোর রেখা দেখতে পেল। সেই আলোটার দিকে লক্ষ্য রেখে সুড়ঙ্গ তৈরী করতে করতে সে একটা দরজার এসে পৌঁছল। দরজা খুলে দেখল চারিদিক মুক্ত বায়ু, আর খোলা জায়গা। একটা হ্রদের ধারে সে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে এক বিরাট মুক্তোর পাহাড়। নীচে একটা সোনার চেয়ার আর তার চারপাশে ছোট ছোট অনেকগুলো চেয়ার। সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা সুমিষ্ট গান তার কানে ভেসে এল। একটু পরেই সে দেখতে পেল কয়েকজন মেয়ে আসছে। তাদের নীচের দিকটা ঠিক সাপের মতন। মাঝখানে ছিল তাদের রাণী। রাণী সোনার চেয়ারে, আর তার চারপাশে আর সকলে বসল। অনেকক্ষণ পরে রাণী হাসিতকে দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল যে

কি করে সে এখানে এসেছে। হাসিত সব কথা খুলে বল এবং রাণী মন দিয়ে শুনে বল, তাহলে তুমি আমার এই দেশে নিরাপদে থাকতে পার। হাসিত রাণীর রাজ্যে খুব সুখে বাস করতে লাগল। হঠাৎ একদিন তার বাড়ী যাবার খুব ইচ্ছে হল এবং সে রাণীকে জানাল। রাণী প্রথমে রাজী হ'ল না। কিন্তু পরে রাজী হল এবং হাসিতকে প্রতিজ্ঞা করতে বল যে সে যেন কোনদিন "হামাম"-এ (সাধারণের জন্য গরম জলের স্নানাগার) স্নান না করে। হাসিত প্রতিজ্ঞা করলে তাকে উপরে দিয়ে আসা হ'ল। বাড়ী গেলে সবার খুব আনন্দ হ'ল। সে তার মাকে তার অন্যান্য কাঠুরে-বন্ধুর কথা জিজ্ঞাসা করল। তার মা বল্লেন, তারা সবাই বিরাট বড়লোক। হাসিত বল, আমি তাদের সাথে দেখা করব। এ'কথা শুনে সেই বন্ধুরা লজ্জায় তাদের সবার সম্পত্তি ভাগাভাগি করে হাসিতকে খানিকটা দিল।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাসিত একদিন 'হামামে'র পাশ দিয়ে চলেছে। হামামের মালিক তাকে খুব অনুরোধ করলো হামামে আসতে। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হল না কারণ রাণীর কথা তার মনে পড়লো। কিন্তু মালিক কোন কথা না শুনে তাকে জোর করে হামামে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে দিল। হঠাৎ একদল সৈন্য এসে হাসিতকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে গেল। রাজা অসুখে বিছানায় শুয়ে। হাসিত ভয়ে কেঁদে ফেল কারণ সে কোন দোষ করেনি। অবশেষে মন্ত্রী বল যে রাজার কুষ্ঠ রোগ এবং তা' সারাবার জন্যই তাকে আনা হয়েছে। হাসিত বল, আমার তো কোন ওষুধ জানা নেই। মন্ত্রী বল, একমাত্র তুমিই এই অসুখ সারাতে পার কারণ পাতালের রাণীর সাথে তোমার পরিচয় আছে। হাসিত কিছু বুঝতে পারল না। মন্ত্রী তখন রেগে চেঁচিয়ে বল, তাই যদি না হবে তবে তোমার গায়ের রং অত কালো কেন? হাসিত দেখল সত্যিই তার গায়ের রং কালো। কিন্তু তবুও সে কিছু বলল না। তখন মন্ত্রী তাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেত মারল। হাসিত এবার স্বীকার করল এবং তাকে একটা গোপন দরজা দিয়ে আবার পাতালে পাঠিয়ে দেয়া হ'ল।

হাসিত রাণীর কাছে গিয়ে প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করে সব ঘটনা বল। এবং জানাল যে তার কোন দোষ নেই। রাণী বল, আমি সব বুঝেছি। তোমাকে ক্ষমা করলাম। তোমার রং আগের মত হোক।

সঙ্গে সঙ্গে তাই হ'ল। রাণী দুটো বোতলে দুরকম ওষুধ হাসিতের হাতে দিয়ে একটা মন্ত্রী এবং অন্যটি রাজাকে দিতে বল। হাসিত ফিরে এসে রাজাকে এবং মন্ত্রীকে ওষুধ দিল। রাজা ওষুধ খেয়ে সেরে গেলেন। মন্ত্রী গর্ব-ভরে ওষুধ পান করল। সে ধীরে ধীরে ঘুমতে শুরু করল। ধীরে ধীরে হাতীর মত ফুলে গিয়ে শেষে ফেটে মরে গেল। রাজা হাসিতকে মন্ত্রী করলেন। এবং হাসিত তার বাড়ীর সবাইকে নিয়ে সুখে বাস করতে লাগল। একদিন তার মা তার বাবার লেখা ছোট কাগজ দিয়ে হাসিতকে সব কথা বল। তাতে লেখা: অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান বৃথা যায়।"

"The Adventures of Hasit"—গল্পের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

টুকুনের বিলাপ

শ্রীজয়ন্তকুমার গুপ্ত

পাখী তার গেছে উড়ে—
তাই টুকুন অসুখে পড়ে।
কত দুঃখ অন্তরে,
জাগিছে আজিকে,
কত সাধ ছিল তার
মনে পড়ে বার বার
ভুল বকে শুধু আর,
ঘুমায়ে আজিকে—
"চায় যারা যেতে দূরে
যাক তারা বারে বারে
কভু যদি নাহি ফিরে,
খেদ তাতে নাইরে।
সবে চলে যাবে জানি
সব নিয়ে যাবে টানি
নাই এতে মান হানি,
দুঃখ নাই তাইরে।
থাকা শুধু দু'দিনের
ফিরে যেতে হবে ফের
বেথা শুধু বিরামের,
ঠেই ভাই বলরে।
সেথা গিয়ে ঘুরে ফিরে
আবার ধরণী 'পরে
আসিতে হবে যে ঘুরে,
নহী সম হায়রে।"

বোলান গীতি-নৃত্য

নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

বোলানের কথা আমার ভ্রমণ কাহিনীর অংশ। বোলান দেখব এমন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি বেরই নি। একবার দাঁইহাটি স্টেশনে আমাকে সাড়ে-তিন ঘণ্টা প্রতীক্ষা ক'রতে হয়েছিল। সেদিন ছিল চৈত্রের শেষাশেষি। বেলা যখন আড়াইটে সামনে ঢোলের শব্দ শুনলাম।

দেখলাম, স্টেশনের ওধারে একদল রোদে-পোড়া কালো মানুষ ঢোল এবং করতাল বাজিয়ে আসছে। এক জনের হাতে হারিকেন ঝুলছে, তার কাঁচটা সম্পূর্ণ কালো হ'য়ে গেছে। দুটো বড় লাঠিও আছে দুজনের কাছে। এরা নাচ ধরেছে। স্টেশন ছেড়ে রোদ পেরিয়ে আমি ছুটলাম। একজনদের বাড়ির উঠনে নাচ-গান হচ্ছে। উঠনে পুরুষের ভিড়, আর পিঁড়েতে ভিড় বউ-ঝি বৃদ্ধাদের। বেশ ভাল লাগছিল।

সামনে-পেছনে দু-দলে বিভক্ত হ'য়ে তারা উঠনটা ঘুরে চলছে। গাইছে, নাচছে,—পায়ে ঘুঙুর আছে। বেশভূষা কিছু নেই, শুধু মলিন ধুতি-গামছা, কারো গায়ে গেঞ্জি। দুপুর রোদে নেবানো-হারিকেন-হাতে লোকটিও ঘুরছে, বড় লাঠি কাঁধে লোক দুটিও ঘুরছে।

আমার এই প্রথম দেখায় আমি সবটা আবছা দেখে

আদিবাসী বাঙালির
বোলান-নৃত্য
(আধুনিক ধরণের)

জিজ্ঞাসা ক'রে শুনলাম, রাতে বনে জঙ্গলে চ'লতে হ'লে লাঠি দরকার হয়। এটা বোলানের দল। এরা সারা রাত দূর-দূরান্তরের শিবতলাতে শিবতলাতে নেচে গান ক'রে ফিরছে। সারা রাত জলে জলে হারিকেন ছাতার মতো কালো হয়ে গেছে।

গ্রামের ছায়ায় গীত, বাদ্য ও নৃত্যের ধ্বনি উঠেছে। নিচ্ছিলাম। যে দুটকটি ঢোল বাজাচ্ছে, তার উদ্দামতা সকলকে ছাপিয়ে গেছে। এই জোয়ান মাতাল উচ্ছৃঙ্খল বাহিনীটি অনেকেরই আকর্ষণের কেন্দ্র। সামনে আসতে পারছে না, কপাটের আড়ালে থেকে একটি কালো বউ বহুক্ষণ থেকে ঢোল বাদকটিকে মুগ্ধ হ'য়ে দেখছে। আমি তার চকচকে চোখের, মুখের হর্ষ দেখে নিলাম।

ঘড়িতে তিনটে-দশ দেখে স্টেশনে ছুটলাম, সামনে সিগ্‌নাল প'ড়ল।

ট্রেনে যখন ফিরছি, শেষ গানটির খানিকটা মনে মনে ভাঁজছিলাম,—সুরে ধারা আছে,—

"ঘিয়াতে প্রাণ বাঁচে না,
ঘিয়াতে প্রাণ বাঁচেনা,
কাও খেয়ো না। ধুয়া
পুরুষকে বানিয়ে ভেড়া,
মেয়ে বেড়ায় পাড়া পাড়া,
তারা বশে আসে না।
ময় গো পুরুষ ঘোলের হাঁড়া
নারী তাহা বেচে না।
ঘিয়াতে প্রাণ বাঁচে না॥"

সুরে-ছন্দে এ-গান শুনে সেদিনকার পল্লী-জনতার সে কি আনন্দ!

প্রাকৃতিক পরিবেশ

রাত্রিটুকু মাত্র নিজের ঘরে বিশ্রাম ক'রে পূর্ববর্ণিত ঘটনার পরের দিনই আবার এসেছি দাঁইহাটি স্টেশনে। এখানে যদিও পাঠকদের বোলানের কথা ব'লতে ব'সেছি, আগেই জানিয়েছি, আমি কিন্তু বেরতাম ভ্রমণের নেশায়, কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই। অন্য কথা যথাসম্ভব সব ছেঁটে দিয়ে আজ বোলান, আর বোলান সংশ্লিষ্ট বিষয় গুলোই মাত্র আমি বলছি।

বর্ধমান জেলার দাঁইহাটি স্টেশন থেকে আমি পাঁচ মাইল দূরবর্তী ন'দে জেলার হাজরাপোতা গ্রামের দিকে রওনা হয়েছি বারটার রোদ নিয়ে। সেদিন ১৩৫৯ সালের ২৭শে চৈত্র।

দীর্ঘ উত্তপ্ত বালুকারাশি, গঙ্গার পরিত্যক্ত খাত দিয়ে হাঁটছি। মেটিরিতে গঙ্গা পার হয়েছি। মাইলের পর মাইল সবই এককালে গঙ্গার গর্ভে ছিল, বোঝা যায়। তীব্র উত্তাপ। দেখি, মাটি থেকে শূন্যে যেন উদ্গত স্বচ্ছ বাষ্পশিখা কাঁপছে, পাতলা স্বচ্ছ শাদা শির্-শির্ ক'রছে ফড়িঙের পাখার মত। এটা যে কি, তা এখনও আমি জানি না।

প্রতি বছরই চৈত্র শেষে আমি রোদে হাঁটছি। জানি এ-সময়টা পশ্চিমের মতো শুষ্ক উত্তাপ থাকে, ঘাম কম হয়। গরম হাওয়ায় মুখ ঝলসে যায়, একশ চার, ছয়, আট ডিগ্রী তাপ উঠে যায়। এই দিন নিশ্চয়ই ১০৮ ডিগ্রীই উঠেছে। এখন আমার সামনে দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর ধূ ধূ ক'রছে, ঘাস উঠে গেছে, প'ড়ে আছে রিক্ত মাটি। পরম বিস্ময়ে দেখলাম, দূরে দূরে মাটিতে ধপ্ ধপ্ করে যেন আগুন জ্ব'লে জ্ব'লে উঠছে, আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে শূন্যে। দূরে ব'লে নীচের আগুন দেখা যাচ্ছে না, চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ধোঁয়া সোজা ঊর্ধ্বে উঠছে। কুতূহলী হ'য়ে চেয়ে আছি, আমার প্রথম মুহূর্তে একবার নীচের আগুন দেখব। যেখানে যেখানে তীক্ষ্ণচোখে চেয়ে আছি, তার আশে পাশে লাফিয়ে উঠছে ধোঁয়ার স্তম্ভ, তালগাছ সমান উঁচু মনে হচ্ছে। দূরে, বাস্তবে তাই আরও উঁচুও হ'তে পারে। চেষ্টা ক'রেও আমার আগুন দেখা হচ্ছে না। চক্রাকারে আবর্তিত ধোঁয়া উঠছে, দেখছি। আরও দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ ক'রেছি। কিছুটা নিকটে যখন উঠল, বুঝলাম এটা ঘূর্ণী ধুলো। পাক খেয়ে খেয়ে সোজা উঠে দাঁড়াচ্ছে মাথা তুলে কিছুক্ষণ, তারপর কোন দিকে সরটা চ'লছে। চ'লতে চ'লতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঘূর্ণী ছোট ছোট দেখেছিলাম। ছোট বেলায় একে ঘূর্ণী-ভূত ব'লে ভয় ক'রতাম। এখনও ভয় হচ্ছে। এত বড়, এর মধ্যে প'ড়ে শ্বাসরোধ হ'য়ে না যায় ধুলোয়! ভেবে নিলাম নাক-মুখ কাপড়ে ঢেকে নেব।

এই পরিবেশে, মধ্য দিনের এই উত্তাপে বোলানের দল পুড়তে পুড়তে ধূলার ঘূর্ণীর মধ্যে দিয়ে চলেছে, দেখছি।

কিন্তু এরা কি পুড়ছে না? গাজনে বুড়ো শিবতলায় এরা ফুলখেলে, সূর্যতাপে এদের কি ক'রবে? কাঠ পুড়িয়ে জলন্ত কয়লাগুলোর আগুন হাতে ধরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা, তার ওপর দিয়ে হাঁটা হ'ল এদের ফুলখেলা। বোলান গাজনেরই অংশ, আকৃতিক উৎপত্তি। চৈতের গাজন কৃচ্ছ্র সাধনের পরব।

হাজরাপোতার সীমানায় এসে গেছি। ছোট প্যাণ্ট মাত্র প'রে দশ বছরের একটা মেয়ে, দেখলাম, দশ হাত আঁকশি নিয়ে আম তলায়-তলায় ঘুরছে, পেছনে একজন ক্ষুদ্রতর সঙ্গিনী ফিরছে।

আমারও পেছনে আর একটা বোলানের দল মাঠ পেরিয়ে আসছে,—লাল প্যাণ্ট, গেঞ্জিপরা, হাতে তীর-ধনু

মাথায় পাখির পালক। সব দলটা টলছে, মাতাল। দুজনে দুজনে কহুইতে কহুইতে ধরাধরি করে হাঁটছে। মূল-দলটিকে পেছনে রেখে তিনটি ছেলে একক বিক্ষিপ্তভাবে টলতে টলতে তিন দিক দিয়ে গ্রামে ঢুকছে। আঁকশি নাড়িয়ে নির্ভয়ে মেয়েটি দেখছে, তার পাশ দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে গাছের কাঁটাবেড়া অগ্রাহ্য ক'রে একের এক জন বাড়ির উঠনে ঢুকল, এবং ওদিকের বেড়া টপ্‌কে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি তখন বললে, "বুনো শুয়োর, ঘুরে যেতে জানিস্ নে।"

এত দীর্ঘ সময় মাঠ-পান, হাঁটা, রাত জাগা, রোদে পোড়া, নেশা না ক'রে এরা পারে না। এ দলটি পনের মাইল ঘুরের। এরা কিন্তু সোজা রাস্তায় কখন আসে না। ঘুরে ঘুরে শিবস্থানগুলোয় পৌছন এদের চলার লক্ষ্য থাকে।

এতক্ষণে আমি হাজরাপোতায় এসে একটা আশ্রয় লাভ ক'রেছি। আমার আশ্রয় দাতা বন্ধু শ্রীযুধীর ঘোষাল। কিন্তু স্নান খাওয়া, আতিথেয়তা এখন কে চায়? ঐ দলটি যে হাজরাপোতার গাজনতলায় নাচছে, সেখানে ছুটতে চাই। বোলানের নাচগানের একটা কেন্দ্রে এসে গেছি।

বোলান গীতি-নৃত্যোৎসবের কেন্দ্র

বোলানের একটা কেন্দ্র ব'লে হাজরাপোতা গ্রামের আমি কোন বিশেষ মাহাত্ম্য ঘোষণা করি নি। এ অঞ্চলটাই বোলানের। পার্শ্ববর্তী কাঁড়ালিয়া, পাঁচপোতা, হিজুলি, বালিডাঙ্গা, অন্নরামপুর প্রভৃতি সব গ্রামেই বোলানের দল আছে।

বোলান প্রচলিত আছে অতি অল্প-বিস্তৃত অংশে। এই মেটিবি-কাটোয়ার গঙ্গানদীর বাম-দক্ষিণ উভয় তট দিয়ে বিস্তৃত হ'য়ে উজান-তাঁটির দিকে মাত্র কিছু দূর পর্যন্ত। এই এলাকাটি বর্ধমান, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ এই তিনটি জেলার সংযোগ-সীমান্তবর্তী। যেমন মুর্শিদাবাদের সালার, দালু, পাঁচথুপি, জজান, কাঁদি, রেজিনগর, শক্তিপুর, বাহুরা, খেড়ডাঙ্গা, চেঁয়া-বস্তিপুর ইত্যাদি। নদীয়ার মেটিবি, কাঁড়ালিয়া, দেবগ্রাম, পাগলাই-চণ্ডী, কালীগঞ্জ, পলাশি, পলাশিপাড়া, ভাজনঘাট, কাদখালি নতিপোতা, সুজাপুর, ধপাড়া, কুলবেড়ে, মাণিক্যাডিহি, নাকাশিপাড়া, বীরপুর ইত্যাদি। বর্ধমানের কাটোয়া, মৌগ্রাম, কাশটপুর, কেতু-গ্রাম, বিল্বেশ্বর, শ্রীখণ্ড, দইহে-বর্শিতলা, পাঁচনদি, গঙ্গাটিকুরি দাঁইহাট, পাটুলি ইত্যাদি। এই তিনটির কোন জেলার সংযোগ-সীমান্তে বোলানের প্রচলন নেই।

সংকীর্ণ অংচলে হ'লেও বোলান এখনও প্রবলভাবে প্রচলিত আছে। বছরে একবার মাত্র গাজনের সময়ে চৈত্রশেষের মাত্র কয়েকটা দিন বোলান-উৎসব চলে। ১লা বৈশাখ আর এর কোন চিহ্নই থাকতে দেখিনি।

বোলান-পাঁচালি

হাজরাপোতার গাজনতলায় এখনও গান চলেছে,—এটা গানের শেষাংশ—

"কলির ব্রাহ্মণের ছেলে,
শহরে শিক্ষা পেলে,
ষষ্ঠী পূজায় ডাকতে গেলে
করে অস্বীকার।
ধুয়া। ভবের হাটে বিচার চমৎকার।"

কলিকাতায় আই-এ প'ড়ছিল গ্রামের ব্রাহ্মণদের একটি ছেলে। সে তখন বাড়িতে এসেছিল, একজনের ষষ্ঠী-পূজোয় ডাকতে গেলে আসে নি, গ্রামে থাকতে আগে সে পূজোই করত। সেই ছেলেটিকে নাম না ক'রে এ-গানে যে নিন্দা করা হ'ল গ্রামবাসী কারো বুঝতে তা বাকি রইল না।

দলের দশ-বার জন ধুলোয় ব'সে আছে। তার মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে একক কণ্ঠে অঙ্গভঙ্গী দিয়ে ভাব প্রকাশ ক'রে গাইছে। আর এক জন মাত্র দাঁড়িয়ে আছে দূরে, সে ঢুলি। সেও ন'ড়ে চ'ড়ে ঢোল বাজাচ্ছে। দলের আর সকলে উবু হ'য়ে যারা ব'সে আছে, মিলিত কণ্ঠে বার বার তারা ধুয়োটা গাইছে, জুড়ি বাজছে এদের দুজনের হাতে।

"দেশের মত বৈরাগী" যারা নিজেদের "গলে প্রেম-অনুরাগী" তাদের কু-ভাষায় গানে নিন্দা করা হল। আরও এমনি সব সামাজিক নিন্দার শেষে এল রাজনীতি—

"কার সম্পত্তি কে হরিলো,
হিন্দুস্থান-পাকিস্থান হ'লো,
হিংসা, লুণ্ঠন, গণ্ডগোল,
বিচার নাই তাহার।"

তারপরে

"কংগ্রেসকে ক'রে রাজা,
দেশের লোক পেলো সাজা।"

আর

"শুনা যায় ওদের ভারি,
রাখবে না জমিদারি।"

শেষে

"শুন ওহে বংশীধারী,
তুমি আমাদের কাণ্ডারী,
সম্মুখেতে বিপদভারি,
(করো) ভব নদী পার।
। ভবের হাটে বিচার চমৎকার।"

গানে সংবাদ ও সমালোচনা

শুধু গম্ভীরা গানে নয়, প্রায় সর্বত্র বাংলার আঞ্চলিক লোক সংগীতে এই দেশ, সমাজ ও ব্যক্তি-সমালোচনা আছে। কাটোয়ার শিক্ষিতরা, স্কুল-কলেজের ছেলেরা, বোলান শুনতে যায় না। তাদের সঙ্গে তর্ক করলে তারা বলে, "বোলানে যা তা কথা বলে, ও শুধু পরনিন্দা"। তারা বোলানের সব পরিচয়টা জানে না। কাটোয়ার পোষ্ট অফিস পাড়ার এক বৃদ্ধা বললেন,—"ও শুধু খিটকাল, কি শুনবে বাবা, ও ভাল নয়।" আমি বললাম, "বোলানের পালাটা তো কিছু খারাপ নয়। বোলানের শেষে আপনারা পাঁচালি শুনতে চান, তাতে কখন কখন খিটকাল

৩০শে চৈত্র ১৩৪৯, ফরিদপুরের গাজনতলায় শ্রীজগন্নাথ দে বোলান-পাঁচালি গাইছে

এরা শ্রীকৃষ্ণের "বংশীহরণ" পালা গেয়ে শেষ করেছে। বোলান পালার শেষে এরা এটা পাঁচালি গাইল। সময় পেলে বোলানের শেষে দু-চারটে এইরকম পাঁচালি গাওয়ার রীতি আছে।

সব শেষে তণিতা আছে,—

"এবার কি হবে না হবে,
বিশ্বাস কিছুই নাই এ ভবে,
বলরাম বলছে ভেবে,
(হরির) চরণ করো সবে।
। ভবের হাটে বিচার চমৎকার।
আপন বলতে কিছু নাই আমার।

থাকে। তা না হ'লে জমে না। বোলান গেয়ে শেষে ওর একটু হাসিয়ে কৌতুক করে যায়। তাতে খিটকালও থাকতে পারে।

কোন বিধবার কোন চুক্তি ঘটলে, কোন সমাজনেতা কিছু অন্যায় ক'রে থাকলে, সিনেমা দেখতে গিয়ে কোন মহিলা কারো কাছে পান নিয়ে খেলে, এই সব নিন্দা নাম না ধ'রে এরা গানে বুঝিয়ে দিয়ে যায়।

ভাগর একটি আইবুড় মেয়ের নাম না ক'রে গানে নিন্দা করায় এক জেলের ছেলেকে মাছ ধরতে ডেকে এনে সেই মেয়ের অভিভাবকরা খুব ঘেরেছিল।

বোলানে বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ খুব কমই থাকে।

বৃদ্ধা স্মৃতি থেকে খিটকাল যা বললেন,

"বুড়ো শ্বশুর বলে মাগো,
আর একটু দাও চচ্চড়ি।
মুখ ঝামটা দিলে বউ
দাঁতে দাঁতে কড়-কড়ি।
বউ খাবে তিন তপ্ত,
শাশুর মাছের ঝোল।
আর মা খাবে ভিজে শাস্ত
তাতে ট্যাঙা ঘোল।
মা শোবে ছেঁড়া মাদুরে,
তাতে কইয়ের মাটি।
বউ থাকবে ছাপ্পর খাটে
তাতে শেতল পাটি।"

[ট্যাঙা—টক। ছাপ্পর খাট—মশারী খাটাবার চাল-যুক্ত খাট।
"ছাপ্পর ছাড়া ঘর, লক্ষ্মীছাড়া নর" দ্রাষ্টব্য।]

এটা বোধ হয় কারো ব্যক্তিগত সমালোচনাই নয়। বৃদ্ধা আর একটা বললেন,

"মামীমাকে বাইরে শুতে মানা।
বাবরি কাটা মিন্‌সে কটা করছে আনাগোনা।"

এ এক ভিন্ন শ্রেণীর গান, এখন লুপ্তপ্রায়। এর বিষয়ে কোন পরবর্তী সংখ্যায় আমি কিছু বলব।

মনে প'ড়ে যাচ্ছে, বাংলার পশ্চিম সীমান্তে জলেশ্বরী তীরে দুপুরে মাঠে একজন বাগালকে গলা ছেড়ে গাইতে শুনেছিলাম ঝুমুরের সুরে,—

"কনের মাকে পিঁড়ায় শুতে মানা।
লেজ কাটা নেকড়াটা করছে আনাগনা।"

এই বাগাল্যা গানটি এই দুটুই, দু-চরণে সমাপ্ত। "লেজ-কাটা নেকড়া"—অনেক ইংগিতময়, অর্থপূর্ণ।

প্রথম উদ্ধৃতিটি কিন্তু নিশ্চয়ই একটা দীর্ঘ গানের দু'ছত্র, সেটি হবে বাবু গান।

[পরবর্তী আলোচনা "রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা"র (১৩৭০ বৈশাখ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।]

স্বরূপে নদীর ঢেউ

কুমকুম দে

মাঝে মাঝে নদী হই, সমুদ্রের দূর আহ্বানে
আমাকে আকুল করে অতি দূরে বাতাসের স্বর
পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেঁপে ওঠে ঝড়ের বিষাণ
নাবিকের নীল নেশা রক্তে নাচে শলাকুক ঝড়।

নৌকা ভেঙে গেছে তবু হতাশাস ঘেরেনি আমায়
তীরের উজ্জ্বল রেখা মাঝে মাঝে দেয় হাতছানি
উপকূল কাছে এলে—এই কূলে কে আর থামায়
সুতরাং বেয়ে চলি, এ বন্দর নয় রাজধানী!

সাগরে ফিরবো বলে, মনে প্রাণে নদী হতে চাই
অথচ মোহনা-ক্ষেত্রে, গতি স্থির অনাসক্ত মনে
নির্জিত আবেগগুলি এতকাল পালিত বৃথাই
বৈরাগী হৃদয়ে যেন, একতারা বাজে সঙ্গোপনে।

রাতের চিন্তা

সুস্মিতা সান্যাল

সেদিন রাতে শুতে এসে অতীত জীবনটাকে মনে করে নিজের মনেই হাসলো দীপ্তা। দীপ্তা মল্লিক—সকলের শ্রদ্ধেয়া "নিবেদিতা নিকেতনের" প্রতিষ্ঠাত্রী আর এই স্কুল হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। সবাই হাসি খুশী আর আনন্দে মশগুল এই দীপ্তা। বেশ আছে দীপ্তা—সত্যিই বেশ আছে, এই স্কুল, এই হোস্টেল, কচি কচি ছেলে মেয়ে আর দুই বোনের দুই ছেলে মেয়ে সুপ্তা আর জয়দীপকে নিয়ে। জয়দীপ তো শুধু মা-মণি বলতে অজ্ঞান, রাত্রে হোস্টেলে তার নিজের ঘরে জয়দীপ ও সুপ্তাকে দুপাশে নিয়ে শোয় দীপ্তা। ওদের দু বছর বয়স থেকে মানুষ করেছে দীপ্তা। বোনেরা তার অনুগত—তাই একদিন দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে এসে বলে—"দিদি, তোর আদর্শে তোরই মত করে এদের মানুষ করিস।" সেই থেকেই রয়ে গেছে ওরা; মাঝে মাঝে যায় ওরা মায়ের কাছে, ভগ্নীপতিরাও আসেন দীপ্তার কাছে। শ্রদ্ধা ভক্তি করে যথেষ্ট। কাজেই দীপ্তার নির্মল আনন্দ ছাড়া দুঃখ কোথায়?

অল্প বয়সে বন্ধুরা ভয় দেখিয়েছিল—"বিয়ে না করে থাকতে পারবিনা তুই, বেশী বয়সে হলে খিটখিটে হয়ে যাবি—পরকে যতই ভালবাস তারা কেউ কোনদিন আপন হবেনা। এই সব। কিন্তু ও বিশ্বাস করেনি—নিজের মতকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এবং পেরেওছে শেষ পর্যন্ত।

প্রথম জীবনে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল দু একটা আর এসেছিল সুধীশ। সুধীশ ছিল সুশ্রী চেহারার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সরকারের একটা বেতন আর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী। এই সরকারের বেতনকে তুলিয়ে দিয়ে সুধীশকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করল দীপ্তা আর বোঝালো, "তোমার কর্মের মধ্যেই দীপ্তা বেঁচে থাকলো সুধীশ, ঘরের আলো নাইবা জ্বালালো—মনের আলো চিরকাল জ্বলবে শাশ্বত হয়ে।" তাই সুধীশ কর্মস্থানে প্রবেশ করে কিছুদিন বাদেই ঘরের আলো জ্বালতে গৃহিণীকে নিয়ে সংসার পাতলো। দীপ্তার মনে যে কতখানি জুড়ে রইল সেটুকু ভাববার অবকাশ আর রইল না। এই ভাবে সুধীশ বিদায় নিয়ে সরে দাঁড়াল। দীপ্তা তার সেই আবেগময় মন নিয়ে জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। না—দীপ্তার কোন অনুযোগ-অভিযোগ ছিল না সুধীশের কাছে।

তারপর? তারপর কতদিন কেটে গেছে। দীপ্তা কোথায় বেঁধে কাজে লাগলো। ছোট্ট পাঠশালা "নিবেদিতা নিকেতন" বিরাট অট্টালিকায় পরিণত হলো। পাশে হোস্টেল হলো। নতুন নতুন ডিগ্রী নিয়ে নতুন নতুন টীচার আসা যাওয়া করলো। আর দীপ্তা রইল সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে আর সবাইকে স্নেহ ভালবাসায় ঘিরে। এখানে এসে কোন টীচার আর সহজে যেতে চায়না দীপ্তাকে ছেড়ে তবে যে কয়েকজন গিয়েছে তারা সবাই বিয়ে করে গিয়েছে। তারপর বিয়ে হলো দুই বোনের মুক্তা আর মানসীর। তাদের দুই ছেলে মেয়ের নামকরণও করলো দীপ্তা। সুপ্তা আর জয়দীপ। ফুলের মত সুন্দর দুটি ভাইবোন। ক্লাশে ওরা ফার্ষ্ট হয় স্বভাবটিও তারী মিষ্টি—তাই সবাই ভালবাসে ওদের। সঙ্গে সঙ্গে গর্বে দীপ্তার বুক ভরে ওঠে।

দীপ্তা আবার ভাবে, স্বাভাবিকভাবে আর অতি সাধারণভাবে বিয়ে করে আর একটা সংসারের ভার ঘাড়ে নিয়ে কিই বা লাভ হতো তার। দু-চার বছর যেতে না যেতেই অভাব অনটন আর সাংসারিক অশান্তিতে নিষ্পেষিত হতে হতো আর তার মনের যে এই একটা গ'ড়ে তোলার মধুর স্বপ্ন তা একেবারে কোন অতলে তলিয়ে যেত। এসব ভাবতে বেশ লাগে দীপ্তার যে সব বন্ধুরা তাকে সংসার করতে বলেছিল তারাই এখন আক্ষেপ করে মরে, মনে মনে হিংসা করে আর সামনে বলে—"বেশ আছিস ভাই, ঝামেলা নেই।"

দীপ্তা ওদের বলে—"হুঁ, নেই বই কি? বোনের দুটো কি তিনটে আর আমার দু-দো ছেলেমেয়ে! প্রত্যেকের দায়দায়িত্ব আমার।" তবু খুশীর হাসি হাসে। এই তো ও চেয়েছিল। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের মুখে হাসি—অনুযোগ যেখানে ঘা খায় আর একান্তভাবে দীপ্তার ওপর নির্ভরশীলতা। দীপ্তাকে ওরা কেউ 'দিদিমণি বা বড়দি' বলে না, বলে—"মা-মণি"। হ্যাঁ, এই ছোট্ট ফুলের মত চাঁদের হাটে গভীর আনন্দ নিয়ে বেঁচে আছে দীপ্তা মল্লিক, থাকবেও। আলোটা নিবিয়ে পায়ের কাছের চাদরটা অগোছালো ভাবে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লো দীপ্তা। ঘুমের ঘোরে সুপ্তার নরম হাতটা দীপ্তার গলা জড়িয়ে রইল।

বাংলা ও বাঙ্গালী

স্বামী সদানন্দ

জাতীয় সম্পদে সমৃদ্ধ বাঙ্গালী হিন্দুজাতি আজ নানা সমস্যায় সমাচ্ছন্ন হইয়া তাহার জাতীয় গৌরব বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে। বিপদের কৃষ্ণমেঘ তাহাকে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই সমূহ বিপদ হইতে বাঙ্গালী হিন্দুকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে তাহার অতীত জাতীয় জীবনের গৌরব-গাথা শয়নে স্বপনে অনুধ্যান করিয়া লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

বাংলা দেশ অতি প্রাচীন দেশ। বঙ্গরাজ পৌণ্ড্র বাসুদেব, কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রামে যোগদান করিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সেই স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙ্গালী জাতি একাধারে সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সর্ব ক্ষেত্রেই বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়া আসিয়াছে।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় সকল জাতির মধ্যেই সময় সময় বহু মনীষী আবির্ভূত হইয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোকে অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হইয়া জাতীয়জীবনে প্রাণবন্ত নূতন নূতন তথ্য, নূতন নূতন ভাবধারা সৃষ্টি করিয়া জাতিকে সমৃদ্ধ করিয়া জগৎ বাসীর সেবায় তাহা দান করিয়া যান। বঙ্গ সন্তানের বেলায় এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বঙ্গদেশে যুগ যুগে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সর্ব ক্ষেত্রে বহু দেশ বরেণ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন একথা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গলার অতীত ইতিহাস বাঙ্গালী জাতীকে গৌরব মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। এমন একদিন ছিল যখন বাঙ্গালীর বাহুবল ভারত ও বহির্ভারতকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালী রাজগণ অনেকে এক সময়ে উত্তরভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পালবংশীয় দেবপাল দেব ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছিলেন। বঙ্গরাজ লক্ষ্মণ সেন, বারাণসী, প্রয়াগ, ও শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। যে জাতীর জয়পতাকা হিমালয়ের পাদদেশে, যমুনা তটে, সাগরকূলে সিংহলে, যবদ্বীপে, বলিদ্বীপে উড্ডিত সে জাতিকে ছোট করিয়া দেখিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগর ময়।"
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গড়িল উপনিবেশ।

কবির এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

রাঢ়া সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করিয়া পুরুষানুক্রমে ঐ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সিংহবংশের নামানুসারে লঙ্কার অপর নাম সিংহল। বাঙ্গালী বহুকাল ধরিয়া বাহুবলের বিশেষ পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। মুসলমানগণ তিন শত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জয় করিতে পারে নাই। কালিদাস রাজা রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনাকালে বাঙ্গালীর জলযুদ্ধের তৎপরতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

সামরিক প্রয়োজনে বাঙ্গালী জাতি যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্রের নির্মাণ-কৌশল আয়ত্ব করিয়াছিল তাহা বিশেষ শক্তিশালী কামানরূপে ব্যবহৃত হইত। বিষ্ণুপুরের দলমর্দন কামান এবং প্রতাপাদিত্যের কালে যা কামান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যে বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতিকুলের অজেয় প্রতাপে শত্রুকুল সদা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত—যে শূর বংশীয়, পাল-

বংশীয় ও সেন-বংশীয় নরপতিদিগের বীরত্ব ও গৌরব-গাথা কিংবদন্তীরূপে দেশে দেশে প্রচারিত হইত—যে বৃদ্ধ বিশারদ মোহনলাল, দেনাহাটী, জানকী রায় প্রভৃতি সেনাপতিগণের দুর্ধর্ষ রণনীতি সমগ্র দেশকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া রাখিত আজ সে বাঙ্গালী জাতি কোথায়?

অতীতকালে বাঙ্গালী জাতি অধ্যাত্মজগতেও বিশেষ ভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধ দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান অতীশ তাঁহার সমসাময়িক বহু বাঙ্গালী মনীষীর একজন।

বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিয়া গিরি তুষার তুষ্কর।

জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই বাঙ্গালার সন্তান। এই বাংলাদেশেই একদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সাধক কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণের ন্যায় ভক্ত সাধক—

চণ্ডীদাস আর রামপ্রসাদের সুর কোথায় বাজেরে।

সেই আমাদের বাঙ্গলাদেশ আমাদেরই বাঙ্গলা রে।

এই বাঙ্গলার মাটিতে অতিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব গোস্বামীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অসাধারণ মনীষার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বেও কবি বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকগণ বাংলা সাহিত্যে নূতন নূতন ভাবধারা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগৎবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এই সমস্ত বাংলা দেশে বহু মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু জড় বিজ্ঞান জগতে যুগান্তরের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, একথা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ভাল ভাবে জানা আছেন।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বঙ্গমাতার বহু দেশপ্রেমিক কৃতী সন্তান তাঁদের অমূল্য জীবন দান করিয়া গিয়াছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রেমিক শ্যামাপ্রসাদ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সূর্যসেন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গমাতার দান সর্বাপেক্ষা অধিক একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে, বঙ্গসন্তান আজ তার অধিকার হইতে বঞ্চিত! বঙ্গমাতা আজ দ্বিধা বিভক্তা। আজ ছলে, বলে, কৌশলে বাংলার সহস্র সহস্র হিন্দু সন্তান বলি প্রদত্ত হইতেছে। আজ বাংলার এমন কোন সুসন্তান নেই যে বাঙ্গালীকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। বাঙ্গালী হিন্দু জাতির উপর বিধাতার কোপদৃষ্টি করে প্রশমিত হবে কে জানে?

আজ এই সমূহ বিপদ হইতে বাঙ্গালী হিন্দুকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ভেদ-বিভেদ, অনৈক্য, পার্থক্য, দলাদলি ভুলিয়া সর্ব শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে মিলনের মধুচক্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। মুসলমানের মধ্যে জাতীয় স্বার্থবোধ যেরূপ উগ্র হিন্দুর জাতীয় বিপদে সমগ্র হিন্দুকে তদ্রূপ উগ্র হইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলিতে হয়—

"Hinduism must be aggressive and Hindu a little fanatic."

অর্থাৎ হিন্দুকে আজ আত্মপ্রচারশীল ও একটু গোঁড়া হইতে হইবে। জীবনযুদ্ধে দুর্বলের পরাজয়, সবলের জয়লাভ ঘটিয়া থাকে। Survival of the fittest. জীবন সংগ্রামের এই নিদারুণ সত্য যেমন বৈজ্ঞানিক তেমন ধার্মিক জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনসংগ্রামে যেখানে শুদ্ধ, মৃত্যুর ত্রাস ভ্রূকুটি সেখানে প্রকট; সংগ্রামে চাই শক্তি, জীবন সংগ্রামে শুধু শক্তির খেলাই চলিতেছে। এই বিশ্বজগতে অণুপরমাণু থেকে বিরাট গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত সকলের মধ্যে এই শক্তির খেলা চলিতেছে। শক্তিশূন্য হইলে সে জগতে টিকিয়া থাকিতে পারে না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ": দুর্বল ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করিতে সক্ষম হয় না। আজ বাঙ্গালী হিন্দুর এই সঙ্কট মুহূর্তে প্রত্যেক হিন্দুকে এই শক্তির কথা চিন্তা করিতে হইবে। হিন্দু জাতির মধ্যে এই শক্তি জাগরিত করিতে হইলে প্রথমে চাই হিন্দু জাতির মধ্যে একতা আনয়ন। হিন্দুর জাতির জীবনে শক্তি আনয়ন করিবে কে? আজ যারা অন্ত্যজ আখ্যায় আখ্যায়িত তারাই হিন্দু-জাতির মেরুদণ্ড। আজ ইহাদের উন্নতি-অভ্যুদয়ের উপরই সমগ্র হিন্দুজনসাধারণের মান-সম্ভ্রমের, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর

করিতেছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তখনই মিত্রতা সম্ভব হইবে যখন হিন্দু-মুসলমানের ন্যায় সবল ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চলিতে পারিবে। তাই যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—"মিলন হয় সমানে সমানে, সবলে দুর্বলে মিলন হয় না।" তাই আজ বাঙ্গালী হিন্দুকে তাহার মান ইজ্জত রক্ষা করিবার জন্য সবল ও শক্তিশালী হইতে হইবে। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া জাতির স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে হইবে। বৃহৎ স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ। সুগঠিত সঙ্ঘবদ্ধ সমাজের ব্যক্তিরা দূর দূরান্তরে নির্ভীকভাবে চলিতে সক্ষম হয়। কারণ, তাহারা জানে কোন দুষ্ট দুর্বৃত্ত তাহাদের আঘাত করিলে তাহার সমগ্র সুগঠিত সমাজশক্তি তাহাকে রক্ষা করিবে। আচার্যদেব অন্তর্দৃষ্টিবলে হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়া হিন্দুর আত্মরক্ষার জন্য শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে হিন্দু মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত মিলন-মন্দিরের মাধ্যমে সর্ব শ্রেণীর হিন্দুরা মিলিত হইয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের আলোচনা এবং বিপদ-আপদে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হয়। এখানে আচার্যদেবের হিন্দু-সংগঠনের সিদ্ধান্তের একটু উদ্ধৃত করিলাম—"হিন্দুর বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, ধন-সম্পত্তি কাহারও অপেক্ষা কম নহে, এমন কি ব্যক্তিগত শক্তিসামর্থ্যও তার যথেষ্ট আছে। কিন্তু নাই কোন সংহতি শক্তি। একমাত্র সংহতি শক্তির অভাবেই হিন্দু আজ লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, আত্মরক্ষায় অক্ষম, দুর্বল অসহায় ও নিরাশ্রয়। তাই আজ এই সংহতি-সাধনাকে জাগ্রত করিয়া হিন্দু সমাজভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীগুলিকে ঐক্য, সখ্য, প্রেম, প্রীতির সূত্রে গ্রথিত করিয়া সমগ্র সমাজকে সবল শক্তিশালী ও আত্মরক্ষাক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। আজ বাঙ্গালী হিন্দুজাতি আচার্যদেবের এই অভয়বাণী যদি অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে তবে সে এই সমূহ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।

বাউল নৃত্য ও সঙ্গীত প্রসঙ্গে

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

বাউল নৃত্যের দুই ভাগ। নৃত্যভাগ ও নৃত্যাংশ ভাগ। যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে বাউলেরা নৃত্য করে, সে নৃত্য করে শুদ্ধ আঙ্গিকে। আর নৃত্য করে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে। সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন গূঢ় ভাবার্থ নৃত্যছন্দে, ভঙ্গিতে, রেখা-ব্যঞ্জনায় রূপদান করাই নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। সে ক্ষেত্রে নৃত্য আঙ্গিক গৌণ, অনুসরণ মাত্র। সঙ্গীতের ভাবসম্পদ অঙ্গভঙ্গিতে ব্যক্ত করাই নৃত্যের উদ্দেশ্য।

গানের প্রথম কলি গাইবার পরে যে বিরতি, সেই বিরতিতে বাদ্যহীন শুদ্ধ নৃত্য আঙ্গিকে চলে নৃত্য। নৃত্যের উদ্দেশ্য ক্লান্তি অপনোদন ও বিভিন্ন বিচিত্র অঙ্গকর্মে নৃত্যকেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। নৃত্য চলে শুধু যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে—নৃত্য। নৃত্য শেষ হলে, পুনরায় শুরু করে কণ্ঠসঙ্গীত। সঙ্গে সঙ্গে তালের ভাবার্থের অভিনয়—নানা হস্তকল্প সমাযোগে। "চক্রভ্রমরী", মৃগীগতি ও বিবিধ নৃত্যাঙ্গের প্রয়োগও দৃষ্ট হয় নৃত্যাংগে—, রসাত্মক অভিনয় ব্যঞ্জনাই বাউলদের নৃত্যাংশ—নৃত্যে কণ্ঠসঙ্গীত অপরিহার্য। বাউলদের সঙ্গীত রচিত নানা ভাব নিয়ে। আছে বাউলদের দেহতত্ত্বের গান, আছে গুরুবাদের গান, আছে অনিত্যভাব গান, আছে সাধন রহস্যের গান, রচিত স্বর্থক ভাষায় ও স্বর্থক ভাবে। গানের কথার উপরে থাকে এক ভাব, প্রচ্ছন্ন থাকে অন্য ভাব। থাকে ভব কথা,

থাকে সাধন রহস্যের ইঙ্গিত—হেঁয়ালী কথায় যেমন বাউল গানে আছে—

"জলের ভিতর অন্ধে বাতি,
হয় পুরুষ গর্ভবতী
সতী হয়েছে নটী —বুঝতে লাগে চমৎকার—"

অর্থাৎ—চিদাকাশে পরমাত্মার বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের বিবেকরূপ পুত্র জন্মে, আর সতী অর্থাৎ কুল-কুণ্ডলিনীর, নৃত্য নটীর মত, নৃত্যছন্দে ঊর্ধ্বগাগতি সুরু হয়—সে ভাবই গানের কথায় প্রচ্ছন্ন আছে।

এ ধরণের গানের মর্মার্থ শুধু সাধকদেরই বোধগম্য হয়। তাদের গানের কথায় আছে—

"কথা শুনতে চমৎকার—
সাধক বিনে বুঝতে পারে এমন সাধ্য কার,—
কথা যে বুঝেছে, সেই মজেছে,
গিয়াছে সে বেদের পার!"

কণ্ঠসঙ্গীতের ভাষা আঞ্চলিক ভাষা। সুর উদাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাউল সুর, ভাটিয়াল সুর নয়, রামপ্রসাদী সুর নয়, কীর্তন সুর নয়, পাহাড়ী মাল্‌স, পিলু, ভৈরবী সুরের প্রচ্ছন্নভাব থাকলেও সুরের স্বকীয়তায় বাউল সুর বাউলদেরই সুর।

নৃত্যে ও নৃত্যে বাউলেরা প্রথানুসারী নৃত্যরূপ ও নৃত্যরাগবন্ধের গতানুগতিক পুনরাবৃত্তির বিরোধী। ভাবের আবেগে প্রতিমুহূর্তে বাউল নৃত্যভঙ্গী ও রেখাপ্রবাহ সৃষ্টি করে। একই ভাবের গান, বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ভঙ্গীতেও নৃত্য করে। নৃত্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাব প্রকাশের মাধ্যম, বাহন মাত্র। ভাব ও রস অনুযায়ী নৃত্য চলে।

জমায়েতে স্ব স্ব অনুভূতি ও উপলব্ধির বিষয় ও ভাবের আদান প্রদান করে বাউলেরা গানের মাধ্যমে, প্রশ্ন উত্তর ছলে—।

মেলার এক পার্শ্বে বৃক্ষতলে জমায়েত বসেছে হয়তো একজন বাউল গাইল,

দে মানুষ কোথায় পাবি?
খুঁজলে মানুষ কাছেই আছে।
সপ্ততাল ভেদ করিবে
সে যে হাওয়ার ঘরে বইসে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল অন্য একটি বাউল, তাও গানে। সে গান ধরল - গানের তাৎপর্য মানুষ বলে কারে? মানুষ কত প্রকারের? বলতো সহজ মানুষ কে?

পাশের বাড়িরে গাইল—গানে—উত্তরছলে—

মানুষ তিন প্রকার
১। প্রাকৃত সংস্কারসম্পন্ন মানুষ
২। অপ্রাকৃত অযোনিজাত মানুষ
৩। সর্বোপরি সহজ মানুষ

দেখা গেল গান শেষ না হতেই একটি বাউল আসছে পরণে তার শতচ্ছিন্ন আলখাল্লা একতারা নিয়ে নাচতে নাচতে। এসেই ধরল—গান—

"খোল বেহবিধি" পর শোলক উপর নিত্য মানুষ আছে।

সে যখন ধরজা খোলে
পবন হিল্লোল চলে
যে জন জানে ঘরে, মানুষ ধরে
দেখতে পায় সে, রূপের ঘরে
কে ফাঁদ পেতেছে।

বাউলদের ভাবব্যাখ্যান রীতিও অভিনব।

শর্ব্বরী

শ্রীযমুনা ঘোষ

ধরণীবাবু কন্যার সম্প্রদানকার্য্য সমাধান করিয়া আসনের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাত দুইটি ঊর্দ্ধগামী করিয়া আলস্য মোচনে কহিলেন, আঃ! বাঁচলুম! এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। আমার কাঁধ হতে একটি বোঝা নামল।

অমনি পাশ হইতে উত্তর হইল, কেন মশাই, আজ-কালকার মেয়ে কি এতই বোঝা হয়ে পড়ে যে আপনি অমন কথা বলছেন? জানেন, এটা গণতন্ত্রের যুগ। এখন সবলেই স্বাধীন।

ধরণীবাবু কহিলেন,—হাঁ মশাই আমরা সকলেই স্বাধীনই বটে! পেটে অন্ন নেই! পরণে বস্ত্র নেই। বাসের গৃহ নেই! আমরা স্বাধীন। তবে কি জানেন, মেয়েরা স্বাধীন হোক, শিক্ষিত হোক, তবু তাদের পিছনে একটি লঙ্গর থাকার বিশেষ প্রয়োজন হয়।

অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ ধরণীবাবুর শ্বশুর মহাশয় সেইখানে বসিয়া উভয়ের বাক্যালাপ শুনিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে নবদম্পতীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন,—না! না! ধরণী তুমি ঠিক কাজই করেছ। তুমি আজ পিতৃকর্ত্তব্য হতে মুক্ত হলে। স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী আবার কি? তার মানে পথে, পথে, রাস্তায়, বাস্তায় পুরুষদের সঙ্গে হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়ান, আর হাজতে বাস করা। এই তো স্বাধীনতা। দেশটা আজ এই করে উচ্ছৃঙ্খলতায় ডুবে যেতে বসেছে। আমাদের আমলে যে আট-নয় বছরে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া হত সে অনেক সভ্য ছিল। এখানকার মত দব ধিঙ্গী হয়ে বেড়াতে পেত না।

পূর্ব্ব ভদ্রলোক উত্তর দিলেন,—আহা! দাদু! আপনি ভুল করছেন যে—তখন কি মেয়েরা পুরুষদের পাশে বসে চাকরী করত না ছুটে গিয়ে ট্রাম বাস ধরত? আপনাদের যুগ যে পালটে গেছে!

অমনি পুরুত মশাই বলেন,—কি করে হবে? তখন ছিল তিন টাকা চালের মণ। এখন সেটা চৌত্রিশ টাকা হয়েছে। তখন কাপড় ছিল দুই টাকা আড়াই টাকা, এখন সেটা বাইশ টাকা। তাহলেই বুঝে দেখুন, দিনকালের অবস্থা। মেয়েদের এখন বাধ্য হয়েই পথে বেরুতে হয়েছে। পুরুষদের পাশে বসে কাজ করতে হচ্ছে। আর বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একজনের উপার্জ্জনে আর সংসার চলে না।

এই সকল আলোচনার অংশ গ্রহণ না করিয়া ধরণী-বাবু ডাক দিলেন,—"কই গো—মেয়েজামাই তুলে নিয়ে যাও—

গো তখন মেয়েদের ভোজনপংক্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। অপর একটি মহিলা আসিয়া কন্যা-জামাতার হাত ধরিলেন। এবং একটি সুবেশা তরুণী কন্যার জারি হাতে বারি সিঞ্চনের দ্বারা শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দ্বিতলের একটি সজ্জিত সুবৃহৎ কক্ষে ফরাসের উপর বাড় মাজান হইয়াছিল এবং আমন্ত্রিত মহিলাদের সেই-খানেই সমাবেশ ঘটেছিল। তাহারই একদিকে লাল মখমলের গালিচা পাতিয়া জরির কাজ করা আটিনের তাকিয়া দিয়া বরকনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এবং দুইপাশে দুইটি গোলাপের তোড়ার সুমিষ্ট গন্ধে কক্ষটি ভরিয়া গিয়াছে। বরকনেকে আনিয়া সেইস্থানেই বসাইয়া দিয়া মহিলাটি অপর একটি তরুণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"সুনন্দা বরকনের জলখাবারটা নিয়ে আয় না মা—

বড় জ্যাঠাইমার মেয়ে সুনন্দা তখন হেমন্তিনী অধর্ম্মনীর সমবয়স্কদের সহিত হাসির লহরী তুলিয়া আনন্দে মাতোয়ারা

হইয়াছে। আনন্দের ফোয়ার বাধা পড়িল। সুনন্দা উঠিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রূপার থালায় জলখাবার হাতে এবং অপর হাতে রূপার গ্লাসে সরবতসহ সুনন্দা কক্ষে প্রবেশ করিল। কহিল,—কাকীমা ধরো—জলখাবার এনেছি।

কাকীমা তখন কন্যা জামাতাকে কড়ি খেলাইতে ব্যস্ত, উত্তর দিলেন, ধরি—হাত বলিয়া তিনি হাত বাড়াইলেন। নবদম্পতীর জলযোগ সম্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট মহিলাদের আহারের জন্য লইয়া চলিয়া যাইলেন।

এইবার শালিকা ও বন্ধুর দল ঘিরিয়া বসিল বরকনেকে লইয়া। প্রথমেই সুনন্দা প্রশ্ন করিল,—কনে পছন্দ হইয়াছে কিনা—

অমনি পাশ হইতে একটি বিদ্রোহী উত্তর দিল,—কেন জামাইবাবু তো কতবার এসেছেন, দিদিভাইকে দেখেছেন।

বান্ধবীর দল হাসিয়া উঠিল। কহিল,—শর্বরী তুই আজকাল ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলি কই আমরা তো কিছু জানতুম না—

শর্বরী উত্তর দিল,—'নারে,' তোরা ভুল করছিস, ডুবে ডুবে জল খাইনি আমি, ভেসেই জল খেয়েছি—

শর্বরীর বন্ধু রেবা কহিল, তা শর্বরী তুই একটা দেখালি বটে—

কৃষ্ণা কহিল, "জ্যোৎস্নার কি শর্বরীকে দেখে ঈর্ষা হচ্ছে নাকি ?

মোটেই না! ঈর্ষা হবে কেন ?

সুনন্দা কহিল,—না ভাই তোমরা যে যাই বলো, শর্বরীকে মানিয়েছে ভালো, যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী বলিয়া সে একটু মুচকিয়া হাসিল।

ঠিক সেই সময় বরের বন্ধুর দল কক্ষে প্রবেশ করিল ক্যামেরা হাতে। লহমার দল সকলেই সরিয়া দাঁড়াইল।

মৃগাঙ্ক বন্ধুদের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—বিয়ের সময় তোরা সব কোথায় গেছিলি—

আর বলিস কেন! ওবেলা যে ক্যামেরাটা এনেছে সেটা তখন গেল বিগড়ে। আবার তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিতে এলুম।

মৃগাঙ্ক হাসিয়া জিজ্ঞেস করলে—এই বার তাহলে ঠিক ছবি উঠবে তো ?

—সার্টেনলি! উঠবে না মানে—'

জ্যোতিষ কহিল, এবার উঠতেই হবে! তা না হলে আমাদের মান থাকবে না ভাই—বলিয়া তাহারা ছবি তোলা আরম্ভ করল।

শর্বরীর বন্ধু কৃষ্ণা বলে উঠলো অমন গুড্ মর্ডেল ক্যামেরা হাতে শিবমহলে প্রবেশের অনুমতিটা দিল কে—?"

—বাঃ! অনুমতির জন্য আবার অপেক্ষা করতে হবে নাকি ?" বন্ধুদল হাসিয়া উত্তর দিল।

—হ্যাঁ কি বললিলেন ? গুড্ মর্ডেল ক্যামেরা—জানেনা আজকাল আবার ওল্ড ষ্টেল যে ফিরে এসেছে। এই যে দেখুন না! আপনিই তার প্রমাণ।

কথাটা বলিয়াছিল কৃষ্ণা। সে পরিয়া আসিয়াছিল, একখানি বেগুনে রংএর বেনারসী এবং সোনার গহনা "সীতাহারের সেট"।

মৃগাঙ্ক তাহাদের বাক্যালাপে বাধা দিয়া কহিল,—নে ভাই! ছবিটা তুলে আমায় রেহাই দে ভাই—ধড্ড মাথাটা ধরেছে—

—হ্যাঁ! হ্যাঁ! দিচ্ছি! বলিয়া তাহারা ছবি তোলা-পর্ব সমাধা করিয়া বন্ধুকে লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

এইবার সকলে শর্বরীকে ঘিরিয়া ধরিল। বলনা ভাই শর্বরী এমন এ্যাপেল তুই কোথায় পেলি ? কত দিনে তোদের এমন পরিচয় হয়েছে—

শর্বরী উত্তর দিল,—তোরা কি পাগল হয়েছিস। পরিচয় হবে কি! আমার সম্বন্ধ করেই বাবা বিয়ে দিয়েছেন।

—তবে যে ফরবী বলে জামাইবাবু দু-তিনবার এসেছেন।

—তার মানে কি আলাপ করে বিয়ে করা। আমাকে পছন্দ করেই বিয়ে করেছেন। দু-তিনবার আমার অর্থ বন্ধুদের সঙ্গে করে আমায় দেখতে এসেছিলেন। আর জানিস তো—বাবা-মা আমায় কোথাও যেতে দেন না।

স্নিগ্ধা শর্বরীর কাকীমার মেয়ে একটু হাসিয়া জিজ্ঞেস করলে,—হ্যাঁরে শর্বরী, মৃগাঙ্কবাবু তোকে পছন্দ করলে—?

শর্বরী কোন উত্তরই দিল না। তাহার মাসিমার মেয়ে জিজ্ঞেস করলে,—হ্যাঁরে শর্বরী তোর বর কি কাজ করে—?

—ডাক্তারী পড়ে। শর্বরী উত্তর দিল—

এমন সময় শর্বরীর মা আসিয়া কন্যার পানে চাহিয়া কহিলেন,—শর্বরী রাত অনেকটা হয়ে গেছে, তুই একটু ঘুমিয়ে নে। সন্ধ্যে বেলা তোর অত অসুখ করেছিল। এখন একটু বিশ্রাম কর—আবার তো তোরেই নিয়ে যাবে তোকে—

স্নিগ্ধা জিজ্ঞেস করলে,—কেন আজ্ঞাইমা ভাত না খেয়েই বর কনে চলে যাবে—

—হ্যাঁ মা! ভাত না খেয়েই বরকনে যাবে—

উষার আভাসেই সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল, লাভটার গাড়ীতে বরকনে চলে যাবে একেবারে বারাসত। সেই খানেই তাহাদের যৌতাত হইবে। কারণ বরের মা দেশেই সব কাজ করিবেন। যাত্রার সময় উপস্থিত। সকলেই একে একে আশীর্বাদ পর্ব সমাপ্ত করিলেন। এইবার ধরণীবাবু কন্যাকে হাতে হাতে সমর্পণ করিতে উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই দুহিতার হিমকোমল করতল খানি ধরিয়া জামাতার হাতের উপর রাখিয়া আর কোন বাক্য স্ফুরণ করিতে পারিলেন না। কেবল নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া যাইলেন।

এইবার জননী আসিয়া জামাতার হাতটী ধরিয়া কহিলেন,—"বাবা বড় অভিমানী মেয়ে আমার, তুমি ওর সব দোষ ত্রুটী ক্ষমা করে ওকে দেখ! তুমি ওকে সুখী করো—! বলিতে বলিতে তিনি সেইখানেই সংজ্ঞালুপ্ত হইয়া পড়িলেন।

* * *

দেখিতে দেখিতে একটা বছর কাটিয়া গিয়াছে শর্বরীর বিবাহের।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা শর্বরী জননীর কক্ষে নিভৃত অন্ধকারে একাকী শুইয়া আছে। জননী গিয়াছে ঠাকুর বাড়ী পাঠ শুনিতে। ছোট বোন করবী বন্ধুর বাড়ী পড়িতে গিয়াছে। শর্বরীর মনটি আজ সারাদিনই বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। তাহার কেবলই মনে হইতেছে,—চিন্তা করিয়া ভাবিয়া কোন কাজেরই কূল পাওয়া যায় না। সে যে অনেক আশা লইয়াই ঘর বাঁধিতে গিয়াছিল। কিন্তু অলক্ষ্যে কোন একটি দুষ্ট গ্রহ আসিয়া তাহা চুরমার করিয়া ধূলিসাত করিয়া দিয়াছে। তাহার আজ সকল কথাই মনে পড়িতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই সকলের কতই না ঈর্ষা হইয়াছিল। কন্যা তো বলেই মেয়ে জ্যোৎস্নার শর্বরীকে দেখে ঈর্ষা হচ্ছে নাকি! তারপর প্রথম শ্বশুর বাড়ী পদার্পণেই শাশুড়ী বলিয়া দিলেন,—বধূ নাকি তাঁহার একটুও পছন্দ হয় নাই। যখন ওপাড়ার হরিদাসী আসিয়া বলিল,—"দিদি তোমার অমন রূপেগুণে ছেলে, তা তুমি এমন বউ করলে কেন? মেয়ের বাবা বুঝি তোমায় অনেক টাকা দিয়েছে!

তখন শাশুড়ী তাহাকে উত্তর দিয়েছিল, পোড়ার দশা আর কি! কি বলবে দিদি, মেয়ের বাবা আমায় অনেক টাকা দিয়েছে। তবে বলি শোন মেয়ের বাবা একটি কানা কড়িও দেয়নি।

দুলালের মা কহিল,—"তবে এমন কালো বউ করলে কেন? তোমার আর মেয়ে জে টেনি? সে একটু স্পষ্ট-বক্তা মানুষ ছিল। তাই একটু থামিয়া আবার বলিল,—তা তাই দিদি যা বলব, তোমার ঠিক যেন চাঁদকে রাহু গ্রাস করেছে। তুমি যেন কিছু মনে করো না ভাই—"

শাশুড়ী নির্মলাসুন্দরী উত্তর দিয়াছিলেন, মনে করব আমি! আমার কি বউ পছন্দ হয়েছে? তাই তো আমি মৃগাঙ্ককে বলুম, "হ্যাঁরে মৃগু, তুই কি আর মেয়ে পেলি না! এমন কালো বউ করলি কি বলে! সে আমার উত্তর দিলে কি জান দিদি—আমায় বলে সে ভালোই বা কালো। তোমার কাছে থাকবে, কাজ কর্ম করবে, কি হবে আমার সুন্দরে। আর তার প্রয়োজনই বা কি? আমি তো থাকব দেশেই।

হরিদাসী উত্তর দিলে, "তা সত্যি দিদি! যে নিয়ে ঘর করবে, যার জিনিষ তার পছন্দ হলেই হলো। সে যখন আনন্দ করে, আদর যত্ন করে নিয়েছে, তখন তোমার আমার অপছন্দতে কি হবে!

নির্মলা কহিল আমি তো আমার ভালবাসার মেয়ের সঙ্গে কথা কইলুম! আর অমন সুন্দর মেয়ে মৃগুর উপযুক্ত—

দুলালের মা উত্তর দিল, তোমার কপালে আছে কালো বউ তুমি সুন্দর করতে চাইলেই বা পাবে কেন দিদি?

নির্মলা কপালে হাত চাপড়াইয়া কহিল "ভাগ্য! ভাই, আমার ভাগ্য! তা তুমি যা বলেছ দিদি! আমার কপালে যা আছে তাই তো আমি পাব।"

এই সমস্ত কথাই শর্বরীর কানে প্রবেশ করিয়াছিল। শরবিদ্ধ ভীতা হরিণীর মত তাহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। উঃ। ঠাকুর কেন তাহাকে মসীবর্ণ করিল। সে কি কোনদিনই শাশুড়ীর স্নেহ ভালবাসা পাইবে না! তাহার চোখ হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু স্বামী তো তাহাকে দেখিয়া, পছন্দ করিয়াই বিবাহ করিয়াছে! সে তাহার স্নেহ আলিঙ্গনও পাইয়াছে! এতটুকু ত্রুটি কোথাও হয় নাই। তবে কেন, কেন সে শাশুড়ীর মন পাইবে না! সে সকল রকম চেষ্টাই করিতে প্রস্তুত আছে, যাহাতে সে তাহার শঙ্কমাতার মনোরঞ্জন করিতে পারে। কিন্তু সবই প্রস্তরে বীজ নিক্ষিপ্ত হইল। অযথা ক্রোধন হইল। কোন ফলই সে পাইল না।

কিন্তু নির্মলার যে শুধু পছন্দ হয় নাই, তাহার মনে যে অশান্তির ঝড় অহোরাত্র প্রবাহিত হইত তাহা ক্রমে মৃগাঙ্কর কানে উঠিতে বাকী রহিল না। সে জননী বা পত্নীকে কোন কথাই না বলিয়া নির্লিপ্তের মত নিজের লেখাপড়া লইয়াই সময় কাটাইয়া দিত।

আনন্দ যে স্থান হতে লুপ্ত হয় অশান্তির খণ্ড কালো মেঘ আসিয়া সে স্থানে পুঞ্জীভূত হয় এবং তাহারই ছায়াপাতে সমস্ত আনন্দ অন্তর্হিত হইয়া যায়, অতৃপ্তি ক্রমে বিরক্তিতে পরিণত হয়।

নির্মলার আননে কারণে অকারণে বিরক্তির ছায়া ফুটিয়া উঠিত।

মৃগাঙ্ক সেদিন কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, শর্বরী বিছানার উপর শুইয়া। অসময়ে তাহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, এমন সময় শুয়ে আছ শর্বরী! শরীরটা কি ভাল নেই? বলিয়া তাহার গায়ে হাত দিতেই শর্বরী কাঁদিয়া ফেলিল।

মৃগাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিল,—কি হলো তোমার? কাঁদছ কেন? কি অসুখ করছে আমায় বলো—

শর্বরী কহিল, তুমিই তো আমায় পছন্দ করে কালো দেখে শুনেই নিয়ে এসেছ—। তবে কেন আমি দিনরাত এমন করে অপমানিত হই তুমি বলো—আমি আর এখানে থাকব না। আমি মার কাছে চলে যাব।

"বেশ তো তোমার মার কাছে মাসখানেক থেকে এসো—।

না। না! আমি আর এখানে আসতে চাই না।

কিন্তু মা যদি একটু অসুখ হন তার সঙ্গে কি তুমিও তাই হবে শর্বরী! আমি তো তোমায় কোনদিন এতটুকুও অবহেলা করিনি বলিয়া তাহাকে নিজের বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিল।

শর্বরী আপনাকে স্বামীর বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া কহিল,—তাই বলে কি আমি সকলের সামনে কেবলই লাঞ্ছিত হব! তুমি তো বাড়ী থাক না।

—কিন্তু মাকে নিয়েই তো তোমায় থাকতে হবে। একটু সহ্য করে নিতে হবে। কারণ মার আমি একটা মাত্র সন্তান।

এমন সময় নির্মলা পুত্রের চা ও খাবার হাতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া চাহিয়া দেখিল, কাল বৈশাখীর মধ্যাহ্নের একখানি কালো মেঘ পুত্রের আননকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এবং বধূর নয়নযুগল হইতে শ্রাবণের ধারা নামিয়াছে। মনঃ উষ্মাকে সংবরণ করিয়া বধূর পানে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার উনান জ্বলছে যাও—

কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া শর্বরী তৎক্ষণাৎ কক্ষ হইতে চলিয়া গেল।

মৃগাঙ্ক গম্ভীরাহত পত্নীর পানে একবার চাহিয়া জননীর হাত হইতে চা-এর কাপটী লইল।

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জননী কহিলেন, "নে বাবা ধর—আগে—চাটুকু মুখে দে। সেই কাল সকালে চলে গেছিলি—কোথায় ব্যস্ত হয়ে চা খেয়ে তা না এলো কিনা ভাণ্ডারের কাছে সোহাগ জানাতে। জানে না, মানুষ ভেতেপুড়ে এলে আগে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়,আর শিখবেই বা কোথা হতে—মা বাপ কি কোন সভ্যতা, শিখিয়েছে। আমার মেখে

অসহ্য লাগল, তাই সব কাজ ফেলে আগে তোর চা নিয়ে এলুম।

পুত্র কিন্তু মায়ের এই কথার কোন উত্তরই না দিয়া কেবল চা-এর কাপে একটা চুমুক দিল। তাহার অন্তরের মধ্যে তখন শর্বরীর চোখের জলে কেমন একটা বেদনা অনুভব করছিল। সে সকল রকম চেষ্টাই করিয়াছে কিন্তু জননীকে তুষ্ট করিতে কোনরূপেই পারে নাই।

পুত্র জানিত মায়ের এই কটূক্তিটি শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছাইবে। তাই ইহাকে কবরস্থ করিবার অভিপ্রায়ে একটু হাসিয়া কহিল, শোন! শোন মা বলি আজ কি হয়েছে—! কলেজ থেকে যখন বাড়ী আসি হঠাৎ দেখলুম খুব হৈ-চৈ হচ্ছে, কি ব্যাপার? কাছে গিয়ে দেখি কি দুজন পুলিশ একটা লোককে কোলে করে নিয়ে আসছে—তাই দেখে জিজ্ঞেস করলুম, কি হয়েছে? পুলিশ দুটো বল্লে—"বাবু চুরি করতে গিয়ে ব্যাটা তিন তোলার বারন্ডার কারনিশ হতে পড়ে গিয়ে দু'টো পা একেবারে ভেঙে গেছে। সেইজন্য থানায় না গিয়ে এখন হাসপাতালে আনতে হয়েছে। তারপর পা সারলে তখন এর বিচার হবে বলিয়া সে চা-এর কাপে আর একটা চুমুক দিল।

শর্বরী মাতাপুত্রের সকল কথাই অন্তরালে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিল।

ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি যেমন নির্বাপিত হয় না, তাহাতে সামান্য একটি তৃণখণ্ড পড়িলেই প্রমাদ ঘটিয়া থাকে, তেমনি কয়েকদিন পরে শাশুড়ী বধূর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। হঠাৎ নির্মলা বলিয়া উঠিল, মেয়েমানুষের এতবড় স্পর্ধা! এত তেজ—আসুক মুণ্ড, দেখি এর বিহিত করতে পারি কিনা—লজ্জা করেনি আসতে—

সেই জন্যই তো আমি পায়ে ধরে যেতে চাইছি বলিয়া শর্বরী রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

ব্যস্ আর যায় কোথা! বিচারী রূপে অগ্নি নিক্ষিপ্ত হইল। কি এতবড় তেজের কথা—দেখি, তোমার বিয়ের করতে পারি কিনা—

পরাজয়ের বস্ত্র যখন পিছলাইয়া হাত হইতে বাহির হইয়া যায় তখন তাহাকে নাগালে পাইবার জন্য সহস্র প্রকার ক্রিয়া চলিয়া থাকে।

পুত্র বাড়ী আসিতেই মাতা ক্রন্দনরতা হইয়া কলহের ইতিবৃত্ত দিয়া কহিলেন,—"এই মুহূর্তেই তুমি ওকে বিদেয় কর, তা না হলে আমি জলস্পর্শ করব না।

ক্রুদ্ধমূর্তি জননীর পানে চাহিয়া মৃগাঙ্ক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর মায়ের দিকে চাহিয়া কহিল, —গুরুতর অপরাধ করলেই কি তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হয় মা? তবে আপনার জনের সঙ্গে অপরের পার্থক্য কোথায়—

—"তাই বলে কি আমি ওই কালপেঁচীর তেজের কথা সহ্য করব, তুই বলতে চাস—

—"উপায় কি? যদি আমি দোষ করতুম, তুমি কি আমায় তাড়িয়ে দিতে—না সহ্য করে নিতে—

"কি বল্লি—চাঁদে আর কয়োতে সমান—তুই আমার একটা মাত্র সন্তান—

সেই একটি সন্তানই তো তাকে নিয়ে এসেছে মা—

* * *

যে ভূমিকাটা এতদিন ধরিয়া ধরণীবাবুকে কেবল পাশের হারই দেখাইতেছিল, মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে সেটা আজ ফেল করিয়া বসিল। অনুপমা বিশ্বভুবন অন্ধকার দেখিল। শর্বরী যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। এ কি হইল,—একটা নিঃশ্বাস বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে পিতার ছয় শত টাকার আয়টা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল! অথচ ব্যয়ের পথটা খোলাই রহিল। সঞ্চয়ের কোন বালাই ছিল না। মানুষ যে এতখানি অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে পারে তাহা ইতিপূর্বে মাতা-কন্যার কোন ধারণাই ছিল না।

অনুপমা কহিলেন,—শর্বরী কি আর করবি বল! তোকে তো ছেলের মত লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, তাই একটা চাকরীর সন্ধান কর।

দেখি! বলিয়া শর্বরী মায়ের কাছ হইতে উঠিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

পিতা কোনদিন তাহাকে কলেজ ব্যতীত বাড়ীর বাহিরে পা দিতে দেন নাই। মেয়েদের চাকরী করা তিনি পছন্দ করিতেন না। কিন্তু বিধাতার অভিশাপে আজ কিনা তাহাকেই চাকরীর সন্ধানে বাহির হইতে হইবে। দেখিয়া শুনিয়াই তো বাবা তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বনায় তাহাকেই আবার পিতার কাছে,

আমায় ভোকে মত দিতেই হবে—তা না হলে আমি ছাড়ব না—

"তোমাকে কিসের মত দিতে হবে মা ?"

"কেন, তোকে বিয়ে করতে হবে। আমি বউ আনব, বউ না হলে কি সংসার হয় ?

বেশ তো ! আমি কয়েকদিনের জন্য পুরী যাব। পুরী থেকে এসে তোমার মত দেব।

না তা হবে না ! তোমাকে মত করেই যেতে হবে।

আচ্ছা বলিয়া মৃগাঙ্ক আবার কলম ধরিতেই জননী কহিলেন,—ওকি তুই আবার লিখতে বস্‌ছিস। না বাবু, এখন সব কাজ বন্ধ করে স্নান করতে চলে যাও—

মৃগাঙ্ক আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া একান্ত অনুগতের মত স্নানের নিমিত্ত চলিয়া গেল।

নির্মলা দুইহাত কপালে ঠেকাইয়া দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আপন মনেই কহিল ঠাকুর মুখ রেখ আমার—

দীর্ঘ আটবছরের ছাইচাপা স্মৃতির আগুন হঠাৎ আজ খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। মৃগাঙ্ক ক্ষণপূর্বেও তাহা ভাবে নাই। শর্বরীর কথা। উঃ, যেদিন সে চলিয়া গেল সেদিন মৃগাঙ্কর পায়ে পড়িয়া কি বুক-ফাটা কান্নাই না কাঁদিয়াছিল ! কিন্তু মাতা বৈরী···জননীর বিরুদ্ধে তাহার কিছুই করিবার ছিল না। তাহার পর মৃগাঙ্ক অনেক চেষ্টা করিয়াছে মিটমাটের জন্য—কিন্তু কোন ফলোদয়ই হয়নি—। মৃগাঙ্কর বুকে অনেক আশা ছিল, হয়ত শর্বরী আসিবে তাহার সমস্ত পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইতে, তখন মৃগাঙ্ক তাহাকে আটক করিবে, আর যাইতে দিবে না। কিন্তু যা যায়, তা আর আসে না—এক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

মৃগাঙ্কর এখন অনুতাপ বা অনুশোচনার কিছুই নাই। বিবাহ সে করিবে—

আজ কয়েক দিন হইল, মৃগাঙ্ক পুরী চলিয়া গিয়াছে। নির্মলা বিবাহের আয়োজন করিতেছেন। 'শুভস্য শীঘ্রং' কথা একটা আছে। পুত্র যখন একবার মত করিয়াছে, তখন আর সে দেরী করিবে না। মৃগাঙ্ক ফিরিয়া আসিলে শুভকার্যটা যাহাতে সমাধান হইয়া যায় নির্মলা তাহারই আয়োজন করিতে লাগিল। নির্মলা বলিয়াছে,—আশীর্বাদ গাত্র হরিদ্রা, বিবাহ সবই একদিনেই হইবে। কিন্তু বৌভাত হইবে খুব সমারোহ করিয়া—পুত্র তাহাতে সম্মতি দিয়াছে—। পাড়া প্রতিবাসী সকলেই বলা বলি করিতেছে—এইবার দিদির মনের মত বউ হবে। সুখের সংসার হবে—আবার কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে,—হ্যাঁ ভাই, ছেলে মত করলে ?

নির্মলা উত্তর দেয়, সে কি আর সহজে মত করে ! কত ফন্দি-ফিকির করে তবে মত দিয়েছে—

নির্মলার ছোট বোন জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ দিদি, মৃগু তো কাল ভোরে এসে পৌঁছবে—

নির্মলা কহিল, হ্যাঁ ! কাল ভোরে এসে পৌঁছলেই আমি বেলা দশটার মধ্যে তাদের বাড়ী হলুদ পাঠিয়ে দেব—

প্রভাত হইতে না হইতেই নির্মলা একবার করিয়া বাহিরে গেটের কাছে যাইতেছে আবার আসিয়া ঘড়ি দেখিতেছে, এখনও কেন পুত্র আসিল না।

কেহ কেহ কহিল,—ট্রেন বোধহয় লেট হয়েছে, তাই আসতে দেরী হচ্ছে—এখনকার তো ট্রেন, বললেই হলো দুঘণ্টা লেট্—

এমন সময় একটা গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। সকলেই একত্রে বলিয়া উঠিল—ওই আসছে বোধহয়—

ট্যাক্সিটা এসে মৃগাঙ্কদের দোরে থামিতেই একটা চাপা হৈ-চৈ উঠিল,—এসেছে, এসেছে—

যে আসিল সে গাড়ি হইতে নামিয়া কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পার্শ্বোপবিষ্টা মহিলাটির হাত ধরিয়া নামাইয়া একেবারে মাতৃসন্নিধানে আসিয়া কহিল, শর্বরী, মাকে প্রণাম কর—ক্ষমা চাও।

আন্দোলন ও অনাচার—

আমরা গত ১৯২০ সাল হইতে বহু বৎসর বহু প্রকার অনাচার সহ্য করিয়া আসিতেছি। ইংরেজ আমলে যে অনাচারকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করা হইত স্বাধীনতা লাভের পর তাহার গুরুত্ব কল্পনা করা যায় না। ১৯২১ সালে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে আত্ম-দানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। মানুষ স্বেচ্ছায় সকলপ্রকার দুঃখ কষ্ট বরণ করিত। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরও অধিক লোককে ঐ পথে টানিয়া আনিয়াছিল। সেই সময়ে যুবকের দল মৃত্যুকে বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। সে মৃত্যু অন্য রকমের ছিল। যাঁহারা মৃত্যু বরণ করিতেন তাঁহাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পরাধীন দেশকে স্বাধীনতা দান করা। ক্রমে ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ছাড়" আন্দোলন আসিয়াছিল। কে আগে জীবন দান করিবে তাহা লইয়া প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। আমরা সেই যুদ্ধে বহু জীবন আহুতি দিতে দেখিয়াছি। তাহার পর ক্রমে বিশ্বযুদ্ধ, ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য বহু প্রকার অনাচার ও অত্যাচার আমাদিগকে কষ্ট দিয়াছে কিন্তু সে সকল অতিক্রম করিয়া আমরা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। এইখানে ভারতের ইতিহাসের এক অধ্যায় শেষ হইয়াছে। তাহার পর দীর্ঘকাল জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে দেশকে গড়িয়া তোলার আন্দোলন চলিয়াছিল। জওহরলাল চলিয়া গেলেন—তাঁহার স্থানে লালবাহাদুর শাস্ত্রী আসিলেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে শাস্ত্রীজীর কার্যকাল শেষ হইয়া গেল। তিনি তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে করিতে তাসখণ্ডে হঠাৎ পরলোক গমন করিলেন। অবস্থা জটীলতর হইয়াছিল। কিন্তু জওহরলালের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের শাসনকার্য চালাইবার নেতৃত্ব গ্রহণ করায় দেশ কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল।

এই সময়ে হঠাৎ দেশের গতি পরিবর্তিত হইল। শান্তিকামী মানুষের দল শান্তিলাভের আশায় ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট ভারতবাসীকে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিল। দীর্ঘদিন ভারতে খাদ্যাভাব চলিতেছে এবং খাদ্যাভাবে সত্য সত্যই দেশবাসী বিব্রত ও বিপন্ন। কিন্তু একদল এই খাদ্যাভাবের অজুহাতে মানুষকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিল। হঠাৎ দেখা গেল, খাদ্যাভাবকে অজুহাত করিয়া মানুষ নিজেদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতেছে। কি ভাবে কি হইল আজও তাহা স্থির হয় নাই। সরকারী শাসন ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি দেশের একদল সুস্থ মানুষকে বিকৃত মস্তিষ্ক করিয়া তুলিল। একদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্বল শাসন নীতি, স্বজনতোষণ আর একদিকে একদল উচ্ছৃঙ্খল মানুষের অনাচার ও অত্যাচার দেশে কয়েকদিনের জন্য অরাজকতা আনিয়াছিল। দুবৃর্ত্তরা সকল সময়ে ইহার সুযোগ লইয়া থাকে। মানুষ তাহার মানবিকতাবোধ হারাইয়া ফেলিল। নিরীহ প্রতিবেশীর গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া সম্পত্তি ধ্বংস করিয়া, সকল সরকারী মূল্যবান গৃহ আসবাবপত্র প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া, কে কিভাবে নিজেকে ধ্বংস করিল আজও তাহা জানা যায় নাই। একদিকে কৃষ্ণনগরের মত সহরে বহু লক্ষ টাকার ধন সম্পত্তি ও মানুষের প্রাণ ধ্বংস করা হইয়াছে। কে করিল, কিভাবে হইল, কেন হইল তাহা কেহ বুঝিল না। সকলেই জানে এই পথে দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে না। দেশে চাল নাই, সরকারী চাল সংগ্রহনীতি নানারূপ ত্রুটিপূর্ণ। কাজেই মানুষকে সপরিবারে অর্ধাহারে থাকিতে হয়। অন্যদিকে বিদেশ হইতে গম আনিয়া তাহাও দুর্গত জনগণকে উপযুক্ত পরিমাণে দেওয়া যায় না। এ সকল ঘটনা সত্য জানিয়াও কেন যে পশ্চিমবাংলার মানুষ কয়েকদিন ধরিয়া এই

অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা সমর্থন করিল তাহা বুঝা গেল না। যাহাই হোক না কেন এই কয়দিনে আমাদের বহু কোটি টাকার জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে—এবং পুলিশের গুলিতে এবং অগ্নিকাণ্ডে অনেক নিষ্পাপ, নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে—কতরকমের ক্ষতি হইয়াছে তাহা সংবাদপত্রের বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায়—এবং সেই বিবরণ সকলকে কেবল বিস্মিতই করে নাই মর্মাহতও করিয়াছে। ইহার মূল কোথায়? সরকারী শাসননীতির দুর্বলতা এই ধ্বংস লীলার কারণ। পুলিশ তাহার কর্তব্য করে নাই—শাসকের দল নিজ কঠোর কর্তব্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—আর পথে ঘাটে গ্রামে পল্লীতে নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়াছে। আগুন লাগিলে বনের পশু পক্ষীরা যে ভাবে ছুটাছুটি করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে—নিরীহ লোক সেই ভাবে রাত্রিতে বনে জঙ্গলে থাকিয়া নিজ বাসগৃহ হইতে দূরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছে। যাহারা দুর্বল তাহারা ঐ অবস্থায় পথে ঘাটে প্রাণ দিয়াছে। দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে কয়েক দিনের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাঠ করিলে তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে সকলেরই দিধা আসিবে। আমরা কলিকাতা শহরতলীর ঘন বসতি পূর্ণ লোকালয়ের মধ্যে বাস করি। সেখানে এক সপ্তাহ কাল কোনরূপ শাসন ব্যবস্থা ছিল না। অনাচার ও অত্যাচার মানুষকে পশুর স্তরে নামাইয়া দিয়াছিল। এই সকল সত্য ঘটনা। কিন্তু কেন এইরূপ হইল? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কয়দিন তাঁহার বুদ্ধি হারাইয়া ছিলেন। মানুষের রক্ষার কথা চিন্তা না করিয়া তিনি দল ও রাজনীতির প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়া সকল শ্রেণীর মানুষের ক্ষতিসাধন করিয়াছেন। ঐ সময়ে দিল্লী হইতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দাজীলাল নন্দ ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণীয়ম্ ৪।৫ দিন কলিকাতায় থাকিয়া সমস্যা বুঝিবার ও তাহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কাহারও পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া যে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইতিহাসে অতি কম দেখা যায়। তিনি কি চান তাহা নিজেও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কয়দিনে যখন পশ্চিমবাংলার ক্ষতি ও হাহাকার চরমে উঠিল তখন উচ্চতন কর্তৃপক্ষের চাপে তিনি বিনা বিচারে আটক বামপন্থী নেতাদের দলে দলে মুক্তি দান করিয়া সমস্যা সমাধানের পথ খুলিয়া দিলেন। আজও সমস্যার সমাধান হয় নাই বটে কিন্তু কি কংগ্রেসী কি বামপন্থী সকল দল আপোষের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন। হয়তো আপোষ হইবে, কিন্তু যে বিরাট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহা কে পূরণ করিবে? প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বার বার আপোষের জন্য ছুটাছুটি করিয়াছেন, কিন্তু ফল আশানুরূপ হয় নাই। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একবার মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু দলীয় সমর্থনে পদত্যাগ করেন নাই। এই তো অবস্থা। আমরা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় কখনো এইরূপ অনাচার, অত্যাচার, সরকারী কর্মশৈথিল্য, সকল প্রকার সরকারী কর্মীর মধ্যে উৎসাহের অভাব, কর্ম প্রেরণার অভাব ইত্যাদি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আজ পশ্চিমবাংলার প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি সর্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া দিনযাপন করিতেছেন। সকলেরই মনে ভয়, আবার কখন এই সকল ঘটনা পুনরায় ঘটিয়া আমাদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিবে। দেশে নেতৃত্বের অভাব। কংগ্রেসদল সংখ্যাগরিষ্ঠ বটে কিন্তু তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত নেতা নাই। আর বিরোধীদল নানাভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। আর সকলের চেয়ে বড় কথা কংগ্রেস দলের নেতারা কোনরূপ শক্তি বা বুদ্ধির পরিচয় দিয়া দেশকে পথ দেখাইতে পারিতেছেন না।

আমরা জানি, খাদ্য পরিস্থিতি হঠাৎ পরিবর্তন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলিয়া বুভুক্ষু মানুষের দলকে পশুর মত হত্যা করিয়া কোন লাভ হইবে না। এবং যাহারা কয়দিন ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংসের পথ দেখাইয়াছিল তাহাদেরও কেহই প্রশংসা করিবে না। উপায় নাই। যতদিন না আমাদের মধ্যে যোগ্যতর নেতার আবির্ভাব হয়, ততদিন আমাদের এই দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইবে।

গত ১৮ বৎসর ধরিয়া আমরা দেশকে নানাভাবে গড়িয়া তুলিবার কথা চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু দীর্ঘকালের এই খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য কি সরকার পক্ষ, কি জনসাধারণ কেহই উপযুক্ত কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করে নাই। শুধু

কাগজে কলমে আমরা খাদ্য উৎপাদনের কথা বলিয়াছি। কি করিলে দেশের দরিদ্র মানুষ অধিক খাদ্য উৎপাদন করিয়া খাদ্যাভাব দূর করিবে তাহা আজ সকলের চিন্তারও বহুদূরে। সকল সমস্যার উপর রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ যে সমাধানের উপায় দেখাইয়াছেন তাহা আজ সকলের বিচার ও বিবেচনার বিষয়। কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষকে শুধু বক্তৃতার দ্বারা বাঁচাইয়া তোলা যাইবে না। মানুষের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য মানুষ কি করিবে। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া কখনও মানুষের ক্ষুধা দূর হইবে না, অন্যান্য সভ্যদেশ যে ভাবে অন্য সকল সমস্যার কথা ভুলিয়া শুধু খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগী হয়—আমরা কেন সে পথ গ্রহণ করিব না? সকল উন্নতির পরিকল্পনা ভুলিয়া একমাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টাই আজ যদি ভারতবাসীকে সকল পরিশ্রম, বুদ্ধি ও শক্তি নিযুক্ত করিতে প্রেরণা দেয় তবেই এই সমস্যার সমাধান হইবে।

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন প্রধান বিচারপতি—

বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বিচারপতি শ্রীসিংহ রায়পুরের প্রসিদ্ধ সিংহ পরিবারের সন্তান। স্বনামখ্যাত লর্ড সিংহও এই পরিবারেরই কৃতি সন্তান।

বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ হেষ্টিংস হাউস ও শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেন। পরে ব্যারিষ্টাররূপে ১৯৩১ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তারপর দীর্ঘ উনিশ বৎসর দক্ষ আইনজীবীরূপে সাফল্য অর্জনের পর ১৯৫০ সালে বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ষোল বৎসর সুযোগ্য বিচারকরূপে কর্ম্মসম্পাদনের পর প্রধান বিচারপতির গুরুদায়িত্ব তাঁর অতিরিক্ত স্কন্ধে ন্যস্ত হইল। বিচারপতি শ্রীসিংহ বহুদিন যাবৎ হাইকোর্টের "রিট্ কোর্টের" দায়িত্বভার ও পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সভ্য এবং ইণ্ডিয়ান্ ল' ইন্‌স্টিটিউট-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার একজিকিউটিভ্ চেয়ারম্যান্।

বিচারপতি শ্রীসিংহের বয়স এখন ৫৮ বৎসর। তাঁর এক ভ্রাতা শ্রীই, এন, সিংহ পাটনা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি। আমরা নূতন প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি

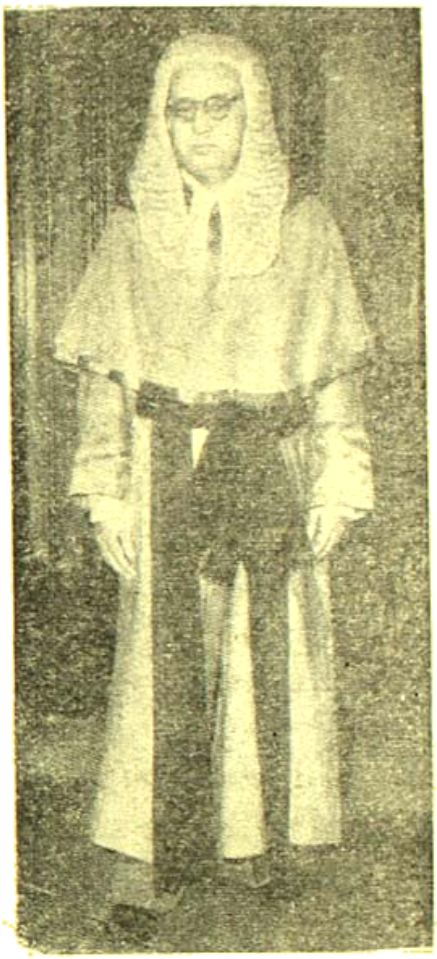

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ

এবং আশা করি তাঁর নেতৃত্বে ও কর্ম্মদক্ষতায় কলিকাতা হাইকোর্টের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিবে।

প্রধান মন্ত্রীর বিদেশ সফর—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর প্রধান মন্ত্রীরূপে বিশ্বের চারিটি দেশ শুভেচ্ছা সফর ও তথাকার রাষ্ট্রনায়কদিগের সঙ্গে মতবিনিময় করিয়া আসিয়াছেন। যদিও এই সফরের সময় ছিল খুবই অল্প তবুও এই ভ্রমণের এবং সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব ছিল খুবই বেশী। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট শ্রীদা গল্ ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী শ্রীউইল্‌সন্‌এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার কিছুটা মামুলি ধরণের হইলেও,—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট শ্রীজনসন ও রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন্‌এর সঙ্গে শ্রীমতী

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

গান্ধীর কথাবার্ত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাকিস্তানের চীন হইতে সমরোপকরণ লাভ এবং 'তাসখন্দ চুক্তি' অবহেলা করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে আবার নতুন করে বিষোদ্গার প্রভৃতি গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয়গুলি লইয়া শ্রীমতী গান্ধী প্রেসিডেন্ট জনসন্ ও প্রধান মন্ত্রী কোসিগিনের সঙ্গে আলোচনা করেন। বিশ্বের এই দুই মহাশক্তিশালী দেশেররাষ্ট্রনায়কদিগের নিকট হইতে আমাদের প্রধান মন্ত্রী বিশেষ সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহারই লাভ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট জনসন্ পাকিস্তানের লালচীনের নিকট হইতে অস্ত্র সাহায্য গ্রহণ এবং সেই সমরোপকরণ প্রকাশ্যে প্রদর্শন প্রভৃতি বিষয় জ্ঞাত হইয়া যে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা বুঝা যায়; এবং মনে হয় ভবিষ্যতে পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্যদানের ব্যাপারে তিনি বুঝিয়াসুঝিয়া কাজ করিবেন।

রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন্‌ও পাকিস্তানের তাসখন্দ চুক্তি লঙ্ঘনে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। এবং তিনি তাঁর দূত হিসাবে পাকিস্তানে তাহাকেও প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া শুনা যায়।

পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অক্লান্ত চেষ্টায় যে 'তাসখন্দ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হইয়াছিল এবং এই দুই দেশের মধ্যে শান্তি আনয়নের জন্য শান্তিযোদ্ধা শাস্ত্রীজী যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত করার পরই মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন,সেই মহামূল্য চুক্তিকে পাকিস্তান আজ হেলায় অবহেলা করিতেছে! জানি না ইহার ফল কি হইবে!

যাহাই হউক, আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর এই দৌত্য যে আমাদের অনুকূলে যাইবে তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। তাঁহার এই সফর খুবই সময়োচিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার সফরের সাফল্যের জন্য তাঁহাকে আমাদিগের অভিনন্দন জানাইতেছি এবং আশা করিতেছি ভবিষ্যতে তিনি আরও সফল সফরের দ্বারা ভারতের মনোভাব অন্যান্য রাষ্ট্রকে সঠিক ভাবে জ্ঞাত করিয়া, তাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভে সমর্থ হইবেন।

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা :

আর্মি স্পোর্ট অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল ট্রেনিং গ্রাউণ্ডে (পুণা) অনুষ্ঠিত ৩১তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে বনাম সার্ভিসেস দলের ফাইনাল খেলাতে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। দুদিনের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। ফলে রেলওয়ে এবং সার্ভিসেস দলকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই নিয়ে দু'বার যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হল। ইতিপূর্বে যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছে মাদ্রাজ এবং সার্ভিসেস, ১৯৫৫ সালে। এই নিয়ে রেলওয়ে দল আট বার এবং সার্ভিসেস দল চার বার জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ান হল। প্রতিযোগিতার ফাইনালে রেলওয়ে দল ইতিপূর্বে তিনবার (১৯৫৯-৬৩ ৬৪) সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করেছে।

১৯৬৬ সালের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় ২৬টি দলের যোগদানের কথা ছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসাম এবং উড়িষ্যা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেনি। বাংলা দল ৩-১ গোলে গত বছরের রানার্সআপ কাপ বিজয়ী পাঞ্জাব দলের কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়। বাংলা তাদের প্রথম খেলায় ১৩-০ গোলে কেরল এবং দ্বিতীয় খেলায় ৪-০ গোলে অন্ধ্র প্রদেশকে পরাজিত করেছিল। এই দুটি খেলায় বাংলার পক্ষে হ্যাটট্রিক করেন ইনাম-উর-রহমন (২টি) এবং রোটাস সিং। কেরলের বিপক্ষে দু'জন হ্যাটট্রিক করেন—ইনাম-উর-রহমন এবং রোটাস সিং।

ইংল্যাণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ড :

নিউজিল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ড দলের ত্রয়োদশ টেষ্ট সিরিজের তিনটি টেষ্ট খেলাই অমীমাংসিত থেকে গেছে; ফলে ত্রয়োদশ অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের টেষ্ট সিরিজও ড্র গেল। ইংল্যাণ্ড এবং নিউজিল্যাণ্ডের মধ্যে সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট খেলা সুরু হয় ৬৬ বছর আগে ১৯৩০ সালের ১৮ই জানুয়ারী, ক্রাইষ্টচার্চ মাঠে। সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে যে টেষ্ট সিরিজ এবং টেষ্ট খেলা হয়েছে তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ১৩টি টেষ্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ড 'ধারার' জয়ী হয়েছে ৯ বার এবং সিরিজ ড্র গেছে ৪ বার। এই তেরটি টেষ্ট সিরিজের ৩৭টি টেষ্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ইংল্যাণ্ডের জয় ১৭বার এবং খেলা ড্র ২০ বার। নিউজিল্যাণ্ড একটা টেষ্ট খেলাতেও জয়লাভ করতে সক্ষম হয়নি, 'ধারার' জয় দূরের কথা।

১৯৬৫ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে নিউজিল্যাণ্ড দল শোচনীয় ভাবে ইংল্যাণ্ডের কাছে তিনটি টেষ্ট খেলাতেই পরাজিত হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের টেষ্ট সিরিজটি নিউজিল্যাণ্ড ভাগ্যের জোরে ড্র করেছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

প্রথম টেষ্ট—ক্রাইষ্টচার্চ :

ইংল্যাণ্ড : ৩৪২ রান (কেভিড এ্যালেন ৮৮, ব্রাইক

স্মিথ ৫৪ এবং পিটার পারফিট ৫২ রান। মন্ত্র ৮৩ রানে ৩ এবং বার্টলেট ৬৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ২০১ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মাইক স্মিথ ৮৭ রান এবং পারফিট নট আউট ৪৬ রান)

নিউজিল্যাণ্ড : ৩৪৭ রান (বিভান কাস্তন ১০৩, এরিক পেক্সী ৫৫ এবং রিচার্ড মন্ত্র ৫৮ রান। জোন্স ৭১ রানে ৪, হিগস ৫১ রানে ৩ এবং ব্রাউন ৮০ রানে ৩ উইকেট)

ও ৬৮ রান (৮ উইকেটে। বব্ কুনিস নট আউট ১৬ রান। হিগস ৫ রানে ৪, পারফিট ৫ রানে ২ এবং ব্রাউন ৬ রানে ১ উইকেট)

দ্বিতীয় টেষ্ট—ডুনেডিন ঃ

নিউজিল্যাণ্ড : ১৯২ রান (ডিক মন্ত্র ৫৭, মাইক স্মিথ ৩৮ এবং বেরী সিনক্লেয়ার ৩৩ রান। জোন্স ৪৬ রানে ৩ এবং হিগস ২৯ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৪৭ রান (৯ উইকেটে। বেরী সিনক্লেয়ার ৩৯ রান। জোন্স ৩২ রানে ২, হিগস ১২ রানে ২ এবং এ্যালেন ৪৬ রানে ৪ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ২৪৪ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কলিন কাউড্রে নট আউট ৮২ এবং জে টি মারে ৫০ রান। মন্ত্র ৭৬ রানে ২, বার্টলেট ৭০ রানে ২, কুনিস ৪৯ রানে ২ এবং পুনা ৪০ রানে ২ উইকেট)

তৃতীয় টেষ্ট—অকল্যাণ্ড :

নিউজিল্যাণ্ড : ২৯৬ রান (বেরী সিনক্লেয়ার ১১৩ এবং বব্ কাস্তন ৬৪ রান। এ্যালেন ১২৩ রানে ৫, জোন্স ৫২ রানে ২ এবং হিগস ৩৩ রানে ২ উইকেট)

ও ৩০৮ রান (মর্গান ২৫ এবং পোলার্ড ২৫ রান। জোন্স ২৮ রানে ৩ এবং হিগস ২১ রানে ৩ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ২২২ রান (কলিন কাউড্রে ৫৯ এবং এরিক রাসেল ৪৬ রান। ব্রুস টেলর ৪৬ রানে ৩ এবং ডিক পোলার্ড ৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৫৯ রান (৪ উইকেটে। জিম পার্কস নট আউট ৪১ রান। টেলর ২০ রানে ২ উইকেট)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন :

কলকাতার ইডেন উদ্যানে আয়োজিত ১৯৬৬ সালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইনাল ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলস : এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান দীনেশ খান্না (পাঞ্জাব) ১২—১৫, ১৫—১১ ও ১৫—৬ পয়েন্টে ২নং ভারতীয় খেলোয়াড় দীপু ঘোষকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : দীপু এবং রমেন ঘোষ (রেলওয়ে) ১৫—৮ ও ১৫—১২ পয়েন্টে হরিপদ গুহ এবং লক্ষ্মী শীলকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : সরোজিনী আপ্তে (রেলওয়ে) ১১—৪ ও ১১—৭ পয়েন্টে সুনীলা আপ্তেকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : সরোজিনী আপ্তে এবং দীপু ঘোষ ১৬—১৮, ১৮—১৩ ও ১৫—১১ পয়েন্টে সুনীলা আপ্তে এবং রমেন ঘোষকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিঙ্গলস : রঞ্জন ঘোষ ১৫—৪ ও ১১—১৫ পয়েন্টে কামাল সাহাকে পরাজিত করেন।

আগামী "বৈশাখ" সংখ্যা

রবীন্দ্র সাহিত্যের নানা আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১৫।৪।৬৬ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

—উপহার দিবার উপযোগী ভাল ভাল বই—

নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত

মেঘদূত

নিখিল বিরহী-জন-হিয়ার প্রতি অসীম সমবেদনা নিয়ে অমর কবি কালিদাস তাঁর অনুপম কাব্য "মেঘদূত"-এর শ্লোকে শ্লোকে—বিরহের যে অভিনব স্বর্গলোক সৃষ্টি ক'রে গেছেন—ইহা সেই অমর "মেঘদূত" কাব্যের সুললিত বাংলায় স্বচ্ছন্দ কাব্যানুবাদ। নয়নমুগ্ধকর চিত্রাবলীতে সুসজ্জিত। দাম—সাত টাকা

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির তিন শতাধিক রোবাই বহু ৭ তাহাদের মূলগত তাৎপর্যানুসারে এবং ভাবানুযায়ী পাঁচটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া বিরাট কলেবরে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত। বহু ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্রের সমাবেশে অনবদ্য।

দাম—সাত টাকা

॥ উৎকৃষ্ট মুদ্রণ—চিত্রের প্রাচুর্য প্রত্যেক বইখানির বৈশিষ্ট্য ॥
উপহার দিয়া অথবা উপহার পাইয়া
আপনাকে খুশি হইতেই হইবে

কান্তকবি রজনীকান্তের

বাণী ২৲

অনুপম কাব্যগ্রন্থ।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত

ঋতু-সম্ভার

পৃথিবীর নিত্য-নূতন রূপ-পরিবর্তনের মাঝে আবেগপ্রবণ প্রেমিকচিত্ত যাহা অন্বেষণ করিয়া ফিরে—এই মহাকাব্যে আছে তাহারই অপূর্ব আস্বাদ। দাম—পাঁচ টাকা

সুরেন্দ্রনাথ রায়

প্রণীত

কুল-লক্ষ্মী

বালিকাগণ কিরূপে শিক্ষিতা হইলে নিজগুণে সকলকে সুখী করিতে পারিবে—তাহাই সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝান হইয়াছে। দাম—দুই টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

— প্রকাশিত হইল —

শক্তিপদ রাজগুরুর বিপুল-কলেবর নূতন উপন্যাস

বাসাংসি জীর্ণানি

22 APR 1966

একদিকে কালজীর্ণ পুরাতন জমিদারী-তন্ত্রের পতন—অপরদিকে শিল্প-সমৃদ্ধ নূতন যান্ত্রিক যুগের উত্থান। প্রাচীন আরণ্যক পরিবেশের স্বর্গরাজ্যে রূপান্তর! হারানোর বেদনা আর প্রাপ্তির আনন্দে স্পন্দমান, ভাঙা আর গড়া, সমস্যা ও সমাধানের অভিনব বৈচিত্র্যে দোদুল্যমান একদল নর-নারী। তারকরত্ন আর অতুল কামার, অশোক আর প্রীতি, ভুবন আর কদম-বৌ, গোকুল আর পানু দাদ, কারিগর আর মিষ্টি, অবিনাশ আর নিতে বাউরী, জীবন আর মণিমালা, প্রশান্ত আর রাঠী, সতীশ আর এমোকালী, সনাতন আর গঙ্গামণি—এরকম আরো অনেকেই এই উপন্যাসে ভিড় ক'রে এসেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রই মনে দাগ কাটার মত। কিন্তু ভাষাহীন নারাণ ঠাকুর লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

পরিবর্তনের পটভূমিতে জীবনের নূতন মূল্যায়ন।

চেনা-জানা পরিবেশে নূতন ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা এমন একখানি জীবন্ত উপন্যাস অনেকদিন বাঙলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়নি।

দাম—চৌদ্দ টাকা

—অন্যান্য উপন্যাস—

গৌড়জন বধূ ৫-৫০
কেউ ফেরে নাই ৭-৫০
কাজল গাঁয়ের কাহিনী (২য় সং) ৫,
মণিবেগম (৩য় সং) ৬-২৫
কুমারী মন (২য় সং ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৩-৫০
জীবন-কাহিনী (ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৪-৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

সাহিত্য

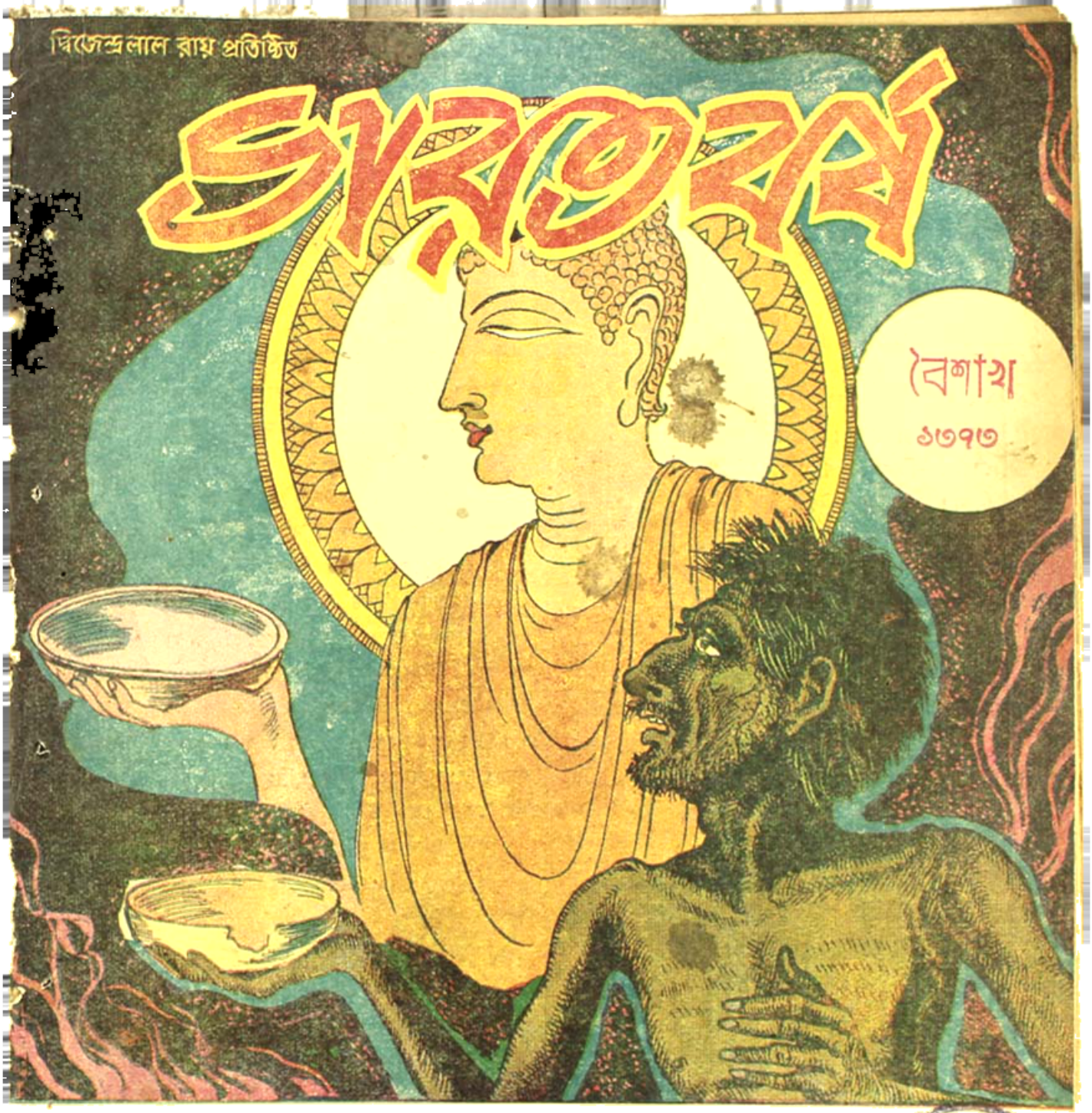

বৈশাখ
১৩৭৩

CALCUTTA

৫৩ তম বর্ষ

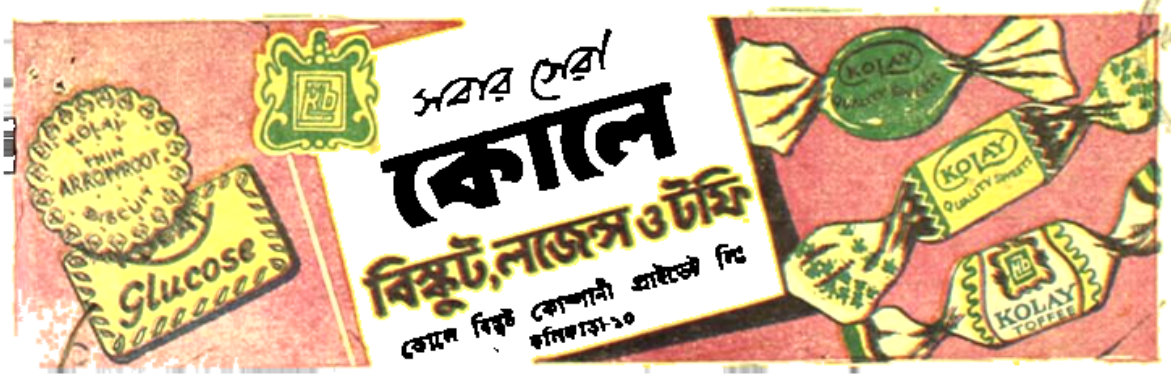

—নূতন প্রকাশিত চারখানি বই—

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পিপাসা

অশোকমুকুলো তরুণ অধ্যাপক—আর বিদিশা একজন কলেজে-পড়া ছাত্রী। অশোক নির্বোধ, বাজুক আর মেধাবী—কিন্তু বিদিশা মুখরা, নির্ভীক আর উগ্র আধুনিকা। তারপর কবির ভাষায় ব'লতে গেলে—"না জানি কী করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে, কী ছিল বিধাতার মনে!" এর ফলে যে বিধুরতের বীজ রোপিত হ'ল, তা কক্ষচ্যুত উল্কার মত টেনে নিলে দু'জনকে জীবনের দু'প্রান্তে। কিন্তু তাদের কক্ষ বাহির হ'লেও কি বিদিশারই যৌবনের উত্তাপ?

দাম—৩৲০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সতীশঙ্কর উৎপলের

সতীশঙ্কর রায়ের সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে। কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্যে অনেক কিছু করেছেন, বাড়ির চাকরকে অফিসের বেয়ারা ক'রে দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন ডাকাত, পরের ধন লুটেপুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। লোকে তাঁকে ভয় ক'রতো যেন সাপ বা বাঘের চেয়েও বেশি। আবার কেউ বলে মেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রেছেন—ব'লতে গেলে একেবারে পোকা ছিলেন।

উৎপলের কাছে সতীশঙ্কর এক বিষম সমস্যা। কার কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে? যে লোক প্রথম জীবনে দেশের জন্যে জেল খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন যশ ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, তিনি আবার সহসা আততায়ীর হস্তে নিহতই বা হ'লেন কেন? এই "কেন" সম্বন্ধে তাঁর সুন্দরী তরুণী বিধবা স্ত্রী-ই বা বলেন কি? দাম—পাঁচ টাকা

শক্তিপদ রাজগুরু

জীবন-কাহিনী

মানুষের জীবনে সমস্যাও যেমন—কৌতুকও তত কম নয়। এই সমস্যা ও কৌতুকের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা দু'টি ভাগ্য-বিড়ম্বিত যুবক-যুবতীর মধুর প্রেমের কাহিনী।

ছায়াচিত্রে রূপায়িত।

দাম—৩৲০

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মজার মজার খেলা

বিজ্ঞানের নানা রকম কল-কৌশলের সাহায্যে মজাদার খেলা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করার মত বই। দেখা ও খেলার কাজ একই সঙ্গে চ'লবে।

কিশোরদিকে উপহার দেওয়ার পরম উপযোগী।

নূতন ধরনের সাইজ। অসংখ্য ছবিতে ভরপুর।

দাম—৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

আপনার সুন্দর কালো
কেশের জন্য...

বেঙ্গল
কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল

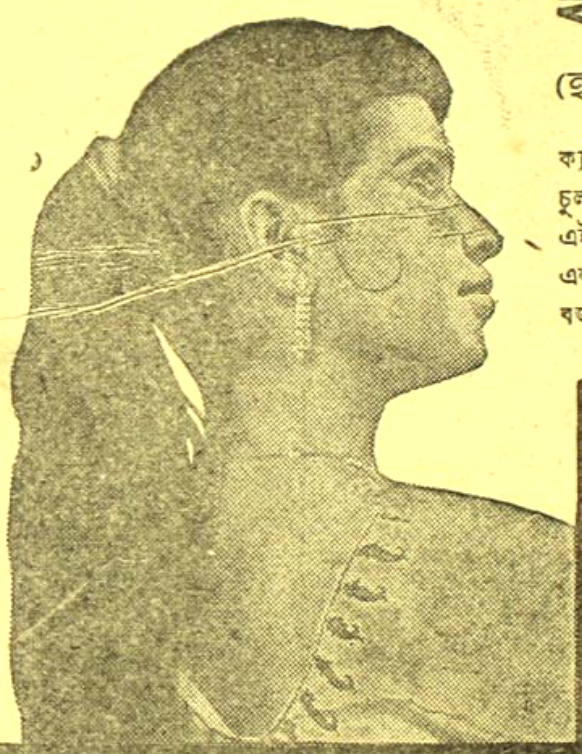

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে চুল বাড়ায়—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। এই কেশ তৈলে ক্যান্থারাইডিসের এক্সট্রাক্ট থাকায় চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ● বোম্বাই ● কানপুর

ভাল ভাল উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ

শরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিপাসা ৪-৫০

তৃতীয় নয়ন ৪-৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এক জীবন অনেক জন্ম ৬-৫০

নীলকণ্ঠী ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অগ্নিমঞ্জরী ৩৲

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

দিব্যদৃষ্টি ২-৫০

অনুরূপা দেবী

গরীবের মেয়ে ৪-৫০ বিবর্তন ৪৲

রামগড় ৪-৫০ বাগ্‌দত্তা ৫৲

পোষ্যপুত্র ৪-৫০ পথের সাথী ৩৲

হারানো খাতা ৩৲

নিরুপমা দেবী

দিদি ৫৲

পুষ্পলতা দেবী

নীলিমার অঙ্ক ৩-৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ ৩-৫০

শক্তিপদ রাজগুরু

জীবন-কাহিনী ৪-৫০

কুমারী মন ৩-৫০

গৌড়জনবধূ ৫-৫০

মণিবেগম ৬-২৫

কেউ কেরে নাই ২-৫০

কাঞ্চনজঙ্ঘার কাহিনী ৫৲

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মনের অগোচরে ৫৲

তাম্বর

কলঙ্কিনী অফ খিং ২-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

পরাজয় ২৲

হাদিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

কলঙ্কিনীর খাল ২-৫০

নবীমাধব চৌধুরী

দেবানন্দ ৪৲

প্রফুল্ল রায়

সীমারেখার বাইরে ১০৲

সোনা জল মিঠে মাটি ৮-৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পতনে উত্থানে ৫৲

সুবা হালদার ও সপ্তপ্রদীপ ৩-৭৫

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অচল প্রেম ৪৲

পঞ্চানন ঘোষাল

একটি অদ্ভুত মামলা ৫৲

একটি নিরীহ হত্যা ২-৫০

অবগুণ্ঠন পৃথিবী ৫৲

একটি নারী-হত্যা ৩৲

অন্ধকারের দেশে ৫৲

গৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২-৫০

মুক্তির আসাম ২-৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিকতার আদর্শ ৪৲

সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণ-সিন্ধা ৩৲

ভুলের মাশুল ৩-৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিবস্ত্র মানব ৫-৫০

কার্টুন ২-৫০

দেহ ও দেহাতীত ৪৲

পত্রাঙ্ক ১ম—২-৫০, ২য়—২-৫০

শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভুলের ফসল ২৲

খেয়ালের খেসারৎ ২৲

বংশধর ২৲

ভোলা সেন

উপন্যাসের উপকরণ ২-৫০

অমরেন্দ্র ঘোষ

পদ্মদীঘির বেদেনী ৩৲

দক্ষিণেশ্বর মিলন ২য় ৪৲

সমরেশ বসু

হিংসাবাঙ্কা ৭-৫০

মায়া বসু

অগ্নিবলয় ২-৭৫

বাণিক

মেঘের পরে আলো ৪-০০

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিয়ান শো ৪-৭৫

রামপদ মুখোপাধ্যায়

কাল-কল্লোল ৪-৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের মন্দিরা ৩-৫০ কালকূট ৩৲ কানু কহে রাই ২-৫০ কাঁচামিঠে ৩৲ আদিম রিপু ৩৲ গৌড়-মল্লার ৪-৫০ বিজয়লক্ষ্মী ২-৫০ বহ্নি-পতঙ্গ ৩-৫০ পঞ্চভূত ২-৫০ বিষের বন্ধী ৪-৫০ শাদা পৃথিবী ৩৲ ছায়াপথিক ৩৲ দুর্গরহস্য ৩-৫০ চুয়াচন্দন ৩-২৫

প্রবোধকুমার সান্যাল

নবীন যুবক ২-৫০ কলরব ২৲

প্রিয় বান্ধবী ৪৲

কয়েক ঘণ্টা মাত্র ৫৲

অশোককুমার মিত্র

দু'ঘণ্টা ৫৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চরাক্ত ৩৲

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

মকবল পাঞ্জাবী ৫৲

শৈলানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঝড়ো হাওয়া ২-৫০

বনফুল

শিতামহ ৬৲

নবপ্রভাতপুরুষ ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

মিলন-মন্দির ৩৲

প্রভাত দেবসরকার

অনেক দিন ৩-৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩-১-১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পণ্যের

প্রচারে

'প্রবাসী'র

প্রচারণী

প্রকৃষ্ট ॥

বিজ্ঞাপনের বিস্তারিত হার—প্রবাসীর ম্যানেজারকে পত্র লিখলে—সানন্দে জানানো হইবে।—প্রতি পৃষ্ঠা ১০০৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬০৲। চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের হার এবং বিশেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের বিষয় জানিতে হইলে পত্র লিখুন—কিংবা সাক্ষাৎ করুন।

ম্যানেজার

প্রবাসী প্রেস প্রাঃ লিঃ

৭৭-২-১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১৩

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে

বিজয় বৈজয়ন্তীবাহী

মোহিনী মিল্‌স লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯০৮)

১নং মিল

কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা)

২নং মিল

বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

২২ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

অনামী (২য় সং—মহাভারত, কালিদাস, ঈশা, বুদ্ধদেব, নানা ইংরাজ কবি, হিব্রু ঋষি প্রভৃতির কবিতার অনুবাদ, দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ গান ও কবিতা, ইন্দিরা দেবীর সুধাগুলির অনুবাদ—স্নেহ শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির পত্রাবলী) মূল্য ৪।০

অজানাকে (অঘটনী উপন্যাস) ১০৲

ব্রাহ্মমাপ (২য় সং) ৭।০

অঘটনের ঘটা (উপন্যাস) ৬৲

দোলা (উপন্যাস—২য় সং) ৮৲

ত্রিখারিণী রাজকন্যা ২৷৷০

ভাগবতী কথা (কবিতা)—৫৲ ভাগবতী গীতি—৪৲

শ্রীচৈতন্য (কাব্যনাট্য)—৩।০ মহাভারতী কথা—৩।০

তীর্থংকর (৩য় সং)—৮৲ দোটানা—৩৲

তারি এক হয় আর (নেতাজী-কেন্দ্রিক উপন্যাস)—৮।০

ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী (ধর্ম্ম ও যোগ সম্বন্ধে)—৫৲

ছায়ার আলো (উপন্যাস)—৭৲

স্মৃতিচারণ ১ম খণ্ড—(দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশ ঘোষ, লোকেন্দ্র পালিত, সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অতুলপ্রসাদ সেন চরিত্রচিত্র—২য় সং মূল্য—৬০০ পৃষ্ঠা) ১২৲

স্মৃতিচারণ ২য় খণ্ড—(রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যতীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ, গোপীনাথ কবিরাজ, জীবেন্দ্র কুমার দত্ত প্রভৃতি—চরিত্র—৩০০ পৃষ্ঠা)— ৭।০

অঘটন আজো ঘটে (উপন্যাস—৭ম সং)—৫৲

ঋষিবন্ধু মন্দির, পুণা—৪ ও কলিকাতার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

কুষ্ঠ ও ধবল

৬০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম্মরোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭ হাওড়া।

শাখা :—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

বহুল প্রশংসিত ও পরীক্ষিত

বক্ষ পীড়ায় সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য মহাপুরুষ প্রদত্ত মহৌষধ

অমিয় স্নেহ

মূল্য দুই সপ্তাহের জন্য ১৲ টাকা ষ্ট্যাম্পসহ পত্রে অন্যান্য বিষয় জ্ঞাতব্য। মূল্য অগ্রিম প্রেরিতব্য।

এখানে সর্ব্ববিধ জ্যোতিষের কার্য্য ও দুরূহ মন্ত্রশক্তিপূত কবচাদি ও দুরারোগ্য ব্যাধির ধারণীয় ও সেবনীয় ঔষধ সুলভে দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ডাঃ শ্রীবিজয়রমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতির্বিনোদ অধ্যাপক—যজঃশক্তি কার্য্যালয়

রাধাবাজার, নবদ্বীপ পোঃ (নদিয়া)

—প্রকাশিত হইয়াছে—

অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার, এম. এ, ডি-ফিল্,

সম্পাদিত

গিরিশচন্দ্রের

প্রফুল্ল ৪, জনা ৪,

ও

দ্বিজেন্দ্রলালের

চন্দ্রগুপ্ত ৪৲ সাজাহান ৪৲

সারগর্ভ ভূমিকা, চরিত্র-আলোচনা ও টীকাসহ। ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে মূল্যবান ও অপরিহার্য সংযোজন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সাংক্রামক চর্মরোগে সত্বর আরাম দেয়।

অস্ত্রস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগেনা।

সব সময় এ্যাক্রিমেণ্ট হাতের কাছে রাখুন।

এ্যাক্রিমেণ্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

যশস্বিনী মহিলা-কথাশিল্পী

অনুরূপা দেবীর

— অমর সাহিত্য-সাধনা —

গরীবের মেয়ে (ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৪-৫০

পোষ্যপুত্র ৪-৫০ **বিবর্তন** ৪৲

পথের সাথী ৩৲ **বাগ্‌দত্তা** ৫৲

রামগড় ৪-৫০ **হারানো খাতা** ৩৲

যে মহিমময়ী মহিলার অবদানে বাঙলা সাহিত্যের বিগত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস সমৃদ্ধ হইয়া আছে—উপরের বইগুলি তাঁহার অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি। সৃষ্টি শক্তির বিশালতা—শিল্পিচাতুর্য ও চিত্ত বিশ্লেষণে মহিলা-ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

— * বিবিধ গ্রন্থ * —

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম ২৲

[illegible] প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ

অবিস্মরণীয় সত্যেন্দ্রনাথবসু ২-৫০

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হে মহাজীবন (জীবনী) ৩৲

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু-অনুলিখিত

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩৲

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সচিত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।
১ম খণ্ড (২য় সং)—৭৲ ২য় খণ্ড—৪৲

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ ৭৲

পদাবলী-পরিচয় ৫৲

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

পারায়ণ (পরলোক-তত্ত্ব) **৯-৫০**

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত ঐতিহাসিক গ্রন্থ

সিরাজদ্দৌলা ৬৲

ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী প্রণীত

শরৎ-সাহিত্যে পতিতা ২-৫০

জাহানারার আত্মকাহিনী ৩-৫০

কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা ২৲

ডাঃ বিমলকান্তি সমদ্দার প্রণীত

রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৫-৫০

শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত

নবভারতের বিজ্ঞানসাধক

সচিত্র। দাম—৩-৭৫

তারকচন্দ্র রায় প্রণীত

বাংলা দার্শনিক সাহিত্য-ভাণ্ডারে নূতন সংযোজন

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস

(১ম খণ্ড) ১০৲ (২য় খণ্ড) ১২৲

সাংখ্য ও যোগ (ভারতীয় দর্শন) ৪৲

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

১ম খণ্ড (সমসাময়িক দর্শন)—১০৲

শ্রীপ্রবুদ্ধকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অক্ষরলিপি-কৌমুদী ২-৫০ ব্রাহ্মণগুরু (১ম) ১-২৫

শ্রীহরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত

সামুদ্রিক-রহস্য ৬৲

পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান (সচিত্র) ৫৲

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

দিল্লীশ্বরী (সচিত্র) ২৲

মজিয়ৎ ও নূরজাহানের জীবন-কথা।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত

কোন্ পথে ? ২-৫০

আটটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ।

ধীরেশচন্দ্র সেন প্রণীত

ঋতুশ্রী ৩-৫০

উপহার দিবার উপযোগী।

ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রণীত

পঞ্চাশের পরে (স্বাস্থ্য-তত্ত্ব) **২-৫০**

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

মানবতার সাগর-সঙ্গমে (সচিত্র) **৬৲**

বাংলার নাটক ও নাট্যশালা ৪৲

নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত

মেঘদূত ৭৲

ওমর খৈয়াম্ ৭৲

দুইখানি অনুপম কাব্য-গ্রন্থ। সচিত্র।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

কান্তকবি রজনীকান্তের

বাণী ২৲

আনন্দময়ী ১৲

শেষদান ১-২৫

বহুদিন ধরিয়া বাঙালী জাতিকে দুর্গগৎ হাস্যরস ও উচ্চভাবের প্রেরণা যোগাইতেছে।

সুধারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

এক জীবন অনেক জন্ম

একই জীবনে জন্ম-জন্মান্তরের বিচিত্র অনুভূতির স্বাদ আনে যে ব্যাপক প্রেম, মৃত্যুর অন্ধকারকে যা' জীবনের দীপ্তিতে রূপান্তরিত করে, তারই স্পর্শী বিস্তার। পথের আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রেমাংশুর অকাল প্রয়াণ দীপার জীবন ম্লান, রুক্ষ ও কঠিন ক'রে তুলেছিল—অনেক পরে মহতের আবির্ভাব—মৃত্যুর অন্ধকার ছিন্ন-ভিন্ন করে যে অসামান্য আলোয় দীপার জীবন পূর্ণ ও সার্থক ক'রে তুলল, সেই অসামান্য আলোর চিরন্তন প্রেমের অপরূপ কাহিনী।

দাম—৬·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

সমরেশ বসুর নূতন উপন্যাস

ছিন্নবাধা

সর্ব বাধা-বন্ধহীন একটি সৃষ্টিশীল আত্মসন্ধানী সাধারণ মানুষের পথ-চলার কাহিনী।

পঙ্কে তার উদ্ভব—পঙ্কিল পরিবেশেই তার পুষ্টি। কিন্তু তার অন্তরের সৃষ্টির প্রেরণা তাকে সকল প্রলোভন—সকল প্ররোচনা এবং সকল জটিলতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে তার শাশ্বত মানবাত্মার অভিব্যক্তিকে সহজ করে দিয়েছে।

একটি বলিষ্ঠ মানুষের সংঘাতময় বাস্তব জীবন-কথা। সুন্দর প্রচ্ছদ-শোভিত সুবৃহৎ উপন্যাস। দাম—৭·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

নতুন ধরনের নতুন বই

সবেমাত্র প্রকাশিত হল

বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা

—নির্মলেন্দু রায় চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যে একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। আজপর্যন্ত কোন ও ভারতীয় সাহিত্যে এ ধরনের প্রচেষ্টা হয় নি।

গ্রন্থটিতে কথাসাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ছত্রিশজন লেখকের ছত্রিশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বা নাটকের কাহিনীগুলি সংকলিত হয়েছে।—মূল গ্রন্থের বক্তব্য এবং উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি বজায় রেখে গ্রন্থকার চিত্তাকর্ষক ভাষায় কাহিনীগুলিকে সরস গল্পরূপে ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। লেখনীর প্রসাদগুণে ও মাধুর্যে প্রত্যেকটি গল্পই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও রসোত্তীর্ণ।

আলোকচিত্রসহ উক্ত বরণীয় সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছে।

আমরা নিঃসন্দেহ যে সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাই গ্রন্থটি প'ড়ে আনন্দ পাবেন।

বইখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রায় চারিশত। সাইজ—ডবল ডিমাই। মূল্য মাত্র দশ টাকা। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই প্রথম শ্রেণীর।

প্রকাশক :

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

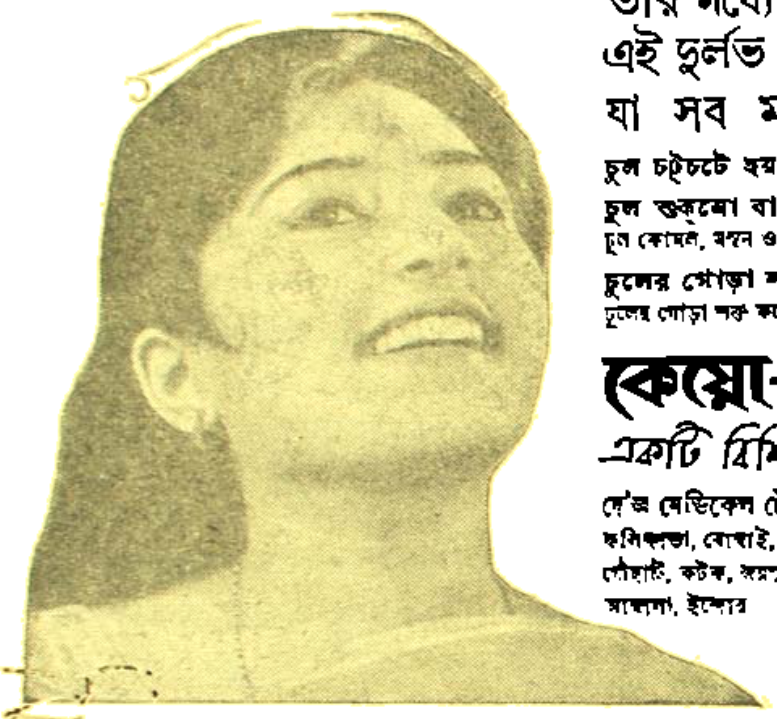

যে কয়েকটি নামকরা চুলের তেল আছে
তার মধ্যে কেয়ো-কার্পিন তেলেই
এই দুর্লভ গুণ গুলি বর্ত্তমান
যা সব মহিলাদেরই পছন্দ

চুল চট্‌চটে হয় না এ শুধু কেয়োকার্পিনেই সম্ভব
চুল শুক্‌নো বা রুক্ষ দেখায় না-সারাদিন
চুল কোমল, মসৃণ ও পরিপাটি থাকে
চুলের গোড়া শক্ত করে-গ্রন্থিস্থ ও পরিষ্কার রেখে
চুলের গোড়া শক্ত করে।

কেয়ো-কার্পিন
একটি বিশিষ্ট কেশ তৈল

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা,
গৌহাটি, কটক, জয়পুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আহমদাবাদ, ইন্দোর

Deys

PK-DHMS-1B

ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্কে
সঞ্চয় করুন,
আনন্দের সঙ্গে
গ'ড়ে উঠবে
সঞ্চয়ের অভ্যাস।

- মেয়াদী আমানতে (মেয়াদ অনুযায়ী) সর্ব্বোচ্চ বার্ষিক সুদ ৭½%
- সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে বার্ষিক সুদ ৪%
- রেকারিং ডিপোজিটে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা

সেবার প্রতীক

ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা—১

ভারতবর্ষের সূচী

ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—পঞ্চম সংখ্যা

বৈশাখ—১৩৭৩

লেখ-সূচী

১। ব্রহ্মজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)
শ্রীশশধরেশ্বর মহাপাত্র

২। ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ (কবিতা)
পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভূষণী ৪৫৩

৩। অঘটনের পূর্বরাগ (উপন্যাস)
দিলীপকুমার রায় ৪৫৪

৪। প্রিয়বন্ধু নিকলসন্ (কবিতা)
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ... ৪৫৯

চিত্র-সূচী

১। রবীন্দ্রনাথ,

২। শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখ-সূচী

৪। রবীন্দ্রনাথের গুরুস্থানীয় গ্রন্থে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব (প্রবন্ধ)
ডঃ দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬০
৬। মহানগরীর পথে (কবিতা)
শ্রীআশুতোষ সান্যাল ৪৬৭
৭। 'নিষ্কাম্যকর্ম'-তত্ত্বের রবীন্দ্র ভাষ্য (প্রবন্ধ)
পম্পা ঘোষ ... ৪৬৮
৮। হাজারাহাজার (গল্প)
অভিনারায়ণ ভট্টাচার্য ৪৭১
৯। রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা (প্রবন্ধ)
শ্রীউদয়দেব রায় ৪৮৪
১০। শুদ্ধশিলা (আলোচনা)
অধ্যাপক অতুলানন্দ সেন ... ৪৮৭

চিত্র-সূচী

রাইকলার-চিত্র
রবীন্দ্রনাথ
বিশেষ-চিত্র
১। আচার্য্য নন্দলাল বসু
২। রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুষমা মিত্র প্রণীত
নিশীথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে
দাম—২৸০

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত
রূপসী না সজীব বোমা? ২৲
লণ্ডনে শঙ্খচর ২৲
মরণের রণ-ভেরী ২৲
কুহকিনীর ফাঁদ ২৲
প্রচ্ছন্ন আততায়ী ২৲
চীনের ড্রাগন ৩৭৫
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কবিভূষণ প্রণীত
আয়ুর্ব্বেদ-সোপান
শরীরং ব্যাধিমন্দিরং—অর্থাৎ আমাদের শরীর বিবিধ ব্যাধির আবাস-স্থল। সেজন্য সাধারণ অট্টালিকার ন্যায় মধ্যে মধ্যে জীর্ণ ও অসুস্থ শরীরেরও মেরামতী বা চিকিৎসা দরকার। সুতরাং তার মিক্সিপিরি বা চিকিৎসা-পদ্ধতি সকলেরই কিছু-না-কিছু জানা থাকা প্রয়োজন।

এদেশের জল-হাওয়ায় মানুষ হওয়া ভারতীয়দের জন্য এই দেশের ঋষিকল্পগণ যুগে-যুগে যে ঔষধ ও চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, আমাদের পক্ষে তা-ই যে সর্বোত্তম বিধান, এতে আর সন্দেহ কি? প্রখ্যাতনামা কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রাচীন আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের ব্যবহার্য দুরূহ তত্ত্বগুলি সরল বাঙলায় সুলভবোধ্যভাবে সাধারণের উপযোগী ক'রে প্রকাশ ক'রেছেন।

প্রতি গৃহস্থেরই ঘরে রাখার উপযোগী অত্যাবশ্যক গ্রন্থ।

দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

লেখ-সূচী

১১। প্রত্যয়ের পরমায়ু (গল্প)
শচীন রায় ৪৯০
১২। নববর্ষের বংশেরা (কবিতা)
শ্রীসুধীর গুপ্ত ৪৯৫
১৩। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক (প্রবন্ধ)
অরুণ বে ... ৪৯৬
১৪। নববর্ষ (আলোচনা)
নির্মলগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় ৪৯৮
১৫। প্রতিহারী (গল্প)
সমীর চট্টোপাধ্যায় ৪৯৯
১৬। তোমার পূজা (কবিতা)
শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী ৫০৪
১৭। সাময়িকী ৫০৫
১৮। বিকালের মাঠ (কবিতা
শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ... ৫০৭

লেখ-সূচী

১৯। বিশ্বভারতী ও বৌদ্ধভাবধারা
সুধাংশুবিমল বড়ুয়া
২০। ফুল ও কেকা (গল্প)—শ্রীসংযী মণ্ডল ...
২১। অপ্রয়োজনে (কবিতা)
সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১৫
২২। দৃশ্যপট (কবিতা)—শক্তি বসাক ৫১৫
২৩। কুমার সিং—শেখরচন্দ্র সেনগুপ্ত ৫১৬
২৪। রবীন্দ্রনাথের "শেষ সপ্তক"এ প্রেমানুভূতি (প্রবন্ধ)
শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য ৫২১
২৫। চিঠির অভাব—শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী ... ৫২৩
২৬। গঙ্গা পতিতপাবনী (কবিতা)
দিলীপকুমার রায়
২৭। কিশোর জগৎ—
(ক) দুঃসাহসী—শ্রীজ্ঞান
(খ) সাইলাস মারনার্—সৌম্য গুপ্ত

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী

জ্যোতিষ-সম্রাটপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষ এম্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)

(জ্যোতিষ-সম্রাট)

অখিল ভারত গণিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং কাশীর মহারাজার স্থায়ী সভাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি, তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংঘাতিক ব্যাধি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত কঠিন রোগাদির আরোগ্যে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মাজদ্ব, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশস্থ মনীষীবৃন্দ তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাঁহারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মাননীয়া মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সম্বোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি, কে, রায়, বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী মাননীয়াহাদুর শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত, কেউমন্ত্রড হাইকোর্টের মাননীয় জজ রাসসাহেব মিঃ এস, এম, বাদ, আসামের মাননীয় মাজ্যপাল স্যার ফকর আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ

ধনদাত্রী কবচ—ধারণে ধনাগমে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (অব্যর্থ)। সাধারণ—৭৷৵, শক্তিশালী বৃহৎ—২৯৷৵, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—১২৯৷৵, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি প্রার্থীর কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য)। সরস্বতী কবচ—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল ৯৷৵, বৃহৎ—৩৯৷৵। মোহিনী (বশীকরণ) কবচ ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১৷৵, বৃহৎ—৩৯৷৵, মহাশক্তিশালী ৩৮৭৷৵। বগলামুখী কবচ—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিস্থ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ৯৷৵, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৯৷৵, মহাশক্তিশালী—১৮৯৷৵ (আমাদের এই কবচ ধারণে আওরাল সন্ন্যাসী জয়ী হইয়াছেন)।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী

(স্থাপিতাব্দ ১৯০৭ খৃঃ) (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (ঙ), ধর্মতলা ষ্ট্রীট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রবেশ পথ ওয়েলেসলা ষ্ট্রীট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৯—৪০৭৯। সময়—বৈকাল ৩টা হইতে ৭টা। ব্রাঞ্চ অফিস ১০৫, গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৬, ফোন ৪৫—৩৬৮৩। সময়—প্রাতে ৯টা হইতে ১১টা

লেখ-সূচী

(গ) বিচার—তপতী দাসগুপ্ত

(ঘ) ছুটির ঘণ্টায়—চিত্রগুপ্ত

(ঙ) খাঁচা আর হেঁয়ালী—মনোহর মৈত্র

২৮। রবীন্দ্র রচনায় শিশু (প্রবন্ধ)
শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী ৫৩৭

২৯। রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)
কালীসাধন সেনগুপ্ত ৫৪৬

৩০। ক্ষয় নাই (গল্প)—শ্রীজগবন্ধু নাথ ৫৪৭

৩১। সমর্পণ (কবিতা)—কিতীশ দাসগুপ্ত ... ৫৫০

৩২। মেয়েদের কথা— ৫৫১

(ক) রবীন্দ্রকাব্যে নারী ও প্রেম (প্রবন্ধ)
কমলিনী রায়

(খ) রূপচর্চা—সুপর্ণা দেবী

(গ) রঙীন কাগজের বুটি-আনার কারুশিল্প—
কচিরা দেবী

(ঘ) রান্নাঘর—সুধীরা সেনগুপ্ত

৩৩। [illegible] মাটির পাত্র—নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৫৫৬

৩৪। গ্রহজগৎ—বাসুদেব ভট্টাচার্য্য ... ৫৫৯

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত
— জ্যোতিষ গ্রন্থরাজি —

পারাশরীয় সুশ্লোক-শতকম্

প্রায় বিশ বছর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ আমার প্রকাশিত হ'ল। জ্যোতি-বাচস্পতি মহাশয়ের টীকাসহ এই সংস্কৃত গ্রন্থখানি বিংশোত্তরী দশা বিচারের অমূল্য সম্পদ। ইহার সহিত "রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটস্" শীর্ষক তুলনামূলক বিচার সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী জহরলাল, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষীর জন্মকুণ্ডলী দেওয়া হয়েছে।

দাম—চার টাকা

বিবাহে জ্যোতিষ

বিয়ের আগে পাত্রপাত্রীর কোষ্ঠী নিয়ে অনেকেই জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হন। জ্যোতিষীর সাহায্য ছাড়া আপনি নিজেই মোটক বিচার করতে পারবেন.

দাম—দু' টাকা

— অন্যান্য গ্রন্থ —

কোষ্ঠী-দেখা ৫৲ হাত-দেখা ৪৲
মাসফল ৩৲ হাতের রেখা ৩৲ লগ্নফল ২৲
রাশিফল ৩৲ সরল জ্যোতিষ ৪৲
ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র ৪৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H

BI-COLATES
REGISTERED TRADE MARK
STEARNS

M&H

পিত্তরসপ্রবাহ, পাকস্থলীর স্বাভাবিক্রিয়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিনের প্রশংসাধন্য একটি অব্যর্থ ঔষধ।

MARTIN & HARRIS
PRIVATE LTD.
MERCANTILE BUILDING, LALBAZAR
CALCUTTA-1

M&H M&H M&H M&H M&H M&H M&H

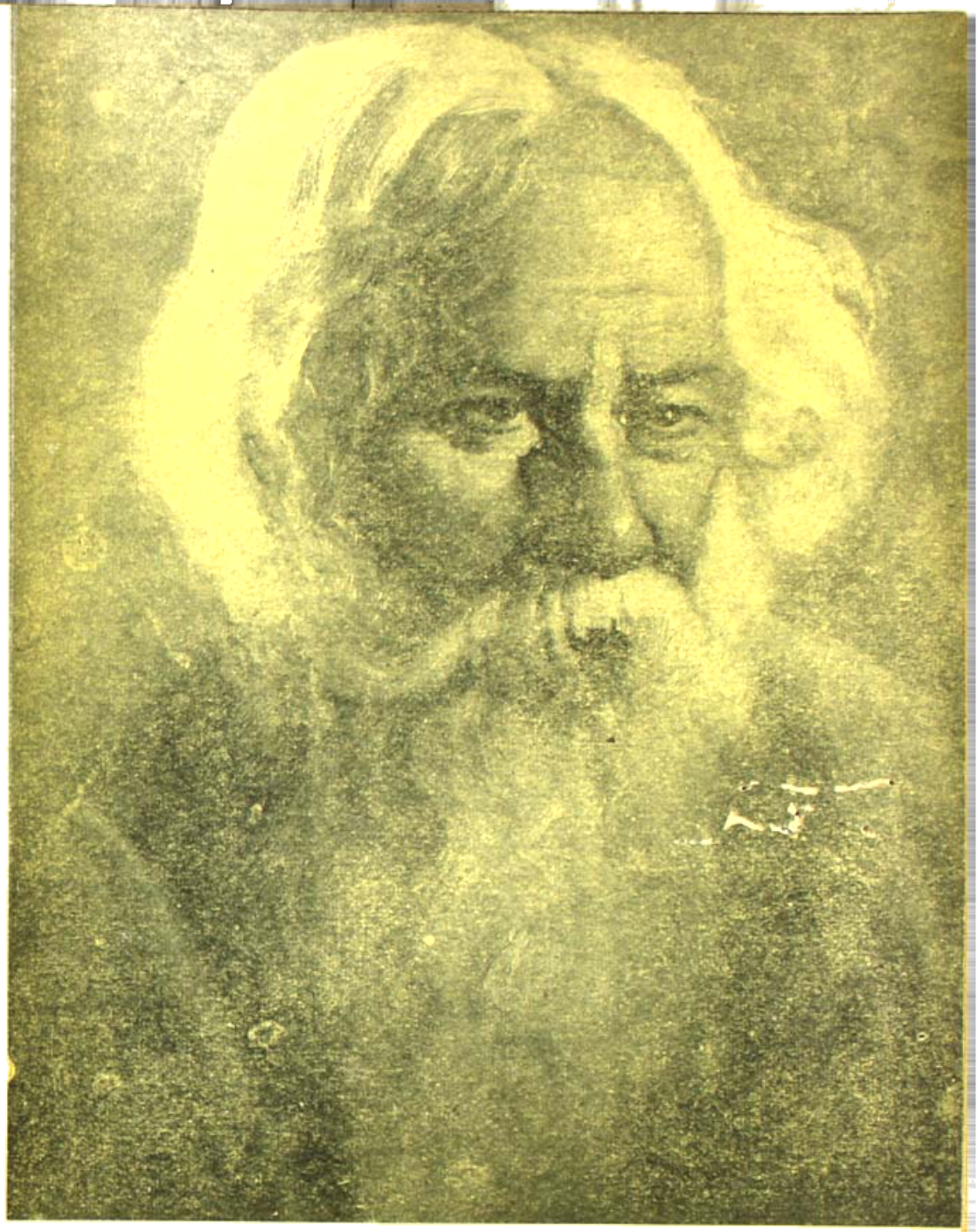

রবীন্দ্রনাথ

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

বৈশাখ—১৩৭৩

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

ব্রহ্মজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশশাঙ্কশেখর মহাপাত্র, এম-এ

"বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্"।

"সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর' অসীমকে জানার জন্য, তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য, যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। অব্যক্ত, অজেয়, অদৃশ্য, নিরাকার পরব্রহ্মকে দেখার জন্য মহামানবেরা লোকালয় হতে বহুদূরে প্রকৃতির নির্জন কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু জানার মধ্যে অনেক অজানা থেকে যায়, দেখার ভেতরে অনেক অদেখা রহে যায়। তিনি যে লীলাময়, ছলনাময়। বিভিন্ন ছলাকলায়, লীলাভঙ্গীমায় মানুষের জানার আকাঙ্ক্ষাকে, রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষমতাকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেন। সেই পরব্রহ্মের রসামৃত আস্বাদনের জন্য, অসত্য হইতে সত্যে উত্তরণের নিমিত্ত, তিনি সমস্ত বাঁধন টুটে 'অকারণ অকারণ' গতিতে সম্মুখের দিকে ধাবিত হন।

রবীন্দ্রনাথ সেই পরব্রহ্মকে জানার জন্য পার্বত্য অঞ্চলে বা বন প্রদেশের নির্জন আশ্রয়ে কোনদিনই কি গিয়েছিলেন? বরং যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই তিনি

দেশের ও দশের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তাইত তাঁকে সংগ্রাম মুহূর্তে দেখা যায় জনতার হাটে, প্রকাশ্য পথের মাঝে। তিনি চেয়েছিলেন অন্ধকারের মধ্যে কিছুটা আলো জ্বালিয়ে যেতে। দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে সে বোধ স্পর্শ করেছে সমস্ত বিশ্বসংসারকে। সেই জন্যই ত তাঁর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, আমরা আপন প্রাণকে মিলিয়ে দিতে পেরেছি মহাজীবন প্রবাহে।

মানুষের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, অত্যাচার, অনাচার, সবই দেখেছেন, অনুভব করেছেন, প্রয়োজনে তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী ধ্বনিত হয়েছে, সবই সত্য; কিন্তু তার চেয়ে আরও চরম ও পরম সত্য হ'ল—

"তবু ত বধির করেনি শ্রবণ তবু
বেসুর তালাতে কে দিয়াছে সুর আনি,
সকল কলুষ কণ্ঠার শুনি তবু
চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী।"

অবসর পেলেই তিনি নিজেকে আত্মচিন্তায়, ব্রহ্মচিন্তায়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে বা ব্রহ্মবিদ্যায় নিয়োজিত রাখতেন। প্রশ্ন জাগে—ব্রহ্মজ্ঞানে বা ব্রহ্মবিদ্যায় রবীন্দ্রনাথের অধিকার ছিল কি? আচার্যগণের মতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্য বিশেষ অধিকার প্রয়োজন। আচার্য শঙ্করের মতে—বিবেক, ঐহিক ও পারত্রিক ভোগের প্রতি বৈরাগ্য, ষট্ সম্পত্তি যথা, শম বহিরিন্দ্রিয় সংযম, দম অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, তিতিক্ষা শীতোষ্ণ ক্ষুধাতৃষ্ণা ইত্যাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, বিষয়ানুভব হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিরতি, আত্মতত্ত্বের ধ্যান এবং গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে সম্যক শ্রদ্ধা এবং মুমুক্ষুত্ব (মোক্ষের নিমিত্ত তীব্র ইচ্ছা) এই সকল যাহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনিই শুধু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্য আচার্যগণ বর্ণিত যে বিধিব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ তাহা কোনদিনই প্রতিপালন ক'রতেন না, তিনি ত নিজেই স্বীকার করেছেন "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"। তিনি যে বিশেষদর্শী ছিলেন, অর্থাৎ চিত্ত হইতে চৈতন্যকে পৃথকরূপে দেখতেন তা আমরা 'জীবন স্মৃতি' আলোচনা করলেই উপলব্ধি ক'রতে পারি। একাদশ কি দ্বাদশ বৎসরে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়েছিল। একদিন প্রাতঃকালে গায়ত্রীর মন্ত্র জপ করতে করতে চোখ দিয়ে জল টস্ টস্ করে পড়তে লাগল। "এই অপরিণত বয়সে গায়ত্রীর মন্ত্র মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি মুক্ত পুরোহিত, মহামুক্তির রসাস্বাদন অর্থাৎ চিত্ত হইতে চৈতন্যকে পৃথকরূপে বাল্যকাল হইতে দেখতেন। যেমন পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বাল্যাবস্থায় মাঠের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করার সময় দূরে এক ঝাঁক বলাকা দেখে তাঁর চৈতন্য অবলুপ্ত হয়েছিল; অর্থাৎ তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

আর একদিনের ঘটনা। "যখন বয়স হইয়াছে। আঠার কি উনিশ হইবে। একদিন ভোরে উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া চাহিয়াছিলাম। তখন সেই গাছপালার পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম এক অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন। আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আস্তরণ ছিল তাহা এক নিমিষে ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। আমার আবরণ খসিয়া পড়িল। মনে হইল সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখিলাম, মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখিলাম"। শাস্ত্রজ্ঞের মতে "ঈশাবাস্যং সর্বমিদং"—এই জগতের সবকিছুতেই ঈশ্বর বাস করেন। এই বিশেষদর্শন হয়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির বর্ণনায় দেখতে পাই সত্যকে দেখা, মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখা। নিজের হৃদয়কে বা অন্তঃকরণকে দেখা মানেই মহর্ষি পতঞ্জলি কথিত চিত্তকে দেখা। উপনিষদ বলেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই সমস্ত ভূতজগৎ আনন্দ হইতে জাত। "অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে"। কিন্তু আমরা ভূতজগৎকেই দেখি, সেই 'আনন্দ' বা "রসো বৈ সঃ"-কেই দেখি না। "চকিত আলোকে [illegible] সুন্দর, তবু দেয় না ধরা"—রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির বর্ণনায় দেখতে পাই। উপনিষদ্ বলেন—"তমেবভান্তং অনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"। সূর্য—চন্দ্র অগ্নি বিদ্যুৎ, কেহই তাহাকে প্রকাশ করে না। পৃথিবীর সমস্ত জ্যোতিষ্মান পদার্থ তাঁর নিকট নিষ্প্রভ হয়ে যায়, ম্লান হয়ে যায়। এই ঘটনাটিই রবীন্দ্রনাথের জীবনে তমসা হতে

জ্যোতিতে প্রথম জাগরণ, অসৎ হতে সত্যে প্রথম উত্তরণ এবং মৃত্যু হতে অমৃতে প্রথম আস্বাদন। একথায় তাঁর জীবনের যেন একটা আমূল রূপান্তর বা জন্মান্তর সাধিত হ'ল।

পরবর্তী কালে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"ধূলির আসনে বসি তুঁহারে দেখেছি ধ্যানচোখে,
আলোকের অতীত আলোকে,
অণু হতে অণীয়ান্, মহৎ হতে মহীয়ান
ইন্দ্রিয়ের পারে তাঁর পেয়েছি সন্ধান"।

ধূলির আসনে ব'সে অর্থাৎ সমস্তাবিজড়িত, হাসি কান্না, সুখদুঃখ সম্বলিত, এই সমাজের মধ্যে অবস্থান করে রবীন্দ্রনাথ ভূমাকে দেখেছেন। এই ভূমাকে দেখবার জন্য লোকালয় হতে বহুদূরে নির্জন প্রান্তরে বসে কঠোর সাধনায় তিনি কোনদিনই মগ্ন হন নাই। বরং "কর্মে ও কথায়" মানুষের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করে ভূমাকে দেখেছেন, অর্থাৎ উপনিষদ কথিত ব্রহ্মকে দেখেছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখা যায় না। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেছেন 'ধ্যানচোখে' যাহা আচার্য্য শঙ্কর 'আবৃতচক্ষু' বলে অভিহিত করেছেন। উপনিষদের ঋষিরা বলেন ব্রহ্মকে দেখা যায়, "মনো হ্যস্য বৈ চক্ষুঃ।' রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত যাহা ধ্যানচোখে আচার্য্য শঙ্করের ভাষায় তাহা আবৃতচক্ষু এবং ঋষিদের নিকট তাহা হ'ল "মনো হ্যস্য বৈ চক্ষুঃ" অর্থ হ'ল বিষয়ানুভব হ'তে বিরতি অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের ধ্যান—"শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ" "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ"।

প্রশ্ন জাগে—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
এইরূপ যে ব্রহ্ম তাঁকে ত দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না। এই কথায় তিনি 'অবাঙ্‌মনসগোচর'।

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির বর্ণনায়

"ধন্য যে আমি সে কথা জানাই কারে
'পরশাতীতের' হরষ বাজে যে বুকে।"

কেন নিজেকে তিনি ধন্য বলে মেনে নিয়েছেন? শুধু তাই নয় 'পরশাতীতের' অর্থাৎ যিনি পরশের অতীত—আনন্দ তাঁর হৃদয় বীণায় "বেদুর ছাপায়ে কে দিয়াছে সুর আনি।" "চির দিবসের শান্ত শিবের বাণী" শুনে তাঁর হৃদয় "ঝড়ের মত নাচে যে" তিনি হয়ে উঠেন "হৃদয়ের পিয়াসী।"। তাঁকে ধ্যানচোখে দেখে রবীন্দ্রনাথের "সুর যেমে যায় কথা না যোগায় মুখে"। সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখা যায় না। দেখতে হ'লে ধ্যানচক্ষুর প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ পরব্রহ্মের সন্ধান কোথায় পেয়েছেন? "আলোকের অতীত আলোকে।" উপনিষদ বলেন "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" এইরূপ যিনি তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় "তমসঃ পরস্তাৎ" অর্থাৎ তমসার পরপারে। যাঁর নিকট "তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। পৃথিবীর সমূহ জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ তাঁর নিকট ম্লান হয়ে যায়, নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কেহই তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, অপ্রকাশের বেদনা মানুষের মনে থাকে বলেই ত তিনি এত মধুময়।

ব্রহ্মের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"অণু হতে অণীয়ান মহৎ হতে মহীয়ান।"

ব্রহ্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে উপনিষদ বলেন—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্"। অণু হতে অণীয়ান্ মহৎ হতে মহীয়ান্ এইরূপ যে ব্রহ্ম তিনি প্রতি জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থিত রয়েছেন।

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" যে ব্রহ্ম রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির বর্ণনায় "ইন্দ্রিয়ের পারে" তাঁর সন্ধান পেয়েছেন। উপনিষদ্ বলেন ব্রহ্ম "তমসঃ পরস্তাৎ" অর্থাৎ তমসার পরপারে অবস্থিত রয়েছেন। বাহ্যতঃ তমসার পার ও ইন্দ্রিয়ের পার একই অর্থ বহন করে না। চক্ষুরাদি ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয় তমসার পরপারের রহস্য উদ্ঘাটনে অসমর্থ হয়। দৃশ্যবস্তুই দ্রষ্টার নিকট প্রকাশ করাই হ'ল পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাজ। বাহিরে অর্থাৎ তমসার পরপারে কি রয়েছে তা উদ্ঘাটন করতে হলে ধ্যানচক্ষুর প্রয়োজন। অতএব চক্ষুরাদি ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয় হ'ল-দ্রষ্টা এবং দৃশ্যবস্তুর মধ্যে সংযোগহেতু। দৃশ্য বস্তুর পরপারে কি রয়েছে তা দ্রষ্টার পক্ষে উপলব্ধি করা অসম্ভব। সেখানে তমসা বিরাজমান। সুতরাং দৃশ্য বস্তু পরপারে কি রয়েছে তা পর্য্যালোচনা না করে দ্রষ্টার পরপারে কি রয়েছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। তা হ'লে হয়ত: এই গূঢ় প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

উপনিষদের ঋষিরা বলেন, তমসার পরপারে দ্রষ্টার হৃদয় গুহায় "রসো বৈ সঃ" বিরাজমান। বিষয়ানুভব হতে ইন্দ্রিয়গণের বিরতি ও আত্মস্থের ধ্যান দ্বারা দ্রষ্টা তমসার পরপারে "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম"-এর বিশ্বরূপ অবলোকনে সমর্থ হন, যিনি প্রতি জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থিত রয়েছেন। সুতরাং এইরূপ যে "রসো বৈ সঃ" তাঁকে দেখার অর্থ হল আত্মাকে দেখা। উপনিষদে বর্ণিত আত্মাকে দেখার অর্থ হ'ল ব্রহ্মকে দেখা। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে তাঁর কাব্যে জীবন দেবতা রূপে অভিহিত করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত—"ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান" অর্থ হল আত্মার সন্ধান পেয়েছেন অর্থাৎ ব্রহ্মের সন্ধান পেয়েছেন। এককথায় তাঁর 'বিশেষ দর্শন' হয়েছিল।

সন্ধান পাওয়ার পর তাঁর মানসিক অবস্থা হয়েছিল—

"চিরপ্রেমের বেদীর সম্মুখে,
চিরনির্ব্বাক রহে বিরাট নিরুত্তর।"

আর তাঁকে দেখে—

"দেখেছি দেখেছি এই কথা বলিবারে
সুর থেমে যায় কথা না যোগায় মুখে।"

চোখ যা দেখে তাকে দেখে 'দেখেছি দেখেছি' বলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'চিরপ্রেমের বেদীর সম্মুখে' সুন্দরকে দেখে 'চিরনির্ব্বাক হয়ে যান।' 'সুর থেমে যায় কথা না যোগায় মুখে।' 'চকিত আলোকে দেখা যেন 'তবুও ধরা না ধরা'। ধরা যেন নাই বলেই ত তিনি এত সুন্দর। অপ্রকাশের বেদনা থাকে বলেই ত তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট 'জীবন দেবতা' রূপে অভিহিত হয়েছেন। তিনি ত্রিগুণাতীত (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) বলেই ত মানুষ তাঁর গুণের সীমা পরিসীমা পায় না। ভিন্ন লীলায়, ভিন্ন ছলা-কলায় মানুষ তাঁর কর্ত্তব্য উপলব্ধি করে বলেই ত তিনি এত লীলাময়, ছলনাময়। মানুষের জ্ঞানের বাহিরে বলেই ত তিনি দুর্জ্ঞেয়, চির রহস্যময়। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" বলেই তো তিনি অব্যয়, ও অব্যক্ত। তিনি কাউকে পূর্ণ করান আবার কাউকে শূন্য করান। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায়—

"আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব,
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নবনব।"

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির বর্ণনায় যাহাই থাকুক না কেন, তিনি "পরশ, কলুষ, মঞ্জায়" যখনই "চিরবিরহের শান্ত শিবের বাণী" শুনেন তখন তাঁর উপলব্ধিতে "বেসুর ছাপায়ে কে দিয়াছে সুর আনি।" যদিও "সুর থেমে যায় কথা না যোগায় মুখে," "তবুও বধির করেনি শ্রবণ কভু" সেই উপনিষদ্ বর্ণিত শান্তং, শিবং, সুন্দরম্-এর বাণী শোনার সময়।

কবির হাত ধরে, তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে, আমরাও পৌঁছে যাই বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্লোকে—

মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে
সেই মূক মাটি আমার মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে,
প্রবাস কোথাও নাহিরে নাহিরে জনমে মরণে।"

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

অন্বয় উপপত্তেঃ (১৩)

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—

য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে
এষ আত্মা ইতি হোবাচ
এতদমৃত মভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি।

এরই মধ্যে পুরুষ যেমন আপন রূপেতে রয়
ইহাই আত্মা অজর অমৃত অভয় রূপেতে রয়
অক্ষি পুরুষ কেহ এরে কয়
কেহ বলে প্রতিবিম্বই হয়
কেহ ভাবে বুঝি আঁখি ইন্দ্রিয় এই রূপ ধরে রয়
কেহ ভাবে জীব, কেহ বা ব্রহ্ম সঠিক একথা হয়।
ইনিই ব্রহ্ম যোগিগণ এরে চক্ষুর মাঝে পায়
নির্লেপত্ব আর কর্মফলদাতা ব্রহ্ম ছাড়া কি হয়
ব্রহ্মে জানিয়া ঠিক
দেখগো নির্নিমিখ
চির অতুলন সেই প্রিয়জন তোমারি আঁখির মাঝে
ভেবে দেখো মন আর কোনজন রহিয়াছে এত কাছে।

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ

স্থানের কথায় আরো বোঝা যায়
ইনি ব্রহ্মই হন
মনে ভুল হয় ব্রহ্ম বা নয়
ব্রহ্ম নহেতে ন।
করিওনা ভুল যিনি সব মূল
সমতুল কেহ নয়
কখন নামেতে কখন রূপেতে
ব্রহ্মেরি কথা কয়।
যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন (বৃঃ উঃ)
তস্য উদ্গিতি নাম (ছাঃ উ)
হিরণ্যশ্মশ্রু (ছাঃ উ)

শ্রুতিতেও নানা স্থানে নাম রূপময়
ব্রহ্মের বর্ণনা আছে ব্রহ্মই হয়।

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ (১৪)

ইনিই সুখবিশিষ্ট উল্লেখ যে হয়
প্রাণো ব্রহ্ম কং অর্থে সুখ জেন হয়
ব্রহ্ম খং আকাশে বলে
সুস্পষ্ট ইহাই হলে
ব্রহ্মে যে অমৃত আর আনন্দ যে রয়
বিষয় সংস্পর্শ ছাড়া শুধু মুক্ত হয়।

শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাৎ (১৫)

উপনিষদের গুরু শুনিয়া জানিয়াছে যেই জন
ব্রহ্মবিৎ বলিয়া তাহারে বলে যে সর্বজন
ব্রহ্মের গতি কয়
উল্লেখ যেথা হয়
উপনিষদ ও গীতায় জানিও এই কথা লেখা আছে
ব্রহ্মে জানিলে দেবযানে গতি মোক্ষ লভে
সে পাছে—
অক্ষি পুরুষ যিনি
এই পথে যায় ঠিক
পরিশেষে সেই ব্রহ্মে লভিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন।
ব্রহ্মই গতি গতির বিষয় বিলয় করিয়া কন।

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ (১৭)

ইতরঃ ন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পুরুষ সমুখে যখন রয়
তাঁরি ছায়া এই চক্ষুতে পড়ে একথা কখন নয়
অসম্ভবাৎ কথা
অমৃতময়ের গাথা
ইহা হতে শুধু ব্রহ্মে বুঝায় ছায়া পুরুষেতে নয়
ব্রহ্মের কথা হল বর্ণনা অন্য কাহারও নয়।

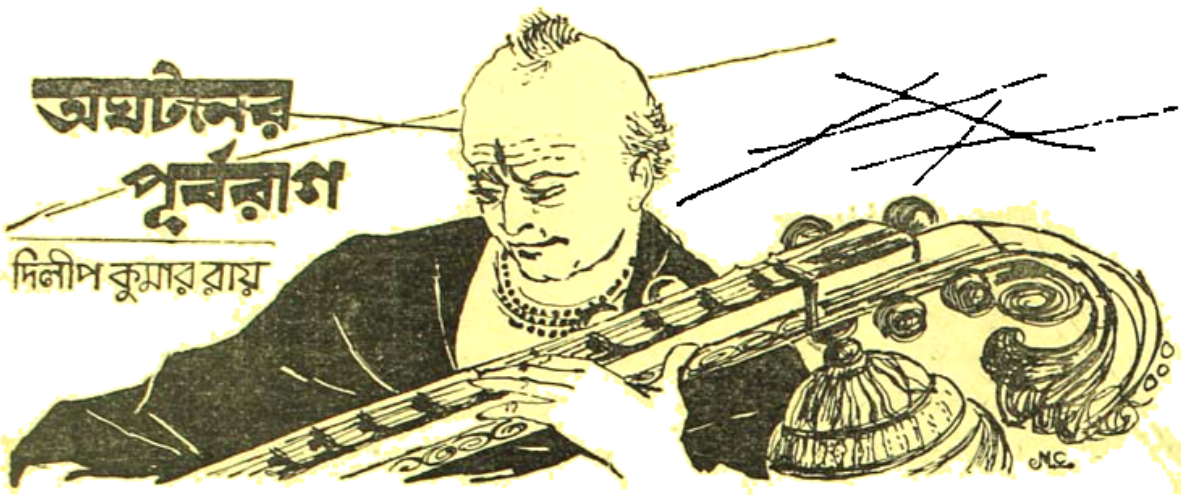

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভেইশ

সোফিয়া (রুদ্ধশ্বাসে) : তারপর, দাদা ?

অসিত : অনহার কথাটার মানে এমন ক'রে আর কখনো অনুভব করেছি কি না মনে পড়ছে না। কারণ মনে হ'ল যেন কী একটা স'রে গেল পায়ের নিচে থেকে। অথচ আমার দোষে না আর কারুর—ভেবে পেলাম না। কী বলব কী করব ভাববার শক্তিও যেন উবে গেছে।

চমক ভাঙল শমিতার কণ্ঠস্বরে। ও আমার দিকে ফিরে বলল নিরুত্তাপ কণ্ঠে, "বোধহয় টেলিফোন। তুমি বোসো অসিত—ওর সঙ্গে একটু গল্প করো—আমি এলাম ব'লে।"

"এতই সহজ ভঙ্গিতে ও কথা বলল যে, আমার একবার মনে হ'ল বুঝি স্বপ্নে একটা নাটক দেখছি। কারণ এরকম অবস্থায় যে কোনো মেয়ে এক মুহূর্তে সুর বদলে এখন সহজে স্বচ্ছন্দে কথা কইতে পারে এ আমি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। মুখের ওর একটা রেখাও কি একটু বদলাল ! কিন্তু যা দেখছি তার বাস্তবতা যাচাই করতে না করতে দেখি শমিতা অদৃশ্য—মুহূর্তে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে।"

ওকে বললাম : "কী ? বলবে একটু ? না কাজ আছে ?"

ও বলল ধারালো হেসে : "আমার কাজ ! ওমা ! আমি কি ঝি ?"

জোর ক'রে হাসতে হ'ল আমাকেও—কী করি ? বললাম : "তাহলে একটু বসলেই বা।"

ও বলল—খুব সহজেই। মনে হ'ল আমার—যদি গল্পে একথা লিখি বহুদর্শী রিয়ালিষ্ট ক্রিটিকরা বলবেনই বলবেন হ'তেই পারে না—

ভগবানের করুণার মতনই এও অবাস্তব। কিন্তু সে দুর্লক্ষ্যে—এ নিয়ে গবেষণা করবারও সময় পেলাম না, ও বলল তেমনি সহজ সুরেই : "ভাবছ—কী সুন্দর বাগানটি দিদির, না অসিত ? রকারিটি দিদি নিজে হাতে তুলেছে !"

"এত ঠাট্টা কেন ?"

"তোমাকে ঠাট্টা ! আর করব আমি—এরও পরে ?"

"কিসের ?"

"আত্মকাহিনীর ! যোগিনীর চোখেও যে এত জল থাকে জানতে কি তুমি ?"

"মানে ?"

"মানে, আমি স—ব শুনেছি আড়াল থেকে।—কিন্তু অমন চম্‌কে উঠছ কেন বিবেকানন্দ পুরুষ ? তুমি নিজে তো আর eyesdropper নও।"

একটু ভরসা পেলাম এতক্ষণে। হাল্কাসুরে বললাম : "দিদির ওপর এত রাগ করা কি ভালো ?"

ওর ঠোঁটে ফুটে উঠল শাণিত হাসি : "রাগ ? আমার অধিকার ? তবে একটু মজা লাগে বৈ কি ভাবতে যে, একই ঘটনাকে দরকার হলে মেয়েরা কী ভাবে উল্‌টিয়ে বলে।"

"মানে—"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—দিদি তোমাকে আগাগোড়া লিখে বুঝিয়েছে। কারণ কাল বাবা-মার মধ্যে যে ওকথার হয়েছিল তার শ্রোতা ছিল দুজন—নৈলে ও তোমাকে এত ক'রে মানা করত না কাউকে বলতে।" ওর বাঙ্গ হাসি নিতে গেল, ও কাঁকালো সুরে বলল: "শোনো অসিত, আমি বলবই আজ, আর স-ব বলব। হয়ত তুমি বিশ্বাস করবে না—তবু সত্যকে যখন বেঁকিয়ে বলা হয় তখন যে মারাত্মক ছবিটা আঁকা হয় তাকে ভেঙে ফেলার সাধ্যমত চেষ্টা করা আমার কর্তব্য। একটু ঘুরে বসবে?—ও আড়ি না পাতে, শোধ তুলতে। আমি চোখ রাখতে চাই।"

• • •

মৃদুনা বলল: "বাবার দোষ আছে আমি জানি অসিত। এ-ও আমি কোনোদিনই মেনে নিই নি যে, সন্তান সন্তান ব'লেই বাপমার কোনো দোষকে সে দোষ বলতে পাবে না। অনুচিত হ'ল অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া—এছাড়া আর কোনো নৈতিক নিষেধ আমি কোনোদিনই মানি নি···আশা করি মানবও না। তাই·· বাবার দোষ আছে একাধিক একথা বলতে আমি বাধা পেলেও কোনো রকমই গ্লানি বোধ করি না। আমার গ্লানি হয়—যখন দেখি কেউ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে একতরফা ওকালতি করছে অর্ধসত্যের আড়ালে আত্মরক্ষা ক'রে। যাক্ শোনো।

"বাবার দোষ যথেষ্ট আছে—প্রধান দোষ তিনি পুরুষ," ঈষৎ বাঙ্গ হেসে: "কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর ডিফেন্স এই যে, পুরুষ হয়ে জন্মানোর ওপর তাঁর হাত ছিল না।—না, হেসো না তুমি। আমি ফেমিনিস্ট হ'তে চেয়ে একথা বলি নি। আমি বিশ্বাস করি, দিদির মতনই, যে, সংসারে বেশির ভাগ দুঃখের জন্যে স্ত্রী মেয়েরা নয়, স্বামী পুরুষের অধিকার বোধের দুরারোগ্য ব্যাধি। কিন্তু তবু—অর্থাৎ মাকে দিয়ে বাবা অনেক কিছুই করাতে চেয়েছেন যা মা স্বেচ্ছায় করতেন না, একথা মেনে নিয়েও আমি বলব আমাদের সংসারে অশান্তি বিশৃঙ্খলার জন্যে মার-ই দায়িত্ব বেশি। মা মুখে বলেছেন সংসারে পৌরুষের অত্যাচারের ধাক্কাটা ওঁকেই সইতে হয়েছে মাত্র পনের আনা। কিন্তু যে-পৃথিবী বাইরের অত্যাচারের অভাব দেয় নিজের অন্তর্জীবনটাকে নষ্ট ক'রে, নিজের আশাভঙ্গের দরুণ সমস্ত গৃহস্থালিটাকে তছনছ ক'রে দেয় অযুনিয়মনে—তার পওয়াকে কি সওয়া নাম দেওয়া চলে অসিত? সব সেই যে tit-এর বদলে tat ফিরিয়ে দিতে চাইলেও পারে না। কিন্তু মা বাবার জন্য যেটুকু ছেড়েছেন তার শোধ তোলেননি কি মুখে-আসলে তাদের আদায় ক'রে নিয়ে? বাবা পৌত্তলিকতার বিরোধী—ওঁকে দিলেন না গির্জের যেতে; বেশ, মা প্রতিফল দিলেন রুজ মেখে, চুরুট খ'রে—যা বাবা পছন্দ করতেন না কোনোদিনও। মা ছিলেন সত্যিই মেয়েলি প্রকৃতির মানুষ—খৃষ্টান হ'লে হবে কি—স্বভাবের তুলনায় আচারগত ধর্ম বাইরের জিনিষ নয় কি?—আগে আগে মাকে দেখলে কেউ কখনো বলতে পারত কি যে, ওঁর মধ্যে খৃষ্টানিয়ানা লেশও আছে? বাস্তবিক ছিলও না। এমন কি, মার প্রকৃতি চাইত পর্দা না হোক, খানিকটা আব্রুর আড়াল। বাবা অন্যায় করলেন সেখানে বাধ সেধে। স্রাবে নাচঘরে রেসে নিয়ে যেতেন জোর ক'রেই, মা যেতে না চাইলে বাধাতেন কুরুক্ষেত্র। এখানে বাবা অত্যাচার করেছেন মানি। কিন্তু মা তার প্রতিশোধ দিলেন কী ক'রে? না, পর্দা আব্রু সব ছেড়ে বছর বছর বিলেত গিয়ে, যেখানে সেখানে অজস্র অর্থব্যয় ক'রে, মেয়েদের বাপের কাছছাড়া করে—নিজে বেশি বয়সেও বলডান্স ক'রে—ধিক্। বাবা এসব দুঃখ পেয়ে মদ ধরলেন। ঘর থেকেও যার ঘর নেই তার দুঃখ নিরাশ্রয়ের চেয়েও বেশি অসিত, কেন না নিরাশ্রয়ের তবু আশা আছে, কিন্তু স্বপ্ন যার ভেঙেছে তার আশা কোথায় বলো? কাল বাবাকে যে-মাতাল অবস্থায় দেখলে—তার পিছনে কি কম যন্ত্রণার ইতিহাস লুকিয়ে আছে মনে করো তুমি? অসিত, বাবাকে বিচার করবার সময়ে এইটে মনে রেখো যে, তিনি দুঃখ যা দিয়েছেন তার অন্ততঃ চতুর্গুণ ফিরে পেয়েছেন। দাঁড়াও—কথা কোয়ো না—আমি আজ তর্ক করতে আসি নি—মা-কে দুষতেও না। আমি এসব বলছি শুধু অসত্যের প্রতিবাদ করা উচিত মনে করি ব'লে।—

একটু দম নিয়ে ও ব'লে চলল: "মানি, বাবা দুঃখে প'ড়ে হাল ছেড়ে দিয়ে ভালো করেন নি—কিন্তু মা-ই

কি ভালো করেছিলেন এভাবে উজ্জ্বল হয়ে সবাইকার জীবনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে? আজ আমি বিলাসিনী —ইচ্ছে করলেও নিজেকে শোধরাতে পারি নে—মানি। কিন্তু আমি কি এরকম না হ'য়ে আর কিছু হ'তে পারতাম না মনে করো, যদি মা আমার চরিত্রের ইচ্ছাশক্তি নিস্তেজ না করে দিতেন আইশব ফিরিঙ্গিয়ানা শিখিয়ে? আমি পিয়ানো ভালোবাসি না, তবু জোর ক'রে আমাকে পিয়ানো শেখালো কে? মা। আমি ক্লাবে যেতে ভালোবাসতাম না—টেনিস খেলতেও না। ক্লাবে যেতে, টেনিস খেলতে আমাকে বাধ্য করালো কে? মা। ভগবানে মতি শুধু দিদিরই একচেটে নয় অসিত। ছেলে-বেলায় প্রার্থনা করতে আমারও চোখে জল আসত। কে আমার মন ঘুরিয়ে দিলে ওসব কুসংস্কার ব'লে? মা।"

আমি বললাম: "কিছু মনে কোরো না মৃদুলা। কিন্তু তোমার দিদির মেরুদণ্ড তোমার মা ভাঙতে পারলেন না কেন?"

ওর কণ্ঠের সুর চড়ল: "দিদি? তাকে তুমি কতটুকু জানো?—কিন্তু না, দিদির কথা যেতে দাও। কেবল একটা কথা ব'লে রাখি: মেয়েরা যে কতটা অভিনয় করতে পারে তার ভুল পাওয়া তোমার মতন সরল মানুষের পক্ষে—" কথাটা ও শেষ করতে পারল না—মুখ ফিরিয়ে বসল হঠাৎ—এমনি।

মনটা কি রকম বিষাদে হ'য়ে গেল। শক্ত মাটির উপরে যে চিরদিন বাস ক'রে এসেছে সে একদিন সকাল বেলা উঠে বসতে গিয়েই যদি হঠাৎ দেখে মাটিটা চোরাবালি —তার মনটা কিরকম অসহায় হয় কল্পনা করতে চেষ্টা করো। আমি সত্যি যেন কোথাও খই পাচ্ছিলাম না—বিশেষ ক'রে আরো এই ভয়ে যে, সত্যিই আমি ওদের কারুর সম্বন্ধেই প্রায় কিছুই জানতাম না।"

বার্বারা (উৎসুক কণ্ঠে): তারপর দাদা?

অসিত: এই সব সাত পাঁচ এলোমেলো ভাবছি এমন সময় ও হঠাৎ ফিরে তাকালো আমার পানে। বলল ওর চিরাচরিত আকস্মিক ঢঙেই: "থাক্ ও কথা।—আমি দিদির নামে চুকলি করতে আসি নি তো।" ব'লে কথাটা বোধ হয় ওর নিজের কানেই একটু বেখাপ্পা লাগল—তাই বলল: "দূর হোক গে যাক—আমার হাতে সময় অঢেল নেই—যা বলতে এসেছি ব'লে শেষ করতেই হবে—যেমন ক'রে পারি। তাই আর তর্ক তুলো না লক্ষ্মীটি, আমাকে বলতে দাও।

"শোনো অসিত, একটা কথা কিন্তু বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে: যে, আমি এসেছি যেমন দিদির নামে লাগাতেও না, বাবার হ'য়ে ওকালতি করতেও না—সত্যি বলছি। এমন কি, তাঁর দুঃখে আমার হৃদয় টনটন ক'রে ওঠে এ জানিয়ে তোমার আদর কাড়তেও আমার এতটুকু তর্পিচ্ছা নয়। বাবার চরিত্রে নানা দোষ ত্রুটি আছে আমি জানি—কিন্তু তবু আমি বলবই বলব যে, দোষ গুণের গুণ এভাবে বিচার করে মানুষকে বুঝতে গেলে তাকে বোঝা যায় না, যায় কেবল বিচার করা। গোটা মানুষটার নাগাল যদি পেতে হয় তবে দেখতে হবে তার সংস্পর্শে আশপাশের জীবন—সব জড়িয়ে—কতটা পেল, সংসার খতিয়ে কতখানি সম্পৎশালী হ'ল। বাবার হাজার দোষ থাক,একটা মস্ত গুণ তাঁর স্নেহশীলতা। তিনি ভালো-বাসেন—ভালোবাসাই তাঁর স্বভাব ব'লে—ভালোবাসা দিয়ে নিজের কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি চান ব'লে নয়। অবশ্য এসূত্রে একটু আধটু অহমিকার খোরাক হয়ত চান গৌণ-ভাবে—মনে রেখো তিনি মানুষ, দেবতা নন। কিন্তু যদি তিনি দেখেন যে স্নেহাস্পদের সুখ একদিকে তাঁর নিজের সুখ অন্যদিকে, তখন তাঁর মতি ঘোর নেবেই প্রথমটার পানে। মা-র অনেক গুণ আছে। কিন্তু ভালোবাসা কাকে বলে তিনি—না থাক্—এসব বলতে আমার ইচ্ছে করছে না। কারণ এও হতে পারে যে মা-র ভালোবাসা না-পাওয়ার দরুণ কোনো দুর্জয় ক্ষোভই এসব বলিয়ে নিচ্ছে আমাকে দিয়ে—শুধু বিশ্বাস কোরো—স্বভাবে আমি সত্যিই নিষ্করুণ নই। থাক্ শেষটুকু ব'লে দাঁড়ি টানবার সময় এলো।

"কাল রাতে বাবা মাকে বলেছিলেন দিদির সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধের কথা। দিদি এটা তোমাকে খুলেই বলেছে। কিন্তু একথা বলে নি যে মা চেয়েছিলেন, দু'মেয়ের যে পারে তোমাকে বঁড়শি বিঁধে তুলুক! বলো দেখি, এই-ই কি মার যোগ্য কাজ? বাবা চেয়েছিলেন দিদির সুখ—মা চেয়েছিলেন জামাই-শিকার। তাই মেয়ে তাঁর কাছে একটা সিম্বল মাত্র—প্রিয়জন নয়। না—"

তর্ক না—তর্কের শেষ নেই—শোনো আমার সময় ফুরিয়ে এল। ও হয়ত এসে পড়বে ফের।

"দিদি তোমাকে যা বলেছে তার ফলে হয়ত তোমার মনে হয়েছে যে, বাবাই মৎলবী, মা উদার। কিন্তু আসলে তা নয়। দিদি তোমাকে ওকথা বলল কেন সেটা তুমি না জানলেও আমি জানি। তুমি তাকে, যে কারণেই হোক, শ্রদ্ধা করো। দিদির গুণ সত্যিই অনেক—শ্রদ্ধা করার মতন মেয়েও সে বটে। কিন্তু সে তোমাকে কেন বলতে গেল অসিত যে, তোমাকে যদিও সে বিবাহ করবে না তবু ওর সঙ্গে তোমার বিবাহ বাবা চেয়েছিলেন? ভেবে দেখেছ কি? দেখ নি, আমি বাজি রেখে বলতে পারি। কারণ একথা তোমার কখনো মনে হ'তেই পারে না যে ও একথা তুলেছিল শুধু তোমাকে বোঝাতে চেয়ে যে ওকে তুমি পাবে না, পাবে না, পাবে না—আর সে শুধু ওর নিজেরই অনিচ্ছা ব'লে। কাছে টেনে এনে দূরে ঠেলা এর চেয়ে কিসে উস্কে দেয় পুরুষের বাসনাকে?

মুহূর্ত একটু সুর নামিয়ে নিয়ে বলল: "মনে আছে অসিত, কিছুদিন আগে আমি তোমাকে বলেছিলাম যে দিদি চায় না তোমার সঙ্গে কোনো অন্তরঙ্গতা করতে। বলেছিলাম, কারণ আমার কাছেও এই ভাবেই কথা বলেছিল দুতিনবার। কিন্তু তুমি চ'লে যাবে শুনেই ও উপযাচিকা হ'য়ে তোমার ওখানে একলা গিয়ে তোমাকে যেভাবে বাঁধল তোমায় গানের শিক্ষা হ'তে চেয়ে—কিন্তু না, যা বলতে এসেছি তাই বলি।

"তুমি চ'লে যাবে স্থির করেছ শুনে তোমার 'পরে আমার শ্রদ্ধা এসেছিল সেটা দিদির কাছেও আমি গোপন করি নি, যদিও—মনে রেখো—দিদি চিরদিন সব কিছুই আড়ালে রেখে এসেছে—শুধু আমার নয়, সবারই কাছ থেকে। কিন্তু হ'লে হবে কি, ওর একটা সহজ প্রতিভা আছে লোকের মনের কথা টেনে বার করবার। ও চাপা মেয়ে হয়েছেও যে সাধ ক'রে তা নয়। কে না জানে বলো সেই দুর্ভাগা রাজপুত্রের কথা যে বনে গিয়ে এক সাত-মহল প্রাসাদ পেল—অঢেল ধনসম্পদ প্রতি ঘরে। সব ঘরেরই চাবি দিয়ে গেলেন পরী—কেবল একটি চোরকুঠরি বাদ। মানা ক'রে গেলেন পই পই ক'রে কেবল ঐ ঘরটিতে না ঢুকতে। কিন্তু করলে হবে কী, ঐ চোরা-কুঠরিতে কী আছে না জেনে রাজপুত্তুরের কি আর শান্তি আছে? শেষটায় পারলেন না সামলাতে—ঢুকলেন জোর ক'রে। ঢুকে দেখলেন ফাঁকা—কিন্তু ওমা! সঙ্গে সঙ্গে সাতমহলের সব গেল উবে চক্ষের নিমেষে, রইল কেবল ঐ শূন্য ভাঙা ঘরটি—তাতেই তাঁকে বাস করতে হ'ল আমরণ। এই-ই ছিল তাঁর সাজা—মনে আছে তো? দিদি তোমার কাছে হ'তে চেয়েছিল সেই বিষিদ্ধ চোরাকুঠরি—'খবর্দার! এদিকে তাকিয়ো না, পাবে না'—এই লেবেল এঁটে।

বলতে বলতে ওর মুখে ঝাঁকা হাসি উঠল ঝিকিয়ে: "অসিত, তাই ঘোরালো পাঁয়তারা যারা তারা তোমাদের এত ক'রে এড়িয়ে চলে—যাতে তোমরা ফসকে না যাও। কিন্তু যখন ও দেখল শাসন বড় বেশি দুঃসহ হয়ে পড়েছে তখন ও রাশ একটু ঢিল দিল। ও দেখতেই উদাসিনী কিন্তু দৃষ্টি ওর অতি ধারালো। মনে করো কি, তোমার চরিত্রের মধ্যে যে বৈরাগ্যী বলিষ্ঠতা আছে তা ওর চোখে পড়ে নি? অসম্ভব—" হাসল ও ফের: "ও বিলক্ষণ জানে যে, ওকে যতক্ষণ তুমি হাতের পাঁচ জানবে ততক্ষণ চাইবে না তেমন করে। অন্যদিকে আমি রুক্ষ মাথি, নাচি গাই, চরিত্রে দুর্বল, নিষ্ঠায় অক্ষম—আমার জন্যে তোমার ক্ষণিক বাসনা হয়ত হ'তে পারে, কিন্তু প্রাণ কাঁদবে না। আমাকে ও তোমার কাছে ছোট ক'রে দিয়ে গেছে বেশ ভালো ক'রেই।"

ক্ষোভে জ্বালায় ওর দুচোখে যেন আগুন জ্ব'লে উঠল—ব'লে চলল উত্তাবেগে: "কিন্তু এইখানে লক্ষ্য করো বাবার মহত্ত্ব। তিনি ভালোবাসেন আমাকে—ওকেও চেনেন বেশ ভালো ক'রেই। জানেন ওর পিতৃভক্তির কথাও হাড়ে হাড়ে। তবু উনি তোমার মতন সুপাত্রকে চেয়েছিলেন আমার জন্যে নয়—ওরই জন্যে। কিন্তু কেন চেয়েছিলেন? কারণ গুণ ওর অফুরন্ত হ'লেও ওর মধ্যে সে উপাদানের অভাব যা পুরুষের মন বেশি টানে। ওর মধ্যে যে দীপ্তি আছে তাকে চিনতে সময় নেয়। এদিকে হবুবরদের সবুর সয় না—তাই তারা বাচাই করে গুণ দিয়ে নয়—চটক দিয়ে। ওর নেই কোনো মার্কামারা চটক। আমার সম্বন্ধে বাবার ভাবনা নেই। বাবা জানেন মেয়েটিকে। জানেন তার চড়চাড় ঠাটঠমক, কিন্তু এ-ও জানেন যে, মেয়ে নিখুঁৎ তিলোত্তমা না হ'লেও মুখরোচক

ও চক্ষুরোচক, কাজেই যদি কাউকে টোপ ফেলতে চায়, রই কাতলার অভাব হবে না। কিন্তু ও পারবে না গাঁথতে কাউকে—ইচ্ছা করলেও না—মানে গড়পড়তা মাছকে। তাই বাবা চেয়েছিলেন আগে সেই মেয়ের সদ্গতি যার ক্রেতার অভাবে দুর্গতি হবার সম্ভাবনাই বেশি—দিদি তোমার এই ব্যাপারটাকেই সম্পূর্ণ উল্টো বুঝিয়েছে। বুঝিয়েছে আমিই তোমার জন্যে ছটফট করছি—অথচ বাবার ঝোঁক দিদির দিকেই। কিন্তু পাছে একথা বলতে না বলতে তুমি ভেবে বসো যে ও ঘাড়ে-পড়া মেয়ে, তাই সঙ্গে সঙ্গে ব'লে রাখল যে ও চায় শুধু নিরাকার ভগবানকেই—কোনো সাকার মনুষ্যকেই না না না।—সুতরাং—stand off! How dare you? আকাশের চাঁদের জন্যে হাত বাড়ানো?—কিন্তু ঐ যে, দিদি আসছে ফের তোমাকে রূপকথা শোনাতে—" ব'লেই আমার হাত চেপে ধ'রে "কেবল এই অনুরোধটি আমার রেখো অসিত, শেষ অনুরোধ—ওকে এসব কথা বোলো না। না—তিন সত্যি করো। আমার মাথার দিব্যি রইল কিন্তু—"

[আগামীবারে সমাপ্য]

ভ্রম সংশোধন :—গত ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত স্বরলিপিতে কিছু ছাপার ভুল ছিল। এখানে সংশোধিত স্বরলিপিটি দেওয়া হল।

লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ম	ধ ধ নি	— ধ ধ ণ	২য়	— ধ ধ নি	— ধ ধ ণ
৩য়	ধ — র্সা —	ধ — র্সা —	৩য়	সা সা সা সা	র্সা র্সা র্সা র্সা
৩য়	সা নি রেসা -নি	র্সা ন র্রের্সা -ণ	৪র্থ	— নি নি নি	- ণ ণ ণ
৪র্থ	নি ধ ণানি —	ণ ধ র্ণাণ —	৪র্থ	পধ নি ধ -	পধ ণ ধ —
৫ম	— ধ ধ নি	— ধ ধ ণ	৬ষ্ঠ	— ধ ধ নি	— ধ ধ ণ
৭ম	ধ পধ ধনিসা -	ধ পধ ধনির্সা —	৭ম	— সা সা সা	— র্সা র্সা র্সা
৭ম	সা নি রেসা -নি	র্সা নি র্রের্সা ণ	৮ম	— নি নি নি	— ণ ণ ণ
৮ম	নি ধ ণানি —	ণ ধ র্ণাণ —	৮ম	— ধ ধ নি	— ধ ধ ণ
৮ম	পধ নি ধ —	পধ ণ ধ —	৯ম	— ধ ধ নি	— ধ ধ ণ
১০ম	— ধ ধ নি	— ধ ধ ণ॥			

গত ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত "চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা" প্রবন্ধের লেখকের নাম ভুলক্রমে শ্রীপরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাপা হয়েছে। লেখকের নাম শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হবে। —সম্পাদক

প্রিয়বন্ধু নিকল্‌সন

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(কাব্য কাহিনী)

১

সাধারণ ইংরেজ যুবক, নিকল্‌সন ছিল তার নাম,
এসেছিল পুরাইতে তার মনস্কাম
সুসজ্জিত বোম্বাই শহরে ;
সৈন্য বিভাগের কাজে তার ভ্রাতা সেথা বাল করে।
অসম্ভব হোলো সেথা থাকা,
কলিকাতা হয়ে পরে গিয়েছিল ঢাকা।
ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে একদা দুপুরে
গেল গৌরীপুরে,
আশ্রয় লভিল যেয়ে ইউরোপীয় অতিথিশালায়,—
সুশোভিত উদ্যানের বৃক্ষবাটিকায়
অতি নিরালায়।
অতিথি ত্রিরাত্র সেথা বিনা-ব্যয়ে করে' যেত বাস,
ধনাঢ্যের এই ছিল মনো অভিলাষ।
আদেশের ব্যতিক্রম করে যদি কেহ,
বাবুর্চ্চি ইস্‌মাইল তার ঘুচাইত সকল সন্দেহ,
নূতন আদেশ নিতে জানাতো নির্দ্দেশ।

২

নিকল্‌সনের সাথে আদেশের ব্যপদেশে বেশ
সর্ব্বাগ্রে ঘটিল পরিচয়।
ধনীর সকাশে যেয়ে জানাজাম ভালো যাতে হয় ;
আদেশ দিলেন, "থাক্, যতদিন ভালো লাগে তার,
বরঞ্চ করিতে হবে অতঃপর তাকে ব্যয়ভার।"
অতিথি সন্তুষ্ট হয়ে ধন্যবাদ জানায়ে আমায়
ফিরে যায় অতিথিশালায়।
সুসজ্জিত চার কক্ষ ছিল সেথা সুন্দর শোভন,
একটি দখল করি' থাকে নিকল্‌সন।
নানা গুণান্বিত ঘুবা ব্যবসাতে উঠিল মাতিয়া,
ধনীদের বাড়ী বাড়ী গিয়া,
বিনই পিয়ানো, ফ্লুট্, হারমোনিয়াম
মেরামত করি' পেলো সুখ্যাতি সুনাম।
অর্থ পেতে লাগিল প্রচুর,
সকল অভাব তার একেবারে হয়ে গেল দূর।

৩

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মোর সাথে বেড়াতে তাহার
বাসনা জানায় বারংবার।
বেড়াতাম দুইজনে গ্রাম্যপথে নানা গল্প করি',
পুলকে হৃদয় যেত ভরি'।
বহুদিন বহু সাধ পুরাইতে হয়েছে তাহার,
চেয়ে খেত আহার্য্য আমার ;
নিমন্ত্রণ করি' তারে খাওয়ায়েছি নানা উপচারে
বাধ্য হয়ে হাত দিয়ে সবি খেত হিন্দুর আচারে,
হাসিতাম অনন্যান্ত অসমর্থতায় ;
সেই দিন কোথা গেল, হায়!
গাঢ় প্রীতি হোলো তার সাথে,
জাগিলে অতীত স্মৃতি অশ্রু জমে আজি আঁখিপাতে!
শত্রুতার বাহিরেই দেখা যায় ক্লেদ!
প্রেম প্রীতি প্রণয়ের নাহি জাতিভেদ!

৪

বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে নাভিশ্বাস উঠিল যখন,
সেই এক ঘোর সঙ্কিক্ষণ,
রক্ষিতে সাম্রাজ্য ভয়ে ইংরেজ তখন
বাধ্যতামূলকভাবে স্বজাতিরে করিল আহ্বান,—
"যে যেথা রয়েছ তবে হও সবে এবে আগুয়ান,
নতুবা পাবো না পরিত্রাণ!"
নেতাজী আগায়ে এসে ভারতের পূর্ব্বসীমানায়।
নিশান প্রোথিত করে যেদে কোহিমায়।

৫

একদিন অকস্মাৎ প্রাতে
নিকল্‌সন যেয়ে মোর সাথে,
বিদায় মাগিল মোর জননীর কাছে।
তার যেন কত কথা বলিবার আছে!
প্রণমি' চরণ তার জাগিলো বিষাদ,
মস্তকে রাখিয়া হাত করিলেন মাতা আশীর্ব্বাদ।
নতশিরে বারান্দায় এলো বাহিরিয়া ;
ঝরে অশ্রু কপোল ভিজিয়া!
বিস্মিতা পত্নীকে পরে নমস্কার করি',
দুটি হাতে মোর হাত জড়াইয়া ধরি'
সকাতরে শেষ কথা শোনালো তাহার,—
"যুদ্ধে যদি বেঁচে যাই, এসে দেখা করিব আবার!"

৬

কত দিবা রাত্রি গেল, গেল পক্ষ মাস বর্ষ শেষে,
আর সে আসিল না তো, সে রয়েছে কোথা কোন্ দেশে!
স্বপ্নাবেশে কথা আমি আজো শুনি তার,—
"বেঁচে গেলে, বন্ধু, আমি আসিব আবার!"
হায় হায়, আর সে তো নাহি এলো আর!

রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয় গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

বৈষ্ণব পদাবলীর রসমাধুর্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে কবির কিশোর বয়স থেকেই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বলরামদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। ব্রজবুলির ভাষা, ভাব ও ছন্দ কবিকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরিত করে। কবির বয়স যখন ১৬ বৎসর, তখন তিনি 'ভারতী'তে ৭টি পদ প্রকাশ করেন; পরে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আরও ১৩টি পদ লেখেন। এইভাবে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা সম্পূর্ণ হয় কবির পঞ্চবিংশতি বয়ঃক্রমকালে। ১৩১৭ সালের ২০শে আষাঢ়ের এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার বয়স যখন তের-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও-আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি; তার ছন্দ রস ভাষা সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করে। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমের বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাভ করেছিলাম।' (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রজীবনী, পৃষ্ঠা ৬১, পরিবর্ধিত সংস্করণ)। বৈষ্ণব ধর্ম-তত্ত্বের সত্তা দর্শন করে তিনি নানা রচনার মধ্যে তা প্রকাশ করে গেছেন। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' কবিতাদ্বয় এর অন্যতম নিদর্শন। বৈষ্ণব কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের আর একটি নিদর্শন হচ্ছে কবির সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' নামে পদ সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১২৯৪ সালে। এই গ্রন্থ সম্পাদনায় রবীন্দ্র-নাথের বিশেষ বৈষ্ণব বিদগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

'খেয়া' কাব্যগ্রন্থে 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' কবিতাদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বিশিষ্ট পরকীয়া প্রেমের নিদর্শন দিয়েছেন, তাই অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে কবির রচিত 'ভগ্নহৃদয়' নামক গীতিকাব্যে। 'শুভক্ষণ' কবিতায় মেয়ে মাকে বলছে,—

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বলো কি মতে।
বলে দে আমায় কি করিব সাজ,
কি ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরণের বাস।
মাগো, কি হ'ল তোমার, অবাক নয়নে
মুখপানে কেন চাস।
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ,
যাবে সে সুদূর পুরে,
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বলো কি মতে।

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত রাজার দুলালকে ক্ষণিকের তরে দর্শনাশায় যে-মেয়ে সমস্ত গৃহকাজ ফেলে বাতায়নপথে দাঁড়াবে, সেই রাজপুত্র তার পানে হয়ত চাইবেই না, তা সে জানে; তথাপি তার হৃদয়বাঁশিটি তার জন্য তো ব্যাকুল সুরে অনুক্ষণ বাজতেই থাকবে। 'ভগ্নহৃদয়'-এর নায়িকা মুরলাও এই মেয়েটির মতো নায়ককে ভালবাসে; কিন্তু তার ভালবাসা সে কখনও প্রকাশ করে নি।

'ত্যাগ' কবিতায় আবার বলা হয়েছে,—

রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখ পথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।

ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি যা দেখে
ছি ছি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার 'পরে।
মাগো কি হ'ল তোমার, অবাক নয়নে
চাহিল কিসের তরে!
মোর হার-ছিঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি ছিলেম কারে জানে না যে কেউ—
ধূলায় রহিল ঢাকা।
শুধু রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখ পথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কি মতে।

যে মণিহারটি রাজার ছেলের উদ্দেশে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সে মণিহারটি তুচ্ছ বস্তুমাত্র নয়, তা পরম হৃদিতেরই উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত প্রেমমণি। এর মধ্যেই প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পরকীয়া প্রেমালোকশিখা। বলা বাহুল্য, এ-প্রেম বৈষ্ণব পদাবলী-অনুসৃত ঠিক পরকীয়া প্রেম নয়; কারণ যার উদ্দেশে এ-প্রেমনিবেদন, সে তো তার কিছুই জানেনা। সেই জন্য পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের এই প্রেম বিশিষ্ট পরকীয়া প্রেম। এই প্রেম সুগভীর অথচ অব্যক্ত, এই অব্যক্ত সুগভীর পরকীয়া প্রেমের বিশেষ নিদর্শন আছে কবিগুরুর রচিত 'ভগ্নহৃদয়' গীতিকাব্যে।

'ভগ্নহৃদয়' গীতিকাব্যখানি প্রকাশিত হয় ১৮০৩ শকাব্দায়। তখন কবির বয়স ২০ বৎসর। গ্রন্থটি ৩৪ সর্গে সম্পূর্ণ। গ্রন্থে পাত্র-পাত্রীর উল্লেখ আছে অথচ নাটক নয়। এর কারণস্বরূপ কবি ভূমিকায় বলেছেন,—'এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলিমাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্তস্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।'

গ্রন্থের প্রধান নায়ক কবি, আর নায়িকা কবির বালা-সখী মুরলা। নলিনী এক চপলস্বভাবা কুমারী সকলের হৃদয় লইয়া খেলা করে; কবিও তার বিলাসবিভ্রমে চঞ্চল। মুরলা কবিকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে, কিন্তু কবি তা জানতে পারে নি। ললিতা নামে সরল বালিকাকে ভালবেসে বিয়ে করেছে মুরলার ভাই অনিল; কিন্তু ললিতার প্রেম আবেগময় ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ নয়। এই প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো, অথচ সুগভীর এবং অব্যক্ত। অনিল এই প্রেমের নাগাল না পেয়ে দূরে সরে যায় এবং নলিনীর চটকে ভোলে। শেষে মুরলা ও ললিতা উভয়েই অন্তর্দাহে জলে মরণের পথে পা দেয়। মুরলাকে যখন কবি বুঝতে পারলেন, তখন যে মৃত্যুপথযাত্রী; সেই যাত্রাতেই তাদের মালা বদল হল, আর মৃতকল্প ললিতার পাশে এসে অনিল সবই বুঝতে পারল।

'ভগ্নহৃদয়'-এ উল্লিখিত এই প্রেম বৈষ্ণবোক্ত পরকীয়া প্রেম থেকে স্বরূপতঃ ভিন্ন। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই প্রেম বিশিষ্ট পরকীয়া প্রেম; কারণ নারীর দিক থেকে এই প্রেম বরাবরই অব্যক্ত অর্থাৎ নারী তার হৃদিতকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেও সে এই ভালবাসা মুখে কখনও প্রকাশ করে নি। গীতিকাব্যখানির নারীচরিত্র মুরলা ও ললিতার মধ্যে তা সুপ্রকট। মুরলা মনে প্রাণে কবিকে ভালবাসে; কিন্তু এ ভালবাসা সে কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারেনা। নির্জনে আপনহারা হয়ে মুরলা বসে থাকে। যেখানে জনপ্রাণী নেই, যে স্থান অতি নির্জন সেখানে ছুটে যায় মুরলা। সখী চপলা মুরলাকে খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে শেষে তাকে দেখতে পায় অন্ধকার বনানীতে। এই নির্জন স্থানে সখীকে একলা বসে থাকতে দেখে চপলা জিজ্ঞাসা করে,—

সখি, তুই কি হলি আপনা-হারা?
এ ভীষণ বনে সখি একেলা আছিস্ বসি
খুঁজে খুঁজে তোরেছি যে সারা!
এমন আঁধার ঠাঁই জন প্রাণী কেহ নাই,
জটিল-মস্তক বট চারিদিকে ঝুঁকি!
দুয়েকটি রবিকর সাহসে করিয়া ভর

অতি সন্তর্পণে যেন মারিতেছে উঁকি।
অন্ধকার, চারিদিক হতে, মুখপানে
এমন তাকায়ে রয়, বুকে বড় লাগে ভয়,
কি সাহসে রোয়েছিস্ বসিয়া এখানে?

রাধিকার ঠিক এই দশা দেখতে পাই পদাবলীতে। নব-অনুরাগিণী রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আপনহারা হয়ে বিরলে বসে থাকে। রাধিকা এমনই কৃষ্ণময় যে কারোর কথা পর্যন্ত তার কানে পৌঁছায় না; আহার-বিহারে তার ভ্রূক্ষেপ নেই; কৃষ্ণের রূপ-সন্দর্শনে মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে; কখনও বা মধুর-মধুর কণ্ঠস্বর নিরীক্ষণ করছে। ভক্ত-কবি চণ্ডীদাসের পদে রাধিকার পূর্বরাগের এই চিত্রটি সুন্দর হয়ে উঠেছে,—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ-পানে
কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী—
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে॥

রবীন্দ্রনাথ ভগ্নহৃদয়-এর নায়িকা মুরলাকেও এই ভাবেই চিত্রিত করেছেন। প্রশ্নের উত্তরে সখীকে মুরলা বলছে,—

সখি, বড় ভালবাসি এই ঠাঁই!
বায়ু বহে হু হু করি, পাতা কাঁপে মরমরি
স্রোতস্বিনী কুলু কুলু করিছে সদাই!
বিছায়ে শুকানো পাতা বটমূলে রাখি মাথা
দিনরাত্রি পারি, সখি, শুনিতে ও ধ্বনি।
বুকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উথলিয়া
বুঝায়ে বলিতে তাহা পারিনা সজনি!

এখানে রাধিকা ও মুরলা উভয়েরই দশা এক।

মুরলার এই অবস্থা দেখে সখী চপলার বড় কষ্ট হয়; সে সখীকে বনমাঝে একলা রেখে যেতে চায় না; সখীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে যদি সে পুরুষ হত তবে,—

সারাদিন তোরে রাখিতাম ধরে,
বেঁধে রাখিতাম হিয়ে,
একটুকু হাসি কিনিতাম তোর
শতেক চুম্বন দিয়ে!

তবু সখীর মুখে হাসি ফুটিলেই চপলা ক্ষান্ত হত না; সে অমিয়া-মাখানো মুরলার মুখখানি বুকের মধ্যে রেখে অনিমেষলোচনে চেয়ে থাকত অনুক্ষণ। এইভাবে দুঃখ করে শেষে চপলা সখীর দুটি হাত ধরে জিজ্ঞাসা করল,—

সখি, কার তুমি ভালবাসা-তরে
ভাবিছ অমন দিন রাত ধরে,
পায়ে পড়ি তব খুলে বল তাহা—
কি হবে রাখিয়া ঢাকি?

সখীর এই প্রশ্নে মুরলা হৃদয়াবেগ আর সংবরণ করতে না পেরে বলে ওঠে,—

ক্ষমা কর মোরে, সখি, শুধায়োনা আর!
মরমে লুকানো থাক মরমের ভার!
যে গোপন কথা, সখি সতত লুকায়ে রাখি
ইষ্টদেবমন্ত্র-সম পুজি অনিবার
তাহা মানুষের কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে—
লুকানো থাক তা, সখি, হৃদয়ে আমার।
ভালবাসি, শুধায়োনা কারে ভালবাসি!
সে নাম কেমনে, সখি, কহিব প্রকাশি!
আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার!
ক্ষুদ্র ওই কুসুমটি পৃথিবী কাননে,
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে—
দিন দিন পূজা করি, শুকায়ে পড়ে সে ঝরি,
আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার—
তেমনি পূজিয়া তারে এ প্রাণ যাইবে হা-রে,
তবুও লুকানো রবে এ কথা আমার!

মুরলার এই কথায় সখীর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে অজানা আশঙ্কায়; সেই প্রণয়াস্পদের নামটি শুধু চপলা জানতে চায় সখীর মঙ্গলের জন্য; সেই নাম রসনার দাঁতের খেলনার মতো; উলটে পালটে সেই নাম নিয়ে রসনা কতই না খেলা করতে পারে। তাই চপলা সখীকে মিনতি করে বলে,—

নাম যদি তার বলিস, তা হলে
তোরে আমি অবিরাম
শুনাব তাহারি নাম—
গানের আকারে সে নাম গাঁথিয়া
সদা গাব সেই গান!
ফুলের মালায় কুসুম-আখরে
লিখি দিব সেই নাম—
গলায় পরিবি, মাথায় পরিবি,
তাহারি বলয় কাঁকন করিবি
হৃদয়-উপরে যতনে ধরিবি
নামের সুষমাদাম!

এই নামের মাহাত্ম্য নিয়ে অনুরূপ একটি বিখ্যাত সুন্দর পদ আছে দ্বিজ চণ্ডীদাসের। রাধিকার কৃষ্ণদর্শন তখনও হয়নি; শুধু তিনি নাম শুনেছেন, তাতেই তিনি উন্মাদিনী। সখীকে উদ্দেশ করে রাধিকা বলছেন,—

সখি কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয়-এ চপলার উক্তিতে যে নামমাহাত্ম্যের বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে, তা তে দেখা যায়, পদটির উপর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে দ্বিজ চণ্ডীদাসের।

চপলা ও মুরলার কথোপকথনকালে হঠাৎ সেই বনে মুরলার প্রেমাস্পদ কবির আবির্ভাব ঘটল। তিনি ভাবনা-বিহ্বলা মুরলাকে দেখতে পেলেন বনদেবীর মতো। কবি জানতে চাইলেন, মুরলা কি প্রকৃতির কাছে উদার ভাষা শিখছে অথবা তটিনীর কলধ্বনিতে কোনো ছন্দের সন্ধান পেয়েছে? পরে কবি চপলাকে বললেন, সখি, মুরলাকে বনদেবীর মতো সাজিয়ে দাও; তার এলোথেলো কেশপাশ লতা দিয়ে বেঁধে তৃণফুল দিয়ে অলক সাজিয়ে দাও; নবপত্রপুষ্প দিয়ে তার বস্ত্রাঞ্চল গেঁথে দাও; হরিণ শিশু নির্ভয়ে এসে সখীর পদতলে আশ্রয় করে পরম নিশ্চিন্ত হবে, আর সবিস্ময়ে সুকুমার গ্রীবাটি বাঁকিয়ে অবাক নয়নে তার দিকে চেয়ে থাকবে। আর—

আমি হয়ে ভাবে ভোর দেখিব মুখানি তোর
কল্পনার ঘুমঘোর পশিবে পরাণে!
ভাবিব, সত্যই হবে বনদেবী আসি তবে
অধিষ্ঠান হইলেন কবির নয়ানে।

কবি ও মুরলার পরস্পরের প্রতি এই অনুরাগ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবধারা থেকে গৃহীত। পরকীয়া প্রেমের কি যে জ্বালা তা যেমন রাধিকার প্রকাশ, তেমনি ভগ্নহৃদয়ের নায়িকা মুরলাও সেই তীব্র দহন বুঝতে পেরেছে কবিকে ভালবেসে। পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের পরস্পর ভালবাসা উভয়েরই নিকট বিদিত; কিন্তু ভগ্নহৃদয়-এ কবি ও মুরলার প্রেম সুগভীর হলেও পরস্পরের নিকট অব্যক্ত। সুতরাং এদের প্রেম অধিকতর জ্বালাময়। তাই কবি যখন জিজ্ঞাসা করলেন মুরলাকে,—

প্রণয়বারির তরে তৃষায় আকুল
ম্রিয়মাণ হয়ে বুঝি পরেছে সে ভূল?
পেয়েছ কি বুঝা কোন মনের মতন?
ভালবাসো, ভালবাসা করহ গ্রহণ—
তা হলে হৃদয় তব পাইবে জীবন নব,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসময় হেরিবে ভুবন।

নিজের প্রণয়াস্পদের মুখে এই কথা শুনে মুরলার হৃদয় হাহাকার করে বলে,—

(স্বগত) বুঝিলেনা বুঝিলেনা কবি গো এখনো
বুঝিলেনা এ প্রাণের কথা!
দেবতাগো বল দাও এ হৃদয়ে বল দাও!
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা।

কবি যে মুরলার প্রেম বুঝতে পারেন না তার কারণস্বরূপ মুরলা মনে করে যে কবি তাকে এতটুকুও ভালবাসেন না। এই অভিমানে মুরলাও তার ব্যথা প্রকাশ না করে বলে—

তবে থাক থাক সব বুকে থাক গাঁথা—

বুক যদি ফেটে যায়—ভেঙ্গে যায়—চুরে যায়—
তবু রবে লুকানো এ কথা।
দেবতাগো বল দাও—এ হৃদয়ে বল দাও
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা!

ইংরেজ পরকীয়া প্রেম রবীন্দ্রনাথের কাছে সমাদর পায় নি; অথচ প্রেমের গভীরতা যে রাধার মধ্য দিয়েই সুপ্রকট তা রবীন্দ্রনাথের অগোচর নয়। তিনি সুস্পষ্টভাবে চপলার মুখ দিয়েই তা প্রকাশ করেছেন; 'রাধা না পাইলে, সখি, সুখেতে কি সুখ আছে?' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরকীয়া প্রেমের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য নায়ক নায়িকার মধ্যে তা অব্যক্ত রেখেছেন। এতে প্রেমের বিশুদ্ধিতাও রক্ষিত হয়েছে, আবার তা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে পরমোৎকর্ষতা লাভ করেছে। পরস্পরের ভালবাসা জানতে পেরে কবি ও মুরলার মধ্যে যদি পরিণয় সম্পন্ন হত, তবে সে প্রেমের গাম্ভীর্য কত লুপ্ত। রাধার মধ্যেই যে প্রকৃত সুখোদয় তা ভাঙে হত না। কবি নলিনীকে ভালবাসে—একথা কবির মুখ থেকে শুনেও কবির প্রতি মুরলার প্রেম বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং মুরলা বলেছে—

অন্তর্যামী দেবতা গো, শুন একবার,
যদি আমি ভালবাসি কবিরে আমার
কবি যেন সুখী হয়, নলিনী সে সুখে রয়—
সখারে আমার আমি ভালবাসি যত
নলিনীবালাও যেন ভালবাসে তত!
নলিনীবালার যত আছে দুখজ্বালা
সব যেন মোর হয়, সুখে থাক বালা!
তবে চলিলাম কবি, আমি চলিলাম—
মুরলা করিছে এই বিদায় প্রণাম!

মুরলা প্রান্তর দিয়ে চলেছে সন্ন্যাসিনীবেশে। পূর্ব স্মৃতি তার ভেসে ওঠে মনে; আর মন ব্যাকুল হলেই সান্ত্বনা দেয় এই বলে—

যার কেহ নাই তার সব আছে,
সমস্ত জগৎ বুক তার কাছে—
তারি তরে ওঠে রবি শশী তারা,
তারি তরে ফুটে কুসুম গাছে।
একটি বালার নাহিক আলয়
সমস্ত জগৎ তাহারি ঘর,
একটি যাহার নাই সখাসখী
কেহই তাহার নহেক পর!

হৃদয়ের সর্বস্ব ধন অন্যকে দিয়ে মুরলা এখন রিক্ত, অথচ মুক্ত। জনহীন প্রান্তর এখন তার কাছে নূতন ভাবে দেখা দিয়েছে। এখানে কেউ কাউকে আদর করে না; কেউ কারোর কাছে ভালবাসা পায়না; এখানে সুখ-দুঃখের বালাই নেই—দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন চলে যাচ্ছে নীরব চরণে। পূর্বে যে-জগতে মুরলা বাস করত, সেখানে ছিল কারও দুঃখ আবার কারোর বা অনন্ত সুখরাশি; কিন্তু এখন যে-জগতে সে আছে সেখানে—

সকলেই চায় সকলের মুখে
শুধায় না কেহো কথা—
নাইক আলয়, চলেছে সকলে
মন যায় যায় যেথা।

মুরলার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে, মৃত্যুর ছায়া সে দেখতে পায় অদূরে। এমন সময় তার মনে পড়ে কবির কথা, সখী চপলার কথা। আবার হাহাকার করতে থাকে তার মন, কবি হয়ত এতক্ষণ এসেছে কিন্তু তার জন্য বাতায়নে তো কেউ অপেক্ষা করছে না! তার পদশব্দ শুনে কেউ তো দ্রুত দ্বার খুলে দিচ্ছে না! তার জন্য কেউ তো মালা গাঁথছে না! হয়ত কবি ভ্রিয়মাণ হয়ে বসে আছে, কথা বলার কেউ নেই। হয়ত অভাগা মুরলার জন্য তার হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠেছে। এই সব ভাবনা মুরলাকে আকুল করে তোলে। সে নিজেকে বলে ওঠে—

হা নিষ্ঠুর মুরলা রে, কেন ছেড়ে এলি তাঁরে
নিতান্ত একেলা ফেলি কবিরে আমার—
হয়ত রে তোর তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর!
বড় স্বার্থপর তুই, নয় দুঃখে তোর
কাঁদিয়া কাটিয়া হত এ জীবন তোর।

কিন্তু হঠাৎ আবার সন্ন্যাসিনী মুরলার সম্বিৎ ফিরে আসে। এ-সমস্ত চিন্তা তার কাছে আবার স্বপ্নময় মনে হয়। সে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলে,—

কোথা কবি? কোন কবি? কে গো সে তোমার?
মাঝে মাঝে দেখিস রে একি স্বপ্ন মিছে!
স্বপনের অশ্রুজল বৃথা কেন মুছে!

মুরলা বুঝতে পারে তার জীবনের দিন ফুরিয়ে এসেছে;

মৃত্যু তার কণ্ঠদেশ প্রসারিত করে আছে মুরলার জন্য। মুরলা স্পষ্ট অনুভব করে—

এ সংসারে ভেবে যদি কেহ ভালবাসে
সে কেবল ওই মৃত্যু—ওই যে আকাশে!
শুকতারা রক্তহীন স্থির হস্তে তার
আলিঙ্গন করেছে সে হৃদয় তোমার!
হে মরণ! প্রিয়তম—স্বামী গো জীবন মম,
কবে আমাদের সেই মিলিবে মিলন?
জীবনের মৃত্যুশয্যা তেয়াগিব কবে?

তাগা টেনে নিয়ে আসে কবিকে মুরলার কাছে জীবন নাহাকে। মৃত্যুপথযাত্রী মুরলাকে দেখে কবির মন হাহাকার করে ওঠে। তিনি নিজেকে আর স্থির রাখতে না পেরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন,—

কি করেছি এত তুই হৃদি যে কাঠোর?
প্রাণ মোর, মন মোর, হৃদয়ের ধন মোর,
সমস্ত হৃদয় মোর, জগৎ আমার—
একবার বল্ বালা, বল্ একবার
ছাড়িয়ে যাবিনে মোরে ফেলি এ সংসার-ঘোরে,
নিতান্ত এ হৃদয়েরে রাখি অসহায়।
আয়, সখি বুকে থাক্, এই দেখা মাথা রাখ্,
হৃদয়ের রক্ত ফেটে বাহিরিতে চায়।
মুরলা এ বুক তুই ভাঙিস্ নে আর—
চিরদিন থাক্, সখি, হৃদয়ে আমার!

মুরলার মরমন শীতল হয়ে যায় কবির প্রেমবারি-বর্ষণে। মুরলা বলে, সে অতি স্বার্থপর, অতি নিষ্ঠুর; নইলে তার কবিকে সে ত্যাগ করে এসেছে! এমন স্নেহময় কবির হৃদয়েও সে আঘাত করতে পারে! একবার তো সে কবির হৃদয়ের কথা ভাবেনি, সে কেবল নিজের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। মুরলা আর থাকতে না পেরে কবিকে বলে,—

মার্জনা করিও এই অপরাধ তার,
কবি মোর, শেষ ভিক্ষা এই মুরলার!
এমন দুর্বল হৃদি, এত নীচ, হীন,
এমন পাষাণে গড়া, এতই সে দীন,
এ যে ছিল চিরকাল হয়ে তব কাছে
এ অপরাধের, কবি, মার্জনা কি আছে।

সখা, অপরাধ মাঝা অস্তিত্ব তাহার—
মরণে করিবে আজি প্রায়শ্চিত্ত তার!···
ছি ছি সখা, কেঁদো নাকো, মুরলার কথা রাখো—
ও মুখে দেখিতে নারি অশ্রুবারিরাশি!

কবিও তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন। যে প্রেমবারি এত দিন সংগোপনে ছিল তা আজ নয়নধারায় প্রবাহিত হল; কবি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন,—

এতদিন এত কাছে ছিনু এক ঠাঁই,
মিলনের অবসর মোরা পাই নাই।
কে জানিত তাহা, সখি, ঘটিবে এমন
মরণের উপকূলে হইবে মিলন!

কবির এই কথায় মুরলার সুখের পরিসীমা রইল না; সে আর মরতে চায়না। এই মরণের দিন যদি ফুরিয়ে না যায়, যদি মরতে মরতেও বেঁচে থাকা যায়, সেই প্রার্থনাই এখন মুরলার। প্রিয়তম কবিকে মুরলা এখন বলে যে সে এখন পরম সুখে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, কবি যেন তার মুখে একটু জল দেয়। কবি বললেন, সখি, আজ সত্যই আমাদের বিবাহ.—

বিবাহ হইবে, সখি, আজ আমাদের—
দারুণ বিরহ ওই আসিবার আগে, সই,
অনন্ত মিলন হোক এই দুজনের!
আকাশেতে যত তারা চাহিয়া নিমেষ হারা,
উহারা অনন্ত সাক্ষী রবে বিবাহের!
আজি এই দুটি প্রাণ হইল অভেদ,
মরণে সে জীবনের হবে না বিচ্ছেদ।
হোক তবে, হোক সখি, বিবাহ সুখের—
চিতার বাসরশয্যা হোক আমাদের!

মুরলা ফুল তুলে আনতে বলল। সেই ফুল রাশিতে চিতা-শয্যা আকুল হয়ে উঠবে; বিশেষকরে রজনীগন্ধার মালার প্রয়োজন জানিয়ে মুরলা বলল,—

রজনীগন্ধার মালা গাঁথ গো ত্বরায়,
সে মালা বরণ করি দিও এ গলায়—
সেই মালা পরে আমি তোমার সমুখে, স্বামি,
কবির শয়ন সুখে সুখের চিতায়!
সেই মালা পরে যেন মরি হায় হায়!

মুরলার সুখের তুলনা নেই, সে আশাও করেনি যে শেষ

সময়ে কবিকে স্বামী বলে চিরবিদায় নিতে পারবে। শেষ দিনে বিধাতা যে তার কপালে এত দুখ লিখেছেন তা তার কাছে স্বপ্নাতীত। তাই কবিকে সে বলল,—

ওই-যে এসেছে মালা—কবি গো, ত্বরায়
পরায়ে দাওগো তাহা এ মোর গলায়।
এই লও হাত মোর রাখ তব হাতে—
ছেলেবেলা হতে মোরে কত দয়া স্নেহ করে
রেখেছ এ হাত ধরি তব সাথে সাথে।
আবার মোদের যবে হইবে মিলন
এ হাত আমার, কবি, করিও গ্রহণ—
যেথা যাবে দেখা হব, দুই জনে এক হব,
অনন্ত বাঁধনে রবে অনন্ত জীবন!

কবি মুরলার গলায় মালা পরিয়ে ও তাকে ফুলসাজে সাজিয়ে বললেন,—

বিবাহ মোদের আজ হল এই ভবে,
ফুল যেথা না শুকায় সদা ফুটে শোভা পায়
সেথায় আরেক দিন ফুলশয্যা হবে!

মৃত্যুর ঘোর অন্ধকার নেমে এল মুরলার চোখে। কবিকে অতি নিবিড়ভাবে কাছে নিয়ে মুরলা শেষ প্রার্থনা জানাল,—

আজ তবে বিদায়, বিদায়!
স্বামী, প্রভু, কবি, সখা, আবার হইবে দেখা
আজ তবে বিদায় বিদায়!

গীতিকাব্যের ললিতা নামে অন্যতম নারীচরিত্রের কথা পূর্বে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হয়েছে। ললিতার বিষয় একটু স্বতন্ত্র। সে অনিলকে বিয়ে করেছে; কিন্তু ভালবাসা রেখেছে অব্যক্ত। এইখানে মুরলার সঙ্গে তার ঐক্য। মুরলা ও ললিতা উভয়েই তাদের হৃদিতকে ভালবাসে; কিন্তু তাদের প্রেমাস্পদ কবি বা অনিল তা বুঝতে পারে না। ফলে, নলিনী নামে অপর এক চঞ্চলা নারীর রূপ-মোহে পড়ে কবি ও অনিল উভয়েই বিভ্রান্ত। নলিনীর স্বভাব হল অন্যের হৃদয় নিয়ে খেলা, শেষে তাকেও অনুতপ্ত হতে হয়; অর্থাৎ যারা তাকে ভালবাসত, তারা দূরে সরে যায়। তাই নলিনী আক্ষেপ করে বলছে,—

হা অদৃষ্ট, কাল মোরে হেরিয়া যে জন
নলিনী নলিনী বলি হত অচেতন,
নিমেষ তুলিত আঁখি, পুরিতনা আশ—
আমার সৌন্দর্যরাশি করিত যে গ্রাস,
মোর রাঙ্গা চরণের ধূলি হইবার
হৃদয়ের একমাত্র সাধ ছিল যার,
ধূলিতে যে পদচিহ্ন করিত চুম্বন,
মুখ ফিরাইয়া আজ গেল সেই জন!

রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটি নিয়েছেন বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দ-দাসের নিম্নোক্ত পদ থেকে,—

একলা যাইতে যমুনা ঘাটে
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান;
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ।

উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখা যায়, গ্রন্থদ্বয় গীতি-কাব্যখানির উপর বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বিদ্যমান। পরকীয়া প্রেমই হচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধানতম বিষয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিকাব্যে যে পরকীয়া প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন, তা বৈষ্ণববর্ণিত পরকীয়া প্রেমের অনুরূপ হলেও স্বতন্ত্রতাবিশিষ্ট। রাধা কৃষ্ণ উভয়ে উভয়কে ভালবাসে। এই ভালবাসার মধ্যে পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, মান, আক্ষেপ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে গ্রন্থদ্বয়ে এ-সমস্ত রসপর্যায় থাকলেও প্রধান চরিত্র কবি ও মুরলার মধ্যে মিলন সংঘটিত হয়নি; কিন্তু অপ্রধান চরিত্র অনিল ও ললিতার পরিশেষে মিলন হয়েছে মাথুরবিরহান্তে রাধাকৃষ্ণ-মিলনের অনুরূপেই। রাধিকার প্রণয়-লাভান্তে কৃষ্ণ মথুরায় চলে গিয়ে অন্যাসক্ত হয়ে দীর্ঘদিন রাধাকে ভুলে থাকলে রাধা ললিতারই মতো প্রাণবিসর্জনে কৃতসংকল্প হয়। দূতী তার এই দশা মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে জানালেই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরে আসেন এবং আবার রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়।

অনিল ও ললিতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ললিতার অকৃত্রিম নীরব প্রেম বুঝতে না পেরে অনিল নলিনীর রূপমোহে পড়ে; কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে ললিতারই পাশে এসে দাঁড়ায়; তখন ললিতাও রাধার মতো মরণে কৃতনিশ্চয় হয়েছিল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনিল ও ললিতার মিলনসংঘটন করিয়ে তাদের সংসারী করেছেন, কারণ তারা বিবাহিত। মুহূর্তের ভ্রমবশতঃ তাদের সাময়িক বিচ্ছেদ হয়েছিল; কিন্তু ভুল সংশোধনের পর

তাদের মধ্যে মিলনের আর বাধা রইল না। বলা বাহুল্য সমাজনীতিও এক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়নি; কিন্তু কবি ও মৃন্ময়ীর মিলন ঘটাননি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কারণবশতঃ। পরকীয়া প্রেমকে স্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের রীতি ও আদর্শকে কখনও ত্যাগ করেননি। রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের মধ্যে বিচ্যুতি থাকলেও সমাজনীতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তার প্রশ্রয় দেন নি। সুতরাং সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করে কবি ও মৃন্ময়ীর মিলন ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ চিন্তা করেছেন। অসংযমহেতু কামনা ও রূপে যে মোহ আসে তা কল্যাণকে সৃষ্টি করেনা। এ-বিষয় নিয়ে কবিগুরু প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার অভিশাপ ও কুমার-সম্ভবের মদনভস্ম ব্যাপারে ঐ কারণই রয়েছে। তবে মৃত্যুশয্যায় যে কবি ও মৃন্ময়ীর মিলন দেখা যায়, তা নিতান্তই পারত্রিক; মরজগতে এ ব্যবস্থার অবকাশ রবীন্দ্রনাথ রাখেননি। এতে যেমন অকৃত্রিম বিশুদ্ধ প্রেম রক্ষিত হয়েছে, তেমনই সমাজনীতিও আদর্শচ্যুত হয়নি। এই কারণেই বলা হয়েছে, শেষরক্ষা-এ যে-প্রেমের অভিব্যক্তি আছে তা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পরকীয়া প্রেম।

মহানগরীর পথে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

মহানগরীর পথে—
বাহির হয়েছি বিস্মৃত সেই কোন্ কৈশোর হ'তে।
আজো এই পথে চলি আমি তাই,
এ চলার যেন শেষ কভু নাই!—
অসহায় তৃণ—ফিরি ঘাটে ঘাটে
কুটিল জীবন-স্রোতে!
ঐ ছোটো সরণি—
কাঁচা রোদ যেথা টালির চালায় অলসে পড়েছে চলি,'
কতো বন্ধুর উদয়-বিলয়
দেখেছি সেথায় আজ মনে হয়;
কতোবার কতো কাজে এই দেখা
কেমনে গণিবো বলি!
ঐ মুসাফিরখানা—
ছোটো 'বোর্ডিং'—এ যেন আমার শত জনমের জানা।
কেহ রংপুর, কেহ রাজসাহী
হতে এসেছিল কতো পথ বাহি,'
একটি বুকে বসেছিল এসে
দেখায় পক্ষী নানা!

সমুখের ফুটপাথে—
কবি' হকটম্ মাথা টন্ টন্ করেছে কতো যে রাতে।
আজো দেখি সেই পানের দোকান
দেখায় জর্দা আর জাফরান,
সোডা-লেমনেড, মিঠে সরবৎ
মিলে যেতো এক সাথে।
কোথা সেই ভিখারিণী?—
কোথা সে পাগল হেদুয়ার ধারে?—
তাহারেও আমি চিনি।
দেখায় পার্কে গোধূলির ছায়
যারে একদিন দেখেছিনু হায়,—
আজ নাহি জানি কাহার ঘরণী সেই নারী কুহকিনী!
চাটি আর শুধু চাই—
এই ভিড়ে যদি চেনা মুখগুলি আবার
খুঁজিয়া পাই!
হায়রে দুরাশা, গেল কে কোথায়!
সাগর-ঊর্মি সাগরে মিলায়!
তিক্ত-মধুর স্মৃতি নিয়ে বুকে আমি পথ চলি তাই!

'নিষ্কামকর্ম'-তত্ত্বের রবীন্দ্রভাষ্য

পম্পা ঘোষ

মহা-ভারতীয় সংস্কৃতির সংহততম প্রকাশ 'গীতা'—একথা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। ভারতবর্ষে অন্তরের সুমহান্ সত্য এতে ধরা দিয়াছে নিত্যকালের ভাষায়। তাই ভারতপথিক কবি রবীন্দ্রনাথও স্বভাবতঃই গীতার প্রতি অনাকৃষ্ট থাকতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর উপনিষদ্ প্রীতির কথাই বাহুল্যের সঙ্গে বলা হয়, গীতা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের কথা প্রায় বলাই হয় না। অথচ গীতাও যে তাঁর চিত্তকে গভীরভাবে অধিকার করে ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে বস্তুতঃ রবীন্দ্ররচনায় গীতার গুরুত্বের বিষয় উপেক্ষিত হলে তাঁর মনোলোকের পরিচয়-টাই অ-সম্পূর্ণ থেকে যাবে।

গীতার বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও উদ্বৃত্তি সুবিস্তৃত রবীন্দ্র-সাহিত্যের নানা স্তরেই বিকীর্ণ হয়ে আছে। তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। গীতার একটিমাত্র প্রসিদ্ধ বাণীর মর্মকথা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-জ্যোতিতে কিভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে, শুধু তাই দেখানোই আমাদের অভিপ্রায়। আশা করি তাতেই রবীন্দ্রচিন্তায় গীতার বিশিষ্ট গুরুত্ব প্রতিপন্ন হবে। সেই বিখ্যাত বাণীটির পূর্ণরূপ এই।—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।
—'গীতা', ২।৪৭

"কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে কদাচ নয়। কর্মফলের কামনাই যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, অকর্মেও তোমার আসক্তি না হক।"

শ্লোকটির সরলার্থ এই।—কর্ম তোমার অবশ্যই করণীয়, কিন্তু ফলকামনার প্রবর্তনায় নয়। পক্ষান্তরে ফলকামনাত্যাগহেতু কর্মত্যাগের প্রতিও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। এই হল গীতার সুবিখ্যাত নিষ্কামকর্ম-তত্ত্বের মূলকথা।

রবীন্দ্রনাথ বারবার শ্লোকটির প্রথমাংশই উদ্ধৃত করেছেন, দ্বিতীয়াংশ উদ্ধৃত করেন নি। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যায় এই অংশের তাৎপর্যটিও সর্বদাই উপলক্ষিগম্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে।

গীতার এই সর্বজনপ্রিয় শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথেরও অতি প্রিয়। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে এই শ্লোকটির যে তাৎপর্য প্রতিভাত হয়েছিল তা অনন্যসাধারণ। তাঁর রচনার বিভিন্ন প্রসঙ্গে বহুবার তিনি এই শ্লোকটি স্মরণ করেছেন—কখনও তাঁর বক্তব্যকে চিরন্তন ভিত্তিভূমির উপরে প্রতি-ষ্ঠিত করবার জন্যে, কখনও বা গীতার মর্মগত এই শ্লোকটির সাহায্যে ভারতীয় চিত্তসংস্কৃতিকে নূতন মহিমায় উজ্জীবিত করে তোলার জন্যে। আর, এর দ্বারা তিনি যে সবসময় কেবল তত্ত্বব্যাখ্যাই করেছেন তা নয়, তাকে প্রয়োগ করেছেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে। রাজনীতি-সমাজনীতিও তার থেকে বাদ যায় নি। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকেও বোঝা যায়, এই বাণীকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সমস্ত অন্তর দিয়েই আর এই বাণীর প্রেরণাকে অন্যের অন্তরে সঞ্চারিত করতেও নিরন্তর চেষ্টিত ছিলেন।

ভারতীয় কর্মযোগতত্ত্বের মূলকথাটিই সংহততম রূপে নিহিত রয়েছে গীতার এই বাণীটিতে। গীতাধর্বিত কর্মযোগের এই মূলনীতি যে ভারত-ইতিহাসে অবাস্তব কল্পিত আদর্শমাত্র থেকে যায় নি তা সপ্রমাণ হয়েছে সর্ব-ত্যাগী গৌতম বুদ্ধের জীবনব্রতে ও রাজর্ষি অশোকের কর্মসাধনায়। এই দুই মহাকর্মযোগীর সাধনালব্ধ প্রেরণার ফলে অনাসক্ত বা নিষ্কাম কর্মের এই আদর্শ এক সময়ে ভারতবর্ষকে গৌরবের মহোচ্চ চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালের ভারতবর্ষে এই আদর্শ বিকৃত হয়ে গেল। অনাসক্তি-অনুশীলনের অর্থ দাঁড়াল সর্বপ্রকার কর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্যসাধনের পথে মুক্তির সন্ধান। রবীন্দ্রনাথকে তাই বলতে হল—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

—'নৈবেদ্য'। ৩০

সংসারের কর্মজাল থেকে মুক্তি পাবার উপায় সংসারকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে গিয়ে নয়, তাকে স্বীকার করে ও পেরিয়ে গিয়ে। অনাসক্তি নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু সেটা কর্মের প্রতি নয়, কর্মফলের প্রতি। প্রয়োজন তাই কর্ম ত্যাগ নয়, কর্মফল-কাঙ্ক্ষাত্যাগ। ফলের প্রতি দৃষ্টি রেখে কাজ করলে কর্মই আমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে থাকে। কারণ ফলের লোভই কানে ধরে আমাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়। কিন্তু অনাসক্ত কর্মে আমরা কর্ম করতে করতেই তার বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে থাকি।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। কর্মের মূলে যদি কোনোরকম প্রেরণা না থাকে, কোনো আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে সাধারণ মানুষ কর্ম করবে কিসের জন্য? তার কর্মোৎসাহ যে আপনিই নিস্তেজ হয়ে আসবে। গীতাকার এ সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকেন নি। নিষ্কাম কর্মের প্রেরণা কোথায়, তার সন্ধানও তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেন, নিছক কর্তব্যবুদ্ধির নীরসতা থেকে কর্মকে মুক্তি দিতে হবে প্রেমে ও আনন্দে। মনকে যদি শুধু নীতি উপদেশে শুষ্ক রেখে কাজ করি তবে কর্মের মধ্যে রস থাকে কই, আনন্দ থাকে কোথায়? কিন্তু এই নীরস কর্তব্যই সরস হয়ে ওঠে যখন তার পশ্চাতে থাকে প্রেম। মানুষ যখন ফলকামনার পরিবর্তে প্রেমের প্রেরণায় চালিত হয়ে কর্ম করে তখন তার সেই কর্মের মধ্যে বন্ধনের দুঃখ থাকে না, থাকে মুক্তির আনন্দ। এমন কি, তখন ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণের মধ্যেই সে পায় চরিতার্থতার পরম পরিতৃপ্তি, ভালবাসার মধ্যেই পায় অমৃতের স্বাদ। এই নিঃস্বার্থ কর্মই হল যথার্থ নিষ্কাম কর্ম। বেতনভোগী ভৃত্যও যখন তার প্রভুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করে বসে, তখন তার ত্যাগের মূল্য কি শুধু টাকায় শোধ করা যায়? মানুষ যখন মানুষের জন্য অথবা কোনো মহৎ আদর্শের জন্য সব বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় তখনই সে নীরস কর্তব্যের বেড়া যায় ডিঙিয়ে। তখন তারই থেকে উচ্ছলিত হয় আত্মবিসর্জনের আনন্দ। কর্মের মূলে যেখানে প্রেমের বদলে লোভ সেখানেই কর্মের দাসত্ব, তার দুঃখত্ব। আর ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি বৈরাগ্যে, ফলভোগের প্রতি অনাসক্তিতে যে কর্ম করি তাতেই পাই অমৃতের স্পর্শ।

২

রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে অনাসক্তকর্ম-তত্ত্বের যে সব ব্যাখ্যা করেছেন, নিম্নে তার থেকে কয়েকটি অংশ সংকলন করে দেওয়া গেল। উদ্ধৃতিগুলি সাজানো হল কালক্রম অনুসারে। আশা করি তাতে যেমন তাঁর ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতা সহজভাবে প্রকাশ পাবে তেমনই তাঁর মননধারার ক্রমাভিব্যক্তিটাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।—

ভারতবর্ষ মানুষকে লক্ষ্যহীন করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুতঃ কর্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়।

—'ভারতবর্ষ', নববর্ষ (১৩০৯)

আমাদের দেশের পূজনীয় শাস্ত্র ফলের আসক্তি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য। দেশের কাজেও ভারতবর্ষ যেন এই শাস্ত্রবাক্য কদাচ বিস্মৃত না হয়। দেশের হিতসাধনের জন্য আমরা প্রাণ সমর্পণ করিব, কেননা সেইরূপ মঙ্গলের জন্য প্রাণ সমর্পণ করাই ধর্ম; কিন্তু কোনো ফল—সে ফলকে ইতিহাসে যত লোভনীয় বলিয়াই প্রচার করুক-না—সেরূপ কোনো ফললাভ করিবার জন্য ধর্মকে বিসর্জন দিব এরূপ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দিলে রক্ষা পাইব না। বাইবেলে কথিত আছে, ফলের লোভে ধর্মকে ত্যাগ করিয়া আদিম মানব স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মরধর্ম লাভ করিয়াছে। ফললাভ চরম লাভ নহে, ধর্মলাভেই লাভ, এ কথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।

—'সমূহ', দেশহিত (১৩১৭। আশ্বিন)

গীতা সেই যোগকেই কর্মযোগ বলেছেন যে-যোগে আমরা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করি। অনাসক্ত হয়ে কর্ম

করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে ; নইলে কর্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্মী হই নে।

—'শান্তিনিকেতন' ত্যাগ (১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৭)

মানুষের বিপুল চাওয়া ক্ষুদ্র-নিজের জন্যে হলে তাতেই হয় অশান্তির সৃষ্টি। যেখানে তার সাধনা সকলের জন্যে সেইখানেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা কৃতার্থ হয়। এই সাধনাকেই গীতা যজ্ঞ বলেছেন ; এই যজ্ঞের দ্বারাই লোকরক্ষা। এই যজ্ঞের পন্থা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। সে কর্ম দুর্বল হবে না, সে কর্ম ছোটো হবে না, কিন্তু সে কর্মের ফলকামনা যেন নিজের জন্যে না হয়।

—'জাভাযাত্রীর পত্র', পঞ্চম পত্র (১৩৩৪ শ্রাবণ ১)

গীতা বলেছেন, 'কর্ম করো, ফল চেয়ো না।' এই চাওয়ার রাস্তাটাই কর্মের পাশ থেকে তার অমৃত ঠেলে নেবার জন্যে লালায়িত। ভিতরকার সহজ হওয়াটি সার্থক হয় বাইরেকার সহজ কর্মে। অন্তরের সেই সার্থকতার চেয়ে বাইরের স্বার্থ প্রবল হয়ে উঠলেই কর্ম হয় বন্ধন ; সেই বন্ধনেই জড়িত যত হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা, নিজেকে ও অন্যকে প্রবঞ্চনা।···

ফল-চাওয়া কর্মের নাম চাকরি, সেই চাকরির মনিব আমি নিজেই হই বা অন্যেই হোক। চাকরিতে মাইনের জন্যেই কাজ, কাজের জন্যে কাজ নয়। কাজ তার নিজের ভিতর থেকে নিজে যখন কিছুই রস জোগায় না, সম্পূর্ণ বাইরে থেকেই যখন আপন দাম নেয়, তখনই মানুষকে সে অপমান করে।···

সাধারণ মানুষের সমস্যা এই যে, কর্ম করতেই হবে। জীবনধারণের গোড়াতেই প্রয়োজনের তাড়া আছেই। তবুও কী করলে কর্ম থেকে প্রয়োজনের চাপ যথাসম্ভব হাল্কা করা যেতে পারে ? অর্থাৎ, কী করলে কর্মে পরের দাসত্বের চেয়ে নিজের কর্তৃত্বটা বড়ো হয়ে দেখা দেয় ? কর্ম থেকে কর্তৃত্বকে যতই দূরে পাঠানো যাবে কর্ম ততই মজুরির বোঝা হয়ে মানুষকে চেপে মারবে ; এই দাসত্ব থেকে মানুষকে উদ্ধার করা চাই।···

ভৃত্যকে যেখেছি তাকে দিয়ে ঘরের কাজ করাতে। মনিবের সঙ্গে তার মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ একান্ত হলে সেটা হয় ঘোলো-আনা দাসত্ব। যে সমাজ লোভে বা দাম্ভিকতায় মানুষের প্রতি ঘরের হাওয়া নি সে সমাজ ভৃত্য আর আত্মীয়ের সীমারেখাটাকে যতদূর সম্ভব ঝিকে করে দেয়। ভৃত্য সেখানে দাবা খুড়ো জেঠার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছয়। তখন তার কাজটা পরের কাজ না হয়ে আপনারই কাজ হয়ে ওঠে। তখন তার কাজের ফল-কামনাটা যার যথাসম্ভব ঘুচে। সে দাম পায় বটে, তবুও আপনার কাজ সে দান করে, বিক্রি করে না।

গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ে দেখেছি, গোয়ালা গোরুকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। সেখানে তার দুধের ব্যবসায়ে ফলকামনাকে তুচ্ছ করে দিয়েছে তার ভালো-বাসায় ; কর্ম করেও কর্ম থেকে তার নিত্য মুক্তি। এ গোয়ালা শূদ্র নয়। যে গোয়ালা দুধের দিকে দৃষ্টি রেখেই গোরু পোষে, কসাইকে গোরু বেচতে যার বাধে না, সেই হল শূদ্র ; কর্মে তার অগৌরব, কর্ম তার বন্ধন। যে কর্মের অন্তরে মুক্তি নেই, যেহেতু তাতে কেবল লোভ, তাতে প্রেমের অভাব, সেই কর্মেই শূদ্রত্ব। জাত-শূদ্রেরা পৃথিবীতে অনেক উঁচু উঁচু আসন অধিকার করে বসে আছে। তারা কেউ-বা শিক্ষক, কেউ-বা বিচারক, কেউ বা শাসনকর্তা, কেউ-বা ধর্মযাজক। কত কি, ডাই, চাকর, মালী, কুমোর, চাষি আছে যারা ওদের মতো শূদ্র নয়।

—'জাভাযাত্রীর পত্র', পঞ্চম পত্র (১৯২৭ জুলাই ২৮)

এর চেয়ে সুন্দরতর ও মহত্তর ব্যাখ্যা আর কারও রচনায় আছে কি না জানি না।

রাজাবাহাদুর

অর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য

বছরে ঐ একবার।

আর আমার বাইরে বেরুবার অবকাশ নেই। শুধু পূজা বোনাসের কল্যাণে যখন শূন্য পকেটটা ভারী ঠেকে তখন মনটাও কেমন যেন দেশভ্রমণের নেশায় মেতে ওঠে। মনে হয় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি বেদুইনের মত, যেদিকে দু চোখ যায়।

এমনি এক বেরিয়ে পড়ার তাগিদেই দেবার মোগল-সরাই জংশনে অমন ক'রে ব্রজরাখালবাবুর সংগে আমার দেখা হবে কে জানত। আর ব্রজরাখালবাবুর সংগে দেখা না হ'লে আমার জীবন থেকে লুপ্ত হ'য়ে যেত এক বিস্ময়কর অধ্যায়!

ট্রেনের প্রচুর দেরী ছিল। প্লাটফর্মের এক কোণে একটা বেঞ্চিতে এসে বসেছিলাম। হাতে ছিল একটা মাসিক রংস্য পত্রিকা। মুখে ছিল অর্ধদগ্ধ সিগারেট।

বেঞ্চির অপর কোণে প্রকাণ্ড একটা ইংরাজী দৈনিকের আড়ালে মুখ ঢেকে বসেছিলেন এক আধাবয়সী ভদ্রলোক। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। গর্বা রঙ্—বলিষ্ঠ চেহারা। এতক্ষণ খুব বেশী মনোযোগ দিতে পারিনি ওদিকে।

এবারে পরিষ্কার গলার স্বরে চমকে উঠলাম। স্মিতমুখে কথা ব'লছেন ভদ্রলোক:

"কি বই প'ড়ছেন? অগাথা ক্রিস্টির অনুবাদ বুঝি?"

ব'লাম "ঠিক ব'লেছেন। ষ্টেশনারের ষ্টল্ থেকে কিনেই ফেল্লাম একখানা।"

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বলেন, "খুব ভালো। খুব ভালো। বইএর মত নেশা হয় না পৃথিবীতে।"

রহস্য পত্রিকাটা জমে উঠেছে মন্দ না। কিন্তু সময় কাটাতে হবে অনেকক্ষণ। কথা বলার একজন মনের মত সংগী পাওয়া গেলে মন্দ কি। বিশেষতঃ একজন পরিচ্ছন্ন রুচির সহযাত্রী। পথের ধারে এরকম মাঝে মাঝে মিলেও যায় বরাতে।

বল্লাম, "আপনারও পড়ার নেশা আছে ব'লে মনে হচ্ছে।"

আলাপটাকে পাকা ক'রে নেবার জন্য নিজের সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

বল্লেন, "বই পড়া আমার জীবনে এক বিচিত্র ইতিহাস হ'য়ে আছে। হয়ত আপনি একটু অবাক হ'চ্ছেন। কিন্তু অনেকের কাছে গল্প করেছি। বলাটাও নেশার দাঁড়িয়ে গেছে।"

কৌতূহলী চোখ মেলে উঠল আমার। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর উপর চোখ রেখেই বল্লাম, "গল্প শুনতে আমিও ভালবাসি। সমঝদার শ্রোতার অভাব হবে না আপনার।"

সিগারেটের আগুনটা আরেকবার তীব্র হয়ে জ্বলে উঠল ভদ্রলোকের ঠোঁটের গোড়ায়। হাল্কা একটু নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বল্লেন, "শুনুন তবে।"

* * *

"বীরভূম জেলার রূপকাঠি গ্রামের নাম বোধহয় শুনে থাকবেন। বেশ বর্ধিষ্ণু একটি গ্রাম। কিন্তু গ্রামের চেয়েও নামকরা ছিল সেখানকার জমিদারী। আর তার চাইতেও নামকরা ছিল সেখানকার জমিদার।

রূপকাঠির জমিদারেরা ছিলেন বিরাট ধনী। জমিদারীর আয়তনের মত তাঁর আয়ও ছিল বিশাল।

রূপকাঠির জমিদারকে আমরা রাজাবাহাদুর ব'লে ডাকতাম। ওটাই ছিল ওঁর খেতাব। আর ওঁর খেতাবের মতই জমকালো ছিল রাজাবাহাদুরের মহল প্যালেস্। উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বিরাট একখণ্ড জমি নিয়ে ছিল তাঁর চওড়া এলাকা। আর তার মাঝখানে

টল্‌টল্ করে উঠত জমিদার বাড়ীর দীঘির স্বচ্ছ জল। সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান আর বাঁধানো পথঘাট দিয়ে সাজানো ছিল প্যালেসের চারদিক। দেখলে সাধারণ লোকের দৃষ্টিভ্রম হ'ত।

সে সময়টা আমি সবে বি-এ পাশ ক'রেছি। বেকার হ'য়ে ব'সেছিলাম নিজের পৈতৃক গ্রাম আনন্দপুরে। এমন সময় হঠাৎ মামার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম।

উনি ছিলেন রূপকাঠি স্কুলের হেড্ মাষ্টার। ওখানকার প্রভাবশালী লোক। রূপকাঠি স্কুল আর কাঞ্চনপাড়া কলেজ—দুটোই অবশ্য রূপকাঠির রাজাবাহাদুরের দানের টাকায় তৈরী হ'য়েছিল।

চিঠিতে মামা লিখেছিলেন রূপকাঠিতে চ'লে আসবার জন্য। আমার চাকরীলাভের একটা প্রচ্ছন্ন আভাসও ছিল সেই চিঠিতে। বলা বাহুল্য ব্রজরাখাল চক্রবর্তী আর বিলম্বমাত্র দেরী করে নি।

'ময়ূর প্যালেসে' যেদিন প্রথম গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সেদিনটা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

সিংহদরজা আর গালপাট্টাওয়ালা বন্দুকধারী দারওয়ানদের পিছনে ফেলে প্যালেসের দিকে চ'লে গিয়েছে পীচ্‌ঢালা মসৃণ পথ। দূরত্বটা নেহাৎ কম নয়। তার মধ্যেই চোখে প'ড়ল কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ জলে ভরা রাজবাড়ীর বিরাট দীঘি। রঙ্‌চঙে ফুলে ভরা বাগান, আর লতাপাতার বাহার।

ময়ূর প্যালেসের সামনে এসে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল আমার। ঝক্ ঝক্ ক'রছে মার্বেল পাথরের তৈরী সাদা প্যালেসটা। রাজবাড়ীর গম্বুজখানা ছিল দেখবার মত। হাওয়ায় উড়ছিল নীল নিশান তার মাথায়। প্যালেসের গায়ের জাক্‌রি আর জালির কাজ দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম আমি।

আভ্যন্তরীণ পথঘাট সেদিন গোলকধাঁধার মত অচেনা মনে হ'য়েছিল। দারওয়ানের সঙ্গে অসংখ্য বারান্দা, সিঁড়ি আর ফুলঘর পেরিয়ে অবশেষে একটা জমকালো ঘরের সামনে এসে পৌঁছলাম। বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে সুশ্রী চেহারার কর্সা ছিপ্‌ছিপে একজন যুবক ব'সেছিলেন। চোখে কালো চশমা। পরণে নিখুঁত নিভাঁজ নীল সুট। বেশ একটু আভিজাত্যের ছাপ চোখে পড়ল—ব্যবহারে আর বেশভূষায়।

ভদ্রলোকের পরিচয় পরে জেনেছিলাম। রাজাবাহাদুরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মিঃ সেন। ময়ূর প্যালেসে মিঃ সেনের লেখা পরেও পেয়েছিলাম। কিন্তু সেকথা পরে ব'লব।

আমার পকেটে ছিল মামাবাবুর লেখা একটি পরিচয়-পত্র। উল্টে-পাল্টে সেটাকে দেখে নিয়ে তিনি বল্লেন: "ঠিক আছে। আপনি সুধীরবাবুর ভাগ্নে তো? এই মহাবীরই আপনাকে রাজাবাহাদুরের কাছে নিয়ে যাবে। আপনি আজ থেকেই কাজ সুরু করুন। আপনার এখানকার থাকার ঘরটায় সব কিছুই ঘরওয়ান দেখিয়ে দেবে।"

মহাবীরের পিছু পিছু কের রওনা হ'লাম ভিতরের মহলের দিকে। এবারে একটা ছুটো নয়, অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সিঁড়ি টপ্‌কিয়ে একেবারে প্যালেসের চৌতালায় এনে আমাকে হাজির ক'রল মহাবীর। পায়ে তখন ব্যথামত ব্যথা অনুভব ক'রছি।

চৌতালার ছাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল জনাকয়েক ভৃত্য। মহাবীর তাদের একজনের জিম্মায় আমাকে ঠেলে দিয়ে ব'ল, "যান্ বাবু—এই গোলাপের সংগে যান্। রাজাবাহাদুর এখন তরবারী খেলছেন, বাত্‌চিত্ হবে।"

লাল পাথরের ঝক্‌ঝকে ছাদটা সহজেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল। তারই এক কোণে খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়েছিলেন প্রৌঢ় একজন ভদ্রলোক। সংগে ছিল তলোয়ারধারী আরেকজন অনুচর। আমার আকস্মিক আবির্ভাবে তলোয়ার খেলায় হঠাৎ যবনিকাপাত হয়েছে—বোঝা গেল পরিষ্কার।

আন্দাজে মনে হ'ল রাজাবাহাদুরের বয়স বছর ষাটেক হবে। মাথার অর্ধেকটা টাকে ভর্তি—অর্ধেকটায় কাঁচা পাকা চুল। পরণে ঝল্‌মলে সিল্কের পাঞ্জাবী আর সিল্কের পাজামা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম।

তলোয়ারখানা আগেই খাপে পুরে ফেলেছিলেন রাজাবাহাদুর। আমারও ওঁর চোখে প'ড়েছিলাম। গোলাপ এগিয়ে গিয়ে দু চারটে কথা বলার পর রাজাবাহাদুর নিজেই এগিয়ে এলেন আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

হাত জোড় ক'রে ব'ল্লেন, "নমস্কার। খুব খুশী হ'লাম আপনাকে দেখে।"

প্রতিনমস্কার ক'রলাম আমি।

রাজাবাহাদুর ব'ল্লেন, "সকলে ব'লছিল প্যালেসের কেতাবঘরে একজন লাইব্রেরীয়ান না হ'লে আমার প্যালেসটা নাকি বেমানান লাগছে। সেই জন্যই আপনাকে আমার বিশেষ দরকার।"

আমি বিনীতভাবে ব'লাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই। এত বড় একটা প্যালেসে লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধায়ক না থাকলে চলবে কেন।"

রাজাবাহাদুরের ইংরেজী উচ্চারণ শুনে আমি শংকিত হইনি। কারণ তাঁর বিদ্যার পরিচয় কিছু কিছু আগেই শুনেছিলাম। সারা যৌবন ঘোড় ক'াপের পিছনে ব্যয় ক'রে লেখাপড়াটা বিশেষ কিছু শিখে উঠতে পারেন নি ভদ্রলোক।

রাজাবাহাদুরের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল বিনয়ে। ব'ল্লেন, তাহ'লে কেতাব-ঘরের ভারটা আপনার উপরেই রইল। চলুন, আপনাকে আমার কেতাব-ঘরটা দেখিয়ে আনি।"

ঘুরে ঘুরে দোতালার নেমে লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ ক'রলাম। রাজাবাহাদুর আর যাই হোক যা করেন তা দরাজ হাতেই করেন। মার্বেল বাঁধানো হল্‌ঘরের সমীহ করার মত আকৃতি ছিল বৈকি। দেওয়ালজোড়া সব অয়েল পেন্টিংগুলিতে রাজাবাহাদুরের পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি টাঙান। তাঁরা নাকি মাত্র কয়েক পুরুষ আগে উত্তর প্রদেশ থেকে এসেছিলেন। ক্ষত্রিয় ব'লে প্রত্যেকের কোমরে একটা ক'রে তলোয়ার ঝুলছে। তা ছাড়া ঝক্ ঝকে বই বোঝাই মেহগিনী কাঠের আলমারী আর র‍্যাক্ সুন্দরভাবে সাজানো। পাঁচ ছজন লোক অনবরত ঘরের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে আর ঘর পরিষ্কার ক'রতে ক'রতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছে।

আমি ভাবছিলাম—

"পাষাণ গাঁথা প্রসাদ পরে আছেন ভাগ্যবন্ত,
হেমগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ।
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা,
অধ্যাদিত মধু যেমন যুথী অনাঘ্রাতা।

ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে ঘর পুরাময়,
দেখা আমার ছন্দোময়ী ক'রবি কি তুই যাত্রা।"

রাজাবাহাদুরের লাইব্রেরী ঘরের হাল অনেকটা ছিল এই রকম।

দু চার দিনেই রাজবাড়ীর সমস্ত খুঁটিনাটি জানা হ'য়ে গেল আমার। কাজ-কর্ম হাতে বিশেষ কিছুই ছিল না। লাইব্রেরী ঘরের টেবিলের সামনে ব'সে চেয়ারে হেলান দিয়ে সীমাহীন অলসতা আর অফুরন্ত স্বাধীনতার মধ্যে সময় কাটত আমার। বইএর একটা লিষ্ট তৈরীর কাজে হাত দিয়েছিলাম—কাজটার প্রস্তুতিপর্ব চলত অতি ধীরে। বাকি সারা দিনটা আমার কাজ ছিল রাজবাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরে বেড়ানো। আনাচে কানাচে দর্শনীয় সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম—রাজবাড়ীর প্রত্যেকটা লোকের সংগে চেনা পরিচয় হ'য়ে গিয়েছিল আমার।

এমনি একদিন দোতালার করিডরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজাবাহাদুরের খাস ভৃত্য নিধুর সংগে গল্প ক'রছি এমন সময় দক্ষিণ দিকের বন্ধ দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। নিধু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বল, "চুপ! সরে আসুন কেতাববাবু।"

আমি ব'লাম, "কেন?"

নিধু চাপা গলায় ব'ল্ল "রাণীমা আসছেন যে! দেখছেন না রাণীমার খাস দাসী পারুলের গলা শোনা যাচ্ছে।"

দুজনে চুপচাপ নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি একেবারে দেওয়ালের সংগে মিশে। প্রথমে পারুলের দর্শন মিলল—তারপর পদ্ম দাসীর। একেবারে হরিণের মত কান খাড়া ক'রে রইলাম। একি? ইনিই কি রাণীমা নাকি? রাজাবাহাদুর আদিত্য কিংকর সিংহের স্ত্রীকে আমি যে সম্পূর্ণ বিপরীত আশা ক'রেছিলাম।

কোথায় শাড়ী-আলতা—গয়নার ভারে জর্জরিত এক মধ্যবয়সী মহিলাকে দেখব ব'লে আশা ক'রেছিলাম—দেখতে পেলাম ক'লকাতার চৌরংগীর এক আধুনিক সংস্করণ। রাণীমা সুন্দরী সন্দেহ নেই—বিশেষ ক'রে কাজলটানা চোখের পাতা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। গায়ের রঙও বেশ ফর্সা। তবে বয়সটা বাইশ তেইশের বেশী হবে ব'লে মনে হ'ল না। পরণে সাদা সিল্কের শাড়ী, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, কিউটেক্স রঞ্জিত নখাগ্র, তেলতেটমোড়া চটিজুতো সব কিছুই চট্ পট্ দেখে নিলাম। হাঁটার

ভংগীর মধ্যে কেমন যেন একটা নাচের ছন্দ আছে রাণীমার।

রাণীমা চ'লে যাবার পরে নিধু যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। ব'লল, "দেখলেন তো! বড় রাণীমা মারা যাবার পরে রাজাবাহাদুর ওনাকেই বিয়ে ক'রেছেন। তা এ বিয়েও তো প্রায় বছর খানেক হ'তে চ'ল।'

ব'ললাম, "রাণীমার পৈতৃক বাড়ী কোথায়?"

—"ওনারা হ'চ্ছেন পাইরাডাঙার জমিদার। তবে রাণীমা কলকেতাতেই মানুষ—সাহেব সুবোর ইস্কুলে লেকা-পড়া ক'রেছেন।"

ব'ললাম, "সে তো দেখেই আন্দাজ ক'রেছি।"

নিধু চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে ব'ল, "সেবার রাজা-বাহাদুরের বিয়ের সময় কি কাণ্ড হ'য়েছিল যদি জানতেন। রাণীমা থেকে ব'সলেন রাজাবাহাদুরকে কিছুতেই বিয়ে ক'রবেন না। ছেলেমানুষ বউ—বুড়ো রাজাকে মনে ধ'রবে ক্যানো? আপনিই বলুন।"

আমি বললাম, "তারপর?"

—"তারপর হলুস্থুল ব্যাপার! রাজাবাহাদুর আজ লোক পাঠাচ্ছেন, কাল ভেট পাঠাচ্ছেন। শেষটায় অবিশ্যি ওনারই জিৎ হ'ল। রাজাবাহাদুরের শ্বশুরের যাহোক টাকার খাঁই—মেয়ের জিন্ পেরাহিই করেন না।"

বললাম, "তা এখন তো ও সব ল্যাঠা চুকে বুকে গেছে। রাণীমার রাগ-টাগ সব প'ড়ে গেছে নিশ্চয়?"

নিধু ব'ল "কোথায় প'ড়েচে! রাণীমা তো এক সকাল বেলা জলখাবারের টেবুল ছাড়া রাজাবাহাদুরের সাথে ভাকাই করেন না। সারাদিন বসে বসে কি রাজকার্য করেন তা উনি জানেন আর ওনার দাসীরাই জানে।"

আমি বললাম, "আর রাজাবাহাদুর?"

নিধু ব'ল "রাজাবাহাদুরের জন্য আমার দুঃখু হয়। সত্যিই বুড়ো বয়সের বৌ'ক—বুঝতেই পাচ্ছেন—রাণীমাকে একেবারে চক্ষে হারান। কিন্তু রাণীমার মত নিদয় মেয়ে-মানুষ আমি আর জন্মে দেখি নি। কোথায় বড়রাণীমা—কোথায় ছোট রাণীমা। আকাশ আর পাতাল। খাবার টেবুলে ওনার ব্যাভারটা যদি দেখতেন।"

বললাম, "কি রকম ব্যবহার?"

নিধু বল, "অতি নিরুজ ব্যাভার। সোয়ামীর সংগে কেউ ও রকম ভাবে কথা কয়। রাজাবাহাদুর নেকা পড়া জানেন না তাই বউএর সাথে ভয়ে ভয়ে কতা বলেন। তাই ব'লে রাণীমা যা খুশী ধমক দেবেন?"

অবাক হ'য়ে বললাম, "খুব ধমক দেন বুঝি?"

নিধু বল, "হ্যাঁ, যখন তখন। রাজাবাহাদুর তো প্রায়ই বেফাঁস কতা কয়ে ফেলেন—আর উনি বাংলা ইঙ্গিরী যা মুখে আসে তাই ধমক দেন। রাজাবাহাদুর আর কি ক'রবেন বলুন, ইস্ত্রীর সংগে তো আর ঝগড়া ক'রতে পারেন না। খালি মাথা নীচু ক'রে থাকেন। আচ্ছা আমি এবার পালাই কেত্তাববাবু।"

ব'ললাম, "কোথায়?"

—"অনেক কাজ প'ড়ে আছে। আমার আর ফিরোবার সময় কই?"

প্রস্থানোদ্যত নিধুকে বড় ভালো লাগল। এরাই আমার সারাদিনের সংগী সাথী। ওরা ছাড়া সমস্যের বোঝা অতি ভারী ঠেক'ত আমার কাছে।

ঘুরে বেড়াতাম কখনো বাগানে কখনো ময়ূর প্যালেসের জমকালো ঘর-বারান্দায়। সত্যি প্যালেসটার ভিতরে যে কত লক্ষ টাকার শিল্পকলা রয়েছে ভাবতে এখনও আশ্চর্য লাগে। প্যালেসের সাধারণ ঘরগুলিতেও দেখেছি রুচি-সম্মত বহার্ঘ আয়না আর দেওয়াল জোড়া অয়েল পেন্টিং। প্যালেসের মিউজিয়ামে প্রাচীন পূর্বপুরুষদের যে সব অস্ত্র-শস্ত্রের নিদর্শন দেখেছি তা দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে যেত যে কোন লোক। মোট কথা ময়ূর প্যালেসের ঐশ্বর্য আমার চোখে রূপকথার স্বপ্ন হয়ে থাকবে।

প্যালেসের বহিরংগ রূপের কথা বাদ দিলেও এর প্রতিটি লোকজনের সংগে আমি অন্তরংগ হয়ে উঠেছিলাম। অংগাংগিভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম প্যালেসের সংগে।

পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই রাজাবাহাদুরের সংগে অনেকটা ঘরোয়া হ'তে পেরেছিলাম বলেই বোধহয় একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমি যদিও লাইব্রেরী-য়ান এবং তপন সেন প্রাইভেট সেক্রেটারী তবুও কার্যতঃ আমিই রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী হতে চলেছি। অশিক্ষিত রাজার সংগে ধোপদুরস্ত তপন সেনের খাপ খায় না। অল্প দিনেই জিনিষটা লক্ষ্য ক'রলাম। সেই সাথে দেখলাম বেচারী রাজা সহানুভূতির সন্ধানে ঘুরে ঘুরে আমার

সাহচর্যকেই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন। দুদিনেই আবিষ্কার করলাম যে আমি একাধারে রাজাবাহাদুরের বয়স্য, বিদূষক এবং পরামর্শদাতা। যাইহোক আমার পক্ষে জিনিষটা লাভজনক বলতে হবে।

• • •

দু পাশের টবে দুষ্প্রাপ্য অর্কিড্ আর মুরদ্ত কার্ব—লালচে লালচে অর্কিড্ ফুল ধরেছে। রাজাবাহাদুরের সংগে দেখা করার উদ্দেশ্যে বারান্দা দিয়ে হাঁটছিলাম। হল্ ঘরটার পাশ দিয়ে রাজাবাহাদুরের খাস কামরায় ঢুকতে যাব এমন সময় দেখি শ্রীমান নিধিরাম বিব্রত মুখে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

বল্ল, "যাচ্ছেন কোথায় কেতাববাবু? রাজাবাহাদুরের মেজাজ আজ খুব গরম!"

ভয়ে ভয়ে বল্লাম, "গরম কেন? রাজাবাহাদুর তো খুব ঠাণ্ডা লোক।"

নিধু বল্ল, "এমনিতে তো খুব ঠাণ্ডা। কিন্তু আজকে গোলমাল বেধেছে। রাণীমার একটা তেল রঙের ছবি ক'লকেতা থেকে এই মাত্তর এসে পৌছুল। ব্যস্ সেই ওষুধি মেজাজ খারাপ। ঘরের মধ্যে খালি ঘুরপাক খাচ্ছেন আর বলছেন ছবিওয়ালাকে এক পয়সা দোব না।"

আমাকে বিব্রত দেখে নিধু ব'ল্ল, "ঠিক আছে, আপনি ভিতরে চ'লে যান। আপনাকে রাজাবাহাদুর খুব পছন্দ করেন—আপনি বুঝিয়ে সুজিয়ে ব'ল্লে ঠিক নরমটি হবেন।"

সামনে জরির চুম্কী বসানো কালো ভেল্ভেটের পর্দা ঝুলছে। আস্তে আস্তে ঠেলে ভিতরে ঢুকে এককোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিধিরাম যা ব'লেছে তা মিথ্যা নয়। রাজাবাহাদুর আজ বাস্তবিকই চটেছেন। টুকটুকে লাল পার্সিয়ান কার্পেটটার উপরে জরি বসানো নাগরার ডগটা বার বার ঘুরে ফিরে আসছে। রাজা-মশাই-এর মুখ আষাঢ়ের মেঘের মত অন্ধকার।

মিনিট খানেক পরে রাজাবাহাদুরের চোখে প'ড়ল। ভ্রূ কুঁচ্কে তাকিয়ে বল্লেন, "ও আপনি?"

আমি আদবকায়দায় অনভিজ্ঞ। ভয়ে ভয়ে কোন উচ্চবাচ্য ক'রলাম না। রাজাবাহাদুর যেন খুলসে উঠলেন। ব'ল্লেন, "দেখেছেন একবার কাণ্ডটা। আক্কেলটা একবার দেখেছেন। এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত ক'রব না।"

তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে টাঙান অয়েল পেন্টিং-টার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্লেন, "ঐ দেখুন ঐটা নাকি রাণীমার ছবি।"

আমি আম্তা আম্তা ক'রে ব'ল্লাম, "আজ্ঞে ছবিটা তো রাণীমার ছবি বলেই মনে হ'চ্ছে।"

রাজাবাহাদুর অগ্নিশর্মা হ'য়ে বল্লেন, "আপনারও দেখছি চশমার দরকার। বলেন কি আপনি? রাণীজীর এত বয়স? এ তো একটা বুড়ীর ছবি এনে হাজির করেছে।"

ভালো করে তাকিয়ে বুঝলাম বেচারী আর্টিষ্টের খুব বেশী দোষ নেই। সে বেচারী রাণীমাকে চর্মচক্ষেও হয়ত দেখে নি। ফটো দেখে আঁকা ছবি—হয়ত তুলির বাহুল্যে মুখে একটু বয়স্ক ভাব এসে গেছে। তা নিয়ে আর যাই হোক এত বিচলিত হবার কোন কারণ দেখলাম না।

নিধু আমার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকেছিল। বল্ল, "ছবি তো ঠিকই আছে। তাই না কেতাববাবু?"

রাজাবাহাদুর মাটিতে পা ঠুকে গর্জন করে উঠলেন,- "আলবাৎ বেঠিক আছে। কর্তাল্ সিং—ইধর্ আও। এই তস্বীর চুলীমে ফিক্ দেও।"

কর্তাল সিং ছবি নিয়ে চলে গেল তবু রাজাবাহাদুরের রাগ প্রশমিত হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। খাঁচায় পোষা বাঘের মত এককোণ থেকে ওকোণ পায়চারী করছেন। আর মাঝে মাঝে বিড়্ বিড়্ করে বলছেন: "চালাকী! জবরদস্তি করে রাণীজীর বয়স বাড়াবার মতলব।"

আরেকদিন মনে আছে রাজবাড়ীর দোতালার একটা ব্যাল্কনীর উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাগান দেখছিলাম। উঁচু উঁচু দেবদারু আর ঝাউগাছগুলি মন্থর বাতাসে এক একবার দুলে দুলে উঠছে। লাইন বাঁধা পাম গাছের উপর দিয়ে একটানা শির্ শিরানির শব্দ। প্যালেস্ কম্পাউণ্ডের পশ্চিম কোণটা কৃষ্ণচূড়ার ফুলে লাল হ'য়ে আছে। কিন্তু আমার দৃষ্টিটা নিবদ্ধ ছিল দক্ষিণ দিকে। বহুক্ষণ ধ'রে দেখছি মাহুত রামকিষেণ রাজাবাহাদুরের পিলখানার দুই পেয়ারের হাতী ফুলমালা আর কণমালাকে স্নান করাচ্ছে। জল নিয়ে হাতী দুটোর কি কসরৎ—কিছুতেই ওদের আর স্নান শেষ হয় না।

হঠাৎ কিন্তু আমার দৃষ্টিটা ঘুরে গিয়ে প'ড়ল সামনের লাল কাঁকর বিছানো পথের দিকে—সুদীর্ঘ লাল সরল রেখা। কিন্তু এই নির্জন তার দুপুরে একটা লাল বিন্দু এত স্পষ্ট হয়ে উঠছে কেন? বিন্দুটা কিন্তু ক্রমশঃই আরও বেশী স্পষ্ট হ'য়ে উঠল—এত বেশী যে আমার বুদ্ধি-ভ্রম হবার উপক্রম। বলে বিশ্বাস ক'রবেন না দোতলার সেই ব্যালকনী থেকে বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কাকে দেখলাম জানেন? দেখলাম কৃষ্ণচূড়া রঙের শাড়ীতে একেবারে পটের বিবিটি সেজে এগিয়ে আসছেন আমাদের রাণীমা। এই নির্জন দুপুরে শুদ্ধ বাগানের মধ্যে রাণীমার প্রবেশের কোন যুক্তিসংগত কারণ অনুসন্ধান করতে পা'রলাম না। দেখেছিলাম কেমন লঘু পা ফেলে ফেলে চলে যাচ্ছেন রাণীমা—চলার সাথে সাথে হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা দুলে দুলে উঠছে। তারপর ধীরে ধীরে উনি বাগানের গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেলেন।

আমি আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে এলাম। সিঁড়ি বেয়ে চলে এলাম তেতালায়। রাজাবাহাদুরের খাস্ কামরা খুব বেশী দূরে নয়। কিন্তু রাজা বোধ হয় খুব সম্ভবতঃ নিদ্‌ঘরে আছেন।

নিঃশব্দ পায়ে হাঁটছিলাম করিডর দিয়ে। হঠাৎ পাশের একটি ঘর থেকে গলার আওয়াজ পেয়ে চমকে ফিরে তাকালাম। কৌতূহলী পা আমাকে আস্তে টেনে নিয়ে গেল সেদিকে।

বেশ বড় সাইজের একটা ঘর। কিন্তু দেখে মনে হ'ল ছোটখাট চিড়িয়াখানা। ঘর ভর্তি খাঁচা ঝুলছে রঙ-বেরঙের পাখীর। তাদের কিচির মিচির শব্দে মুখরিত ঘরটা। ময়না, চন্দনা, ককাতুয়া আরও কত কি। দাঁড়ের উপর হিরেমন পাখীও চোখে প'ড়ল।

সারা ঘরটায় ঘুরে ঘুরে ওয়ারক ক'রে বেড়াচ্ছে একটা লোক। দেখেই চিনলাম। নিধিরামের ছোট ভাই সিধু।

সিধু হেসে ব'ল, "আরে আরে কেতাববাবু যে! কখন এলেন?"

বললাম, "আসছি এই মাত্র। কিন্তু ব্যাপার কি এখানে? এ যে দেখছি রঙবেরঙের পাখীর সাম্রাজ্য!"

সিধু ব'ল, "সব রাজাবাহাদুরের খেয়াল। এদের দেখবার জন্যেই তো আমাকে এখানে রাখা হয়েছে। আর দশ মিনিট সবুর করুন—রাজাবাহাদুর আসবেন—.দখবেন কাকেন পাখের আওয়াজে কান খাড়া হয়ে ওঠে আর্ দেখে পাখীগুলোর।"

বল্লাম, "রাজাবাহাদুর খুব পাখী ভালবাসেন বুঝি?"

সিধু ব'ল, "বাসেন বৈকি। অনেক দিনের শখ। কিন্তু পাখী না পুষেই কি করেন বলুন। দুকুর বেলাটা যা হোক কাটাতে হবে তো, শুয়ে ঘুমিয়ে লোকে কতক্ষণ পারে। রাণীমা তো দুকুর বেলা ওঁকে কাছে ঘেঁষতেই দেন না।"

আমি ব'ল্লাম, "তার মানে?

সিধু ব'ল্ল, "দুকুরবেলাটা নাকি রাণীমার বড্ড মাথা ধরে। রাজাবাহাদুরকে তাই বাধ্য হয়ে সময়টা এদিক ওদিক কাটাতে হয়। কি আর ক'রবেন—তাই পাখী পুষছেন।

সিধু আবার ব'ল্ল, "নেশাটা কিন্তু মন্দ নয়। সময় কাটে বেশ, কি বলুন কেতাববাবু।"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবার সময় বার বার মনে পড়ছিল রাজাবাহাদুরের পাখী পোষার খেয়াল। সময় কাটাবার কি অভিনব পরিকল্পনা! একি আত্মবঞ্চনা না আত্ম-সান্ত্বনা?

এসে বসলাম দোতালার করিডরে। এইখানে এক-কোণে চেয়ার পেতে বসে থাকাটা আমার স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ কিন্তু হঠাৎ ঘড়িতে টং করে একটা বাজার পর বেশ একটু চমকে উঠলাম আমি। সামনের ঘাস ঢাকা লনে রোদ বেশ ঘন হয়ে উঠেছে—হঠাৎ যে বেলা কখন বেড়ে উঠেছে একদম খেয়াল হয় নি আমার।

উঠি উঠি করছি এমন সময় পিছন থেকে কে ডাকল, "কেতাববাবু?"

তাকিয়ে দেখি আবক্ষনির্মিত শ্বেতপাথরের নারী-মূর্তিটার পিছন থেকে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসছে শ্রীমান নিধিরাম।

বলল, "এখানে বসে এতক্ষণ করছেন কি? শুধু বাগান দেখেই পেট ভরাবেন?"

ব'ল্লাম, "কই না, এখনই উঠব। কিন্তু কালকে

ব্যাপারটা কি হ'য়েছিল বল তো? গলাবাজী ক'রছিলে কার উদ্দেশ্যে?"

নিধু চোখ পাকিয়ে ব'ল্ল, "হ্যাঁ। কাছে পেলে এক-বার দাঁতগুলো খুলে নেই। আস্ত জানোয়ার একটা।"

অধৈর্যভাবে ব'ল্লাম, "আহা, ঐ জানোয়ারটি কে?"

নিধু উত্তেজিতভাবে ব'ল্ল, "ঐ রাজাবাহাদুরের সেক্রে-টারী। ফুরসুৎ পেলেই আমাকে ইস্ত্রিরীতে গাল দেয়। তা ও আমায় ব'কবার কে—আমি ওর খাই না পরি। রাণীমার আস্কারা পেয়ে দিন দিন তেজ বেড়েই চলেছে।"

আমি ব'ল্লাম, "রাণীমার আস্কারা পেয়ে? সে আবার কি?"

নিধু দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ করে বল্ল, "হ্যাঁ। আস্কারা পেয়েই তো ঐ জোচ্চর টিঁকে আছে। নইলে সেবার রাজাবাহাদুর তো ঘাড় ধ'রে বিদেয় করে দিতেন।"

ব'ল্লাম, "কি হয়েছিল ব্যাপারটা? আমি তো কিছুই জানি না।"

নিধু ব'ল্ল, "হ'য়েছিল আবার কি। সরকার মশাইএর বাক্সো ভেঙে তছরূপ ক'রেছিল লোকটা। রাজাবাহাদুর জানতে পেরে রেগেমেগে অস্থির। 'আভি নিকালো' ব'লে তক্ষুণি বার করে দিলেন।"

আমাকে স্তম্ভিত দেখে নিধু ব'ল্ল, রাজাবাহাদুরকে তাই ব'লে বয়স্কাণী মনে ক'রবেন না—ওনার ঘয়স শরীর। কত লোকের খাজনা উনি মুকুব ক'রেছেন জানেন। সেবার কাছারীর অমূল্য দশ টাকা চুরী করেছিল ব'লে উনি ওর দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন—ব'লেছেন অভাব থাকলেই লোকে চুরী করে।

আমি ব'ল্লাম, "তা তো করে। কিন্তু সেক্রেটারীর কি হ'ল?"

নিধু ব'ল্ল, "ওরে বাবা। সে দারুণ ব্যাপার। রাণী-মার বাপের বাড়ীর দেশের লোক। তার অপমানে নাকি রাণীমার অপমান। উনি রাগ করে গোসাঘরে খিল দিলেন। কিছুতেই ওনার আর মান ভাঙানো যায় না।"

আমি ব'ল্লাম, "তারপর?"

—"তারপর তো বাড়ীশুদ্ধ হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। রাণীমা রাগ ক'রে এক কাপড়ে বাপের বাড়ী ক'লকেতায় চ'লে গেলেন। রাজাবাহাদুর খবর পেয়ে ইস্ত্রীর মান ভাঙানোর জন্য পড়ি কি মরি করে ছুটলেন শ্বশুরবাড়ী। কিছুতেই আর রাণীমার রাগ পড়ে না। জলটুকু মুখে তুলবেন না বলে পিতিজ্ঞে ক'রেছেন।"

ব'ল্লাম, "ব্যাপার তাহলে সাংঘাতিক গড়িয়েছিল বল?"

নিধু ব'ল "তা আর ব'লতে। রাজাবাহাদুর তিন দিনের পীড়েপীড়িতে রাণীমার মান ভাঙিয়েছেন। বাধ্য হ'য়ে সেক্রেটারীকে ফের কাজে ফিরিয়ে আনবার কথা দিয়েছেন। তবু রাণীমার মন উঠল না। ব'ল্লেন ওকে চ'লবে না—আগে আমার গা ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে কর। রাজামশাই ব'লেন, ক'রছি। রাণীমা ব'ল্লেন, ও যত দোষ করুক কিছুতেই চাকরী থেকে ওকে ছাড়াতে পারবে না। আমার বাপের বাড়ীর দেশের লোকের অপমান আমি সহ্য ক'রতে পারব নাকো ব'লে দিচ্ছি।"

আমি ব'ল্লাম, "রাজাবাহাদুর তাতেই রাজী হ'লেন?"

নিধু ব'ল্ল "হ্যাঁ। তা ছাড়া আর উপায় কি ছিল আপনিই বলুন। একেই রাণীমার যা মেজাজ। রাগের চোটে কি ক'রে বসেন কিছুই ঠিক নেই। তা ছাড়া রাজাবাহাদুরের বুড়ো বয়সের বিয়ে—বুঝতেই পারছেন—একটু বুঝে সুজে টেনে বুনে চ'লতে হবে তো।"

আমি ব'ল্লাম, "তা হ'লে রাজাবাহাদুর বোধ হয় একটু ভীতু প্রকৃতির লোক।"

নিধু চটে গিয়ে ব'ল, "কেতাববাবু আপনি নেকাপড়া জানা লোক হ'য়েও মনিষ্যিচরিত্তের কিছুই জানেন না। চুল পাকবার বয়সে বিয়ে ক'রলে আপনিও বউএর অমন আঁচলে ধরা হ'তেন! খামখা রাজাবাহাদুরকে দোষ দেবেন না।"

আমি উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

নিধু ফের ব'ল্ল "রাণীমার ঐ আস্কারা পেয়েছে বলেই তো ওর অত—দেমাক। দেকেন না ক্যামন রাজহাঁসের মত ঘাড় উঁচু ক'রে ঘুরে বেড়ায়। রাজাবাহাদুর ওকে দু চক্ষে দেখতে পারেন না—খালি রাণীমার ভয়ে চুপচাপ থাকেন। তাই বলে লোকটা এসেছে আমার কাছে মতানী ক'রতে। আরেকবার আসুক না, সিধে রাজা-

বাহাদুরের কাছে নালিশ ঠুকে দেব। এই নিধিরাম কাউকে খাতির করে না, হ্যাঁ।"

* * *

এই রকমই বিচিত্র জীবন ছিল মযূর পালেসের বৈচিত্র্যে ভরা, কৌতূহলে ভরা জীবন।

ভোরবেলা রাজাবাহাদুরের সাথের বাগান 'খোসবাগে' গেলেই দেখা মেলে রাজাবাহাদুরের। বাগানের এক অংশে নিভৃত ক'রে গড়ে তোলা অতি সুন্দর কুঞ্জবন। দামী দামী সেরা সেরা ফুলের গাছ আর লতা পাতায় ভর্তি। বহু রকমের দুষ্প্রাপ্য ফুলের গাছ জোগাড় ক'রে এনে লাগিয়েছেন রাজাসাহেব। শ্বেত গোলাপ আর রক্ত গোলাপের মিষ্টি গন্ধে সারাক্ষণ মেতে থাকে সমস্ত বাগানটা। রোজ ভোরবেলা নিজের হাতে প্রতিটি ফুলের শুশ্রূষা করেন রাজাবাহাদুর। যেন দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু মিশে আছে ঐ ফুলগুলির ভিতর। একটা ফুল নষ্ট গেলে হাহাকার ক'রে ওঠেন।

বলেন, "খোসবাগকে" আরও চমৎকালো ক'রে গড়ে তুলব কেতাবিবাবু। রাণীজী বড় ফুল ভালবাসেন কিনা!"

এই স্বপ্ন নিয়ে খোসবাগকে সর্বাংগসুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুলছেন রাজাবাহাদুর। মার্বেল পাথরে বাঁধানো বেদীর উপর রাণীমাকে একদিন পাশে নিয়ে চাঁদনীরাতে এসে বসবেন। সামনের ফোয়ারা থেকে জল ঝির্ ঝির্ ক'রে ক'রে পড়বে।

রাজাবাহাদুরকে বহুদিন আগে কথা দিয়েছিলেন রাণীমা। রাজাবাহাদুর জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কবে আসবে?" রাণীমা বলেছিলেন, "যেদিন আমার খুশী।"

সেই খুশীর আশায় পথ চেয়ে বসে আছেন রাজাবাহাদুর। রোজ রোজ নতুন পরিকল্পনায় ভরিয়ে তুলছেন খোসবাগ। কিছুতেই যেন মনের মতন সাজাতে পারছেন না—মনের মত ক'রে মেলে ধরতে পারছেন না রাণীমার জন্য। যদি পছন্দ না হয় রাণীমার—রাজাবাহাদুরের সমস্ত মান, সম্মান ধূলায় লুটে যাবে।

আতরগন্ধী রুমালে মুখ মুছে মালীদের বলেন, এই বাঁ পাশের সারিটা জিনিয়া দিয়ে ঢেকে দে—ডানদিকের সারিতে ডালিয়া। আর ওপাশের সূর্যমুখীর গাছগুলি সব উপড়ে ফেল। সাদার পাশে হলুদে রঙ্ দেখলে রাণীজীর নজরে বেঠিক লাগবে হয়ত। খুব খাপসুরৎ হওয়া চাই!"

পরের দিন আবার জিনিয়ার সারিটাকেই উপড়ে ফেলে দেবার আদেশ দিবেন হয়ত।

বোধ হয় সেদিনটা শনিবার ছিল। ভোরবেলা উঠে চোখে মুখে পথে জল দিয়েছি—বাগানে বেড়াতে যাব। এমন সময় বক্তা সিং এসে সেলাম জানিয়ে বলল, "আইয়ে কেতাবিবাবু। রাজাবাহাদুর ডাকিয়েছেন।"

বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথে নিধুর সংগে দেখা হয়ে গেল। ব'ললাম, "ব্যাপারখানা কি? হঠাৎ সাতসকালে আমার তলব পড়ল যে?"

নিধু মুচ্‌কী হেসে ব'লল "সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ভিতরে গেলেই টেরটি পাবেন। আজকে রাণীমার জন্মদিবস কিনা।"

জয়পুরী পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। অন্তদিনের মত হাতীর দাঁতের কাজকরা জমকালো চেয়ারটায় বসে রূপোবাঁধানো আলবোলায় টান দিচ্ছিলেন রাজাবাহাদুর। আমায় দেখে আনন্দে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। অদ্ভুত উৎফুল্ল দেখাচ্ছে রাজাবাহাদুরের মুখ। কেমন যেন একটা দিগ্বিজয়ী ভাব।

বলেন, "এই যে আপনি এসেছেন। বাঁচালেন আমায়।"

কুশলান্তে বল্লাম, নিধুর কাছে কিছুই জানতে পারি নি। ব্যাপার কি রাজবাহাদুর?

রাজাবাহাদুর সলজ্জ হাসি হেসে বল্লেন, "রাণীজীর আজকে জন্মদিন কিনা—বেওয়াজটা বেশ আচ্ছা হওয়া দরকার কি বলেন?"

আমি ব'ললাম, "নিশ্চয়। নিশ্চয়। রাণীমাকে আজ আপনার মনের সাধ মিটিয়ে উপহার দেবার দিন! আর তা না হলে রাণীমাই বা সন্তুষ্ট হবেন কেন?"

রাজাবাহাদুর উৎফুল্ল হ'য়ে ব'ললেন, "আপনি একটা সাচ্চা কথা বলেছেন। আসুন, তার আগে রাণীজীর নতুন উপহারগুলো আপনাকে দেখাব।"

খুশীতে ফেটে পড়লেন যেন রাজাবাহাদুর। সামনে এগিয়ে এসে খুলে ধরলেন চন্দন কাঠের সুন্দর একটা বাক্স।

রাজবাড়ীর মাস্তাতার আমলের বুড়ো স্যাকরাকে দিয়ে তৈরী করিয়েছেন রাণীকৃত অলংকার।

আমার কিন্তু গহনা শাস্ত্রে অতি সহবিদ্যা থাকা সত্ত্বেও কেমন যেন ভয় করতে লাগল। মনে হ'ল এই বিশমণী ওজনের সেকেলে গহনাগুলো আমাদের একেলে এবং অতি আধুনিকা রাণীমার চোখে কেমন লাগবে কে জানে? রাজাবাহাদুরের এত আগ্রহ—আয়োজন সমস্তই পণ্ডশ্রম হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। বিস্ময়ের মাঝে লক্ষ্য করলাম রাজাবাহাদুরের বিশেষ অনুরোধে হীরের নাকছাবিও তৈরী হয়েছে একটি। কি সর্বনাশ! ত্যানিটি-ব্যাগ-বিলাসিনীর নাকে নাকছাবি! কল্পনা করা যায় কি?

আমার সামনে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছিলেন রাজাবাহাদুর। ব'ল্লেন, "কেমন দেখলেন? রাণীজী খুশী হবেন তো?"

ভাবলাম একবার সত্য কথাটাই খুলে বলি। কিন্তু কেমন যেন মায়া লাগল প্রৌঢ় রাজাকে দেখে। অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস মুখে মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাঝে মাঝে খুশীতে চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠছে।

রাজাবাহাদুর আবার ব'ল্লেন, "এই গহনাগুলো খুব ভালো, তাই না? আমার ঠাকুরমা এই রকম সব গহনা প'রতেন। আহার যাও। আমার কথামত সেই রকম ক'রে বানিয়েছে। আজকালকার যেকী জিনিষ আমার ভালো লাগে না।"

আমি ব'ল্লাম "নিশ্চয়। খুব সুন্দর গহনা।"

রাজাবাহাদুর হাসতে হাসতে ব'ল্লেন—"লোকে মনে করে আমি পড়ালেখা জানি না ব'লে কোন কাজই পারি না। আসলে আমি সব পারি। কি বলেন আপনি?"

পরের দিন বিকেলে বাগানের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাব'ছিলাম অনেকগুলি কথা। ছেঁড়া ছেঁড়া টুক্‌রোর মত মনে এসে প'ড়ছে। তারপর সবগুলি মিলিয়ে জট পাকিয়ে একাকার হ'য়ে যাচ্ছে ক্রমে।

এ বাড়ীতে এতগুলি মাস কাটাবার পর কেমন যেন একাত্ম হ'য়ে গেছি এই প্রাসাদ-বাড়ীটার সংগে। এ বাড়ীর লোকগুলির দুঃখ, কষ্ট, হাসি, কান্না সব কিছুকেই কেমন যেন নিজের ঘরোয়া ব্যাপার বলে মনে হয়। পরের সমস্যাগুলিকে নিজের সমস্যা বলে মনে ক'রে কেমন যেন দুশ্চিন্তা করতে ইচ্ছা হয় অকারণে।

বেচারী রাজাবাহাদুরের অদৃষ্টের কথাই ভাবছিলাম। আমার অনুমিত আশংকা এক চুল মিথ্যে হয় নি সেদিন। শুনেছি রাণীমা নাকি মর্মান্তিক আদেশ দিয়েছেন। গহনাগুলোকে নাকি সব গলিয়ে ভেঙে নতুন করে গড়াবার উদ্দেশ্যে ক'লকাতার হ্যামিল্টন্ বাড়ীতে পাঠানো হবে। একেই বলে কলিকাল!

বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্যই করি নি কখন চাঁদ উঠেছে। আপনা কালো অন্ধকার ভেদ করে ঝিঁঝিঁর সানাই আর জোনাকির মিট মিট আরও তীব্র হ'য়ে উঠল। রাজবাগানের সূর্যমুখীর ঝাড় থেকে টিয়ার ঝাঁক কখন উড়ে চ'লে গেছে—জিনিয়া, পিটুনিয়া আর বোগনভিলিয়ার রঙ আর চেনাই যাচ্ছে না। শুধু রাজবাড়ীর বড় দীঘিটা জ্যোৎস্নার শ্বেত চন্দন মেখে আয়নার মত চক্ চক্ করছে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আস্তে আস্তে এবার প্যালেসের দিকে পা বাড়ালাম।

প্যালেসে পৌঁছে দেখি ঘড়িতে প্রায় সন্ধ্যা সাতটা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় দরওয়ান বলবন্ত সিং এগিয়ে এসে সেলাম জানাল। ব'ল্ল রাজা নাকি আমাকে ডেকেছেন।

কি রকম একটা এলোমেলো মন নিয়ে রাজাবাহাদুরের খাস কামরার সামনে এসে দাঁড়ালাম। পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে সংকোচ হ'চ্ছিল প্রথম প্রথম।

উস্কো খুস্কো চুলে এদিক ওদিক পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন রাজাবাহাদুর। চোখে মুখে একটা বিস্রস্তবিভ্রান্ত দৃষ্টি। ভয়ানক উদ্বিগ্ন মনে হ'ল রাজাবাহাদুরের মুখ দেখে।

আমায় দেখে সংগে সংগে ঘুরে দাঁড়ালেন উনি। যেন সহসা অকূলে কূল দেখতে পেয়েছেন।

রাজাবাহাদুর হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লেন, "এই যে আপনি এসেছেন। রাণীজী আমার দিনরাত কি বিপদে ফেলেন বুঝে উঠতে পারি না কেতাববাবু।"

ওঁকে আশ্বস্ত ক'রে ব'ল্লাম, "বিপদটা কি রাজাবাহাদুর?"

রাজাবাহাদুর ঘাড় নেড়ে ব'ল্লেন, "বিপদ্‌টদ সর্বনাশ। বিলির দারুণ অসুখ করেছে। এখন আমি কি যে করি।"

বিলি হচ্ছে রাণীমার পেয়ারের ল্যাপ্‌ডগ্‌! খবরটা শুনে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হ'লাম। আজ বিকেলে একটু আগেই প্যালেস ছেড়ে বাগানে যাবার ফলে জানতে পারি নি ব্যাপারটা।

বললাম, ও, "বিলির অসুখ।"

রাজাবাহাদুর ব্যস্ত হয়ে ব'লেন, "হাঁা, সাংঘাতিক অসুখ। খানাপিনার নামগন্ধ নেই—খালি চুপচাপ শুয়ে থাকে। কিন্তু ওকে না বাঁচাতে পারলে রাণীজীকে আমি মুখ দেখাব কি ক'রে—আমার ইজ্জত সব বেঠিক হ'য়ে যাবে কেতাববাবু।"

রাজাবাহাদুর ব্যাকুল হ'য়ে তাকালেন আমার মুখের দিকে।

বললাম, "বেশ তো। ভেটিরিনারী ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করালেই তো সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

রাজাবাহাদুর ব'ললেন, "তার কি কোন বাধ রেখেছি। এই মাত্র ক ঘণ্টায় কয়েকজন ডাক্তার আসা যাওয়া ক'রছে। কিন্তু ওরা বিলিকে আরাম ক'রতে পারবে না—ক'লকাতার ডাক্তার চাই।"

আমি নির্বাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম। রাজাবাহাদুর আমার হাতে কড়কড়ে এক তাড়া নোট গুঁজে দিয়ে ব'লেন, "একটু জল্‌দি ক'রে কেতাববাবু। হীরালালের মোটরে এক্ষুণি ক'লকাতা রওনা হ'য়ে যান। যত টাকা লাগে লাগুক—সব চেয়ে ভালো ডাক্তার নিয়ে আসা চাই।"

আমি দরজার দিকে পা বাড়াতে যেতেই রাজাবাহাদুর ফের ডাক দিলেন, "আর শুনুন কেতাববাবু। ক'লকাতা থেকে বাচ্চাকাচ্চাদের যে ঠেলাগাড়ী পাওয়া যায় তাও একটা আনবেন। নইলে বিলি আরাম হ'লে গায়ে জোর পাবে কি ক'রে।"

বুঝলাম রাজাবাহাদুর প্যারাম্বুলেটারের কথা ব'লছেন। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মনে আছে নগদ দু হাজার টাকা খরচ ক'রেও বিলিকে বাঁচানো যায় নি সেবার। সাতদিন ঘুমুতে পারলেন না রাজাবাহাদুর—খাবার টেবিলে রাণীমার সামনে মুখ তুলতে পারলেন না কয়েকদিন। নিধু আমায় চুপি চুপি এসে ব'লে গিয়েছিল ব্যাপারটা।

বল, "এমন কঠিন মেয়েছেলে জন্মে দেখিনিকো কেতাববাবু। কুকুর ম'রে গেচে তাই ব'লে ঘরের মুখ দেকা বন্ধ ক'রে দিতে হয়।"

জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম, "তার মানে?"

নিধু ব'ল "মানে আবার কি। রাজারাণীর দেকাশোনা এ্যাদ্দিন যাও চ'লছিল এখন একেবারে বন্ধ। খাবার টেবুলে পর্য্যন্ত উনি দেকা করেন না।"

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'ল, "সত্যি কি পোড়া কপাল নিয়েই জন্মেছিলেন রাজাবাহাদুর। নইলে ব্যাঙের নাথি সইতে হয়! কার সংগে কার তুলনা।"

এতদিন নিরুপদ্রবে রাজবাড়ীতে আরামে দিন কাটাচ্ছিলাম। এবার বাড়ী থেকে চিঠি পেলাম একটা। পৈতৃক জমি নিয়ে কি একটা গণ্ডগোল বেধেছে। তার তদারকীর কাজে আমার আসাটা একান্ত প্রয়োজনীয়।

রাজাবাহাদুরের কাছে আমি পেশ ক'রে ছুটি নিয়ে চ'লে গিয়েছিলাম আনন্দপুরে। কিরতে লাগ'ল পাকা দু মাস। এরই মধ্যে অবাক হ'য়ে দেখলাম রাজবাড়ীর সব কিছুই যেন নতুন নতুন। সেই মার্বেল পাথরে গড়া পরীর মূর্ত্তি—টবে ঝোলান সবুজ অর্কিড্‌—প্যালেসের সুদৃশ্য গম্বুজ—সব কিছুই যেন অচেনা। তেতালায় পাখীদের ঘরে ঘাঁড়ের উপর পোষা হীরেমন আর কাকাতুয়াগুলোকে দেখে মনে হ'ল সেগুলিকে নতুন করে আমদানী করা হয়েছে।

প্যালেসের ভিতরের খোঁজ নিয়ে শুনলাম খবর খুব খারাপ। আমি চ'লে যাবার অল্প কদিন পর থেকেই নাকি রাজাসাহাই-এর স্বাস্থ্যের দারুণ অবনতি ঘটেছে। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একদিন নাকি ব্লাড্‌প্রেসারের স্ট্রোক্ হয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন। তারপর থেকেই এই বিপত্তি। মাস খানেক ধ'রে অবশ্য অবস্থার অনেকটা উন্নতি হ'য়েছে—কিন্তু হলে কি হবে রাজাসাহাইএর স্বাস্থ্য নাকি ভেঙে পড়ছে দিনকে দিন অথচ এই—স্বাস্থ্য নিয়েও 'খোসবাগকে' ছাড়তে পারেন নি রাজা। রোজ সকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য খোসবাগের ঠিক তদারক করা চাই ওঁর।

মালীদের বলেন: "রক্তগোলাপের চারা দিয়ে খোসবাগের পশ্চিম দিকটা ঘিরে দে। আর পাতাবাহারের

পাশ দিয়ে চলে গোলাপের সারি। রাণীরা খুব ফুল ভালবাসেন কিনা।"

নিধুকে এই প্রথম ক্রন্দনোন্মুখ দেখলাম। ছল্ ছল্ চোখে ব'লল "দেখে আসুন কেতাববাবু। রাজাবাহাদুরের কি হাল হ'য়েছে। কোন খাবারে রুচি নেই। আমি ভালো ভালো খাবার তৈরী ক'রে আনি আর উনি কাটি দিয়েও সে খাবার ছোঁন না!"

সত্যি কি চেহারা হয়েছে রাজাবাহাদুরের! কংকাল-সার রুগ্ণমূর্তি—বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে রয়েছেন। মাত্র এই কদিনেই যেন বড্ড বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন রাজাবাহাদুর। গায়ের উপর একটা দামী কাশ্মীরি শাল। মুখের দিকে তাকালে সত্যিই মায়া হয়।

রাজাবাহাদুর উঠে ব'সতে যাচ্ছিলেন। আমি বাধা দিয়ে ব'ললাম, "উঠবেন না থাক্। আপনি কেমন আছেন আজকে?"

উত্তরে একটু ম্লান হেসে খোলা জানলা দিয়ে বাইরে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রাজাবাহাদুর। বললেন, "আমার আর থাকা না থাকা কি কেতাববাবু! রামজী যতদিন রাখেন ততদিন আছি।"

কথাবার্তাটা সেদিন অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও একেবারেই জম'ল না।

বেশ কয়েকটা দিন কাটল। দৈনন্দিন অভ্যাসের মত সেদিন গিয়েছি বিকেলে বাগানের মধ্যে বেড়াতে, লাললাল ক্যানা ফুলে আলো হ'য়ে রয়েছে যেন সারা পথটা, বাঁ দিকের শাখা পথটা দিয়ে ক্রমশঃ দীঘির দিকটায় এগিয়ে চ'লাম।

এদিক ওদিক তাকিয়ে খোঁজ করতে লাগলাম চার-দিক। বাগানের এদিকটায় নাকি রাজাবাহাদুর রোজই আসেন! কিন্তু এত বড় একটা বাগানে খুঁজে বের করা সহজসাধ্য নয়।

একটু অন্যমনস্ক ভাবেই হাঁটছিলাম। ঝাউগাছের শির্ শির্ আওয়াজ বেশ লাগছিল শুনতে। লক্ষ্যই করিনি কখন রাজাবাহাদুরের সখের বাগান 'খোসবাগের' সামনে এসে প'ড়েছি। রেলিং দিয়ে ঘেরা সুন্দর নিরালা জায়গা। কিন্তু খোসবাগের ভিতরে ঢুকবার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না সেদিন—বলা বাহুল্য যদি না সেই মুহূর্তে সেই আশ্চর্য ব্যাপারটা ঘট'ত।

যা দেখলাম তা আমার একেবারেই কল্পনাতীত ছিল। সামনের সাদা-ছাল অর্জুন গাছটার আড়াল থেকে কে যেন তীব্রস্বরে দু দুটো শিস্ দিয়ে উঠ'ল। আর তারপরেই তান পাশ থেকে নারীকণ্ঠে ভেসে এল খিল্ খিল্ অট্টহাসি। শুনলে চম্‌কে উঠ'ত যে কোন লোক।

ব্যাপারটা তখনও ভালো ক'রে বুঝতে পারি নি। শুধু তীব্রবেগে পাশের একটা বড় গাছের আড়ালে স'রে গিয়েছিলাম এইমাত্র। এখন দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম সব কিছু। একটা দেবদারু গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হেসে কুটি কুটি হ'য়ে যাচ্ছেন আমাদের রাণীমা। দামী সিল্কের শাড়ীর আঁচল খ'সে গিয়ে মাটির উপর লুটিয়ে প'ড়েছে সেদিকে খেয়াল নেই।

ও পাশের ঘন গাছ পালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল প্রাইভেট সেক্রেটারী তপন সেন। পরণে চকোলেট রঙের নিখুঁত নিভাঁজ ট্রাউজার্! ফর্সা সাদা শার্টটা ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠছে বিকেলের আলোয়।

ততক্ষণে অতিকষ্টে হাসি থামিয়েছেন রাণীমা। তপন সেন অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'রল, "ব্যাপার কি মিলি? এত হাসি কিসের?"

বাঁ হাতটা কোমরে—ডান হাতের তর্জনীটা চিবুকে—অপরূপ ভংগিমায় দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের রাণীমা। দুই কানে দুলের কুঁড়ির মত দুলছে দুটো মুক্তোর দুল।

বল্লেন, "হেভেন্‌স্। কি ফ্রাইটফুলি বিশ্রি শিস্ দিতে পার তুমি। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল আমার।"

তপন সেন অপ্রতিভ হ'য়ে বল্ল, "বড্ড বেশী জোর হয়ে গিয়েছিল বুঝি? যাক্ গে, তোমার পতিদেবতাকে আজকেও ফাঁকি দিতে পেরেছ বলে ধন্যবাদ।"

রাণীমা ভ্রু কুঁচ্‌কে ব'ল্লেন, "পতিদেবতাটা কে? ওঃ, তুমি ঐ বুড়োটার কথা ব'লছ! হুঃ! ওর জন্য আবার ভাবনা! ওটা আবার একটা মানুষ নাকি! দিনরাত এমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে যেন আমি একটা গ্রাম্ কেক্ কিম্বা প্যাটি।"

তপন সেন চিন্তিত মুখে ব'ল্ল, "আহা সেই জন্যই তো এত দুর্ভাবনা। তোমাকে গ্রামকেক্ না ভেবে ক'রে মুড়ি মুড়কি ভেবে ফেললে এই অসহ্য হাংলামীর হাত থেকে অন্তত রেহাই পাওয়া যেত।"

রাণীমা অপ্রসন্ন মুখে ব'ল্লেন, "কি ব'লতে চাও স্পষ্ট ক'রে বল। হেঁয়ালী আমার ভালো লাগে না।"

তপন বল্ল, "খোলাখুলি তো অনেক দিন ধ'রেই ব'লছি। আমার ত জায়গাটা মোটেই নিরাপদ মনে হয় না। মালীগুলোকে আরও কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দান ক'রে হাতে রাখা দরকার।"

রাণীমা বল্লেন, "আচ্ছা ভেবে দেখব। আপাততঃ খোসবাগের ভিতরে ঘোরাফেরার কাজটার চল তো। পরের কথা পরে হবে। বুড়ো আর যাই করুক—আমার কথামত বাগানখানা তৈরী করেছে বেশ। মালীগিরিতে সার্টিফিকেট্ দিতে রাজী আছি।"

তপন ফের চাপা গলায় ব'ল্ল, "কালকে কয়েকটা লোককে এখান দিয়ে ঘোরাফেরা ক'রতে দেখেছিলাম। যদি কেউ এসে পড়ে।"

রাণীমা বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বল্লেন, "যদির কথা পরে হবে। যা ক'রতে ব'লছি তাই কর।"

বলব কি। দেখতে দেখতে উত্তেজনায় আমার মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হ'য়ে উঠেছিল। সর্বাংগ রাগে রি-রি ক'রে জ্বলে উঠছিল আমার। নিস্ পিস্ ক'রে উঠছিল হাতটা।

সেদিন—জীবনে যা করিনি সেই একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেল্লাম। পাড়াগাঁয়ের ছেলে—দৌড় ঝাঁপকে কোনদিন ভয় করিনি। নিজেকে একটু সাবধান করে নিয়ে সন্তর্পণে হাজির হলাম রেলিংএর ওপারে। সামনে বড় বড় ঝাউগাছ, পাম গাছ সার বেঁধে সুন্দর ক'রে সাজানো। ভিতরে শ্বেত পাথরের তৈরী একটা বেদীতে ব'সে গল্পে নিমগ্ন হ'য়ে উঠেছেন রাণীমা। পাশে তপনের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে একটার পর একটা রিং উঠে আবছা করে তুলছে তার সাদা মুখটাকে।

ওদের পিছনে হাসুহানার যে ঝোপটা ছোট জংগল সৃষ্টি ক'রেছিল সেখানে নিজেই আত্মগোপন করলাম। ধরা পড়ার ভয় যে একেবারেই ছিল না তা নয়। তবে পালাবারও প্রচুর সুযোগ ছিল।

দেখছিলাম কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। রাণীমা একটা চন্দ্রমল্লিকা ফুল কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে তপনের আনত মুখে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর খিল্‌খিল্ হাসি। হাসি আর থামতেই চায় না। হাসুহানার সেই মিষ্টি গন্ধের ভিতরে একরাশ রোমান্টিক কথাও ভেসে আসতে লাগল।

শুনলাম রাণীমা আস্তে আস্তে বলছেন, "কি ইন্‌টলারেবল্ সাইলেন্স্। পারাক্ষণ এ রকম চুপটি ক'রে কাটিয়ে দেবে নাকি?"

তপন বল্ল, "মন্দ কি!"

রাণীমা গ্রীবাভংগী ক'রে বল্লেন, "রটন্। কি রকম যেন ভাল্ হ'য়ে যাচ্ছ আজকাল। ডেঞ্জ্ আরও ভাল ক'রে তোমায় পাঠিয়ে দেব কিনা ভাবছি।"

তপন গম্ভীর হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বল্ল, "ব্যাপার কি মিলি? আজ দেখছি একেবারে পাল্টুয়াল্। তোমার ঘড়ি আজ থেকে ঠিকমত চলতে সুরু ক'রেছে বুঝি আবার?"

রাণীমা বল্লেন, "আহা রে! তোমার নিজেরই বা কি পাল্টুয়ালিটি? পরশুদিন লেট্ ক'রেছিল কে?"

ব্যস্। কিছুক্ষণ খুন্‌সুড়ি সুরু হ'ল দুজনের। কিন্তু তার পরেই আবার সব মিটমাট হ'য়ে গেল। ফিরে এল ঠাণ্ডা আবহাওয়া।

শুনলাম রাণীমা বলছেন, "অমন ক'রে কি ভাবছ বল দেখি? ঐ শ্বেত গোলাপগুলোর সামনে ব'সে তুমিও কবি হ'য়ে উঠলে দেখছি।"

তপন ব'ল্ল, "ওসব কবিত্ব-টবিত্ব তোমারই পোষায়। আমি রীতিমত প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ম্যান্। আমাদের যাতায়াতের নতুন একটা পথ এরই মধ্যে আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি।"

লিপ্‌স্টিক্ মাখা অধরে হাত বুলিয়ে রাণীমা ব'ল্লেন, "কোথায়?"

তপন ব'ল্ল, "দীঘির পশ্চিম কোণে সরু একটা পায়ে-চলা পথ আছে দেখেছ—যেখানে একটা মান্ধাতার আমলের লোহার কামান পাতা আছে।"

রাণীমা উল্লাসে লাফিয়ে উঠে ব'ল্লেন, "আর ব'লতে হবে না। বুঝে নিয়েছি। উঃ, কি ফার্স্ট ক্লাস ব্রেন্ তোমার ডার্লিং!"

তপন ব'ল্ল, "একেবারে নিরিবিলি রাস্তা। কোথাও কিচ্ছুটি নেই। কারুর সাধ্য নেই চোখে পড়ে।"

রাণীমা ব'ল্লেন, "ঠিক বলেছ। চল এখনি ওঠা যাক। তুমি ডান দিকের রাস্তা ধরবে—আর আমি পিছন দিক দিয়ে ঘুরে যাব। দুটো রাস্তার মোড়ে আমার জন্য ওয়েট ক'রবে কিন্তু।"

তপন ব'ল্ল, "চট্‌পট্। দেখো তোমার পতিদেবতার সাঙ্গ পাঙ্গরা যেন টের না পায়।"

হাসিতে মুক্তো ছিটিয়ে রাণীমা ব'ল্লেন, "পতিদেবতা! হরিবল্! দেখলে মনে হয় যেন একটা নাইট্‌মেয়ার্ পার্সোনিফায়েড্।"

তপন হাসতে হাসতে ব'ল্ল "এক্সেল্ড নিওনা। ওকে দেখলে আমারও ঠিক ভারত সার্কাসের ক্লাউনের কথা মনে প'ড়ে যায়।"

চারপাশে অসংখ্য ফুল ছিটিয়ে ছড়িয়ে একাকার ক'রছিল ওরা দুজনে। এবারে চট্‌পট্ উঠে প'ড়ল ওরা। কিন্তু আমি ওদের অনেক আগেই স'রে এসেছি। নিঃশব্দে রেলিং টপ্‌কাতে টপ্‌কাতে লক্ষ্য ক'রলাম চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে গেটের দরজা খুলছে তপন। রাণীমা শাড়ীর আঁচল পাকাতে পাকাতে পিছনে এসে দাঁড়ালেন।

খোসবাগের সীমানার বাইরে এসে সোজা উল্টো পথ ধ'রলাম। দীঘির পাড় ধ'রে ক্রমশঃ এই রাস্তা চ'লে গেছে। এদিক দিয়ে ওরা আসবে না কিছুতেই। অতিকষ্টে ওদের অনুসরণ করার উদগ্র ইচ্ছাটা দমন ক'রেছি। কারণ সন্ধ্যার আগেই প্যালেসে ফিরতে হবে—বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

অভিভূতের মত ঝরা পাতাগুলোর উপরে একটা ক'রে পা ফেলছি। খস্ খস্ শব্দ হ'চ্ছে—আর টুক্‌রো টুক্‌রো চিন্তা মনে আসছে। ভাবছি রাণীমা আর প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর কথা। ভাবছি 'খোসবাগের' কথা। রাজাবাহাদুরের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হ'য়েছে বোধ হয়—রাণীমার পছন্দ হয়েছে খোসবাগ। তাই নিভৃত কুঞ্জ হিসাবে নিজের মনের মত ভাবগা বেছে নিয়েছেন খোসবাগকে। কিন্তু সেই সাথে চোখের সামনে ভেসে উঠছে আর একটি বেদনাক্লিষ্ট অসহায় মুখ—যে মুখ নিজের সর্বনাশের কথা জানেনা। যে মুখ বঞ্চনার বেদনা ভুলে থাকতে চায় মিথ্যা সান্ত্বনার প্রলেপে।

হাওয়ায় ঝির্ ঝির্ শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম বিকেল আবছায়া হ'য়ে আসছে। ওপাশের দেবদারু গাছগুলির ফাঁক দিয়ে আধ-ডুবন্ত সূর্যের রাঙা মুখ উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু আমিও তো অনেক দূর চ'লে এসেছি। হঠাৎ চমকে উঠেই সামনে নজর প'ড়ল কতকগুলি বাবার গাছের দিকে। বুকের ভিতর কেমন একটা হিমশীতল উত্তেজনা খেলে গেল আমার।

এক পা দু পা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম অনুমানে ভুল হয়নি। এক তিল ভুল হয় নি আমার। একটা গাছের নীচে সবুজ রঙের বেঞ্চিতে চুপচাপ ব'সে আছেন আমাদের রাজাবাহাদুর। ঘোলাটে দৃষ্টিতে একভাবে তাকিয়ে আছেন কেন অমনি ক'রে? দেখলে মনে হবে কয়েক শতাব্দী ধ'রে বোধ হয় এ মানুষটার চোখের পলক পড়ে নি।

অমানুষিকভাবে রাজাবাহাদুর চমকে উঠলেন আমাকে দেখে। আতংকগ্রস্ত মুখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে ব'ল্লেন, "ওঃ, আপনি এসে প'ড়েছেন। আমি মনে ক'রেছিলাম বুঝি আর কেউ।"

তারপরেই কোন কথা না ব'লে চুপচাপ লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন উনি। ভাঙা ভাঙা গলায় ব'ল্লেন, "কি রকম গরম প'ড়েছে দেখেছেন কেতাববাবু। শীত ফুরাতে না ফুরাতে এই হাল। আর কিছুদিন বাদে রোদের তেজ যখন বাড়বে তখন আমার খোসবাগের গাছগুলো বেঁচে থাকবে কিনা ভগবান জানেন।"

তারপর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত গলায় ফের ফিরে তাকালেন আমার দিকে। ব'ল্লেন, "মালীদের একটা কথা ব'লে দেবেন কেতাববাবু। ওরা যেন বেলফুলের নতুন চারা লাগায় খোসবাগে। আর কিছু যুঁই ফুলের চারা। খোস্‌বুতে মাতিয়ে রাখবে জায়গাটা। রাণীজী বড় ফুল ভালবাসেন কিনা।"

এতদিনকার উজ্জ্বল দিবালোকে যা লক্ষ্য করিনি আজকের আবছায়ায় তাই লক্ষ্য ক'রলাম। আমাদের মত খাড়া হয়ে নয়, লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে হেঁটে চ'লেছেন রাজাবাহাদুর।"

হঠাৎ ষ্টেশন্ কোলাহলমুখরিত হয়ে উঠল—ট্রেন্ এসে গেছে।

ব্রজবাবুলববাবুও তাঁর গল্প বলা শেষ ক'রলেন। যোগলসরাই ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বিহ্বল হ'য়ে ব'সে রইলাম কিছুক্ষণ। মুখে কোন ভাষা আসে নি।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা

শ্রীজয়দেব রায়

রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎস ধারার সন্ধান ক'রতে হলে আমাদের বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারায় অনুধাবন করতে হবে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কথার কোন বিশেষ স্থান ছিল না, রবীন্দ্রনাথ গানের বাণীকে মহীয়সী রাণীর আসনে বসিয়েছেন বাংলাগানে। কবি রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর কাব্যকলারই পরিচয় সাড়ম্বরে ঘোষণা করছে। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—

"সঙ্গীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে, সেখানে তার নিয়ম-সংযমের যে শুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গানরূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সঙ্গীত রীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের বাতায় সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে।"

তাঁর গানের দ্বিতীয় ব্যতিক্রম তান প্রয়োগে। হিন্দুস্থানী রীতির গানে তানের যথেচ্ছ ব্যবহার করেন গায়করা। বস্তুতঃ তানের সাহায্যেই গানগুলি ছন্দিত তালে নেচে নেচে চলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে তান প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে—"গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে, তেমনই তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তুতঃ, এই তানগুলি বাহিরে ছোটে, কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। কিন্তু যদি এ আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে উল্টাই হয়। তাহা হইলে তানের দ্বারা গান কেবল দুর্বল হইতেই থাকে। সে তানে নিয়ম যতই জটিল ও বিশুদ্ধ থাক না কেন, গানকে সে কিছুতেই রস দেয় না, তাহা হইতে সে কেবল হরণ করিয়াই চলে।"

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তার গীতিরীতিতে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গীতিরীতি স্বতন্ত্র একটি বিশিষ্ট রীতি। তাঁর আড়াই হাজার গানে প্রায় সবই একটি বিশেষ ভঙ্গীতে একটি লীলায়িত ঢঙে গাওয়া হয়। ব্রহ্মসঙ্গীতই হোক্, মায়ার খেলার গানই হোক আর চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের গানই হোক—সমস্ত গানেরই একটি নিজস্ব শ্রী ও বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর গানের 'আন' বা সুরবলটিকে চিনতে ভুল হয় না। এই গায়কী সম্পর্কে শ্রীঅমিয়নাথ সান্যালের মন্তব্যটি এখানে তুলে দেওয়া গেল—

"রবীন্দ্রগীতির গীতিরূপগুলি যে অত্যন্ত সুকুমার, তাদের শ্রী ও সুষমা কোনোরকম বিজাতীয় গায়কীর স্পর্শমাত্র সহ্য করতে পারে না—এ কথা শুধু সত্য নয়, যে সকল আধুনিক উন্মার্গগামী শিল্পী রবীন্দ্রগীতি নিয়ে খেলা করবার চেষ্টা করেন, অর্থাৎ তাঁদের স্বকপোলকল্পিত গায়কী দিয়ে রবীন্দ্রগীতির উদ্ভট রূপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন, সেই সকল Free Lance-দের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার মতো অপ্রিয় কাজ আর কিছু নেই। প্রশ্ন হতে পারে, রবীন্দ্রগীতি এত স্পর্শাসহিষ্ণু কেন? প্রশ্নের উত্তর যদি নাও পাওয়া যায় তা হলেও ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না।"

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎসধারার সন্ধান করতে হলে আমাদের বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-ধারার ইতিহাস অনুধাবন করতে হবে।

নিধুবাবু পশ্চিমাঞ্চল থেকে শোরীমিঞার টপ্পাভঙ্গী কণ্ঠে নিয়ে এলেন, বাংলার টপ্পাগান তথা উচ্চাঙ্গের গানের চলন হ'ল। তার আগে কীর্তন ও পল্লীসঙ্গীত ছাড়া বাংলার অন্য গান ছিল না।

শোরীর টপ্পার হুবহু অনুকরণেও রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছিলেন। সিন্ধু, মধ্যমানে রচিত শোরীর টপ্পা ছিল—

যে পরি গাঁ তাঁতে তাঁতে পর
বন বাঁধিয়া বেহে মিলা ঘুম লুঁয়া
রলদকরে পরিয়াঁ না বে সাবক বরু ঃ
পরিয়াঁ বে পরি বন বহিয়া অওরণ

শকদে শোরী যে দি টপে দিয়া বক্ত ॥

রবীন্দ্রনাথ অনুকরণ করলেন—

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে, ভুবনেশ্বর প্রভু,
জাগাইলে অনুপম সুন্দররশোভা, হে হৃদয়েশ।
সহসা ফুটিল কুসুমকলী শুকানো তরুতে,
পাষাণে বহে সুধাধারা ॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুকৃত টপ্পা গানে শোরীর 'জমজমা' অলঙ্করণের বাহুল্য বর্জন করেছেন, সে সঙ্গে বোলতান যান্ত্রিক অলঙ্করণের সাহায্যে একই কথার অংশকে হেরফের করার প্রচেষ্টাও নেই।

নিধুবাবু বাংলাভাষায় উচ্চাঙ্গের গানের চলন করলেন, কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দীভাষায় রচিত উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের চর্চা তার বহু আগে থেকেই চলে আসছিল।

সঙ্গীতের জগতে 'ঘরোয়ানা' বলে একটি কথা আছে, গুরুর কাছ থেকে ঘরোয়ানার অধিকার পায় শিষ্যেরা।

মোগল বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় একদিন দরবারী সঙ্গীতের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল, মিঞা তানসেনের ঘরোয়ানা ছিল সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর এই 'সেনীঘরোয়ানা'র বাহাদুর সেন নামে একজন সঙ্গীতবিদ্‌কে নিয়ে আসেন বাংলাদেশে বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ। বাহাদুর সেনের সঙ্গে এসেছিলেন পীরবক্স নামে একজন পাখোয়াজ সঙ্গতকারী।

বাহাদুর সেনের বাঙালী শিষ্য তৈরি হল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, নাজির ভ্রাতৃদ্বয়। গদাধরের ঘরোয়ানা তৈরী হল শ্যামচাঁদ গোস্বামী, অনন্তলাল চক্রবর্তী, নীলমাধব চক্রবর্তী প্রভৃতি ধ্রুপদীদের প্রচারে। রামশঙ্করের ঘরোয়ানার ধারা চলে এল ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুনাথ ভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই যদুভট্টেরই শিষ্য।

কলকাতায় রাজা-মহারাজাদের বৈঠকে গুণী সঙ্গীতবিদ্‌রা তখন সসম্মানে আশ্রয় পেতেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হলেন, যদুভট্ট প্রতিষ্ঠিত হলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে। যদুভট্টের সুর রচনার নাম ছিল 'রঙ্গনাথ'—তাঁর নিজেরও গান রচনার প্রতিভা ছিল আর ছিল তাঁর কণ্ঠে বিষ্ণুপুরী ঘরোয়ানার অজস্র হিন্দি উচ্চাঙ্গের গান।

সঙ্গীতের ঔপপত্তিকদিকের আরও একজন সার্থক নিয়ামক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ঠাকুরবাড়ীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

ব্রাহ্মসমাজ তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাজা রামমোহন রায়ের ডান হাত তখন প্রিন্স দ্বারকানাথ। ব্রাহ্মসমাজে খৃষ্টীয় যাজনসঙ্গীতের অনুকরণে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' নামে এক শ্রেণীর ভাগবতী গীতি গাওয়া হত। এই ভাগবতী গীতি-রচনার সূত্রপাত করেন স্বয়ং রাজা রামমোহন রায়। এগুলিতে সুর দিয়ে গাইতেন ব্রাহ্মসমাজের পেশাদার গায়কেরা। এই সব গায়কদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী ও কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্তী।

বিষ্ণুচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সময় থেকে সুদীর্ঘকাল ধরে আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়কের কাজ করেছিলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীতের ষষ্ঠ-ভাগ পর্যন্ত প্রায় সকল গানের সুর তিনিই দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যবয়সে তাঁর কাছে গান শিখেছিলেন। বিষ্ণুচন্দ্রের নিজের রচিত গান বিশেষ পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রায় সব গানই কৃতবিদ্য সুরকারদের সুর সংযোজনে ও কৌশলী গায়কদের কণ্ঠে ধ্রুপদ ও ধামার রীতিতেই গাওয়া হ'ত। এর ফলে গানগুলি এক শ্রেণীর পবিত্রতার গাম্ভীর্য অর্জন করেছিল; অনভিজ্ঞ অনভ্যস্ত গায়কেরা এগুলির অনুকরণ করতে পেত না। গানগুলি গাওয়া হ'লে একটা স্বতন্ত্র পরিবেশ গড়ে উঠত।

বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর পর ব্রাহ্মসমাজের গায়ক নিযুক্ত হ'ন যদুনাথ ভট্ট। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় এবার একটা নতুন চঙ এসে পড়ল। যদুভট্ট জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতেই থাকতেন, তাঁর কাছ থেকে হিন্দী গান শুনে শুনে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দ্বারা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করতেন তবহু সেই সব সুরে। যদুভট্টের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোন হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না।"

দেবেন্দ্রনাথও ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর নিজের সঙ্গীতসম্পর্কে বিশেষ অনুরাগও ছিল। দেবেন্দ্রনাথের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে একটির উল্লেখ করা হ'ল—

কেন ভোল, ভোল চির সুহৃদে ? ভুলনা চির সুহৃদে।
ধন প্রাণ মান সকলি যা হতে, এমন সুহৃদে
কেন ভোল ?
দেখনা, দেখনা, তাঁ হতে অন্তর ;
তাঁরে ছেড়ে তাপ কোথায়, কোথা শান্তি বল ?
চির জীবন-সখা চির-সহায়ে, করুণা-নিলয়ে
কেন ভোল ?

উপরের গানটির সুরও ছিল খুব উচ্চাঙ্গের, করুণ রাগিণীতে আড়াঠেকা তালে গাওয়া হ'ত।

তাঁকে ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়ত—"যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

'তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে
কে সহায় ভব অন্ধকারে'—

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া মাদুরের কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।"

রবীন্দ্রনাথের গাওয়া উপরে উল্লিখিত গানটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। বেহাগে রচিত উক্ত গানটি হচ্ছে—

তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে, কে সহায়
ভব-অন্ধকারে !
রয়েছি বন্দীসম মোহের আগারে,
কলুষিত পাপ-বিকারে।
বিষয়-রসে মত্ত, তব প্রেমামৃত ছাড়ি মনোদুঃখ
বিহারে ! (কাওয়ালী)

দ্বিজেন্দ্রনাথ একজন বড় বিশেষজ্ঞ ওস্তাদ ছিলেন, ক্লারিওনেট বাঁশিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নতুন একটা স্বরলিপি পদ্ধতিরই তিনি প্রচলন করেন। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত—

সকল মঙ্গল নিদান, ভবমোচন, অরূপ, চেতনরূপে
বিরাজো।
তুমি অকূল, অমৃত পুরুষ, বিশ্বভুবনপতি,
সুন্দর অতি অপূর্ব।
জীব-জীবন, দীনশরণ, দুখ-সিন্ধু তারণ হে।
কৃপা বিতর কৃপাসাগর, তার তব অন্ধকারে।
পরমব্রহ্ম, পরমধাম, পরমেশ্বর, সত্যকাম,
পরমশরণ, চরম শান্তি তুমি সার।

উপরের গানটি ইমনকল্যাণ,চৌতালে রচিত একটি উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, বহুভটের সুর অবলম্বনে বাংলা কথা বসিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার ধারার সূত্রপাতও করেন তিনি। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত—

হয়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমার,
তৃষিত চাতক-সমান।
করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ আমার।
অভয়-মূরতি দেখা দিয়ে কর হে অভয়দান ;
তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার ?

উপরের গানটি বহুভটের গাওয়া হিন্দী গান অবলম্বনে সিন্ধুড়া-ধামারে রচিত।

বহুভটের রচিত বাংলা ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীতও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ছায়ানট ঝাঁপতালে রচিত তাঁর একটি ব্রহ্মসঙ্গীত—

বিপদ-ভয়-বারণ যে করে তারে মন তাঁরে কেন ডাক না !
মিছা ভ্রমে ভুলে সদা রয়েছে ভবঘোরে মজি,
এ কি বিড়ম্বনা।
এ ধন জন না রবে হেন, তাঁরে যেন ভুল না,
ছাড়ি অসার ভজহ সার, যাবে ভব যাতনা।

হেমেন্দ্রনাথও ছিলেন সুগায়ক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজের কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"দেজদাদা শিখতেন বটে তিনি সুর ভাঁজছেন তো ভাঁজছেনই, গলা সাধছেন তো সাধছেনই, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।"

এছাড়া ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনিই রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই অজস্রমুখী সঙ্গীতস্রোতের কর্ণধারের কাজ করেছেন বহুদিন ধরে।

তক্ষশিলা

অধ্যাপক অতুলানন্দ সেন

তক্ষশিলা পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত রাওয়ালপিণ্ডি নগরীর প্রায় ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা প্রাচীনতম প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল। ইহা গান্ধার প্রদেশের রাজধানী ছিল। কথিত আছে যে রামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরত ইহার স্থাপন করেন এবং ভরত-পুত্র তক্ষ এই স্থানের অধিপতি হন। তক্ষের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম তক্ষশিলা হইয়াছে। তক্ষশিলায় মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

রাওয়ালপিণ্ডি তহশীলের অধীনে ঢেরি সাহান বা সাঢেরি নামক একটি গ্রাম আছে। জেনেরাল কানিংহামের মতে এই গ্রামই প্রাচীন তক্ষশিলা। গ্রামে যে সকল ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় তাহার বিস্তৃতি ছয় মাইল। এই স্থানে বহু বিশাল স্তূপ ও মঠ ভগ্ন অবস্থায় আছে। কাহারও মতে তক্ষ বা তক্ষক নামক তুরাণী জাতি এই প্রদেশে পূর্বকালে বাস করিত। কেহ কেহ বলেন শালিবাহন রাজা এই তক্ষজাতি-সম্ভূত। কথা-সরিৎ-সাগরের ও তাহার আদর্শ বৃহৎকথার জনশ্রুতি অনুসারে জানিতে পারা যায় যে দক্ষিণাপথের তক্ষকচ্ছ নামক স্থানে শালি-বাহন রাজার রাজধানী ছিল। এই জাতি একসময়ে সিন্ধুসাগর দোয়াবের অধিকারী ছিল। এই জাতির নাম হইতে তক্ষশিলার নাম উৎপন্ন। গ্রীক্ ঐতিহাসিক আরিয়ান (arian) তক্ষশিলাকে সমৃদ্ধিশালী ও বহুজনপূর্ণ নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নগরটি মারগলা (margale) নামক গিরিসংকটের কয়েক মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। এখনও সেই স্থানে বিশাল অট্টালিকা-সমূহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

৩২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে মাসিডন নরপতি আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে বিজয়ের জন্য প্রবেশ করেন। হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া তিনি প্রথমে কাবুল উপত্যকার কয়েকটি দুর্দ্ধর্ষ পার্বত্যজাতিকে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত করেন। ইহার পর ৩২৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তক্ষশিলায় উপস্থিত হইবামাত্র সেইস্থানের রাজা অম্ভি বিনাযুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং আলেকজাণ্ডার অম্ভি কর্তৃক সমারোহের সহিত সমাদৃত হন। আলেক-জাণ্ডার ইহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা অম্ভিকে তাঁহার তক্ষশিলা রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আরও কয়েকটি স্থান প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত এক সন্ধি করেন। আলেকজাণ্ডার রাজা অম্ভিকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করেন। কথিত আছে যে সেসময়ে তক্ষশিলায় কতিপয় তপস্যারত জ্ঞানী সন্ন্যাসী ছিলেন। আলেকজাণ্ডার ইহাদিগের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করার জন্য তাঁহা-দিগকে তাঁহার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার প্রেরিত সামরিক কর্মচারীকে বলেন যে বিনা কৃচ্ছ্র সাধনে এবং পার্থিব ভোগবিলাস পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাদের অর্জিত জ্ঞান কেহ লাভ করিতে পারেনা এবং তাঁহারা আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন না। রাজা অম্ভি অতিকষ্টে এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজনকে পার্থিব পরিচ্ছদে (ইহারা প্রায় সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় তপস্যা-রত থাকিতেন) আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে এবং রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গ্রীকগণ ইহাকে "কালানস" (kalanos) নামে অভিহিত করেন (এই সন্ন্যাসী কল্যাণ-দায়ক মনে করিয়া তাঁহাকে এই নাম প্রদান করেন)।

আলেকজাণ্ডার বিশ্রামের জন্য কতিপয় দিবস তক্ষ-শিলায় অবস্থান করেন এবং তাহার পর রাজা পুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পূর্বদিকে অগ্রসর হন।

মৌর্যযুগে তক্ষশিলা মৌর্যসাম্রাজ্যের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানী ছিল। সম্রাট বিন্দুসারের সময় তক্ষ-শিলার রাজকর্মচারীদিগের কুশাসন এবং অত্যাচারের জন্য ভীষণ বিদ্রোহ হয়। তিনি যুবরাজ অশোককে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন। অশোক

সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহ দমন করিয়া তক্ষশিলায় শান্তি এবং সুশাসন স্থাপন করেন। ইহার পর মহান্ বিন্দুসার যুবরাজ অশোককে তক্ষশিলার রাজপ্রতিনিধি (viceroy) স্বরূপ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার শাসনকালে তক্ষশিলা সমৃদ্ধিশালী হয় এবং সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি লাভ করে এবং জনসাধারণ সুখে এবং স্বাচ্ছন্দে কালাতিপাত করে। মৌর্য্যদিগের সময় তক্ষশিলা মৌর্য্যসাম্রাজ্যের একটি প্রধান প্রদেশ ছিল এবং একজন রাজপুত্র সর্ব্বদা রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। মৌর্য্যযুগে তক্ষশিলা সর্ব্ববিষয়ে উন্নত ছিল।

রাজনৈতিক বিপর্য্যয়

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারসিকগণ তক্ষশিলা আক্রমণ এবং অধিকার করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইণ্ডোব্যাকট্রীয়ানগণ, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে সিথীয়ানগণ (scythians) খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পূর্ণবগণ এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে হুনগণ (huns) তক্ষশিলা আক্রমণ এবং অধিকার করেন। এই উপর্য্যুপরি বৈদেশিক আক্রমণ এবং অধিকারের ফলে তক্ষশিলার সমৃদ্ধি এবং শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু এই ক্ষতি এবং ধ্বংস অল্পকাল স্থায়ী ছিল, কারণ সকল বিজেতাগণই তক্ষশিলার রাজধানী রাখিয়াছিলেন এবং ইহার উন্নয়ন করিয়াছিলেন। এই বৈদেশিক বিজয়ের প্রভাব শিক্ষা-পদ্ধতির এবং শিক্ষার বিষয়গুলির উপর দৃষ্ট হয়। পারসিকগণ ব্রাহ্মীর পরিবর্ত্তে খরোষ্ঠী বর্ণমালার প্রবর্ত্তন করেন। ইণ্ডোব্যাকট্রীয়ান-(গ্রীক) দিগের অধিকার কালে তক্ষশিলার বহু আচার্য্য গ্রীকভাষা এবং সাহিত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ছাত্রদিগকে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের সহিত গ্রীকভাষা এবং সাহিত্যও শিক্ষা দিতেন সরকারী পদ লাভ করিবার সুবিধার জন্য। কিন্তু গ্রীক প্রভাব তক্ষশিলার শিক্ষার উপর কি প্রকার বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

শিক্ষা কেন্দ্র

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় তক্ষশিলায় কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ছিলনা। তক্ষশিলা তদানীন্তন উচ্চশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই স্থানে বহুসংখ্যক খ্যাতনামা আচার্য্য এবং বিশেষজ্ঞ ছিলেন। উত্তরভারতের সর্ব্বত্র হইতে উচ্চশিক্ষাভিলাষী ছাত্রগণ এই খ্যাতনামা সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ শিক্ষকদিগের নিকট উচ্চ শিক্ষার এবং কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। ইঁহারা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিতেন না। এই আচার্য্যগণ তাঁহাদের সমুদয় ছাত্রবৃন্দসহ এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলেন। ইঁহারাই পাঠ্য বিষয় এবং শিক্ষা প্রণালী স্থির করিতেন। ছাত্র সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিলনা—প্রত্যেক আচার্য্য তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী ছাত্রসংখ্যা গ্রহণ করিতেন, এবং শিক্ষার্থীদিগের অভিলষিত বিষয়গুলির শিক্ষা প্রদান করিতেন।

শিক্ষার্থীগণ তাঁহাদের সুবিধানুযায়ী অধ্যয়ন কাল শেষ করিতে পারিতেন। কোনও প্রকার পরীক্ষার বন্দোবস্ত ছিলনা, এবং সেই জন্য শিক্ষার্থীদিগকে কোনও প্রকার উপাধি (degree or diploma) প্রদান করা হইত না। তক্ষশিলার আচার্য্যগণ সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।

গ্রীসের (Greece) "সোফিষ্ট" দিগের ("Sophist") ন্যায় তাঁহারা প্রাচীন সার্ব্বভৌমিক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, এবং সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিতেন, এবং তাঁহাদের ন্যায় পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন। প্রত্যেক আচার্য্য সাধারণতঃ ২০ জন ছাত্রকে একত্রে শিক্ষাদান করিতেন কারণ তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কোনও সুবৃহৎ কক্ষের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই—সুতরাং একত্র বহুসংখ্যক ছাত্রদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলনা, এবং বৃহৎ ছাত্রাবাসও ছিলনা।

তক্ষশিলার খ্যাতি

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে তক্ষশিলা প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। গমনাগমন বিশেষ বিপদ-সঙ্কুল এবং অসুবিধাপূর্ণ সত্ত্বেও বারাণসী, রাজগৃহ, মিথিলা, কুশিনগর, বৈশালী, কোশল, উজ্জয়ীন, পাটলিপুত্র, এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে রাজকুমার এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ তক্ষশিলায় উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করিতেন। কোশল নরপতি প্রসেনজিৎ, কুরুর জীবক্, কুশিনগরের রাজপুত্র বন্ধুল, বৈশালীর রাজপুত্র মাহালী, পাণিনি, এবং কৌটিল্য (চাণক্য) তক্ষশিলায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শিক্ষার্থীগণ ষোড়শ বৎসর প্রাপ্ত হইলে

তক্ষশিলায় শিক্ষার্থে গমন করিতেন। সাধারণতঃ তাঁহারা তাঁহাদের আচার্য্যগৃহেই বাস করিতেন। ধনী ছাত্রগণ, যেমন বারাণসীর রাজপুত্র ভূবহা পৃথক বাসভবনে থাকিতেন। সাধারণতঃ শিক্ষা, আহার, এবং আচার্য্য গৃহে আবাসের জন্য শিক্ষার প্রারম্ভেই শিক্ষার্থীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইত। দরিদ্র শিক্ষার্থীগণ দিবাভাগে আচার্য্যের গৃহে তাঁহার গৃহকার্য্য করিতেন, এবং রাত্রিকালে তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হইত। তক্ষশিলার আচার্য্যগণ বেদ, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, অস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা এবং অন্যান্য সামরিক শিক্ষা, কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য শাস্ত্র, ইন্দ্রজাল বিদ্যা, সর্প-সম্মোহিনী বিদ্যা, গুপ্তধন প্রাপ্তি বিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রশিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। বিম্বিসারপুত্র কুমার জীবক তক্ষশিলায় জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং অস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য সাত বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। জাতিনির্ব্বিশেষে শিক্ষার্থীগণ—যে কোন শাস্ত্র (বিষয়) অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণশিক্ষার্থীগণ একত্র বেদ অধ্যয়ন করিতেন, এবং ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীগণ একত্র ধনুর্বিদ্যা এবং অন্য প্রকার অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেন। বহুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণছাত্রগণ বেদ অধ্যয়নের পরিবর্ত্তে ধনুর্বিদ্যা এবং অন্যপ্রকার যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পরবর্ত্তী কাল হইতে তক্ষশিলার শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কোনও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ নাই। ইহা নিশ্চিত যে কুষাণ (kushan) দিগের রাজত্বকালের শেষ পর্য্যন্ত (২৫০ খৃষ্টাব্দ) তক্ষশিলা সমৃদ্ধিশালী এবং প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।

কুষাণদিগের পরবর্ত্তীকালে তক্ষশিলায় সমৃদ্ধি এবং শিক্ষাখ্যাতি অতিশয় হ্রাস পায়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (Fa-Hien) তক্ষশিলার সমৃদ্ধি এবং শিক্ষাগৌরব কিছুই দেখেন নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে হূণদিগের আক্রমণ এবং অধিকারের ফলে তক্ষশিলার অবশিষ্ট গৌরব-খ্যাতি, এবং সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াঙ (yhan chwang) তক্ষশিলা দর্শনকালে ইহার অতীত গৌরব, খ্যাতি, এবং সমৃদ্ধির কোনও প্রকার চিহ্নই দেখিতে পান নাই। এই প্রকারে প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধিশালী এবং প্রখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্র তক্ষশিলা হূণদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং একটি নামে মাত্র পর্য্যবসিত হয়।

তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ

প্রত্নতত্ত্ববিভাগ তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষকে ছয়টি পৃথক ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

(১) "বী" স্তূপ"। ইহা চেরিনাহনে গ্রামের সন্নিকট। এ স্থানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিলষিত বহু মুদ্রা এবং প্রস্তর ইষ্টকাদি পাওয়া যায়।

(২) হাতিয়াল—ইহা পর্ব্বতশ্রেণীর একাংশে অবস্থিত প্রাচীন দুর্গ।

(৩) শিরকাপ—ইহা পূর্ব্বোক্ত দুর্গের সহিত সংযুক্ত অতিরিক্ত দুর্গ বলিয়া অনুমিত হয়।

(৪) কাপ-কোট—সম্ভবতঃ এই স্থানে যুদ্ধের সময়ে হস্তী ও অন্যান্য পশু রক্ষিত হইত।

(৫) বাবরখানা—এটি অশোক নির্ম্মিত স্তূপ বলিয়া কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন। ইউয়ান চোয়াঙ্ এই স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬) বহুদূর বিস্তৃত মঠ ও বৃহৎ অট্টালিকার সমষ্টি।

প্রত্যয়ের পরমায়ু

শচীন রায়

অফিস থেকে ফিরে পড়াতে বসেছিলাম মেয়েটাকে। সামনেই হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা। কে যেন ডাকল আমার নাম ধরে, মেয়েটাকে চুপ করতে বলে কানখাড়া করলাম।

আবার শুনলাম। অভ্যাসবশে 'কে' বলতে যাচ্ছিলাম —সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম গলার স্বরটা। চমকে উঠলাম। কমল মজুমদার! আমার বাড়ীতে?

মনে মনে বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে গেঞ্জিটা টেনে নিয়ে গায়ে চড়াচ্ছি, আবার ডাকল। চেঁচিয়ে বললাম—ভেতরে এস না—

কিন্তু বলেই মনে পড়ল ভেতরে এলে বসাবো কোথায়?—আপ্যায়নেই কি করতে পারব ঠিক মত?

অথচ না ডেকে পারাও যায় না। আগে এই জাফরী-ঘেরা বারান্দাতেই বসে কত আড্ডা মেরেছে—এক সঙ্গে তেলমুড়ি বা নারকোল মুড়ি বা রুটি পরোটা খেয়েছি।

কিন্তু এখন ও অন্য স্তরের লোক হয়ে গেছে। এখন সে মেশে হাই-সার্কেলে—সমস্ত হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে। তাই মনে করি বসাবো কোথায়!

আমার বাড়ীর সামনে বেশ প্রশস্ত একটা বাগান আছে তার ফটকের বাইরে থেকে ডাকছিল কমল। আমি এগোতে এগোতে বললাম—ভেতরে আসতে হয়ত'।

—না ভাই ভেতরে যাবার মত সময় নেই—খুবই ব্যস্ত।

ফটকটা খোলার আগেই একটা লম্বা মত খাম হাতে এগিয়ে দিয়ে বলল—রাখ'।

বাইরের আলোর যেটুকু অংশ আসছিল—তাইতে দেখলাম খামের ওপরে বিরাট একটা শাঁখের ছবি। বুঝলাম বিয়ের চিঠি—কিন্তু কার বিয়ে সে কথা জিজ্ঞেস করতে মুখ তুলে দেখি ফটাফট্ দিয়ে বলছে—চলি ভাই—অনেক যায়গায় যেতে হবে।

শব্দ তুলে ফটাফট চলে গেল।

পেছন ফিরে দেখি তিনটি ছেলে-মেয়েই পড়া ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। কাঠের জাফরী দিয়ে দেখতে পেলাম গীতাও বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তার চোখেও কৌতূহলের ছিটে।

ছেলে-মেয়েদের বকুনি দিতেই ছুটে গিয়ে পড়তে বসল। গীতা একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—হঠাৎ মজুমদার সাহেব কেন?

ছেলে-মেয়েদের অমনোযোগের জন্যে মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিছু না বলে শুধু খামটা এগিয়ে দিলাম হাতে।

—একি বিয়ের নেমন্তন্ন? কার বিয়ে? তোমার বন্ধুর নাকি?

শেষের কথাটায় একটু রাগ হোলো। গত পরশু দিন ক্লাবে ওই রকম একটা কথা কানাঘুষোয় শুনেছিলাম। আমি আমল দিইনি গুজবটায়। কমল বড়লোক হওয়ার পর থেকেই ওর নামে অনেক মিথ্যে নিন্দে ওরকম শুনেছি —তা ছাড়া বাল্যবন্ধুর জন্যে কমলের ভালবাসাটা মনে করলে ওই ধরণের কথা আর মাথায় ঠাঁই পাবনা—।

গীতার কথায় বুঝলাম মেয়ে মহলেও ওই গুজবটা ছড়িয়েছে। সেই কারণেই রাগ হোলো। বলে ফেললাম —দেখই না খুলে কার বিয়ে।

গীতা ততক্ষণে চিঠি খুলে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ওর মুখে দেখি চাপা হাসি। চিঠি পড়া শেষ করে হাসতে হাসতে আমার হাতে দিয়ে বলল—এবার তুমি নিজে পড়। তোমার বন্ধুর কীর্তি দেখ। একি আর সেই কমল আছে? এখন যে মজুমদার সাহেব! বরযাত্রীর নেমন্তন্ন পেয়েছ ত?

চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়লাম। পড়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। নিজের হস্তাক্ষরে লেখা। পাত্রীর নামও নেই। আর বউ ভাতের নেমন্তন্ন নেই—আছে প্রীতি-ভোজে যোগ দেওয়ার নেমন্তন্ন।

এর আগের বারে ওর বিয়েতে আমরা বরযাত্রী গিয়েছিলাম। বাসর ঘরে গানও গেয়েছিলাম অনেক। এবারে বলল না। ভালই হয়েছে। এখনত ও আর আমাদের ঠিক বন্ধু নয়। এক সময় আমরাই বন্ধু আত্মীয় ইত্যাদি সব কিছু হলেও এখনও যে থাকতে হবে তার কি মানে আছে? শিশুর কাছে যে মা বিরাট, উপযুক্ত হয়ে-যাওয়া-ছেলের কাছে মার কি সেই বিরাটত্ব থাকে? তখন হয়ত শুধু সম্বন্ধগত আর সংস্কারগত টানটাই শুধু মাত্র থাকে অনেকের কাছে। কমল নিজেও হয়ত খুসি হোতো যদি আমাদের না বলতে হোত। কারণ যে সব লোককে পানাহার করতে ডাকবে, যাদের সুহৃদ বলে পরিচয় দেবে তাদের কাছে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বীকার করবে কি করে? লজ্জা পাবে যে। এত আর শ্রাদ্ধ বাড়ী নয়। অবশ্য বাসন্তীর শ্রাদ্ধের সময় কমলের কষ্ট আন্তরিক নয় বলে সামান্যমাত্রও মনে হয়নি।

—কি গো বললে না ত বরযাত্রী যাচ্ছ কিনা?

কোথা থেকে ঘুরে এসে গীতা আবার খোঁচাল। একটু গম্ভীর ভাবেই বললাম—না বলেনি কিছু, হয়ত লজ্জা পেয়েছে বলতে। এমনি চিঠিটা দিতেই লজ্জা পাচ্ছিল। মুখে কিছু বলল না পর্য্যন্ত। এ বিয়েটা করছে বটে—হয়ত ব্যবসায়ই খাতিরে—তবে লজ্জা পেয়েছে খুব।

কথাগুলো বলে ফেলে নিজেই চমকে উঠলাম। কমলের অন্যায় যেন নিজের অন্যায় মনে করেই কেমন গুছিয়ে কৈফিয়ৎও বানিয়ে দিলাম!

—কিন্তু ব্যাপারটা দেখ—যে লোকটা বউ মারা যাবার পর আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল—বা বউয়ের অসুখের সময় হাসপাতালের কেবিন থেকে যাকে নড়ানো যাচ্ছিল না—সে এরই মধ্যে সব ভুলে গেল। তোমরা—পুরুষরা বাপু সব পার। চোখ বুঁজলেই আরেকটা ধরে আনবে।

আমি ঘরে ঢুকে লুঙ্গি ছেড়ে ধুতিটা পড়ে পাঞ্জাবী চাপাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে বলল—চললে কোথায়?

—যাব একটু ক্লাবে।

—কেন? উপহারের জন্যে?

—দেখি ওরা কি করে।

—কি দেবে তোমরা? তার চেয়ে বরং যেও না নেমন্তন্নে। এর আগের বারেও তোমরা কেউ কেউ চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত খরচা করেছিলে। এখনও সেই পরিমাণ টাকা খরচা করতে পারলে তবে উপযুক্ত উপহার দিতে পারবে। তখন ও টাকা খরচা করেছিলে—বিয়ে আর উপহারের পেছনে এখন শুধুই যদি উপহারের জন্যে খরচা করতে পার তবে হবে।

—দেখি কি করা যায়।

বলতে বলতে চটিতে পা গলিয়ে ছেলে-মেয়েগুলোকে ভাল করে পড়তে বলে—বেরিয়ে পড়লাম।

* * *

মনটা বড় খারাপ লাগছিল। না, ওর নেমন্তন্ন করার ধরণে নয়—বাসন্তীকে এত তাড়াতাড়ি মন থেকে মুছে ফেলার জন্যেই মনটা বড় খারাপ লাগছিল।

বাসন্তীর সঙ্গে ওর বিয়েতে আমরাই ওকে জোর করে রাজি করিয়েছিলাম। ওর মামা দেখে শুনে ঠিক করেছিলেন নারকেলডাঙ্গার বাসন্তীকে। যেমন বড় তেমনি মুখ-চোখ। নিখুঁত সুন্দরী। কিন্তু ওর বাবার অবস্থা ভাল ছিলনা। সামান্য স্কুল মাষ্টার।

কমলেরও অবস্থাও তখন ভাল নয়। একটা ছোট ষ্টেশনারী দোকান শুধু ছিল। আমাদের সকলেরই তখন বে' থা হয়ে গেছে—ছেলেপুলেও হয়ে গেছে। ওর বিধবা মার ছিল হার্টের অসুখ। আমাদের কেবল বলতেন—জোর করে ওর একটা বিয়ে দিয়ে যাও। আমি মরে গেলে ওকে দেখবে কে?

কমল বলত নিজেরই খেতে কুলোয়না আবার শঙ্করাকে ডাকা!

ওর মতলব ছিল কিছু টাকা জমিয়ে একটা মিষ্টির দোকান করার। আমরা বললাম—তোর যখন এতদিনে সেটা হয়ে উঠল না তার আর দরকার নেই—ওইতেই বেশ চলে যাবে।

সেই বিয়েতে আমরাই ছিলাম সব। এখান থেকে একসঙ্গে ট্রেণে গিয়ে এক সঙ্গেই এসেছিলাম। বাসন্তীর

আত্মীয়স্বজনেরা আমাদের কমলের নিকট-আত্মীয় হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন। বার বার করে বলেছিলেন লক্ষ্মীকে তুলে দিলাম আপনাদের হাতে আপনারা একটু দেখবেন। বাসন্তীর ডাক নাম ছিল লক্ষ্মী।

এখানে বিশেষ ফুল পাওয়া যায়না বলে কলকাতা থেকে ফুলের স্তূপ এনেছিলাম ওদের নিয়ে ফেরার সময়। কমলের বউভাতটা এই সহরের একটা বিশেষ উৎসবে পরিণত করেছিলাম। আমাদের ক্লাবের সকলেই নিজেদের ক্ষমতার অতিরিক্ত খরচা করেছিল আর আনন্দও করেছিল প্রাণ খুলে।

দু দিনের মধ্যে বাসন্তীও বেশ সহজ হয়ে উঠল আমাদের সঙ্গে। বেশ সহজ ভাবেই সে মিশত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে।

কিন্তু চাকা ঘুরল কয়েক বছরের মধ্যেই। ওর বৈপনারী দোকানের বিক্রী বিয়ের পর থেকেই যেন কিছু বেড়ে গেল। তারপর হঠাৎ সে রেজার্সের সেকেণ্ড প্রাইজ পেয়ে বসল—বাসন্তীর নামে কেনা টিকিটে।

সেই টাকা দিয়ে দোকানটাকে ডিপার্টমেণ্টাল দোকানে পরিণত করল—তারপর একটা বাড়ীও খরিদ করল—দু একটি কণ্ট্রাক্টারের পরামর্শে।

তারপর রেলের কাজের কণ্ট্রাক্ট নিতে লাগল ধরা ধরি করে—খাইয়ে দাইয়ে।

এখন পাকা কণ্ট্রাক্টর হয়ে গেছে—সঙ্গে বাড়ীও আছে দোকানও আছে।

বিয়ের বছর তিনেক পরে একটা ছেলে হয়েছিল সে এখন কানিংহামে পড়ে। তারপর আর হয়নি।

আমাদের ক্লাবে আগে ও রোজ আসত, দোকান বন্ধ করে অন্তত দশটার সময়ও একবার চুঁ মেরে যেত। বলত-কি করব ভাই এটা নেশার মত টানে।

কিন্তু সে টান ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হোলো। ক্লাবে আসে নয়মাসে ছয়মাসে—তাও পায়ের ধুলো দিয়ে ধন্য করে দিচ্ছে এই রকম একটা পরিবেশে আমরা থাকে। তবে বাসন্তী আর একটু বেশী বার আসত—কিছু কথা কইত হাসত। বাসন্তী সকলের সঙ্গেই বেশ সহজ আর সপ্রতিভ ভাবে মিশত বড় বড় লোকেদের সঙ্গে বেশ সপ্রতিভ ভাবে কথা বলত, অনেকে অনেক সময় বলেছে যে কমলের কণ্ট্রাক্টর হিসেবে সাফল্যের পেছনে বাসন্তীর অনেকখানি অবদান আছে।

আমাদের ক্লাবের চাঁদা বা কোন বিশেষ সাহায্য চাইতে গিয়ে কোনদিন ওর বাড়ী থেকে ফিরতে হয়নি কিন্তু আগের মত ক্লাবে সেটুকু পৌঁছে দিতে আর পেরে ওঠেনা।

ক্লাবে ওকে নিয়ে আমাদের ইদানীংকার বেশীর ভাগ আলোচনাই হোতো নিন্দেমূলক। ওর কোন একটা কাজের প্রশংসা কেউ করলেও আর পাঁচ জনে তার পাঁচটা খুঁৎ ঠিক বার করত।

কিন্তু বাসন্তী মারা যাবার পর কমল কিরকম একটা অসহায় ভাব নিয়ে যখন আমাদের সাহায্যপ্রার্থী হলো তখন আর আমাদের কেউ ওর কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি স্মরণ করিনি ও-যে আমাদেরই সেই বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে গিয়েছি।

শ্রাদ্ধশান্তির পরও মাঝে মাঝে আসত, পুরোন দিনের কথা রোমন্থন করত, কিন্তু তারপর হঠাৎ দেখি আবার প্রভাবর্ত্তন করেছে। এই তিন মাসের মধ্যে একদিনও আমাদের ক্লাবমুখো হয়নি বা রাস্তায় দেখা হলে এড়িয়ে গেছে কিংবা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। আমাদের কাছে এটা খুব অস্বাভাবিক ঠেকেনি। ক্রমেই মনে হয়েছে এই কিছুদিন যে কমল আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছিল—সেইটেই ছিল অস্বাভাবিক।

* * *

ক্লাবে পৌঁছে দেখি কমলকে নিয়েই আলোচনা হচ্ছে তাস ফেলে রেখে। কয়েকজন মাত্র ছিল তাদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই মুখ চোখের ভাব দেখে মনে হয় যেন একটা বাজি জিতে গেছে। ওরা যেন বাজি ধরেছিল কমল আমাদের কাছে সহজ হয়ে আবার আমাদের কাছে আসতে পারেনা, আর সেই বাজি যেন খুব ভাল ভাবেই জিতে গেছে।

যে জন্যে গেলাম সে আলোচনা সম্পূর্ণ হলো না—অনেকে না থাকার জন্যে। কিছুক্ষণ কমলের আগের বিয়ের কথা—কমলের মায়ের কথা, আগেকার কমলের কথা আলোচনা করলাম তারপর কিছুটা নিন্দেও করলাম বর্ত্তমান কমলের। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লাম।

একাই ফিরছিলাম। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আমার সাহিত্যিক বন্ধু মলয়ের সঙ্গে। ছদ্মনামে মলয়ের কয়েকখানা ঐতিহাসিক উপন্যাস বেরিয়েছে। বই কখানা থেকে পয়সা বিশেষ না পেলেও আমাদের এ অঞ্চলে খ্যাতির খুব পায়। আমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব কলেজ থেকে। আমার অনেক পরে ও এখানে চাকরী নিয়ে আসে। আমিই ওকে আমাদের ক্লাবে ঢোকাই—তারপর সব-যায়গায় পরিচয় করিয়ে দিই। আমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্বটা এখনও একটু আন্তরিক আছে। আমরা পরস্পরকে খুবই বিশ্বাস করি আর ঠকাবার চেষ্টা করিনা। মলয়কে জিজ্ঞেস করলাম কমল নেমন্তন্ন করেছে কিনা। একটু ইতস্তত করে সে বলল-হ্যাঁ করেছে। তারপর জিজ্ঞেস করলাম বরযাত্রীর জন্যে বলেছে কিনা। ও একটুখানি বিব্রত হয়ে পড়ল তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে উল্টে প্রশ্ন করল আমাকে বলেছে কিনা।

বললাম—আমাকে বলেনি তাছাড়া ক্লাবের যাদের সঙ্গে দেখা হোলো তাদেরও বলেনি। তখন ও হেসে ফেলে বলল যে-তাকেও বলেনি।

মলয়ের সঙ্গে রাস্তা হাটতে হাটতে সমালোচনা করছিলাম কমলের। একসময় বললাম—আমাদেরই তাই লজ্জা করছে। মনে হচ্ছে আমরাই যেন অন্যায় করতে এসেছি-যারা চিরকাল আমাদের দেখেছে দূর থেকে তারা কৈফিয়ৎ চাইছে আমাদের কাছে—তাদের চোখে মুখে ব্যঙ্গের চাবুক।

মলয় কিন্তু সারাক্ষণই চুপচাপ ছিল। হঠাৎ কেন জানিনা মনে হোলো মলয় বুঝি কমলের সমর্থক তাই অমন চুপ করে আছে। আর মনে পড়ে গেল মলয় সাহিত্যিক। একটু ক্ষুব্ধ গলাতেই বলে ফেললাম—কিরে তুই যে চুপ করেই রইলি? তোর কিছুই বলবার নেই? তোরা সাহিত্যিক—তোরা বিওরীর ওপর ভিত্তি করে জীবন রচনা করিস আর জীবনের মধ্যে তোদের বিওরীর মিল বা মিলের আভাস দেখতে পেলেই বলে উঠিস এটাইত স্বাভাবিক। কমলের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বলবি খুবই স্বাভাবিক। বলবি একটা কালচু স্মৃতি নিয়ে কতদিন বাঁচা যায়—। কিন্তু ওদের ভালবাসাকে এখানে সকলেই হিংসে করত, বলত…

না রে না আমি অন্য অনেক কথা ভাবছি—

—অন্য কথা মানে?

—সে তোর দরকার নেই—।

—কার সম্বন্ধে?

—ওই কমলেরই কথা।

—তাহলে বলনা—।

যদিও তুই আমাকে অনেক গালাগাল দিলি—কিন্তু ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।

—তাহলে বলবিনা?

বলে ফেলেই হঠাৎ ভাবলাম-ওকি বলতে চায়? যার সঙ্গে কমলের বিয়ে হচ্ছে তার সঙ্গে কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছে—নাকি?

জিজ্ঞেস করলাম সে কথা।

হেসে উঠল মলয়। বলল সে রকম কোন কথা শুনিনি।

বললাম—আমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে—না হলে কি করে এত তাড়াতাড়ি আর একটা বিয়ে করতে এগোয়?

তবে শুনেছি এবার বিয়ে করবে রেজিষ্ট্রি করে। মেয়েপক্ষও রাজি।

—তাহলেত' বরযাত্রীর আর প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ক্লাবের ওরা ত' কিছুই খবর রাখেনি দেখছি। কিন্তু ভাবতে কষ্ট লাগছে বাসন্তীকে এত তাড়াতাড়ি ভুলল কি করে?

—ভুলল মানে? একেবারে মুছে ফেলেছে। বাসন্তীর সব স্মৃতি মুছে ফেলতে চেষ্টা করছে।

—সে কি?

—এই যাঃ, তোকে ত' বলে ফেললাম অনেকখানি।

—বলেই ফেল্‌না।

—কিন্তু কাউকে বলবি না-এমন কি বউকেও না—।

—আচ্ছা।

—আমার এক শিল্পী বন্ধু নীরেন বসু বছর কয়েক আগে একবার এখানে এসেছিল,—মনে আছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে। আমার একটা স্কেচ করে দিয়েছিল—। আছে এখনও। বেশ মনে আছে তার

কথা, খুব জমি—মানুষে। বাসন্তীর সঙ্গেও খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে তারাপীঠ যাবার ঠিক করছিল, কিন্তু পরের দিন শুনি ভোরে বাসন্তীর সঙ্গে গাড়ী করে তারাপীঠ চলে গেছে।

মনে আছে তার পরের দিন সেলাম একটা তারাপীঠের সুন্দর স্কেচ আর বাসন্তীর একটা অল্প সুন্দর স্কেচ।

—যাক তারপর শোন, বাসন্তী ওকে দিয়ে কমলের বাবা-মার দুটো ছবি—ফটো থেকে আর কি বানিয়ে নিতে চায়। ও বলে ষ্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে করে দেবে। এখানে ও' সব জিনিষ আনেনি। যাইহোক কমল-বাসন্তী তাতেই রাজি হোলো।

তারপর বাসন্তী মাকে মধ্যে দিয়ে তাগাদা দিয়ে তাগাদা দিয়ে ছবি দুটো তৈরী করিয়ে আনতে পারে প্রায় মাস আষ্টেক পরে। এর মধ্যে বাসন্তী একবার বাপের বাড়ি গিয়েছিল বেশ কয়েকদিনের জন্যে।

যাই হোক, ছবি দুটো কমলের খুবই ভালো লাগে। তারপর এই মাস কতক আগে হঠাৎ কমলের খেয়াল হয় যে বাসন্তীর একটা বড় ছবি আর একটা মাঝারি ছবি দুই ঘরে টাঙিয়ে রাখবে।

তখন থেকেই কেবল আমাকে বলে তোমার আর্টিষ্ট বন্ধুর বাড়ী একদিন নিয়ে চলো। আমি ঠিকানা দিয়ে দিলাম তাতে হবে না। আমি সঙ্গে থাকলে নাকি একটু বিশেষ ভাবে ইন্টারেষ্ট নেবে এই ধারনা।

যাই হোক—একদিন গেলাম দুজনে। নীরেন বাড়ি ছিল না। ওর বসবার ঘরটাই ষ্টুডিও। বেশ বিরাট ঘর। বেশীর ভাগ অংশটাই ষ্টুডিও, পর্দা দিয়ে আড়াল করা। সামনের কিছুটা অংশ শুধু বসবার জন্যে চেয়ার টেবল পাতা।

কিছুটা বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে উঠে পড়ে ষ্টুডিওর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। একটা পর্দা তোলাই ছিল। কমলও উঠে পড়ল বলল সেই ভালো। শুধু ছবি দেখে দেখে সময়টা কাটবে।

দেওয়ালে টাঙানো কয়েকটা বিশিষ্ট আর্টিষ্টের ছবি ছিল। সেইগুলো বেশ সময় নিয়ে দেখে এদিকে ফিরে দেখি কমল এক পাশে উবু হয়ে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে যেন একটা ছবি দেখছে। ছবিটা নীচে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা রয়েছে। একবার মনে হলো আঙুল দিয়ে কি যেন মুছল। একটু ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলাম। ব্যস্ত হলাম এই ভেবে যে নীরেন হঠাৎ দেখলে না আবার কিছু অপমান করে বসে।

কাছে যেতেই কমল উঠে পড়ল, আমাকে কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল চল-চল আর দেরী করা যায় না।

অবাক হয়ে বললাম সে কি? তুমি যে জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে এলে তাইত হোলো না।

—না না আমার দেরী করলে চলে না। বললাম—অন্তত নীরেনের সঙ্গে দেখা করে যাই।

—আমিও বলছি আমার সময় নেই। আমার অনেক জরুরী কাজ আছে। আমি তাহলে চললাম।

কথা কইতে কইতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম কমল বলতে বলতে ছিটকে রাস্তায় নেমে গিয়ে একটা ট্যাক্সিকে থামিয়ে তাতে করে উধাও হোলো।

হঠাৎ আমার মনে হোল এরকম করল কেন? এত ক্ষেপেই বা গেল কেন?

ভাবতে ভাবতে কারণটার সূত্র ষ্টুডিও হ'তে পার মনে করে আবার ঢুকলাম ষ্টুডিওতে। তারপর কমল যে ছবিগুলো দেখছিল সেইদিকে এগিয়ে গেলাম।

বেশ বড় বড় কয়েকটা ছবি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে লম্বা করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার আশেপাশেও অনেক ছবি ইতস্তত রয়েছে, কাছে গিয়ে দেখি ওপরেই একটা নগ্ন ছবি। ছবিটা বেশ বড়। ছবিটার মুখটা দেখে খুবই চমকে উঠি। আর বুঝতে পারি কমলের এই মানসিক পরিবর্ত্তনের কারণটা।

আমি আরও ভাল করে দেখে পায়ে পায়ে পালিয়ে এলাম। ভাগ্য ভাল নীরেন তখনও ফেরেনি।

—তারপর? মলয় থামলে বলে উঠলাম।

মলয় বলল তারপর আর কি! তারপর থেকে কমল আমার সঙ্গে একদম কথাই কয় না। দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আমাকে নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত করেনি আর করবেও না বলে বিশ্বাস। আমি তখন তোকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম।

মলয় থামলে জিজ্ঞেস করলাম—তুই যে বলছিলি বাসন্তীর সব ছবি টবি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে—তা তুই জানলি কি করে?

—খবর নিয়েছি ভাই। সব খবরই কিছু কিছু পাই। না, এবার চলি তোর সঙ্গে অনেক দূর চলে এলাম।

—আচ্ছা একটা কথা। কোনোরকম দেখার ভুল হয়নি? মানে নগ্ন ছবিতে', মুখ দেখে কি সহজে চিনতে পারা যায়?

—আমিতে' পরে দেখলাম—যে ভাল করে চেনে সে যে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে অমন ভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠে আমাকে সচেতন করে দিয়ে গিয়েছিল। যাক চলি। এসব কথা ভাই একেবারে ভেবে যাস। আমি ঠিক করেছি ওর বউ-ভাতের আগের দিন পালাব এখান থেকে—যাতে না পাঁচজনকে কৈফিয়েৎ দিতে হয় গেলাম না কেন বলে। আমায় যে নেমন্তন্ন করেনি তা ভেবে যাস। ভোদের ক্লাব থেকে যে টাকা চাঁদা ঠিক হবে—সে চাঁদা দিয়ে দেব।

মলয় কথা বলে যাচ্ছিল—কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যেন অনেক দূরে বসে কথাগুলো শুনছি। আমি যেন একটা অদৃশ্য নির্জনতার পড়ে রয়েছি—আমার হাত থেকে বিশ্বাসের আর প্রত্যয়ের কবচ খুলে পড়ে গেছে—তার জন্যে শুধুই মায়া আছে কিন্তু লোভ নেই।

নববর্ষের রঙ্-ফেরা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

পৃথিবীর রঙ্-ফেরা দেখিবার সাধ যদি জাগে,
আয় ওরে, প্রকৃতির স্পর্শ-লাগা হর্ষাতুর বনে;
বৃক্ষে বৃক্ষে—ডালে ডালে—জয়-দীপ্ত
পত্র পুরোভাগে
মহোল্লাস জাগিয়াছে নববর্ষে মত্ত সমীরণে;
জরা-জীর্ণ—শীর্ণ দীর্ণ উড়ে যায় সকলের আগে;
রুগ্ন ভগ্ন—শুষ্ক রুক্ষ ঝ'রে যায় শুভ্র শুভক্ষণে।

২

পৃথিবীতে পুরাতন পরিপন্থী অগ্র-গমনের
চিরকাল স্থিরভাবে কখনো যে পারে না রহিতে;
সর্ব্বনাশ সাধে রুদ্র আত্মম্ভরি দক্ষের যজ্ঞের,
লণ্ড ভণ্ড ক'রে দেয় অগ্ররোধী কুচক্রে চকিতে।
বিসর্জনে আবাহন হয় শেষে মহামঙ্গলের;
রঙ্-ফেরা এই মত চিরদিন চলে পৃথিবীতে।

৩

উজ্জীবন-মন্ত্র নিয়ে—যৌবনের নিয়ে উদ্দীপনা,
পুরাতন ভগ্ন যত গতি-বেগে করি' পরিহার
নববর্ষ নব বেশ ধরিত্রীর করিছে রচনা।
ওই শোনো সমীরণে ধ্বনিতেছে তাহারই ঝঙ্কার।
উতরোল হয় না কি সর্ব্ব দেহে শোণিতের কণা!
নবলব্ধ চেতনায় রোমাঞ্চিত হোলো চারিধার।

৪

ভয় নাই, জয় হবে; এই ভবে অনুশোচনায়
পিছে প'ড়ে থাকিবার—নীচতার কোথা আছে ঠাঁই!
ভাঁটারও আঘাটা তরি' ধেয়ে আসে গতিমত্ততায়
মহাপ্লাবনের ধারা, সে বন্যারে বক্ষে পেতে চাই;
বন্ধন-শৈথিল্য হ'তে এ জীবন তাই মুক্তি পায়;
বাসন্তী-ভোটনা-হারা জীবনের কোনো অর্থ নাই।

৫

হে দাক্ষিণ্যপূর্ণ বায়ু, এসো তবে তূর্ণ বেগে বেয়ে;
জমানো জঞ্জাল যত আহারাযে নিয়ে চ'লে যাও;
'জয়—তব জয়' ব'লে মোরা সবে জয়ধ্বনি গেয়ে
তোমারে জীবনে বরি' তব সাথে হইব উধাও।
পৃথিবীর রঙ্-ফেরা তুমি চাও, আমরাও চেয়ে
তোমারে করেছি গুরু, নববর্ষে মহামন্ত্র দাও।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক

অরুণ দে

গীতধর্মী কবিমানস কেবল ছোটগল্প আর উপন্যাসেই নয়, নাটকের মধ্যে দিয়েও যে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তার প্রথম সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে। এর আগে যে সব নাটক রচিত হয়েছিল সে-

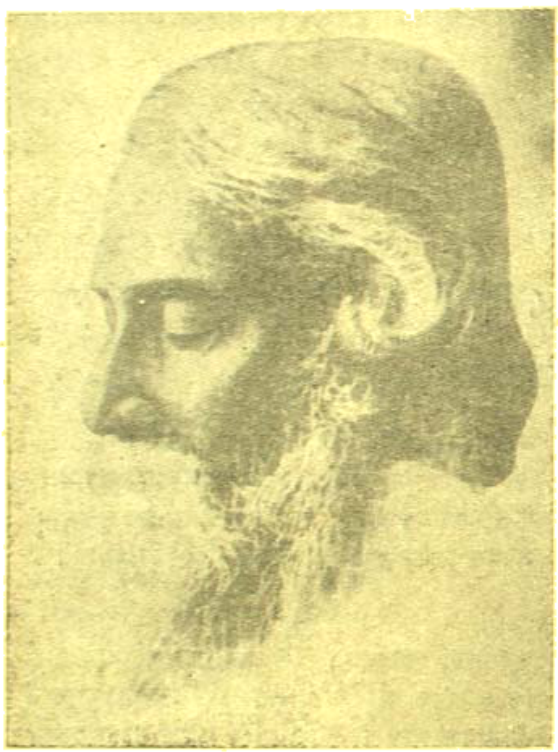

রবীন্দ্রনাথ

গুলির মধ্যে মানুষের হৃদয়ের যে দ্বন্দ্ব ঘটনার উচ্ছল আবর্ত ও উদ্দাম গতিবেগের মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করত, তা' এসব নাটকে প্রায় নেই বললেই হয়। তার পরিবর্তে একটা সুগভীর প্রশান্ত অনুভূতি, অনন্তের জন্য রসপিপাসা এবং রূপকের সাহায্যে অরূপ ও অসীমের সন্ধানের চেষ্টা মেটার-লিংক, ইয়েট্‌স, নিজ প্রভৃতি নাট্যকারগণের সাংকেতিক নাটকের (Symbolical drama) প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বাঙ্গালী-সাহিত্যিক সাংকেতিক নাটক রচনার সময় ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুগামী হয়েছিলেন কিনা—অথবা ইয়েটস্-এর "The land of the heart's desire, মেটারলিংক-এর "The blue bird কিংবা রোসট্যাণ্ড-এর "Chanticleer" প্রভৃতি নাটক হতে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের অবসর আছে তবে একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে রবীন্দ্রনাথই সর্ব-প্রথম বাংলা সাহিত্যে সার্থক সাংকেতিক নাটক রচনা করেন।

এধরণের নাটক রচনা করতে হলে কেবল প্রতিভা নয়, একটা বিশিষ্ট মানসিক সংস্কৃতিও থাকা প্রয়োজন। রবীন্দ্রসাহিত্যের রসপিপাসু পাঠক মাত্রেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিমানস একান্তভাবে গীতধর্মী—তিনি চিরদিন রূপের মাঝে অরূপের, সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান করেছেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সাংকেতিক নাটক থেকে হয়ত তিনি এ ধরণের নাটক রচনার অনু-প্রেরণা লাভ করেছিলেন কিন্তু তাঁর গীতিপ্রবণ ও অনন্তের রসপিপাসু কবিচিত্তটি যে সাংকেতিক নাটক রচনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে সেটাই তো স্বাভাবিক। বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনায় সমসাময়িক কিংবা পূর্ববর্তী সাহিত্যরথীদের প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ সাংকেতিক নাটক রচনার সময় ইয়েটস্, মেটারলিংক প্রভৃতি নাট্য-কারগণের দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন—কিন্তু প্রকৃত প্রতিভাবান লেখক যেমন অল্পকালের মধ্যে সমস্ত প্রভাব অতিক্রম করে স্ব স্বরূপে ব্যক্ত হন, রবীন্দ্রনাথও সেরকম অল্পসময়ের মধ্যেই অন্যান্য নাট্যকারগণের প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজের প্রতিভার সৌরভে চারিদিক নন্দিত করে তুললেন। তিনি বাংলাসাহিত্যে নাট্যরচনার এমন একটা নতুন ধারার পথ নির্দেশ করলেন যে ধারা দ্বিজেন্দ্র-

লাল, গিরিশচন্দ্র, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি নাট্যকারগণের ঘটনাবহুল বস্তুধর্মী নাটক রচনা পদ্ধতি থেকে অনেকটা পৃথক। তাঁর নাটকগুলি বহির্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-বিরোধের পরিবর্তে—মানব মনের সুতীব্র অনুভূতির প্রকাশে মুখর হয়ে উঠেছে। কবির সুউচ্চ ধর্মবোধ, অনন্তের জন্য তাঁর রহস্যপিপাসা ও রূপের স্পর্শে অরূপ ও অসীমের সন্ধানের সাধনা তাঁর সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। 'রাজা', 'ডাকঘর' 'শারদোৎসব', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি যে সব নাটকে কবির প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে সেগুলি সাংকেতিক নাটকের অন্তর্গত। কবির নাট্যরচনার প্রথম যুগে সাংকেতিকতা তেমন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কোন কোন নাটকে আবার রূপক ও সাংকেতিকতার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। 'রক্ত-করবী' এই ধরণেরই একটি নাটক।

নাট্য রচনার শেষ যুগে কবি অনেকটা সাংকেতিকতার প্রভাব মুক্ত হয়েছিলেন। এ যুগের একটি প্রধান নাটক 'নটীর পূজা'য় সাংকেতিকতা অপেক্ষা সাধারণ নাটকোচিত-গুণের অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত যে রবীন্দ্রনাথের নাটকের আসল রূপ তাঁর সাংকেতিক নাটকগুলিতেই প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোন সমালোচক বলেন যে কবির নাটকগুলি নাটক হিসাবে ব্যর্থ। কারণ এসব নাটকে বহির্ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এবং গতি নেই। তাঁর "নাটকগুলি আমাদের দুর্গাপ্রতিমার মত। সুন্দর রঙ, বিচিত্র গঠন, রাঙতার চাকচিক্য সকল আছে—নাই কেবল প্রাণ।"

সত্যি, নাটক বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝতাম, নাটক সম্বন্ধে যে ধারণা এতকাল আমাদের মনে বদ্ধমূল ছিল—রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি সেই বদ্ধমূল ধারণার দুয়ারে কঠিন আঘাত হেনেছে। সমালোচক হাডসন আমাদের বলেছিলেন, "Drama is life, presented in action," —পিরাণ্ডেলো নাটকের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, "Drama is action, Sir, action—not confounded philoso-phy,"—এই পুরাতন সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে রবীন্দ্রনাথের নাটককে খাঁটি নাটক বলতে দ্বিধা হতে পারে, কিন্তু কবির সাংকেতিক নাটকগুলি বিচারের সময় একথাই আমাদের সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে যে—মানুষের অন্তরের মধ্যে চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতির যে প্রবল গতিবেগ ও দ্বন্দ্ব রয়েছে তাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন; বাইরের ঘটনা-প্রবাহ বা actionএর চিত্রণে প্রাধান্য না দেখিয়ে—তিনি দেখিয়েছেন মানবমনের সেই সব অবস্থাগুলি যেগুলি বহির্ঘটনার দ্যোতক।

মানুষের জীবনের স্নেহ ও প্রেমের সুমধুর কলতান, দুঃখ ও বেদনার ব্যথাতুর সুরের সাধারণ ভাবগুলি নাটকের মধ্যে প্রকাশ করা একেবারে অসাধ্য নয়। কিন্তু আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এমন কতকগুলি ভাব ও অনুভূতি আমরা মাঝে মাঝে উপলব্ধি করি যেগুলিকে সাধারণ নাটকের অতি সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে মনে হয় যে অনেকটাই বুঝি অপ্রকাশিতই থেকে গেল। অতীন্দ্রিয়ের জন্য যে ব্যাকুলতা, সীমার মধ্যে অসীমের যে সুগভীর অনুভূতি—তাকে তো সাধারণ নাটকের ভাষায় স্পষ্ট করে বোঝান যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথের মত উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকারগণ সেই সব অনুভূতিকে ভাবের বিগ্রহে মণ্ডিত করে রূপক ও সাংকেতিকতার সাহায্যে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেন। তাই এ ধরণের নাটক অনেকের কাছে অস্পষ্ট কুহেলিকাময় বলে মনে হয়।

যাঁরা কবির নাটককে প্রাণহীন দুর্গাপ্রতিমা বলে ব্যঙ্গ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বিশেষ লাভ নেই। কবির নাটকের প্রাণবস্তু সকলেই যে উপভোগ করতে পারবেন তা' সম্ভব নয়। আমার তো মনে হয় পাঠকের একটা বিশিষ্ট মানসিক সংস্কৃতি না থাকলে রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাট্যসাহিত্যের রস উপলব্ধি করে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না।

নববর্ষ

নির্মলগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

সময় ও স্রোত কখনও কারো জন্য অপেক্ষা করে না! দিনে-দিনে মাস, মাসে মাসে বৎসর—দেখতে দেখতে বর্ষচক্র বিঘূর্ণিত হয়ে ফিরে পাওয়ার মাস, বর্ষ শেষের চৈত্র-অন্তে আমাদের অতি পরিচিত পুরাতন বৎসর ১৩৭২ সনকে পশ্চাতে কালের পাতার ঘনান্ধকারে চিরকালের জন্য ফেলে নবাশা নিয়ে নূতন পঞ্জিকা নবীন বর্ষারম্ভের ঘোষণা করে ১৩৭৩ সাল এসে উপস্থিত হল এবং স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বসিত আনন্দোৎসবের মধ্যে যথাযোগ্যভাবে বন্দিত হচ্ছে। পুরাতনের সমাধির উপরই নবীনের অভিষেকের সিংহাসন চিরন্তন পাতা হয়। চৈত্র শেষের তীব্র সৌরকর জ্বালার মধ্যে রুদ্রের আগমনীর উপযুক্ত সঙ্গীত চড়কের চাকের চড়া ও কড়া আওয়াজ আজ থেমে গিয়েছে—সহস্র দিঙ্‌মণ্ডল উল্লাসের প্রবাহে পরিব্যাপ্ত করে ত্রাহ্‌ত গগন হতে প্রখর আলোক বিচ্ছুরিত করে গ্রীষ্মের ও নববর্ষারম্ভের সূচনা করে বৈশাখ এল। এই রুদ্রতেজেরই আমাদের নূতন বৎসরের বাণী বহন করে আনে—আমাদের বিশেষত্বই এই অর্থাৎ কঠোর সাধনার দ্বারা আমরা অতিমানব সিদ্ধিকে অর্জন করি। চৈত্র মাসে শুষ্ক পত্র ঝরে পড়ে আর আমরা নবপল্লবের সমুদ্গমের আশায় উৎকণ্ঠিত হই—আমরা তার স্নিগ্ধ ছায়ার আশ্রয় এবং ফলফুলে জীবনের প্রয়োজনের পরিপূর্তি আকাঙ্ক্ষা করি। অতীতকে বিদায় দিয়ে নূতনকে বরণ করবার এই চিরাচরিত রীতির ছন্দের সুখ-দুঃখের দোলায় আমাদের জীবনের ক্রীড়া চলে। যে পুরাতন বৎসর প্রতিটি স্মৃতিতে ফলে-ফুলে-শস্যে মুঠি ভরে দিয়েছিল, কাউকেও পরম প্রাপ্তিতে এবং কাউকেও বা চরম বেদনায় উন্মীলিত-নিমীলিত করেছিল, সে চড়কের চাকের সুরের সঙ্গে চিরন্তনী প্রথায় নূতনকে আহ্বান জানিয়ে একান্ত রিক্ত-নিঃস্ব ভাবে একাকী বিদায় নিয়েছে। জীবনজগতের এই বড় সত্যটাই যেন চড়কের চাকের কাঠিতে বিলাপ হয়ে বর্ষান্তের ক্ষিপ্ত রাত্রিকে অধিকতর বেদনাঘন করে তুলেছিল।

শস্যের জন্য উগ্র আদিত্য-দেবতার তপস্যা শুরু হয়েছে—কালের প্রতিবেশকে উত্তপ্ত করে মহাকাল নূতন সৃষ্টির উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। জাতির দুঃখ-বেদনার ভিতর দিয়ে আগত নিদাঘের দহন-জ্বালায় আমরা তাঁর তপঃ-প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করছি। গ্রীষ্মের সেই বহ্নিবর্ষী সৌরকর আমাদের সব গ্লানি-মালিন্য-অবীর্যকে ধ্বস্ত করে, অবলুপ্ত করে, আমাদের চিত্তকে উত্তপ্ত করে, আমাদের হৃদয়ে নবীন বল এবং বাহুতে নবশক্তি সৃষ্টি করুক!

নবসৃষ্টির উদ্দীপনাময় আবেশান্তরে আমরা নবাগত ১৩৭৩ সনকে একান্তভাবে প্রত্যুদ্গতে অভিনন্দন ও স্বাগত জ্ঞাপন করছি। বিগতকালের সকল দুঃখ-ক্লেশ, ব্যর্থতা-বিষাদ, পাপ-গ্লানি বিস্মৃত হয়ে নব-আশায়, নূতন-ভাষায় ও নবীন-উদ্যমে আমরা সকলেই নূতন পথে শুভযাত্রা শুরু করছি। প্রাত্যহিক-জীবনের একটানা যাত্রাপথে মানবের মধ্যে যে জীবন-শক্তি বিশ্রিত হয়ে আসে, নববর্ষের আবির্ভাবে তা বিদূরিত হয়, তখন সকলে পুনর্বার নবজাগ্রত উদ্দীপনায় ও উৎসাহে নূতন করে যাত্রারম্ভ করে। বস্তুতঃ নূতন বৎসরের বাণী নূতন জীবনেরই এবং নবজন্মেরই বাণী—প্রতি বৎসরারম্ভে মানব নবজন্ম লাভ করে এবং আশায়, আনন্দে, উৎসাহে ও প্রেরণায় নবকর্মে অগ্রসর হয়। ফেলে-আসা বর্ষের সব দুঃখ-ক্লেশ ও ক্ষয়-ক্ষতি বিস্মৃত হয়ে মানব-জীবনের সাফল্য-সম্ভাবনার নূতন অধ্যায় সূচনা করে। নব-বর্ষারম্ভের পুণ্যাহ-ক্ষণে আমাদের নূতন জীবনের সৃষ্টি নূতন সমাজ গঠনের এবং রাষ্ট্রকে নূতন নূতন উদ্যোগের পথে পরি-চালনার সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে। সকল অবসাদদূর করে জাতির নৈতিক-শক্তিকে আত্ম-মহিমায় সমুদ্দীপ্ত করতে হবে। জাতির কল্যাণ করে নবসৃষ্টির প্রেরণা সমাজের সকল স্তরে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হওয়ার জন্য নিজেদিগকে উৎসর্গ করতে হবে।

।।। প্রতিহারী ।।।

সমীর চট্টোপাধ্যায়

বিলাসপুর রেলওয়ে কলোনীর পদস্থ অফিসাররা থেকে শুরু করে, সাধারণ কেরাণীরা পর্যন্ত কেউই এ খবর জানতো না যে, তাদেরই আপিসের একজন নগণ্য ডেস্প্যাচার মণিময় সেনের ঘরে এমন একটি রত্ন এতদিন লুকানো ছিল।

এই কথা ভেবে তারা যথেষ্ট বিস্মিত হল যে মণিময়ের মত একজন সাধারণ শ্রেণীর লোক ; বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং উপার্জনে অতি সামান্য, সে কেমন করে ওই অমূল্যরত্নটি লাভ করল। রত্নটি হল দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের বিলাসপুর শাখার একজন নগণ্য ডেসপ্যাচার শ্রীমণিময় সেনের স্ত্রী শ্রীমতী মণিকা সেন।

কথাটা এর আগে, অর্থাৎ সেদিনের উৎসব অনুষ্ঠানের কিছুক্ষণ আগেও কেউ জানতো না। মণিময়কেই বা কে চিনতো এই বিলাসপুর কলোনীতে। কিন্তু সেদিন থেকে বড়, ছোট সকলের কাছেই বিখ্যাত হয়ে গেল মণিময়। সবাই তাকে চিনলো, জানলো, আর সেই সঙ্গে তার এই আশ্চর্য্য রকমের সৌভাগ্যে তার ওপর ঈর্ষা করল।

মণিময় জানতো যে মণিকার প্রতিভা একদিন প্রকাশিত হবেই। যে গুণের সে অধিকারিণী, তার সমাদর সে লাভ করবেই। সেই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে মণিময়েরও নাম। বিলাসপুরের সকলে মণিকার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও সমাদর করবে। সমীহ করে চলবে। তাদের কাছে মণিময়েরও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হবে।

মণিকাকে প্রকাশিত করার জন্য, তার গুণকে, তার প্রতিভাকে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য, সেদিন থেকে মনপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতে শুরু করেছিল মণিময়। তার স্ত্রী সুন্দরী এবং সর্বোপরি সে সুগায়িকা। কিন্তু মাত্র ওইটুকু বললেই সব বলা হল না তার সম্পর্কে। মণিকার মত অমন অপূর্ব কণ্ঠস্বর বড় একটা দেখা যায় না। উপযুক্ত চর্চা এবং বিকাশের সুযোগ লাভ করলে সে যে একজন বিখ্যাত গায়িকা হতে পারতো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গরীবের ঘরের মেয়ে মণিকা। কিন্তু সুন্দরী এবং অপূর্ব কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী মণিকাকে লাভ করে মণিময় নিজেকে মনে মনে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেছিল। কলকাতায় থাকার সময় মণিকার সঙ্গীত চর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছিল মণিময়। ভেবেছিল, একদিন মণিকার প্রতিভাকে বাইরের জগতে সে প্রকাশিত করবে। কিন্তু তার আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে কলকাতা ছাড়ার নোটিশ এসেছিল মণিময়ের কাছে। তারপর এই বিলাসপুরে। এখানে এসেও সেই চেষ্টা থেকে ক্ষান্ত হয়নি সে। কিন্তু বিলাসপুরে কে চেনে মণিময়কে। তার কথা কেই বা আমল দেয়।

তাই যখন বিলাসপুর রেলকর্ম্মী সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে মণিকাকে গান গাওয়াবার জন্য তাদের কর্ম্মকর্তা সমর চৌধুরীর কাছে আবেদন জানালো মণিময়, তখন সমরবাবু উপেক্ষার সঙ্গে তাকে হটিয়ে দিলেন।

—তুমি কি বলছো মণিময়! কলকাতা থেকে নামজাদা বেতার-শিল্পীরা যেখানে আসছেন, সেই আসরে তোমার সেই অখ্যাত শিল্পীটিকে আমি চান্স দিই কি করে বল?

মণিময় বলল,—প্রথমে সকলেই অখ্যাত থাকেন সমরবাবু। কিন্তু সুযোগ পেলে সেই অখ্যাত ও অনামী শিল্পীই মানুষের চোখে ধরা পড়েন। আজ যে সব নামকরা গায়ক-গায়িকারা এখানে আসছেন, তাঁরাও কি একদিন অখ্যাত ছিলেন না?

সমরবাবু বললেন,—ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁরা আর অখ্যাত নন। আজ তাঁরা দেশ বিখ্যাত। সুতরাং তাঁদের ডাক পড়া স্বাভাবিক। তোমার শিল্পীও যেদিন

নামকরা গাইয়ে হবেন, সেদিন আমরাও তাঁকে সাদরে বরণ করবো।

মণিময় বলল, সুযোগ না পেলে খ্যাতি আসবে কেমন করে সমরবাবু? তাছাড়া আমি আপনাদের রেলওয়ে আপিসের একজন ষ্টাফ। আমার কথাটা আপনি রাখবেন, এই আশা করেই আমি এসেছি!

বিস্মিত দৃষ্টিতে মণিময়ের দিকে তাকিয়ে সমর চৌধুরী বললেন,—তুমি কি বলছো মণিময়? এটাকে কি তুমি একটা ছেলেখেলা বলে মনে করো নাকি? দস্তুর মতো হায়ার অফিসাররা রয়েছেন এর মধ্যে। তাঁরা হলেন এই উৎসবের মধ্যমণি। এমন কি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস্, নটরাজন পর্য্যন্ত এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি আমাদের এই বার্ষিকীর সভাপতি। এসব চুনোপুঁটির ব্যাপার নয় হে! বড়-বড় রুই-কাতলারা আছেন এর মধ্যে। সুতরাং তোমার এই ছেলেমানুষী আপাততঃ স্থগিত রাখো।

তবু ক্ষান্ত হয় নি মণিময়, সে বলল,—আমি বলছি সমরবাবু, আপনারা বিশ্বাস করুন, খুব ভাল গায়। একবার তার গান শুনলে আবার শুনতে চাইবেন।

একজন সদস্য টিপ্পনী কেটে বললেন,—তাই নাকি হে মণিময়? গাইয়ের সম্পর্কে প্রচারের ঘটাটা যেন বেশী বলে মনে হচ্ছে? চেস্‌প্যাচোর না হয়ে ক্যানভাসার হলে তোমার উন্নতি হতো!

ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কোন উত্তর দেয়নি মণিময়। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোন রকমে একবার সুযোগ করতে পারলে তখন এই সব টিপ্পনীর উপযুক্ত জবাব আপনি হয়ে যাবে। কিছুতেই চেষ্টা থেকে বিরত হল না মণিময়। কদিন ধরে আহার নিদ্রা বন্ধ করে উঠে পড়ে লেগে গেল সে। সমরবাবুর কাছেও যাতায়াত করলো। উৎসবের কর্মকর্তাদের মন নরম করার চেষ্টা করলো সে নানা ভাবে। আপনারা এত পয়সা খরচ করে কলকাতা থেকে আর্টিষ্ট আনছেন সমরবাবু, আর আপনাদের হাতের কাছেই এমন একজন শিল্পী রয়েছেন, তাকে আপনারা সুযোগ দিলেন না।

মণিময়ের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন সমর চৌধুরী, বললেন,—কেন একশোবার বিরক্ত করছো মণিময়? আমাদের এই বিলাসপুরে অনেক ভাল শিল্পীই আছেন, সেকথা আমারও অজানা নেই। এর আগে তাঁদের নিয়ে ফাংশন যে না করি'ন এমনও নয়। কিন্তু এবারের উৎসবে তাঁদের কাউকেই আমি বলিনি। তোমার শিল্পীও নিশ্চয় তাঁদেরই সমান, সুতরাং—

মণিময় বলল, সে কথা কেমন করে আপনি জানলেন সমরবাবু? তাঁর গান তো আপনি শোনেননি। গান না শুনেই একজন গাইয়ের সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা কি উচিত?

মণিময়ের অদ্ভুত ধৈর্যের জন্য তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন সমরবাবু। এখন তাঁর কাজে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন তোলায় মণিময়ের ওপর বিরক্ত হলেন তিনি এবং সাফ্ জবাব দিলেন যে, মণিময়ের কোন আবেদনই তিনি গ্রহণ করতে সক্ষম নন এক্ষেত্রে। অফিসারদের কাছ থেকে মোটা মোটা টাকা ডোনেশান্ নিয়ে, আর টিকিট বিক্রি করে তিনি তাঁদের এবং সাধারণ শ্রোতাদের কাছে অপ্রিয়ভাজন হতে পারবেন না।

অনেক চেষ্টা এবং তদ্বির করেও সেদিন বিলাসপুর রেলপথ কর্মী সঙ্ঘের কর্মকর্তাদের মন নরম করতে পারলো না মণিময়। ব্যর্থ হয়ে সে ফিরে এল।

উৎসব দিবসে দু'খানা প্রবেশপত্র কিনে, মণিকাকে সঙ্গে করে অডিটোরিয়ামের একধারে অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর আসনে বসলো মণিময়, ভোজসভায় একান্ত অবহেলিত বিনা নিমন্ত্রণের মতো অত্যন্ত সঙ্কোচভরে।

হঠাৎ একটা খবর শোনা গেল। যা মণিময়ের কাছে একান্ত অভাবনীয় আবার কাম্যও। গাড়ীর গোলমালের জন্য কলকাতার শিল্পীদের আসতে কিছু বিলম্ব হবে। সুতরাং—।

মাইকে বারবার ঘোষণা করা হ'ল কথাটা। সুতরাং মাননীয় ও মাননীয়াগণ, আপনারা ধৈর্য্য সহকারে মাত্র অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন। ইতিমধ্যে আপনাদের আনন্দদানের ব্যবস্থা করছি।

স্থানীয় শিল্পীদের অনুরোধের পালা শুরু হ'ল। সেই সঙ্গে মণিময়ের খোঁজ পড়লো। তাকে গ্রীণরুম থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন সমরবাবু। দয়া করে একবার যেন মণিময় তাঁর সঙ্গে এখনি দেখা করে।

গ্রীণরুমের মধ্যে প্রবেশ করলো মণিময়। তাকে দেখে সমরবাবু এগিয়ে এলেন, বললেন, কিছু মনে করো না ভাই! তোমাকে একটা রিকোয়েষ্ট,—মানে তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে। আশা করি তুমি তা রাখবে।

অনুরোধটা যে কি, তা বুঝলো মণিময় তৎক্ষণাৎ। এঁদের এই বিপদকালে মণিকাকে দিয়ে গান গাওয়াতে হবে। এই কথাটাই বলতে চান বোধহয় সমরবাবু।

মণিময় বলল,—বলুন।

মণিময়ের একটা হাত ধরলেন সমর চৌধুরী, বললেন, তোমার সেই আর্টিষ্টকে আনাবার ব্যবস্থা করতে হবে মণিময়, না হলে—।

নাহলে যে কি হতে পারে, সে ঘটনার আভাস কিছু কিছু পাচ্ছিল মণিময় এই গ্রীণরুম থেকেই। বাইরে অডিটোরিয়ামে যথেষ্ট শান্তি বিরাজ করছে না। শ্রোতারা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন। ওই সংবাদ ঘোষণা হওয়ার পর দু'একটা কঠিন মন্তব্যও ভেসে আসছে শ্রোতাদের মধ্য থেকে! পদস্থ অফিসাররা চিন্তিত মুখে ঘোরাফেরা করছেন। স্বয়ং মিঃ নটরাজন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করছেন, মাত্র অল্পক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করে থাকার জন্য।

মণিময় সম্মত হল, বলল,—শিল্পী আমার সঙ্গেই আছেন। আপনারা তাঁর নাম ঘোষণা করুন। আমি তাঁকে ডায়াসে নিয়ে যাচ্ছি।

সমরবাবু উৎসাহভরে বললেন,—বেশ! বেশ। আমি এখনি তাঁর নাম মাইকে ঘোষণা করছি। এই কথা বলে তাঁর রাইটিং প্যাডের ওপর ফাউন্টেনপেনটা ধরে বললেন,—নাম?

মণিময় বলল,—লিখুন, শ্রীমতী মণিকা সেন।

খস্ খস্ করে নামটা লিখে নিতে গিয়ে পরক্ষণটার কাছে ঠেক্ খেলেন যেন তিনি, আর সেই সঙ্গে অবাক চোখে দেখলেন মণিময়ের মুখের দিকে, বললেন,—তাই নাকি, ইনি···

গর্ব্বভরে বলল মণিময়, আজ্ঞে, আমার স্ত্রী।

—তাই নাকি! সচকিত হলেন সমর চৌধুরী একেবারে স্বয়ং তোমার গিন্নী? তা বেশ! তা বেশ! অত্যন্ত সুখী হলাম মণিময়!—আই ওয়ান্ট মাচ্ এন্‌থিউসিয়াম্! অথচ এটাই আজকাল আমাদের সব থেকে অভাব। দিস্ ইজ মোষ্ট নীডফুল।

নাম ঘোষণা করার জন্য ডায়াসের দিকে এগিয়ে গেলেন সমর চৌধুরী। মণিকার কাছে এসে তাকে কথাটা বলল মণিময়। কিন্তু এভাবে গান গাওয়ার আগ্রহ মণিকার নেই। সে বলল—নাইবা গাইলাম। এতে তোমার মান কি বজায় থাকবে? আগে তোমার কথা কানেও তোলেনি, এখন বিপদে পড়ে ডাকতে এসেছে।

মণিময় বলল,—এখন তুমি গান গাইলে আমার মান আরও বাড়বে মণিকা! নাহলে আমারও খুব একটা আগ্রহ ছিল না এভাবে তোমাকে দিয়ে গান গাওয়ানোর। কিন্তু আজ তোমাকে গাইতেই হবে।

গান শুরু করল মণিকা। অডিটোরিয়ামে শ্রোতার আসনে বসে লক্ষ্য করল মণিময়, শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত করতালি, বারবার আর অনুরোধের উপর অনুরোধ। পরপর পাঁচখানা গান গেয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠে এল মণিকা ডায়াস্ ছেড়ে।

গ্রীণরুম থেকে ডাক পড়লো মণিময়ের। ভেতরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন সমরবাবু।

গ্রীণরুমের দরজায় উপস্থিত হতেই মণিময়ের হাতদুটো জড়িয়ে ধরলেন সমরবাবু, বললেন,—ওয়াণ্ডারফুল! সত্যি, আগের ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত চন্দ্রি মণিময়! মিসেস্ সেন যে এত সুন্দর গান গাইতে পারেন, তা আমার ধারণাও ছিলনা! একজন সদস্য বললেন,—উনি যে আমাদের বিলাসপুর কলোনীতে থাকেন, সেজন্য আমরা যথেষ্ট গৌরব অনুভব করছি!—এরপর আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে যেন ওঁর সহানুভূতি থেকে আমরা বঞ্চিত না হই।

ওপাশে চেয়ারে বসে আছে মণিকা। তার হাতে একগোছা রজনীগন্ধা। এইমাত্র একজন অফিসার তাকে উপহার দিলেন। ফুলের গোছা হাতে ফোটা ফুলের মতই বসে আছে মণিকা। মনে মনে ভাবল মণিময়। হাঁা, আজ মণিকা পূর্ণ প্রস্ফুটিতা! তার সৌরভে বিলাসপুর রেলকলোনীর সঙ্গীতানুষ্ঠান আজ পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মণিকার চারিধারে সকলে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। সকলে দেখা করতে আসছে তার সঙ্গে। সে আজ দর্শনীয় হয়ে উঠেছে সকলের কাছে।

বারংবার খাওয়ার জন্ত অনুরোধ জানাচ্ছে সবাই। কি খাবেন মিসেস সেন? অরেঞ্জ না লাইম? কোকাকোলা, না ক্যোয়াস্?—কিছু না? তাহলে একটা আইসড্—কোকাকোলা?—ও বুঝেছি, আপনি আর্টিষ্ট মানুষ, আপনাদের গলার যত্ন নেওয়া দরকার! বেশ, তাহলে প্রেন হট্ ড্রিঙ্ক?

মণিকাকে কিছু খাওয়াবার জন্ত যেন রীতিমত এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে একের সঙ্গে অন্তের। অবশেষে এক কাপ করে চা খেল মণিকা আর মণিময়।

ইতিমধ্যে কলকাতার কয়েক জন শিল্পী এসে পড়েছেন। তাঁদের গান শুরু হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে মণিকার গান যে পরিবেশ রচনা করেছে, যে মাদকতার সঞ্চার করেছে বিলাসপুরের মানুষের মনে, তারপর আর কেউ তা করতে সক্ষম হবে না। সেই কথাই ভাবলো মণিময়। এমনকি নামকরা বেতার শিল্পীরাও নন।

অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত মণিময় আর মণিকাকে থাকতে হল। কলকাতার শিল্পীরা সবাই চলে গেলে যখন সে আর মণিকা সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো, ঠিক সেই সময় একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল মিঃ নটরাজনের সঙ্গে। স্ত্রীকে সঙ্গে করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, পাশে তাঁর প্রকাণ্ড এম্বাসাডার।

মণিকাকে দেখে এগিয়ে এলেন মিঃ নটরাজন। দাঁড়িয়ে পড়ল মণিকা আর মণিময়। ইতিমধ্যে নটরাজনের সঙ্গে মণিকার প্রাথমিক আলাপ হয়ে গেছে। কপালে হাত ছুঁইয়ে নমস্কার করল মণিকা। মিঃ নটরাজন বললেন,—চমৎকার আনন্দ দান করলেন আজ আপনি! আর আমার একটা সৌভাগ্য যে, আমি বাংলা ভাষা জানি! নাহলে…। উচ্চৈঃস্বরে হাসলেন তিনি।

একপাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সঙ্কোচভরে হাসলো মণিময়ও। সে ভাবলো, আজ তার কি সৌভাগ্য! সামান্ত একজন ডেসপ্যাচার মণিময়, তার স্ত্রীর সঙ্গে উপযাচক হয়ে বাক্যালাপ করছেন তাদেরই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট!

—আমার গাড়ীতে আসুন, আপনাকে লিফট দিয়ে দেব! বললেন মিঃ নটরাজন।

সসঙ্কোচে মণিকার সঙ্গে গাড়ীর মধ্যে উঠে বসলো মণিময়। তারপর গাড়ীটা শূন্যে ভাসলো রাজহাঁসের মত, আর চারধারে শতদৃষ্টি ঈর্ষাভরে দেখল মণিময় আর মণিকাকে।

ক্রমে ক্রমে মণিকার গুণ-গন্ধ সারা বিলাসপুরে ছড়িয়ে পড়ল! বিলাসপুরের ঘরে-ঘরে মণিকার নাম, তার সঙ্গীতের সুখ্যাতি, আর আলোচনা। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থেকে শুরু করে বিলাসপুরের সাধারণ মানুষ পর্য্যন্ত সবাই মাতাল হয়ে উঠল মণিকার কণ্ঠ-মদিরায়।

একটার পর একটা কোন জলসাতেই বাদ পড়ে না মণিকার নাম! মিসেস সেন না হলে বিলাসপুরের কোন অনুষ্ঠানই জমে না। শুধু বিলাসপুর নয়, আশপাশের অঞ্চল থেকেও ডাক আসে মণিকার। তাদের সঙ্গে এগ্রেমেণ্টমেণ্ট করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে মণিময়।

আপিসে মণিময়ের মর্য্যাদা বেড়ে গেছে। আগের সে মণিময় আর নেই। এখন সে আর ডেসপ্যাচার মণিময় সেন নয়। সুধাকণ্ঠী গায়িকা মণিকা সেনের হাজব্যাণ্ড মিঃ মণিময় সেন। মিঃ নটরাজনের কৃপাদৃষ্টি তার পদোন্নতি ঘটিয়ে দিয়েছে। মণিময় এখন ষ্টোর একাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টে ভাল পদে বহাল হয়েছে। মাইনে ষেড্‌শো থেকে দুশো পঁচাত্তর।

সভা বা জলসায় নিমন্ত্রণ হলে মণিকার সঙ্গে যায় মণিময়ও। দর্শকের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর আসনে বসে মণিকার গান শোনে। গণ্যমান্ত অতিথি বা উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে হেসে, বিনীতভাবে আলাপ করে। সুগায়িকা স্ত্রীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শোনে দু'কান ভরে। তারপর সভা শেষে মণিকাকে সঙ্গে করে ফিরে আসে।

আজকাল মণিকার জন্ত কোন চেষ্টা, কোন পরিশ্রম করতে হয় না মণিময়কে। করতে হয় না কোন তদ্বির-তদারক। আজ যেন মণিময় অবান্তর। কোন প্রয়োজন আজ তার নেই মণিকার এই নিত্যকার জীবনে। আজ যেন সে গৌণ। মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করেছে মণিকা নিজে। বরং আজ মণিময়ের জীবনের উন্নতির জন্ত মণিকারই চেষ্টার পালা। মোটরে চড়ে সভা-সমিতিতে

বা গানের জলসায় যায় মণিময় মণিকার সঙ্গে। গান শেষে আসে মোটরে করে। মণিকার থেকে বেশ কিছু দূরে বসে থাকে সে। অন্য কারো সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তখন মণিকা। তাদের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় মশগুল থাকে।

দূরে বসে ওদের কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করে মণিময়। সেও হাসে অনেক সময়। না বুঝে, না জেনেও হাসে। কথা বলে। ওদের কথায় সায় দেয়।

একদিন সমর চৌধুরী এলেন মণিময়ের কোয়ার্টারে। একটা গানের অনুষ্ঠান হবে। কোন সভা বা জলসা নয়।

সমর চৌধুরীর নিজের বাড়ীতে। তাঁর জন্মতিথি উৎসবে মণিকার নিমন্ত্রণ। সেখানে তাকে গান গাইতে হবে। অতি অবশ্য তার যাওয়া চাই। নাহলে অত্যন্ত দুঃখ পাবেন সমরবাবু। কথাটা বারংবার জানালেন তিনি মণিকাকে।

মণিকার আজকের এই যশ, খ্যাতির মূলে সমরবাবুর অংশ বড় কম নয়। মণিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, তার সঙ্গীত প্রতিভাকে প্রকাশিত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন তিনি। আজ তাঁর এই নিমন্ত্রণ কেমন করে অগ্রাহ্য করবে মণিকা।

মণিময়ের সামনে বসে স্থির করে গেলেন সমরবাবু যে, মণিকা তাঁর বাড়ীতে গানের আসরে নিশ্চয় যাবে। নিমন্ত্রণ শেষে সমরবাবু চলে গেলেন নিশ্চিন্তমনে, সামনে উপবিষ্ট মণিময়কে যেন একরকম উপেক্ষা করেই। মণিকা তাঁর সঙ্গে এগিয়ে গেল বাইরের দরজা পর্য্যন্ত।

চুপ করে বসে থাকল মণিময়। ফিরে এল মণিকা, মণিময়কে বলল সে,—কাল সমরবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণের কথা হল, শুনলে তো? গান গাইতে হবে আমাকে।

—না, এভাবে গান গাওয়া হবে না তোমার।

আশ্চর্য্য হল মণিকা, মণিময়ের মুখ থেকে এ ধরণের কথা শুনে।

—কেন? জিজ্ঞেস করল মণিকা।

—বিষয়টি চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে! কোন সভা বা গানের আসর নয়, বাড়ীতে পাঁচজন বন্ধু নিয়ে তোমার গান শোনার ইচ্ছা! সে ইচ্ছাটা অন্যভাবেও পূরণ করা যায়!

—তোমার কথাটা আমি ঠিক বুঝলাম না।

—বোকা তোমার উচিত! তুমি বাজারের ভাড়া করা বাইজী নও, যে—!

কি বলছ তুমি!

—ঠিকই বলছি! তাছাড়া সমরবাবু আমাকে অপমান করেছেন!

—তিনি তোমাকে অপমান করেছেন! কেন?

—আমার সঙ্গে কোন আলোচনা না করে, আমাকে উপেক্ষা করে তোমাকে তাঁর বাড়ীতে গান গাইতে বলেন তিনি কোন সাহসে?

—কি যা-তা বলছ! সমরবাবুর সম্পর্কে এ'সব ধারণা তোমার মনে আসে কেন? তিনি আমার যথেষ্ট হিতৈষী। তাঁর আন্তরিক চেষ্টাতেই আজ আমার···

—চুপ করো! যেখানে আমি যাব না, সেখানে তোমার যাওয়া হতে পারে না! তাঁকে বলে দাও যে, তোমার শরীর ভাল নেই!

—না, তা হয় না! আমি সমরবাবুকে কথা দিয়েছি। এখন আমাকে যেতেই হবে।

—কিন্তু যেখানে আমার নিমন্ত্রণ হয়নি, সেখানে তুমি একা···।

—বিরক্তি ভরে বলল মণিকা,—ছেলেমানুষের মত কথা বলছ! সব তাতেই তোমার রাগ আর অভিমান! সব জায়গাতে আমার সঙ্গে তোমাকেও থাকতে হবে, এমন কি কথা আছে? এখানে আমার একার নিমন্ত্রণ যখন, তখন আমি একাই যাব!

আশ্চর্য্য হয়ে মণিকার মুখের দিকে তাকাল মণিময়। সে ভাবল, একদিন তার মান অপমানের কথা ভেবে সভায় গান গাইতে রাজি হচ্ছিল না মণিকা। আর আজ তার মান অপমানকে তুচ্ছ করে মণিকা গান গাইতে চলেছে।

পরের দিন যথাসময়ে গাড়ী এসে দাঁড়াল মণিময়ের কোয়ার্টারের সামনে। সাজ-গোজ করে বাইরে এল মণিকা। ফিটফাট মার্জ্জিত বেশ-বাস। পরণে দামী জেকুরণ শাড়ী। খোঁপায় একটা তাজা বেলফুলের মালা। হাতে একগোছা রজনীগন্ধা।

—ভাবলাম খুনই সেব সময়বাবুর জন্মদিনে উপহার হিসেবে, কি বল? ভাল করিনি? মণিকা বলল মণিময়কে।

কোন কথা বলল না মণিময়।

—তুমি বাড়ীতেই থাকবে। কোথাও যেন যেওনা। আমি তাড়াতাড়ি করে ফেরার চেষ্টা করব।

মণিময় নিরুত্তর।

—কথা বলছ না যে? আমি যাচ্ছি, দেরী হয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে উঠল মণিময়,—না, তোমার যাওয়া চলবে না, কিছুতেই নয়!

—কি অসভ্যের মত চিৎকার করছ! ফোঁস করে উঠল মণিকা। বাইরে লোক রয়েছে, সেদিকে তোমার হুঁস নেই?—কেন যাব না? যাদের জন্য আজ আমার এই প্রতিষ্ঠা, তোমার চাকরির উন্নতি, তাদের জন্য কি আমার কিছুই করার নেই?—আজ বিলাসপুরের সবাই তোমাকে চেনে, অথচ একদিন···

একের পর এক করে মণিময়কে উপদেশ দিচ্ছে মণিকা। তাকে আদেশ করছে। তার নির্ব্বুদ্ধিতা আর ঔদ্ধত্যের জন্য তাকে তিরস্কার করছে।

মাথা নীচু করে শুনছে মণিময়। তার যশ, তার মর্য্যাদা, তার চাকরির উন্নতি···!

মণিকা চলে যাচ্ছে ঘরদোর বাইরে। একবার সব দ্বিধা আর ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ভেঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করল মণিময়। চিৎকার করে কি একটা কথা বলতে চেষ্টা করল। প্রতিবাদ করতে চাইল। কিন্তু মণিকা তখন চলে গেছে।

বোবা, বিষণ্ণ মণিময় একা ঘরে বসে আছে মণিকার ব'ড়ী ফেরার অপেক্ষায়। বসে বসে ভাবছে সে। যেন একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের সব থেকে উঁচু তলার একটি কক্ষে বাস করে মণিকা, ওই প্রাসাদের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে। আর তারই যশ, খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠার তত্ত্বাবধায়ী মণিময় ওই প্রাসাদের একজন দারপাল মাত্র।

তোমার পূজা

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

প্রভাত কুসুমে চরণে তোমার
বিশ্ব ঢালিছে অঞ্জলি:
ফুল সৌরভে তোমার পূজার
ধূপ ধুনা পড়ে উছ'লি।
আকাশের তারা সূর্য্য চন্দ্র
নীরবে নিভৃতে জ্বলিছে মন্ত্র,
তাদের শিখায়, তোমারই পূজায়
'হোমশিখা' উঠে উজলি।
বিহঙ্গ কল-কণ্ঠে তোমার
বন্দনা গীত মুখরিত:
'কিশলয়' বুকে প্রকৃতি তোমার
মহিমা করিছে অঙ্কিত।
মৌন পাহাড় করে নাম জপ,
বিমুগ্ধ চিত্তে করি অনুভব,
করিছে সাধনা, আরাধনা তব
চরণ লভিতে ফুলকলি।
নদী কলতানে সিন্ধু সলিলে
তরঙ্গে মধু ছন্দে—
তোমার পূজায় ধ্বনিছে মন্ত্র
দিকে দিকে একই সঙ্গে।
বনে বনদেবী কত মমতায়,
ফুল ফলভারে অর্ঘ্য সাজায়
হৃদি মন্দিরে তোমারই আরতি
শত প্রদীপে উঠে জ্বলি'।

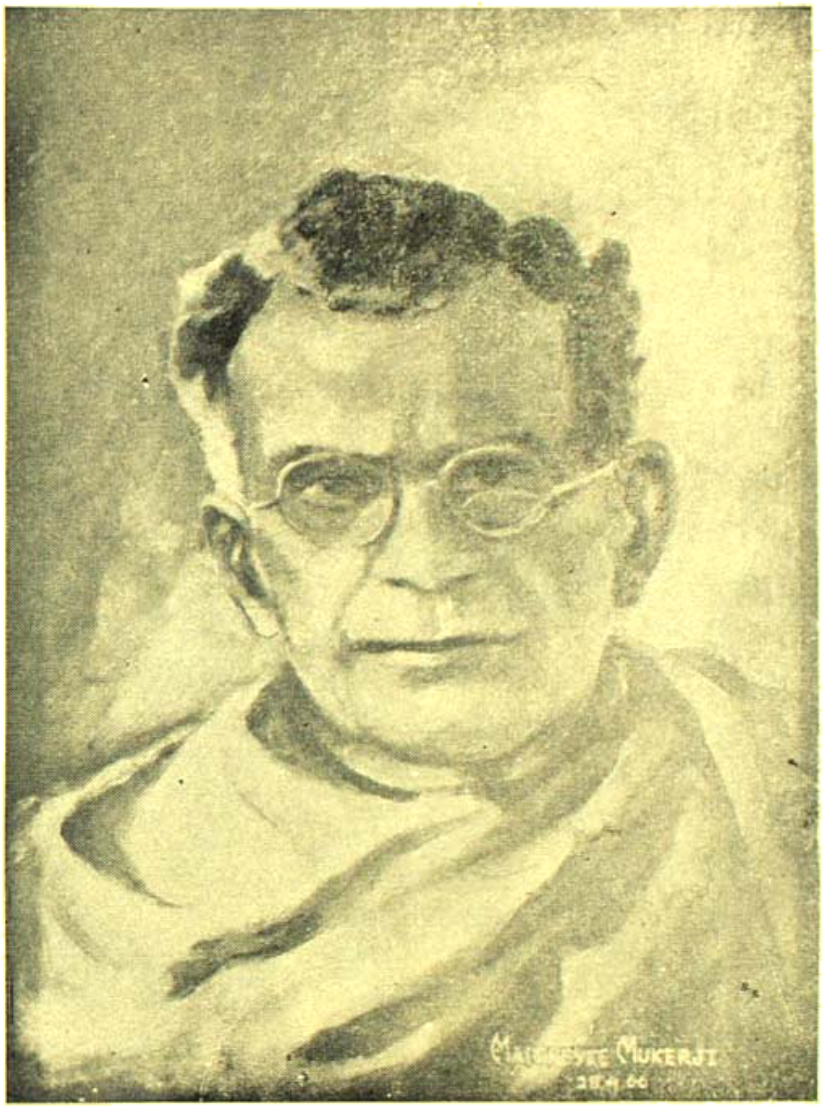

আচার্য্য নন্দলাল বসু — শিল্পী : মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী : শম্ভু রায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু—

ভারতের শ্রেষ্ঠতম শিল্পগুরু আচার্য নন্দলাল বসু গত ১৬ই এপ্রিল বিকালে তাঁহার বোলপুর শান্তি নিকেতনস্থ নিজস্ব বাসভবনে ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ৫০ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং কবিগুরু তাঁহার জীবিতকালে শান্তিনিকেতনের সকল নির্মাণ কার্য ও সাজ-সজ্জার বিষয়ে নন্দলালের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বর্তমান শান্তিনিকেতনের শুধু শিল্পচর্চা বা শিল্পাদি শিক্ষাদান ব্যাপারে নন্দলালের দান ছিল না, তিনি সর্বদা গুরুদেবের কাছে থাকিয়া শান্তিনিকেতনকে শিল্পে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ, জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত আচার্য নন্দলাল বসু বিশ্বভারতীকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান শিষ্য হিসাবে নন্দলাল ভারতের শিল্প শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন ভাবধারা আনিয়াছিলেন। এবং আজ ভারতের শিল্প শিক্ষা ও শিল্প চর্চা কেন্দ্র সমূহে তাঁহার আদর্শ সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের বাস ভবনে প্রতি সন্ধ্যায় যে বৈঠক বসিত নন্দলাল নিষ্ঠার সহিত প্রত্যেকটিতে যোগদান করিতেন এবং গুরুদেবও তাঁহার পরামর্শ মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু শান্তিনিকেতনের নহে সমগ্র ভারতের শিল্প-ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইল তাহা পূর্ণ হইবার নহে।

স্বামী অভেদানন্দ জন্মশতবার্ষিকী—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রথম যুগের অন্যতম শিষ্য ও রামকৃষ্ণ মিশনের একনিষ্ঠ প্রচারক স্বামী অভেদানন্দ ১৮৬৬ সনের অক্টোবর মাসে কলিকাতা নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেজন্য আগামী অক্টোবর মাস হইতে তাঁহার জন্মের শত বার্ষিকী উৎসব পালন করা হইবে। সংসার আশ্রমে তাঁহার নাম ছিল কালীপ্রসাদ চন্দ, সেজন্য দীর্ঘকাল তিনি কালীমহারাজ নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৩ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর কৌপীন ধারণ করিয়া সারা ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি ভারতীয় বেদান্ত দর্শনে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন ও বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাদান অভ্যাস করেন। স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মসম্মিলনে বক্তৃতার পর যখন আমেরিকায় ভারতীয় বেদান্ত ধর্ম প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করেন, তখন তিনি তাঁহার গুরুভাই স্বামী-মহারাজকে আমেরিকায় লইয়া যান। 'পঞ্চদশী' নামক ভারতীয় দর্শনের সুবিখ্যাত পুস্তক সম্বন্ধে লণ্ডনে প্রথম বক্তৃতা করিয়া কালীমহারাজ সকলের সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ২৫ বৎসর কাল ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় বেদান্ত দর্শন ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা প্রচার করিয়া ঐ দেশে এক নতুন সাড়া আনিয়াছিলেন। সেই সময় আমেরিকায় বহু বেদান্ত-মঠ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষ হইতে রামকৃষ্ণ-মিশনের বহু সন্ন্যাসী ঐ দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েকমাস বেলুড়ে থাকার পর স্বতন্ত্র ভাবে কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। প্রথমে তিনি মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের কাজ আরম্ভ করেন। আমাদের সেই সময় হইতে তাঁহার সহিত পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহার আমেরিকার শিষ্যরা তাঁহার কার্যের জন্য প্রচুর অর্থ পাঠাইতেন এবং তাহার দ্বারা তিনি ক্রমে দার্জিলিং ও কার্সিয়াং-এ দুইটি বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মেছুয়া বাজার হইতে তিনি বিডন ষ্ট্রীটে একটি বড় বাড়ী

ভাড়া করিয়া তথায় চলিয়া যান ও ক্রমে রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে জমি ও বাড়ী সংগ্রহ করিয়া তথায় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯০৯ সালে দেহরক্ষা করেন। তিনি ভারতবর্ষে প্রায় ২০ বৎসর কাল বহু গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এক নব যুগের সৃষ্টি করেন। আগামী শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যেরা নতুন করিয়া তাহার জীবনী ও রচনাবলী প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছেন—তাঁহার সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর-কাল আমেরিকাবাসের বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই, সে সকল কথা জানিতে পারিলে নূতন কর্মীবৃন্দ উপকৃত হইবেন।

নূতন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র—

ডাঃ প্রীতিকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীমিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর মেয়র ও ডেপুটি মেয়র হইয়াছিলেন। গত ২৫শে এপ্রিল তাঁহারা আবার কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। তবে মেয়র মাত্র ২টি ভোট বেশী পাইয়া ও ডেপুটি মেয়র মাত্র ৭টি ভোট বেশী পাইয়া বিরোধীদলকে পরাজিত করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় কর্পোরেশনে কংগ্রেস পক্ষের শক্তি কমিয়াছে। আমরা নূতন মেয়র ও ডেপুটি মেয়রকে স্বাগত জানাই।

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা রবীন্দ্র বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ৪ বৎসরের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, কর্মশক্তি ও সুমধুর ব্যবহার তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছে। কাজেই তাঁহার এই পুনর্নিয়োগে দেশবাসী আনন্দিত হইবেন। যৌবনে আই. সি. এস. পাশ করিয়া তিনি জেলা জজ হইয়াছিলেন। এবং নূতন দেশগঠনের পর তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের কমিশনার পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। তিনি ঐ কাজ চাকরী হিসাবে গ্রহণ না করিয়া দেশসেবা হিসাবে দীর্ঘ ১০ বৎসর সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেজন্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতী পুত্র এবং পিতার মত দীর্ঘ জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ ও অধিকতর গৌরবময় জীবন কামনা করি।

শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক—

অবসর প্রাপ্ত জেলাজজ শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক সম্প্রতি ৪ বৎসরের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মধ্য শিক্ষা পরিষদের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সারা জীবন জেলা জজের কাজের সহিত অন্যান্য বহুবিধ জনহিতকর কাজ করিয়াছেন। তিনি বাঙলা দেশের সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ কবি ৮৪ বৎসর বয়স্ক শ্রীযুদুরঞ্জন মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জ্যোৎস্নানাথের শিক্ষা বিভাগে এই পদ প্রাপ্তিতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা—

অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সুবর্ণজয়ন্তী অধিবেশন গোয়ালিয়র নগরীতে আগামী ১৪ই, ১৬ই ও ১৭ই মে

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুষ্ঠিত হইবে। বর্তমান সভাপতি শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তৃতপূর্ব সভাপতি শ্রীভি, জি, দেশ-

পাতে এবং সংসদ সমস্ত শ্রীবিষণচন্দ্র শেঠের সহিত সভাপতি পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অবতীর্ণ করেন।

আগামী ১৩ই মে তুর্কান এক্সপ্রেসে বাংলার প্রতিনিধি দল নির্বাচিত সভাপতিসহ গোয়ালিয়র যাত্রা করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা—

মার্চ মাসের প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে নানারূপ অশান্তি ঘটায় দেশবাসী ভীত হইয়াছিল। গত এক-মাসের মধ্যে দেশ হইতে অশান্তি কমিয়া গিয়াছে, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি ক্রমে ক্রমে আরম্ভ করা সম্ভব হইয়াছে। চাউল ও আটার সমস্যা যায় নাই বটে কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র যেখানে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চাল ও আটা পাওয়া যাইতেছে। যাহারা কম পরিমাণ ভাত ও রুটি খাইতে অভ্যস্ত তাহাদের কষ্ট না থাকিলেও দেশের অধিকাংশ লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। দেশে খাদ্যোৎপাদন না বাড়িলে খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে না। সরকার এবার অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য কিছু চেষ্টা করিতেছেন বটে কিন্তু জনসাধারণ সে বিষয়ে এখনও উদাসীন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯বৎসর চলিয়া গেল খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে সরকার উপযুক্ত চেষ্টা করেন নাই। বিদেশ হইতে ধার বা ভিক্ষা করিয়া চাল ও গম আনিয়া কতদিন মানুষকে বাঁচানো যাইবে? খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী না হইলে আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নহে।

যুদ্ধের ভয়—

ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে যাইয়া রাশিয়ার রাষ্ট্রনেতা কোসিগিনের মধ্যস্থতায় পাকিস্থান-নেতা আয়ুব খানের সহিত একটা আপোষ রফা করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কয় মাস যাইতে না যাইতে চীন কর্তৃপক্ষের প্ররোচনায় আয়ুব খাঁ সে চুক্তির সর্ত্ত অমান্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেজন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমে-রিকার তাসখন্দ চুক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়াছেন। ভারত চিরদিন শান্তিকামী, কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাদ করিতে চাহে না। কিন্তু গত ১৯ বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান তাহার সহিত কোন চুক্তিতে রাজী হয় নাই। চীন এতদিন ধরিয়া এই বিবাদে পাকিস্তানকে সাহায্য করিতেছে ফলে ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিরোধ লাগিয়া আছে। ভারতকেও তাই অগত্যা বহু অর্থব্যয় করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে এবং সেজন্য অনেক প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কার্য্য ব্যাহত হইতেছে। যতদিন এই যুদ্ধের ভীতির অবসান না হইবে, ততদিন এইভাবেই চলিতে হইবে।

বিকালের মাঠ

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বিকাল হলেই চলে আসি এখানে
চারিদিকে সবুজের মহা বিশ্রাম,
মাঠের প্রশান্তিতে নিজের ছায়াছবি দেখি,
আহা, কী দৃশ্য নয়নাভিরাম!

এখানে এক নিবিড় প্রতিজ্ঞা পালনের শান্তি,
যাকে ভালবাসি তাকে যদি নাও পাই,
একটানা সবুজের বুকে মাথা রেখে
নিজেকে অলক্ষ্যে হারাতে চাই।

মাঠের আহ্লাদে আমি হয়ে যাব লীন
জীবনের শেষ সাধ ছড়িয়ে যাবে
ঘাসে ঘাসে,
আমি ডুবে যাবো তার শান্ত বিশালতায়
হৃদয় মুক্ত হবে বৈরাগ্যের আস্বাদে।

আমার হিংসার পৃথিবী দূরে সরে যাবে
আমার রামধনু মন ভালবাসা
ফিরে পাবে।

বিশ্বভারতী ও বৌদ্ধভাবধারা

সুধাংশুবিমল বড়ুয়া

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার সঙ্গে বিশ্বভারতী এক নিবিড় যোগসূত্রে গ্রথিত। তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে আদর্শ ও ধ্যানধারণাকে প্রকাশ করেছেন, বিশ্বভারতীতে সে আদর্শকেই রূপায়িত করতে চেয়েছেন। বস্তুত বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বাণীসাধনার সংহত মূর্ত প্রতীক। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শও যে বৌদ্ধ ভাবধারার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছে তাই আমার বর্তমান আলোচনার বিষয়।

শান্তিনিকেতন আশ্রম তথা বিশ্বভারতীর মূলে রয়েছে প্রধানত প্রাচীন ভারতের তপোবনের অনুপ্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে তপোবন তিনি ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পান নি, পেয়েছেন কবির কাব্য থেকে (১) কিন্তু বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলে একমাত্র কবির কাব্য থেকে পাওয়া তপোবনের আদর্শ নয়, সত্যকার ইতিহাসের প্রেরণাও শক্তিয় ছিল। এই ইতিহাস প্রধানত বৌদ্ধযুগের ইতিহাস। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় তথা বৌদ্ধ ভাবধারার দ্বারা বিশ্বভারতী বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তা ছাড়া তপোবনের কথা বলতে গিয়েও রবীন্দ্র-নাথ বৌদ্ধযুগের কথা স্মরণ করেছেন—

> "...বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে, নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে, কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো বড়ো যুগ চলে গেছে, বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগ, সে দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবনে কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন; রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায় নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল" (২)

বাস্তবিকই বৈদিক ঋষিদের মত ভগবান বুদ্ধও নিভৃত বনচ্ছায়াতেই তাঁর সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। গিরিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে যেমন তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন গয়া, রাজগৃহ, ঋষিপত্তন মৃগদাব, সংকুল পর্বত (বিহার), পারিলেয়ৎ বন (মির্জাপুর), সুংসুমার গিরি (চুনার), চালিয় পর্বত (বিহার), শ্রাবস্তীর জেতবন প্রভৃতি স্থানসমূহে। এর থেকে অনুমান করা যায় নিভৃত বনভূমি কিভাবে তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয় ও বৌদ্ধ ভাবাদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণদান উপলক্ষে তিনি বলেছেন,—

> "য়ুনিভর্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা, বিক্রমশিলা, তক্ষশিলায় বিদ্যায়-তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কালনির্ণয় এখনো হয়নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, য়ুরোপীয় য়ুনিভর্সিটির পূর্বেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে। তার পূর্ববর্তী কালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, এ কথা সুনিশ্চিত। সমাজের সেই সর্বত্র-পরিকীর্ণ সাধনাই পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূত রূপে এক সময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল।...সে যুগে সে বিদ্যার মহৎমূল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল; তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতায় কেন্দ্রীভূত করে সর্বজনীন জ্ঞানসত্র রচনা করবার ইচ্ছা স্বতই ভারতবর্ষের মনে সমুদ্ভূত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ একদিন যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন সে ধর্ম তার নানা তত্ত্ব, নানা অনুশাসন, তার সাধনার নানা

১। আত্মপরিচয় ৬
২। তপোবন, শিক্ষা।

প্রণালী নিয়ে সাধারণচিত্তের আন্তর্ভৌম স্তরে প্রবেশ করে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন যেন প্রবলভাবে কামনা করেছিল এই বহুশাখান্বিত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে উৎসরূপে উৎসারিত করে দিতে সর্বসাধারণের স্নানের জন্য, পানের জন্য, কল্যাণের জন্য"।১

বিদ্যার মহৎমূল্যকে ভারতবর্ষ কোনদিন অস্বীকার করে নি। অতি প্রাচীনকাল থেকে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের শিক্ষার ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু বিদ্যার ক্ষেত্রেও বৌদ্ধযুগের একটি বিশেষত্ব আছে। এ যুগে বিদ্যাশিক্ষা সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হবার বিশেষ সুযোগ লাভ করেছে এবং বিদ্যায়তনগুলিও সত্যকার সর্বজনীন জ্ঞানমন্দিরে পরিণত হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে আমাদের দেশে যে গুরুগৃহ প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানে মাত্র অল্পসংখ্যক ছাত্র একজন গুরুর নিকট অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করত। সেজন্য দেখা যায় বৌদ্ধ সঙ্ঘের সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা যে বৃহৎ বিদ্যায়তন সমূহ গড়ে উঠেছে, ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় তা সম্ভব ছিল না। (২) তা ছাড়া ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে বিদ্যাশিক্ষা সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণের স্বার্থ-বুদ্ধি একদিকে যেমন ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়কে বিদ্যাশিক্ষার স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে আবার অনেক-ক্ষেত্রে বিদ্যাকে নিজেদের 'প্রভুত্বরক্ষণীরূপে' নিযুক্ত করেছে। (৩) রামায়ণে শূদ্র শম্বুকের মধ্য দিয়ে এসকল বঞ্চিত ও নিগৃহীত মানবাত্মার করুণ আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে।

বৌদ্ধযুগের বিদ্যায়তনসমূহ সকল দেশের অভ্যাগতের জন্য উন্মুক্ত ছিল। পৃথিবীর দূর-দূরান্তের বিদ্যার্থীরা এসে এখানে তাঁদের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করতেন। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে এমন কোন আন্তর্জাতিক বিদ্যায়তনের কথা জানা যায় না। আর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে যে তপোবনের কথা বলেছেন সে তপোবনকে 'বিশ্ববিদ্যাপ্রাঙ্গণ' বলা যায় কিনা সন্দেহ। এদিক থেকে দেখতে গেলে বিশ্বভারতীর সঙ্গে বৈদিক ঋষির তপোবন নয়, নালন্দা প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়েরই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লক্ষ্য করেছেন,—

"নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশবিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সেদিন অনুভব করেছিল, তার এমন সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা"।১

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর মূলেও রয়েছে এই আদর্শ। আধুনিক বিশ্বভারতীর মধ্যে প্রাচীন নালন্দাই যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। বিশ্বভারতীর জ্ঞানের অন্নসত্রও আজ দেশবিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য উন্মুক্ত। বিশ্ব-ভারতী নামের মধ্যেও এই ইংগিতটুকু স্পষ্ট ধরা পড়ে। আর বিশ্বভারতীর কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার উচ্চারণ করেছেন এই বাণী,—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' যেখানে সমগ্র বিশ্ব একনীড়ে ঠাঁই পাবে। ১৯২১ সালে (৮ই পৌষ, ১৩২৮) বিশ্বভারতী পরিষদ্-সভার প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণের উপসংহারে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেন,—

"পূর্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা-সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী করে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতীরূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে"।২

এই উক্তি থেকেও বুঝতে পারা যায় বিশ্বভারতী কিভাবে প্রাচীন বৌদ্ধ বিদ্যায়তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধ ভাবধারার দ্বারা বিশ্বভারতী কি ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি উক্তি থেকে আরও স্পষ্ট প্রমাণিত হবে।—

"আধুনিক কালের পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হ'য়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষা।

২। R. K. Mookerji, Ancient Indian Education (2nd ed.), P. 460

৩। বঙ্কিমচন্দ্র, সাম্য (শতবার্ষিক সং), পৃঃ ৭।

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষা।

২। বিশ্বভারতী, পরিশিষ্ট

মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। মানুষ বিশ্ব-ব্যবহারে আজ পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, একথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সত্য সাধনার পূর্ব পশ্চিম নেই। বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীনদেশে গিয়ে মানব-চিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এশিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্যসাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে।"১

আরেক জায়গায় বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বুদ্ধদেব সমস্ত মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য যে সাধনা করেছেন, ভারতবর্ষের মধ্যে আবার সেই সাধনাকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। বর্তমান পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের খর্বতা, অপূর্ণতা ও চরম বেদনার দিনে এর প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশি। তাই কবি সকলের নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করেছেন যেন তাঁরা সকলে মিলে বিশ্বভারতীকে এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করার ভার গ্রহণ করেন।২

আমাদের দেশে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসাবেও বিশ্বভারতীর নাম উল্লেখ করা যায়। বিংশশতকের একেবারে গোড়ার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার শুরু হয় এবং কালক্রমে 'চীনভবন' প্রতিষ্ঠার মধ্যে এর পরিণতি লাভ করে। দেশবিদেশের বহু বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিশ্ব-ভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চায় রত ছিলেন। এঁদের মধ্যে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, রাজগুরু ধর্মাধার মহাস্থবির, আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি, অধ্যাপক লিন ও-চিয়াং, অধ্যাপক জোসেপ তুচ্চি, অধ্যাপক নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও অধ্যাপক তান য়ুন-শান প্রমুখ সুধীবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানেও বিশ্বভারতীতে সিংহল-কম্বোডিয়া, শ্যাম-ভিয়েৎনাম ও চীন-জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ শিক্ষার্থীদের সমাগম দেখতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিশ্বভারতী তথা শান্তিনিকেতনের মধ্যে বৌদ্ধযুগের নানা স্মৃতিও বিরাজিত। চীনভবনের প্রাচীন চিত্র সমূহ, 'নন্দন' সম্মুখস্থ বিরাট বুদ্ধ-মূর্তি, সঙ্গীতভবন সন্নিহিত সুজাতার প্রতিমূর্তি এবং উদয়ন ও অন্যত্র বুদ্ধমূর্তিসমূহ দেখলে সামগ্রিকভাবে প্রাচীনযুগের বৌদ্ধ সভ্যতার কথাই আমাদের মনে পড়ে। বিশ্ব-ভারতীতে বৌদ্ধযুগের ঐতিহ্য ও ভাবধারাকে সযত্নে রক্ষা করার সর্বতোমুখী প্রয়াস এ সকল থেকে অনুমান করা কঠিন নয়।

পরিশেষে একটি ঘটনার উল্লেখ করে এই প্রবন্ধের উপসংহার করি। একবার কয়াচিতে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথকে একজন ছাত্র প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনাকে ও সবাই 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করে, আপনার গুরু কে?" রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমারও একজন গুরু আছেন, তোমরা সবাই তাঁকে জান। তিনি হলেন বুদ্ধদেব"।১

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও শিক্ষাদর্শ পর্যালোচনা করলে এই উক্তির সত্যতা নিরূপণ সহজ হবে।

১। বিশ্বভারতী—৪

২। বিশ্বভারতী—১১

১। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট এই তথ্য জানতে পারি।

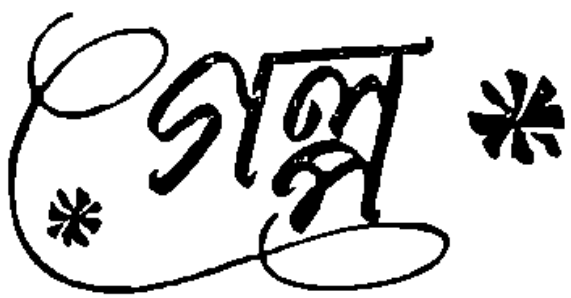

কুহু ও কেকা

শ্রীবংশী মণ্ডল

অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থাকে প্রশান্ত। একদৃষ্টে নিষ্পলক তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখে। এই প্রকাণ্ড বাড়ীটার অতল স্পর্শ নির্জনতায় সারাক্ষণ মনটা ভরে থাকে তার। কি করবে ও। ওর কাছে কেউ আসেনা। শুধু তার চার-পাশের নির্মম অন্ধকারের নিঃসীম শূন্যতা আঁকড়িয়ে ধরে থাকে সারা বাড়ীটাকে।

পাশের সাজানো বাগানে নানান ফুলের সমারোহ। কতকগুলি গাছ পালা জুড়ে বাগানটা বেশ জঙ্গলের মতই হয়ে আছে। বাড়ীর চারপাশে কোকিল ডেকে ওঠে। বসন্তে পাতা ঝরে গেলে গাছের শুকনো ডালে পাখীরা বাসা বাঁধে। কত যে রঙ বেরঙের পাখী আছে এই গাছ-গুলিতে।

রায়বংশের পুরনো বাড়ী।

শুধু এখানে থাকা খাওয়া ছাড়া প্রশান্তর কি কাজই বা থাকতে পারে? বাড়ীর প্রাঙ্গণে তুলসী গাছও বিস্তর। মাঝে মাঝে ছোট বড় আগাছার জঙ্গলও। দোয়েল পাখী সকালে বকুল গাছটার ডালে বসে। আশে পাশে একটু তাকিয়ে উড়ে চলে যায়।

সকালবেলার আচ্ছন্নতা কাটিয়ে প্রশান্ত ঘুম থেকে জেগে ওঠে। অসাড় দেহটাকে টেনে নিয়ে এ ঘর থেকে ওঘরে ঘুরে পায়চারী করে সে। জানালার গরাদে মাথা রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে চায়। দেওয়ালে ক্যালে-ণ্ডারের ছবি হাওয়ায় ওড়ে। টেবিলের ঘড়িটা জীবনের সঙ্কেত জানিয়ে টিক্ টিক্ শব্দ করে বাজে। ঝিম ঝিম রোদের কণাগুলো মাটীর ধুলোর সাথে মিশে চিক চিক করে ওঠে একবার।

পঞ্চান্ন বৎসরের পঙ্গু-জীবনটাকে কেমন যেন বিষাক্ত ও বিস্বাদ লাগে প্রশান্তর। একটা ঘর পার হয়ে অন্য ঘরে এসে পুরনো আলমারীর কাছে এসে দাঁড়ায় ও। একখানা রবীন্দ্রনাথের বই টেনে নেয় নিজের খেয়ালে। বইটা খুলে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করে সুর করে। এটা রোজকার অভ্যাস ওর। কাছে কেউ এলে তার সাথে গল্পও করে কিছুক্ষণ।

সকালবেলার মাছরাঙার ডাক, ঠাণ্ডা হাওয়ার দির দিয়েনী, কোকিলের অশান্ত কূজন ওর মনে অতীতের কোন এক বিস্মৃত বসন্তের জাগিয়ে তোলে। ফেলে-আসা জীবনের সমস্ত কথাগুলো তার দুটি চোখের সামনে এসে ভীড় করে একবার।

প্রশান্তর স্ত্রী একটি ছেলে রেখে যারা গিয়েছিল। আজ মণিকা নেই। ছেলেটাও নেই। সে এই মণিকার স্মৃতিকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখে এই বাড়ীটাতে টিকে আছে কোন রকমে। ওকে দুবেলা টিউশানিও করতে হয়। একটা কিছু না করলে কি করে চলে মানুষের!

ছেলেটার জন্মদিনের কথা, তার মুখের মিষ্টি হাসি ও আধফোটা বুলি প্রশান্ত কিছুতেই ভুলতে পারেনি আজো। আর বুঝি পারবেও না। বুঝি তার বিচ্ছিন্ন অতীতের কালসমুদ্রের অজস্র ঢেউগুলো ওর বুকের রত্নটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সেই দিন। আজ প্রশান্ত তার জীবনের সমস্ত ভালবাসা ও বেঁচে থাকার উষ্ণ অস্তিত্ব দিয়ে সেটাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না কোনোদিনই। যে চলে যায় সে আর আসে না। কোন দিন আপরাহ্নে স্কুলের ছেলেরা ফিরতি পথে প্রশান্তর বাড়ীটার কাছে এসে দাঁড়ায়। তখন ও গান গাইছে শুন শুন করে। ছেলেরা ওর গান শুনে যে যার বাড়ীর দিকে চলে যায়।

একদিন একটি ছোট ছেলে প্রশান্তর কাছে এল। ওর গায়ে ছেঁড়া জামা। মাথার চুল উস্কো খুস্কো। দারিদ্র্যের চিহ্ন সর্বাঙ্গে। প্রথমে ছেলেটা এসে চুপ করে দাঁড়াল তার কাছে। কি বলবে ও। ওর ঘরে বিধবা মা ছাড়া

আর কেউ নেই। পরের ঘরে উপবাস থেটে দুমুঠো পেটের ভাত জোগাড় করতে হয় বিধবাকে। ছেলেটাও দুষ্টু। গ্রামের লোকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল ছেলেটার নামে। একবার মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

বিধবা কাঁদতে কাঁদতে এসে একদিন প্রশান্তকে বললে বাবা, বিনুকে তোমার কাছে রেখে দাও। ও বড় দুষ্টুমি করে, জ্বালাতন করে, মারছে সবাইকে। আর তোমার কাছে থাকলে পড়শোনাও একটু হবে। আমার কেউ নেই বাবা, দেখছো তো।

বিনু তার মায়ের কাছ হতে এসে একদিন হাজির হোল প্রশান্তর বাড়ীতে। তার নিঃসঙ্গ জীবনের পাশে এসে দাঁড়াল অসহায় ভাবে। কি আনবে ও। কিছুই তো সঙ্গে আনেনি। প্রশান্তকে কিছু দিয়ে সাহায্য করবার সঙ্গতি নেই ছেলেটার। তাই সে আজ প্রশান্তর অসহায় একাকিত্বের মাঝে একবিন্দু রঙীন আকাশের ইন্দ্রধনু যেন।

বিনু প্রশান্তর বইখাতা নিয়ে নাড়া চাড়া করে। ঘর ধোয় বাসন মাজে। দুটি খেতে পায় তার বদলে। এর বেশী তো না। সময় পেলে প্রশান্তর কাছে পড়েও। একদিন বিনু একটা পাখী নিয়ে এসে বললে—

দাদা, এই পাখীটা তোমার জন্য নিয়ে এসেছি।—প্রশান্ত ঘাড় তুলে বললে—কি পাখীরে বিনু, কই দেখি? বিনু তার ছোট্ট খাঁচা থেকে বার করলে কাল পাখীটা। ঠোঁটটা চেপে ধরে বললে—এই কোকিলটা আপনার জন্য নিয়ে এলাম। প্রশান্ত হেসে উত্তর দিলে—ঠিক আছে ভাই, ভালই হোল, আমারও পাখি টাখি বেশ ভাল লাগে। সকালে পাখিটা খাঁচায় কুহু কুহু করে ডাকে। তখন সকালের আশ্চর্য্য রোদ প্রশান্তর ঘরে একবার উঁকি দিয়ে চলে যায়। সে কোকিলটার দিকে চেয়ে থাকে। অনেক দিনের পুরনো কথা এসে জড়ো হয়।

দিন চলে যায়। সে কারো অপেক্ষায় বসে থাকে না। বেদনায় অশ্রুসিক্ত দিন, ব্যথে ব্যথে কাজ ভুলে যাওয়ার দিন, বাঁধনহারা খাপছাড়া মনের দিন, এমনি কত রকমের দিনগুলো মানুষের সবার চার পাশে এসে ভীড় করে তা কে জানে। সব সময় জানা যায় না।

গভীর নিস্তব্ধ রাত।

পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী তন্দ্রার কোলে নিমগ্ন। গাছের পাতায় জমাট বাঁধা অন্ধকার। এক ঝলক হিমেল বাতাস এসে প্রশান্তর ঘরে ঢুকল। ও তখন উপরের ঘরটায় বসে আছে টুকরো মেঘের দিকে চেয়ে। কোকিলটা একবার ডেকে ওঠে খাঁচার ভিতর থেকে। জ্যোৎস্নার চল নেমেছে সুদূর দিগন্তে। প্রশান্তর ভাঙ্গা ছাদের কানাচে ছোট্ট একটি বট গাছের চারা। মাঝে মাঝে হাওয়ায় কাঁপছে ওটা।

দোতলার এই ঘরখানি প্রশান্তর খুবই পছন্দ। ও প্রায় রোজই রাত্রে বারান্দায় এসে বসে। কোকিলটাও ওর পাশে থাকে। প্রশান্তর দুটি চোখে ঘন তন্দ্রার আচ্ছন্নতা। গভীর ঘুমও বলা চলে না একে। প্রশান্ত ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে—বারান্দায় একটু দূরে কে যেন রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। একটা অস্পষ্ট নারী মূর্ত্তি। তার শাড়ীর আঁচলটা ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ছে। উদ্ভিন্ন-যৌবনা বিরহিণী তন্বী। ওর দেহের কমনীয় পেলব সুষমা বাতাসের চারিধারে ছড়িয়ে পড়ছে যেন। ওকি, ওর চেহারা মাঝে মাঝে কাপসা লাগছে কেন। দূর আকাশে টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে রাতের চাঁদ সরে যাচ্ছে একটু করে। এ কোন পরিচয় হীনা নারীমূর্ত্তি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। চেনা যায় না। ঠিক ছায়া ছবির মত মনে হয়। কিছুক্ষণ পর নৃত্য সুরু হোল তার। মেয়েটির চটুল সন্ধানী দৃষ্টি বুঝি ঘরের মধ্যে কোন হারান জিনিষকে খুজছে হয়তো। একটু পরেই গান আরম্ভ হোল। মেয়েটি তার হাতের গোলাপ ফুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝের। আহা, লাল গোলাপ। প্রতিটি পাপড়িতে দুর্ম্মদ যৌবনের ছোঁওয়া। প্রশান্তর মনে হোল—কোন প্রবালসমুদ্রের তীর হতে এসেছে, কিংবা জলপরী হবে বোধ হয়।

প্রশান্তর ঘুম ভেঙ্গে গেল। আচ্ছন্ন ভাব কাটল তার। চোখ মুছে আকাশের পানে চাইল সে। আর ও ঘুমুবে না হয়তো। এমনি ভাবে বসেই রাত কাটিয়ে দেবে। ওর জন্য রাতও বসে থাকবে না।

প্রশান্ত হাতের বইটা জোরে বন্ধ করে টেবিলের ওপর রেখে দেয়। মনের সুর কেটে যায় তার। এমন ভাবে

বারো মাস এখানে থাকাটা ওর পক্ষে অসহ্য! অন্য কোন যায়গায় গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে এলে ভাল হয়। এই বাড়ীটার অতলস্পর্শ স্তব্ধতার সমুদ্রে ওর নিঃসঙ্গ মনটা হাবুডুবু খেয়েও কূল পায় না।

টেবিলের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে ও।

সকালে প্রশান্তর হাতে একটা চিঠি এল। তাড়াতাড়ি খামটা খুলে পড়ে কিছুটা বিস্মিত হোল যেন। বুকি এক রোমাঞ্চের শিহরণ এনে দিল ওর অবশ স্নায়ুতে। অর্পণা ওকে আসবার জন্য বলেছে। পশ্চিমের জল হাওয়া ভাল। কিছুদিন থাকলে প্রশান্তর হাওয়া পরিবর্তন হবে। মনের অভ্র ঘুমোট কাটিয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে শুধু চিঠিটার দিকে চেয়ে রইল প্রশান্ত।

ওর মনের দিগন্তে একটা খুশীর হাওয়া লেগেছে। দুটি চোখ প্রসন্নতায় দীপ্ত। ওর এক বার মনে হোল শুধু—অর্পণা ওকে কিছুতেই ভুলে যায়নি তা হলে। দীর্ঘশ্বাস বুকের পাঁজর ভেঙ্গে বার হোল শুধু।

হায় রে জীবন। হায় মানুষের সংসার! অর্পণা প্রশান্তর জীবনের অনেক খানি অংশ জুড়ে ছিল একদিন। আর আজ? আজ ওদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান এনে দিল কে? শৈশবে ওরা এক সাথে খেলা করেছে। এক সাথে এক যায়গায় লেখা পড়া স্কুল যাওয়া।

প্রশান্তর বাবা চাকুরী সূত্রে পাটনায় বদলী হয়ে এসেছিলেন। পাশাপাশি দুটি সংসার। বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেছিল ওদের মধ্যে। তখন প্রশান্ত ও অর্পণা ছোট। অর্পণার মা হাসির ছলে ওদের দুজনের বিয়ের কথা তুলেছিলেন। অর্পণাও এর কিছুটা বুঝতে পেরেছিল হয়তো।

সেদিনের মুহূর্তগুলো আর আর নেই। জীবনের হিসাব থেকে কেটে বেরিয়ে গেছে অনেকখানি। শুধু তার স্মৃতির টুকরোগুলি কোন দিন অবসন্ন মনের অন্ধকারে এক বিন্দু আলোর ঢেউ তুলে দেয়। সমস্তটা রঙীন হয়ে ওঠে মাত্র। তারপর বিস্মৃতি—তার পর ভুলে যাওয়া—তার পর সব চুপ্ চাপ। জীবনের দিন পার হয়ে যাচ্ছে। প্রাণের হিসাব এমনি ভাবেই পুঞ্জীভূত হচ্ছে।

এর পরও কিছু দিন কেটে ছিল ওদের।

পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে জীবনের কয়েকটি বসন্ত পার হয়েছিল। পরে প্রশান্তর বাবার চাকরীতে রিটায়ার করবার নোটিশ এল। প্রশান্তর মা ও বাবা পাটনা থেকে বাংলা দেশে চলে এলেন। অর্পণার বিয়ে হোল আর এক-জনের সঙ্গে। সেটা তার ভাগ্যে সইল না। অর্পণা বিধবা হোল।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত জীবনের অনেকগুলি সময় পার করে এসেছে অর্পণা। এতদিনের ফাঁকটাকে কি দিয়ে ভরিয়ে তুলবে সে। এমন কি দুর্লভ বস্তু থাকতে পারে পৃথিবীতে যা দিয়ে কিছুকালের জন্য তার শূন্য নারী-হৃদয় একবার পূর্ণ হয়ে উঠবে!

সেকি হয়? তা কখনই হয় না। প্রশান্তর স্ত্রী নেই। অর্পণার স্বামী নেই।

প্রশান্ত বিহুকে নিয়েই বা কেমন করে এই বাড়ীটায় বাস করবে। ওর কাছে থেকেও বিহুর মনের স্বভাব একটুও বদলায়নি। কাজ ফেলে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়ান ওর স্বভাব। টো টো করে রোদে ঘুরে স্নান করে ঠাণ্ডা লেগে জ্বরে ধরল বিহুকে। বেশ কিছুদিন ভুগল। প্রশান্তর সেবা যত্ন সত্ত্বেও ছেলেটা বাঁচল না। মাস খানেকের পর মারা গেল বিহু। বিহুর মা এসে অনেক কাঁদলে। কি করা যাবে। উপায় তো নেই।

প্রশান্ত বিহুর মাকে বললে কয়েক মাসের জন্য বাড়ীটা আগলিয়ে থাকতে। তালা চাবি ওর কাছেই থাকবে। শুধু থাকা খাওয়া দেখা শোনা করা।

একটা দিন ঠিক করে প্রশান্ত পাটনায় চলে এল বিহুর মায়ের হাতে ঘরের ভার দিয়ে। অনেক দিন পর হঠাৎ প্রশান্তকে দেখে বিস্ময় ও উল্লাসে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অর্পণা। কি বলবে সে। শুধু এক ফোঁটা আত্ম-তৃপ্তি ও আত্মজিজ্ঞাসার ছোঁওয়ায় ওর চোখ দু'টো ছল্ ছল্ করে উঠল কিছুক্ষণের জন্য। অর্পণা বললে—বহুদিন পর আমার কাছে এলে প্রশান্তদা? তা হলে আমার চিঠি পেয়েছিলে নিশ্চয়? প্রশান্ত অভিভূতের মত চেয়ে রইল শুধু। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে অর্পণা অস্ফুটে বললে—তুমি কি রোগা হ'য়ে গেছ। ছেলেবেলায় তোমার শরীর

কেমন মোটাসোটা ছিল। আর আজ একি হয়েছে তোমার? প্রশান্ত নিরুত্তর।

এখানে অর্পণার নিঃসঙ্গ জীবন। ঘরে কেউ নেই। মা বাবা অনেক দিন গত হয়েছেন। বিধবা হবার পর সে এই বাড়ীটাতেই থাকে। এখানকার গার্লস স্কুলের মিষ্ট্রেস অর্পণা। যা পায় একটা পেট চলে যায়।

কুয়াশার আবেশ ছড়িয়ে পশ্চিমের সন্ধ্যা নেমে আসে। প্রশান্ত অর্পণার পাশে বসে থাকে। লঘু চপলছন্দে আকাশে মেঘ ভেসে যায়।

একদিন অর্পণা বললে—চল না পাহাড়তলী দিয়ে আমরা বেরিয়ে আসি। চমৎকার যায়গা, ভাল লাগবে তোমার। প্রশান্ত অর্পণার কথায় রাজী হয়ে বললে—হ্যাঁ, চল না।

ওরা দুজনেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। অনেক ছোট বড় পাহাড় জঙ্গল ও নদীতে ছেয়ে আছে যায়গাটা। ওরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলল। কিছুক্ষণ পথ হেঁটে এসে গেল এক প্রকাণ্ড মাঠের ধারে। মাঠটা পার হয়েই জঙ্গল। আর একটা গভীর জঙ্গলে এসে ঢুকল।

নির্জ্জন অরণ্যভূমি।

সৃষ্টির বুকে বসন্ত নেমে এসেছে কুসুমের পণ্যসম্ভার নিয়ে। চারিদিকে ফুটন্ত ফুল। প্রশান্ত বললে—কি সুন্দর যায়গা এটা বলতো?—

অর্পণা মিষ্টি হেসে প্রশান্তর দিকে চেয়ে বললে—বেশ সুন্দরই তো। একটু থেমে প্রশান্ত বললে—আমার কোকিলটাকে ফেলে এসেছি অর্পণা। হয়তো সে আমার ঘরে নির্জ্জনে চীৎকার করে ডেকেই চলেছে। এখানে পাখীটা নেই। বিহগও নেই। বুঝি কোন নিরুদ্দেশের পথে ডানা মেলে উড়ে চলে গেছে তারা। চারবংশের বাড়ীতে ওদের কোন অস্তিত্ব নেই আজ। অর্পণা বললে—ওই দেখ, গাছের ফাঁক দিয়ে আর একটা কোকিল ডাকছে। প্রশান্ত অর্পণার হাত ধরে ঝরণার দিকে নেমে এল নীচের চালু জমিতে। পিছনে অনেক পথ ফেলে এসেছে তারা। ফিরে যাওয়ার রাস্তাও হারিয়ে গেছে।

ঝরণার জল পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে। চারদিকে সবুজ বনস্থলী। পাতার ফাঁকে আবার গোটা দুই কোকিল ডাকল। প্রশান্তর দৃষ্টি চলে গেছে দূর দিগন্তে। তার উদ্‌ভ্রান্ত অসংযত মনের বেদনা বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে আজ। কিন্তু ওরা আরো এগিয়ে চলল।

সামনে অজস্র ফুটন্ত ফুল। জীবন্ত লাল গোলাপ। ডালে ডালে পাখীরা ডাকছে। আজ স্থলে জলে আকাশে বাতাসে ও হৃদয়ের আনন্দ বেদনার গোপন গহনে কে এক অব্যক্ত প্রাণের শিহরণ তুলছে। তার সাথে বসন্তের কোকিল, খাপছাড়া মনের বাঁধনহারা কোকিল একযোগে উড়ে আসছে—ছুটে আসছে, ডেকে উঠেছে—কুহু—কুহু—কুহু—কুহু।

পার্ব্বত্য ঝরণার মৃদু কলধ্বনি, উচ্ছৃঙ্খল বনহংসীর অদ্ভুত চীৎকার, পাখীর ডাক। তিনি মাহের সকরুণ আর্ত্তনাদ সবই এক যোগে বাতাসের চারিধারে ছড়িয়ে পড়ছে যেন।

অর্পণা প্রশান্তর হাতখানি তার বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললে—কি দেখছ প্রশান্তদা? প্রশান্ত জবাব দিল—যা দেখছি সবই ভাল লাগছে। অর্পণা প্রশান্তর গায়ে একটু হেলান দিয়ে বললে—ভাল লাগার জন্যই তো তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। প্রশান্তও অর্পণার বাঁ হাতটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে হেসে বললে—নিশ্চয়ই, সে তো বটেই। প্রশান্ত নীরব। কিছুক্ষণ নিজের মনে ও কি একটা চিন্তা করে বললে—আমরা কোন স্বপ্নলোকের মধ্যে পা ফেলে চলেছি অর্পণা?

অর্পণা নিরুত্তর।

একটা চমৎকার ছবি প্রশান্তর সামনে ফুটে উঠল যেন। সে তার সমস্ত শক্তি সংহত করে দূরের পানে চেয়ে দেখল—শুধু জল। অজস্র জলপ্রবাহ একখানি শ্বেত-পদ্মের মৃণালে সংহত হয়েছে। তার মাঝে প্রস্ফুটিত পদ্মের লীলা বিলাস। সবুজ স্নেহের মত সমস্ত জলরাশি তার চোখের সামনে টল্‌টল্ করে উঠেছে। আর তার সাথে কোন শতদলবিহারিণী বনহংসীর দেহে ও মনে জেগেছে এক অলৌকিক আনন্দের অব্যক্ত ছন্দমিথুন তা কে বলবে।

প্রশান্ত কিছুক্ষণ পর ঘুরে দাঁড়াল একবার। এক অনাস্বাদিত উল্লাস ও বিস্ময়ের আভাস ওর দুটি চোখে। অর্পণাও উৎসুক দৃষ্টি মেলে ওর পাশে দাঁড়িয়ে। এটা ওদের জীবনে ঘটেনি কোনদিন। দুর্ব্বোধ্য নারীচিত্তের

প্রদোষিকায় প্রশান্তর বিস্ময় কাতর মন একটু বিচলিত হয়নি তা কে জানে।

বেলা নেই। ওরা দুজনে আবার ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। আস্তাচলগামী সূর্যের রক্ত রঙে আকাশ রক্তবর্ণ।

গতদিনের চিন্তায় প্রশান্তর মন মেঘাচ্ছন্ন ও আকুল। তার মনে জাগে শুধু—তবে কে এই রহস্যময়ী নারী। যে প্রতিটি মুহূর্তে, আলাপে, হাসে ও কথাবার্তায় প্রকৃতির বিস্ময়কর উদ্ঘাটিত করে দিতে পারে? অর্পণা কি তাই? বহুদিনের ব্যবধান ওদের মনের মধ্যে বহু কিছুরই পরিবর্তন এনে দিয়েছে হয়তো। দুটি হৃদয় এক হতে পারেনি মোটেই। এদের বিয়ে সম্ভব হয়নি। প্রশান্তর স্ত্রী বেঁচে থাকলে সে আরো নিজেকে সহজ ও সংযত করতে পারত আজ। প্রশান্তর ছেলেটাও বেঁচে নেই। মণিকা নিজে গেছে, কিন্তু তার ছোট্ট ছেলেটাকে প্রশান্তর কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সেইদিন।

সন্ধ্যা আসন্ন। অর্পণা তার বাড়ীর তুলসীমঞ্চে ছোট্ট একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে এল। পাশের শোবার ঘর থেকে তার স্বামীর ফটোটা খুলে নিয়ে এসে প্রশান্তর কাছে বসল মাথা হেঁট করে। ফটোর দিকে চেয়ে গলবস্ত্র হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে অর্পণা বললে—আজ উনি আমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছেন প্রশান্তদা। আমার মনের মধ্যে নেই আজ। শুধু কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল অর্পণার দুটি গাল বেয়ে ঝরে গিয়ে ফটোর কাঁচটা ঝাপসা করে তুলল।

পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল প্রশান্তর, তখন বেলা হয়েছে অনেকটা। অর্পণা বিছানার পাশে প্রশান্তর মুখের দিকে চেয়ে বললে—এখন যদি না ওঠ তবে ঘুমোও। পরে ডেকে দেব তোমায়।

কিছুটা হতাশার ঘোরে ক্ষীণ স্বরে প্রশান্ত জানাল—দূরে ওই একটা কোকিল পাহাড়ের ফাঁকে কেবলই ডাকছে শুধু—কুহু কুহু।

অপ্রয়োজনে

সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঞ্জীভূত তৃষা সাহারার
জমে থাকা অনেক হাহাকার,
আকুল প্রার্থনা হ'য়ে ফেরে
দিক্ হ'তে দিগন্তরে
এক ফোঁটা বারিবিন্দু তরে,
তবুও মেঘ জমেনা তার আকাশে
বৃষ্টি নামেনা সেখানে।
আর এখানে, বৃষ্টি নামে,
অসীম জলধি বক্ষে
অগণিত তরঙ্গের মাঝে
কোনও প্রয়োজন নেই
তবুও সে নামে
অকাতর ধারে।
সাহারার আকুল আহ্বান
উপেক্ষা ক'রে
অনাহূত সাগরের বুকেই
সে নেমে আসে,
অপ্রয়োজনে!

দৃশ্যপট

শক্তি বসাক

অনেক ক্লান্তির পর শিয়রে পাথর রেখে
আমি শুয়ে আছি একা—
ক্ষণিকের স্বস্তির আরামে;
ঘুরানো পাহাড় আর নাম জানা অথবা বেনামী
অরণ্য বৃক্ষের সারি চারিপাশে,
দক্ষিণে ও বামে। এসব দেখেছি ঢের;
বিবর্ণ চিন্তার শেষ নেই।
পেছনে ক্লান্তি ও ক্লেদাক্ত জীবনের বড় পার হয়ে এসেছি;
কে জানে কি আছে ভাগ্যের হাতে;
হঠাৎ আকাশ দেখতেই চমকে উঠেছি—
কেন এত বড় আকাশ এখানে?
রোজ মাথার 'পরে তোলা থাকে সুনীল আকাশ
তা নিয়ে ঘুরেছি আমি—বহুদিন পথে ও প্রান্তরে;
অথচ আজকে যেন
আকাশের বিরাট চৌহদ্দি
নতুন দিগন্ত খুলে দিল, হৃদয়ের নদী।
মনে হয় ক্লান্ত অবসরে
এমনি ভাবে হয়তো একদিন পেয়ে যাবো তাকে।

কুমার সিং

শেখরচন্দ্র সেনগুপ্ত

লাল কোলানাথের টু-সীটারে চেপে সাহাবাদ জেলার আরা শহর থেকে সোজা গিয়েছিলাম জগদীশপুরে। আমার আধুনিক মনে এই প্রাচীন স্থানের অনেক মায়া। অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আকুল কল্পনা! শত বৎসরের পুরাতন যুগচিহ্ন আকর্ষণ করেছে আমাকে বার বার। ভারতের পথ-প্রান্তে, প্রাসাদে-প্রাসাদে, উদ্যানে উদ্যানে তাই ছুটে চলতে ইচ্ছা হয়।

জগদীশপুরের উপরে আকাশ নির্মল নীল, পায়ের নীচে গেরুয়া মাটি, বাতাসে সুরভিত, সূর্যালোক অমল উজ্জ্বল।

রাজপুত বীর কুমার সিংএর স্মৃতি জড়িত আছে এর আকাশে বাতাসে। ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন তিনি। বীরত্বে, ব্যক্তিত্বে, ধৈর্যে ও তিতিক্ষায় সম্ভবতঃ ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের পরই তাঁর স্থান।

সমগ্র জগদীশপুর এবং এর আশে পাশের আরও কিছু গ্রাম নিয়ে ছিল তাঁর জমিদারী। এই বিশাল এলাকার রাজস্বও কম কম ছিল না। সমসাময়িক দলিল-পত্রাদি থেকে জানা যায়: কুমার সিংহের বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০০,০০০ টাকা এবং বৃটিশ সরকারকে তাঁর দেয় কর ছিল বাৎসরিক ১৪৮,০০০ টাকা।

জগদীশপুরে কুমার সিংহের রাজপ্রাসাদের চিহ্নমাত্র খুঁজে পেলাম না। কিন্তু ইতিহাস পাঠে জানতে পেরেছি, এখানে নাকি ছিল এক সুরম্য অট্টালিকা। ছিল অবিস্মরণীয় দৃশ্য ও শোভা, শ্বেতপাথরের স্তম্ভ ও মন্দির, রাজপুরুষগণের নয়নাভিরাম সাজসজ্জা ও মনোহর আচার-ব্যবহার।

বিলাসে বৈভবে তরপুর ছিলেন কুমার সিং। দানবীর হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল বহুদূর। প্রার্থীদের ভিড় লেগেই থাকতো তাঁর দরবারে। নিষ্ঠাবান হিন্দু কুমার সিং ধর্মকর্মেও ব্যয় করতেন অকাতরে। ব্রাহ্মণ সেবায় ও মন্দির নির্মাণে তাঁর রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নির্দিষ্ট থাকতো।

ইতিহাসের আরও অনেক সফল নায়কের মত কুমার সিংও ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু এই নিরক্ষরতা তাঁর রাজধর্মকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। আকবর, শিবাজী ও রণজিৎ সিংহের পথাঙ্ক অনুসরণে তিনিও নিজের সহজাত প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে ভাস্বর হ'য়ে উঠেছিলেন।

জাতিতে রাজপুত, ধমনীতে উচ্ছল রক্ত স্রোত নিয়ে কুমার সিং তাঁর যৌবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর দীর্ঘ-দেহ, অমিত শক্তি—জগদীশপুরের শ্রেষ্ঠ সন্তান তিনি। ঘোড় দৌড়ে, অসি চালনায়, বন্দুক নিয়ে নিশানা স্থির করাতে তাঁর সমকক্ষ অন্ততঃ সে তল্লাটে আর কেউ ছিলেন না।

অথচ, আশ্চর্য, বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক হয়েও কুমার সিং কিন্তু প্রথম জীবনে আদৌ ইংরাজ বিদ্বেষী ছিলেন না। বরং, সাহেব সুবোর সঙ্গেই ছিল তাঁর জোর দহরম্ মহরম্। পদস্থ ইংরাজ অফিসারের দল জগদীশপুরে এসে আপ্যায়িত হতেন। পাটনার কমিশনার টেলর (Taylor) ছিলেন তাঁর বন্ধুস্থানীয়।

যৌবনের প্রান্তে থেকে প্রৌঢ়ত্বের দ্বার পর্যন্ত এই ইংরাজ সাহচর্যে কুমার সিং তাঁর দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে তাঁকেই দেখা গেলো বিদ্রোহীদের নায়ক রূপে। তাঁর এই বিরাট পরি-বর্তনের পিছনে ক্রম-সঞ্চারিত কতকগুলি কারণ বর্তমান ছিল।

প্রথমতঃ, বিদ্রোহের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর কুমার সিংকে অত্যন্ত আর্থিক দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয়েছিল। তাঁর নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে তাঁর অসাধু কর্মচারীরা প্রায়ই রাজস্বের মোটা অংশ আত্মসাৎ করতো।

এ সম্বন্ধে টেলর (Taylor) স্বয়ং বলে গেছেন: Baboo is altogether illiterate and thus ever

been an easy prey to the designing and a puppet in the hands of his interested agents.

তদুপরি, কুমার সিং নিজেও হিসাব করে চলতেন না। ফলে, রাজকোষ দুর্বল হয়ে প'ড়ে। কিন্তু ইংরাজ ট্যাক্স-কলেক্টরগণ কড়ায় গণ্ডায় নিজেদের পাওনা আদায় করতে কসুর করতেন না। কুমারসিং টেলরকে তাঁর বিপক্ষের কথা জানালেন এবং ইংরাজ সরকারের কাছে আরিক সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু বার বার আবেদন পাঠিয়েও ব্যর্থ হলেন তিনি।

এই ঘটনাই ক্রমশঃ তাঁকে ইংরাজ বিদ্বেষের দিকে পরিচালিত করে।

দ্বিতীয়তঃ, এই সময় ইংরাজ সরকার ক্রমশঃ কুমার সিংহের উপর সন্দেহ-প্রবণ হয়ে উঠে। চারদিকে তখন বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্বলিত। বহু স্থানচ্যুত, অসন্তুষ্ট জমিদার তাঁদের পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ইংরাজ-নিধনে।

পাটনার উপরওয়ালাদের ধারণা বদ্ধমূল হলো, কুমার সিংও গোপনে গোপনে বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলেছেন।

কুমার সিংকে নির্দেশ দেওয়া হলো, পাটনাতে এসে কৈফিয়ৎ দিতে।

বস্তুতঃ, তখন পর্যন্ত কিন্তু কুমার সিং বিদ্রোহের স্বপ্নও দেখতে শুরু করেন নি। কিন্তু এই হঠাৎ নির্দেশই তাঁর ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিতভাবে চিহ্নিত ক'রে দিয়ে গেলো। কুমার সিং স্পষ্টতই বুঝতে পারলেন, পাটনাতে উপস্থিত হওয়া মানেই স্বেচ্ছায় ইংরাজ শত্রুর গিয়ে ধরা দেয়া। এই ঘটনারই কিছুদিন পূর্বে (২০শে জুন, ১৮৫৭) কয়েকজন 'তহেবী নেতা' পাটনাতে ইংরাজ কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বন্দী হয়েছিলেন।

এমন কি, সন্দেহ তীব্রতর হলে মৃত্যুদণ্ডও আশ্চর্য ছিল না।

তৃতীয়তঃ, এইক্ষণে বিদ্রোহের আগুন ক্রমশঃ আরা শহরকেও স্পর্শ করে। একদল বিদ্রোহী সিপাহী দানাপুর সেনানিবাস থেকে আরার দিকে রওনা দেয়। ইংরাজরা শত চেষ্টাতেও এই শহরটিকে রক্ষা করতে পারেনি।

বিদ্রোহী সেনারা কুমার সিংহের নেতৃত্ব প্রার্থনা করলো। ইংরাজদের উপর বীতশ্রদ্ধ কুমার সিং সানন্দে এগিয়ে এলেন। জগদীশপুর ত্যাগ করে আরাতে তাঁর শিবির স্থাপিত হলো।

কুমার সিং শহিদ হবার পথে এগিয়ে চললেন।

এ সেই ১৮৫৭ সালের ইতিকথা। রক্তপিচ্ছিল সংগ্রামের ইতিহাস। শত বৎসরের ইংরাজ মূল নড়ে উঠলো সবেগে। হিংস্র, উন্মত্তগতিতে বিপ্লবের দলিল গতি রক্তাক্ষর আঁকতে লাগলো। দিল্লী, বাংলা, অযোধ্যা, কানপুর, ঝাঁসী, ভরতপুর, গোয়ালিয়র, মিরাট, কলপি আর, এই আরাতে।

কুমার সিং তখন তাঁর যৌবন হারিয়েছেন। মধ্য-বয়সের সেই শারীরিক দক্ষতা আর নেই। সত্তরের কোঠা পার হতে চলেছেন। চোখের দৃষ্টি গভীর হলেও ঘোলাটে। দীর্ঘদেহ নুব্জ হয়ে পড়েছে। মুখের চারধারে বলিরেখার স্থায়ী স্বাক্ষর।

বৃদ্ধ তিনি দেহে ; কিন্তু অন্তরে তখনও নবীন। অদম্য বল যেন তাঁর দীর্ঘ দুই বাহুতে। কণ্ঠস্বরে যেন যাদু। বলিষ্ঠতায় ভরপুর যেন তাঁর প্রতিটি দৃপ্ত পদক্ষেপ। জাতীয় ইতিহাসের এক চাকল্যকর চরিত্র হয়ে উঠলেন এই পঞ্চাশি বয়সেই। তাঁর অগ্রগতি সৃষ্টি করলো ইংরাজ শিবিরে এক দারুণ অনুরণন। একধারে বার্ধক্য, অন্যধারে বিবিধ রোগ-জ্বালা—সমস্ত কিছুকেই উপেক্ষা করে তিনি অগ্রগামী হলেন।

কমিশনার টেলর লিপিবদ্ধ করে গেছেন :

"I would mention in conclusion that the Baboo is very old and now, I regret to say, so ill that it is not possible that he will live long···Old age and ill health, however, could not make him dispirited nor could they hold him check and this was all the more remarkable in view of his very daring military activities possible only for a man in full possion of youth and vigour."

কুমার ত্যাগ ক'রে এলেন তাঁর জগদীশপুরকে।

আরা শহরে বিদ্রোহীদের শিবিরে প্রাণ-চঞ্চলতার সাড়া পড়ে গেলো। তারা তাদের নেতা পেয়েছে!

নির্ভাবনায়, নিশ্চিন্তে কুমারের নির্দেশে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবে এবার।

কুমার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন বিদ্রোহীদের প্রস্তুতি। রাত ঘনিয়ে এল। আকাশে তারা, অনুজ্জ্বল ম্লান তারা। অন্ধকারের কাথা মুড়ি দিয়ে সমস্ত আরা শহর যেন সুপ্ত, শান্ত, স্থির। মধ্যে মধ্যে হিমেল বাতাসের ঝাপ্‌টা।

সেই তারকা-খচিত আকাশের দিকে চেয়ে হয়ত সেদিন দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছিলেন। ভাগ্যের ফের! না হলে, তাঁরই অন্তরঙ্গ বন্ধু টেলরের বিরুদ্ধে আজ তাঁকে অভিযান চালাতে হবে কেন?…গভীর নিমগ্নতায় কুমার সিং তাঁর পরিকল্পনা স্থির ক'রে ফেললেন।

ক্রমশঃ ভোর হয়ে এলো।

সাথে সাথে আবার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো সিপাহীদের হুঙ্কার, "জ্যাঁয়, কুমার সিং কী জ্যাঁয়!"

কাঁকা মাঠের উপর দমকা বাতাসের মত কুমার সিং তাঁর সেনাদল নিয়ে ছুটে এলেন ইংরাজদের কোষাগার লুঠ করতে। শুরু হলো তুমুল গোলাবর্ষণ! কিন্তু বন্যার জলের মত সমস্ত কিছুকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে করতে সিপাহীরা ঝাঁপিয়ে পড়লো। অল্প আয়াসেই কোষাগার বিদ্রোহীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হলো।

এরপর কুমার সিং ছুটলেন জেলের প্রাচীর চূর্ণ করতে।

ইংরাজ রক্ষীদের মৃতদেহ জমে উঠলো। শক্ত প্রাচীর মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হ'য়ে এলো।

বন্দীদের মুক্তিদানে চতুর্দিক মুখরিত।…

পাটনার ইংরাজ শিবিরে সংবাদ পৌঁছতে বিলম্ব হলো না। ক্যাপ্টেন ডানবার (Dunbar)-কে পাঠানো হলো একদল সেনাসহ। অগ্রগামী কুমারসিংহের মুখোমুখি হলেন ডানবার। আবার শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি, রণহুঙ্কার, আর্তনাদ। অশ্বারোহী কুমারসিং যুযুধের দীপ্ততায় উজ্জীবিত হ'য়ে উঠলেন যেন। হতবল ক্যাপ্টেন ডানবার শেষশয্যা গ্রহণ করলেন। লাঞ্ছিত ইংরাজ সেনা মিলিয়ে গেল দৃষ্টির অন্তরালে।

কিন্তু মুষ্টিমেয় সিপাহী নিয়ে বিশাল বৃটিশ-সিংহের বিরুদ্ধে কতক্ষণ আর সংগ্রাম চালাতে পারবেন কুমার সিং? তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ হলো। ইংরাজ সেনাপতি ভিসেন্ট এয়ার (Vicent eyre) এক বিশাল সেনাদলসহ তিনদিক দিয়ে বেষ্টন করে ফেললেন আরা শহরকে। গুলজার-গঞ্জের প্রাঙ্গণে আর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা হলো।

শিখ ও গুর্খা সেনার তীব্র আক্রমণে কুমার সিং বিব্রত হ'য়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এই ভাবে যুদ্ধ চালালে অল্পক্ষণেই তাঁর সমস্ত অনুচরই শেষ শয্যা গ্রহণে বাধ্য হবে। তাই কুমার পিছিয়ে এলেন। রক্তাক্ত আরা শহরে আবার ইংরাজ পতাকা উড়লো।

অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে কুমার সিং তাঁর জগদীশপুরে ফিরে এলেন। রাজপ্রাসাদটিকেই দুর্গাকৃতি ক'রে তুললেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন ইংরাজ আক্রমণের জন্য।

সেদিন পড়ন্ত বেলায় কামান গর্জন করে উঠলো। জগদীশপুরের ধূসর মাটি রাঙা হ'য়ে এলো। অগ্নি-গোলক-গুলি ছিটকে ছিটকে পড়তে থাকে কুমার সিংহের প্রাসাদে। কুমার সিংও দিলেন প্রত্যুত্তর। দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠলো। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। কুমার সিং বুঝতে পারলেন, দুর্গের পতন অবশ্যম্ভাবী। চকিতে স্বল্প জীবিত অনুচরসহ বেরিয়ে এলেন তিনি।

ধূলি ধূসরিত জগদীশপুরের এলাকা পেরিয়ে আবার দূরে—বহুদূরে মিলিয়ে গেলেন কুমার। বৃদ্ধের সর্বদেহ তখন কাঁপছে। আরক্তিম আকাশের দিকে চেয়ে তিনি যেন পরমপুরুষের কাছে শক্তি প্রার্থনা করলেন। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। জোনাকিরা জ্বলছে নিভছে। নীরবে রোশনাই সাজাচ্ছে। অক্লান্ত গতিতে ঘোড়া ছুটছে। কুমার সিং এগিয়ে চলেছেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।…

ইংরাজ সেনা মহাকলরবে এগিয়ে এলো।

জগদীশপুরের রাজপ্রাসাদ এক মহানুভবতায় হাহাকার করছে। প্রাচীরের প্রতিটি ইট খসিয়ে দেওয়া হলো। বিলাসের প্রতিটি সামগ্রীকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো। অবশিষ্ট সমস্ত ধনরত্নই লুণ্ঠিত হলো। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় জগদীশপুরের রাজপ্রাসাদ বিরাট এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'য়ে হাহাশ্বাসে ভরে উঠলো।…

পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে কুমার সিং থামলেন। ঘোলাটে দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাতেই তাঁর অন্তর আবার উৎসাহে পূর্ণ হ'য়ে উঠলো।…

ঐ তো সামনেই 'রোটাস' (Rhotas) এলাকা! ওখানেই স্থাপিত হয়েছে বিদ্রোহীদের আর এক শিবির। ওদের কাছেই আশ্রয় নিতে হবে তাঁকে! আবার নূতন উদ্যমে শুরু করতে হবে সংগ্রাম!...

কুমারসিং 'রোটাস' এলাকাতে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এই সময় তিনি সুযোগ পেলেই ইংরাজসেনার উপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতেন। এমন কি ইংরাজসেনার অগ্রগতি রুদ্ধ করবার জন্য 'বাদশাহী সড়কের' (Grand Trunk Road) খানিকটা উড়িয়ে দিয়েছিলেন পর্যন্ত।

কিন্তু 'রোটাস্' অঞ্চলেও কুমার সিং অধিকদিন অবস্থান করেন নি। আরও অধিক সংখ্যক সিপাহী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন 'রেওয়া' (Rewa) রাজ্যে। রেওয়ার অধিপতি তাঁর আত্মীয়। নিশ্চয় তিনি সাহায্য করবেন কুমারকে!

মির্জাপুর জেলার গভীর জঙ্গল-পথ ভেঙ্গে কুমার সিং এসে দাঁড়ালেন রেওয়ার দ্বারে।

কিন্তু তাঁকে হতাশ হতে হলো। রেওয়ার শাসনকর্তা স্বয়ং তোপ দাগাতে লাগলেন কুমারসিংহের সেনাদলের উপর।

হতাশ ক্ষুব্ধ কুমার সিং আবার ফিরে চললেন।...চলতে চলতে উপস্থিত হলেন 'বান্দা' (Banda)তে। তারপর সেখান থেকে 'কলপি' (Kalpi)।

'কলপি' তখন বিদ্রোহীদের একটি শক্ত ঘাঁটি। গোয়ালিয়র থেকে দলে দলে সিপাহীরা এখানে এসে জমায়েত হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রখ্যাত নানাসাহেবের ভ্রাতা বালারাও পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছেন এখানে

কুমারসিংকে নেতৃত্বদানের অনুরোধ জানানো হলো। এক বিশাল সেনাদলসহ নবউদ্যমে কুমার সিং 'কান্দাপুরের' (Kandhapur) ইংরাজ ঘাঁটি আক্রমণ করলেন। কিন্তু অধিকতর রণকৌশলের অধিকারী,উন্নততর অস্ত্রসহ ইংরাজ সেনা সেই আক্রমণ প্রতিহত করলো।

পরাজিত কুমার সিং ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে চললেন। অনেক পথ-প্রান্তর অতিক্রম করে উপস্থিত হলেন কানপুরে। কানপুর ত্যাগ করে লাক্ষ্ণৌতে। এখানে অযোধ্যার বালক নবাব অপেক্ষা করছিলেন তাঁরই জন্য। রাজকীয় সমাদর পেলেন কুমার সিং। 'আজমগড়ের' (Azamgarh) ফরমান দেওয়া হলো তাঁকে। আর সাহায্য করা হলো নগদ দশ সহস্র মুদ্রা।

কিন্তু অযোধ্যার আজমগড় তখন সম্পূর্ণভাবে ইংরাজদের করতলগত। কুমার সিং এই শহর আক্রমণ করলেন। কর্ণেল মিলম্যান (Milman) বাধা দিলেন; কিন্তু পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলেন।

কুমার সিং আজমগড়ের অধিকার পেলেন।

আজমগড়ের পতন ইংরাজদের মধ্যে বিস্ময় ও ত্রাসের সঞ্চার করলো। কারণ, এটি ইংরাজদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটিরূপেই গণ্য হতো। পাঠানো হলো সেনাপতি ডামস্‌কে (Dames)। কিন্তু এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ডামস্‌ও ফিরে গেলেন।

এলাহাবাদ হেডকোয়ার্টার থেকে অনুসন্ধান করা হলো, বার বার সরকার পক্ষের এই পতনের কারণ কি। এবার পাঠানো হলো লর্ড মার্ক কের (Lord Mark kerr)কে আরও একদল সুশিক্ষিত শিখ ও গুর্খা বাহিনীসহ। কিছু পাঠান গোলান্দাজও এসে শক্তিবৃদ্ধি করলো ইংরাজ বাহিনীর।

বৃটিশ কামান গর্জন করতে লাগলো। আজমগড়ের উপর চড়াও হলেন লর্ড মার্ক। শুরু হলো তীব্রতর আক্রমণ!

কিন্তু অটল অটল কুমার সিং ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দ। প্রতিটি আক্রমণের সম্মুখীন হতে লাগলেন অকুতোভয়ে।...মার্ক খবর পাঠালেন, আরও সৈন্যের প্রয়োজন! আরও এক বিশাল সেনাদলসহ আজমগড়ের রণ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন স্যার এডোয়ার্ড লুগার্ড (Sir Edward Luguard)।

কুমার সিংহের পরাজয় ঘনিয়ে এলো। আবার এক বিচিত্র উপায়ে তিনি আত্মগোপন করলেন। আবার ফিরে চললেন তিনি তাঁর জন্মভূমি বিহারের দিকে।

এই যাত্রাপথ দীর্ঘ, দুর্গম। কুমারের সমস্ত শক্তি যেন ভিল ভিল ক'রে শেষ হয়ে আসছে। বার্ধক্যের জ্বালা অনুভব করছেন তিনি তাঁর সর্বদেহে। তবু থেমে পড়লে তো চলবে না, তাঁকে যেতেই হবে! তাঁকে লড়তেই হবে! এই দেহের শেষ রক্তবিন্দু নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত

তাঁকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

হ্যাঁ, বিকল্প অবশ্য আছে! সেই বিকল্প মৃত্যু! সেই মৃত্যুরই যেন ছায়া দেখতে পেলেন কুমার!

ক্লান্ত দেহ টানতে টানতে তিনি এসে দাঁড়ালেন শিউপুর ঘাটে। সামনেই বয়ে চলেছে গঙ্গা। স্বচ্ছ, পুণ্যতোয়া নদী। তাঁকে যেন হাতছানি দিচ্ছে। স্নিগ্ধ-শীতল আলিঙ্গন!

নৌকায় চেপে গঙ্গা পার হতে লাগলেন কুমার। কল্ কল্ ছল্ ছল্ শব্দে সমুদ্রসন্ধানে তীরবেগে জলধারা ছুটে চলেছে। বুঝি কুমারকেও সঙ্গী ক'রে নিতে চায়! ... ভবের খেলা বুঝি শেষ হ'য়ে এলো। এবার শান্তি! সমুদ্র প্রশান্তি চাই তাঁর!...

হঠাৎ ইংরাজ বন্দুক গর্জে উঠলো। গঙ্গার অপর পার থেকে কে যেন নিশানা করে গুলি ছুড়েছে কুমার সিংয়ের দিকে!

ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলেন কুমার। তাঁর বাঁ হাতের দুটো আঙুল থেঁতলে দিয়ে গুলিটা ছিটকে বেরিয়ে গেছে। কুমারের দু'জন অনুচর ছুটে এলো। আঙুল দুটো চেপে ধরলো। কুমার নিষেধ করলেন। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। তাঁর রক্ত ঝরছে! বড় ঘন রক্ত! টপ্ টপ্ ক'রে ঝরে পড়ছে পাটাতনে।

নিজেরই রক্ত দেখতে দেখতে হঠাৎ আবার যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন কুমার সিং। কটি থেকে ছুরি বের করে আনলেন। এক লহমায় ক্ষত বিক্ষত আঙুল দুটো ছিন্ন ক'রে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করলেন।

কুমারের অনুগামীরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতবাক!...

আর সংগ্রাম চালাবার মতো শক্তি কুমারের ছিল না। তাঁর দলের লোকেরাও একে একে বিদায় নিচ্ছে। মাত্র দু'হাজার প্রায় নিরস্ত্র সিপাহী নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁরই জগদীশপুরে!

ইংরাজ সেনার ছাউনি পড়েছে সেখানে সারি সারি।

আহত সিংহের মতো হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কুমার সিং। যুদ্ধ হলো ক্ষণকাল!...

তাঁর প্রিয় জগদীশপুরের গেরুয়া মাটিকে লাল ক'রে কুমার যেন পরম তৃপ্তিতে সমুদ্র-শান্তিকে আলিঙ্গন করলেন।

১৮৫৮ সালের ২৪শে এপ্রিল ভোর হলো। পাখীরা বৈতালী গাইলো। বাতাসের নিঃশ্বনে কারা যেন আনন্দ প্রকাশ করলো—

কুমার সিং ফিরে এসেছেন; আর কখনও তিনি ত্যাগ ক'রে যাবেন না তাঁর প্রিয় জগদীশপুরকে।...

লালা ভোলানাথের টু-সীটারটা গর্জন ক'রে উঠলো। জগদীশপুর ত্যাগ ক'রে আবার আমি ফিরে চললাম শহরের দিকে।

রাজপুত ঐতিহ্যের সার্থক ধারক কুমার সিং। পশু-রাজের চেতনা তাঁর বক্ষে। যে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলেন, সাগর পারের ঐ সাদা লোকগুলোর ভূমিকা কি, সেই মুহূর্তেই নিজের কর্তব্য স্থির করতে তিনি দ্বিধা করেন নি।

তখন তো তিনি তাঁর যৌবন হারিয়েছেন। মধ্য-বয়সের সেই শারীরিক দক্ষতা আর নেই। সত্তরের কোঠা পার হতে চলেছেন। চোখের দৃষ্টি গভীর হলেও ঘোলাটে। দীর্ঘদেহ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। মুখের চারধারে বলীরেখার স্থায়ী স্বাক্ষর।

বৃদ্ধ তিনি দেহে; কিন্তু অন্তরে তখনও নবীন!...

অতীতের অতলান্তে ডুবতে গিয়ে আমি হঠাৎ সোজা, ঋজু হ'য়ে উঠলাম।

গাড়ী ছুটে চলেছে পূর্ণগতিতে।

জগদীশপুরের উপরে আকাশ নির্মল নীল, পায়ের নীচে গেরুয়া মাটি, বাতাস সুরভিত, সূর্যালোক অমল উজ্জ্বল।...

রবীন্দ্রনাথের "শেষ সপ্তক"-এ প্রেমানুভূতি

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ অখিল বিশ্বকে ভালবেসেছেন, কেননা, তাঁরি মধ্যে তিনি 'দুটো নয়ন মেলে' দেখেছেন অপরূপকে। বিপুল সৃষ্টির মধ্যে আবার আমাদের এই পৃথিবীকে ভালবেসেছেন তার সব খুঁটিনাটি ও ভালমন্দ নিয়ে, 'পাকে পাকে ফেরে ফেরে' ভালবেসেছেন তাকে। কারণ ভালবাসাই তাঁর ধর্ম, তাঁর সাধনা। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় যে মুক্তি তাই তাঁর সাধ্য, তাঁর পুরুষার্থ।

মহাকবির জীবনের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ "শেষ সপ্তক"-এ তাঁর পূর্বজীবনের দৃষ্টিভঙ্গী মোটামুটি বজায় আছে; কিন্তু ভাবের সমাবেশ ও বাচনশৈলী অর্থাৎ শিল্পকলার পরিপাট্যে কাব্যরূপের নবীনতা ও চমৎকারিতা ঘটেছে।

সংকীর্ণ জীবনের কারাবাস হতে উন্মুক্ত উদার মহাজীবনের মহাসাগরে পাড়ি দিতে চেয়েছে কবিচিত্ত; তার পরিচয় মেলে এই কয় ছত্রে:

'এই ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন
শুভ্র আলোকের প্রান্তরতায়।
অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন
সৃষ্টির মহাসাগরে।'(৪)

তিনি অনন্ত বিশ্ব-জীবের পূজারী; তাই সব কিছুর সঙ্গে আত্মীয়তা আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর জীবন-সাধনা। কবির কথায় এর প্রমাণ মেলে;—

'যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিন-রাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূর বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে। (ঐ)

এই হচ্ছে কবির সৃষ্টি ও জীবনের উপলব্ধি। একেই বলা যেতে পারে তাঁর জীবনপ্রেম। এই গভীর ও উদার জীবনদর্শনের জন্যেই জীবনের বহু বিচিত্র রূপের স্বীকৃতি রয়েছে তাঁর কাব্যে;—

'চার দিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।' (ঐ)

মানুষের জীবন ধারার মধ্যেও রয়েছে সেই মহাবিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশ। ভাঙা-গড়া, জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়েই তার নব নব বিকাশ:

'অতি পুরাতন প্রাণের বহির্বাসের নানা পর্দা নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন-গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা।' (ঐ)

সৃষ্টি ও জীবনের এই রূপই কবির দৃষ্টিতে সত্য; সৃষ্টিটা যেন 'নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোত'; এর একদিকে স্থিতি, অপরদিকে গতি; একদিকে পুরাতনতা, অপরদিকে নিত্য নতুনতা। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়েই তো কবি বিশেষ বিশেষ জীবনরূপের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন যেমন, তেমনি পারেন রূপান্তরতার সময় এলে তাদের বিদায় দিতে আসক্তিমুক্ত চিত্তে। তাই তো তাঁর প্রেমভাবনায় জীবনের বৈচিত্র্য ও নবনবায়মানতার উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে।

মৃন্ময়ী ধরণীর কত বিচিত্র লীলায় মুগ্ধ হয়ে কবি তার অনুরাগী হয়েছেন তা বোঝা যায় যখন তাঁর একথা শুনি:—

'চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে
সন্ধ্যার ডাঙনলাগা
খাড়া পাড়ির বনঝাউ বনে,
আষাঢ়ে দু চোখ ভরে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে
শীতের ঘুঘুডাকা দুপুরবেলায়
রাঙা পথের ওপারে,
যেখানে শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে
চরে বেড়ায় দুটি-চারটি গোরু।
(শেষ-সপ্তক—৪৬)

এই নিখিল সৃষ্টিকে যে কবির এত ভাল লাগে তার কারণ এই রূপের নিত্যনবীনতা। নিত্যকালের নবীনের আবির্ভাব হয়ে চলেছে তার মধ্যে।

বিরহই প্রেমকে নিশ্চিত বাঁচায়। বিচ্ছেদই প্রেমকে দেয় নবনবায়মান হয়ে ওঠার সুযোগ।

কবি বলছেন, একদিন বক্ষের যে-প্রেম ঢাকা ছিল 'আপনারই আলিঙ্গনের আচ্ছাদনে, 'ঢাকা ছিল তার

আপনাকে দিয়ে, যা ছিল সংকীর্ণ সংসারের পরিধির সীমায় বন্দী তা বিরহের তপস্যায় হল 'স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিময়ী', যে-প্রেয়সী ছিল, 'একান্তে, নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী' তার হৃদয়টি আসন পেল যেমন অনন্তের আনন্দ-মন্দিরে, তেমনি পেল তার অন্তরে।'

বিরহ-বেদনা সত্ত্বেও যে অনুরাগ থাকে অক্ষুণ্ণ, অচঞ্চল তাই প্রেম। অঘটন-ঘটনপটীয়সী, অসাধ্যসাধিকা তার শক্তি :

ভালবাসার সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব,
জানার মধ্যে অজানা,
কথার মধ্যে অকথা।' (ঐ—১৯)

বস্তুর স্বরূপ সত্তার সত্য পেতে হলে চাই প্রেমের দৃষ্টি ; সে দৃষ্টি লাভ হলে দেখা যাবে, যাকে চেনা গিয়েছিল বলে মনে হত তার সত্তার অনেকটাই ছিল অপরিচিত। তার দাক্ষিণ্যেই বোঝা যাবে, যাকে তুচ্ছ ও সামান্য বলে ভাবা হত সে কত মহিমময়, কত অনির্বচনীয়। যে অজানা মানুষ 'আপনার রহস্যে আপনি একাকী চলেছে' তাকে তার স্বরূপে চেনার উপায় ভালবাসা ছাড়া উপায় নেই। কবির কথা উদ্ধৃত করা যাক :—

'এমন সময় কোথা থেকে
ভালবাসার বসন্ত হাওয়া লাগে—
সীমার আড়ালটা যায় উড়ে,
বেরিয়ে পড়ে চির-অচেনা।
সামনে তাকে দেখি স্বয়ংসত্তায় অপূর্ব, অসাধারণ—
তার জুড়ি কেউ নেই।' (ঐ—১২)

অপরূপ অরূপের অধরনীয়তা প্রমাণিত হয় ধরা দেবার মধ্যেই। প্রেমে মিলনের মধ্যেও বিরহ থাকে গোপনে বাসা বেঁধে। একেই তো বলে প্রেম-বৈচিত্র্য। রূপের মধ্যে অপরূপের দর্শন পেলেই বলতে হয়—

'অচিন পাখী তুমি,
মিলনের খাঁচায় থাক—
নানা সাজের খাঁচা।
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখীর পাখায়
…ওড়ার মধ্যে।' (ঐ—১৩)

তবু উদার আকাশে থেকে থেকে বেদনাতুর স্মৃতি বিদেহ স্পর্শ দিয়ে মনকে ব্যথা উতলা করে ; সে স্মৃতি হয়তো বা ধ্বনিত হয়ে ওঠে কখনো কখনো এমনি করুণ ভাষায় :—

'এখানে ছিল হাওয়ায় ছড়ানো যে স্পর্শ,
চুলের যে অস্পষ্ট গন্ধ,
তারই একটা বেদনা লাগল
ঘরের সব কিছুতেই (ঐ—৩১)

এ যেন মনের সেই অবস্থা যখন মন বলে উঠতে চায়—

'কেন উর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে কত মনোরথ,
কেন প্রেম আপনায় নাহি পায় পথ।'

কিন্তু, তবু, প্রেমের জন্য বেদনাতেও লাগে ভালো! বেদনাকে অতিক্রম করে প্রেমের দান আর স্মৃতিই ধরে জীবনের মূল্যতাকে ভরে। সব মিলিয়ে প্রেমই জীবনের অমূল্য অক্ষর সম্পদ। প্রেমেরই কল্যাণে জীবন। কবির বহু কবিতায় সুন্দর স্বীকৃতি আছে তার।

প্রেম যে অদ্ভুত, অপরূপ সন্দেহ নেই তাতে, এমন কি, এক হিসেবে যে অসীম তাও বলেছেন কবি। তবু, অপর-দিকে সীমাও আছে তার। যে পরিবর্তন প্রেমকে ধরে নব নব রূপ সেই তাকে ধরে সীমায় বন্ধন। প্রেম সীমার মধ্যে অসীম, অর্থাৎ, সীমিত হলেও তার রূপে আভাসিত হয় সীমোত্তর ব্যঞ্জনা। কবির দৃষ্টি এমনি সুস্মিত, সুবল, নিরপেক্ষ, সত্যদর্শী ও মুক্ত। তাই তিনি প্রেমকে দেখেন তার যথাস্থানে, মর্যাদা যেন তাকে যথোচিত। তবু কিন্তু প্রেম অবুঝপনা করতে ছাড়ে না ; 'দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে' তার গরব টুটলেও পরাভব মানতে চায় না সে কিছুতেই, বোঝে না যে—

'ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে,
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে।
তাই স্পর্ধাভরে সে বলতে চায়—
…আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমাহতে দূরে যেতে পারে ?

কিন্তু সে বুঝতে চায় না যে এমনি করে ধরে রাখতে চাওয়াতেই তার সর্বনাশ, সব লীলার, সব মাধুরীর সমাপন।

এই জীবনকে ভালোবেসেছিলেন বলেই তিনি মহা-জীবনকে ভালোবাসবার প্রেরণা পেয়েছেন ; এই জীবন দিয়েই বুঝেছেন মহাজীবনের রহস্য-সৌন্দর্যকে। জীবন-সাধনায় যথার্থ জীবনপ্রেম হয়েছে বলেই তিনি আসক্ত হয়ে পড়েন নি ছোট জীবনের মোহে। তাই তো স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছেন,—

'আজ নেব মুক্তি।
সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে
নতুন পার।
তাকে জড়াতে যাব না
এ পারের বোঝার সঙ্গে।
এ নৌকায় মাল নেবনা কিছুই,
যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে। (ঐ—৪৬)

চিঠির জবাব

শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী এম-এ

বন্ধুবর সুকুমারের চিঠিখানা পাওয়ার পর থেকেই মনটা কেমন-একটা বিস্বাদে ভ'রে গেল। সারাদিন কোন কাজ-কর্মে আর মন বসল না। কেবলই মনে হতে লাগল—যাদের সংগে এতদিনের মেলামেশা তারা আমায় এমন ভুল বুঝলে!

নৈশভোজন কোনরকমে সেরে শয়নকক্ষের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে অবিলম্বে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রলাম। কত কি ভাবতে ভাবতে অবশেষে নিদ্রাহীন চক্ষে যেইমাত্র একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে, অমনি সবিস্ময়ে অনুভব ক'রলাম কে যেন ধীরে ধীরে এসে আমার মশারীর পাশে পা ছড়িয়ে বসলে।

গা'টা তৎক্ষণাৎ ভার হয়ে উঠলো। মনের মধ্যে ইচ্ছা হোল একবার জিজ্ঞাসা করি—কে? কিন্তু কোন কথাই মুখ দিয়ে বেরোল না। চোখ বুঁজে নিঃসাড়ে শুয়ে আছি এমন সময় একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এসে পৌঁছলো,—ঘুমুলে নাকি?

সাহসে ভর কোরে পিঠ্-পিঠ্ বলে উঠলাম—না-না ঘুমাব কেন? চোখ বুঁজে একটা কথা শুধু ভাবছি।

কি কথা?

—ভাবছি,—আমার আমি বিয়ে করেছি কি না—এ-কথা সুকুমার আমার কাছে জানতে চেয়েছে কেন?

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে স্মিতহাস্যে সে বললে—তা' বুঝি জান না?

—কি ক'রে জানবো বল? পাঁচ-ছ বছর হোলো আমি ত দেশ ছাড়া।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগের পর সমবেদনার স্বরে সে বললে—দেশ ছেড়ে আসার পর থেকে তুমি বড় কষ্টে আছ, না?

—তার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই। ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখেন তাই-ই হাসিমুখে মাথা পেতে নিতে হয়।

—আচ্ছা, তোমার বন্ধুবান্ধবেরা কি রকম লোক বল ত?

—কেন, বল দেখি?

—মিছে মিছে তোমার নামে একটা কুৎসা রটিয়ে তাঁদের কি লাভ হচ্ছে?

—কি কুৎসা?

—তুমি নাকি আবার একটা বিয়ে করেছ।

—তাই নাকি? কাকে বল ত!

—যে মেয়েটাকে তুমি প্রাইভেট পড়াও।

বজ্রাহতের ন্যায় কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবস্থানের পর অস্ফুটকণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করলাম—এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে?

—কেন, তোমার অন্তরংগ বন্ধুবান্ধবরাই তো গ্রামময় এই ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

—কিন্তু এ খবর তারা পেলে কোথায়? আর তাই তারা বিশ্বাস করলে?

—একমাত্র সুকুমারবাবু ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তা' বিশ্বাস করেছেন। শুধু বিশ্বাস করা নয়, মনে মনে উৎফুল্লও হয়েছেন।

—বুঝেছি। সমাজে আমার মাথা হেঁট দেখলে তারা সুখী হয়। কিন্তু সুকুমার তাদের দলভুক্ত নয় কেন?

—গরীব হলেও উনি একজন খাঁটী লোক এবং তোমার একজন যথার্থ বন্ধু। কী ঝগড়াটাই-না ক'রে বেড়াচ্ছেন আজ দেশশুদ্ধ সবার সাথে!

—তাই বুঝি আমার স্বহস্তে লিখিত একটা জবাবের জন্য এত ব্যস্ত হ'য়ে চিঠিখানা লিখেছে।

কক্ষস্থিত ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বেজে গেল।

ছায়ামূর্তি সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল—আমি তবে এখন উঠি।

—না, না, রাণু, তোমায় আমি আজ আর কিছুতেই ছাড়ব না।

—সারা রাত তা'হলে তোমার অসুখ করবে যে।

—করুক। তোমায় হারিয়ে আমি কি সুখে আছি মনে করছ?

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মৃদু মধুর কণ্ঠে সে বললে—একটা কথা বলব?

—কি বল।

—তুমি সেই মেয়েটাকে বিয়ে কর।

—কাকে? অসীমাকে?

—হ্যাঁ, তাকেই।

—সে কি! তুমি এ-কথা বলছ?

—না বলে যে পারছি নে। তোমার এই নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ দেখে সত্যি আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবস্থানের পর হৃদয়াবেগে সহসা বলে উঠলাম,—আচ্ছা, রাণু, সেদিনের কথা তোমার মনে আছে?

—কোন দিনের কথা বলছ?

—যেদিন আমার বন্ধুদের কাছে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে আমি বলেছিলাম—স্বামীর মৃত্যুর পর যদি কোন স্ত্রীর পুনরায় বিয়ে করবার বিধান সমাজে না থাকে, তবে কোন বিপত্নীকের বেলায় তা থাকবে কেন?

—সেদিনের সেই জ্যোৎস্নাময়ী নিশিতে আকাশভরা চাঁদের আলোয় তোমার মুখে যে সৌকুমার্য্য দেখেছিলাম, তোমার কণ্ঠে যে সুমধুর বাণী শুনেছিলাম তা' কি জীবনে কখনো ভোলা যায়?

—কিন্তু, রাণু, আমার সেই বন্ধুদের প্রস্থানের পর আমার মুখের পানে চেয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে তুমি বলেছিলে না—আমার একবার মরে দেখতে ইচ্ছে করে তোমার ঐ সুখের কথাটা কত সত্যি?

একটু থমকে গেয়ে আপন মনে সে শুধু বললে—আজও তা' তুমি মনে করে রেখেছ দেখছি।

—রাখব না? তোমার ভালবাসার অমর্য্যাদা করব?

মনে মনে খুসী হয়ে সহাস্যবদনে সে বললে—তা' কি তুমি কখনো করতে পার?

—তবে অসীমাকে বিয়ে করার কথা বলছ কেন? জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কি তুমি আমার পরীক্ষা করবে?

—না, না, পরীক্ষা নয় প্রিয়তম। তোমার শরীরের যে অবস্থা দেখছি তাতে আমি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি। দু'দিন বিছানায় পড়ে থাকলে তোমায় কে দেখবে?

—আমার অবস্থা যদি তোমার হ'ত, তবে কি তুমি আর একজন পুরুষকে বিয়ে করতে পারতে?

—ছিঃ—ছিঃ—অমন কথা ভুলেও আর মুখে এনো না।

ভোরের আলো বাতায়ন পথে ঘরের মধ্যে উঁকি মারতেই আমার প্রিয়ার সেই ছায়ামূর্তি অকস্মাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে হয়ে গেল।

২

সপ্তাহখানেক পরে অসীমাদের পরিবারের সঙ্গে কার্সিয়াং শহরে বেড়াতে এসেছি। খাইদাই, চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াই, আর দু'বেলা অসীমাকে কিছুক্ষণ ধরে পড়াই।

বেশ ভ্রমণ করতে আমার বড় ভাল লাগে। জানি না কেন আমার মন বেশীদিন একজায়গায় বাঁধা থাকতে চায় না। ঘরের মধ্যে থেকে থেকে প্রাণটা যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন বাইরের 'আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে।'

প্রকৃতি-জননীর মত এমন স্নেহময়ী আর কে আছে? সংসারের শত চিন্তায় বিব্রত হ'য়ে তাপদগ্ধ চিত্তে যখন তাঁর সুশীতল কোলে যেয়ে বসি তখন সব জ্বালা ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যায়, ঘরে ফিরতে আর মন চায় না।

সেদিন অপরাহ্ণে পরমশান্তির আলয় হিমালয়ের এক নিরালা নিভৃত প্রান্তে বসে ধ্যানমগ্না প্রকৃতির মৌনমাধুরী, অনুপম সৌন্দর্য-সুধা প্রাণ ভ'রে পান করছি, এমন সময় কার পদশব্দে সচকিত হয়ে পশ্চাতের দিকে ফিরে দেখি অসীমা একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তথায় এসে উপস্থিত।

অন্যমনস্কভাবে তার মুখের পানে চাইতেই অভিমানের সুরে সে বলে উঠলো,—আমায় না ব'লে অমন চুপি চুপি পালিয়ে এলেন কেন, মাষ্টারমশাই?

—পালিয়ে আসব কেন? তুমি ঘুমুচ্ছিলে বলে তোমায় ডাকি নি।

—মিছে কথা বলবেন না। আমি কাছে থাকলে আপনার ভাল লাগে না তাই বলুন।

—এ-কথা কেন বলছ, অসীমা? আমার কাছ থেকে কোনদিন কি অনাদর পেয়েছ?

—পাইনি বলেই ত আমার প্রাণে আজ এত ব্যথা লেগেছে।

—অকারণে যদি তুমি দুঃখ পাও তবে আমি কি করব বল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে ধীরে ধীরে বললে,—আচ্ছা মাষ্টারমশায়, আমি ম'রে গেলে আপনি সুখী হন?

—ছেলেমানুষের মত এ-সব তুমি কি বলছ! জান, আত্মহত্যার চিন্তা করাও মহাপাপ।

—তা' ছাড়া আর উপায় কি?

ক্ষণকাল চিন্তার পর তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, দেখো তোমার বাবা-মাকে তোমার বিয়ের জন্য আমি বুঝিয়ে বলব।

—না না, তা কখ্খনো করতে পারবেন না। ওই কথা যদি তাঁদের বলেন, তবে আর-একটি দিনও কেউ আমায় ধ'রে রাখতে পারবে না।

দীর্ঘকাল চিন্তার পর তাকে উদ্দেশ করে সস্নেহ বচনে বললাম,—দেখ, অসীমা, তোমার মনের ইচ্ছা কি আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তা' পূর্ণ করা কখনও কি সম্ভব?

নতনেত্রে সলজ্জবদনে সে শুধু বললে,—তা' আমি জানি নে।

—না, না, ঐ কথা বললে চলবে না। তোমায় আজ আমায় সব কথাই জানতে হবে। তুমি কি জাননা যে আমি বিবাহিত।

—কেন জানবো না? কিন্তু আপনার স্ত্রী তো আর বেঁচে নেই।

—না থাকলেও তার ভালবাসার অমর্যাদা আমি কিছুতেই করতে পারি নে।

—স্ত্রী-বিয়োগের পর কেউ কি আর বিয়ে করে না?

—কেন করবে না? কিন্তু তা' করা কি উচিত?

—উচিত কি অনুচিত তাই তবে কি লোকে বিয়ে করে?

—সবাই তা' করে না বটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রবৃত্তির তাড়নায় লোকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়।

—তবে আপনি তাকে মানতে চান না কেন?

—চাই না তার কারণ, তাকে totally reject না কোরে indulgence দিলে পশুদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে কোথায়?

—সাধারণ লোকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু মুনি-ঋষিরাই কি তা পেরেছেন?

—সবাই না পারলেও কেউ কেউ ত পেরেছেন।

ক্ষণকাল নীরবতার পর দৃঢ়কণ্ঠে সে বলে উঠলো, —আমার ত মনে হয় বিয়ে করতে যারা চায় না তারা হয় পশু না হয় দেবতা।

—অর্থাৎ তারা মানুষ নয়, কেমন?

কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বনের পর সহসা সে আবেগোত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল,—আচ্ছা, মাষ্টারমশাই, একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন?

—কি বল।

—যা একেবারেই পরিত্যাজ্য, বাস্তবিকই যার কোন প্রয়োজন নেই, ভগবান মানুষকে তা' দিয়েছেন কেন?

—প্রয়োজন নেই কে বললে? তা' না থাকলে তাঁর এই সুন্দর সৃষ্টি রক্ষা হোত কি ক'রে?

এতক্ষণ পরে অসীমার মুখে হাসি দেখা দিল। উৎফুল্ল হৃদয়ে সে বলে উঠলো,—তবে কেন আপনি সৃষ্টিকর্তার প্রাণের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান না?

—আমায় তুমি ভুল বুঝেছ দেখছি।

—তবে কি আপনি সত্যি সত্যি অনিচ্ছুক নন?

—তাই যদি হব, তবে বিয়ে করেছিলাম কেন?

আমার মুখের পানে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে বিষাদভরা কণ্ঠে আপনমনে সে বললে,—আপনার এই অবস্থা দেখে সত্যি বড় দুঃখ হয়। কেন যে ভগবান আপনার প্রতি এমন নির্দয় হলেন।

—নির্দয় কি সদয় কি কোরে বুঝব বল। তাঁর কৃপা কখন কি ভাবে যে দেখা দেয় তা কি আমরা জানতে পারি?

—যাইই বলুন না কেন, এ রকম নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে কোন সুখ শান্তি নেই।

—যার নেই, তার নেই।

—আপনি কি তা'হলে বলতে চান যে, জীবন-সঙ্গিনীকে হারিয়েও আপনি বেশ সুখে আছেন?

—সুখে আছি কি দুঃখে আছি জানি নে। তবে এটা জানি যে,—'সুখ নাহি পাওয়া যায় সুখেরে চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ।
নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।'

অসীমার চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল কথাগুলি যেন গভীরভাবে তার হৃদয় স্পর্শ করেছে। ক্ষণকাল পরেই মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সে বলে উঠলো,—কবির ওই কথাগুলি যখন আপনি মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছেন, তখন এই হতভাগিনীর প্রাণের ইচ্ছা কেন পূর্ণ ক'রবেন না?

—অবুঝ হোয়োনা, অসীমা। তার যদি সত্যই কোন বাধা না থাকত, তবে কি তোমার প্রাণে এই বাধা আমি দেই? তোমার প্রাণে যে কী দুঃখ তা' কি আমি বুঝি না?

অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে শুধু বললে,—তা' যদি বুঝতেন, তবে একজনের জীবন এমন ভোরে ব্যর্থ ক'রে দিতে পারতেন না। এতক্ষণ ধ'রে আপনার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ক'রে আপনার শান্তির যে বিঘ্ন ক'রলাম তার জন্য আমায় মাফ ক'রবেন।

কথাকয়টি শেষ হ'তে না হ'তেই সহসা উন্মত্তার ন্যায় আলুথালু বেশে আলুলায়িত কেশে সে উঠে দাঁড়াল। মাতালের মত কম্পিত চরণে টলতে টলতে পার্বত্য পথ বেয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল।

তার মানসিক অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন দেখে আমার মনে ভয় হোল। তখন আর কালবিলম্ব না কোরে সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠে পড়লাম। 'অসীমা,—অসীমা, একটু দাঁড়াও'—বলে ত্রস্তার্তকণ্ঠে ডাকতে ডাকতে তার পিছনে পিছনে ছুটলাম।

(৩)

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি অসীমার পিতামাতা বাইরের ঘরে ম্রিয়মাণচিত্তে বসে আছেন। তখন আমাকে পদার্পণ করতে দেখেই প্রাণতোষবাবু বলে উঠলেন,—এই যে মাষ্টার মশাই, কি কবি বলুন তো। বড়ই চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছি।

এক অজানা আতংকে অন্তরটা কেঁপে উঠলো। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম,—অসীমা কি অবাঞ্ছিত একটা কিছু করলে নাকি? ক্ষণকাল পরেই প্রকাশ্যে তাঁকে বললাম,—কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি নে।

একখানি টেলিগ্রামের কাগজ আমার হাতে দিয়ে প্রাণতোষবাবু বললেন,—এখানা পড়ে দেখুন, তা হ'লে সব বুঝতে পারবেন।

মনোযোগ সহকারে টেলিগ্রামটি পাঠের পর মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম,—যাক্, বাঁচা গেল। অসীমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা উপায় হোল দেখছি।

কয়েক মিনিট পরে প্রাণতোষবাবুর প্রশ্নের উত্তরে গম্ভীরস্বরে তাঁকে বললাম,—তাইতো দুশ্চিন্তার কথাই বটে। এ রকম সংবাদ পেয়ে এখানে আর থাকা চলে কি ক'রে?

আমার কথায় সমর্থন কোরে প্রাণতোষবাবুও বলে উঠলেন—না, না, কোনমতেই তা' চলে না। কিন্তু আমি একা যাব, না সবাইকে সাথে নিয়ে যাব তার একটা কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারছি নে। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা আরও কিছুদিন এখানে তিনি থাকেন। আপনি যখন আছেন তখন আর ভাবনা কি?

—তা' ঠিক নয়, প্রাণতোষবাবু। আপনার ভাইয়ের যখন এতবড় অসুখ, তখন বাসাশুদ্ধ সকলেরই ক'লকাতায় ফিরে যাওয়া উচিত।

—ঠিক বলেছেন, মাষ্টারমশাই।

অতঃপর স্ত্রীকে উদ্দেশ ক'রে প্রাণতোষবাবু বললেন,—যাও, এখানে আর একমিনিটও বসে থেকো না। আজকের ট্রেনে যাওয়ার জন্যেই প্রস্তুত হ'য়ে নাও।

যথাসময়ে ক'লকাতাগামী দার্জিলিং মেলের সেকেণ্ড-ক্লাসের একটি কামরায় মালপত্র নিয়ে আমরা সকলেই উঠে পড়লাম। পার্বত্য রেলপথের উভয় পার্শ্বের বিচিত্র মনোরম প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে আর গল্পগুজব করতে করতে আমরা এগিয়ে চলেছি। লক্ষ্য করলাম কামরার এক প্রান্তে অসীমা নীরবে আপন মনে বসে আছে। তার

চোখে-মুখে এক গভীর বিষাদের কালিমা। ভাবলাম তাকে কাছে ডেকে নিয়ে কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হোল—না; কাজ নেই। হয়ত সে আমার কথা রাখবে না। ক'লকাতা থেকে একটি যোগাযোগের সংগে ওর বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে। সময়মত মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার অনেক দোষ।

রাত্রি দশটা বাজতেই সামান্য কিছু জলযোগের পর একখানা বেঞ্চির একধারে একটু জায়গা ক'রে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। দুর্ভেদ্য অন্ধকারের বুক চিরে দূর হ'তে সুদূরান্তরে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ী যৌবনমধুমত্তা অভিসারিকার মত। অসীমার বুকেও বুঝি এমনিতরো এক অধীর ব্যাকুলতা। উত্তরের কথা ভাবতে ভাবতে কখন-যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা' জানি নে।

গভীর সুষুপ্তির মধ্যে সহসা সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম, কে আমায় সংকাতর কণ্ঠে বলছে—এখনও তুমি ঘুমোচ্ছো! ওঠো—ওঠো, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এই সামনের ষ্টেশনেই নেমে পড়।

আচমিতে ঘুম ভেংগে যেতেই ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লাম। তাড়াতাড়ি সুটকেশটা বাঙ্কের উপর থেকে নামিয়ে নিতেই গাড়ী একটা ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল, চোখ রগড়াতে রগড়াতে গাড়ীর ভিতরে একবার তাকিয়ে দেখলাম সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। কোথায় নামছি, কেন নামছি সে কথা ভাববারও একটু সময় পেলাম না। কে এসে যেন জোর ক'রে হাত ধরে টানতে টানতে গাড়ী থেকে আমায় নামিয়ে নিয়ে গেল। গাড়ী প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করবার কিছুক্ষণ পরে আমার একটু হুঁস হোল। খবর নিয়ে জানলাম সেটা ব্যারাকপুর ষ্টেশন।

নির্জন প্ল্যাটফর্মে একাকী বসে বসে যখন আমার এই অদ্ভুত আচরণের কথা ভাবছি, তখন ষ্টেশনমাষ্টারের কক্ষে ফোনে সংবাদ এল পরবর্তী ষ্টেশনে একখানা মাল-গাড়ীর সংগে উক্ত দার্জিলিং মেলের সাংঘাতিক এক সংঘর্ষ হয়েছে। এতক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম কে আমায় ঘুম থেকে জাগিয়ে, গাড়ী থেকে নামিয়ে আমার জীবন রক্ষা করেছে। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলাম,—রাণু, রাণু, আমায় কি তুমি আজও ভুলতে পার নি।

পরের দিন সকালের গাড়ীতে শিয়ালদহে পৌঁছে ভালভাবে সংবাদ নিয়ে জানলাম-প্রাণতোষবাবুর পরিবারের যে কয়জন সেই গাড়ীতে ছিল তাদের কেহই আর জীবিত নেই। এরূপ এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা যে ঘটবে তার বিন্দুমাত্র যদি তখন জানতে পারতাম তাহলে এতগুলি প্রাণ অকালে বিনষ্ট হোত না। অসীমার কথা বারে বারে মনে হতে লাগলো। কী গভীর বেদনা নিয়েই না সে এ জগৎ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। এমন ভাবে এক অপমৃত্যু বরণ করে নিয়ে সে যে আমায় মুক্তি দেবে তা' কে জানত!

পরলোকগতা পতিব্রতার অপ্রত্যাশিত সহায়তায় নিরাপদে কোলকাতার সেই আলোকবাতাসহীন অন্ধকূপে ফিরে এলাম বটে, কিন্তু কাজকর্মে আর কোনো উদ্যম, উৎসাহ নেই। এমনিভাবে জীবন্মৃতের ন্যায় দিনগত পাপক্ষয় করে যখন চলেছি, তখন বন্ধুবর সুকুমার সহসা একদিন আমার সেই বাসায় এসে উপস্থিত হোল।

যথারীতি অভ্যর্থনার পর সবিস্ময়ে তাকে প্রশ্ন করলাম—কি সংবাদ, সুকুমার? কোন চিঠিপত্র না দিয়ে একেবারে সশরীরে হাজির যে!

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের পানে চেয়ে সে বলে উঠলো,—সে কি! আমার কোন চিঠি পাও নি?

—পেয়েছি বৈকি।

—তবে এতদিন তার উত্তর দাও নি কেন?

—আমার সাংসারিক বিশৃঙ্খলার কথা তুমি ত সব জান। আর, নানা কারণে মনটা অশান্তিতে ভরে আছে। চিঠিটার উত্তর দেওয়ার কথা একেবারেই ভুলে গেছি।

—দীর্ঘদিন তোমার কোন পত্র না পেয়ে ভাবলাম আমার চিঠিখানা হয়তো তোমার হস্তগত হয় নি। তাই এত ব্যস্ত হয়ে চলে এলাম।

—এসেছ খুব ভালই হয়েছে, বড় আনন্দের কথা। কিন্তু মিছা-মিছি তোমার কতকগুলি টাকা খরচ করালাম —তাতে আর কি হয়েছে। তোমার ছেলে মেয়েদের অনেকদিন দেখিনি। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও সবাইকে একবার দেখতে তো ইচ্ছে করে।

—তোমার আন্তরিক ভালবাসার কথা জীবনে কোন দিন ভুলতে পারব না, বন্ধু। তোমাদের ছেড়ে আসার

পর থেকে কি ভাবে যে দিনগুলি আমার কাটছে তা' একমাত্র ভগবানই জানেন।

—আমারও সেই অবস্থা, গ্রামে আর এমন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই যার সঙ্গে দু'একঘণ্টা কথাবার্তা ব'লে অভাব অভিযোগের জ্বালা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকব।

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থানের পর তাকে বললাম,—আমার মনে হয় কি জান?

—কি?

—বন্ধুবান্ধব না থাকাই ভাল। স্বচক্ষে তো দেখতে পাচ্ছ আমার বন্ধুরা আমার কত হিতৈষী।

—কি আশ্চর্য! তারা যে তোমার সম্বন্ধে এমন এক হীন ধারণা পোষণ করতে পারে তা' আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

—কেন পারবে না? যার যা প্রকৃতি, সে কি কখনও তা' ত্যাগ করতে পারে?

—তা' ঠিক। কিন্তু তার কারণটা কি আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।

—কারণ কি, শুনবে?

—কি বল তো।

—মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে 'Inferiority complex' তা' ছাড়া আর কোনো কারণ নেই।

—যাই বল না কেন, ওদের মুখ আমি বন্ধ কোরবোই।

—কি কোরে?

—তোমার নিজের হাতে লেখা উত্তর নিয়ে ওদের সবাইকে আমি তা দেখাব। সেইজন্যেইতো এত কষ্ট কোরে এতদূর পর্যন্ত ছুটে এসেছি।

—একান্তই যদি না ছাড় তবে এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি ও-ঘর থেকে নিজের হাতেই তোমার চিঠির একটা জবাব লিখে নিয়ে আসছি।

অতিমাত্রায় বন্ধুর অনুরোধ কোনমতে এড়াতে না পেরে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কয়েক পৃষ্ঠা কাগজে আমার উত্তরটা লিখে এনে তার হস্তে প্রদান করলাম।

সেই কাগজগুলির উপর একবার চোখ বুলিয়ে সবিস্ময়ে আমার মুখের পানে চেয়ে বন্ধুবর বলে উঠলো,—এ কি! এ যে দেখছি একটা গল্প।

—হ্যাঁ। ওই গল্পটাই তোমার চিঠির জবাব, বন্ধু।

গঙ্গা পতিতপাবনী

দিলীপকুমার রায়

এসো পতিতপাবনী কৃষ্ণাহরণী কোলে টেনে নিতে
গেয়ে গান।
এসো ধূসর ধরায় নীল করুণায় দিতে মা তোমার বরদান।
কত মিছে কাজে পড়ি বাঁধা হায়,
তাই শুনি না তোমার "আয় আয়",
যায় বেলা, শুধু মায়াদীপ জ্বালি' চাই ছায়ায়
আলোর সন্ধান।
গেয়ে আলোকীর্তন হরিনাম
তুমি গগনগঙ্গা অবিরাম
স্নেহ সঞ্চয় বাড়াও তারিণী, আমরা পাতি না সে-সুরে
আজো কান।
ফিরে তোমার পায়ে মা এসেছি,
যারে শৈশবে ভালোবেসেছি,
যেতে ওঠে সেই হারা রাগমালা শুনি' তোমার
প্রেমের কলতান।
আর থেকো না মা ভুলে পায়ে
দাও শান্তি উপাসী প্রাণে
করো একান্ত তব চরণে, চায় না বাস্তবিলাস আর প্রাণ।

হরিদ্বার, ৮ই বৈশাখ, ১৩৭৩

দুঃসাহসী

শ্রীজ্ঞান

দুঃসাহসী!—কথাটার মধ্যে যথেষ্ট রোমাঞ্চ আছে, তাই না? তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত মনে মনে এই দুঃসাহসী হবার ইচ্ছা পোষণ করে থাক। ম্যাড্-ভেঞ্চারের গল্প পড়তে তোমাদের খুবই ভাল লাগে—রহস্য রোমাঞ্চের গন্ধে তোমাদের কিশোর প্রাণ সহজেই মেতে ওঠে। এর ওপর সেই ম্যাড্ভেঞ্চার যদি গল্প না হয়ে সত্যিকার হয়, তাহলে তো কথাই নেই! তখন শুধু তোমরা কেন, বয়স্কদেরও মনে সেই সত্যিকার ম্যাড্-ভেঞ্চারের খবর জানতে, সেই দুঃসাহসিক কার্য্যে রত বীরদের কথা পড়তে আগ্রহ জাগে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অভিযানে ক্যাপ্টেন স্কট্ ও অ্যামণ্ডসেন্-এর দুর্জ্জয় সাহসের কথা তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। দুর্লঙ্ঘ্যশৃঙ্গ এভারেষ্ট জয়ের অভিযানগুলিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। মেলরি ও আরভিং-এর মরণপণ অভিযানের কথাও তোমরা জান। আর তেনজিং ও হিলারির দুর্জ্জয় সাহসে শৃঙ্গ জয়ের কথা তো সকলেই জানে। আরও কত কত দুঃসাহসিক অভিযান পৃথিবীতে চলেছিল এবং চলছেও। সমুদ্রের অতল তলে নামার চেষ্টা, ঊর্দ্ধে মহাশূন্যে গমন, জলে ও স্থলে কত দ্রুত যান চালান যায় তার বিপজ্জনক চেষ্টা, একা একটি ভেলায় চড়ে মহা-সাগর পাড়ী দেওয়া, নানা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সাগর-বক্ষে সন্তরণ করে চ্যানেল পার হওয়া প্রভৃতি নানারূপ দুঃসাহসিক কাজ ম্যাড্ভেঞ্চার-পাগল মানুষে জীবন বিপন্ন করে করে আসছে। অতীতে এই ম্যাড্ভেঞ্চারের নেশাই ভাস্কো-ডা-গামাকে ভারতে আসার পথ দেখিয়েছিল—কলম্বাসকে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়েছিল। দুর্গম দেশে, অনাবিষ্কৃত অরণ্যে, সুউচ্চ শিখরে, অতল জলতলে অভিযান চালাতে দুঃসাহসিক মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে এই ম্যাড্ভেঞ্চারের নেশাই। রহস্যের উদ্ঘাটনে, রোমাঞ্চের সন্ধানে দুঃসাহসী মানুষ তাই ধেয়ে চলেছে যুগে যুগে প্রাণকে বিপন্ন করে, জীবনকে তুচ্ছ করে। তাঁদের এই সাহস, তাঁদের এই সাধনা আবার অনুপ্রাণিত করেছে পরবর্ত্তী কালের মানুষকে শক্তির সাধনায়, সাহসের জয়যাত্রায় এগিয়ে আসবার জন্য।

তোমরাও নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত হও এই সব দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর অদম্য সাধনার অধ্যবসায়, আগ্রহ, ও আকাঙ্ক্ষা দেখে! নিশ্চয়ই তোমাদের মনেও জাগে এই রকম দুঃসাহসী হবার ইচ্ছা? তাই নয়? আচ্ছা, এইবার তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এই কিছুদিন আগেই ঘটে যাওয়া এই রকম এক দুঃসাহসী মানুষের দুঃসাহসিক ম্যাড্-ভেঞ্চারের কথা। খবরের কাগজে সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কথা তোমরাও নিশ্চয়ই আগ্রহভরে পড়েছ; আর এই সাহসী মানুষটিকে জানিয়েছ তোমাদের আন্তরিক অভি-নন্দন ও শুভেচ্ছা। এই সাহসী বীরটি হচ্ছেন বাংলার মুখোজ্জ্বলকারী সাতার শ্রীমিহির সেন। সন্তরণবীর মিহির

সেন প্রথম ভারতীয়রূপে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছিলেন। আবার তিনিই প্রথম ভারত ও সিংহলের মধ্যবর্তী বিপদসঙ্কুল 'পক্' প্রণালী অতিক্রম করে ভারত তথা বাংলার সাহসী পুরুষদের দুর্জয় সাহসের পরিচয় প্রদান করলেন। হিংস্র হাঙ্গর, বিষধর সর্প, দুর্লঙ্ঘ্য তরঙ্গ ও প্রচণ্ড স্রোতের আকর্ষণ উপেক্ষা করে অসীমসাহসে ও অসাধারণ অধ্যবসায়ে এই সমুদ্রপথ অতিক্রম করে সন্তরণবীর মিহির সেন দুঃসাহসিকতার যে নজীর স্থাপন করলেন, তা পরবর্তী কালে বিশ্বের সন্তরণ বীরদের এই দুর্লঙ্ঘ্য প্রণালী অতিক্রম করতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবে। স্বদেশেও তাঁর এই দুঃসাহসিক অভিযান এক বিরাট দৃষ্টান্ত হয়ে রইল এবং ভারতীয় সাঁতারুদের, বিশেষ করে বাংলার তরুণদের দুঃসাহসিক কার্যে প্রেরণা জোগাবে—তাদের উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করে তুলবে।

তোমাদের মধ্যে যারা ষ্ট্যাণ্ড্‌ভেকার তারাও নিশ্চয়ই মিহির সেনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছ এবং আশা করি ভবিষ্যতে বড় হয়ে এই রকম নানা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়ে এবং সাফল্য লাভ করে, ভারতীয় তথা বাঙ্গালীর সাহস ও বীর্যের পরিচয় প্রদান করে বিশ্বের অভিনন্দন লাভ করবে।

•••

জর্জ এলিয়ট

রচিত

সাইলাস মার্নার

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এমনিভাবে সাইলাসের স্নেহ-ভালোবাসায় আর আদর-যত্নে মা-হারা অনাথা এপি রাভেলো-গ্রামের সেই নিরালা ছোট্ট কুটিরের নিরাপদ আশ্রয়চ্ছায়ে নির্বিঘ্নে বসবাস করে দিনে দিনে বড় হয়ে উঠতে লাগলো। দুর্যোগের রাতে হঠাৎ আবির্ভাবের সেই স্মরণীয় মুহূর্ত থেকে এপি বরাবরই ছিল নিঃসঙ্গ সাইলাসের নয়নের মণি···অভাগী এপির জীবন যাতে শান্তি-সুখে ভরে থাকে—সেদিকে সাইলাসের ছিল সদা সজাগ দৃষ্টি। তাই শিক্ষায়-সহবতে, কাজে-কর্মে স্বভাবে আচরণে—প্রত্যেকটি বিষয়েই এপি যেন সেরা-চৌখশ আর ফুলের মতোই সুন্দর অপরূপ হয়ে ওঠে—এই ছিল সাইলাসের ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা।

সাইলাসের নিবিড় আন্তরিকতার পরশ পেয়ে এমন নিরবচ্ছিন্ন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দে মানুষ হয়ে ওঠার ফলে, এপিও কোনোদিন এতটুকু অনুভব করেনি—তার নিজের মা-বাবার অভাব···এ দুনিয়াতে শুধু সাইলাস্‌ই ছিল তার একান্ত আপন জন। তাই শৈশবকাল থেকেই এপি সাইলাস্‌কে 'বাবা' বলে ডাকতো এবং অকপটেই জানাতো তার যা কিছু মনের কথা—সখ-সাধ-আবদার···ছুনুর উপদ্রব··সুখ-দুঃখ···অভাব-অভিযোগ···নিত্যকার বৈনন্দিন জীবনের ছোট বড়, ভালো-মন্দ, দরকারী-বেদরকারী প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার!

এমনিভাবেই পরম শান্তি সুখে আনন্দে দেখতে দেখতে কেটে গেল সুদীর্ঘ ষোলো বছর। এই ষোলো বছরের ভিতরে ছোট্ট রাভেলো গ্রাম আর সে গ্রামের অন্য সব বাসিন্দাদের মতোই সাইলাস্ আর এপি—দুজনেরই দেহে-মনের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। সাইলাসের বয়স এখন পঞ্চান্ন হলেও, মাথার চুল তার শেকে আগাগোড়া শণের নুটির মতোই শাদা ধবধবে···দেহ জরাজীর্ণ দুর্বল···মুখে-চোখে বার্দ্ধক্যের রেখা···তবে মন তার আনন্দে সুখে নিবিড় প্রশান্তিতে ভরপুর···এতদিনে সে বুঝি তার জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে! পিতৃতুল্য প্রৌঢ় সাইলাসের পাশে পাশে সারাক্ষণ ছায়ার মতো অনুসঙ্গিনী হয়ে থেকে ছোট্ট একরত্তি এপিও এ ক'বছরে অপরূপ সুন্দরী অষ্টাদশী তরুণীতে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে···এপির মতো রূপসী—শুধু সারা রাভেলোতেই নয়, আশপাশের অন্যান্য গ্রামেও বিশেষ নজরে পড়তো না। তাছাড়া বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, রূপ-সৌন্দর্যের মতোই এপির স্বভাব আচরণ আর মনটিও এমন সরল সুন্দর নিষ্পাপ মধুর

হয়ে উঠেছিল যে গ্রামের লোকজন সবাই তাকে আন্তরিক-ভাবে ভালোবাসতো। লোকজনকে ঘর আর ঘরকন্নার কাজকর্ম, লেখাপড়া, কারুশিল্প—প্রত্যেকটি বিষয়েই এপির ছিল সদা-সজাগ নিপুণ দৃষ্টি···নিঃসঙ্গ সাইলাসের ছন্নছাড়া সংসারটিকে এপি দিনের পর দিন নিজের হাতে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছবির মতোই মনোরম সুন্দর ছাঁদে গড়ে তুলেছিল। অরাজীর্ণ সাইলাসের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দিকেও এপির যত্নের অভাব ছিল না এতটুকু। সাইলাসের কুটিরের আশ-পাশের পড়ো জমিটুকুও এপির নিপুণ হাতের সযত্ন-স্পর্শে দিনে দিনে রূপান্তরিত হয়েছিল—ফলে-ফুলে সাজানো অপরূপ সুন্দর ছবির মতো নয়নাভিরাম একটি বাগানে। বাড়ি-ঘর সাজানো গোছানো আর বাগান রচনার কাজে-কর্মে এপির নিত্য সহায়ক ছিল—সাইলাসের পড়শিনী ডলি উইনথ্রপের ছেলে আরন্। শৈশবকাল থেকেই দিনেরপর দিন একসঙ্গে মিলেমিশে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে, আরন্ আর এপি—দুজনের মধ্যে প্রীতি সাহ-চর্যের অপরূপ মধুর একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাদের দুজনের এই সরল নিষ্পাপ ঘনিষ্ঠতা দেখে গ্রামের লোকজনেরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন যে—এবারে বিবাহ দিয়ে এদের দুটি হাত একসঙ্গে মেলাতে পারলেই সবচেয়ে মানানসই কাজ হয়।

এপির বিবাহের কথা ভাবলেই সাইলাস্ কিন্তু বিশেষ উদ্বিগ্ন চকিত হয়ে উঠতো! দুর্যোগের রাতে মা-বাবা হারা কুটকুটে একরত্তি যে মেয়েটিকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে সুদীর্ঘ এই ষোলো বছর ধরে সারাক্ষণ নিজের হাতে স্নেহ-যত্নে আদরে মানুষ করে তুলেছে, তাকেই শেষে পরের ঘরে ঘরণী হিসাবে পাঠিয়ে দিতে হবে—এই চিন্তাই সাইলাস্‌কে রীতিমত ব্যাকুল অস্থির করে তুলতো···নয়নের মণি এপির অদর্শন—সাইলাস্ মুহূর্তের তরেও সইতে পারতো না। কারণ সাইলাসের নিঃসঙ্গ নিরানন্দ যে জীবন দিনে দিনে রূপে-রসে বর্ণে গন্ধে রঙীন মধুর সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল এপির আবির্ভাবে···এপির সাহচর্যে, সে সবই মিলিয়ে যাবে—বিবাহের পর এপি পরের ঘরে সংসার রচনা করতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে! তাই সাইলাস্‌ও এপির বিবাহের প্রসঙ্গ যথা-সম্ভব এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করতো। তবে সাইলাসেরও জীবনদীপ ক্রমেই নিষ্প্রভ-ক্ষীণ হয়ে আসছে···ওদিকে এপিরও বয়স ক্রমে বেড়েই চলেছে···কাজেই যথাসময়ে সুপাত্রে বিবাহ দিয়ে এপিকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করাও একান্ত দরকার···নিজের সুখ-সুবিধার চিন্তায় বিভোর হয়ে অনর্থক টাল-বাহানা করে এপির বিবাহের ব্যবস্থাও আর বেশীদিন মুলতুবী রাখা ঠিক নয়। এমনি দুশ্চিন্তা আর সমস্যায় সাইলাস সারাক্ষণই আকুল হয়ে থাকে।

কিন্তু নিয়তির এমনই বিচিত্র বিধান যে সাইলাসের এ সমস্যা-সমাধানেরও সুযোগ মিলে গেলো নিতান্তই অভাবনীয় এক সহজ সরল উপায়ে। [ক্রমশঃ

বিচার

তপতী দাশগুপ্ত

গ্রামের তিনটি কুখ্যাত দুষ্ট ছেলে—স্যাপলা, বাদল আর জীবু। এদের দৌরাত্ম্যিতে গ্রামখানি সদাই তটস্থ। তিনজনে ভারী ভাব। এদের দুষ্টবুদ্ধির কাছে অনেক বুদ্ধিমান লোককেও নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছে। এ-হেন ছেলেরা হঠাৎ একদিন উধাও হ'ল। গ্রামের লোকেরা নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। শুধু তিন:ক্ষুর বাড়ীতে কান্নার রোল উঠল। যাই হোক্ অনেক খোঁজ-খবরের পরও তাদের সন্ধান পাওয়া না যাওয়ায় সবাই স্থির করল তাদের আর পাওয়া যাবেও না। এই ব্যস্ত পৃথিবীতে মানুষ সাধারণতঃ কোন ঘটনাই দু-দিনের বেশী মনে রাখতে পারে না। এদের নিরুদ্দেশের কথাও দুদিন বাদে সবাই প্রায় ভুলে গেল। সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

• • •

এদিকে তিনবন্ধু পালিয়ে অনেক দূরে একগ্রামে এসে পড়ল। ছোট্ট গ্রাম, লোকসংখ্যা খুবই কম। মোট দশ বারোটি ঘর। গ্রামের তিনদিক দিয়ে ঘন জঙ্গল আর অপর দিকে একটি ছোট্ট খরস্রোতা নদী। নদীর পারে কত নাম-না-জানা ফুলের গাছ। ভারী সুন্দর সে দৃশ্য। এই অপূর্ব শোভা স্যাপলা, বাদল ও জীবুর মত

তিনকুলে পর্য্যন্ত মুখ করল। এরা এই ছোট্ট গ্রামে-খানিতেই তাদের আস্তানা গাড়ল। বন থেকে ফলমূল জোগাড় করে তা ওপারের হাটে বিক্রী করে জীবিকার ব্যবস্থা করতে লাগল। তখন বর্ষাকাল। এমনি একদিন তারা ওপারের হাটে চলেছে ফলমূল নিয়ে। নদী পার হয়ে যেতে হবে। খেয়াঘাটে গিয়ে নৌকোয় উঠল ওরা। সেদিন ওদের নৌকোয় একজন নতুন আরোহী উঠল। পরিষ্কার ও পরিপাটি পোষাক পরিচ্ছদ। সঙ্গে একটি ছোট সুটকেস। দেখেই বেশ অবস্থাপন্ন বলে মনে হয়। স্থাপলা, বাদল ও জীবু তিনবন্ধুর চোখে চোখে কি কথা হল এবং তিনজনে মিলে কি পরামর্শও করল। তারপর অযাচিতভাবে সেই নতুন আগন্তুকটির সঙ্গে ওরা আলাপ সুরু করে দিল। কথাপ্রসঙ্গে ওরা জেনে নিল লোকটি কি করে, কেন গ্রামে এসেছে—এই সব খবর। তারা আরও জেনে নিল লোকটি তার এক আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষে বেশ কিছু টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।

নদীটি ছোট্ট হলে কী হবে, তার স্রোতের বেগ বড় দুর্দান্ত। বর্ষায় সে আরও বেগবতী হয়ে মাঝে মাঝে ঘূর্ণির আবর্ত্ত সৃষ্টি করে বয়ে চলে। নৌকা চলে বটে, কিন্তু খুব হুঁসিয়ার হয়ে চালাতে হয় কারণ অসতর্ক হলেই বিপদের সম্ভাবনা। কেউ নদীতে একবার পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। সলিল সমাধি অবধারিত। তিনবন্ধুর চোখে চোখে আবার কী কথা হয়ে গেল। স্থাপলা আর বাদল হঠাৎ পিছন থেকে মাঝিকে ঠেলে ফেলে দিল জলে। বেচারা টেরও পেলনা আগে। কিন্তু যখন সে টের পেল তখন সে জলে। মাঝি বেশ ভালই সাঁতার জানত। কিন্তু হলে কি হবে, হঠাৎ একটা ঘূর্ণির আবর্ত্তে পড়ে গেল—আর তাকে দেখা গেল না। ব্যস, নৌকো এখন তিনবন্ধুর আয়ত্তে। স্থাপলা আর জীবু দাঁড় টানতে লাগল প্রাণপণে। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে পাড়ি দিল অজানা পথে। বাদল গিয়ে দাঁড়াল সেই আগন্তুক ভদ্রলোকটির কাছে। লোকটি কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল এই ব্যাপার দেখে। বাদলের ডাকে যেন সে সম্বিৎ ফিরে পেল। "শুনছেন মশাই, শুনছেন?"—বাদল ডাকল। ভদ্রলোক ফিরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসু চোখে বাদলের মুখের দিকে তাকালেন। বাদল গম্ভীর গলায় ভাল ছেলের মত বলল, "আপনার সঙ্গে যা যা আছে তা ভালয় ভালয় আমাদের দিয়ে দিন। নইলে মাঝির মত আপনারও গঙ্গাপ্রাপ্তি আছে।"

"আমার সঙ্গে কিছুই নেই। কি দেব তোমাদের বল?"

"ওসব শুনছি না। চাবি দিন, আপনার সুটকেস দেখব।"

"না-না, সুটকেসে কিচ্ছু নেই।"

"কেন, এই তো বল্লেন এক আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষে কিছু টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। আর যদি আপনার সঙ্গে কিছু নাই থাকে, তাহলে চাবি দিতে এত ভয় কেন?"

"না, না, ভয়ের কি? তা বসনা একটু গল্প করি।"

বাদল, স্থাপলা ও জীবু কট্‌মট্‌ করে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে। বাদল বলল, "দেখুন, আবার বলছি, ভালয় ভালয় দেবেন তো দিন, নয়ত আমরা আপনাকে বেঁধে ফেলে রেখে সব কিছু কেড়ে নেব।"

দিশেহারা ভদ্রলোক পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুটকেসের উপর। বললেন, "আমাকে না মেরে তোমরা আমার কাছ থেকে কিচ্ছু নিতে পারবে না।"—বাদল কি ইঙ্গিত করল স্থাপলা আর জীবুকে। ওরা পাল তুলে হাওয়ার অনুকূলে নৌকা ছেড়ে দিয়ে বাদলের কাছে এসে দাঁড়াল। তীরবেগে ছুটে চলল নৌকা অজানা নিশানায়। বাদল এবার স্বর আর এক পর্দা তুলে বলল—

"দেবেন তো দিন, নইলে—

"না-না, তোমরা আমাকে না মেরে কিচ্ছু নিতে পারবে না।"

"বটে"—বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল স্থাপলা। পরমুহূর্ত্তেই স্থাপলা আর জীবু লোকটিকে আষ্টে চেপে ধরল আর বাদল তার সব কিছু মায় হাতের ঘড়িটি পর্য্যন্ত কেড়ে নিল। তারপর এক ধাক্কায় নদীর জলে ফেলে দিল লোকটাকে। বাঁচবার কি আকুতি! বারবার উপরে হাত তুলে আশ্রয় খুঁজছিল। কিন্তু সব বৃথা। ঘূর্ণাবর্ত্তের অতল তলে মিলিয়ে গেল লোকটা। বাদলের মনটা সেই দৃশ্যে এক অব্যক্ত বেদনায় টন্‌টন্‌ করে উঠল। মুখে সে কিছুই প্রকাশ করল না।

তিনবন্ধু দাঁড় বেয়ে চলল। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখতে পেল নদীর পাশে নিবিড় ঘন বন রয়েছে। এই ঘন বনকেই তাদের কাজ সমাধানের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করে সেখানে তিনবন্ধু নেমে পড়ল। ঝোপের আড়ালে একটা জায়গা বেছে নিয়ে তিনবন্ধু বসল লব্ধ পাওয়া জিনিষগুলির ভাগবাটোয়ারা করতে। তিনজনেই মনে মনে ভাবছে কি করে বেশী অংশ নেওয়া যায়। কিন্তু বেশী অংশ দাবী করতে গেলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-কাটি হওয়ার সম্ভাবনা। যাই হোক্ জীবু গুম হয়ে খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে নিল। পরে বলল, "আমি একটু চারদিক ঘুরে দেখে আসি। এখানেই তো আমাদের কিছুদিন থাকতে হবে।"—স্থাপলা তখন মনে মনে ফন্দি আঁটছে কি করে সবটাই তার ভাগে আসে। জীবু চলে গেল। বাদল কিছুটা উদাস মনে বসে বসে ভাবছিল—তাইত আমরা আজ দু-দুটো খুন করলাম। লোকটাকে কি নদীর জলে না ফেলে দিলেই চলত না? কিন্তু উপায়ই বা কি? ছাড়া পেলে যে পুলিশে ধরিয়ে দিত সবাইকে। বাদল বিমর্ষ মনে এমনি নানা এলোমেলো চিন্তা করছিল। হঠাৎ স্থাপলার ডাকে চমকে উঠল।

"বাদল—"

"কে, কে? ও স্থাপলা?"

"হ্যাঁ সোনু,—আর জীবুর অংশ আমরা দুজনের মধ্যে ভাগ করে নি। তারপর জীবু ফেরার আগেই যে পাড়ি। তখন আর আমাদের পায় কে? জীবু থাক এখানে নির্বাসনে। বাদলের মন কিন্তু এতে সায় দিল না। সে রাজি হতে চাইল না। অনেক পীড়াপীড়িতে অবশেষে রাজি হ'ল। সঙ্গের টাকা পয়সা নিয়ে স্থাপলা আর বাদল দু-বন্ধুতে এগোতে লাগল নদীর দিকে যেখানে তাদের নৌকা বাঁধা রয়েছে। বাদলের কেন জানি আজ বড় ভয় ভয় করছে। যন্ত্রচালিতের মত অন্যমনস্কভাবে সে চুপচাপ যাচ্ছে স্থাপলার সঙ্গে সঙ্গে। যেতে যেতে হঠাৎ স্থাপলা তাকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলে গলাটা চেপে ধরল। বাদল প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু যতই ও ছাড়াতে যায়, ততই স্থাপলার হাত বাদলের গলা সাঁড়াশির মত চেপে ধরে। আস্তে আস্তে বাদলের চোখে সম্মুখের পৃথিবীর আলো গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যেতে লাগল। অবশেষে সব কালো—ভালো আর কালো! চিরতরে সব কালো হয়ে গেল। বাদলকে খুন করে যে মুহূর্তে স্থাপলা উঠে দাঁড়িয়েছে, ওমনি দুটো হিংস্র চোখের সঙ্গে তার চোখের দৃষ্টির বিনিময় হ'ল। সে চোখ জীবুর। জীবু কর্কশ স্বরে বলে উঠল, "তুই বাদলকে মেরে ফেলি কেনরে পাপিষ্ঠ?"—স্থাপলা জীবুর ঐ মূর্ত্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে জীবুকে বলে টানতে গেল। আমতা আমতা করে বলল, "তুই আর আমি যাতে বেশী ভাগ পাই তার জন্যইত বাদলকে সরিয়ে দিলাম পৃথিবী থেকে—এটাও বুঝলি না?"—ওর কথা শুনে জীবু অকস্মাৎ গোটা বনটাকে কাঁপিয়ে বিকট ভাবে হেসে উঠল। হাসির বেগ থামতে বলল, "হাঁরে, ঘুঘু দেখেছিস, কিন্তু ফাঁদ তো দেখেছনি, এইবার দেখবি।"—বলে জোর করে স্থাপলার মুখে কী একটা তরল পদার্থ ঢেলে দেয় জীবু।

"উঃ, জ্বলে পুড়ে গেলাম রে, বাবারে"—বলে স্থাপলা ছটফট করে চেঁচাতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে ওর ছটফটানি বন্ধ হতে হতে দেহটা শক্ত হয়ে বেঁকে স্থির হয়ে গেল। স্থাপলার প্রাণহীন দেহটার দিকে তাকিয়ে জীবুর মুখে এক পৈশাচিক হাসি ভেসে উঠল। আজ ওরই জয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরই জয়। আজ বাদল, স্থাপলার সব ভাগই ওর। ও তাড়াতাড়ি গিয়ে ওদের ভাগ আর নিজের ভাগ বুকে তুলে নিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, নির্জনতা ভেঙে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। সূর্য্য তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। জীবু অধীর আগ্রহে ছুটল নৌকার পানে। কিন্তু হায়! সেব সফলতা আর এলনা জীবুর জীবনে। অতি আগ্রহে নৌকার উপর উঠতে গিয়ে পা পিছলে জলে পড়ে গেল। একটা ঢেউ এসে ওকে নিয়ে ফেল খরস্রোতা নদীর ঘূর্ণির আবর্তে। সূর্য্য হঠাৎ ডুবে গেল—সারা নদী, অরণ্য ও পৃথিবীতে নেমে এল গাঢ় অন্ধকার।

চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের আরেকটি আজব-মজার বিজ্ঞানের খেলা দেখানোর কলা-কৌশলের কথা বলি। এ কলা-কৌশলটুকু বেশ ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়ে, ছুটির দিনে কিম্বা নিত্য-নৈমিত্তিক পড়াশুনোর অবসরে বাড়ীতে আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে বিচিত্র-মজার এই বিজ্ঞানের খেলা দেখিয়ে তোমরা অনায়াসেই তাঁদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো।

পরিষ্কার কাগজের উপর যদি জলছবির মতো কোনো ছাপা ছবি কিম্বা লেখার হুবহু প্রতিলিপি ফুটিয়ে তুলতে চাও তো তার সহজ-সরল উপায়টুকু শিখে রাখো।

সে উপায়টি হলো—এক গামলা গরম জলে খানিকটা সাবানের গুঁড়ি আর সেই সঙ্গে আধ পাইট তার্পিন-তেল (Turpentine) চায়ের চামচের আধ-চামচ 'অ্যারোম্যাটিক-স্পিরিট অফ্ অ্যামোনিয়া (Aromatic Spirit of Ammonia) এবং দশ-ফোঁটা কেরোসিন তেল মিশিয়ে নাও। এগুলি মিশিয়ে তরল-স্বচ্ছ যে বিচিত্র দ্রাবক পদার্থ তৈরী হলো, সেই দ্রাবকে ছবি বা লেখা ছাপা কাগজখানিকে চুবিয়ে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ভিজিয়ে নাও।

এভাবে ভিজিয়ে নেবার পর, শুকনো পরিষ্কার যে কাগজখানিতে নক্সার হুবহু প্রতিলিপি মুদ্রিত করবে, সেটিকে সমতল মেঝে কিম্বা টেবিলের উপর বিছিয়ে রেখে, সে-কাগজের গায়ে সযত্নে-সাবধানে দ্রাবক-সিক্ত ছবি বা লেখা ছাপা কাগজখানিকে সেঁটে বসিয়ে দাও। দ্রাবক-সিক্ত কাগজের যেদিকে ছবি বা লেখা ছাপা রয়েছে, সেদিকটিই শুকনো পরিষ্কার কাগজের সঙ্গে লেপে থাকা চাই।

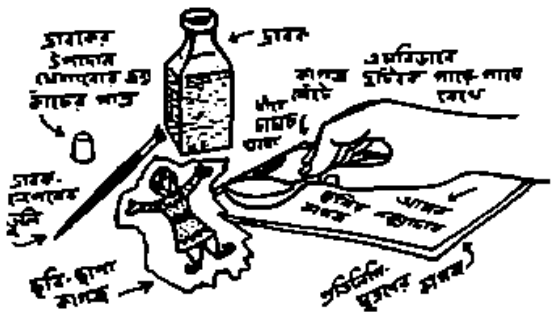

এমনি উপায়ে দু'খানি কাগজ গায়ে-গায়ে লেপে লাগিয়ে নিয়ে, উপরের নক্সার নমুনানুসারে যে কাগজে ছবি বা লেখা ছাপানো রয়েছে, সেই কাগজখানির উল্টো পিঠে ধীরে ধীরে মৃদু-চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ চামচ বুলাও। তাহলেই দেখবে—চামচের চাপে পরিষ্কার কাগজের বুকে দিব্যি সুস্পষ্টভাবে দ্রাবকসিক্ত কাগজের ছাপানো ছবি বা লেখার হুবহু প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়ে উঠেছে।

এ উপায়ে, শুধু শাদা কাগো রঙে ছাপানো ছবি বা লেখার প্রতিলিপি মুদ্রণই নয়, নানা রঙে ছাপা যে কোনো ছবি কিম্বা লেখারও অবিকল প্রতিলিপি তুলতেও এতটুকু অসুবিধা ঘটবে না।

বিচিত্র উপায়ে ছাপানো ছবি বা লেখার হুবহু প্রতিলিপি মুদ্রণের সহজ সরল কলা কৌশল তো মোটামুটি শিখলে, এবারে তোমরা নিজের হাতে পরখ করে রাখো এই আজব কেরামতীটির আসল রহস্য।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি মজার কারসাজির কলা কৌশলের পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। হেঁয়ালী-ছবি :

আমাদের গাঁয়েথেকা চিত্রশিল্পী-মশাই সেদিন এক-খানি হেঁয়ালি-ছবি এঁকে সম্পাদকের দপ্তরে এসে হাজির। চিত্রকর-মশাইয়ের আঁকা সেই হেঁয়ালি-ছবির হুবহু নমুনাটি আমরা নীচে ছেপে দিলুম।

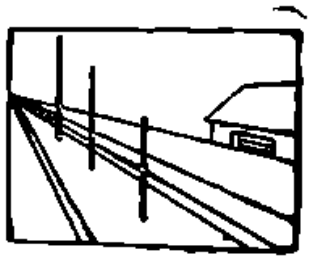

ছবিতে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছো—শহরের বাঁধানো-সড়কের মাঝখানে লম্বা-ছাঁদের তিনটি দণ্ড খাড়াভাবে দাঁড় করানো রয়েছে। বলতে পারো—উপরের ছবিতে দেখানো এই তিনটি দণ্ডের মধ্যে কোনটি বড়-মাপের, কোনটি মাঝারি-মাপের এবং কোনটি ছোট-মাপের ?··· চিত্রকর-মশাইয়ের আঁকা এই হেঁয়ালি-ছবির সঠিক উত্তরটি আমাদের দপ্তরে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে··· তোমাদের জবাব পেলেই আমরা সেটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখবো···এবং যাদের উত্তর নির্ভুল হবে, আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তাদের প্রত্যেকেরই নাম-ধাম ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে সবাইকে জানিয়ে দেবো।

২। কিশোর-জগতের সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

দু'অক্ষরে নাম মোর—
পেলে হই খুশী ;
চাও যদি, মনে হয়—
মারি দুই ঘুসী।
অর্দ্ধের আকার যদি
লোপ করো, ভাই—
ধরার রবো না···নেবো আকাশেতে ঠাঁই।

রচনা : কল্যাণী মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

৩।

শত-ছিদ্র পাত্র, তবু
সুধা পাওয়া যায়,
শত শত রক্ষী তারে
পাহারা দেয় ঠায় ;
ছুঁইতে গেলে সে মধু,
নিস্তার আর নাই,
পলকে শলাকা বিঁধে—
জ্বালা খুবই পাই।

রচনা : ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষক (বাঘবেড়িয়া)

ফাল্গুন মাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালির উত্তর :

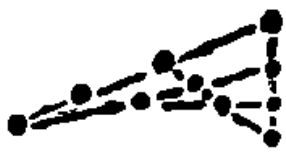

উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি-ভাবে সাজালেই হেঁয়ালীর সঠিক-সমাধান করা যাবে।

২। কাজল
৩। বসুধারা

ফাল্গুন মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

রাজা, কুটন ও পুপু (কলিকাতা), পূরবী, সুমিতা, সমীরকুমার ও সঙ্গীতকুমার মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ) বিজয়া ও সৌরাংশু আচার্য্য (কলিকাতা), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), বাপি, বুতাম, পিন্টু ও অশোক গঙ্গো-পাধ্যায় (বোম্বাই), শর্মিষ্ঠা ও সখমিত্রা রায় (কলিকাতা), রিনি ও রবি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), বুবু ও মিঠু গুপ্ত

(কলিকাতা), হরিদাস, বৈকুণ্ঠ, কানু ও পুরন্দরী তরফদার (ইছাপুর), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), রাণা ও বুনা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সন্তোষ, সন্তু, দুবারি, অমিয় ও সুনীল (ভিলাই), ধ্রুব, খোকন ও কাবুল চক্রবর্ত্তী (কৃষ্ণনগর), ফণী, রোচনা ও নবীনা সাহা (কলিকাতা)।

ফাল্গুন মাসের দুইটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

দেবকীনন্দন ও বিশ্বনাথ সিংহ (গয়া), বিপ্লব, বিনয়, ইন্দ্রজিৎ, অভয় শর্ম্মা, (হাজারীবাগ), অমিত, প্রশান্ত, কৃষ্ণলাল, সুনীত, মৃণাল, অমৃত, অজিত, তিনকড়ি, পুলিন ও হরিদাস (পড়িয়া), বেণু, ডলি, পলি, মলি, দুর্গা, প্রণব, খুকু, প্রশান্ত ও ক্ষেপী (রাণাঘাট), ক্ষেত্রমোহন, ত্রিলোকীমোহন, সুষমা, গুণময়, গৌরীমোহন চট্টোপাধ্যায় (চন্দ্রেশ্বর), কল্যাণ, শচীন, রজত, বিশ্বতোষ, ইন্দ্র, ও বিমল (কলিকাতা), সকিতা, টুলটুল, কুসকুস, বুবুন, নন্দা, মিনতি, তিনু, ছন্দা, অলকা, গোপেন, চন্দ্রকুমার, আনন্দ ও মনোমোহন পালিত (বিলাসপুর), পৃথ্বীশ, মন্তোষ, আশুতোষ, নীলমণি, সুশীল, নির্ম্মল ও লাবণ্য রায়চৌধুরী (বর্দ্ধমান), রবি, মীরা, অনিল মুখোপাধ্যায় (দ্বারভাঙ্গা), পুলিন ও পূর্ণিমা গঙ্গোপাধ্যায় (পাটনা) দীপঙ্কর, বাদল ও কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় (হাওড়া), বিমল ও মাণিক ঘোষ (হুগলী), কবি, অধীর ও অমিতাভ হালদার (জগদ্দল)।

ফাল্গুন মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

হীরেন ও সুমিতা ঘোষ (কলিকাতা), অরুণ, বেণু, দুলাল, মালতী, শ্যামসুন্দর ও মতী পাল (রায়পুর), বিজন দাস (কলিকাতা), ভাষা, রুবি ও খুশী (উত্তরপাড়া), বাচ্চু, লালু, ঘণ্টি, মণ্টু পান্থ, দামু ও গোকুল তালুকদার (ডায়মণ্ডহারবার), নরেন, বরেন, হরেন, চম্পকলতা, কনকলতা, কাঞ্চনমালা সেন (জব্বলপুর), নলীনেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, নীহারিকা, সাগরিকা ও তুহিনা চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), কাদের নওয়াজ (মুর্শিদাবাদ),

মাঘমাসের ৩নং ধাঁধার উত্তর—শিশির, জোনাকী বাগচী।

নূতন ধাঁধা :

উর্দ্দুজানা মৌলভী সাহেব নূতন বাংলা শিখেছেন তাই চেষ্টা করেন শিশুদের মতনই সকল বাংলা লেখা পড়তে। একদিন বৈঠকখানায় বসে আছেন তিনি বন্ধুদের সাথে, ডাকপিওন এসে দিয়ে গেল একখানা চিঠি তাঁর হাতে। চিঠিখানার শিরোনামাটা বাংলাতে লেখা থাকলেও অভ্যাসবশতঃ ভুল করে তিনি পড়লেন নামটা উর্দ্দুপড়ার ধরণে, অর্থাৎ বাংলা পড়ার রীতিতে বাঁয়ে থেকে ডাইনে না পড়ে পড়লেন তিনি ডাইনে থেকে বাঁয়ে যেমনভাবে পড়তে হয় উর্দ্দু আরবী ইত্যাদি। নামটা পড়ে তিনি যার চিঠি তাকেই দিয়ে দিলেন ঠিকমত।

বলত কি সেই নামটা যে নামটা পদবী সমেত উল্টোদিক থেকে পড়েও মৌলভীসাহেব ঠিকমতই পড়েছিলেন সেই বাঙ্গালী নামটা ? রচনা—জোনাকী বাগচী পূর্ব্বপুঠিয়ারী

রবীন্দ্ররচনায় শিশু

শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী

রবীন্দ্র সাহিত্যপারাবারের তীরে সকলের সঙ্গে শিশুদেরও আছে মেলা জমাবার সুপ্রচুর অবকাশ। কবির বিপুল সাহিত্যকর্মের মধ্যে যে অবকাশের ব্যাপকতা, বিচিত্রতা, বিপুলতা সত্যিই বিস্ময়কর। শুধু মাত্র শিশুদের জন্য রচিত কবির রচনাগুলিই যেকোন সাহিত্যিককে বিশ্বসাহিত্যিকের পর্যায়ে আখ্যাত করার পক্ষে যথেষ্ট। কবির 'শিশু' কাব্যগ্রন্থখানি Cresent moon নামে ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হবার পরে গীতাঞ্জলির মতই সমাদর লাভ করেছিল সারা ইউরোপে। শিশুদের জন্য রচনা ও রচনায় শিশু চরিত্র চিত্রণের মধ্যে প্রেরণা হিসাবে কবির বালক কালের স্মৃতিমন্থন ও কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর পুত্রকন্যাদের শোক মোচনের যথার্থতা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে শুধু মাত্র স্মৃতি মন্থন ও শোক মোচনের উদ্দেশ্যেই কবিতাগুলির উদ্ভব হলেও সেটাই শেষ কথা নয়।

শিশুর জগৎ আনন্দের জগৎ। কবিরও বিচরণ আনন্দলোকে কিন্তু শিশু প্রকৃতিসৃষ্ট তাই তার কাজের মধ্যে সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া নাই। কবি বয়স্কলোক তাই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তিনি অনেকখানিই মনুষ্যসৃষ্ট। ফলে কবির আনন্দ ও শিশুর আনন্দে স্বভাবতই ফাঁক থেকে যায় অনেকখানিই। কবিও একদিন শিশু ছিলেন তাই তিনি যখন মানসভ্রমণে ফিরে যেতেন শিশুকালে তখন সেদিনকার মনের কথা ফুটে উঠতো তাঁর রচনায়।

কবিও একদিন ছিলেন শিশু। তাঁর জন্যেও
'...বিধাতা রেখেছিলেন গড়ে
অকর্মণ্যের অপ্রয়োজনের জল স্থল আকাশ।'

বয়সের ধর্মে সেখান হতে সরে যেতে হয়েছে কবিকে, তবু সেদিনকার কথা-বছরে বছরে নাড়া দেয় তার গানের সুরকে আর মনে পড়ে—

'...সেদিনকার আমারি মতো অনেক ছেলে
আছে ঘরে ঘরে,
তাদের মনের কথা তারাই জানে।'

সে ছেলেদের মনে 'সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা, পদে পদে দামের খুটিনাটি'র হিসাব নাই। কিন্তু কবির ছিল বড়ো হওয়ার দায়, 'বড়ো হবার দায় নিয়ে, এই বড়োর হাটে এসে নিত্য চলে ঠেলাঠেলির পালা।' তাই কবির মনের চিরকালে শিশু বার বার ফিরে যেতে চাইত শিশুর জগতে, শিশুর আনন্দলোকে।

'শিশু হবার ভরসা আবার
জাগুক আমার প্রাণে,
লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে।
ভবিষ্যতের মুখোশখানা
খসবে একটানে,
দেখব তারেই বর্তমানের কালে।'

যে শিশুর কাছে চেনা অচেনার হিসাব নাই, 'নাই বুদ্ধি দীপের আলো জ্বালি হাওয়ায় শিখা কাঁপছে খালি, হিসেব করে পা টিপে পথ হাঁটার সময়তা।' কাজ অকাজের ভিড় হতে কবি তাই বার বার ছুটি চেয়েছেন আর চেয়েছেন শিশু লীলার মধ্যে ডুব দিতে। কারণ সেখানে

'ছাদের কোণে পুকুর পারে
আমার নিত্য অজানারে
মিলিয়ে রবে অচেনা আর চেনা;
জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা
তৈরী হবে আমার খেলা
সুখ রবে মোর বিনামূল্যেই কেনা।'

(শিশুর জীবন : শিশু ভোলানাথ)

শিশুর মতই কবিও সর্বকালের, তারও কল্পলোক অসীম। কিন্তু শিশুর কাছে তিনি চিরকালের কেনা। বিনামূল্যে কেনা সুখের আশায় কবি বিকিয়ে আছেন শিশুর কাছে,

'সাগরতীরে রোদ পড়েছে, ঢেউ দিয়েছে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।
যেন আমায় চিনে বললে—
'অমনি নেব কিনে।'
কোলা আমার খালাস হোলো তখনি সেই দিনে।
খেলার সুখে বিনামূল্যে নিল আমায় কিনে॥'

(চরমমূল্য : গীতিমালা)

নানা কাজের ভীড়ের মধ্যে তাই একটু খানি ফাঁক পেলেই, একটু অবসর করে নিয়ে কবি মাঝে মাঝে ফিরে যান অতীতের কোলে শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিতে, নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বর্তমান কাল হতে 'ছুটি করে সেই কেলে-আসা শৈশব কালের মধ্যে মিশে যেতে।

'আমেরিকার বস্টগ্রাম থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম, বন্দী ফাঁক পেলেই যেমন ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে।.....প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তার খেলার ক্ষেত্র লোকে লোকান্তরে বিস্তৃত, এই জন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।

(শিশু ভোলানাথ : পরিশিষ্ট)

শিশু ভোলানাথের কবিতাগুলি রচনার প্রায় এক যুগ পূর্বে রচিত হয়, 'শিশুর' কবিতাগুলি। তারও বহুপূর্ব হতেই কবির চারণ শুরু হয়েছে শিশু জগতে। 'জগৎ পারাবারের তীরে শিশু মহামেলার আনন্দ যজ্ঞে তাঁর পদার্পণ অনেক দিনের।

'জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা
কত্থা ফিরে গগন তলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণ দূত উড়িয়া চলে
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা"।

(শিশু)

শিশু নিত্যকালের, চিরপুরাতন। অনাদি কালের প্রথম প্রভাতে তার মহা আবির্ভাবের দিন হতে আজও সে নিত্য।

'সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—

(জন্মকথা : শিশু)

কবির মতে সাধারণ মানুষের বিধি-নিষেধ ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দের পরিসীমার মধ্যে শিশুর আচরণকে—শিশু মানসকে বেঁধে রাখা যায় না, তাই শিশুচরিত্র আমাদের কাছে মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়—মনে হয় ত অসামঞ্জস্যে ভরা, কিন্তু শিশু শিশুই—সে সর্বকালের, সব চেয়ে পুরাতন, কবি শিশুর বয়সকে টেনে নিয়ে গেছেন কৈশোরের শুরু পর্যন্ত, মোটা বালাকালই শিশুর জীবন বলে ধরেছেন তিনি।

"শারদত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ বারো ছিল তখন তাহারা কেবলই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান করিয়াই দিন কাটাইয়াছে, একথা যদি কোনো পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য নই—কারণ শিশুচরিত্র নামক পুরাণটি সকল পুরাণের অপেক্ষা পুরাতন। তাহার মত প্রামাণিক-শাস্ত্র কোনো ভাষায় লিখিত হয় নাই।

(পিতৃস্মৃতি : জীবনস্মৃতি)

আদি শিশুর জন্মের পর হতে নানা বিবর্তন পরিবর্তনের মধ্যে মনুষ্য সমাজ এগিয়ে এসেছে আজকের দিনে। এই দীর্ঘ কালের মানুষের ইতিহাস বয়স্ক মানুষেরই ইতিহাস—নিরন্তর নিয়ম কানুনের মধ্যে উত্থান পতনের ইতিহাস। শিশু সে ইতিহাসের সঙ্গী হলেও অংশী নয়। সে চিরনূতন আবার চির পুরাতন।

"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মত পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানুষের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে; কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে

শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম যখন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার, যেমন বৃদ্ধ যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন, কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা।'

(ছেলে ভুলানো ছড়া)

বয়স্ক মানুষের ভীড় হতে কবি তাই মাঝে মাঝে ফিরে যেতেন চির-নবীন চিরপুরাতন খোকার রাজ্যে—'খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে'। তাঁর নিজের জীবনের সে রাজ্যের কথা তিনি লিখেছেন 'ছেলে বেলার' 'জীবনস্মৃতি'তে। ছেলেবেলার ভূমিকায় বলেছেন, 'তাহলে, ছেলে মানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক্। চেষ্টা করলুম সেই অতীতের প্রেতলোকে প্রবেশ করতে। এখনকার সঙ্গে তার অন্তর বাহিরের মাপ মেলে না। তখনকার প্রদীপে যত ছিল আলো তার চেয়ে ধোঁওয়া ছিল বেশি। বুদ্ধির এলাকায় তখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয়নি, সম্ভব অসম্ভবের সীমা সরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো।'

কবির সেই 'অতীতের প্রেতলোকের' স্মৃতি আর বয়স্ক কবির শিশুমন কল্পনার সংমিশ্রণে শিশুদের জন্য তাঁর রচনার মধ্যে শিশুমনের বিকাশ যেমন অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে তেমনি বিশ্লেষিত হয়েছে শিশুমনের বৈচিত্র্য নানা ভাবে। অবশ্য শিশুদের জন্য রচিত সবগুলিই যে শিশুদের কাছে পরম উপাদেয় বলে মনে হবে তা মনে করার কোন হেতু নাই। শিশুর জগতের সঙ্গে কবির কল্পনার জগৎ যখন এক হয়ে মিশে গেছে তখনই সার্থক হয়ে উঠেছে সেই রচনা। কিন্তু কবির কল্পনার জগৎ যখন উধাও হয়ে গেছে মর্তলোকের সীমা ছাড়িয়ে অসীমের অন্বেষণে তখন ঘুড়ির সঙ্গে মাটির যোগসূত্রটি ছিঁড়ে গেছে আর সে সুর মিশে গেছে নিঃসীম শূন্যে। ফলে শিশুদের জন্য রচনার কিছু কিছু শুধু শিশুদের পক্ষেই নীরস বা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেনি ; বয়স্কদের পক্ষেও খুব সহজ পাচ্য নয়।

কবির কল্পনার জগৎ হতে যে সমস্ত শিশু রূপপরিগ্রহ করেছে তাঁর লেখনীতে তারাও যে সবাই আমাদের ঘরের আটপৌড়ে ছেলে তা নয়, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ কল্পনার খোলস ছেড়ে ধূলা মাটি জল হাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি, মাটির ছোঁয়া পাবার কোন অবকাশ ঘটেনি তাঁদের জীবনে।

'ডাকঘরের' অমলের কথাই বলি। সে যেন হারিয়ে যাওয়ার জন্যই জন্ম নিয়েছে—সে হারিয়ে যাওয়া তার বর্তমানের সংকীর্ণ গণ্ডীর জীবন থেকে বৃত্তর, মহত্তর জীবনে। তাকে কি আমরা পুরোপুরি চিনি? তার জন্য যেমন কবির কল্পলোকে, বিলুপ্তিও সেখানেই। বিশ্ব প্রকৃতির বিচিত্র রূপের সঙ্গে তার পরিচয় জানালা দিয়ে। সামনে গেছে পথ—সে পথে জীবন বয়ে চলে বিচিত্র ধারায়—অবিচ্ছিন্ন গতিতে ; কিন্তু তার সবটাই থাকে অমলের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

এ যেন অনেকটা কবির নিজেরই কথা। বিলাইহহে বোটে বসে জানালা দিয়ে তিনি যেন দেখছেন বাইরের বিচিত্র জীবন, জগৎ, প্রকৃতি। অসীম প্রকৃতি ব্যাকুল করে তোলে কবিকে, হাতছানি দিয়ে ডাকে, তারপর এক দিন যখন সত্যিকারের ডাক আসে কবি চলে যান বৃহত্তর মহত্তর জগতে—অমল ঘুমিয়ে পড়ে রাত্রা কখন এসে ডেকে পথে নিয়ে যাবেন সেই অপেক্ষায়—পড়ে থাকে শূন্য খোল উড়ে যাওয়া পাখীর শূন্য নীড়ের মতো।

ডাকঘরের শিশু মনের জগৎ কল্পনার জগৎ। এতে অরূপকে অপরূপ করে তোলা হয়েছে, মূর্ত করা হয়েছে একটা আইডিয়াকে কিন্তু ধূলা মাটি জল হাওয়ায় তাকে জীবন্ত করা যায়নি। কবিতায় বা নাটকে এই ধরণের চরিত্র কিছু অবাস্তব বা অকল্পনীয় বলে মনে নাও হতে পারে কিন্তু গল্প উপন্যাসে এদের যে স্বভাবতই অস্বাভাবিক বলে মনে হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

কাজেই রবীন্দ্র-রচনার মধ্যে শিশু মানসের বিচ্ছিন্ন ভাব ভাবনা দুঃখ বেদনার চিত্রগুলির কথা বাদ দিয়ে বিশেষ ভাবে শিশু চরিত্রগুলিকে আহরণ করতে গেলে উপন্যাস ও গল্পের মধ্যে তাদের খুঁজতে হবে। কিছু কিছু কবিতায় শিশুমনের ভাবরূপ আর কিছু নাটকে শিশুর কল্পরূপকে আমাদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না, অনুভূতি, উপলব্ধি আর সহৃদয়তার জীবন রসে তাদের সঞ্জীবিত করতে হয়, তাদের আপন করে নিতে হয় আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। গল্প ও উপন্যাসে এরাই ভীড় করে আছে তাদের স্বরূপ নিয়ে। সেখানে শিশুরা এসে

দাঁড়িয়েছে আমাদের আপন মনের মতো, 'হাসি কান্নার দোল দোলানে তাদের চির নবীন বৈচিত্র্য নিয়ে—এসে দাঁড়িয়েছে মাটির বুকে দুহাত ভরে ধুলো কাদা মেখে।

কবিও তাঁর শিশু সাহিত্যের এই আংশিক অপূর্ণতার বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। তাই অধিকে মাষ্টার যখন কবির কাছে দুঃখ করে গেল

'শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগেনা কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।
পাতাগুলো দুষ্টুমি করে কেটে রেখে দেয়
বলে, ইঁদুরে কেটেছে।
এত বড় বাঁদর।

কবি তার উত্তরে বলেছেন—

'সে ত্রুটি আমারই,
থাকত ওর নিজের জগতের কবি,
তাহোলে ওবরে পোকা এত স্পষ্ট হোতো
তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না ;
কোনোদিন বাঘের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে
আর সেই নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডি।

(ছেলেটা : পুনশ্চ)

দুই

শিশুমনের চাবি কাঠি ছিল কবির হাতে। শিশু মনের বিভিন্ন কুঠরিতে তাই তাঁর যাতায়াত ছিল সাবলীল। শিশুর সুখ, দুঃখ, কৌতূহল, অভিমান, অনুকরণ প্রবৃত্তি, ঘুষুৎসা, আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রভৃতি নানা বিচিত্র ভাবের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে। 'খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে' গিয়ে না বসতে পারলে কারো পক্ষেই এসব কথা এত নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কবি তাই চেয়েছিলেন—

'খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসে সে নিভৃতে।'

কারণ শিশুমনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে না পারলে শিশু মনের বিচিত্র গতি-প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। তার অন্তহীন অনন্তবের পরিসীমায় সে মনের ঠিকানা পাওয়া ভার—সৃষ্টিছাড়া তার কাজ মানে না কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা।

'খোকার মনের ঠিক মাঝখান যেঁষে
যে পথ গিয়েছে সৃষ্টি শেষে
সকল উদ্দেশ-হারা
সকল-ভূগোল ছাড়া
অপরূপ অনন্তব দেশে—
যেথা আসে রাত্রিদিন
সর্ব ইতিহাস হীন
রাজার রাজত্ব হতে হাওয়া—

(খোকার রাজা)

সে পথের একধারে বসে সেখান দিয়ে কারা যাওয়া আসা করে তাই দেখতে চেয়েছেন কবি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? তিনি তো তার আগেই পৌঁছে গেছেন 'খোকার মনের ঠিক মাঝখানটি' ছাড়িয়ে একেবারে শিশুমনের মণি-কোঠায়, নিজের অতীত শৈশবের স্মৃতির সহায়তায় শিশু মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় বিশ্লেষণে তিনি যে শিশু কবিতাগুলি রচনা করেছেন তার মধ্যে শুধু শিশুর সহজ ও সরল ভাবনাই প্রতিফলিত হয় নি, তাতে প্রয়োগ করেছেন শিশুর একান্ত তন্ময়তা।

শিশু মনের প্রাথমিক বিকাশ দেখা যায় তার কৌতূহলে। শিশুর সেই কৌতূহলের চরম প্রকাশ দেখা যায় 'অন্তকথা' কবিতায়।

'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'

অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ প্রশ্ন। আর তার প্রকাশও অপূর্ব। কিন্তু তার পরেই এই কবিতায় যে কথাগুলো বলেছেন কবি শিশুর প্রশ্নের উত্তরে তার মায়ের মুখ দিয়ে তার মধ্যে শিশুর জানার ও বুঝার অতিরিক্ত আছে সবটুকুই। কিন্তু সেখানে উত্তরের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু নাই বা নাই কিন্তু অস্বাভাবিকতা।

শিশুর কৌতূহলের অন্য এক প্রকাশ দেখা যায় তার জিজ্ঞাসু মনের প্রথম বিকাশে। তখন সে যা দেখে তাই জানতে চায়। যা শোনে তাই জানতে চায়। তা ছাড়াও তার মনে আরো অনেক প্রশ্ন ভীড় করে যে গুলোর উত্তর

হয় নানান বিপরীত অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে। পড়া পড়া খেলা তার ভাল লাগে কিন্তু সত্যিকার পড়ার জ্বালা তার সয় না। তাই পড়তে বসে কল্পনায় সে মনে করে ওই তো বিকেল হয়ে এলো, সূর্য ডুবে যাচ্ছে,দীঘির জল কালো হয়ে আসছে, ফিরে আসছে সবাই হাটের থেকে, চাষীরা ফিরে এলো মাঠ থেকে, কাজেই আর কত পড়ব। মাকে বলে—'মাগো আমায় ছুটি দিতে বল, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা। এখন আমি তোমার ঘরে বসে করব শুধু পড়া পড়া খেলা' মার তাতে আপত্তি থাকে। তিনি বলেন 'দুপুর এখন সবে।' শিশু তা মেনে নিয়েই উত্তর দেয়—

'একদিনও কি দুপুর বেলা হলে
বিকেল হল মনে করতে নাই ?'

শুধু নিজেই সে কথা সে মনে করে না, মাকেও বলে—

'মনে কর-না উঠল সাঁঝের তারা,
মনে করনা সন্ধে হল যেন।
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন।'

(প্রশ্ন)

দুপুর হলেই সন্ধে হল মনে করেই তার ভাবনা শেষ হয়না অন্যদিনের তুলনায় রবিবার কেনই বা এত দেরী করে আসে আর কেনই বা এত তাড়াতাড়ি চলে যায় সে ভেবে পায় না।

'সোম মঙ্গল বুধের খেয়াল
থাকবার জন্যেই
বাড়ি ফেরার দিকে ওদের
একটুও মন নেই।
রবিবারকে কে যেন এমন
বিষম তাড়া করে,
ঘণ্টাগুলো বাজায় যেন
আধ ঘণ্টার পরে।" (রবিবার)

কাজেই থাকনা সব চিন্তার শেষ হয়ে। ঘণ্টা, মিনিট, সকাল-দুপুর, সোম, মঙ্গল সব চিরকালের মতই শেষ হয়ে গেলে আপদ চুকে যায়।

যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে নেই বা গেলেম, কেউ যদি কয় মন্দ,
আমি বলব দশটা বাজাই বন্দ।'

স্কুলে যাওয়াই যদি বন্ধ হয়, সময় বলেই যদি কিছু না থাকে তা হলে—'সময় যদি ফুরোয় তবে ফুরোয় না তো খেলা, ফুরোয় না তো গল্প বলার খেলা।' (সময়হারা)

শিশু মনের দুঃখ ও অভিমানের কথায় 'পুতুল ভাঙা' 'মূর্খ, 'দুষ্ট' প্রভৃতি কবিতাগুলি অনবদ্য। 'সাত-আট্‌টে সাতাশ' বলেছিল বলে গুরুমশায় রেগেমেগে রথের দিনে পাঁচ পয়সায় কেনা রঙীন পুতুলটা ভেঙে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে বলেছেন—

'তোর দিনরাত্তির
কেবল যত খেলা।
একটুও তোর মন বসে না
পড়াশুনোর বেলা।'

(পুতুল ভাঙা)

শিশুর এ দুঃখের শেষ নাই। তাই সে নালিশ জানাতে চায় গুরুমশায়ের গুরুর কাছে। তাঁরও তো কোনো রকম পুতুল থাকতে পারে আর সেই পুতুল নিয়ে খেলা করতে গিয়ে কোনো না কোনো সময় তাঁরও পড়ায় ক্ষতি হতে পারে, তাহলে তখন—

'ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে
ভাঙেন কেহ রাগে,
বল দেখি মা, ওঁর মনে তা
কেমনতরো লাগে।'

গুরু মশায়ের অবিবেচনার ফলেই যে তার দুঃখ হয় তা নয়, মায়ের উপরও তার অভিমান কম নয়। মা তাকে বলেন মূর্খ, দুষ্ট। যেন মূর্খ দুষ্ট আর কেউ কোথাও নাই। তাছাড়া সেও তো পণ্ডিত হতে চায় না।

'যখন গিয়ে পাঠশালাতে
দাগা বুলোই খাতার পাতে,
গুরুমশায় দুপুরবেলায়
বসে বসে ঢোলে,
হাঁকিয়ে গাড়ি কোন গাড়োয়ান
মাঠের পথে যায় গেয়ে গান
শুনে আমি পথ করি যে
মূর্খ হব বলে।'

(মূর্খ)

'মূর্খ যারা তাদেরই তো সমস্তখন ছুটি'। 'তারাই তো সব রাখাল ছেলে গোরু চরায় মাঠে', 'তারাই মাঠে মাঠা খেতে পাখি তাড়ায় ফসল খেতে', 'বাঁকে করে দই নিয়ে যায় পাড়ার ঘরে ঘরে', 'কাস্তে হাতে চুবড়ি মাথায় সন্ধ্যে হলে পরে ফেরে তারা কৃষাণ ছেলে',—'এরা যে পাঠ-ভোলার দলে পাঠশালা সব ছাড়তে বলে'। কাজেই শিশুও মূর্খ হয়ে থাকতে চায়—সে পণ্ডিত হয়ে কারো আদর চায় না—বরঞ্চ মূর্খ হয়ে মায়ের আদর পেয়েই খুশী হয়ে থাকতে চায়।

লেখাপড়া করতে চায় না বলে মা বলেন মূর্খু হয়ে থাকবে আবার দুষ্টুমিতে ভিজে এলে, কর্দা জামাকাপড় মলিন করে এলে মা বলেন দুষ্টু। সে কথা নিয়েও তার অভিমানের অন্ত নাই।

'পাঠকড়ি ঘোষ লক্ষ্মী ছেলে,
ঘরপাড়ার সবাই
তোমার কাছে আমিই দুষ্টু,
ভালো যে আর সবাই।
তোমার কথা আমি যেন
শুনিনে কক্ষনোই।
জামা কাপড় যেন আমার
সাফ থাকে না কোনোই।' (দুষ্টু)

শিশুর অভিমান যে কোন অবস্থাতেই উথলে উঠতে পারে। সে তার নিজেকে নিয়েই হোক আর তার খেলার পুতুল বা সঙ্গী নিয়েই হোক। খেলার পুতুল বা সঙ্গীদের জন্য তার সমবেদনারও অন্ত নাই। কুকুর ছানা আর টিয়ে পাখিটাকেও সে তার নিজের মতই ভাবে। কিন্তু তাদের ও তার কাছে মায়ের আদরের তফাৎ দেখে সে ব্যথা পায়। তাদের প্রতি সমবেদনায় তার মন ব্যথাতুর হয়ে উঠে।

'যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই তাতে
তুমি করতে আমায় মানা ?'

আর—

'বলতে আমায় 'দূর দূর দূর',
কোথা থেকে এল এই কুকুর ?'
যা যা তবে যা যা
আমার কোলের থেকে নামা।
আমি যাব না তোর হাতে,
আমি যাব না তোর পাতে। (সমব্যথী)

টিয়ে পাখিটাকে মা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন পাছে সে উড়ে যায় বলে। এতেও ব্যথা লাগে শিশুর মনে। অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে—

'আমি রব না তোর কোলে,
আমি বনেই যাব চলে।'

শুধু খেলার সঙ্গীর জন্যেই তার সমবেদনা জাগে না; মাঝে মাঝে মায়ের জন্যেও জাগে। যখন দীর্ঘদিন ধরে বাবার চিঠি না পেয়ে মা ব্যাকুল হয়ে উঠেন, শিশুর মনেও তার দাগ পড়ে। সেও সমবেদনায় ব্যথিত হয়। সে সান্ত্বনা দেয় মাকে—

'মা গো মা, তুই আমার কথা শোন্।
ভাবিস্‌নে মা, অমন সারাক্ষণ।
কালকে যখন হাটের বারে
বাজার করতে যাবে পারে
কাগজ কলম আনতে বলিস কিনে।
দেখো ভুল করব না কোনো
ক খ থেকে মূর্ধন্য ণ
বাবার চিঠি আমিই দেব লিখে।'
(ব্যাকুল)

ছোটো বলেই শিশুদের নানা চিন্তার টুকরোকে আমরা এড়িয়ে যাই বা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই। কিন্তু সেই সঙ্গে ভেবে দেখি না যে তাদের মধ্যেও ছোট বড় ভেদজ্ঞান বা আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা বেশ ভালভাবেই প্রকাশ পায় নানা কথার মধ্যে, অনেক কাজের মধ্যে, আচরণের মধ্যে 'আমি যখন বাবার মতো হবো'—এই কথাটাই অনেক শিশুর মুখে শোনা যায়। বাবার কাঁধে চেপে বাবার চেয়েও বড় হয়ে শিশু—দাদাদের সে আমলেই আনে না।

'এখনো তো বড়ো হইনি আমি,
ছোটো আছি ছেলেমানুষ বলে।
দাদার চেয়ে অনেক বড় হব
বড় হয়ে বাবার মত হলে।'
(ছোটো বড়ো)

তখন দাদা যদি পড়তে না গিয়ে পাখীর ছানা পোষে তবে সে তাকে বকে দেবে, বলবে, 'তুমি চুপটি করে পড়ো।' বলবে 'তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে'। গুরুমশায় এসে যখন বলবেন 'শ্লেটে কোথা? দেরী হচ্ছে বলে পড়া করো।' সে বলবে—'খোকা তো আর নেই। হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।' পূজোর ছুটিতে বাবা আসবে হরীন জাধা জুতো নিয়ে, বলবেন 'পরো'। খোকা বলবে—

'দাদা পরুক এসে,
আমি এখন তোমার মতো বড়ো।
দেখছ নাকি যে ছোটো মাপ আমার
পড়তে গেলে আঁট হবে যে আমার।'

ছোটোবড় ভেদজ্ঞানের মতই অনুকরণ প্রবৃত্তি শিশুদের মধ্যে খুব ছোটোতেই দেখা যায়, এমন কি কথা বলতে শেখার পূর্বেই শিশুদের দেখা যায় বড়দের অনেক ভাব-ভঙ্গী অনুকরণ করতে। একটু বড় হলে তো কথাই নাই। সে অনুকরণে বেশীর ভাগ প্রকাশ পায় পড়া পড়া খেলার অনুকরণে। বাঁধা ধরা সময়ের গণ্ডীতে পড়তে আর শেলেটে দাগা বুলাতে তার ভাল লাগে না। তাই সেই অনিচ্ছুক ছাত্রের ইচ্ছায় খোকা বেড়াল ছানা বা ছোট্ট বোনটি বা বারান্দার হেলিংয়ের উপর চাপিয়ে সে নেয় গুরুমশায়ের কাজটা নিজের কাঁধে। 'মাষ্টারবাবু' এই শ্রেণীর কবিতা। 'বিজ্ঞ' কবিতাটিও এই জাতেরই—তবে তাতে বিজ্ঞতার ভানের আধিক্য আছে।

'আমি আজ কানাই মাষ্টার—
পোড়ো মোর বেড়াল ছানাটি।
আমি ওকে মারি নে মা, বেত,
মিছিমিছি বসি নিয়ে কাঠি।' (মাষ্টার বাবু)

বিড়াল ছানাকে সে অনেক বোঝায়; ভাল করে মন দিয়ে পড়তে বলে, বারণ করে চুরি করে খেতে, গোপালের মত ভালো হতে বলে, কিন্তু পোড়োটি তার সে কথা কানেই তোলে না। গুরুমশায় তাকে যেমন করে পড়ার সময় বলেন সেও তেমনি করে আর পোড়ো বিড়াল ছানাকে শিখায়—

—'পড়ার সময় তুমি পোড়ো,
তারপর ছুটি হয়ে গেলে
খেলার সময় খেলা কোরো।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে, সে চলে তার স্বভাব মতোই।

'মাছ যদি খেয়েছে তোমাও
কিছুই থাকে না আর মনে।'

অনুকরণ প্রবৃত্তির সঙ্গে যখন বিজ্ঞতার ভান এসে পড়ে তখন সে যেন হঠাৎ অনেক বড় হয়ে যায়। ছোটোদের সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না আর বড়দেরও আমল দিতে না হলেই বেঁচে যায়।

'আমি শুধু বলেছিলাম,
'কদম গাছের ডালে
পূর্ণিমা চাঁদ আটকা পড়ে
যখন সন্ধেকালে
তখন কি কেউ তারে
ধরে আনতে পারে।'
শুনে দাদা হেসে কেন
বললে আমায়, খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাইকো বোকা।"
(জ্যোতিষ শাস্ত্র)

মায়ের কাছে খোকার অভিযোগ দাদার বিরুদ্ধে। কত করে সে দাদাকে বোঝাতে চেয়েছে যে চাঁদ তো ঐ ছোট্ট একটুখানি; দুটি হাতের মুঠোতেই ধরে আনা যায়, দাদা তা বিশ্বাস করে নি। আর বার বার তাকে বোকা বলেছে। তাই শেষ পর্যন্ত সে রাগ করে দাদাকে বলেছে—

...'কী তুমি ছাই
ইস্কুলে যে পড়।
মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নিচু,
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্ত বড় কিছু।'

ছোট বোনটিকে নিয়ে সে যখন পড়া পড়া খেলতে বসে তখন হঠাৎ সে যেন অনেক বড় হয়ে যায়।

'খুকি তোমার কিছু বোঝে না মা,
খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ।'
... ...
সামনেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে
যদি বলি, খুকি পড়া করো:

দু-হাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে
তোমার পুঁথির পড়া কেমন তরো।

শুধু কি তাই, যতই কেন না খোকা চেষ্টা করে খুকিকে বোঝাবার খুকি যেন কি—কোন কিছুতে তার যেন বুদ্ধি ঠিক খোলে না কারণ সে যে 'ভারি ছেলেমানুষ।'

বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে নানা ফুল ফুটে উঠে। গ্রীষ্মে যে সব গাছ মরে শুকিয়ে গেছে তারাই আবার নবীন বর্ষার সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। পাছে মা সেই সব ফুলের আবির্ভাবকে শুধু ফুল বলেই ভুল করে বসে তাই মাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'তুই যে ভাবিস ওরা কেবল
অমনি যেন ফুল,
আমার মনে হয় না, তোদের
সেটা ভারি ভুল।
ওরা সব ইস্কুলের ছেলে
পুঁথি পত্র ফেলে
মাটির নীচে ওরা ওদের
পাঠশালাতে থাকে।' (বৈজ্ঞানিক)

তারপর যখন বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর বেলা পেরিয়ে আষাঢ়ের বিকেল আঁধার করে আসে—

'মেঘের ডাকে তখন ওদের
সাড়ে চারটা বাজে।
অমনি ছুটি পেয়ে
আসে সবাই ধেয়ে।
হলদে রাঙা সবুজ সাদা
কত রকম সাজে।

নিজের মনের প্রচ্ছন্ন বেদনাকে শিশু ফুলের কথায় প্রকাশ করেছে এখানে। গুরু গুরু মেঘের সাড়া দিয়ে আষাঢ় মাসের বৃষ্টি জলের ধারা নেমেছে দিকে দিগন্তরে। এমন সময় পাঠশালায় বসে পড়া মুখস্থ করা কি সহজ কাজ! নিশ্চয় নয়। তবু তাকে থাকতে হয় কারণ সে তো আর ফুল নয়।

নিজেকে বড় মনে করতে করতে শিশুর মনে অন্যকে রক্ষা করার প্রবৃত্তি ও দুঃসাহস জেগে উঠে। কল্পনায় সে ছাড়িয়ে যায় তার বয়স, কাল, পরিবেশ। 'বীরপুরুষ' কবিতাটি তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

'মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে—
দরজা ছুটো একটুকু ফাঁক করে—
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।'
(বীর পুরুষ)

তারপর সন্ধ্যে হল জোড়াদীঘির মাঠে, কোনোখানে জন-মানব নাই—এমন সময় হাঁ রে রে রে রবে ডাকাতদল ছুটে এলো।

'আমি বলি দাঁড়া খবরদার।
এক পা কাছে আসিস যদি আর—
টুকরো করে দেব তোদের মেরে।'
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল হাঁরে রে রে রে রে।'

খোকা একাই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সবাইকে হারিয়ে দিয়ে ঘেমে রক্তে নেয়ে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল। মা তাকে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে বলল—ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল।

'পথহারা' কবিতাটি এই জাতীয় কবিতারই অন্য এক রূপ।

'আজকে আমি কতদূর যে—
গিয়েছিলেম চলে।
যত তুমি ভাবতে পার
তার চেয়ে সে অনেক আরো
শেষ করতে পারব না তা
তোমায় বলে বলে।'

কত মাঠের পরে মাঠ পেরিয়ে সামনে পড়ল প্রকাণ্ড এক বন। জামতলাতে বুড়ি ছিল—বললে 'খবরদার'। তাকে ছ'পণ কড়ি গুণতে দিয়ে বনে ঢুকে পড়ল খোকা, সেখানে গভীর অন্ধকারে কত রকম ভূতের সাড়া—কিন্তু ভয় পায় না সে কিছুতেই। বুড়িকেও ভয় পায় নি। সে যখন ছ'পণ কড়ি গুণে তুলছিল, সেই অবসরে সে পালিয়ে গেছে। শেষে সামনে কিসের ছায়া দেখে সে বললো—'শেয়াল ভায়া, মায়ের গাঁয়ের পথ তোরা কেউ দেখিয়ে দেনা মোরে।' হঠাৎ সেখানে হানুম করে ভেংচে

দিদিমার কার ঘাড়ে যেন লাফিয়ে পড়ল আর সেই ভাকে ভেঙ্গে গেল তার ঘুম।

এই সব বিচিত্র চিন্তার সঙ্গে শিশুর মনে নানারকম সাধ জাগে। কখনো চায় নদীর বুকে নৌকা নিয়ে দিনের পর দিন বেয়ে যেতে, কখনো রামের মত বনবাসে যাবার সাধ হয়, কখনো রাজমিস্ত্রী সেজে ইঁটের উপর ইঁট গেথে বাড়ী বানাতে ইচ্ছা যায়। কবির 'ছেলেবেলা'র আছে এমনি বিচিত্র সাধের কথা। পরিত্যক্ত একখানা পালকির মধ্যে মাঝে মাঝে কবি গিয়ে বসতেন আর "বেলা বেড়ে যায়, রোদ্দুর ওঠে কড়া হয়ে, বেউরিতে ঘণ্টা বেজে ওঠে। পালকির ভিতরকার দিনটা ঘণ্টার হিসাব মানে না।···একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পালকি, হাওয়ায় তৈরী বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে।···তারপর এক সময় পালকির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে উঠে ময়ূরপঙ্খী, ভেসে চলে সমুদ্রে। ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্-ছপ্ ছপ্ছপ্, ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে উঠে সামাল সামাল, ঝড় উঠল।···এই তো ছিল পালকির ভিতর আমার সফর। পালকির বাইরে এক একদিন ছিল আমার মাষ্টারি। রেলিংগুলো আমার ছাত্র। ভয়ে থাকত চুপ।"

কবির শিশুকালের এই সব বিচিত্র সাধ চিরকালের শিশুমনের স্পর্শে অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

'বয়স তখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহখানা
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।'

সেই বয়সের কথা 'ছেলেবেলায়' বলতে গিয়ে কবি বলেছেন :

'জানার সঙ্গে আধেক জানা, দূরের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল বোনা,
নানা রঙের ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফেরা,
সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,
ভাবনাগুলো তারই মধ্যে ফিরত থাকি থাকি—
বানের জলে ভাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।

(বালক : ছেলেবেলা)

শিশুমনের সেই সব বিচিত্র ভাবনাগুলো ধরা পড়েছে 'বিচিত্র সাধ' 'মাঝি', 'বনবাস', 'নৌকাযাত্রা', 'লুকোচুরি' প্রভৃতি কবিতায়। রাস্তার গলিপথ দিয়ে শিশু যখন ইস্কুলের পাঠশালার পথে যায় তখন :

'ফেরিওলা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে।
'চুড়ি চাই, চুড়ি চাই সে হাঁকে
চীনের পুতুল মুড়িতে তার থাকে
যায় সে চলে যে পথে তার খুশি
যখন খুশী যায় সে বাড়ী গিয়ে।

আবার বিকেল সাড়ে চারটায় খোকা যখন ফিরে পাঠশালা হতে দেখে বাবুদের ফুল বাগানের মালি মাটি চোপাচ্ছে—'গায়ে মাথায় লাগছে কত ধুলো, কেউ তো এসে বকে না তার কাজে।' আবার একটু রাত হতে না হতে মা যখন ঘুম পাড়াতে চায়—তখন সে দেখে 'পাগড়ি পরে পাহারা-ওলা যায়।' কাজে কাজেই তারও ইচ্ছা হয় ফেরিওলা হয়ে পাড়ায় পাড়ায় চুড়ি চাই, চুড়ি চাই বলে হেঁকে বেড়াতে, বাগানের মালি হতে আর পাহারাওলা হতে কারণ তাহলে আর ইস্কুল বসতেই স্কুলে যাওয়ার তাড়া থাকবে না, যত ইচ্ছা ধুলা মাখতে পারবে আর রাত দশটা এগারোটা হয়ে গেলেও কেউ কিছু বলবে না।

আবার সে হতে চায় খেয়াঘাটের মাঝি, যেখানে ডিঙি নৌকায় কৃষাণেরা লাঙল কাঁধে পার হয়ে যায়। রাখাল ছেলে গরু মহিষ সাঁতরে নিয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে। নৌকা নিয়ে সে এপার ওপার করবে। 'সূর্য যখন উঠবে মাথায় অনেক বেলা হলে,' ঘরে ফিরে এসে খেতে চাইবে আবার ফিরবে 'আঁধার হলে সাঁঝে।'

'বাবার মতো যাব না মা,
বিদেশে কোন্ কাজে,
মা যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়া ঘাটের মাঝি।' (মাঝি)

শুধু পালকিরই চেহারা বদলে গিয়ে ময়ূরপঙ্খি হয়ে ওঠে না—ডিঙি নৌকায় পারাপার করবার ইচ্ছা কোন এক মুহূর্তে বদলে গিয়ে একশো দাঁড়ের চার পাঁচটে ছ'টা পাল তোলা নৌকায় রাজপুত্র হয়ে নৌকাভরা সোনা মাণিক বয়ে 'আমি কেবল যাই একটিবার সাত সমুদ্র তের নদীর পার।' অবশ্য—"মধু মাঝির ঐ যে নৌকাখানা

বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে,
কারো কোনো কাজে লাগছে না তো
বোঝাই করা আছে কেবল পাটে।
আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি"…

(নৌকাযাত্রা)

ফিরে আসতে সেই সন্ধে হয়ে যাবে। তারপর মায়ের কোলে বসে গল্প বলবে সেই 'হিরণ্মনির ঘাট' 'ভেপান্তরের মাঠ' পেরিয়ে যাওয়া নতুন রাজার দেশের।

ঠাকুমা দিদিমার কোলে মাথা রেখে সন্ধেবেলায় রামায়ণ মহাভারতের গল্প শোনার কথা আজকাল গল্প শোনার দিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই রামের মত বনে যাওয়ার কল্পনা করা আজকের দিনের শিশুদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নাও মনে হতে পারে—

'মাগো আমার দে-না কেন একটি ছোটো ভাই—
দুইজনেতে মিলে আমরা বনে চলে যাই।
আমাকে মা লিখিয়ে দিবি রামযাত্রার গান,
মাথায় বেঁধে দিবি চূড়ো, হাতে ধনুক বাণ।
চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই এমনি বরষাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার থাকত সাথে সাথে।'

(বনবাস)

শিশু কবির মনেও যে এই বিচিত্র সাধ এক সময় ছিল সে কথা আছে তাঁর ছেলেবেলায়। শেষ বয়সে শৈশবকালে স্মৃতিকথা লেখার সময়ও সে কথা তিনি বিস্মৃত হন নি।

'কিশোরী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হোলে।
বাঁ হাতে তার খেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
ভুতলদের আড্ডে যেত সব কুলের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া;
মনে মনে ইচ্ছে হোত, বদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হোত এই পাঁচালির দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে। (বালক)

সহজপাঠের কবিতার মধ্যে একটিতে উপরোক্ত ভাবনারই চিত্র দেখা যায়। এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের বালকের মনের ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে।

"ঐখানে মা পুকুর পাড়ে
জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
হোথায় হব বনবাসী—
কেউ কোথাও নেই।

রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে
মারবে উঁকি আড়ে আড়ে
দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি
ধনুক নিয়ে হাতে।"

বিচিত্র সাধ বিচিত্রই। তাই শিশু যেমন মাঝি হতে চায়, মালী হতে চায়, রামের মত বনবাসে যেতে চায় তেমনি আবার তমিজ মিঞার সঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেও তার সাধ যায়।

'আমি যে রোজ সকাল হলে
যাই সহরের দিকে চলে
তমিজ মিঞার গরুর গাড়ী চড়ে,
সকাল থেকে সারা দুপুর
ইট সাজিয়ে ইটের উপর—
খোয়াল মতো খোয়াল তুলি গড়ে।'

(সহজপাঠ)

রবীন্দ্রনাথ

কালীসাধন ফৌজদার

এখনো অদৃশ্যপটে একখানি হাত—
ব'য়ে চলে রত্নজালে কথার সিনার,
ভাষার বৈদূর্য মণি। তরঙ্গ আঘাত
সুরের আকাশে ব'য়ে কোমল গান্ধার
নেপথ্যে নিপুণ তুলি আলো সঞ্চয়মান;
মুখর আকাশে বাজে বৈজয়ন্তী তূরী।
মুগ্ধপ্রাণ জনচিত্তে তারই অনুধ্যান।
আলো তাই মুক্তো খোঁজে অনেক ডুবুরী
মনো সরসীতে। তাঁরি ছায়াপাত
দেখেন দাঁড়ায়ে নিজে রবীন্দ্রনাথ।

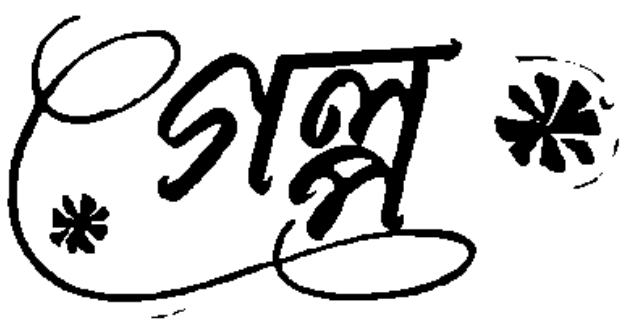

ক্ষয় নাই

শ্রীজগবন্ধু নাথ

সুশান্ত আজ মানুষ হয়েছে! সত্যি সে মানুষ হয়েছে। আজ তার বয়স তিরিশ বছর। সুডৌল চেহারা। গায়ের রং ফরসা। টানা টানা চোখ, আর এক জোড়া টানা টানা ভ্রূ। সুশান্ত শহরের নামকরা ব্যবসাদার। শহরের বড় রাস্তার ওপর বড় দোকান। ধান চালের কারবার। ক'বছরের মধ্যে পয়সাও কামিয়েছে প্রচুর। ওর হাতে এখন অনেক টাকা। ও বিয়ে করেছে ক'বছর হল। একটা ছেলে। ছেলেটিও বাপের মতো হয়েছে। তেমনি গায়ের রং আর স্বাস্থ্যও ভাল।

সে দিন ছুটি ছিল অর্থাৎ দোকান বন্ধ। একলা বেরিয়েছিল সুশান্ত। বেড়াতে বেড়িয়েছিল। মনের অবস্থাও ভাল ছিল না। তাই গম্ভীর ভাবে ও এগুচ্ছিল আস্তে আস্তে। নদীর ধারের রাস্তাটা ধরে ও এগুচ্ছিল। তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। পশ্চিমে অস্ত সূর্যটা জ্বলছিল। ঝির ঝির করে বাতাস বইছিল। ভাল লাগছিল সুশান্তর।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে পাশ কাটাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল সুশান্তকে। বৃদ্ধের মুখের দিকে চাইল সুশান্ত। বৃদ্ধের বয়স সত্তরের ওপর হবে। স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। মুখে ও শরীরে বার্ধক্যের ছাপ। চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। চিনতে পারল সুশান্ত। স্কুলের মাষ্টার অমলবাবু। মাথা নত করল সুশান্ত। অমলবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সুশান্ত।

অমলবাবু একটু বিস্মিত হলেন। সুশান্তর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। বোধ হয় চিনতে পারলেন না।

—কে বাবা, তোমাকে তো চিনতে পারলাম না! অমলবাবু বললেন।

—চিনতে পারলেন না স্যার! আমি সুশান্ত! সুশান্ত পরিচয় দিল।

অতীতের পাতাগুলো হাতড়ে গেলেন অমলবাবু। এবার মুখে অল্প হাসি ফুটে উঠল।

—তুই সুশান্ত! বললেন অমলবাবু।

সুশান্ত হাসল। হ্যাঁ স্যার আমি আপনার সুশান্ত।

সুশান্ত ছেলেবেলা খুব দুষ্টু ছিল। কতদিন ও অমল-বাবুর বাগানের নারকেল খাবার জন্য হানা দিয়েছে তার কী ঠিক আছে? দুষ্টু হলেও ও পড়াশুনায় ভাল ছিল। স্কুলের পড়া ঠিকমত তৈরী করে নিয়ে যেত। তাই অমল-বাবু ওকে খুব ভাল বাসতেন।

—কেমন আছিস? জিজ্ঞাসা করেন অমলবাবু।

—ভাল, আপনি কেমন আছেন?

—আমার কথা আর বলিস না! শরীর ভেঙ্গে গেছে। আর কতদিনই বা বাঁচব?

—আপনাকে অনেকদিন দেখিনি স্যার। সুশান্ত বলল।

—আমিতো এখানে থাকি না। আজ দশবছর হয়ে গেল স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়েছি। এখানে আর ভাল লাগে না।

—এখন কোথায় আছেন? সুশান্ত প্রশ্ন করে।

—বর্ধমান! সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন অমলবাবু।

বর্ধমানে আপনার কোন আত্মীয় আছেন?

—হ্যাঁ—আমার ভাইপো ওখানে থাকে। ওখানে ওর বড় ব্যবসা আছে। আমাকে ও নিয়ে গেল। জীবনের শেষ কটাদিন ওখানেই কাটিয়ে দেব। অমলবাবু থামলেন। হাঁপাতে লাগলেন তিনি।

এগুতে লাগল সুশান্ত অমলবাবুর সংগে। নদীর ধারের রাস্তাটা এর মধ্যেই মুখর হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা

যুবক, যুবতীর কলরবে আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠেছে। সূর্যের সোনালী আলো ওদের গায়ে পড়েছে। আর শরতের স্নিগ্ধ ছিরে বাতাস শরীরের সব ক্লান্তি দূর করে দিচ্ছে।

—আর হাঁটতে পারছি না! একটু বসা যাক। কি বলিস। অমলবাবু বললেন।

সুশান্ত আপত্তি করল না। নদীর ধারে গিয়ে বসল সুশান্ত। অমলবাবুও বসলেন। লাঠিটা নামিয়ে রাখলেন মাটির ওপর।

সামনে দিয়ে এক কালি নদী বয়ে চলেছে। ছোট ছোট ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে তীরের ওপর। একটা ডিঙ্গি নৌকা এগিয়ে চলেছে। ওপারে কাশবন। সাদা ফুলে ভরে গেছে। বাতাসের ছোঁয়া লেগে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে কাশফুলগুলো।

অতীতের কথা মনে পড়ে সুশান্তর। ছবির মতো ভেসে ওঠে অতীতের দৃশ্যগুলো। যেন মনে হয় সেদিনের ঘটনা। অমলবাবু তখন স্কুলের শিক্ষক। চোখের কোণে স্বপ্ন। আদর্শ শিক্ষক অমলবাবু! চোখে মানুষ গড়ার স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নের ছোঁয়া এসে লাগছে ছাত্রদের গায়ে।

মাষ্টারী করে কাটিয়ে দিলেন অমলবাবু। উনি যেন আদর্শ শিক্ষক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছেলেবেলায় কলেজ জীবনে স্বদেশী করেছেন। তারপর পার্টির সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় পার্টির কাজ ছেড়ে দিলেন। স্কুলের চাকরী নিলেন অমলবাবু। তখন ওঁর বয়স মাত্র পঁচিশ বছর। মানুষগড়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন যুবক অমল চট্টোপাধ্যায়। এ সব কথা অমলবাবুর মুখেই শোনা।

—মানুষ তৈরী করতে হবে বুঝলে! তোমাদের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে! বলতেন অমলবাবু।

আর ছাত্ররা অমলবাবুর কথাগুলো কানে নিত না। ভাবতো বোধ হয় তিনি ঠাট্টা করছেন। মানুষ হয়েই তো জন্মেছি আমরা, আবার মানুষ হব কি? ছাত্ররা হাসাহাসি করত। অমলবাবুকে পাগল বলত তারা!

অমলবাবু চিরকুমার। আদর্শের জন্য বিয়ে করেননি। বলতেন বিয়ে করলে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাব। অবশ্য ছাত্রদের কাছে তিনি একথা বলতেন না। বলতেন তাঁর সমবয়সীদের কাছে। অমলবাবুর বাবা ছেলেকে বিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি।

গল্প শোনা যায় অমলবাবু একদিন নাকি মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। অমলবাবুর সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুরা। মেয়ে দেখলেন অমলবাবু। কিন্তু কোন ভাবান্তর ঘটেনি তাঁর মনে। তিনি শুধু মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মা, তোমার নাম কি?

সেদিন সবাই হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। মেয়েকেও হাসতে হয়েছিল। তারপর মেয়ের বাপ অমলবাবুর হাতে মেয়ে তুলে দেবার জন্যে যথেষ্ট সাধা সাধনাও করেছিলেন। কিন্তু অমলবাবু আর রাজি হননি। পরে নাকি তিনি বন্ধুদের বলেছিলেন, মেয়েদের আমি মায়ের মতো দেখি।

আজীবন অমলবাবু কুমার থেকে গেলেন। রাস্তা দিয়ে যখন চলেন, তখন মুখ নীচু করে চলেন। কত সুন্দরী তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে যায়, তাঁর খেয়ালও হয় না। কত সুন্দরী তাঁর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ফিরে গেছে। শুধু তাদের মুখ দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস বেড়িয়ে এসেছে—নিষ্ঠুর! হাঁ অমলবাবু নিষ্ঠুর—সত্যি নিষ্ঠুর। আর ছাত্রেরা তাঁকে নতুন নামে নামকরণ করেছে—সে নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত ইতিহাস। ইতিহাস মেয়েদের দিক থেকে, তাঁর দিক থেকে নয়! বিধবা—অমলবাবু বিধবা।

সেই অমলবাবু আজ বৃদ্ধ। অনেকদিন পর তাঁর সঙ্গে দেখা। এ যেন সুশান্তর পরম সৌভাগ্য।

—মাষ্টার মশাই। সুশান্তর স্বর গভীর।

অমলবাবু চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিলেন। হিনিও বোধহয় অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোর কথাই ভাবছিলেন। সুশান্তর কণ্ঠস্বর তাঁর কানে গিয়ে পৌছাল না।

—স্যার! সুশান্ত আবার ডাকল।

—উঁ! অমলবাবুর গলার স্বর শান্ত।

—কী ভাবছেন?

—ভাবছি অতীতের কথা। সে অতীত আজ হারিয়ে গেছে! অমলবাবু বললেন।

—অতীত তো হারিয়ে যাবেই! সুশান্ত বলল।

—হারিয়ে যায় না সুশান্ত! অতীত কখনো পুরানো হয় না। অতীত চিরনূতন। অমলবাবু বললেন।

—মানুষ অতীতের রোমন্থন করতে ভাল বাসে। সুশান্ত বলল। অতীতের যা কিছু সবই ভাল, আর বর্তমানের সব কিছু মন্দ—এটাই আমাদের ধারণা!

—ধারণাটা তো মিথ্যে নয়। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সেদিনের মানুষকে আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজকের মানুষ একদম পালটে গেছে।

—পরিবর্তনই জীবনের ধর্ম! সুশান্ত বলল।

—একথা স্বীকার করি! কিন্তু পরিবর্তনটা সমাজের পক্ষে কল্যাণ কি অকল্যাণকর, একথাতো চিন্তা করতে হবে।

—আপনি কি বলতে চান আজকের সমাজের সব কিছু ক্ষতিকর।

—একথা বলব না। তবে আজকের সমাজে বহু গলদ, বহু দোষ ত্রুটি দেখা দিয়েছে। এগুলো সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর!

—যেমন!

—দেখ আগেকার মানুষের মধ্যে একটা আদর্শবাদ ছিল। দেশের দশের জন্য মানুষ জীবন দিয়েছে। কিন্তু আজ, আজ সে মানুষ কোথায়?

—আজকের মানুষের মধ্যেও আদর্শবাদ আছে। আজকের মানুষও দেশের জন্যে জীবন দিতে পারে! সুশান্ত বলল।

—স্বীকার করি! কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। অমলবাবু উত্তর দিলেন।

—আজকের মানুষ বহু সমস্যায় জর্জরিত। পেটের ক্ষুধা মিটাতে তাদের সময় চলে যায়। দেশের জন্য চিন্তা করবে কখন? সুশান্ত বলল।

—সমস্যা আগেও ছিল, চিরকাল থাকবে! আসল কথা হচ্ছে তখন দেশের মধ্যে দেশপ্রেমের জোয়ার এসেছিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই চেয়েছিল স্বাধীনতা। আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আজ আমাদের সামনে তুলে ধরবার মতো কোন আদর্শবাদ নেই—নেই কোন লক্ষ্য! তাই আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট।

—কেন, দেশগড়ার কাজ এখনো বাকী আছে। সুশান্ত বলল।

—তার জন্যে জীবন পণ কোথায়? শিক্ষা আজ আর নেই। আজ শিক্ষার ভেজাল, খাদ্যে ভেজাল, এমনি আমাদের চিন্তায় ও কথায় ভেজাল। এটা হল ভেজালের যুগ। আমরা ফাঁকি দিয়ে মহৎ কিছু করব বলে ব্যস্ত। এভাবে কিছু করা যায় না সুশান্ত, কিছু করা যায় না। দেশকে গড়তে হলে ত্যাগ করতে হবে। সন্তান পালন করার জন্যে যেমন মাকে ত্যাগ করতে হয়, ঠিক তেমনি। অমলবাবু থামলেন। ওঁর চোখে স্বপ্ন। মুখে বার্ধক্যের ছাপ। দেহের শক্তি গেছে কমে। অমলবাবু যেন অতীতের জীবন্ত প্রতীক।

সুশান্ত ভাবল অমলবাবু মহান। তাঁর জীবনের যে দান, তাতো ভুলবার নয়। সুশান্তর বয়স আজ ত্রিশ! সে দেশকে কী দিয়েছে! সে প্রচুর পয়সা রোজগার করেছে ব্যবসা করে। শহরে তার সুনামও আছে। এই মুহূর্তে মনে হল সুশান্তর জীবন ফুলে ফলে ভরে ওঠেনি। মনে হল একরাশ ক্লান্তি এসে তার শিরা-উপশিরার রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। সে আর বাঁচবে না। সে বাঁচতে চায় না।

—সুশান্ত! অমলবাবু ডাকলেন।

—মাষ্টার মশাই!

—তোমরা যখন স্কুলে পড়তে, তখনকার কথা চিন্তা করে দেখ তো! তখন কি এমন ছিল? দেশে কী এত সমস্যা ছিল? তখনও তোমাদের মনে আদর্শ ছিল। সংযম ছিল। আর আজ—আজকের কথা চিন্তা করে দেখ—সে আদর্শ নেই—সে সংযমও নেই! এটা হল "লারে লাপ্পার" যুগ।

—ঠিকই বলেছেন স্যার। আমাদের পথ দেখানোর জন্যে আজ নেতার প্রয়োজন।

—জানি! কিন্তু নেতা তো খুঁজে বেড়ালে পাওয়া যায় না! নেতা তোমাদের মধ্যে আছে। তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে সেই প্রতিভা। সেই সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোল। কাজে লেগে যাও! দেখবে পথ তৈরী আছে। পারবে না সুশান্ত!

—পারব! সুশান্ত বলল। ও ওর সমস্ত সত্তা দিয়ে বলল—আমি পারব। এই মুহূর্তে ওর মনে হল ও পারবে। নিজের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পেল সুশান্ত।

—জান সুশান্ত, এখন আমার শরীর ভেঙে গেছে।

কিন্তু এখনও আমি যা শক্তি রাখি, তা তোমাদের মধ্যে নেই।

সুশান্ত কোন কথা বলল না। ও যেন চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেল। ওর সমগ্র সত্তা এক অপূর্ব আনন্দে ভরে গেল।

—সুশান্ত, সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাক। সত্যের ক্ষয় নেই। জয় হবেই। অমলবাবু বললেন।

সুশান্ত দেখল অমলবাবুর চোখদুটো যেন ভাঁটার মতো জ্বলছে। মনে পড়ল পনের বছর আগের কথা! সে তখন স্কুলের ছাত্র। সেদিনের অমলবাবুকে ওর মনে পড়ল। সেই অমলবাবু আজও তেমনি আছেন,শরীর ভেঙ্গে গেলেও মন ভাঙ্গেনি। শ্রদ্ধায় ভরে গেল সুশান্তর মন।

লাল সূর্যটা ডুবে গেছে পশ্চিম দিগন্তে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে মাটির পৃথিবীতে। সুশান্ত তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ ঐ দিকে। প্রকৃতির রূপবদল সুশান্তর মনেও অন্ধকার আভাষ এনে দিল।

—সুশান্ত! অমলবাবু ডাকলেন।

—বলুন! সুশান্ত উত্তর দিল।

—কী দেখছ?

—দেখছি প্রকৃতির দৃশ্য!

—একটু আগেও আলো ছিল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে—তাইনা?

—ঠিকই বলেছেন। অন্ধকারেরও প্রয়োজন আছে। সুশান্ত বলল।

—কিন্তু এটাই শেষ হয়। অমলবাবু উত্তর দিলেন। সুশান্ত অমলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—আবার সূর্য উঠবে! এমনি ভাবে সেদিন পূর্ব দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সেদিন হয়ত আমি থাকব না। কিন্তু তোমরা থাকবে। তোমরাই সেই নতুন যুগের অগ্রদূত।

সুশান্ত কোন কথা বলল না। সে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল অমলবাবুর দিকে। মনে হল সত্যের জয় হবেই। কবিগুরুর ভবিষ্যৎ বাণী আবার চোখের সামনে ঝলমল করে উঠল।

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

সুশান্ত দেখল অমলবাবুর চোখদুটো যেন কোন এক স্বপ্নে বিভোর।

সমর্পণ

ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

হে দেবী তোমারে আজ ক'রে গেছ দান
আমার হৃদয়-রাঙা বীণা; তার ক'তে
সুরে সুরে রচিয়াছি যত কিছু গান
সত্য মিথ্যা জীবনের বাসনার স্রোতে।

যাহের কুড়ায়ে পেনু নিতি নব রূপে
রিক্ত হ'য়ে তার মাঝে খুঁজেছিনু ঠাঁই
আকাশে বাতাসে শুধু শুনি চুপে চুপে
হাহাহানি হাহাকার আর কিছু নাই।

ভুল ক'রে পেয়েছিনু ভুলের মাশুল
অবজ্ঞার অনাদরে তুচ্ছ উপহারে
জীবন সাঙ্গাহে দেখি এতো নহে ফুল
আবার ফিরিনু তাই তব পদপারে।

মরমের মাঝে পেয়ে তোমার ইঙ্গিত
বাউলের বেশে মোর জীবন-সঙ্গীত।

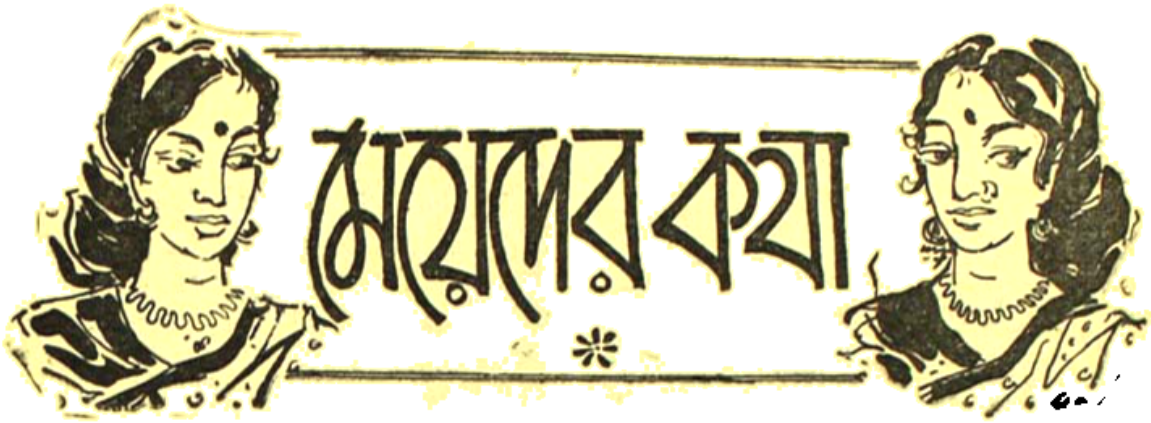

রবীন্দ্রকাব্যে নারী ও প্রেম

কমলিনী রায়

রবীন্দ্রকাব্যে নারীর দুটি চিত্র অংকিত হয়েছে। একটি উর্বশীর অপরটি লক্ষ্মীর।

"কোন ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র মথনে
উঠেছিল দুই নারী,
অতলের শয্যাতল ছাড়ি
একজনা। উর্বশী সুন্দরী
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তারে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।"

একজন মোহ-উন্মাদনায় মূঢ় চিত্তকে মাতাল করে তোলে, আর একজন শ্রী ও কল্যাণকর্মে মানব চিত্তকে শান্ত সমাহিত করে। একজনকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন—

"কোন কালে ছিলে নাকি মুকুলিকা বালিকা বয়সী
হে অনন্ত যৌবনা উর্বশী।"

অন্যজনের প্রশস্তি গেয়েছেন—

"পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি দেবী তুমি সতী।"

রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী কবি। তাই তাঁর কাব্যে প্রেমের আদর্শরূপ—যার প্রকাশ নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক—

"ত্রিযামা একা বসে গান গাহি
হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।
হে বন্ধু আছো তো ভালো? মুখে তার চাহি,
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।"

তাঁর প্রথম যৌবনের রচনায় প্রেমের প্রকাশ অতি সূক্ষ্ম অত্যন্ত সুকুমার কল্পনাবিলাসে ভরপুর—যা মৃদু সুগন্ধে মধুময়—

আমার যৌবন স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত।

এসব কবিতায় কবিমনের ভীরু প্রেমই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ক্ষণিকার কবিতায় তাঁর প্রেম যেন একটু দেহ ধরে দেখা দিয়েছে—

"হৃদয় পানে হৃদয় টানে
নয়ন পানে নয়ন ছোটে
দুটি প্রাণের কাহিনীটা
একটুকু বই নয়কো মোটে।"
"হে নিরুপমা
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে
করিয়ো ক্ষমা।"
"আমি লাববো মহাকাব্য
সংরচনে
ছিলো মনে—

কৈলো কখন তোমার কাঁকণ
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল কাটি
হাজার গীতে।"

প্রবুদ্ধকারী মহান প্রেমের অবগানে কবি মুখর হয়ে উঠেছেন—

"বিরহ দিন, বিরহ রাত,
কে কোথা ছিনু দোঁহে
এসেছ প্রেম এনেছো আজ
কী মহা সমারোহে।"

কিন্তু প্রেয়সীকে নিয়ে সুখ-শান্তির নীড় গড়তে চাইলেন না—সাধারণ মানুষ যা চায়। তিনি চাইলেন প্রেমের এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি—

"আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা
গড়িব না ধরণীতে
মুছ ললিত অশ্রু গলিত গীতে
পরশরের বেদনা মাধুরী দিয়ে
বাসর রাত্রি রচিবনা মোরা প্রিয়ে,
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, আমি নিশ্চয়
তুমি আছ আমি আছি।"

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাই বলেছেন :—

'সারাদিন আপিসে খেটে-খুটে বাড়ি ফিরে যেন দেখতে পাই তুমি সেজে-গুজে গন্ধ মেখে থালাভরা লুচি সাজিয়ে বসে আছো—কমিটির মিটিংএ হেরে গিয়ে যেদিন মন খারাপ হয় সেদিন তুমি যেন থাকো আমাকে বাহবা দিতে, যেদিন কোন নির্বোধ আচরণের জন্য সবাই আমাকে উপহাস করছে, সেদিন তুমি আমাকে একঘরার করবে। যে পুরুষ নারীকে তার দায়িত্বের, তার দুঃখের, তার অপমানের অংশ দিতে চায় না তাকে শুধু ভালবাসা খেলার পুতুল সাজিয়ে রাখতে চায়, সে দুর্বল সে কাপুরুষ—তারি বিরুদ্ধে আধুনিক নারীর বিদ্রোহ। এই ছেলে ভুলানো বিলাসিতার ওপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমের ভিত্তি স্থাপন করতে পরাঙ্মুখ, তিনি চান দুজনে মিলে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াতে—সব দুঃখ একসঙ্গে মাথা পেতে নিতে। সব দারিদ্র একত্র বহন করতে। প্রিয়াকে একথা বলবার পরম সাহস তাঁর আছে—

"সেবা-কর্মে করি না আহ্বান—
শুনাও তাহারি জয় গান,
যে বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটু লুব্ধ অনন্তায় যে তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।"

সুপর্ণা দেবী

অভিজ্ঞ-আধুনিক রূপচর্চা-বিশারদদের মতানুসারে মুখের লাবণ্য-শ্রী অটুট অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিত্য নিয়মিত-ভাবে বিশেষ ধরণের যে সব ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি, এবারেও তেমনি ধরণের আরো কয়েকটি ব্যায়াম পদ্ধতির মোটামুটি

পরিচয় দিচ্ছি। আলোচনা প্রসঙ্গে ৪নং ছবিতে যে ব্যায়াম ভঙ্গীটির নমুনা দেখানো হয়েছে, নিত্য-নিয়মিত-ভাবে এ ভঙ্গীটি অনুশীলনের রীতি হলো প্রত্যেকটি ভ্রূ উপর আঙুলের মৃদু-চাপ দিয়ে রেখে ধীরে ধীরে ডাইনে ও বাঁয়ে অন্ততঃ দশ বারো বার আঙুল বুলানো। প্রথমে

বাঁ-দিকের ভ্রূর উপর এভাবে আঙুল বুলাবেন···তারপর অনুরূপ ভঙ্গীতে ডান দিকের ভ্রূটিতে—এমনিভাবেই এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অনুশীলন করবেন।

এ ব্যায়াম ভঙ্গী অনুশীলনের পর, অনেকটা ঠিক এমনিভাবেই নীচের ৫নং ছবিতে দেখানো ভঙ্গীটিও নিত্য-নিয়মিত অভ্যাস করা দরকার। এ দুই ব্যায়ামের ফলে ভ্রূ-যুগলের শোভা-মাধুর্য বৃদ্ধি পাবে এবং মুখশ্রী রমণীয় হয়ে উঠবে উত্তরোত্তর।

এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অনুশীলনকালে, একের পর এক—উভয় ভ্রূর উপরে আঙুল বুলাতে হবে চক্রাকারে ঊর্ধ্বমুখী-ভাবে। অর্থাৎ ভ্রূর উপর থেকে আঙুল না উঠিয়ে, ভ্রূকে কেন্দ্র করে আঙুলের মৃদু-চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে ভ্রূ-চর্মের উপরভাগে যেন সযত্নে চক্র রচনা করছেন—এমনিভাবে অঙ্গ পরিচর্যা করা চাই। ব্যায়ামের এ ভঙ্গীটিও আগেরটির মতোই অন্ততঃ দশ-বারোবার নিয়মিত-ভাবে অভ্যাস করা আবশ্যক।

এবারে মুখের মধ্যভাগ···অর্থাৎ গালের, অধরাংশের ও থুতনীর অংশ পরিচর্যার পালা। মুখের এ সব অংশের পারিপাট্য-সাধনের উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গীটি নিত্য-নিয়মিত অভ্যাস করা দরকার—নীচের ৬নং ছবিটি দেখলেই তার মোটামুটি হদিশ পাবেন।

এ ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের রীতি হলো—মুখের উপরে মধ্যমাঙুলির মৃদু-চাপ দিয়ে রেখে গালের উভয়-দিকেই পর্যায়ক্রমে, অন্ততঃ দশ-বারোবার নাকের প্রান্ত থেকে নীচেকার অধরোষ্ঠাংশ পর্যন্ত সীমানায় ধীরে ধীরে আঙুল বুলানো। নিত্য-নিয়মিত এ ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের ফলে, মুখের মধ্যভাগে···অর্থাৎ, নাকের প্রান্ত-সীমায় গালের দু'পাশে ও অধরোষ্ঠের আশেপাশে কোথাও অকাল বার্দ্ধক্যের কুঞ্চন-রেখা বা লোল-চর্মের অসুন্দর-কদর্যতা নজরে পড়বে না—ত্বকের বর্ণ-লাবণ্যও মনোরম হয়ে উঠবে দিনে-দিনে।

মুখ-মণ্ডলের শোভা-শ্রী রমণীয় ছাঁদের করে তুলতে হলে, নীচের ৭নং ছবিতে দেখানো বিশেষ ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গিটিও নিয়মিতভাবে নিত্য অনুশীলন করা প্রয়োজন।

এ ব্যায়াম-ভঙ্গী অভ্যাসের নিয়ম হলো—গালের ঠিক নীচে হাতের বুড়ো-আঙুল এবং বাকী আঙুল-গুলিকে চিবুকের তলায় রেখে, প্রত্যেকটি আঙুলের মৃদু-চাপ দিয়ে অন্ততঃ দশ-পনেরো বার ধীরে ধীরে চিবুক থেকে দুই কানের পাতা পর্যন্ত অংশ সযত্নে ঘর্ষণ-মর্দন করা। এভাবে ঘর্ষণ-মর্দন বা 'massaging'-এর ফলে, অচিরেই গালের পেশী ও স্নায়ুগুলি সুস্পষ্ট-সবল হয়ে উঠে মুখ-মণ্ডলের লাবণ্য-মাধুর্য অপরূপ সুন্দর-মনোরম এবং সুঠাম-পরিপাটি দেখাবে।

দৈহিক রূপ লাবণ্য অটুট-সুন্দর রাখার জন্য, নিত্য-নিয়মিত এ সব ব্যায়াম-চর্চা ছাড়াও, অঙ্গ-পরিচর্যার আরও যে সব একান্ত আবশ্যকীয় বিধি নিয়ম পালন করা দরকার, আগামী সংখ্যায় সে সম্বন্ধে আধুনিক রূপচর্চা-বিশারদদের সুচিন্তিত মতামত ও নির্দেশাবলীর আভাস দেবার বাসনা রইলো।

——

হাতের কাজ

রঙিন-কাগজের বুটি-দানার কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

ছোট-বড়, সরু-মোটা, লম্বা আর গোলাকার নানা ছাঁদের রঙীন পুঁতির সারি গেঁথে হরেক রকমের সৌখিন-সুন্দর কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার বিচিত্র কলা-কৌশলের মোটামুটি হদিশ-পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দিয়েছি। এবারে বলছি—অনেকটা ঠিক উপরোক্ত-প্রথারই ধরণে রঙ-বেরঙের কাগজের টুকরো ছাঁটাই করে অভিনব কলা-কৌশলে ছোট-বড়, সরু-মোটা, লম্বা ও গোল নানান্ ছাঁদের 'বুটিদানা' বানিয়ে, রঙীন-পুঁতির মতোই সেগুলিকে সারি গেঁথে হরেক রকমের সৌখিন-সুন্দর কারুশিল্প সামগ্রী রচনার কথা।

রঙীন কাগজের টুকরো ছাঁটাই করে পুঁতির মতো নানান্ ধরণের 'বুটি-দানা' বানাতে হলে, সবার আগে চাই—লাল, কালো, হলদে, সবুজ, নীল, বেগুনী, শাদা, বাদামী, সোনালী, রুপালী প্রভৃতি হরেক রঙের কাগজ কিম্বা সচরাচর বই-কেতাব, প্রাচীর-পত্র, দেয়াল-ক্যালেণ্ডার প্রভৃতিতে যে সব রঙ-চঙে ছবি ছাপানো হয়, তেমনি ধরণের কয়েকটি বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত কাগজের টুকরো, একখানি ভালো কাঁচি, একটি পেন্সিল, জ্যামিতি-নক্সা রচনার সাজ-সরঞ্জাম (geometrical design drawing instrument box), মজবুত সুতো বা মিহি তার (Fine-wire), একটি ১১ বা ১২ নম্বর মাপের পশম-বোনার কাঁটা এবং একশিশি গঁদের আঠা কিম্বা খানিকটা 'ময়দার লেই'!

এ সব উপকরণ সংগ্রহের পর কারুশিল্প রচনার কাজে হাত দেবার আগে গোড়াতেই, নীচের ছবিতে 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ', 'চ' এবং 'ছ' চিহ্নিত অংশগুলিতে যেমন নমুনা দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি ছাঁদে বিভিন্ন রঙীন কাগজের টুকরোগুলিকে আগাগোড়া নিখুঁত পরিপাটি-ভাবে ছাঁটাই করে নিতে হবে।

ছাঁটাইয়ের কাজ শেষ হলে, রঙ-বেরঙের কাগজের টুকরোগুলির যেদিকটি শাদা অর্থাৎ কোনো রঙীন-নক্সা ছাপানো নেই, সেইদিকে আগাগোড়া বেশ পরিপাটিভাবে গঁদের আঠা বা ময়দার লেইয়ের প্রলেপ লাগিয়ে কাগজের চওড়া-প্রান্তের উপর পশম বোনার কাঁটাটিকে বসিয়ে রেখে সযত্নে সেটিকে পাক দিয়ে নিলেই উপরের ছবিতে যেমন নমুনা দেখানো হয়েছে, তেমনি ধরণের সুচারু-অভিনব ও ছোট-বড়, সরু-মোটা ও লম্বা আর গোল বিভিন্ন ছাঁদে রঙীন-কাগজের সৌখিন-সুন্দর বুটি-দানা বানানো যাবে।

এভাবে বুটি-দানা রচনার পর, সেগুলিকে ছায়া-শীতল জায়গায় রেখে উন্মুক্ত-বাতাসে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। গঁদের আঠা বা ময়দার লেইয়ের প্রলেপ দিয়ে পাকিয়ে জোড়া রঙীন-কাগজের বুটি-দানাগুলিকে আগাগোড়া শুকিয়ে নেবার পর, সেগুলির ভিতর থেকে পশম-বোনার কাঁটাটিকে সযত্নে টেনে বার করে নিলেই বিভিন্ন-ছাঁদের বুটি-দানাগুলি পুঁতির দানার মতোই দিব্যি সুঠাম-সুন্দর ও মিহি-ভাব

কিম্বা সুতোর গাঁথার উপযোগী হয়ে উঠবে। তখন বিভিন্ন ছাঁদের এই সব নক্সাদার রঙীন কাগজের বুটি-কাটা দিয়ে নানা রকম বিচিত্র অভিনব নৌকিন সুন্দর কারুশিল্প সামগ্রী রচনার পালা সুরু করা যাবে।

মজবুত সুতো কিম্বা মিহি-তারের সাহায্যে রঙীন কাগজের এমনি সব নক্সাদার বুটি-কাটা গেঁথে যে কত কি অভিনব-অপরূপ কারুশিল্প সামগ্রী রচনা করা যায়, তার আর ইয়ত্তা নেই। স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ সে প্রসঙ্গের বিশদ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হলো না—আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্র অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ-প্রিয় বিচিত্র-মুখরোচক অভিনব এক-ধরণের নিরামিষ-তরকারী রান্নার কথা। মহারাষ্ট্রীয় পাক-প্রণালী অনুসারে বানানো অপরূপ সুন্দর এই নিরামিষ তরকারীর নাম—'ইকোড়' বা 'এঁচোড়ের ডালনা'।

পাঁচ-ছয়জনের আহারোপযোগী এ খাবারটি রান্নার জন্য উপকরণ চাই—মাঝারি আকারের একটি এঁচোড়, একটি নারিকেল, গোটা-কয়েক ধনে শাকের পাতা, বড় একটি পেঁয়াজ, চায়ের চামচের আধ চামচ গুঁড়ো সরষে, চায়ের চামচের সিকি-চামচ গুঁড়ো হলুদ, চায়ের চামচের আধ চামচ গুঁড়া-জিরে, চায়ের চামচের দুই চামচ চিনি, আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প একটু গুঁড়ো নুন এবং বড় চামচের এক চামচ ঘি। এগুলি হলেই চলবে, তবে খাবারের সুস্বাদের জন্য প্রয়োজনবোধে, আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প একটু গুঁড়ো শুকনো বা দুএকটি কাঁচা লঙ্কাও ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপরের কর্দমতো উপকরণগুলি জোগাড় হলে, রান্নার কাজ সুরু করবার আগে, হাতের তালুতে এবং আঙুল-গুলিতে অল্প একটু তেল বা ঘি মাখিয়ে নিয়ে, বঁটির সাহায্যে পরিপাটিভাবে এঁচোড়টির খোসা ছাড়িয়ে প্রয়োজনানুযায়ী বড় বা ছোট ছাঁদে টুকরো করে কুটে রাখুন। এ কাজ সারা হলে, কুরুনীর সাহায্যে নারিকেলের শাঁসটুকু মিহি-ধরণে কুরে নিয়ে, কোরা-নারিকেলের শাঁসটুকু নিঙড়ে অন্ততঃ চায়ের পেয়ালার দু'পেয়ালা পরিমাণমতো দুধ (cocoanut milk) বার করে রাখুন। তারপর পেঁয়াজটির খোসা ছাড়িয়ে মিহি ছাঁদে কুচিয়ে নিন। তরকারীর সুস্বাদের জন্য, তরকারীতে যদি কাঁচা লঙ্কা ব্যবহারের বাসনা থাকে, তাহলে কাঁচা-লঙ্কা দুটিকে ফালি করে চিরে রাখবেন। তবে শুকনো-লঙ্কার গুঁড়ো ব্যবহার করলে অবশ্য, এ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই···রান্নার অন্যান্য গুঁড়ো-মশলার মতোই, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো তরকারীতে মিশিয়ে নিলেই চলবে।

এমনিভাবে উপ্তোগপর্বের কাজ করে, উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে পেঁয়াজের কুঁচিগুলিকে ভেজে বাদামী রঙের করে নিন এবং রান্নার গুঁড়ো মশলা···অর্থাৎ, জিরে, সরষে, হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতিও উনানের আঁচে বসানো রন্ধন পাত্রে ছেড়ে, অন্ততঃ ৩।৪ মিনিটকাল খুন্তীর সাহায্যে নাড়াচাড়া করে সেগুলিকে ভালোভাবে ভেজে ফেলুন। তবে রান্নার গুঁড়ো মশলা-গুলিকে এভাবে ভেজে নেবার সময়, নজর রাখবেন—সে-গুলি যেন বেশীক্ষণ ভাজবার ফলে, অথবা পুড়ে নষ্ট হয়ে না যায়। এ কাজগুলি সারা হলে, উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে খানিকটা জল ঢেলে এঁচড়ের টুকরোগুলি এবং সেই সঙ্গে রান্নার বাকী উপকরণগুলি মিশিয়ে, রন্ধন-পাত্রের মুখ ঢাকা-চাপা দিয়ে, তরকারীটকে কিছুক্ষণ আগুনের তাপে ফুটিয়ে আগাগোড়া সুসিদ্ধ করে নিন। উনানের আঁচে খানিকক্ষণ এভাবে রন্ধন-পাত্রের তরকারীটি যখন বেশ সু-সিদ্ধ, নরম এবং ডালনার মতো বেশ ঘন ঘনঘনে ও কাই কাই ধরণের হয়ে উঠবে, তখনই রান্নার পালা চুকবে। এবারে উনানের উপর থেকে রন্ধনপাত্র নামিয়ে নিয়ে, সযত্নে তুলে রাখুন। তাহলেই মহারাষ্ট্রীয় প্রথায় 'ইকোড়' বা 'এঁচোড়ের তরকারী' রান্নার কাজ শেষ হবে।

জলমাটির গন্ধ

বরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

স্কুলের কাছাকাছি এসে সমীরণ অন্য পথ নিল। তার রাস্তা বাঁয়ে শুভ্রার ডাইনে। সে কিছু বলবার আগেই সমীরণ হাত জোড় করে বিদায়-নমস্কার জানাল। হেসে বলল, 'আসবেন কিন্তু আমাদের ফাংশনে। আপনাদের স্কুলে গিয়ে আমি নিমন্ত্রণ করে আসব।'

শুভ্রা কোন কথা না বলে স্মিতমুখে প্রতি নমস্কার জানাল।

এই ধরণের ফাংশন কলকাতায় নিজেদের পাড়ায় সে অনেক দেখেছে। লাইব্রেরী কি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস, ম্যাজিনয়, ক্লাসিকাল মিউজিকের অনুষ্ঠান, আধুনিক সঙ্গীতের আসর একটা-না-একটা লেগেই আছে। শ্যামল মাঝে মাঝে কার্ড নিয়ে আসে। কখনো বা টিকেটও কাটতে চায়। কিন্তু এসব অনুষ্ঠানে শুভ্রার বড় একটা যাওয়া হয় না। শুধু মায়ের আপত্তি আছে বলে নয় তার নিজেরও এতে বড় একটা উৎসাহ নেই। লোকজনের ভিড় হৈ হৈ শুভ্রা তেমন ভালোবাসেনা। তার চেয়ে সে বরং নিরিবিলিতে বসে মনের মত একখানা বই পড়তে ভালোবাসে।

কিন্তু সমীরণের আহ্বানের মধ্যে বিশেষ আন্তরিকতা ছিল। ওর স্বভাবের মাধুর্যও তাতে ফুটে উঠছিল।

স্কুলের ভিতরে ঢুকতেই কয়েকটি টিচার তার দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে চিত্রা আর ইন্দিরাও ছিল। এদের সঙ্গে শুভ্রার আগেই আলাপ হয়েছে।

শুভ্রা টিচার্স রুমে গিয়ে বসল। চিত্রা আর ইন্দিরা অন্য টিচারদের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিল। একজন বর্ষীয়সী টিচার বললেন, 'কলকাতা থেকে আসতে তো তোমার বড় অসুবিধা হবে। ডেলি প্যাসেঞ্জারি প্রথম প্রথম দু-একদিন ভালোই লাগবে। তারপর কিন্তু বড্ড একঘেয়ে হয়ে যাবে। সময় আর কাটতে চাইবে না।'

ইন্দিরা বলল, 'কী আর করবে মল্লিকাদি। সবাই তো আর আপনার মত স্কুলের কাছাকাছি বাসা ভাড়া করে থাকতে পারেনা। এক কাজ করুন না। সেক্রেটারীকে বলুন না মেয়েদের জন্যে একটা হষ্টেল করে দিতে।'

মল্লিকাদি হেসে বললেন, 'সে ভাই আমি বললে কি হবে। আমি এখন বুড়ো-বুড়ী হয়ে গেছি। রিটায়ার করবার দিন এগিয়ে এল। তারপর এই চেহারা। আমি

বললে রামবাবু কথা কানেই তুলবেন না। বরং তোমরা বললে কাজ হবে। তোমরা যদি তেমন করে ধরতে পার উনি তাহলে সব করে দেবেন তোমাদের। বিশেষ করে আমাদের যে এই নতুন কলীগটি এসেছে।

তোমার নামটি কি ভাই? তোমাকে কিন্তু আমি তুমিই বলব। প্রায়ই মেয়ের বয়সী তুমি।'

শুভ্রা নিজের নামটি ওকে জানাল। তারপর হেসে বলল, 'বেশ তো ভাই বলবেন মল্লিকাদি। আমাকে আপনি নাম ধরেই ডাকবেন।'

মল্লিকাদি খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ ভাই। কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের আপনি আপনি করতে নিজেরই কেমন যেন কানে লাগে। সবাইতো আর তোমার মত লক্ষ্মী মেয়েটি নয়। কেউ কেউ এমন ভাবে তাকায়! তাদের সেই চাউনি যেন চেঁচিয়ে বলতে চায় তুমি আমাকে তুমি বলবার কে?'

ওঁর মুখ চোখের ভঙ্গি দেখে শুভ্রা মৃদু হাসল। মল্লিকাদি মোটেই সুন্দরী নন। কালো মোটা গোলগাল চেহারা। মুখখানাও গোলের দিকেই। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ। অনেকদিন ধরে পরতে পরতে বোধ হয় এমন মোটা হয়েছে। চুলেও একটু একটু পাক ধরেছে। বয়স বছর পঞ্চাশের কম হবেনা। কিন্তু মানুষের চেহারাটাই তো সব নয়। কথাবার্তায় যতটুকু অনুমান করা যায় মহিলাটির স্বভাব প্রকৃতি ভালই হবে বলে মনে হল শুভ্রার। তবে মাঝে মাঝে ওঁর কথার মধ্যে একটু খোঁচাও রয়েছে দেখা গেল। তিনি বললেন তাঁর বয়স হয়েছে, চেহারা-টেহারার দিক থেকেও ভগবান মেরে রেখেছেন, তিনি বললে কোন কাজ হবেনা। তবে শুভ্রার মত মেয়েদের একটি ডেপুটেশন যদি সেক্রেটারীর কাছে যায় তারা যে কোন জিনিস আদায় করতে পারে। বিগত-যৌবনা এবং কুরূপা একটি মহিলার এই ঈর্ষাকে শুভ্রা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিল।

ইন্দিরা বলল, 'বেশ তো দরকার হলে দলবল নিয়ে আমরা তো যাবই মল্লিকাদি। কিন্তু দলের নেতৃত্ব আপনাকেই নিতে হবে।'

মল্লিকা বুড়ো আঙুলটি তুলে দেখিয়ে বললেন, 'আমি গেলে এই আঙ্গায় হবে তোমাদের।'

খানিক বাদে হেড মিষ্ট্রেসের ঘরে ডাক পড়ল শুভ্রার। ওঁর নাম সে আগেই শুনেছিল। অণিমা দাশগুপ্তের বয়স মল্লিকা রায়ের মতই হবে। কিন্তু বিয়ে-টিয়ে করেন নি। দিঁথি সাদা। শ্যামবর্ণ, লম্বা ছিপছিপে চেহারা। ইনিও সুশ্রী নন। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে বেশ একটু গাম্ভীর্য আছে। চাল চলনে তার হাশভারি ভাবটা চোখে পড়ল শুভ্রার।

মিস্ দাশগুপ্ত কাজের কথা দিয়েই শুরু করলেন, 'আপনাকে যদি সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট ক্লাসে বাংলা পড়াতে দিই আপনার কোন অসুবিধে হবেনা তো?

শুভ্রা বলল, 'অসুবিধে কিসের। বাংলাই তো আমার সাবজেক্ট।'

মিস দাশগুপ্ত বললেন, 'তা ঠিক। তবে পড়া আর পড়ানো তো ভিন্ন ব্যাপার। তা ছাড়া আপনি ছোট মেয়েদের পড়াতে ভালোবাসেন—না বড়দের পড়িয়ে বেশি আনন্দ পান তাও ঠিক আমার জানা নেই।'

শুভ্রা বলল, 'ছোট বড় সবাইকে পড়াতে আমার ভালো লাগে।'

মিস দাশগুপ্ত বললেন, 'শুনে খুশি হলাম। বড়দের চেয়ে ছোটদের পড়ানো কিন্তু কম শক্ত নয়। ছোটদের মনে পড়াশুনোর আগ্রহ জন্মিয়ে দেওয়া, তাদের উৎসাহী করে তোলা, স্বাধীনতা দেওয়া আবার সেই সঙ্গে শৃঙ্খলা বজায় রাখা বেশ কঠিন।'

শুভ্রা চুপ করে রইল। স্কুলের কাজের ধরণ-ধারণ যে কী তা সে জেনেই এসেছে। পাড়ার একটি স্কুলে শীত ভ্যাকানসিতে সে কাজও করেছে। তাই অসুবিধে কিছুতেই হবেনা।

হেড মিষ্ট্রেস বললেন, 'আপনাকে অবশ্য সব ক্লাসেই পড়াতে হবে। আচ্ছা, নিচের ক্লাসে যদি অঙ্ক-টঙ্ক করাতে দিই—'

শুভ্রা একটু হেসে বলল, 'অঙ্কটা বাদ দিতে পারলেই ভালো হয়। আর ভূগোল।'

হেড মিষ্ট্রেস বললেন, 'ভূগোলে আপনার বুঝি তেমন ইণ্টারেষ্ট নেই।'

শুভ্রা বলল, 'না।'

হেড মিষ্ট্রেস মৃদু হেসে বললেন, 'ভূগোল কিন্তু খুব ইন্টারেষ্টিং সাবজেক্ট। প্রথম প্রথম ভূগোলে আমারও

বিভীষিকা ছিল। কিন্তু বড় হবার পরে যখন ফের পড়তে গেলাম দেখি ওর মধ্যে রহস্যের শেষ নেই। আসলে পড়াবার দোষে আমরা ইনটারেস্টিং বিষয়গুলিকেও ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে আনইনটারেস্টিং করে তুলি।'

শুভ্রাকে কোন ক্লাসে কোন বিষয় পড়াতে হবে হেড মিষ্ট্রেস তাকে মুখে বলে দিলেন। পরে পাকা রুটিন হবে।

ক্লাস নিতে শুভ্রার ভালোই লাগল। কোন ক্লাসেই ছাত্রীসংখ্যা বেশি নয়। শুভ্রার মনে হল এই ভালো। এতে প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হবে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

ছাত্রীরা নতুন দিদিমণিকে পেয়ে খুশিই হয়েছে দেখা গেল। এরই মধ্যে কেউ কেউ তাকে নতুন দিদিমণি বলে ডাকতেও শুরু করেছে।

শুভ্রা ক্লাস নাইনের একটি মেয়েকে ডেকে বলল, 'আমার এ নাম তুমি কোথায় পেলে?

হাসি পেয়ে শাড়িপরা কিশোরী মেয়েটি হেসে বলল, 'মল্লিকাদিদিমণি বলে দিয়েছেন। আপনি নতুন এসেছেন কিনা!'

শুভ্রা বলল, 'তাই বুঝি? আমি যখন পুরোনো হয়ে যাব তখন কী বলে ডাকবে।'

'নতুন দিদিমণি বলেই ডাকব! নাম কি আর বার-বার বদলায়?'

মেয়েটি তো বেশ কথা বলতে পারে!

শুভ্রা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নামটি তো বললে না এখনো।'

মেয়েটি বলল, 'পদ্মা সুর। আমার দাদার সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে, তাঁকে আপনি চেনেন।'

শুভ্রা একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'কে বলতো?'

পদ্মা বলল, 'তাঁর নাম সমীরণ সুর। আমার দাদা এখানকার ক্লাবের সেক্রেটারী। তিনি বিকেলের দিকে আসবেন আপনার খুসে। দিদিমণিদের নিমন্ত্রণ করে যাবেন। নতুন দিদিমণি, আপনি যাবেন তো আমাদের ফাংশনে?'

শুভ্রা মৃদুস্বরে বলল, 'যাব।'

চারটে বাজবার আগেই সমীরণ কতকগুলি কার্ড নিয়ে এসে হাজির হল। টিচার্সরুমে তার সঙ্গে দেখা হল শুভ্রার।

হেড মিষ্ট্রেস আর তাঁর অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট টিচারদের প্রত্যেককেই আলাদাভাবে কার্ড দিয়েছে সমীরণ। শুভ্রাও বাদ যায়নি।

মেয়েদের এত নাম কোত্থেকে জোগাড় করল সমীরণ? ওর বোন পদ্মার কাছে শুনেছে নাকি? সে কি সব টিচারের নাম জানে!

কার্ড দিয়ে মুখেও সবিনয়ে অনুরোধ করল সমীরণ, 'যাবেন কিন্তু।'

স্কুলের ছুটির পরে ফাংশন। থাকা কি আর সম্ভব হবে?

কিন্তু সে কথা এখনই বলে সমীরণকে ক্ষুণ্ণ করতে চাইল না শুভ্রা।

স্মিত মুখে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'যাবো।' [ক্রমশঃ

অনিবার্য্য কারণে এই সংখ্যায় "পট ও পীঠ" ও "খেলা-ধূলা" বিভাগ প্রকাশ করা সম্ভব হল না। —সম্পাদক

মাসিক রাশিফল

শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য

১৬ই বৈশাখ হতে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত

এ শাখায় আমরা প্রতি মাসে ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করবার প্রয়াস পাব। জ্যোতিঃবিজ্ঞানীরা গ্রহদের গতি, প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেছেন। ফলিত জ্যোতিষ বিজ্ঞানীদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল—পৃথিবী তথা জীব জগতে গ্রহদের প্রভাব।

এ জগতে অনন্ত শক্তির দুটি লীলা—জীবন ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও ধ্বংস, সংযোগ ও বিয়োগ পাশাপাশি চলছে। এ-হিসাবে গ্রহদের দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

১। সৃষ্টিকারক ২। ধ্বংসকারক।

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। বুধ, শুক্র ও শনি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

রবি সৌর জগতের আদি বা কেন্দ্র। অন্যান্য গ্রহগণ রবি হতেই প্রসূত। এজন্য রবিকে সবিতা বলা হয়। রবি হতে যে আলোক নির্গত হয়, সে আলোক বা তেজ দ্বারা পৃথিবী আলোকিত করে। রবি হতে যে জ্যোতিঃ বহির্গত হয়, উহার কোন আকার নেই। রবি জ্ঞানরাজ্যের রাজা। সে রাজ্যে তমঃ বলে কিছু নেই। তিনি সকল অন্ধকার দূর করে থাকেন। রবি সত্বগুণের আধার। কাজেই সে রাজ্যে সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও বিষাদ, এবং রাগ ও অনুরাগের প্রবলতা দেখা যায় না।

দেবগুরু বৃহস্পতি সাত্বিক, সর্ব্ব ধর্ম শাস্ত্রে পারদর্শী ও ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি রবিকে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রবি পুরুষ, চন্দ্র প্রকৃতি। রবি সৃষ্টির কর্ত্তা, চন্দ্র সৃষ্টির প্রকাশক। রবি বীজ, চন্দ্র ক্ষেত্র। রবি আত্মা, চন্দ্র মন। রবি তেজ বা অগ্নি, চন্দ্র জল। রবি পিতা, চন্দ্র মাতা। রবি সাম্যে প্রতিষ্ঠিত, চন্দ্র ঘাত নীতিতে তাহাকে পরিপূর্ণ করেছেন।

রবি ক্ষত্রিয়, আদর্শ রাজা। মঙ্গল রক্ষী বা সেনাধ্যক্ষ। মঙ্গল শাসন দণ্ড ধারণ করে রবিকে সুশাসক রাজা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শনি সাম্য নীতির পরিপন্থী, বিভেদ সৃষ্টির কারক। রবির চক্ষে সবাই সমান। শনি বলেন তাহা নহে, কেহ বৃহৎ, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ উন্নত, কেহ অবনত।

রবি সৌর জগতের প্রবলতম শক্তি, জীবনী শক্তির কারক ও উচ্চতম ক্ষমতার প্রকাশক। রবি নির্দ্দেশ করে সৃষ্টি, জীবন, মস্তিষ্ক, আত্মা, গৌরব, মর্য্যাদা, শক্তি ও শৃংখলা। তিনি সৃষ্টি কর্ত্তা, পালয়িতা ও রক্ষাকর্ত্তা রাজা। সমাজের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি।

জন্মকুণ্ডলীতে রবি বলবান হলে জাতকের সৃষ্টিক্ষমতা ও জীবনী শক্তি খুব প্রবল হয়। রবি দুর্ব্বল হলে তাঁহার সৃষ্টির ক্ষমতা ও জীবনী শক্তি খুব সামান্য হয়।

রবি সবল হলে জাতক শক্তিমান এবং গৌরব ও মর্য্যাদাবিশিষ্ট হয়। রবি দুর্ব্বল হলে জাতক শক্তি ও শৃংখলাবিহীন এবং গৌরব ও মর্য্যাদা শূন্য হয়। রবি সবল হলে পিতার শুভ ও রাজার অনুগ্রহ লাভ এবং দুর্ব্বল হলে পিতার অশুভ ও রাজভয় উপস্থিত হয়।

রবির কারকতার বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হল। এবারে জন্মরাশি অনুসারে ব্যক্তিগত মাসিক শুভাশুভ ফলের আভাস দেয়া গেল।

মেষ—আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে এমাসে। নানা কারণে উত্তেজিত হবার যোগ রয়েছে। আত্মা কিছু উৎপাত করবে। বাদের বয়স পঁয়তাল্লিশ কিংবা ষাট তাদের সাবধান থাকা দরকার। রক্তচাপ বৃদ্ধি, অর্শ কিংবা রক্তামাশয় রোগে ভুগিবার সম্ভাবনা। সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকদের চুক্তি কিংবা নতুন কাজে হাত দিতে হলে মাসের শেষ দিকটা অনুকূল। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা প্রতিকূল। কিন্তু খনিজদ্রব্য, লোহা, কয়লা প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা ভাল। আইন ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা গোলমেলে। বিচারকদের সুনাম ও কর্ম্মক্ষেত্রে পরিবর্ত্তনের যোগ রয়েছে। পুলিশের পদস্থ কর্ম্মচারীদের শেষাংশে ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। লেখক ও শিল্পীদের পক্ষে সময়টা ভাল নয়। বেকারের চাকুরী লাভের যোগ রয়েছে। মহিলাদের সময়টা ভাল।

বৃষ—নিরাশ হবেন না। মনোমত কাজ করবার সুযোগ এসেছে। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পাবেন। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা এখনও গোলমেলে। আইন ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা প্রতিকূল। সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকদের পক্ষে সময়টা ভাল। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের অপ্রত্যাশিত আঘাত পাবার মত সম্ভাবনা। লেখক ও সাংবাদিকদের সুখবর পাবার যোগ আছে। এমাসে আপনার কিছু ঋণ হতে পারে। মাসের মাঝামাঝি আপনার শরীর খারাপ হতে পারে।

মিথুন—ধৈর্য্য ধরুন। শত্রুরা বন্ধুত্বের অভিনয় করবে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা এখনও গোলমেলে। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির যোগ আছে। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের আয় বাড়বে। চিত্রপরিচালক ও প্রযোজকদের আবাসিক ব্যাপারে গোলমাল মাসের শেষে কেটে যাবে। সরকারী চাকুরীজীবীদের সময়টা ভাল। বেকারের চাকুরী লাভ হবার

সম্ভাবনা। মহিলাদের সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ।

কর্কট—এমাসে আপনার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের যোগ রয়েছে। সাংসারিক পরিবেশ কিছুটা প্রতিকূল। উচ্চতর মহলে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন। কিন্তু উৎকণ্ঠায় আপনি বিব্রত হবেন। আর্থিক ব্যাপারে উন্নতির যোগ আছে। দীর্ঘদিনের ঋণ এ সময়ে পরিশোধ হতে পারে। লেখক ও শিল্পীরা সমালোচকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। এখন থেকে মেপে কথা বলতে চেষ্টা করুন। শাসন বিভাগীয় কর্তাদের সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। বেকারের চাকুরী লাভ হবে। মহিলাদের সময়টা ভাল।

সিংহ—এ মাসে আপনার কিছু ঋণ হতে পারে। বৈষয়িক ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ আপোষে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। প্রতারিত হবার আশঙ্কা রয়েছে। সিনেমার পরিচালক ও প্রযোজকদের পক্ষে সময়টা ভাল। আইনজীবীদের কোন ব্যাপারে হতাশ হবার যোগ রয়েছে। রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের হতাশ হবার মত যোগ রয়েছে। শাসন বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সময়টা গোলমেলে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা প্রতিকূল। বেকারের চাকুরী লাভ হবে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ।

কন্যা—সময়টা ভাল নয়। স্নায়ুবিরোধ হবার সম্ভাবনা। তীব্র মনঃকষ্ট পাবেন। বেফাঁস কথা বলে নিজের ক্ষতি করবেন না। ঝগড়াঝাটি ও মামলা-মোকদ্দমা এড়িয়ে চলুন। সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকদের পক্ষে সময়টা ভাল। আইনজীবীদের সময়টা প্রতিকূল। বিচারকদের সময়টা গোলমেলে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা প্রতিকূল থাকা সত্ত্বেও নতুন কর্মের যোগ রয়েছে। লেখক ও শিল্পীদের কাজে বাধা আসতে পারে। বেকারের চাকুরী লাভের যোগ আছে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ভাল।

তুলা—সামাজিক মর্যাদা লাভ ও প্রীতির প্রসার হবে। স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে কিছু গোলযোগ দেখা যায়। পরিণামে শুভফলের আশা করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা ভাল। আইনজীবীদের সু-সময় বলা যেতে পারে। দূরভ্রমণের যোগ রয়েছে। বেকারের চাকুরী লাভের যোগ আছে। মহিলাদের পক্ষে এখন প্রীতির প্রসার ও প্রিয়জনের উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায়।

বৃশ্চিক—এ মাসে আপনি সামান্য অসুখে ভুগতে পারেন। আয় বাড়বে। শত্রুরা পরাজয় স্বীকার করবে। আকস্মিক আঘাতপ্রাপ্তির যোগ আছে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা গোলমেলে। গৃহ ও পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। আইনজীবী ও বিচারকদের সময়টা ভাল। সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকদের পক্ষে সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। লেখক ও শিল্পীদের সময়টা গোলমেলে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ভাল নয়।

ধনু—নৈরাশ্য কেটে যাবার সময় এসেছে। আপনার চিন্তাধারা এবার নতুন কর্মের সন্ধান দেবে। নতুন বন্ধুলাভের সম্ভাবনা। আইনজীবীদের আয় বৃদ্ধির যোগ আছে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা গোলমেলে। লেখক ও শিল্পীদের কাজে বাধা আসতে পারে। বেকারের চাকুরীলাভ হবার সম্ভাবনা। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ভাল।

মকর—নতুন ক্ষেত্রে কর্মের প্রসার বা যোগাযোগ হবে। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা উপকৃত হবেন। মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে সুরাহা হবার সম্ভাবনা। বন্ধুলাভ হবে। বাসস্থানের গোলযোগ মিটে যাবে। পূর্বের প্রাপ্য অর্থ কিছু আদায় হবে। লেখক, শিল্পী ও গবেষকদের পক্ষে সময়টা ভাল। পূর্বপরিকল্পিত কাজে হাত দিতে পারেন। লোহা ও কয়লা ব্যবসায়ীদের সময়টা ভাল। শাসন বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের স্থান পরিবর্তনের যোগ আছে। বেকারের চাকুরী লাভ হবে। মহিলাদের সময়টা ঝঞ্ঝাট পূর্ণ।

কুম্ভ—নিরাশ হবেন না। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হবে। আর্থিক দিকটা ভাল। পরের কথায় কান দেবেন না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভয়ের কারণ নেই। এ মাসে আপনার যোগ্যতা বা গুণের স্বীকৃতি পাবার সময় এসেছে। দূরভ্রমণের যোগ আছে। বেকারের কর্মলাভ হবে। জমি কেনাকাটার ব্যাপারে কয়েকটা মাস অপেক্ষা করুন। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ভাল নয়। প্রতারিত হবার যোগ আছে।

মীন—অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। পারিবারিক ব্যাপারে মনের উপর চাপ পড়তে পারে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা ভাল নয়। লেখক ও শিল্পীদের ভাগ্য পরিবর্তনের যোগ আছে। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের সময়টা ভাল। সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকদের পক্ষে চুক্তিবদ্ধ কাজ করবার সময় এখন নয়। আইনজীবীদের আয়ের দিকটা ভাল নয়। বিচারকদের মাসের প্রথম দিকটা ভাল। বেকারের চাকুরীলাভ হবে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা খুবই ভাল।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১৯।৪।৬৬ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

—উপহার দিবার উপযোগী ভাল ভাল বই—

নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত

মেঘদূত

নিখিল বিরহী-জন-হিয়ার প্রতি অসীম সমবেদনা নিয়ে অমর কবি কালিদাস তাঁর অনুপম কাব্য "মেঘদূত"-এর শ্লোকে শ্লোকে—বিরহের যে অভিনব স্বর্গলোক সৃষ্টি ক'রে গেছেন—ইহা সেই অমর "মেঘদূত" কাব্যের সুললিত বাংলায় স্বচ্ছন্দ কাব্যানুবাদ। নয়নমুগ্ধকর চিত্রাবলীতে সুসজ্জিত। দাম—সাত টাকা

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির তিন শতাধিক রোবাই বহু যত্নে তাঁহাদের মূলগত ভাবানুসারে এবং ভাবানুযায়ী পাঁচটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া বিরাট কলেবরে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত। বহু চিত্রবর্ণ-রঞ্জিত চিত্রের সমাবেশে অনবদ্য।

দাম—সাত টাকা

॥ উৎকৃষ্ট মুদ্রণ—চিত্রের প্রাচুর্য প্রত্যেক বইখানির বৈশিষ্ট্য ॥
উপহার দিয়া অথবা উপহার পাইয়া
আপনাকে খুশি হইতেই হইবে

কান্তকবি রজনীকান্তের

বাণী ২৲

অনুপম কাব্যগ্রন্থ।

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত

ঋতু-সম্ভার

পৃথিবীর নিত্য-নূতন রূপ-পরিবর্তনের মাঝে আবেগপ্রবণ প্রেমিকচিত্ত যাহা অন্বেষণ করিয়া ফিরে—এই মহাকাব্যে আছে তাহারই অপূর্ব আস্বাদ। দাম—পাঁচ টাকা

সুরেন্দ্রনাথ রায়

প্রণীত

কুল-লক্ষ্মী

বালিকাগণ কিরূপে শিক্ষিতা হইলে নিজগুণে সকলকে সুখী করিতে পারিবে—তাহাই সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝান হইয়াছে। দাম—দুই টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

28 MAY 1968

— প্রকাশিত হইল —

শক্তিপদ রাজগুরুর বিপুল-কলেবর নূতন উপন্যাস

বাসাংসি জীর্ণানি

একদিকে [illegible] পুরাতন জমিদারী-তন্ত্রের পতন—অপরদিকে শিল্প-সমৃদ্ধ নূতন যান্ত্রিক যুগের [illegible] পরিবেশের স্বর্গরাজ্যে রূপান্তরণ। হারানোর বেদনা আর প্রাপ্তির আনন্দে [illegible] আর গড়া, সমস্যা ও সমাধানের অভিনব বৈচিত্র্যে দোদুল্যমান একদল নর-নারী। [illegible] আর অতুল বাসার, অশোক আর প্রীতি, ভুবন আর কদম-বৌ, গোকুল আর পান্থ দাস, [illegible] আর টিপি, অবিনাশ আর নিতে বাউরী, জীবন আর মণিমালা, প্রশান্ত আর রাঠী, সতীশ আর [illegible], সনাতন আর গঙ্গামণি—এরকম আরো অনেকেই এই উপন্যাসে ভিড় ক'রে এসেছে। [illegible] চরিত্রই মনে দাগ কাটবার মত। কিন্তু ভাবহীন নারাণ ঠাকুর লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি

পরিবর্তনের পটভূমিতে জীবনের নূতন মূল্যায়ন।

[illegible] পরিবেশে নূতন ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা এমন একখানি জীবন্ত উপন্যাস অনেকদিন বাঙলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়নি।

দাম—চৌদ্দ টাকা

—অন্যান্য উপন্যাস—

গৌড়জন বধূ ৫-৫০

কেউ ফেরে নাই ৭-৫০

কাজল গাঁয়ের কাহিনী (২য় সং) ৫;

মণিবেগম (২য় সং) ৬-২৫

কুমারী মন (২য় সং ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৩-৫০

জীবন-কাহিনী (ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৪-৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

[illegible]

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIV

দ্বিজেন্দ্র লাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

সবার সেরা
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০
KOLAY
THIN
ARROWROOT
BISCUIT
Glucose
KOLAY
QUALITY SWEETS
KOLAY
TOFFEE

৫৩-তম বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড
প্রথম সংখ্যা

—নূতন প্রকাশিত চারখানি বই—

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পিপাসা

অশোকেন্দুর্ভো তরুণ অধ্যাপক—আর বিদিশা একজন কলেজে-পড়া ছাত্রী। অশোক নিরীহ, লাজুক আর মেধাবী—কিন্তু বিদিশা দুখরা, নির্ভীক আর উগ্র আধুনিকা। তারপর কবির ভাষায় ব'লতে গেলে—"না জানি কী করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে, কী ছিল বিধাতার মনে!" এর ফলে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হ'ল, তা কক্ষচ্যুত উল্কার মত খেলে দিলে দুজনকে জীবনের দুপ্রান্তে। কিন্তু তরুণের কল্পনা রাত্রির বুকেও কি বিদিশারই যৌবনের উত্তাপ?

দাম—৩'৫০

শক্তিপদ রাজগুরুর

জীবন-কাহিনী

মানুষের জীবনে সমস্যাও যেমন—কৌতুকও তত কম নয়। এই সমস্যা ও কৌতুকের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা দুটি ভাগ্য-বিড়ম্বিত যুবক-যুবতীর মধুর প্রেমের কাহিনী।

ছায়াচিত্রে রূপায়িত।

দাম—৪'৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সতীশঙ্কর উৎপলেন্দু

সতীশঙ্কর রায়ের সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে। কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্যে অনেক কিছু করেছেন, বাড়ির চাকরকে অফিসের বেয়ারা ক'রে দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন জাকাত, পরের ধন লুটেপুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। লোকে তাঁকে ভয় ক'রতো যেন সাপ বা বাঘের চেয়েও বেশি। আবার কেউ বলে মেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রেছেন—ব'লতে গেলে একেবারে পোকা ছিলেন।

উৎপলের কাছে সতীশঙ্কর এক বিষম সমস্যা। কার কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে? যে লোক প্রথম জীবনে দেশের জন্যে জেল খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন যশ ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, তিনি আবার সহসা আততায়ীর হস্তে নিহতই বা হ'লেন কেন? এই "কেন" সম্বন্ধে তাঁর সুন্দরী তরুণী বিধবা স্ত্রী-ই বা বলেন কি? দাম—পাঁচ টাকা

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মজার মজার খেলা

বিজ্ঞানের নানা রকম কল-কৌশলের সাহায্যে মজার খেলা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করার মত বই। দেখা ও খেলার কাজ একই সঙ্গে চ'লবে।

কিশোরদিকে উপহার দেওয়ার পরম উপযোগী।

নূতন ধরনের বাইন্ড। অসংখ্য ছবিতে ভরপুর।

দাম—৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

আপনার সুন্দর কালো
কেশের জন্য...

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

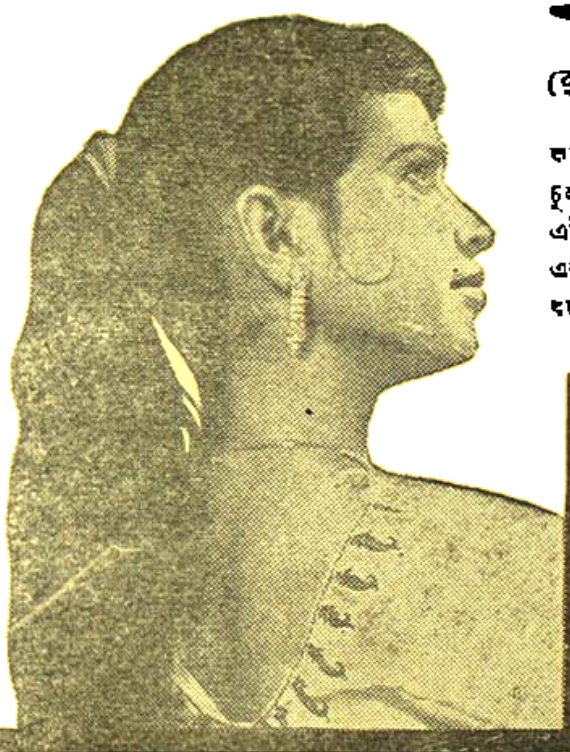

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে চুল বাড়ে—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। এই কেশ তৈলে ক্যান্থারাইডিসের এষ্ট্রাক্ট থাকায় চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ● বোম্বাই ● কানপুর

ভাল ভাল উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ

শরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিপাসা ৪-৫০

তৃতীয় নয়ন ৪-৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এক জীবন অনেক জন্ম ৬-৫০

নীলকণ্ঠী ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নমঞ্জরী ৩৲

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

দিব্যদৃষ্টি ২-৫০

অনুরূপা দেবী

গরীবের মেয়ে ৪-৫০ বিবর্তন ৪৲

রামগড় ৪-৫০ বাগ্‌দত্তা ৫৲

পোষ্যপুত্র ৪-৫০ পথের সাথী ৩৲

হারানো খাতা ৩৲

নিরুপমা দেবী

দিদি ৫৲

পুষ্পলতা দেবী

মৌলিমার অশ্রু ৩-৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ ৩-৫০

শক্তিপদ রাজগুরু

জীবন-কাহিনী ৪-৫০

কুমারী মন ৩-৫০

গৌড়জনবধূ ৫-৫০

মণিবেগম ৮-২৫

কেউ কেরে নাই ৭-৫০

কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৫৲

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মনের অগোচরে ২৲

তাস্কর

রুল্‌ অফ্‌ থ্রি ২-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

পরাজয় ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

কলঙ্কিনীর খাল ২-৫০

নরীমাধব চৌধুরী

দেবানন্দ ৪৲

প্রফুল্ল রায়

সীমারেখার বাইরে ১০৲

সোনা জল মিঠে মাটি ৮-৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পঞ্চমে উত্থানে ৫৲

সুধা হালদার ও সম্প্রদায় ৩-৭৫

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অচল প্রেম ৪৲

পঞ্চানন ঘোষাল

একটি অদ্ভুত মামলা ৫৲

একটি নির্মম হত্যা ২-৫০

অবগুণ্ঠন পৃথিবী ৫৲

একটি মায়া-হত্যা ৩৲

অন্ধকারের দেশে ৫৲

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২-৫০

মুক্তির আলোয় ২-৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মীয়তার আদ্দ ৪৲

সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অয়ং-সিদ্ধা ৩৲

ফুলের মাশুল ৩-৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিবস্ত্র মানব ৫-৫০

কার্‌টুন ২-৫০

দেহ ও দেহাতীত ৪৲

গল্প ১ম—২-৫০, ২য়—২-৫০

শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ফুলের ফসল ২৲

খেয়ালের খেসারৎ ২৲

বংশধর ২৲

ভোলা সেন

উপন্যাসের উপকরণ ২-৫০

অমরেন্দ্র ঘোষ

পদ্মদীঘির বেদেনী ৩৲

কস্তিপাথর বিল ২য় ৪৲

সমরেশ বসু

ছিন্নবাধা ৭-৫০

মায়া বসু

অগ্নিবলয় ২-৭৫

বাণিক

মেঘের পরে আলো ৪-০০

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিয়ান্স শো ৪-৭৫

রামপদ মুখোপাধ্যায়

কাল-কল্লোল ৪-৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের মন্দিরা ৩-৫০ কালকূট ৩৲ কাকু কহে রাই ২-৫০ কাঁচামিঠে ৩৲ আদিম রিপু ৩৲ গৌড়-মল্লার ৪-৫০ বিজয়লক্ষ্মী ২-৫০ বহ্নি-পতঙ্গ ৩-৫০ পঞ্চভূত ২-৫০ বিশ্বের বন্দী ৪-৫০ শাদা পৃথিবী ৩৲ ছায়াপথিক ৩৲ দুর্গরহস্য ৩-৫০ চুয়াচন্দন ৩-২৫

প্রবোধকুমার সান্যাল

নবীন যুবক ২-৫০ কলরব ২৲

প্রিয় বান্ধবী ৪৲

কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲

অশোককুমার মিত্র

দু'ঘণ্টা ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চরাক্ত ৩৲

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

মকল পাঞ্জাবী ২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কাড়ো হাওয়া ২-৫০

বনফুল

শিভামহ ৬৲

নবপ্রভাতপুরুষ ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

মিলন-মন্দির ৩৲

প্রভাত দেবসরকার

অনেক দিন ৩-৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পণ্যের

প্রচারে

'প্রবাসী'র

প্রচারণী

প্রকৃষ্ট ॥

বিজ্ঞাপনের বিস্তারিত হার—প্রবাসীর ম্যানেজারকে পত্র লিখলে—সানন্দে জানানো হইবে।—প্রতি পৃষ্ঠা ১০০৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬০৲। চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের হার এবং বিশেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের বিষয় জানিতে হইলে পত্র লিখুন—কিংবা সাক্ষাৎ করুন।

ম্যানেজার

প্রবাসী প্রেস প্রাঃ লিঃ

৭৭-২-১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে
—বিজয় বৈজয়ন্তীবাহী—

মোহিনী মিল্‌স লিমিটেড

(স্থাপিত—১৯০৮)

১নং মিল
কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা)

২নং মিল
বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস
চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
২২ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

শ্রীকিশোরীলাল রায়ের
অনামী (২য় সং—মহাভারত, কালিদাস, গীতা, ভংবুতি, নানা ইংরাজ কবি, তিব্বি কবি প্রভৃতির কবিতার অনুবাদ। কিশোরীলালের স্বরচিত গান ও কবিতা, ইন্দিরা দেবীর স্বরলিপির অনুসরণে—দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির পত্রাবলী) মূল্য ৪৲
অভাগ্যনীয় (অঘটনী উপন্যাস) ১০৲
ভ্রাম্যমাণ (২য় সং) ৸৹
অঘটনের ঘটা (উপন্যাস) ৬৲
দোলা (উপন্যাস—২য় সং) ৮৲
ভিখারিণী রাজকন্যা ২৷৷৮
ভাগবতী কথা (কবিতা)—৫৲ ভাগবতী গীতি—৪৲
শ্রীচৈতন্য (কাব্যনাট্য)—৩৷৹ মহাভারতী কথা—৩৷৹
তীর্থংকর (৩য় সং)—৮৲ দোটানা—৩৲
তারি এক হয় আর (নেতাজী-কেন্দ্রিক উপন্যাস)—৮৷৹
ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী (ধর্ম ও যোগ সম্বন্ধে)—৫৲
ছাকার আলো (উপন্যাস)—৭৲
স্মৃতিচারণ ১ম খণ্ড—(বিজেন্দ্রলাল, গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্র লালিত, সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অতুলপ্রসাদ সেন চরিত্রচিত্র—২য় সং সচিত্র—৮০০ পৃষ্ঠা) ১২৲
স্মৃতিচারণ ২য় খণ্ড—(রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, যতীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ, যোগীনাথ কবিরাজ, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি—সচিত্র—৩০০ পৃষ্ঠা)— ৬৷৹
অঘটন আজো ঘটে (উপন্যাস—৭ম সং)—৫৲

হরিকৃষ্ণ মন্দির, পুরী—৫ ও কলিকাতার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

কুষ্ঠ ও ধবল

৬০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম্মরোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।
পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭ হাওড়া।
শাখা :—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

বহুল প্রশংসিত ও পরীক্ষিত
বন্ধ পীড়ায় সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য মহাপুরুষ প্রদত্ত মহৌষধ
অমিয় স্নেহ
দাম দুই সপ্তাহের জন্য ৭৲ টাকা ষ্ট্যাম্পসহ পত্রে অবস্থার বিষয় জ্ঞাতব্য। মূল্য অগ্রিম প্রেরিতব্য।
এখানে সর্ব্ববিধ জ্যোতিষের কার্য্য ও দুর্লভ মহাশক্তিপূত কবচাদি ও দুরারোগ্য ব্যাধির ধারণীয় ও সেবনীয় ঔষধ সুলভে দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ডাঃ শ্রীবিজয়কুমার ভট্টোপাধ্যায়
জ্যোতির্বিনোদ ভূতপূর্ব্ব—মহঃশক্তি কার্য্যালয়
রাধাবাজার, নবদ্বীপ পোঃ (নদিয়া)

—প্রকাশিত হইয়াছে—
অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার, এম. এ, ডি-ফিল্,
সম্পাদিত
গিরিশচন্দ্রের
প্রফুল্ল ৪, জনা ৪,
ও
দ্বিজেন্দ্রলালের
চন্দ্রগুপ্ত ৪৲ সাজাহান ৪৲
সারগর্ভ ভূমিকা, চরিত্র-আলোচনা ও টীকাসহ। ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে মূল্যবান ও অপরিহার্য সংযোজন।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

লিলি
বিস্কুট
শুধু বড়দের নয় ছেলেমেয়েদেরও প্রিয়

৪৩-21/68

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

— * বিবিধ গ্রন্থ * —

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম ২,

শ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত ঐতিহাসিক গ্রন্থ

অত্যাচারী সত্যেন্দ্রনাথবসু ২-৫০

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হে মহাজীবন (জীবনী) ৩৲

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু-অনুলিখিত

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩৲

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সচিত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।
১ম খণ্ড (২য় সং)—৩৲ ২য় খণ্ড—৪৲

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ ৭৲

পদাবলী-পরিচয় ৫৲

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

পারায়ণ (পরলোক-তত্ত্ব) **১-৫০**

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত ঐতিহাসিক গ্রন্থ

সিরাজদ্দৌলা ৬,

ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী প্রণীত

শরৎ-সাহিত্যে পতিতা ২·৫০

জাহানারার আত্মকাহিনী ৩-৫০

কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা ২৲

ডাঃ বিমলকান্তি সমদ্দার প্রণীত

রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৫·৫০

শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত

নবভারতের বিজ্ঞানসাধক

সচিত্র। দাম—১·৭৫

তারকচন্দ্র রায় প্রণীত

বাংলা দার্শনিক সাহিত্য-ভাণ্ডারে নূতন সংযোজন

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস

(১ম খণ্ড) ১০৲ (২য় খণ্ড) ১২৲

সাংখ্য ও যোগ (ভারতীয় দর্শন) ৪·

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

৩য় খণ্ড (সমসাময়িক দর্শন)—১০৲

শ্রীপ্রবুদ্ধকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অবলিপি-কৌমুদী ২-৫০ রাগেশ্রী (১ম) ১-২৫

শ্রীহরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত

সামুদ্রিক-রত্ন ৬৲

পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান (সচিত্র) ৫৲

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

দিল্লীশ্বরী (সচিত্র) ২৲

রজিয়ৎ ও নূরজাহানের জীবন-কথা।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত

কোন্ পথে? ২-৫০

আটটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ।

দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত

গৃহশ্রী ৩-৫০

উপহার দিবার উপযোগী।

ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রণীত

পঞ্চাশের পরে (স্বাস্থ্য-তত্ত্ব) **২-৫০**

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

মানবতার সাগর-সঙ্গমে (সচিত্র) **৬৲**

বাংলার নাটক ও নাট্যশালা ৪,

নরেন্দ্র দেব
সম্পাদিত

মেঘদূত ৭৲
ওমর খৈয়াম্ ৭৲
দুইখানি অনুপম কাব্য-গ্রন্থ। সচিত্র।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

কান্তকবি রজনীকান্তের

বাণী ২,

আনন্দময়ী ১৲
শেষদান ১·২৫

বহুদিন ধরিয়া বাঙালী জাতিকে যুগপৎ হাস্যরস ও উচ্চভাবের প্রেরণা যোগাইতেছে।

পোড়া, কাটা, পোকার কামড় এবং সংক্রামক চর্মরোগে সত্বর আরাম দেয়।

ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করে। কাপড়ে দাগ লাগেনা।

সব সময় এ্যাক্রিমেণ্ট হাতের কাছে রাখুন।

এ্যাক্রিমেন্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

যশস্বিনী মহিলা-কথাশিল্পী

অনুরূপা দেবীর

— অমর সাহিত্য-সাধনা —

গরীবের মেয়ে (ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৪-৫০

পোষ্যপুত্র ৪-৫০ **বিবর্তন** ৪৲

পথের সাথী ৩৲ **বাগ্‌দত্তা** ৫৲

রামগড় ৪-৫০ **হারানো খাতা** ৩৲

যে মহিয়সী মহিলার অবদানে বাঙলা সাহিত্যের বিগত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস সমৃদ্ধ হইয়া আছে—উপরের বইগুলি তাহার অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি। সৃষ্টি শক্তির বিশালতা—লিপিচাতুর্য ও চিত্ত বিশ্লেষণে মহিলা-ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

অতিথি-নিয়ন্ত্রণ বিধি

লঙ্ঘন করে
অতিথিদের আপ্যায়ন করলে
আপনার অহমিকা হয়তো তৃপ্ত হতে পারে

কিন্তু তার ফলে

হাজার হাজার লোক
দৈনন্দিন খাদ্যে বঞ্চিত হয়

অতএব

অতিথি-নিয়ন্ত্রণ বিধি মেনে চলুন

যাঁদের নিমন্ত্রণ না করলে নয়, শুধু তাঁদের নিমন্ত্রণ করুন

আর যে-সব খাদ্য-পরিবেষণ আইনসম্মত শুধু তাই খাওয়ান

ভর. বি. (আই অ্যাণ্ড পি. আর) এ. ডি. ডি ।১৬

ভারতবর্ষের সূচী

ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—ষষ্ঠ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৩

লেখ-সূচী

১। আমি কে? (প্রবন্ধ)
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

২। ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ—
পুষ্পদেবী সরস্বতী শ্রুতিভারতী

৩। অবটনের পূর্বরাগ (উপন্যাস)
দিলীপকুমার রায়

৪। বাঙ্ময়তনায় ছন্দোছন্দ (প্রবন্ধ)
প্রবোধেন্দু সেন ৯৭ ৫৭৫

চিত্র-সূচী

১। স্টুডিওর বাইরে সবিতা বসু। "ফিরে চল" চিত্রে একে আবার দেখা যাবে, ২। নবাগতা সবিতা বিশ্বাস। "পাগল ঠাকুর" চিত্রে বৌঠান-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, ৩। পুণ্যপ্রভা দেবী, ৪। "বেদী তারাসম" নামের ছোট্ট মেয়েটি আজ যৌবনময়ী অভিনেত্রী হিসেবে খ্যাতি-লাভ করেছেন। এর চলতি ছবি ছিপো কা বেটা, ৫। জনপ্রিয় কয়েকটি বাঙলা ছবির নায়িকা সুপ্রিয়া দেবী।

লেখ-সূচী

৫।	জীবনের জয় (কবিতা)—ছায়া দেবী	৫৮৯
৬।	অনন্ত (গল্প) প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৮২
৭।	অনুভব (কবিতা)—অমিতাভ বসু	৫৮৬
৮।	সুন্দরনগরের ইতিকথা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ করণ এম-এ,	৫৮৭
৯।	আহ্বান (কবিতা)— শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯১
১০।	সময় হয়নি (গল্প) শ্রীকালাচাঁদ রায়	৫৯২
১১।	সুন্দর (কবিতা) কবিরত্ন হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯৩

চিত্র-সূচী

রাইকাগার-চিত্র

শৈল-শহর (শিমলা)

FOR COOL DELIGHT

WHEN OPPRESSED BY HEAT AND STICKY SWEAT, OATINE TALCUM POWDER IS A HANDY RELIEF. ITS SWEET SMELL AND SILKY SMOOTHNESS TRANSPORT YOU INTO A HEAVEN OF COOL DELIGHT.

MARTIN & HARRIS (PRIVATE) LIMITED
CALCUTTA-1

লেখ-সূচী

১২। অতীতের স্মৃতি—
পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায় ৫৯৪
১৩। পরিবর্ত্তন (গল্প)
বিভাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০০
১৪। আমি (কবিতা)—গীতা মুখোপাধ্যায়… ৬০৪
১৫। সাময়িকী ৬০৫
১৬। অনামিকা (কবিতা)
শক্তি মুখোপাধ্যায় ৬০৭
১৭। প্রতিনিধি (গল্প)
শ্রীঅনিলকুমার বাগচী ৬০৮
১৮। কোথায় থামবেন ?
শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ৬১০
১৯। গ্রহ-জগৎ—বাসুদেব ভট্টাচার্য্য ৬১১
২০। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ (নাটিকা)
পীযূষ চন্দ ৬১৭

লেখ-সূচী

২১। প্রাচীন ভারতের শুক্রনীতি—
অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী ৬২৯
২২। ফুলের গন্ধে (গল্প)—রমেশ মজুমদার … ৬২৬
২৩। কিশোর জগৎ— ৬২৫
(ক) আচরণ বিধি—শ্রীজ্ঞান
(খ) বস্তিবুড়োর ছড়া—শচীনন্দন আঢ্য
(গ) একটি অধ্যায়—নির্ম্মল চক্রবর্ত্তী
(ঘ) মাকড়সার জাল ও সুতা—গৌর আদক
(ঙ) কিশোরের ডাক (কবিতা) বিশ্বেশ্বর সামন্ত
(চ) পানকৌড়ী (উপকথা) শ্রীবিভারাণী দেবী
(ছ) পাখি-চোখ (কবিতা) রমাপ্রসাদ দে
২৪। শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের ইঙ্গিত—
ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার ৬৩৩
২৫। মেয়েদের কথা— ৬৩৫
(ক) সংকট : সমাজে, সংসারে—শৈল চট্টোপাধ্যায়

যে কয়েকটি নামকরা চুলের তেল আছে
তার মধ্যে কেয়ো-কার্পিন তেলেই
এই দুর্লভ গুণ গুলি বর্ত্তমান
যা সব মহিলাদেরই পছন্দ

চুল চট্‌চটে হয় না শুধু কেয়োকার্পিনেই সম্ভব
চুল শুক্‌নো বা রুক্ষ দেখায় না-সারাদিন
চুল কোমল, মসৃণ ও পরিপাটি থাকে
চুলের গোড়া শক্ত করে-ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার রেখে
চুলের গোড়া শক্ত করে।

কেয়ো-কার্পিন
একটি রিমিষ্ট কেশ তৈল

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা,
গৌহাটী, কটক, জয়পুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ,
লাহোর, ঢাকা

Dey's

PX-DMK/8-15

লেখ-সূচী

(ঙ) বিজ্ঞানী মেঘে রেডেন ব্রাউন—সুষমা মৈত্র
(গ) পণপ্রথার পরিণাম ও উহার প্রতিকার চিন্তা
(প্রবন্ধ) শ্রীগৌরগোবিন্দ ভট্টাচার্য
২৬। অভিনয়নের পাখি (উপন্যাস)
প্রফুল্ল রায় ৬৩৯
২৭। অহেতুকী কৃপা
শ্রীগোপালদাস কাব্যভারতী ৬৪৩
২৮। নব্যভারত গঠনে আত্মত্যাগ—
অমিতাভ কুমার ৬৪৪
২৯। জল মাটির গন্ধ (উপন্যাস)
নরেন্দ্র মিত্র ৬৫০
৩০। গৃহে এস গৃহ-লক্ষ্মী ৬৫২
৩১। পট ও পীঠ—শ্রীলীলা ৬৫৩
৩২। খেলা-ধূলা—
সম্পাদনা—শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ৬৫৯
৩৩। খেলার কথা—
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ৬৫৯

শ্রীসুষমা মিত্র প্রণীত

নিশীথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে

দাম—২.৫০

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত

নিত্যকর্ম-কৌমুদী

যাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে—তাহাই নিত্যকর্ম।

ইহাতে ত্রিসন্ধ্যার সমস্ত কার্য, সন্ধ্যা, আহ্নিক, সকল প্রধান দেব-দেবী পূজা, ধ্যান, প্রণাম, স্তব-কবচ, পার্থিব শিবপূজা, তীর্থ-স্নান, তর্পণ ও বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সহজ বাংলা ভাষায় যে কার্য যেমন ভাবে করিতে হয়—তাহা লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখা ত নিকটে থাকিলে কাহাকেও আরকোন বিষয়ের জন্য অন্যের সাহায্য লইতে হইবে না। অধিকন্তু গৃহস্থগণ সুযোগিত অভাবেও বহুবিধ নিত্যকর্ম করিতে সক্ষম হইবেন। দাম—৭

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

● মেয়াদী আমানতে (মেয়াদ অনুযায়ী) সর্বোচ্চ বার্ষিক সুদ ৭½%

● সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বার্ষিক সুদ ৪%

● রেকারিং ডিপোজিটে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করুন, আনন্দের সঙ্গে গড়ে উঠবে সঞ্চয়ের অভ্যাস।

সেবার প্রতীক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা—১

শৈল-শহর (সিমলা)

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৩

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

আমি কে ?

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

আমি কে এ প্রশ্ন যারা অনেক সাধু মহাত্মার অনেক [illegible] করে এসেছেন। তাঁরা নিজ নিজ মতানুসারে জিজ্ঞাসুদিগকে নানা ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন। তাতে কেউ তুষ্ট হচ্ছেন—কেউবা নিরন্তর আত্ম-জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ নিয়ে তত্ত্বের ও তর্কের ঘনারণ্যে প্রবেশ করেছেন—যে অরণ্যের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে আর তাঁরা ফিরে আসতে পারছেন না।

কোন কোন মহাত্মা বলেছেন—আমি হচ্ছি পরম পিতার দ্যুতির এক কণা। প্রারব্ধ বশত ইহলোকে দেহ ধারণ করে আছি। দেহ আমি নই। এই দেহ আমায় ত্যাগ করে যেতে হবে। এ দেশও আমার নয়, সত্য-দেশের প্রকৃত অধিবাসী আমি। কিন্তু সত্যদেশে যাওয়ার পাথেয় হচ্ছে সদ্‌গুরুদত্ত সৎ-নাম যে নামে আর পরমসত্তায় কোন ভেদ নেই। আমি নাম স্বরূপ—আমার মন্ত্র সৎ-নাম—আমার দেবতা—নাম। নামই পরমগতি। নামে আর পরমসত্তায় কোন পার্থক্য নেই। নাম স্মরণ করাই তাঁকে স্মরণ করা। গুরুদেবের একথা শ্রবণ করে ঠাকুরমা নাতির নাম রাখলেন শ্রীমধুসূদন। মধুসূদনকে বারবার ডাকবার একটা সহজ উপায় তিনি বের করে নিলেন। সজ্ঞানে অজ্ঞানে তো মধুসূদনকে ডাকা যাবে।

কিন্তু নাস্তিকে মধুসূদন বলে ডেকে ডেকে ঠাকুরমা ক্রমে ভুলেই গেলেন নামটা আসলে কার। মধুসূদন নাম কানে আসলে এখন তাঁর আর ভক্তকুলহৃদয়বিহারী শ্রীমধুসূদনের নাম মনে আসে না—মধু নামক দুশ্চরিত্র মদ্যপায়ী অকাল কুষ্মাণ্ড নাস্তিকটির কথাই মনে পড়ে। ঠাকুরমা ভুলে যান—নামই ব্রহ্ম—নামে আর তাঁতে কোন তফাৎ নেই।

নামে আর ব্রহ্মে কোন তফাৎ নেই—এই মতবাদ ভক্তহৃদয়ে নাম-রস পানলালসা বৃদ্ধি করে সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন নামের অন্য কোন মানে আমাদের মনে বাসা করে বসে তখন সেই নামের মহিমা আর থাকে না। তখন গৌরহরি নামক পাশের বাড়ির লম্পট মাতালটাই মনের মাঝে দেখা দেয়, প্রেম বিলিয়ে পথে পথে গমনরত গৌরহরির ছবি চিত্রপটে ভেসে উঠে না। তাই নাম যে ব্রহ্ম নয়, এ অপেক্ষা বহু সাধু মহাজনকে পীড়িত করেছে। সেই কারণেই কোন কোন সাধু বৈকুণ্ঠের রামকে অযোধ্যার রাম থেকে পৃথক করে ভাবতে চেষ্টা করেছেন। হরি, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী কত নামে ডেকেছেন,—এইভাবে নাম ছেড়ে কত নামের সাধনা মানুষ করেছে—জিহোভা, গড, আল্লা, কত নামের সাধনায় মানুষ মেতেছে। শেষে নামের বিভ্রাটে গিয়ে মস্ত কবীরকেও গাইতে হয়েছে—'রাম রহিম এক হ্যায়, নাম ধরায়া দো।' কিন্তু তাঁর অনেক আগে উপনিষদের যুগের ঋষিরাই নামের মহিমার বিভ্রাটে স্থিরচিত্ত থাকতে পারেন নি। সব নাম বাদ দিয়ে তাঁরা চিরন্তন প্রভুকে 'সঃ' এই সর্বনামে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আত্মাকে তাঁর সঙ্গে অভিন্ন জেনে বলেছেন—সোঽহং। জগৎকে তাঁর সঙ্গে অভিন্ন জেনে বলেছেন—'ওং খমসি'। আমাদের 'অহংকারে'র সঙ্গে আমাদের নাম বিশেষভাবে জড়িত। আমার নামের সঙ্গে আমার একত্বে আমি কখনও সন্দেহ করতে পারি না। আমার নামকে আমি এত ভালবাসি। আমার নামকে ভালবাসা—আসলে আমার অহংকে ভালবাসা। এই কারণেই ঈশ্বরও তাঁর নাম এক ও অভিন্ন এ কল্পনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু আর্য ঋষিদের অনেকেই মানুষের এই চিত্ত-জাত সংস্কারের অর্থ বুঝতে পেরে ঈশ্বরকে কোন নাম দিতে চান নি—শুধু 'তিনি' বলেছেন—সঃ বলেছেন—সেই 'সঃ'তে আর আমাতে কোন ভেদ নেই।

এই যুগের সাধক আনন্দ স্বামী (৺আনন্দচন্দ্র নন্দী রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক) বহু নামের বিভ্রাট ঘুচাতে গিয়ে আর এক নূতন নামে ডাকতে লাগলেন প্রভুকে। যে নাম সকল সম্প্রদায়ের গ্রাহ্য—সেই মধুর নাম 'দয়াময়'। তিনি বিভ্রান্ত মানুষদের ডেকে বললেন ঝগড়ায় মত হয়ো না—বিভেদ ভুলে প্রভুকে এক নামে ডাকো—তিনি বুঝিয়ে বললেন—

"যেমন মনুষ্যমধ্যে জাতিগত পার্থক্য দূর না হইলে মঙ্গলের সম্ভাবনা অল্প, তদ্রূপ নামগত এই নানা পার্থক্য দূর না হইলে মঙ্গলের সম্ভাবনা অল্প, তদ্রূপ এই নামগত নানা প্রকার ভাব দূর হইয়া সকল মনুষ্য এক নামে দীক্ষিত না হইলে সর্বধর্মের এক যোগ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সর্বনামের যোগ এক নামেতে দিয়া করুণাময় ঈশ্বর ধর্মের সকল বিধা দূর করিবেন এই অভিপ্রায় জানা যাইতেছে। সেই নাম কোন ভাষায় অনূদিত না হইয়া একভাবে সকল মনুষ্যের হৃদয়কে অধিকার করিবে এবং সকলেই এই এক নামে দীক্ষিত হইয়া জীবনাশা সকল করিবে ও ভ্রাতৃবিরোধ একেবারে দূর করিয়া দিয়া আনন্দ লাভ করিবে।" তিনি গান করলেন :—

ভয় নাই আর সংসারে দয়াময় নাম সাধরে
জীবের পরিত্রাণ তত বিধান দয়াময় রূপসাগরে।
মধুর প্রেমের ধন, দয়াময় কর মনন, হৃদয় শুদ্ধ
হবে অচিরে।
দেখ যাবে ব্যাধি হবে সিদ্ধি, মৃত্যুঞ্জয় হবে শরীরে।"

কিন্তু দয়াময় আখ্যা [illegible] তো তিনি সকলের মুখে এক নাম ফোটালেন, কিন্তু 'আমি কে' এর উত্তর তো পাওয়া গেল না। এই দেহে আমি বাস করছি—এই দেহ আমি নই, এই দ্বিধা বিচ্ছিন্ন আমিত্বের ধারণা তিনি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করলেন। তিনি জানালেন দেহ ও আমি এক। আর আমি ও দেহ তাঁরই প্রকাশ। তিনি বুঝিয়ে দিলেন :—

"আত্মা এবং শরীর উভয়েই এক এবং ব্রহ্মভূত পদার্থ। সিদ্ধ ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দর্শন করেন না। শরীর আত্মাতে কার্য করিতেছে ও আত্মা শরীরে [illegible] ও ভূত সকল একে অন্যের সহিত সামঞ্জস্য

রক্ষা করিয়া পরমাত্মার বিবিধ শক্তি যোগে জগতের কার্য সম্পাদন করিতেছে। উহারে এক মূল হইতে উদ্ভব না হইলে এইরূপ ঐক্যভাবের কার্য হইতে পারে না। প্রকার-ভেদ হইলেও এক মূল হইতে উৎপন্ন দুই বস্তু বস্তুতঃ এক।"

আমি কে? আমি আত্মা—আমি দেহ—আমি মন—আমি—তিনি যাঁর পর আর কেউ নেই। আমার নাম নেই আমার জন্ম নেই—আমার মৃত্যু নেই। তবে কি দেহেরও জন্ম-মৃত্যু নেই? না—নেই। জন্মের অর্থ যদি অস্তিত্বে আগমন—আর মৃত্যুর অর্থ যদি অস্তিত্বের বিলোপ বুঝায় তবে দেহেরও জন্ম-মৃত্যু নেই। কারণ এই দেহ কোন না কোন রূপে চিরকাল ছিল, কোন না কোন-রূপে চিরকাল থাকবে।

ন মে মৃত্যুশংকা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।

(নির্বাণষটক)

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ (১৮)

"য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং
সর্ব্বাণি চ ভূতানি অন্তরো যময়তি
যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, পৃথিব্যা অন্তরো
যং পৃথিবী ন বেদ" (বৃহদারণ্যক)

যিনি ইহলোকে যিনি পরলোকে থাকিয়া সবার মাঝে
আপনার বশে রাখে সবাকারে প্রতিটিপ্রাণীতে রাজে
পৃথিবীর মাঝে থেকে
নিজেকে রাখেন ঢেকে
পৃথিবী জানেনা তাঁহার মহিমা যাঁরে শত বেদ হারে
সবার অতীত সেই অতুলন মুনি-ঋষি চায় যারে।
অন্তরযামী সবার ভিতরে সাক্ষীরূপেতে রন
তাঁহার ধর্ম্ম ব্রহ্ম ধর্ম্ম ব্যপদেশ বলি কন
যেমন ব্রহ্ম করে
ইন্দ্রিয় যারা করে
অন্তরযামী অন্তরে রহি চালক শাসক হন
সবাকার সেই পূজ্য পরম সবার কাম্য ধন।

(ন চ স্মার্ত্ত মতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ) ১৯

স্মার্ত্ত অর্থে স্মৃতিতে উক্ত প্রকৃতি প্রধান নয়
তদ্ধর্ম্ম অর্থে প্রকৃতি ধর্ম্ম বলা দেখা নাহি হয়
সাংখ্য দর্শনেতে যাহা কয়
অন্তরযামী পুরুষ যে হয়
দ্রষ্টা এবং শ্রোতা বলি দেখা ব্রহ্মেরি
কথা বলে
ব্রহ্ম এমন জেন নিশ্চয় ভুলিওনা কোন ছলে।

শারীরশ্চ উভয়েঽপি হি ভেদেন এনং অধীয়তে (২০)

শারীর জীব ও অন্তরযামী শব্দ বাচ্য নয়
"উভয়ে অপি" কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় শাখাতে কয়
এবং বলিয়া এই জীবকেই
ভিন্ন করেছে পরমাত্মাতেই
ভেদেন অধীয়তে কথার অর্থে তাহাই জানিও হয়
যজুর্ব্বেদের দুইটি শাখাকে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন কয়।
কাণ্ব শাখাতে যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন এই
কথা বলিয়াছে
বিজ্ঞানময় জীবের মধ্যে অন্তরযামী রাজে
মাধ্যন্দিন শাখাতে কয়
তাহা এই মত হয়
স আত্মনি তিষ্ঠন আত্মনোঽন্তরঃ
তাহা এই মত কয়
জীবাত্মার মাঝে থাকিয়া আত্মা ভিন্ন হইয়া রয়।

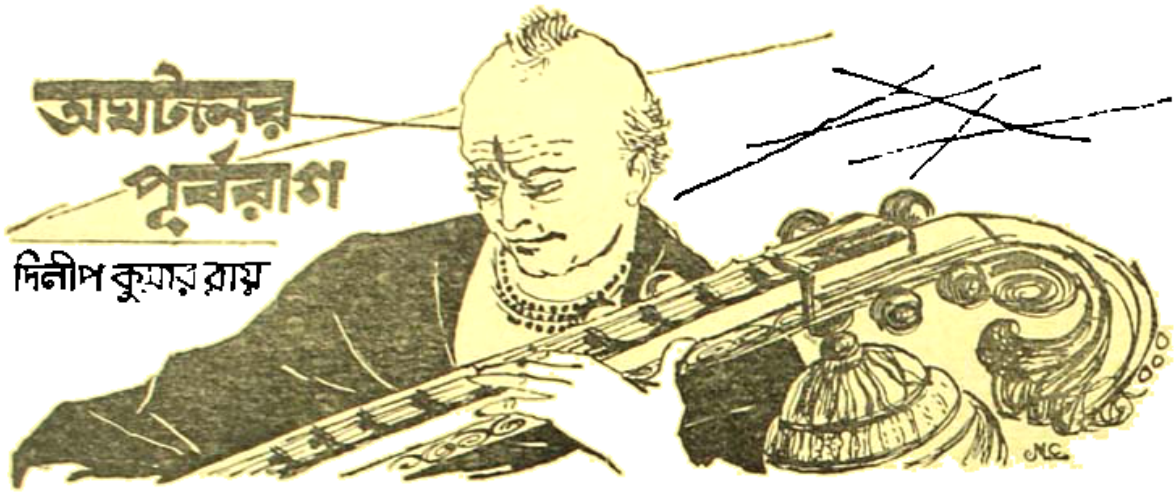

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চব্বিশ

অসিত (একটু ভেবে) : বলতে এত সময় লাগছে কারণ আমি থেমে থেমে বলছি, টীকা টিপ্পনিও করছি। কিন্তু ঘটনাগুলো ঘ'টে গেল কটিতিই—যেন সিনেমায় ভোলা ছবির মতন—এর পরে ও, তার পরে সে—একটুও ফাঁক না রেখে। কাজেই সত্যিই আমি ভাববারও সময় পেলাম না শমিতা এসে জেরা করলে কী বলব। আমার কেবল একটি ভয়ে—বুক চিপ চিপ করছিল—পাছে কের আবার একটা 'সীন' হয়।

কিন্তু ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, শমিতা ওদিকেই ঘেঁষল না। "সীন করবে ও? ছি!" এই ভাব মুখে ফুটিয়ে ওর দিকে তাকালোও না। যেন ও-ই এই ভাবেই আমাকে বলল: "তোমাকে মা ডাকছেন। বিশেষ জরুরি।" ব'লেই আমার উত্তরের জন্যে একটুও অপেক্ষা না ক'রেই খপ্ ক'রে আমার একটা হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চ'লে এলো—বাইরের ঠাটটা পর্যন্ত বজায় রাখল না।

একটু দূরে এসেই হাত ছেড়ে দিয়ে আমাকে বলল: "আমি মাকে বলেছি যে, দুদিন আগে আমাদের নিয়ে যে তকরার হয়েছিল তাঁদের মধ্যে সে সবই তোমার কাছে ব'লে ফেলেছি।"

ঠিক এই সময়ে এল বাগানের একটা মোড়। আমরা বেঁক নেবার মুখে ঘাড় ফেরাতেই দেখলাম মূর্ছনা আমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বেঁকিতে ব'সে দুহাতে মুখ ডুবিয়ে।

মোড়টা নিতে না নিতে দেখি শমিতা আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে—বুঝতে তো ওর বাকি ছিল না আমি কার কথা ভাবছিলাম। তাই আরো ঢাকতে চেয়েই বললাম: "কিন্তু তোমার বাবা-মার তকরারের কথা বেশি কিছু তো আমাকে বলো নি তুমি।"

ও বলল: "যেটুকু বলেছি তারই কথা মাকে বললাম—মূর্ছনা কতটা বলেছে জানি না—তাই তার কথা বলি নি, ভয় নেই।"

একটু আশ্চর্য হ'য়েই বললাম: "এতে ভয় আমার আর কী বলো!—আমি শুধু—"

"কী?"

অগত্যা বললাম: "জানতে কৌতূহল হচ্ছিল ঠিক কী বললে তুমি মাসিমাকে?"

"বললাম—তবে আমি বিবাহ করব না এটা যখন নিশ্চিত তখন কেনই বা এসব ঝামেলা বোঝানো? বাবা কাশ্মীরে আমাদের যে কুটীরটি দিয়েছেন সেখানে যেতে দাও আমাকে—এখানে আমি আর টিঁকতে পারছি না।"

বলতে বলতে আমরা পৌঁছলাম মাসিমার শয়নকক্ষের সামনে। মূর্ছনার দাসী হাজির, বলল: "মেমসাহেব ডাকছেন। তাঁর শরীর—"

শমিতা বলল: "জানি—যা তুই। —শোন্—এখানে আড়ি পাতলে যেন দূর ক'রে মনে রাখিস।"

* * *

মাসিমার ঘরে যখন পৌঁছলাম তখন মনের মধ্যে

অস্বস্তির কী যে অঙ্কুর গ'জে উঠেছে! কিন্তু তাঁকে দেখে ভরসা এল অনেকখানি। ভাবান্তর এল বিশেষ ক'রে তাঁর বিষণ্ণ মুখখানি দেখে। ঘরে তাঁর একটি ডাইভান মতন ছিল—আশেপাশে অনেকগুলি কুশন। ডাইভানও ঠিক না। জাপানীরা যেমন মাদুরের ফ্রেম করে না? অনেকটা তেম্‌নি। কেবল এই ফ্রেমটার একটা দিক একটু তোলা যায় সার্জারির টেবিলের মতন। সেই দিকটা খানিকটা তোলা হয়েছে, তাতেই ঠেশান দিয়ে তিনি ব'সে। মাসিমা শোবার ঘরে যখন পড়তেন এই ভাবেই পড়তেন।

বার্বারা: তারপর?

অমিত: এহেন শেষে আশেপাশে কুশনের মাঝখানে এলায়িত হ'য়ে মাসিমা অর্ধশায়িতা অবস্থায় চোখ বুঁজে প'ড়ে ছিলেন। ঘরে ঢুকতে আমার চোখে পড়ল তাঁর গায়ে একটি অপরূপ সুন্দর খাস জাপানি কুলকাটা কিমোনো। আমরা ঢুকতেই তিনি চমকে তাকালেন ফিরে। এমন ক্লিষ্ট চাহনি যে, মায়া হ'ল, সত্যি। বুঝলাম ঝড়ের এখন অনেক ঝাপটাই তাঁর ওপর দিয়ে গেছে যার কিছুই আমি টের পাই নি এখনো। তাঁর ভাবে এ-ও বুঝলাম যে, শমিতা তাঁকে আমাদের সকালবেলার কথা-বার্তার অনেক কিছুই বলেছে। কিন্তু এ-ও আবার এক কণ মুখফিস নয়—যে, কতটা বলেছে ঠাহর পাচ্ছিলাম না—কারণ যে-পরিবারে প্রতিপদে বিরোধ ও রেষারেষির আড়াল সেখানে কে যে কোন্ চাল চেলে ঘুঁটি মেরে ব'সে আছে তার হদিস পাবার কোনো উপায়ই তো নেই। (পরস্পর বার্বারা ও সোফিয়ার দিকে চেয়ে) তাই কেন বলি—ড্রামা জিনিষটা সাহিত্যের নাটমন্দিরই লঘু তথা স্বাদু—জীবনের অন্তঃপুরে দারুণ ও গুরুপাক।—অন্ততঃ এমুহূর্তে আমার কেবল কেবলই মনে হচ্ছিল সেই সময়ে। কেবল সঙ্গে সঙ্গে এই একটা জিজ্ঞাসাও প্রবল হয়ে উঠেছিল মনে আছে: শমিতা কি তাহ'লে মিথ্যাবাদিনী? মন যদি বা বলে—হ'তেও পারে—অন্তর রুখে ওঠে, বলে: অসম্ভব। অথচ মুহূর্মুহু অভিনয় করে জেনেও তার সব কথাই যে ভুয়ো এতটাও তো ভাবা যায় না। সে বাইরে এখন একা বসে। মনের মেঘে তখনো তার দীপ্ত চোখ, উদ্বেল কণ্ঠস্বর, উচ্ছ্বসিত ভাষার রঙের রেশ লেগে—কিছুতেই মন নেয় না যে এ-ভঙ্গি আসে শুধু সাজিয়ে বলার নৈপুণ্যে। মিথ্যে কথা সাজিয়ে বলা যায় না বলি না অবশ্য—কিন্তু এমন বিদ্যুন্ময়ী ভাষা জোগায় কি?—মরকগে। আমার সংশয়ের কথা রেখে মাসিমার কথাই বলি।

মাসিমা আমাকে দেখে একটু উঠে বসলেন, কিমোনোটা সাম্‌লে নিয়ে বললেন: "বোসো কাছে—আমি জোরে কথা বলতে পারব না—একটু মাথা ঘুরছে।'

অদূরে একটা চেয়ার ছিল, টেনে নিয়ে বসলাম তাঁর কাছ ঘেঁষে। শমিতা কোমলকণ্ঠে বলল: "আর একটা ল্যাবেণ্ডার জলপটি দেব মা?" মাসিমা বললেন: "না মা, এখন অনেকটা সহজ মনে হচ্ছে।" শমিতা বলল: তা-হ'লে আমি একটু আসি—কেমন? দরকার হ'লেই হাতের কাছে এই ঘণ্টা রইল। আমি একটু চোখ রাখব ওর বজ্জাত বাইটা না ঘুর্ ঘুর্ করে বানাচে কানাচে।" মাসিমা ঘাড় নাড়লেন ক্লান্ত হেসে, শমিতা বেরিয়ে গেল। দোরের কাছে গিয়েই হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকল। আমি কাছে যেতেই মৃদুস্বরে বলল: "বাবার সম্বন্ধে আমি অনেক কথা বলেছি যা বলা আমার পক্ষে উচিত ছিল না—কিন্তু মাকে দেখলে হয়ত বুঝতে পারবে কেন বলেছি—মা একেবারে ভেঙে পড়েছেন অমিত, হয়ত বেশিদিন নেই আর।" ব'লে তাড়াতাড়ি অশ্রু গোপন ক'রে মুখ একটু আড় ক'রে রেখে বলল: "আমার সব কথা ধোয়ো না—ক্ষোভের মাথায় আমরা হাজার চেষ্টা করলেও ভুল জায়গায় ঝোঁক না দিয়ে তো পারি না সব সময়"—ব'লেই চ'লে গেল দ্রুতপদে।

আমি ফিরে এসে বসলাম মাসিমার কাছে। তিনি চোখ বুঁজে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর মুখখানি ক্লান্ত ব'লেই বুঝি এত সুন্দর দেখাচ্ছিল। এক একজনের মুখ যেন গ্রীষ্মের আকাশের মতন: বেলা প'ড়ে এলে তবেই রঙ ধরে, আলো নিভলে তারা ফুটিয়ে তোলার মতন। মাসিমার মুখ ছিল এই জাতের। কপালে, গালে, চোখের কোলে পরতালিনেই রেখা পড়েছে তো কতই, চুলে রং দেওয়া সত্ত্বেও পাক ধরেছে—চোখের নিচে কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। অথচ অপ্রসাধিত মুখ, অবিন্যস্ত এলানো দেহভঙ্গি এসবের মধ্যে তাঁর জীবনেরই বিষাদ ফুটে উঠেছে এমন সুন্দর হ'য়ে যে, দেখলে মায়া করে। বললাম: "হাওয়া করব মাথায়?" মাসিমা মাথা নেড়ে "না" ক'রেই

চোখ বুঁজে রইলেন। আমি বললাম: "মাথা কি বেশি দুলছে?" উনি মৃদুস্বরে বললেন: "না, খুব সামান্য একটা হার্ট অ্যাটাক মতন হয়েছিল কিন্তু ও আমার যে মাঝে মাঝেই—একটু বাদেই কেটে যাবে। বোসো, কথা আছে।"

• • •

মনটা বড়ই নরম হয়ে গেল। একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। কতক্ষণ—মনে নেই, কেবল এইটুকু মনে আছে যে, তাঁর ক্লান্ত মুখখানিকে যেন সেদিন হঠাৎ একটা নতুন দৃষ্টিতে দেখলাম। কেমন যেন একটা অনুশোচনার মতনও এল সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর কাছে অনেক স্নেহ পেয়েছি—তাঁর কোনো গুণই যে কখনো চোখে পড়ে নি এমনও নয়। তবু মনে হ'ল যেন এযাবৎ তাঁর মেজমাসেবিয়ানাকে বড় বেশি বিচারের চোখেই দেখে এসেছি ব'লেই হয়ত তাঁর মধ্যেকার আসল মানুষটিকে চাক্ষুষ করি নি। তাঁর রোগপাণ্ডুর মুখখানির দিকে চেয়ে চকিতে মনে হ'ল: যদি এযাত্রা তিনি না বাঁচেন!—যদি ধরো এই মুহূর্তে হার্ট ফেল করে! ভাবতেই বুকের মধ্যে কোথায় ছাঁৎ ক'রে উঠল···ছিঁড় ক'রে এল তাঁর কত দানের স্মৃতি···কত অযাচিত প্রশ্রয়···স্নেহের অনুযোগ··· সেবা···আদর···যত্ন। মনে হ'ল মল্লীপরিবারে যে অবাধ অন্তরঙ্গতার ছাড়পত্র আমি না-চাইতেই পেয়েছিলাম সে তো বলতে গেলে এই অসুখী গৃহিণীটিরই জন্যে। অথচ নিজের দুঃখের কথা কই তিনি তো কখনো ভুলেও জানান নি আমাকে। সংসারে এমন বলিষ্ঠ হৃদয় কটা আছে যে, চায় না কারুরই দান, সমবেদনা? কিন্তু মাসিমা তো কোনোদিনই মুখফুটে কিছু চান নি! কাছে ডেকেছেন, আদর যত্ন সেবা—আমার দু-একটা ছোটখাট অসুখে শুধু শুশ্রূষার ব্যবস্থা—সবই তিনি করেছেন, অনেক সময়ে আমার অজান্তে, অথচ কখনো এ-ভাব তো প্রকাশ পায় নি যে, আমার কাছে তিনি কোনো স্বীকৃতি চান! একথা আগে কেন আমার মনে হয় নি?—হ'লে হয়ত তাঁর'পরে অন্তত মনে মনেও তো একটা সুবিচার করতে পারতাম? কেন দেখেও দেখি নি তাঁর এই অসামান্যতা? আহা, কত একলা তিনি! বিশেষ ক'রেই মনে হ'তে লাগল সুহৃদা ও শমিতার দল নিয়ে তাঁর নিরন্তর উৎকণ্ঠা। আর এ-উৎকণ্ঠার আবর্ত সৃষ্টি না করলেও নিমিত্তের ভাগী তো আমিই ব'নাম। অথচ এজন্যেও কখনো কি তিনি একটি-বারও অনুযোগ করেছেন? মেয়েরা স্বাধীন—একথাও তিনি মা হয়েও স্বীকার ক'রে নিজে দূরে দূরেই থেকেছেন —কিন্তু এতদিনে একবারও বলেন নি আমাকে এমন কোনো কথা যাতে আমার মনে কষ্ট হতে পারে এই ভেবে যে, এ-অশান্ত পরিবারে আমি এসে একটুও অশান্তি বাড়িয়েছি।

ভাবতে ভাবতে সত্যিই চিত্তখানি গভীর হ'য়ে উঠল। যতই তাকাই তাঁর ম্রিয়মাণ মুখের পানে, ততই মনে হয় নিজেকে অপরাধী। যে শুধু নেয়, কিছু দেয় না—সে অপরাধী নয় তো অপরাধী কে? গীতায় তাকেই না বলেছে 'চোর'? শমিতা ও মুহূর্নাকে নানা সূত্রে কিছু অন্তত: দিয়েছি। কিন্তু মাসিমাকে? মনে এ-চিন্তা পর্যন্ত কোনোদিন ঠাঁই পেয়েছে কি যে, উনিও একটি মানুষ—আবেগে গালে রঙ মাখলেও বা ক্লাবে টেনিস খেললেও মানুষের হৃদয়ের মূল চাহিদার এতটুকু এদিক ওদিক হয় না—বিশেষ ক'রে মেয়েদের ক্ষেত্রে?

চিন্তায় বাধা পড়ল—তাঁর আকস্মিক দীর্ঘ নিশ্বাসে তাকিয়ে দেখি তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে।

আমি কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম: "কেমন লাগছে এখন মাসিমা?"

"ভালোই বাবা!—বেশি কিছু হয়নি বটিত, তবু কাল প্যালপিটেশনের দরুণ সারা রাত ঘুমতে পারি নি কি না—তাই আজ একটু দুর্বল মনে হচ্ছে। কথা আছে ব'লে তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে একটা বলিয়ে রাখলাম ব'লে কিছু মনে করো নি তো?"

"সে কি কথা মাসিমা?' আমি কি এতই—"

"জানি বাবা তবু—কিন্তু যাক এসব বাজে কথা। দরকারী কথাটা আগে হ'য়ে যাক। তবে একটু বেশি ঘরোয়া কথা—তাই তোমার যদি একটুও আপত্তি না থাকে—"

"আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠলাম: "এ কী বলছেন আপনি?"

মাসিমা ম্লান হেসে বললেন: "বলছি কেন বুঝতেই তো পারছ বাবা! অপরকে নিজের দুঃখের সরিক করতে

নেই—সংসারে দুঃখের কি আর অভাব আছে? না না—মুখ অমন কোরো না। বিশ্বাস কোরো কাঁদুনি গাওয়া আমার স্বভাবও নয়। তবে—"

"এসব কথা কেন মামিমা? আমি কি একটুও বুঝতে পারি না মনে করেন যে, আপনি আমার জন্যে কত করেছেন—"

"না না—আমি তোমার জন্যে কী-ই বা করেছি বাবা? তাছাড়া যদি কিছু ক'রেও থাকি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে করিনি জানোই তো। তবে আমার প্রতি তোমার যে একটা বিমুখতা আছে—"

"এসব কথা আপনি কেন বলছেন মামিমা?"

"সত্যি ব'লেই বলছি বাবা। মেয়েরা যত বোকাই হোক না একটা বিষয়ে পুরুষকে হার মানাতে পারে: টের পেতে কে তাদের পছন্দ করে কে করে না। কিন্তু—থাক—শোনো বাবা! আমার প্রতি তোমার বিমুখতার জন্যে তোমাকে আমি দুষব না—তবে কি জানো—" ব'লে একটু হাসলেন: "বলে না তোমাদের সাহেব-পুরাণে যে, শয়তানও তত কালো নয় যত কালো ক'রে তাকে আঁকা হয়? না শোনো, তোমাকে ভাকিনি আজ—আমার কোনো মাটুকে কথা শোনাতে। আমি তো কবুল করেইছি যে, তোমাকে আমি যে আদর দেখিয়েছি তার মধ্যে সবটা ভুয়ো নয় ব'লেই বলা চলে না যে, সবটাই সাচ্চা। কিন্তু এ-ও তুমি মানবে আশা করি যে, লুকোচুরিও আমি করি নি।—না না, বাধা দিও না। দেখ সন্তান কী বস্তু যে জানে নি সে জানতে পারে না মায়ের মনে কত রকম উৎকণ্ঠা জাগে তার জন্যে। হয়ত মুহূর্মা তোমাকে ব'লে থাকবে সন্তানের পক্ষে আমি খুব ভালো মা নই। ওর দোষও নেই। বাইরে থেকে দেখতে গেলে বলা যায় বৈ কি আমি আর পাঁচটার মতনই এক ডাকসাইটে মেম-মা—যে সন্তানকে বোর্ডিঙে দিয়ে বা নার্স গভর্নেস রেখে মেম বানিয়েই মনে করে কর্তব্য করা হ'ল নিখুঁতভাবে। এ-ও আমি মানবো যে আমার দুই মেয়ের কেউই আমাকে বেশি তোপায় নি। আমার জীবনে দুঃখের দুর্ভিক্ষ নেই, কিন্তু তার কারণ আমার মেয়েরা নয়। অবিশ্যি"—বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারি হ'য়ে এল: "মুহূর্মা আমার প্রতি প্রসন্ন নয় এজন্যে একটা ব্যথা আমার আছে। কোন মা চায় বলো তার সন্তান তাকে অশ্রদ্ধা করে? কিন্তু এজন্যেও দোষ তার চেয়ে হয়ত আমারই বেশি। সন্তানের শ্রদ্ধা পেতে হ'লে মাকে সব আগে স্বেচ্ছাচার ছাড়তে হয়। তাছাড়া সন্তানকে গ'ড়ে তোলার ভার তো ছিল আমারই। তার শ্রদ্ধা ভালোবাসার অধিকারও ছিল আমার গ'ড়ে পাওয়া সম্পত্তি! তবু যদি এ-ধন আমি খুইয়ে থাকি—বলব খুইয়েছি আমার নিজেরই দোষে—তছনছ ক'রে—অর্থাৎ নিজেরই অযোগ্যতায়।—অবশ্য অদিত, তবু আমি ভাবি," বলতে বলতে তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান হাসি ফুটে উঠল: "কী হবে ওদের আমি গেলে?"

"একথা আজ উঠল কেন?"

"আজ ব'লে নয় বাবা!—কি জানি কেন, আমার মনে পড়েছে কিসের একটি ছায়া—যাকে আমি বলব প্রিমনিশন—অবশ্য তোমরা নাম দাও সুপারস্টিশন। কিন্তু আমি দেখেছি যে, এসব নাম যারা বেশ তারাই ঠকে বেশি—অনেক চাইলে-বিলেত-এমন গভীর আঘাত থেকে রক্ষিত হ'য়ে।—কিন্তু যাকগে সে কথা, এক্ষেত্রে যা বলতে চাইছি সেটা এই যে, এরকমের ছায়া আমার মনে যখনই পড়েছে কোনো না কোনো দুর্বিপাক বা দুর্ঘটনা এসেছে পিঠ পিঠ। হয়ত শেষ যাত্রার বেশি দেরিও নেই—ভগবান্ করুন তাই যেন হয়।"

আদি বাধিত কণ্ঠে তাঁর কপালে হাতবুলোতে বুলোতে বললাম: "কেন এমন কথা বলছেন মামিমা?—হাঁট দুর্বল হলেও মানুষ দীর্ঘকাল বাঁচে।"

মামিমার মুখে ফের সেই করুণ হাসি ফুটে উঠল, বললেন: "তুমি কি মনে করেছ দীর্ঘকাল বাঁচবার খুব বেশি লোভ আমার আছে?—না বাবা, এ আমার অহমিকার ইচ্ছাকৃত নয়। আমি বলছি না—জীবন আমার ভালো লাগে না—খুব দুঃখের সময় হয়ত বলি একথা, কিন্তু তবু বাইরের পাকেচক্রে যেসব কথা আমাদের দিয়ে বলিয়ে নেয়—সেইসবই তো আমাদের মনের কথা নয়। তাই একথা আমি বলব না যে, জীবন আমাকে আগাগোড়াই ঠকিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সমান সত্যি যে, জীবনের'পরে টান থাকলেও লোভ আমার খুব বেশি নেই। তবে কি জানো বাবা?—সত্যই বড়াই করিনা

কেন—কেউ লোভও তবু থাকেই—তাই যতই কেননা বলি উদাসভাবে যে, মরণ তেমন কিছু দুর্দৈব নয়—সে যখন সত্যি হুমুখ করে আমাদের প্রাণপাখিকে খাঁচা বদল করতে, তখন তার সে-বরণ বাবরা চায় না কেউই—না খাঁচা না পাখী। সবই জানি অমিত, কিন্তু তবু—মানে, জীবনদেবতাকে আমি না বুঝলেও তাঁর কাছে কৃতঘ্ন বোধ করতেও পারি নি কোনোদিন। দোষ যে আমার স্বভাবেরই তাও আমি জানি। যা মেলেনি তাকেই যারা বড় ক'রে দেখে জীবনে তারাই থাকে বঞ্চিত। কারণ এমন স্বভাবের মানুষ আমি জানি যারা একদিক দিয়ে হয়ত আমার চেয়েও দুর্ভাগা—মানে বেশি বঞ্চিত—অথচ তবু তাদের প্রকৃতির শ্যামলতার হানি হয় নি—কিন্তু এও একটা শক্তি বাবা, দুর্লভ শক্তি—যেমন ধরো শমিতার মধ্যে এ-শক্তি আছে—অথচ মৃদুলার মধ্যে নেই। তাই ওদের দুজনকেই আমি স্নেহ করলেও শমিতাকে আমি বেশি শ্রদ্ধা না ক'রে পারি না। কিন্তু সে যাক্, কী বলছিলাম বেন? ঐ দেখ—আমি বড্ড ভুলে যাই—তবে বয়স হ'লে স্মৃতিভ্রংশ বুদ্ধিভ্রংশ তো হয়ই—হয় না বাবা?"

একটু ভরসা পেয়ে বললাম হাল্কা সুরে: "জানেন? প্রবীণরা বলেন যে যাঁরা বেশি বেশি ক'রে বলেন তাঁরা বার্ধক্যে পৌঁছেছেন তাঁদেরই ভেতরটা আছে তাজা—যাঁরা সত্যি বৃদ্ধ—বয়স্থা, তাঁরাই চান সিং ভেঙে বা—অপকল্পের দলে ঢুকতে।'

মাসিমা হাসলেন, বললেন: "কিন্তু একটা সীমান্ত পার হবার পরে আর একবা খাটে না বাবা—তখন সিং থাকলেও আর নতুন ক'রে কামধেনু হ'তে না চেয়ে গঙ্গা-যাত্রার জন্যে তৈরী হওয়াই ভালো।"

আমি তাঁর আতপ্ত কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম: "আপনার বয়স যে এখনো সে-সীমান্ত পেরোয় নি মাসিমা এ আপনার শত্রুতেও স্বীকার করে—যারা বলে যে—" ব'লেই আমি থমকে গেলাম।

মাসিমা পাদপূরণ করলেন তৎক্ষণাৎ: "আমি মনে করি আমার সাজগোজ হাবভাবে এখনো অনেক মুনির মন টলবে—কেমন এই না?"

আমি অপ্রতিভ হ'য়ে বললাম: "আমি ওভাবে—"

মাসিমা আমার হাতটা তাঁর কপাল থেকে টেনে নিয়ে মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে বললেন: "জানি বাবা, জানি। আর সেই জন্যেই তোমাকে স্নেহ করেছি প্রথম থেকে। জানি এ-স্নেহ সম্বন্ধে তোমার মনে সন্দেহ থাকাই বেশি সম্ভব, তবু বিশ্বাস কোরো বাবা যে, এর ষোলো কড়াই কাণা নয়। স্বার্থ আমার ছিল মানি—কিন্তু এ-ও তুমি মানবে যে, এ-স্বার্থ একেবারে নির্ভেজাল মৎলববাজি নয়। অবিশ্যি তাদের কাছে একথা প্রমাণ করবার কোনো উপায় নেই—যারা আমার হবু শাশুড়িগিরিকে কটাক্ষ ক'রে মুচকে হাসবে। কিন্তু যখন আমি জানি যে তোমাকে জামাই করতে চাওয়ার মধ্যে কোন দুরভিসন্ধিই আমার ছিল না, তখন লোকের চাপা হাসি বা বাঁকা কথায় আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে না।—কিন্তু কী যে সবমাথামুণ্ডু ব'কে চলেছি—এ-সব তোমার কানে প্রলাপ ঠেকলে সাবধান ক'রে দিও বাবা, লক্ষ্মীটি।"

আমি হেসে বললাম: "যারা সত্যি প্রলাপ বকে মাসিমা, তাদের কি এ-ধরণের প্রশ্ন মনে আসে?"

মাসিমা হাসলেন, কিন্তু তক্ষণি মুখে তাঁর ফের নেমে এল ছায়া। বললেন: "কথাকে নিয়ে যারা বেশি ঘর করে তাদের দুর্দশা কিছু স্বচক্ষে দেখেছি ব'লেই ভয় হয়। —কিন্তু কথারই বা দোষ কী অমিত!—আমার মনে পড়ে ···সে আজ কতদিনের কথা···তবু মনে হয় যেন কালকের ···যখন প্রতি ফুলটির মধ্যে দেখতে পেতাম নিজের হাসি, প্রতি পাতায় শুনতাম নিজের প্রাণের কাঁপন।···বললে হয়ত আজ হাসবে, কিন্তু মৃদুলাকে কবিতার প্রথম দীক্ষা দেয় কে জানো?—এই অতি গদ্যময়ী মেয়েমানুষ—আর কেউ নয়। সত্যি, আমার মনে কত সাধই যে ছিল।··· তোমাকে দেখে মনে হয় আমরা [illegible] কথা।···এত বয়স পেরিয়ে চলে আমরা যেন অঞ্জলি পাতি পূবের কাছে, না? আক্ষেপ হয় সেখানে আলোর পালা ফুরিয়ে আসছে দেখে। সত্যি অমিত, যৌবনের আলো কেন এমন স্বল্পায়ু তাবি সময়ে সময়ে।··· কেউ কি জানে?"

আমি কথা কইলাম না। মনে ফের জেগে উঠল সেই অনুশোচনা: এঁর ওপর কী অবিচারই না করেছি! মাসিমা ব'লে চললেন যেন নিজেরই মনে:

"অথচ মনে পড়ে শেলির কথা যে কত ঘ্রান কল্পনা আছে তার মধ্যে সব চেয়ে ম্লান বোধহয় এই কল্পনা—"

যে কী হ'তে পারত? সত্যি অসিত, আমি কী হ'তে পারতাম আর কী হয়েছি?" তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন: "তবে কেনই বা এসব সাতসতেরো ভেবে মনে দুঃখ পাই? আরও কত মানুষই তো এমনি লীন হয়ে গেছে এই দুদিনের অর্থহীন জীবনস্রোতের এক একটা ক্ষণজীবী বুদ্বুদের মত! এই বিশাল বিপুল অর্থহীন অথচ দুর্নিবার প্রাণ তরঙ্গের স্রোতে কোন্ ঢেউ যে কাকে কোথায় নিয়ে যায় আগে থেকে কে ব'লে দেবে? অথচ তবু—তবু এত আশা আমাদের বুকে জাগে কেন মরণকে বিদ্রূপ ক'রে? শুধু কি কালের কাছে হার মানতে?

"সত্যি অসিত, সময়ে সময়ে ভেবে পাইনে এ-জীবন নিয়ে হাসব না কাঁদব? সংসার একটা পরীক্ষা, না পরিহাস? ট্রাজেডি বা কমেডি?" একটু থেমে: "মনে পড়ে জীবনের সোনার সকালে যে-কত স্বপ্ন ছিল চোখে—মানুষকে কত দেব—কুরূপ জগতে তুলব রূপের তুফান, অন্ধকারে বওয়াব আলোর জোয়ার—দুঃখীর দুঃখমোচন, আনন্দের নিত্য নতুন মেলা বসানো—আরও কত পিপাসা, আকাঙ্ক্ষা, অভিসার অজানার পানে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-সবের মধ্যে কোনটা টিকল বলো দেখি?" বলতে বলতে স্বর তাঁর গাঢ় হ'য়ে এল: "না বাবা এ মিথ্যে আক্ষেপ নয়। শুধু একটা কথা কল্পনা করতে চেষ্টা করলে বুঝতে পারবে হয়ত কোন্‌খানে আমার ব্যথা। ধরো, আজ আমাকে যারা দেখছে তাদের কেউ কি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে—আমি বিশ বছর বয়সে কী ছিলাম? শুধু রূপে বলছি না—সৌন্দর্যে, সুষমায়, সৃজনের সম্ভাবনায়? সে সব মেয়েদের দেখলে জগৎ ঈর্ষা করে আমি ছিলাম তাদেরই একজন—অথচ আমার জীবন কেন এমন ব্যর্থ হ'ল? শুধু একজনের দোষে? সবই একটা দুর্দৈব—দুর্গ্রহ?"

একটু দম নিয়ে হাসিমা ব'লে চললেন: "আমাকে ভুল বুঝো না। আমার অনেক দোষ থাকলেও সে-জাতের মেয়ে আমি নই যারা নিজের সব দুঃখ দায় ব্যর্থতার জন্যেই দায়ী করে শুধু অপরকে। যদিও মুহূর্না হয়ত আমার এমনি ধারাই একটা ছক কেটে রেখেছে তার মনে। কিন্তু সে তো আমাকে কোনোদিনই চেনে নি, চায়ও নি চিনতে। সে ভাবে তার জীবনটা আমিই মাটি করেছি, শুধু শমিতাকে নিয়েই আমার যত মাথা ব্যথা। হয়ত পরে কোনোদিন বুঝবে যে সে শমিতা হ'তে পারত না ব'লেই তাকে আমি এত ক'রে বিলিতি শিক্ষা দিয়েছিলাম, কোনোরকম কঠোর ডিসিপ্লিন সে সইতে পারবে না জানতাম ব'লেই সুখের কোলে মানুষ করেছিলাম।

"অবশ্য এ-ও সত্যি যে, আমার পক্ষে অন্যরকম দীক্ষা দেওয়া অসম্ভব ছিল আমার শেষদিককার জীবনে। মিথ্যা ভাঁক করব না—শুল আমার যতই থাক না কেন প্রকৃতিতে যে আমি চঞ্চলমতি ছিলাম একথা আমি হাড়ে হাড়ে জানি। যানি বিলাসে আমি অত্যন্ত ভালোবাসতাম। কিন্তু এখানেও কলি এল এই ছিদ্র দিয়ে যে, বিলাসে আমি রোধ দেখতাম না। জগৎ যখন ভোগের জন্যেই গড়া, ভোগ করব না কী দুঃখে?—ভাবতাম—'হেসে নাও এ-দুদিন বৈ ত নয়' এই-ই হ'ল গানের মতন গান।

তাছাড়া অসিত, এক একজন মেয়ে আছে যারা নিজেকে শুধু যে ছড়িয়ে দিতে চায় তাই না, তার প্রতি রোমকূপের প্রণালী দিয়ে বাইরের আলো হাওয়া আনন্দ চায় শুষে নিতে। আমি ছিলাম এই জাতেরই মেয়ে। কাজেই মুহূর্নাকে আমি অন্যরকম দীক্ষা দেব কোত্থেকে বলো? গাছের কচি পাতা পারে কি ধূসরতা বা অনুকূলতার মন্ত্র দিতে?"

"কিন্তু তাহলে শমিতাকে গড়ল কে?"

"ঐ দেখ, ও আর এক হেঁয়ালি—অন্তত আমার কাছে। ছেলেবেলা থেকেই ও খাপছাড়া। একা বসে থাকবে—সঙ্গীটঙ্গীর সঙ্গে মিশবে হয়ত, কিন্তু আলগোছে—ফলে ভিড়বে না কোনোমতেই। বই আর পাঁচজনের সেবা দেওয়া যতটা পারে আড়ালে থেকে। হাল আমলে বিলিতি মাষ্টারেরা আমাদের কানে বিলেন শিক্ষার মন্ত্র, বললেন: ছেলেবেলায় টুটি চেপে ধরলে নাকি যে কোনো শিশুকে যেদিকে ইচ্ছে ফেরানো যায়, লওয়ানো যায়। কিন্তু এর চেয়ে ভুল কথা আর নেই বাবা! শমিতার চরিত্রই দেখ না কেন। বাপ মা বোন সবই বিলাসী—অথচ ও কেন হ'ল স্বভাব-পূজারিণী? ওর আশেপাশের যারা মিশ খেত পাঁচজনের সঙ্গে—ও-ই কেন কুনো? বিলেতেও তো ছিল অনেকদিন—সেখানে কে না ভালবাসে খেলা-

ঘুলো চৈ চৈ? কিন্তু ও রইল বই দুখে ক'রে! আর এ অসুখ রোগই বা ও পেল কার কাছ থেকে বলবে আমাকে? কেউ কি ওকে এতটুকু বেকাতে পেরেছে কোনোদিন? কিছু মনে করো না অসিত—সরলভাবেই বলছি এবথা—ওর কাছে কত লোকে ইঙ্গিত করেছে আমার চরিত্র নিয়ে। বছরের পর বছর ওর বাবা ওকে রেখেছেন বিলেতে যাতে ক'রে ও আমার প্রভাবের ছায়াও না মাড়াতে পারে। কিন্তু তবু কেন যত আমি ওর কাছ থেকে দূরে স'রে গেছি তত ও ধরেছে আমাকেই আঁকড়ে—বলতে পারো?"

আমি বললাম: "এটা আশ্চর্য বটে।"

মাসিমা হাসি দিলেন: "আরো আশ্চর্য এই জন্যে যে, ওর সঙ্গে আমার স্বভাবের একটুও মিল নেই। তবু ও কি না আমার দিকেই ঝুঁকল—আর দুর্ঘটনা—যাকে লোকে বলে আমি গড়েছি আমার understudy ক'রে—সে-ই কিনা হ'য়ে দাঁড়ালো আমার ঘরশত্রু বিভীষণ! কিন্তু সে থাক্। আমি খুব ক'রেই জানি যে, আমি মনে মনে যে-মানুষটিকে আমার জীবনের ব্যর্থতার জন্যে দোষী করি দোষ তাঁর ততটা নয় আমার নিজের চরিত্রের—মনের প্রাণের গড়নের। আমার স্বামী আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। বাইরের দিক থেকে খুব যে দুঃখে রেখেছিলেন তা-ও তো নয়। অথচ তাঁর জন্যে যে আমাকে আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজ করতে হ'ত এইটে আমি সইতে পারতাম না কেন? ওঁর দিকের কথাটা ভুলে আমি রাগের মাথায় শুধু ওঁকেই দায়ী করি কেন এই ব'লে যে, ওঁর কাছে যা চেয়েছিলাম পাই নি? আমার কাছেই কি উনি যা চেয়েছিলেন পেয়েছিলেন? না তো! তবে? শোধবোধ বলাই ভালো নয় কি? না—আমার মনে হয় এই জন্যেই বেশি অসিত। আমি যদি চাইতাম পারতাম বৈকি আমার জীবনকে সার্থকতার দিকে ফেরাতে। অনেকে ফিরিয়েছে আমার চেয়েও বেশি প্রতিকূল পরিবেশে। ঝড়ে ঘর ভাঙলেও ভাঙা মেলায় কেউ বসিয়েছে আনন্দের হাট—বেদনার আঁধারে এনেছে সাধনার আলো। কিন্তু আমি এ পারব কোত্থেকে বলো? আমার চরিত্রে যে নিষ্ঠার ছিটে-ফোঁটাও ছিল না—না বিশ্বাসের বালাই। তাই তো দুঃখকে কোনোদিনই আমি ঠিকভাবে নিতে শিখি নি, যদিও চেয়েছি নিতে। কিন্তু শুধু তো চাইলেই হবে না বাবা, শুধু চেয়ে কেউ কিছু পায় না এ-সংসারে, দাম দিয়ে কিনতে হয়। না, এ-ও ঠিক বলা হ'ল না। কারণ আমি যে দাম দিতে একেবারে রাজী ছিলাম না তা-ও তো নয়। বরং বলব—আমি জীবনের প্রাপ্তিলোকের চাবিকাঠির সন্ধানই পাই নি"···দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে: "জানি না কটা মেয়ে পায়, আর যারা পায় নি তারাও সবাই জানে কি না যে পায় নি। সাদা চোখে যা দেখি তা এই যে, তারা দিব্যি চলে জীবনপথে শূন্যতার মধ্যে দিয়েই কোনোরকম ক'রে টলতে টলতে বা চিকিয়ে চিকিয়ে। অন্তত যা পেয়েছে তার চেয়ে বেশি বা বড় কিছু পাওয়ার আছে এ যে তারা জানে না এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এক হিসেবে তাদের দুঃখ খুব বেশি নয় হয়ত, কেননা দুঃখ আসে অভাববোধ থেকে। যাদের অভাববোধের চেতনাই নেই তারা হয়ত একদিক দিয়ে ভাগ্যবতী। যত যন্ত্রণা তাদের—যারা না-পাওয়াটাকে শূন্যতা ব'লে চেনে—যারা তৃষিত হ'য়ে ওঠে দুর্লভের জন্যে, চকল হ'য়ে ওঠে প্রাণের অনামা সুধার গহ্বর কোনো সার্থক সুধা দিয়ে ভরাট করতে। আমার বেদনার হেতুও এইখানে, ব্যর্থতার মূলও। যা পাইনি তার জন্যে তৃষ্ণা আমার আছে, অথচ মূল্য দেওয়া আমার হ'য়ে উঠল না। নৈলে কেউ অর্থহীন চকলতার মধ্যে এভাবে দিনের পর দিন কাটাতে পারে কখনো?—কিন্তু কপাল আমার। এসব হাবিজাবি বলতে তোমাকে মোটেই ডাকি নি বাবা! বেচারি—বেলা বাড়ল—তুমি এখানেই এবেলা খাও—কেমন?" বললেন সাগ্রহে।

আমি বললাম ওঁর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে: "কেন ব্যস্ত হচ্ছেন মাসিমা? আমার কি এসব শুনতে খারাপ লাগতে পারে মনে করেন? স্নেহ করেন ব'লেই না বলছেন—আন্‌প্রাক্‌টিকাল ব'লে আপনারা আমাকে প্রায়ই ক্ষেপান—ভালোই করেন—কিন্তু আনপ্রাক্‌টিকালরা কি এতই অপদার্থ যে স্নেহও বোঝে না?"

মাসিমা কের আমার হাতটি কপাল থেকে নিজের হাতে টেনে নিয়ে আমার করতলের দিকে খানিক একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। পরে তাকালেন স্থিরনেত্রে আমার পানে।

হঠাৎ মনে হ'ল—কী সুন্দর চোখ—আর তার চেয়েও মিষ্টি ঐ কালো চোখের স্নিগ্ধ চাউনি। শুধু স্নিগ্ধ নয়—সেই সঙ্গে যেন···কী বলব···ব্যথার শিখায় উজ্জ্বল···গাঢ়। হঠাৎ আমার যেন একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলাম এ-দুঃখিনী বিলাসিনীকে!···এমনই হয় এ-জীবনে! লোকে বলে মিরাক্কের যুগ গত। মিথ্যে কথা—প্রতিদিন মিরাক্ল ঘটছে আমাদের চোখের সামনে—কুঁড়ি ফুটছে ফুল হ'য়ে, মেয়ে নিজেকে ক্ষয় ক'রে স্নেহের পুনরাবৃত্তিতে নিজেকে চিরন্তন ক'রে চলেছে, জড় স্নেহের তামস ভেদ ক'রে ছুটছে চিন্তার কণা, অন্ধকারের কান্নার সাড়া দিচ্ছে আলোর সান্ত্বনা···আরো কত কী আনন্দের ইন্দ্রজাল রোজ ঘটছে বেদনার নাটমঞ্চে। কিন্তু—মনে হচ্ছিল সেদিন বারবারই—সবচেয়ে বড় মিরাক্ল বোধহয় এই ধরণ ভালোবাসা স্নেহ প্রীতির রসলীলা, নয় কী? কারণ ভেবে দেখো একটু। একজন অপরিচিত মানুষ চলেছে পথ দিয়ে। তার কোনো অর্থই তোমার কাছে নেই, বটে তো? কিন্তু যেই সে তাকালো তোমার দিকে প্রীতির অঞ্জন প'রে, অমনি সে-শুভদৃষ্টিতে জাগল কী বলোতো? শুধু কি একটা নতুন আত্মীয়তার আত্মপ্রসাদ? তার চেয়ে হাজারগুণে বড় কথা এ-ই নয় কি যে একদিকে এই নব পরিচয়লোকের আনন্দে গৌরবে তুমি নিজেরও একটা নব প্রতিরূপ দেখতে পেলে নববন্ধুর বন্ধুত্বের আয়নায়? অন্যদিকে, যে ছিল নামান্ত—কোটি কোটি লোকের কাছে একেবারে নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর, সে-ই হ'য়ে উঠল একমুহূর্তে অসামান্ত অদ্বিতীয়! বন্ধুত্বের এই যে আশ্চর্য দান এর চেয়ে বড় মিরাক্ল কী আছে বলো দেখি?"

বার্বারা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। অমিত ব'লে চলল: মাসিমা চুপ ক'রে রইলেন জানলার দিকে চেয়ে। আমার মনে কেমন যেন একটা আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে গেল—একেবারেই আচমকা। ছেলেবেলা থেকে আমার মা নেই। আত্মীয়া অনেক পেয়েছিলাম কিন্তু তাঁরা স্নেহ করলেও আমাকে কেউ কোনোদিন বোঝেন নি। আত্মীয়তার মধ্যে আছে অতিপরিচয়ের ভ্রান্তিবিলাস—অন্যকে আমি চিনব না তো চিনবে কে—তাকে জন্মাতে দেখলাম—ইত্যাদি—জানোই তো যাঁদের বলি গুরুজন তাঁদের স্নেহভালবাসার ভাবের দিকটা কি রকম দুর্ভর। সত্যি, তাঁদের এই নীরস অন্ধ আত্মম্ভরিতাই আমাকে আত্মীয়বিমুখ ক'রে তুলেছে। আমি তোমাদের ভক্ত। আত্মীয়তা আর সব কিছুই হ'তে পারে হয়ত, পারে না কেবল রোমান্টিক হতে। They are too familiar: আমাদের বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে তাই না পরকীয়া নিয়ে এত উচ্ছ্বাস। কিন্তু এই যে পরকীয়া ভাব—যাকে দৈনন্দিনতার ধুলোবালিতে টেনে নামাতে পারি না ব'লেই সে রইল আমার মানসী প্রতিমা তিলোত্তমা—এ যে শুধু প্রতি সাঁচ্চা ধাপ্পতা প্রণয়ের গোড়াকার কথা তাই নয়—সব সত্য সুস্থ প্রীতির মধ্যেই এই অ-ধরা ভাবটা থাকে। ঘরোয়া মানুষের মধ্যে এই ভাবটা সব সময়ে না হ'লেও প্রায়ই যায় উবে। কিন্তু বাইরের কাউকে যেই মা বলতে সাধ জাগে—অমনি উঁকি দেয় এই রোমান্স। সেখানে রয়েছে কি না সেই ব্যবধান যা ঘরোয়া মা-ছেলের মধ্যে থাকে না। অথচ এই যে ব্যবধান এটা স্নেহের ভাইল্যুশন সূচনা করে না—আনে গাঢ়তা, আনে ঠাশবুনি। 'অর্ধেক রমণী তুমি অর্ধেক কল্পনা' এ কথা মানুষের বেলায় আরো বেশি খাটে ব'লেই না স্বদেশকে ধরিত্রী-রূপে কল্পনা না ক'রে 'বন্দেমাতরম্' ব'লে এত তৃপ্তি পাই।

মাসিমা বোধহয় কেমন ক'রে টের পেয়েছিলেন আমার ঘুমন্ত মনে সোনার কাঠি ছুঁইয়েছে কে। তাঁর চোখের পাতা উঠল ভিজে। বললেন: অমিত, এসব তোমাকে খুঁটিয়ে বললাম তার কারণ কিন্তু এ নয় যে অসুখে আমার উচ্ছ্বাসের তোমায় এল। আমি তোমার কাছে আগে লুকিয়েছিলাম ব'লেই আর আরো না ব'লে থাকতে পারলাম না। তবে হয়ত একথা তুমি এখন ঠিক বুঝতে পারবে না।"

ব'লে আমার দিকে স্নিগ্ধনেত্রে চেয়ে খুব মৃদুস্বরে বললেন: "বাবা, জগতে সবচেয়ে মাতামাতি মেয়েদের যৌবন নিয়ে। কাজেই ধাপ্পতা প্রণয়ই হ'য়ে এসেছে প্রেমের আদর্শ—মুকুটমণি। কিন্তু এ-প্রেমে শিহরণের অভাব না থাকলেও গভীরতা নেই তেমন। যেটুকু গভীরতা আসে সেটুকু মাদকতার দরুণ নয়—নারীর মধ্যে মা আর পুরুষের মধ্যে শিশু লুকিয়ে থাকে ব'লে। এই যে শিশু, সে শিশু ব'লেই চায় মাকে—সর্বস্ব—এমন কি তার ধরিত্রীর মধ্যেও। তাই যেখানে ধাপ্পতা বন্ধন সত্য হয় স্থায়ী হয়

দেখবে—যদিও খুব কম ক্ষেত্রেই এটা ঘটে—সেখানে এই সাড়াই জাগে আঁধারে আলো হ'য়ে : তখন দয়িতা হ'য়ে ওঠে সেবিকা ত্রাস ধাত্রী—অন্য ভাষায়, তার সখিত্ব হ'য়ে ওঠে গৌণ—মাতৃত্বই হ'য়ে ওঠে মুখ্য।

"আমার স্বামীর সঙ্গে এই সম্বন্ধটাই আমার গ'ড়ে উঠতে পেল না কোনোদিন। আমার গভীর ব্যর্থতা সেইখানেই। নইলে হয়তো এত অবসাদ আসত না পকাশ না পেরুতেই। এজন্যে ওঁকে দোষ দেওয়ার কোন দুরভিপ্রায়ই আমার নেই। এ-ও আমি কৃতজ্ঞচিত্তেই মানব যে বিয়ের পর প্রথম দিকে—যতদিন যৌবনের নেশায় ঘোর নূতনত্বের মাদকতা কিঁকে হয়ে আসে নি ততদিন—আমাকে দেখে সীমন্তিনীরা সত্যিই হিংসে করত। আমার সে সময়ের অনেক সুধাই উনি মিটিয়েছিলেন। একদিকে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী—অন্যদিকে সুদর্শন বুদ্ধিমান্ বড়-চাকরে স্বামী—এর চেয়ে বাঞ্ছনীয় সম্বন্ধ কী হ'তে পারে বলো গড়পড়তা দম্পতির মধ্যে?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে : "তাই তো বলছিলাম বাবা, যে জীবনটা মেলোড্রামা না প্রহসন আজো যেন ঠাউরে পেলাম না। নৈলে যে-গাছে অমৃতফল ফলবার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি—" কথাটা তাঁর শেষ হ'ল না—হঠাৎ প্রবল কাশি এসে বাধা দিল।

অনেকক্ষণ কেশে ক্লান্ত হ'য়ে চোখ বুঁজে শুয়ে মালিমা হাঁপাতে লাগলেন—আমার একটি হাত তাঁর দুহাতের মধ্যে চেপে ধ'রে। থেকে থেকে শুধু সে-হাতের নরম পীড়নে টের পাই যে তিনি জেগে আছেন।

মনের মধ্যে এমন একটা কোমল ভাব ছেয়ে এল···মনে হ'ল না তাঁকে ষষ্টীসেবী মহিলা—যিনি দুদিন আগেও ছিলেন আমার কল্পনা-পরিধির বাইরে—মনে হ'ল যেন একটি অসহায়া বালিকা। ওঁর আধঘুমন্ত পাণ্ডুর মুখখানি দেখে আরো বেশি ক'রে মনে হ'ল যে মাতৃহারা তিনিই—আমি নই।

"অজান্তে বোধহয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থাকব—কারণ মালিমা হঠাৎ চোখ মেলে বললেন। "কী?"

আমি চুপ ক'রে রইলাম। তিনি বললেন : "ওদিকের ঐ কুশনটা দাও তো বাবা আমার পিঠে—এবার একটু উঠে বসি।"

"না, এখন চুপটি ক'রে শুয়ে থাকুন। নৈলে ফের কথা বললে হয়ত—"

"কিছু হবে না বাবা, ও আমার মাঝে মাঝে হয়। হাঁপানি এমন কিছু মারাত্মক রোগ নয় যার দরুন—যাক্ শোনো—" ব'লে একটু নড়ে চ'ড়ে বসলেন, তার পর বলতে লাগলেন : "এর পরে এল শর্মিতা আমাদের বিয়ের চার পাঁচ বছর বাদে। আরো দুবছর বাদে—মূর্ছনা। তার পরে সে সাত সতেরো অনেক কিছু—সে সব বলার দরকারও নেই, বলতে ভালোও লাগেনা—শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে, মেয়েরা প্রথমে আমার জীবনে ক্ষতিপূরণ হ'য়েই এসেছিল বটে কিন্তু দুঃখও উঠল ফেঁপে এর পরের অধ্যায়ে যখন মূর্ছনা আর শর্মিতার মধ্যে সুরু হ'ল রেষারেষি!

"সে অনেক কাহিনী। ক্রমশঃ যা দাঁড়াল তা এই যে, মূর্ছনা আমার কাছ থেকে একটু একটু ক'রে স'রে গেল, আর শর্মিতা এল কাছে। ও না থাকলে কী যে করতাম আমি—জলের গেলাসটা আর একবার দেবে বাবা?" জল চুমুক দিয়ে পান ক'রে ফের ব'লে চললেন :

"কিন্তু মূর্ছনা আমার প্রতি বিমুখ হ'লেও ভেবো না ওকে আমি তখনো তুলেও অনাদর করেছি। ওর বিমুখতা আমাকে দুঃখ দিয়েছে খুবই—কিন্তু সেজন্যে ওকে আমি সত্যিই কোনোদিন দোষ দিই নি : আরো এই ভেবে যে, হয়ত শর্মিতাও ওঁকে এমনিই দুঃখ দিয়ে থাকবে। যেখানে মানুষ শুধুই দুঃখের ভাগী হয় সেখানে ক্ষোভ আসতে পারে, কিন্তু যেখানে সে পালটে দুঃখের হেতু হ'য়ে ওঠে সেখানে ক্ষোভ পুষে রাখা সাজে কি?—বিশেষ যখন একথা আমি অস্বীকার করতে পারি না যে, শর্মিতা ওঁর প্রতি বিমুখ হোক এ আমি চেয়েছিলাম আমার মনের নিভৃতে—" ব'লে আমার চোখে চোখ রেখে করুণ হেসে বললেন : "এই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অশান্তিতে অন্তর্দাহে মানুষ যে কী হীন হ'য়ে পড়ে বাবা, তোমাকে যেন কোনোদিনও না জানতে হয়।" বলতে বলতে তাঁর বিষাদভরা আয়ত চোখদুটি চিক চিক ক'রে উঠল—কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ ক'রে ব'লে চললেন : "কিন্তু ঐ দেখ, ফের যা বলতে চাই নি তা-ই উথলে উঠতে চাইছে—কিন্তু কেন চাইছে জানো?" ব'লে আমি কিছু বলবার আগেই

নিজেই জবাব দিলেন নিজের প্রশ্নের : "কারণ তোমাকে দেখেই মায়া প'ড়েছিল আমার। দেখ, মেয়েদের বড় সাধ অন্তত: একটি ছেলে পেতে। মেয়ের আমি নিন্দে করছি নে।—এ ও আমি একশোবার বলব যে সন্তান মাত্রই মা-র মাতৃত্বকে সার্থক করে—কি ছেলে কি মেয়ে। কিন্তু তবু আমার কেন জানি না মনে হয় যে, মা সবচেয়ে বেশি চায় মেয়ে নয়—ছেলে। তবে এবিষয়ে আমার ভুল হ'তেও পারে—হয়ত ছেলে পাই নি ব'লেই এরকমটা মনে হয়।" ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর ফুটে উঠল ফের করুণ হাসি : "জানোই তো বাবা, যা আমরা পাই না সব আগে চাই তাকেই। আকাশের চাঁদ যদি সত্যিই হাতে পেতাম তবে—কে জানে—তার সঙ্গে পথে-পাওয়া চকচকে ঝিনুকের বিশেষ তফাৎ থাকত কি না!"

আমি কথা কইলাম না। উনি নিজেই নিজেকে শুধরে নিলেন : "না—কথাটা হয়ত ঠিক বলা হ'ল না। কারণ এ আমার সত্যিই মনে হয় না যে, ছেলে আমার জন্মায় নি ব'লেই ছেলের এত ঝোঁক ধরেছে আমার অবুঝ মন। অবুঝ বলছি এই জন্যে যে, আমি আগে থাকতে ধ'রে নিচ্ছি যে, আমার যদি একটি ছেলে থাকত তাহ'লে আমার জীবনের শূন্যতা সহনীয় হ'ত খানিকটা। কত মাকেই কি দেখিনি ছেলের চক্ষুশূল হ'তে?—কিন্তু সে যাক, এবার বলার সময় এল এপ্রসঙ্গ কেন তুললাম।

"তোমার মা নেই প্রথমে জানতাম না। কিন্তু যে-ই শুনলাম ছেলেবেলা থেকেই মা কী বস্তু তুমি জানো নি, অমনি কেমন যেন একটা মায়া প'ড়ে গেল তোমার 'পরে। আহা, তোমাকে যদি আমি শৈশবে পেতাম বাবা!···কী? মনে মনে হাসছ বুঝি দেখে যে আমি ভাবছি শুধু আমারই তরফের কথা? ভাবছ বুঝি—আমার মতন মা পেলে তোমার যে কী দুর্গতি হ'ত—" কথাটা শেষ হ'ল না—চোখে জল ভ'রে এল।

আমার মন কেমন ক'রে উঠল। আপন জনার মতন তাঁর চোখ সাদরে মুছিয়ে দিয়ে বললাম : "কেন নিজেকে এভাবে জর্জর ক'রছেন বলুন তো? আপনি কি মনে করেন মা-ই ছেলে চায়—ছেলে মা চায় না?"

মাসিমা হাসলেন। কী স্নিগ্ধ হাসি! মুখে হাসি চোখে জল—আর সমস্ত মুখখানি কোমল হ'য়ে উঠেছে গভীর স্নেহে! আমার মন আনন্দে দিউরে উঠল সত্যি! বুকের মধ্যে উথ্‌লে উঠল সেই অশ্রুসাগর যার আলোয় দুনিয়ার চেহারাটাই যায় বদ্‌লে। পাই নি ব'লেই এরকমটা হ'ল কি না জানি না—কিন্তু কারণ যাই হোক দেবের প্রতি অণু যেন ব'লে উঠল—"পেয়েছি! পেয়েছি! পেয়েছি!" এসব কথা বলতে বাধে—কিন্তু বারবারই আমি ব'লি নি কি যে, এক বিষয়ে আমার জীবনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছে : অর্থাৎ আবাল্য নানারকম অঘটন ঘটেছে আমার পথচলায়—পদে পদেই। দৈবী করুণা আমার শেষের জীবনে এ-অঘটন ঘটিয়েছে প্রত্যক্ষ ভাবে—প্রথম জীবনে অলক্ষ্যে থেকে এই যা তফাৎ। আমার বলবার কথা এই যে, এই বিচিত্র পরিবেশে আমি হঠাৎ পেলাম যেন মাতৃস্নেহের স্বাদ—দুদিক থেকেই। এর নাম যদি অঘটন নেই—বেশি বলা হবে কি?

কিন্তু একে নিছক সাংসারিক স্তরের অনুভূতি বললেও হয়ত একটু ভুল বলা হবে : আমাদের শাস্ত্রে একটি গভীর কথা আছে—যা এখানে তাই সেখানে, যা এখানে নেই তা কোথাও নেই। মাকে আমরা যে প্রণাম দিই জগন্মাতাকেও তো সেই পূজাই দেব? জগন্মাতা তো জগৎছাড়া কিছু নন। মার মধ্যেও তিনিই তো আসেন মূর্তি ধ'রে! অবশ্য যেখানে সত্যিকার মা জেগে ওঠেন সেখানেই। কারণ এ আমি বিশ্বাস করি নাযে মা মাত্রই সত্যিকার মা। তা নয়—হ'তে পারে না—যেমন ভাই মাত্রেই সত্যিকার ভাই নয়, বোন মাত্রেই সত্যিকার বোন নয়, বন্ধুত মাত্রেই সত্যিকার বন্ধুও নয়। না—প্রতি সম্বন্ধের মধ্যে একটা আলো আছে যা নিজেকে জানান দিতে না পারলে সম্বন্ধটা সত্য হ'তে পারে না। এ-আলো জগতের হ'য়েও জাগতিক নয়—মানুষের হয়েও মানবিক নয়। এ-আলোয় মুখচাপা পাথর তমসের পাথর, দৈনন্দিনতার পাথর তুচ্ছতার পাথর সময়ে সময়ে ভগবানের করুণায় যেন আচমকাই যায় স'রে—আর তখনই প্রতি সম্বন্ধের অন্তর-মহলের আনন্দ, আত্মজ্যোতি উছলে ওঠে—অপূর্বস্পষ্ট। চোখটা খোলে—তখন শুধু যে দেবতাই প্রিয় হ'য়ে ওঠেন তাই নয়—প্রিয়ও হ'য়ে ওঠে দেবতা। কিন্তু এ-ধন্যতা—blessedness সুলভ নয়, মানুষ হাজার চেষ্টা করেও

এড়ে পেতে পারে না। জীবনের অতি অপরিচিত ঘরোয়া তামসিক রূপ দেখে দেখে আমাদের চোখ অন্ধ হ'য়ে থাকে বেমন হয় অন্ধকূপে বহুদিন কাটালে। তাই হয়ত এ রসের অনুভবকে যখন সকল আনন্দ ব'লে অস্বীকার করি তখন লোকে সে-আনন্দের নাম দেয় উচ্ছৃঙ্খল। কেন না ঊর্ধ্ব চেতনা বুঝতে পারে নিম্ন চেতনার ধর্ম, কিন্তু নিম্ন চেতনার পক্ষে ঊর্ধ্ব চেতনার ছন্দ বোঝা অসম্ভব। আলো যে দেখেছে আর যে দেখে নি তাদের মধ্যে ভাববিনিময়ের কোনো পথই নেই, থাকতে পারে না।"

আকাশে মেঘ ছেয়ে গেছে। বাগানে খানিকক্ষণের জন্যে নিস্তব্ধতা যায় বিছিয়ে। কেবল থেকে থেকে ঝির-ঝিরে হাওয়ায় আশ পাশের গাছের পাতারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যেন।

* * *

অমিত: চুপ ক'রে ব'সে রইলাম অনেকক্ষণ মালিনীর একটি হাতের উপর হাত বুলোতে বুলোতে। হঠাৎ কেমন যেন আশ্চর্য লাগল: কই দুদিন আগেও তো এ-মানুষকে এত কাছের মানুষ মনে হয় নি! মনে মনি এল ভাবতে যে, তাঁকে কতখানিই না ভুল বুঝেছি—তাঁর মেহসাহেবিয়ানার নানা অসঙ্গতি নিয়ে মনে মনে হেসেছি। ভাবতে ভাবতে অনুতাপ এল সত্যিই, বললাম: "মালিনা আপনার কাছে আমি অপরাধী—আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার সম্বন্ধে কত সময়ে কত কীই যে ভেবেছি!"

"খুব অন্যায় তো ভাবো নি বাবা! আমিও তোমার নানা ছিঁছরামি চাল তো প্রথম প্রথম ঠিক ঠোকে ধরি নি। শুধু তোমার কেন সাধুজির নির্মল চরিত্রেরও দাম দিতে পারি নি। তোমাকে ভাবতাম দেকেলে, তাঁকে ভাবতাম কুসংস্কারের তাঁবেদার। তারপরে যখন তোমার প্রতিভাকে চিনতে শিখলাম তখনও দেখ না কেন—তোমার প্রতি আমার স্নেহ প্রথম দিকে মোটেই সোজা ছিল না। আমি অনেক ঠেকে তবে শিখেছি বাবা যে মানুষের মেরে মিথ্যে থাকেই—নিখাদ সোনা পেতে হ'লে সোনাকে অনেক পুড়োতে হয় সাধুজিকে দেখতে দেখতে তবে আমার দৃষ্টি খোলে। একদিন তিনি বলে-ছিলেন মনে পড়ে: মানুষ তার চরিত্রের পিছুটান কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না যতক্ষণ সে বাস করে প্রকৃতির খাসতালুকে। কেবল এক একটা পুণ্য মুহূর্তে আমরা আভাস পাই এ-ভালোবাসা কী হ'তে পারত যদি না আমরা বড়াই করতাম ভালোবাসার দাবি নিয়ে যার জন্যে মাথা হেঁট করাই উচিত ছিল।" সময়ে সময়ে সত্যি লজ্জা আসে অমিত, যে আমরা কেমন ক'রে পারি মনকে বোঝাতে যে, ঈর্ষা প্রমাণ করে প্রেমকে, অভিমান মেকে, স্বয়ংবোধ মমতাকে!" চোখে তাঁর জল ভ'রে এল, তিনি একটু চুপ ক'রে সামলে নিয়ে বলতে লাগলেন:

"কিন্তু এ-লজ্জা আমার কাছে ধরা পড়েছিল হয়ত এইজন্যেই যে, আমার বিবাহিত জীবন সুখের হয় নি। এক এক সময়ে আমার তাই তো মনে হয় বাবা, যে মায়া সাংসারিক দিক দিয়ে সুখী তারা হয়ত মিথ্যেকে, ঠিকে-জুলকে প্রশ্রয় না দিয়ে পারে না। পরের ছেলেকে যে কখনো নিজের ছেলে মনে করে নি সে কি সত্যি জানে মাতৃত্ব কী বস্তু? একথা আমি বলছি না যে, আমার মেয়েদের আমি ভালোবাসি নি। গর্ভে যাকে ধরেছি তার প্রতি—সে যে নাড়ীর টান। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই তোমাকে পেয়ে আমি টের পেয়েছি বাবা, যে যে-টান প'ড়ে-পাওয়া সে-টান আমার নিজের সৃষ্টি নয় ব'লেই তার মধ্যে আপনাকে পুরোপুরি ঢেলে দেওয়া যায় না। এ সম্ভব হয় শুধু সেখানে যেখানে সম্বন্ধ প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। কেবল সেইখানেই শুভ কামনার সোনার স্বয়ংবোধের খাদ ঠাঁই পায় না। আমি—

এমনি সময়ে দুজনেই চমকে উঠলাম পায়ের শব্দে। মুখ ফেরাতেই দেখি, মন্ত্রীসাহেব!"

ব্যঙ্গরচনায় সংস্কৃত ছন্দ

প্রবোধচন্দ্র সেন

দীর্ঘকাল পূর্বে ভারতবর্ষ পত্রিকায় (১৩৪১, অগ্রহায়ণ) 'বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। বর্তমান প্রবন্ধটি তারই অনুবৃত্তি হিসাবে গ্রহণীয়। বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ রচনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, সংস্কৃত ছন্দের নিখুঁত বিশ্লেষণও লেখকের অভিপ্রায় বহির্ভূত। বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের একটি ফলপ্রদ ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও সে সম্বন্ধে পাঠকের মনে কিছু ঔৎসুক্য জাগানোই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। নীরস বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হলে রস-গ্রহণের ব্যাঘাত ঘটতে পারে, এই আশঙ্কায় ছন্দের খাতিরে কাব্যের দেহবাবচ্ছেদের প্রণালী যথাসম্ভব বর্জন করতে সচেষ্ট হয়েছি। পক্ষান্তরে যে-সব ক্ষেত্রে রচনার রস বহুলাংশে ছন্দোভঙ্গির উপরেই নির্ভর করে সে সব স্থলে ছন্দোবৈচিত্র্যের দিক্‌টাকে উপেক্ষা করলে রচনার রসটুকুও মারা পড়ে। 'শিখরিণী' ছন্দের একটি রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করে দিলেই আশা করি এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে।

"এ কবিতাটি যদি সংস্কৃত ছন্দে না পড়তে পারো, তাহলে এর মস্তক ভক্ষণ করা হবে। অতএব, নিতান্ত অক্ষম হলে বরঞ্চ একজন ভট্টাচার্যের কাছে পড়িয়ে নিয়ো, তা যদি না পারো তবে এ কবিতাটি না হয় না পোড়ো।"

—য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (১২৯১), পৃঃ ৮৪

সংস্কৃত শিখরিণী ছন্দে রচিত এই কবিতাটির অংশ-বিশেষ যথাস্থানে উদ্ধৃত করা যাবে। যা হক, রচনার রস-গ্রহণের পক্ষে যতখানি ছন্দোবিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক, বিভিন্ন উদ্ধৃতির প্রসঙ্গে ততটুকুমাত্র বিশ্লেষণ করেই নিরস্ত হব। আশা করি তাতে রচনাগুলির ছন্দোবেশ ও ভাবরসের সুসমঞ্জস উপলব্ধির সহায়তা হবে।

১

শতাধিক বৎসর পূর্বে ভুবনমোহন রায়চৌধুরী নামে একজন ছান্দসিক সংস্কৃত 'অনুষ্টুপ্' ছন্দে দুঃখ করে লিখে-ছিলেন—

দেশীয় সাধুভাষাতে। ছন্দগ্রন্থ সুদুর্লভ।
সে হেতুক রহে লোকে। ছন্দজ্ঞানে বিবর্জিত।
পাঁচালী নাম বিখ্যাতা সাধারণ-মনোরমা।
পয়ার-ত্রিপদী আদি প্রাকৃতে হয় রচনা।
...
পঠনে সেসব ছন্দঃ রাখিতে ভালগৌরব।
পঠিছে সর্বদা লোকে উচ্চারণ-বিপর্যয়ে।
লঘুকে গুরু সম্ভাষে দীর্ঘবর্ণে কহে লঘু।
হ্রস্বে দীর্ঘে সমজ্ঞানে উচ্চারণ করে সবে।
ছন্দস্ত প্রায় সম্ভাষে পদের শেষ অক্ষরে।
বর্ণান্তস্থ অকারেতে লুপ্তাকারে পঠে সদা।
এই কুৎসিত সংস্কারে দেশভাষা দিনে দিনে।
হয়েছে সম্পদ্‌ভ্রষ্টা হীনভাবে ভ্রমে সদা।
—'ছন্দঃকুসুম' (১৮৬৪), ভূমিকা পৃ ৩১১-১২, ৩১৭-১৭

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত সংস্কৃত ছন্দে স্বর-বর্ণের উচ্চারণে দীর্ঘহ্রস্বভেদ অবশ্য রক্ষণীয়। অধিকন্তু হস্-চিহ্নহীন অকারান্ত বর্ণের অকারান্ত উচ্চারণ অত্যাবশ্যক। সংস্কৃত বর্ণবৃত্তবর্গীয় প্রত্যেক ছন্দের বর্ণগুলি লঘুগুরু ভেদে সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে বিন্যস্ত থাকে। যথাস্থানে তা চিহ্নযোগে দেখানো হবে। চিহ্ন লঘুত্বসূচক,—চিহ্ন গুরুত্বসূচক। অনুষ্টুপ্ ছন্দ চারটি বস্তিবিভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক বিভাগে আটটি বর্ণ। প্রত্যেক বিভাগেই পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ণ যথাক্রমে লঘু ও গুরু হওয়া চাই, দ্বিতীয় ও চতুর্থ বিভাগে সপ্তম বর্ণটি হবে লঘু। অন্য সব বর্ণের বিন্যাসে কোনো বাঁধা-বাঁধি নিয়ম নেই।

যা হ'ক, উদ্ধৃত অংশটির লেখক দেশভাষার উক্ত 'কুৎসিত সংস্কার' দূর করে ছন্দজ্ঞান-বিবর্জিত পাঠকদের

যথার্থ ছন্দোবোধ জাগাবার উদ্দেশ্যে 'ছন্দঃকুসুম' গ্রন্থখানি রচনা করেন (১২৭০ ফাল্গুন)। গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায় ছিল 'সংস্কৃত ছন্দঃসমূহ ভাষাতে প্রচলিতকরণ।' এই গ্রন্থে সংস্কৃত ছন্দসমূহের দৃষ্টান্ত রচনাচ্ছলে 'শ্রীকৃষ্ণলীলা-মানভিক্ষোপন্যাস' নামে একখানি কাব্যও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কিছুকাল পরে ওই একই উদ্দেশ্যে 'ছন্দঃকুসুমের সাহিত্য-স্বরূপ' 'পাণ্ডবচরিত' নামে আর-একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন (১২৮৩ চৈত্র)।

ভুবনমোহনের পর বলদেব পালিত (১৮৩৫-১৯০০) সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর 'হর্তৃহরি' কাব্যখানি (১২৭৯) 'আদ্যোপান্ত সংস্কৃতছন্দে বিরচিত'। এতে বহু বিভিন্নপ্রকার সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এই কাব্যের ভূমিকায় তিনি সংস্কৃত ছন্দের বহুল প্রশংসা করে অভিমত প্রকাশ করলেন—

"এই সকল ছন্দ পয়ার ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি বঙ্গ-ভাষা-প্রচলিত যাবতীয় ছন্দের অপেক্ষা মধুর এবং ওজোগুণ সম্পন্ন।"

এই মতের সঙ্গে ভুবনমোহনের অভিমতের সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষণীয়। এই কাব্যের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—"বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ গঠন তাহাতে সংস্কৃতছন্দ ভাল বসে না।"

—বঙ্গদর্শন ১২৭৯ পৌষ

একথা স্বীকার করেও তিনি বলদেবের সাফল্য মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তথাপি এই কাব্যপ্রকাশের তিন বছর পরেই 'কর্মাভূমি' কাব্যের ভূমিকায় বলদেব লিখলেন—

"এতদ্দেশে স্বরবর্ণের লঘুত্ব বা গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করিবার প্রথা না থাকাতে ঐ সকল (সংস্কৃত) ছন্দ সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হয় না। আমার 'হর্তৃহরি' কাব্যই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সেই কারণ-বশতঃ আমি ঐ প্রকার রচনায় আর প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম না।"

বলদেবের মতো সংস্কৃত ছন্দের ঘোরতর অনুরাগীও বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের ব্যর্থতা স্বীকার করলেন। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের তথা দীর্ঘ স্বরবর্ণের আয়ত্ত উচ্চারণের এমনই মোহ যে, বলদেবের পরেও বাঙালি কবিরা বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগের লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। পরবর্তী কালে যাঁরা সংস্কৃত ছন্দের বহুল প্রয়োগ করেছেন তাঁদের মধ্যে হরগোবিন্দ লস্করচৌধুরী ও বিজয়চন্দ্র মজুমদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হরগোবিন্দ চৌধুরীর 'দশানন-বধ' (১৩১০) এবং বিজয়চন্দ্রের 'কুসুমশর' (১৩১১) কাব্যে সংস্কৃত ছন্দের বহুল প্রয়োগ আছে। আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কথা এই যে, এত প্রয়াস এবং পরীক্ষণ-সত্ত্বেও খাঁটি সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় চলল না। কেননা, খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণ বাংলার পক্ষে অস্বাভাবিক এবং ভুবনমোহন রায়-চৌধুরী যাকে 'কুৎসিত' এবং 'উচ্চারণ-বিপর্যয়' বলে বর্ণনা করেছেন বাংলার পক্ষে সেইটেই স্বাভাবিক। বাংলা ভাষার যেরূপ গঠন তাতে সংস্কৃত ছন্দ ভাল বসে না, বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিই সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথও ঠিক এইজাতীয় কথাই বলেছেন—

"সংস্কৃতের অনুকরণে বাংলা স্বরবর্ণে হ্রস্বদীর্ঘতার প্রচলন করতে গেলে ওই কৃত্রিমতা বেশিক্ষণ সয় না। তার অসংগতি অধিকাংশ স্থলে ব্যঙ্গকাব্যেরই প্রয়োজন মেটাতে পারে।"

—'ছন্দ' (১৩৬৯), ছন্দের প্রকৃতি, পৃ ১২২-২৩

ভুবনমোহন যাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করতেন, রবীন্দ্র-নাথের মতে সেইটেই আসলে উচ্চারণবিপর্যয়। এই বিপর্যয় ও কৃত্রিমতার ফলেই ভারতচন্দ্র থেকে বিজয়চন্দ্র পর্যন্ত সকলের প্রয়াসই ব্যর্থ হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্বোক্ত 'বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ' প্রবন্ধটিতে বিস্তৃত আলোচনা করেছি, এখানে পুনরুক্তি করতে চাই নে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্ভাবিত সংস্কৃত ছন্দ রচনার নূতন পদ্ধতিও আমাদের আলোচ্য নয়। সংস্কৃত উচ্চারণের কৃত্রিমতা ও অসংগতি বাংলায় কিভাবে ব্যঙ্গকাব্যের প্রয়োজন মেটাতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টান্তযোগে দুএকটি কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

২

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি পাঠ বা আবৃত্তিযোগ্য কবিতার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, গীতি-রচনার সম্বন্ধে নয়। বাংলায় স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ যতই অস্বাভাবিক হক না কেন, গানের স্বরবিস্তারের পক্ষে তা শুধু স্বাভাবিক নয়, বরং অনেকখানি অনুকূল। বৈষ্ণব

কবিদের অনেক পদাবলী, রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক', 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'মাতৃ-মন্দির পুণ্য অঙ্গন', দ্বিজেন্দ্রলালের 'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে' প্রভৃতি গানের কথা স্মরণ করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে।

ব্যঙ্গকাব্যের প্রয়োজন মেটাবার তথা হাস্যরসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে কে প্রথম সংস্কৃত উচ্চারণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা বলা কঠিন। কেননা, বহু বাংলা উদ্‌ভট কবিতায় এ কৌশলের ব্যবহার দেখা যায় এবং এসব উদ্‌ভট কবিতা রচনার প্রথা বেশ প্রাচীন বলেই বোধ হয়। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে এ কাজ করেছেন প্রধানতঃ দুই জন —দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের দ্বারা যে হাস্যরসের সৃষ্টি হতে পারে তার সূচনা দেখা গিয়েছিল অনেক আগেই। বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের প্রথম প্রবর্তক ভারতচন্দ্রের 'তূণক' ছন্দে রচিত দক্ষযজ্ঞনাশ বর্ণনাতেই তার পূর্বাভাস পাওয়া যায়—

রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দিভৃঙ্গি-সঙ্গিয়া,
ঘোর বেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়া।
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়িগোঁপ ছিঁড়িল,
পূষণের ভূষণের দন্তপাতি পাড়িল।
বিপ্র সর্ব দেখি খর্ব ভোজ্যবস্ত্র নারিছে,
ভূতভাগ পায় লাগ লাথি কীল মারিছে।
ছাড়ি যজ্ঞ ফেলি হব্য মুক্ত কচ্ছ ধায় রে
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ যায় রে।

'তূণক' ছন্দের প্রতি পংক্তিতে থাকে পনেরোটি বর্ণ এবং সবগুলি বর্ণই নিরবচ্ছিন্নভাবে গুরুলঘু ক্রমে বিন্যস্ত থাকে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এখানে সংস্কৃত উচ্চারণটা হাস্যরসের প্রধান অবলম্বন নয়, কিন্তু তাহলেও সেটা যে হাস্যরসসৃষ্টির আনুকূল্য করেছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রবন্ধের প্রথমেই ভুবনমোহন রায়চৌধুরীর যে রচনাংশটি উদ্ধৃত হয়েছে তাতে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে তা রচয়িতার অনভিপ্রেত, কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু বক্তব্য বিষয়টা নয় উচ্চারণ-ভঙ্গিটাও হাস্যরসের হেতু। ভুবনমোহনের 'মদিরা'ছন্দে রচিত নিম্নোক্ত লৌহপ্রশস্তিটি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।—

দেখহ সুন্দর লৌহরথে চড়ি লৌহপথে কত লোক চলে,
ষষ্ঠ মুহূর্তক মধ্য করে গতি যোজন পঞ্চদশের পথে।
লৌহবিনির্মিত তার ভরে বহু দূর অবস্থিত লোক সবে

দূর অবস্থিত বন্ধুসনে সুখচিত্ত পরস্পর বাক্য কহে।

'মদিরা' ছন্দের প্রতি পংক্তিতে বাইশটি বর্ণ এবং বর্ণগুলি গুরুলঘুলঘু ক্রমে বিন্যস্ত থাকে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দে এই অংশটির যে তরজমা করেছেন তাও দেওয়া গেল।—

দেখ দেখ মনোহর লোহার গাড়িতে চড়ি
লোহাপথে কত শত মানুষ চলিছে।
দেখিতে দেখিতে তারা যোজন যোজন পথ
অনায়াসে তরে যায় টিকিট কিনিয়া.
যেসব মানুষ আছে অনেক দূরের দেশে
লোহা দিয়ে গড়া তার রয়েছে বলিয়া,
সুদূর বঁধুর সাথে কত যে মনের সুখে
কথা চালাচালি করে নিমেষে নিমেষে।

—'ছন্দ' (১৩৮৯), ছন্দের অর্থ, পৃ ৪৮

বোধ করি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই সর্বপ্রথম সংস্কৃত ছন্দের কৃত্রিমতাকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যঙ্গরচনার কাজে লাগিয়েছেন। বিলাতগামী নব্য বাঙালিদের লক্ষ্য করে 'শিখরিণী' ছন্দে তিনি একটি ব্যঙ্গকবিতা রচনা করেন। সেটি ১২৮৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। নমুনা-স্বরূপ তার থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।—

বিলাতে পালাতে। ছটফট করে নব্য পড়ুয়ে,
অরণ্যে যে-জন্তু গৃহগবিহগপ্রাণ ঘটয়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজনবশে কিছু হয় না,
বিনা ছাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি-শিরহনে মান রয় না।
... ...
বিহারে নীহারে বিবিজনসনে খেটিঃ ঘরি
বিবাহে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিমেলে কী মেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
কি তাহে উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে।

—দ্রঃ রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীরপত্র' (১২৯১), পৃ ৮৩

'শিখরিণী' ছন্দের প্রতি পংক্তিতে দুই বিভাগ, প্রথম বিভাগে ছয়টি এবং দ্বিতীয় বিভাগে এগারোটি বর্ণ। বর্ণগুলির বিন্যাসক্রম নির্দিষ্ট চিহ্নযোগে দেখানো হল।

দ্বিজেন্দ্রনাথের টকাদেবীর স্তোত্রটিও এখানে উল্লেখযোগ্য।—

টঙ্কাদেবী। যদি কর কৃপা। না রহে কোন জ্বালা,
বিদ্যাবুদ্ধী কিছুই কিছু না থাকি তবে যি চালা
ইচ্ছা সম্যক্ তব দরশনে, কিন্তু পথের ক্লান্তি,
পায়ে শিকলী মন উড়ু-উড়ু একি দৈবের শাস্তি।

—দ্রঃ রবীন্দ্র-গ্রন্থের 'ছন্দ' (১৩৪২), পৃ ২৬৭ ৬৮

এটি 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দ। এ ছন্দের প্রতি পংক্তিতে তিন ভাগ, ভাগগুলির বর্ণসংখ্যা যথাক্রমে চার, ছয় ও সাত; বর্ণগুলির বিন্যাসক্রম চিহ্নযোগে নির্দিষ্ট হল। গুরুগম্ভীর রচনার জন্য এর খ্যাতি। যে মন্দাক্রান্তা ছন্দকে কালিদাস 'মেঘদূত' কাব্যের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যের উপযুক্ত বাহন বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তার যে এরকম ব্যবহার হবে তা কে জানত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই টঙ্কাস্তোত্রটির রচনাকাল নির্দিষ্টরূপে জানা যায় নি। তবে এ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করবার মতো প্রমাণ দেওয়া যায়। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একখানি পত্রে ('চিঠিপত্র' ৮, পত্র ৩৪) রবীন্দ্রনাথ এই রচনাটির শেষ দুই পদ উদ্ধৃত করেন। এই পত্রখানি ১৮৮৬ জানুয়ারি মাসের কাছাকাছি সময়ে রচিত বলে অনুমান করা হয়েছে। সুতরাং এই স্তোত্রটি তার পূর্ববর্তী কোনো সময়ের রচনা বলে মনে করা যায়। বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ যে ওরকম সময়ে সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করছিলেন তার প্রমাণ আছে। এ প্রসঙ্গে শেষ কথা এই যে, উক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথ বক্তব্যের প্রয়োজনে 'তব দরশনে'র স্থলে বসিয়েছিলেন 'উপবন ভ্রমণে'। কিন্তু তাতে যে মন্দাক্রান্তার বিধান লঙ্ঘিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

'প্রমদা' ছন্দ মন্দাক্রান্তার চেয়েও গুরুগম্ভীর, সাধারণতঃ দেবস্তোত্রাদি রচনায় এই ছন্দের ব্যবহার হয়। কিন্তু অজ্ঞাতনামা পণ্ডিতশ্রেণীর রসিক উদ্ভট কবি তাকেও অতি অনায়াসেই ব্যঙ্গরচনার বাহনরূপে ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। গ্রামান্তরে সত্যনারায়ণের পূজা, প্রসাদ-লোভী ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়ে কিভাবে নিরাশ ও নাকাল হয়েছিলেন তারই বর্ণনা থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করছি।—

গত্বা গ্রামান্তরেঽহং। ভাল বটে শিরিনী।
সত্যনারায়ণস্য
গত্বা তত্রাতিহর্ষাদ। আটখানি বাতাসা।
পাইলামাংশেষে।
রাত্রৌ ঘোরান্ধকারে। চোখে কিছু দেখি না।
দ্বা গুঁতা খাই তপস্বে
ভুক্ত্বা খেদান্বিতোঽহং। ফিরে আসি বাড়িতে।
রো বলে যে "বটে রে"।

'প্রমদা' ছন্দের প্রতি পংক্তিতে তিন ভাগ, প্রতি ভাগের বর্ণসংখ্যা সাত। প্রমদা বস্তুতঃ মন্দাক্রান্তার বর্ধিত রূপমাত্র। প্রমদা ও মন্দাক্রান্তার তৃতীয় ভাগ অবিকল একরূপ তবে প্রমদার দ্বিতীয় ভাগের প্রথমে একটি লঘুবর্ণ এবং প্রথম ভাগের শেষে একটি গুরু ও দুটি লঘুবর্ণ বেশি।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, কৌতুক-সৃষ্টির অভিপ্রায়ে এটিতে ইচ্ছা করেই শুধু যে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে তা নয়, বাংলা অংশগুলির মধ্যে সংস্কৃত ও বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের মিশ্রণও ঘটানো হয়েছে। প্রত্যেক পংক্তির দ্বিতীয় বিভাগগুলিতে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ আছে (কেবল 'আট'কে অকারান্তরূপে উচ্চারণ করতে হবে), কিন্তু তৃতীয় বিভাগগুলির বাংলা অংশেও সংস্কৃত উচ্চারণ মেনে চলতে হবে। এভাবে উচ্চারণবৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আবৃত্তি করলে এই শ্লোকটির অন্তর্নিহিত হাস্যরসটা অনিবার্যরূপেই ঠিকরে বেরোবে।

শিখরিণী, মন্দাক্রান্তা, প্রমদা বর্ণবৃত্ত ছন্দোবর্গের অন্তর্গত। দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তবর্গের ছন্দকেও ব্যঙ্গরচনার কাজে লাগিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি কৌতুকপূর্ণ পত্রের তিনি যে ছন্দোবদ্ধ উত্তর দিয়েছিলেন সেটিও কম কৌতুকপূর্ণ নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবনচরিতে (দেবকুমার রায়চৌধুরী-প্রণীত) সেটি সংকলিত হয়েছে। বাংলা কৌতুকরচনায় সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রয়োগের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসাবে সেটিকে এখানে উদ্ধৃত করা গেল।—

ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধি বৃহস্পতি, যমপ্রতাপ চ নাস্তিক যে।
ন চ নন্দনকানন, স্বর্ণবাহন, পদ্মবিনিন্দিত পদযুগ যে।
আছে সত্যি পদরজস্তি, তাও পবিত্র কি জানিত নে।
চৌদপুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি অবশ্য যাস্তিব তব ভবনে।

কিন্তু

হেথাচ্ছত্রে শনি-অপরাহ্নে যদি গুরু বাধা না ঘটে যে,
কিংবা যদপি সহসা চুপিচুপি প্রেরিত না হই পরধামে।

এখানে দ্বিতীয় পংক্তির 'ন চ' বর্ণদুটিকে অতিপর্ব হিসাবে আগে রাখতে হবে। 'ন চ নন্দনবন' লিখলে এটুকু ব্যতিক্রমের প্রয়োজন হত না। যা হক, ছন্দের বিচারে এটি জয়দেবের 'চন্দনচর্চিত নীলকলেবর' এবং রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' প্রভৃতি রচনার সগোত্র। বরং এটিতে দুই মাত্রা বেশি আছে। তাতে এটির ছন্দোগত গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য বাড়বারই কথা। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ এই গুরুগম্ভীর উচ্চাঙ্গের ছন্দটিকে অবলীলাক্রমে কৌতুকসৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন। এরকম রসান্তর ঘটানো শুধু অসাধারণ প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

৩

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দকে এভাবে কাজে লাগাবার বিশেষ চেষ্টা করেন নি। তবে এরকম প্রয়োগের নিদর্শন যে একেবারেই নেই তা নয়। প্রথমেই সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তবর্গীয় ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

এস বিশ্বভারনত
শুষ্ক-কঠিনপথ
মরুপরিচারণ-ক্লান্ত,
এস হিসাব 'শত্তর'-ত্রস্ত
তহবিলমিলভুল-গ্রস্ত
লোচনপ্রান্ত ছল ছল হে।
... ...
এস কর্মিটিপলাতক
বিধানঘাতক
এস দ্বিগ্‌ভ্রান্ত টলমল হে।

—'প্রহাসিনী': সংযোজন, সুনীল চা-চক্র

এটির ছন্দও জয়দেবের 'চন্দনচর্চিত-নীলকলেবর' ও রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' প্রভৃতি রচনার সহিত একবর্গীয়। সুতরাং ছন্দের বিচারে এটি ও দ্বিজেন্দ্রনাথের 'ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধি বৃহস্পতি' ইত্যাদি রচনাটি একই পর্যায়ভুক্ত। অথচ রচনা-দুটির কৌতুকরসের স্বাদগত পার্থক্যটুকুও রসিকজনের কাছে উপেক্ষণীয় নয়। বলা বাহুল্য এই দুটি রচনার মধ্যে কিছু ছন্দোগত পার্থক্যও আছে। একটু মন দিলেই তা ধরা পড়বে, সুতরাং বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। শুধু বলা উচিত যে, অতিপর্বস্থানীয় তিনটি এবং পর্বভুক্ত একটি, এই চারটি 'এস' শব্দের 'এ' হ্রস্বরূপে উচ্চার্য।

বর্ণবৃত্তবর্গীয় ছন্দেরও দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রথমেই দেওয়া যাক 'অনুষ্টুপ্' ছন্দের দৃষ্টান্ত। প্রবন্ধের শুরুতেই এ ছন্দের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অনুষ্টুপ্ ছন্দকে কি ভাবে কৌতুকসৃষ্টির কাজে লাগানো যায় তার নিদর্শন আছে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে। পত্রখানির তারিখ জানা যায় নি, সম্ভবতঃ ১৮৮৬ জানুয়ারি থেকে ১৮৮৮ এপ্রিলের মধ্যে কোনো সময়ে লিখিত। দুটিমাত্র ছত্রে লেখা পত্রখানি এই।—

দোকানে গমিষ্যামি। খাদ্যকারণ্ড শিক্ষন্ত চ।
কখনং যাইতে হৈবে। টাইমবধারয়।

—'চিঠিপত্র' ৮, পত্র ৪৪

বলা বাহুল্য, এখানে এক স্থানে অনুষ্টুপ ছন্দের স্খলন ঘটেছে। ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণটাই যে এই রচনাটুকুর একমাত্র উপভোগ্য বস্তু তা নয়, সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রয়োগটাও এটুকুর রসসৃষ্টিতে কম সহায়তা করে নি। এদিক্ থেকে এটুকু 'শ্রুত্বা গ্রামান্তরেঽহং' ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকের সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত।

'তোটক'-ছন্দ সকলেরই পরিচিত।—

'দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ শুণে';
'কত কাল পরে বল ভারত রে
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে';
'গুরুদেব দয়া কর হীনজনে',
'প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্'

ইত্যাদি রচনায় 'তোটক' ছন্দের সঙ্গে পরিচয় না ঘটেছে এমন বাঙালি পাঠক বিরল। এই সুপরিকল্পিত উচ্চাঙ্গের ছন্দটিকেও রবীন্দ্রনাথ অনায়াসেই হাস্যরসের বাহনরূপে ব্যবহার করেছেন।

কত কাল রবে বল ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে
দেশে অম্লরসের হল ঘোর অনটন্
ঘর হইছি মেডা আর মুগিমটন্
যাও ঠাকুর চৈতন চুটকি নিয়া,
এস ঘাড়ি নাড়ি কলিমদ্ধি দিয়া।

—'চিরকুমার সভা' তৃতীয় পরিচ্ছেদ (ভারতী ১৩০৭)

'তোটক' ছন্দের প্রতি পংক্তিতে বারোটি বর্ণ এবং বর্ণগুলি লঘু লঘুগুরু ক্রমে বিন্যস্ত থাকে। অর্থাৎ তোটকের বিন্যাসক্রম মোটকের বিন্যাসক্রমের বিপরীত। পাশ্চাত্য ছন্দের পরিভাষায় বলা যায় তোটক হচ্ছে anapaest আর মোটক ছন্দকে বলা যায় dactyl। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই দৃষ্টান্তটিতে সংস্কৃত রীতি অনুসারে হ্রস্বদীর্ঘস্বরের উচ্চারণ সমভাবে রক্ষিত হয় নি। আবৃত্তিকারের উচ্চারণ কৌশলের উপর এর অনেকখানি নির্ভর। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এটিতে ভারতচন্দ্রপ্রমুখ কবিদের অনুসৃত প্রচলিত রীতি ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্য রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। উক্ত নব্যরীতির আংশিক পূর্বাভাস বলে এই দৃষ্টান্তটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। তা ছাড়া এটিতে তোটকের বিন্যাসক্রমও সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। একটু লক্ষ্য করলেই ব্যতিক্রমগুলি ধরা পড়বে।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পংক্তি দুটিও স্মরণীয়। উপরের দৃষ্টান্তটির মতো এই রচনাটুকুতে কৌতুকের হাসি নেই, যে হাসি এটিতে ফুটে উঠেছে তা পরম বেদনারই হাসি।

কত কাল পরে পদচারি ওরে,
দুখসাগর সাঁতরি পার হবে।

—'কালান্তর', কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (১৩২৪ ভাদ্র)

এখানে 'ওরে' শব্দের 'ও' ছন্দের খাতিরে হ্রস্বরূপে উচ্চার্য। 'পদচারি' শব্দের 'রি' এবং 'সাঁতারি' শব্দের 'ত'ও হ্রস্ব হয়েছে ছন্দের প্রয়োজনেই।

বোধ করি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনাতেই সংস্কৃত ছন্দে ব্যঙ্গরস জমেছে সবচেয়ে বেশি। তাঁর রচনা থেকে দুটি উদাহরণ দিয়েই এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। প্রথমেই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 'পজ্‌ঝটিকা' ছন্দের। 'পজ্‌ঝটিকা' মাত্রাবৃত্তবর্গীয় ছন্দ। এ ছন্দের প্রতি পংক্তিতে ষোলো মাত্রা, মাত্রাগুলি দুয়ে-দুয়ে বিভাজ্য হওয়া চাই, আর আট মাত্রার পরে একটি গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রক বর্ণ থাকলে ছন্দ সৌন্দর্যের উৎকর্ষ ঘটে। বর্ণবৃত্তরীতির অনুষ্টুপ ছন্দের ন্যায় মাত্রাবৃত্তরীতির পজ্‌ঝটিকা ছন্দেও কবির স্বাধীনতা প্রায় নিরঙ্কুশ। দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলা পজ্‌ঝটিকার দৃষ্টান্ত কিছু বেশি পরিমাণেই দেওয়া গেল।

জানো না কি কদাচন মূঢ়,
কর্ণবিমর্দন মর্ম কি গূঢ় ?

... ...

কর্ণাকর্ণ অতিশয় তুচ্ছ,
যা কর সাহিত্য নাড়িব পুচ্ছ।
হুজুর হুজুর বলি জীবনমরণে
রব পড়ি ইন্দুবিনিন্দিত চরণে ;
রহিও খুশি, ঘুঁষি আসুটা, রাগে
যেরো নাকো কেবল নাকে।

... ...

ও ঘুষি পড়িলে গণ্ডে জোরে
একেবারে মাথা ঘোরে।
কানা নিশ্চিত পড়িলে চক্ষে,
ভূমি বিলুণ্ঠিত পড়িলে বক্ষে।
চাপ্‌কান্ পরিয়া আপিস নিত্য
আসি হি পুরুষানুক্রম ভৃত্য।
নাকে কর্ণে চুপে চুপে
রক্ষা করিয়া কোনো রূপে
সংসারেতে টিকিয়া আছি—
রহি না ঘুষি-ঘুষি কাছাকাছি।

—'আষাঢ়ে' (১৩০৫), কর্ণবিমর্দন-কাহিনী

'দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে' ইত্যাদি গঙ্গাস্তোত্রটি এবং 'মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং' ইত্যাদি 'মোহমুদ্গর'-নামক রচনাটিও এই পজ্‌ঝটিকা ছন্দেই রচিত। বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের 'কর্ণবিমর্দন'-কবিতাটিকেও একরকম মোহমুদ্গর বলে আখ্যা দেওয়া যায়। তবে যে মোহ এই কবিতাটির লক্ষ্য সেটি আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নয়, নিতান্তই পার্থিব প্রকৃতির মোহ। আর মুদ্গরটিও নিরেট নয়, অত্যন্ত হালকা ওজনের, কিন্তু কার্যসিদ্ধির পক্ষে অধিকতর সহায়ক।

সংস্কৃত 'অনুষ্টুপ' ছন্দ দিয়ে প্রবন্ধটি আরম্ভ করেছি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ দিয়েই সমাপ্ত করা যাক।—

ব্যারিষ্টার উকীলাদি। মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারি অদ্ভুত। আশ্চর্য মহতী সভা॥

... ...

এ হেন হি মহাযজ্ঞে হইলা বক্তৃতা সুরু।
ইংরাজের মহাকেজ্ঞা ইংরাজি রেজল্যুশনে॥

... ...

চাপাননিরত প্রাজ্ঞে ইংরাজ লাটসাহিব।
পড়িয়া এ মহাবার্তা আতঙ্কে তু বিমূর্ছিত॥

উঠিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস' বলিলেন অতঃপর।
এ জাতিকে রসে রাখা দেখিতেছি অসম্ভব।
উঠিবে উঠিবে এরা ঠেকানো বড় দুষ্কর।
বুঝি যে এখনো শ্রেয় মানে
মানে পলায়ন।
লাটসাহিব ইত্যাদি করি উক্ত বিবেচনা।
পোটলা পুঁটুলী বাঁধি স্বদেশে দেন চম্পট।
পরপ্রাপ্ত হতে রাজ্য আর্যজাতির সংস্থিত।
পরপ্রাপ্ত হতে কীর্ণ হিন্দুধর্ম সনাতন।
... .
একদা তু বঙালীর হইল বড় মুস্কিল।
কূট তর্ক উঠে এক মহানন্দে ঘরে ঘরে।
উঠিল কুটিল প্রশ্ন সমস্যা জটিলা অতি।
শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচু পোড়া হি ভক্ষণ
আবার হইলা দেশে ডাকিতা মহতী সভা।
সমাগত সেই প্রশ্ন বিচার করিতে সবে।
কিন্তু সেই মহাপ্রশ্ন মীমাংসা হইবে কিসে।
সবাই বক্তৃতাদক্ষ সবাই বক্তৃতা করে।
পরিশেষে সভাস্থানে সবাই অপরাজিত।
দিলে হি বক্তৃতাচোটে উড়াইয়া পরস্পরে।
বাঙালী মহিমাকীর্তিকলাপকাহিনী যদি।
শুন মন দিয়া বাবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

—'আষাঢ়ে' (১৩০৫), কলিবজ

অন্য ক্ষেত্রে যা-ই হক, বিচিত্র ছন্দসৃষ্টির ক্ষেত্রে বাঙালির কীর্তিকলাপকাহিনী মন দিয়ে শুনলে বোধ করি পুনর্জন্মলাভে অরুচি হবে না, বরং নানা ছন্দের ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে বারবার ফিরে-আসার ইচ্ছেটাই প্রবল হয়ে উঠবে।

জীবনের জয়

ছায়া দেবী

কবরের বুকে ফুটিয়াছে ফুল তুমি জাননা তো
সে কী অতুলন ?
বুঝি মরণের শেষে জীবনের জয় হলো তাই
শুধু অনুমান !
গোধূলির আলো চাঁদে কি মিলালো, আঁধারের সেই
নব পরিচয় ?
কবরানো ফুলের আনালো সুবাস, চামেলি চাঁদের
মধু পরিণয় !
উষার নলিনী কাঁদিয়া বলেনি, প্রদোষেতে হয় কার
অবসান ?
রাতের কুমুদী জাগিলে তখন, করে তারে সুখে হাসি
সব দান।
জীবন বেলার মধুর মেলায়, কত রঙীনের
শত অভিলাষ !
পাষাণের গায় সব টুটে যায়, হায় বিধাতার কোন
পরিহাস ?
কাঁটায় জড়ানো রুধিরের ফুলে, চায় সে তাহারে দিতে
উপহার।
মরুতে জনম যাহার সে কিরে আনে কভু মিছে মায়া
উপচার ?
বিরহের ডোরে গাঁথা মিলনের ফুলে রচি প্রেম আজি
ক্ষণিকার,
নিশীথ গগনে লুকানো তারার আলো জ্বলে স্মৃতি তবু
কণিকার !
কাহার আশায় তৃষিত প্রাণেতে রচিলে কামনা
হে রূপাভিসারী ?
প্রকৃতির মায়া নবি হয় ছায়া, চকিতে মিলায়
সে ছবি যে তারি !
কবরের বুকে যে বেদনা জাগে স্মৃতি বহি, চুমি নব
মাধুরিমা—
অজানা আবেশে সেই তো ফোটায় মরমে গোলাপ
রঙ অরুণিমা !

।।। অসম্পূর্ণ ।।।

প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনো দেখা যাচ্ছে ওদের। বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু খানিক বাদেই ওই বাঁকটা পেরোলেই ওরা হারিয়ে যাবে। চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাবে, শুধু কিছুক্ষণের জন্যে পথের বুকে ওদের পায়ের কতকগুলো ছাপ আকাশের দিকে চেয়ে উদাস ভাবে শুয়ে থাকবে, তারপর, কয়েক ঘণ্টা পরে ওই ছাপ গুলোর বুকে পা ফেলে সবাই চলে আসবে, আসবে না শুধু একজন। না, কোনোদিনই সে আসবেনা।···কিন্তু আসবেনা তো ওই একজনই তবু মনে হচ্ছে যেন, ওরা কেউই আর ফিরে আসবেনা।

কাঁচা বাঁশের খাটটায় শুয়ে আছে সে। দেহটা যেন অসাড় হয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। যুগের সমস্ত শ্রান্তি যেন নেমে এসেছে ওই একটি মাত্র দেহের ওপর তাই আজ সে আরাম করছে একটু। কাঁচা বাঁশের খাটের সাথে বাঁধা দেহটা যেন উঠে আসতে চায়। উঠে এসে দাঁড়াতে চায় নগেনের পাশে। কিন্তু ওই লোকগুলো বড় নির্মম, ইস্পাত দিয়ে যেন তৈরী ওদের বুক। ওরা কিছুতেই ওদের দু'জনকে আর এক হ'তে দেবেনা।

বলহরি···হরিবোল। উঃ! কী নির্মম শোনাচ্ছে ধ্বনিগুলি। ওই লোকগুলির সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি যেন নগেনের বুকের পাঁজর গুড়িয়ে দিচ্ছে, হৃৎপিণ্ডের ভেতরে যেন সমানে নির্দয়ভাবে হাতুড়ির আঘাত করছে।

দাওয়ায় বসে পেছনের দিকে চাইলো নগেন। রান্না-ঘরটা পতিপরিত্যক্তা কোনো নারীর ম্লান মুখের মতো দেখাচ্ছে। এবার আর কারো হাতের চুড়ি বাসনের বুকে ধাক্কা খেয়ে ঝন ঝন করে উঠবেনা, কারো হাঁচার শব্দ এ ঘরের বাতাসে প্রতিধ্বনিত হ'বেনা···আরো এ রকম অনেক কিছুই হবেনা কিন্তু তবুও নগেন বেঁচে থাকবে। তারপর নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মতো কিছু কাল কাটিয়ে সে ফিরে যাবে তার কাছে। তার-পর আর কিছুতেই তারা আলাদা হবেনা। অভিন্ন হৃদয়ের দু'টি তারা হয়ে পাশা-পাশি ভাবে আকাশের বুকে জেগে থাকবে। রান্নাঘরের দরজাটা খোলা। বাসনপত্তরগুলো ঠিক তেমন করেই গুছানো রয়েছে। যেন কোনো শিল্পী নিখুঁত ভাবে কোনো ছবি এঁকে গেছে। চুলোটা যেন ম্লান চোখে নগেনের দিকে চেয়ে আছে। একজনের মাত্র অভাবে সারাটা ঘর, সারাটা উঠোন যেন শ্মশান হয়ে গেছে।

বলহরি···হরিবোল·· বলহরি···। শব্দগুলি বাতাসের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে নগেনের কানে এসে ধাক্কা খাচ্ছে। কানের পর্দা যেন কাটিয়ে দিতে চায় ওই নির্মম শব্দগুলি।

অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নগেন। চোখের পলক পড়ছেনা। তারপর কতকগুলো এলোমেলো জল এসে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করে দিল। শ্রাবণের আকাশ-খসা সমস্ত জলই যেন নগেনের চোখে এসে এসে ভীড় করেছে। সেই জলের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ব্যথার প্রলেপ দিয়ে মাখা একটা ক্লান্ত দীর্ঘনিশ্বাস অজান্তেই নগেনের বুকের সমস্ত পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে এলো !!!

• • • •

বোশেখের এক ক্লান্ত দুপুরে ক্ষেত থেকে বাড়ীতে খেতে ফিরছিল নগেন। অসহ্য গরম। জিভ শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে। তেষ্টা পেয়েছে ভীষণ। একটু জলের আশায় দৃষ্টি প্রসারিত করল নগেন। বটের ছায়ায় বসে কুয়ো থেকে খানিকটা জল খেয়ে নেবে। দেহের রক্তও যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কুয়োর দিকে এগিয়ে গেল নগেন।

পুষ্প বসেছিল কুয়োর পাড়ে। নগেনকে এদিকে এগুতে দেখে একটু চমকে উঠল। দূর থেকে বহুবারই সে নগেনকে দেখেছে কিন্তু এত কাছ থেকে এ-ই প্রথম।

কুয়োর ধারে এসে থামলো নগেন। তারপর মাথা

থেকে গামছাটা খুলে মুখের ঘাম মুছে পুষ্পর দিকে মুখতুলে চাইল। লজ্জা পেলে পুষ্প। গাল দুটো জবা ফুলের মতোই লাল হয়ে উঠলো।

—একটু জল খাই ?

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলো পুষ্প। পরপুরুষের সাথে সে বড় একটা কথা বলেনা। তবুও বুকের জোর মুখে এনে বললো—কুয়ো কী আমার বাপের যে আমার অনুমতি ছাড়া জল খাবেন ?

একটু হাসলো নগেন। তারপর পুষ্পর মুখে একটা ব্যঙ্গ দৃষ্টি মেলে বলল—কিন্তু তোর বাপ তো গাঁয়ের মোড়ল আর তুই মোড়লের বেটি।

—হুঁ। আর তুই ও তো গাঁয়ের সব চেয়ে বড় পালোয়ান।

আত্মপ্রশংসা শুনে বেশ একটু গর্ব অনুভব করলো নগেন। তারপর ঠোঁটের ভাজে হাসি টেনে বলল—তা হ'লে দে তোর বালতিটা, জল টেনে তুলি।

—কেন মাঠা খা-না ?

—মাঠা ? নগেনের কণ্ঠে আশ্চর্য।

—হ্যাঁ। মুচকি হাসলো জবা।

—মাঠা কোথায় ?

—সাথেই আছে। ক্ষেতে খাবার নিয়ে যাচ্ছি যে। পাশে রাখা পোটলাটা খুলতে খুলতে পুষ্প বললো।

—কিন্তু আমার জন্যে তো আর নিয়ে আসিসনি। অন্যের ভাগেরটা খেয়ে শুধু শুধু পাপ কুড়োই কেন ? একটু হাসলো নগেন।

—তোর জন্যেই মাপা ছিল বোধ হয়, পুষ্পর ঠোঁটে দুষ্টু হাসি।

—মাপামাপি জানিনা। জলই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

বড় একটা পিতলের গেলাসে মাঠা ঢেলে পুষ্প বললো—নে, তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল, নয়তো পেতল উঠবে।

—যে তা হ'লে। নগেন আর অসম্মতি প্রকাশ করলনা।

মুচকি হাসছে পুষ্প, বড্ড দুষ্টু সে হাসি।

—কে তৈরী করেছে মাঠা ? এক নিঃশ্বাসে সমস্তটা নিঃশেষ করে নগেন জিগ্যেস করলো।

—আমি। পুষ্পর কণ্ঠের স্বর লাজুক।

—বড্ড চমৎকার তো তোর হাত। এমন ভাবে খাওয়ালে রোজই আসবো তোর কাছে। বল খাওয়াবি ? নগেনের সুরে হাসির রেশ।

কোনো উত্তর দিলনা পুষ্প। তাড়াতাড়ি পোটলাটা বেঁধে নগেনের দিকে বাঁকা ভাবে একবার চেয়ে ক্ষেতের দিকে এগিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে দেখলো নগেন। ওর চলার ভঙ্গীটা অপূর্ব। একটা হালকা দেহ যেন হাওয়ায় নেচে নেচে এগিয়ে যাচ্ছে।

কতক্ষণ ওই একভাবে বসেছিল কে জানে! সেবে চমক ভাঙ্গলো পুষ্পর ডাকে—এখনো বসে-বসে গাছের পাতা গুনছিস দেখছি।

—এ্যাঁ! বড্ড লজ্জা পেল নগেন। সত্যি কী যা-তা ভাবছিল এতক্ষণ বসে। কোনোমতে নিজেকে সংযত করে বলল—এইবার যাচ্ছি। তারপর বাতাসের বেগে পা চালিয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিকেলে মোড়লের বাড়ীর সামনে এসে হাঁক দিল—বাড়ী আছো নাকি সামন্ত ?

—এসো ভাই এসো। সামন্ত নিজে এসে ওকে দাওয়ায় নিয়ে বসালো।—তারপর কী মনে করে ?

যাঃ রে! তুমি মোড়ল, আর তোমার বাড়ী আসতে কিনা মন তৈরী করে আসতে হ'বে।

—না সে কথা বলছি না। মুচকি হেসে মোড়ল বললো—গাঁয়ের ভাবী মোড়ল তো তুমিই। তোমার আবার কী অসুবিধে ?

—অসুবিধে ছাড়া আসতে নেই বুঝি ?

—একশো বার আসতে আছে। মোড়লের স্বরে দাপটের ভাব।

প্রসঙ্গ পাল্টে নিল নগেন—তোমার বাড়ীর মাঠা'র স্বাদ সত্যিই অপূর্ব। আজ দুপুরে ক্ষেত থেকে যখন খেতে ফিরছিলাম তখন ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল তাই কুয়োর ধারে গিয়েছিলাম একটু জলের আশায় কিন্তু তোমার মেয়ে আমাকে জল খেতে দিলনা, জোর করে মাঠা খাইয়ে তবে ছাড়ল। খেয়েছি সেই দুপুরে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এই-মাত্র খেয়ে এলাম। সত্যি অপূর্ব তোমার বাড়ীর মাঠা।

বেশ কিছুক্ষণ আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলো সামন্ত, তারপর নগেনের মুখের দিকে চেয়ে নিজের সম্পত্তির একটা ফিরিস্তি দিয়ে বললো—চাষ্টে গাই পালছি। দুটো পাকাবী, একটা পাটনাই আর শেষেরটা দেশী। কথাগুলো এমন ভাবে সামন্ত উচ্চারণ করলো যেন শেষের দেশী গাইটা ছাড়া বাকী তিনটি কে বিলেত থেকে কিনে এনেছে।

—তা, ভালই তো; গাই পালা মহা পুণ্যের কাজ।

—হুঁ পুণ্য! ও শব্দটা এখন শুধু কেতাবের পাতায়ই লেখা আছে। আজ আর ধর্ম কর্ম কই বাপু? সবাই নাস্তের হয়ে গেছে একেবারে। পুজো নেই, আর্চা নেই, একটু যজ্ঞ অবধি আজ আর কেউ করে না। সারা দেশটা তাই রসাতলে যাচ্ছে। সামন্তর কথা ভেদকরে তার রাগ প্রকাশ পেল।

—হুঁ। তা, তুমি তাহ'লে বেশ পুণ্যাই করছো! নগেনের সুরে ব্যঙ্গের ভাব।

একটু গর্বিত হাসি হেসে সামন্ত বললো—তুমি ঠিক

ধরতে পেরেছ বাছা, আজ আর এ সব বোঝে কে? একটু পুরো-আর্চা করি বলে অনেকে পেছন থেকে বিদ্রূপ করতেও পিছপা হয়না।

—আর যদি ধর্মের কথা বাদও দাও তাহ'লেও লাভ আছে সামন্ত। অন্ততঃ খাঁটী দুধ, ঘি-টা তো পাচ্ছো।

—যা বলেছো ভায়া। আজকাল মানুষ অবধি ভেজাল হয়ে গেছে। জিনিষের কী দাম, তার ওপর ভেজালতো আছেই। চোখ ছোড়া কপালে ঠেকিয়ে অপূর্ব ভঙ্গীতে সামন্ত কথাগুলি উচ্চারণ করলো।

—আর খাঁটী হওয়ার তোমার বাড়ীর মাঠার স্বাদই অপূর্ব। নগেন আবার মাঠার কথা স্মরণ করালো।

—তা খাবে নাকি একটু? নগেনের মনের কথা ঠিক ঠিক বুঝে নিল সামন্ত।

—না মানে···

নগেনের বক্তব্য মাঝপথেই থামিয়ে সামন্ত বললো—কী যে হয়েছে তোমরা। দু'দিনের ছেলে কিন্তু খাবার কথা নিয়ে জামাইর মতো না—না—না। তোমাদের মতো বয়সে আমরা যা খেতাম, কী আর বলবো। একটা লম্বা কিরিস্তি শুনিয়ে মোড়ল পেছনের দিকে মাথা ঘুরিয়ে হাঁক-দিল—এক গেলাস মাঠা নিয়ে আয় মা।

একটু বাদেই বড় এক গ্লাসে মাঠা নিয়ে পুষ্প এসে সামনে দাঁড়ালো।

সামন্ত মেয়ের তারিফ করে বললো—ও'ই নিজের হাতে করে সমস্ত মাঠা।

জেনেও না জানার ভানকরে ব্যঙ্গের সুরে নগেন বললো—তাই নাকি? তাই বুঝি এত স্বাদ।

ভীষণ লজ্জা পেল পুষ্প। গাল দু'টো আপেলের মত লাল হয়ে উঠলো। মাঠার গেলাসটা তাড়াতাড়ি দাওয়ার রেখে ছুটে পালিয়ে গেল।

—ভীষণ লাজুক মেয়ে। মোড়ল মেয়ের গুণাগুণ বর্ণনা করলো—তবে কাজের আছে খুব। জানোই তো ওর মা নেই, তাই ঘর গেরস্তির সমস্ত কাজই ওকে করতে হয়।

গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে নগেন বললো—ভালই তো। আজকাল মেয়েরা আর কাজ করতে চায় কই? চায় কেবল শহরে মেয়েদের মতো সেজে গুজে বসে থাকতে। আর সেখানে তোমার মেয়ে সমস্ত কাজ করছে এ নিশ্চয়ই আনন্দের কথা।

নানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে অনেকক্ষণ সময় কাটলো। শেষে রাতের খাওয়া খেয়ে তবে নগেন নিজের ঘরের কথা স্মরণ করলো।

পরের দিনও ক্ষেত থেকে দুপুরে ফেরার সময় নগেন কুয়োতলায় হাজির হলো।—যে দেখি তোর মাঠা। বড্ড ভেটা পেয়েছে। কোনো রকম ভূমিকা ছাড়াই নগেন বললো।

একটা আগুন ধরানো ভুবড়ির মতো জ্বলে উঠলো পুষ্প—নবাব পুত্তুর নাকি? মাঠা ছাড়া চলেনা! পারলে জল খাও, নইলে দূর হও এখান থেকে।

থতমত খেয়ে অপ্রস্তুত কণ্ঠে নগেন বললো—আহা, আমার উপর এ তো চটছিস কেন?

চটবোনা? কাল বাবার সামনে আমাকে ঠাট্টা করতে খুব ভাল লাগছিল, তাই না? গর্জে উঠলো পুষ্প।

—দূর পাগলি। একগাল হাসি ছেড়ে নগেন বললো—ঠাট্টা তো তাকেই লোকে করে যে নাকি আপন।

কথাটার অর্থ বুঝলো পুষ্প, বললো ধোৎ।

—দে শিগ্‌গীর তোর মাঠা। আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

—আর যা তা বলবেনা তো? মাঠা ভরা গেলাসটা সামনে এগিয়ে পুষ্প বললো।

কোনো উত্তর দিলনা নগেন। এক চুমুকে গেলাসটা নিঃশেষ করে পুষ্পর মুখের দিকে একটা কৃতজ্ঞতা সূচক দৃষ্টি মেলে ধরলো।

মাস খানেক পরে মোড়ল নগেনকে ডেকে পাঠালো। সন্ধ্যের দিকে নগেন হাজির হলো সেখানে। আজ যেন একটু খাতির-টাতির বেশীই হচ্ছে। কেমন যেন একটা নতুন আত্মীয়তার ভাব সবার মুখে।

ঘরের মেঝেতে একটা পাটি পেতে নগেনকে নিয়ে সামন্ত বসলো। তারপর অনেকক্ষণ চুপ থেকে নগেনের দিকে চেয়ে বললো—একটা কথা তোমাকে অনেক দিন থেকে বলবো বলবো ভাবছি।

—তা অতো ভাবা ভাবির কী আছে। বললেই হয়। আমি তোমার বেটার মতো।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। মানে কথাটা হ'লো পুষ্পর ভার তোমাকেই নিতে হবে বাবা। সামন্তর কণ্ঠে অনুনয়ের সুর।

—কিন্তু আমার আছে কী? মা, বাপ, ভাই, বোন চতুঃসমানার কেউই তো নেই, তাছাড়া ধন সম্পত্তিও তেমন কিছু তো নেই···

অর্ধসমাপ্ত কথাটা নগেনের মুখ থেকে লুফে নিয়ে সামন্ত বললে—তোমার সবই আছে বাবা। একটাই তো মেয়ে আমার, তাই, এ বাড়ী-ঘর যা কিছু সবই তোমার। তুমি আপত্তি কোরোনা বাবা। সামন্তর সুর অস্বাভাবিক নরম।

দিন কতক পর ওদের বিয়ে হ'ল। পুষ্প খুব খুশী। এমন সুন্দর রূপবান গুণবান স্বামী ক'জনের ভাগ্যে জোটে? তা ছাড়া গাঁয়ের সবাই নগেনকে যেন তোয়াক্কা করেই চলে। এমন পুরুষের সঙ্গিনী হ'তে পেরে জবা মনে মনে যেন খানিকটা গর্ব অনুভব করলো। নগেনও খুব খুশী পুষ্পকে পেয়ে।

বিয়ের দিনকতক পর দুপুরে খেতে এসে খাওয়ার বসলো নগেন। মাথার গামছাটা খুলে ঘাম মুছে পুষ্পর উদ্দেশে বললো—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল—

—কেন? মাঠা আনি? কিক্ করে হাসলো পুষ্প।

—আন যা তোর ইচ্ছে।

চট করে দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো পুষ্প। তাড়াতাড়ি মাঠা তৈরী করে একটা গেলাসে ঢেলে নিয়ে নগেনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

—ঠিক বিয়ের আগে যেমন তৈরী করতিস তেমনি করেছিস তো?

—কোনো উত্তর দিল না পুষ্প। লজ্জায় গালদুটো রাঙিয়ে উঠলো।

—চল। ভাত খাবি।

—ভাত তো রোজই খাওয়া আছে। কিন্তু তোর এ রূপ তো আর রোজ বসে থাকছে না।

পুষ্প নগেনের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি মেলে ধরলো।

—বুঝলি না কথার অর্থ? তোর ওই লাল গাল দুটো দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। শেষের কথাটাকে টেনে টেনে বলল নগেন।

—ধ্যেৎ! অসভ্য!

—বাঃ রে! এতে অসভ্যতার কী আছে।

—আচ্ছা চল খেতে।

ওরা গিয়ে খেতে বসলো। কথায় কথায় অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। নগেনের কোনো হুসই নেই। শেষে যখন খেয়াল হ'ল, তাড়াতাড়ি মুখে জলের ছোঁয়া লাগিয়ে ক্ষেতের দিকে তাড়াতাড়ি পা চালালো নগেন।

যাবার সময় গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে গেল—আমার ফিরতে একটু রাত হবে। তুই খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়িস।

জরুরী একটা কাজে একটু শহরে গিয়েছিল নগেন। ফিরতে বেশ রাত হ'লো। এগারোটা বেজে গেছে, কিন্তু পুষ্প এখনো রান্না ঘরে কুপির ধারে বসে ঝিমুচ্ছে।

—পুষ্প—উঠোনে এসে নগেন ডাক দিল।

চমকে উঠলো পুষ্প। ঘুম জড়ানো চোখে উঠোনের দিকে তাকালো।

—আমি এসেছি পুষ্প।

পুষ্প এসে নগেনের বুকের কাছে দাঁড়ালো।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে পুষ্পর মুখের দিকে একটা মৌন দৃষ্টি মেলে নগেন বললো—তুই এত রাত অবধি জেগে আছিস পুষ্প।

—তুই সারাদিন রোদে পুড়ে জলে ভিজে রক্ত জল করলি, আর আমি কিনা আরাম করে শুয়ে ঘুমাবো? পুষ্পর কণ্ঠে অভিমান।

কথাটা শুনে নগেনের বুক ফুলে উঠলো। তা হলে সে একা নয়। তার পিছনে দাঁড়াবার মতো কেউ আছে তাহলে এ পৃথিবীতে।

নগেনের চাউনিতে যেন আনন্দ উছলে পড়ছে। পুষ্পকে বুকে টেনে বললে—তুই আমাকে কত ভালবাসিস পুষ্প?

প্রশ্নটা বড় কঠিন। পুষ্পর মতো নিরক্ষরা মেয়ে এ প্রশ্নের কীই বা জবাব দেবে! তবুও নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—আকাশে যত তারা তত।

বুকের আরো ঘনিষ্ট করে পুষ্পর দিকে চেয়ে নগেন বললো—আজ আমার কত আনন্দ হচ্ছে জানিস জবা, না··· না তা আমি বলতে পারবো না।

একটু হাসলো শুধু। তারপর নগেনের হাতে ঝোলানো থলেটার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বলল—কী আছে এতে?

—আরে? আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। দেখ তোর জন্যে কত সুন্দর একটা জিনিষ এনেছি। থলে থেকে একটা প্যাকেট বের করে পুষ্পর হাতে তুলে দিয়ে নগেন বললো।

মুহূর্তের মধ্যে মোড়কটা ছিঁড়ে ফেলল পুষ্প। চোখ দুটো ওর যেন খুশীতে ঝলমল করে উঠল—বাঃ! কী সুন্দর সাড়ী।

হ্যাঁ। শহরের মেয়েরা বউরা খুব পড়ছে আজকাল। আমি তাই আমার পুষ্পর জন্যে একখানা নিয়ে এলাম। কেমন, পছন্দ তো?

—খুব।···কিন্তু তুই নিজের জন্যে কি এনেছিস?

নগেনের মুখে কোন উত্তর নেই। শেষে অনেক কষ্টে একটা বানানো উত্তর খুঁজে পেল নগেন—বাঃ রে, আমার জন্যে কিছু আনতে বলেছিলি তুই?

আমি কী জানতাম যে·····

পুষ্পর মুখের কথা লুফে নিল নগেন বলল ঠিক আছে। আবার যখন শহরে যাবো তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। আমার জন্যে কিনিস তোর যা ইচ্ছা। একদম মানা করবো না।

—সত্যি? পুষ্পর কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

—হ্যাঁ। আচ্ছা, একটা কথা বলবি?

—বল্?

—আজের এ আনন্দের কথা মনে করে আমি তোকে কিছু দিতে চাই। কী চাই তোর?

—আমার কিছুরই অভাব নেই। সবই তো আছে। তুই-ই আমার সব।

—না তবুও বল।

—যেন সিঁথির সিঁদুর নিয়ে মরতে পারি।

—দূর পাগলি। তুই আমার আগে মরবি কেন? একসাথেই মরবো দু'জনে। তোকে ছাড়া আমি বাঁচবো কী করে?

কথার আর শেষ নেই। সারারাত অনেক কথা বললো ওরা। সকালবেলা উঠে ক্ষেতে যাবার সময় নগেন বলে গেল—আজ নতুন সাড়ীটা পরিস। দুপুরে এসে যেন তোকে ওই সাড়ীটা পরা দেখি।

পুষ্প কোন উত্তর দিলনা। স্বামীকে এগোতে দরজা অবধি এলো শুধু।

দুপুরে খেতে এলো নগেন। আজ পুষ্প আগে থেকেই মাঠা তৈরী করে রেখেছে। দাওয়ায় এসে বসতেই মাঠার গেলাসটা এগিয়ে দিল।

—কী? মাঠা?

—হ্যাঁ।

—সত্যি পুষ্প তোর হাতের মাঠার স্বাদ আমি মরলেও ভুলবোনা।

—বালাই। মরবি কেন?

—তোর মনে আছে পুষ্প?

—কী?

—সেই প্রথম দিন যে আমাকে মাঠা খাইয়েছিলি!

—হ্যাঁ।

আর পরের দিন আমাকে ধমক দিয়েছিলি।

লজ্জা পেল পুষ্প। কোনো উত্তর দিলনা।

—তোর সেই প্রথম দিনের মাঠার স্বাদটা যেন আরো ভালো ছিল।

—এখন বুঝি খারাপ হয়ে গেছে? পুষ্প প্রশ্ন করল।

—তা হয়নি—কোনদিন হবেও না। তুই যেমন আমার কাছে সব সময়ে নূতন থাকবি তেমনি তোর মাঠাও।

হাসল পুষ্প।

তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে ক্ষেতের পথে পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়ালো নগেন। এ কি পুষ্প সাড়ীটা পরিসনি তুই। পছন্দ হয়নি? তাহ'লে দিস, ফেরৎ দিয়ে আসবো। নগেনের কণ্ঠে উদাস ভাব। অভিমানের সুর।

—আজ নয়। মুচকি হাসলো পুষ্প। যেদিন তোর আরো বিশ বিঘে মাটি আর পাঁচ জোড়া বলদ হবে তখন পরবো সে সাড়ী।

—দূর পাগলী। তখন দেখিস তোর জন্যে আমি কী নিয়ে আসি। আরো অনেক দামী কোনো জিনিষ। আজ বিকেলে পরে থাকিস, আমি এসে দেখবো।

উত্তর না দিয়ে পুষ্প মুচকি হাসলো শুধু।

• • •

মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যবধানেই পুষ্প রাগ করে চলে গেল। সত্যিই সিঁথিতে সিঁদুর নিয়েই সে গেল, শুধু রেখে গেল ব্যথার প্রলেপ দেয়া এক বোবা স্মৃতি। সারাটা ঘর, সারাটা উঠোন, খালি হয়ে গেছে—যেন শ্মশান হয়ে গেছে।

এখন আর শববাহকদের দেখা যাচ্ছে না। বাঁকটা পেরিয়ে গেল ওরা এই মাত্র। শুধু ওই নির্মম ধ্বনিটা তীরের ফলার মতো এখনো ছুটে আসছে…বলো হরি…হরি বোল…।

অনুভব

অমিতাভ বসু

আজ তোমাকে খুব মনে পড়ছে
মনে পড়ছে তোমার রেশমী চুল
নীল শাদ ফুল খোঁজা।
কপালের টিপ
গোলাপী শরীর—
ভালিম লালিম ঠোঁটে হাসিটির ছোঁয়া।
আজ তোমাকে খুব মনে পড়ছে
মনে পড়ছে তোমার পাখীর নীড়ের মত চোখ
স্বপ্নের ছাওয়া দিয়ে ঘেরা;
মরাল গ্রীবার সেই নিটোল গড়ন
সরমে নরম মুখ, চপল চরণ
কতদিন একসাথে বহু পথ চলা।
আজ তোমাকে খুব মনে পড়ছে
মনে পড়ছে তুমি শেষ বিদায় নিয়ে গেছ,
জানি তোমার পরিচয় আজ বদল হয়ে গেছে
তবু মনে হচ্ছে তুমি আমার সেই আছো।

সুন্দরনগরের ইতিকথা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ করণ, এম-এ

সর্পিল গতিতে অচেনা পথটি পল্লীর ভেতরে চলে গেছে। দু'ধারে শুধু বন আর বড় বড় বাঁশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট পুকুর কচুরিপানায় ভরতি। অবশ্য পুকুর না ব'লে এঁদো ডোবা বললে ঠিক বলা হয়। মেঠো পথ—কোথাও কোথাও এঁটেল মাটি বালি-মেশানো। বর্ষার জল আশ্রয় নেয় ঐ সব ডোবার বুকে। অন্যমনে চলতে পা হঠাৎ ধরাশায়ী হবার ষোলআনা সম্ভাবনা, তা না হলে একেবারে ডোবায় অবগাহন স্নান। পথের দু'ধারে বড় বড় শ'ড়ো ভিটে, দালান, কোঠাবাড়ির ভগ্নাবশেষ। জীর্ণ বাড়িগুলো কোন্ সুদূরের দিকে তাকিয়ে বলছে: 'আমার নগ্নতা আর জীর্ণতা দেখে তোমরা বিদ্রূপ করছ। কিন্তু আজকের যা নতুন তা আমারই ধ্বংসাবশেষের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমার দিন গেছে, তোমাদের সময় এসেছে। তাই একদিন তোমরা নিজেদের দর্পে নিজেরই সমাধি রচনা করবে।'

চলতে চলতে একটু ভেতরে প্রবেশ করলাম। চারিদিকে জঙ্গল—পায়ে চলবার মত একটি রাস্তা চ'লে গেছে। রাস্তাপথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম দেবমন্দির—তার পাশে এক ফালি ফাঁকা জায়গা। একপাশে একটি পুকুর—অনাদরে পূর্বের শ্রী নষ্ট হয়ে গেছে। বিরাট কোঠাবাড়ি—ভগ্নাবশেষই শুধু দাঁড়িয়ে আছে অতীতের স্মৃতি বহন ক'রে। জীর্ণ বাড়িটাকে কেন্দ্র করে বিরাট বিরাট অশ্বত্থ আর বটবৃক্ষ আকাশের দিকে মাথা তুলে অট্টালিকাটির প্রাচীন ঐতিহ্যকে ব্যঙ্গ করছে। উঠোনটাকে ঘুনো ঘাসে ছেয়ে ফেলেছে, চারধারে ছোট ছোট তৃণগুল্ম পথচলারও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। বাড়িটার ভেতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলাম। কুতূহলী মন—কি আছে ঐ বাড়িটার অভ্যন্তরে। জানবার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। ভর-দুপুর, পথটা জনমানবহীন—পথচারীর দেখা মেলা দুষ্কর। দক্ষ যে-পথটা লোকালয়ের মধ্যে চ'লে গেছে তার রিক্ততা দেখে মনে মনে শিউরে উঠলাম। সামনে আর পেছনে যতদূর নজর যায় ভাল ক'রে চোখ বুলিয়ে নিলাম। আপন মনেই প্রশ্ন করলাম এ বাড়িটার পরিচয় কি? বাড়িটা কি মালিকহীন? অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনিতে শব্দতরঙ্গ ভেসে এল কানে: 'শোন নাই এ বাড়িটার ইতিকথা, আমাদের কাহিনী? এখানেই আজ হয়ে বন্দীশালার জীবন যাপন করছি, মুক্তির পথ এখনও দেখতে পাই নি। সেই সুদূর অতীতকাল থেকে ডুকরে ডুকরে কেঁদে বেড়াচ্ছি আর সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মুক্ত কর। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না।' গোটা শরীরটা থর থর ক'রে উঠল—একটা বিস্ময়ের শিহরণ বয়ে গেল। আতঙ্কে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। কখন যেন অজ্ঞাতসারে বাড়িটার দালানের ভেতরে পৌঁছে গিয়েছি। পেছন ফেরার শক্তিও লুপ্ত। দুপুরের খরতাপও যেন বাড়িটার অভ্যন্তরে ঢোকবার অনুমতি পাচ্ছে না। একটা থমথমে আবহাওয়া যেন বিরাজ করছিল। দু'চারটে চামচিকে অতর্কিতে পতপত করে উড়ে চ'লে গেল। একটা রোগা অনশনক্লিষ্ট বিড়াল মিউ মিউ ক'রে তার আগমনবার্তা ঘোষণা করল। কিছুক্ষণ পরেই প্রশ্ন এল—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে।

বিহ্বলের মত তাকিয়ে আছি। হঠাৎ বের হয়ে এল অবচেতন মন থেকে—'তাই তো। এসেছি স্মৃতির ভাণ্ডারে কিছু সঞ্চয় করবার জন্য।' প্রত্যুত্তর পেলাম অন্ধ বদ্ধগৃহের মধ্য থেকে—'এটাই প্রাচীন কাশীযোড়া রাজবংশের অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে—যাদের শৌর্যবীর্য,

জ্ঞানশক্তি ও বদান্যতার কীর্তি ইতিহাসের অতল সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

হঠাৎ জ্ঞানশক্তি পূর্বের মতই মনে হ'ল। স্মৃতিপটে ভেসে এল পুরাণো দিনের মেদিনীপুরের কথা। মেদিনীপুর শহরের পাথরের কেল্লা—যার উত্থান-পতনের কাহিনী আজও সঠিক লিপীত হয় নি। তবে মুঘল-রাজত্বের আমলের যে এটা একটি প্রধান সেনানিবাস ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কেশপুর থানার সামি রাজার গড় ও আড়া গড়, বিনপুরের রামগড়, লালগড় এবং শিলদার গড়বাড়ি, রসকমণ্ডো দুর্গ, নারায়ণগড় বা হাজোলগড় রাজভবন, পাঁটগড় প্রভৃতি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অনেকগুলি ঐতিহাসিক গড় ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ অতীত দিনের করুণ স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে। মনে পড়ল তাম্রলিপ্তের অতীত মহিমা। তাম্রলিপ্ত যে বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে শুধুই প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল তা নয়, বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের সময় (৪৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) এটা ছিল বৌদ্ধদের একটি প্রধান পীঠস্থান। খৃষ্টপূর্ব ৩০৭ অব্দে এখান থেকেই বৌদ্ধদের বোধিবৃক্ষ সিংহলে প্রেরণ করা হয়েছিল বলে বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশে' উল্লেখ আছে। স্মৃতিপটে উদিত হ'ল প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের তাম্রলিপ্ত ৪১১ ও ৪১২ খৃষ্টাব্দে বসবাসের কথা। মনে পড়ল খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষপাদে গজরাজ সিংহ নামে জনৈক রাজপুত বীরের 'বগড়ী' রাজ্য স্থাপনের কথা, আর চন্দ্রকেতুর 'চন্দ্রকোণা' স্থাপনের কীর্তিগাথা। রসুলপুর নদীর পূর্বতটে কশবা হিজলী গ্রামটি এর অনতিদীর্ঘ জীবনযাত্রার মুসলমান ও কোম্পানীর রাজত্বের সুখ-দুঃখের কাহিনী বহন করছে। হিজলীর উপকূল পর্তুগীজ ও মগ দস্যুদের অত্যাচারে অত্যাচারিত—তাদের অত্যাচারে হিজলী হয়েছিল জন-মানবশূন্য উপকূল।

স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ করণ কর্তৃক সংগৃহীত একটি প্রাচীন ফার্সী পাণ্ডুলিপি হিজলীর ইতিহাসের উপর যথেষ্ট আলোক-পাত করতে সক্ষম হয়েছে। মনে পড়ল, বাঙলাদেশের সমুদ্রমুখে প্রবেশের সিংহদ্বারে প্রধান বন্দর ও স্টেশন 'দেবুহির' কথা। যাদের অতীত গৌরবের শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে বিগত সুখ-সমৃদ্ধির কথা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়।

স্পষ্ট হয়ে চোখের উপর ভেসে উঠল পাঁশকুড়া থানার তমরাগ্রামে যামিনীদীঘি, ফকিরগঞ্জের জিতসাগর, চণ্ডীপুরের জোড়াপুকুর, প্রতাপপুরের অনন্ত বাসুদেব, রঘুনাথবাড়ির রঘুনাথজিউ, ভেড়িয়াচকের শ্রীশ্রীগোবর্ধনধারী ও জয়পাটনা গ্রামের জয়চণ্ডীর মন্দির।

কালের ইঙ্গিতে এগুলি ধীরে ধীরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান করে নিয়েছে। কত ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতনের ইতিহাস এদের কেন্দ্র করে কতই কীর্তিগাথা রচিত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃতি এক কূল ভাঙে, আর অপর কূল গড়ে। প্রকৃতিদেবীর খেয়ালে কোথাও সৃষ্টি অতলগহ্বরে প্রবেশ করছে, আবার কোথাও বিরাট জলরাশি হঠাৎ স্থলে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই বৈচিত্র্যের মাঝে মেদিনীপুর বিবিধ বৈচিত্র্যে ভরপুর হয়ে আছে। এর কোথাও নিবিড় অরণ্য-ঘেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণী, কোথাও-বা উষর রুক্ষময় রক্তবর্ণ কঠিন মৃত্তিকা—আবার অন্যদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র-সৈকত। কোথাও বা নদীর মোহনাজাত লবণাক্ত বালুকা-পূর্ণ ভূমি, আবার কোথাও নদীবিধৌত শস্যশ্যামল, কোমল সমতল প্রদেশ। তাইতো এই স্থান যুগে যুগে কালের সাক্ষ্য বহন ক'রে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদান প্রদানের এবং ভাবমিলন কেন্দ্ররূপে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে অধুনা-তম কাল পর্যন্ত এদের চিহ্ন ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথির পাতায়, ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড আর উৎকীর্ণ শিলা-লিপিতে, জীর্ণ মন্দিরগাত্রে ও পঙ্কপূর্ণ জলাশয়ে; কিন্তু তার আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু বেশির ভাগই প্রচ্ছন্ন আছে প্রত্নতত্ত্বের দুর্গম পথে আগামীকালের দুঃসাহসী অভিযাত্রীর গলে জয়মালা দানের শুভ প্রতীক্ষায়। এই মেদিনীপুরের বীর সন্তানগণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বারে বারে যুদ্ধ করেছে পররাজ্যলোভী, প্রবল প্রতাপশালী দুর্ধর্ষ রাজন্যবর্গের সাথে, অত্যাচারী মোগল ও পাঠান, জলদস্যু পর্তুগীজ ও মগ দস্যুর সাথে। সর্বশেষ সমাপ্তি হয়েছে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরবাসীর আত্মবলিদানের এবং পরাধীন ভারতে তাম্রলিপ্তের স্বাধীন জাতীয়-সরকার গঠনে।

এই পটভূমিকে ভিত্তি ক'রে মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত সুন্দরনগরের অতীত ইতিহাসকে আবিষ্কার করতে হবে। সাধারণত: মনে প্রশ্ন

জাগে—কেন 'সুন্দরবনগর' নামে কথিত হল? কেনই-বা সুদূর পল্লীর অভ্যন্তরে এই নগরের পত্তন করা হয়েছিল?

ইংরেজী ১৭৫৬ সাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক স্মরণীয় বৎসর। মুর্শিদাবাদের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ, মীরজাফরী চক্রান্তে পলাশীর রণক্ষেত্রে ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানির প্রতিভূ লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক নিহত হলেন। বাঙলার আকাশ-বাতাসে সে কি হাহাকার! সে কি এক করুণ দৃশ্য! এক ফোঁটা জলের জন্য তৃষ্ণার্ত নবাবের কি আকুতি-মিনতি। সেদিন যে রক্তের স্রোত পলাশীর প্রান্তরে বয়েছিল, আজও বাঙলার বুকের 'পরে তা বয়ে চলেছে। বেনিয়া কোম্পানি বাঙলাদেশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সেদিন সাহায্য নিয়েছিলেন যেসব বিভীষণদের। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব-নাজিম মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার অধিকার বেনিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দিলেন বটে কিন্তু তখনও মেদিনীপুরের সমস্তটা ওরা গ্রাস করতে সক্ষম হয় নি। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি সনদ পেল। এই সময়েই তাম্রলিপ্ত বেনিয়াদের শাসনে আসে কিন্তু এর পরেও কয়েক বছর তাম্রলিপ্তের সমগ্র অঞ্চলে ওদের শাসন কায়েম হয় নি। এরই মাঝে তাম্রলিপ্তের অন্তর্গত কাঁসাই-ঘোড়া রাজ্য অশাসিত অঞ্চল ব'লে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান ক'রে নিয়েছে। এই রাজ্যের রাজা তখন রাজা রাজনারায়ণ রায়। তাঁর এই রাজ্যের মাঝেই তিনি রাজবল্লভপুর প্রতিষ্ঠা করলেন। এরই একাংশে নির্মিত হ'ল রাজার বিরাট রাজপ্রাসাদ, খনন করা হ'ল চারধারে পরিখা—শত্রুমুক্ত করার জন্য। প্রতিষ্ঠা করলেন দেববিগ্রহ, মন্দির নির্মাণান্তে। চারিদিক হ'ল গড়বেষ্টিত। সুদূর পল্লীর বুকে প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠল। পল্লীবাসীরা আবার প্রাণে সম্বিৎ ফিরে পেল। কালের কুটিল পথে ওর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান।

তখন এই রাজবল্লভপুর গ্রামের পাশ দিয়েই কংসাবতী নদীর এক শাখা প্রবাহিত হ'ত। এই নদীর ওপর দিয়েই নৌকার মাধ্যমে যাতায়াতের পথ ছিল। সে নদী এখন মজে গেছে—ওর বুকে এখন চাষীরা ধান চাষ করে, পথিকেরা পথ চলে, গরমের দিনে গোরু-ছাগল চ'রে বেড়ায়। প্রকৃতির কি অপরূপ লীলা! সেই ব'য়ে যাওয়া নদীর 'পরে কোথাও কোথাও লোকালয় সৃষ্টি হয়েছে। এখনও এই নদীর বুক খনন করলে পুরাণো দিনের স্মৃতি-চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় মালবাহী নৌকা ও যানবাহনে ব্যবহৃত ছোট ছোট নৌকার ধ্বংসাবশেষও দেখতে পাওয়া যায়। প্রবাদ যে, সতী বেহুলা মৃত স্বামী লখীন্দরকে বুকে ধ'রে কলার ভেলায় ভেসে এই নদীর উপর দিয়েই গিয়েছিলেন। সরকারী কাগজপত্রে এই মজে যাওয়া নদীটি পুরাণো 'কাসাই বেড' ব'লে আখ্যায়িত।

তারপর অনেক দিন কেটে যায়। কালের গতি রাজা রাজনারায়ণের কীর্তিকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থায়ী ক'রে দেবার জন্য এক অলৌকিক ঘটনার সূচনা করে। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে হরিদাস বাবাজী নামে জনৈক ধর্মনারায়ণ সাধু সুদূর পশ্চিমাঞ্চল থেকে শ্রীশ্রীরঘুনাথ জিউর বিগ্রহ নিয়ে রাজবল্লভপুরে পদার্পণ করেন। পল্লীর অভ্যন্তরে এক নব-জাগরণ সৃষ্টি হয় এই বিগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে। দলে দলে ধর্মপরায়ণ হিন্দুগণ দেবদর্শন অভিলাষে এই গ্রামে আসতে থাকেন বহু সুদূরান্তর থেকে। তখনকার দিনে ছয় পায়ে-হাঁটা পথ, নচেৎ জলপথ। কিন্তু ধার্মিক ও ধর্মভীরু পল্লী-বাসিগণ মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে কণ্টকাকীর্ণ কণ্টকাকীর্ণ পথে অনন্তব পরিশ্রম ক'রে পায়ে হেঁটেই এই রাজবল্লভপুরে সমবেত হ'তে থাকেন। চারিদিকে ভিড় জমতে থাকে। লোকে লোকারণ্য। দোকানপাট, বাজার, বাড়িঘর ধীরে ধীরে এই গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠে। সাধুজীর অসাধারণ ক্রিয়াকলাপ মুগ্ধ করে সবাইকে। ধর্মীয় আলোড়ন প'ড়ে যায় গ্রামে গ্রামে। জনশ্রুতি যে, হাজারে হাজারে ভক্তগণ দূর দূরান্তর থেকে এসে এই স্থানটিকে তখন তীর্থে পরিণত ক'রে ফেলেন। এই সব কানে যায় রাজা রাজনারায়ণের। স্বয়ং রাজা বিগ্রহমূর্তি দর্শন ক'রে ও সাধুবাবার অলৌকিক কার্যকলাপ সন্দর্শন ক'রে অতীব প্রীত হন। তাই তিনি রাজবল্লভপুর গ্রামের কিয়দংশ দান করেন রঘুনাথজিউ বিগ্রহের নামে। এই অংশটিকে রঘুনাথবাড়ি নামে চিহ্নিত ক'রে মন্দির নির্মাণ-পূর্বক প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীশ্রী৺রঘুনাথজিউ বিগ্রহকে। সাধু হরিদাস বাবাজীকে অভিষিক্ত করেন ঐ মন্দিরের (পরবর্তিকালে মঠ) প্রথম মোহান্তপদে। স্বত্বদান করেন,

কয়েকটি মৌজার, দেবসেবার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য। এই গ্রামেরই কিছু দূরে মেড়িয়াচকে শ্রীশ্রীগোবর্ধন-ধারীর বিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করেন ধর্মপরায়ণ রাজা রাজ-নারায়ণ। তাই তো আজও এই অঞ্চলে রাজার নাম মুখে মুখে উচ্চারিত হয়—তাঁর দানশীলতা ও বদান্যতার কীর্তি ঘরে ঘরে গীত হয়।

রাজা রাজনারায়ণের পরলোকগমনের পর রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দর-নারায়ণ। তিনি ছিলেন স্বীয় নামের পূজারী। ভবিষ্যতের মসিকোঠার স্থায়ী আসন পাতার লোভে রাজবল্লভপুরকে আখ্যায়িত করা হ'ল সুন্দরনগর নামে। অবশ্য কেহ কেহ আবার বলেন সুন্দরনারায়ণ রাজা হবার পর নিজের জাতের ক্ষত্রিয় কিছু লোক ও অন্যান্য জাতের শিল্পীদের নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান ক'রে বসবাস করান। নানা জাতের শিল্পীর বসবাসহেতু বিভিন্ন ধরণের শিল্প গ'ড়ে ওঠে। ফলে এর নামকরণ হয় 'সুন্দরনগর'। অবশ্য সুন্দরনগরের পাশাপাশি গ্রাম বিখ্যাত 'মহলন্দ' শিল্পের উৎপত্তিস্থান ব'লে বহু পুস্তকাদিতে দেখতে পাওয়া যায়।

রাজা সুন্দরনারায়ণের রাজত্বকালে ইংরেজ সরকার জমি জরিপ আরম্ভ করেন মেদিনীপুর জেলায়। এই-সব অঞ্চলের ও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসিগণ জরিপাদি কার্যে বহাল শ্বেতাঙ্গ কর্মচারিগণকে বাধা দেন, কারণ তাঁরা ঐসব বিদেশীদের বিশ্বাস করতেন না। তাই বাধ্য হয়ে ঐসব কর্মচারী সিপাহী ও সৈন্য বেষ্টিত অবস্থায় জরিপ করতেন এবং ওদের সাহায্য নিয়ে চলা-ফেরা করতেন। কত বড় অসহায় অবস্থায় পড়লে ঐসব সাহায্য নিতে হয়। প্রশ্ন থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলা দেশের একাংশে একদল দেশপ্রেমিক ঐসব বিদেশী শ্বেতাঙ্গ শাসকদের ঘৃণা করতেন এবং স্বাধীনতা হরণকারীদের বিভিন্ন কার্যে বাধা দিতেন। তখনকার দিনে কাশীযোড়ার বহু প্রজা খাজনা না দিয়েই জমি-জায়গা ভোগ করতো। সকলের যে সনদ ছিল তা নয়, প্রয়োজনমত রাজারক্ষার কাজে বিনা বেতনে চাকরি করত ব'লে পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখল করত জমি-জায়গা অবশ্য খাজনা না দিয়েই। রাজা সুন্দরনারায়ণ রাজ্য শাসনের ব্যয়ের জন্য খাজনা চাইলে প্রজারা হ'ল একত্রিত, আর রুখে দাঁড়াল রাজার বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার রক্ষাকল্পে। সম্ভবতঃ ইংরেজরাজত্বের প্রারম্ভেই মেদিনীপুর জেলার কৃষক-প্রজা বিদ্রোহ। রাজার রেভেনিউ একপক্ষেই বাকি পড়তে লাগল। সুপ্রীম কোর্টের আদেশে সার্জেন্টসহ ষাটজন সিপাহী বন্দী করতে এল রাজা সুন্দরনারায়ণকে। কিন্তু রাজা বুদ্ধি ক'রে আগে থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাই অত্যাচারটা পড়ল নিরীহ কর্মচারীদেরই 'পরেই। ঐ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারিগণ চালালো বর্বরতার অভিযান ওদের উপরে। প্রহার ক'রে জখম করা হ'ল কর্মচারিগণকে। অন্দরমহলের ধরজা ভেঙে শ্লীলতাহানি করল মেয়েদের, লুঠ করল অস্থাবর সম্পত্তি ও গহনাপত্র, করল অপবিত্র দেবমন্দির ও খুলে নিল অলঙ্কারাদি দেবদেবীর গাত্র থেকে। রাজা সুন্দরনারায়ণ নালিশ করলেন তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস-এর কাছে ও প্রার্থনা করলেন সুবিচার ঐসব অত্যাচারের ভিত্তিতে দিয়ে। অভিযোগ করলেন রাজা যে, সিপাহীরা তাঁর রাজ্যের প্রজাদের প্ররোচনা দিয়েছে এবং নিষেধ করেছে খাজনা দিতে। প্রতিকূলতা করলেন লর্ড হেষ্টিংস সুপ্রীম কোর্টের কাজে। যার ফল হ'ল সুপ্রীম কোর্ট সমন জারি করলেন হেষ্টিংস-এর উপর। সমন অমান্য করলেন হেষ্টিংস।

উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন 'শাসন ক্ষমতানুসারে যে কাজ আমি করেছি তাতে সুপ্রীমকোর্টের আদেশ পালনে আমি বাধ্য নই।' বিলাতের পার্লামেন্টে এই নিয়ে আলোচনা হ'ল এবং সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা আইন ক'রে কিছু কমানো হ'ল। এর ফল এই হ'ল যে, বকেয়া খাজনার জন্য জমিদারগণকে জেলে দেওয়ার কঠোর ও ক্রূর প্রথার বিলোপ ঘটলো। প্রসঙ্গতঃ সুন্দরনারায়ণের সাহসিকতা তখনকার দিনে এক বিস্ময়। তাই তো 'কাশীযোড়া' বা 'সুন্দরনগর' বৃটিশ যুগারম্ভের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান ক'রে নিয়েছে।

আইন যারা কঠোরতা হ্রাস পেল বটে, কিন্তু নানা উপায়ে জমিদারদের জমিদারির আংশিক বা সামগ্রিক নিলাম, বাজেয়াপ্ত বা খাসদখল অবাধে চলতে লাগল। এই সর্বনাশা অত্যাচারের ফলেই সকলে সমবেত হ'ল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এবং ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্রই বিদ্রোহ-

বহি মেদিনীপুরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। ইতিহাসে এই সব বিদ্রোহকে আখ্যায়িত করা হয়েছে মেদিনীপুরের স্বাধীনতাপ্রিয় ও উৎপীড়িত প্রজাগণের বহ্নিস্ফুরণ। এইসব স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত, যাঁরা অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মৃত্যু-পণ করেছেন, বর্বরতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, যাঁরা জীবনমরণ তুচ্ছ ক'রে এইসব রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নিজেদের লিপ্ত করেছিলেন তাঁরা আমাদের নমস্য। তাঁরাই সত্যিকারের স্বাধীনতার পূজারী—তাঁরাই স্বাধীনচেতা। এইসব বিদ্রোহের সময় নিরীহ প্রজাগণের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন দেখলে আজকের সভ্য জগৎ শিউরে উঠত। এইসব বিদ্রোহ এরূপ ভয়াবহ ও বিধ্বংসী আকার ধারণ করেছিল যে, বেনিয়া ইংরেজ সরকারের পক্ষে ভূমিরাজস্ব আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সমস্ত জেলার পুলিস, দারোগা, শ্বেতাঙ্গগণ ভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত, দিশাহারা! তাদের জীবন বিপন্ন, শাসন পরিচালন ব্যর্থতায় পর্যবসিত—জেলা শাসক আমদানি করলেন বাহির থেকে কয়েক ব্যাটালিয়ন সৈন্য আপাততঃ পরিত্রাণের জন্য।

কাশীযোড়ার চারপাশেই অশান্তি আর বিক্ষোভ—প্রজারা মিলিটারি শক্তির সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত। রাজা সুন্দরনারায়ণ ও তাঁর আমাত্য দুলালচাঁদ এই বিক্ষোভ ও বিদ্রোহে জড়িত এই সন্দেহে ইংরেজ সরকারের রোষ-দৃষ্টিতে পড়লেন। তখনকার কালেক্টর সাহেব ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ৬০,০০০ টাকা রাজস্ব বাকির জন্য রাজার জমিদারি ক্রোক করলেন। তারপর থেকেই রাজবংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে লুপ্ত হ'ল। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়লেন রাজা। পর পর শ্রাবণ, ঝড়, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে দেশের জনসাধারণ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল—নেমে এল ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক অবনতি। তবুও কাশীযোড়া তথা সুন্দরনগরের প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রইল।

আহ্বান

শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তাবি নিশিদিন আমি তো স্বাধীন, স্বাধীন আমার দেশ
কথা বলিবার আছে অধিকার, একথা জানিতো বেশ।
যাহা সত্য তাহা বলিবারে তবে
মনে কেন মোর এত দ্বিধা হবে
হাসিবে কেহবা হয়তো বাহবা নয়তো করিবে দ্বেষ।
তবু বলে যাব জানিনা কি পাব বলার হবেনা শেষ।
যতদিন যায় দেখি শুধু হায় বেড়ে চলে হাহাকার
যে করে শোষণ সেই মহাজন আজকের দুনিয়ার।
অনাহারে যারা কেঁদে শুধু মরে
ভাবে না তো কেউ তাহাদের তরে।
বন্ধু মাজিয়া যে সব কাড়িয়া কে করে বিচার তার
তাহার শাসনে অসহায় মনে করে শুধু হাহাকার।

দিকে দিকে আজ শুনি যে আওয়াজ ক্ষুধার অন্ন চাই
ফেলিতেছে শ্বাস পরণের বাস বুঝিগো তাদের নাই।
সাধুতা বুঝিগো লোপ পেল হায়
অসাধু সংখ্যা শুধু বেড়ে যায়।
তাইতো আঁধার ঘেরে চারিধার কোথা আলো রোশনাই
ভরসা কে দেবে আঁখি মুছে দেবে নাই বুঝি কেহ নাই।
তুমি তো আসিলে অসত্য নাশিলে হরিলে তৃষার ব্রত
আজ তুমি কোথা হে মোর দেবতা ডাকি তোমা অবিরত।
অনাচার আর সহিতে না পারি
নেমে এস প্রভু পাপ-সংহারি।
মরুক ধ্বংস হউক ধ্বংস পাপ, অনাচার, ক্ষত
এস ধরাতলে যাক দূরে চলে আঁধার কালিমা যত।

সময় হয়নি

শ্রীকালাচাঁদ রায়

কাজ আর কাজ—আর পারছিনে বাবা! একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব তার উপায় নেই। বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। চেয়ারটায় বসে সিগারেটটা ধরাতে যাবো অমনি ছোটকাকীমা ডাকতে ডাকতে এসে হাজির হলেন। বললেন, আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি হাওয়া কাটলে।

কি আর করবো। বোকার মত ছোটকাকীমার মুখের দিকে নতুন আদেশের প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকলাম।

কোন রকম ভণিতা না করেই ছোটকাকীমা বললেন, হুকলে, তোমাকে নিয়ে একটু কালীবাড়ী যাবো ভাবছি। অবাক হয়ে বললাম, এইমাত্র যে আপনি বললেন, বেলাকে নিয়ে "জনতার" কাপড়ের দোকানে যেতে হবে?

ও—হ্যাঁ! আচ্ছা, তুমি না হয় আমার সঙ্গে ঘুরেই এস। পরে না হয় একবার বেলাকে নিয়ে যেয়ো, কেমন? আমি হ্যাঁ কিছু বলবার আগেই ছোটকাকীমা শয়ন-জারী করে চলে গেলেন। ভাবখানা এমন দেখালেন যে ওঁর সঙ্গে যাবার জন্ত আমি যেন তৈরী হয়ে নিই। ছোট-কাকীমাকে কালীবাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরলাম। বসতে না বসতেই আবার পূর্ববৎ মেয়েলী কণ্ঠ বেজে উঠল। ভাস্কর-পো, তুমি তো এখন আর কোথাও বেরোচ্ছোনা। তবে যাওনা, বেলাকে "জনতার" থেকে ঘুরিয়েই নিয়ে এস। মুখ ফুটে ছোটকাকীমাকে কিছু বলতে পারিনি। এবার অসহায়ভাবে একবার শুধু তাকালাম। একটা লাল পাড়ের শাড়ী পরে ডান হাতে কালীবাড়ীর চরণামৃতের ঘটিটা ধরে সসঙ্কোচে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন। আর উঁচু স্বরে মেয়েকে ডেকে দিচ্ছেন, বেলা—ও বেলা, ওই অরুণ ভাস্করপো তোর জন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে, যা তাড়াতাড়ি ঘুরে আয়।

অগত্যা কি আর করবো। বেলাকে নিয়েও "জনতার" থেকে ঘুরে আসতে হোল। বাড়ীতে ফিরে বসে বসে একটু খবরের কাগজটা দেখছি আবার আমার ছোট-কাকীমার গলার আওয়াজ পেলাম। মনে হোল, লুকাব নাকি কোথাও? এক্ষুনি এই রোদ্রে কোথায় যে পাঠাবেন তা ভগবানই জানেন।

ছোটকাকীমা এলেন। বললেন। আস্তে আস্তে পান চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, কি ভিড়টাই না হয়েছে কালীমন্দিরে! মনে হয় যেন মাছের বাজার বসেছে! ইচ্ছে হোল মুখ তুলে কিছু বলি। কিন্তু সাহস হোলনা। আবার ছোটকাকীমা বলতে শুরু করলেন, আজকাল সব তাতেই মানুষ একেবারে বিল্‌বিল্ করে। কি যে শোনে, কি যে বোঝে তারাই জানে। থামলেন ছোটকাকীমা। বাইরে যেয়ে পানের পিক্‌টা ফেলে এসে আবার বসতে বসতে বললেন, তা তোমাকে কিন্তু আর একটা কাজ করে দিতে হবে।

চমকে মাথা তুলে তাকালাম ছোটকাকীমার দিকে। উনি বেশ নির্বিকার ভাবেই বললেন, না ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি চার আনা পয়সা দেবে টক্ করে দু'টো ম্যাটিনী শো'র টিকিট এনে দেবে। শুনলাম বইটা নাকি ভালই হয়েছে। তাই ভাবলাম, দেখেই যাই এখান থেকে। আমাদের ওখানে কবে কখন যাব তার কি ঠিক আছে?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, হ্যাঁ তা ঠিক। আপনাদের ওখানে যেতে তো একটু দেরীই হবে। ছোটকাকীমা তখনকার মত আর কিছু বললেন না। ওখানেই নিস্তার দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ছোটকাকীমারা এখানে থাকেন না। থাকেন কৃষ্ণনগর। এখানে দিন কয়েক বেড়াতে এসেছেন। আর

পাকরাও করেছেন আমাকে। ওদের যাবতীয় ফরমাশ সব আমার দ্বারা চলছে। চক্ষু-লজ্জার খাতিরে না-ও করতে পারিনে। হাজার হলেও কাকীমা তো! যাক, যথাসময়ে ছোটকাকীমাদের সিনেমায় পৌঁছে দিয়ে ফিরছি হঠাৎ মনে পড়ে গেল যোগনাথের কথা। যোগনাথ আমার এক বন্ধুর দোকানে কাজ করে। সেই থেকেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ। ও অনেকদিন থেকেই আমাকে ধরেছে ওর মেয়েটাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার জন্যে। আজকাল তো সুপারিশ ছাড়া কোন কাজ চলেনা। তাই যোগনাথ আমাকে সকাতর অনুরোধ করেছে। এ ক'দিন মোটেই আমার সময় হয়নি। ছোটকাকীমার ব্যতিব্যস্তে বেশ খানিকটা হাঁপিয়ে বা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যোগনাথের কথা একটুও মনে ছিলনা আমার। হঠাৎ একা একা ফিরতেই মনে পড়ে গেল ওর কথা। ভেসে উঠল যোগনাথের মেয়ের রোগাক্রান্ত পাংশু মুখখানি। মনটা বেদনায় ভরে উঠল। নিজেকে কেমন যেন ছোট ছোট মনে হোল। গরীব একটা লোক কতদিন করুণ মিনতিভরা আবেদন জানিয়েছে। ওকে কালের অছিলায় সান্ত্বনা দিয়ে রেখেছি। আজ এই মুহূর্তে ওর কাজটা করে দিতে মনটা উন্মুখ হোল।

শোভাবাজারগামী একটা বাসে উঠে বসলাম। যোগনাথের বাসার কাছে এসে কেমন যেন একটু সঙ্কোচ ঘিরে ধরল আমায়। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। কড়াটা নাড়লাম।

অনেকক্ষণ পর খুট্ করে দরজাটা খুলে গেল। খুলে দিল যোগনাথ নিজেই। ওকে দেখে চমকে উঠলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি খবর যোগনাথ? মালতী কেমন আছে?

মালতী! সে আর নেই অরুণদা! অস্ফুটে চীৎকার করে দরজার কাছে মুখ ঢেকে বসে পড়ল যোগনাথ। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল কয়েকদিন আগের ছবিগুলো।

সেদিনও যোগনাথ বলেছিল আমাকে, আজকে অরুণদার সময় হবে?

এদিকে ছোটকাকীমা বলেছেন, চলনা ভাদুরপো, একটু চিড়িয়াখানা ঘুরে আসি। সেখানে নাকি এবারে দু'টো সাদা বাঘ এসেছে?

তাই সময় হয়নি!

সুন্দর

কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এক টুক্‌রো সাদা মেঘ ও একফালি চাঁদ
তারকা খচিত আকাশের বুকে রঙিন
স্বপ্নের জাল বোনে। সৃষ্টি রহস্যের মাঝে
যেন একখানা চকচকে আয়না।
মুগ্ধ মন। যেন সব হারিয়ে যাওয়ার
মাঝে একটু তৃপ্তি এগিয়ে আসে,—
আপনা হতেই ঝরণার গান বেজে ওঠে,
দেরি করা আর যেন যায়না।
নিবিড় অন্ধকারের বেদনার মধ্য থেকে
যে জ্যোতি উষসীর কোলে নেমে আসে,
চোখ মেলে তা দেখেছি।
একটা অবাক বেদনায়
মুহ্যমান পড়েছি;
এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু হয়না।
আজ আমি রিক্ত সব কোলাহলের—
বাইরে আমি।
ঘুম ভাঙা কাকর ছড়ানো পথের—
প্রান্তে বসে আছি।
আমার বুকে সুন্দরের সাধ
আর যেন বয়না।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোম্পানীর আমলে কলিকাতা শহরে সেকালে প্রতি বছরেই চৈত্র-সংক্রান্তি তিথিতে চড়ক আর গাজনের উৎসব উপলক্ষ্যে রীতিমত ধুমধাম-আড়ম্বর আর নানা রকম আমোদ-প্রমোদের বিচিত্র আয়োজন হতো। এদেশের হিন্দু-সমাজের বিশেষ-প্রিয় বাৎসরিক-অনুষ্ঠান হলেও, এ পার্ব্বণের উৎসব-আসরে যোগ দিয়ে আনন্দ-উপভোগ করতে জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ইংরাজের হাতে-গড়া এই আজব-শহরের দেশী-বিলাতী, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র—সকল শ্রেণীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাই সাগ্রহে এগিয়ে এসে ভীড় জমিয়ে তুলতেন। কারণ, ইংরাজ বণিক-শাসকদের এই অভিনব বাণিজ্য-কেন্দ্র ও রাজধানী কলিকাতা শহরে সেকালে কাঁচা-পয়সা রোজগারের সুযোগ-সুবিধা ছিল প্রচুর···কাজেই দেশ-দেশান্তর থেকে নানা জাতের লোকজন এখানে এসে ছোট-বড় নানা ধরণের কাজ-কারবারের দৌলতে অল্পদিনের মধ্যেই রীতিমত বিত্ত-শালী হয়ে উঠতো। তাছাড়া ইংরাজশাসকদের 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের' কল্যাণে বাংলাদেশের তৎকালীন জমিদারদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো এবং স্বচ্ছল সুপ্রাচুর্য্যময় থাকায় মনে তাঁদের স্ফূর্তিও ছিল অঢেল। তাই ছোট বড় বিভিন্ন পাল পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে নিজেদের হরেক রকমের উদ্ভট বিলাস বাসনা আর আজব সৌখিন-খেয়াল চরিতার্থের উদ্দেশ্যে তাঁরা তখন নিত্যই মুঠো-মুঠো টাকা উড়িয়ে ধুমধাম আড়ম্বরে নানা ধরণের আমোদ প্রমোদ উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদি করতেন। তারই ফলে সেকালের সমাজে সারাক্ষণই বইতো এমনি নানান্ আমোদ-প্রমোদের অনুক্ষণ প্রবাহ। তবে সেকালে শিক্ষা ছিল না···ছিল অর্থ, রুচি শালীনতা ছিল না···ছিল ধর্ম্মের গোঁড়ামি আর কুসংস্কার···সুস্থ সবল শুভ-চেতনারও যথেষ্ট অভাব ছিল তখনকার দিনের সমাজে···তাই পূজাপার্ব্বণের অনুষ্ঠানে, ধর্ম্মকে একান্তে কোণঠাসা করে রেখে, শুধু বিভব ঐশ্বর্য্য আর উচ্ছৃঙ্খল বিলাস অনাচার···নিছক হৈ-হুল্লোড়, পানোন্মত্ততা, ব্যভিচার আর বিকারগ্রস্ত উদ্দাম আমোদ-প্রমোদের আড়ম্বরে মেতে থাকাটাই ক্রমশঃ কলিকাতা শহরের তৎকালীন অধিবাসীদের সর্ব্বজনীন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানের মতোই, সেকালে কলিকাতা শহরের হিন্দু অধিবাসীদের বিশিষ্ট সাম্বৎসরিক পার্ব্বণ চড়ক আর গাজন উৎসব পালনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যেতো না। এমন কি, এ সব পার্ব্বণোৎসব পালনের অজুহাতে সেকালে অনেক ক্ষেত্রে আরও নির্লজ্জ অশালীনতা, ইতর রঙ্গ-রসিকতা, খেউড় খিস্তি অনাচার আর নির্ম্মম নৃশংস বর্ব্বরাচরণ, যন্ত্রণাদায়ক আত্মনিপীড়ন প্রভৃতি নানা রকম বীভৎস ব্যভিচার ও কদর্য্য ক্রিয়াকর্ম্মের এমন অনুষ্ঠান হতো যে কোম্পানীর শাসক গোষ্ঠি শেষে নিতান্তই বাধ্য হয়ে

কঠোর আইন জারি করে সে সব বেয়াড়া হেওয়াজ চির-তরে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

চড়ক সংক্রান্তি আর গাজন উৎসবের সময় সেকালে কিভাবে ধুমধাম আড়ম্বরে পর্ব্ব-পালন করা হতো, খৃষ্টীয় উনবিংশশতকের প্রায় শেষার্দ্ধে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনবদ্য-রচনা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' গ্রন্থে তার মনোরম নিখুঁত অপূর্ব্ব কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র পাওয়া যায়। একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির উদ্দেশ্যে, প্রসঙ্গ-ক্রমে, তার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

• • •

(৺কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

• • • •

কলিকাতা সহরের চার দিকেই ঢাকের বাজ্‌না শোনা যাচ্ছে, চড়্‌কীর পিঠ সড়্‌ সড়্‌ কচ্ছে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্ছে; সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার, বিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোবান গামছা হাতে; বিল্বপত্র বাঁধা সুতা গলায় ষণ্ড ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন!"

• • • •

এদিকে ছুলে বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নূপুর পায়ে উত্তরিয় সুতো গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীরব্রতের ও মহত্বের স্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে বেতালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের সঙ্গতে নেচে বেড়াচ্ছে। ঢাকীরা ঢাকের চোরেতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্ছে; গুরু মশায়ের পাঠশাল বন্ধ হয়ে গিয়েছে—ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ি করে তুলেছে; আহার নাই, নিদ্রা নাই; ঢাকের পেছোনে পেছোনে রপ্তে রপ্তে বেড়াচ্ছে; কখন "বলে ভদ্দরের শিবো মহাদেব" চীৎকারের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, কখন ঢাকের চোরের চামর ছিঁড়ছে, কখন ঢাকের পেছনটা দুম্ দুম্ করে বাজাচ্ছে—বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যাপার করে হয়।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার দৃশ্য—লালদিঘীর পুরাতন দুর্গ
(প্রাচীন প্রতিলিপি অবলম্বনে)

ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাঁটাকাঁপ! আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কারে বিল্ব-পত্র গুঁজে, হাতে এক ঘুটো বিল্বপত্র নিয়ে, ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েছে, সুতরাং বাবু তারে নমস্কার কল্লেন; মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা ভক্ত ধোয় করাপের উপর দিয়ে বাবুর মাতায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন,—বাবু উঠ্‌লেন!

বৈঠকখানার বেকাবি ক্লকে টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজ্‌লো, সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। সহরের বাবুরা কেউ, দেওয়ান্‌জীতে, বগি ও ব্রাউহামে করে অবস্থাগত স্ত্রেণ, ভদ্রলোক, বা ঘোড়াহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগানে চল্‌লেন—দুই চার জন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরি পিছনে মাগভরা যোড়াগাড়ি চল্লো, পাছে লোকে জান্‌তে পারে, এই ভয়ে কেউ সে গাড়ির সইস কোচম্যানকে তফরা নিতে বারণ করে দেচেন—কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেতাবাজী বাহাদুরির কাজ মনে করেন; বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেছেন, খাতির নদারদ! কুঠিওয়ালারা গহনার ছজুড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, ঢাক বাজতে লাগ্‌লো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো, সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্ছে, কেহ ভক্তিযোগে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েছে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটুচ্ছে, প্রায় আধ ঘণ্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না; কি হবে! বাড়ির ভিতরে খবর

গেলো ; গিন্নিরা পরস্পর বিষণ্ণ বদনে "কোন অপরাধ হয়ে থাকবে" বলে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেরা "বোধ হয়, ভুল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাকবে, সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয়" ; এই বলে নানা-বিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করে ; অবশেষে গুরু পুরুত, ও গিন্নির ঐক্য মতে বাড়ির কর্ত্তাবাবুকে বাঁচাই স্থির হলো। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচ জন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে—"মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে," "ভুল ও পড়ে না!" সন্ধ্যা হয়—বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোষাক পরা, রুমালে বোকো মেখে বেরুচ্ছিলেন—তখনই অজ্ঞান! কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়েকাণ্ড বন্ধ করা হয় না, অগত্যা পায়নাপেলের চাপ্‌কান পরে, সাজগোজ সমেতই গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আস্‌তে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সার দেতে চল্লো, মোসাহেবেরা বাবুর সমূহ বিপদ মনে করে বিষণ্ণ বদনে বাবুর পেচোনে পেচোনে যেতে লাগ্‌লো।

গাজনতলায় সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠ্‌লো, সকলে উচ্চস্বরে "তত্তেশ্বরে শিবো মহাদেব "বলে চীৎকার করতে লাগ্‌লো ; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন—বড় বড় হাতপাখা দুপাশে চল্‌তে লাগ্‌লো, বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পারতো যে, আজ বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দুহাত একত্র করে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কাঁধ কাঁধ মুখ করে রেশমি রুমাল গলায় দিয়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন, পুরোহিত শিবের কাছে "বাবা ফুল দাও", ফুল দাও," বারংবার বল্‌তে লাগ্‌লো, বাবুর কল্যাণে এক ঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাতায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাতা ঘুরুতো লাগ্‌লো, আধ ঘণ্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাতা থেকে এক বোঝা বিল্বপত্র সরে পড়্‌লো! সকলের আনন্দের সীমা নাই "বলে তত্তেশ্বরে শিবো" বলে চীৎকার হতে লাগ্‌লো, সকলেই বলে উঠলো, না হবে কেন—কেমন বংশ!

ঢাকের তাল ফিরে গেলো। সন্ন্যাসীরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে কাছের পুকুর থেকে পরত দিনের কালা কতক-গুলি বইচির ডাল তুলে আন্‌লে। গাজনতলায় বিশ কাঁটি বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো, ক্রমে সব কাঁটাগুলি মুখে মুখে বসে গেলে পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী তখন গামছা বেঁধে তার দুদিকে টানা ধল্লে,—সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো ; উঃ! "শিবের কি মাহাত্ম্য!" কাঁটা ফুট্‌লে বলবার যো নাই। এদিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু একজন কুটেল চোরা গোপ্তা মাচ্ছেন। অনেকে দেবতাদের মতো অন্তরীক্ষে রয়েছেন, মনে কচ্চেন বাজে আধারে দেখে নিলুম, কেউ জান্‌তে পারে না। ক্রমে সকলের ঝাঁপ খাওয়া ফুরুলো ; একজন আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিৎ হয়ে উল্‌টো ঝাঁপ খেলে ; সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো। দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি কত্তে লাগলেন—"গিন্নিরা বলে দিয়েছেন, ঝাঁপের কাঁটার এমনি গুণ, যে, ঘরে রাখ্‌লে এমন্তে বিছানায় ছারপোকা হবে না।"

এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁসোর ঘণ্টার শব্দ থামলো। সকল পথের দরজায় আলো জ্বালা হয়েছে। "বেলফুল!" "বরফ!" "মালাই!" চীৎকার শুনা যাচ্ছে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েছে অথচ খদ্দের কিচ্ছে না—ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এলো ; এ সময় ইংরাজী জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনি আর সিমলের ধুতির কল্যাণে রাস্তায় ছোট লোক ভদ্দর লোক আর চেন্‌বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গররা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় ঢু মেরে মেরে বেড়াচ্ছেন—এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন আবার মজলা সেবা দেখে বাড়ি ফির্‌বেন! মেছো-বাজারের হাঁড়িহাটা—চোরবাগানের মোড়, ঘোড়াগাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোনাগাজীর গলি ও আহিরিটোলার চৌরাস্তা লোকারণ্য—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন কেউ তাঁরে চিন্‌তে পারবে না ; আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে, কেশে, হেঁচে, লোককে জানান দিচ্চেন যে, "তিনি সন্ধ্যার পর দু গণ্ডা আধেল করে থাকেন!"

সৌখীন কুঠিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ

করে সেতারটি নিয়ে বসেছেন। পাশের ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার করে বিদ্যেসাগরের বর্ণপরিচয় পড়ছে। পীল ইয়ার ছোকরারা উড়তে শিখছে। ওস্তাদরা দুর্গাপ্রদীপ সামনে নিয়ে রাৎকাল দিবার উপক্রম করেছে। রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েছে, রোকোড়ের দোকানদার পোদ্দার ও সোনারবেপেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাটছে। শোভাবাজারে রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোনা ইলিস নিয়ে ক্রেতাদের—"ও গামছাকাঁধে, ভালো মাচ নিবি?" "ও খেংরাগুঁপো মিন্‌সে, চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দুইএক জন রসিকতা জানাবার জন্য মেছুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলি-খোর, গেঁজেল ও মাতালরা লাটি হাতে করে কানা সেজে "অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর মাতাগণ" বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্চে; এমন সময় বাবুদের গাজনতলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠলো, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" চীৎকার হতে লাগ্‌লো; গোল উঠলো, এবারে ঝুল সন্ন্যাস। বাড়ির সামনের মাঠে তারা টারা বাঁধা শেষ হয়েছে; বাড়ির কুদে কুদে হবু হজুরেরা দরওয়ান, চাকর ও চাকরাণীর হাত ধরে গাজনতলায় ঘুর ঘুর কচ্চেন। ক্রমে সন্ন্যাসীরা ঘড়ে আগুন জেলে তারার নীচে ধল্লে—এক জনকে তার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুড়গুলো ফেলতে লাগলো, ক্রমে একে একে ঐ রকম করে তুল্লে, ঝুল সন্ন্যাস সমাপন হলো; আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সহর জুড়লো, পূর্ব্বের মত সেতার বাজতে লাগ্‌লো, "বেলফুল" "বরফ" "মালাই"ও যথামত বিক্রী করবার অবসর পেলে, শুক্রবারের রাত্তির এই রকমে কেটে গ্যালো!

আজ নীলের রাত্তির! তাতে আবার শনিবার; শনিবারের রাত্তিরে সহর বড় গুল্‌জার থাকে—পানের খিলির দোকানে বেল-লণ্ঠন আর দেওয়ালগিরি জলচে। কুরকুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুর ভুর করে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুল্‌চে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়িতে খ্যামটা নাচের তালিম হচ্চে, অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুমুর ও মন্দিরার রুনু রুনু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন। কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারাওয়ালা এক জন চোর ধরে বেঁধে নে যাচ্চে—তার চারি দিকে চার পাঁচ জন চোর যাচ্চে আর মজা দেখ্‌চে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে, তারা যে একদিন ঐ রকম দশায় পড়্‌বে তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজোনতলায় চিৎপুরের চর। ওদের মাঠে সিংগির বাগানের প্যালা। ওদের পাড়ায় যেতে পাঁচালি। আজ সহরের গাজোনতলায় ভারি ধুম,—চৌমাথার চৌকিদারদের পোহাবারো! মদের দোকান খোলা না থাকলেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রি হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকালে শুনবেন যে—"ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটীটি পাচ্চে না," "পালেদের একধামা পেতলের বাসন গাচে ও গন্ধবেণেদের সর্ব্বনাশ হয়েচে"। আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়—থেকে থেকে চাকের বাদ্যি, সন্ন্যাসীর হোরহা ও "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চীৎকার।

এদিকে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং চং, টুং টাং চং করে রাত চারটে বেজে গ্যালো—বারফট্‌কা বাবুরা ঘরমুখো হয়েচে।****দুই একদল মেয়েমানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েছেন।***

গুপুস্ করে তোপ পড়ে গ্যালো! কাকগুলো "কা কা" করে বাসা ছেড়ে উড়বার উদ্যুগ করে। দোকানীরা দোকানের ঝাপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হুঁকোয় জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উদ্যুগ কচ্চে। ক্রমে কন্‌সা ঘরে এলো—মাচের ভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেচে—মেছুনীরা ঝগড়া কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েচে। * * *

ক্রমে গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গ্যাল। সহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য. চার দিকে চাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশোল, সাপ, ছিপ ও বাণ ফুড়ে একেবারে মরিয়া হয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে কালীঘাট থেকে আস্‌চে। বেন্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ারগোচের ভদ্র-লোকে পরিপূর্ণ, সকের দলের পাঁচালি ও হাপ্ আখ্‌ড়াদের দোয়ার. গুলগার্ডেনের মেম্বরই অধিক,—এঁরা গাজোন দেখবার জন্য ভোরের ব্যালা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুকে বড় মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্চে। কেউ সিভিলিজেশনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন। কেউ কেউ নিতে ব্রাজি হয়েও—"শাক্ত পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা, কি করেন, বড় দাদা, সেকেলে, শিবে বর্ত্তমান—আবার ঠাকুরমার এখনো কাশী-প্রাপ্তি হয় নাই।

অনেকে চড়ক, বাণফোঁড়া, তরওয়ালফোঁড়া দেখ্‌তে ভালবাসেন; প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পৌত্তুর, ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে তামাসা দেখ্‌তে বেরোন। অনেক বুড়ো মিন্‌সে হয়েও হীরে বসান টুপি, বুকে জরির কারচোপের কর্ম্ম করা কাবা ও গলায় মুক্তর মালা, হীরের কণ্ঠি, দুহাতে বলটা আংটি পরে "খোকা" সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয় ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাট বৎসর—তাগ্‌নের চুল পেকে গ্যাছে।

• • • •

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েচে। চৌমাথায় বেশের দোকান থেকে পুরে গ্যাছে। নানা রকম রকম বেশ—কারু কক্‌ ও কলারওয়ালা কামিজ, রুপোর বগলস আঁটা শাইনিং লেদর, কারো ইস্তিরি করা আধ চাদনা কোট, হাতে ইষ্টক, ছেলের চাদর, চুলের গাড় চেন গলায়, আল-বার্ট ব্যাশানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর বড়াকর-বিশেষ, না দেখে এমন জানোয়ারই নাই; রাস্তার দু পাশে অনেক আমোদ দেখে মহাশয়েরা দাঁড়িয়েছেন; ছোট আদালতের উকীল, সেকেন্দ রাইটর, টাকওয়ালা গন্ধ-বেণে, তেলী, চাকাই কামার আর কলারে বজ্জেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে দুটি মেয়ে—কারু তিনটে ছেলে!

কোথাও পাদরি সাহেব মুড়ি মুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন কাচে ক্যাটিকুই ভায়া—দুবর্ণের চৌকিদারের মত পোশাক—পেনটুলন টাংটোয়ে চাপকান, মাথায় কাল রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপি। আধাসতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খৃষ্ট-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন্—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো বাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফিরওয়ালা একমনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকুই কি বলচেন কিছুই বুঝতে পাচ্চে না! পূর্ব্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ মার সঙ্গে বকড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খৃষ্টান হতো, কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে—আর ফিরি খৃষ্টানদের দুর্দ্দশা দেখে খৃষ্টান হতেও ভয় হয়!

চিৎপুরের বড় রাস্তা মেপ করে কাদা হয়—ধুলোয় ধুলো, তার মধ্যে ঢাকের গট্‌রার সঙ্গে গাজন বেরিয়েছে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশে বেঁধে কাঁধে করেচে—কতকগুলো ছেলে নূপুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে—তার পেচোনে এলোমেলো নিসেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা ঘন বেঁধে ঢোলের সঙ্গতে "ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা সেটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা", তখন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তকমা-ওয়ালা বরকন্দাজ, হরকরা, সেপাই। মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায় শিব ও পার্ব্বতী সাজা সং। তার পেচনে কতকগুলো সন্ন্যাসী খপলকী ফুঁড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেচে। পাশে বেণোরা ঝিরে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেচে। লম্বা লম্বা ছিপ্, উপরে পোলার ঝিংড়িমাছ বাঁধা। সেটকে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক্ করে রং বাজাচ্চে। পেচনে বাবুর ভাগ্‌নে, ছোট ভাই বা পিস্‌তুতো ভেয়েরা গাড়ী চড়ে চলেচেন—তাঁরা রাত্রি তিনটের সময় উঠেচেন, চোক লাল টক্ টক্ কচ্চে, মাথা তখনো পুরে ও কালীঘাটে ধুলোয় ভরে গিয়েছে। দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখচেন, মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোড়া খেপেচে—হুড়মুড় করে কেউ দোকানে কেউ খানার উপর পড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়চেন না।

ক্রমে পুলিসের হুকুম মত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেট-ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উত্তরে গ্যাচে; অমনি মার্শল ল জারি হলো, ঢাক বাজালে খানায় ধরে নিয়ে যাবে। ক্রমে দুই একটা ঢাকে অমাদারের হেতে কোঁৎকা পড়বামাত্রই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে করে চুপে চুপে বাড়ি এলেন—দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিনম্পাত কত্তে কত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সহরটা কিছুকালের জন্ত জুড়ুলে। বেণোরা বাণ খুলে মদের দোকানে ঢুকলো। সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে

রাতপাখার বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেলে। গাজনতলায় শিবের ঘর বন্ধ হলো—এ বছরের মত বাণ-ফোঁড়ার আমোদও ফুরুলো। এই রকম রবিবারটা দেখতে দেখতে গ্যালো।

আজ বৎসরের শেষ দিন। সুদীর্ঘ কালের এক বৎসর গ্যালো দেখে যুবক যুবতীরা বিষণ্ণ হলেন। ০০০০আজ বুড়োটি বিদেয় নিলেন, কাল ঘুঁটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন।০০০ইংরাজেরা নিউ ইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাড়াওয়া পান দিয়ে বরণ করে আন—নেশার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙ্গালিরা বছরটি ভাল রকমেই যাক আর খারাবেই শেষ হক, সজনে খাড়া চিবিয়ে ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে পুরাণকে বিদায় আন। কেবল কলসী উচ্ছুগ্‌গু কর্ত্তারা আর নতুন খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করেছেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছুগ্‌গু করবেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধুম করে কালীপূজো করেছিলেন ও বিধবাবিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেন নি। আজকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার কি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে, মড়াকান্না কাঁদতে হবে।০০০

চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেছে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েছে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো। সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ি, ফেটিং ও ষ্টেট ক্যারেজে নানা রকম পোষাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েছেন, কেউ সাঁপারীদের নায়ের মত পাখীগাড়ীর ছাতের উপর বসে চলেছেন—ছোট লোক, বড় মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।০০০

কলকেতা সহরের আমোদ শিগ্‌গির ফুরায় না, বারোইয়ারি পূজোর প্রতিমা পূজো শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসী, পচা, গলা ও ঘসা হয়ে থাকে—সে সব বল্‌তে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ও ক্রমে ভেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাট্‌কা চড়ক টাট্‌কা টাট্‌কাই শেষ করা গেল।

এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরি, টিনের ঘুঙুরি দেওয়া হলতা বাঁশের বাঁশী, হলদে রং করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া জাকড়ার তৈরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেয়ারে পুতুল, চিত্তির করা হাঁড়ি বিক্রি কত্তে বসেচে, "ড্যানাক ড্যানাক ড্যানাং ড্যাং চিঙ্গিড়ি মাছের ছুটো ঠ্যাং" ঢাকের বোল বাজ্চে, গোলাপি খিলির খোনা বিক্রি হচ্চে। একজন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে—মইয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে, পা ছেড়ে ঘুত্তে লাগলো। কেবল "দে পাক দে পাক" শব্দ। কার সর্ব্বনাশ, কার পৌষ মাস! একজনের পিঠ ফুঁড়ে খোরান হচ্চে, হাজার লোকে মজা দেক্‌চেন!

• • [ক্রমশঃ

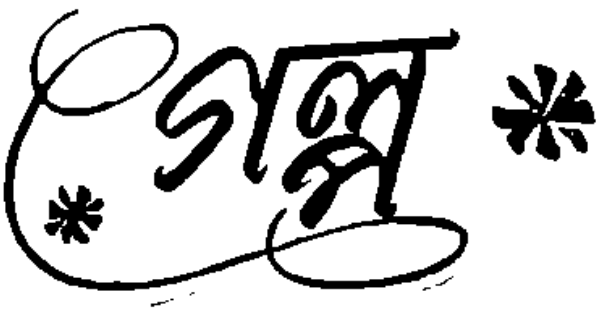

পরিবর্তন

বিভাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

ললিতা কলেজের নাম করা মেয়ে। কলেজের এমন কোনো ছেলে নেই যে ললিতাকে চেনে না। সকলের দৃষ্টি ললিতার ওপর। ললিতার "আলোক দৃষ্টি" অনেক গ্রাম্য ধনী ছাত্রের চিত্তে দোলা জাগিয়ে গ্রাম্যভাব কেটিয়ে দূর ক'রে দিয়ে নাগরিক সভ্যতার লালবাতি জেলে দিয়েছে। মাঝে মাঝে পার্টি পিকনিকেও তাকে যেতে হয়।

ললিতা কালীকিংকরের মেয়ে। কালীকিংকর চক্রবর্তী একটি মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী। অফিসের সকলের সঙ্গে মিলমিশ আছে কালীকিংকরের। তাঁর মনে গর্ব যথেষ্ট। মেয়ে ললিতা আধুনিকা। সকলেই তাকে পছন্দ করে। অনেক তার বন্ধু-বান্ধব। অনেক গুণগ্রাহীর দল আছে। বি-এ পাশ করতে পারলে তাঁকে আর ললিতার বিয়ের জন্য ভাবতে হবে না। কেউ না কেউ পছন্দ করবেই। এক-দিন হয়তো তিনি দেখতে পাবেন—ললিতা একজন যুবকের সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে বলবে—ইনি তোমার জামাই। আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

কালীকিংকর চক্রবর্তীর বাড়িতে ছেলে-মেয়ে—ঘাতায়াতের অভাব নেই। কেবলই কলিং বেল বাজছে। কিন্তু কালীকিংকরকে কেউ চায়না—সকলেই এসে খোঁজ করে মিস্ চক্রবর্তীর। কেউ আসছে প্রেম বিহারীলের জন্য, কেউবা পার্টিতে নেমন্তন্ন করতে।

কালীকিংকরের সন্তান বলতে ঐ একটি—ললিতা। ঐ ছেলে, ঐ মেয়ে। ললিতা ছাড়া কালীকিংকরের মুখে অন্য কথা নেই। গৃহিণী শৈলবালার এতে আপত্তি অনেক। তিনি বলেন, মেয়েদের অত বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। বেশী পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ভাল নয়। বিয়ে দিয়ে ওকে সংসারী করে দাও।

কালীকিংকর গৃহিণীকে "সেকেলে" বলে—তাঁর কথা মাঝে মাঝে উড়িয়ে দেন। আবার কখন কখন মনে করেন শৈলবালা ঠিকই বলেছে। মেয়েটি পাত্রস্থ হলেই ভাল হয়।

অফিসেও কালীকিংকর তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলো-চনা করেন। সহকর্মীরা বলেন—কালীকিংকর আর দেরী করো না—দেরী করলে পরে পস্তাবে। এখনই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেল।

অমরেশ। অমরেশ চট্টোপাধ্যায় ঐ পাড়ারই ছেলে, যে পাড়ায় কলিকিংকর থাকেন। ছেলেটি দেখতে শুনতে বেশ ভাল। বি-এ পাশও করেছে। পাল্টি ঘরও। কালীকিংকরের বেশ পছন্দ ছেলেটিকে। মনে মনে ভাবেন, ছেলেটিকে যদি জামাই করা যায় তবে খুবই ভাল হয়।

রবিবার সকালে কালীকিংকর বাজারে যাচ্ছেন। রাস্তায় অমরেশের সঙ্গে দেখা। অমরেশকে দেখে কালী-কিংকর একটু আলাপ সুরু করলেন। কেমন আছ। এখন কি করবে। অমরেশ, একদিন আমাদের বাড়িতে এসোনা।

অমরেশের বাবা পার্বতীচরণও বাজারে আসছিলেন। পথে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কালীকিংকরের সঙ্গে অমরেশের কথাবার্তা হচ্ছে দেখে তিনি ভ রেগেই আগুন। সমস্ত ক্রোধটা সংবরণ করে পার্বতীচরণ গম্ভীর স্বরে অমরেশকে বললেন—অমরেশ বাড়ি যাও। রাস্তায় কি এত সময় নষ্ট করা ভাল! যাও বাড়িতে অনেক কাজ আছে।

অমরেশ মাথা নীচু করে সে স্থান ত্যাগ করলো।

কালীকিংকর তখন পার্বতীচরণকে বললেন—কেমন আছেন? আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অনেকদিন পরে। আপনার ছেলেটি বেশ ভাল। সুন্দর ছেলেটি।

পার্বতীচরণ হাঁ, ইয়ে ইত্যাদি দু-একটি কথা বলেই বাজারের দিকে রওনা হলেন।

কালীচরণ বললেন,—চলুন পার্বতীচরণবাবু, আমিও বাজারে যাবো এক সঙ্গেই যাই।

পথ চলতে চলতে কালীকিংকর আলাপ সুরু করে দিলেন। বললেন, পার্বতীচরণবাবু—আমার একটি কন্যা আছে, দেখতে শুনতেও ভাল। বি-এ পড়ছে। আপনার ছেলে অমরেশের সঙ্গে কিন্তু মানায় বেশ। তবে টাকা পয়সা ত খরচ করতে পারবো না—বুঝছেন ত মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী। তার ওপর দুর্মূল্য বাজার! আপনি যদি দয়া করে নেন···।

পার্বতীচরণ গম্ভীরভাবে বললেন—দেখুন কালীকিংকর-বাবু, আপনি যা বলছেন সবই ঠিক। আপনার মেয়ে ভাল। তবে কি জানেন—বাগীগাছের রঘুনাথ বাঁড়ুজ্যের আমার ছেলেটির ওপর খুব ঝোঁক। তিনি একরকম মনে মনে ঠিক করে বসে আছেন—যে আমার ছেলে তাঁর জামাই হবে। অনেক টাকা যৌতুক দেবেন। প্রচুর খরচ করবেন।

কালীকিংকর : আপনারও ত মেয়ে আছে। সেজন্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কথা একবার ভেবে দেখুন। রঘুনাথ বাঁড়ুজ্যে বড়লোক। তিনি টাকার জোরেই কন্যা পাত্রস্থ করবেন। কিন্তু আমাদের মত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের কি হবে বলুন ত যদি আপনারা দয়া না করেন!

পার্বতীচরণ : হাঁা, আপনি বলেছেন ঠিকই। আমারও ত কন্যা আছে। তবে কি জানেন আমার ছেলের বিয়েতে অনেক টাকা নগদ পাচ্ছি, সেই টাকা থেকে ম্যানেজ করে আমার কন্যাকে পাত্রস্থ করবার ব্যবস্থা করে ফেলবো। জানেন চক্রবর্তীমশাই—পিতার একমাত্র সন্তান পুত্র। তাছাড়া ছেলেকে পড়াতেও ত অনেক খরচ হয়েছে—এখন সে টাকা বেয়াইয়ের কাছ থেকে আদায় করতে না পারলে সমাজে মান থাকবে কেন? আচ্ছা, চলি।

কালীকিংকর হতাশার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাজারের থলিটার দিকে একটু নজর দিয়ে বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

মেয়ে বড় হচ্ছে,পাড়ার লোকেও যারে যারে খোঁচা দেয়—তবে ললিতার বিয়ে হচ্ছে। পাড়ার গিন্নীরা এসে শুনিয়ে যায়—ললিতার বয়সে আমরা ছেলেপুলের মা হয়ে পুরোপুরি সংসারী হয়ে গেছি।—শৈলবালার মনে শান্তি নেই।

কালীকিংকর বুঝলেন মেয়ের বন্ধুবান্ধব অনেক। কিন্তু কেউ বিয়ে করবার প্রস্তাব নিয়ে আসে না। সকলে গল্প গুজব করেই চলে যায়।

অনেক চিন্তা করে, বন্ধু বান্ধবের পরামর্শে কালী-কিংকর পাত্রের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন।

বহু নম্বর দিয়ে দুটি বিজ্ঞাপন পড়লো। একটিতে—"পাত্রী সকাল সন্ধ্যায় গীতা, ভাগবত পাঠ অভ্যস্তা। গোঁড়া হিন্দু পরিবারের উপযোগী প্রতিপালিতা, গৃহকর্মনিপুণা, সূচীশিল্প প্রভৃতি সর্বকর্ম নিপুণা। শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, ভাসুর, দেওর প্রভৃতিদের ঘরে সুরক্ষা।" অপরটিতে—"পাত্রী আপটুডেট। গান নাচ বাজনা অভিনয়, বক্তৃতায় পারদর্শিনী।"

ছেলের বাপ যদি গোঁড়া হিন্দু হয় তবে প্রথম বিজ্ঞাপনটি কার্যকরী হবে। আর ছেলের বাপ যদি কালো বাজারের টাকার উঁচু মহলের সঙ্গে মিশ খিশ করে বেশ কিছু কামিয়ে এই সহরে প্রাসাদ রচনা করে এ্যারিষ্টোক্র্যাট সেজে বসে থাকে তবে সে প্রাসাদের যোগ্য বধূ হবার জন্য দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটিই যথেষ্ট।

বিজ্ঞাপনটি দেবার দুদিন পরেই একজন আধা প্রৌঢ় ও একটি যুবক কালীকিংকরের দরজায় কলিং বেল টিপলেন।

কালীকিংকর বিজ্ঞাপনের জবাব বুঝতে পেরে তাঁদের বাইরের ঘরে বসালেন। অতিথিদের মিষ্টি খাইয়ে আপ্যায়িত করার পর ললিতার পরীক্ষা সুরু হল। সে নিয়মমত পাত্রীর কাঠগড়ায় এসে হাজির হলো।

চুল খুলে দেখানো হলো—পরচুলো নয় তার প্রমাণের জন্য। দাঁত দেখাতে হলো—কোরালদাঁতি নয় সেজন্য। হেঁটে দেখাতে হলো—পা দুটি খড়মপায়ী নয় তার জন্য। চোখের তারা দেখাতে হলো—কটা কি কৃষ্ণবর্ণ সেজন্য।

এবার প্রৌঢ় ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন : কালী-কিংকরবাবু, আপনার মেয়ে গান জানে ত?

কালীকিংকর : আজ্ঞে হাঁা, গান বাজনা নাচ সর্ব বিষয়ে মেয়ে আমার পারদর্শিনী। গাও ত মা একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত।

প্রৌঢ় : থাক্, থাক্। ও গান গাইতে হবে না। বরং টপ্পা বা খেয়াল একখানা শুনি। না থাক, ওগুলো

সেকেলে। একটা ভজন শোনাও।—না থাকগে। আপনি যখন বলছেন তখন আর পরীক্ষা ক'রে লাভ নেই। দেখি তোমার হাতখানি একবার।

হাতটি হাতের ওপর রেখে মনে মনে প্রৌঢ় বললে: বাঃ, বেশ নরম হাতখানি ত? প্রকাশ্যে বললে—চক্রবর্তী মশাই, আপনার মেয়ের বয়স কত?

: আজ্ঞে, এই কুড়ি চলছে।

: কি যে বলেন, কুড়ি কি বলছেন—তার চেয়েও বেশী। তবে যাই হোক, নেহাৎ অল্প হবে না। মানাবে বেশ।

কালীকিংকর প্রৌঢ়ের পাশে উপবিষ্ট যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন: আজ্ঞে হাঁা, আপনার ঐ নাতির সঙ্গে বেশ সাজত হবে।

প্রৌঢ়: বলছেন কি? ও কি বিয়ে করবে নাকি? বিয়ে ত করবো আমি।

: আপনি পাত্র?—বলেই কালীকিংকর চোখ কপালে তুললেন।

: কেন বেমানান হবে কি? আমি বিপত্নীক। হিন্দু কোড বিল মতে বাধা নেই। আমার সম্পত্তিও আছে অনেক। ছেলেমেয়ে মাত্র দু'টি। তাতে আপনার মেয়ের কোন অসুবিধা হবে না। আর আপনার মেয়ে যখন কুড়ি পার করে ফেলেছে তখন আর ত কোন অসুবিধা নেই কারণ আমাদের একটা চলতি কথা আছে—মেয়েরা কুড়ি পেরুলেই বুড়ি।

আচ্ছা—আজকের মত চলি। পরে আপনারা আমার বাড়িতে এসে পাকাপাকি করে ফেলুন। তবে কাজটা গোপনেই সেরে ফেললেন। বেশী হৈ চৈ না করাই ভাল। কারণ বোঝেন ত শুভ কাজে বাধা অনেক। সত্বর সেরে ফেলাই ভাল। এই বলে প্রৌঢ় যুবকসহ গাত্রোত্থান করলেন।

ললিতা রাগে গস্ গস্ করছিল। সে তার বাবাকে বললো: আমি তোমাদের চক্ষুশূল হয়ে গেছি না? আমাকে এখন আর তোমরা সহ্য করতে পারছো না, তাই আমাকে এভাবে আজ অপমান করতে পারলে। কিন্তু আর নয়। আমি বিয়ে করবো না, করবো না, করবো না।

বাবা বললেন: তবে যা কি করবি?

ললিতা বলে, চাকরী করবো। নিজের উপায়ে নিজে চলবো। তাতে তোমাদের আর বোঝা হয়ে থাকতে হবে না।

—যা, যা, এখন খেয়েদেয়ে কলেজ যা। তুই কি বুঝবি কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কি ব্যথা! মেয়ে হয়ে জন্মেছিস—অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

এবার শৈলবালা মুখ খুললেন। বললেন, মেয়েকে তুমিই মাথায় তুলেছ। অবিবাহিতা মেয়ে থাকলে ওরকম একটু-আধটু সহ্য করতেই হবে। তবে এটাও ঠিক—সাধ কথা না বলে বিয়ের কথা পাকা হয়না।

কালীকিংকরের মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল। কোন রকমে খেয়ে-দেয়ে অফিস ছুটলেন। অফিসে পৌঁছে কাজের ফাইলপত্র ওলটাতে ওলটাতে আপন মনে বকতে লাগলেন—সারাজীবন খেটেই মরলাম। না ভরলো পেট, না পেলাম উচ্ছৃৎ। মেয়েটাকে পর্যন্ত অর্থাভাবে ভাল পাত্রস্থ করতে পারছি না।

অফিসের বন্ধু-বান্ধবরাও এসে কালীকিংকরের ব্যথায় যোগদান করলো। ওদিকে বড় সাহেবের তাকাডাকি সুরু হয়েছে।

বড় সাহেবের ঘরে ঢুকতেই মিঃ হাচিন্সন্ প্রশ্ন করলেন: কি, মিঃ চক্রবর্তী তুমি কি আজকাল কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছ? অফিসে বসে ভোট পাকাচ্ছ? শেষে কি চাকরীটা খোয়াবে? এই অফিসে তোমার বাবা চাকরী ক'রে গেছে। তুমি চাকরী করছো। আবার তোমার ছেলেরও চান্স আছে।

: না, স্যার আমি দল পাকাইনি। শুধু এইটুকুই দুঃখ করছিলাম যে—জীবনভোর খেটেই গেলাম। না ভরলো পেট, না ভরলো মন। মেয়েটাকে নিয়ে একটু বিব্রত বোধ করছি। জীবনটা সমর্পণ করেছি কোম্পানীর কাজে। অথচ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে বেঁচে থাকতে দিতে চায়না কোম্পানী, মেয়ের বিয়ের টাকা ত দূরের কথা।

: তাতে কোম্পানী কি করবে বল? ষ্টেটই যেখানে কিছু করতে পারে না, ষ্টিল ইন্ ইনব্যান্সি—আর কোম্পানী কি করতে পারে বল! আচ্ছা, তুমি জেল দেখেছ? আই মিন্—তুমি কি কখনো স্বদেশের নাম ক'রে জেল খেটেছো?

: না, স্যার। ছেলে গেলে কি সেকালে ইংরেজ কার্যে চাকরী পাওয়া যেত! জেল খাটিনি বলেই ত আপনার কোম্পানীর পুরাতন সেবক আমি, শ্রীকালীকিংকর চক্রবর্তী।

: তা হলে কি হবে বল? জেলে গেলে অন্ততঃ মন্ত্রী-মহলে একটু ঘোরাঘুরি করতে পারলে নিশ্চয়ই কিছু সুবিধা হত।

মিঃ হাচিনসন এই কথাগুলি বলে কালীকিংকরের দিকে চাইলেন। একটু চিন্তা করলেন। পরে বললেন, আচ্ছা তোমার ছেলেকে নিয়ে এসো তাকে এই কোম্পানীতে নিযুক্ত করে দেবো। থ্রিং হিম টুমরো পজিটিভ্‌লি।

: স্যার আমার ছেলেত নেই। মাত্র একটি মেয়ে।

: ছেলে নেই! তোমার মেয়েকে ত এ অফিসে চাকরী দেওয়া মুস্কিল। আচ্ছা, তোমার মেয়ে কতদূর লেখাপড়া করেছে?

: আজ্ঞে, বি-এ পড়ছে। দেখতে শুনতে ভাল। স্মার্ট। খেলাধূলা জানে। পার্টি পিকনিকেও পটু।

একটু চিন্তা করে মিঃ হাচিনসন বললেন: তুমি তাকে আগামীকাল নিয়ে এসো। আমার বন্ধুর ছেলে জনিকে বলবো—তার কাজে লাগিয়ে নেবে। তবে জনির বড় খেলার ঝোঁক। খেলার মাঠে যেতে হবে। দরকার হলে ঘোড়দৌড়ের মাঠেও। সেও এই রকম একটি হাউসমাস বাঙালী মেয়ে খুঁজছিল। কারণ তার বাঙলা ভাষার ওপর একটু ঝোঁক আছে। বাঙালী মেয়েদের পছন্দ করে।

বড়সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে কালীকিংকর নিজের চেয়ারে এসে বসলো।

অফিস ফেরৎ কালীকিংকর বাড়ি গিয়ে দেখে মেয়ের খুব জ্বর হয়েছে। ললিতা কথা বলতে পারছে না। একেবারে বেহুঁশ।

তিনি ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তারও রোগ ধরতে পারলেন না।

ডাক্তারের নির্দেশমত ললিতাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হল। রোগ এখনও ধরা পড়লো না।

পরদিন অফিস যেতে কালীকিংকরের এক ঘণ্টা লেট হয়ে গেল। বড় সাহেব মিঃ হাচিনসন ত রেগে একেবারে কাঁই। বললেন—চক্রবর্তী তোমার এত দেরী কেন?

কালীকিংকর তখন গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা জানালেন এবং অফিস আসবার সময় হাসপাতাল হয়ে আসতে হয়েছে তাও বললেন।

বড় সাহেব জিগগেস করলেন অসুখটা কি?

কালীকিংকর জানাল, রোগ এখনও ঠিক করতে পারে নি ডাক্তাররা। এখনও এক্সপেরিমেন্ট চলছে।

: আজকাল নবীনরা হয়েছে ডাক্তার। ডাক্তারী শিখতে হলে বিলেত যেতে হয়। ডাক্তারী পাশ করলেই ডাক্তার হওয়া যায় না। আচ্ছা যাও, আর যেন লেট না হয়।

কালীকিংকরের মনটা এত ভারাক্রান্ত যে আজ অফিসে কাজগুলিও ঠিকমত ক'রে উঠতে পারলেন না। সহকর্মীরা এসে অনেক প্রবোধ দিলেন, অনেক সহানুভূতি জানালেন।

অফিস ফেরৎ কালীকিংকর মেয়েকে দেখতে হাসপাতালে এলেন। ললিতার তখনও হাই ফিভার। রোগ এখনও ধরা পড়েনি। বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরলেন।

গিন্নী শৈলবালা ঠাকুরের কাছে অনেক মানত করলেন —যাতে মেয়ে সুস্থ হয়ে ঘরে ফেরে।

দ্বিতীয় দিনেও অফিসে যেতে লেট হল কালীকিংকরের। বড়সাহেব বললেন, আগামীকাল লেট হলে চাকরী থাকবে না।

কালীকিংকর কি করেন! একদিকে চাকরী! জীবিকা! অন্নের সংস্থান! অপরদিকে কন্যা। ব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছে। তার পাণ্ডুর মুখে যন্ত্রণার ছাপ। তার সেবা। মহা মুস্কিলে পড়লেন। দুদিকই যাতে বজায় থাকে তারই চেষ্টা করছেন কালীকিংকর।

আজ তৃতীয় দিন। বড় সাহেব ঘড়ি ধরে ব'সে আছেন। হাজিরার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। গ্রেস পিরিয়ডও পার হল। কালীকিংকর তখনও অফিসে অনুপস্থিত।

বড়সাহেবের যে কথা সেই কাজ। ডিস্‌গার্জ মেমো রেডি ক'রে রেখে দিলেন। এলেই কালীকিংকরকে দেওয়া হবে।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে কালীকিংকর এসে হাজির। একেবারে বড় সাহেবের চেম্বারে।

দরজা খুলে সাহেবের টেবিলের ওপর খবরের কাগজটা রেখে কালীকিংকর হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন : নাউ কিপ ইওর প্রমিস স্যার।

হাচিনসন ত অবাক! কোথায় ডিসচার্জ মেমো দিয়ে কালীকিংকরকে বিদায় ক'রে হতবাক করবেন—না তার বদলে নিজেই হতবাক! কিসের প্রমিস মিঃ চক্রবর্তী?

কী শপথ করেছি তোমার কাছে?

: স্যার আপনি বলেছিলেন, আমার ছেলেকে আপনি আপনার অফিসে চাকরী দেবেন!

: কোথায় তোমার সেই ছেলে?

: এই যে স্যার। মেডিক্যাল কলেজের রিপোর্ট পড়ুন।

কালীকিংকর খবরের কাগজের খবরটি দেখালেন। "ললিতা নাম্নী মেয়েটির মধ্যে পুরুষের সব লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ডাক্তারেরা অনুমান করছেন যে কিছুদিনের মধ্যে মেয়েটি সম্পূর্ণভাবে পুরুষে রূপান্তরিত হবে। অর্গানগুলি সম্পূর্ণভাবে পুষ্টিলাভ করছে।"

হতভাগের কালীকিংকরের করমর্দন করে বললেন যে —তোমার ট্রান্সফর্মড্ ছেলের জন্য চাকরী ঠিক থাকলো। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই এখানে নিয়ে আসবে। মিঃ চক্রবর্তী তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এ সংবাদের জন্য। তুমি এখন কন্যাদোকাগ্রস্ত পিতা নও। পুত্রের পিতা।

এই সংবাদে অফিসে খুব হৈ-হুল্লোর পড়ে গেল। সকলে কালীকিংকরকে অভিনন্দিত করলেন। কালীকিংকর তুমি ভাগ্যবান। তোমাকে আর মেয়ের বিয়ের জন্য ভাবতে হবে না।

বাড়ি ফেরার পথে কালীকিংকরের পার্বতীচরণের সঙ্গে দেখা। তিনি এ খবরটা খবরের কাগজে পড়েছিলেন্। তিনি কালীকিংকরকে অভিবাদন জানিয়ে হাত দুটি ধরে বললেন—চক্রবর্তী মশাই, আমার মেয়েটিকে আপনি পুত্রবধূ করুন। আমি আজীবন আপনার অনুগৃহীত হয়ে থাকবো।

পার্বতীচরণের ছেলের সঙ্গে ললিতার বিয়ের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হবার দরুণ যে আঘাত কালীকিংকর পেয়েছিলেন আজ প্রতিশোধ নেবার সে সুযোগ এসেছে।

গম্ভীর হয়ে কালীকিংকর পার্বতীচরণকে উত্তর দিলেন : তা কি করে হয় পার্বতীচরণবাবু! আমার ছেলের যে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে—শ্রীরামপুরের মুখুজ্যে বাড়ির মেয়ের সঙ্গে। বনেদী ঘর। অনেক টাকা যৌতুক পাবো। অত টাকা ত আপনি দিতে পারবেন না। ছেলে আমার হাসপাতাল থেকে বেরুলেই বিয়ের সানাই বেজে উঠবে। আর সেই সঙ্গে ললিতার নামও বদল হয়ে ললিত হবে। আচ্ছা চলি! নমস্কার।

আমি

গীতা মুখোপাধ্যায়

মনের জানালা খুলি
ভাবি বসে দিনযামী
কে এই আমি
কোথা হতে এ'ল আমি?
শুধু দেখা যায় আমি
মনের জানালা খুলে
আমি কে এই সন্ধানটুকু
খুঁজি নাই কভু ভুলে।
আমার আমি তো নয়
ভুল ক'রে এতদিন
মনের জানালা বন্ধ করিয়া
বাজায়েছি মনবীণ।
এতদিন পরে দৃষ্টির মাঝে
ধরা পড়ে গেছে আমি
অভিনব কিছু নয় এই আমি
আমিই পরমস্বামী।
পরমানন্দে হৃদয় কাননে
বাজাই মনের বীণ
একদিন এই তাঁহার আমি
তাঁহাতেই হবে লীন।

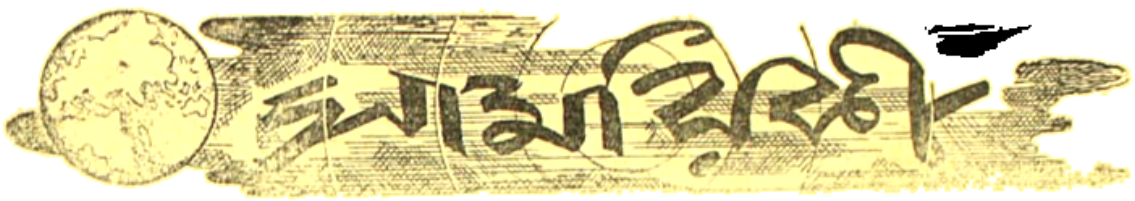

রবীন্দ্র স্মরণীর উদ্বোধন—

গত ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে "রবীন্দ্র স্মরণী" নামক নূতন গৃহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের নিজ কণ্ঠে গীত রেকর্ড করান বন্দে মাতরম সঙ্গীত বাজাইয়া শোনান হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এত দিন বাদে কলিকাতায় তাঁহার স্মৃতিতে এই গৃহ নির্মিত হইল! তবে কিছু না হওয়ার চেয়ে দেরীতে হওয়া ভাল এই নীতি স্মরণ করিয়া আমরা কর্মকর্তাদের প্রশংসা করি। যাহাতে ঐ গৃহ রবীন্দ্রনাথের কাজ ও রচনা জানার উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয় তাহার ব্যবস্থা হইলে দেশবাসী সন্তুষ্ট হইবে। রবীন্দ্র-নাথের স্মরণে চিৎপুর রোডের নাম রবীন্দ্র সরণী হইয়াছে, তাঁহার পৈতৃক বাসগৃহে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি এই রবীন্দ্র স্মরণী রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হইবে।

চীন কর্তৃক পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ—

পৃথিবীর কোন জাতি আর উর্ধ্বদিকে পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করিবে না এই বিষয়ে সারা পৃথিবীতে আন্দোলন হইয়াছে এবং আমেরিকা ও রাশিয়া এই চুক্তিতে আবদ্ধও হইয়াছে। কিন্তু চীনদেশের কর্তারা সেই বিশ্বের শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিদের এই মতকে উপেক্ষা করিয়া আবার পরমাণবিক বোমা ফাটাইয়াছে! ফলে নানা দেশে বিপদের সম্ভাবনা হইয়াছে। সে জন্য চীন-দেশের একমাত্র শত্রু আমেরিকা পৃথিবীর সকল দেশকে জানাইয়া দিয়াছে কাহারও যদি কখনও বিপদ হয় আমে-রিকাকে তাহা জানাইলে সে তাহাকে সাহায্য করিবে। এই ভাবে পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে এবং এখন কোন শক্তি নাই যে ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে।

ভারতের বিপদও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। চীন যতই শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, ততই সে পররাজ্য গ্রাসে উদ্যোগী হইবে। পরমাণু অস্ত্র হাতে লইয়া সে এখন আমেরিকা ও রাশিয়ার সাথে পাল্লা দিবার স্বপ্ন দেখিতেছে এবং ভারতের বুকে যে কোনও মুহূর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্যও সে প্রস্তুত হইয়া আছে। এরূপ পরিস্থিতিতে ভারতকেও প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

তাসখন্দে আবার যুদ্ধের আশঙ্কা—

ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে যাইয়া পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সহিত আপোষ করার পর ভারতবর্ষ মনে করিয়াছিল আর পাকিস্তানের সহিত বিবাদের সম্ভাবনা থাকিবেনা। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরিয়া পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাসখন্দ চুক্তি অমান্য করিতেছে, তাহার কারণ পাকিস্তানের পিছনে চীনের প্ররোচনা আছে। সম্প্রতি পাকিস্তান ভারতের কয়েকটি স্থানে লোক পাঠাইয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়াইয়া দিয়াছে। সে জন্য ভারতকে আরও চিন্তিত হইতে হইয়াছে। পাক-ভারত যুদ্ধবিরতির পর প্রায় এক বৎসর ভারত সামরিক প্রস্তুতি অনেক কমাইয়া দিয়াছিল। এখন আবার তাহা বাড়াইতে হইয়াছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন ও সেনাপতি জেনারেল চৌধুরী সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহারা পাকিস্তান বা চীনের আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছেন। পাশা-পাশি তিনটি দেশ যদি সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে তবে তাহাদের পক্ষে দেশবাসীর প্রাত্যহিক জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করা কঠিন হইয়া পড়ে। সেই কথা ভাবিয়া রুশীয় রাষ্ট্রনেতা কোসিগিন এই অবস্থার অবসানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ফলবতী হইল না। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাহার উপর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় বেশী মন দিলে বা বেশী অর্থব্যয় করিলে তাহার পক্ষে দেশবাসীকে রক্ষা করা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ মুখে পৃথিবীর শান্তির কথা বলে বটে কিন্তু কাজের সময় ভারত ও পাকিস্তানকে সমান ভাবে সাহায্য দান করিয়া যুদ্ধের অবস্থা বাঁচাইয়া রাখে। এ রকম কার্যের অবসান হওয়া উচিত এবং এশিয়াখণ্ডের এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা করা বিশ্বশান্তি রক্ষার পক্ষেও যে একান্ত দরকারী এ কথাটা যেন সব পক্ষই মনে রাখেন।

গিলগিট সমস্যা—

গিলগিট ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তের একটি অংশ। ইংরাজ কাশ্মীর জয় করিবার ৭০ বৎসর আগে

তথায় ইংরাজকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এখনও গিলগিটের কিছুটা অংশ কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না। কাশ্মীর, পশ্চিম পাকিস্তান, ভারত কেহই গিলগিটের ঐ অংশকে অধীন করিতে পারে নাই। সম্প্রতি বহু সংখ্যক চীনা গিলগিটের ঐ অংশে প্রবেশ করিয়া তাহা চীনাদের দেশ বলিয়া দাবী করিতেছে। চীনারা কোন পথে যে ভারতে প্রবেশ করিবে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছে না। ভারতের উত্তরাংশে ও তিব্বতের দক্ষিণে ভারতের একটি বিরাট অংশ চীনারা জোর করিয়া অধিকার করিয়া তথায় বসবাস ও ব্যবসা করিতেছে। ঐ অংশ পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। চীনারা তাহা পরিষ্কার করিয়া তথায় ঘর বাড়ী করিয়া বসবাস করিতেছে। চীন দেশ বহুকাল ধরিয়া তাহাদের রাজ্যের এলাকা বাড়াইবার জন্য উৎসুক। মনে হয় তাহাদের সেই চেষ্টা ধীরে ধীরে সফল হইতেছে।

উড়িষ্যায় বিস্তৃতভাবে দুর্ভিক্ষ—

উড়িষ্যা রাজ্যে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত ধানের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যভারত প্রভৃতি রাজ্যের বহু স্থানে ধানের অভাব মিটানো হইয়া থাকে। গত বৎসর বৃষ্টির অভাবে উড়িষ্যায় ভাল ধান হয় নাই। এ বৎসর আবার সারা এপ্রিল ও মে মাসে উড়িষ্যার কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি না হওয়ায় ধানের চাষের অবস্থা খুব খারাপ। এ বিষয়ে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উড়িষ্যার কোন কোন স্থান নিজে পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বহু স্থানে সাহায্যদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। অনেক স্থানে লোক না খাইয়া মারা যাইতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় ২০ বৎসর হইয়া গেল এখনও অধিক খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা কোথাও সম্পন্ন হয় নাই। উড়িষ্যা রাজ্যের যে সকল স্থান, জঙ্গল ও পাহাড়ে পূর্ণ ছিল সে সকল স্থানের জমি চাষের উপযুক্ত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যে কেন সেচের ব্যবস্থা করা হয় নাই তাহা বুঝা যায় না। নানা কারণে সরকারী কর্মচারীরা ভাল কাজ করেন না ফলে সর্বত্র সব কাজ আংশিক ভাবেই সম্পূর্ণ করা হয়, ঠিকভাবে করা হয় না. এই ব্যবস্থার পরিবর্তন না হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ বন্ধ হইবে না।

প্রধানমন্ত্রীকে শ্রীপ্রফুল্ল সেনের পত্র—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এক পত্র দিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্যা সমাধানে আদৌ মনোযোগী নন। পশ্চিমবঙ্গের দুটি সমস্যা এখন প্রধান। এক হলদিয়াতে একটি বড় উপনগর স্থাপন তাহা না করা হইলে কলিকাতায় মানুষের ভীড় ও বেকার সমস্যা কমানো যাইবে না। দুই ফারাক্কায় বাঁধ নির্মাণ। মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় বাঁধ সম্পূর্ণ না হইলে পশ্চিমবঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত থাকিবে। ফলে পরিবহন ও ব্যবসার সমস্যা সমাধান করা যাইবে না। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশের সহিত দক্ষিণ অংশের যোগাযোগ আজও সম্ভব হয় নাই। এই যোগাযোগের উপর পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। শ্রীসেন শ্রীমতী গান্ধীকে লিখিয়াছেন সত্বর পশ্চিমবঙ্গের এই দুই সমস্যার সমাধান না হইলে এই রাষ্ট্রে আবার গণবিপ্লব আরম্ভ হইবে। ক্রমে তাহা পাশের রাজ্যগুলিতেও ছড়াইয়া পড়িতে পারে। সে জন্য শ্রীসেন কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত হইয়া সত্বর সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে—

গত ৯ই মে কলিকাতায় মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা জননেতা ও ত্যাগী দেশকর্মী মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলের জন্মশতবার্ষিক উৎসব পালিত হইয়াছে। গোখলে বাংলা দেশকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাই তিনি একদময় বলিয়াছিলেন, "বাংলাদেশ আজ যাহা চিন্তা করে সমগ্র ভারত কাল তাহা চিন্তা করে" অর্থাৎ বাংলাদেশ সমগ্র ভারতের চিন্তার পথপ্রদর্শক। যৌবনে তিনি ভারত সেবক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্থির হয় সমিতির সদস্যরা কেহ ব্যক্তিগত সাংসারিক খরচের জন্য মাসিক ৭০৲ টাকার বেশী গ্রহণ করিবেন না। তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং চমৎকার বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার জীবনী ও রচনাবলী এ যুগের তরুণদের পাঠ করা উচিত। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায় প্রভৃতির সহকর্মী ছিলেন এবং সকলের সহিত একযোগে কংগ্রেসের কাজ করিতেন।

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ—

খ্যাতনামা বিপ্লবীনেতা ও পরবর্তীকালের নামকরা ব্যবসায়ী অতুলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় গত ৪ঠা মে ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রথমজীবনেই যুগান্তর-দলের সহিত বিপ্লব আন্দোলনের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন এবং রাসবিহারী বসু, যাদু যতীন প্রভৃতির সহিত একযোগে কাজ করিতেন। ছয় বৎসর তিনি পুলিশের চক্ষু এড়াইয়া আত্মগোপন করিয়া বাস করিয়াছিলেন পরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅমলকৃষ্ণ ঘোষের সহিত তিনি দীর্ঘকাল একযোগে দেশসেবা ও ব্যবসা করিতেন। তিনি সারাজীবন জাতীয়তাবাদের সমর্থক এবং প্রকৃত দেশসেবক ছিলেন।

সৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক সৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় গত ১২ই মে বৃহস্পতিবার বিকালে কলিকাতার শরৎ বসু রোডে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। যৌবনে বি-এল পাশ করিয়া

তিনি সারাজীবন হাইকোর্টে ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রথম জীবন হইতে গল্প উপন্যাস লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন প্রভৃতির তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার লেখা বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইত। কয়েক বৎসর তিনি 'ভারতী' মাসিক পত্রের সম্পাদকও ছিলেন। 'ভারতবর্ষে'ও তাঁহার বহুসংখ্যক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ও গত কয়েকবৎসর যাবৎ "ভারতবর্ষে" নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন প্রকৃত সাহিত্যরসিক, সামাজিক ব্যক্তির তিরোভাব হইল। তিনি ২৪ পরগণার ইছাপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও সারা জীবন কলিকাতায় বাস করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল।

পাকিস্তানে গণ্ডগোল—

গত ১৯ বৎসর পাকিস্তান সৃষ্টি হইয়াছে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দুইটি পৃথক দেশ হইয়াছে। দুই দেশের মধ্যে পার্থক্য এত অধিক যে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা প্রায়ই পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পৃথক হইবার জন্য আন্দোলন করে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে লোকসংখ্যা বেশী। কাজেই কে কাহাকে দাবাইয়া রাখিবে তাহা লইয়া সর্ব্বদা প্রতিযোগিতা চলে। সম্প্রতি আবার চীন এ বিষয়ে হাত দিয়াছে। চীন তাহার দেশের আয়তন বাড়াইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, কাজেই সুযোগ পাইলে সে পাকিস্তানকেও ছাড়িয়া দিবে না। খানিকটা পাকিস্তান গ্রাস করিতে পারিলে তাহার দেশের আয়তন বাড়িয়া যাইবে।

"অনামিকা"

শক্তি মুখোপাধ্যায়

আমার জীবনে তুমি আসবে বলে
কথা দিয়েছিলে।
আমার হৃদয় তুমি ভরে দেবে বলে
কথা দিয়েছিলে।
আমি তাই নিশিদিন দুয়ার খুলে
দুচোখ পেতেছি।
আমার প্রিয়াকে আমি সাজাবো বলে
মালা যে গেঁথেছি।
মিলনের দিনগুলি একলা বিরলে
তুমি এলে না কেন!
এ জীবনে ভালোবাসা অপরাধ হলে
ভালোবাসি কি হেন।

যৌবনে যে বসন্ত মধুর আলাপে
হৃদয়ে গুঞ্জন করে—
দুয়ারে যে এসে তারে নিঠুর প্রলাপে
কেমনে বলিব, 'যাও ফিরে'।
কত রাগ রাগিণীর সুরের মায়াতে
প্রকৃতি মধুর;
তুমি কাছে নেই তাই হৃদয় ছায়াতে
বেদনা বিধুর।
বাসরের দীপ জেলে আজিও নিশীথে
জেগে আছি একা
কাছে এসো, এসো আজ হৃদয় বীথিতে
ওগো অনামিকা।

প্রতিনিধি

শ্রীঅনিলকুমার বক্সী

শেষ পর্যন্ত উমা এ ব্যবস্থাতে রাজি হ'লো। রাজি হ'লো নয়, রাজি হ'তেই হ'লো। ইন্‌জেকশনটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসীম যন্ত্রণার একটা আলোড়ন সর্ব শিরাউপশিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে তার সমস্ত শরীরটাকে নাড়া দিয়ে গেল। উমা অনেক কিছুই ভাবছিল কিন্তু ইতিমধ্যেই সমস্ত ভাবনার কল বুঝি বিকল হ'য়ে গেছে। নিজেকে সে অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় অনুভব করল।

শরীরের দিক থেকে না হলেও মনের দিক থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। জীবনের দুটো দিক নিয়ে এক সঙ্গে চলা যায়না—যেমন চলা যায়না দু নৌকোয় পা দিয়ে। শয্যায় শায়িত উমা জানলার দিকে তাকিয়ে দেখল—জানলাটা যেন বাইরের ছবির ফ্রেম। বিরাট তাঁবুর ছাউনির মত জ্যোৎস্নামাখা কাঞ্চনজঙ্ঘা আর তারই উপরে অসংখ্য তারাভরা আকাশ যেন অসংখ্য চোখ মেলে তার দুঃসাহসের সাক্ষী হ'য়ে থাকল চিরকাল। উমা ঘুমুতে পারলনা। থেকে থেকে তাদের পোষা মুরগীটার তীব্র আর্তনাদ—বোধ হয় তার বাচ্চাকে নিশাচর কোন প্রাণী আক্রমণ করছে। আর ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা বুকফাটা আর্তনাদ তার মনের হাহাকারের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

এই অল্প কিছুদিনের মধ্যে তার জীবনে কতবড় ঘটনাটা ঘটে গেল। এ বাড়ীতে সে এসেছিল তার বড়দির একান্ত অনুরোধে—তার পরিচর্যার উদ্দেশ্য নিয়ে মাত্র কিছুদিনের জন্য। ডাক্তারের বারণ সত্ত্বেও তার দিদির গর্ভে আবার সন্তান এলো। চারটি বছর ঘুরতে না ঘুরতে তিন সন্তানের জননী। এ নিয়ে সে তার জামাইবাবুকে দোষারোপ ক'রেছে। জামাইবাবু শুধু মৃদু হেসে উমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে—এবার থেকে সাবধান হবে। সন্তান হওয়ার অনুকূলে দিদির শুধু পাশপোর্ট ছিল। কিন্তু উমার এ কি হ'লো? কি কুক্ষণে যে সে এই শৈলশহরটিতে পা দিয়েছিল!

তার চোখের সামনে কি করুণ দৃশ্যের অবতারণা ক'রে তার দিদি মারা গেল—ডাক্তারদের সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল করে দিয়ে। "এক্লেমপ্সিয়া" রোগ নাকি সাংঘাতিক, এতে বেশিরভাগ প্রসূতিই মারা যায়! দিদি যে মারা গেল এ কথা যেন বিশ্বাসই করা যায়না। তার সোনার সংসার ফেলে। এই জন্যেই তো মানুষ ভগবানের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। সবই আছে শুধু দিদি নেই। সামনের সেলাইএর কলটাতে ঢাকনা দিতে ভুলে গিয়েছি বলে দিদির কি বকুনি।—তোরা জিনিসের যত্ন জানিসনে। বাক্সগুলো তো খোলাই যায়না। ওর নিজের হাতে পাট-করা জামা-কাপড়-সাড়ী ধরে ধরে সাজান। দিদির অন্তগামী দৃষ্টির সর্বশেষ রশ্মিটুকু প্রতিটি ঘরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে মিশে আছে।

মরবার আগে দিদি ব'লেছিল—এতখানি এগিয়ে এসে মরতে ইচ্ছে ক'রছেনা উমা। যেমন ক'রে হ'ক তোরা আমাকে বাঁচিয়ে তোল। ফুলও ফুটল সেই ফলও ধরল কিন্তু সে ফলকে পুষ্ট ক'রে যেতে পারলাম না যদি মরি আমার সাজান সংসার যেন ভেসে না যায় মেয়েমানুষ মরে গিয়েও যেন দায়িত্ব শেষ হয়না। আমার 'খোকন'—আমার 'ছবি'—ওরা যে আমারই ছবি আমার জীবন্ত কবিতা। তোকে সব ভার দিয়ে গেলাম। তোরও একটা গতি হবে আমার আত্মাও শান্তি পাবে।...উমার চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। যারা যায় তারা বেঁচে যায় যারা বেঁচে থাকে তাদেরই মরণ!

রমা আর উমা দুই সহজ বোন। রমা একঘণ্টা আগে জন্মানর দিদি। উমা কোনদিনই ওকে দিদি বলে

ডাকতনা শুধু ঠাকুরমার জন্যে। ঠাকুরমা কে যে কোন জন ঠিক করতে পারতনা। তাই ওদের পরস্পরকে 'বড়দি' আর 'ছোড়দি' নামে ডাকত। সেই থেকে উমা রমাকে বড়দি বলে ডাকত আর রমা উমাকে ছোড়দি বলে।

রমাকে হারিয়ে অমল সব কিছু হারাল বলে ক্ষোভ করলেও আসলে সে কতটুকু হারালো—পৃথিবীকে হারিয়ে রমা যেমন হারিয়ে ফেলল সব সেই তুলনায়! উমার মধ্যে রমাকে সে যেন নূতন ক'রে পেল। পড়া বই এর মত—চেহারা, মন, স্বভাব, হুবহু যেন মুখস্ত—পুরানো বই ছিঁড়ে গেলে লোকে যেমন সেই বই নূতন ক'রে কেনে এও যেন তেমনি। অমল অবাক হয়ে গেল যে, যে সময় রমার অসুখ করত উমারও হ'লো তাই। রমার পরিত্যক্ত সেই ওষুধই কাজে লেগে গেল। রমার ছেলেমেয়েকে উমা বুঝতেই দিলনা যে তারা তাদের মাকে হারিয়েছে।

দু'দিনের জন্যে এসে সহস্র বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেল উমা। পাকিস্থানে বৃদ্ধ মা বাবা পড়ে রইলেন। পাশপোর্টে ফিরে যাওয়ার তারিখ কবে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। খুচরো পয়সার মত দিনগুলো একসঙ্গে করে উমা দেখল কয়েকটা গোটা মাসই বেরিয়ে গেছে।

আপিস থেকে ফিরে অমল একদিন বল্লে—সত্যিই উমা তোমার কপাল ভাল। যে প্রমোশনের কথাটা বহুদিন ধরে চলছিল এতদিনে সেটা পাকাপোক্ত হ'লো। তার চিঠি আজই হাতে পেলাম। আজ একটা রেডিওর অর্ডার দিয়ে এলাম। বাড়ীতে তোমাকে একলা থাকতে হয়। ড্রেসিং আয়নাটার ঢাকনাটা আজও আনতে করোনি। ধুলো জমে কাঁচটা না নষ্ট হয়ে যায়। এ রকম বেলজিয়ান গ্লাস আজকাল আর পাওয়া যায়না।

উমা কিন্তু আয়নাটার দিকে তাকাতে পারতনা। যখনই তাকাত মনে হতো আয়নাটার উপরের আকাশ থেকে উঁকিমারা দিদির চোখের সঙ্গে বুঝি তার চোখের সংঘর্ষ হ'লো।

অমলের প্রমোশনের কথাটা শুনে উমার চোখে জল এল। অতি কষ্টে সম্বরণ ক'রে বল্লে—সত্যিই আমার কপাল ভাল কিন্তু তোমার কপালের সঙ্গে আমার কপাল জোড়া হ'লো কই?

নিজেকে শতধারে বিকশিত ক'রে—উমা কথাটা পাড়ল সবইতো হ'লো বাকিতো কিছুই রাখনি, কিন্তু বিয়ের কী করচ!

অমল বল্লে—এত তাড়া কিসের? ওটাতো হ'য়েই আছে, হ'লেই হলো।

উমা বল্লে—এদিকে নিন্দের মুখ দেখাতে পাচ্ছিনে।

অমল বল্লে—নিন্দে কিসের?

উমা ব'ল্লে—সেদিন তোমাদের আপিসের পালবাবুর স্ত্রী বেড়াতে এসেছিলেন।

পালবাবুর স্ত্রী যে কথাটা বলেছিল উমা এদিক ওদিক তাকিয়ে অমলের কানে কানে সে কথাটা বল্লে!

অমল চটে গিয়ে ব'লে—এসব কথা জানল কি করে?

উমা বল্লে—ঐ কাজীটা বলে দিয়েছে। ও ও-বাড়ীতেও তো কাজ করে। ও কি কম শয়তান।

অমল বল্লে—জাতে নেপালী হলে কি হবে—ওসব ব্যাপারে সব মেয়েমানুষই সমান! বাসন মাজে আর সব কিছুই লক্ষ্য করে। এখানকার আকাশকে যেমন বিশ্বাস নেই—তেমনি বিশ্বাস নেই এখানকার মেয়েদের।

উমা হেসে বল্লে—এখানকার আকাশ ব'লোনা—বলো—শুধু আকাশকে—এখানকার মেয়েমানুষকে ব'লোনা—বলো—মানুষকে—

অমল বল্লে—লোকে যেমন এদিক থেকে দেখচে, তেমনি ওদিকটাও ভেবে দেখবার আছে। এই ক'দিন হ'লো বউটা মরেচে সঙ্গে সঙ্গে আবার বিয়ে! তখনও লোকে বলতে কম করবেনা!

উমা বল্লে—তা' বলে বলুক। কিন্তু আর তো দেরি করা যায়না।...উমা কথাটা বলেই হেসে। অমল এই প্রথম জানতে পারল উমার অবস্থাটা। বিয়েতে যদিও সে রাজি হয় বছর ঘোরার আগেই সে সন্তান পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে।

অনেক ভেবে-চিন্তে অমল এখুনি বিয়ে করতে রাজি হলো শুধু এক সর্তে। নিরুপায় উমা বাধ্য হয়ে তাতেই রাজি হ'লো। অমলের এক বন্ধু ডাক্তার আছে। বিলাত ফেরৎ—গাইনোকলজিষ্ট। এসব ব্যাপারে খুব দক্ষ। তাকেই কল্ দেওয়া হ'লো গোপনে। ডাক্তার সব কিছু

পরীক্ষা করে রায় দিলেন—যদিও খুব সাংঘাতিক কেস তবু আশঙ্কার কোন কারণ নেই।

ধীরে ধীরে সেই দিনটি এগিয়ে এল। রোগশয্যায় শায়িত উমা ভাবছিল সব কথা। ছায়াছবির মত সব ঘটনার ছবি প্রতিফলিত হ'চ্ছিল তার মনে একে একে। ডাক্তার ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়ে আর সব কর্ত্তব্য শেষ ক'রে বিজয়ী বীরের মত দৃপ্ত পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উমার কানে এক তীব্র আর্ত্তনাদ ভেসে এল। মানুষের নয়। তাদের পালিত মুরগীটার। সে আর্ত্তনাদে পৃথিবী যেন কেঁপে কেঁপে উঠল। সারারাত তার কক্ কক ডাকে সে ঘুমাতো পারলনা। ভোরের আলোতে উমা লক্ষ্য করল কার পায়ের চাপে মুরগীর একটা বাচ্চা চাপা পড়েছিল—ছিন্ন হয়ে গেছে। পিঁপড়ে-লাগা নাড়ীভূড়ি সমেৎ সেই ছিন্ন অংশগুলোকে মুরগী-মা তার ঠোঁটে ক'রে এক জায়গায় জড়ো করার বৃথা চেষ্টা করছে। যদি বাচ্চাটা বেঁচে উঠে—খুটি খুটি পায়ে আবার তার মাকে অনুসরণ করে চলে। উমা ভাবছিল মা হিসেবে ঐ মুরগী-মাটা তার চেয়ে কত বড়!

কোথায় থামবেন ?

শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়

জীবনের চলার পথে প্রতিদিনই দেখি আমরা, বিশেষ করে বাঙালীরা থামতে জানি না। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন স্তরে মাত্রাজ্ঞানের অভাব আমাদের মধ্যে বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। সংযম আমাদের মোটেই নেই একথা আমি বলছিনা, অনাবশ্যক ও মাত্রাজ্ঞানের অভাব আমাদের চলনে, বলনে এবং কাজে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়। যদি কোন সভায় আপনার উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আপনি বিশেষভাবেই উপলব্ধি করে থাকবেন। যদি কোন বক্তা "মাইকে" বলবার অধিকারী হন তাহলে তিনি অমায়িকভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বারবার বলে আপনার কান ও প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবেন। নয়তো পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার কথাই নানান ভাবপাল্টা দিয়ে সাজিয়ে বিরাট বহীরুহে পরিণত করবেন। আর যদি কোন সাহিত্য-বাসরে আপনার উপস্থিত থাকবার সুযোগ হয়ে থাকে তাহলে দেখে থাকবেন; বাংলাদেশে আর যার অভাব হোক কবির অভাব নেই। একটির পর একটি কবিতা বিভিন্ন পকেট থেকে বেরিয়ে আসরকে রসে ভাসাতে ভাসাতে রসাতলের দিকে নিয়ে যাবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা, ছন্দের বন্ধার ও শব্দের মনোহারিত্ব থাকা সত্বেও তা সেই এক অর্থাৎ কবিতা ছাড়া অন্য কিছু। কবিতার নামগন্ধও তাতে পাবেন না।

সভায় কি বলা উচিত সেটা যেমন স্থির করা প্রয়োজন তেমনি কি বলা উচিত নয় সেটাও বিচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার মনে হয় আজকের দিনে লেখা কবিতা ও বক্তৃতা প্রভৃতির ওপর যদি কিছুটা সংযম ও সংকোচ করা হয় তাহলে পাঠক ও শ্রোতা অতিপঠন ও অতিশ্রবণের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। এই বিষয়ে সুবোধপাঠক ও নিরীহ শ্রোতাদের তরফ থেকে কবিকুল, লেখকসমাজ ও বাগ-বিস্তার বাগ্মী সমাজকে অনুধাবন করতে অনুরোধ করি।

অনেক কবি ও লেখক আছেন যাঁদের লেখা বেশ সুললিত, সরল এবং চিত্তাকর্ষক। বহু বক্তা আছেন যাঁদের বাণী অতি শুদ্ধ এবং বক্তব্য খুব প্রাঞ্জল। কিন্তু অতি-ভাষণ ও মাত্রাজ্ঞানের অভাব তাঁদের পাঠক ও শ্রোতার কাছে ভয়াবহ করে তোলে। এই প্রসঙ্গে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের একটি মূল্যবান উপদেশ আমার মনে পড়ে। বাল্যকালে লেখার ভূত আমার মাথারও চেপেছিল এবং শরৎচন্দ্রের কাছে লেখক হবার সহজপথ জানতে চেয়েছিলুম। তার উত্তরে যে অমূল্য উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন তা হয়তো আজ বেশীর ভাগ লেখকের প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেছিলেন "কি লিখবে ?"

মাসিক রাশিফল

শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য

১৬ই জ্যৈষ্ঠ হ'তে ১৫ই আষাঢ় পর্যন্ত

এবার আমরা ফলিত জ্যোতিষ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করছি। গত বৈশাখ সংখ্যায় আমরা রবি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এবারে তা শেষ করে চন্দ্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলাম।

শুক্র সদা সর্বদা রবিকে বেষ্টন করে আছেন। তিনি কখনই রবির কাছ ছাড়া হতে চান না। ইন্দ্রিয়সুখ-সম্ভোগের দিকে তাঁর দৃষ্টি সদা জাগ্রত। বিলাসিতায় তিনি ডুবে থাকতে চান। তিনি বলেন, সর্বদা হাস, খেল ও আনন্দ কর এবং প্রকৃতির যা কিছু সুন্দর ও মধুর তা ভোগ কর। কিন্তু রবি ভোগবিলাসের পক্ষপাতী নন। তিনি আদর্শ রাজা, পিতা ও রক্ষাকর্তা। কাজেই আমন্দ-লিপ্সা রবির মধ্যে প্রবলভাবে অভিব্যক্ত হয় না।

বুধও শুক্রের মত রবির কাছে কাছেই থাকতে চান। বুধ অর্থনীতিবিদ্, পণ্ডিত ও বক্তা। তিনি জ্ঞানের বার্তা প্রচারে মুখর। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। কাজেই, তিনি যখন যে গ্রহের সঙ্গে যুক্ত হন, তখন তাঁরই মত হয়ে কাজ করেন। তাই বার্তাবহ বুধ রবির প্রচার সচিব ও হিসাব রক্ষক।

চন্দ্রের প্রভাবও রবির চেয়ে কম নয়। রবি হচ্ছেন পুরুষ, চন্দ্র প্রকৃতি। রবি ব্রহ্ম, চন্দ্র মায়া। রবি সৃষ্টির কর্তা, চন্দ্র সৃষ্টির প্রকাশক বা রক্ষক। রবি জীবের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি ও জীবনীশক্তি নির্দেশ করেন—চন্দ্র নির্দেশ করেন —সে প্রকৃতির প্রকাশ বিকাশ ও শক্তির সংরক্ষণ। রবি যে জীবনীশক্তি উৎপন্ন করেন, চন্দ্র যদি তা জমা করে না রাখেন, তাহলে জীবদেহ রক্ষাকরা সম্ভব নয়। তাই শিশুরিষ্ট বিচারে চন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী।

রবি জীবনীশক্তির কারণ, চন্দ্র জীবনের প্রকাশ। জীবনের প্রকাশ নিয়েই কোষ্ঠীর বিচার। সেজন্য রবি মূলাধার হলেও কোষ্ঠী বিচারে চন্দ্রের প্রাধান্য অনেক বেশী। গোচর বিচারে চন্দ্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। দশা বিচারও চন্দ্রভোগ্য নক্ষত্র হতেই করতে হয়।

চন্দ্র মনের কারক। সকল জিনিষ অনুভূতির কেন্দ্রই মন। চন্দ্রই মাতার শুভাশুভ সূচনা করেন। বলবান চন্দ্র যাদের জন্ম, তাদের হৃদয় মায়ের মত কোমল ও মমতাময়। তাঁরা পরের দুঃখ-কষ্টে কাতর হয়ে থাকেন। দুর্বল চন্দ্রে যাদের জন্ম, তাঁরা নিষ্ঠুর, নির্দয়, বিবেকশূন্য ও স্বার্থপর হন। তাঁরা পরশ্রীকাতর হয়ে থাকেন।

চন্দ্রের নিজস্ব কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। তিনি যখন যে আধারে বা পাত্রে থাকেন, তখন সে আধার বা পাত্রের আকার ধারণ করেন। তিনি যখন যে রাশি বা গ্রহকে আশ্রয় করে থাকেন, তখন তিনি সে রাশি বা গ্রহের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন এবং তাদের রূপ নিজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেন।

চন্দ্র ভাব রাজ্যের রাজা। তিনি সর্বদা ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। তিনি কল্পলোকে বিচরণশীল। কিন্তু শনি পরিপূর্ণ দুঃখ ও নৈরাশ্যের সূচক। তিনি জড়ত্ব ও স্থবিরের

প্রভৃতি। তিনি বাস্তববাদী, কল্পনার স্থান তাঁর কাছে নেই। কাজেই চন্দ্র অস্থির ও চঞ্চল। মনঃকষ্টে তিনি ভেঙ্গে পড়েন। দুঃখের প্রতিচ্ছবি তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

বৃহস্পতি হচ্ছেন তত্ত্বজ্ঞানী ও পরিপূর্ণ আনন্দময়। তিনি জ্ঞানের অনুভূতি। জ্ঞানকে তিনি বাস্তব জিনিষের মত প্রত্যক্ষ করেন। তিনি সর্বদা অরূপের ধ্যানে মগ্ন। তিনি ধ্যানের দ্বারা পরমতত্ত্ব অবগত হয়েছেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি সর্বত্র ব্রহ্মের প্রকাশ ও বিকাশ দেখতে পান। আর চন্দ্র সংবেদনশীল। তার মধ্যে বিশ্বের সুখ ও দুঃখ অনুভব করবার শক্তি যথেষ্ট রয়েছে। কাজেই যার জন্মসময়ে চন্দ্র বৃহস্পতি দ্বারা সু-সংযুত হন, তিনি জ্ঞানে ও হৃদয়ে বিশ্বমানব হতে পারেন এবং তাঁরই বাণী বিশ্বের দরবারে বিশ্বমানবের বার্তা বহন করে।

চন্দ্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হল। যাক, এবারে রাশিগুলি অনুসারে ব্যক্তিগত মাসিক শুভাশুভ ফলের আভাস দিচ্ছি।

মেষ—চাকুরী কিংবা ব্যবসায় রূপবিবর্তনের যোগ রয়েছে। অর্থাগমের যোগাযোগ ঘটতে পারে। কোনও কারণে উত্তেজিত হবেন না; পরিণামে অনর্থ ঘটবে। বাইরে যাবার যোগ রয়েছে। মাসের প্রথম দিকে স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে। ভুলের বশে কিছু অর্থক্ষতি হতে পারে। শত্রুর কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত, তারা আপনার দুর্নাম প্রচারের চেষ্টা করবে। আইনজীবীদের সময়টা ভাল নয়। চিত্রপরিচালক ও প্রযোজকদের নতুন চুক্তির ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট দেখা দিতে পারে। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের পক্ষে সময়টা প্রতিকূল। ব্যবসায়ীদের অর্থাগমের যোগ রয়েছে। বেকারের চাকুরীলাভ হতে পারে। মহিলারা ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে অশান্তি ভোগ করবেন।

বৃষ—অর্থাগমের যোগাযোগ ও নতুন কর্ম প্রচেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা। গৃহাদি সংক্রান্ত ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলুন। নিজের ভুলে দাম্পত্য-ক্ষেত্রে অশান্তি ঘটতে পারে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের সম্ভাবনা রয়েছে। হঠাৎ কোন খরচের ভাবনায় পড়তে পারেন। একগুঁয়েমী ও জেদের বশে কোন কাজ করবেন না। আত্মীয়-বিরোধ হতে পারে। কারীগরী ও চিকিৎসা-বিদ্যায় সুনাম লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা গোলমেলে। অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতীদের পক্ষে সময়টা অনুকূল। চিত্রপরিচালক ও প্রযোজকরা নতুন চুক্তির ব্যাপারে সাফল্য পাবেন। বেকারের চাকুরী লাভের যোগ রয়েছে। তরুণ-তরুণীদের স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে বাধা আসতে পারে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা প্রতিকূল।

মিথুন—আগের চেয়ে আর্থিক অবস্থা অনেকাংশে ভাল চলবে। ছেলেমেয়েদের কারো জন্য উৎকণ্ঠা ভোগের লক্ষণ আছে। শিরঃপীড়ায় মাঝে মাঝে কষ্ট পাবেন। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাউকে কথা দেবেন না। আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে কিছু অর্থ সাহায্য করতে হতে পারে। পত্নীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীন থাকবেন না; পরিণামে দুশ্চিন্তা আসবে। আপনি কি লটারীর টিকেট কাটেন? কেটে যান; টাকা পাবেন। ব্যবসায়ীরা পূর্ব সুনাম ফিরে পাবেন। শিল্পী ও লেখকদের সুনাম ও স্বীকৃতি লাভের সম্ভাবনা। আইনজীবীদের ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে মাসের মধ্যভাগ সুফলপ্রদ নয়। পুলিশের পদস্থ কর্মচারীদের এ মাসটা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। বেকারের চাকুরীলাভ হবে। মহিলাদের মধ্যে যারা চাকুরী করেন তাদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ও মর্যাদালাভের সম্ভাবনা।

কর্কট—নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে নামার পক্ষে এ সময় প্রতিকূল। শত্রুরা প্রবল হয়ে উঠতে পারে। স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে। যে আর্থিক ব্যাপারটা নিয়ে কিছুদিন থেকে বিব্রত বোধ করছিলেন, এবার তার সুরাহা হবে। আত্মীয় ও বন্ধুদের জন্য কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। বাসস্থানের রূপবিবর্তনের যোগ রয়েছে। প্রিয়জনের কারো সম্পর্কে কিছুটা উৎকণ্ঠা ভোগের আশঙ্কা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা গোলমেলে। চাকুরীজীবীদের কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট ও ক্ষতির আশঙ্কা আছে। চিত্র পরিচালক ও প্রযোজকদের নতুন প্রচেষ্টা সফল হবে। শিল্পী ও লেখকদের কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। তরুণ-তরুণীদের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহ হতে পারে। বেকারের চাকুরী লাভ এখনে হবে না। মহিলাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা।

সিংহ—কোন ঝুঁকির কাজ নিয়েছেন কি? ঝঞ্ঝাটে পড়বেন। আরও কিছুদিন আর্থিক দুর্ভাবনার উদ্বিগ্ন

থাকতে হবে। চাকুরীজীবীদের মনোমত কর্ম পরিবর্তনের যোগ রয়েছে। দাম্পত্য-ক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পাবে। পত্নীর দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। ব্যবসায়ীদের আয় যেমন বাড়বে তেমনি কোনো আকস্মিক বিপদও ঘটতে পারে। লেখক ও শিল্পীদের পক্ষে এ মাসটা আশানুরূপ হতে পারে। আইনজীবীদের পক্ষে এ মাসটা সুফলপ্রদ। বেকারের কর্মলাভ মাসের শেষ দিকে হতে পারে। মহিলাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে।

কন্যা—পারিবারিক অশান্তির লক্ষণ আছে। এমাসে আপনার কিছু ঋণ হতে পারে। স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে। কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট দেখা দিতে পারে। ভুলের বশে কিছু অর্থক্ষতির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের পক্ষে এ মাসটা নৈরাশ্যসূচক। চাকুরীজীবীদের পক্ষে মাসের শেষাংশ সুফলপ্রদ। বেকারের কর্মলাভ হতে দেরী আছে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ।

তুলা—আপনার উৎসাহ-উদ্দীপনা নতুন কর্মে সাফল্য ও স্বীকৃতি দেবে। কারো প্ররোচনায় কোনো বে-আইনী কর্মে লিপ্ত হবেন না। শত্রুরা কুৎসা রটাতে পারে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে এ মাসটা ভাল নয়। চিত্র-পরিচালক ও প্রযোজকদের সময়টা গোলমেলে। ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান হন। শিল্পী ও লেখকদের পক্ষে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্যের আলো দেখা দেবে। তরুণ-তরুণীদের মনোনীত পাত্রী-পাত্রে বিবাহ হতে পারে। বেকারের কর্মলাভ হবে। মহিলাদের সময়টা ঝঞ্ঝাট পূর্ণ।

বৃশ্চিক—বেপরোয়াভাবে কোনো কাজে এগিয়ে যাবেন না। তাতে ঝামেলায় পড়বেন। কর্মবাধায় বাধা ও সংঘাত মনের উপর চাপ দেবে। উদর ও আন্ত্রিক পীড়াদি মাঝে মাঝে উৎপাত করবে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে এমাসটা গোলমেলে। প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে সাবধান হয়ে চলুন। নচেৎ ভবিষ্যৎ-জীবন অশান্তিপূর্ণ হবে। আর্থিক নৈরাশ্য দেখা দিলেও সঞ্চয় কিছু থাকবে। মাসের শেষে কর্মপ্রেরণা বাড়বে। গুরুজন হানির যোগ দেখা যাচ্ছে। বেকারের কর্মলাভ হতে দেরী আছে। মহিলাদের স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে।

ধনু—চাকুরী কিংবা ব্যবসায়ে সুপরিবর্তনের যোগ রয়েছে। অর্থাগমের যোগাযোগ ঘটতে পারে। স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করবে। ব্যবসায়ীদের আয় বাড়বে। আইনজীবী ও চিকিৎসকদেরও অর্থাগমের যোগাযোগ বাড়বে। যাঁরা কারখানার মালিক তাদের আকস্মিক কারণে ক্ষতির সম্ভাবনা। চাকুরীজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। প্রিয়জনদের কারো জন্য উৎকণ্ঠা বাড়বে। এবার আপনার কর্মধারায় পরিবর্তনের যোগ রয়েছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ হতে পারে। বেকারের চাকুরীলাভ হবে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ভাল।

মকর—আপনি যে গোপনীয়তা রক্ষা করছিলেন, এবার তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আপনার পরনির্ভরশীলতা কাটবার সময় এসেছে। নিরাশ হবেন না। ধৈর্য ধরে কাজ করে যান। উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলুন। আর্থিক নৈরাশ্য কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই, কোন বিশেষ ব্যাপারে যোগ্যতা দেখাবার সুযোগ আসছে। চিত্র পরিচালক ও প্রযোজকদের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। শিল্পী, অভিনেতা ও লেখকদের নতুন চুক্তির ব্যাপারে সাফল্য পাবেন। আইনজীবীদের আয় বাড়বে। চিকিৎসকদের এ মাস মন্দা যাবার সম্ভাবনা। বেকারের চাকুরীলাভের যোগ রয়েছে। মহিলাদের প্রীতির প্রসার ও উৎসাহ-আনন্দ বৃদ্ধি পাবে।

কুম্ভ—আর্থিক ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কর্মক্ষেত্রে সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে। একজন হৃদয়বান বন্ধু লাভ করতে পারেন। স্বাস্থ্যসম্বন্ধে উদ্বেগের কোন কারণ নেই। পারিবারিক ঝঞ্ঝাট আছে। শত্রুরা উৎপাত করবে। পত্নীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আইনজীবীদের আয় বাড়বে। ব্যবসায়ীদের নিজের ভুলে ক্ষতি হতে পারে। দূরভ্রমণে বাধ আসতে পারে। তরুণ-তরুণীদের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহ হতে পারে। শিল্পী ও লেখকদের আয় বাড়বে। আশ্রিতজনের বিশ্বাসঘাতকতা অসহ্য হয়ে উঠবে। ভ্রাতার পীড়াদি আপনাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে। বেকারের কর্মলাভের যোগ রয়েছে। মহিলাদের শরীর ও মনের উপর চাপ পড়ার সম্ভাবনা।

মীন—কর্মক্ষেত্রে চিন্তার কোন কারণ নেই, যদিও অবাঞ্ছিত ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনের উপর চাপ দেবে। দূরভ্রমণের যোগ রয়েছে। যাদের কর্মবিরতির কথা, তাদের কর্মান্তর প্রাপ্তিতে বেকারত্ব ঘুচে যাবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তরুণী মেয়েদের বিবাহ হতে পারে। আত্মীয়-বিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় থাকবে না। লেখক ও শিল্পীদের নৈরাশ্য দেখা দেবে। নতুন বন্ধুলাভের যোগ রয়েছে। চিত্র-পরিচালক ও প্রযোজকদের এমাসটা ঝঞ্ঝাট পূর্ণ। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবেনা। ব্যবসায়ীদের এমাসটা মন্দা যাবে। বেকারের চাকুরীলাভের যোগ রয়েছে। মহিলাদের স্বাস্থ্য উৎপাত করবে; বিশেষ কোন সখের জিনিষ পাবারও সম্ভাবনা।

প্রজাপতির নির্বন্ধ

* ● ● পীযূষ চন্দ

—চরিত্র পরিচয়—

অনাদি মিত্র		কন্যার পিতা।
অমল		অনাদির ছোট ছেলে।
রমা		ঐ কন্যা।
মালতী		ঐ স্ত্রী।
যতীন রায়		ছেলের পিতা।
মলিনা		যতীনের স্ত্রী।
শ্যামল	...	ঐ ছেলে।

দুটিনটি অল্পবয়সী মেয়ে।

[মঞ্চ :—বিকেল। মধ্যবিত্ত পরিবারের drawing room cum study, সোফা, কৌচ ইত্যাদি যেমন আছে আবার অবসরে জন্য এককোণে পড়াশোনা করার চেয়ার-টেবিলও আছে। ঘরের মাঝে একটি টেবিলকে ঘিরে অনাদি, যতীন, মলিনা বসে আছেন। অমল তার চেয়ার ঘুরিয়ে এঁদের দেখছে।]

মলিনা। আজকাল শ্যামলের মত ছেলে হয় না। নিজের ছেলে বলে নয়, আপনি ওর অফিসে, পাড়ার ক্লাবে যেখানে ওর যাতায়াত আছে, খোঁজ নিয়ে জানবেন, ওর মত মিষ্টকে, পরোপকারী ছেলে আর হয় না। যেটুকু সময় বাসায় থাকবে ওর বন্ধুরা ডাকাডাকি করবে। ছেলে ঘুমানো খাওয়ার অবসর পায় না। কোথায় পাড়ার function হবে শ্যামলকে চাই, না হলে সব বন্ধ। কোথায় শ্যামল মিত্র, বটুক নন্দী, ধনঞ্জয় ভটচায আরো কত কে? আমি ছাই নামও জানি নে, হাঁগা, আরো সব artistদের নাম যেন কি?

যতীন। মলিনা রায়, যতীন রায়—

সকলের হাস্য

মলিনা। কী সব সময় ইয়ার্কি কর। আমি আবার artist হলুম কবে! তুমিই বয়েস কালে পাড়ায় থিয়েটার করে বেড়াতে। আমি আবার কবে থিয়েটার করেছি?

যতীন। [স্মিত হাস্যে] তোমরা হলে জাত artist, অভিনয় প্রতিভা নিয়েই জন্মাও। আমাকে অনেক সাধ্য সাধনা করে artist হতে হয়েছে। অনেক rehearsal দিতে হয়েছে। powder, panit মাখতে হয়েছে। কিন্তু তোমরা—মানে গৃহিনীদের কিছুই করতে হয় না। ভগবান তোমাদের সব দিয়ে দিয়েছেন আর সংসারই তোমাদের stage.

মলিনা। যাক্, ওর কথায় কাজ কি! অনাদিবাবু এবার মেয়েকে নিয়ে আসুন, দেখব।

অনাদি। অমল, যা ত' রমাকে নিয়ে আয়।

অমলের প্রস্থান

যতীন। আমার হাতে মোটেই সময় নেই। ছটার সময় আমাকে বাড়ী ফিরতে হবে। আপনারা একটু শীগ্‌গির করুন।

অনাদি। (চেঁচিয়ে) অমল, রমাকে যেমনি আছে তেমনি নিয়ে আয়। দেরী করিস নি। (নিম্নস্বরে) মেয়ে দেখার আগে একটু মিষ্টি মুখ করবেন না?

মলিনা। মুখ আমাদের মিষ্টি সব সময়। নতুন করে আর কি করব? আমি না হয় মাকে দেখতে ভেতরে যাই। মেয়ের মা তো এখনও দর্শন দিলেন না। ভেতরে গিয়ে একটু আলাপ-পরিচয় করে আসি। (উঠতে উদ্যত)

যতীন। ভেতরে গেলে দেরী হয়ে যাবে। তার চাইতে পরিচয়, দেখা ইত্যাদি এখানে করো।

[নম্রপদে রমার অমলের পেছনে প্রবেশ। পরিধানে

সাধারণ মিলের সাড়ী, রমার হাতে মিষ্টির প্লেট। অমলের হাতেও। মালতী দোরের কাছে দাঁড়িয়ে। আরো দুই তিনটি অল্পবয়সী মেয়ে জানালা দিয়ে বারে বারে উঁকি দিচ্ছে। অমল ও রমা মিষ্টির প্লেট টেবিলের উপর রাখল।]

মলিনা। [রমাকে আপাদমস্তক দেখে] দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো মা, বোস।

[রমা বসল]

অনাদি। এই আমার মেয়ে রমা। রূপ আপনারা দেখছেন। গুণে লক্ষ্মী-সরস্বতী। [রমা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল]

মলিনা। বেঁচে থাক মা! নাম কি তোমার?

রমা। কুমারী শাশ্বতী মিত্র। ডাক নাম রমা।

মলিনা। B. A. তে তোমার কি combination ছিল?

রমা। Economics আর Education.

মলিনা। আধুনিক গায়কদের মধ্যে কার গান ভাল লাগে?

রমা। কারোই নয়।

মলিনা। সে কি! তুমি গান ভালবাস না?

রমা। বাসি, তবে আধুনিক নয়—ধ্রুপদী।

মলিনা। ধ্রুপদী মানে classic তো। তা মা, ধ্রুপদী গায়কদের মধ্যে কার গান ভাল লাগে?

রমা। সবারের।

অনাদি। মা আমার ওস্তাদী গানের বড় ভক্ত।

মলিনা। তা বেশ। শুকতো রাঁধতে কাঁচা না শুকনো লংকা দেবে?

রমা। আমরা লংকা দি না। আদা বাটা দি।

যতীন। (হেসে) মিলবে ভাল। দেখি মা, তোমার বাঁ হাত। (হাত দেখে) ভাগ্যরেখাটি চন্দ্র থেকে রবি পর্যন্ত সমান টানা। শুক্রর দৃষ্টি প্রখর। তুঙ্গে বৃহস্পতি। বেশ বেশ। হাত ওল্টাও। নরগণ, শ্যামলের দেবগণ, রাজযোটক, আঙুল লম্বা, শিল্পীর লক্ষণ। (কপাল দেখে) ধনবতী, দেখি মা তোমার পা—ধীরগামিনী, আচ্ছা মা, নিশ্চয় তোমার পড়তে ইচ্ছে করে? কোন subject নিয়ে M. A. দেবে?

রমা। আমার আর পড়ার ইচ্ছে নেই।

যতীন। That's good, (মলিনাকে দেখিয়ে) এঁকে তোমার কেমন লাগল?

মলিনা। ও কি প্রশ্ন? সবাইয়ের সঙ্গে কাজলামো। মা, তুমি এবার যাও। তোমার মাকে পাঠিয়ে দাও।

রমার প্রস্থান

অনাদি। মাকে কেমন লাগল? পছন্দ হয়েছে তো?

যতীন। আমাদের পছন্দ তো আর final নয়। যার সংগে জীবন কাটাতে হবে তার পছন্দ হলেই হল।

অনাদি। আমার অবস্থা স্বচোখে দেখতে পাচ্ছেন। নতুন করে আর কি বলব? আমি আজ দু'বছর হল retire করেছি। ছোট ছেলেটি এবার class x এ উঠল। Retire করার সময় যে টাকা পেয়েছিলাম তা ওর দিদির বিয়েতে খরচ হয়ে গেছে। অবশ্য ওর দাদা রেলের Assitant Engineer কিন্তু হলে হবে কি। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। যদি দয়া করে আমার মাকে আপনাদের পায়ে একটু ঠাঁই দেন, আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। দেনা-পাওনা সম্বন্ধে—

[হাত কচলাতে লাগলেন।

যতীন। আপনাকে জানিয়েছি তো শ্যামলের পছন্দ-অপছন্দের ওপর সব নির্ভর করছে। এখন দেনা-পাওনার কথা উঠতে পারে না!

অনাদি। ধরুন, ছেলের পছন্দ হয়েছে, তাহলে? হেঁ—হেঁ—হেঁ। সবই আপনার কৃপা। একটু দয়া করে—

যতীন। এর মধ্যে দয়ার প্রশ্ন অবান্তর। আপনার মেয়ে ও আমার ছেলে দুজনেই বিবাহযোগ্য। এ'তো ব্যবসা নয়। ছেলের পছন্দ হলে পাওনার জন্য আটকে থাকবে না।

অনাদি। সত্যি, আপনি কত যে মহৎ, কত উদার!

যতীন। উদার-মুদার আমি কোন দিনই নই। ও বদনাম আমার শত্রুরাও দিতে পারে না।

অনাদি। (চেয়ার হতে উঠে প্রায় নতজানু হয়ে) কি যে বলেন Sir! [মালতী প্রবেশ করলেন এবং অনাদির দিকে ভ্রূকুটি করলেন]

যতীন। (হাত ধরে অনাদিকে চেয়ারে বসিয়ে) একি করছেন? (মালতীকে) বসুন।

[মালতী বসল

অনাদি। একটা estimate করতে হবে তো। যদি দয়া করে একটু জানান।

যতীন। সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম বলতে গেলে এই আমার প্রথম। আমার ছেলে মাত্র ঐ একটি। মেয়ে এবার degree courseএ ভর্তি হলো। ওর বিয়ের এখনও অনেক দেরী। দরদস্তুর আমার দশ কাঠার ওপর দোতলা বাড়ী। বেলঘরিয়ার বাড়ীটি একতলা। দুশ টাকায় ভাড়া দিয়েছি। বর্ত্তমানে আমাদের দশ বিঘে ধানী জমি আছে। জামাইর চাকরীর কথা তো জানেন। কেমিক্যাল কম্পের Purchasing officer. ওর underএ তিনটে graduate, একটা M. A. সরকারী মহলে ওর দুর্দান্ত influence. জামাই শুধু আমাদের ছেলে বলে নয়, সবাই বলবে—ভারী smart এবং popular ও।

মলিনা। কোম্পানী ওকে নিউ আলিপুরে quarter দিতে চেয়েছিল। ও নেয় নি। তাই বাড়ী ভাড়া বাবদ আড়াইশো টাকা দেয়। মাসের মাসে ওকে গাড়ী—ড্রাইভার দেবে।

যতীন। Assitant Manager হওয়ার আগে বিলেত যেতে হবে। এতদিনে promotion পেয়েও যেত। কিন্তু ছেলের কি ওসব খেয়াল আছে? আমারই তো ছেলে। শুধু function নিয়ে ব্যস্ত। কত বলি, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। নেশা মশাই, রক্তের নেশা। আমারও ছিল। থিয়েটার—থিয়েটার করে আমার service career doomed হয়ে গেল। নির্ঘাৎ chief controller হতে পারতুম। অদ্দিষ্টে নেই তাই Deputy হয়েই retire করতে হলো। থাক গে সে সব। আমার শ্বশুরমশায় কিন্তু আমাকে বড্ড ঠকিয়েছিলেন—

মলিনা। Shut up. বলতে লজ্জা করে না। ত্রিশ বছর আগে ত্রিশ ভরি সোনা খাট চেয়ার টেবিল। হাজার টাকা নগদ। আর—আর—হাঁ—দিদি, আপনি বলুন, রূপ কি আমার কম?

মালতী। সে আর বলতে! এখনও আপনাকে বিয়ে দেওয়া যায়। [হাসি]

মলিনা। বাকী ছিল শুধু দিতে চিত্তের কাঠ।

যতীন। আরো দিয়েছিলেন—একটি steelএর জিভ। আমার বাবা ছিলেন সন্ন্যাসির! যাকগে মশাই, পুরনো কথা। দাবী দাওয়া আমার কিছু নেই। ব্যবসা করতে আসি নি। ছেলেকে বেচব না। আত্মীয়-কুটুম আছেন। তাদের মুখ চেয়ে বলতে হয়। বাড়ী গাড়ীর দরকার নেই। তা আপনাদের আশীর্বাদে আমার আছে আর হবেও যাবে। লক্ষ্মীকে গৃহে পাঠাবেন তার উপযুক্ত দিতে হবে বৈকি? সোফা, কৌচ, আলমারী, ড্রেসিং টেবিল এগুলো তো mention করতে হবে না। all-wave radio আমার আছে। কিন্তু জামাইর গান-বাজনার ভারী সখ। একটি radiogram না হলে ছেলের মন উঠবে না।

মলিনা। গান-বাজনা হলেই হ'বে। বলি খেতে হ'বে না? Refrigerator না হ'লে খাবারটা রাখবে কোথায় শুনি।

যতীন। সে তো ঠিক। আমার মনে ছিল না। সে জন্যেই তো darling, you're dear to me more than life.

অনাদি। ভগবান আপনাদের দীর্ঘায়ু করুন, Sir. কিন্তু এসব আমার পক্ষে—

যতীন। (বাধা দিয়ে) আমি bargain করতে আসি নি। আপনাকে প্রথমেই জানিয়েছি। মেয়ে আপনার। তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আপনার।

অনাদি। সে তো একশ বার। ওর দিদিকে আমি পাকা দশ ভরি দিয়েছিলাম। ও তো আমার ছোট মেয়ে। ওকে নিশ্চয় দশভরির এক রতি কম দেব না। তা বলে ভাববেন না আমি 14-carat দেব। যাচাই করে নেবেন। ওই তো সবই ওর মায়ের গায়েই আছে। হাঁগা, তুমি এগিয়ে এসে দেখাও না কেন? ওঁদের মনে যেন কোন doubt না থাকে।

মালতী। দেখাতে হবে না। ওঁদের চোখ আছে।

যতীন। আপনি বেশ খাঁটি কথা বলেন।

মালতী। আমি কথায় ও কাজে খাঁটি—

মলিনা। তা বেশ, তা বেশ। আজকাল আবার সবেতে ভেজাল কিনা! আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে পারলে বেশ খাঁটি আত্মীয়তা হবে বলে মনে হচ্ছে।

যতীন। কিন্তু অনাদিবাবু, আপনার মেয়ে কি দশ ভরিতে মানাবে?

অনাদি। রমা বলে, ওর নাকি সোনাদানা পরতে

ভাল লাগে না। বিশেষ করে চীনা আক্রমণের পর থেকে সোনার ওপর ওর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে।

যতীন। মা, আমার দেশপ্রেমিকা! শ্যামলের একটা দিকে অন্ততঃ বাঁচোয়া। সোনা না হয় নাই দিলেন। রূপো কিন্তু আমার দশ হাজার চাই।

অনাদি। একি বলছেন যতীনবাবু, আপনাকে তো বলুম, বড় মেয়ের বিয়ে দিতে আমার retirementএর টাকা সব বেরিয়ে গেছে। আমার হাতে আর কিছু নেই। এটা Sir, আপনাকে consider করতেই হবে।

যতীন। সোনাতে বললেন আপনার মেয়ের বিতৃষ্ণা। কিন্তু রূপোতে আমার তৃষ্ণা আছে। ওটি না হলে আমার চলবে না।

অনাদি। আমার সব বিক্রি করলেও যে দশ হাজার হবে না।

যতীন। তাহলে কি বলতে চান, ছেলের বিয়েতে ঘরের টাকা খরচ করব? আমার মেয়ে যে এখনও আই-বুড়ো, সে কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন, অনাদিবাবু।

অনাদি। এ যে আকাশ-চোঁয়া! ধারে কাছে যাই এমন সাধ্যি আমার নেই।

যতীন। মেয়ের বিয়েতে তা এমন একটু-আধটু খরচ হয়েই থাকে।

অনাদি। কিন্তু প্রিয়বাবু যে বললেন খুব easy terms কোন খরচ পাতি নেই। শুধু বাপ মায়ের পছন্দ হলেই হল। এখন শুনতে পাচ্ছি ছেলের পছন্দ final. সোফা, কৌচ, refrigerator, radiogram, তারও পর দশ হাজার টাকা cash, হাঁগা, প্রিয়বাবু তোমাকে কি বলেছিলেন?

যতীন। who's প্রিয়বাবু? ছেলে প্রিয়বাবুর না আমার? তার কথার দাম কি মশাই?

মলিনা। দাদাকে নিয়ে টানাটানি কেন? এ ব্যাপারে দাদার কি? পেলে ভাল না পেলে আরো ভাল। দাদার কি এসে যায়?

[অমল book-shelf থেকে একটি বই নিয়ে দেখছিল। এমন সময় একটি ফটো মাটিতে পড়ে গেল। যতীনবাবু বিস্মিত হয়ে সেটি কুড়িয়ে নিলেন)

যতীন। খোকা, এ ফটো এখানে কেন?

অমল। জানি না, এটা দিদির বই। তার ভেতরে ছিল।

মলিনা। কার ফটো দা—দেখি, দেখি—ওমা, এযে শ্যামলের ছবি। এ ছবি এখানে এলো কি করে, অনাদিবাবু?

অনাদি। [ছবি দেখে] তাই তো, এ ছবি তো আপনার ছেলের। বাবাজীকে সেদিন দেখলুম। হাঁগা, এ ছবি এখানে এলো কি করে?

মালতী। বলি, এত বয়েস হলো এও বুঝতে পারলে না। একটি কুমারী মেয়ের কাছে যদি একটি জোয়ান ছেলের ছবি থাকে তার মানে কি হয়?

মলিনা। কি সব হেঁয়ালী করছেন? খুলে বলুন না, মালতী দেবী।

মালতী। আমিও মা, আপনিও মা। ছেলের মনের খবর যদি না রাখলেন তবে আপনি কেমন মা?

[যতীনবাবু ও মলিনা ক্রুদ্ধ এবং মৌন। অনাদিবাবু, বিব্রত, তাই অন্যমনস্ক। এমন সময় দ্রুতপদে শ্যামল প্রবেশ করল। একটু ইতস্তত করে এগিয়ে গেল।]

শ্যামল। এই যে বাবা, না তোমরা আজই হাজির হয়েছ। বাবা, তোমার না মিটিং ছিল ছটায়? এখন তো সাড়ে ছটা বাজে। মিটিং কি এখানে হচ্ছে?

[উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে ওকে দেখল]

মলিনা। তুই এখানে এলি কেমন করে?

যতীন। কতদিন থেকে তুমি এখানে যাতায়াত করছ? কি প্রয়োজন তোমার এখানে আসার?

শ্যামল। এতগুলো বুলেট এক সঙ্গে ছুঁড়লে কোন্-টাকে থামাই বল? মায়ের প্রশ্নের উত্তরে বলছি—এটা রমাদের বাড়ী তাই এসেছি। বাবার প্রশ্নের উত্তরে বলব, আজ নিয়ে তিনদিন এলুম। আর এসেছি, তোমরা যে হানা দেবে তার সংবাদ দেওয়ার জন্য।

[রমার প্রবেশ এবং মুখে হাসি। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে]

যতীন। তাহলে এ সব farce এর কি দরকার ছিল? আমাদের এখানে আনিয়ে তোমার এ ভাবে অপমান করার কোন right নেই। preplaned intrigue!

শ্যামল। সত্যি বলছি বাবা, একটা farce নয়। আমার জীবনের চরম সমস্যা। [যতীনবাবুর পা ছুঁয়ে]

আর তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, তোমাদের অপমান করার কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না। রমাকে আমি ভালবাসি। তাকে সহজ ভাবে পাওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয়েছে।

যতীন। আহা কি কর্তব্য বোধ! ভক্তিপ্রকাশ কি অপূর্ব নমুনা। ধন্য তোমার রুচি জ্ঞান। ৬০ লক্ষ লোকের কলকাতায় আর মেয়ে পেলে না। বেছে বেছে হা-ভাতে ঘরের মেয়ের সঙ্গে love-এ পড়েছ।

শ্যামল। বাবা, আমি ঘরের প্রশ্ন বিবেচনা করি নি! কার বাপের কত bank balance আছে, কার কলকাতায় কখানা বাড়ী আছে, মোটর আছে, সে বিচার করবে তোমরা। আমি জানি, রমা একটি accomplished girl. রুচি আছে, সংযত, বুদ্ধিমতী, cultured—

যতীন। stop talking. নির্লজ্জ বেহায়া! তোমার মত দুষ্পোষ্য শিশুর কাছে আমাকে মেয়ে-চেনার lesson নিতে হবে? বলতে তোমার লজ্জা করে না? তুমি ভুলে যাচ্ছ, society-তে আমার একটা position আছে?

শ্যামল। তুমি তোমার society নিয়ে থাক। আমাকে সে society-তে পাবে না। [যেতে প্রস্তুত]

মলিনা। [শ্যামলকে জড়িয়ে ধরে] একি কথারে খোকা, তোর বাবা তোকে কত ভালবাসেন। তোর জন্য আমাদের কত গর্ব। তাঁকে এমন করে আঘাত দিলি। ব্যাপার কি বলত? রমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আমার গু-উ—ব ভাল লেগেছে। সব খুলে বল।

[ছেলের মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন]

শ্যামল। [ধরা গলায়] রমা ভাল classic গায়। fuaction-এ আমাদের পরিচয়। বুঝতে পারলুম, রমাকে ছাড়া আমার চলবে না। রমার বাবা বোধ হয় কিছু জানেন না। তিনি conservative, তাই তাঁকে এড়িয়ে গেছি। কিন্তু রমার মা জানতেন। কিন্তু যখন জানলেন, তখন তাঁর পক্ষে আমাদের বাধা দেওয়া সাধ্যাতীত। বাবাকে জানি, তিনি সহজ ভাবে আমাদের ভালোবাসাকে মেনে নিতে পারতেন না। আর তুমি? তুমিও বাবার বিরুদ্ধে যেতে পারতে না। সংসারে অশান্তি দেখা দিতই। তাই মাকে সমস্ত খুলে বলেছি। তিনি আমাদের সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার জন্য বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। মা, আমি এর মধ্যে অপমান বা অস্বাভাবিক কিছু দেখি নি।

অনাদি। এতদূর ব্যাপার গড়িয়েছে! যাক, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। প্রিয়বাবুকে আমি জানি। তিনি উত্থাপন করাতে আমি রাজী হয়েছি। যতীনবাবু, আপনাকে আমি চিনতুম না। এখন চিনলুম। তাতে করে আপনাদের ঘরে মেয়ে দেওয়ার চাইতে হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে মেয়েকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া অনেক ভাল।

মালতী—মলিনা।—ঘাট, ঘাট!

মালতী। এখন আর সে উপায় নেই। শ্যামল আর রমা registry করেছে। [অনাদিকে] মেয়ে তোমার এখন সাবালিকা। রায়েলা বাড়িয়ো না। মলিনা দেবী, আশা করি, ব্যাপার বুঝতে পেরেছেন। এখন আপনাদের যা করণীয় আপনারা করতে পারেন।

মলিনা। আমাকে 'মলিনা' আর বলবেন না। বলবেন 'বেয়ান'। আর আমার যা করণীয় তা আমাকে করতে দিন [ক্রন্দনরত রমাকে ডেকে, চোখের জল মুছিয়ে] মা, আমার লক্ষ্মী, [নিজের গলার হার খুলে পরিয়ে দিলেন] কেঁদো না মা। [রমা পায়ে হাত দিয়ে সবাইকে প্রণাম করল, সবাই আশীর্বাদ করলেন বিশেষ করে যতীনবাবু। মলিনা রমার হাতে মিষ্টির প্লেট দিয়ে সবাইকে পরিবেশন করালেন।]

যতীন। [অনাদিকে জড়িয়ে ধরে] ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। যা হবার বেয়াই হয়ে গেছে। আমিও বলেছি, আপনিও বলেছেন। শোধ বোধ। Hit of the moment-এ অনেকে অনেক কথা বলে থাকে। ও নিয়ে মন খারাপ করবেন না। কোন দিন যা করি নি, আজ তা করতে গিয়ে এই বিপত্তি। ইচ্ছে ছিল business করব, কিন্তু তাতে total loss.

অনাদি। আমাকে ক্ষমা করবেন। ব্যাপার বুঝতে পারি নি। যুগের দাবীকে মেনে নিতে হয়। নইলে অশান্তি—গৃহবিপ্লব। সন্তানের কাছেও শেখা যায়, আজ আমি সে শিক্ষা পেলুম।

মালতী। তোমাকে তো আগেই বলেছি :—

"যব তুল্‌হা তুল্‌হান রাজী
তব ক্যা কর্‌েগা কাজী।"

আমরা 'কাজী' আমাদের করার কিছু নেই।

মলিনা। সত্যি বেয়ান, কথা ও কাজে আপনি খাঁটি।

শ্যামল। আমার যদি অনেক দিদি থাকত, তা হলে বিনে পয়সায় এমনি অনেক বিয়েটার দেখতে পেতুম।

সকলের হাসি

যবনিকা

প্রাচীন ভারতের শুল্কনীতি

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ, এম-এ, পি-আর-এস

মানব-সভ্যতার প্রাথমিক যুগে যখন মানুষের মধ্যে মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল—অর্থাৎ জলে যেমন বড় মাছ ছোট মাছগুলিকে খাইয়া ফেলে, তেমনি বলবান্ লোকেরা দুর্ব্বল লোকদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের সংগৃহীত খাদ্যাদি অপহরণ করিত, সেই সময়ে চিন্তাশীল মানুষেরা মানব সমাজের নিরাপত্তা বিধানের জন্য একজন শক্তিমান, চিন্তাশীল, নিরপেক্ষ, জ্ঞানী ব্যক্তিকে রাজারূপে বরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম মানবসমাজে রাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আমরা এই তথ্যটি জানিতে পারি। সর্ব্বপ্রথম যাঁহাকে রাজা করা হয়, তাঁহার নাম মনু (সংস্কৃত মহাভারত অনুসারে) ; এই কারণেই মনুকে আদিরাজ বলা হয়।

কেবল একজন লোককে রাজা করিলেই দেশে শান্তি স্থাপিত হয় না। দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত শক্তিও রাজার হস্তে তুলিয়া দিতে হয়। একজন লোক যতই শক্তিশালী ও কৌশলী হন না কেন, অসংখ্য দুর্ব্বৃত্তকে দমন করা তাঁহার সাধ্যাতীত। এই কারণে কিছুসংখ্যক সশস্ত্র লোককে শান্তিরক্ষার জন্য নিয়োগ করিতে হইল। ইহারা জনরক্ষক হইয়া রাজার আদেশে দুর্ব্বৃত্তদিগকে খুঁজিয়া বাহির করতঃ বিচারের জন্য রাজার কাছে লইয়া আসিবে ; সুতরাং নিজেদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য আহার্য্য বা বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবার সময় তাহাদের স্বভাবতঃই থাকিবে না ; অতএব ইহাদিগকে খাদ্য ও বস্ত্রাদি দেওয়ার আবশ্যক হইল। এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণ প্রত্যেক পরিবার হইতে কিছু শস্যাদি রাজার ভাণ্ডারে প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন, ইহারই নাম রাজস্ব।

ক্রমে ক্রমে রাজার দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, দেশে শান্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার দায়িত্বও রাজাকে গ্রহণ করিতে হইল এবং এই উদ্দেশ্যে সুসজ্জিত বিশাল একটি সেনাবাহিনী স্থায়ীভাবে পোষণ করিবার জন্য রাজকোষে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হইল। রাজার শক্তি ও সম্মান দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া দেশের একশ্রেণীর ক্ষমতাশালী লোক রাজক্ষমতা অধিকারের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকায় রাজার দেহ ও রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য একটি শক্তিশালী রক্ষী বাহিনীরও আবশ্যক হইল। ক্রমে রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধির ফলে এবং বিচার, চিকিৎসা, শিক্ষা, পূর্ত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের পরিচালন ভার রাজার হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় অধিকতর অর্থের প্রয়োজন দেখা দিল, এবং এই বিপুল ব্যয়ভার বহনের জন্য ক্রমে ক্রমে রাজস্বের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার শুল্ক আদায়ের অধিকারও রাজাকে গ্রহণ করিতে হইল। ইহাই রাজস্ব ও শুল্কের ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সে যুগের ভারতীয় রাজারা রাজস্ব ও শুল্ক হইতে লব্ধ সমুদয় অর্থ কেবলমাত্র জনকল্যাণেই ব্যয় করিতেন। প্রজাদের ধন ও প্রাণ রক্ষা করা সেই যুগের রাজাদের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হইত। যে রাজা এই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য পালন করিতে অসমর্থ হইতেন, তিনি ইহলোকে ধিক্কৃত এবং পরলোকে নিরয়গামী হইতেন। এই সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু বলেন—

যোঽরক্ষন্ বলিমাদত্তে করং শুল্কঞ্চ পার্থিবঃ।

প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ স সদ্যো নরকং ব্রজেৎ (৮।৩০৭)

অর্থাৎ যে রাজা সম্যকরূপে প্রজাপালন না করিয়া কর ও শুল্ক আদায় করেন, তিনি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নরকে পতিত হন।

প্রজাদিগকে যথারীতি রক্ষা না করিয়া যে সকল রাজা

রাজস্ব আদায় করিতেন প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে তাঁহারা অসুর এবং রাক্ষস নামে অভিহিত হইয়াছেন। রাজা বেণ এই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থ হওয়ার ফলেই তাঁহার রাজ্যে গণবিদ্রোহ দেখা দেয় এবং জননেতা ব্রাহ্মণদের অভিশাপে রাজার দেহ ভস্মীভূত হয়। কিন্তু সেই যুগের জনগণ ক্ষমতালোভী ছিলেন না; তাই তাঁহারা বেণের পুত্র পৃথুকেই পুনরায় সিংহাসনে বসাইয়া তাহাকে দিয়া স্বেচ্ছায় বেণের শাসন ও শাসনের ব্যবস্থা করেন।

রাজারা প্রজাদের নিকট হইতে যে কর ও শুল্ক গ্রহণ করিতেন তাহার বিনিময়ে প্রজাদের ধন, প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হইত—এই তথ্যটি কেবল মনুসংহিতাতেই নহে; অন্যান্য স্মৃতি গ্রন্থেও পরিষ্কার ভাবেই বিবৃত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালের তুলনায় প্রাচীন ভারতে রাজস্ব ও শুল্কের পরিমাণ ছিল অতি নগণ্য। আয়কর, সম্পত্তিকর ব্যয়কর, দুষ্যকর প্রভৃতি বহুল শ্রেণীর করগুলি সে যুগের মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল। রাজারা যে অতি অল্প পরিমাণ রাজস্ব গ্রহণ করিতেন তাহার বিনিময়ে তাঁহাদিগকে কিরূপ কঠোর দায়িত্ব পালন করিতে হইত গৌতম, বিষ্ণু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের গ্রন্থ হইতে আমরা তাহা উত্তমরূপেই জানিতে পারি। ঐ সকল গ্রন্থে পরিষ্কার ভাবেতেই বলা হইয়াছে যে, কোন প্রজার যে কোন প্রকার মূল্যবান দ্রব্য চোর কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, তাহা উদ্ধার করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব রাজার। রাজা বা তাঁহার লোকেরা যদি এইরূপ অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করিতে না পারেন, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পূর্ণ ক্ষতি রাজকোষ হইতে পূরণ করিয়া দিতে হইবে। যে ব্যক্তির দ্রব্যাদি অপহৃত হয়, তিনি যে কোন শ্রেণীর লোকই হউন না কেন, রাজা উল্লিখিত দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই সম্বন্ধে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। গৌতম (১০ম অধ্যায়) বলেন—

"চৌরহৃতমুপলভ্য যথাস্থানং গময়েৎ। কোষাদ্বা দদ্যাৎ"।

বিষ্ণু (তৃতীয় অধ্যায়) বলেন—

"চৌরহৃতং ধনমবাপ্য সর্ব্বমেব সর্ব্ববর্ণেভ্যো দদ্যাৎ।

অনবাপ্য তু স্বকোষাদেব দদ্যাৎ"

উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলিতে ধর্ম্মশাস্ত্রকার গৌতম ও বিষ্ণু রাজকোষ হইতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য পরিষ্কার ভাষায় নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা যদিও রাজকোষ শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তথাপি অনুরূপ বিধান তাঁহারাও দিয়াছেন। মনু বলেন—যে কোন বর্ণের লোকের বাড়ীতেই চুরি বা ডাকাতি হউক না কেন, রাজা তাহাকে অপহৃত ধন প্রত্যর্পণ করিবেন।

"দাতব্যঃ সর্ব্ববর্ণেভ্যো রাজ্ঞা চৌরৈর্হৃতং ধনম্।" (৮।৪১)

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—জনপদের যে কোন অধিবাসীর কোন দ্রব্যাদি অপহৃত হইলে তাহা প্রত্যর্পণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা উহা প্রত্যর্পণ না করেন তিনি নিজেই চুরির অপরাধে অপরাধী।

"দেয়ং চৌরহৃতং দ্রব্যং রাজ্ঞা জানপদস্য তু।

অদদদ্ধি সমাপ্নোতি কিল্বিষং যস্য তস্য তৎ॥" (২।৩৭)

পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন—বর্ত্তমানের গণতান্ত্রিকধানী রাষ্ট্রসমূহে কোথাও অনুরূপ বিধান প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে কি?

গল্প

ফুলের গন্ধে

রমেশ মজুমদার

দুরের কাছেই ফুলনের বাড়ী। ফুলন বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। বাবা চাকরী করে না। চাষ করে। কখনো চিন্তাতুরে বসে ছিপ হাতে মাছ ধরে। সংসার তার ছোট। ঘরটিও ছোট।

ঘরের প্রায় কাছে পাঁচ বিঘে জায়গা আছে ভগবান দাসের। সেই জমিতে নানারকম ফসল ফলায় সে। কখনো লাউ-কুমড়ো, কখনো উচ্ছে-বেগুন, কখনো কপি-আলু-টমেটো।

বারো মাস তার ঐ পাঁচ বিঘে জমিতে ফসল ফলছে। ভগবান দাস হাড়ভাঙা খাটনি খাটে। শুধু সে একাই নয়, সাথে থাকে ষোল-সতেরো বছরের ডাগর মেয়ে ফুলন। মাঝে মাঝে ফুলনের মাও আসে এবং কাজে লাগে। কিন্তু সংসার ফেলে বেশীক্ষণ লিপ্ত থাকতে পারে না। কিছুক্ষণ পরেই ঘরে ফিরে যায়।

ভগবান দাস একা এত জমি চাষ করবে কি করে! লোক নিতে বাধ্য হয়। সবাই মিলে ক্ষেত চাষ করে। সার দেয়।

শাক-সব্জী হয় প্রচুর : আর লোকের ভিড় হয়। সবাই জমায়েত হয় শাক-সব্জী কিনতে। অনেকে আবদার করে। যারা আবদার করে তারা যুবক। ফুলনকে ওজন করে দিতে বলে। ফুলন হাসে। বলে, আমি আবার কি ওজন করবো!

ভগবান দাস মৃদু হাসে। চেয়ে দেখে। ঘরের লক্ষ্মী। তার মনে বাধা দিতে নেই। তাতে যদি লাভ হয় ওর তাই দিক। দে মা, একটু ওজন করে দে।

লজ্জিতা ফুলন দাঁড়ি ধরতে বাধ্য হয়। ওজন করে একের পর এক। তা দেখে আরো অনেকে দু' পাঁচ সের কেনে।

ক্ষেতের থেকে তোলা সব্জীগুলো ক্রমে সব বিক্রী হয়ে যায়। ভগবান দাস দাঁড়িয়ে মৃদু হাসে। ভাবে—মা আমার লক্ষ্মী! মা দাঁড়ি ধরেছে আর যে পাঁচ সের নিত সে দশ সের নিচ্ছে।

এবার টাকা নিয়ে ঘরে ফেরার সময়। প্রায় দশটা বাজে। সে-ই কোন সকালবেলা বাপ-মেয়ে বের হয়েছিল সব্জী তুলতে। তখনও সূর্য ওঠেনি। সূর্য উঠতে-উঠতে খদ্দের জড়ো হয়েছে। তারাও হাতে-হাতে সব্জী তুলেছে। তারপর বেচার পালা।

ফুলনের হাতে টাকা। বাইশ টাকা বিক্রী হয়েছে। গতকাল হয়েছিল আঠারো টাকা। ফুলনের মুখে হাসি, মনে আনন্দ।

ভগবান দাস সংসারের জন্য কিছু সব্জী নিয়ে চললো, খেতে হবে তো। বৌটা বসে আছে। গেলে তরকারী রাঁধবে। আজ আর চিন্তার ধারে যাবে না মাছ ধরতে।

মেয়েটা অবশ্য একটু মায়ের কোল হলে তারী খুশী হয়। বাপের সাথে চিন্তার ধারে যায় সব্জীগুলো ধুয়ে হাত-পা ধুয়ে আসতে।

হাত-পা ধুতে ধুতে বাপকে ফুলন বললে, আজ মাছ ধরতে আসবে না বাবা?

—না, মা, আজ থাক। কাল আবার আসবো।

ফুলন চুপ করে যায়। বনানী ও পাহাড়ে পরিবেষ্টিত চিন্তার দিকে চেয়ে থাকে। বিশাল চিন্তা। ছোট-খাট সমুদ্র। নীল তার জলরাশি। কত ঢেউগুলা জমেছে ওর বুকে। নিস্তরঙ্গ চিন্তা।

বাবার সাথে নীরবে ঘরে ফেরে। কাল মাছ খেয়েছে। আজ থাক। আজ তরকারী হবে।

এতক্ষণ পথ চেয়ে বসেছিল ওর মা। ফুলন বাঁচলের টাকা, মায়ের হাতে তুলে দিল। মা একে একে সবগুলো

পয়সা গুণে নিল। বললে, আজ কয়েকটা টাকা বেশী হয়েছে।

—যাও রেখে হাও গে।

ভগবান দাস বৌকে বললে, ওগুলো রেখে এসে এগুলো কুটে ফেলে হাও। আজ ভাজা আর তরকারী হোক। মাছ আবার কাল হবে। বলে হাতের ঝুড়িটা নাবিয়ে রাখলো।

উনুনে ভাত বসেছে। প্রমীলা এবার তরকারী কুটতে বসলো। পরণে তাঁতের শাড়ী। ফুলনের শাড়ীখানাও তাঁতের। অবশ্য একটু ভাল। মায়ের চেয়েও ভাল মেয়ের স্বাস্থ্য। রং কালো হলেও ফুলন কিছু উজ্জ্বল।

—ফুলন, চারটে মুড়ি নিয়ে খা, আর বাপেরে দে। হাঁড়ি থেকে একটু গুড় বের করে নে।

—তুমি খেয়েছো তো? ভগবান দাস জিজ্ঞেস করে।

—আমার খাওয়া নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। তোমরা পরিশ্রম করে এলে তোমরা আগে খাও।

—তার মানে! এখনও খাওনি! পরিশ্রম কি শুধু আমরাই করছি!

—খাচ্ছি-খাচ্ছি! আগে তোমরা খাও, তারপর—।

ঠিক এমনি সময় একটি ছেলে এলো একটা ভেটকী মাছ নিয়ে। ঘরের দাওয়ার উপর রেখে বললে, কাকাবাবু, এটা খাবেন।

—হাত! তুই মাছ কোথায় পেলিরে?

—এটা চিন্তার মাছ। সন্তায় পেয়েছিলাম দু'টো। একটা বাড়ীর জন্য পাঠিয়েছি, একটা আপনাকে দিলাম।

ভগবান দাস বিস্মিত হলো যেমন, তেমনি আনন্দিত হলো। হাতর বাড়ী এখান থেকে অনেকটা দূর। মাছের ব্যবসা করে। ভাল টাকা পায়। বয়স ত্রিশ হবে। থাকে মাছের আড়তে।

হাত ফুলনের দিকে চেয়ে হাসে। বলে, কিরে ফুলন, কেমন আছিস?

—ভালই আছি দাদা।

—কি খাচ্ছিস, মুড়ি?

—হ্যাঁ, দাদা! খাবে চারটে।

—হাসে হাত। বললে, দে খাই। তুই জিজ্ঞেস করবি কেন? সামনে দে এনে। তা—চা খাস তো?

—না, দাদা!

—তাহলে মজবে না ভালো। আচ্ছা, এরপর যেদিন আসবো চা তিনি নিয়ে আসবো। চা তৈরী করে খেয়াবো এবং খাওয়াবো।

—সত্যি?

—মিথ্যে বলছি নাকি!

—শুনেছি চা নাকি বাবুরা খায়।

—আজকাল সবাই খায়। সুতরাং তুমিও বাবু আমিও বাবু।

ফুলনের মুখে হাসি ফোটে। মাছটার কাছে গিয়ে দু'হাতে তুলে নেয়। ভীষণ ভারী। প্রায় চারসের ওজন হবে। বললে, তুমি আজ কোথায় খাবে?

—আড়তে।

প্রমীলা অমনি বলে বললো, কেন, এখানেই চারটে মাছভাত খেয়ে যাওনা, দাদা!

—না, কাকীমা। আর একদিন খাবো।

এরপর আর কেউ কোন কথা বললো না। হাতর ধোপদুরস্ত পোষাক ওদের পোষাককে ম্লান করে দিল। সবাই বারবার চায় হাতর দিকে। ফুলন চায় আর চোখোচোখি হতে লজ্জায় মাথা নত করে।

হাত ফুলনের দিকে চেয়ে মৃদু হাসে। হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তে চমকে ওঠে যেন। বা-বা, পৌনে এগারোটা বাজে! চললাম। ফুলন চলছি, আর একদিন আসবো। চলি কাকা।

—এসো আর একদিন। সেদিন এখানে খাবে।

হাত চলে গেল।

প্রমীলা মৃদু হেসে স্বামীর দিকে চাইলো। ভগবান দাস হাসি থেমে অন্য কথা তুললে। কাল শুধু শাক আর লাউ বিক্রী করবো, আর কিছু কপি।

—আজ কপি বিক্রী করোনি? প্রমীলা জিজ্ঞেস করে।

—না, সামান্য কয়েকটা ফুল তুলেছিলাম। বাঁধা-গুলোতে হাত দিইনি। যেগুলো তুলেছিলাম প্রচুর। তাছাড়া ছিল পাকং শাক, মূলো।

প্রমীলা বললে, হাট থেকে কিছু চাল এনে রেখো। সামান্য চাল আছে। কাল একবেলা হবে।

ভগবান দাস বললে, ঠিক আছে, দশ সের এনে রাখবো,

তার জন্য চিন্তা নেই। কিন্তু শুনছি চালের দাম বেড়ে গেছে। বাংলাদেশে বেড়েছে, তাই এদিকেও একটু বাড়বে বৈকি!

প্রমীলা কোন জবাব দিলে না। তরকারী কোটা শেষ করে মাছ কাটতে বসলো। কাটতে কাটতে বললে, মেয়ে মাছ ভালবাসে, যাক পাওয়া গেল মাছ। সরষে বাটা কাল হবে।

ফুলন ঘরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুড়ি খাচ্ছে। আর চেয়ে দেখছে দাওকে। বহু দূরে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। তারপর ফিরে এসে বললে, মা, চান করে আসি।

—যাও, কলসীটা ভরে নিয়ে এসো।

ফুলন তেল মাখতে ব্যস্ত হলো। তারপর কলসী নিয়ে চিন্তার দিকে ছুটলো। চিন্তার পাশে বাংলোর ধার দিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়ালো। বিরাট একটা সাপ পথ জুড়ে ছিল। সড় সড় করতে করতে পাশের ইটের স্তূপের ভেতর ঢুকে পড়লো।

আরো কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো ফুলন। আর দেখা গেল না। এবার সামনে এগোলো। বাংলোর পাশ থেকে কয়েকটা ছেলে চীৎকার করে উঠলো, হুদে কত বড়-বড় হাঁস পড়েছে।

ফুলন চেয়ে দেখলো। সত্যিই তাই। সাদা বড় হাঁস। আর বহু বেলে হাঁস চরছে।

সবুজ দেবদারু বনে ঘেরা চিন্তার ঠাণ্ডা জলে মনের আনন্দে চান করে মেয়েটা। গামছা ভিজিয়ে গলা পর্যন্ত দেহ ডুবিয়ে গা-হাত-পা রগড়ায়। তারপর হাঁসগুলোর মত মনের আনন্দে ডুব দেয়।

আবার কলসী ভরে নেয়। পাড়ে উঠে এসে মাথা মোছে। গা মোছে। বাংলোর পাশ থেকে বাড়ুদারটা প্যাট-প্যাট করে চেয়ে দেখে।

সেদিকে ফুলনের নজর পড়তেই লজ্জিত হয়ে বুকের উপর গামছা চাপা দিয়ে কাপড়ের জলটা একটু নিংড়ে কলসী তুলে নিয়ে চলে যায়। বনের ভেতর থেকে কালো পাখিটা ডেকে ওঠে—বিয়ে হোক! লজ্জা পায় ফুলন। পাখিটাও ভীষণ পাজি। কোথা থেকে যেন দেখে ফেলেছে! ছিঃ, ছিঃ!

ফুলন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে। হাঁপিতে মুখ ভরে যায়। কলসীটা ঘরের দাওয়ায় রেখে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢোকে। দরজা বন্ধ করে কাপড় ছাড়ে।

ভগবান দাস বললে, আমি চান করতে গেলাম।

প্রমীলা সাড়া দেবার অবকাশ পেলে না। মাছ রান্না নিয়ে ব্যস্ত। হয়তো শুনতেই পায়নি।

মাছ ভাজার পরই চাপাবে তরকারী, তারপর ভাজা। মাছটা ঘরে এলো বলে। ভীষণ কাজের বৌটা। একটু সময় বসে থাকে না। সারাদিন সে কিছু না কিছু করছেই।

ঘরের পাশেই কয়েকটা ফুল গাছ। জবা, দালতা, হাস্নুহানা, আর গাঁদা। প্রজাপতি এসে বসে। আনাগোনা করে ভ্রমরেরা। আবার বৃহস্পতিবারে প্রমীলা ঐ ফুল তুলে লক্ষ্মীপুজো করে। প্রমীলাই যেন লক্ষ্মী স্বয়ং এদের সংসারে অভাব নেই।

স্নানাহার শেষ হলো।

প্রমীলা বসে আসন্ন শীতের কাঁথা সেলাই করতে করতে বললে, অনেক দিন বাপের বাড়ী যাইনি। এবার কয়েকদিনের জন্য যাবো কিন্তু; তোমায় বলে রাখছি।

—দু'দিনের জন্য হয় যেয়ো। তা না হলে সংসার দেখা, কেউ দেখা সম্ভব হবে না। কে রান্না করে; কে খায়!

—দুদিন ফুলন চালিয়ে নেবে। না হয় ভাতে ভাত খেয়ো কষ্ট করে।

সূর্য্য পশ্চিমাকাশে গড়িয়ে গেল। নজর পড়লো তা ভগবান দাসের। উঠে পড়লো মাদুরের উপর থেকে। বিড়ি টানতে-টানতে বের হলো ক্ষেতের দিকে। চৌকি-কলে জল তুলে জমিতে দিতে হবে। নালা বেয়ে সেই জল ক্ষেতের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তবে তো ভাল সব্জী হবে!

ফুলন আর গেল না। সে কেবল যায় সকালবেলা। বিকালে মায়ের পাশে-পাশে ঘোরে। কিম্বা শকুন্তলা এসে খেলা করে: শকুন্তলা আর একটি মেয়ে। ক্ষেতের ওপাশে তাদের বাড়ী। বয়সে ফুলনের চেয়ে ছোট। ওর বাবাও একজন চাষী।

শকুন্তলা এলো একটু পরেই। সাথে ওর মামা মঙ্গল। বয়স কুড়ির কম নয়। মাঝে মাঝে আসে, গল্পগুজব করে,

চলে যায়। ফুলন এবার খেলতে ব্যস্ত হয় মাটিতে কোট কেটে। মঙ্গলও খেলে। মাঝে মাঝে ফুলনের পিঠে চড় খাবা মারে। হাসে ফুলন। সেও মঙ্গলকে 'মাম্বা' বলে ডাকে।

বেশ সুখে কাটে ওদের দিনগুলো।

সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরে ভগবান দাস। হাত-পা ধুয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে মাদুর পেতে বসে।

প্রমীলা রাতের রান্না চাপিয়ে দেয়। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখে দাওয়ায়। আলো ছড়িয়ে পড়ে ঘরখানিতে।

বাইরে অন্ধকার। সুচিভেদ্য, অন্ধকার। জোনাকীরা মিট-মিট করে আলো জ্বালিয়ে দিকে দিকে ছুটাছুটি করে।

সকালে মেয়েকে নিয়ে ভগবান যুড়ি হাতে যাবে ক্ষেতে। এটা নৈনিকদার রীতি। মাঝে-মাঝে বাঘ যায়। নতুন সব্জী লাগালে এক মাস অপেক্ষা করতে হয়। কিম্বা তারও বেশী। তখন পুঁই শাক, লাউ, কুমড়ো বিক্রী করতে হয়।

কয়েকদিন পরেই প্রমীলা কটক যাবে। কটকে তার বাপের বাড়ী। তার বাবাও একজন চাষী। তবে এদের চেয়ে ভাল অবস্থা। পঞ্চাশ বিঘে ধানের জমি, তা ছাড়া শাক সব্জীর ক্ষেত।

নির্দিষ্ট দিনে গরুর গাড়ীতে চেপে প্রমীলা বের হলো ছোট একটা বাক্স আর একটা পুঁটলী নিয়ে। দেব-দেবীকে প্রণাম করে চললো। সাবধানে থাকতে বলে গেল স্বামী ও মেয়েকে। প্রমীলাকে এগিয়ে দিতে গেল শকুন্তলার মামা মঙ্গল।

প্রমীলার মনে কত আনন্দ। পরিষ্কার কাপড় পরেছে সে। পায়ে ব্লাউজ দিয়েছে। মুখে স্নো দিয়েছে। কত খুশী।

ভগবান দাস তার যাত্রাপথের দিকে চেয়ে থাকে। মনটা ভারী হয়ে আসে। ফিরে যায় ঘরে। চুপ-চাপ বসে থাকে। রাতের রান্না করে রেখে গেছে প্রমীলা। স্ত্রীর মঙ্গল কামনা করে মনে-মনে।

এরপর ভগবান দাস একা। সকালে তার সাথে মেয়ে যেতে পারে না। ফুলন রান্না করে, ঘর দেখে, একপা বাইরে যাবার উপায় নেই। টাকা-পয়সা আছে ঘরে। তাছাড়া কত জিনিষ।

ঘণ্টার আগেই ক্ষেত থেকে বাড়ী ফিরলো ভগবান। চুবড়ীতে কতকগুলো শাক আর মূলো। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো। ফুলন দাঁড়িয়ে কাঁদছে। দু' চোখে জল। ঘরের দাওয়ায় দু' কাপ চা। তার পাশে বড় একটা কাতলা মাছ।

—দাওদা এসেছিল। রেগে চলে গেছে। ফুলন বললে।

—চলে গেল কেন? আর তুই কাঁদছিস কেন?

ভগবান দাস জবাব পেলে না। অনেকক্ষণ পরে বললে সে-কথা যাও বললেই তো পারে! ভাল কথা! আমরা চেষ্টা করবো।

আচরণ বিধি

শ্রীজ্ঞান

"আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়"—এই উপদেশ শ্রীচৈতন্যদেব দিয়ে গেছেন। এর অর্থও তোমরা নিশ্চয়ই জান। শুধু মৌখিক উপদেশ দিয়েই নয়, নিজের কাজের দ্বারা লোককে শেখাতে হবে। নিজে মিথ্যা কথা বলছি, কিন্তু অপরকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করছি! নিজে ভূরি ভোজন করছি, কিন্তু অপরকে অতিভোজনের কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করছি! নিজে কোনও শৃঙ্খলা মেনে চলছি না, কোনও দায়িত্ব পালন করছি না, কোনও নিয়ম মতন কাজ করছি না; অথচ অপরকে উপদেশ দিচ্ছি উচ্ছৃঙ্খল না হতে, নিজ দায়িত্ব পালন করতে, সব সময়ে নিয়ম মেনে কাজ করতে! নিজে হয়ত সময় রাখতে পারি না—ঠিক সময়ে কোনও কাজই হয়ত করতে পারি না; কিন্তু সময়ের মূল্য সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলে থাকি!—এ রকম ভাবে নিজের কাজের ও কথার মধ্যে কোনও মিল না রেখে শিক্ষা দেওয়া চলে না বা দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে এ কথাটা বড় একটা কেউই মনে রাখেন না বা মানতে চান না। তাই বাড়ীর শিক্ষাই বল, আর বিদ্যালয়ের শিক্ষাই বল কিছুই ঠিকমত দেওয়া হচ্ছে না। গৃহে অভিভাবকদের উপদেশ এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দেওয়া শিক্ষা কিছুই আর আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। যিনি ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যাশিক্ষা দিতে চান, যিনি উপদেশ দিয়ে ছেলেমেয়েদের ঠিক পথে চালিত করতে চান—তাঁর নিজের প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। নিজেকে সংশোধিত করে,নিজেকে দর্পণালোকের উর্ধ্বে রেখে, নিজের কাজ ও কথার মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করে যিনি শিক্ষাদান করেন, উপদেশ বিতরণ করেন, তাঁর কথা সবাই শুনবে এবং তাঁর দেওয়া উপদেশ সকলে মেনে চলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু আগেই বলেছি আজকাল শিক্ষক ও অভিভাবকরা এ বিষয়ে একেবারেই মনোযোগ দেন না এবং তার ফলস্বরূপ ছেলে মেয়েদের শিক্ষাও সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারছে না।

শুধু বই মুখস্ত করে পরীক্ষায় পাশ করাটাই তো শিক্ষা নয়! শিক্ষা বলতে এর চেয়ে অনেক বেশী কিছুই বোঝায়। শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে হলে পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও অনেক কিছুই শিখতে হবে, বুঝতে হবে, অভ্যাস করতে হবে,—ধর্মীয় নীতি, সামাজিক আদর্শ, সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি ঠিকমত অনুসরণ করতে হবে। আর সর্বোপরি নিজের মন ও শরীরকে সকল কুসংস্কার ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে, সুস্থ ও সবল করে গড়ে তুলতে হবে। তবেই শিক্ষা লাভ সম্পূর্ণ হবে। এখন যে অসম্পূর্ণ ও অর্থকরী শিক্ষা তোমরা পাচ্ছ তাতে হয়ত কিছু রোজগার করে ভবিষ্যতে সংসারে সাহায্য করতে পারবে, কিন্তু জাতি গঠনের দিক থেকে, সমাজ উন্নয়নের দিক থেকে, উন্নত, সুস্থ জীবনযাপনের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে

এই নীতিহীন, আচারহীন, শৃঙ্খলাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু উচ্ছৃঙ্খলতা, উদ্দামতা, উদ্‌ভ্রান্ততাই ডেকে আনছে। তাই আজ সমাজের স্তরে স্তরে জমা হচ্ছে অসন্তোষ আর অধীরতা এবং প্রায়ই তা প্রকাশ পাচ্ছে উন্মত্ততা ও উদ্দামতার মধ্যে দিয়ে! চতুর্দিকে আজ অনাচার, অবিচার, অত্যাচারের যেন দুই পড়ে গেছে! দয়া, মায়া, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণ যেন মানুষের মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে—মনুষ্যত্ব যেন অবলুপ্তপ্রায়!

শাসনের ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে, ধর্ম্মের ব্যাপারে, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, জীবনের প্রতিটি স্তরে আজ এই অনাচার বাসা বেঁধেছে, আর সমাজজীবনের ভিত্তিকে আলগা করে দিচ্ছে। এর পরিণামের কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়!

তবে এখনও সময় আছে। এখনও চেষ্টা করলে এই নৈতিক অধঃপতন থেকে জাতিকে—বিশেষ করে তোমাদের মত সুকুমারমতি কিশোর-কিশোরীদের বাঁচান যেতে পারে। তোমরাই হচ্ছ জাতির ভবিষ্যৎ, তোমরাই হচ্ছ আগামী দিনের অভিভাবক, তোমরাই হচ্ছ ভবিষ্যতের নাগরিক, তোমরাই গড়বে আগামী কালের সমাজ—তাই তোমাদের আচরণ যেন বিসদৃশ না হয়, বিশৃঙ্খল না হয়, বিকৃত না হয়। তোমরা যেমন বড়দের কাছ থেকে শিখছ, তেমনি তোমাদের চেয়ে যারা ছোট তারা শিখবে তোমাদের আচরণ দেখে। তাই সর্ব্বদা মনে রেখ তোমাদের ওপর রয়েছে এক বিরাট দায়িত্ব। তোমাদের আচরণ যাতে শুদ্ধ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল হয় সেদিকে তোমাদের কড়া নজর রাখতে হবে—নজর রাখতে হবে আশেপাশের সহপাঠী-সহপাঠিনীদের ওপর, বন্ধু-বান্ধবদের ওপর, আত্মীয় স্বজনদের ওপর এবং প্রয়োজন হলে তাদের বিকৃত, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন আচরণকে শুধরেও দিতে হবে। তোমাদের অভিভাবকরা যদি এ দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহলে তোমাদেরই নিতে হবে এই শোধনের, এই সংস্কারের দায়িত্ব। তোমরা যদি সুষ্ঠুভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পার তবেই আমাদের সমাজজীবনের এক বিরাট গ্লানির হাত থেকে আমরা মুক্তি পাব—তোমাদের জীবনও হয়ে উঠবে সুস্থ-সবল, আর আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজও হয়ে উঠবে সত্য-সুন্দর।

তোমরা কি এই আচরণ-সংস্কার করে নতুন আচরণ-বিধি প্রবর্ত্তন করতে পারবে না? নেবে না কি তোমরা এই দায়িত্ব? নিশ্চয়ই নেবে।

***

বক্সিবুড়োর ছড়া

শ্রীশচীনন্দন আঢ্য

আজিকালের বক্সিবুড়ো সতীশ কবিরাজ
যাহার কথা সবিস্তারে বলছি শোন আজ।
বয়স ত নয় এমন কিছু আশীর ওপর ঘটে,
টেকো মাথা রোগন দেহ বুদ্ধি আছে ঘটে।
দাঁতগুলো তার বজায় আছে, লম্বা দেড়হাত দাড়ি,
নস্যি নেয়াই আসল নেশা তারিকি চাল তারি।
জীবনে তার চারটি কন্যা হয়েছে শ্রেফ ভাল,
তাতেই জেলে দিয়েছে সে বিজ্ঞাপনের আলো।
কথায় কথায় ঐ তুলনা যখন তখন ছাড়ে,
মস্ত নিজেই নিজের কথায়, ঈষৎ মাথা নাড়ে।
"ম্যালেরিয়ায় ছাগলাদ্য ঘৃত হবে খেতে,
নিউমনিয়ায় পরেই খানিক চেকে হবে যেতে।
এজমা হ'লে মোরক খাবে, মৃগীতে চ্যবনপ্রাশ,
কেশোরগীর বুকে মালিশ তৈল মহামাষ।
মধ্যমনারায়ণ মাখ সর্দ্দি যদি হয়,
নিরামিশ করবে আহার রোগ বরিলে ক্ষয়।
বাতের ওষুধ মাংস খাওয়া, ক্রিমি হলে গুড়,
হার্ট ডিজিজে পুরাতন ঘি মালিশ যে ভরপুর।"
এই সাজেশন্ রোজ বিকালে দেন যে বসে বসে,
দুঃখ খালি আসেনা কন্যা বোধ হয় কপাল দোষে।
গাঁয়ের সবার বড় তিনি সম্মানীয় চের,
কাজ যে প্রধান পরচর্চা গল্প রসের ফের।
আড়াই পোয়া চালের ভাত গলধকরণ চাই,
দশটি গাঁয়ে তাঁহার সমান খাইয়ে কেহ নাই।
ভিষগাচার্য, প্রাণাচার্য টাইটেল সাত হাত,
চিকিৎসক ত নয়ক খাঁটি শুধু কন্যারা হয় "কাৎ।"

একটি অধ্যায়

নির্মল চক্রবর্তী

হাতের কাঁচনটা দিয়ে টেবিলটা মুছে চোখ তোলে দিলীপ, কি দেব স্যার, স্রেস্ কাটলেট, মাটন কাটলেট, মাটন চপ, ফিস্ ফ্রাই···

বাধা দিয়ে প্রতুল বলে, থাম, থাম, সংক্ষিপ্তে প্রশ্ন করে কিরে কি খাবি?

যা হয় বল। সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়।

প্রতুল ঘাড় ফেরায় দিলীপের দিকে, কি ভাল আছে?

স্রেস কাটলেট স্যার, চমৎকার, আমাদের দোকানের নাম করা কাটলেট স্যার। দিলীপ উত্তর দেয়। অনুভব করে খদ্দের ভাল।

প্রতুল চোখ তোলে। দেখে দিলীপকে। বার বছরের একটি শীর্ণ কিশোর। রোগা রোগা হাত। ফ্যাকাশে মুখ। ছেঁড়া সার্টের ভেতর দিয়ে বুকের পাঁজরাগুলো দেখা যায়। শীতে শরীরটা কুঁকড়ে গেছে। প্রতুলের মনটা কেমন যেন মায়ায় ভরে ওঠে।

দিলীপ একবার তাগিদ দেব, দেব স্যার।

যাও। বেশ গরম করে দিও। প্রতুল মোর দেয়।

নিশ্চয়ই, দিলীপ একটু হেসে চলে যায়। মুখের হাসিটা সারা মনে ছড়িয়ে পড়ে। দোকানের মালিক খুসী খুব দিলীপের কাজে। চাকরীটা পাকা হবে। তার ওপর ভাল বড়লোক খদ্দের···দিলীপের মনটা আশায় চকচক করে ওঠে। দু-এক আনা বকশিসও মিলতে পারে।

কেইদা, দুটো গরম স্রেস কাটলেট, তাড়াতাড়ি, দিলীপ রান্নাঘরে এসে বলে। আঃ কি সুন্দর গন্ধ কাটলেটের। দিলীপের মাঝে মাঝে বড় খেতে ইচ্ছে করে রেস্টোরাণ্টের স্রেস কাটলেট। কাঁটা চামচ দিয়ে একটা আস্ত কাটলেট খেতে কেমন লাগে? খুব ভাল। কেমন একটা গন্ধ ওরোয়। তার সাথে পিঁয়াজ আর মাই। নরম কাটলেট মুখে দিয়ে চিবুতে এক অনুভূত আনন্দ। দিলীপ অনেকদিন দেখেছে খদ্দেরা কেমন করে কাটলেট খায়। কাঁটা-চামচে কেমন করে চলে। দিলীপ একবার চোখ গেলে।

কই কেইদা হোল, দিলীপ তাগিদ দেয়। গুরু গরু আংগুল দিয়ে পিঁয়াজ ছাড়াতে থাকে। ওটা ফেলে দেয় খানিকটা।

এই যে দিনু দুটো কাটলেট, কেইদা এগিয়ে দেয়।

দিলীপ একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। গরম কাটলেট। ধোঁয়া বেরোচ্ছে কেমন।

সরু হাত দুটো সচল হয়ে ওঠে। দু গেলাস জল আর কাটলেটের প্লেট নিয়ে এগোয় দিলীপ।

এই যে স্যার, একেবারে গরম কাটলেট। দিলীপ খুসী হয়ে বলে। খদ্দের খেয়ে খুসী হলে হয়তো দু এক আনা বকশিসও মিলতে পারে। ছোট ভাই সলুর জন্য বিস্কুট খাবার জন্য বড় ঝেদ করে। বকশিস মিললে আজ নিয়ে যাবে সলুর জন্য বিস্কুট। নোনতা বিস্কুট অল্পে মুখে বড় ভাল লাগে। হঠাৎ ইচ্ছে হয় দিলীপের সলুকে একটা কাটলেট খাওয়াবে। স্রেস কাটলেট। অল্প সেরে গেলে সলুকে একদিন এখানে নিয়ে এসে কাটলেট খাওয়াবে।

বয় বয়, নতুন ভদ্রলোক তিনজন চেয়ার টেনে বসে ডাকে।

দিলীপ এগিয়ে যায়। ঝাড়ন দিয়ে টেবিলটা মুছে দাঁড়ায়। অভ্যস্ত সুরে বলে, কি চাই স্যার। স্রেস কাটলেট, মাটন কাটলেট, মাটন চপ···

কিছু চাইনা, তিন কাপ চা।

শুধু চা স্যার, খাবার···

বাধা দিয়ে বলে না, না চা নিয়ে এস।

দিলীপ চলে যায়। কেইদা, তিন কাপ চা।

বয়, বয়, পুরোণ টেবিলের ডাক।

দিলীপ ফেরে। অভ্যস্ত স্বরে বলে, আর কিছু দেব স্যার। মাটন চপ, এগ চপ···

প্রতুল মুখ তোলে, হেসে বলে, না আর কিছু নয়। শুধু এই ভদ্রলোকের জন্য একটা কাটলেট। তোমাদের কেমন স্রেস কাটলেট।

দিলীপ ঘাড় ফেরায়। মুখটা তার ফ্যাকাশে হয়ে যায় নতুন ভদ্রলোককে দেখে।

দিলীপ, তুমি এখানে? নতুন ভদ্রলোক অকপটবাবুর স্বরে প্রতুল অবাক। দিলীপের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—মাষ্টার মশাই!

প্রতুল প্রশ্ন করে কি ব্যাপার অরুণ।

দিলীপ আমাদের স্কুলের একজন সেরা ছাত্র ছিল। প্রতি পরীক্ষায় ভাল ফল হত। হঠাৎ একদিন ওকে আর ক্লাসে দেখতে পেলাম না। অনেকদিন হল। জানলাম ওর বাবা হঠাৎ মারা গেছে। সমস্ত সংসারের চাপ ঐ বার বছরের কিশোরটির ওপর পড়েছে। আমি ওকে খুঁজেছিলাম, পাইনি।

তাই নাকি? প্রতুল দুঃখিত হয়, বার বছরের এই দীর্ঘ কিশোরের এই পরিণতি।

অরুণ ম্লান হাসে। প্রতুল! আমাদের দেশে এভাবে কত ভাল ছেলে নষ্ট হয়ে যায়। পয়সার নিদারুণ অভাবে হয় লিখাপড়া আর না হয় রেষ্টোরাণ্টের বয় কিম্বা পকেটমার —জোচ্চোরদের দলে ভেড়ে। দুটো ভাতের জন্য কোথায় নেমে যায়। প্রতুল নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

অরুণ বলে, মজা দেখনা, আমরা খাচ্ছি চপ কাটলেট আর ওরা এনে দিচ্ছে আর খাওয়ার পর প্লেটগুলো ধুয়ে রাখছে। ওদের চেহারাগুলো দেখ। থাক্, ঘাড় ফেরাস্ না—দিলীপ নেই।

মাষ্টারমশাইকে দেখে দিলীপ সন্ধ্যায় গুটিয়ে নেয় নিজেকে। রেষ্টোরাণ্টের এই চকল পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। দৌড়ে ফিরে আসে রান্নাঘরে দিলীপ। কেমন যেন অসহ্য লাগে। অসহনীয়।

কেষ্টদা মুখ তুলে প্রশ্ন করে, কিরে দিলু, কিছু নিবি?

হাঁ কেষ্টদা, একটা স্পেশ কাটলেট দাও।

কেষ্টদা হেসে বলে, বেশ ভাল খদ্দের পেয়েছিস দেখছি। বকশিশ ভালই মিলবে।

দিলীপ হাসে। ফ্যাকাশে হাসি। মাষ্টার মশাইকে দেখে দিলীপের মন ছটফট করে ওঠে—পুরোণ কথার স্মৃতিতে। অনেক আশা আর ভরসা নিয়ে স্কুলে পড়াশোনা সুরু করেছিল। কিছুদিন আগে আলীপুর কোর্টে জজ দেখে জজ হবার সাধ জেগেছিল। বড় জজ হবে। কত-লোক তাকে সম্মান করবে। অরুণবাবু তাকে বড় ভাল-বাসতেন। ইতিহাস পড়াতে পড়াতে কত গল্প বলতেন মহাপুরুষদের জীবন নিয়ে। দিলীপ অবাক হয়ে শুনত। সেই গল্প শুনে বড় হবার দুরন্ত ইচ্ছে তাকে পাগল করে তুলত। কিন্তু হঠাৎ বাবা মারা গেলেন! দিলীপ কেঁদে-ছিল সেদিন পাগলের মত। তারপর অভাব আর অনটনের তাড়নায় এই চাকরী নিতে হল।

এই নেবে দিলীপ কাটলেট, কেষ্টদার ঘরে দিলীপ ফেরে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তার ছোট্ট দেহটাকে কাঁপিয়ে দেয়।

দিলীপ প্লেটটা তুলে নেয়। না, সে যেতে পারবেনা মাষ্টার মশাইয়ের সামনে। এক গভীর লজ্জা যেন তাকে জড়িয়ে নিশ্চল করে দিচ্ছে। এই ভাবে অভ্যন্ত-সুরে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেনা—কি চাই।

এই সুধীর, ভাই, কাটলেটটা ঐ কেবিনে দিয়ে আয়। আমি সিগারেট কিনতে যাচ্ছি বাবুর জন্য।

সুধীর প্লেটটা নিয়ে চলে যায় কেবিনের দিকে।

দিলীপ ফিরে আসে আবার রান্নাঘরে। চায়ের কাপ-গুলো ধুতে সুরু করে। ঠাণ্ডা জলে আংগুলগুলো যেন অবশ হয়ে যায়। অবশ হয়ে যাচ্ছে সমস্ত চেতনা। কত বড় হবার দুর্বার ইচ্ছেই ছিল দিলীপের মনে আর স্বপ্নে। ক্লাসে সেই পুরোণ বেঞ্চিটার কথা মনে পড়ে, মোহনের সংগে ঝগড়া করে ছুরী দিয়ে নাম লিখেছিল বেঞ্চির ওপর। প্রথম বেঞ্চির প্রথম সিট্। মাষ্টার মশাইয়ের স্নেহ আর ভালবাসা। অরুণবাবু, প্রকাশবাবু, সংগ্রেশবাবু···দিলু এই দিলু এই দিলু সুধীরের ডাকে চমক ভাংগে দিলীপের। কি বলছিস্ সুধীর, দিলু বলে।

তোকে কত খোঁজ করছিল কেবিনের ঐ ভদ্রলোক, আমি তোকে খুঁজেই পেলাম না, সুধীর আগ্রহ নিয়ে পকেট থেকে একটা নোট এগিয়ে দেয়, এই নে, এই টাকাটা ঐ ভদ্রলোক দিলেন, বললেন, অরুণবাবু দিয়েছেন। একটু থেমে সুধীর গলা নামিয়ে বলে, হ্যাঁরে দিলু, তোর কেউ আত্মীয় বুঝি?

দিলীপ চোখ তোলে। জলে ভরে গেছে চোখ দুটো।

কাঁদছিস তুই, সুধীর অবাক হয়।

কই না তো, তাড়াতাড়ি চোখটা মুছে বলে দিলীপ। টাকাটা হাতে নেয়। মাষ্টার মশাইয়ের পান। মনে মনে ভাবে দিলীপ আজ সলুর জন্য বিস্কুট কিনে নিয়ে যেতে হবে। অনেক বিস্কুট। জ্বরের মুখে নোনতা বিস্কুট খেতে ভাল লাগে।

দিলীপের মুখে নোনতা স্বাদ লাগে। হয়ত দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে মুখে। কেউনা তাকাচ্ছে বোধহয়। দিলীপ ফেরে।

মাকড়সার জাল ও সূতা

গৌর আদক

জাল ও সূতা তৈরি করা কাজটা যে কেবল মাত্র মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে তা নয়। এ পৃথিবীতে যে সব বিচিত্র ধরণের প্রাণী দেখা যায় তাদের মধ্যেও কিছু কিছু প্রাণীকে জাল ও সূতা তৈরি করতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে মাকড়সাই অগ্রগণ্য এবং মাকড়সারই এক চেটিয়া কাজ বলা যায়। আজ তোমাদের কাছে মাকড়সার জাল এবং সূতা তৈরির কথা বলবো।

মাকড়সার জাল এবং সূতা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, ঘরের আনাচে কানাচে এবং গাছ পালা প্রভৃতি বিভিন্ন যায়গায় মাকড়সার জাল দেখা যায়। মাকড়সার জাল এবং সূতা তৈরি করাটাই হলো এদের বৈশিষ্ট্য।

মাকড়সার জালই তোমরা দেখেছো কিন্তু মাকড়সা যে কি ভাবে জালটি তৈরি করে তা তোমরা অনেকেই জানো না, কিন্তু তোমরা যদি একটু ভাল করে লক্ষ্য কর তাহলেই ওদের জাল বোনার কৌশলটা জানতে পারবে।

মাকড়সার জাল বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে—প্রায় সাত-আট রকমের। বিভিন্ন মাকড়সা বিভিন্ন রকমের জাল বুনে। কোনটি খাড়া, কোনটি ভূমি সমান্তরাল, কোনটি তেকোণা, কোনটি বহুকোণা, কোনটি বা তাঁবুর মতন। আবার কোন কোনটি পাতলা, কাগজের মত মসৃণ। এদের জাল বোনার কৌশলটি বড়ই অদ্ভুত এবং এর জন্য এরা যথেষ্ট মেহনৎ করে থাকে। এদের কাছে জালটি এদের ডিম ও বাচ্চার মতন অতি মূল্যবান সম্পত্তি।

জাল বোনবার সময় ওরা প্রথমে কোন একটি উঁচু স্থানে বা উঁচু গাছের ডালে সূতা আটকে সেই সূতার উপর ভর করে কিছুটা নীচে ঝুলে পড়ে এবং সেই ঝুলন্ত অবস্থাতেই আবার সূতা ছাড়তে থাকে, তখন সেই সূতা আবার হাওয়ায় উড়তে উড়তে কোন এক জায়গায় আটকে গেলে মাকড়সাটি সেই সূতা বেয়ে বেয়ে সেই স্থানে চলে যায় এবং সেখান থেকে আবার সূতা ছেড়ে ঝুলে পড়ে। সূতাটি কোথায় আটকে গেছে বুঝতে পারলে সেই স্থানে চলে যায়। এই ভাবে মাকড়সা তৈরি করে ত্রিকোণী একটি জালের কাঠামো। তারপর মাকড়সা ঐ ত্রিকোণী জালের কাঠামোর উপর ছাতার শিকের মতন কয়েকটি সূতোর টানা দেয়। এরপর মাকড়সা তার ত্রিকোণী জালটিকে তলপেটের গ্রন্থি থেকে সূতা ছেড়ে পিছনের পায়ের দ্বারা ঘুরে ঘুরে সেই জালটিকে গোলাকার করে। এই ভাবে মাকড়সার একটি জাল সম্পূর্ণ হয় এবং এই জাল বুনতে মাকড়সার আধ ঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে। মাকড়সার জালের মধ্যে অসংখ্য বিন্দু বিন্দু আঠালো পদার্থ থাকে। এই পদার্থ মাত্র দুই-তিন দিন থাকে। যখন এই পদার্থটি শুকিয়ে যায় তখন ওরা পুনরায় জাল বুনতে থাকে এবং জালটি যদি কোথাও ছিঁড়ে যায় তখন ওরা চটপট মেরামত করে ফেলে।

মাকড়সার বৈশিষ্ট্য হলো সূতা বোনা। সব মাকড়সা জাল বুনতে পারে না। অনেক মাকড়সা আছে যারা শুধু সূতা বুনতে পারে। যে সমস্ত মাকড়সা জাল বুনতে পারে না তাদের তলপেটে কয়েকটি গ্রন্থি থাকে। সেই গ্রন্থি থেকে একপ্রকার তরল সূক্ষ্ম পদার্থ বাহির হয়। সেই সূক্ষ্ম তরল পদার্থ হাওয়ায় শুকিয়ে সূতা তৈরি হয়। একে বলে মাকড়সার রেশমী সূতা। এই সূতা একত্রে তিন-চারটি মিলিত হইয়া একটি শক্ত সূতায় পরিণত হয় এবং এই সূতার দ্বারা উহারা ডিম পাড়বার থলি তৈরি করে। শুধু তাই নয়, এই সূতার দ্বারা উহারা শত শত মাইল উড়ে যেতে পারে।

কিশোরের ডাক

বিশ্বেশ্বর সামন্ত

আয়না ভোরা আয়না ছুটে
খেলতে মাঠে যাই,
খেলাধূলার মধ্যে আছে
শক্তি সাহস ভাই,
সুস্থ শরীর মনের মন
এই তো আমরা চাই,
আয়না ভাই সবার মিলে
খেলতে মাঠে যাই,
লেখা-পড়ার সঙ্গে চাই
দেহের প্রতি যত্ন,
তবেই তুমি পারবে হ'তে
সভ্যতাদের রত্ন।
ছিপ্পী নিয়ে খেলবে যখন
আশা তোমার মোটেই নেই,
সবের পথ বন্ধ হ'বে
অন্ধ তুমি সব দিকেই।
লেখা-পড়া, খেলা-ধূলা
উভয়ে তারা দুইটি ভাই,
এক সঙ্গে মিলে আছে
তাই তাদের বিরোধ নাই।
অতি কচি বয়সে তোরা
কেন আছিস বল,
ঐ বয়সই আশা গড়ার
প্রকৃত শুভ লগ্ন।
আয়না সবাই, আয়না রে ভাই
ঘর থেকে বাইরে,
সবাই মিলে এক দৌড়ে
মাঠের দিকে যাইরে।

পানকৌড়ী

শ্রীসবিতারাণী দেবী

(উপকথা)

"পানকৌড়ী, পানকৌড়ী, মাছ দিয়ে যা'।
একটা মাছ আমায় দিয়ে বাকীগুলো খা' ॥"

পানকৌড়ী দেখলেই আমরা, দলবদ্ধ শিশুরা চীৎকার করে বলতাম ছড়াটা। এ ছড়া যে আমরা কার কাছে শিখলাম, সেই বা কার কাছে শিখেছিল তার কোন গোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে না বটে কিন্তু বলতাম আমরা সবাই, হয়তো আমাদের বাপ-ঠাকুরদারাও বলতেন, বলেছে আমাদের ছেলেমেয়েরাও ঐ একই কথা, একই ছড়া।

পুরুষানুক্রমে উচ্চারিত এই ছড়ার মর্যাদা কিন্তু পানকৌড়ী কোনদিনই রাখেনি—দেয়নি একটা মাছও কোনদিন—আমরা কিন্তু বলেই চলেছি দিনের পর দিন ছড়াটা পানকৌড়ী দেখলেই।

কালো রঙের, লিকলিকে সরু গলার অনচর এই পাখীগুলোকে তোমাদের কেউ কেউ হয়তো দেখেছ বড় বড় পুকুরে বা বিলের জলে ডুবে ডুবে মাছ ধরতে। যারা চিরকালই সহরে আছ তাদের সাথে এদের পরিচয় না থাকারই কথা। শীতের দিনে কম দেখা গেলেও বর্ষায় এদের দেখা যায় বেশী সংখ্যায়—অনেক।

মাছ খেয়েই এরা বেঁচে থাকে—আর কোন জিনিষ খায় না এরা। মাছরাঙা পাখীও মাছ খায় বটে কিন্তু তারা পানকৌড়ীর মত জলে সাঁতার কাটতে পারে না, তার কারণ ডানার দুই পানকৌড়ীর পায়ের পাতা জোড়া লাগান।

মাছরাঙা আর পানকৌড়ীর মাছ ধরার কায়দাও আলাদা রকমের। মাছরাঙা সাধারণতঃ জলের উপর ঝুলে-পড়া গাছের ডালে বসে থাকে, মাছ দেখলে তাকে ধরতে চুপ করে ডুবে যায় চোখের পলকে আবার তড়িৎ উঠে আসে মাছ নিয়ে বা খালি মুখে—গা ঝেড়ে জল ফেলে আবার বসে। আর পানকৌড়ী মাছের সাথে সাথে জলের নীচে সাঁতার কেটে ফেরে যায় বহুদূর—কখনো পারে

কখনো পারে না। আবার মাঝে মাঝে বোধে পাখা ঝুড়িয়ে গা শুকিয়ে নেয়।

পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গাতে পানকৌড়ীকে বলে—"পানিকাক।"

আজ আমরা পানকৌড়ীকে যেমন দেখি আগে—অনেক অনেক আগে তারা কিন্তু ঠিক এমনটি ছিল না। যেমন ছিল মোটা তাজা মানানসই চেহারা তাদের, তেমনি ছিল গায়ের রঙ—"দুধে আলতা" যাকে বলে। এদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে মনে হত বুঝি বা হাতে রঙ লেগে গেল। নরম তুলতুলে পালক। অপূর্ব তার স্পর্শসুখ।

পানকৌড়ীরা তখন থাকতো মানস-সরোবর থেকে প্রায় ১০ যোজন দূরে দক্ষিণ-পূব কোণে প্রকাণ্ড একটা সরোবরে।

দুধসাগর ছিল তার নাম। নামেও যেমনি আসলেও তেমনি। জলের বদলে দুধেই ভরা ছিল দুধসাগর। আর সেই দুধের গন্ধে নানা জায়গা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা উড়ে এসে বসত দুধসাগরের তীরে দুধের লোভে। তীর্থযাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকত সেখানে সব সময়েই। দিনের পর দিন কেটে যেত তাঁদের। দুধসাগরের দুধ ছেড়ে আর যেতে চাইত না তাঁদের মন। পথের ক্লান্তি দূর হয়ে সোনার কান্তি হত তাঁদের দুধসাগরের দুধ খেয়ে।

এই দুধসাগরের পাড়েই থাকত পানকৌড়ীরা। এদিক ওদিক ঘুরে এসে জুটত দুধসাগরে। দুধসাগরের দুধেই স্নান করত তারা, গা মেজে ঘসে পরিষ্কার করত দুধ দিয়ে। তখন যে দুধে আলতায় রঙ, তা আরো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠত। মাঝে মাঝে উড়ে যেত আর ঘুরে এসে বসত, স্নান করে গা মেজেঘসে চকচকে করে ফেলত—ঐ দুধসাগরের দুধ দিয়ে।

আকাশ দিয়ে ঝাঁক ধরে যখন পানকৌড়ীরা উড়ে যেত, সূর্যের আলোতে রামধনুর রঙ ধরত তাদের গায়ে। লোকেরা অবাক হয়ে দেখত সেই চলন্ত রামধনুর ঝাঁক—ডেকে দেখাতো একে অন্যকে—তারিফ করত সকলে।

ফিরে এসে বসত আবার তারা দুধসাগরের তীরে। ঘুরে ফেলত গায়ে লাগা ময়লা-মাটী, আবার যেত উড়ে—আসত আবার ফিরে।

এইভাবেই কেটে গেছে তাদের অনেক অনেক—যুগ-যুগ যুগান্ত পুরুষানুক্রমে।

একদিন দুপুরবেলা।

অনেক দূর থেকে উড়ে এসে ক্লান্ত হয়ে বসেছে পানকৌড়ীরা। সবাই ব্যস্ত গা ধুতে, মেজেঘসে পরিষ্কার হতে দুধ খেয়ে ক্লান্তি দূর করতে। এমন সময় কোথা থেকে উড়ে এল ছোট্ট একটা ফুটফুটে ছেলে তার ছোট্ট ছোট্ট ডানা মেলে।

নেমে পড়ল সে যেখানে পানকৌড়ীরা তাদের গা ঘসে পরিষ্কার করছে।

আহুরী পরীর বাচ্চা ছেলে সে। নাম তার চুচুং পরী। পরীর দেশের ভাষায় চুচুং মানে হল 'যার চেয়ে আর সুন্দর হয় না।' চুচুং মার সাথে গেছিল দেশ ভ্রমণে, ঘরে ফিরে আসছে মায়ের-ব্যাটায়।

যোজন দূরে থেকেই দুধসাগরের দুধের গন্ধে চুচুংএর পেয়ে গেল খিদে। খাবার জিনিসের সন্ধান পেলে ছোট্টদের খিদে পায় চিরকালই। মাকে বলল চুচুং খিদের আর উড়তে পারছি না মা, আমায় খেতে দাও। মা আহুরী বলল যা ঐ দুধসাগর থেকে তুই চট্ করে দুধ খেয়ে আয়। আমি ততক্ষণে ঘুরে আসি মানস সরোবর থেকে।

মার কথায় চুচুং তাই নেমে এল দুধসাগরের তীরে—পানকৌড়ীদের কাছে।

চুচুং তার ছোট্ট ছোট্ট পা বাড়িয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় দুধসাগরের ধারে।

তাকে দেখে একটা পানকৌড়ী বলল "তুই আবার কেরে, পুঁচকে ছোঁড়া? কি চাস্ এখানে?"

চুচুং বলল "বড্ড খিদে পেয়েছে আমার, একটু দুধ খেতে এসেছি এখানে। আমি অসকার আহুরী পরীর ছেলে—চুচুং আমার নাম।

"না, পাবিনা তুই দুধ খেতে।" বলল সেই পানকৌড়ীটা—এটা আমাদের দুধসাগর যেখানে আমাদের দুধ তোকে খেতে।"

চুচুং অনেক করে বলল কিন্তু সেই পানকৌড়ীটা কিছুতেই তাকে ঘেঁসতে দিলনা দুধের ধারে কাছে।

চুচুং বলল—"আমি ছোট্ট বাচ্চা অতশত বুঝিনা।

যার কাছে শুনেছি সৃষ্টির শুরুর থেকেই এই দুধসাগর সৃষ্টি করেছেন ভগবান্। ভগবানের জিনিষে অধিকার সকলেরই সমান, তোমাদেরও যেমন আমারও তেমন। এসো আর তোমরা তৈরী করনি যে আমাকে এর দুধ খেতে দেবে না। সর ভাই, আমায় একটু খেতে দাও—বড্ড খিদে পেয়েছে আমার।

দুষ্টু পানকৌড়ীটা কিন্তু এই সব ভালকথায় আরো রেগে গেল। বলল "দাঁড়াতো ছোঁড়া, খাওয়াচ্ছি তোকে" এই না বলে দুষ্টু সেই পানকৌড়ীটা ডুস্ করে ডুব দিল সেই দুধসাগরে। ডুব দিয়ে একেবারে তলিয়ে গেল সাগরের তলায়—মাটীতে। এমন করে ঘুলিয়ে দিল সেই মাটীটা যে কাদামাটীতে ঘোলা হয়ে গেল দুধ-সাগরের দুধ। এমন যে দুধ সে হয়ে গেল একেবারে কাদামাখা ঘোলা জল থকে।

যে সব পানকৌড়ী জমেছিল তারে, তারা তাড়াতাড়ি উঠে পাখন পাখে পৃ পৃ করতে করতে।

রাগে দুঃখে কুচুং-এর বাড়া গাল হয়ে উঠল আগুনের মত লাল। পানকৌড়ীরা তার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল 'হি' হি' করে।

রাগে কেটে পড়ল কুচুং। কাঁপতে লাগল তার সারা শরীরটা। কি এতবড় কথা—

কাঁপতে কাঁপতে বলল কুচুং—"আমার খিদের সময় আমাকে একটু দুধ খেতে না দিয়ে যেমন করে কাদামাটি মাখা করে দিলি দুধসাগরের দুধ, আজ থেকে যেন এমনি কাদা গোলা হয়ে থাকে এর দুধ। তোরাও আর খেতে পারবিনা না তা আজ থেকে। আর তোদের এই হিংসুটে মনের জন্যে আজ থেকে তোদের এই রূপে যেন ছাই পড়ে যায়, দেখতে তোরা এমন কদাকার হয়ে যা যেন লোকেরা আর তোদের দিকে ফিরেও না তাকায়।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই দুধসাগরের দুধ ঝকঝকে কাদায় ভর্তি হয়ে গেল আর পানকৌড়ীদের অমন যে দুধে-আলতা রঙ তা হয়ে গেল একেবারে মিশ কালো, গলাটা হয়ে উঠল সরু সিকলিকে।

হায় হায় করে, একসঙ্গে তারা কেঁদে উঠল চীৎকার করে!

যেমন হিংসুটে তাদের মন তেম্নি-পেল তার ফল হাতে হাতে।

পাখি-চোখ

রমাপ্রসাদ দে

বল্ দেখি ভাবু তোরা
আমাদের চোখ কি
কোনদিন হতে পারে
ডানাওলা পক্ষী?
তাহলে তো বেশ ভাই
ইচ্ছাতে দেখে যাই
মিশর, চীনের নদী
স্বর্গের লক্ষ্মী।
উড়ে যাই
ঘুরে যাই
ইচ্ছাটা যখন
পাখা মেলে দেখে নেব
আকাশের রোদ্দুর
ভাবু কয়, 'সে কি হয়
বেশ তুমি বোক তো!
চোখ পাখি হয়ে গেলে
থাকবে না চোখ তো!

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের ইঙ্গিত

ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার, এম-এ, পি-এইচ-ডি, ডিপ-এড

জীবনের আনন্দ রসের গভীরতম উৎস যাকে রবীন্দ্রনাথ সন্ধান পেয়েছিলেন সেই অলক্ষ্য অধ্যাত্ম সত্তাটুকুর। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে আধ্যাত্মিক লক্ষ্যচ্যুত শিক্ষা অসম্পূর্ণ; তিনি জীবনের মূলে আধ্যাত্মিকতার উৎস উপলব্ধি করে শিক্ষাকেও সেই রসে সঞ্জীবিত করতে চাইলেন।

মানুষের ধ্যানকেন্দ্রী সৃজন প্রাণ কলহসিত মনোজগৎ তৈয়ারীর কাজেই বড় কথা। তাই শিক্ষককে দ্বিতীয় স্রষ্টা ও নবযুগের ঋত্বিক্ বললে ভুল হয় না। সংকল্পে অটল, সমর্পিতপ্রাণ তাদৃশ শিক্ষকের সযত্ন তত্ত্বাবধানে আত্মস্থ স্বাস্থ্যকর পরিবেশনিচয় শিশুমনের অজ্ঞাত স্তরে ক্রিয়া করে, তার বিকাশে সহায়তা করে। অবচেতন স্তরে ঘুমায় ভবিষ্যতের মানুষ—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।

শারীরিক ক্ষমতা সসীম জেনে বিশেষতঃ স্বাস্থ্যের দিক থেকে অপটু আমাদের ছেলেপুলেদের জন্য কয়েকটী দরকারী বিষয়েরও সীমা বেঁধে দিতে হবে। ভূরিভোজের মত অফুরন্ত বিষয় ও ভাষার ব্যবস্থা কারও মুখ চেয়ে রাখা দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতা; স্বাধীন ধারায় স্বাভাবিক বিকাশই গণতন্ত্রে বাঞ্ছনীয়। বিষয়তার আলুর গাড়ীর মত না হয়ে যথাসাধ্য বহনযোগ্য হওয়া উচিত।

এর মধ্যেই শিক্ষক মহাশয় এই সীমিত বিষয়গুলিকে আবশ্যকমত রঞ্জিত, বিকসিত, সঞ্জীবিত করে পড়াবেন। বিষয়াবলী অনুকূল পরিবেশে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব স্পর্শে জীবিত ও জাগ্রত হয়ে উঠবে। কাঁঠাল গাছের গুঁড়িতে কাঁঠাল কোলার মত গোড়া থেকেই ভারাক্রান্ত থাকবে না। "পুঁথিকে মনের রাজা না করে মনকে পুঁথির রাজা করতে হবে।" কথাটা নিশ্চয়ই কবিতার ছলে বলা হল না, বুঝে কাজ করতে হবে।

জাতি ও মানবকল্যাণ আদর্শরঞ্জিত ত্যাগ ও দুঃখ বরণোজ্জ্বল পরিবেশ মাঝে স্বাভিজাত্যাহ্বিত আত্মসংযত আধারে "গুরুজ্ঞানদীপে আত্মদীপ জ্বালিয়ে" শিক্ষার কাজ চলবে; নতুনের অন্তরে প্রাচীনের জ্ঞান যজ্ঞাগ্নি শিক্ষা জ্বলতে থাকবে।

গণতন্ত্রে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অ স্বাস্থ্যসারে কাজ করার ক্ষমতা, আদেশ পালন ও কর্তৃত্ব পরিচালন, দলের সেবায় নিজের ও নিজের কাজে দলের মঙ্গল দেখা, সৌর কর্তব্য ও অধিকার, প্রজাই রাজা—এ বুদ্ধিতে আইন প্রণয়নে সাহায্য করে আইন অনুগ হয়ে 'আইনের রাজ' অর্থাৎ 'Reign of Law' প্রতিষ্ঠাস্তে গণতন্ত্রকে প্রাণ ও বাস্তবতা দিতে পারাই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই অন্য কিছু কিছু বাদ দিয়ে হলেও এ শিক্ষার ব্যবস্থা কার্যদৃষ্টির অঙ্গীভূত হওয়া আবশ্যক।

এখন বাইরের সংসার জীবনের বিভিন্ন বিভাগ স্বল্প-জীবনে খানিকটা প্রতিফলিত করে আজ অগ্রসর হতে হবে —বাস্তবের নতুন পথে। এর মধ্যে দেখতে হবে কোন বিষয় জীবনে কতখানি দাবীদাওয়া অধিকার করে আছে। তার গুরুত্ব অনুসারে তার স্থান সীমিত বা ব্যাপ্ত হওয়া উচিত। সে হিসাবে আগেই প্রচলিত দু একটী বিষয়ে কিছু বললে হয়তো নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনেকে হয়তো অঙ্কে একেবারে কাঁচা, অথচ ভাষা বা অন্য বিষয়ে বেশ ভালই। আবার কেউ বা তার উল্টো। কেউ ইংরাজীতে ততটা পেরে উঠছে না—হিন্দীর তো কথাই নেই। এ ক্ষেত্রে ইংরাজীতে অধ্যক্ষ ওয়ার্ডসোয়ার্থের উল্লিখিত working knowledge in English বা business English অর্থাৎ কাজ চালানর মত ইংরাজী-জ্ঞানের ব্যবস্থা থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না, অবশ্য তা কতক ছাত্রের জন্যে। হিন্দীর আস্তে আস্তে অনুপ্রবেশ ভবিষ্যতে সুবা বাংলাই এর মত কিছু ডেকে না নিয়ে আসে। কাজ চালান ইংরাজী আপাতের মত আমাদের ক্ষেত্রেও চলতে দিলে ভাল হয়। তবে উচ্চ শিক্ষার সুবিধার জন্য ও যারা পারবে তাদের জন্যে ভাল ইংরাজী শিখবার ব্যবস্থাও থাকা উচিত। অঙ্কে অপটুতাও কোন

কোন ছাত্রের বা ছাত্রীর ভাষার অধিকার থাকা সত্ত্বেও ফুলফাইনালের চৌকাঠ ডিঙাতে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এর একটা প্রতিবিধান আবশ্যক। ইংরাজীর মত কাজ চালানর আদর্শে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ঐক্যিক নিয়ম ও তদ্ভবীয় দু একটা আর্যাই তার জন্যে যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। এবিষয়ে প্রথম মাট্রিকুলেশনে তার আত্মতোষ-প্রসূত ইঙ্গিতই যথেষ্ট বলে মনে হয়।

মাছের চাষ, আলু, ধান, ছোলা, মটর, মুগকলাই বোনা, তাঁতের কাজ, কারখানার কাজ তার মধ্যে বই বাঁধান ছুতোরের ও রাজমিস্ত্রীর কাজ, কামারের ও দর্জির কাজ, কেক, লজেঞ্জ, মিষ্টি, জ্যাম, জেলী তৈয়ারী সাবান তৈয়ারী, মাটির কাজ, পটারির কাজ, পট ও ছবি আঁকা প্রভৃতিও সম্ভবমত নিয়ে গ্রুপের মধ্যে চারিয়ে দেওয়া হবে; বিশেষে 'মাটো' বুদ্ধি অথচ সাহসী ছেলেদের জন্যে সমর শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে পারলে মন্দ হয় না। যারা 'কেতাবী' বিদ্যা ও হাতের কাজ দুয়ের একটাতেও ভাল করতে পারে না, অথচ কর্মঠ ও সাহসী তাদের দৈনিক বৃত্তির দিকে আকর্ষণ করতে পারলে ভাল। এতে করে সমাজের সকল শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিকে সমান সুযোগ-দিয়ে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করা হয়।

বিলাতে আমার দেখা আউণ্ডেল স্কুলে বছরের মধ্যে তিনমাস ব্যবহারিক কাজের জন্য আলাদা রাখা হয়। আমার মনে হয় সে রকম পুরাপুরি ক্লাশের কাজ বন্ধ দিয়ে একটানা ব্যবহারিকের ব্যবস্থা হয়তো আমাদের অবস্থায় ততটা সুবিধাজনক নাও হতে পারে। তবে দু একটা ক্লাশ সুবিধামত রাখা যেতে পারে।

ছেলেমেয়েদের গ্রুপ প্রণালীতে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এক এক গ্রুপে পাঁচ, ছয় জন থাকবে, তবে সকল গ্রুপই একই সময়ে কাজে রত না থাকলে অবশিষ্টের জন্যে সমান্তরাল ভাবে ক্লাশের কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়তো সম্ভব হবে না। আমাদের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমরা হয়তো বছরের মধ্যে তিনটে বা চারটে ব্যবহারিক অন্তরাল (interval) স্থির করে নিয়ে অগ্রসর হতে পারি। এই বর্ষাংশগুলোয় শুধু ব্যাবহারিকবিশেষকে অবশ্য বিশেষে প্রাধান্য দিয়ে চলতে হবে—তখন ক্লাশের কাজ খুব কমের দিকেই রাখতে চেষ্টা করা হবে হয়তো এক তৃতীয়াংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তা দুপুরেই হোক বা সন্ধ্যার পরেই খানিকটা হোক-যখন বা যেখানে যেমন সুবিধা, সেই ভাবে চলবে। আসলকথা কাজ যেন হয় এই মত ব্যবস্থা চলবে, শুধু নিয়ম বজায় রাখাই উদ্দেশ্য নয়।

আর এক কথা, সব স্কুলেই যে সবরকম ব্যবহার জীবনের বিভাগগুলি থাকবে তার কোন কথা নেই; পুষ্করিণী প্রধান বা চাষ আবাদ প্রধান এলেকায় যেমন মাছ বা শস্যের চাষকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে, তেমনই শিল্পাঞ্চলে কারখানার কাজই বিশেষ স্থান পাবে। এসব জিনিসের বেচাকেনার জন্যে ছেলেমেয়েদের শান্তি-নিকেতনের মত কো-অপারেটিভ বিভাগ থাকবে।

স্কুলের মধ্যেই 'কেতাবী' বিদ্যার গণ্ডীর বাইরে বেচা-কেনার একটা ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে চালিত রাখতে পারলে ভাল হয়। তাতেকরে কালো বাজারের উপর একটু স্বাস্থ্যকর প্রভাব পড়ে। ছেলেরাও কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়ী বাড়ী দুধ, মাছ, তরকারী সরবরাহের ব্যবস্থায় অংশ নিতে পারে। তবে এখানেও ব্যাচ বা গ্রুপ প্রণালীর সাহায্যে কাজ চালাতে হবে। স্কুলের সঙ্গে বাইরের জীবনের এই যোগাযোগ বিষয়ে যোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কাজ চালানর দরকার। এক এক দলের কাজ বছরের মধ্যে এভাবে দু মাসের বেশী চলা উচিত নয়। তবে বিভিন্ন দল মিলে বছরের অর্ধেকের কিছু বেশী সময় এই রকম ভাবে বাজার চালান যেতে পারে। তা নইলে পৌরজীবনের সঙ্গে কার্যকরী সমন্বয়সাধন দুরূহ। বিদ্যালয়, গৃহ ও সংসার the school, the home and the world এই ভাবেই শিক্ষার কেন্দ্রীভূত, প্রতিফলিত হতে পারে। বিলাতের আউণ্ডেল স্কুলের ছেলেরা চাষীদের লাঙ্গল, কাল, ঘোড়া-গোরুর নাল, পেরেক, নিরেণ প্রভৃতি নিজেরাই তৈয়ারী ও সরবরাহ করে থাকে এবং স্বোপার্জনের আনন্দ পায়। শ্যামবাজার পলিটেক্-নিকের পিটাভেলের 'শিক্ষায় স্বাবলম্বন' নীতি (self-supporting education) অনেকটা এই ভাবের। স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় একবার কৃষ্ণনগর শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণের উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে এসে আমাদের সব ভাইকে আর্টসের ভক্ত দেখে বলে উঠলেন "রেখে দেগা তোদের কেতাবী বিদ্যে!" শিক্ষা-সংস্কারের কাজ আরম্ভ করতে আমি রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত বলে বিলাতের ও ইউরোপের অনেক শিক্ষা তীর্থ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের বর্তমানের শিক্ষার নিগড় খানিকটা আলগা করার পথের কিছুটা আভাস দিতে সাহস করলাম। বর্তমানের অবস্থাচক্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমরা সাধারণে ও শিক্ষকেরাও পুরাণোকে আঁকড়ে ধরে থাকাতে ছাত্রমনের নবভাবধারার বিকাশের ঠিক মত রাস্তা খুলে দিতে পারছি নে। এই নৈরাশ্যের প্রতীকারের জন্যে আমাদের বাস্তবের পথে বিকাশের নতুন ধারায় সাহসের সঙ্গে ঝাঁপ দিতে হবে, শিক্ষক মহাশয়কেও মুখ তুলে চেয়ে সব দেখে নিয়ে অবস্থামত কাজে নামতে হবে। "তুমি কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় আস!"—যুগঋষির এই আবাহনগীতি নব জীবন রস-চল বাস্তব সমস্যার মাঝে নবস্তবোধনে ঐ বাজছে!

সঙ্কট ঃ সমাজে, সংসারে

শৈল চট্টোপাধ্যায়

আজ আমাদের সমাজ, সংসার সব এক সঙ্কট-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে যে চলেছে তা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন। দিকে দিকে আজ শুধু অভাব, অনটন, অভিযোগ, অবিচার, অনাচার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এক অভাব মোচন করতে গিয়ে আরও বহু অভাবের সৃষ্টি হচ্ছে; এক অনাচারের প্রতিকার করতে গিয়ে অনেক অনাচারই ঘটছে। তাই অভিযোগ যেমন স্তরে স্তরে জমা হচ্ছে, অবিচারও সেই অনুপাতে বেড়ে চলেছে! চতুর্দিকে এক বিরাট অসন্তোষ, অধীরতা, অনিশ্চয়তা ধূমায়িত হচ্ছে—আমাদের জীবনকে গ্রাস করছে, পঙ্গু করে দিচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রাকে!

আমাদের দেশ এখন চলেছে এক বিরাট সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে। অর্থ-সংকট ও খাদ্য-সংকটে জাতি আজ জর্জরিত! কালোবাজারী, মুদ্রাস্ফীতি ও মুনাফাখোরী চক্রান্তে জনজীবন আজ বিপর্যস্ত! বহিঃশত্রুর আক্রমণ আশঙ্কায় সকলে সন্ত্রস্ত! কুশাসন ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে আভ্যন্তরিক শান্তি বিঘ্নিত! জনচিত্ত সব সময়ে শঙ্কা ও সংশয়ে সঙ্কিত—অভাবে ও অনটনে অভিভূত!

এর শেষ কোথায়? তা আজ কারুরই বোধ হয় জানা নেই। কিন্তু যখন সঙ্কট এসেছে তখন তো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না বা হা-হুতাশ ও কান্নাকাটি করে এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়াও যাবে না। এর জন্যে চাই গঠনমূলক পরিকল্পনা ও সুষ্ঠুভাবে তার রূপায়ণ। প্রতিটি গৃহই আজ একরকম সঙ্কটের সম্মুখীন! গৃহকর্তার চেয়ে গৃহিণীর ওপরই এর চাপ সমধিক পড়ছে; কারণ গৃহের ব্যাপারে গৃহিণীর দায়িত্বই বেশী। গৃহের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা, অভাব-অনটন থাকলেও তারই মধ্যে গুছিয়ে ও ব্যয় কমিয়ে সংসার চালানে ইত্যাদি সবই সুগৃহিণীকেই যে করতে হয় এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু গৃহই তো সব নয়! এর পরেও আছে এক বৃহত্তর ক্ষেত্র—সমাজ এবং সামাজিকতা। সেখানেও মেয়েদের দায়িত্ব বড় কম নয়। সামাজিকতা বজায় রাখতে হবে—তবে বাহুল্যতা না করে। সব সময়ে মনে রাখতে হবে নিজের অবস্থা অনুযায়ীই ব্যয় করা চলবে—তার অতিরিক্ত যেন না হয়।

সুষ্ঠুভাবে সমাজ জীবন যাপন করতে হবে। সভ্যতা ও শালীনতা যেন সমাজের মর্যাদা বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং নিজেদের আচরণও সেই অনুযায়ী সুসংযত ও সুসঙ্গত করে চলতে হবে। সমাজ দেহে যাতে ব্যভিচার প্রবেশ করতে না পারে, অনাচার যাতে সমাজ-সংসারকে কলুষিত করতে না পারে, অশ্লীলতা ও রুচি-বিকৃতি যাতে সামাজিক রীতিনীতিকে বিপর্যস্ত না করতে পারে, সে বিষয়ে মেয়েদেরই বিশেষ করে সচেতন থাকতে হবে। মেয়েরা যদি ঠিক থাকে—শত অভাবে, অনটনে, অবিচারেও অবিচলিত থেকে যদি তারা সংসারের হাল দৃঢ় হস্তে ধরে রাখতে পারে, নিজেদের নৈতিক অধঃপতন থেকে যদি তারা রক্ষা করতে পারে, শত প্রলোভনেও যদি তাদের পদস্খলন না হয়, শত প্রয়োজনেও যদি তারা ধর্ম-ভ্রষ্ট না হয়ে ধর্মের নীতিতে, সামাজিক রীতিতে পূর্ণ আস্থা

রেখে যদি তারা সগর্বে মাথা উঁচু করে সকল বিপদ, সকল আঘাত, সকল সংঘাতের সামনে দাঁড়াতে পারে, আর বুকে নিষ্ঠা ও ভক্তি নিয়ে, মনে সাহস ও শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলতে পারে, তবেই হয়ত এই ভাঙনের হাত থেকে, এই বিপ্লবের মার থেকে, এই সঙ্কট-সংঘাত থেকে আমাদের সংসারকে, আমাদের সমাজকে আমরা রক্ষা করতে পারব।

আশা করি আমার মা-বোনেরা জাতির এই দুর্দিনে, সমাজে ও সংসারের এই সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে সুস্থ মস্তিষ্কে, সুবিবেচনা ও সুপরিকল্পনার মাধ্যমে কি ভাবে সংসারকে, সমাজকে ভাঙনের হাত থেকে, অকল্যাণের হাত থেকে, কলুষতার হাত থেকে বাঁচান যায় তা ভেবে দেখবেন এবং এই দুর্দিনেও মাতা, স্ত্রী ও কন্যার কর্তব্য অবিচলিত নিষ্ঠার পালন করে ঘরে ঘরে শ্রী ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবেন।

বিজ্ঞানী মেয়ে রেচেল ব্রাউন

সুষমা মৈত্র

অতীতের কথা ভাবলে রেচেলের একথা কেবলই মনে হয় যে, তিনি যে কলেজে পড়তে পেরেছিলেন এটা একটি অলৌকিক ঘটনা। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। পড়াশুনার দেওয়াজ সে পরিবারে ছিল না। অতি অল্প বয়সেই রেচেলের মাকে সংসারের ভার নিতে হয়েছিল। অতি দরিদ্রতা সত্বেও তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল কি করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা যায়। স্কুলে পড়া কালীন রেচেলও পার্টটাইম কাজ করে, বৃত্তি নিয়ে—ঘরকর্ণ করে মাকে সাহায্য করতে আরম্ভ করে। এই সময় তিনি হোলিইয়ক থেকে বৃত্তি পেয়ে পেয়ে গ্রাজুয়েট হবার চেষ্টায় ছিলেন। সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্যই তিনি এই পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর এই কৃতিত্বে রেচেলের দিদিমার এক বন্ধুলোক বান্ধবী রেচেলের কলেজের যাবতীয় শিক্ষার ভার নিলেন। তিনি যে টাকাটা দিতেন তা যেন হোলিইয়কে যে কোন ছাত্রীর খরচের টাকার সমতুল।

এইভাবে অনেক টাকা পেয়েও ডঃ রেচেলের অর্থের প্রতি কোন মোহ ছিল না। অন্যান্য নতুন এন্টিবায়োটিক নাইস্‌টেটিন্ (nystatin) আবিষ্কার করা সত্বেও তার ব্যবসায়ী দিকটার তিনি মনোযোগ দেন নি। তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতে ভালবাসেন। তিনি যখন এই এন্টিবায়োটিক ওষুধটি আবিষ্কার করেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এ সময় তাঁকে অপারেশন করতে হয়। এই সময় তাঁর মাইনে যে কোন সিভিল সার্ভিস স্কেলকে ছাড়িয়ে যায়। এই মাইনেতে তাঁর বেশ ভালভাবেই চলে যেত। তিনি অর্থের প্রতি নিরাসক্ত ছিলেন। কাজেই তিনি এর বেশী টাকার প্রয়োজন বোধ করতেন না।

রেচেল ব্রাউনের মত হচ্ছে যে, "যদি তোমার প্রচুর থাকে, তবে তুমি অধিক কী চাইবে!" অনেক বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ উপরোধেও তিনি যে পেটেন্ট ওষুধ আবিষ্কার করেন তার রয়ালটি নিতে কোনমতে রাজি হননি। এলিজাবেথ হাজেন, যাঁর সঙ্গে একযোগে এই ওষুধ আবিষ্কার করেন তিনিও নেননি। তাঁরা এই রয়ালটির টাকা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে ব্যয় করতে বলেন। ১৯১২ সালে রিসার্চ করপোরেশন স্থাপিত হয়। এই করপোরেশন স্থাপন করেন ফ্রেডারিক জি কোটেল্ নামে এক ব্যক্তি। এই প্রতিষ্ঠানের ওপরই ভার দেওয়া হয় এই রয়ালটির টাকা আদায় করা ও যাতে বৈজ্ঞানিক কাজে এই টাকা ব্যয়িত হয় সেদিকে নজর দেওয়া।

মানুষ যে ইচ্ছে করলে কী করতে পারে রেচেল ব্রাউনের জীবনই হল তার একটি জলন্ত নিদর্শন। পাঠ্য-বস্তুর খুব একটা মেধাবী ছাত্রী তিনি ছিলেন না, কিন্তু হঠাৎ কী কারণে জানি না রসায়ন শাস্ত্রের ভিতর প্রবেশ করবার আগ্রহ তাঁর বেড়ে যায়। তখন থেকে অন্যান্য বিষয় ছেড়ে রসায়ন শাস্ত্রের ওপরই বেশী মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

মাউন্ট হোলিইয়ক কলেজে ভর্তি হবার সময় তিনি প্রথমে ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। তারপর ইতিহাস ছেড়ে তিনি অকস্মাৎ রসায়নশাস্ত্র নিয়ে পড়তে সুরু করেন। উপরোক্ত কলেজে তিনটি বিরাট বিরাট রসায়ন

বিভাগ ছিল। ডঃ এমাকারের মত বিজ্ঞ অধ্যাপিকা পেয়ে তাঁর পড়াশুনার মস্ত সুযোগ এসে গেল। এই অধ্যাপিকার পরামর্শেই তিনি শিকাগো যান আর সেখানে এম-এস ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর আরম্ভ হল পি-এইচ-ডি'র পড়া। অবশ্য এর পূর্বে অন্যান্য সকলের মত তিনি কিছু-দিন মাষ্টারী করেন। কিন্তু পরে তা ছেড়ে দিয়ে পি-এইচ-ডি'র জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তিনি তাঁর থিসিস্ লিখে যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করেন। কিন্তু সামান্য কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেটিকে নামঞ্জুর করেন। পরে কিছুদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে থিসিস্টি অনুমোদন করেন এবং তাঁকে পি-এইচ-ডি উপাধিতে ভূষিত করেন।

রেচেল ব্রাউন কি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন সেটা এবার বলা দরকার। যখনকার কথা বলা হচ্ছে তখনকার দিনে এন্টিবায়োটিক বলে কোন জিনিষ ছিল না। তাই কারো নিউমোনিয়া হলে তাকে বাঁচানো মুস্কিল হত। বিভিন্ন জীবাণু থেকে বিভিন্ন ধরণের নিউমোনিয়া হয়। তখনকার ডাক্তারেরা বিভিন্ন ধরণের ইন্‌জেকশন্ দিয়ে এই জীবাণু ধ্বংস করবার চেষ্টা করতেন কিন্তু কী ধরণের জীবাণুতে রোগী আক্রান্ত হয়েছে সেটা সব সময় সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে উঠতো না। ফলে রোগীকে বাঁচানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠতো। এই ব্যাপারে রেচেলের গবেষণা চিকিৎসা-বিদ্যাকে অনেক সাহায্য করেছিল। ১৫ বছর ডঃ রেচেলের এ্যালবানি লেবরেটরিতে গবেষণা করার পর ১৯৪০ সালে পেনিসিলিনের ব্যাপক প্রচলন হলে এই গবেষণার গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায়। পেনিসিলিন আবিষ্কার হওয়ার পর রেচেল তার ফলাফল নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। বহু চিকিৎসকের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেল যে পেনিসিলিন প্রয়োগ করে রোগীকে সারানো গেছে বটে কিন্তু পেনিসিলিনের প্রভাবে আবার রোগীর দেহে অন্যান্য ধরণের ব্যাধি বা উপসর্গের সূত্রপাত হয়েছে। এই ধরণের একটি ব্যাধির নাম মুনিলায়েসিস (moniliasis)। এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে রোগীর মুখমণ্ডল ফুলে যায়—খাবার সময় অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করে।

এই রোগের একটি প্রতিষেধক বার করবার জন্যে মিস রাচেল বদ্ধপরিকর হন। বিভিন্ন প্রকারের মাটি ও উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার পর তিনি এমন একটি পদার্থের সন্ধান পেলেন যা এই রোগের মহৌষধ। তারপর সেই পদার্থটি ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেখা হল। ১৯৪০ সালে ডঃ রাচেল ব্রাউন ও ডঃ হেডেন যৌথভাবে ঘোষণা করলেন যে তাঁরা উপরোক্ত রোগের একটি ওষুধ বের করেছেন তার নাম ফাঙ্গিসাইডিন (fungicidin)। এর পর থেকে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পেটেন্টের ভার দেওয়া হল রিসার্চ করপোরেশনের ওপরে। গবেষণাটি সফল হয়েছিল আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশে। এই প্রদেশের সম্মান রক্ষার্থে ওষুধটির নতুন নামকরণ করা হল নাইস্ট্যাটিন (nystatin)। পূর্বেই বলেছি এই ওষুধের যা কিছু লভ্যাংশ তা এই বৈজ্ঞানিকরয় দান করেছেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যার্থে।

মানুষ হিসেবে মিস ব্রাউন অত্যন্ত সাদাসিধে। টাকাপয়সার ওপরে তাঁর কোনরকম ঝোঁক ছিল না, মাইনে থেকে জমিয়ে জমিয়ে একখানি বাড়ি কেনেন তিনি। সেখানে তিনি তাঁর মা ও ঠাকুরমাকে নিয়ে গিয়ে রাখেন। তারপর তাঁদের মৃত্যুর পর সেই বাড়ীতে জনৈক ডাক্তারকে ভাড়া দেন। এত কাজ সত্ত্বেও মিস্ ব্রাউন সান্‌ডে স্কুলের গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের ভোলেননি। এখনও দেখা যায় প্রতি রবিবারে তিনি তাদের পড়াতে যাচ্ছেন।

একেবারে নীচু থেকে সম্মানের উচ্চশিখরে উঠে এই মহিয়সী মহিলা যত না আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন তার চেয়ে বেশী আত্মতৃপ্তি পান যখনই দেখেন তাঁর আবিষ্কারে শত শত আর্ত পীড়িত মানুষের জীবন রক্ষা পাচ্ছে। এই মানবতাবোধ দুর্লভ বস্তু বিশেষতঃ আজকের এই আত্ম-কেন্দ্রিক, ভোগসর্বস্ব দুনিয়ায়।

পণ প্রথার পরিণাম ও উহার প্রতিকার চিন্তা

শ্রীগৌরগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য

প্রতিজ্ঞার্থক 'পণ' কথাটিই বোধহয় পারিপার্শ্বিক প্রথার প্রভাবে কালক্রমে কার্যাপণ বা কন্যাপণরূপে বিবাহক্ষেত্রে পণপ্রথায় পরিণত হইয়াছে।

প্রাক্ বিবাহ পর্য্যায়ে ভাবী বৈবাহিকদ্বয়ের পুত্রকন্যার ভাবী বিবাহ বন্ধন বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইবার অর্থেই পণ কথাটির প্রয়োগ উক্তিই বলিয়া মনে হয়। কারণ ইদানীংকালেও স্থিরীকৃত বা প্রায়স্থিরীকৃত বিবাহক্ষেত্রে বর বা কন্যাপক্ষের কেহ যদি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন তবে অপর পক্ষ 'পণভঙ্গকারী' 'প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনকারী', 'প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী' রূপে আখ্যাত হন। তৎস্থলে পণ কথাটির প্রতিজ্ঞার্থক অর্থই প্রাধান্য লাভ করে; যৌতুকাদির আদান-প্রদান অর্থ গৌণ হইয়া যায়।

পণপ্রথা প্রচলনের আধিকারণ সমূহের কয়েকটি কারণ নিরূপণ হওয়া বিচিত্র নহে—(১) তৎকালীন প্রাচুর্য্যের দিনে নিজ প্রাচুর্য্যহেতু স্বীয় কন্যা-জামাতাকে প্রচুর পরিমাণে দানপ্রথা। (২) গৃহাগতবিত্ত কন্যার বিচ্ছেদবিধুরতা উপশম করে ও ভাবী স্বাচ্ছন্দ্য মানসে যথোচিত দান বা যৌতুক দান প্রথা। (৩) অনাকর্ষণীয়া, অসৌষ্ঠবাঙ্গী, কৃষ্ণা কুমারীর পাত্রস্থ করণ মানসে দায়গ্রস্ত পিতৃপক্ষের আকর্ষণীয় উপঢৌকন দানেচ্ছা। (৪) বিবাহ ক্ষেত্রে বৃত বরের (তথা বরপক্ষের) স্থান ও মানপ্রাধান্য হেতু বরপক্ষের বৈষয়িক সুবিধা দাবী প্রথা। (৫) উপযাচক কন্যাপক্ষের অত্যাগ্রহ হেতু বরপক্ষের বর্দ্ধিত দাবী আদায়েচ্ছা (৬) বৃত পক্ষের কৌলিন্য ও কুলমর্য্যাদার অনুকূলে মণিকাঞ্চন দানপ্রথা। লক্ষণীয় এই যে কোন না কোন প্রকারে বৈষয়িক, প্রাতিষ্ঠানিক, কৌলিক বা লৌকিক প্রথা সমূহই কালক্রমে পণপ্রথায় পরিণত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বৈষয়িক বিপর্য্যয়ের ও আর্থিক অনটনের দিনে গরীব সাধারণের বিবাহবন্ধন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

যথার্থই বলা হইয়াছে—'আপাতমধুরা বিষয়াঃ পর্য্যন্তপরিতাপিনঃ।' আপাতত আস্বাদনীয় বিষয়গুলি পরিণামে পরিতাপের কারণ হয়। এককালের বিগ্রহ অন্যকালের গলগ্রহ! এককালের কাম্য অন্য কালের অকাম্য। তাই এক কালের অভিনন্দিত পণপ্রথা আজ অনভিনন্দিত, অনভিপ্রেত এবং সাধারণের পরিণয় পথের পরিপন্থীরূপে অনুভূত। এককালের প্রথার প্রভাবে যাহা সৃষ্ট, তাহারই প্রভাবে আজ দরিদ্র, বিত্তহীনমধ্যবিত্ত, ছাত্রদেহ কন্যাদায়গ্রস্তগণ অতি মাত্রায় ক্লিষ্ট। বরানুবরণ ও কন্যা পাত্রস্থকরণ তাহাদের পক্ষে দুরূহ হইতে দুরূহতর। এমন কি গণমন সংযোগকারী, সমাচারবাহী সংবাদপত্রও বরানুসন্ধানে আশানুরূপ আনুকূল্য করিতে পারিতেছে না!

সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া স্বাধীনোত্তর যুগে আমাদের জাতীয় সরকার আইনের সাহায্যে এই বিরক্তিকর পণপ্রথার বিলোপ সাধনে বদ্ধপরিকর। বর্ত্তমান বিবর্ত্তনের দিনে, প্রগতির যুগে, সমাজ দেহ হইতে অশান্তিকর, অনভিপ্রেত প্রথা সমূহ অনিবার্য্যভাবেই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। স্বার্থবুদ্ধি পরিহারে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে পণপ্রথা পরিহারে সকলেরই ব্রতী হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থকৌলিন্য, বহুকৌলিন্য, কুলকৌলিন্য, বিদ্যা-বৃত্তিকৌলিন্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী না হইয়া—শিক্ষা সচেতনতায়, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সুগম পথে অগ্রসর হইলে, স্বল্পবিত্ত সকলেই করুণ কন্যাদায় হইতে মুক্তি পাইতে পারেন।

আপন কন্যার কল্যাণে বিত্ত-বিভব-যৌতুকাদি দানে পিতা মাতারই সর্ব্বাধিক আনন্দ ও সন্তুষ্টি। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ যে দায়াবদ্ধ পিতামাতা তাহা করিতে পারিতেছেন না, তাহাকে কি চিরকালই দায়াবদ্ধ থাকিতে হইবে? বা তাহাই কল্যাণকর, সুখকর হইবে?

পণপ্রথা বর পক্ষের বিভববাসনার ও বিত্তলাভের কিঞ্চিৎমাত্র সাময়িক চরিতার্থতা আনয়ন করে বটে কিন্তু দায়গ্রস্ত কন্যাপক্ষের দুঃখ-দুর্দ্দশা দীর্ঘস্থায়ী করে। তাই পরিবর্ত্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সকলে সমবেতভাবে পণপ্রথা পরিত্যাগে ব্রতী হইলে আত্মীয়তার অঙ্গনে প্রবেশপথ সকলের পক্ষেই সুগম হইবে।

আত্মবৎ উপলব্ধি, আচরণ ও অনুভূতিই যথার্থ আত্মীয়তা, আর্থিক আদান প্রদানের ভিত্তিতে কৃত ও ক্রীত আত্মীয়তা, যথার্থ আত্মীয়তা নহে। অধিকন্তু আজ যাহা অন্ত হইতে গৃহীত হইল, আগামী দিনে যদি অনিবার্য্যভাবেই তাহা অন্তরের চাতে তুলিয়া দিতে হয়, তবে এই দান প্রতিদানের, গ্রহণ বর্জ্জনের প্রথা পরিত্যাগ শ্রেয় নহে কি? তাহাতে অনেক অবস্তুকর উৎকণ্ঠ অশান্তির উপশম হইবে।

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

নলিনদাসজী কৌতূহলী হলেন। কিছুটা বা উদ্বিগ্নও। কণ্ঠস্বরে মনের দুই রূপ মিশিয়ে বললেন, 'অশান্তি কেন?'

একটু কি ভেবে নিয়ে দীপেন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা নলিনদাসজী, আপনি নিশ্চয়ই নীলাদের ফ্যামিলির সবাইকে চেনেন?'

'চিনি বৈকি।'

'যদি কিছু মনে না করেন, বলবেন কি, কিভাবে চিনলেন?

নলিনদাসজী উত্তর দিলেন, 'কেন, আপনাকে তো আগেই বলেছি নীলাদের সোনারপুরের ঠিকানায় আমি অনেকবার গেছি। সেই সময় নীলার বাবা-মার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, ভাই-বোনদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।'

নলিনদাসজীর চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দীপেন বলল, 'ওর বাবাকে কি রকম লোক মনে হয়েছে?'

কিছু না ভেবেই নলিনদাসজী বললেন, 'কেন, চমৎকার। ভদ্রলোক দেশে থাকতে সোশাল ওয়ার্কার ছিলেন, স্কুল মাস্টারি করতেন, ভাল স্পোর্টস্‌ম্যানও ছিলেন। কিন্তু এ-সব কথা আপনার তো জানা কথা লাহিড়ী সাহেব। কেননা—'

দীপেন চকিত হল, 'কী?'

'আপনি নীলা চৌধুরীর তো আত্মীয়। কেমন আত্মীয় যেন?'

'মামাতুতো ভাই।'

চোখের কোণে হাসলেন নলিনদাসজী, 'হাঁ-হাঁ মামাতুতো ভাই।'

দীপেন মনের ভেতরে খানিকটা থমকে গেল। চোখের কোণে লোকটার অমন হাসার অর্থ কী? একটু ইতস্তত করে অবশেষে স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে বলল, 'আমি কি জানি না জানি, সে কথা থাক। নীলার বাবা সম্পর্কে আপনি যা বললেন তা-ও আমার জিজ্ঞাস্য ছিল না।'

'তবে?'

'নীলার বাবা মানে আমার মেসোমশায়ের চরিত্র আপনার কেমন মনে হয়েছে, সেটুকুই শুধু জানতে চেয়েছি।'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন না নলিনদাসজী; ধীরে ধীরে চোখ দুটি জানালার বাইরে নিয়ে গেলেন। দূরে আন্ধেরী রোডে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বাড়িগুলো জ্বলে উঠেছে। নলিনদাসের চোখ আলোকোজ্জ্বল রাস্তা পার হয়ে আরো দূরে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। অনেকটা সময় সেইভাবেই রইলেন তিনি। তারপর দৃষ্টিটা মনের ভেতরে ফিরিয়ে এনে বললেন 'নীলার বাবার সঙ্গে পরিচয়টুকুই শুধু হয়েছে। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা আমার নেই।'

'বেশ, ঠিকানাটা আমিই আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

নগিনদাস কিছু বললেন না, ভ্রূ উত্থিত করে জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন।

দীপেন বলল, 'নীলার বাবা অত্যন্ত বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ। কোন অন্যায়ের সঙ্গে তিনি আপস করতে জানেন না। তাঁর বিশ্বাস—'

'কী?' অর্ধস্ফুটে প্রশ্ন করলেন নগিনদাসজী।

'নীলা এই বোম্বাই শহরে যেভাবে পয়সা রোজগার করছে সেটা আদৌ সৎপথের উপার্জন নয়। কাজেই—'

বাধা দিয়ে নগিনদাসজী বলে উঠলেন, 'বুঝতে পেরেছি। যে পয়সা অসৎ পথে এসেছে উনি তা গ্রহণ করতে চান না; এই তো?'

'ঠিক। উনি না খেয়ে মরে যাবেন সে-ও ভাল। তবু ঐ অর্থে জীবন ধারণ করবেন না। প্রতি মাসে নীলার যে টাকা এখান থেকে যায় তা নিয়ে সংসারের অশান্তি চরমে উঠেছে।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'এ সম্বন্ধে আমার দুটো প্রশ্ন আছে।'

'বলুন; উত্তর জানা থাকলে নিশ্চয়ই দেব।'

নগিনদাসজী বললেন, 'আমার প্রথম প্রশ্নটা হল, নীলার বাবা কেমন করে জানলেন এখান থেকে মাসে মাসে টাকা যায়? মনি অর্ডার তো সোনারপুরের ঠিকানায় যায় না; যায় ভবানীপুরে গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে! তবু কি ভাবে জানলেন সেটাই আশ্চর্য!'

দীপেন বলল, 'আমি তা জানি না।'

'এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। টাকাটা নীলা সৎপথে উপার্জন করছে অথবা অসৎপথে সেটা উনি কি করে জানতে পারলেন?'

'এর উত্তরও আমার জানা নেই। তবে মাসিমা আমাকে বলে দিয়েছেন ঐ টাকাটা গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের ঠিকানায় না পাঠিয়ে কালীঘাটে ঈশ্বর গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটের ঠিকানায় পাঠালে ভাল হয়।'

'বেশ তো তা-ই পাঠাব। কালীঘাটের ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাবেন।

'এখুনি দিচ্ছি।' পকেট থেকে ডায়েরী বার করে একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিল দীপেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

একসময় দীপেনই স্তব্ধতা ভাঙল, 'আচ্ছা—'

নগিনদাসজী উৎকর্ণ হলেন, 'বলুন—'

'নীলা চৌধুরী তো বললেন দু'মাস আগে এখান থেকে চলে গেছে।'

'জী।'

'এর ভেতর আপনার সঙ্গে একবারও কি দেখা হয় নি।'

'জী, না।' নগিনদাসজী মৃদু হাসলেন, 'নীলা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হলে আমি কি এখানে বসে বসে তার বাড়ি ঘর এমন যত্নের মত আগলাতাম! তার জিনিস তাকে বুঝিয়ে দিয়ে কবে চলে যেতাম। আপনি নিজেই বিবেচনা করুন লাহিড়ী সাহেব, আমার নিজেরও তো ঘরদোর আছে, স্ত্রী-পুত্র সংসার আছে। সে-সব ছেড়ে এখানে এসে পড়ে আছি। এভাবে কতদিন থাকা সম্ভব?'

দীপেন বলতে যাচ্ছিল, এমনি এমনি কি আর পড়ে আছ! নিশ্চয়ই এতে তোমার বিপুল স্বার্থ রয়েছে। আর যদি এ সব তোমার ভাল না লাগে ছেড়েছুড়ে চলে গেলেই পার। বলতে গিয়েও কিন্তু পারল না দীপেন। নগেন-দাসজী স্বার্থে হোক অথবা নিঃস্বার্থভাবেই হোক, পরোপকার যদি করতে চান তাতে তার কী? সে এসেছে বোম্বাইয়ের বিপুল জনারণ্য থেকে নীলা চৌধুরীকে খুঁজে বার করতে এই অন্বেষণটাই তার জীবনের একমাত্র দায়াংসায় হওয়া উচিত। এর বাইরে আর কোনদিকে তাকানো তার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

অতএব দীপেনের মুখে তার দুশ্চিন্তাটা গভীর রেখায় ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে শ্লথ সুরে বলল, 'নীলা চৌধুরী কোথায় আছে, আপনি তো বলতে পারলেন না।

'জানলে তো বলব!' নগিনদাসজী যেন অবাক।

নগিনদাসের চোখমুখ অথবা কণ্ঠস্বর কিছুই লক্ষ্য করল না দীপেন। আচ্ছন্নের মত কিছুক্ষণ নিজের চিন্তায় ডুবে রইল। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা নগিনদাসজী, এমন কোন হদিশ দিতে পারেন কি, যেখানে গেলে নীলা চৌধুরীর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে?'

নগিনদাসজী অতর্কিতে শব্দ করে হেসে উঠলেন।

দীপেন হকচকিয়ে গেল, 'ও কি, হাসছেন যে?'

নগিনদাসজী হাসতে হাসতেই বললেন, 'হাসির কথায় হাসব না?'

'আমি কি হাসির কথা বলেছি!' দীপেন কিছুটা বিরক্ত।

'নিশ্চয়ই।' নগিনদাসজী বলতে লাগলেন, 'আপনাদের বাঙালীদের সম্বন্ধে আমার ধারণাটা খুব উঁচুতে ছিল। এতদিন ভাবতাম তারা খুব বুদ্ধিমান। এখন তাদের সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে হবে।'

কৌশলে তাকে এবং সমস্ত বাঙালী সম্প্রদায়কে নির্বোধ বলে গিয়েছেন নগিনদাসজী। তীব্র উষ্ণ সুরে দীপেন বলল, 'কারণটা জানতে পারি কি?'

'অবশ্যই। কোথায় গেলে নীলা চৌধুরীর হদিস পাওয়া যাবে তা-ই যদি জানতাম তা হলে তো নিজেই চলে যেতাম।'

দীপেন অপ্রতিভ। লজ্জিত অস্ফুট স্বরে বলল, 'তা বটে।'

আবার খানিকটা নীরবতা। তারপর দীপেনই শুরু করল, 'নীলা চৌধুরী বোম্বাইতে অনেক দিন আছে। নিশ্চয়ই বহু লোকের সঙ্গে তার মেলামেশা হয়েছে?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

কার কার সঙ্গে সব চাইতে বেশি মেলামেশা সে করত তাদের নাম ঠিকানা যদি দিতে পারেন বড় ভাল হয়। একবার চেষ্টা করে দেখি কোন খোঁজ পাই কিনা।'

স্থির দৃষ্টিতে দীপেনের চোখের দিকে তাকালেন নগিনদাসজী। দীপেন-চরিত্রের একটা অভাবিত নতুন দিক হঠাৎ যেন তাঁর কাছে ধরা পড়ে গেছে। তাতে তিনি হকচকিয়ে গেছেন এবং খুব ভাল করে সেটা যাচাই এবং বিশ্লেষণ করে নিতে চাইছেন। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে বললেন, 'কত লোকের সঙ্গেই তো নীলা চৌধুরী ঘুরেছে। তাদের সবাইকে চিনি না। তবে—'

'বলুন—'

'বছর কয়েক আগে একজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এ নিয়ে খবরের কাগজে খানিকটা 'হৈ-চৈও পড়ে গিয়েছিল।'

খবরটা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। অসীম আগ্রহে দীপেন বলল, 'হৈ-চৈ কেন?'

'এই তাদের নানা জায়গায় নানা অবস্থায় দেখা যেত। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা তো একেকজন ক্ষুধে গোয়েন্দা। নীলাকে তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকোতে পারত না; ধরা ঠিক পড়ে যেত। নীলা আর সেই নেতার নানা ধরনের ছবি ছাপিয়ে তারা বোম্বাই সহরে সেনসেশন্' চলে দিয়েছিল।'

'কোন্ কোন্ কাগজে ঐ সব খবর আর ছবি বেরিয়েছিল?'

'উইকলি স্পার্ক', 'লাইটনিং', 'থাণ্ডার'—এই সব কাগজে। কাগজ দেখে আমার কথা যাচাই করে নিতে চান নাকি?' সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন নগিনদাসজী।

দীপেন বলল, 'কাগজগুলো নিশ্চয়ই দেখব তবে আপনাকে যাচাই করতে নয়; নিজেরই কৌতূহলে।'

'বেশ।'

একটু ভেবে দীপেন বলল, 'আচ্ছা যে রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে নীলার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তিনি কি খুব বড় নেতা?'

'প্রথম শ্রেণীর না হলেও—' নগিনদাসজী বললেন, 'হাই লেভেলে ক্লাস। বোম্বাই প্রভিন্সের বাইরেও তাঁর নাম আছে।'

'কী নাম বলুন তো?'

একটু ইতস্তত করে নগিনদাসজী বললেন, 'নীলকান্ত ঘোষী।'

যে তক্ষণথে দীপেনের সকরুণ সেখানে রাজনীতির ছায়ামাত্র নেই। সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা নীলকান্ত ঘোষী কেন, সর্বভারতীয় আরো অনেক মহারথীর নামটুকু পর্যন্ত সে শোনে নি। সে জন্য তার আপসোস, আক্ষেপ অথবা লজ্জা কোনটাই নেই। নিদারুণ আত্মসুখ ও আত্মমগ্নতা ছাড়া আর কোনদিকে তাকাবার অবকাশ আর পর্যন্ত সে পায় নি। জগতের কোথায় কি ঘটছে, কোথায় কোন রাজ্য ভেসে গেল, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ভূকম্পনে কে তুঙ্গ শিখরে চড়ল—এ সব নিয়ে

অকারণে মস্তিষ্ককে উদ্বাস্ত করা তার চরিত্র-বিরুদ্ধ। নিজের জীবনকে উজ্জ্বল পালিশে আরো ঝকঝকে তকতকে করে তোলাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য।

দীপেন বলল, 'মিস্টার ঘোষী কোথায় থাকেন?

'সায়নে।' ঠিকানাটা লিখে দিলেন নলিনদাসজী। তারপর বললেন, 'কেন, সেখানে যাবেন নাকি?'

'দেখি।'

একটু চুপ করে থেকে দীপেন আবার বলল, 'এবার আমি উঠব নলিনদাসজী।

'এখনই?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

দীপেন উঠে দাঁড়াল; দেখাদেখি নলিনদাসজীও উঠলেন।

দীপেন বলল, 'আপনার অনেকখানি মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিয়ে গেলাম।'

'কিছুমাত্র না।' দু হাত নেড়ে নলিনদাসজী বললেন, 'আমার কোন কাজ ছিল না। আপনি আসতে সন্ধ্যেটা চমৎকার কাটল। নমস্তে—'

'নমস্তে' দীপেন নিখিল পারে ঘরের বাইরে চলে এল। তারপর সুড়ির সুরকি পথ ধরে গেটের দিকে এগিয়ে চলল।

অন্যমনস্কের মতই হাঁটছিল সে। পেছন থেকে ডাকটা শোনা গেল, 'লাহিড়ী সাহেব—'

ফিরে দাঁড়াতেই দীপেন দেখতে পেল নলিনদাসজী এসেছেন। অবাক হয়ে বলল, 'এ কি, আপনি!'

'হাঁ, চলুন আপনাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'আবার কষ্ট করে—'

বাধা দিয়ে নলিনদাসজী বললেন, 'ও কিছু না। এটুকু হাঁটলে আমি মরে যাব না। তা ছাড়া আপনি আমার কাছে এসেছেন। ভদ্রতার খাতিরেও তো আপনাকে এগিয়ে দেওয়া উচিত। তখন আমার খেয়াল ছিল না।'

'তাই বুঝি ভুলটা সংশোধন করতে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছেন!' দীপেন হাসল।

নলিনদাসজীও হাসলেন, 'যা বলেছেন।'

খানিকটা নিঃশব্দে হাঁটার পর নলিনদাসজী হঠাৎ বললেন, 'আমার কথাটা মনে আছে তো?'

'কী?' মনের আধো-অন্ধকারে দীপেন মুখ ফেরাল।

'নীলা চৌধুরীর যদি খোঁজ পান আমাকে দেবেন।'

'আগে খোঁজই পাই।'

'পাবার পরেই বলছি, আগে নয়।' নলিনদাসজী আবার হাসলেন।

দীপেন উত্তর দিল না।

নলিনদাসজী আবার বললেন, 'আপনাকে আমি বন্ধু-ভাবেই নিয়েছি লাহিড়ী সাহেব। কাজেই সঙ্কোচ না করে আবার প্রস্তাবটা কিন্তু দিচ্ছি।'

'কী প্রস্তাব?'

'যদি টাকার দরকার হয়—'

দীপেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সে কথা আমার মনে আছে। টাকার আমার দরকার হবে না।'

'তবু—'

দীপেন একবার ভাবল নলিনদাসজীকে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেয়। টাকা দিয়ে লোকটা তাকে কিনে নিতে চাইছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল দীপেন; একে চটানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বোম্বাই শহরে নীলাকে খুঁজে বার করবার এই প্রধানতম সূত্র। একে চটিয়ে দিলে এতদূরে ছুটে আসা তার ব্যর্থ হয়ে যাবে। আত্মসংবৃত দীপেন বলল, 'তেমন বুঝলে আপনাকে নিশ্চয়ই বলব। এই বোম্বাই সহরে আপনি ছাড়া আমার তো কেউ পরিচিত নেই।'

নলিনদাসজী উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, 'এই তো বন্ধুর মত কথা।'

কথায় কথায় গেটের কাছে এসে পড়েছিল দুজনে। বাইরে গিয়ে দীপেন বলল, "আচ্ছা, আজ তাহলে চলি।'

'আবার আসবেন, আশা করি সুখবর নিয়েই আসবেন।'

কিছু না বলে হাঁটতে শুরু করল দীপেন। কয়েক পা এগুতেই বাধা পড়ল। নলিনদাসজী পেছন থেকে ডাকলেন, 'লাহিড়ী সাহেব, লাহিড়ী সাহেব—

দীপেন ফিরে এল। অবাক এবং বিরক্ত সুরে বলল, 'আবার কী?'

'একটা খুব দরকারী কথা মনে পড়ল। আপনি তো ব্রাহ্মণ—লাহিড়ী ব্রাহ্মণদের পদবী হয় বলে জানি।'

'হাঁ, আমি ব্রাহ্মণ। কেন?'

'নীলা চৌধুরীরা কিন্তু কায়স্থ। তাই ভাবছিলাম নীলা আপনার আত্মীয় হয় কি করে? এক যদি ইন্টার-কাস্ট ম্যারেজ হয়ে থাকে, সে আলাদা কথা।'

বাঙালী সমাজের অনেক খুঁটিনাটি খবরই দেখি রাখে ছোকরা। দীপেনের মুখ নিমেষে রক্ত শূন্য হয়ে গেল।

নগিনদাদাজী আবার বললেন, 'আরেকটা কথা। নীলার কোন মাসি নেই; কাজেই মাসতুতো ভাই থাকার কথা নয়। সে যাক গে, মাত্র এটুকুর জন্যে আপনার আমার সম্পর্কে চিড় ধরবে না। বন্ধুত্বটা ঠিকই থাকবে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন—এ সব প্রশ্ন আমি কোনদিনই করব না।'

অনেকক্ষণ পর দীপেনের নিঃশ্বাস যখন স্বচ্ছন্দ প্রবাহে বইতে শুরু করল। সেই সময় দেখা গেল নগিনদাদাজী ফটকের ওপারে নেই, কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

[ক্রমশঃ

অহেতুকী কৃপা

শ্রীগোপাল দাস কাব্যভারতী

দধির ভাণ্ড লইয়া গোয়ালা
চ'লেছে গ্রাম্য হাটে,
অতি দরিদ্র ছা-পোষা মানুষ
দুঃখে জীবন কাটে।
দেখিল আজি সন্ন্যাসী এক
আসিছেন অদূরেতে,
একি অপরূপ স্বর্ণ-কান্তি
হরিনাম বদনেতে।
পরিধানে তাঁর নৈষ্ঠিক বাস
গোয়ালার বিস্ময়,
এই বিশ্বে মানুষের কিগো
এতরূপ সম্ভব হয়।
চলিতে না পারে শুষ্ক গোয়ালা
সন্ন্যাসী এলো কাছে,
মৃদু কণ্ঠে শুধাইল—"বৃন্দাবন
কত দূরে আছে?"
"বেশী দূর নয় ক্রোশ দুই আছে"—
গোপ কহে "শুন,
এমন নবীন বয়স তোমার
সন্ন্যাসী হ'লে কেন?"
"সে অনেক কথা পিপাসা আমার
তাতে তোমার কি?"
"নাই আছে বাপু"—"দাও দেখি তবে
তৃষ্ণা মিটিবে কি?"
দু'হাত পাতে সন্ন্যাসী বর
গোপ দই ঢালে হাতে,
ঢালিতে ঢালিতে ভাণ্ড শূন্য
গোয়ালা অবাক তাতে।
দশ সের দই শেষ হয়ে গেল,
শূন্য ভাণ্ড রেখে,
অবাক গোয়ালা মনের ভ্রম কি
দিবা স্বপ্ন দেখে!
সন্ন্যাসী কহে, "দাম দিবে পিছে
আসিছে দুই জন,"
"কৃষ্ণ" কহ বলি দুই বাহু তুলি
চলিল বৃন্দাবন।
সার্ব্বভৌম রায় রামানন্দ
আসিলেন ক্ষণ পরে,
গোয়ালা তখন নিবেদিল সব
ভক্তিযুক্ত করে।
হঠাৎ দেখে সে দধির ভাণ্ড
স্বর্ণ ভাণ্ড হইল,
ভয়ে বিস্ময়ে গোপনন্দন
ভক্ত চরণে লুটিল।
যাঁহার পরশে মাটির ভাণ্ড
সোনার ভাণ্ড হয়,
গোয়ালা ভাবে তাঁহার চরণে
মাগিব পদাশ্রয়।
অহেতুকী কৃপা লাভে ধন্য-মানি
গোপের নন্দন,
শ্রীচৈতন্য সঙ্গলাভে
চলিল সে ব্রজ বৃন্দাবন।

নব্যভারত গঠনে আশুতোষ

অমিতদ্যুতি কুমার

উনবিংশ শতকের সপ্তম দশকের মধ্যভাগ বর্তমান ভারতের অন্যতম প্রধান রূপকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম-প্রকাশ ভাস্বর। স্বাধীনতা হারাবার শত বৎসর অতিক্রান্ত হলেও সবে মাত্র তখনই ভারতবাসীর হৃদয়ের অন্তঃপুরে আত্মনিয়ন্ত্রণের আলোকরেখা অনুভূত হয়েছে। লক্ষ্ণৌ কানপুর দিল্লীর পথে-প্রান্তরে সিপাহীদের প্রথম বিজাতীয়-শৃঙ্খল মোচনের আকাঙ্ক্ষা সমূলে দমিত হয়েছে কিন্তু তার দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ভারতমানসে সুস্পষ্ট হয়ে রয়ে গাছে। তেত্রিশকোটি মানবাত্মাকে সঠিক পথ প্রদর্শনের দিশারী তখনো ভারতগগনে অপরিদৃশ্যমান। আপন প্রয়োজনেই শাসকজাতি আগ্রহী হয়েছে শিক্ষা প্রসারে, সভ্যতার উন্মেষে। অথচ এ মহান কর্মকাণ্ডের বাণী, তার কথার জাতির মর্মমূলে পৌঁছে দেবার সুরকার তখনো জন্ম গ্রহণ করেন নি এদেশের মাটিতে। বিদেশী মানসভূমিতে ভারতীয় মনোকুঞ্জের চারা রোপণ করা হয়েছে। জন্ম নিচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে এক আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সংস্কৃতি। আশুতোষের জন্মকাল তাই মহান সম্ভাবনার উন্মেষকাল। এ সম্ভাবনা একাধারে জাতির স্বাধীনতা পিপাসা চরিতার্থ করার সম্ভাবনা, শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতির প্রভায় ভাস্বর হবার সম্ভাবনা, জ্ঞানে বিজ্ঞানে জাতির জীবন মানস প্রস্ফুটিত করার সম্ভাবনা, নীতিতে কর্মে আদর্শে অনগ্রসর জাতি-গুলির নেতৃত্বদানের সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার প্রদীপকে সাফল্যের আলোকশিখায় প্রজ্বলিত করার জন্যই বোধ-হয় উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম-সপ্তম দশকের ভারতে একটির পর একটি মহাপুরুষের জন্মলগ্নের মহাশঙ্খ ধ্বনিত হয়েছে। আসলে একই সাথে এতগুলি বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাসেবী, রাজনীতিবিদ, আত্মদানকারী দেশপ্রেমিক, সমাজসংস্কারকের মিলিত প্রচেষ্টার বহুবর্ণই আজ ভারতকে শুভ্র আলোকদ্যুতিতে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। সেই বর্ণালীর একটি অপরিহার্য রঙীন আলো আশুতোষ। কর্মময় জীবনের আপাত সায়াহ্নে আশুতোষ পরলোক গমন করলেন সেটা বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যকাল। ষষ্টিবর্ষ জীবনের কর্মসূত্রে বিবর্তিত হয়েছে ভারতবাসীর জীবনের এক একটি ক্রান্তিকাল। তা কখনো সাফল্যের গরিমায় প্রোজ্জ্বল, কখনো বা আত্মদানের মহিমায় উজ্জ্বল, কখনো দুর্ভেদ্য ঐক্যে দুর্জয়, কখনো বা নীচতায় মসীলিপ্ত। আশুতোষের মৃত্যুশয্যায় ভারতাত্মা আপন প্রাণের গহনপুরে স্বাধীনতার আহ্বান শুনেছে, এ স্বাধীনতা শুধু বিদেশীর নাগপাশ থেকে মুক্তির স্বাধীনতাই নয়, এ স্বাধীনতা অজ্ঞানতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাবার স্বাধীনতা। সেই সময়ের ভারতাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আশুতোষ স্বাধীনতার প্রথমোক্ত ক্ষেত্রের একটি অপরিহার্য নাম হলেও, স্বাধীনতার দ্বিতীয়বিধ রূপায়ণেই তিনি সার্থক রূপকার।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আশুতোষ এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন এবং ডক্টরেট পান ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। অন্তরকাল ১৮৬৪ থেকে ১৮৯৪—সুদীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি শিক্ষাজীবনের সাথে যুক্ত ছিলেন শিক্ষার্থী হিসাবে। একটি খাঁটি বাঙালী তথা ভারতীয় পরিবারের সন্তান হিসেবে এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা—ত্রুটি ও সাফল্য সম্পর্কে অতি ঘনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী এতখানি বাস্তবানুগ ছিল। বর্তমান ভারতীয় জনমানসে আশুতোষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিচারে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় ভারতীয় শিক্ষাসংস্কারের ইতিহাসেই আশুতোষের অবদান সর্বাধিক। সমষ্টির সেবার জন্য ব্যষ্টির যে দৃঢ় ভিত্তিভূমি থাকা উচিত সুরক্ষা স্বাধীনচেতা আশুতোষের তা ছিল।

কর্মজীবনের সুরু থেকেই আশুতোষ ছিলেন সরকারী সেবক। স্বাধীনচেতা হলেও মোটামুটি বিশ্বস্তভাবে এবং অনুগত হয়ে তিনি সরকারী কর্তব্য করে গেছেন।

আশুতোষের কর্মজীবনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর সুকবি দীনেশচন্দ্র সেনের মতে 'রাজদ্রোহকে আশুতোষ অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।' এ বিষয়ে আশুতোষের মতের প্রবল বিরুদ্ধতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিরোধে তিনি সরকারের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামে ব্রতী হতে দ্বিধা করতেন না। অর্থাৎ সরকারের রাজশক্তির বিরুদ্ধতা করা তাঁর অভিধানে রাজদ্রোহের সংজ্ঞাধীন ছিলনা। এই সত্যনিষ্ঠা কিন্তু দেশপ্রেমের এক সঙ্কীর্ণমানস রূপ। স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের জন্য যে আত্মশক্তি যে অভিধা যে অনুশীলন প্রয়োজন, শিক্ষা-দীক্ষা সত্য-নিষ্ঠার প্রচারের সেই মহান ব্রত প্রচারই আশুতোষের দেশপ্রেমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বাধীনতার মূল্য সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান থাকার আগে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন কোনো প্রতিশ্রুতি বহন করে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম কাল ছিল এই ধরণের আন্দোলন। স্বাধীনতার সঠিক মূল্য অবগত না হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র আন্দোলনের অনুপ্রেরণায়, সঠিক ভাবে বলা উচিত আন্দোলনের রোমান্টিকতার অনুপ্রেরণায় নির্বিশেষ দেশবাসীর অসহযোগ ইত্যাদি ধরণের প্রতিরোধ তিনি বরদাস্ত করতেন না। কিন্তু জাতিগঠনের যে মহান ব্রত আশুতোষ আপন হাতে তুলে নিয়েছিলেন তাই-ই তাঁকে দেশ প্রেমিকের—সত্যকার দেশপ্রেমিকের মর্যাদা দিয়েছে।

আশুতোষের বয়স যখন মাত্র পঁচিশ বছর, তখন থেকেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই বিদ্যাভবনের সেবা করে গেছেন। কলকাতা ভারতে ইংরাজী সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। শাসনযন্ত্রেরও প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা। শিক্ষা বিস্তারের অগ্রবর্তী সোপান কলকাতায়ই রচিত। সারা ভারতের অগ্রগতি এবং শিক্ষাবিস্তার, জাতীয়তা এবং দেশাত্মবোধ কলকাতায়ই পুষ্টি লাভ করেছে। তাই ভারতের শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে; ভারতের জাতিগঠনের ইতিহাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অসামান্য। বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ সকলেই প্রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপন মেধা চর্চা করেছেন। নব্যভারতের রূপকার সমস্ত বৈজ্ঞানিক, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ, সকলেই আশুতোষের কাছে ঋণী। ভারতের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এবং শিক্ষানীতিও পরোক্ষ ভাবে আশুতোষ দ্বারা প্রভাবিত। এই কারণে নব্যভারত গঠনে আশুতোষের শ্রেষ্ঠতম অবদান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার।

রাজধর্ম ইংরাজ হয়ে থাকায় স্বভাবতই দেশের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির ওপর ইংরাজ ও ইংরাজীসংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল। এদেশে শিক্ষা বিস্তারে ইংরাজ সরকারের আগ্রহ আপন স্বার্থের সঙ্গেই জড়িত। শুধু মাত্র জ্ঞান লাভ ও আত্মোৎকর্ষের জন্য খুব কম লোকেই জ্ঞান চর্চা করত। সরকারী চাকুরী এবং রাজদরবারে প্রতিষ্ঠার লোভই বিদ্যাচর্চায় আগ্রহী জনমানসের আগ্রহের কারণ ছিল। স্বভাবতঃই সরকারী দাক্ষিণ্যে পুষ্ট বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানগুলি দেশীয় শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চা অপেক্ষা ইংরাজী এবং ইংরাজী সংস্কৃতির প্রতি বেশী যত্নবান ছিল। আশুতোষের চেষ্টায়ই ভারতীয় শিক্ষা সংস্কারের পথিকৃৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বাংলা ভাষা নয়, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাও যথাযোগ্য সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং এর দেখাদেখি বোম্বাই মাদ্রাজ এবং অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়েও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাকে মর্যাদা দেওয়া হয়। ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় চরিত্র গঠনে এ যে কতবড় অবদান তা বলা যায় না। শুধু মাত্র একটি লোকের একক প্রচেষ্টায় একটা পরাধীন দেশের একটী ভাষা বেভাবে রাজ-শক্তি আশ্রিত ভাষাকে অগ্রাহ্য করে শিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিল, তা থেকেই তাঁর আত্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মাতৃভাষা চর্চা এবং শিক্ষাদান ও গ্রহণের মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা প্রয়োগের যে ক্ষোভ তিনি জাতীর অন্তরে সঞ্চারিত করেছিলেন, তাই-ই পরবর্তী-কালে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রয়োগকে উদ্বুদ্ধ করেছে। অশিক্ষিত ভারতবাসীকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাতৃভাষার উপযোগিতা আজ আমরা উপলব্ধি করছি, আজ থেকে ষাট বছর আগেই তিনি তা অনুভব করেছিলেন। এবং তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই বাংলা ভাষা ও

সাহিত্য ম্যাট্রিকুলেশান থেকে বি-এ পাঠক্রমে পরীক্ষণীয় বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়। বর্তমান ভারতের শিক্ষা সাধনার প্রথম দৃঢ় সোপানগুলি তাঁই আশুতোষের রচনা।

লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংস্কার দ্বারা মূলতঃ দেশে উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। যে অসন্তোষ সমস্ত উন্নতির মূল, অশিক্ষিত জনমানসে শিক্ষার বিস্তার দ্বারা সেই অসন্তোষকে জাগ্রত না করতে পারে, ভারতীয় জনগণের সেই আত্মোপলব্ধির দ্বার রুদ্ধ করার জন্য ইংরাজ সরকারের এ প্রচেষ্টা ছিল সুপরিকল্পিত। বাংলার পুরুষসিংহ তাঁর আশুতোষের বুদ্ধিদীপ্ত প্রবল প্রতিপক্ষতায় ইংরাজ সরকারের এই ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদীসুলভ কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে তাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শিক্ষিত, আত্মশক্তি-সম্পন্ন স্বেচ্ছাসৈনিকের অভাব হয়নি। আত্মোপলব্ধির যে দ্বার আশুতোষ ভারতীয় জনগণের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, সেই আত্মোপলব্ধিই স্বাধীনতা সংগ্রামের বেল্লবিন্দু অসন্তোষের ধাত্রী। আশুতোষ তাই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক।

আত্মোপলব্ধির আর এক দিগন্ত আশুতোষ উন্মোচিত করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি" নামক বিভাগের মাধ্যমে। জাতীয় ইতিহাসের সেই স্বর্ণোজ্জ্বল পৃষ্ঠাগুলি অধ্যয়ন নিশ্চয়ই জাতির সুপ্ত দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করতে সক্ষম। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাচর্চাতেই নয়, তাঁর উদ্যোগে অনুপ্রেরণায় বহু অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী এদেশের প্রাচীন ইতিহাস গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ ভারততত্ত্ববিদ ও ইতিহাসকার রমেশচন্দ্র মজুমদার, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ বসাক, সুকুমার মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতদের শিক্ষাজীবন এবং গবেষণার আশুতোষের অবদান অপরিমেয়। ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপরেখা রচনায়ই আশুতোষ সবথেকে বেশী উল্লেখযোগ্য। তাই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন তিনিই প্রথম ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি অধ্যয়নের সুযোগ করে দিলেন, তেমনি-ই প্রতিষ্ঠিত হল নৃতত্ত্ব বিভাগ (এনথ্রপলজি), ঐস্লামিক সংস্কৃতির বিভাগ, বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের বিভাগ ইত্যাদিও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কলকাতায়ই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সমস্ত কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে আশুতোষের প্রাপ্য। আপন দায়িত্বকে তিনি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতেন বলেই হয়তো ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পতাকা হাতে তিনি দণ্ডায়মান হন নি, কিন্তু সরকারের যে সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থের, ভারতীয় শিক্ষাধনের পরিপন্থী বলে মনে হয়েছে তার বিরুদ্ধে শার্দুলসুলভ তুরন্ত দৃঢ়তা নিয়ে তিনি দাঁড়াতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এ সব ক্ষেত্রে শাসক-চূড়ামণির সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের থেকে তাঁর কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতীয় স্বার্থ—জাতীয় মানস। মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পূর্বে কলকাতাবিদ্যালয়ের সমাবর্তনে লর্ড লিটনের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যপদ্ধতির সমালোচনার যে প্রত্যুত্তর তিনি দিয়েছিলেন, তাই-ই তাঁর জাতীয়তাবাদী মনের সোনালী পরিচয় বহন করছে। মৌমাছির মত দেশবিশ্রুত জ্ঞানী গুণী বিদগ্ধজনকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুচক্রে সমবেত করেছিলেন। চরম অর্থকষ্টে সেই সমবয়সিত অধ্যাপকেরা একাধিক্রমে কয়েকমাস বেতন না পাওয়ায় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন, তখনও তিনি ইংরাজ সরকারের ঘৃণ্য স্বাধীনতার ক্রয়ের প্রস্তাবে সম্মত হন নি। বিদ্যারতনের স্বাধীনতার বিনিময়ে তিনি অর্থকৃচ্ছ্রতা জয়ে সম্মত হননি। জীবনের সাথে পদে পদে 'কম্প্রোমাইজ' করে চলার চেষ্টাকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। তাই এবিষয়ে ইংরাজ সরকারের সাথে তাঁর আপোষহীন সংগ্রাম এবং জলদমন্দ্র বজ্রনির্ঘোষ Faceedom Frst. Freedom second and Freedom last' পরবর্তীকালে ইংরাজ সরকারের সাথে স্বাধীনতার বিষয়ে আপোষহীন সংগ্রামে পথপ্রদর্শক।

বিদেশী ব্যুরোক্রেসীর শাসনাধীনে বাংলা অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জমান দেখে নব-ন্যায়ের দেশ মৌলিকতা হারিয়ে নকলনবিশী করে তার শ্রেষ্ঠ গুণরাশির বিকাশ কেউ করতে পারছেনা দেখে যে বেদনা তিনি অনুভব করেছিলেন, সে বেদনা তিনি বুকভরে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি মুষড়ে পড়েন নি, নিষ্ফল ক্রন্দনে কালক্ষেপ করেননি—দেশের পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষার দীপশালা জ্বালিয়েছেন, মৌলিক গবেষণার জন্য সাহিত্যমন্দির, বিজ্ঞান মন্দির, শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন।

উন্নয়নের যে সাধনায় ব্রতী আজকের ভারত, জ্ঞানতপস্বী কর্মবীর আশুতোষই তার জনক, পথপ্রদর্শক, দিশারী।

১৯০৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-পদে বৃত হন। কিন্তু তার বহু আগে থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবদান রয়েছে। আশুতোষের মৃত্যুতে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' যে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল, তা অনুধাবন যোগ্য—'...The University Act of 1904 which has laid the foundation of the University on a more or less democratic basis owes not a little to the transcendental genius of Sir Ashutosh himself.' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ঐ বৎসরই প্রকৃতপক্ষে আজকের ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনার ভিত্তিভূমি। লর্ড কার্জন এই আইনটির নিয়মকানুন পরিবর্তিত করে তাকে শাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ আয়ত্তাধীনে আনার যে নিন্দনীয় প্রচেষ্টা চালান, আশুতোষ প্রচণ্ড মেধা ও আত্মশক্তির বলেই সেদিন গণতন্ত্রের সম্মান রক্ষা করতে পারেন। বর্তমান ভারতের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থায় আংশিক সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং আংশিক শিক্ষাসেবীদের পরিচালনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যবস্থাই সব থেকে বেশী উপযোগী। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের কাঠামো তাই আশুতোষেরই রচনা বলা যায়।

জাতিগঠনে রাজনীতিবিদ সমাজ সংস্কারক অপেক্ষা শিক্ষাবিদের দান কম নয়। আপন প্রতিভার আশুতোষ অনায়াসেই সর্বজনবরেণ্য দেশনেতা হতে পারতেন। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান আরো সুদূরপ্রসারী এবং নব্য-ভারতের গঠন উপাদানে সমৃদ্ধ। এ প্রসঙ্গে 'Modern Review' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভ (জুন, ১৯২৪) থেকে একটী স্মরণযোগ্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"...Had he (Ashutosh) chosen to devote as much of his time and energies to municipal work, he could have easily achieved as much distinction as Pherozeshah Mehta did in Bombay. If he had elected to be a politician and statesman and specialised in council work, he might have rubbed shoulders with and possibly surpassed Gokhale. In fact no distinction were beyond his reach in any field in which great intellectual powers, uncommon capacity for mastering details, remarkable debating powers, wide range of information, self-confidencly courage, patriotism, and indefatigable energy are passports to success. But it was the advancement of the causes of educatin, knowledge and culture, which was his chosen field of work and here he achieved eminence. For those, he laboured with exemplary devotion in various degrees as no one of his generation, and perhaps none of any previous generation in modern India, as for as we are aware, did."

১৮২১ খৃষ্টাব্দে লর্ড রোণাল্ডসে এবং লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের অনুরোধে তিনি আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় গান্ধীজি এবং চিত্তরঞ্জন দাসের অনুপ্রেরণায় ছাত্ররা অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে স্কুল-কলেজ ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়। আশুতোষ সর্বতোভাবে এই আন্দোলন প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জানতেন এই বিরুদ্ধাচরণের জন্য হয়ত দেশবাসী তাঁকে ক্ষমা করবে না। তবু তিনি নিজের আদর্শ ও কর্মপথ থেকে বিচ্যুত হন নি, কারণ তাঁর ধারণা ছিল এ পথে স্বাধীনতা আসবে না। সমাজ-কল্যাণের জন্য যে কাজ নিজের কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন তা করতে একটুও দ্বিধা করেন নি। আন্দোলনের রোমাঞ্চিকতা অপেক্ষা কর্তব্যের আহ্বান তাঁর কাছে বড় ছিল। সেই কর্তব্যবোধেই তিনি আপন স্বদেশপ্রেমের অগ্নি পরীক্ষা দিলেন। লর্ড লিটনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের চেষ্টাকে যে ভাবে তিনি আত্মশক্তি এবং দেশপ্রেমের অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত করেছিলেন সে দেশপ্রেম বিরল—একে তুলনা করা যায় রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগে, গান্ধীজীর রোণাল্ডস্-এর প্রতি ব্যবহারে। স্বাধীনতার অর্থ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। এর অর্থ অর্থনৈতিক,

সমাজনৈতিক, শিক্ষানৈতিক স্বাধীনতা, স্বাধীনতার অর্থ মানবতার উত্তরণ। এই স্বাধীনতার, এই মানবাত্মার পূজারী আশুতোষ-হিমাচল দেবতাত্মা ভারত—তারই অভ্রান্তদ আলোকশিখার বর্ণালী বিচ্ছুরণে আশুতোষ জ্যোতিষ্মন্ত। যে ভারত আপন গরিমা, আদর্শ, ঐতিহ্য বিস্মৃত হতে চলেছিল সেই ভারতকে আপন ঐতিহ্যের সুমহান পথে পরিচালিত করাই, শিক্ষায়, সমাজের সেই স্বাধীনতার দেবীকেই আরাধ্য করা। আশুতোষের বিস্তৃতমানস দেশপ্রেমেরই পরিচয়, সে মানসিকতা, সে ভাস্বরতা দেবতাত্মা হিমালয়ের মতই মহান। আশুতোষ তাই এক আত্মবিস্মরণের যুগের ভারতপথিক,—পথ-প্রদর্শক, ঐতিহ্যময়ী ভারতমাতার নবরূপের অন্যতম প্রধান এবং সার্থকসাধনা রূপকার।

আশুতোষ বর্তমান ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাঠামো-শিল্পী—একথা আগেই বলেছি। আগের দিনের বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল পরীক্ষা গ্রহণের যন্ত্রমাত্র—'বিদ্যস্ত বিদ্যায়াং' নয়। ভারতের ঐতিহ্যে আশুতোষ রূপ দিলেন বিশ্ব-বিদ্যালয়কে। যে দৃঢ়দৃষ্টি নিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ক্লাস খোলার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে তিনি যে যুক্তি দেন তা সত্যই অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'যে সব শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বিভিন্ন মহা-বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করছেন, তাঁদের মিলিত শক্তিই তো শিক্ষার উচ্চতম সোপান সৃষ্টি করবে।' আশুতোষের সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হল; প্রোথিত হল বর্তমান ভারতের উচ্চশিক্ষার ভিত্তিভূমি। তাঁর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তই জন্ম দিল বর্তমান ভারতের রূপকার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, রাজনীতিকের। আশুতোষ তাই নবভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক নয়, বহু প্রোথিতযশা সংগঠকের তিনি পিতৃস্থানীয়ও বটে। সি, ভি, রমণ তাঁর সাহায্য ছাড়া গবেষণাতেই আত্ম-নিয়োগ করতে পারতেন না, বিজ্ঞান শাখায় এশিয়ার একমাত্র নোবেল পুরস্কার জয় তো দূরের কথা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের এত বিস্তৃত চর্চা হত না তাঁর অনু-প্রেরণা ছাড়া। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, ঐশ্লামিক সংস্কৃতি ভাষাতত্ত্ব এবং ন্যায়শাস্ত্র, এসব ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায়ই স্থাপিত হয় য়ুনিভার্সিটি 'ল' কলেজ, য়ুনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স। এ দুটি আপন ক্ষেত্রে আজও সমগ্র এশিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

তিনি যেবার এম-এ পরীক্ষা দেন সে বছরই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি শুধুমাত্র বিদ্যাভ্যাসী ছাত্রদের মধ্যে সীমা-বদ্ধ করার অপচেষ্টা চলে। একমাত্র আশুতোষের চেষ্টায়ই সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর বহু ছাত্রছাত্রী প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির আনুকূল্যেই আপন প্রতিভা কাজে লাগিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত করতে পেরে-ছিলেন। শুধু প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিই নয়, তিনি বাংলার তথা ভারতের বহু ধনী সন্তানকে মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এখনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত বৃত্তির ব্যবস্থা আছে মেধাবী ছাত্রদের জন্য, তার অনেকগুলির সঙ্গেই আশু-তোষের নাম জড়িত।

ভারতবর্ষের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সংস্কৃতির প্রসার ও চর্চার নিয়ন্ত্রক কলেজ ইউনিয়ন। আশুতোষের উদ্যোগেই প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলাদেশের মধ্যে সর্ব-প্রথম কলেজ ইউনিয়ন গঠিত হয়। আশুতোষ ছিলেন সেই ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি। ছাত্রসংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলেজ ইউনিয়নের ভূমিকা নিশ্চয়ই অবিসম্বাদীভাবে প্রশংসনীয়। আশুতোষ এ বিষয়েও পথিকৃৎ। তাই ভারতের ছাত্র সংস্কৃতির, ছাত্র-শিক্ষক ঐক্যের তিনি অন্যতম অগ্রদূত একথা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি করা হয় না।

আপন কন্যা কমলার স্বামীর পরলোকগমনের পর তিনি আবার তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। সমাজের প্রতি-কূলতা তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারে নি। বহু শতাব্দীর কুসংস্কারে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর এসব কুসংস্কার ভেঙে বেরুবার জন্য প্রয়োজন ছিল এই ধরণের শুভ সিদ্ধান্ত। সমাজে তিনি নিশ্চয়ই একজন প্রতিষ্ঠিত এবং মান্যগণ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর এই আঘাতে সমাজের সংস্কারের প্রাচীরে নিশ্চয়ই যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল—এবং তাঁর দৃষ্টান্ত আরো অনেক হতভাগ্য বিধবা বালিকার জীবনে আশার আলো জ্বেলেছিল। ধর্ম ও সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নবভারতে মানবতার যে অভিযান তাতে তাঁর এই অবদান অমূল্য।

ব্যবহার শাস্ত্রে তাঁর অপরিসীম দক্ষতা এবং বাগ্মিতা যে কোন ভারতীয়ের আদর্শস্বরূপ। তাঁর বাৎপত্তির অনেকখানিই হয়তো প্রকৃতিদত্ত প্রতিভার দান, কিন্তু তাঁর নিষ্ঠা তাঁর আগ্রহ ভারতের ঐতিহ্যময় প্রাচীনযুগের জ্ঞানতপস্যার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আশুতোষের জীবনকাব্যের কয়েকটি পঙ্ক্তি চয়ন করে তাঁর জীবনাদর্শকে তাঁর কর্মজীবনকে সামান্য গণ্ডীর মধ্যে একটা রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। এপরিচয় নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ। তাঁর কর্মসাধনার সুবিস্তৃত অঙ্গনে মহান মানবতার যে পূজার্চনা তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। আশুতোষ নব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক এই কারণে, তিনি ভারতের ঐতিহ্যময় তপস্যার সার্থক তাপস—একজন অপরিহার্য শিক্ষাগুরু। দেশের সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, মানবতার মূল নিহিত শিক্ষার সুবিশাল বৃক্ষকাণ্ডে। আশুতোষ বর্তমান ভারতের পুষ্পিত সেই বৃক্ষকাণ্ডের রোপক এবং রক্ষাকর্তা। তাঁর সুবিশাল দেহের মতই সুবিস্তীর্ণ জ্ঞানের পরিধিতে তিনি নব্যভারতের শিক্ষাসাধনার অগ্রদূত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন, একটির পর একটি সুবিন্যস্ত সৌধে সুগন্ধ, রমণীয়, শ্রদ্ধেয় করে তুলেছেন ভারতের ভারতী কলকাতা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে। আজকের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রদূত। নেতৃত্বের যে উদ্দাম রক্তস্রোত সঞ্চালিত করে গেছেন আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধমনীতে ধমনীতে তাই-ই আজো একে অপরাজেয় অগ্রবর্তীর সম্মানে শোভিত করেছে।

জাতির পরিচয় তার শিক্ষায়—তার সৌধে। এ সৌধ অস্ত্রশক্তির নয়—আত্মশক্তির। ইতিহাস ভুলে যাবে আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনীর বিস্তার, মনে রাখবে পুরুরাজার প্রতিরোধ, ভুলে যাবে আকবরের দিগন্ত বিজয়, অক্ষয় হয়ে থাকবে বুলন্দ দরওয়াজার পরতে পরতে, যশোবাঈ মহলের প্রতিটী কণায় আকবরের মানবপ্রীতি দীন-ইলাহি সেবাধর্ম। ইতিহাস তাই ভুলে যাবে একদিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতকে, মনে রাখবে সংস্কৃতির প্রভায় অপূর্ব আলোকোজ্জ্বল জ্ঞানতপস্বী ভারতকে—মনে রাখবে সেই আলোকের পিতা ও ধাত্রীদের। আশুতোষ তাঁদের অন্যতম। তাই নব্যভারতের ইতিহাসে "আশুতোষ" একটী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত নাম।

ভারততীর্থের ঘাটে ঘাটে 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে'র যে আকুতি, তা আশুতোষ উপলব্ধি করেছিলেন—তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু আক্ষরিক অর্থে নয় প্রাণস্পন্দনে হয়ে উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয়। দেশকাল গণ্ডীর ঊর্ধ্বে মানবতা ও সংস্কৃতির রূপচ্ছটায় ভারতের জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনের যে ঐতিহ্যময় দাবী, নব্যভারতে তার রূপায়ণে আশুতোষ তাই এক প্রধান বাস্তুকার।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার ঊর্ধ্বে যে স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা এনে দেয় প্রতিশ্রুতি জ্ঞানের, অশিক্ষা থেকে মুক্তির, যে স্বাধীনতা রূপ দেয় আত্মশক্তির, আপন প্রতিভার উজ্জ্বল ছটায়, যে স্বাধীনতা সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি দেয় সত্যতায়, যে স্বাধীনতার তপস্যার মধ্য স্বাধীন ভারত, আশুতোষ সেই স্বাধীনতার প্রথম এবং সব থেকে বেশী উল্লেখ্য প্রেরিক। রাজনৈতিক সংগ্রামে আশুতোষ হয়তো রাজশক্তির সামনে বুক পেতে দাঁড়ান নি, হয়তো তাঁর বাগ্মিতা প্রত্যন্ত প্রদেশের আপামর জনগণের প্রাণে স্বাধীনতার আকুতি পৌঁছে দেয়নি, হয়তো তাঁর নেতৃত্বে উত্তেজিত ভারত স্বাধীনতার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখর করে তোলেনি, কিন্তু তাঁর অপরিসীম কর্মশক্তি নিয়ে বিশ্বকর্মার মত বিশ্ব বিদ্যালয়ের অঙ্গনে তিনি সৃষ্টি করেছেন একটির পর একটি সৈনিক, যারা শিক্ষার আলোকে আপন অন্তরে মৃন্ময়ীরূপে দেশমাতৃকার রুক্ষ বেশ দেখেছিল, যে দিব্যদৃষ্টি হৃদয় থেকে কাজে প্রেরণা দেয়, মনকে উদ্বুদ্ধ করে সে দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে সন্তানবৎসল পিতার মত একটির পর একটি সোপান তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আশুতোষ তাই ভারতের সর্বতোমুখী স্বাধীনতার এক অক্লান্ত নীরব কর্মী। স্বাধীনতার আদর্শমূলের অনুভূতিতেই ভারতে সৃষ্টি হয়েছে একটির পর একটি নেতা। সেই সব নেতাদের শিক্ষাগুরু আশুতোষ, তাই নব্যভারতের সংগঠকদের অন্যতম পুরোধা হচ্ছেন আশুতোষ।

আশুতোষের জন্মকালের ভারতের যে অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপ বিংশশতকের তৃতীয়দশকে সে অন্ধকার অপসৃয়মান—সমস্ত জাতি আলোকের এক অপার পিপাসায় আকুল, আর সেই আলোকসাধনার পুরোহিত যাঁরা ছিলেন আশুতোষ তাঁদের অন্যতম। অন্ধকার থেকে আলোকের পথে বিবর্তনের সব কৃতিত্বটুকুই শুধু আশুতোষের প্রাপ্য নয়, ঊনবিংশ-শতকের পঞ্চম-সপ্তম শতকের মুহূর্তে মুহূর্তে যে সব মহাপুরুষের জয়গণ্ডের মহাশঙ্খ ধ্বনিত হয়েছে সেই সব অনির্বাণ নক্ষত্রের মাঝে ভারতের সৌভাগ্যাকাশে আশুতোষ ধ্রুবতারা—এ ধ্রুবতারা নব্যভারতের আলোক তপস্যার পথের দিশারী।

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভাবের কাশবনে স্কুলের ছাত্রীরাও যাবে টিচাররাও যাবেন তাই হেডমিস্ট্রেস একদল আগেই ছুটি দিলেন।

অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা শুভ্রার তেমন ছিল না। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। এই নিয়ে মা আবার বকাবকি করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না গিয়ে পারল না। শুধু সমীরণ নয়, স্কুলের টিচাররাও তাকে অনুরোধ করলেন। বিশেষ করে সেক্রেটারী রামবাবু।

তিনি বললেন, 'আপনি অন্তত কিছুক্ষণ থাকুন। প্রধান অতিথি আসছেন কলকাতা থেকে। তিনিও বেশি দেরি করবেন না। আপনি তাঁর সঙ্গে ফিরতে পারবেন। না গাড়িতে নয় তিনিও ট্রেণেই যাবেন।'

শেষ পর্যন্ত শুভ্রা থেকে যাওয়াই স্থির করল। একটু রাত হয় হবে। পথ তো চেনাই। ওঁরা সবাই যখন অমন করে অনুরোধ করছেন তা রক্ষা না করাটা শুভ্রার পক্ষে অভদ্রতা হবে।

শুভ্রা অন্য টিচারদের সঙ্গে সমীরণদের লাইব্রেরীতে গিয়ে উপস্থিত হল।

রাস্তার ধারে সুন্দর একটি একতলা বাড়ি। দক্ষিণ দিকে খেলার মাঠ। পূবদিকে রেল লাইন। রেল লাইনের ওপারে দিগন্তব্যাপী শস্যক্ষেত। উত্তরে পশ্চিমে গ্রাম। বসতি একটু দূরে।

পরিবেশটুকু ভারি ভালো লাগল শুভ্রার। লাইব্রেরীর ঘরখানি সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে পূর্বসূরীদের প্রতিকৃতি। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র।

নিচু নিচু দুখানি তক্তপোষ জুড়ে ভাষাস করা হয়েছে। দুপাশে দুটি চিত্রিত করা মাটির কলসী, তার মধ্যে রজনীগন্ধা।

মেয়েরা একদিকে বসেছে, ছেলেরা আর একদিকে।

অনুষ্ঠান একটু বাদেই আরম্ভ হবে।

সভাপতি, প্রধান অতিথি তাদের গিয়ে বসেছেন। একটি ছোট মেয়ে তাঁদের গলায় মালা দিয়ে এল।

হঠাৎ সমীরণ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'এবার শ্রীমতী শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে দেবেন। তিনি আমাদের গ্রামে নবাগতা। তাই এই শুভ অনুষ্ঠানটি আমরা তাঁকে দিয়ে আরম্ভ করছি।'

অন্য টিচাররা শুভ্রার দিকে তাকালেন। তার মনে

হল হলশুদ্ধ সবাই তার দিকে চেয়ে আছে। তারি বিব্রত বোধ করল শুভ্রা। এমন তো কথা ছিল না। হঠাৎ সমীরণ এমন ধরণের ঘোষণা করতে গেল কেন। এর আগে সে অবশ্য শুভ্রাকে একান্তে ডেকে সভায় কিছু-না-কিছু বলবার জন্যে অন্তত একটি কবিতা আবৃত্তি করবার জন্যে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু শুভ্রা তাতে রাজি হয়নি। শান্তভাবে বলেছে, 'আমি শুধু দেখতে এসেছি। দয়া করে আর কিছু আমাকে করতে বলবেন না। তাহলে আমি আপনাদের অনুরোধ রাখতে পারব না।'

শুভ্রা ভেবেছিল সমীরণ এতে নিরস্ত হবে। সে যে গোপনে গোপনে এমন একটি অনুষ্ঠানের কথা ভেবে রেখেছিল শুভ্রা তা কী করে জানবে। কিন্তু সে ভিতরে ভিতরে যত বিব্রত আর অসন্তুষ্টই হোক দীপ জ্বালাতে অস্বীকার করে একটা নাটকীয় দৃশ্য সৃষ্টি করে লাভ নেই। তাই শুভ্রা উঠে দাঁড়াল তারপর তাদের একটি ধারে রাখা পঞ্চপ্রদীপের পাঁচটি শিখা মেলে দিয়ে এল।

আড়চোখে দেখে নিল সমীরণ তার দিকে কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

শুভ্রা ফিরে এসে নিজের জায়গাটিতে বসল। মল্লিকাদি কাছেই বসেছিলেন। তিনি মৃদু হেসে ফিসফিস করে বললেন 'দীপ জ্বালাবার জন্যে উপযুক্ত মেয়েকেই ওরা বেছেছে। আসরের মধ্যে সবচেয়ে সেরা সুন্দরী। নিজেই তো একটি দীপ। কোথায় যে অগ্নিকাণ্ড বাধাবে তাই ভাবি।'

শুভ্রা মৃদু ধমকের সুরে বলল 'আঃ কী হচ্ছে মল্লিকাদি। শুনুন, গান শুনুন।

ততক্ষণে উদ্বোধন সঙ্গীত শুরু হয়ে গেছে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।'

মল্লিকা বললেন, 'ওরে বাবা,এবে দেখছি সবজায়গাতেই আগুন। গানের মধ্যেও। এত আগুনে জলে পুড়ে মরবে কে তাই। আমি কিন্তু পারব না। আমার সে সাহস নেই।'

শুভ্রা আবার বলল, 'আঃ কী হচ্ছে।'

তারপর যথারীতি অনুষ্ঠানের কাজ এগিয়ে চলল। লাইব্রেরীর সেক্রেটারী সমীরণ দূর বার্ষিক বিবরণী পড়লেন, 'চারা আর এককালীন দান হিসাবে লাইব্রেরীতে এবছর কত টাকা আয় হয়েছে, কিনে কত খরচ হয়েছে, কত বই কেনা হয়েছে, সদস্যসংখ্যা কত বেড়েছে—এসব খুঁটিনাটি কে শুনতে যায়?

শুভ্রা আশেপাশে একটু তাকিয়ে দেখে শুধু সেই নয় আশে-পাশের অনেকেরই এই বিবরণে কোন আগ্রহ নেই। অনেকেই নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। সমীরণের বিবরণের দিকে কোন কানই দিচ্ছে না। কিন্তু সমীরণ যখন এই শিশু প্রতিষ্ঠানকে বড় করে তুলবার জন্য গ্রামবাসীদের সাহায্য সহযোগিতা চাইল, যখন সে এমন একটি পল্লীতে লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলল তখন তার ভাষা আরও প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তখন সকলের গল্প বন্ধ হল। সমীরণ যা বলছে তা সাগ্রহে শুনতে লাগল।

সমীরণের বক্তব্য এমন কিছু নতুন নয়। কিন্তু তার বলার মধ্যে আবেগ আছে, আন্তরিকতা আছে। তাতে আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায় না।

শুভ্রা লক্ষ্য করল সমীরণের বলবার ভঙ্গিও ভালো। উচ্চারণ নিখুঁৎ, গলার স্বরে গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাধুর্য মিশে আছে। পাড়াগাঁয়ের লাইব্রেরীর একজন সেক্রেটারীর মধ্যে এত গুণ দেখে শুভ্রা একটু অবাক হয়। লাই-ব্রেরী আর ক্লাবের পাণ্ডা শুভ্রাদের পাড়াতেও আছে। কিন্তু তাদের কারোর মধ্যে এমন নিষ্ঠা আন্তরিকতা এবং তাকে রূপ দেবার আর ভাষা দেবার ক্ষমতা শুভ্রা যেন এর আগে কখনো দেখেনি।

সমীরণ তার বক্তব্যের শেষে সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাল। প্রথমে বলল রামবাবুর কথা। অর্থ দিয়ে, আসবাবপত্র দিয়ে প্রয়োজন হলে তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে তিনি এই লাইব্রেরীকে সাহায্য করেছেন। আর একজন আছেন নীরব কর্মী এই লাই-ব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান আমিনুল হক। সে তার ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ এই লাইব্রেরীতে দান করেছে। তার চেয়েও বেশি বিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে। এমন একটি নিরলস কর্মীকে যদি পরম শ্রদ্ধেয় আর সহায়ক হিসাবে না পেত সমীরণ, তাহলে সে কিছুই করে উঠতে পারত না।

সেক্রেটারীর বক্তৃতার পর প্রধান অতিথি বলতে উঠলেন। তিনি লাইব্রেরী-আন্দোলনের উপযোগিতা,

পরিচালনা পদ্ধতি সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ মূল্যবান ভাষণ দিলেন। কিন্তু তাঁর বলবার ভঙ্গি তেমন হৃদয়গ্রাহী না হওয়ায় শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলেন না।

উপস্থিত যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কিছু বলবেন কিনা সভাপতি একবার জিজ্ঞাসা করে নিলেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে রাজী হলেন না! শুভ্রা দেখে একটু অবাক হল গ্রামবাবুও কিছু না বলায়। সভাপতি পাশের গাঁয়ের হাইস্কুলের হেড মাষ্টার। এখন অবসর নিয়েছেন। বক্তৃতায় তিনি একটু বেশি সময় নিলেন।

তাঁর ভাষণ শেষ হতে শুভ্রা উঠে দাঁড়াল। এবার তাকে ফিরতে হবে। বহু দূরের পথ।

কয়েকজন টিচার আগেই চলে গিয়েছিলেন। দু-তিন জন যাঁরা ছিলেন তাঁরাও এবার বিদায় নিলেন।

অন্য কাজের মধ্যেও সমীরণ এক ফাঁকে এসে শুভ্রাকে জিজ্ঞাসা করল 'আপনি চলে যাচ্ছেন?

শুভ্রা বলল 'হ্যাঁ।'

'আমাদের নাটকটা দেখে যাবেন না? ক্লাবের মেম্বাররাই করছে।'

শুভ্রা হেসে বলল 'না! নাটক দেখতে গেলে রাত্ভোর হয়ে যাবে।'

সমীরণ বলল, আজকালকার নাটক অত লম্বা হয় না। যাই হোক আপনি যে এসেছেন তাতেই আমরা কৃতজ্ঞ।' তারপর একটু থেমে বলল 'আপনাকে দিয়ে দীপ জ্বালিয়ে নিয়েছি বলে রাগ করেননি তো?'

শুভ্রা সমীরণের দিকে একবার তাকাল। তারপর ও কথার কোন জবাব না দিয়ে একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা চলি।' [ক্রমশঃ

গৃহে এস গৃহ-লক্ষ্মী

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আকুলি

গৃহের লক্ষ্মী বাহিরে গিয়েছে, গৃহের সুষমা গিয়েছে চলে ;
সান্ধ্যগগনে বাজে নাক শাঁখ, জ্বলেনাক দীপ তুলসী-তলে,
প্রেমের প্রতিমা, গৃহের বেদীতে তুমি না করিলে অধিষ্ঠান,
নিরানন্দের কালো ছায়াপাতে অপহৃত হবে গৃহের মান।
অতিথি তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে, কে দেবে বসিতে আসন পেতে?
আজি অতিথির অভ্যর্থনা হয়না তোমার অঙ্গনেতে।
গৃহের ধর্ম কলুষিত আজ, হয়না সাদরে তাহার সেবা,
গৃহের লক্ষ্মী তুমি না আসিলে সেবার ধর্ম লইবে কেবা?
অন্নপূর্ণা তুমি না আসিলে কে দেবে অন্ন পানীয় জল?
কর্ম কঠোর ক্লান্ত পুরুষে শান্ত করিবে হৃদয় তল।
ছোট্ট শিশুরে দোলনা দোলাতে ঘুমপাড়ানির কে গাবে গান,
কে দেবে সোহাগে চুম্বন এঁকে তুষ্ট করিতে দুষ্ট-প্রাণ?
স্কুলে ভরা মাচা ভেঙে পড়ে গেছে না পারি' সহিতে বাধার ভার ;
নাহি শান্তির সুশীতল ছায়া গৃহ-অঙ্গনে আহা আর।
আঁচলে তোমার লক্ষ মাণিক, গৃহের লক্ষ্মী তুমি না এলে—
পরিপাটী করে কে সাজাবে গৃহ সারা হৃদয়ের দরদ ঢেলে?
এস মঙ্গলা, তপশ্চারিণি! তোমার স্বরূপ প্রকাশ করি'—
লালনে, পালনে, স্নেহ-সমাদরে সেবা পরায়ণা মূরতি ধরি'!
গৃহে এস গৃহ-লক্ষ্মী তোমার আলতায় রাঙা চরণ দুটি—
আত্মত্যাগের পূত হোমানলে দিব্য ভাতিতে উঠুক ফুটি'।

পাটি ও পীঠ

শ্রীঅ—

॥ মূল্য হ্রাস ও চলচ্চিত্র ॥

ভারত সরকার মুদ্রামূল্য হ্রাস করলেন। তার ফলস্বরূপ ব্যবসার ক্ষেত্রে, শিল্প ক্ষেত্রে, লেনদেনের সর্ব্ব ক্ষেত্রেই নানা রূপ প্রতিক্রিয়া যে ঘটবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। কূটনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে না ঢুকে আমরা শুধু চলচ্চিত্র শিল্পের ওপর এই মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া নিয়ে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি।

প্রথমেই আমরা দেখছি যে এই মুদ্রা মূল্য হ্রাস বাংলা চলচ্চিত্রের বিশেষ ক্ষতি সাধন করবে। কারণ, চিত্র নির্ম্মাণের জন্যে যে সকল দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় তার ভারতীয় মুদ্রামূল্য বেড়ে গেল। কাঁচা ফিল্ম ছাড়াও ফিল্ম লেবরেটরীর রাসায়নিক উপাদান, ক্যামেরার নানা রূপ উপকরণ, ষ্টুডিও বাল্ব, টেপ্ রেকর্ডিং ফিল্ম প্রভৃতি অনেক কিছুই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আর এই সব জিনিষ আমদানি করতে এখন থেকে মুদ্রামূল্য হ্রাসের জন্যে অনেক বেশী খরচ পড়বে। তার ওপর কাঁচা ফিল্মের খাতে খরচও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। একটি মাঝারি ধরণের বাংলা চিত্র নির্ম্মাণ করতে যেখানে কাঁচা ফিল্মের জন্য খরচ পড়ত প্রায় ৬০,০০০ টাকার মতন, এখন খরচ পড়বে প্রায় এক লক্ষ টাকার মতন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই হারে চিত্রের নির্ম্মাণমূল্য বেড়ে গেলে অনেক সাধারণ চিত্র-নির্ম্মাতাকেই চিত্র-নির্ম্মাণের সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হবে এবং বিশেষ করে পরীক্ষামূলক চিত্র নির্ম্মাণ করতে কেহই আর সহজে আগ্রহী হবেন না। অবশ্য হিন্দী চিত্র, বিশেষ করে জাঁকজমক-পূর্ণ বড় বাজেটের হিন্দী চিত্র, যার বিদেশে জনপ্রিয়তা লাভের সম্ভাবনা আছে, সেই সব ছবি এই মুদ্রামূল্য হ্রাসে লাভবানই হবে। কারণ, এই ধরণের চিত্র প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন করে থাকে। মধ্যপ্রাচ্য, সংযুক্ত আরবরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এই চিত্রগুলি খুবই জনপ্রিয়। সুতরাং আরও বেশী মুদ্রা অর্জ্জন করে এই ধরণের চিত্র-নির্ম্মাতারা লাভবানই হবেন। কিন্তু বাংলা চিত্রের বাজার স্বতন্ত্র এবং সীমিত। তাই বাংলা চিত্রের ক্ষেত্রে বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন করার সম্ভাবনা কম। আর বাংলা চিত্র-নির্ম্মাতাদের পক্ষে সাধ্যাতীত খরচ করে ঐ সকল হিন্দী চিত্রের ধরণের চিত্র নির্ম্মাণ করা সম্ভবও নয় এবং বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে ঐ ধরণের হিন্দী চিত্রের মতন নিম্নমানের চিত্রনির্ম্মাণে করা অনুচিতও। তাই বাংলা চিত্রকেই এই মুদ্রামূল্য হ্রাসের জন্য বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে বলেই মনে হয়।

তবে সরকারকে যদি বাংলা চিত্র-নির্ম্মাতারা এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল করতে পারেন, তাঁদের অসুবিধা ও ক্ষতির দিকটা দেখিয়ে বোঝাতে পারেন এবং সরকারও এ বিষয়ে মনোযোগী হন, তাহলে হয়ত কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে। সরকারের পক্ষেও এ বিষয়ে বাংলা চিত্রকে সাহায্য করা বিশেষ করে দরকার, কারণ বাংলা চিত্রের উৎকৃষ্টতাই বিদেশে, বিশেষ করে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় চিত্রের সম্মান বৃদ্ধি করে আসছে এবং আরও করবে যদি না এই মুদ্রামূল্য হ্রাসের জন্য বাংলা চিত্র বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আশা করি ভারত সরকার এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের গৌরব বাংলা চিত্রকে রক্ষা করবেন এবং এর প্রসারে ও প্রচারে সাহায্য করবেন।

***

প্রবন্ধাপ্রবন্ধ :

"নায়ক" নামের একটি দল শীঘ্রই একটি চিত্র নির্ম্মাণ শুরু করবেন। পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সহকারীবৃন্দই এই "নায়ক"-এর কর্ম্মীবৃন্দ এবং তাঁদের ছবিটি হবে শরদিন্দু

বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক রহস্য কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত "চিড়িয়াখানা" নামে। ছবিটির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করবেন : উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কনিকা মজুমদার, সুশীল মজুমদার, অহর গাঙ্গুলী ও শৈলেন মুখার্জী।

সত্যজিৎ রায়ও চিত্রটির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন চিত্র-নাট্য রচনা, সঙ্গীত পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়ে।

***

ছবির বাইরে সবিতা বসু

"ফিরে চল" চিত্রে এঁকে আবার দেখা যাবে

ফটো : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রতিধ্বনি" নামে যে নতুন চিত্রটি নিত্যানন্দ দত্তর পরিচালনায় নির্মিত হবে, তার নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

***

পরিচালক সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদারের পরিচালনায় কবি নজরুলের জীবনচিত্র "বিদ্রোহী"-র চিত্র গ্রহণ আরম্ভ হয়ে গেছে।

"গীতছন্দম্ পিকচার্স"-র প্রথম প্রয়াস "হংসমিথুন" নামের চিত্রটি। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দাশগুপ্ত, বিকাশ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষমা গুহঠাকুরতা, রবি ঘোষ, অনুপকুমার ও সবিতা বসু ছবির প্রধান কয়েকজন শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন।

***

চিত্র-পরিচালিকা শ্রীমতী মধু বে এবার তাঁর "অভিশপ্ত চম্বল" ছবিটির অবতারণা গ্রহণ করছেন। কাজ হচ্ছে কালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। ছবিটির পরিচালনা ছাড়াও শ্রীমতী বে পুতলীবাঈ চরিত্রে অভিনয়ও করছেন।

***

"ডি-এল-প্রোডাকশন্স"-এর "বধূবরণ" চিত্রটিতে নায়িকা গীতা দত্ত অভিনয় করছেন এবং তাঁর বিপরীতে অভিনয় করছেন প্রদীপকুমার। প্রদীপকুমার ও গীতা দত্তকে নিয়ে ছবির বেশ কয়েকটি দৃশ্য সম্প্রতি তোলা হয়েছে। পরিচালক দিলীপ নাগ ছবিটি পরিচালনা করছেন এবং ছবির অন্যান্য শিল্পীরা হলেন : বিকাশ রায়, অজী ভট্টাচার্য্য, ভারতী দেবী, অজয় বিশ্বাস, রাখী বিশ্বাস, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, গীতা দে, হরিধন, অহর রায় প্রভৃতি। ছবির কাহিনী লিখেছেন শ্যামল গুপ্ত।

***

বাংলা চিত্র "কাঞ্চন রঙ্গ"কে তামিল ভাষায় রূপদানের আয়োজন করেছেন মাদ্রাজের দুই বিশিষ্ট চিত্রপ্রযোজক সাথীরাম ও নানজুদন। হিন্দী ও তামিল চিত্রের খ্যাত-নামা অভিনেত্রী পদ্মিনী এই চিত্রের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। পরিচালনায় রয়েছেন ক্যামেরাম্যান্ ভিন্‌সেন্ট।

***

"রূপশ্রী পিকচার্স"-এর কয়েকটি চিত্র "৮০-তে আসিও না" দ্রুত সমাপ্তির মুখে।

এই চিত্রের প্রধান চরিত্রটিতে রূপ দিয়েছেন প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌর শী রচিত এই হাসির ছবিটির অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকার শিল্পী হলেন : কমল মিত্র, অহর রায়, অসিতবরণ, গঙ্গাপদ বসু, তরুণকুমার,

"বেবী তাবাসম"—সেই ছোট্ট মেয়েটি আজ যৌবনময়ী অভিনেত্রী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন।
এঁর চলতি ছবি হল "মিথো কা বেটা"

রবি ঘোষ, রেণুকা রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা গুহ-ঠাকুরতা। গোপেন মল্লিক ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক।

***

"টকিনে ইউনিট"-এর "লীলা" চিত্রটির কাজ প্রায় সমাপ্ত। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ছবিটির পরিচালক এবং প্রধান চরিত্রটিতে রূপ দিয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

***

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস "জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার" ঐ নামেই চিত্ররূপ লাভ করে এখন মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। অজিত লাহিড়ী ছবিটি পরিচালনা করেছেন এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র প্রভৃতি শিল্পী ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে রূপ দিয়েছেন।

***

নবাগতা সবিতা সিনহা
"পাগল ঠাকুর" চিত্রে বৌঠান-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ফটো: অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

"এস-এস-চিত্রমন্দির"-এর "ঘেরে দাস" চিত্রটি শীঘ্রই কলিকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। বাংলা ছবি "বাঈশা"-র এই হিন্দী রূপটি পরিচালনা করেছেন সতোন বসু এবং সুরারোপ করেছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

দেবকুমার, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, অভি ভট্টাচার্য, মালা সিনহা, মহেশ ও রতন এই চিত্রের প্রধান শিল্পীগণ।

***

দেশে বিদেশে :

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'আর-ভি-বি'র 'নায়ক' চিত্রটি বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রিভিউয়িং কমিটি কর্তৃক ভারতের একমাত্র প্রতিযোগী চিত্ররূপে নির্বাচিত হয়েছে। ২৪শে জুন এই চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হবে।

***

ভেনিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে ভারতীয় চলচ্চিত্র হিসাবে প্রদর্শনের জন্য তপন সিংহ পরিচালিত বাংলা ছবি "অতিথি"কে মনোনীত করা হয়েছে।

***

আগামী ২১শে আগষ্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এডিনবরায় যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে তাতে হরিসাধন দাশগুপ্ত পরিচালিত "একই অঙ্গে এত রূপ" বাংলা চিত্রটি প্রদর্শনের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছে।

***

মৃণাল সেন-কৃত "আকাশ কুসুম" চিত্রটিও এই এডিনবরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য পেশ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

***

বিখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্র গায়ক মহম্মদ রফি পোর্ট অফ স্পেনে ভারতীয় হাই-কমিশনারের কাছে আতীয় সাহায্য তহবিলের জন্য ৬,২১৩ ডলারের একটি চেক্ দিয়েছেন। সম্প্রতি পোর্ট অফ স্পেনে অনুষ্ঠিত মহম্মদ রফি ও তাঁর সম্প্রদায়ের এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে এই অর্থ সংগৃহীত হয়।

ত্রিনিদাদ, গায়না ও সুরিনামে রফি ও তাঁর শিল্পীদল এক মাস ধরে সফর করেছেন।

***

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন প্রবর্তিত "নেহরু মেমোরিয়াল্ ট্রাষ্ট" এর সাহায্যকল্পে অর্থ সংগ্রহের জন্য বিলাতে "ফেষ্টি-ভ্যাল্ অব মিউজিক্" নামে এক উৎসবের আয়োজন করে-

*

জনপ্রিয়া নায়িকা

সুপ্রিয়া চৌধুরী

*

ছেন লণ্ডনের শঙ্কর প্রেজেণ্টেশন্ লিমিটেড্। আগামী অক্টোবর মাসে এই সঙ্গীত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবে আধুনিক সঙ্গীত ও লোক-সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকবে এবং অনুষ্ঠান-সূচী তৈরী করা হবে বিশেষ করে ভারতীয় শ্রোতা-দর্শকদের কথা স্মরণে রেখেই।

শঙ্কর প্রেজেণ্টেশন্-এর উদ্যোমান পরিচালক ও লণ্ডন প্রবাসী শ্রীধীরেন্দ্র শঙ্করের কাছ থেকে আরও জানা গেল যে, লণ্ডন, মাঞ্চেষ্টার ও বার্মিংহাম এই তিনটি বড় শহরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে ভারতের বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করবেন।

এর পর শঙ্কর প্রেজেণ্টেশন্ যে উৎসবটির ব্যবস্থা করছে, তার অনুষ্ঠানসূচী রচিত হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিল্পীদের সমাবেশে।

***

প্রযোজক আর-ডি-বনশল্ পরিচালক সুধীর মুখার্জিকে তাঁর পরবর্তী সঙ্গীতমুখর রোমান্টিক চিত্র "চৈতালী"-র পরিচালকরূপে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। এর আগে বনশল্ ও মুখার্জির যুক্ত প্রচেষ্টায় "শরীবাবুর সংসার" ও "শেষ পর্যন্ত" চিত্র দু'টি বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল। "চৈতালী" চিত্রটিও তাঁরা সর্বপ্রযত্নে সাফল্যমণ্ডিত করবার চেষ্টা করবেন বলে মনস্থ করেছেন।

সুরকার শচীনদেব বর্মণ অনেককাল পরে আবার বাংলা চিত্র জগতে ফিরে আসছেন এই "চৈতালী" চিত্রের সুর-স্রষ্টারূপে। আর নায়ক নায়িকার ভূমিকাটির আকর্ষণও বড় কম নয়। এই দু'টি ভূমিকায় দেখা যাবে উত্তমকুমার ও সুচিত্রাকে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন গৌরাঙ্গ বসু।

***

বৃটেনে একমাত্র ভারতীয় বৃটিশ চিত্র প্রযোজক এবং Molliko Films (London) Limited-এর ম্যানেজিং

পুণ্যপ্রভা দেবী

ডিরেক্টর উমেশ মল্লিকের মাতা পুণ্যপ্রভা দেবী গত ৩০শে বৈশাখ তাঁর বাগবাজারস্থ বাস ভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৩ বৎসর হয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে উমেশ মল্লিক তাঁর নতুন বৃটিশ চিত্র "কুবলাওখান" নির্মাণে এখন লণ্ডনে ব্যস্ত আছেন। এই চিত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর শীঘ্রই ভারতে আসবার সম্ভাবনাও আছে।

***

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা ঃ

হাম্বুর্গে (পশ্চিম জার্মানী) অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ অপরাজিত অবস্থায় শীর্ষস্থান (যে-সরকারীভাবে) লাভ করেছে। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল এই বারটি দেশ—ভারতবর্ষ, হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম, পাকিস্থান, কেনিয়া, ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রিয়া। এই খেলার চূড়ান্ত তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল হল্যাণ্ড এবং পশ্চিম জার্মানী—উভয়েরই ১০ পয়েন্ট—ভারতবর্ষের থেকে এক পয়েন্ট কম। ভারতবর্ষের ৭টি খেলার ফলাফল জয় ৪ এবং ড্র ৩। ভারতবর্ষ ১-১ গোলে পাকিস্থান, ১-১ গোলে পশ্চিম জার্মানী এবং ৩-০ গোলে বেলজিয়ামের সঙ্গে খেলা ড্র করেছিল। প্রতিযোগিতায় অপরাজিত ছিল মাত্র দুটি দেশ—ভারতবর্ষ এবং পশ্চিম জার্মানী। গত ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় যৌথাদক বিজয়ী পাকিস্থান ৭টি খেলায় ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তালিকায় চতুর্থ স্থান পায়। পশ্চিম জার্মানী ১-০ গোলে এবং হল্যাণ্ড ২-১ গোলে পাকিস্থানকে পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক গোল (১৩টি) এবং সর্বাধিক খেলায় (৫টি) জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে হল্যাণ্ড। হল্যাণ্ডের খেলা প্রধানতঃ আক্রমণাত্মক এবং ভারতবর্ষের খেলার নীতি আত্মরক্ষামূলক। ভারতবর্ষের খেলার পদ্ধতি সূক্ষ্ম কারুকার্যময়, অপরদিকে দ্বিতীয়স্থান অধিকারী হল্যাণ্ড এবং পশ্চিম জার্মানীর খেলা বলিষ্ঠতায় প্রাণবন্ত। ইউরোপীয় দেশগুলির হকি খেলার পদ্ধতি হল 'হিট-এ্যাণ্ড-রান'। পাকিস্থান তার চিরাচরিত ভারতীয় পদ্ধতি ত্যাগ ক'রে আজ ইউরোপীয় পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে বিশেষ লাভবান হয়েছে বলে মনে হয় না। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলার পদ্ধতিতে বিশেষ রকমের গলদ ধরা পড়েছে। ভারতীয় হকি দল তাদের সাতটা খেলায় মোট ৬৩টা কর্ণার সট পেয়ে মাত্র একটা গোল দিতে পেরেছিল—অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের পক্ষে নিঃসন্দেহে চরম ব্যর্থতার পরিচয়। আগামী ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষকে যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে তার আভাস এখনই পাওয়া যাচ্ছে।

হাম্বুর্গের আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ চারটি খেলায় জয়ী হয় : ১০-০ গোলে গ্রেটবৃটেনকে, ২-০ গোলে ফ্রান্সকে, ১-০ গোলে অষ্ট্রিয়াকে এবং ২-০ গোলে হল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। খেলা ড্র করে ৩টি : পাকিস্থানের সঙ্গে ১-১ গোলে, পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে ১-১ গোলে এবং বেলজিয়ামের সঙ্গে ৩-০ গোলে।

উবের কাপ :

মহিলাদের দলগত আন্তর্জাতিক উবের কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে জাপান ৫-২ খেলায় গত তিনবারের বিজয়ী আমেরিকাকে পরাজিত করে এশিয়া মহাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম উবের কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, উবের কাপ প্রতিযোগিতায় জাপান তার যোগদানের প্রথম বছরেই সাফল্য লাভ করলো। চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের সাতটি খেলায় (সিঙ্গলস তিন এবং ডাবলস চার) মধ্যে জাপান জয়ী হয় তিনটি সিঙ্গলস এবং দুটি ডাবলসের খেলায়।

উবের কাপ প্রতিযোগিতা প্রতি তৃতীয় বছরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছর (১৯৫৭) থেকে আমেরিকা উপর্যুপরি তিন বার (১৯৫৭, ১৯৬০ ও ১৯৬৩) উবের কাপ জয় করে।

বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ :

লণ্ডনের আর্মেনিয়ান ফুটবল ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধের অপরে ক্যাসিয়াস ক্লে (মহম্মদ আলী) ই লাণ্ডের হেনরী কুপারকে পরাজিত ক'রে হেভী ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে তাঁর বিশ্ব খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এই লড়াই ১১ রাউণ্ড পর্যন্ত নির্দ্ধিষ্ট ছিল, কিন্তু ৫ম রাউণ্ডেই রেফারী খেলা বন্ধ করেন।

বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা :

১৯৬৩ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিশ দল ১-০ গোলে কোর অব সিগন্যালস দলকে (ডলফিন) পরাজিত করে। তাদের এই প্রথম বেটন কাপ জয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একই বছরে পাঞ্জাব পুলিশ দল রোভার্সদের আগা খাঁ কাপ এবং কলিকাতার বেটন কাপ জয়ের গৌরব অর্জন করলো। পাঞ্জাব পুলিশ দল ইতিপূর্ব্বে ১৯৬১ সালের ফাইনালে সেণ্ট্রাল রেলওয়ে দলের কাছে পরাজিত হয়েছিল। অপরদিকে বেটন কাপের ফাইনালে কোর অব সিগন্যালস দলের এই প্রথম খেলা।

এশিয়ান ফুট বল প্রতিযোগিতা :

ফিলিপাইনের ম্যানিলা শহরে অনুষ্ঠিত ৮ম এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাটি ১-১ গোলে ড্র যায়। ফলে ফাইনাল খেলায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্রায়েল এবং ব্রহ্মদেশকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৬৪ সালের ফাইনাল খেলাটি ড্র যাওয়ার ফলে ইস্রায়েল এবং ব্রহ্মদেশকে যুগ্মভাবে পুত্রা কাপ বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৯৬৮ সালের প্রতিযোগিতায় এই বারটি দেশ যোগদান করেছিল : ইস্রায়েল, ব্রহ্মদেশ, ডেনমার্ক, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, জাপান, মালয়েশিয়া, সিংহল, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং হংকং। এই বারটি দেশ প্রথমে লীগ প্রথায় খেলে ; কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নক্-আউট প্রথায় খেলা হয়। কোয়ার্টার-ফাইনালে ভারতবর্ষ ০-৪ গোলে ইস্রায়েলের কাছে পরাজিত হয়।

ফেডারেশন কাপ :

তুরিনে (ইতালী) অনুষ্ঠিত ১৯৬৩ সালের মহিলাদের আন্তর্জাতিক ফেড'রেশন লন্ টেনিস কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে আমেরিকা ২-০ খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে দ্বিতীয় বার ফেডারেশন কাপ জয় করেছে। সেমি-ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ২-১ খেলায় গত দু'বছরের ফেডারেশন কাপ বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়াকে এবং আমেরিকা ২-১ খেলায় বৃটেনকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ :

ম্যাঞ্চেষ্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে আয়োজিত ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের ১৯৬৬ সালের টেষ্ট সিরিজের প্রথম টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস এবং ৪০ রানে ইংল্যাণ্ডকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। পাঁচদিনের বরাদ্দ খেলা তৃতীয় দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দ্ধিষ্ট সময়ের ৪৫ মিনিট আগে শেষ হয়ে যায়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনের খেলায় ৫টা উইকেট খুইয়ে ৩৪৩ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনে ৪৮৪ রানের মাথায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। তাদের প্রথম ইনিংস ৮ ঘণ্টা ১০ মিনিট স্থায়ী ছিল। দ্বিতীয় দিনের বাকি খেলার সময়ে ইংল্যাণ্ডের ৮টা উইকেট পড়ে মাত্র ১৬০ রান উঠেছিল।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড তাদের বাকি দুটো উইকেটে মাত্র ৪ রান করেছিল—১৬১ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের ৪৮৪ রান থেকে ৩২৩ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ২৭৭ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদল এক ইনিংস এবং ৪০ রানে জয়ী হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের এই জয়লাভের প্রধান ভূমিকায় খেলেছিলেন বর্ত্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অল-রাউণ্ড খেলোয়াড় অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স এবং অব-স্পিন বোলার স্যান্স গিবন। সোবার্স প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী (১৬১ রান) করেন এবং ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৮৭ রানে ৩টে উইকেট পান ; তাছাড়া তিনি লটলেগ ৫টা ক্যাচ নিয়েছিলেন। অপর দিকে স্যান্স গিবন খেলাতে ১০৬ রানে ১০টা উইকেট পান (৩৭ রানে ৫ এবং ৬৯ রানে ৫ উইকেট)।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১৮।৬।৬৬ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আষাঢ়ের আকর্ষণ

আগামী আষাঢ় সংখ্যায়

লিখছেন :

বড় গল্প—শ্রীদিলীপকুমার রায়

ও

শ্রীমণীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্টুন গল্প—শ্রীঅখিল নিয়োগী

প্রবন্ধ—ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী

শ্রীপ্রহ্লাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রভৃতি

কবিতা—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

সুধীর গুপ্ত

আশুতোষ সান্যাল

প্রভৃতি

চলতি উপন্যাস—প্রফুল্ল রায়

ও

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

এবং আরও অনেকের উৎকৃষ্ট লেখা প্রকাশিত হবে।

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১০ই আষাঢ়ের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১৫৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৭·৫০ সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি, পি, খরচ পৃথক লাগিবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নূতন গ্রাহক' কথাটি উল্লেখ করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—**ভারতবর্ষ**

— প্রকাশিত হইল —

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

শ্রমিক-বিজ্ঞান

অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্যের উৎপাদন উদ্যোগ-শিল্পের চরম লক্ষ্য। আধুনিক উন্নত সকল রাষ্ট্রের ভিত্তিই এই উদ্যোগ-শিল্পের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই উদ্যোগ-শিল্পের সৃষ্টি ও প্রসার বিঘ্নহীন নয়। এর একদিকে আছে মালিকের স্বার্থ—অপর দিকে শ্রমিকের। রাষ্ট্রের স্বার্থও উপেক্ষা করা যায় না। সব কিছু মিলে এক জটিল অবস্থা। এই জটিল ব্যাপারের বিভিন্ন প্রতিবন্ধক ও সমস্যাগুলি লেখক সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন যাতে এর ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ত্রুটিমুক্ত হ'য়ে দেশে এক স্বয়ং-নির্ভর সুদৃঢ় শিল্প-ব্যবস্থা গড়ে উঠ্‌তে পারে।

অপরাধ-তত্ত্বের মত এই বিষয়ের আলোচনাতেও লেখক
বাংলা সাহিত্যে পথ-প্রদর্শকের কাজ করেছেন।

ডঃ নবগোপাল দাস লিখিত ভূমিকা সহ।

দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৯

—উপহার দিবার উপযোগী ভাল ভাল বই—

নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত

মেঘদূত

নিখিল বিরহী-জন-হিয়ার প্রতি অসীম সমবেদনা নিয়ে অমর কবি কালিদাস তাঁর অনুপম কাব্য "মেঘদূত"-এর শ্লোকে শ্লোকে—বিরহের যে অভিনব স্বর্গলোক সৃষ্টি ক'রে গেছেন—ইহা সেই অক্ষয় "মেঘদূত" কাব্যের সুললিত বাংলায় স্বচ্ছন্দ কাব্যানুবাদ। নয়নমুগ্ধকর চিত্রাবলীতে সুসজ্জিত। দাম—সাত টাকা

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির তিন শতাধিক রোবাই বহু যত্নে তাহাদের মূলগত তত্ত্বানুসারে এবং ভাবানুযায়ী পাঁচটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া বিরাট কলেবরে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত। বহু ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্রের সমাবেশে অনবদ্য।

দাম—সাত টাকা

॥ উৎকৃষ্ট মুদ্রণ—চিত্রের প্রাচুর্য প্রত্যেক বইখানির বৈশিষ্ট্য ॥
উপহার দিয়া অথবা উপহার পাইয়া
আপনাকে খুশি হইতেই হইবে

কান্তকবি রজনীকান্তের

বাণী ২৲

অনুপম কাব্যগ্রন্থ।

ক্ষীরোদনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত

ধরণী-সম্ভার

ধরণীর নিত্য-নূতন রূপ-পরিবর্তনের মাঝে আবেগপ্রবণ সচকিত বাহা অন্বেষণ করিয়া ফিরে—এই মহাকাব্যে তাহারই অপূর্ব আস্বাদ। দাম—পাঁচ টাকা

সুরেন্দ্রনাথ রায়

প্রণীত

কুল-লক্ষ্মী

বালিকাগণ কিরূপে শিক্ষিতা হইলে নিজগুণে সকলকে সুখী করিতে পারিবে—তাহাই সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝান হইয়াছে। দাম—দুই টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

REG. NO. C. 679—BHARATVARSHA. Phone—74-1744 Gram—Publicasun Cal.
Price—Single Copy—Rs. 1/25, Subscriptions—Annual—Rs. 15/-, Half-yearly—Rs. 7/50.

— প্রকাশিত হইল —

শক্তিপদ রাজগুরুর বিপুল-কলেবর নূতন উপন্যাস

বাসাংসি জীর্ণানি

একদিকে কালজীর্ণ পুরাতন জমিদারী-তন্ত্রের পতন—অপরদিকে শিল্প-সমৃদ্ধ নূতন যান্ত্রিক যুগের উত্থান। প্রাচীন আরণ্যক পরিবেশের স্বর্গরাজ্যে রূপান্তর। হারানোর বেদনা আর প্রাপ্তির আনন্দে কম্পমান, ভাঙা আর গড়া, সমস্যা ও সমাধানের অভিনব বৈচিত্র্যে দোদুল্যমান একদল নর-নারী। তারকরত্ন আর অতুল কামার, অশোক আর প্রীতি, ভুবন আর কদম-বৌ, গোকুল আর পানু দাস, কারিগর আর মিষ্টি, অবিনাশ আর নিতে বাউরী, জীবন আর মণিমালা, প্রশান্ত আর রাঠী, সতীশ আর এমোকালী, সনাতন আর গঙ্গামণি—এরকম আরো অনেকেই এই উপন্যাসে ভিড় ক'রে এসেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রই মনে দাগ কাটার মত। কিন্তু ভাষাহীন নারাণ ঠাকুর লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি

পরিবর্তনের পটভূমিতে জীবনের নূতন মূল্যায়ন।

চেনা-জানা পরিবেশে নূতন ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা এমন একখানি জীবন্ত উপন্যাস অনেকদিন বাঙলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়নি।

দাম—চৌদ্দ টাকা

—অন্যান্য উপন্যাস—

গৌড়জন বধূ ৫-৫০
কেউ ফেরে নাই ৭-৫০
কাজল গাঁয়ের কাহিনী (২য় সং) ৫,
মণিবেগম (৩য় সং) ৬-২৫
কুমারী মন (২য় সং ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৩-৫০
জীবন-কাহিনী (ছায়াচিত্রে রূপায়িত) ৪-৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬